বাংলা একাডেমী

চরিতাভিধান

বাঙালির সাহিত্য, শিক্ষা, সংগীত, চিত্রকলা,
সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন,
সাংবাদিকতা, স্বাধিকার-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ
প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য
মনীষীদের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত ও অবদান
এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত

গ্রন্থটি ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমী
প্রকাশিত 'চরিতাভিধান' গ্রন্থের পরিবর্ধিত,
পরিমার্জিত ও সংশোধিত তৃতীয়
সংস্করণরূপে প্রকাশিত

বর্তমান সংস্করণে ভুক্তির সঙ্গে প্রায় ১০০০
চিত্র সংযোজিত

প্রায় ১৩শত ভুক্তি সম্বলিত এই গ্রন্থ থেকে
যাতে সাধারণ পাঠক বাঙালি মনীষীদের
জীবন সম্পর্কে ধারণা পান এবং গবেষকগণ
যাতে তাঁদের গবেষণার প্রাথমিক উপাত্ত
সংগ্রহ করতে পারেন, সে লক্ষ্যে ভুক্তিসমূহ
সংকলিত

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত অন্যান্য
অভিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্তমান
সংস্করণের নামকরণ, অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণ প্রভৃতি
পুনর্বিন্যস্ত

একাডেমীর অন্যান্য অভিধান ও শব্দকোষ

- Bangla Academy English-Bengali Dictionary
- Bangla Academy Bengali-English Dictionary
- বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
- বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান
- বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান
- বাংলা একাডেমী ছোটদের অভিধান
- বাংলা একাডেমী সহজ বাংলা অভিধান
- বাংলা একাডেমী সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান
- বাংলা একাডেমী বাংলা উচ্চারণ অভিধান
- বাংলা একাডেমী বানান-অভিধান
- বাংলা একাডেমী আরবি-বাংলা অভিধান
- অর্থনীতি অভিধান
- সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ
- আইন-কোষ
- সঙ্গীত-কোষ
- উদ্ভিদবিদ্যা শব্দকোষ
- বৈজ্ঞানিক শব্দকোষ
- নজরুল শব্দকোষ
- সমাজতত্ত্বের প্রত্যয়বিন্যাস
- বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ
- পরিভাষা কোষসমূহ

বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান

বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ

সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান
সেলিনা হোসেন
আজহার ইসলাম
নূরুল ইসলাম
অপরেশ কুমার ব্যানার্জী
আমিনুর রহমান সুলতান
তপন বাগচী

বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান
প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২/জুন ১৯৮৫
দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ ১৪০৩/ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮/ জুন ২০১১

বাএ ৬০১৯
[২০১০-২০১১ গসফো : সংকলন ৪]

পাণ্ডুলিপি
সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক
অপরেশ কুমার ব্যানার্জী
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস
বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
চারশত টাকা মাত্র

Bangla Academy Charitabhidhan [Dictionary of Biography]. Published by Aparesh Kumar Banerjee, Director, Research, Compilation and Folklore Division Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Edition June 1985. Revised Third Edition June 2011. Price Tk. 400.00 US $ 10.

ISBN 984-07-5138-7

তৃতীয় সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান সবসময় হাতের কাছে রাখার মতো একখানি অপরিহার্য গ্রন্থ। গবেষক, ইতিহাস ও ঐতিহ্য-সন্ধানী পাঠক, শিক্ষক-অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ছাত্র এবং সংস্কৃতিকর্মীসহ সকল অনিসন্ধিৎসু মানুষের কাছে এই গ্রন্থের চাহিদা রয়েছে বলে আশা করা যায়। সেদিক থেকে এ-গ্রন্থ প্রবহমান ইতিহাস ও ইতিহাস-নির্মাতাদের জীবন ও কর্ম-সাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-নির্দেশিকামূলক দলিলও বটে। বর্তমান তৃতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণে প্রথম দুই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্টজন ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এমন সব সাম্প্রতিককালে প্রয়াত গুণীজনকেও। ভুক্তি নির্বাচন এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের তথ্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর পূর্বতন নীতিমালার কোনো ব্যত্যয় ঘটানো হয়নি। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্টদের ইতিবাচক-নেতিবাচক দুধরনের কর্মকাণ্ডকেই তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত পুরাতন-নতুন মিলিয়ে ভুক্তির সংখ্যা ১২৫৮টি। এ সংস্করণে নতুন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ২৪৭টি ভুক্তি। বহু ক্ষেত্রে পুরনো ভুক্তিসমূহের তথ্যশুদ্ধি এবং আংশিক পুনর্লিখনেরও প্রয়োজন হয়েছে। পুরনো ভুক্তিসমূহের অস্পষ্ট ছবি পরিবর্তনসহ ২৩৬টি নতুন ছবি সংযোজন করা হয়েছে। ফলে এই তৃতীয় সংস্করণটি অনেক বেশি তথ্যনিষ্ঠ এবং প্রকাশনা-মানে উন্নত করা সম্ভব হয়েছে। ভুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্মতারিখের ক্ষেত্রে যেখানে আগের সংস্করণে শুধু বাংলা সন তারিখেরই উল্লেখ ছিল এই সংস্করণে তার অনুষঙ্গী গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সন তারিখের উল্লেখ করা হয়েছে। এই শ্রমসাধ্য কাজটি সম্পন্ন করেছেন সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক ড. তপন বাগচী। পূর্ববর্তী সংস্করণ দুটির নানা ক্রটি এবং অপূর্ণতা দূর করার ক্ষেত্রে নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল আহসান চৌধুরী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস)-এর অধ্যাপক ড. স্বরোচিষ সরকার। তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। কিছু নতুন ভুক্তি সংকলন করেছেন জনাব শামসুল হোসাইন, অধ্যাপক শফিউল আলম, অধ্যাপক শান্তনু কায়সার, মাননীয় সাংসদ বেবী মওদুদ, অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী, জনাব অনুপম হায়াৎ, ড. শাহীদা আখতার, ড. বিপ্লব বালা, অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকার, ড. আমিনুর রহমান সুলতান, ড. তপন বাগচী, অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর, জনাব মামুন সিদ্দিকী, জনাব তারেক রেজা এবং কোনো কোনো তথ্য ও চিত্র সংগ্রহে সহায়তা করেছেন ড. ফিরোজ মাহমুদ, ড. তসিকুল

ইসলাম রাজা, জনাব বাবু রহমান, জনাব আহমাদ মাযহার, জনাব সুমন কুমার দাস প্রমুখ। তাঁদের সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক জনাব অপরেশ কুমার ব্যানার্জী, সংকলন বিভাগের উপপরিচালক ড. তপন বাগচী এবং ফোকলোর বিভাগের উপপরিচালক ড. আমিনুর রহমান সুলতান এই সংস্করণ প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সাথে এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন।

এই ধরনের কাজ পূর্ণতায় ও বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করা কখনোই সম্ভব নয়। তাই এই বইয়েও কিছু অপূর্ণতা এবং ছোটখাট ত্রুটি থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। সহৃদয় পাঠক এবং ব্যবহারকারীবৃন্দ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সন্নিবেশিত করা সম্ভব হবে।

এ-বইয়ের প্রথম সংস্করণের তথ্য সংগ্রহ, ভুক্তি রচনা ও সম্পাদনার কাজ করেছিলেন শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন। তাঁদের পরেই ছিলেন আজহার ইসলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে এই ক্রমবিন্যাস রক্ষিত হয়নি। তাই এ-সংস্করণে প্রচলিত প্রথানুযায়ী সম্পাদক হিসেবে তাঁর নামও সংযোজন করা হলো।

আশা করি, বর্তমান গ্রন্থখানি পাঠকদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

প্রথম সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

চরিতাভিধান প্রকাশের পরিকল্পনা বাংলা একাডেমীর অনেক দিনের। আমরা আনন্দিত, দেরিতে হলেও বইটি প্রকাশ করতে পেরেছি।

বর্তমান যে-ভূখণ্ড বাংলাদেশ নামে পরিচিত, সে-ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক বিবর্তনের অথবা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন মেটানোর কাজে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন, একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেবল তাঁদেরই সংক্ষিপ্ত জীবনী এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। গ্রন্থের ব্যাপ্তি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। কোনো জীবিত ব্যক্তির জীবনী এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

চরিতাভিধানের ভুক্তিসমূহ একটি কমিটি পরীক্ষা করে দেখেছেন ও অনুমোদন করেছেন। কমিটিতে ছিলেন প্রফেসর সালাহউদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও ড. আনোয়ার হোসেন। কমিটির সদস্যদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

ভুক্তিসমূহ প্রাথমিকভাবে সংকলন করেন একাডেমীর একদল কর্মকর্তা। এঁরা ছাড়াও একাডেমীর বাইরে থেকে কয়েকজন লেখক* ও শিল্পী আমাদের সাহায্য করেছেন। এ সব রচনার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন জনাব সেলিনা হোসেন। সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করেন জনাব শামসুজ্জামান খান। দুর্লভ তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন সর্বজনাব বদরুদ্দীন উমর ও আমানুজ্জামান খান। বাংলা একাডেমী প্রেসের সহকর্মীবৃন্দ এ গ্রন্থ প্রকাশের কাজে অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

কিছু কিছু ভুক্তি পরিশিষ্ট সংযোজিত হলো। মুদ্রণের কাজ শুরু হবার আগে এ সব ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বলে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে।

তথ্যসমূহ যতদূর সম্ভব নির্ভুল করার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবুও ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোনো সহৃদয় পাঠক যদি ভুলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাহলে আমরা বাধিত হবো। অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিলো, এমন কোনো কোনো জীবনী প্রধানত তথ্যাভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এজন্য আমরা দুঃখিত। চরিতাভিধানের পরবর্তী সংস্করণ উন্নততর হবে বলে আশা করি। সবাইকে শ্রদ্ধা জানাই।

মনজুরে মওলা
মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২/ ১০ জুন ১৯৮৫

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'চরিতাভিধান' (১৯৮৫) গ্রন্থটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান' নামে দ্বিতীয় সংস্করণরূপে প্রকাশিত হলো। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়াত যেসব মনীষীর অবদান বাঙালির ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা সংযোজন করাতে বর্তমান সংস্করণে প্রায় দুইশত ভুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সংস্করণে প্রায় তিনশত ভুক্তি নতুনভাবে লেখা হয়েছে এবং

---

* আজহার ইসলাম, আলমগীর জলিল, জাকিউল হক, মফিজুল ইসলাম, কল্যাণী ঘোষ, নূরুল ইসলাম, সামীয়ুল ইসলাম, জাহিদুর রহমান, আবদুল ওহহাব, হায়াৎ মামুদ, কায়েস আহমেদ, মোবারক হোসেন খান, হাশেম খান ও মুস্তাফা পান্না।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অবশিষ্ট ভুক্তিগুলোকে পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়েছে। এ সংস্করণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, ভুক্তির মধ্যে মনীষীদের স্ট্যাম্প আকারের প্রায় সাতশত ছবির সংযোজন– পাঠক, গবেষক ও ব্যবহারকারীর কাছে যা বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। এছাড়া এই ছবিগুলো প্রাসঙ্গিক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পাঠকের মনে একটা ধারণা সৃষ্টি করবে। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত অন্যান্য অভিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনে এ অভিধানের অঙ্গসজ্জা এবং মুদ্রণে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রয়াত যেসব মনীষীর অবদান বাঙালির সাহিত্য, শিক্ষা, সংগীত, শিল্পকলা, সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা, স্বাধিকার-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, প্রথম সংস্করণে ভুক্তি নির্বাচনের সময়ে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছিলো। বর্তমান সংস্করণে নতুন ভুক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অভিন্ন দৃষ্টিকোণ রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। নানান দিক দিয়ে এবং নানাভাবে যুগে যুগে যাঁরা এ দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় বিনির্মাণ তথা বাঙালির আত্মপরিচয় সৃজন করে নতুন প্রজন্মকে দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন, তাঁদের পরিচিতি সংরক্ষণ করা এবং সহজে বহনযোগ্য একটি সংস্করণে তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ জাতীয় উদ্যোগের প্রয়াস। জাতীয় ইতিহাস সঠিকভাবে লিখিত হওয়ার দায়িত্ববোধ থেকে এই গ্রন্থে কতিপয় খ্যাত-অখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিকেও স্থান দিতে হয়েছে।

বর্তমান সংস্করণে ব্যবহৃত ছবিগুলো সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। প্রাক্তন মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ চরিতাভিধানটিকে বর্তমান সংস্করণরূপে প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তাঁর উদ্যোগে গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক নূরুল ইসলাম বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের পাতা ও দুর্লভ গ্রন্থ থেকে মনীষীদের ছবিগুলো সংগ্রহ করেছেন এবং এই সংস্করণের সংকলকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কয়েকটি ছবি ভুক্তিবদ্ধ মনীষীদের আত্মীয়স্বজন অথবা হিতাকাঙ্ক্ষীরা আমাদের সরবরাহ করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশের মুহূর্তে নাম না জানা সেই সব চিত্রগ্রাহককে স্মরণ করি, অমূল্য এই প্রতিকৃতিগুলো যাঁরা ক্যামেরাবদ্ধ করেছিলেন। বহু ভুক্তিতে ছবি সংযোজন করা সম্ভব হয়নি, এজন্যে আমরা দুঃখিত। সহৃদয় পাঠকের নিজস্ব সংগ্রহে যদি এছাড়া আরো কোনো ছবি থেকে থাকে, এবং তা যদি তিনি আমাদের ব্যবহারের সুযোগ দেন, তাহলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংযোজন করা যাবে।

গ্রন্থটি প্রণয়ন ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। এ ব্যাপারে গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক সেলিনা হোসেনের সক্রিয় ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহ ও উদ্যোগ গ্রন্থটির এই সংস্করণ প্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক জনাব ওবায়দুল ইসলাম বর্তমান সংস্করণের আঙ্গিক সম্পর্কে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া নতুন ভুক্তি সংকলন, ছবিসংগ্রহ প্রভৃতি কাজে যাঁরা সম্পাদকমণ্ডলীকে বিভিন্ন সময়ে সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমিরুল মোমেনীন, শামসুদ্দীন চৌধুরী, মোবারক হোসেন, ডক্টর শহীদুল্লাহ্ মৃধা, আ. ব. ম. শামসুদ্দীন, শেরজাহান সিদ্দিকী, মোহাম্মদ আবদুর রশিদ, সফিজ উদ্দীন প্রমুখ অন্যতম। কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন মোহাম্মদ শাহনূর আলম, মোবারক হোসেন, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, আমির উদ্দীন, রেজাউল করিম ওয়ারেছী, আবু মোহাম্মদ ইমদাদুল হক এবং প্রয়াত মীর মোশরেফা আলী দিবা। এ উপলক্ষে সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ।

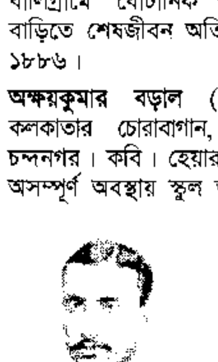
এ জাতীয় গ্রন্থে নানা ধরনের ভুলত্রুটি থাকার আশঙ্কা থাকে। সহৃদয় পাঠক যদি সেগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাহলে কৃতজ্ঞ ও বাধিত হবো।

মনসুর মুসা
মহাপরিচালক
১২ মাঘ ১৪০৩/ ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৭

বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান



অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)॥ জন্ম. চুপী গ্রাম, বর্ধমান, ১৫ জুলাই ১৮২০। প্রাবন্ধিক। পীতাম্বর দত্ত ও দয়াময়ী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে দু'বছর পড়ার পর পিতৃবিয়োগের ফলে বিদ্যালয় ত্যাগ করে কর্মজীবনে প্রবেশ। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা পরিত্যাগ করলেও সারাজীবন নানা বিদ্যার চর্চা। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ফারসি, জার্মান ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন। গণিত, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন। ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রবন্ধাদি বঙ্গানুবাদ করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশ। এভাবেই তাঁর গদ্যরচনার সূত্রপাত। ১৮৩৯ এ তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম সভ্য মনোনীত এবং কিছুদিন উক্ত সভার সহ-সম্পাদক। ১৮৪০-এ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার (১৮৪০) পদার্থবিদ্যা ও ভূগোলের শিক্ষক নিযুক্ত। ১৮৪২-এ তৎকর্তৃক 'দিগ্‌দর্শন' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। ১৮৪৩-এ ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপাত্র 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। ১৮৫৫ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। বছর তিনেক বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সমসাময়িক জীবন ও সমাজ সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নির্ভীকভাবে মতামত প্রকাশ। এ-সকল বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জমিদারি প্রথা, নীলচাষ-সম্পর্কিত মতামত। ১৮৪৩-এর ২১ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অপর ১৯ জন বন্ধুর সঙ্গে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ। এই দলই প্রথম দীক্ষিত ব্রাহ্ম। তৎকর্তৃক ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলাভাষায় প্রার্থনার প্রবর্তন। পরে প্রার্থনাদির প্রয়োজন অস্বীকার এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী অক্ষয়কুমার দত্ত শেষ জীবনে অনেকটা অজ্ঞেয়বাদীতে পরিণত। বাংলাভাষায় পাশ্চাত্য-রীতিতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা অক্ষয়কুমার দত্তের অন্যতম কৃতিত্ব। তাঁর রচনারীতি বিষয়ানুগ, প্রকাশক্ষম, বাহুল্যবর্জিত ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন। বাংলায় ভাষাতত্ত্ব ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনার প্রথম কৃতিত্বও তাঁর। উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ: ভূগোল (১৮৪১), বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম ভাগ ১৮৫২, ২য় ভাগ ১৮৫৩), ধর্মনীতি (১৮৫৫), প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার, চারুপাঠ (১ম ভাগ ১৮৫২, ২য় ভাগ ১৮৫৪, ৩য় ভাগ ১৮৫৯), ধর্মনীতি (১৮৫৫) পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬), ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (১ম ভাগ ১৮৭০, ২য় ভাগ ১৮৮৩) ইত্যাদি। তাঁর 'চারুপাঠ' এককালে শিশুপাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। দেশ থেকে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কদাচার ও দুর্বলতা দূর করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। বালিগ্রামে 'বোটানিক গার্ডেন' নামে পরিচিত বাড়িতে শেষজীবন অতিবাহিত। মৃত্যু. ১৮ মে ১৮৮৬।



অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)॥ জন্ম. কলকাতার চোরাবাগান, ১৮৬০। আদিনিবাস চন্দননগর। কবি। হেয়ার স্কুলে শিক্ষা শুরু এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় স্কুল ত্যাগ। কর্মজীবনে দিল্লি অ্যান্ড লন্ডন ব্যাংক ও নর্থ ব্রিটিশ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ। কিছুকাল নর্থ ব্রিটিশ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে প্রধান কর্মচারীরূপে দায়িত্ব পালন। প্রথম কবিতা 'রজনীর মৃত্যু' 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত। আত্মগত কল্পনামূলক প্রেম ও

সৌন্দর্যবোধের উপর কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন। প্রথম জীবনের কবিতায় দুঃখের সুর বিদ্যমান। মৃত পত্নীর স্মৃতিচারণ করে লিখিত 'এষা' কবিতাগ্রন্থে গার্হস্থ্য-জীবনের ও নারী-প্রেমের আলেখ্য অঙ্কনে দক্ষতার পরিচয় প্রদান। রচিত কবিতাগ্রন্থ: প্রদীপ (১৮৮৪), কণকাঞ্জলি (১৮৮৫), ভুল (১৮৮৭), শঙ্খ (১৯১০) এবং এষা (১৯১১)। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হয়েও কাব্যের প্রকাশভঙ্গি, শব্দচয়ন ও বিষয় নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা। মৃত্যু. ১৯ জুন ১৯১৯।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০)॥ জন্ম. মাতার মাতুলালয়, শিমুলিয়া গ্রাম, কুষ্টিয়া, ১ মার্চ ১৮৬১। ইতিহাসবেত্তা। পৈতৃক নিবাস গুড়নই গ্রাম, রাজশাহী। পিতা মথুরানাথ মৈত্রেয় (ইনি প্রথমে কুমারখালী ইংরেজি স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে রাজশাহী দেওয়ানি আদালতে চাকরি গ্রহণ)। বোয়ালিয়া গভর্নমেন্ট স্কুল (রাজশাহী) থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স (১৮৭৮), রাজশাহী কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ.এ. (১৮৮০) ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে বি.এ. (১৮৮৩) পাস। রাজশাহী কলেজ থেকে বি.এল. (১৮৮৫) ডিগ্রি লাভ। রাজশাহী আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। রাজশাহী রেশম-শিল্প বিদ্যালয়ের (১৮৯৭) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই বিদ্যালয়ের একাধারে সম্পাদক ও শিক্ষক। ১৯০৪-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতি ও ১৯১১-তে এর বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত। শরৎকুমার রায় ও রমাপ্রসাদ চন্দের সহযোগিতায় রাজশাহীতে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' (১৯১০) প্রতিষ্ঠা আজীবন এই সমিতির পরিচালক। রাজশাহী থেকে 'ঐতিহাসিক চিত্র' (১৮৯৮-১৮৯৯) নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁকে আধুনিক বাঙালি-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয় বলে আখ্যায়িত। প্রকাশিত গ্রন্থ: সমরসিংহ (১৮৮৩), সিরাজদ্দৌলা (১৮৯৮), সীতারাম রায় (১৮৯৮), মীরকাসিম (১৯০৬), গৌড়লেখমালা (১৯১২), ফিরিঙ্গি বণিক (১৯২২), অজ্ঞেয়বাদ



(১৯২৮)। 'সিরাজদ্দৌলা' তাঁর একখানি সাড়া জাগানো ঐতিহাসিক গ্রন্থ। অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক ব্রিটিশ শাসকদের মনোরঞ্জনার্থে বঙ্গের নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নির্দয়, উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী হিসেবে চিত্রিত করে তাঁর চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপন করেছেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা অন্ধকূপ-হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে এ-সকল ঐতিহাসিক প্রচার চালান। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর এই গবেষণামূলক গ্রন্থে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নিষ্কলঙ্ক প্রতিপন্ন এবং অন্ধকূপ-হত্যা সম্পূর্ণ অলীক এবং অন্ধকূপ-হত্যা আদৌ সংঘটিত হয় নি বলে প্রমাণ করেছেন। 'কায়সার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক (১৯১৫) ও সি.আই.ই. উপাধি (১৯২০) লাভ। মৃত্যু. ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ (২৭ মাঘ ১৯৩৬)।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)॥ জন্ম. মাতুলালয়, চুঁচড়া, হুগলী, ১১ ডিসেম্বর ১৮৪৬। পৈতৃক নিবাস কণকশালী। পিতা রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর (সাবজজ)। কবি ও সাহিত্য-সমালোচক। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৬৩), হুগলী কলেজ থেকে এফ.এ (১৮৬৫) ও বি.এ. (১৮৬৭) এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ল' (১৮৬৮) ডিগ্রি লাভ। এম.এ. পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। কর্মজীবনে বহরমপুরে ও পরে চুঁচুড়ায় ওকালতি। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম রচনা 'উদ্দীপনা' প্রকাশিত ১৮৭৩-এ চুঁচুড়া থেকে 'সাধারণী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ। ১৭ বছর এই পত্রিকা পরিচালনা। ১৮৮৪-১৮৮৯ পর্যন্ত 'নবজীবন' নামক আর একটি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ। দেশীয় শিল্প উৎপাদন ও স্বায়ত্তশাসনোপযোগী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ আগ্রহী। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের (চট্টগ্রাম, ১৯১২) মূল সভাপতি। এ ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি (১৮৯৭-১৮৯৯, ১৯১৩) ও ভারত সভার (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) প্রথম যুগ্ম সহকারী সম্পাদক (১৮৭৬) রচিত কবিতাগ্রন্থ: গোচারণের মাঠ, শিক্ষানবীশের পদ্য (১৮৭৪)। গদ্যপুস্তক: সমাজ সমালোচন (১৮৮৪),



সনাতনী, কবি হেমচন্দ্র (১৯১১), মোহিতকুমারী (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, ১৯১৭), রূপক ও রহস্য (১৯২৩), পিতাপুত্র (আত্মজীবনী), মহাপূজা, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ইত্যাদি। যুক্তাক্ষরবর্জিত শিশুপাঠ্য 'গোচারণের পাঠ' তাঁর বিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ। মৃত্যু. ২ অক্টোবর ১৯১৭।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)॥ জন্ম. নোয়াখালী, ১৯০৩। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। পিতা রাজকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন নোয়াখালী আদালতের উকিল। কলকাতা সাউথ সুবারবন স্কুল থেকে ১৯২০-এ মেট্রিক পাস। সাউথ সুবারবন কলেজে ভর্তি। এই কলেজ থেকে আই.এ. (১৯২২) এবং বি.এ. অনার্স (ইংরেজি) পাস (১৯২৪)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. (১৯২৬) এবং বি.এল. (১৯২৯) ডিগ্রি লাভ। মুন্সেফরূপে কর্মজীবনের শুরু (১৯৩১)। ক্রমে সাব-জজ ও জেলা-জজ পদে উন্নীত। ১৯৬০-এ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। কল্লোল গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে অতি আধুনিক ধারার সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। তাঁর লেখায় আধুনিকতা অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রস্ফুটিত। ১৯২৫-এ 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ। গল্প, উপন্যাস, কাব্য ও জীবনী রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। প্রথম উপন্যাস 'বেদে' (১৯২৮)। এটি আঙ্গিক, রচনাভঙ্গি ও বিষয়বিন্যাসে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। 'কাকজ্যোৎস্না' (১৯৩১) ও 'প্রথম কদমফুল' (১৯৬১) তাঁর অপর দুইটি বিখ্যাত উপন্যাস। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' (৪খণ্ড, ১৯৫২-১৯৫৭) জীবনীগ্রন্থটি লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন। তাঁর লিখিত 'কল্লোলযুগ' (১৯৫০) বাংলা সাহিত্যের একটি অসাধারণ স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ। একজন খ্যাতিমান ছোটগল্পশিল্পী। বিচার বিভাগের চাকরি-সূত্রে বাংলাদেশের নানান স্থানে ঘোরার ফলে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তাঁর যে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছিল, তাঁর ছোটগল্পে সেসব মানুষের জীবনালেখ্য নিপুণভাবে অঙ্কিত। 'টুটা-ফুটা' (১৯২৮) তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। 'কাঠ খড় কেরোসিন' (১৯৪৫), 'চাষাভূষা' (১৯৪৭), 'হাড়ি মুচি ডোম' (১৯৪৮), 'একরাত্রি' (১৯৬১) তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থ। কবি হিসেবেও খ্যাত। রোমান্টিকতা ও গণচেতনা উভয়ই তাঁর কবিতার ভাববস্তু। প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'অমাবস্যা' (১৯৩০)। 'আমরা' (১৯৩৩), 'প্রিয়া ও পৃথিবী' (১৯৩৬), 'নীল আকাশ' (১৯৪৯) প্রভৃতি কাব্যের কবিতাগুলো অত্যন্ত উপভোগ্য। মৃত্যু. ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৬।



অচ্যুত গোস্বামী (১৯১৭-১৯৮০)॥ জন্ম. পূর্ববঙ্গ, ১৯১৭। ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও রাজনৈতিক কর্মী। কর্মজীবন শুরু বামপন্থি রাজনীতির ভেতর দিয়ে। ঢাকায় 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৪২-এ 'প্রতিরোধ' নামে একটি মার্কসবাদী ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সাহিত্যের পাক্ষিক পত্র প্রকাশ এবং তা কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সঙ্গে দুই বৎসর সম্পাদনা। পরবর্তীকালে কলকাতায় গমন। শেষ জীবনে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রবন্ধঃ 'বাংলা উপন্যাসের ধারা'। উপন্যাসঃ 'কানাগলির কাহিনী', 'রাজ্যচ্যুত ঈশ্বর'। মৃত্যু. ১৯৮০।

অজিতকুমার গুহ (১৯১৪-১৯৬৯)॥ জন্ম. সুপারিবাগান, কুমিল্লা শহর, ১৫ এপ্রিল ১৯১৪। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও লেখক। কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা থেকে ১৯৩০-এ মেট্রিক, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৩২-এ আই.এ. ও একই কলেজ থেকে ১৯৩৪-এ বি.এ. পাস। ১৯৩৬-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৯-এ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। বি.টি. অধ্যয়ন। প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.টি. পাস। ১৯৪০-১৯৪২ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে বাস। এ-সময়ে রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ। ১৯৪২-এ ঢাকার প্রিয়নাথ হাইস্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত। প্রায় ছয় বছর এই স্কুলের শিক্ষকতা করার পর ১৯৪৮-এ ঢাকার জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনায় নিয়োজিত। ১৯৫৭-১৯৫৮-তে ঢাকা



বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক। জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানরূপে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালনের পর ১৯৬৮-র ৩১ জুলাই অবসর গ্রহণ। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের দায়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) গ্রেফতার। প্রায় দেড় বছর কারাভোগের পর মুক্তিলাভ। ১৯৫৪-র ৩০ মে ৯২-ক ধারা জারি করা হলে পুনরায় গ্রেফতার। এবার প্রায় এক বছর কারানির্যাতন ভোগ। এদেশের অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিচর্চার ধারা নির্মিতিতে তাঁর অবদান ও সাফল্য অপরিসীম। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্রুতকীর্তি অধ্যাপক। সুকথক ও সুবক্তা হিসেবেও খ্যাত। বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য-সভায় সুস্পষ্ট উচ্চারণে সুললিত ও পরিমার্জিত ভাষায় শ্রুতিমধুর বক্তৃতা দিয়ে ব্যাপক সুনাম অর্জন। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতিবিষয়ক বহু প্রবন্ধের রচয়িতা। এ-সকল প্রবন্ধে তাঁর প্রজ্ঞা ও মননশীলতা পরিস্ফুট। মূল্যবান ভূমিকাসহ কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পাদনা। 'মেঘদূত', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'গল্পগুচ্ছ', 'সোনার তরী' ও 'গীতাঞ্জলি' তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ। মৃত্যু. সুপারিবাগান, কুমিল্লা, ১২ নভেম্বর ১৯৬৯।

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮)॥ জন্ম. মঠবাড়ি, ফরিদপুর, ২০ আগস্ট ১৮৮৬। সাহিত্যিক। ১৯০৩-এ বি.এ. পাস করার পরে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু। ১৯১০-এ বৃত্তি লাভ করে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য বিলেত গমন। রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদ ইউরোপে প্রকাশিত হবার পূর্বেই রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুবাদ করে ইউরোপে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিতি করে তোলেন। দক্ষ অভিনেতা ও সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। রবীন্দ্র-সংগীতচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন প্রধান ব্যাখ্যাতারূপেও তিনি সুপরিচিত। 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯১২) ও 'কাব্যপরিক্রমা' (১৯১৪) রবীন্দ্র-সাহিত্যের ওপর তাঁর রচিত দুইখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ। অন্যান্য গ্রন্থ: 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯১১) ও 'রামমোহন চরিত' (১৯১৬)। মৃত্যু. ১৯১৮।

অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯)॥ জন্ম. বিক্রমপুর, ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৭। কবি, সম্পাদক, অধ্যাপক। ঢাকা কিশোরীলাল জুবলী স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯২৪) ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ. পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্সে ভর্তি। বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ. উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম



শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। ছাত্র বয়সেই সাহিত্যে হাতেখড়ি। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে মিলে 'প্রগতি' বের করেছিলেন প্রথমে হাতে লিখে পরে ছাপিয়ে। তিরিশের যুগের বিখ্যাত সাহিত্যপত্র কল্লোলে'র নিয়মিত লেখক। ছাত্রাবস্থা শেষ হলে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু। বুদ্ধদেব বসুর ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম দিকের যুগ্ম সম্পাদকের একজন। পরবর্তীকালে 'দিগন্ত' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা দীর্ঘদিন সম্পাদনা এবং 'দিগন্ত পাবলিশার্স' প্রতিষ্ঠা। কাব্য-চর্চা, পত্রিকা সম্পাদনা ইত্যাদির বাইরে পেশা ছিল বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত। ১৯৭০-এ অবসর গ্রহণ। প্রকাশিত গ্রন্থ সর্বমোট চৌদ্দটি। দশটি কাব্য গ্রন্থ, তিনটি গদ্যগ্রন্থ ও একটি গবেষণাগ্রন্থ। গ্রন্থ: কাব্য-'কুসুমের মাস' (১৯৩০), 'পাতাল কন্যা' (১৯৩৮), 'নষ্টচাঁদ' (১৯৪৫), 'পুনর্নবা' (১৯৪৬), 'ছায়ার আলপনা' (১৯৫১) 'জানালা' (১৯৫৯), 'কবিতা-সংগ্রহ' (১৯৫৯), 'সাদা মেঘ কালো পহাড়' (১৯৭১): রম্যরচনা। 'জনান্তিকে' (১৯৪৯), 'মনপবনের নাও' (১৯৫০), 'সরস প্রবন্ধ' (১৯৬৮): প্রবন্ধ। 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' (১৯৬০): অনুবাদ। 'কথা-ভারতী', 'দুর্গাপূজার গল্প'। ব্যক্তিগত রচনা লিখতেন 'রৈবতক' ছদ্মনামে। মৃত্যু. কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৯।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৮৩)॥ জন্ম. রোপো গ্রাম, মানভূম জেলা, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩। নাট্যকার, অভিনেতা। পিতা



ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা লক্ষ্মী দেবী। কুলটি হাইস্কুল থেকে মেট্রিক এবং বার্ধমান রাজ কলেজ থেকে আই.এ. পাস

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কলেজে ইংরেজিতে বি.এ. অধ্যয়ন। প্রথম জীবনে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। কলকাতার পাশে দমদমে বিদ্যায়তন ও বাবুই আটিতে হিন্দু বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা। বামপন্থি চিন্তায় বিশ্বাসী। ১৯৫৬-তে গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দিয়ে ১৯৬১ পর্যন্ত অভিনয়। ১৯৬০-এ নিজের নাট্যগোষ্ঠী 'নান্দীকার' প্রতিষ্ঠা। ১৯৭৭-এ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'নান্দীমুখ'। চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় ১৯৬৫-তে। জীবনের শেষ পর্যায়ে যাত্রার দিকে ঝুঁকেছিলেন। ১৯৭৯-র সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৮৩-র মার্চ পর্যন্ত যাত্রায় অভিনয়। শুধু অভিনেতা ছিলেন না, নাটকের নির্দেশনা, গান রচনা, সংগীত পরিচালনা ও মঞ্চসজ্জায়ও দক্ষ ছিলেন। প্রায় ৪০টি নাটকে কখনো-বা নাট্য নির্দেশনায়, কখনো-বা অভিনয়ে আবার কখনও উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ। বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে ৬৩ চলচ্চিত্রে অভিনয়। রূপান্তরিত নাটক: তিন পয়সার পালা, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, ভালো মানুষ ও শের আফগান। 'তিন পয়সার পালা' অভিনয়ের নির্দেশনা ও সংগীত পরিচালনার জন্য সর্বাধিক বিখ্যাত। রচিত মৌলিক নাটক: 'সেতু বন্ধন', 'হে সময় উত্তাল সময়', 'সওদাগরের নৌকা'। পুরস্কার: পশ্চিমবঙ্গ সংগীত-নাটক আকাদেমি পুরস্কার, মস্কো নিউজ ক্লাব পুরস্কার, ক্রিটিক সার্কেল অব ইন্ডিয়া পুরস্কার প্রভৃতি। মৃত্যু. কলকাতা, ১৪ অক্টোবর ১৯৮৩।

অতীন্দ্রনাথ বসু (১৮৭৩-১৯৬৫)॥ জন্ম. কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩। বিপ্লবী নেতা। যুগান্তর বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় যোগাযোগের জন্য কয়েকবার কারাবরণ। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ অনুযায়ী তৎকালীন ভারতের স্বাধীনতাপ্রিয় যুবকদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা। ১৯০৫-এ তাঁর চেষ্টায় 'ভারত ভাণ্ডার' নামক সংস্থা গঠিত। এ-ছাড়া যুবকদের শরীর-চর্চার জন্য 'শিমলা ব্যায়াম সমিতি' প্রতিষ্ঠা। নিজে একজন দক্ষ কুস্তিগীর হওয়ায় বাঙালি যুবকদের মধ্যে শরীরচর্চা প্রসারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ১৯২৫-এ তাঁর শিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গণে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই শক্তির আরাধনা করুক—এই আদর্শ প্রচার। এই ব্যায়াম সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ডা. জে.এম. দাশগুপ্ত প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ১৯৩২-এ এই সমিতি ইংরেজ সরকার কর্তৃক বেআইনি ঘোষিত হয়। মৃত্যু. ১০ জুন ১৯৬৫।

অতীন্দ্রমোহন রায় (১৮৯৪-১৯৭৯) জন্ম. ভোলাচঙ্গ, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৮৯৪। বিপ্লবী ও সমাজসেবী। পিতা আনন্দমোহন রায়চৌধুরী, মাতা কামিনীসুন্দরী রায়চৌধুরী। কুমিল্লা ইউসুফ স্কুলের ছাত্রাবস্থায় (১৯১১) অনুশীলন দলের সদস্য।



কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাস করে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে দ্বিতীয় বর্ষ অধ্যয়নকালে রাজনীতিতে সক্রিয় এবং দলের পরামর্শে গৃহত্যাগ (১৯১৬)। পলাতক জীবনে ঢাকা, কলকাতা, রাজশাহী, নাটোর, পুঁটিয়ায় অবস্থান। কুমিল্লায় নজরুলের ঘনিষ্ঠ সহচর। 'ধূমকেতু' প্রকাশের পর কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন। আদর্শবাদ ও শারীরিক কসরতের মাধ্যমে বিপ্লব ও কঠিন পরিস্থিতির উপযোগী করে গড়ে ওঠেন। ঢাকায় কলতাবাজারে দু'জন পুলিশ ও কলকাতায় ডিএসপি বসন্ত চ্যাটার্জি হত্যায় অংশগ্রহণ। কংগ্রেস জেলা কমিটির সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত। বিপ্লবী ধারার রাজনীতিতে আস্থাশীল। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আরএসপি) গঠন। ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি। ব্রিটিশদের অনুগত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়িতে ডাকাতি করে প্রাপ্ত অর্থে বিদেশ থেকে যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ। জার্মানি থেকে বিপ্লবীদের জন্য কয়েক জাহাজ উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র আনার তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে বহু বিপ্লবীর সঙ্গে গ্রেপ্তার ও কারাবরণ। কুমিল্লা জেল, প্রেসিডেন্সি জেল, আলীপুর জেল, দমদম জেল, রাজপুতনার দেউলি বন্দীশিবির, হিমালয় প্রদেশের বকসার এবং হিজলীর বন্দীশিবিরে দীর্ঘ কারাজীবন। জেলে ছিলেন প্রায় ২৫ বছর। এর মধ্যে ৩৫ দিন অনশন। ১৯৪৬-এ সর্বশেষ কারামুক্তি। বীরভূমে লাভপুরে অন্তরীণ অবস্থায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সখ্য এবং 'গণদেবতা'য় ডেটিনিউ যতীন চরিত্রটি তাঁর বিপ্লবী জীবনের রূপায়ণ। ১৯৪৬-৫৪-তে কুমিল্লা পৌরসভার

চেয়ারম্যান। কুমিল্লা অভয় আশ্রম, বসন্তস্মৃতি পাঠাগার, অমূল্য স্মৃতি পাঠাগার, কচি-কাঁচার মেলাসহ শহরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। বিপ্লবী ও রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতি প্রসঙ্গে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা। ভাষা-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ছাত্র নেতৃবৃন্দের অভিভাবক। বাংলাদেশ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯৬৯)। ফরিদা বিদ্যায়তন (১৯৬৪) স্কুলের পরিচালনা কমিটির সম্পাদক হিসেবে প্রাণান্তকর পরিশ্রম। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী একমাত্র পুত্র কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের প্রদর্শক অসীম শান্তি রায়চৌধুরীকে কুমিল্লা সেনানিবাসে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। পুত্রের শহীদের ঘটনায় বাহ্যিক জীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। শেষজীবনে বই-পুস্তক পড়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন। ত্যাগী, আদর্শবাদী ও দেশপ্রেমী। মৃত্যু. কুমিল্লা ৫ এপ্রিল, ১৯৭৯।

অতীশ দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান (৯৮২-১০৫৩)॥ জন্ম. বজ্রযোগিনী গ্রাম, বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ, ৯৮২। লেখক ও পণ্ডিত। পিতামাতা নাম রেখেছিলেন আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। উনিশ বছর বয়সে বিহারের ওদন্তপুরীর মহাসঙ্ঘিকাচার্য শীলরক্ষিতের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে নতুন হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। প্রথমে নিজের মা ও পরে অবধূত জেতারির কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং বিহারের কৃষ্ণগিরি রাহুলের কাছে বৌদ্ধ গুহ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 'গুহ্যজ্ঞানবজ্র' উপাধি লাভ। ১০১১-তে শতাধিক শিষ্য নিয়ে সুবর্ণ দ্বীপে গমন। সেখানে বারো বৎসর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করার পর দেশে প্রত্যাবর্তন। তখন বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন প্রথম মহীপাল। তাঁর অনুরোধে বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রধান অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ। তিব্বতের রাজা হ্লা-লামা স্বর্ণ-উপহারসহ নিজ রাজ্যে ধর্ম প্রচারের আহ্বান জানালে তা প্রত্যাখ্যান। হ্লা-লামার মৃত্যুর পর পরবর্তী রাজা চ্যান-চাব জ্ঞানপ্রভ-কর্তৃক পুনরায় আমন্ত্রিত হয়ে ১০৪১-এ দুর্গম হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বত গমন। পথিমধ্যে নেপালের রাজা অনন্তকীর্তি কর্তৃক সংবর্ধিত। নেপাল-রাজপুত্র পদ্মপ্রভা তাঁর কাছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিব্বতে রাজকীয় সম্মান লাভ। এখনও সেখানকার মঠের প্রাচীরে এই সংবর্ধনার দৃশ্য আঁকা আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র, চিকিৎসা ও কারিগরিবিদ্যা সম্বন্ধে তিব্বতীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করলে তিব্বতিদের দ্বারা সম্মানজনক 'অতীশ' উপাধিতে ভূষিত। তিব্বতে বহু প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং নিজের হাতে সেগুলোর প্রতিলিপি প্রস্তুত করে বঙ্গদেশে পাঠান। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ভোট ভাষায় অনুবাদ। এ-ছাড়া নিজে রত্নকরণ্ডোদঘাট, বোধিপাঠ প্রদীপপঞ্জিকা, বোধিপাঠ প্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সম্রাট নয়পালের উদ্দেশ্যে 'বিমলরত্নলেখ' নামক পত্র রচনা। 'চর্য্যাসংগ্রহ প্রদীপ' নামক গ্রন্থে অতীশ রচিত অনেক সংকীর্তনের পদ পাওয়া যায়। তাঁর মূল সংস্কৃত রচনাগুলো বিলুপ্ত হয়েছে। তবে তিব্বতি ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে এগুলোর অস্তিত্ব টিকে আছে। তিব্বতের এক নদীতে বন্যা হলে তা প্রতিরোধের সংকল্প গ্রহণ। তিব্বতিরা তাঁকে যে অর্থ দান করেছিলেন, তা দিয়ে নদীতে বাঁধ নির্মাণ। ভারতে অবস্থানকালে সম্রাট নয়পাল ও পশ্চিমদেশিয় কর্ণরাজের বিবাদে মধ্যস্থতা করে দেশে শান্তি স্থাপন। তিব্বতে বুদ্ধের অবতার বলে পূজিত। সেখানে সতেরো বৎসর বসবাস এবং বাহাত্তর বৎসর বয়সে পরলোকগমন। রাজধানী লাসার নিকট ঞেথাং-এ তাঁর সমাধি আছে। মৃত্যু. তিব্বত, ১০৫৩।



অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১)॥ জন্ম. বিন্নাইক গ্রাম, টাঙ্গাইল, ১২ মার্চ ১৮৮৪। সাহিত্যিক ও আইনজীবী। পিতা উমেশচন্দ্র গুপ্ত ওকালতি ব্যবসায় উপলক্ষে আদি বাসস্থান টাঙ্গাইল ছেড়ে রংপুরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯০১-এ রংপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ বি.এ. পাস। ১৯০৬-এ দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. (প্রথম শ্রেণি) এবং ১৯০৭-এ রিপন কলেজ থেকে বি.এল. ডিগ্রি লাভ। পরে কিছুকাল রংপুরে



জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা রংপুরে আইন ব্যবসায় শুরু, পরে ১৯১৪-তে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান। ১৯১৮-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোমান ল ও জুরিসপ্রুডেন্স বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত, দশ বছর অধ্যাপনা করে ওকালতিতে প্রত্যাবর্তন এবং ভারতবর্ষের অন্যতম আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন। ১৯০৫-এ এম.এ. ক্লাসে পড়াকালীন সময়ে কুখ্যাত কার্লাইল সারকুলারের প্রতিবাদে আন্দোলনে যোগদান। ১৯৪৭-এ র‍্যাডক্লিফ ট্রাইব্যুনালে পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য তৈরি ও উপস্থাপন করার দায়িত্ব গ্রহণ। কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হতেন বলে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর বন্ধু। অতুলচন্দ্র একজন খ্যাতিমান গদ্যলেখক। রচিত গ্রন্থ: কাব্যজিজ্ঞাসা (১৯২৮), শিক্ষা ও সভ্যতা (১৯২৭), নদী পথে (১৯৩৭), জমির মালিক (১৯৪৪), সমাজ ও বিবাহ (১৯৪৬), ইতিহাসের মুক্তি (১৯৫৭)। তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' (১৯২৮) বাংলা সাহিত্যের রসতত্ত্বের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। ১৯১৮-তে Trading with the Enemy শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অনাথনাথ দেব' পুরস্কার লাভ। ১৯৫৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.এল. উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু. ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১।

অতুলচন্দ্র দত্ত (১৮৭৫-১৯৬৫)॥ জন্ম. খরনদ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, ১২ এপ্রিল ১৮৭৫। সাহিত্যিক। পটিয়া হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পরবর্তী সময়ে আইন পাস। চট্টগ্রাম জেলা জজ কোর্টে ষাট বছর ওকালতি। একজন নীতিবাদী সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত। রচিত গ্রন্থাবলি: গৃহসুখ, গৃহশিক্ষা, Child Nature। মৃত্যু. ২ এপ্রিল ১৯৬৫।

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)॥ জন্ম. ঢাকা শহর। আদি নিবাস শরিয়তপুর জেলার 'মগর' গ্রাম, ২০ অক্টোবর ১৮৭১। কবি, গীতিকার ও গায়ক। ১৮৯০-তে প্রবেশিকা পাস ও প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন। পরে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস। কলকাতা ও রংপুরে কিছুদিন আইন-ব্যবসায় ও পরে লক্ষ্ণৌ শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস। ক্রমে সেখানকার একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ। কিশোর বয়সে



সংগীত-জীবনের শুরু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ। প্রেম, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে গীত রচনা। বাংলা গানে সর্বপ্রথম ঠুমরি আমদানির পথিকৃৎ। প্রসিদ্ধ সুরকার ও গীতিকার হিসেবে সংগীত-ভুবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকারে। তাঁর রচনা সার্থকতা অর্জনের মূল কারণ: ১. গানের প্রথম কলির বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি; ২. গানের কথা রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব; ৩. সুর সৃষ্টির মৌলিক রীতি, গানের সুরে কীর্তন ও বাউল সুর প্রয়োগ, চমকপ্রদ সুর সংগ্রহ ও প্রয়োগ, সুরের প্রচলিত ঢঙ, গজল, দাদরা, লোকসংগীত ইত্যাদি অবলম্বন করে সুর রচনা। কাজী নজরুল ইসলামের গান থেকেও সুর গ্রহণ; এবং ৪. করুণরসের অভিব্যক্তি। ভৈরবী, খাম্বাজ, পিলু, বেহাগ, কাফী প্রভৃতি প্রচলিত রাগের উপর ভিত্তি করে সুর রচনা। ভাষা রচনায় সিদ্ধহস্ত– স্নিগ্ধ কোমল শব্দ চয়ন করে কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর সৃষ্টিতে দক্ষ। সমসাময়িক বাংলা গানের সঙ্গে সমতা রেখে তাঁর রচিত গানে বিশিষ্ট কাব্যিক রূপ দান। রচিত গানগুলো তিনভাগে বিভক্ত– স্বদেশি সংগীত, ভক্তিগীতি ও প্রেমের গান। মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও স্বজাতির উদ্দেশে নিবেদিত গানগুলো জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে জনসাধারণের মনে প্রেরণা জোগায়। তাঁর 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!'– গানটি ষাটের দশকে পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় দুশো। 'কয়েকটি গান' ও 'গীতগুঞ্জ' (১৯৩১) তাঁর প্রকাশিত গানের সংকলন। মৃত্যু. ২৬ আগস্ট ১৯৩৪।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১)॥ জন্ম. গোকর্ণ গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১ জানুয়ারি ১৯১৪। ঔপন্যাসিক। দরিদ্র ধীবর পরিবারে জন্ম। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হন। গ্রামের মানুষ চাঁদা তুলে তাঁর পড়ার খরচ চালাতো। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস (১৯৩৩)। কুমিল্লা

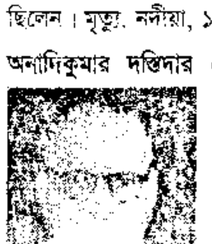
ভিক্টোরিয়া কলেজে কিছুদিন আই.এ. ক্লাসে



অধ্যয়ন। ১৯৩৪-এ জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় গমন। সেখানে মাসিক 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় শুরু করেন তাঁর সাংবাদিক ও কর্মজীবন। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'নবশক্তি' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক পদে যোগদান (১৯৩৬)। এর সম্পাদক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন। নবশক্তি প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর 'মাসিক মোহাম্মদী'র সম্পাদকের সহকারী হিসেবে যোগদান। তিন বছর এ পদে দায়িত্ব পালন। এ সময়ে একই সঙ্গে দৈনিক আজাদেও সাংবাদিকতা। নবযুগ, কৃষক ও যুগান্তর পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৪৫-এ সাপ্তাহিক দেশ-এ সম্পাদকের সহকারী পদে নিযুক্তি লাভ। আমৃত্যু এ পদে দায়িত্ব পালন। আয় বাড়াবার জন্য বিশ্বভারতীর প্রকাশনা শাখায় পার্ট টাইম চাকরি গ্রহণ। তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রথম মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত। কয়েকটি অধ্যায় মুদ্রিত হওয়ার পর এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রাস্তায় হারিয়ে যায়। বন্ধুবান্ধব ও পাঠকদের আগ্রহে পুনারায় কাহিনীটি লেখেন। কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে যাওয়ার আগে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বন্ধুবান্ধবকে দিয়ে যান। লেখকের মৃত্যুর কয়েক বছর পর উপন্যাসটি (তিতাস একটি নদীর নাম) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। মূলত এই একটি মাত্র উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে এতে ধীবর সমাজের জীবনসংগ্রামের কাহিনীকে দিয়েছেন অবিনশ্বরতা। তাঁর গ্রন্থপ্রীতি ছিল অসাধারণ। নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যেও বই কিনেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর বন্ধুরা রামমোহন লাইব্রেরির হাতে তাঁর গ্রন্থভাণ্ডার তুলে দেন। সাহিত্য, দর্শন ও চারুকলা বিষয়ক এমন সুচিন্তিত ও সুনির্বাচিত সংগ্রহ দুর্লভ। লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ এই সহস্রাধিক গ্রন্থ সংগ্রহকে একটি পৃথক বিভাগে রক্ষা করেছেন। মৃত্যু. ষষ্ঠীপাড়া, কলকাতা, যক্ষ্মায়, ১৬ এপ্রিল ১৯৫১।

অদ্বৈতাচার্য/অদ্বৈত প্রভু (১৪৩৪-১৫৫৮)॥ জন্ম. নবগ্রাম-লাউড়ে, সিলেট, ১৪৩৪। চৈতন্যদেবপূর্ব বৈষ্ণব ধর্মবেত্তা। অধ্যয়নের জন্যে নদীয়ার শান্তিপুরে গমন এবং সেখানে বাবলা গ্রামে স্থায়ী বসবাস। দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অদ্বৈতাচার্যের পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে 'অদ্বৈতাচার্য' উপাধি লাভ। শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বেই ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের জন্যে খ্যাত। ১৫১৩-এ শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুরে এলে তিনি বিদ্যাপতির পদ গেয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য 'মদনগোপাল' নামক কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর দুই সহধর্মিনীর নাম শ্রীদেবী ও সীতাদেবী। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই অদ্বৈত পরিবারেরই বংশধর। পুরীর রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে শ্রীচৈতন্যকে অবতার ঘোষণা করেন অদ্বৈতাচার্য। অদ্বৈতাচার্য সম্পর্কে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, হরকৃষ্ণ দাসের 'বাল্যলীলাসূত্র' (১৪৮৭), ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' (১৫৬৯), হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল', শ্যামদাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' ও নরহরি দাসের 'অদ্বৈতবিলাস' (১৮ শতক)। অদ্বৈতাচার্য লোকাচার অপেক্ষা ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মৃত্যু. নদীয়া, ১৫৫৮।

অনাদিকুমার দস্তিদার (১৯০৩-১৯৭৪)॥ জন্ম. সিলেট, ১৯০৩।



সংগীতশিল্পী ও রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম প্রচারক। ১৯১২-তে শান্তিনিকেতন গমন। ১৯২০-এ প্রবেশিকা পাস। পাঁচ বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ। ভীমরাও শাস্ত্রী, নকুলেশ্বর গোস্বামী ও রাধিকা গোস্বামীর কাছে শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা লাভ। বীণা বাদ্যযন্ত্রে সিদ্ধহস্ত। ১৯২৫-এ কলকাতায় গমন ও রবীন্দ্রসংগীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। বেতার, রেকর্ড কোম্পানি, চলচ্চিত্র ও থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। গ্রামোফোন কোম্পানিতে রবীন্দ্রসংগীতের প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন। রেডিও-র বুক প্রোগ্রাম প্রচারের পথিকৃৎ। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অনুরোধে থিয়েটারে যোগদান। 'চিরকুমার সভা'

ও 'শেষ রক্ষা' নাটকের নৃত্যদলের একজন বীণাবাদক। 'স্বরলিপি সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। বহু গানের স্বরলিপি প্রণেতা। তাঁর পরিচালনায় ছায়াছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলন। 'টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট' থেকে 'রবীন্দ্রতত্ত্ববিশারদ' উপাধি লাভ। মৃত্যু, ১৯৭৪।

অনিল মুখার্জি (১৯১২-১৯৮২)॥ জন্ম, মুন্সীগঞ্জ,



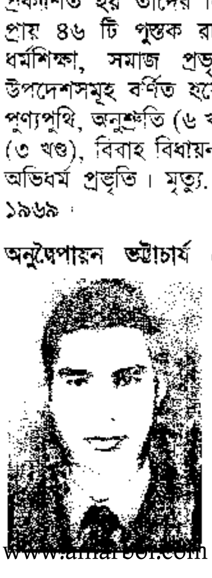
ঢাকা, ১০ অক্টোবর ১৯১২। রাজনীতিবিদ ও লেখক ১৯৩০-এ কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে প্রথম কারাবরণ। মেদিপনীপুর হিজলী বন্দী শিবিরে আটক। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সশস্ত্র সংগ্রামে যুক্ত থাকার অভিযোগে আন্দামানে প্রেরণ। বন্দীদের মরণপণ আন্দোলনের ফলে ১৯৩৮-এ মুক্তিলাভ এবং কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ। ১৯৪৬-এ নারায়ণগঞ্জের সুতাকল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক আন্দোলনে নেতৃত্বদান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর পুনরায় গ্রেফতার। ১৯৫৫-তে মুক্তিলাভ। ১৯৫৫ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত আত্মগোপন অবস্থায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা। ১৯৫৬-তে কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় সম্মেলনে (গোপন) কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৮-তে পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (গোপন) কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৯-এ গোপনভাবে প্রথমবারের মতো মস্কো সফর এবং বিশ্বের পঁচাত্তরটি পার্টির মহাসম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব। ১৯৭৩ ও ১৯৮০-তে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় ও তৃতীয় কংগ্রেসেও পুনরায় কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: সাম্যবাদের ভূমিকা, শ্রমিক আন্দোলনের হাতেখড়ি, স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি ও ছোটদের জন্যে লেখা 'হারানো খোকা'। মৃত্যু, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬৯)॥ জন্ম,



হেমায়েতপুর, পাবনা, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ 'হিন্দুধর্মের সৎসঙ্গ নামক ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। বাল্যকাল থেকেই ভক্তি প্রবণ ও সেবাধর্মপরায়ণ কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং নিজ গ্রামে গিয়ে রুগ্ন মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ। কিছুদিন পর মায়ের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে সাধন-চর্চায় মনোনিবেশ। ধীরে ধীরে একটি কীর্তন দল গঠন এবং তার মধ্য দিয়ে সত্যভাষণ ও সৎকর্মের আদর্শ প্রচার শুরু। কেউ কারো ওপর নির্ভরশীল হবে না, কেউ কারো কাছে প্রত্যাশী হবে না, স্বাবলম্বন ও দীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে–অনুকূল ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত সৎসঙ্গ আশ্রমের এই হলো আদর্শ। তাঁর ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় তপোবন বিদ্যালয়, মাতৃ বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্থাপন। ১৯৪৬-এ বিহারের দেওঘরে গমন। সেখানেও আশ্রম এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন। 'শাশ্বতী' নামে আশ্রমের একটি মুখপাত্র প্রকাশিত হয় তাঁদের নিজস্ব ছাপাখানা থেকে। প্রায় ৪৬ টি পুস্তক রচনা করেন। এগুলোতে ধর্মশিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে আদর্শ ও উপদেশসমূহ বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: পুণ্যপুথি, অনুশ্রুতি (৬ খণ্ড), চলার সাথী, শাশ্বতী (৩ খণ্ড), বিবাহ বিধায়না, সমাজ সন্দীপন, যতি অভিধর্ম প্রভৃতি। মৃত্যু, দেওঘর, ২৬ জানুয়ারি ১৯৬৯।

অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য (১৯৪৫-১৯৭১)॥ জন্ম,



জাত্তারী গ্রাম, নবিগঞ্জ, সিলেট, ৩১ জানুয়ারি ১৯৪৫। শিক্ষাবিদ ও শহীদ। সিলেটের নবিগঞ্জ জে.কে. হাইস্কুল থেকে ১৯৬১-তে প্রথম বিভাগে মেট্রিক, সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে ১৯৬৩-তে প্রথম

বিভাগে আই.এসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬-তে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণিতে বি.এসসি, আনার্স এবং ১৯৬৭-তে ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণিতে এম.এসসি. ডিগ্রি লাভ। ছাত্রজীবনে মেধার পরিচয় দান। ১৯৬৮-র মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬৯-১৯৭১ পর্যন্ত জগন্নাথ হলের হাউস টিউটর। প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী শিক্ষক হিসেবে খ্যাতিমান। মৃত্যু: বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুতে ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে নিহত।

অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮)॥ জন্ম. কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮২। ঔপন্যাসিক। পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পিতামহের কাছেই সংস্কৃত শিক্ষা ও বাংলা সাহিত্যচর্চায় প্রেরণা লাভ। কিছুকাল দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন। বড়বোন সাহিত্যিক ইন্দিরা দেবীর প্রেরণায় তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু। রাণীদেবী ছদ্মনামে গল্প লিখে কুন্তলীন পুরস্কার লাভ। ১৮৯৬-র ২৩ ফেব্রুয়ারি আইনজীবী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ। স্বামীর কর্মক্ষেত্র মজফ্‌ফরপুরে বসবাস। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার সঙ্গে মজফ্‌ফরপুরে চ্যাপম্যান গার্লস স্কুল নামক একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা। এ-ছাড়া কাশী ও কলকাতায় বিভিন্ন মহিলা বিদ্যালয়, নারীকল্যাণ আশ্রমের উন্নয়নের সঙ্গে সংযুক্ত। ১৯৩০-এ মহিলা সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন। ১৯৩১-এ উত্তর বিহার সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভানেত্রী। ১৯৩৪-এ বিহারের ভূমিকম্পে আহত হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন। ১৯৩৭-এ চন্দননগর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে কথাসাহিত্যিক শাখার সভানেত্রী। ১৯৪৬-এ হিন্দু কোড বিল ও ১৯৪৭-এ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন। প্রথম প্রকাশিত গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার লাভ। রচিত উপন্যাস: পোষ্যপুত্র (১৯১১), বাগদত্তা (১৯১৪), মহানিশা (১৯১৯), মা (১৯২০), উল্টরায়ণ, পথহারা। সমালোচনা গ্রন্থ: সাহিত্য ও সমাজ, সাহিত্যে নারী ইত্যাদি।



১৯১৯-এ শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল থেকে 'ধর্মচন্দ্রিকা' উপাধি ও ১৯২৩-এ শ্রীশ্রীবিশ্বমানব মহামণ্ডল থেকে 'ভারতী' উপাধি লাভ। ১৯৩৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' ও ১৯৪১-এ 'ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক' প্রদান। ১৯৪৪-এ 'লীলা লেকচারার' পদে অধিষ্ঠিত। মৃত্যু. ১৯ এপ্রিল ১৯৫৮।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৫-২০০২)॥ জন্ম ১৫ মে ১৯০৫, ঢেঙ্কানল, উড়িষ্যা, ভারত। কবি, ছড়াকার, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক। পিতা ঢেঙ্কানল রাজস্টেটের কর্মী নিমাইচরণ রায় এবং মাতা কটকের প্রসিদ্ধ পালিত বংশের কন্যা হেমনলিনী। ছোটবেলায় ঢেঙ্কানলে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯২১-এ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। কটকের র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে আই.এ. পরীক্ষা দিয়ে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৫-এ বি.এ পরীক্ষাতেও তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম স্থানাধিকারী। ১৯২৭-এ এম.এ. পড়তে পড়তে আই.সি.এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় হিসেবে এ গৌরব লাভ করেন। সেই বছরেই সরকারি খরচে আই.সি.এস হতে ইংল্যান্ড যান। সেখানে দুই বছর ছিলেন। এই সময়ে তাঁর ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী 'পথে প্রবাসে' বিচিত্রায় প্রকাশিত। ১৯৩০-এ মার্কিন কন্যা অ্যালিস ভার্জিনিয়া অনফোর্ডকে বিবাহ করে তাঁর নাম দেন লীলা রায়। লীলা রায় বহু বই বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। অন্নদাশঙ্করের অনেক লেখা লীলাময় ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৬-এ প্রথম নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজে যোগ দেন। তিনি এই পদে বিভিন্ন জেলায় কাজ করে কুমিল্লা জেলায় জজ হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত সরকারি কাজে নিযুক্ত থেকে ১৯৫০-এ পশ্চিমবঙ্গের বিচার বিভাগের সেক্রেটারি হন। ১৯৫১-এ স্বেচ্ছায় সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন।



উপন্যাস: 'সত্যাসত্য', 'যার যেথা দেশ', 'অজ্ঞাতবাস', 'কলঙ্কবতী', 'দুঃখমোচন', 'মর্ত্যের স্বর্গ', 'অপসারণ', 'আগুন নিয়ে খেলা', 'অসমাপিকা', 'পুতুল নিয়ে খেলা', 'না', 'কন্যা'; প্রবন্ধগ্রন্থ: 'তারুণ্য', 'আমরা', 'জীবনশিল্পী', 'একহারা', 'জীয়নকাঠি', 'দেশকালপাত্র', 'প্রত্যয়', 'নতুন করে বাঁচা', 'আধুনিকতা'। আত্মজীবনী: 'বিনুর বই', 'পথে প্রবাসে'। ছোটগল্প: 'প্রকৃতির পরিহাস', 'দু কান কাটা', 'হাসন সখী', 'যৌবন জ্বালা', 'কামিনি কাঞ্চন', 'রূপের দায়', 'গল্প' প্রভৃতি। পুরস্কার: বিদ্যাসাগর পুরস্কার, পদ্মভূষণ, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, দুইবার আনন্দ পুরস্কার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দেশিকোত্তম' ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট. উপাধি। মৃত্যু. কলকাতা, ২৮ অক্টোবর ২০০২।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪)॥



জন্ম. যশোর, মতান্তরে মহেশপুর, নদীয়া, ১৮৭৫। নাট্যকার, নট ও নাট্যপরিচালক। প্রথমে স্টার থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রের নিকটে অভিনয় কলা শিক্ষা গ্রহণ। পরে গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের নিকটে অভিনয় বিষয়ে বিস্তৃত শিক্ষা লাভ। মিনার্ভা থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে যোগদান (১৯০৪)। কিছুকাল এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন। নব-সংগঠিত স্টার থিয়েটারে যোগদান। এ প্রতিষ্ঠানের নট, নাট্যকার ও পরিচালক রূপে খ্যাতি অর্জন। বাংলা নাটকের পুরনো ধারার শেষ উল্লেখযোগ্য লেখক। গিরিশচন্দ্রের আদর্শে নাটক রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ। তাঁর কর্ণার্জুন (১৯২৩), নাটকের বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ। রঙ্গিলা (১৯১৪), রামানুজ (১৯১৬), চণ্ডীদাস (১৯২৬) তাঁর অন্যান্য নাটক। এছাড়া অনুরূপা দেবীর মন্ত্রশক্তি (১৯১৫), পোষ্যপুত্র (১৯১১) ও মা (১৯২০) এ তিনটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দান। 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী। মৃত্যু. ১৯৩৪।

অপূর্ব দত্ত॥ জন্ম. মির্জাপুর গ্রাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। শিক্ষাবিদ ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'র‍্যাংলার' পদবি অর্জন। এই শতকের বিশ দশকে সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে রচিত গবেষণামূলক গ্রন্থ: Indian Astronomy। জন্ম ও মৃত্যুতারিখ অজ্ঞাত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)॥ জন্ম.



জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ৭ আগস্ট ১৮৭১। চিত্রশিল্পী, লেখক। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও গুণেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। ঠাকুর বাড়ির প্রথানুসারে ১৮৭৬-১৮৮০ পর্যন্ত গৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত। কিছুকাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে কলেজের পাঠ ত্যাগ (১৮৯০)। নিজের সাধনায় ইংরেজি, ফরাসি, সংস্কৃত এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন। সংগীত-চর্চায়ও পারদর্শিতা অর্জন। ইটালিয়ান গিলার্ডি ও ইংরেজ পামারের কাছে পাশ্চাত্য রীতিতে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি শিক্ষালাভ। এ-ছাড়া পরবর্তীকালে টাইকান নামের এক জাপানি শিল্পীর কাছে জাপানি চিত্রাঙ্কন রীতি শিক্ষা। কলকাতাস্থ আর্ট কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ই.বি. হ্যাভেলের উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় ১৮৯৮-তে আর্ট কলেজের সহ-অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ। ১৯২১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯৪২-এ রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর আচার্যের পদ গ্রহণ। পাশ্চাত্য রীতিতে সুদক্ষ হয়েও এই রীতিতে পরিতৃপ্ত না-হয়ে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতি পুনরুদ্ধারের সাধনা শুরু। ভারতীয় রীতিতে তাঁর প্রথম প্রয়াস কৃষ্ণলীলাবিষয়ক চিত্রাবলী। এই রীতির অন্যান্য চিত্রকর্ম: বজ্রমুকুট, ঋতুসংহার, বুদ্ধ ও সুজাতা। জাপানি রীতিতে আঁকা 'ওমর খৈয়াম' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত চিত্রের মধ্যে রয়েছে: শাহজাদপুরের দৃশ্যাবলী, আরব্যপোন্যাসের গল্প, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, প্রত্যাবর্তন, জারনিস এন্ড, সাজাহান প্রভৃতি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পের প্রভাবে ভারতীয় শিল্পধারার নতুন প্রাণ লাভ। অল্প দিনেই ভারতীয় শিল্পের নবজন্মদাতারূপে স্বীকৃতি লাভ। ১৯০৭-এ অবনীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শ জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ভগিনী নিবেদিতা, স্যার জন উডরফ, হ্যাভেল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি স্থাপন। ১৯১৩-তে চিত্র প্রদর্শনী হয় লন্ডন ও প্যারিসে এবং ১৯১৯-এ জাপানে। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার আর এক প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। তাঁর অধিকাংশ রচনা ছোটদের জন্য; কিন্তু সব বয়সের পাঠকই তার রস আস্বাদন করতে পারে। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'শকুন্তলা' (১৮৯৫), 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬), 'রাজকাহিনী' (১৯০৯), 'ভারত শিল্প' (১৯০৯), 'ভূত পত্রীর দেশ' (১৯১৫), 'নালক' (১৯১৬), 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯), 'খাজাঞ্চির খাতা' (১৯২১), 'প্রিয়দর্শিকা' (১৯২১), 'চিত্রাক্ষর' (১৯২৯), 'বুড়ো আংলা' (১৯৪১), 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪), 'সহজ চিত্র শিক্ষা' (১৯৪৬), 'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ' (১৯৪৭), 'আলোর ফুলকি' (১৯৪৭), 'ভারত শিল্পে মূর্তি' (১৯৪৭), 'মাসি' (১৯৫৪) 'একে তিন তিনে এক' (১৯৫৪), 'শিল্পায়ন' (১৯৫৫), 'মারুতির পুঁথি' (১৯৫৬), 'রং বেরং' (১৯৫৮) ইত্যাদি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপকরূপে (১৯২২-১৯২৭) চিত্রকলার উপর যে-সব প্রবন্ধ পাঠ করেন সেগুলো পরে 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' নামে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত (১৯৪১)। মৃত্যু কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ১৯৫১।

অমলকৃষ্ণ সোম (?-১৯৭১)॥ জন্ম, নড়াইল, যশোর। মঞ্চাভিনেতা। প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা হিসেবে ১৯৬০-১৯৭১ পর্যন্ত বিশেষ সুনাম অর্জন। অভিনীত নাটকের সংখ্যা ১০০ টি মতো। প্রধানত খল-চরিত্রে অভিনয় করতেন, তবে কেন্দ্রীয় চরিত্র বা টাইপ চরিত্রেও পারদর্শিতা প্রদর্শন। মৃত্যু, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে যশোরের বাসভবন থেকে কার্ফু চলাকালে পাক-সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার এবং হত্যা, ১৬ মার্চ ১৯৭১।

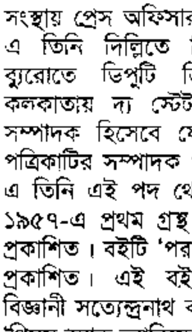
অমল হোম (১৮৯৩-১৯৭৫)॥ জন্ম, মজিলপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগণা, ১০ নভেম্বর ১৮৯৩। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ছাত্রাবস্থায়ই সাংবাদিকতার প্রতি আকর্ষণ জন্মে। প্রথমে পিতৃবন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ শুরু। এরপর সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় যোগদান। ১৯১৮-তে লাহোরে লালা লাজপত রায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি দৈনিক 'দি পাঞ্জাবী' প্রত্রিকায় যোগদান। এরপর কালীনাথ রায় সম্পাদিত লাহোরের 'দি ট্রিবিউন' পত্রিকার সহ-সম্পাদক কারারুদ্ধ হলে পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক। ১৯২০-এ এলাহাবাদে বিপিনচন্দ্র পালের সহকারীরূপে মতিলাল নেহেরুর 'দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট' পত্রিকায় যোগদান। এ-বছর তাঁরই উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া সোশ্যাল সার্ভিস কনফারেন্স'-এ মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব করেন। ১৯২১-এ কলকাতায় 'ইন্ডিয়ান ডেইলী নিউজ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯২৪ পর্যন্ত এই পত্রিকায় কর্মরত। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল' পত্রিকার সম্পাদক। 'হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড' পত্রিকার প্রকাশনার শুরু থেকে এর রবিবাসরীয় বিভাগের দায়িত্ব পালন। ১৯৪৯-এ 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল' পত্রিকা থেকে অবসর গ্রহণের পর পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের আগ্রহে রাজ্য সরকারের 'ডাইরেকটর অব পাবলিসিটি'র পদে যোগদান। তিন বছর কাজ করার পর দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের চিফ ইনফরমেশনের অফিসার নিযুক্ত। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ', 'Rammohan Roy and His Works', 'Some Aspects of Modern Journalism in India', ইত্যাদি। মৃত্যু, ২৩ আগস্ট ১৯৭৫।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত (১৯০৩-১৯৫৫)॥ জন্ম, মাদারীপুর, ১৯০৩। বিপ্লবী ও সাহিত্যিক। স্কুলে অধ্যয়নকালেই স্বদেশি মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিয়েই অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯২১-এ প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে পাস। বহরমপুরে আই.এ. অধ্যয়নকালে সেখানকার জেলে বন্দী মাদারীপুরের বিপ্লবী দলের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন। এ-কাজে নিযুক্ত থাকার সময় আকস্মিকভাবে ধরা পড়েন এবং কারারুদ্ধ হন। কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর ঢাকায় এসে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি এবং বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন। জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ. পাস করে বি.এ.তে ভর্তি হবার পর বিপ্লবী সংগঠনের নির্দেশে কলকাতা গমন। ১৯৩০-এ বি.এ. পরীক্ষা দেবার অল্প কিছুদিন পর পুনরায় গ্রেপ্তার এবং সুদীর্ঘ আট

বছর বিভিন্ন বন্দী শিবির ও জেলে দিনযাপন। কারামুক্তির পর ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। সঙ্গে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৪০-এ হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে যোগ দিলে পুনরায় গ্রেপ্তার। ১৯৪৬-এ মুক্তিলাভ। ঐ সময় থেকেই আমৃত্যু আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ বকশা ক্যাম্প, 'ডেটিনিউ ও বন্দীর বন্দনা'। মৃত্যু. ১১ আগস্ট ১৯৫৫।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত (১৯২৪-২০০৮)॥ জন্ম. মুন্সিগঞ্জ, ১৯২৪। স্থানীয় স্কুল থেকে ১৯৪০-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৪২-এ আই.এ. পাস। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি বিভাগে অনার্সে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে ইংরেজি বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু। পরে দিল্লি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। দিল্লিতে ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসে যোগদান। কিছুদিন দিল্লির আকাশবাণীতে কাজ করার পর ১৯৫৮-এ তিনি ভিয়েতনাম আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থায় প্রেস অফিসার পদে যোগদান। ১৯৬৩-এ তিনি দিল্লিতে ফিরে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোতে ডিপুটি ডিরেক্টর হন। ১৯৬৪-এ কলকাতায় দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান। ১৯৮০-এ তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। ১৯৮৬-এ তিনি এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৭-এ প্রথম গ্রন্থ 'দ্য অ্যাটম অ্যান্ড ইটস' প্রকাশিত। বইটি 'পরামাণু শক্তি' নামে বাংলায়ও প্রকাশিত। এই বইয়ের মুখবন্ধ লিখেছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ২০০৫-এ দ্বিতীয় গ্রন্থ 'থিমস অ্যান্ড ভ্যারিয়েশনস' প্রকাশিত হয়। মৃত্যু. কলকাতা, ২০ আগস্ট ২০০৮।

অমলেন্দু বিশ্বাস (১৯২৫-১৯৮৭)॥ জন্ম. পিতার



কর্মক্ষেত্র বার্মায়, ১৯২৫। যাত্রা অভিনেতা ও অধিকারী। স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ ভারতীয় বিমান বাহিনীতে চাকরি গ্রহণ। যুদ্ধশেষে কিছুকাল রেলওয়ে বিভাগে চাকরি করার পর বাবুল অপেরায় অভিনয়ে যোগদান। প্রায় পঁচিশ বছর বিভিন্ন যাত্রা দলের অভিনেতা ও নির্দেশক হিসেবে কর্ম সম্পাদন। চারণিক যাত্রাদল প্রতিষ্ঠা। প্রায় দেড় দশক এর পরিচালনা। বিভিন্ন যাত্রাপালায় নায়কের ভূমিকায় অভিনয়। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতেন তাঁর স্ত্রী জ্যোৎস্না বিশ্বাস। ১৯৬১-তে জ্যোৎস্নার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। মধুসূদন, জানোয়ার, লেনিন, অচল পয়সা, ভাওয়াল রাজা সন্ন্যাসী, সিরাজদ্দৌলা, সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রভৃতি যাত্রাপালায় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন। শিল্পীজীবনে মানিকগঞ্জের জাবড়া গ্রামে নিজের বাড়িতে বসবাস। ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের সদস্য। যাত্রায় অবদান রাখায় বাচসাস, সিকোয়েন্স, থিয়েটার ও শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার লাভ। মরণোত্তর একুশে পদক লাভ। চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অরুণা বিশ্বাস তাঁর কন্যা। মৃত্যু. ঢাকা, ১৩ অক্টোবর ১৯৮৭।

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭)॥ জন্ম.



শ্রীরামপুর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ১০ এপ্রিল, ১৯০১। সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। আসামের গৌরীপুর রাজ্যের দেওয়ান দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর পিতা। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস (১৯২১) করে শান্তিনিকেতনের গবেষণা বিভাগে যোগদান। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯২৬)। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন (১৯২৬-১৯৩৩)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা, গবেষণার বিষয় ছিল: 'The dynasts and the post war poetry: a study in modern ideas'। এ অভিসন্দর্ভের জন্য ১৯৩৭-এ সপরিবার আমেরিকা গমন এবং ১৯৭৭ পর্যন্ত সেদেশে বাস। হাওয়ার্ড, বস্টন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক প্রাচ্য ধর্ম ও সাহিত্যে অধ্যাপনা (১৯৪৮-১৯৬৭)। কবি ইয়েটস, জর্জ বার্নাড শ, আলবার্ট আইনস্টাইন, রবার্ট ফ্রস্ট, আলবার্ট সোয়াইটজার, বোরিস পাস্তেরনাক, পাবলো কাসালস প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য মনীষীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ

সম্পর্ক স্থাপন। একজন শীর্ষস্থানীয় আধুনিক কবি। ত্রিশের দশকের পাঁচজন আধুনিক কবির একজন। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রভাবিত কাব্য-বলয়ের বাইরে তাঁর অবস্থান। সৃজনশীল গদ্যশিল্পীও। ত্রিশোত্তর বাংলা গদ্য সাহিত্যে তৎকর্তৃক একটি বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তন প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: কাব্য– 'খসড়া' (১৯৩৮), 'এক মুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২) 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩) 'দূরবাণী' (১৯৪৩) 'পারাপার' (১৯৫৩) 'পালাবদল' (১৯৫৫) 'ঘরে ফেরার দিন' (১৯৬১) 'হারানো অর্কিড' (১৯৬৬) 'পুষ্পিত ইমেজ' (১৯৬৭); গদ্য রচনা – 'চলো যাই' (১৯৬২), 'সাম্প্রতিক' (১৯৬৩), 'পুরবাসী', 'পথ অন্তহীন' ইত্যাদি। 'ইউনেস্কো পুরস্কার' (১৯৬০) ও 'ভারতীয় ন্যাশনাল একাডেমি পুরস্কার' লাভ। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত (১৯৭০)। মৃত্যু. ১৯৮৭।

অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৭৩)॥ জন্ম. কুলকাঠি গ্রাম, ঝালকাঠি, ১৯১১। লেখক ও শিক্ষাবিদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৩-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. পাস। ছাত্রকালে বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে ব্রিটিশবিরোধী সহিংস আন্দোলনে যোগদান। ১৯৩৩-এ আলিপুর বোমা-মামলায় গ্রেফতার। প্রায় পাঁচ বছর বন্দী জীবন যাপন। কারাগার থেকে পরীক্ষা দিয়ে অর্থনীতিতে এম.এ. ও ল' পাস। ১৯৩৭-এ কারাগার থেকে মুক্তিলাভ। ১৯৩৮-এ বরিশাল বি.এম. কলেজে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধ্যাপক নিযুক্ত। এ কলেজে প্রায় দুই বছর অধ্যাপনা। দৌলতপুর বি.এল. কলেজ, গোপালগঞ্জ রামদিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজ ও কাঁথি পি.কে. কলেজে বিভিন্ন মেয়াদে ১৯৭৩-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপনা। ১৯৪৬-১৯৪৭-এ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও শনিবারের চিঠি'র সহ-সম্পাদক। সম্বুদ্ধ নামে পরিচিত ও খ্যাত। গল্প ও গোয়েন্দা কাহিনী রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ। লেখায় ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সৃষ্টিতে পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প– 'ডায়লেকটিক' (১৯৩৯) ও 'শিকার কাহিনী' (১৯৪৬); গোয়েন্দা কাহিনী – 'ছেলেধরা জয়ন্ত' (১৯৬৬)। মৃত্যু. কাঁথি, পশ্চিমবঙ্গ, ৫ মার্চ ১৯৭৩।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৭-১৯৪০)॥ জন্ম. ১৮৭৭। পণ্ডিত, শিক্ষক ও সম্পাদক। পৈতৃক পদবি ঘোষ। কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ। দেশি-বিদেশি মোট ২৬টি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন। বিভিন্ন ভাষায় চিঠিপত্র অনুবাদের জন্য ১৮৯৭-তে 'ট্রান্সলেটিং



ব্যুরো' এবং ভাষা শিক্ষার জন্য ১৯০১-এ 'অ্যাডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন। ১৯০১-১৯১৫ পর্যন্ত এই সব প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। ১৯০৫-১৯৪০ পর্যন্ত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে পালি, বাংলা ও হিন্দির অধ্যাপক। ১৯০৬-১৯০৭ পর্যন্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ অ্যাডুকেশনে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, পালি ও বাংলা ভাষায় অধ্যাপনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাধ্যক্ষ, পত্রিকাধ্যক্ষ ও সহকারী সম্পাদক। ১৯১২-এ প্রথম প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' মাসিক প্রত্রিকায় প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক ও 'বাণী', 'ইন্ডিয়ান একাডেমি', 'পঞ্চপুষ্প' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা। 'বিশ্বকোষ'-এর ২য় সংস্করণের ১ম ও ২য় খণ্ডের সম্পাদনা। বঙ্গীয় মহাকোষ নামক কোষগ্রন্থের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সম্পাদনা। তাঁর জীবনকালে এই গ্রন্থের একটি মাত্র খণ্ড প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। 'ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস' সংকলনেও কিছুকাল নিয়োজিত থাকেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর লেখা কয়েকটি গ্রন্থ: 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস', 'জৈনজাতক', 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'। মৃত্যু. ৪ এপ্রিল ১৯৪০।

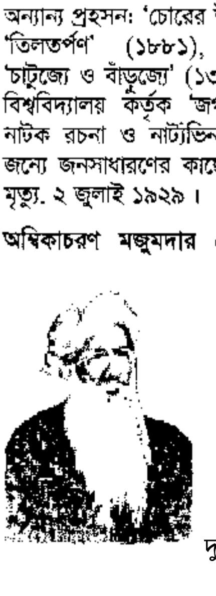
অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ১৮৫৩। নাট্যাভিনেতা ও নাট্যকার। কলকাতার কম্বুলিয়াটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত। কিছুকাল হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে ১৮৬৯-এ এন্ট্রান্স পাস



দুই বছর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে

চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন। কাশীতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অধ্যয়ন করে কিছুকাল হোমিওপ্যাথিচর্চা। পরে সরকারি চিকিৎসকরূপে পোর্টব্লেয়ারে গমন। কিছুকাল পুলিশ বিভাগে কর্ম সম্পাদন। ১৮৭২-এর ৭ ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোতে মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে 'নীলদর্পন' নাটকে অভিনয়। পরবর্তীকালে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের উৎসাহে ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানি, বেঙ্গল, স্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে সুনাম অর্জন। নাট্যশালার অধ্যক্ষরূপেও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান। স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মী এবং বাগ্মীরূপে পরিচিত। শ্যামবাজার অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুলের কর্মাধ্যক্ষ, সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতি ও এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশ, তার মধ্যে নাটক চৌত্রিশটি। উল্লেখযোগ্য নাটক: 'তরুলতা (১৮৯১), 'বিমাতা বা বিজয়বসন্ত' (১৮৯৩), 'হরিশচন্দ্র' (১৮৯৯), 'আদর্শ বন্ধু' (১৯০০) ইত্যাদি। প্রহসন রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাতে রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচয় প্রদান। নারীশিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতা বিদ্রূপ করে 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসন রচনা। 'কালাপানি প্রহসনে হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা ও 'বাবু' প্রহসনে দেশের প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্রাহ্মসমাজের ও 'একাকার' প্রহসনে নীচ জাতির ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ নিক্ষেপ। অন্যান্য প্রহসন: 'চোরের উপর বাটপারি' (১৮৭৬), 'তিলতর্পণ' (১৮৮১), 'ভিসমিশ' (১৮৮৩), 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' (১৩০৪) ইত্যাদি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী পদক' প্রদান। নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ে অসাধারণ সাফল্যের জন্যে জনসাধারণের কাছে 'রসরাজ' রূপে খ্যাত। মৃত্যু. ২ জুলাই ১৯২৯।

অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২)॥ জন্ম. সেনদিয়া, মাদারীপুর, ৬ জানুয়ারি ১৮৫১। আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী। জমিদার পরিবারে জন্ম। পিতা মাধবচন্দ্র (রাধামাধব) মজুমদার। মাতা সুভদ্রাদেবী। ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলীতে বাস করতেন। গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র সরকারের পাঠশালায় তাঁর শিক্ষায় হাতেখড়ি। পাশের গ্রাম খালিয়ায় নতুন স্কুল চালু হলে সেখানে ভর্তি হন। পরে বরিশালের একটি স্কুল থেকে ১৮৬৯-এ প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করেন। ১৮৭১-এ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ পাস করেন। ১৮৭৪-এ স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বি.এ. পাস করার পর মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। শিক্ষকতা করার সময়ে এম.এ. ও পরে বি.এল. পাস। ১৮৭৫-এ তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরোধে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৭৯-তে শিক্ষকতা ছেড়ে ফরিদপুরে ওকালতি শুরু। ১৮৮০-এ ও ১৯০২-এ তিনি ফরিদপুর উকিল বারের সভাপতি নির্বাচিত হন। স্যার সুরেন্দ্রনাথের সাহচর্য লাভ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ। ১৮৮১-তে পিপলস অ্যাসোসিয়েশন নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা। পরে এই অ্যাসোসিয়েশন ভারতসভার সঙ্গে সংযুক্ত। ১৮৯৯-তে অনুষ্ঠিত ভারতসভার প্রাদেশিক সম্মেলনের বর্ধমান অধিবেশনের এবং ১৯১০-এ অনুষ্ঠিত ভারতসভার সভাপতি। ১৯১৩-১৯১৬ পর্যন্ত ভারতসভার সভাপতি। ১৯১৬-তে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সভাপতি। ১৯১৮-তে বাইশরশির জমিদার রমেশচন্দ্র রায়চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে তাঁর পিতা রাজেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীর নামে ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজ সমিতির সভাপতি নিযুক্ত। ১৯১৯-এ ফরিদপুরে জুরির বিচার প্রবর্তন। ফরিদপুর জেলা বোর্ড ও পৌরসভার সদস্য, ভাইসচেয়ারম্যানস ও চেয়ারম্যান ছিলেন। চেয়ারম্যান হিসেবে ২০ বছর দায়িত্ব পালন। তাঁর সময়ে শহরে সড়কে আলো ও পানি সরবরাহ চালু হয়। গোপালগঞ্জের উলপুর থেকে 'চিত্রকর' নামক পত্রিকা প্রকাশ। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের ওপর রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'Indian National Evolution'. তাঁর নামে ফরিদপুরে একটি রেলস্টেশন, একটি সড়ক, একটি মিলনায়তন, একটি পাঠাগার ও একটি ময়দান রয়েছে। মৃত্যু. ২৯ ডিসেম্বর ১৯২২।



অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৫ আগস্ট ১৮৭২। রাজনৈতিক নেতা,

অধ্যাত্মসাধক এবং দার্শনিক। কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁর পিতা ও রাজনারায়ণ বসু তাঁর মাতামহ বাল্যেই পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে প্রেরিত। ১৮৯০-এ গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায়



শীর্ষস্থান অধিকার করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৮৯২-তে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রাইপস পাস। অশ্বচালনা পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকায় চাকরি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। ১৮৯৩-তে দেশে ফিরে বরোদা কলেজে প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত। বরোদায় মহারাষ্ট্রের গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের নেতা পুনার ঠাকুরের কাছে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ। ১৯০২-এ অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত করে গুপ্ত বিপ্লবী দল সংগঠনের জন্য বাংলায় প্রেরণ। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশি আন্দোলন শুরু হলে ১৯০৬-এ বরোদার চাকরি পরিত্যাগ করে বাংলায় আগমন এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। কংগ্রেস র‍্যাডিক্যাল ও মডারেট এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লে র‍্যাডিক্যাল গ্রুপের অন্যতম প্রধান নেতা এবং ১৯০৬-এ প্রকাশিত এই দলের মুখপত্র ইংরেজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদক। ১৯০৮-এ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক রচনা প্রকাশের অজুহাতে গ্রেফতার এবং বিখ্যাত আলিপুর মামলার আসামিরূপে বিচার অনুষ্ঠান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক মামলা পরিচালনায় মুক্তিলাভ। এরপর রাজনীতি পরিত্যাগ করে দিব্যজীবনের সন্ধানে বাংলাদেশ ত্যাগ করে পণ্ডিচেরী গমন। ভারতের সনাতন ধর্ম প্রচার ও আশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজে মনোনিবেশ। ইংরেজি সাপ্তাহিক 'কর্ম যোগিন' বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ। রাজনৈতিক সংস্রব ছেড়ে পণ্ডিচেরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে যোগসাধানায় আত্মনিয়োগ। ১৯১৪ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত দর্শন বিষয়ক ইংরেজি 'আর্য' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁর ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা উপস্থাপন বাল্যকাল থেকেই ইংরেজি রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। তাঁর রচিত ইংরেজি গ্রন্থের সংখ্যা ৩২টি বাংলা ৬টি। উল্লেখযোগ্য ইংরেজি গ্রন্থ: The Life Divine. Essays on Gita. Savitri. Mother India. The Hero and the Nymph Urvasie (বিক্রমোর্বশী), Song of Myrtilla and other Peoms, The Age of Kalidasa. A System of National Education. The Renaissance in India. Speeches of Aurobinda. বাংলা গ্রন্থ: কারাকাহিনী, ধর্ম ও জাতীয়তা, অরবিন্দের পত্র ইত্যাদি। অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা ও আধ্যাত্মসাধক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) কংগ্রেসের র‍্যাডিক্যাল গ্রুপের বিশিষ্ট নেতা, আর অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী দলের নেপথ্য নায়ক হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন। তাঁর কাছে ধর্ম ও জাতীয়তা ছিল এক ও অভিন্ন। মৃত্যু. ৫ ডিসেম্বর ১৯৫০।

অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৭৪)॥ জন্ম. কলকাতা, ১ আগস্ট ১৮৮১। আইন ব্যবসায়ী, শিল্প সমালোচক, অধ্যাপক। সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন ও.সি গাঙ্গুলি নামে। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৮৬-তে এন্ট্রান্স পাস। ১৯০০-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস। এরপর কলকাতা গ্রেগরি অ্যান্ড জেন্সি কোম্পানিতে সলিসিটরের ট্রেনিং লাভের উদ্দেশ্যে ভর্তি এবং প্রযুক্তি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ। আইন পাস করে এটর্নি হিসেবে হাইকোর্টে যোগদান আইন ব্যবসায় তাঁর পেশা ছিল, কিন্তু নেশা ছিল শিল্পকলাচর্চা এবং শিল্পকলার ইতিহাস ও আলোচনা অধ্যয়ন। ছবি আঁকায় হাতেখড়ি অল্প বয়সেই, প্রেরণা পেয়েছিলেন মাতামহ ভাস্কর শ্রীনাথ ঠাকুরের কাছে। শিল্পচার্য যামিনী রায়ের মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথসহ ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ঘটে। 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর সচিব। সোসাইটির পত্রিকা 'রূপম' (ইংরেজিতে প্রকাশিত) সম্পাদনা। ১৯৪৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগেশ্বরী অধ্যাপকরূপে যোগদানের পর আইন ব্যবসায় ত্যাগ। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: ভেডিক পেন্টিং, মিথুন ইন ইন্ডিয়ান আর্ট, সাউথ ইন্ডিয়ান ব্রোঞ্জ, মডার্ন ইন্ডিয়ান পেইন্টার্স, মাস্টার পিসেস অব রাজপাত পেন্টিংস এবং সংগীত সম্পর্কীয় রাগস অ্যান্ড রাগিনিজ

ব্যতীত বাংলা বইও তাঁর কিছু আছে: ভারতের ভাস্কর্য, রূপশিক্ষা, ভারতের শিল্প ও আমার কথা। মৃত্যু. কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (১৮৫০-১৯০৯)॥ জন্ম. বাগবাজার, কলকাতা, ১৮৫০। নট ও নাট্যশিক্ষক। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, তবে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান ছিল। বাল্যকালেই রাজবাড়ির নাট্যমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৬৭-র ২ নভেম্বর



কয়লাহাটায় অভিনীত 'কিছু কিছু বুঝি' নামক একটি প্রহসনে প্রথম অভিনয়। এরপর গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যশিল্পীর সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকে অভিনয়। হাস্যরসাত্মক ও গুরুগম্ভীর চরিত্র এবং সাহেবদের ভূমিকায় নাট্যাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'নীল দর্পণ'-এ উড সাহেবের ভূমিকায় অভিনয়। এ-ছাড়া অন্যান্য নাটকে উল্লেখযোগ্য চরিত্রাভিনয়ের মধ্যে রয়েছে 'নবীন তপস্বিনী'তে জলধারন, 'আবু হোসেন' নাটকে আবু হোসেন, 'জনায়' বিদূষক, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিদ্যাদিগ্গজ, 'সিরাজউদ্দৌলা'য় ডেক, 'মীর কাশীম'-এ হলওয়েল, 'প্রফুল্ল' নাটকে রমেশ, 'রিজিয়া'য় ঘাতক ইত্যাদি। নাট্যশিল্পে আজন্ম নিবেদিতপ্রাণ। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন। মৃত্যু. ১৯০৯।

অশোক বড়ুয়া (১৯২১-১৯৬৮)॥ জন্ম. হাইদচকিয়া গ্রাম, ফটিকছড়ি-চট্টগ্রাম, ১৩ নভেম্বর ১৯২১। লেখক। ফটিকছড়ি করোনেশন হাইস্কুল থেকে তিনটি বিষয়ে লেটার মার্কসসহ মেট্রিক পাস (১৯৩৯)। নবপ্রতিষ্ঠিত কানুনগো পাড়া স্যার আশুতোষ



কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে কলেজের পাঠ ত্যাগ করে ব্রিটিশ ভারতীয় বিমান বাহিনীর মেডিক্যাল কোর এর চাকরিতে যোগদান। যুদ্ধকালীন সময়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সেক্টরে দায়িত্ব পালন। এ সময়ে সাহিত্যচর্চা শুরু। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর চাকরি পরিত্যাগ। কলকাতায় একটি ঔষধ কোম্পানিতে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি গ্রহণ। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে আয়কর হিসেবের খাতা লেখার আয় দ্বারা জীবিকানির্বাহ। 'বৌদ্ধ সংস্কৃতি সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও 'পাকিস্তান বৌদ্ধ সমিতির' সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'পারমিতা' এবং 'বিশ্বমৈত্রী' নামক সাময়িকপত্র সম্পাদনা। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও গান রচনা করে সুনাম অর্জন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: মানস কবি, চন্দ্রগোমী। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮।

অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০)॥ জন্ম. ঢাকাদক্ষিণ গ্রাম, গোলাপগঞ্জ, সিলেট, ১৪ নভেম্বর ১৯১০। কবি ও শিক্ষাবিদ। পিতা বঙ্কুবিহারী রাহা ও মাতা ব্রহ্মময়ী রাহা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতা পাঠ করে প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'কেবল লেখার নৈপুণ্য নহে কবিত্বের পরিচয় পাইলাম'। ১৯৩১-এ সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ। এ-সময় শ্রীহট্ট রবীন্দ্রজয়ন্তী পরিষদের প্রতিনিধি রূপে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ লাভ। ১৯৪৩-৪৪-এ শ্রীহট্ট জেলা গণনাট্য সংঘ গড়ে ওঠে, তিনি সহসভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: ডিহাং নদীর বাঁকে (১৯৪১), রুদ্রবসন্ত (১৯৪১), জল-ডম্বরু পাহাড় (১৯৪৫), রক্তসন্ধ্যা (১৯৪৫), শেষচূড়া (১৯৪৫), উড়োচিঠির বাঁক (১৯৫১), চৈত্রের শালবন (১৯৬১), বাণীশিল্পী অবীন্দ্রনাথ (১৯৭৩), ঘণ্টাবাজে: পর্দা সরে যায় (১৯৮১), পত্রাষ্টক (১৯৮১), পৌষ-ফসল (১৯৮৩), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৪)। মৃত্যু. শান্তিনিকেতনের পিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতাল, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯ অক্টোবর ১৯৯০।

অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩)॥ জন্ম. বাটাজোড়া গ্রাম, গৌরনদী, বরিশাল, ২৫ জানুয়ারি ১৮৫৬। রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী ও লেখক। সাব-জজ ব্রজমোহন দত্ত তাঁর পিতা। ১৮৭০-এ রংপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১৮৭৮-এ বি.এ. পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৭৯-তে এম.এ.

এবং ১৮৮০-তে বি.এল. ডিগ্রি লাভ। সাত মাস শ্রীরামপুরে চাতরা ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালন। পরে বরিশালে ওকালতি শুরু। ওকালতিতে সত্যের মর্যাদা রক্ষা করা যায় না বলে কিছুকাল পর ওকালতি ছেড়ে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ। ১৮৮৪-তে ব্রজমোহন স্কুল প্রতিষ্ঠা। ১৮৮৫-তে বরিশাল মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে ১৮৮৬-তে পিপলস অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন। ১৮৮৭-তে তাঁর প্রচেষ্টায় বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড স্থাপিত। একই বছর নারীশিক্ষা প্রসারের জন্যে 'বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা' ও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৮৮-তে বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত। ১৮৮৯-তে পিতার নামে বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর এই কলেজে বিনা বেতনে অধ্যাপনা। ১৮৯৭-তে বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) শুরু হলে বিলাতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'স্বদেশবান্ধব সমিতি' গঠন। ১৯০৬-এ দাদাভাই নওরোজির সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বাবিংশতম অধিবেশনের প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক ও শিবাজী উৎসবের প্রধান অধিবেশনের সভাপতি। ১৯০৭-এ কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন পণ্ড হবার পর নরম ও চরম পন্থিদের মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা ব্যর্থ হলে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। ১৯০৮-এর ১৩ ডিসেম্বর রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গ্রেফতার ও লক্ষ্ণৌ জেলে আটক। এ সময়ে তাঁর 'স্বদেশবান্ধব সমিতি' বেআইনি ঘোষিত। ১৯১০-এর ৮ ফেব্রুয়ারি মুক্তিলাভ। ১৯১৩-তে ঢাকায় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের সভাপতি। রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ফজলুল হককে পৃষ্ঠপোষকতা দান। ১৯২১-এ মহাত্মা গান্ধী প্রথম বরিশাল এসে জেলার অদ্বিতীয় নেতা হিসেবে অশ্বিনীকুমার দত্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। ১৯২২-এ আসামের চা বাগানের কুলিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে আন্দোলন বাংলা রেলপথ ও স্টিমার কোম্পানিতে পালিত ধর্মঘটে বরিশাল শাখার সভাপতি হিসেবে ভূমিকা পালন। ১৯০৬-র দুর্ভিক্ষ ও ১৯১৯-এর ঝড়ে কবলিত দুর্গতদের সাহায্যকার্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন। ছাত্রাবস্থাতেই কলকাতায় রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন। কলকাতায় থাকাকালে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৮৮২-তে বরিশালে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যপদ গ্রহণ। গ্রন্থ: ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, প্রেম, দুর্গোৎসবতত্ত্ব, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ভারতগীতি। তাঁর রচনা প্রধানত ধর্ম ও নীতিমূলক। মৃত্যু. কলকাতা, ৭ নভেম্বর ১৯২৩।



অসিত ভট্টাচার্য (১৯১৫-১৯৩৪)॥ জন্ম. লেশিয়ারা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৪ এপ্রিল ১৯১৫। বিপ্লবী, ফাঁসি কাষ্ঠে আত্মোৎসর্গকারী। পিতা ক্ষিরোদমোহন ভট্টাচার্য, মা বিরজাসুন্দরী দেবী। বিপ্লবী প্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য ও বিধু ভট্টাচার্য তাঁর অগ্রজ।



পিতামহ চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক। পিতামহের প্রবন্ধগ্রন্থ 'বৃদ্ধের বচন' স্বদেশী আন্দোলনে উদ্দীপনা যুগিয়েছে। সূর্য সেন-পরিচালিত চট্টগ্রাম গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সদস্য হিসেবে অগ্রজ বিধু ভট্টাচার্য জালালাবাদ পাহাড়ে স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। অসিত ভট্টাচার্য হেমচন্দ্র-পরিচালিত বিভি'র (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স) সক্রিয় সদস্য। বিভি'র সঙ্গে 'যুগান্তর' দলের সংযোগ ছিল। পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ মঠসংলগ্ন মাঠে ব্যায়ামচর্চার ক্লাব প্রতিষ্ঠা (১৯২৯)। ব্যায়াম চর্চার অন্তরালে চলতো বিপ্লবী কার্যক্রম। কুমিল্লার নেতৃস্থানীয় যুবকবৃন্দ যখন একে একে ধরা পড়ে যান, তখন কিশোর বিপ্লবীরাই গুপ্ত বিপ্লবী দলকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নেন। দল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ব্যাংক বা ডাক লুটের। ১৯৩৩-এর ১৩ মার্চ হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুরের রেলওয়ে স্টেশন ইটাখোলায় ডাক লুট করতে গিয়ে বিপত্তি দেখা দেয়। অসিতের সঙ্গে ছিলেন বিরাজ সেন। তারা মেল-ব্যাগ থেকে সরকারি টাকা লুট করেন। স্থানীয় জনতা তাদের ডাকাত ভেবে বসায় সব

উলট-পালট হয়ে যায়। এদের কাছ থেকে রক্ষাকল্পে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের গুলি বর্ষণ। স্থানীয় জনগণ চারদিকে ঘেরাও করে অসিত ভট্টাচার্যসহ চারজনকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। সেখান থেকে পুলিশ তাদের সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করে। দলের কাছে বিপুল সংখ্যক অস্ত্রের মজুদ ছিল। বিচার কার্যের সময় অস্ত্রভাণ্ডারের সন্ধানের জন্য পুলিশ বিপ্লবীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। কিন্তু তারা মুখ খুলেননি। হাইকোর্ট অসিত ভট্টাচার্যের ফাঁসি এবং অন্য তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। অসিত ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে সরকার কোনো আইনজীবীকে দাঁড় করাতে পারেনি। সিলেটের আইনজীবী মাখন দত্ত প্রথম তাঁর মামলা গ্রহণ করেন এবং সব জেনে নিয়ে সরকার পক্ষের আইনজীবী হিসেবে আবির্ভূত হন। এই প্রতারণার জন্য অসিতকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়। ১৯৩৪-এর ২ জুলাই ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যকর। হাসিমুখেই ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছিলেন। দেশবাসীর প্রতি তাঁর আহবান ছিল, 'আমার ভারতবাসী বন্ধুগণ। আমি দেশমাতৃকার বেদীমূলে স্বাধীনতার জন্য আত্মবলি দিচ্ছি। তোমরাও এর জন্য প্রস্তুত থাকবে।' মৃত্যু. সিলেট, ২ জুলাই ১৯৩৪।

অসিতবরণ মুখোপাধ্যায় (১৯১৬-১৯৮৪)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৯১৬। অভিনেতা, গায়ক। দারিদ্র্যের কারণে পড়াশুনা বেশি দূর এগোয় নি। তবলাবাদনে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে তালিম গ্রহণ। ১৯৩৮-এ তবলাবাদক হিসেবে কলকাতা বেতারে যোগদান। ১৯৪১-এ পাহাড়ী সান্যালের সহায়তায় 'প্রতিশ্রুতি' চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ লাভ। চল্লিশের দশকে চলাচল, রূপকথা, ইন্দ্রধনু, জয়দেব, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন। ১৯৫৭ থেকে পেশাদার মঞ্চাভিনেতা। সংগীতশিল্পী হিসেবেও খ্যাতি লাভ। চলচ্চিত্রে নিজের অভিনীত ছবিতে কণ্ঠদান ছাড়াও গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া অসংখ্য গানের জনপ্রিয়তা অর্জন। সংগীতে, অভিনয়ে, বাজনা ছাড়াও ফুটবল খেলার অনুরাগী। মৃত্যু. কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ১৯৮৪।

অহীন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৪)॥ জন্ম. কলকাতা, ১২ আগস্ট ১৮৯৫। নট ও চিত্রাভিনেতা। লন্ডন মিশনারি স্কুলে লেখাপড়া কিশোর বয়সেই থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত। ১৯২৩-এ কর্নার্জুন নাটকে অর্জুনের



ভূমিকায় সর্বপ্রথম মঞ্চাভিনয়। অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ। অশোক, মিশরকুমারী, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি নাটকে অভিনয় ও খ্যাতি অর্জন। একই চলচ্চিত্রেও অভিনয় শুরু। তটিনীর বিচার, রাজনর্তকী, সোনার সংসার, শেষ উত্তর প্রভৃতি চলচ্চিত্রে অভিনয়। ১৯২২-এ 'সোল অব এ স্লেভ' নামক চিত্রে নিজস্ব পরিচালনায় অভিনয়। ১৯৫৭-তে মিনার্ভা মঞ্চে সাজাহান নাটকের নাম ভূমিকায় শেষ অভিনয়। ১৯৫৪-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সংগীত নাটক আকাদেমি'র অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৯৫৮-তে 'সংগীত নাটক আকাদেমি' কর্তৃক পুরস্কৃত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গিরিশ অধ্যাপক' হিসেবে বক্তৃতাপ্রদান। ১৯৬৭-তে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিলিট উপাধি গ্রহণ। ১৯৭২-এ নাট্যশতবার্ষিকী উৎসবে স্টার থিয়েটার পদক লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ৫ নভেম্বর ১৯৭৪।

আইভি রহমান (১৯৪৪-২০০৪)॥ জন্ম ৭ জুলাই,



১৯৪৪। বড়বাড়ি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ। রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী। প্রকৃত নাম জেবুন নাহার আইভি। পিতা ঢাকা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক জালালুদ্দিন আহমেদ এবং মাতা হাসিনা বেগম। আট বোন এবং তিন ভাইয়ের মধ্যে পঞ্চম। তাঁর বড় বোন শমসুন্নাহার সিদ্দিকী হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানার শাশুড়ী। আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমানের সঙ্গে ২৭ জুন ১৯৫৮ তারিখে আইভি রহমানের বিয়ে হয়। জিল্লুর রহমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। পরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি। আইভি রহমানের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। ছেলে নাজমুল আহসান জাতীয় সংসদের সদস্য ও বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের

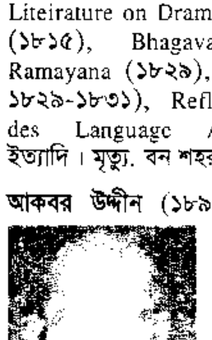
সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৬৯-এ বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে মহিলা আওয়ামী লীগ গঠিত হলে আইভি রহমান হন তার প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক। ১৯৭১-এ ভারতে গিয়ে অস্ত্র চালনা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং সরাসরি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ। ১৯৭৫-এ জাতির জনককে সপরিবার হত্যার পরে সাহসী ভূমিকা নিয়ে দল পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ। ১৯৭৮-এ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহি কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৮০-এ একই সঙ্গে মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০০২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের পর মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৯৬-এ জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং জাতীয় মহিলা সমিতির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা সমিতির চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ অন্ধ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক। সমাজসেবা ও স্বাধীনতাযুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য ২০০৯-এ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে ভূষিত। ২০০৪-এর ২১ আগস্ট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলায় মারাত্মকভাবে আহত। তাঁর দুটি পা উড়ে যায়। মৃত্যু. সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায়, ঢাকা, রাত ২টা, ২৪ আগস্ট ২০০৪।

আউগুস্ট হ্বিলহেলেম ফন শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫)॥ জন্ম. হানোভার, জার্মানি, ৮ সেপ্টেম্বর ১৭৬৭। কবি, সমালোচক, অনুবাদক, রোমান্টিসিজমের প্রবক্তা, প্রাচ্যবিদ্যাবিদ। পিতা জোহান এডলফ শ্লেগেল। হানোভারে প্রাথমিক শিক্ষার পর গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত। কিছুকাল আমস্টার্ডামে এক ধনীগৃহে শিক্ষকতা। ১৭৯৬-এ ইয়েনা শহরে গমন। ১৭৯৮-তে ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। এ সময় থেকেই শেক্সপিয়র রচনাবলী জর্মন ভাষায় অনুবাদ শুরু। ১৮১০-এর মধ্যে সম্পন্ন। এই অনুবাদকর্ম জর্মন



সাহিত্যে তাঁর একক বৃহত্তম অবদান। ইয়েনায় অবস্থানকালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফ্রিডরিশ ফন শ্লেগেলের সহযোগিতায় 'ডাস আর্টেনাউম' (১৭৯৮-১৮০০) নামে সাহিত্যপত্র পরিচালনা করে রোমান্টিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। ১৮০২-এ শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতাদানের উদ্দেশ্যে বার্লিন গমন। গ্রিক ট্রাজেডি অনুসারে একটি নাটক রচনা। বিভিন্ন দেশের কিছু নাটক ও গীতিকবিতার অনুবাদ প্রকাশ। ১৮০৯ থেকে ১৮১১ পর্যন্ত ভিয়েনায় ছিলেন নাট্যকলা ও সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে। ১৮১৬-১৮১৭ পর্যন্ত প্যারিসে অবস্থানকালে অধ্যাপক দ্য শেজির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা এবং ১৮১৮-তে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষায় অধ্যাপক নিযুক্ত। বন শহরে সংস্কৃত মুদ্রণাক্ষরসম্বলিত একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠাও তাঁর কীর্তি। ১৮২৩-এ ভারতবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্যে 'ইন্ডিশ বিব্লিওটেক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ। ১৮৩০ পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিল। ১৮২৩-এ নিজের প্রেস থেকে মূল গীতি ও তৎসঙ্গে স্বকৃত লাতিন অনুবাদ প্রকাশ। ১৮২৯-এ প্রকাশিত হয় তাঁর জর্মন অনুবাদে রামায়ণের একাংশ এবং ১৮২৯-১৮৩১ সময়কালে অনূদিত হিতোপদেশ (মূল ও জর্মন অনুবাদে) বেরোয় দু'খণ্ডে। প্রধান রচনাবলি: Gedichte (১৮০০), Ion (নাটক, ১৮০৩), Spanisches Theater (২য় খণ্ড: ১৮০৩-১৮০৯), Blumens Traune Italienishcer, Spanischer and Portugies Ischer Poesie (১৮০৪). A course of Liteirature on Drama. Art and Literature (১৮১৫), Bhagavat Gita (১৮২৩), Ramayana (১৮২৯), Hitopodesh (২ খণ্ড: ১৮২৯-১৮৩১), Reflexions sur l'etudes des Language Asiatiques (১৮৩২) ইত্যাদি। মৃত্যু. বন শহর, ১২ মে ১৮৪৫।

আকবর উদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮)॥ জন্ম. চাঁদ সড়ক, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ১৮৯৫। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, জীবনীকার, অনুবাদক। পিতা জয়নাল আবেদীন সিলেটে ঠিকাদারির কাজ করতেন। ১৯১১-তে সিলেট সরকারি বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক, ১৯১৩-তে সিলেট



মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে আই.এ. এবং ১৯১৬-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ও আইন ক্লাসে কিছুকাল অধ্যয়ন। ১৯১৭-তে কৃষ্ণনগর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত। ১৯১৮-তে কৃষ্ণনগর সরকারি জজ আদালতে অনুবাদক নিযুক্ত। ১৯৪৩ পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব পালন। কৃষ্ণনগর পৌরসভার নির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান (১৯২৪-১৯২৮, ১৯৩৩-১৯৪২)। ১৯৪৯-এর নভেম্বর থেকে ১৯৫৬-এর জুন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত ঢাকার ইউ.এস.আই.এস.-এর ব্রাঞ্চ সেন্টারের কো-অর্ডিনেটর। দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দৈনিক আজাদ-এর সহকারী সম্পাদক। ১৯৪৮-১৯৪৯ পর্যন্ত কলকাতার দৈনিক পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর। ১৯৫৯-১৯৬৫ পর্যন্ত দৈনিক আজাদ-এর সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত। মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী লেখক। সমকালীন সম্বিৎহারা বাঙালি মুসলমান সমাজকে নবজাগরণের চেতনায় উজ্জীবিত করার প্রয়াসে সাহিত্যসাধানায় আত্মনিয়োগ। ষাটের দশকে পাকিস্তান সরকারের রবীন্দ্রবিরোধিতার সমর্থনে বিবৃতি প্রদান। উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম নাটক: সিন্ধু বিজয় (১৯৩০), আজান (১৯৪৩), সুলতান মাহমুদ (১৯৫৪), নাদির শাহ (১৯৩২), মুজাহিদ। উপন্যাস: মাটির মানুষ, বেড়াজাল, অভিনেতা। ছোটগল্প: অসমাপ্ত কাহিনী ও অন্যান্য গল্প। জীবনী: পথের দিশারী, শহীদ লিয়াকত (১৯৬৪), কায়েদে আযম (১৯৬৯)। অনুবাদ: অপরাধ ও শাস্তি (দস্তয়ভস্কির Crime and Punishment), হাজী মুরাদ (টলস্টয়), হেনরি অ্যাডামসের আত্মজীবনী, ফেডারিলিস্ট (আলেকজান্ডার হেমিলটন ও জেমস মেডিসন), জন মার্শাল, প্রকৃতি ও মানুষ (ইমারসন), হেনরি জেমস অ্যাডামসের শিক্ষাবিষয়ক আত্মচরিত (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড)। ১৯৬৪-তে নাটকে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। ১৯৬৪-তে দাউদ পুরস্কার এবং ১৯৬৩-তে পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে 'তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব লাভ। মৃত্যু. ৭ অক্টোবর ১৯৭৮।

আকবর হোসেন (১৯১৫-১৯৮১)॥ জন্ম. কেয়াগ্রাম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, ৩১ সেপ্টেম্বর ১৯১৫। কথাশিল্পী। কুষ্টিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স ও কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পাস। দীর্ঘকাল সরকারি চাকরিতে কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ: অবাঞ্ছিত (১৯৫০), কি পাইনি (১৯৫২), মোহমুক্তি (১৯৫৩), ঢেউ জাগে (১৯৬১), দু'দিনের খেলাঘর (১৯৬৫), আলোছায়া (১৯৬৪), মেঘ বিজলী বাদল (১৯৬৮), নতুন পৃথিবী (১৯৭৪)। তাঁর সমসাময়িককালে জনপ্রিয় কথাশিল্পী। মৃত্যু. ২ জুন ১৯৮১।

আ. ক. ম. মুজতবা (১৯২৭-১৯৮৩)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৯২৭। সংগীতশিল্পী, বংশীবাদক, বেহালাবাদক। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩-তে ইসলামের ইতিহাসে এম.এ. পাস। 'ময়না ভাই' নামে সুপরিচিত। বিখ্যাত বংশীবাদক মনোরঞ্জন বিশ্বাসের নিকট বংশীবাদনে তালিম গ্রহণ। ঢাকা বেতারের নিয়মিত বংশীবাদক। ১৯৫৬-তে বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে বাঁশির শিক্ষক হিসেবে যোগদান। ১৯৫৭ থেকে বেহালা বাদনের চর্চা শুরু। অচিরেই পারদর্শিতা লাভ। বুলবুল ললিতকলা একাডেমির বেহালা বিভাগের শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ। নিবেদিতপ্রাণ সংস্কৃতিকর্মী। ১৯৬৩-তে মিউজিক কলেজের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন। শতাব্দীর স্বপ্ন, ঝঞ্ঝা, সুর পেলো সুরভী প্রভৃতি নৃত্যনাট্যের রচয়িতা। মৃত্যু. ১০ নভেম্বর ১৯৮৩।

আকরামুজ্জামান খান, খানবাহাদুর (১৮৮৫-১৯৩৩)॥ জন্ম. বিহারের সাসারাম মহকুমায়, ১৮৮৫। পৈতৃক নিবাস দাদরোখী, মানিকগঞ্জ। চাকরিজীবী, সমাজসেবী। পাটনা কলেজিয়েট স্কুল ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভ। ১৯০৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস। ১৯০৭-এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত। পটুয়াখালী, ভোলা, ফেণী ও সর্বশেষ গোপালগঞ্জ জেলার এস.ডি.ও. হিসেবে চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ। জনপ্রিয় মহকুমা প্রশাসক হিসেবে গোপালগঞ্জেই সমাহিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। চাকরি উপলক্ষে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকাকালে বহু শিক্ষা ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপন। ১৯১৭-তে বরিশালে ভোলায় হাইস্কুল ও ১৯২২-এ ফেনীতে নোয়াখালী জেলার প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠা। ১৯৩১ ও ১৯৩২-এ স্পেশাল জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কমিশনার হিসেবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ

মামলার রায় প্রদান করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন। মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান স্মরণীয়। সরকার কর্তৃক খানবাহাদুর উপাধি লাভ। মৃত্যু. ১৯৩৩।

আখতার হামিদ খান (১৯১৪-১৯৯৯)॥ জন্ম. বেরিলি, উত্তর প্রদেশ, ভারত, ১৫ জুলাই ১৯১৪। পিতা খানসাহেব আমির আহমেদ খান, মাতা মাহমুদা বেগম। শিক্ষাজীবন মিরাট ও আগ্রায়। ইংরেজি সাহিত্যে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। আইসিএস অফিসার হিসেবে ১৯৩৭-১৯৪৪ পর্যন্ত কুমিল্লা, পটুয়াখালী, নওগাঁ, নেত্রকোনা ও পশ্চিমবঙ্গের তমলুকসহ বিভিন্ন স্থানে উচ্চপদে চাকরি। খাকসার আন্দোলনের প্রবর্তক আল্লামা মাশরেকীর কন্যার সঙ্গে বিয়ে (১৯৩৯)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষে জনগণের মধ্যে খাদ্য বিতরণ না করে ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্য মজুদ রাখার প্রতিবাদে মহকুমা প্রশাসকের চাকরি ত্যাগ। ১৯৪৪-৪৭-এ তালা মেরামত কারখানায় চাকরি। কিছুদিন 'মিরাট' পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৪৭-৫০-এ দিল্লিতে ড. জাকির হোসেন প্রতিষ্ঠিত জামিয়া মিল্লিয়াতে প্রধান শিক্ষক। ১৯৫০-৫৮-এ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ। ১৯৫৪-৫৫-এ Village Agricultural and Industrial Development (V-AID) কর্মসূচির পরিচালকের দায়িত্ব পালন। ১৯৫২-এ কুমিল্লায় পূর্বপাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন উদ্বোধন এবং সম্মেলনের কর্মকাণ্ডে বিশেষ সহায়তাদান। ১৯৫৫-এ কুমিল্লায় আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক সম্মেলন আয়োজন। এই সময়ে পূর্বপাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য। খুলনার দুর্ভিক্ষের (১৯৫১) কারণ অনুসন্ধান ও ত্রাণ বণ্টনের তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত। ১৯৫৬-এ কুমিল্লা বুড়িচংয়ের বন্যাদুর্গত এলাকা পর্যবেক্ষণ করে পূর্ববাংলার বন্যা ও খাদ্যাভাবের ওপর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'বেঙ্গল রিমিনিসেন্স: ফুড অ্যান্ড ফ্লাড' প্রণয়ন। ১৯৫৯-এর ২৭ মে পাকিস্তান পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা এবং প্রধান নির্বাহী পরিচালক পদে যোগদান। পল্লীউন্নয়নে তাঁর নীতি 'কুমিল্লা মডেল' হিসেবে খ্যাত। কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ নিশান-ই-ইমতিয়াজ, হিলাল-ই-পাকিস্তান, সিতারা-ই-পাকিস্তান উপাধি এবং 'ম্যাগসেসে' পুরস্কার লাভ (১৯৬৩)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব ল' এবং পাকিস্তানের করাচি বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট. উপাধি লাভ। মুক্তিযুদ্ধের সময় ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে বাধ্য হয়ে কুমিল্লা ত্যাগ। পরে যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং পাকিস্তানের ঔরাঙ্গীতে উন্নয়নমুখী প্রতিষ্ঠান গঠন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'আওরকমল' (উর্দু কাব্য), 'Rural Development in East Pakistan', 'Institutions for Rural development in Indonesia', 'Rural Development in Pakistan', 'What I learnt in Comilla and Orangi', 'Twenty Weeks in America', 'Ten Decades Of Rural Development', 'Comela Say Orangi Tak', 'Safer e America Ki Diary', 'A module on Participatory Development', 'Akhtar Hamid Khan ki dairi', 'Orangi Pilot Project programs'। মৃত্যু. যুক্তরাষ্ট্র, ৯ অক্টোবর, ১৯৯৯।

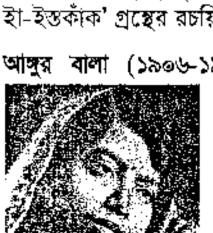


আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)॥ জন্ম. মাতুলালয়, গোটিয়া গ্রাম, গাইবান্ধা, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩। ডাকনাম মঞ্জু। কথাসাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস চেলোপাড়া, বগুড়া। পিতা বদিউজ্জামান মুহম্মদ ইলিয়াস পূর্ববঙ্গ পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সাবেক সদস্য (১৯৪৭-১৯৫৩) এবং মাতা মরিয়ম ইলিয়াস। বগুড়া জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৫৮) ও ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৬০) পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে বি.এ. অনার্স (১৯৬৩) ও এম.এ. (১৯৬৪) ডিগ্রি লাভ। ১৯৬৫-তে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাংলার প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬৫-১৯৮৬ পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজে ও ১৯৮৭-১৯৯০ পর্যন্ত ঢাকা সংগীত মহাবিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯০-তে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বাংলা বিভাগে সহযোগী



অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। পরে ঢাকা কলেজে বদলি এবং আমৃত্যু অধ্যাপনা। সমাজ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সচেতন একজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক। অনাহার, অভাব, দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবনযাপন করছে সে-সব অবেহেলিত মানুষের জীবনাচরণ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত। তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস 'খোয়াবনামা'-য় ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন ও ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, পাকিস্তান-আন্দোলন ও ভারতবিভাগকালীন সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পটভূমিতে রচিত হলেও গণ্ডগ্রামবাংলার শ্রমজীবী মানুষের জীবন এখানে চিত্রিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প– অন্যঘরে অন্যস্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দুধেভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৯), জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল; উপন্যাস– চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭) ও খোয়াবনামা (১৯৯৬); প্রবন্ধ: সংস্কৃতির ভাঙাসেতু (১৯৯৮)। এদেশের প্রগতিশীল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি ছিল তাঁর ঐকান্তিক সমর্থন। কথাসাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২) ও আনন্দ পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ক্যান্সার রোগে, ৪ জানুয়ারি ১৯৯৭।

আগা আহম্মদ আলী (?-১৮৭৩)॥ জন্ম. ঢাকা। শিক্ষাবিদ। একজন ফারসি বৈয়াকরণ এবং কলকাতা মাদ্রাসার ফারসি শিক্ষক। এশিয়াটিক সোসাইটির বহু গ্রন্থের সম্পাদক এবং 'রিসাল-ই-ইস্তকাঁক' গ্রন্থের রচয়িতা। মৃত্যু. ১৯৩৩।



আঙ্গুর বালা (১৯০৬-১৯৮৪)॥ জন্ম. কাশিপুর, কলকাতা, ২৩ জুলাই ১৯০৬। গায়িকা ও মঞ্চাভিনেত্রী। প্রকৃত নাম প্রভাতী দেবী। মেধাবী ছাত্রী হিসেবে স্কুল ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষায় জলপানি লাভ। সংগীত প্রতিভা তাঁর সহজাত। সুকণ্ঠের অধিকারী হওয়ায় শৈশবেই সংগীতসাধনায় আত্মনিয়োগ। খেয়াল, ঠুংরী, দাদরা ও গজলে একাধিক গুণী ওস্তাদের কাছে তালিম গ্রহণ। কিশোরী বয়সেই গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে গানের রেকর্ড প্রকাশ। তাঁর সংগীত জীবনের উপর উল্লেখযোগ্য অবদান [illegible] ঠাকুর, জমিরউদ্দিন খাঁ এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামের। ঈষাণ ঠাকুরের কাছে কীর্তন, জমিরউদ্দিন খাঁর কাছে ঠুংরী, গজল ও দাদরা এবং কাজী নজরুল ইসলামের কাছে নজরুলগীতি শেখেন। অজস্র হিন্দি ও বাংলা গানে কণ্ঠদান। তাঁর গাওয়া রেকর্ডের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচশত। অভিনেত্রী হিসেবেও খ্যাতি অর্জন। 'মিনার্ভা' থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থেকে অসংখ্য নাটকে অভিনয়। মৃত্যু. ৬ জানুয়ারি ১৯৮৪।



আজিজুর রহমান (১৯১৭-১৯৭৮)॥ জন্ম. হাটশ হরিপুর গ্রাম, কুষ্টিয়া, ১৮ জানুয়ারি ১৯১৭। কবি ও গীতিকার। এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্ম। কৈশোরে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় উচ্চশিক্ষা ব্যাহত। সাহিত্যচর্চার আগে জড়িয়ে পড়েন নাট্যাভিনয়ে। খেলাধুলা, ক্লাব, সমিতি, সঙ্ঘ প্রভৃতি পরিচালনা। এযাত্রার দল গঠন এবং নানাবিধ নাটকে অভিনয়। ১৯৩৮ থেকে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ। নবযুগ, নবশক্তি, আনন্দবাজার, সওগাত, অরণি, মোহাম্মদী, আজাদ, বুলবুল, ভারতবর্ষ, বাঙ্গালী, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ১৯৫৪-তে নিজস্ব শিল্পী হিসেবে ঢাকা বেতারের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৬০-এ কিশোর মাসিক 'আলাপনী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৬৪-১৯৭০ পর্যন্ত দৈনিক পয়গামের সাহিত্য সম্পাদক। দুই হাজারের বেশি গীত রচনা। প্রেম, প্রকৃতি, দেশাত্মবোধ, ইসলামি ঐতিহ্য ও সমাজসচেতনতা তাঁর গান ও কবিতায় মনোজ্ঞভাবে পরিস্ফুটিত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ডাইনোসোরের রাজ্যে (১৯৬২), জীবজন্তুর কথা (১৯৬২), ছুটির দিনে (১৯৬৩), এই দেশ এই মাটি (১৯৭০), উপলক্ষের গান (১৯৭০)। ১৯৭৯-তে একুশে পদক লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।

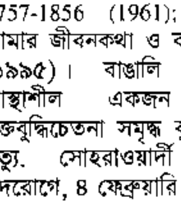
আজিজুর রহমান মল্লিক (১৯১৮-১৯৯৭)॥ জন্ম. রাজাপুর গ্রাম, ধামরাই, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৮। শিক্ষাবিদ ও গবেষক এ.আর. মল্লিক নামেও পরিচিতি। পিতা ইসমাইল মল্লিক (ভারতীয় কাস্টমসের রেঙ্গুন অফিসের কর্মচারী), মাতা সাজেদা খাতুন। মানিকগঞ্জ মডেল স্কুল

থেকে মেট্রিক (১৯৩৪) ও ঢাকা কলেজ থেকে



আই.এ. (১৯৩৬) পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে বি.এ. অনার্স (১৯৩৯) এবং একই বিষয়ে এম.এ. (১৯৪০) ডিগ্রি লাভ। ১৯৪১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক নিযুক্ত। এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯৪৩-এ রাজশাহী সরকারি কলেজে ইতিহাসের প্রভাষক পদে যোগদান। ১৯৫১-তে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলেত গমন। 'দি ডেভেলপমেন্ট অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল এন্ড বিহার ১৮১৩-১৮৫৬, উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দেয়ার এডুকেশন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ (১৯৫৩)। ১৯৫৪-তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনায় যোগদান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকালে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন (১৯৬৫-১৯৬৮)। ১৯৬৮-তে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পদে নিযুক্তি লাভ। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের (৩ মার্চ-২৫ মার্চ ১৯৭১) সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ। এ আন্দোলনের সমর্থনে তাঁর সভাপতিত্বে ২৩ মার্চ (১৯৭১) চট্টগ্রামের প্যারেড গ্রাউন্ডে সর্বস্তরের মানুষের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত। ২৫ মার্চ (১৯৭১) রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেশব্যাপী গণহত্যা শুরু করলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে ভারত গমন (এপ্রিল ১৯৭১) এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কর্ম সম্পাদন। 'বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্সিয়া' (১৯৭১) গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং এর সভাপতির পদ অলংকৃত। স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য গমন। সে সব দেশে সভা-সমাবেশ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব নিযুক্ত (জানুয়ারি ১৯৭২)। কিছুকাল পর ভারতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত। ১৯৭৫-এর ২৬ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভ। বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাকশাল) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য (৬ জুন ১৯৭৫)। একই বছর ১৫ আগস্ট (১৯৭৫) সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হলে তাঁর (মোশতাক আহমদ) সরকারেরও অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত। ৭ নভেম্বর (১৯৭৫) জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এলে মন্ত্রিত্ব হারান। ১৯৭৬-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯৮৩ থেকে আমৃত্যু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রফেসর। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি (১৯৮৩-১৯৮৬), বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির সভাপতি, জাতীয় যাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, বাংলা একাডেমীর ফেলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ও ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান (১৯৮৩-১৯৯৩)। ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস গবেষণায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান। গবেষণামূলক গ্রন্থঃ British Policy and the Muslim in Bengal, 1757-1856 (1961); স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থঃ আমার জীবনকথা ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম (১৯৯৫)। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আস্থাশীল একজন অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তবুদ্ধিচেতনা সমৃদ্ধ বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাত। মৃত্যু. সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল (ঢাকা), হৃদরোগে, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

আজিজুল হক, স্যার (১৮৯২-১৯৪৭)। জন্ম. শান্তিপুর, নদীয়া, ২৭ নভেম্বর ১৮৯২। মন্ত্রী, সমাজসেবক। এক



সাধারণ মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে জন্ম। পিতা মুনশী মনিরুদ্দিন আহমদ। পিতৃব্য কবি মোজাম্মেল হক। পিতামাতার একমাত্র সন্তান। শৈশবে মাতৃহীন হন। শান্তিপুর হাই মুসলিম ইংরেজি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯০৭) পাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। এই কলেজ থেকে এফ.এ. (১৯০৯) ও ডিস্টিংশনসহ বি.এ. (১৯১১) পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ

থেকে বি.এল. (১৯১৪) ডিগ্রি লাভ। ১৯১৫-তে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। একই বছর হুগলীর শিমলাগড়ের জমিদার কন্যা কানিজ খাতুনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ বেটনা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচত। ১৯২৬-এ নদীয় জেলার সরকারি উকিল (জি.পি.) ও পাবলিক প্রসিকিউটর (পি.পি) নিযুক্ত; একই বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত নদীয়া জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান। ১৯২৯-এ ব্যবস্থাপক সভায় পুনঃনির্বাচিত। ১৯৩৩-এ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত। ১৯৩৪-এর ১৫ জুন বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৩৭-এ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। একই বছর লীগ কোয়ালিশন দলের সদস্যদের ভোটে ব্যবস্থাপক সভার স্পিকার নির্বাচিত। ১৯৪২ পর্যন্ত এপদে দায়িত্ব পালন। ১৯৩৮ এর আগস্ট মাসে দুই বছরের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত। ১৯৪০-এ এই পদে পুনঃনিযুক্তি লাভ এবং ১৯৪২-এর মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন। ১৯৪২-এর এপ্রিলে বিলাতে ভারতের হাইকমিশনারের পদে নিযুক্তি পেয়ে লন্ডন গমন। এক বছর রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করে ১৯৪৩-এর এপ্রিলে দেশে প্রত্যাবর্তন। একই বছর ৩ মে (১৯৪৩) ভারতের বড় লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্তি। এই পদে বাণিজ্য, শিল্প ও খাদ্য বিভাগের কেবিনেট মন্ত্রির দায়িত্ব লাভ। ১৯৪৫-এ কেন্দ্রের মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ। কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯৪৬-এ মুসলিম লীগের টিকিটে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। অবিভক্ত বঙ্গের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও লেখক হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। সরকারি স্কুলে শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজি থেকে বাংলায় চালু, প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনাকে অ্যাক্টে পরিণত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রতিষ্ঠা (১৯৪০), শিক্ষা সপ্তাহ পালন কর্মসূচি প্রবর্তন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপন সভায় মহাজনি বিল ও প্রজাস্বত্ব আইন উপস্থাপন তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। প্রকাশিত গ্রন্থ: History and Problems of Moslem Education in Bengal (1917). The Man Behind the Plough (1939). The Sword of the Crescent Moon (1944) খানবাহাদুর (১৯২৩), সি.আই.ই. (১৯৩৭), নাইট (১৯৩৭), কে.সি.এস.আই. (১৯৪৬) উপাধি লাভ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট উপাধি প্রদান (১৯৪২)। মুসলিম লীগের বোম্বাইর প্রস্তাব (১৯৪৬) অনুযায়ী সব সরকারি খেতাব অর্জন। মৃত্যু. কলকাতা, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে, ১৯ মার্চ ১৯৪৭।

আজিজুল হাকিম (১৯০৮-১৯৬২)॥ জন্ম. হাসনাবাদ, ঢাকা, ১৯০৮। কবি ও প্রাবন্ধিক। স্কুল পর্যন্ত অধ্যয়ন। কিছুকাল মাসিক 'সবুজ বাঙলা' ও পাক্ষিক 'নওরোজ' পত্রিকা সম্পাদনা। রচিত কবিতাগ্রন্থ: ভোরের সানাই, মরুসেনা, ঘরহারা, পথহারা, বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর। 'আজাজিলনামা' ব্যঙ্গ কবিতা সঙ্কলন। অনুবাদ গ্রন্থ: রোবাইয়াৎ-ই-হাফিজ ও রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম। গল্পগ্রন্থ: ঝড়ের রাতের যাত্রী। মৃত্যু. ১৯৬২।

আজিমউদ্দিন, মুনশী॥ জন্ম. খড়ি, বর্ধমান। উনিশ শতকের অন্যতম প্রহসন-রচয়িতা। তৎকালীন সংস্কৃতপ্রধান সাধু বাংলার পরিবর্তে সহজ কথ্যভাষায় গ্রন্থ রচনা। প্রহসন: জামাল নামা (১৮৫৯), কি মজার কলের গাড়ি (১৮৬৩), কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে (১৮৬৮) প্রভৃতি। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

আজীজ-উল হক (১৯২৩-২০০২)॥ জন্ম, চান্দনা, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা। পিতা শরাফত আলী ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা, মাতা আমেনা বেগম। বাবার বদলির চাকরি ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ। ১৯৩৮-এ কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা



পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। ১৯৪০-এ ইংরেজিতে ডিস্টিংশনসহ আই.এসসি. পাস। ১৯৪৩ ও ১৯৪৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক সম্মান ও প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন স্নাতক (১৯৫২) এবং হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.এ. (১৯৬০) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) পরিপ্রেক্ষিতে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বেসামরিক সরবরাহ বিভাগে মহকুমা নিয়ন্ত্রণ

পদে কর্মজীবন শুরু করেন, পরবর্তীকালে অতিরিক্ত জেলা নিয়ন্ত্রক ও জেলা নিয়ন্ত্রকে উন্নীত হন। ১৯৪৯-এ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সাপ্লাই ডেভেলপমেন্ট বিভাগের পরিচালক পদে যোগদান করেন। ১৯৫৭-এ পূর্ব-পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থার (ইপসিক) পরিচালক পদে যোগদান। ১৯৬০ পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের ডিরেক্টর অব সাপ্লাই পদে যোগদান। ১৯৬২-তে ইপসিকের চেয়ারম্যান, ১৯৬৫তে পূর্ব-পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের পরিচালক পদে বৃত হন। ১৯৬৮-তে কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমির পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৭৬-৭৯তে রাষ্ট্রপতির কৃষি উপদেষ্টা ও পরে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯-এ প্রতিষ্ঠা করেন সিরডাপ (দ্য সেন্টার অন ইন্টেগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া এন্ড দ্য প্যাসিফিক)। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক পদে বৃত হন এবং ১৯৮৪ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকেন। বাংলাদেশের রোটারী আন্দোলনের অগ্রদূত। স্কাউট আন্দোলনের প্ররোধা ব্যক্তিত্ব। ডায়ারেটিক সমিতি প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। ১৯৫৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আজিজুল হকের কন্যা এসনে আরা হকের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি পল্লী উন্নয়ন, সাক্ষরতা, গণশিক্ষা, কৃষিউন্নয়ন, শস্যচাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে জেলের উন্নয়নে নিয়োজিত চিত্তে কাজ করেছেন। মৃত্যু, ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০২।

আতাউর রহমান খান (১৯০৭-০৯৯১)॥ জন্ম. বালিয়া গ্রাম, ধামরাই, ঢাকা, ১ জুলাই ১৯০৭। রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও লেখক। ঢাকা পগোজ স্কুল থেকে ১৯২৪-এ এন্ট্রান্স, জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯২৭-এ এফ.এ. ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে



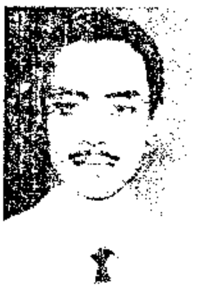
১৯৩০-এ অর্থনীতিতে বি.এ. অনার্স পাস। রাজনীতিতে যোগদান। ঢাকা জেলা প্রজা সমিতির সম্পাদক (১৯৩৪-১৯৩৫)। ১৯৩৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এল. ডিগ্রি লাভ। ১৯৩৭-এ ঢাকা জেলা আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯৪২-এ মুন্সেফ পদে চাকরি গ্রহণ। ১৯৪৪-এ চাকরি ছেড়ে পুনরায় ওকালতিতে প্রত্যাবর্তন। একই বছর মুসলিম লীগে যোগদান। ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও মানিকগঞ্জ মহকুমা লীগের সহসভাপতি নির্বাচিত। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার সময় আইন সহায়ক কমিটির সম্পাদক। ১৯৪৯-এর ২৩ জুন ঢাকায় আওয়ামী লীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। দলের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সহভাপতি (১৯৪৯-১৯৬৪)। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ (৩০ জানুয়ারি ১৯৫২)-এর অন্যতম সদস্য। ভাষা-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার দায়ে আহ্বায়কসহ কর্মপরিষদের বহু সদস্য গ্রেফতার হলে পুনর্গঠিত কর্মপরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত (মার্চ ১৯৫২)। যুক্তফ্রন্ট (৩ ডিসেম্বর ১৯৫৩)-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক (১৯৫৩-১৯৫৫)। যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে ১৯৫৪-র মার্চে ঢাকা জেলার পশ্চিম-উত্তর অঞ্চল থেকে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গ সরকারের বেসামরিক সরবরাহ দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত (৩ এপ্রিল ১৯৫৪)। ৩০ মে (১৯৫৪) কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা জারি করে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিলে মন্ত্রিত্ব থেকে পদচ্যুত। ১৯৫৫-র জুন মাসে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের বিরোধীদলের নেতা (১৯৫৫-১৯৫৬) ও একই সঙ্গে গণপরিষদের বিরোধীদলের উপনেতা (১৯৫৫-১৯৫৬)। ১৯৫৬-র ৬ সেপ্টেম্বর পূর্বপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারির পূর্বপর্যন্ত এপদে দায়িত্ব পালন। সামরিক সরকার কর্তৃক তাঁর উপর 'এবডো' আইন প্রয়োগ (১৯৬০)। ১৯৬২-তে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এন.ডি.এফ) গঠন ও ফ্রন্টের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৬৯-এ ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও ১৯৭০-এ বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৯-এর ২০ জুলাই তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় লীগ গঠিত ও দলের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ঢাকা-৩ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ পার্টির কাছে পরাজিত। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করলে ঢাকা ত্যাগ করে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ। সেখান থেকে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার। প্রায় পাঁচমাস ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকার পর সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিলাভ। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ ঢাকা-১৯ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭৫-এর ৭ জুন শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাকশাল (কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ)-এ যোগদান ও এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিযুক্তি। সামরিক বাহিনীর কিছুসংখ্যক সদস্যের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর বাকশালের বিলুপ্তি ঘটায় ১৯৭৬-এ তৎকর্তৃক জাতীয় লীগের পুনরুজ্জীবন। ১৯৭৯-র ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা-২১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত। ১৯৮৩-১৯৮৪-তে সাত দলীয় জোটের অন্যতম সদস্য হিসেবে লে. জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ। পরে মত পরিবর্তন করে এরশাদ সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান। ১৯৮৪-র ৩০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৮৫-র ১ জানুয়ারি পর্যন্ত এপদে অধিষ্ঠিত। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। এরশাদের সামরিক সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করায় তাঁর জনপ্রিয়তা খর্ব। লেখক হিসেবে খ্যাত। ওজারতির দুই বছর (১৯৬৩), স্বৈরাচারের দশ বছর (১৯৬৯), প্রধানমন্ত্রিত্বের নয় মাস (১৯৮৭) ও অবরুদ্ধ নয় মাস (১৯৯০) তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি। মৃত্যু. ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯১।

আতাউর রহমান খান খাদিম (১৯৩৩-১৯৭১)॥ জন্ম. কারামপুর গ্রাম আখাউড়া, কুমিল্লা, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩। শিক্ষাবিদ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জর্জ হাই স্কুল থেকে ১৯৪৮-এ মেট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫০-এ আই.এসসি., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩-এ পদার্থবিজ্ঞানে বি.এসসি. (অনার্স) ও ১৯৫৪-তে এম.এসসি. (পদার্থ বিজ্ঞান) ডিগ্রি লাভ। ১৯৫৫-১৯৫৬ পর্যন্ত ফিলিপস ইলেকট্রিক কোম্পানিতে X-Ray Engineer পদে চাকরি। ১৯৫৯-১৯৬০ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানির গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে Theoritical Physics বিষয়ে অধ্যয়ন। ১৯৬৫-এর ৫ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। মুক্তবুদ্ধি, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও সমাজবাদী সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী। কৃতি অধ্যাপক হিসেবে খ্যাত। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে শহীদুল্লাহ হলের সামনে গুলি করে হত্যা করে।

আতিকুজ্জামান খান (১৯২১-১৯৮৩)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৯২১। পৈতৃক নিবাস দাদরোখী, মানিকগঞ্জ। সাংবাদিক, অধ্যাপক, ক্রীড়াবিদ, কূটনীতিক। কলকাতা মাদ্রাসা থেকে ১৯৩৬-এ প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৩৮-এ আই.এ., একই কলেজ থেকে ১৯৪০-এ ইতিহাসে বি.এ. (অনার্স) পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৩-এ ইতিহাসে এম.এ. ডিগ্রি ও লন্ডন স্কুল অব জার্নালিজম থেকে ১৯৫০-এ সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা লাভ। চল্লিশের দশকে কলকাতায় স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, স্টার অব ইন্ডিয়া প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা। দেশ বিভাগের (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর ঢাকায় আগমন এবং প্রথমে মর্নিং নিউজ ও পরে অবজারভার পত্রিকার ফিচার এডিটর নিযুক্ত। মর্নিং নিউজ-এর সহকারী সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক পদে কিছুকাল দায়িত্ব পালন। ১৯৬২-র আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ খোলা হলে এর রিডার ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত। ১৯৭৩-এর মে মাস পর্যন্ত উভয় পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান। সত্তর দশকের শেষের দিকে প্রায় তিন বছর কলকাতায় বাংলাদেশ দূতাবাসের ডেপুটি হাই কমিশনার। ঢাকা বেতারকেন্দ্রের খ্যাতনামা স্ক্রিপ্ট রাইটার, সংবাদ বিশ্লেষক, অনুষ্ঠানসূচি প্রস্তুতকারক ও ক্রীড়া ভাষ্যকার। ক্রিকেটের ধারাভাষ্যকার ও ক্রীড়া সাংবাদিকতা বিশারদ। সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের ক্রীড়া লেখক সমিতির প্রথম সভাপতি। উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ: Press in East Pakistan: A Study in Content Analysis. Dream Image নামে একটি কবিতার বই প্রকাশ। মৃত্যু. ঢাকা, ১০ মার্চ ১৯৮৩।





আতিকুল ইসলাম (১৯৩৫-১৯৭৫)। জন্ম. চাঁদপুর, ১৯৩৫ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী শান্তিনিকেতনের 'বিশ্বভারতী' থেকে ১৯৫৮-তে রবীন্দ্র সংগীতে ডিগ্রি লাভ। ১৯৫৯-এ রবীন্দ্র সংগীতের শিক্ষক হিসেবে ঢাকার বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে যোগদান। ১৯৬৫-তে হাওয়াইয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মেরিট অন প্রোডপাকশন' শীর্ষক কোর্স গ্রহণ। একই বছর বুলবুল ললিতকলা একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের অধিকর্তা হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ। ১৯৬৭-এর জুন মাসে পাকিস্তানি সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের পদক্ষেপ নিলে সরকারের তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের সংগঠক, ৬৯-এর গণ-আন্দোলনের সময়ে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ সংগঠন, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আলতাফ মাহমুদের সহযোগিতায় গোপনে শিল্পীদের সংগঠন। বুলবুল ললিতকলা একাডেমি প্রযোজিত বহু নৃত্যনাট্যের সামগ্রিক দায়িত্ব পালন। তাঁর সংগীত পরিচালনায় প্রশংসিত নৃত্যনাট্যের মধ্যে 'হাজার তারের বীণা' 'বাদল বরিষণে', 'চিত্রাঙ্গদা', 'রাজপথ জনপদ' উল্লেখযোগ্য। এদেশে রবীন্দ্রসংগীত জনপ্রিয়তা করে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। মৃত্যু. ঢাকা, ২ এপ্রিল ১৯৭৫।



আনন্দচন্দ্র নন্দী (১৮৩২-১৯০০)। জন্ম. কালীকচ্ছ, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২২ মে ১৮৩২। সাধক পুরুষ, 'সর্বধর্ম সমন্বয়' মতবাদের প্রবর্তক ও প্রচারক। পিতা দেওয়ান রামদুলাল নন্দী কালী-উপাসক, মালসী গান রচয়িতা ও ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান। উল্লাসকর দত্ত তাঁর দৌহিত্র। প্রথম জীবনে পিতার শাক্তধর্মে দীক্ষালাভ। কিশোর বয়সে নিয়মিত শিবপূজা ও সন্ধ্যা বন্দন। ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা পড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের পৌত্তলিকতার প্রতি বীতরাগ ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট। ঢাকায় পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন (১৮৬৯) ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র নন্দী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীসহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ। ১৮৭০-এ বিজয়কৃষ্ণ, বঙ্গচন্দ্র রায় প্রমুখকে নিয়ে কালীকচ্ছে প্রথম ব্রাহ্মোৎসব পালন। ১৮৭৬-এ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতা গমন; সর্বধর্ম সমন্বয় নিমিত্তে 'দয়াময়' নাম প্রচারারম্ভ এবং বহু শিষ্যকে দীক্ষাদান। 'দয়াময়' নাম প্রচারার্থে বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় বহু সংগীত রচনা। একসময় পূর্ববঙ্গে তার গান সমধিক প্রচলিত ছিল। রচিত পুস্তক: 'সর্বধর্ম গীত' (দুই খণ্ড), 'প্রকৃত তত্ত্ব', 'সর্বধর্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী', 'সর্বধর্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালীর সারমর্ম', 'যোগপ্রণালী'। প্রবর্তিত মতবাদের মূলগ্রন্থ 'প্রকৃত তত্ত্ব'। গ্রন্থগুলি সর্বধর্ম সমন্বয় মতবাদের বিশ্লেষণ। নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত 'আনন্দ আশ্রম'-এ অনুসারীগণ সমবেত হয়ে এ-মতবাদ প্রচার করেন। উনিশ শতকের অন্তিমে ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর 'সর্বধর্ম-সাধন' ধর্মান্দোলনের বিস্তৃতি লাভ। মহর্ষি মনোমোহন দত্ত ও আফতাবউদ্দিন খাঁর গুরু। রচিত গ্রন্থসমূহ নবীনগর থানার ভোলাচং 'সর্বধর্ম মিশন' থেকে প্রকাশিত। আনন্দ স্বামীর প্রথম জামাতা গুরুদয়াল সিংহের কুমিল্লা শহরে ব্রাহ্ম মন্দির স্থাপন (১৯২৭) এবং 'ত্রিপুর হিতৈষী' (১৮৯৬) পত্রিকা সম্পাদনা। দ্বিতীয় জামাতা দ্বিজদাস দত্ত (১৮৪৯-১৯৩৫) শিক্ষাব্রতী ও অধ্যাপক, বহু গ্রন্থের প্রণেতা। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দ্বিজদাসের কুমিল্লা শহরে 'সর্বধর্ম সমন্বয়' সমিতি (১৯৩১) স্থাপন। মৃত্যু. কালীকচ্ছ, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৪ মে ১৯০০।



আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬)। জন্ম. জরাসিন্ধি গ্রাম, ময়মনসিংহ, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭। রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক। বিত্তশালী পরিবারে জন্ম। ময়মনসিংহ জজ আদালতের পেশকার পদ্মলোচন বসু তাঁর পিতা। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে নবম স্থান অধিকার করে

এন্ট্রান্স পাস (১৮৬২)। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে এফ.এ. (১৮৬৪), বি.এ. (১৮৬৭) ও গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. (১৮৬৮) ডিগ্রি লাভ। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনা। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে দশ হাজার টাকা বৃত্তি লাভ। ১৮৭০-এ গণিতে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য ইংল্যান্ডে গমন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে নবম স্থান অধিকার করে গণিতে র‍্যাংলার ডিগ্রি লাভ। ১৮৭৪-এ ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও দেশে প্রত্যাবর্তন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসুর কন্যা ও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর ভগ্নী স্বর্ণপ্রভা বসুর সঙ্গে বিয়ে। ১৮৬৯-এর ২২ আগস্ট কেশবচন্দ্র সেনের (ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য) নিকট সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। পর্দা দূর করে নিয়ে প্রকাশ্যভাবে নারী-পুরুষে একত্রে বসে উপাসনা করার দাবি কেশবচন্দ্র সেন অগ্রাহ্য করলে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৬৬) ত্যাগ করে শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাশ, উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন (১৫ মে ১৮৭৮)। এর প্রথম সভাপতির। বিভিন্ন সময়ে প্রায় তেরো বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন। ১৮৭৪-এ কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। দেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৪) প্রতিষ্ঠা এবং সভাপতির পদগ্রহণ। রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সুহৃজ্জনের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (২৬ জুলাই ১৮৭৬) স্থাপন। এর অবৈতনিক সম্পাদক নির্বাচিত। কেউ কেউ আনন্দমোহনের ধর্মমত ভারতসভার (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) পরিপন্থী বলে উল্লেখ করলে সম্পাদকের পদ ত্যাগ (১৮৮৫)। কিছুকাল পরে আবার এর সহসভাপতি ও কালে সভাপতি পদে বৃত। আজীবন এর সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন (১৮৯৬-১৯০৬)। আফগান যুদ্ধের ব্যয়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, ইলবার্ট বিল, মুদ্রাযন্ত্র বিধি, প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে যে সব আন্দোলন সংঘটিত হয় তাতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন। ১৮৯৮-তে মাদ্রাজে জাতীয় মহাসমিতির পদে বৃত। ১৮৮৪, ১৮৯০ ও ১৮৯৫-তে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। চৌকিদারি বিল, মফঃস্বল আদালতে জুরি প্রথা প্রবর্তন ও জলকষ্ট নিবারণের ওপর ব্যবস্থাপক সভায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) তীব্র বিরোধিতা। ১৯০৫ এর ১৬ অক্টোবর অখণ্ড বঙ্গভবন স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতা ফেডারেশন হলের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক মহাসভায় ভগ্নস্বাস্থ্যে শায়িত অবস্থায় সভাপতিত্ব। সমাজে শিক্ষাবিস্তারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। কলকাতায় 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' (১৮৭৬) স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন। শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় কলকাতার 'সিটি স্কুল' (১৮৭৯) প্রতিষ্ঠা। পরে এটি কলেজে রূপান্তরিত। এডুকেশন কমিশনের সদস্য নিযুক্ত (১৮৮২)। ময়মনসিংহ শহরে 'ময়মনসিংহ ইনস্টিটিউশন' (১৮৮৩) নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন। পরবর্তীকালে এটি কলেজে রূপান্তরিত এবং তাঁর নামানুসারে এর নাম রাখা হয় 'ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ'। উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মৃত্যু, কলকাতা, ২০ আগস্ট ১৯০৬।

আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা (১৯৪১-১৯৭১)॥



জন্ম, পঙ্গাগ্রাম, নীলফামারী, রংপুর, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। শহীদ সাংবাদিক। দিনাজপুর সরকারি স্কুল থেকে ১৯৫৮-তে মেট্রিক, দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে ১৯৬০-এ আই.এ., একই কলেজ থেকে ১৯৬৩-তে বি.এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬-তে বাংলায় এম.এ. পাস। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র সংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক, পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দিনাজপুর জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক ও ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক। ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনেও একই বছর সেপ্টেম্বরে হামিদুর রহমানের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলনে দিনাজপুর শহরে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। উক্ত আন্দোলনে কারানির্যাতন ভোগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান। দৈনিক 'সংবাদ'-এর বার্তা বিভাগে দায়িত্ব পালন। ১৯৬৬-তে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার সাহিত্যসম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৬৯-এ 'দৈনিক পূর্বদেশ'-এর সিনিয়র সাব-এডিটর পদে যোগদান। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার সম্বলিত গ্রন্থ 'অন্তরঙ্গ আলোকে' (১৯৬৭) সংকলন ও সম্পাদনা করে খ্যাতি অর্জন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন দৃঢ় সমর্থক হিসেবে পরিচিত। ঢাকা শহরে মুক্তিযুদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীচক্রের কোপানলে পতিত। মৃত্যু. ১৯৭১ এর ১১ ডিসেম্বর ঢাকার গোপীবাগের বাসা থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দোসর আলবদর বাহিনী কর্তৃক অপহৃত হয়ে নৃশংসভাবে নিহত।

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬)॥ জন্ম. ফরিদপুর শহর, ৮ মে ১৯১১। সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। পূর্ণনাম আবু নয়ীম মুহম্মদ বজলুর রশিদ। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ১৯২৮-এ মেট্রিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৩১-এ আই.এ., একই কলেজ থেকে ১৯৩৩-এ বি.এ. ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪-তে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৯৫৮-১৯৫৯ এ আমেরিকার নিউজার্সি স্টেটের বাগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রশিক্ষণ বিষয়ে অধ্যয়ন। ১৯৩৮-এ ঢাকার মুসলিম গভর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত। এ স্কুলে ছয় বছর (১৯৩৪-১৯৩৯), জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে দুই বছর (১৯৩৯-১৯৪২) ও ঢাকার আরমানিটোল গভর্নমেন্ট স্কুলে বার বছর (১৯৪২-১৯৫৫) শিক্ষকতা। ১৯৫৫-তে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬৪-তে অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৭২-এ অবসর গ্রহণ। ১৯৭৩-১৯৭৫ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ধ্বনিবিজ্ঞানের খণ্ডকালীন অধ্যাপক ও ১৯৭৫-১৯৮০তে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ধ্বনিতত্ত্বের অধ্যাপক। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক অন্তর্ঘাতী ১৯৬৭-র জুন মাসে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের উপর একাধিক গ্রন্থরচনা। কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও গীতিকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: কাব্য– পান্থবীণা (১৯৪৭), মরুসূর্য (১৯৬০), শীতে বসন্তে (১৯৬৭), রঙ ও রেখা (১৯৬৯), এক ঝাঁক পাখি (১৯৬৯), মৌসুমী মন (১৯৭০), মেঘ বেহাগ (১৯৭১), রক্তকমল (১৯৭২); নাটক – ঝড়ের পাখি (১৯৫৯), যা হতে পারে (১৯৬২), উত্তরফাল্গুনী (১৯৬৪), সংযুক্তা (১৯৬৫), ত্রিমাত্রিক (১৯৬৬), শিলা ও শৈলী (১৯৬৭), সুর ও ছন্দ (১৯৬৭), উত্তরণ (১৯৬৯), রূপান্তর (১৯৭০), একে একে এক (১৯৭৬), ধানকমল (১৯৭৬); উপন্যাস – পথের ডাল (১৯৪৯), অন্তরাল (১৯৫৮), মনে মনান্তরে (১৯৬২), নীলদিগন্ত (১৯৬৭); ভ্রমণকাহিনী– দ্বিতীয় পৃথিবীতে (১৯৬০), পথ বেঁধে দিল (১৯৬০), দুই সাগরের দেশে (১৯৬৭), পথ ও পৃথিবী (১৯৬৭); প্রবন্ধ– আমাদের নবী (১৯৪৬), আমাদের কবি (১৯৫১), রবীন্দ্রনাথ (১৯৬১), জীবন বিচিত্রা (১৯৬২), পাকিস্তানের সুফীসাধক (১৯৬৫), স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষণ (১৯৬৯), ইসলামের ইতিবৃত্ত (১৯৭২), জীবনবাদী রবীন্দ্রনাথ (১৯৭২)। নাটকে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৬৭)। মৃত্যু. ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৬।



আনর খাঁ॥ ধর্মপ্রচারক। খুলনার খ্যাতনামা দরবেশ খান জাহান আলীর সঙ্গে খুলনায় আগমন। বাগেরহাটের বাগমারা গ্রামে 'আনার খাঁ দিঘি ও মসজিদ তাঁর স্মৃতি বহন করছে। জন্ম ও মৃত্যুতারিখ অজ্ঞাত।

আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯০)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৯২৯। পৈতৃক নিবাস কুমিল্লা। নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভ (১৯৫৩)। দৈনিক আজাদে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। দৈনিক সংবাদের সহকারী সম্পাদক, বাংলাদেশ বেতারের বার্তা



বিভাগের পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপ-মহাপরিচালক, পাকিস্তানে বাংলাদেশ সরকারের বহিঃপ্রচার বিভাগের মহাপরিচালক, পাকিস্তানে বাংলাদেশ দূতাবাসের সচিব ও ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানির উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব পালন। বিশিষ্ট নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক। মধ্যবিত্ত মানুষের দ্বন্দ্ব সংঘাত, দুঃখ-দারিদ্র্য ও সংগ্রামী চেতনা তাঁর নাটক ও উপন্যাসে নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কিত। মানচিত্র (১৯৬৩), অ্যালবাম (১৯৬৫), চেহারা (১৯৭৯), তবুও অনন্যা প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। উপন্যাস: সরোবর (১৯৬৭), সৌরভ (১৯৬৮), শখের পুতুল (১৯৬৮), মধুগড় (১৯৭৪), ঐ রকম একজন (১৯৮৬), ময়নামতী। গল্প সংকলন: সুদর্শন ডাকছে (১৯৭৮)। নাটকে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৮) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ২ নভেম্বর ১৯৯০।

আনিসুজ্জামান খান (১৮৮০-১৯২৮)॥ জন্ম. ১৮৮০। পৈতৃক নিবাস দাদরোখী, মানিকগঞ্জ। ১৮৯৩-তে পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. অনার্স এবং ১৮৯৭তে ইংরেজিতে এম.এ. পাস। আজীবন কৃতি ছাত্র। ১৯০১-১৯০২-এ বি.এ. এস. এক্সকিউটিভ পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ। বহু মহকুমায় এস.ডি.ও. হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯১১-তে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত। পরে কিছুদিন চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন। জজ-এর পদসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন। ১৯২৬-এ কলকাতা রায়ট মামলার বিচারে সুনাম অর্জন। সূক্ষ্ম বিচারবোধ, মানবিকগুণ ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের জন্য খ্যাত। দানশীল, পরোপকারী ও শৌখিন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। বহু দরিদ্র ছাত্রকে পড়ানো, বুয়াডাঙ্গার বড় মসজিদ নির্মাণ ও বহু স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রধান কীর্তি। মৃত্যু. ৩১ জুলাই ১৯২৮।

আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১)॥ জন্ম. ডবকাই গ্রাম, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৫ এপ্রিল ১৯২৮। কবি, কথা সাহিত্যিক, সমালোচক, শিক্ষাবিদ। ১৯৪৬-এ ভাবতা আজিজিয়া উচ্চ মাদ্রাসা থেকে হাই মাদ্রাসা, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আই.এ, ১৯৫১-তে রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে বি.এ. ১৯৫৩-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাস। ১৯৫৩ থেকে



১৯৫৭ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে হাই মাদ্রাসা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকতা। ১৯৫৮-তে পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত। পরে এই কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান। ১৯৬৬-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে জুনিয়র প্রভাষক পদে যোগদান, ১৯৭০-এ সিনিয়র প্রভাষক পদে উন্নীত। উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম– উপন্যাস: নীড় সন্ধানী (১৯৬৮), নিশুতি রাতের গাথা (১৯৬৮), রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩); কাব্য: নদী নিঃশেষিত হলে (১৯৭০), সমুদ্র শৃঙ্খলতা উজ্জয়িনী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৭৪); সমালোচনা: সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল (১৯৬৭), রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা (প্রথম খণ্ড ১৯৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৮)। ১৯৭২-এ বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ। মৃত্যু. রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী ভক্ত ও প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী আনোয়ার পাশাকে ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টার্স থেকে পাক হানাদার বাহিনীর এ-দেশীয় সহযোগী আলবদরের সদস্যরা ধরে নিয়ে গিয়ে ঢাকার মীরপুর বধ্যভূমিতে হত্যা করে।

আনোয়ার হোসেন॥ খুলনার প্রখ্যাত ছাত্রনেতা ও রাজশাহী জেলের খাপরা ওয়ার্ডের শহীদ। সাহস ও তীক্ষ্ণ মেধার জন্য কিশোর বয়স থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম। রাজশাহী কারাগারে বন্দী অবস্থায় অন্যান্য রাজবন্দীদের অনশন করেন। ১৯৫০-এর ২৪ এপ্রিল পুলিশ জেলের ভেতরে আরো ছয়জন রাজবন্দীর সঙ্গে তাকেও গুলি করে হত্যা করে। কুশলী তার্কিক হিস্যবে খ্যাতি এবং শিল্প সাহিত্যে প্রচণ্ড আগ্রহ ও বিশেষ দখল ছিল। জন্ম তারিখ অজ্ঞাত।

আনোয়ারুল হক (১৯১৮-১৯৮১)॥ জন্ম. উগাণ্ডা, ১৮ জুলাই ১৯১৮। চিত্রশিল্পী। ছেলেবেলায় কাটে উগাণ্ডায়। ৮ বছর বয়সে কলকাতায় আগমন। ১৯৩৫-এ কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি। অভিভাবকরা অনেকেই পছন্দ করেনি ছবি আঁকা শেখা। তৎকালীন মুসলমান পরিবারে ছবি আঁকা

ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। কিন্তু অদম্য উৎসাহে সব



বাধাকে অতিক্রম করে আর্ট স্কুলের ছয় বছরের কোর্স শেষ করে কৃতিত্বের সঙ্গে চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ষাটজন ছাত্রের মধ্যে তাঁরা মাত্র ১১ জন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এরপর আর্ট স্কুলে 'টিচারশিপ' কোর্সে ভর্তি। কিন্তু কোর্স শেষ করেন নি। কিছুদিন স্বাধীনভাবে ছবি আঁকার কাজে নিয়োজিত থেকে ১৯৪৩-এ ড্রইং শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ফরিদপুর জিলা স্কুলে। তাপর হাওড়া জেলা স্কুলে এবং কিছুদিন পর কলকাতা আর্ট স্কুলে বাণিজ্যিক শিল্পকলা বিভাগে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। ১৯৪৫-এ সর্বভারতীয় শিল্পকলা প্রতিযোগিতায় 'জল রং চিত্রে' শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান লাভ। ১৯৪৭-এ দেশ ভাগের পর চট্টগ্রামে নর্মাল স্কুলে ড্রইং শিক্ষক পদে যোগদান। তারপর ১৯৪৮-এ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, শফিউদ্দিন আহমেদ, কামরুল হাসান প্রমুখের সম্মিলিত চেষ্টায় ঢাকায় গড়ে তোলেন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট। প্রথম থেকেই উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় যোগদান। ১৯৭৭-এ চারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ। শিক্ষকতা জীবনের দীর্ঘ ৩০ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আদর্শ শিল্পী তৈরিতে, চারুকলার পাঠ্যসূচি প্রণয়নে এবং আর্ট ইনস্টিটিউটের সব রকম উন্নয়নের কাজে নিজকে সমর্পণ করেছিলেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের বিদেশ ভ্রমণের সময় ও অবসর গ্রহণের পর কয়েক বছর আর্ট ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন। চিত্রশিল্পের একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয়। কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম তিনি উপহার দিয়েছেন। জল রং ও তেল রং এ দুটো মাধ্যমেই ছবি এঁকেছেন। প্রথমদিকে বাস্তবধর্মী বিশেষ করে জল রং মাধ্যমে এবং ষাটের দশক থেকে প্রকৃতি নির্ভর বিষয়ে তেল রং এ নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিত্র নির্মাণ করেন এবং পরাবাস্তববাদে তাঁর আগ্রহ লক্ষণীয়। তাঁর ছবির সংগ্রহ রয়েছে ঢাকা যাদুঘর, শিল্পকলা গ্যালারি, দিল্লি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ও অনেক ব্যক্তিগত সংগ্রহে। মৃত্যু. ১৮ নভেম্বর ১৯৮১।

আন্দালীব সাদানী (১৯০৪-১৯৬৯)॥ জন্ম. মুরাদাবাদ, উত্তরপ্রদেশ, ভারত, ১ মার্চ ১৯০৪। শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। অন্য নাম ওয়াজহাদ হোসেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৫-এ ফারসি সাহিত্যে এম.এ. পাস। ১৯২৬-১৯২৭-এ দিল্লির হিন্দু কলেজে ফারসি সাহিত্যে অধ্যাপনা। ১৯২৮-এর জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফারসি বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৩২-১৯৩৪ পর্যন্ত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'The Muslim Historians of India' বিষয়ে গবেষণা এবং পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফারসি-র অধ্যাপনায় যোগদান। ১৯৪৫-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি রিডার পদে ও ১৯৪৭-এর ২ আগস্ট অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৪৫-১৯৬৯ পর্যন্ত উর্দু ও ফারসি বিভাগের অধ্যক্ষ। ড. আন্দালীব সাদানী ফারসি ও উর্দু সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা কবি, গবেষক, গল্পকার ও সমালোচক। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। সাহিত্য-সমালোচনা, অভিধান, গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ে বারোটি গ্রন্থ রচনা। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: Naqsh-i-Badi (A modern colloquial Persian Di9ctionary), Chahar maqala (A critical edition), Rubaiyat-I-Baba Tahir (A critical edition with complete Urdu translation and exhaustive note), Shachchi Kalanyan (Short stories), Tahqiqat (Research works), Daur-i-Hazir-Aus Urdu Ghazal goi (Literary criticism), Ruba-I-Shikas (A collection of poems), Tahqiq-Ki-Ioshni (Collection of Research Paper) গ্রন্থের জন্য ১৯৬৮-তে দাউদ পুরস্কার লাভ। বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৪৮-১৯৫২-তে পূর্ববাংলায় যে ঐতিহাসিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। উর্দুভাষী ড. আন্দালীব সাদানী সে সব আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থক ছিলেন। ১৯৬১-তে পূর্ববাংলায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের পক্ষে বক্তব্য প্রদান। মৃত্যু. ঢাকা ২৯ জুলাই ১৯৬৯।

আফজল আলী (ষোড়শ শতাব্দী)॥ বাংলার প্রাচীন মুসলমান কবিদের মধ্যে অন্যতম। সময়কাল আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দী। চট্টগ্রামের সাতকানিয় থানার মলুয়া গ্রামের অধিবাসী। এ পর্যন্ত কবির রচিত 'নসীহতনামা' শীর্ষক একখানি গ্রন্থের ও বৈষ্ণবীয় ঢঙে লিখিত কয়েকটি পদের সন্ধান

পাওয়া গেছে। 'নসীহতনামা' গ্রন্থটি ষোড়শ শতাব্দীর মুসলিম বাংলার সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কারণ এ সময়ে রচিত ইসলাম ধর্মের উপদেশ-সম্বলিত বাংলা গ্রন্থের তেমন একটা সন্ধান পাওয়া যায় না। পদকর্তা হিসেবেও আফজল আলী যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী।

আফতাবউদ্দিন খাঁ (?-১৯৩৩)॥ জন্ম. শিবপুর



গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। শৈশবে পিতার নিকট সংগীতশিক্ষা শুরু। পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঙ্গোড়া গ্রামের জমিদারের দরবারের তবলাবাদক ভ্রাতৃদ্বয় রামধন ও রামকানাইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ। অল্পদিনেই তবলাবাদনে দক্ষতা অর্জন। বাঁশি বাদনে একজন অদ্বিতীয় শিল্পী। হারমোনিয়ম ও দোতারা বাদনে অসামান্য দক্ষ। কখনো তবলা, বাঁশি ও হারমোনিয়মে, কখনো দোতারা, বাঁশি ও বাঁয়ায়। 'ন্যাসতরঙ্গ' নামে একটি যন্ত্র বাদনে দক্ষ। একাধারে গীতিকার, সুরকার, গায়ক ও বাদক। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাতমোড়া গ্রামের সাধু মোহন দত্তের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। মনোমোহন দত্ত রচিত সকল গানের সুরারোপ ও প্রচার। মনোমোহন দত্ত তাঁর রচিত গানের সংকলন প্রকাশ করে নাম রাখেন 'ম-ল-য়া' (মনোমোহন-লব-আফতাবউদ্দিনের নামের আদ্যক্ষর)। সকল প্রকার রাগ-রাগিণীতে পারদর্শী। পল্লীগীতিতে অসাধারণ দক্ষতা। একজন বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবক। তাঁর সৃষ্ট বাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে 'স্বর সংগ্রহ' ও 'মেঘডম্বুর' উল্লেখযোগ্য। অতি দীনহীন, সরল ও আদর্শ সাধুর মতো জীবন-যাপনের জন্য 'ফকির' (তাপস) নামে সুপরিচিত। মৃত্যু. ১৯৩৩।

আবদুর রব সেরনিয়াবাত (১৯২১-১৯৭৫)॥ জন্ম. সরাইল গ্রাম. গৌরনদী, বরিশাল, এপ্রিল ১৯২১। রাজনীতিবিদ। ভোলা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল' পাস। গণতন্ত্রী দলের (১৯৫২) সাধারণ সম্পাদক (১৯৫৬-১৯৫৭)। ১৯৫৭-র ২৫ জুলাই ন্যাশনাল পার্টি (পশ্চিম পাকিস্তান), মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রগতিশীল আওয়ামী লীগ অংশ ও গণতন্ত্রী দল নিজ নিজ



অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করলে তার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিযুক্ত। ১৯৬৪-র ১২মার্চ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিযুক্ত। ১৯৬৯-এ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে বরিশাল-১ আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে মুজিবনগর গমন এবং মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে দায়িত্ব পালন। ১৯৭২-এর ১২ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের ভূমি প্রশাসন, ভূমি সংস্কার ও ভূমি রাজস্ব (১২ এপ্রিল ১৯৭২ থেকে ৭ জুলাই ১৯৭৪) ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সম্পদ ও বিদ্যুৎ (৮ জুলাই ১৯৭৪ থেকে ১২ আগস্ট ১৯৭৫) দফতরের মন্ত্রী। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চের নির্বাচনে পুনরায় বরিশাল থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭৫-এর ৬ জুন বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিযুক্ত। এ দেশেরর গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। কৃষক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। মৃত্যু. ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর একদল ব্যক্তির হাতে নিহত।

আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬)॥



জন্ম. তারুটিয়া গ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ২৭ নভেম্বর, ১৯০০। রাজনীতিবিদ। এক খান্দান পির পরিবারে জন্ম। স্থানীয় ডায়মন্ড জুবলি ইংরেজি স্কুলে এন্ট্রান্স অধ্যয়নকালে অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) যোগদান। এ সময়ে স্কুলের পাঠ ত্যাগ। সভাসমিতি করে কংগ্রেসের পক্ষে

জনমত গঠন। স্থানীয় সলঙ্গাহাটে কংগ্রেসের অফিস স্থাপন। ১৯২২-এর ২৮ জানুয়ারি হাটের দিন ঐ অফিস থেকে গ্রেফতার। উক্ত হাটের আর্মড ফোর্স ক্যাম্পে আটক। এর প্রতিবাদে জনসাধারণ কর্তৃক ক্যাম্প ঘেরাও। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সৈন্য বাহিনী গুলি চালালে সাতজন নিহত। জনসাধারণের চাপের ফলে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মুক্তিলাভ। হাঙ্গামা সৃষ্টির দায়ে সিরাজগঞ্জ ফৌজদারি আদালতে তাঁর বিচার অনুষ্ঠান। বিচারে ছয় মাসের কারাদণ্ড। শাস্তি ভোগের পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আরবি শিক্ষার জন্য উত্তর ভারত গমন। সেখানকার দারুল দেওবন্দ মাদ্রাসায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষালাভ। এরপর লাহোর গমন। তথাকার এরশাদ ইসলামি কলেজে হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্ম এবং তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন। লাহোরে তর্ক প্রতিযোগিতায় সুনাম অর্জন এবং তর্কবাগীশ উপাধিতে ভূষিত। ১৯২৬-এ লাহোর থেকে কলকাতা আগমন। আঞ্জুমান ওয়ায়িদিনের পক্ষ থেকে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রচার। ধর্ম প্রচারে নেমে বাংলার সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ। জমিদার ও মহাজনদের শোষণ থেকে কৃষককুলের মুক্তির লক্ষ্যে কৃষক আন্দোলনে যোগদান। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় নিখিল বঙ্গ রায়ত খাতক সমিতি প্রতিষ্ঠা। সমিতির চাচকর (রাজশাহী) সম্মেলনে তৎকর্তৃক ঋণসালিশি বোর্ড গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত। এ প্রস্তবের আলোকে বঙ্গীয় বিধানসভায় ঋণসালিশি বোর্ড আইন পাস। ১৯৩৬-এ মুসলিম লীগে যোগদান। এ দলের কৃষক ফ্রন্টের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত। ১৯৪৬-এ মুসলিম লীগের টিকেটে সিরাজগঞ্জ মহকুমা থেকে বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শনরত ছাত্র জনতার উপর পুলিশ গুলি চালালে বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ শহীদ। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট ও মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি থেকে পদত্যাগ। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩) গ্রেফতার ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ। ১৯৫৩-র ১ জুন জেল থেকে মুক্তিলাভ। আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৫৪-র মার্চে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য ও ১৯৫৫-র জুনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত। মারীতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন (আগস্ট ১৯৫৫)-এ ও করাচিতে গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬)-এ বাংলায় বক্তৃতা প্রদান। ১৯৫৭-তে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নিযুক্ত। ১৯৬৬-র ১৯ মার্চ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। ছয় দফাপন্থি ও পিডিএম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট)-পন্থি এই পরিচয়ে আওয়ামী লীগ দ্বি-খণ্ডিত হলে ১৯৬৭-র ২৩ আগস্ট পিডিএম-পন্থী আওয়ামী লীগের পূর্ব-পাকিস্তান শাখার অ্যাডহক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণ-আন্দোলনের পর ছয় দফার প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পাবনা-২ আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ মুজিবনগর গমন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৭২-এ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৭৬-এর অক্টোবরে তৎকর্তৃক গণ-আজাদী লীগ গঠন ও এর সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৮৩-র ৩০ জানুয়ারি তাঁর ঢাকার বনগ্রামস্থ বাসভবনে তাঁরই সভাপতিত্বে ১৫টি রাজনৈতিক দলের (আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ওয়ার্কার্স পার্টি ইত্যাদি) যৌথ সভায় ১৫ দলীয় জোট গঠন। জোটের অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। এ দেশের গণতান্ত্রিক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী। লেখক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: শিরাজীর স্মৃতি, সমকালীন জীবনবোধ, সত্যার্থ প্রকাশের সত্যার্থ, ইসলামের স্বর্ণযুগের ছিন্ন পৃষ্ঠা, সত্যার্থ ভ্রমণী, শেষ প্রেরিত নবী, স্মৃতির সৈকতে আমি। মৃত্যু. ঢাকা, ২০ আগস্ট ১৯৮৬

আবদুর রসুল, ব্যারিস্টার (১৮৭২-১৯১৭)॥



জন্ম. গুনিয়াক গ্রাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৮৭২ । রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী। পিতা গোলাম রসুল ছিলেন সাবেক ত্রিপুরা জেলার একজন সমৃদ্ধি সম্পন্ন জমিদার। বাল্যকালে পিতৃহীন হন। পিতৃবিয়োগের পর কিশোরগঞ্জে নীত হন। সেখানে মায়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ। ঢাকায় আগমন। ১৮৮৮-তে ঢাকার কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কিছুকাল ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন। ১৮৮৯-তে বিলেত গমন। লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে ১৮৯২-তে প্রবেশিকা, অক্সফোর্ডের জোনস কলেজ থেকে ১৮৯৬-তে বি.এ. এবং ১৮৯৮-তে এম.এ. পাস। ঐ বৎসরই (১৮৯৮) মিডল টেম্পল থেকে আইন পাস করে বি.সি.এল. উপাধি লাভ। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম এই ডিগ্রি লাভের কৃতিত্ব তাঁরই। ব্যারিস্টারি পাস করে ১৮৯৮-এ দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু। বিলেত থেকে দেশে ফেরার আগে জনৈক উচ্চবংশোদ্ভূতা ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ। হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামী ও স্বদেশি আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) সমর্থক। সুরেন্দ্রনাথ, জিন্নাহ ও ফজলুল হকের রাজনৈতিক সহকর্মী। ১৯০৬ ও ১৯১০-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতি। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উদ্দেশ্যে গঠিত মুসলিম লীগের (ঢাকা, ১৯০৬) পাল্টা সংগঠন 'ইন্ডিয়ান মুসলমান অ্যাসোসিয়েশন (কলকাতা ১৯০৭) গঠন ও তার সাধারণ সম্পাদক। নওয়াব সৈয়দ মহামেদ বাহাদুর ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যথাক্রমে এই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও অন্যতম সহ-সভাপতি। The Mussalman (1906) নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত। কৃষক সমিতি স্থাপন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে বক্তৃতা দান। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের কারণে নিয়োগ বাতিল। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস রাজনৈতিক ঐকমত্যে পৌঁছার কালে মুসলিম লীগে যোগদান (১৯১৬)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ইংরেজির প্রধান পরীক্ষক (১৮৯৯-১৯০৩)। কিছুকাল বি.এ. পরীক্ষারও পরীক্ষক। সমাজসেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং মুসলমানদের বহু বিবাহ দূর করার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা। কৃতী ছাত্র, বিশিষ্ট বাগ্মী, তীক্ষ্ণধী আইনবেত্তা, দৃঢ়চেতা, সাহসী, নিষ্ঠাবান ও সৎ রাজনৈতিক নেতা ও একজন অসাধারণ মানুষ হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন। ব্রিটিশ শাসনামলের একজন বিশিষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা। মৃত্যু. ৩০ আগস্ট ১৯১৭।

আবদুর রহমান (১৯০২-১৯৭৭)॥ জন্ম. পটিয়া

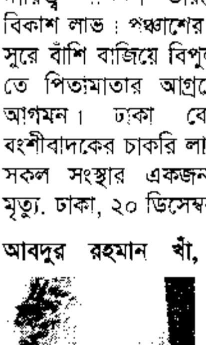


গ্রাম, চট্টগ্রাম, ১ জানুয়ারি, ১৯০২। শিক্ষাবিদ ও লেখক। পিতা আশরাফ আলী ছিলেন একজন ক্ষুদে ব্যবসায়ী। এন্ট্রান্স ক্লাশে অধ্যয়নকালে পিতৃহীন হন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স (১৯২২) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. (১৯২৪) ডিগ্রি লাভ। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড. পাস। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত (১৯২৫)। বি.সি.এস. (বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার (১৯২৬)। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় শাসন বিভাগের চাকরি লাভ থেকে বঞ্চিত। বগুড়া জেলা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান। একই পদে রংপুর জেলা স্কুল, চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুল ও পাবনা জেলা স্কুলে দায়িত্ব পালন। ১৯৩৬-এ খুলনা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৪৯-এ চট্টগ্রাম বিভাগের সেকেন্ড ইন্সপেক্টর অব স্কুল পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৫৭-তে শিক্ষকতার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯৬১-তে প্রাদেশিক অ্যাডভাইজার কাউন্সিলের সদস্য পদ লাভ। জীবনভর শিক্ষা ও সংস্কৃতি-চিন্তায় নিবেদিত আবদুর রহমান একজন অনুবাদক, প্রাবন্ধিক এবং কবি। পবিত্র কোরাআনের বঙ্গানুবাদ 'কোরআন ও জীবন দর্শন' (১ম খণ্ড-১৯৬১, ২য় খণ্ড-১৯৬৩ ও ৩য় খণ্ড-১৯৬৫) তাঁর প্রধান কীর্তি। অন্যান্য গ্রন্থ:

কাব্য–স্মৃতিকণা (১৯৬১), প্রবন্ধ গ্রন্থ– আদর্শ ও সাধনা (১৯৬৯), আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ– যতটুকু মনে পড়ে (১৯৭২)। কোরআনের পদ্যানুবাদ– কাব্যে আমপারা (১৯৯০)। মৃত্যু. ১৯৭৭।

আবদুর রহমান (১৯৩৫-১৯৮৯)॥ জন্ম. বজ্রযোগিনী গ্রাম, বিক্রমপুর, ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৫। বংশীবাদক। প্রায় এক দশক আকাশবাণী গৌহাটি কেন্দ্রের স্টাফ আর্টিস্ট পদে দায়িত্ব পালন। ভারতে তাঁর শিল্প-প্রতিভার বিকাশ লাভ। পঞ্চাশের দশকে সেদেশে সুললিত সুরে বাঁশি বাজিয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন। ১৯৬২-তে পিতামাতার আগ্রহে ভারত থেকে ঢাকায় আগমন। ঢাকা বেতার ও টেলিভিশনে বংশীবাদকের চাকরি লাভ। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ-সকল সংস্থার একজন মনোহর বংশীবাদক। মৃত্যু. ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৯।

আবদুর রহমান খাঁ, খানবাহাদুর (১৮৯০-১৯৬৪)॥ জন্ম. ভাণ্ডারিয়াকান্দি গ্রাম, শিবচর, মাদারীপুর। শিক্ষাবিদ ও লেখক। বরিশাল জিলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯০৮) পাস। এই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ. (১৯১০), ঢাকা কলেজে থেকে গণিতে অনার্সসহ বি.এ. (১৯১২) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এম.এ. (১৯১৪) ডিগ্রি লাভ। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি লাভ। অতঃপর ঢাকা ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনার কর্মে যোগদান। ১৯২২-এ চট্টগ্রাম নর্মাল স্কুলে বদলি। ১৯২৪-এ ঢাকা নর্মাল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ১৯২৬-এ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সেক্রেটারি, ১৯৩৩-এ বর্ধমান বিভাগের স্কুল পরিদর্শক, ১৯৩৬-এ ঢাকা ট্রেনিং স্কুলের প্রিন্সিপাল, ১৯৩৯-এ এ.ডি.পি.আই. পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৪৮-এর ১ জুলাই জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, বি.এ. ও বি.কম. ক্লাস চালু ও নাইট ৫ সিফ্‌ট প্রবর্তন করে এ কলেজের উন্নতিসাধন। ১৯৫৬-তে প্রিন্সিপালের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। নিজের গ্রাম ভাণ্ডারিয়াকান্দিতে পিতার নামে 'আছালত মেমোরিয়াল হাইস্কুল' স্থাপন। এ স্কুলের



শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। অনুবাদ, প্রবন্ধ ও জীবনী সাহিত্যের লেখক হিসেবে খ্যাত। কুরআন ও হাদিসের বঙ্গানুবাদে দক্ষতার পরিচয় প্রদান। ইসলামিক ঐতিহ্য আশ্রয় করে বহু গ্রন্থ রচনা। মুসলিম নারী (১৯২৭), শেষ নবী (১৯৪৯), ইসলাম পরিচিতি (১৯৫২), ইসলামিক তমদ্দুন ও পাকিস্তান (১৯৫৬), নয় খুতবা (১৯৫৯), আমার জীবন (আত্মজীবনী, ১৯৬৪) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অনুবাদঃ কুরআন শরীফ (১ম খণ্ড ১৯৫২, ২য় খণ্ড ১৯৫৩, ৩য় খণ্ড ১৯৫৩), হাদিস শরীফ (১ম খণ্ড ১৯৫৭, ২য় খণ্ড ১৯৫৫, ৩য় খণ্ড ১৯৫৮)। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক খানবাহাদুর উপাধি লাভ। মৃত্যু. ২৩ ডিসেম্বর ১৯৬৪।

আবদুর রহিম মুনশী (?-১৯৩১)॥ জন্ম. বসিরহাট, চব্বিশ পরগনা। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। উনিশ শতকের শেষভাগে প্রকাশিত 'মিহির ও সুধাকর' এবং 'মুসলিম হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক। ইসলামের ইতিহাস-সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। মৃত্যু. ১৯৩১।

আবদুর রহিম, স্যার (১৮৬৭-১৯৫২)॥ জন্ম. মেদিনীপুর, ১৮৬৭। ধনী জমিদার পরিবারের সন্তান। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। মেদিনীপুর সরকারি হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. (১৮৮৫) পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। ১৮৯০-তে লন্ডনের মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পাস। দেশে প্রত্যাবর্তন করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। এই পেশায় অসাধারণ খ্যাতি অর্জন। ১৯০০-১৯০৩ পর্যন্ত কলকাতা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। ১৯০৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' রূপে ইসলামি ব্যবহারশাস্ত্র সম্পর্কে মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান। এই বক্তৃতামালা পরে 'প্রিন্সিপলস্ অফ মহামেডান জুরিসপ্রুডেন্স' নামে প্রকাশিত। ১৯০৮-এ মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত। ১৯২০ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন এবং দুইবার (১৯১৬ ও ১৯২০) প্রধান বিচারপতির



পদ অলঙ্কৃত। মুসলিম লীগ (১৯০৬) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন। লীগের গঠনতন্ত্র তৈরিতেও তাঁর অবদান অপরিসীম। ১৯২১-১৯২৫ পর্যন্ত তৎকালীন বাংলার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের এবং ১৯২৬-১৯২৯ পর্যন্ত বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য। ১৯২৯-এ নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হলে এর সভাপতি ও ১৯৩০-এ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৩১-১৯৩৫ পর্যন্ত ইন্ডিপেন্ডেন্ট দলের নেতা এবং ১৯৩৪-১৯৪৫ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সভাপতি। ১৯৩৫-এ বিলেতে অনুষ্ঠিত জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কনফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান। তাঁর চেষ্টায় ইন্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিসে মুসলমানদের পদোন্নতি ও জুডিশিয়াল সার্ভিসের এক-তৃতীয়াংশ পদে মুসলমান নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত। মুসলিম লীগের আলীগড় অধিবেশনের সভাপতি রূপে তৎকর্তৃক মুসলমান সম্প্রদায়কে হিন্দুদের প্রতি নিরপেক্ষ হয়ে চলার উপদেশ দান। ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নাইট (১৯১৯) এবং কে.সি.এস.আই. (১৯২৫) উপাধি লাভ। মৃত্যু. করাচি, ১৫ আগস্ট ১৯৫২।

আবদুর রাজ্জাক (১৯১৪-১৯৯৯)॥ জন্ম. পারাগ্রাম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা, ১৯১৪। শিক্ষাবিদ, জাতীয় অধ্যাপক। পিতা আব্দুল আলী একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। ঢাকার সরকারি মুসলিম হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস। ১৯৩১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ১৯৩৬-এ প্রথম শ্রেণিতে এমএ পাস। সে বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির তত্ত্বাবধানে পিএইচডির গবেষণা শুরু। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির মৃত্যুর পর অভিসন্দর্ভ জমা না দিয়ে দেশে ফিরে আসেন। ছয়দফার প্রস্তাবকদের অন্যতম। আইয়ুব খানের সরকার একবার তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা থেকে বহিষ্কার করে। যথাযথ আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে তিনি স্বপদে ফিরে আসেন। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁর অনুপস্থিতিতে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৭৩-এ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধিলাভ। ১৯৭৫-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ। এই ববছরই 'জাতীয় অধ্যাপক' পদে বৃত। অল্প কিছু প্রবন্ধ রচনা না করলেও অসাধারণ বাগ্মিতা ও প্রজ্ঞার কারণে কিংবদন্তির খ্যাতি অর্জন করেন। আহমদ ছফা তাকে নিয়ে 'যদ্যপি আমার গুরু' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সরদার ফজলুল করিম রচনা করেন 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ: অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা'। তাঁর ভাষণ 'বাংলাদেশ: স্টেট অব দ্য ন্যাশন' প্রকাশিত। মৃত্যু. ঢাকা, ২৮ নভেম্বর, ১৯৯৯।



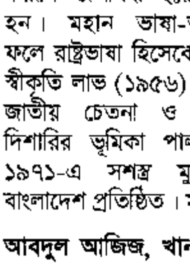
আবদুর রাজ্জাক (১৯২৬-১৯৮১)॥ জন্ম. রাজাবাজার, বগুড়া, ১ জানুয়ারি, ১৯২৬। সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক। লালমনিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাস (১৯৪১)। কলকাতা রিপন কলেজে আই.এ. ক্লাসে অধ্যয়ন। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর ফলে কলেজের পড়া ত্যাগ করে সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান। ১৯৪৩-এ দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত। সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক (১৯৪৬), দৈনিক 'স্বাধীনতা'র স্টাফ রিপোর্টার (১৯৪৮-১৯৪৯) ও দৈনিক 'সত্যযুগ'-এর স্টাফ রিপোর্টার (১৯৪৯-১৯৫০)। ১৯৫১-তে কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। পরের বছর দৈনিক 'সংবাদ' এ চিফ রিপোর্টার হিসেবে যোগদান (১৯৫২)। ১৯৫৮ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। এরপর কিছুকাল দৈনিক 'ইত্তেফাক', 'ডেইলি নিউ নেশন' ও দৈনিক 'জেহাদ'-এ সাংবাদিকতা। ১৯৬৪-র ৫ ডিসেম্বর ঢাকা টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা বার্তা-সম্পাদক নিযুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে সরকার তথাকথিত 'টাকেরহাট হত্যা মামলা' দায়ের করলে চাকরি থেকে অপসারিত (১৯৬৫)। ১৯৬৯-এ দৈনিক 'পূর্বদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সিনিয়র সহকারি সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের



মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সপরিবার মুজিবনগর গমন। স্বাধীন বাংলা সরকারের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন. স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের কথিকা পাঠক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২-এ দৈনিক 'পূর্বদেশ'-এর যুগ্ম-সম্পাদক পদে উন্নীত। ১৯৭৫-এর জুন মাসে সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এপদে অধিষ্ঠিত। ১৯৭৬-এ রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দৈনিক বার্তা'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে যোগদান। পরে এ পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৮০-তে বি.এফ.ইউ.জের সিনিয়র সহসভাপতি নির্বাচিত। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী। ষাটের দশকে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। গল্প-উপন্যাস রচনা করে সুনাম অর্জন। 'কন্যাকুমারী' (১৯৬০) তাঁর একখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। মৃত্যু. ঢাকা, ২৫ মার্চ ১৯৮১।

আবদুল আউয়াল (১৯২৬-১৯৫২)॥ বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। ২৬ বৎসর বয়সে শহীদ হন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ হাশিম। আবদুল আউয়াল একজন রিকশাচালক। তাঁর বাড়ির ঠিকানা ছিল ১৯, হাফিজুল্লাহ রোড, ঢাকা। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২-র ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে গুলিবিদ্ধ হয়ে আবদুল আউয়াল নিহত হন। মহান ভাষা-আন্দোলনের আত্মত্যাগের ফলে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ (১৯৫৬)। তাঁর শহীদ স্মৃতি বাঙালির জাতীয় চেতনা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রতকরণে দিশারির ভূমিকা পালন। এই চেতনার বলেই ১৯৭১-এ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যু. ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

আবদুল আজিজ, খানবাহাদুর (১৮৬৭-১৯২৬)॥



জন্ম. নোয়াখালী, ১৮৬৭। শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, সাহিত্যিক। ১৮৮৬-তে ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. পাস। নোয়াখালী জেলার প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট। ১৮৮৮-তে সরকারি শিক্ষা বিভাগের চাকরিতে যোগদান এবং ১৯১০-এ প্রভিন্সিয়াল এডুকেশনাল সার্ভিসে উন্নীত। দীর্ঘদিন চট্টগ্রামে সহকারী ইনসপেক্টর অব স্কুলস এবং বিভাগীয় ইনসপেক্টর অব স্কুলস থাকাকালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। চট্টগ্রামের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্যে তাঁর অবদান বিশেষ স্মরণীয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক সম্পত্তি দান। চট্টগ্রামে মুসলিম সাহিত্য সমিতি, কবীরউদ্দীন মেমোরিয়াল হল ও ভিক্টোরিয়া ইসলামি ছাত্রাবাস স্থাপন। মওলানা ওবায়দুল্লাহ আল ওবেদীর মৃত্যুতে 'ওবেদী বিয়োগ' নামে একটি শোক-কাব্য রচনা। 'কৈত্রে কাতিক' (Kaitra Kateak) নামেও একটি বই লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কবি নজরুল ইসলাম তাঁকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য 'খান বাহাদুর' উপাধি লাভ। মৃত্যু. ১৯২৬।

আবদুল আলিম (১৯৩১-১৯৭৪)॥ জন্ম. তালিবপুর গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, ২৭ জুলাই ১৯৩১। সুবিখ্যাত লোকগীতি গায়ক। এক নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম। তালিবপুর স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। বাল্যকাল থেকেই গান-বাজনার প্রতি আগ্রহী। গানের শিক্ষক রেখে গান শেখার সামর্থ্য ছিল না বলে অন্যের গাওয়া গান শুনে শুনে গানের চর্চা। পালা-পার্বনে গান পরিবেশন করে জনপ্রিয়তা অর্জন. মুর্শিদাবাদের অধিবাসী কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা তাঁকে তালিবপুর থেকে কলকাতায় নিয়ে যান। সেখানে সৈয়দ গোলাম ওলির কাছে গানের তালিম গ্রহণ. দরাজকণ্ঠের অধিকারী শিল্পীর অচিরেই কলকাতায় সুনাম অর্জন। কলকাতার আলীয়া মাদ্রাসার মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় সংগীত পরিবেশন করে শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হকের আশীর্বাদ লাভ। সুকণ্ঠের জন্য বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও বিখ্যাত লোকসংগীতশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদের স্নেহে ধন্য হবার গৌরব অর্জন। চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর গানের গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত। বিখ্যাত দোতারা বাদক কানাইলাল শীলের শিষ্যত্ব গ্রহণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর



কলকাতা ত্যাগ করে ১৯৪৮-এ ঢাকায় আগমন ও ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিত পল্লীগীতি পরিবেশন মরমি লোকসংগীতের একনিষ্ঠ গায়ক। 'দুয়ারে আইসাছে পাল্কী', 'নাইয়ারে নায়ের বাদাম তুইলা', 'বন্ধুর বাড়ি মধুপুর', 'এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া' প্রভৃতি মরমি লোকগীতি গেয়ে শ্রোতাদের মন জয়। মেগাফোন, কলম্বিয়া, হিজ মাস্টার্স ভয়েস, গ্রামোফোন কোম্পানি অব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানি কর্তৃক তাঁর গানের অসংখ্য রেকর্ড প্রকাশ। ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'-সহ প্রায় পঞ্চাশটি চলচ্চিত্রের নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী। উল্লেখযোগ্য ছবি: এদেশ তোমার আমার, জোয়ার এলো, সুতরাং, পরশমণি, অরুন বরুণ কিরণ মালা, বেদের মেয়ে, অবাঞ্ছিত, আলিঙ্গন, শীত বিকেল, নদী ও নারী, রূপবান, কাগজের নৌকা, ভাওয়াল সন্ন্যাসী, আপন দুলাল, নবাব সিরাজদ্দৌলা, কাঞ্চন মালা, মধুমালা, সাত ভাই চম্পা, এতটুকু আশা, সুয়োরানী দুয়োরানী, পারুলের সংসার, গাজী কালু চম্পাবতী, পালাবদল, পদ্মা নদীর মাঝি, লালন ফকির, সুজন সখী, দস্যুরানী, উৎসর্গ, গাঁয়ের বধূ, নিমাই সন্ন্যাসী, দয়াল মুর্শিদ, তীরভাঙ্গা ঢেউ, সাগর ভাসা প্রভৃতি। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে (২২ জুন ১৯৬৭) তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে বিবৃতি প্রদান (১৭ মে ১৯৭১)। ঢাকার সংগীত মহাবিদ্যালয়ের লোকগীতি বিভাগের অধ্যাপক। সংগীতে বিশেষ অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান (১৯৭৭)। মৃত্যু. ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

আবদুল আলী, নওয়াবজাদা (?-১৯৪৭)॥ জন্ম. কলকাতা। শিক্ষাবিদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস। ১৯০৬-তে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত। ১৯২১-এ ভারত সরকারের রেকর্ড কিপার পদে নিযুক্তি। ১৯৩৮-এ সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। বিভিন্ন সময়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রাস্টি বোর্ড ও ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের সেক্রেটারি রোটারি ক্লাবের প্রথম ভারতীয় সভাপতি। ঐতিহাসিক ও গবেষক রচনার জন্য সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি লাভ। 'Bengal Past and Present' পত্রিকার সম্পাদক। মৃত্যু. ১৯৪৭।

আবদুল আলীম চৌধুরী (১৯২৮-১৯৭১)॥ জন্ম. খয়েরপুর গ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ১৯২৮। চক্ষুবিশেষজ্ঞ। ১৯৪৫-এ কিশোরগঞ্জ হাই স্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৪৮-এ কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই.এসসি., ১৯৫৫-তে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. এবং ১৯৬১-তে লন্ডন থেকে ডি.ও. ডিগ্রি লাভ। ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। ১৯৪৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান এবং এ-কারণে ১৯৫৩-তে কারা নির্যাতন ভোগ। ১৯৫৪-১৯৫৫ পর্যন্ত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি। কর্মজীবনে বিলাতের সেন্ট জেমস হাসপাতালের রেজিস্ট্রার (১৯৬১-১৯৬৩), মীর্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালের প্রধান চক্ষু চিকিৎসক (নভেম্বর ১৯৬৩-অক্টোবর ১৯৬৫), ঢাকায় পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চক্ষু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক (জুন-ডিসেম্বর ১৯৬৭), ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক (জানুয়ারি ১৯৬৮-সেপ্টেম্বর ১৯৭০), রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক (জুন-অক্টোবর ১৯৭১) এবং ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক (নভেম্বর-ডিসেম্বও ১৯৭১)। এ ছাড়া ১৯৫৭-১৯৫৮ পর্যন্ত পাকিস্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব-পাকিস্তান শাখার যুগ্ম-সম্পাদক, ১৯৬৭-১৯৬৮ পর্যন্ত উক্ত সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৯-এ ইস্ট পাকিস্তান অপথালমোলজিক্যাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪১-১৯৪২ পর্যন্ত 'খাপছাড়া' (মাসিক পত্রিকা), ১৯৫২-১৯৫৩ পর্যন্ত 'যাত্রিক' (মাসিক পত্রিকা) ও ১৯৫৭-১৯৫৮ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদক। আবদুল আলীম চৌধুরী শ্রেণিহীন, শোষণমুক্ত



সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৪ ডিসেম্বর (১৯৭১) পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সহযোগী আল-বদর বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং ঢাকার মীরপুরের বধ্যভূমিতে হত্যা করে।

আবদুল আহাদ (১৯২০-১৯৯৪)॥ জন্ম. রাজশাহী, ১৯২০। সুরকার, কণ্ঠশিল্পী ও সংগীত পরিচালক। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার ফুকুরহাটি গ্রাম। শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী অবদুস সামাদ খান তাঁর পিতা। বাল্যকাল থেকে সংগীতানুরাগী। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৩৪) পাস করে কলকাতা সিটি কলেজে আই.এ. ক্লাশে ভর্তি। কলকাতায় কারমাইকেল হোস্টেলে বাসকালে ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত তালিম গ্রহণ। ১৯৩৮-এ সরকারি বৃত্তি পেয়ে গান শেখার জন্য শান্তিনিকেতনে ভর্তি। এর সংগীত ভবনের প্রথম বাঙালি মুসলমান ছাত্র। একদিন উত্তরায়ণে শান্তিনিকেতনের নবাগত ছাত্রদের এক গানের অনুষ্ঠানে 'দিনের পর দিন যে গেল' রবীন্দ্র-সংগীতটি গেয়ে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভ। শান্তিনিকেতনে চার বছর রবীন্দ্রসংগীত শেখার পর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন (১৯৪১)। সেখানে গ্রামোফোন কোম্পানিতে রবীন্দ্রসংগীত ট্রেনার নিযুক্ত। একদা পঙ্কজকুমার মল্লিককে 'সঘন গহণ রাত্রি' ও 'তুমি কি কেবলি ছবি' এ দু'খানি রবীন্দ্রসংগীত বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের সুরানুসারে শিখিয়ে রেকর্ড করান। একই সময়ে কলকাতা বেতারে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন ও আধুনিক গানে সুরসংযোজন। 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' ছবিতে এককভাবে সংগীত পরিচালনা (১৯৪৬)। তার সুর করা দু'টি আধুনিক গান 'তুমি আমি দুই তীর সুগভীর তটিনীর' ও 'সে পথ ধরি আস নাই, আস নাই তুমি' সন্তোষ সেনগুপ্তের কণ্ঠে রেকর্ডিং হলে জনপ্রিয়তা অর্জন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন (১৯৪৮)। ঢাকা বেতারে সংগীত প্রযোজক হিসেবে যোগদান। দীর্ঘকাল রেডিওতে সংগীত শিক্ষার আসর পরিচালনা। আধুনিক গান, দেশাত্মবোধক গান ও রবীন্দ্র-সংগীতের সুরকার ও শিক্ষক হিসেবে খ্যাত। 'পূর্ববাংলার শ্যামলিকা', 'আমার দেশের মাটির গন্ধে', 'এই বাংলার সবুজে শ্যামলে', 'দুর্গম এ যাত্রা পথে', 'জীবন এমন সুর পেয়েছে', 'কালোর তিমিরে এসেছে আলোর পায়রা', 'আমি সাগরের নীল', 'আমিতো আমার গল্প বলেছি', 'অনেক বৃষ্টি ঝড়ে তুমি এলে', 'সংগীতা যদি ডাকে' প্রভৃতি জনপ্রিয় গানের সুরস্রষ্টা। 'সালামত', 'নবারুণ', 'আসিয়া', ও 'দূর হ্যায় মুখ কা গাঁও' ছায়াছবির সংগীত পরিচালক। লেখক হিসেবেও সুনাম অর্জন। 'গণচীনে চব্বিশ দিন', 'নব দিগন্তের গান', 'সিন্ধু দেশের সংগীত' (অনুবাদ) ও 'আসা যাওয়া পথের ধারে' (১৯৮৯) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সংগীতে অবদান রাখায় পাকিস্তান সরকারের 'তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' (১৯৬২) ও 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' (১৯৬৯) খেতাব ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'স্বাধীনতা পুরস্কার' (১৯৭৮) গ্রহণ। চিরকুমার আবদুল আহাদ এদেশের একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ। রবীন্দ্র-সংগীতের শিল্পী হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর হিন্দু শিল্পীরা ব্যাপকভাবে এ দেশ ত্যাগ করলে ঢাকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে এসে নতুন নতুন শিল্পী সৃষ্টির মাধ্যমে সে দৈন্য পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু. ঢাকা ১৫ মে ১৯৯৪।



আবদুল ওয়াসেক (১৯০৯-১৯৬৭)॥ জন্ম. বাড়রাহ গ্রাম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা, ১৯০৯। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ। প্রথম জীবনে পত্নী ও শিশু-পুত্রকে হারিয়ে রাজনীতি ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ। অখণ্ড ভারতবর্ষে মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের অগ্রপথিক। নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র সমিতির সভাপতি (১৯৩৫)। নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ (১৯৩৫)



এবং নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন (১৯৩৭) প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন। হলওয়েল মনুমেন্ট (১৯৪০) আন্দোলনের অন্যতম নেতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম 'শ্রীপদ্ম' ও 'বন্দেমাতরম' বিরোধী সংগ্রামে জয়লাভ তাঁর সফল নেতৃত্বেরই ফল (১৯৩৬)। বাংলার মুসলমান ছাত্রদের পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে সংগঠিতকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর ঢাকা জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি, পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের ইতিহাস বিভাগের পরীক্ষক, ঢাকা জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও নবাবগঞ্জ স্কুলের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন। ১৯৬২-তে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় ঢাকা-১ আসন থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। সুবক্তা ও বিভাগপূর্বকালের জনপ্রিয় ছাত্রনেতা। মুসলিম লীগের রাজনীতির একজন অনুসারী। মৃত্যু. ঢাকা, ২১ নভেম্বর ১৯৬৭।

আবদুল ওহাব খান (১৮৯৮-১৯৭২)॥ জন্ম. রহমতপুর গ্রাম, বাবুগঞ্জ, বরিশাল, ১৮৯৮। রাজনীতিবিদ, আইনজীবী। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯১৮-তে বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২১-এ বি.এল. পাস। বরিশাল



আদালতে আইন ব্যবসায়ে যোগদান। প্রজা আন্দোলনের অংশগ্রহণ। কৃষক-প্রজা পার্টির অন্যতম নেতা। প্রায় কুড়ি বছর সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর পদে দায়িত্ব পালন। ১৯২২-এ বরিশাল সদর লোকাল বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত। ১৯২৭-১৯৩৩-এ বরিশাল জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৪০ ও ১৯৫২-তে উক্ত সংস্থার চেয়ারম্যান নির্বাচিত। পর পর তিনবার বরিশাল মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্বাচিত। ১৯৩৭-এ কৃষক-প্রজা পার্টির মনোনয়নে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪২-এ বরিশাল জেলা স্কুল বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ও ১৯৫০-এ জেলা স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। ১৯৫৩-তে কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ আইন সভার সদস্য, ১৯৫৫-তে কৃষক-শ্রমিক পার্টির মনোনয়নে পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য এবং গণ-পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত। তাঁর সভাপতিত্বে গণ-পরিষদে ১৯৫৬-র শাসনতন্ত্র গৃহীত। নয়া শাসনতন্ত্র মোতাবেক গণ-পরিষদ জাতীয় পরিষদে রূপান্তরিত হলে স্পিকার পদে পুনঃবহাল। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর সামরিক সরকার জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দিলে স্পিকার পদ হারান। ১৯৬২-র ২৮ এপ্রিল মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজয় বরণ। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের রাজনীতির একজন অনুসারী। মৃত্যু. ১৯৭২।

আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩)॥ জন্ম. পাঠানটুলা, সিলেট, ১৮৬৩। ইতিহাস লেখক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৮৬-তে ইংরেজিতে (অনার্সসহ) বি.এ. পাস। ১৮৮৬-১৯১৪ পর্যন্ত প্রথমত স্কুল শিক্ষক, পরে কিছুকাল সহকারী স্কুল পরিদর্শক। স্কুল পরিদর্শক হিসেবে অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় বসবাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজীবন ফেলো ও এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ও আরবিতে প্রবন্ধ রচনা। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত (১৮৯৮), ভারতবর্ষের ইতিহাস, মক্তব ও মাদ্রাসার বর্তমান শিক্ষা প্রণালী ও তাহার সংস্কার, Hints on English Pronunciation, Hints on Class Management and Method of Teaching, Islam: Universal Religion of Peace and Progress, History of Hindu-Muslim Pact. মৃত্যু. কলকাতা, ১৯৪৩।

আবদুল করিম (১৯২৮-২০০৪)॥ জন্ম. চাঁপাছড়ী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ১ জুন ১৯২৮। ১৯৪৪-এ চট্টগ্রাম আইআই কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বোর্ডে ২য় স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা পাস। ১৯৪৬-এ ঐ প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রথম বিভাগে বোর্ডে ৮ম স্থান অধিকার করে আই.এ পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে ১৯৪৯-এ বি.এ. অনার্স এবং ১৯৫০-এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম.এ ডিগ্রি অর্জন। ১৯৫৮-এ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি এবং ১৯৬২-এ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয়বার পিএইচডি ডিগ্রি

অর্জন করেন। এসময় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত। ১৯৫১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান। ১৯৬২-এ তিনি রিডার পদে উন্নীত। ১৯৬৬-এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে রিডার হিসেবে যোগদান। ১৯৬৯-এ অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৯২-এর জুন থেকে ১৯৯৬-এর জুন পর্যন্ত সুপারনিউমারি অধ্যাপক। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সহকারী হাউস টিউটর, ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত হাউস টিউটরের দায়িত্ব পালন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাওল হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন এবং ১৯৭৫-এর ২৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত। ১৯৮১-এর ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। বাংলায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২৬ এবং ইংরেজিতে ১০। বাংলায় ও ইংরেজিতে প্রবন্ধের সংখ্যা ১৮৪। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজ বিস্তারের ইতিহাস সম্বলিত 'সোশ্যাল হিস্ট্রি অব দ্য মুসলিমস্ ইন বেঙ্গল ডাউন টু ১৫৩৮' পুস্তকাকারে ১৯৫৮-এ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত এসময় বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রার একটি 'করপাস' রচনা ও প্রকাশ করে সুলতানদের কালক্রম নির্ধারণে এক অসামান্য এবং দুরূহ গবেষণা পরিচালনা। জে.বি. হ্যারিসনের তত্ত্বাবধানে লন্ডনের 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এ 'মুরশিদ কুলী খান অ্যান্ড হিজ টাইমস্' গবেষণা সম্পন্ন। গবেষণার প্রয়োজনে ফরাসি এবং ডাচ, মাদ্রাসায় শেখা ফারসি ভাষা আয়ত্ত। বিলেতবাসের দ্বিতীয় বছরে ড. করিম ঢাকার ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণা-উপাদান সংগ্রহের কাজ করেন। এর ফসল 'ঢাকা দ্য মোগল ক্যাপিটাল' এবং 'ঢাকাই মসলিন' গ্রন্থ দু'টি। 'বাংলার ইতিহাস' (সুলতানী আমল), 'করপাস অব দি অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্সিয়ান ইন্সক্রিপশন অব বেঙ্গল' এবং 'বাংলার ইতিহাস' (মোগল আমল) তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষায় যথোপযুক্ত উপাদানের ব্যবহার ইতিহাসচর্চার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঢাকার বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস রচনায় উপাদানের সন্ধান ও চয়নে ড. করিম একনিষ্ঠ এক পরিশ্রমী গবেষকের পরিচয় বিধৃত করেন। মুদ্রা শিলালিপির করপাস রচনা এবং সাহিত্য উপাদানের ভিত্তিতে কালানুক্রম নির্ধারণ ও স্থানীয় ইতিহাসের উপাদান সনাক্তকরণ; সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা, রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা এবং স্থানীয় ইতিহাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। সম্মাননা: ন্যুমিজমেটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার আকবর সিলভার মেডেল, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি গোল্ড মেডেল, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গোল্ড মেডেল এবং একুশে পদক (১৯৯৫)। মৃত্যু. ঢাকা, ২৭ জুলাই ২০০৪।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩)॥



জন্ম. সুচক্রদণ্ডী গ্রাম, পটিয়া-চট্টগ্রাম, ১১ অক্টোবর ১৮৭১। সংগ্রাহক ও লেখক। পিতা মুনশী নুরউদ্দীন। পিতৃবিয়োগের তিন মাস পরে জন্ম। এগারো বছর বয়সে নয় বছর বয়স্কা পিতৃব্য-কন্যা বদিউন্নিসার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৮৮২)। সতেরো বছর বয়সে মাতার পরলোকগমন। পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাস (১৮৯৩)। চট্টগ্রাম কলেজে দুই বছর এফ.এ. অধ্যয়ন। এফ.এ. পরীক্ষার পূর্বে সন্নিপাত রোগে আক্রান্ত হন; ফলে পরীক্ষা না দিয়ে কলেজের পাঠ ত্যাগ। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত (১৮৯৫)। একই বছর সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অস্থায়ী পদ গ্রহণ। সেখানে কার্যকাল শেষ হলে চট্টগ্রাম প্রথম সাব-জজ আদালতে শিক্ষানবিস পদে যোগদান (১৮৯৬)। একসময়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'পূর্ণিমা' (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬-ডিসেম্বর ১৮৯৯) পত্রিকায় 'অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী' শিরোনামে এক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ। প্রবন্ধটি পাঠ করে কবি নবীনচন্দ্র সেন মুগ্ধ হন। তিনি চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে কমিশনারের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে আসেন। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর অফিসে আবদুল করিমকে কেরানির পদে চাকরি দেন (১৮৯৮)। পুঁথি সংগ্রহের মানসে আবদুল করিম স্থানীয় 'জ্যোতি' পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন দেন। এ বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে আবদুল করিমের চাকরিচ্যুতি এবং নবীনচন্দ্র সেন কুমিল্লায় বদলি

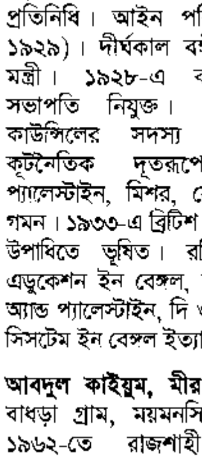
কিছুদিন বেকার থাকার পর আনোয়ারা মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভ (১৮৯৯)। ১৯০৬-এ চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর অফিসে দ্বিতীয় কেরানির পদে চাকরি লাভ। ১৯৩৪-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ। অবসর-জীবনে সাহিত্যসেবা ছাড়াও নানা জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট (১৯৩৫-১৯৪৫)। পটিয়া আঞ্চলিক ঋণ সালিশি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। ১৯০৩-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত। এর সহসভাপতি (১৯১৯)। চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি (১৯১৮), কলকাতা মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (১৯৩৯), চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি (১৯৫১), ও কুমিল্লা সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি (১৯৫২)। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স ও পরে বি.এ.-র বাংলার পরীক্ষক নিযুক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা অনার্সের একটি পত্রের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিয়োগ (১৯৫১)। প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও গবেষণায় অসাধারণ নিষ্ঠা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদান। তাঁর সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার পুঁথি বাঙালি মুসলমানের রচনা। এককভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এতো পুঁথি সংগ্রহ করতে সমর্থ হন নি। পুঁথি সংগ্রহে অসামান্য অবদান রাখায় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, 'তিনি ব্যক্তি নহেন, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান।' তাঁর এই সংগ্রহ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যেও ইতিহাস রচনা কোনো সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তার পক্ষেই সম্ভব হতো না। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের গবেষণামূলক রচনাবলির অনেকাংশ তাঁর সংগৃহীত উপাদানের উপর ভিত্তি করে রচিত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুরোধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (প্রথম ও ২য় সংখ্যা ১৯১৩) 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' শিরোনামে তাঁর সংগৃহীত পুঁথির পরিচিতি প্রকাশ। বাংলা প্রাচীন পুঁথির উপর অন্যান্য লেখকদের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাঁর 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'ই (১৯১৪) অধিকতর সমৃদ্ধ ও আদর্শস্থানীয়। আবদুল করিমের সম্পাদিত নরোত্তম ঠাকুরের 'রাধিকার মানভঙ্গ', কবিবল্লভের 'সত্যনারায়ণের পুঁথি', দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ', রামরাজার 'মৃগলুব্ধ সম্বাদ', দ্বিজ মাধবের 'গঙ্গামঙ্গল', আলী রাজার 'জ্ঞানসাগর', বাসুদেব ঘোষের 'শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস', মুক্তারাম সেনের 'সারদামঙ্গল', শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়' ও আলাওলের 'পদ্মাবতী' (খণ্ডাংশ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত। তাঁর সম্পাদনা কর্মের প্রশংসা করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, 'গ্রন্থের সম্পদনা কার্যে যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহৃদয়তা ও যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সমস্ত বাঙ্গালায় কেন, সমস্ত ভারতেও বোধ হয় সচরাচর মিলে না। এক একবার মনে হয়, যেন কোন জর্মান এডিটর গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন। পুঁথি সংগ্রহ, সম্পাদনা ও তার পরিচিতি রচনার পাশাপাশি দেশ-কাল-সমাজ-ভাষা-শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতিক সমস্যা, ইতিহাস প্রভৃতি নানামুখী চিন্তা-চেতনামূলক অজস্র মৌলিক প্রবন্ধ রচনা। 'ইসলামাবাদ' (চট্টগ্রামের সচিত্র ইতিহাস) ও 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (মুহম্মদ এনামুল হকের সহযোগে রচিত) তাঁর দুইখানি মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। এ-সকল রচনা প্রাঞ্জল ও সাধুগদ্যে নির্মিত। 'পুঁথি পরিচিতি' (আহমদ শরীফ সম্পাদিত) তাঁর আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী একজন মনীষী। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ ও মমত্ববোধ। পাকিস্তানের ভাষা বিতর্কে বাংলা ভাষার পক্ষে মত প্রকাশ। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ রচনা। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম বাংলা করার দাবি জানান। তাঁর সংগৃহীত বিপুল পুঁথি সম্পদের মুসলিম পুঁথিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালকে এবং হিন্দু পুঁথিগুলো রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্স মিউজিয়ামকে তিনি দান করে গেছেন। সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ চট্টল ধর্মমণ্ডলী কর্তৃক 'সাহিত্য বিশারদ' (১৯০৯) উপাধি লাভ নদীয়ার সাহিত্য সভার কাছ থেকে 'সাহিত্য সাগর' (১৯২০) উপাধি লাভ। গবেষণাকর্মে অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'স্বাধীনতা পুরস্কার' (মরণোত্তর) প্রদান (১৯৯৫)। মৃত্যু. সুচক্রদণ্ডী, চট্টগ্রাম, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩।

আবদুল করীম গযনবী, স্যার (১৮৭২-১৯৩৯)॥ জন্ম. দেলদুয়ার গ্রাম, টাঙ্গাইল, ২৫ আগস্ট

১৮৭২। রাজনীতিবিদ, জমিদার, সমাজ-হিতৈষী ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে শিক্ষাজীবন অতিবাহিত। শিক্ষা সমাপনান্তে ১৮৯৪-তে দেশে প্রত্যাবর্তন এবং দেলদুয়ার এস্টেটের পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ। ১৯০৯-১৯১৬ পর্যন্ত ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আসাম ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশের একক প্রতিনিধি। ১৯১৩-১৯১৬ পর্যন্ত বড় লাটের কাউন্সিলে বঙ্গীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি। আইন পরিষদের সদস্য (১৯২৩-১৯২৯)। দীর্ঘকাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী। ১৯২৮-এ বঙ্গীয় সাইমন কমিটির সভাপতি নিযুক্ত। ১৯২৯-এ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হন। ব্রিটিশ রাজের কূটনৈতিক দূতরূপে অনেকবার সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশে গমন। ১৯৩৩-এ ব্রিটিশ সরকারের 'নওয়াব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত। রচিত গ্রন্থাবলি: মোসলেম এডুকেশন ইন বেঙ্গল, পিলগ্রিম ট্রাফিক টু হেজায অ্যান্ড প্যালেস্টাইন, দি ওয়ার্কিং অব দি ওয়ার্কিক্যাল সিসটেম ইন বেঙ্গল ইত্যাদি। মৃত্যু. ১৯৩৯।



আবদুল কাইয়ুম, মীর (১৯৩৯-১৯৭১)॥ জন্ম. বাধড়া গ্রাম, ময়মনসিংহ, ১৯৩৯। শিক্ষাবিদ। ১৯৬২-তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। পরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতি তাঁর দৃঢ় সমর্থন ছিল। মুক্তিবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তায় বিশ্বাসী। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ২৫ নভেম্বর রাতে পাক সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে হত্যা করে



আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)॥ জন্ম. আড়াইসিধা গ্রাম, কুমিল্লা, ১ জুন ১৯০৬। কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, ছান্দসিক ও সম্পাদক। পাটের ব্যবসায়ী হাজী আফসারউদ্দীন তাঁর পিতা। অতি শৈশবে মাতৃহারা হন। ১৯২৩-এ ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা মডেল হাই স্কুল থেকে পাঁচটি লেটারসহ মেট্রিক, ১৯২৫-এ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এসসি. পাস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন (১৯২৭-১৯২৯)। ১৯২৯-এ কলকাতায় সওগাত (১৯২৬) পত্রিকায় সম্পদনা বিভাগে চাকুরি গ্রহণ। ১৯৩০-এ কলকাতা কর্পোরেশনের একটি প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান। ১৯৩৫-এ কমরেড মুজফ্ফর আহমদের কন্যা আফিয়া খাতুনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৩৭-এ 'জয়তী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পদনা। একই বছর 'নবশক্তি'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৩৮-এ 'যুগান্তর' পত্রিকায় যোগদান। ১৯৪২-এ কাজী নজরুল ইসলামের 'নবযুগ' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক নিযুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে ভারত সরকারের Publicity Organisation-এর বাংলা অনুবাদক পদে যোগদান। ১৯৪৬-এ সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ও অর্ধ-সাপ্তাহিক 'পয়গাম' পত্রিকায় চাকরি গ্রহণ। বিভাগ পরবর্তীকালে ১৯৫২-তে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্র মাসিক মাহেনও (১৯৪৯) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। দীর্ঘকাল এ-পত্রিকার সম্পাদক (১৯৫২-১৯৬৪) থাকার পর ১৯৬৪-তে কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডে প্রকাশন অফিসার হিসেবে যোগদান। ১৯৭০-এর ১ জুন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬)-এর নেতৃত্বে ঢাকায় যে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন সূচিত হয় তিনি তার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা এবং সাহিত্য সমাজের মুখপত্র বার্ষিক 'শিখা' (১৯২৭) পত্রিকার প্রকাশক ও লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ– কবিতা: দিলরুবা (১৯৩৩), উত্তর বসন্ত (১৯৬৭)। প্রবন্ধ: বাংলা কাব্যের ইতিহাস: মুসলিম সাধনার ধারা (১৯৪৪), কবি নজরুল (১৯৭০), মওলানা মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন (১৯৭৯), কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৭৬), ড. মুহম্মদ এনামুল হক বক্তৃতামালা (১৯৮৩), ছন্দ-সমীক্ষণ (১৯৭৯),



লোকায়ত সাহিত্য (১৯৮৫ তাঁর মৃত্যুর পর বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত)। মৌলিক রচনা ছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেছেন বিখ্যাত কাব্য সংকলন কাব্য-মালঞ্চ, মুসলিম সাহিত্যের সেরা গল্প, নজরুল রচনাবলি (১ম খণ্ড–৫ম খণ্ড), রোকেয়া রচনাবলি, শিরাজী রচনাবলি, লুৎফর রহমান রচনাবলি, ইয়াকুব আলী রচনাবলি, আবুল হুসেন রচনাবলি, কাব্যবীথি ইত্যাদি। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক, কুমিল্লা ফাউন্ডেশনস পদক, মুক্তধারা পুরস্কার লাভ। দিলরুবা কবিতাগ্রন্থের যশস্বী কবি আবদুল কাদির ছান্দসিক, গবেষক ও মননশীল প্রবন্ধকার এবং নজরুল ও অন্যান্য রচনাবলির সম্পাদক হিসেবে সুপরিচিত। শুধু ছন্দ রচনায় নয়, ছন্দ-বিচারেও তাঁর অধিকার সংশয়াতীত। তাঁর 'ছন্দ সমীক্ষণে' বাংলাছন্দের সামগ্রিক রূপটি বিশ্লেষিত। তাঁর কাব্যপ্রয়াসে মোহিতলালে ধ্রুপদী সংগঠন ও নজরুলের উদাত্ত আবেগের চমৎকার সমন্বয় সহজেই লক্ষণীয়। মৃত্যু. ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪।

আবদুল কুদ্দুস মাখন (১৯৪৭-১৯৯৪)॥ জন্ম. মৌড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১ জুলাই ১৯৪৭। রাজনীতিবিদ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিয়াজ মোহাম্মদ হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক (১৯৬২), ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে আই.এ. (১৯৬৪) পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে বি.এ. অনার্স (১৯৬৬) ও এম.এ. (১৯৬৯) ডিগ্রি লাভ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলনে (১৯৬২) অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতিতে যোগদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্রলীগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত। ফজলুল হক হল ছাত্রসংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৬-১৯৬৭) ও সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৮-১৯৬৯)। ৬-দফাভিত্তিক পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে (১৯৬৬) ও ১১-দফা ভিত্তিক আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলনে (১৯৬৯) সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৭০-এ ছাত্র লীগের মনোনয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ডাকসুর প্রথম সাধারণ সম্পাদক বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় ছাত্রসমাজকে ছাত্রলীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' (১মার্চ ১৯৭১) চার নেতার একজন (অপর তিন নেতা হলেন নূরে আলম সিদ্দিকী, আ.স.ম. আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজ)। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ২ মার্চ (১৯৭১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন প্রাঙ্গণে এক ছাত্র-সভায় প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা (জাতীয় পতাকা) উত্তোলন এবং ৩ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে অপর এক ছাত্র-জনসভায় শেখ মুজিবর রহমানকে জাতির পিতা, রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে জাতীয় সংগীত এবং গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ সম্বলিত স্বাধীনতার প্রথম ইস্তেহার পাঠ। ২৩ মার্চ (১৯৭১) আবদুল কুদ্দুস মাখনসহ চার ছাত্রনেতা কর্তৃক পল্টন ময়দানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন ও জয় বাংলা বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ। প্যারেড করে শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমণ্ডির বাসভবনে গিয়ে তাঁকে স্বাধীন বাংলার পতাকা উপহার প্রদান। মুক্তিযুদ্ধে (মার্চ-ডিসেম্বর ১৯৭১) বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। পূর্বাঞ্চলীয় লিবারেশন কাউন্সিলের ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ঐ অঞ্চলের মুজিব বাহিনীসহ সব শ্রেণির মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুটমেন্ট, তাদের ট্রেনিং গ্রহণের জন্য প্রেরণ ও ট্রেনিং গ্রহণ শেষে তাদের অস্ত্র সরবরাহের দায়িত্ব সম্পাদন। যুব লীগের (১১ নভেম্বর ১৯৭২) প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডিয়ামের সদস্য। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত (১৫ আগস্ট ১৯৭৫) হওয়ার পর ২৩ আগস্ট (১৯৭৫) গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ। ১৯৭৮-এর ১২ নভেম্বর জেল থেকে মুক্তিলাভ। আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য লাভ। আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য (১৯৯২-১৯৯৪)। ১৯৯১-এর ২৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমন (২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩)। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক



বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য মৃত্যু: ফ্লোরিডা স্যান্ডস বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, যুক্তরাষ্ট্র, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।

আবদুল খালেক, ইঞ্জিনিয়ার (১৮৯৭-১৯৬২):



জন্ম: সুলতানপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম, ২০ জুলাই ১৮৯৭। প্রকৌশলী, সম্পাদক ও প্রকাশনা-উদ্যোক্তা। পিতা মোহাম্মদ বেলায়েত আলী চৌধুরী ও মাতা ফয়েজুন্নেসা। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে। রাউজান আর আর এ সি ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা (১৯১২) ও চট্টগ্রাম কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পাস (১৯১৪)। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে স্বর্ণপদকসহ তড়িৎ প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি লাভ (১৯১৯)। গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করে কর্মজীবন শুরু। তড়িৎ প্রকৌশলী হয়ে কিছুকাল রেঙ্গুনে চাকরি। চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানিতে তড়িৎ প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান এবং চট্টগ্রামে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন। পরে চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় শুরু। চট্টগ্রামে প্রথম বিদ্যুৎ চালিত প্রেস কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস (১৯২৮), পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রির প্রতিষ্ঠান কোহিনূর লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা (১৯৩৩)। নিজের সম্পাদনায় কোহিনূর নামে একটি সাপ্তাহিক সাময়িকী প্রকাশ (১৯৫০)। চট্টগ্রাম থেকে দৈনিক সংবাদপত্র দৈনিক আজাদী সম্পাদনার মাধ্যমে (১৯৬০) ন্যায়নিষ্ঠ নিরপেক্ষ সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদান। চট্টগ্রামে মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে পুরোধা এই মুসলিম ব্যক্তিত্ব একাই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত। তাঁর প্রেস ও প্রকাশনা সংস্থা থেকে শওকত ওসমান, আবুল ফজল, সাদত আলী আখন্দ, মাহবুবুল আলম, সুচরিত চৌধুরী প্রমুখ বহু সাহিত্যিকের গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত। বাঙালি সংস্কৃতি-বিদ্বেষী পাকিস্তান সরকারের দমননীতি উপেক্ষা করে মাহবুবুল আলম চৌধুরী রচিত একুশের প্রথম কবিতা 'কাঁদতে আসি নি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' এই প্রেসেই গোপনে মুদ্রিত। আবদুল খালেক শিশুপাঠ্য ও শিশুতোষ গ্রন্থের রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (১৯৫৭), দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, শেখে চাটগাম কাজেম আলী, নেপোলিয়ন, বার আউলিয়া প্রভৃতি মৃত্যু: চট্টগ্রাম, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬২।

আবদুল গনি, নবাব (১৮১৩-১৮৯৬): জন্ম: ঢাকা, ১৮১৩।



জমিদার। পিতা খাজা আলীমুল্লাহ। দুই ভার্যা– মনি বিবি ও ওমদা খানম। ঢাকা বাসীদের কাছে গনি মিয়া নামে সুপরিচিত। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের আদি ছাত্রদের একজন। পিতার জীবদ্দশায়ই তাঁর জমিদারির কর্তৃত্বভার গ্রহণ ১৮৪৬। ঢাকা, বরিশাল, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলায় এই জমিদারি বিস্তৃত ছিল। সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭) চলাকালে অর্থ, হাতি, ঘোড়া ও নৌকা দিয়ে ইংরেজদের সহয়তা প্রদান। এর ফলে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক স্থাপিত। ১৮৬০-এ ঢাকায় শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে এক মারাত্মক দাঙ্গা বাধলে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র দাঙ্গা দমন করতে ব্যর্থ হলে নবাব আবদুল গণির হস্তক্ষেপে সে হাঙ্গামা মাত্র তিন দিনে মধ্যে প্রশমিত। ১৮৬৭-তে ভাইসরয় কর্তৃক আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত। তিনি পৈতৃক বাসভূমি পুনঃনির্মাণ করে জ্যেষ্ঠপুত্র আহসানউল্লাহর নামানুসারে সে ভবনের নাম রাখেন 'আহসান মঞ্জিল' (১৮৭২)। ১৮৭৫-এ বংশানুক্রমে নবাব উপাধি লাভ। ঢাকার শাহবাগ ও বেগুনবাড়িতে সুদৃশ্য উদ্যান রচনা। ঢাকার ঘোড়দৌড় মাঠ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা নির্মিত এবং তৎকর্তৃক পেশাদারি ঘোড়দৌড় চালু। ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ঢাকা নিউজ' (এপ্রিল ১৮৫৬)-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী। দাতা হিসেবেও খ্যাত। ঢাকার 'ওয়াটার ওয়ার্কস প্রকল্প' (১৮৭৮)-এ দু'লক্ষ টাকা দান। মিটফোর্ড হাসপাতালে 'মহিলা ওয়ার্ড' নির্মাণ। ঢাকা শহরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন। ঢাকার নবাব পরিবারের সর্বাপেক্ষা শক্তিধর, ক্ষমতাবান ও ঐশ্বর্যশালী পুরুষ। 'ইংরেজ প্রশাসন তাঁকে সমীহ করতো, সমীহ করতো হিন্দু-মুসলমান, সাধারণ মানুষ। মহররম, ঈদে যেমন তিনি যোগ দিতেন,

সাহায্য করতেন, তেমনি জন্মাষ্টমী বা কালীপূজায়ও। সি.এস.আই. (১৮৬০) ও কে.সি.আই. (১৮৮৬) উপাধি লাভ মৃত্যু. ১৮৯৬।

আবদুল গনি বয়াতি (১৯০৯-১৯৭৮)। জন্ম. নুরুল্লাহপুর (মেহেদীপুর), বরিশাল, ১৯০৯। জারিগায়ক ও গীতিকার। শৈশব থেকেই গানের চর্চা শুরু। জারি গানের রচয়িতা হিসাবেও সুখ্যাত। অসংখ্য পল্লীগীতির রচয়িতা। পল্লীগান ও জারি গানের কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যু. ১৯ আগস্ট ১৯৭৮।

আবদুল গনি, মেজর (১৯১৯-১৯৫৭)। জন্ম. নাগাইশ গ্রাম, বুড়িচং কুমিল্লা, ১৯১৯। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪০-এ বি.এ. ডিগ্রি লাভ। ফায়ার অফিসার পদে ১৯৪১-এ কলকাতা ফায়ার ব্রিগেডে যোগদান।



কলকাতা অগজিলারি ফায়ার সার্ভিসের অফিসার ইন-চার্জ পদে দায়িত্ব পালন। কলকাতা এ.আর.পি-র প্রধান ইন্সট্রাক্টর। ১৯৪২-এ ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কমিশন পদে যোগদান। দুই বছর বার্মা সেক্টরে কর্তব্য সম্পাদন। ১৯৪৫-এ তাঁর উদ্যোগে বাঙালি সৈন্যদের সমন্বয়ে একটি ইউনিট গঠন। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর সামরিক ইউনিটসহ ঢাকা আগমন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনের দায়িত্বলাভ। ১৯৪৮-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন ও মেজর পদে উন্নীত। পূর্ববঙ্গের রিক্রুটিং অফিসার পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৫৩-তে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ এবং রাজনীতিতে যোগদান। ১৯৫৪-তে স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসেবে বুড়িচং এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। পরে আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৫৭-র অক্টোবরে বার্লিনে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব অভিজ্ঞ প্রাক্তন সৈনিকদের' সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান। টাইগার গনি নামে খ্যাত। মৃত্যু. বার্লিন, ১১ নভেম্বর ১৯৫৭।

আবদুল গনি হাজারী (১৯২১-১৯৭৬)। জন্ম. নয়াগ্রাম, সুজানগর, পাবনা, ১২ জানুয়ারি ১৯২১। কবি ও সাংবাদিক। হারাণপুর (ফরিদপুর) স্কুল থেকে মেট্রিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. অনার্স (দর্শন) পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. (দর্শন) ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। কলকাতায়



সাপ্তাহিক আলোড়ন (১৯৪৭) পত্রিকা সম্পাদনা। দেশ বিভাগের (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন (১৯৪৮)। ঢাকার জুবলি প্রেসে সহকারী ম্যানেজার হিসেবে যোগদান। ১৯৪৯-এ তদানীন্তন পাকিস্তান অবজার্ভার (১৯৪৯) পত্রিকার সহকারী বিজ্ঞাপন ম্যানেজার নিযুক্ত। ১৯৫০-এ এর প্রেস ম্যানেজার পদে উন্নীত। দৈনিক সংবাদের (১৯৫১) সহকারী জেনারেল ম্যানেজার পদে দায়িত্ব পালন (১৯৫১-১৯৫৪)। একই সঙ্গে এ পত্রিকার সাহিত্যপৃষ্ঠা সম্পাদনা। ১৯৫৬-তে অবজার্ভার, পূর্বদেশ ও চিত্রালীর ম্যানেজিং এডিটর পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৬৭-তে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় চাকরি ত্যাগ। Cellux Limited নামক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তা পরিচালনা (১৯৬৭-১৯৬৯)। ১৯৬৯-এ আবার অবজার্ভারে যোগদান। অবজার্ভার গ্রুপ ও অ্যাসোসিয়েট প্রিন্টার্সের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার (১৯৬৯-১৯৭২)। ১৯৭২-এ দৈনিক আজাদের প্রশাসক নিযুক্ত। অবজার্ভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন্সের প্রশাসক (১৯৭২-১৯৭৩)। সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা বোর্ডের চেয়ারম্যান (১৯৭৪-১৯৭৬)। ১৯৫০-এ মাসিকপত্র 'মুকতি' ও ১৯৬৫-১৯৬৮-তে লেখক সংঘের মাসিক সাহিত্যপত্র 'পরিক্রম' সম্পাদনা। লেখক সংঘের কার্যকরী সংসদের সদস্য। ঢাকা আর্টস স্কুল প্রতিষ্ঠায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে সহযোগিতা (১৯৪৮)। ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের (১৯৫৪) যুগ্মসম্পাদক। প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল সেক্রেটারি ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন। মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ হাসনা'র সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯৬৫)। একজন শক্তিশালী বিদগ্ধ কবি। নাগরিক জীবনের বিকার ও অসংগতিকে বিদ্রূপের ব্যঞ্জনায় কবিতায় রূপায়ণ করে খ্যাতি অর্জন

বুদ্ধির তীক্ষ্নতায় তাঁর কবিতা সমুজ্জ্বল কবিতগ্রন্থঃ সামান্য ধন (১৯৫৯) সূর্যের সিঁড়ি (১৯৬৫), জাগ্রত প্রদীপ (১৯৭০)। রম্যরচনাঃ কলপেঁচার ডায়েরী (১৯৬৭)। 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' কবিতার জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৪) ও কবিতায় বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭২) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী (১৮৭২-১৯৫৯)॥ জন্ম. খাসপুর গ্রাম, বসিরহাট, চব্বিশ পরগনা, ১৮৭২। গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক। কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ। কর্মজীবনে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা এবং পিতার পুস্তক ব্যবসায় দেখাশুনা করতেন। 'হাবলুল মতীন' (বাংলা সংস্করণ), 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫-১৯১১) বিরোধী ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য। ১৯৫০-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর খুলনা জেলার দৌলতপুরের কাছে দামোদর গ্রামে বসতি স্থাপন। পুঁথি-সাহিত্যের সংগ্রহ ও গবেষণা ছিল তাঁর আজীবনের ব্রত। পশ্চিমবঙ্গে ছাপা মুসলমানি পুঁথিগুলোর উদ্ধার করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ শহীদ তিতুমীর (১৯১৬), মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য (১৯২২), বিষাদসিন্ধুর ঐতিহাসিক পটভূমি। তিনখণ্ডে সমাপ্ত তাঁর আত্মজীবনী এখনও অপ্রকাশিত। মৃত্যু. ১৯৫৯।



আবদুল গোফরান, খানবাহাদুর (১৮৮৮-১৯৪৯)॥ জন্ম. শর্ষদী গ্রাম, ফেণী, ২৯ জানুয়ারি ১৮৮৮। আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী। ১৯১৪-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক। ১৯১৬-তে নোয়াখালী আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু। ১৯২০-এ মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং নোয়াখালীতে বিশেষ ভূমিকা পালন। মুসলিম লীগের নোয়াখালী জেলা শাখার একাধিকবার সভাপতি। নোয়াখালী জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১২ বছর দায়িত্ব পালন। নোয়াখালী পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে ৪ বার নির্বাচিত ১৯৩৩-তে খানবাহাদুর উপাধি লাভ। ১৯৪৬-এ বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী ও ১৯৪৩-এ খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন। ১৯৪৬-এ নোয়াখালীর দাঙ্গা নিরসনে ভূমিকা পালন এবং রামগঞ্জে মহাত্মা গান্ধীকে সার্বক্ষণিক সঙ্গদান। এলাকার অনেক স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। মৃত্যু. কুমিল্লা, ৯ অক্টোবর, ১৯৪৯।



আবদুল জব্বার (১৮৩৭-১৯১৮)॥ জন্ম. পারহাটি গ্রাম (মাতুলালয়), বর্ধমান, ১৮৩৭। রাজনীতিবিদ, আইনজীবী। পিতা খানবাহাদুর গোলাম আসগর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের বিচার বিভাগে সদরে আলা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পিতা তাঁকে প্রথম থেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠি। বি.এ. ক্লাসের শেষ বৎসরে থাকার সময়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ। উর্দু ও ইংরেজি ছিল তাঁর শিক্ষার মাধ্যম। স্বীয় প্রচেষ্টায় বাংলাভাষার জ্ঞান অর্জন। এবং বাংলাভাষায় 'ইসলাম ধর্ম পরিচয়' নামক পুস্তক রচনা। মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী। মহামেডান লিটারারি সোসাইটির সদস্য। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের কারণে ব্রিটিশ সরকারের নবাব উপাধিতে ভূষিত। সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৮৯৭-১৯০২ পর্যন্ত ভূপালের রাজদরবারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন। সে সময়ে ভূপালে বেশকিছু জনহিতকর কার্যক্রমের সূচনা। বিশ শতকের প্রথম দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। তৎকালীন ভারতবর্ষে মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত। মৃত্যু. কাশিয়াডাঙ্গা (বর্তমান কাশেম নগর), বর্ধমান, ১৯১৮।

আবদুল জব্বার (১৯১৯-১৯৫২)॥ জন্ম. পাঁচুয়া গ্রাম, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ, অক্টোবর ১৯১৯। ভাষা-আন্দোলনের শহীদ। স্থানীয় পাঠশালায় কিছুকাল অধ্যয়ন। পরিবারের দারিদ্র্যের কারণে

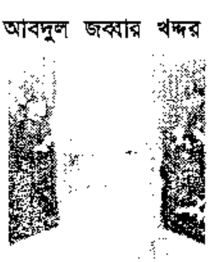
লেখাপড়া ত্যাগ করে পিতাকে কৃষি কাজে



সাহায্য প্রদান। পনের/ষোলো বছর বয়সে একদিন খেয়ালের বশবর্তী হয়ে সকলের অজান্তে গৃহত্যাগ করে ট্রেনে চেপে নারায়ণগঞ্জ আগমন। সেখানকার জাহাজ ঘাটে এক ইংরেজ সাহেবের সান্নিধ্য লাভ। সাহেবের অনুগ্রহে একটি চাকরি পেয়ে বার্মায় গমন। চাকরিসূত্রে দীর্ঘকাল বার্মায় অবস্থান। সে সময়ে ইংরেজি ভাষা রপ্ত। দশ/বারো বছর বার্মায় কাটাবার পর দেশে প্রত্যাবর্তন। আমেনা খাতুন নাম্নী এক যুবতীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। এক পুত্রের জনক হওয়ার কিছুকাল পর তাঁর শাশুড়ি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য শাশুড়িকে নিয়ে ১৯৫২-র ২০ ফেব্রুয়ারি গ্রামের বাড়ি থেকে সস্ত্রীক ঢাকায় আগমন। শাশুড়িকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। পরের দিন ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে হাজার হাজার জনতার সমাবেশ ঘটে। আবদুল জব্বারের সেই সমাবেশে যোগদান। আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালালে বুলেটবিদ্ধ হয়ে আবদুল জব্বার গুরুতর রূপে আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। ঐদিন রাতে (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) হাসপাতালে মৃত্যু। মহান রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। তাঁর শহীদ স্মৃতি উত্তরকালে বাঙালির জাতীয় চেতনা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রতকরণে দিশারি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এ চেতনা বলেই ১৯৭১-এ বাঙালিরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করে। মৃত্যু. ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

আবদুল জব্বার (?-১৯৭১)॥ জন্ম. টোলনা গ্রাম, ডুমুরিয়া, খুলনা। আইনজীবী। ১৯৩১-এ যশোর জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক, দৌলতপুর কলেজ থেকে ১৯৩৩-এ আই.এ. এবং ১৯৩৬-এ একই কলেজ থেকে বি.এ. পাস। ১৯৪০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল পাস এবং খুলনা আদালতে আইনব্যবসায় শুরু। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে পাকসেনারা তাঁকে রাতে বাসা থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে, ২৩ জুন ১৯৭১।

আবদুল জব্বার খদ্দর (১৮৯৭-১৯৭৭)॥ জন্ম.



ফেনী, ১৮৯৭। রাজনীতিবিদ। ১৯২০-এ এন্ট্রান্স পাস করে কংগ্রেসে যোগদান। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) অংশগ্রহণ। বিদেশি পোশাক বর্জন করে খদ্দর পরিধান। স্বদেশি বস্ত্র ব্যবহার করার জন্য খদ্দর পদবি লাভ। কংগ্রেস নেহরু রিপোর্ট (১৯২৬) গ্রহণ করার প্রতিবাদে ১৯২৬-এ কংগ্রেস ত্যাগ, জমিদার ও মহাজনদের শোষণ থেকে কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য কৃষক আন্দোলন পরিচালনা। ১৯৩৫-এ মুসলিম লীগে যোগদান। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলার নিযুক্ত। পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৪৯-এর ২৩ জুন ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে তা সংগঠিত করার কাজের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৯৫৪-র ৯ মার্চ ফেনী-সোনাগাজী এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। পুনরায় আওয়ামী লীগে যোগদান এবং পূর্ববঙ্গ পরিষদের চীপ হুইপ নিযুক্ত। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারির পূর্ব পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৬২-১৯৬৩-তে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে এন.ডি.এফ. (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট)-এর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। এন.ডি.এফ.-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য (১৯৬২-১৯৬৯), পি.ডি.এম. (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট)-এর নোয়াখালী জেলা কমিটির সভাপতি (১৯৬৭-১৯৬৯) ও পি.ডি.পি. (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য (১৯৬৯-১৯৭১)। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা পাকিস্তান দখলদার বাহিনীকে সহযোগিতা দানের জন্য গঠিত 'শান্তি কমিটির' (১৯৭১) কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য। সুবক্তা হিসেবে খ্যাত। সমবায় আন্দোলন এবং ব্যাংক ও বিমা ব্যবসায়ের অন্যতম সংগঠক। ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি ও ইস্টার্ন ব্যাংকি

কর্পোরেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মৃত্যু. ফেনী, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৭।

আবদুল জব্বার খান (১৯০২-১৯৮৪)॥ জন্ম. বাহের চর, বরিশাল, ১ জানুয়ারি ১৯০২। বিচারপতি ও স্পিকার। ১৯১৯-এ বরিশাল জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক ও ১৯২১-এ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ. পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৪-এ বি.এ. অনার্স (আরবি), ১৯২৫-এ এম.এ. (আরবি) ও ১৯২৭-এ বি.এল. ডিগ্রি লাভ। অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি এবং ল' পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। ১৯২৯-এ বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (জুডিশিয়াল)-এ যোগদান। বিভিন্ন সময়ে সাব-অর্ডিনেট জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ ও জেলা জজ পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৫৬-তে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত। ১৯৬২-তে এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ। রাজনীতিতে যোগদান। ১৯৬৪-তে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ (কনভেনশন)-এর পূর্ব-পাকিস্তান কমিটির সভাপতি নিযুক্ত। ১৯৬৫-র ২১ মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে বরিশাল জেলা থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ১০ জুন জাতীয় পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত। ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ সামরিক আইন জারির পূর্ব পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। কর্মজীবনে স্কুল কলেজসহ বহু সামাজিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। আবদুল জব্বার খান তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে পরিচিত। মৃত্যু. ঢাকা, ২৩ এপ্রিল ১৯৮৪।



আবদুল জোব্বার (১৯২৬-১৯৭১)॥ জন্ম. মঙ্গলবাড়ি গ্রাম, জয়পুরহাট, বগুড়া, ১৯২৬। আইনজীবী। বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ১৯৪৩-এ মেট্রিক, রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে ১৯৪৯-এ বি.এসসি. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩-তে এল.এল.বি. ডিগ্রি লাভ। এরপর বগুড়া আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। উত্তরকালে একজন দক্ষ আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন। নিঃস্বার্থ [illegible] সংস্কৃতিসেবী। মৃত্যু. ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে ১৬ মে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত

আবদুল বারী (১৮৭২-১৯৪৪)॥ জন্ম. বাবুপুর বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, ১৮৭২। কবি ও সমাজহিতৈষী। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করে শিক্ষকতা শুরু। দীর্ঘকাল নোয়াপ্পাই ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান। বহু বৎসর ঋণ সালিশি বোর্ডের চেয়ারম্যান। নোয়াখালী জেলা বোর্ডের সভ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: কারবালা (১৯১৩), ভারতের যুবরাজ, ইছালে ছওয়াব, রক্ত লেখা ইত্যাদি। মৃত্যু. ১৯৪৪।

আবদুল মওদুদ (১৯০৮-১৯৭০)॥ জন্ম. ওয়ারী গ্রাম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ১ জুন ১৯০৮। লেখক ও বিচারপতি। ১৯৩১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. ও ১৯৩২-এ এল.এল.বি ডিগ্রি লাভ। ১৯৩৬-এ মুন্সেফ নিযুক্ত। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় আগমন। জেলা সাব-জজ ও জেলা জজ হিসেবে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন। ১৯৬৭-তে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৬৮-র জুন মাসে জুডিসিয়াল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ এবং সাবেক কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের অবৈতনিক চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত। পাকিস্তানের তাহযিব ও তমদ্দুনের একজন দৃঢ় সমর্থক হিসেবে পরিচিত। ষাটের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান সরকার রেডিও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের পদক্ষেপ নিলে সরকারের সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। সুবক্তা ও মননশীল লেখক হিসেবে খ্যাত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: প্রবন্ধ ও জীবনী।ইসলাম ইউরোপকে যা শিখিয়েছে (১৯৪৭), কলেম নবী (১৯৪৯), মুসলিম মনীষা (১৯৫৫), শাহ আবদুল লতিফ ভেটাই (১৯৬৪), হজরত ওমর (১৯৬৭), মধ্যবিত্তের ক্রমবিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর (১৯৬৯); অনুবাদ।ভারতীয় মুসলমান (১৯৪৬), পৃথিবী ও পাশ্চাত্য জগৎ (১৯৬৪); ছোটগল্প।ক্রিমিনাল (১৯৬৮)। মৃত্যু. ঢাকা, ১১ [illegible] ১৯৭০



আবদুল মতিন চৌধুরী (১৯২১-১৯৮১)॥ জন্ম. নন্দনপুর গ্রাম, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ১ মে ১৯২১। শিক্ষাবিদ, গবেষক। নোয়াখালী অরুণচন্দ্র হাই স্কুল থেকে ১৯৩৭-এ প্রবেশিকা, ১৯৩৯-এ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এসসি., ১৯৪২-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে পদার্থ বিজ্ঞানে বি.এসসি.অনার্স এবং ১৯৪৩-এ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে পদার্থ বিজ্ঞানে এম.এসসি. পাস। স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ছিলেন থিসিস গ্রুপে। গবেষণা বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন অধ্যাপক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন বোস। ১৯৪৬-এ সরকারি বৃত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন, সেখানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে Atmospheric Physics-এর ওপর গবেষণা এবং উক্ত গবেষণার জন্য ১৯৪৯-এ পিএইচ.ডি. উপাধি অর্জন। পেশাগত জীবনের শুরু আবহাওয়া দপ্তরে Meteorologist হিসেবে। ১৯৫০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার নিযুক্ত। ১৯৫৬-তে সরকারি বৃত্তি পেয়ে যুক্তরাজ্য গমন, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কবেক কলেজে জে. ডি. বার্নালের অধীনে X-Ray Crystallography বিষয়ে প্রায় দু'বছর গবেষণা করার পর স্বাস্থ্যগত কারণে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় পুনরায় যোগদান। লন্ডনের অসমাপ্ত গবেষণাটি সমাপ্ত করে ১৯৬১-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয়বার পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ। ১৯৬২-তে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৬২-১৯৬৭ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ, ১৯৬৭-১৯৭০ পর্যন্ত পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের সদস্য, ১৯৭০-১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান বিজ্ঞানী ও প্রেসিডেন্টের বিজ্ঞান উপদেষ্টা। এছাড়া পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স-এর সম্পাদক, পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন অব সাইনটিস্ট অ্যান্ড সাইন্টিফিক প্রফেশন্স-এ সভাপতি এবং ব্রিটেনের রয়েল মেটিরিয়লজিক্যাল সোসাইটির ফেলো, পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার নির্বাচনী কমিটির এশীয় বিভাগের সদস্য, নেহেরু শান্তি পুরস্কার নির্বাচনী কমিটির সদস্য। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানে ক্যাম্পে আটক জীবন যাপন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন ও



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত। ১৯৭৩-১৯৭৫ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৭৫-এ সামরিক সরকার কর্তৃক তাঁকে উপাচার্যের পদ থেকে পদচ্যুত ও গ্রেফতার। প্রায় দেড় বছর কারানির্যাতন ভোগের পর মুক্তিলাভ। ১৯৭৬-এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উলকসন কলেজ-কর্তৃক ভিজিটিং ফেলোশিপ প্রদান। ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন বোসের নামে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে 'সত্যেন বোস চেয়ার' স্থাপন এবং আবদুল মতিনকে বোস অধ্যাপক পদ প্রদান। আজীবন শিক্ষা ও গবেষণা কর্মে নিয়োজিত মননশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মতিন চৌধুরী জীবনের শেষপ্রান্তে এসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯৭৮-এ 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' গঠন ও এর সভাপতি পদে দায়িত্বভার গ্রহণ। মৃত্যু. ঢাকা, ২৪ জুন ১৯৮১।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)॥ জন্ম. চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৩ আগস্ট, ১৯৪৩। কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক। ছদ্মনামঃ অশোক সৈয়দ। ঢাকায় এসে গোপীবাগে বসবাস। পরে গ্রীন রোডে স্থায়ী হন। পিতা সৈয়দ এ.



এম. বদরুদ্দোজা (১৯১০-৮৯) ছিলেন সরকারি চাকুরে। মাতা কাজী আনোয়ারা মজিদ ছিলেন গৃহিণী। স্ত্রী সায়রা সৈয়দ রানু। একমাত্র কন্যা জিনান সৈয়দ শম্পা। ১৯৫৮-এ ঢাকার নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলা বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং

১৯৬৩-তে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৬৪-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষা-জীবন শেষে তিনি সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। কর্মজীবনে তিনি শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজ, সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজে, এবং ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। দায়িত্ব পালন করেছেন ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করার পর ২০০২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত মেয়াদের জন্য তিনি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতাঃ জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৭), জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা (১৯৬৯), ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ (১৯৭৪), কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (১৯৮২), পরাবাস্তব কবিতা (১৯৮৪), পার্ক স্ট্রিটে এক রাত্রি (১৯৮৩), মাছ সিরিজ (১৯৮৪), নির্বাচিত কবিতা, আমার সনেট। উপন্যাসঃ পরিপ্রেক্ষিতের দাস-দাসী, অ-তে অজগর (১৯৮২), কলকাতা (১৯৮০), ক্ষুধা প্রেম আগুন (১৯৯৪), পোড়ামাটির কাজ, হে সংসার হে লতা; ছোটগল্পঃ সত্যের মতো বদমাশ, চলো যাই পরোক্ষে, মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা, নেকড়ে হায়েনা ও তিন পরী; প্রবন্ধঃ বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা, দশ দিগন্তের দ্রষ্টা, করতলে মহাদেশ, আমার বিশ্বাস, ছন্দ। স্মৃতিকথাঃ ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়। জীবনীঃ নজরুল ইসলামঃ কবি ও কবিতা, বেগম রোকেয়া, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, ফররুখ আহমদ, শাহাদাৎ হোসেন, জীবনানন্দ দাশ, প্রবোধচন্দ্র সেন, আবদুল গনি হাজারী, সৈয়দ মুর্তাজা আলী। জীবনানন্দ বিষয়ক গ্রন্থাবলিঃ শুদ্ধতম কবি (১৯৭২), জীবনানন্দ দাশ (১৯৯৩), জীবনানন্দ (১৯৮৪), জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৬), জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলি (১৯৮৭), জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮৯)। পুরস্কারঃ বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), একুশে পদক, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), নজরুল পুরস্কার (পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৮), নজরুল পদক (২০০১), কবি তালিম হোসেন পুরস্কার (২০০০), লেখিকা সংঘ পুরস্কার, ২০০০, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (২০০২)। মৃত্যু. ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১০।

আবদুল মালেক (১৮৯৮-১৯৬৫)॥ জন্ম. গোপীনাথপুর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১ নভেম্বর ১৮৯৮। রাজনীতিক ও কৃষক আন্দোলনের নেতা। স্কুলজীবনেই স্বদেশী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হন। ১৯২০-এ কসবা হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস করেন। আগরতলা অবস্থানকালে মোক্তারি সনদ নেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কংগ্রেসের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।



আজীবন জাতীয়তাবাদী ছিলেন। সুভাস বসুর অন্তরঙ্গ অনুরাগী ছিলেন এবং বাংলার দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেসে ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য হন। দেশের অভ্যন্তরে আজাদ হিন্দু বাহিনীর গুপ্তচর হিসেবে বাড়িতে ছাতার কারখানার অন্তরালে বিপ্লবী প্রচারণা ও সৈন্য সংগ্রহ কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। রাজদ্রোহিতার জন্য বহু বছর কারাবরণ। নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ত্রিপুরা কৃষক সমিতির প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬-এ সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত। জীবনের বাকি দিনগুলিতে কৃষকনেতা হিসেবেই সুপরিচিত ছিলেন। ১৯৫২-এ একুশের মর্মস্পর্শী ঘটনার প্রতিবাদে তাঁর আহবানে ত্রিপুররা কৃষক সমাজ একদিন কৃষিকাজ বন্ধ রাখে। ওজস্বিনী ভাষায় দীর্ঘ বক্তৃতায় অভ্যস্ত তাঁর বজ্রবাণী ছিল 'লাঙ্গল যার জমি তার'। একজন সুলেখক হিসেবে দৈনিক আনন্দবাজার যুগান্তর, নবযুগ, প্রত্যহ, সাপ্তাহিক জেলবার্তা, মাসিক নওরোজ ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ তাঁর চিন্তা ও আদর্শের স্বাক্ষর বহন করে। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। মৃত্যু. ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৯৬৫।

আবদুল মালেক উকিল (১৯২৪-১৯৮৭)॥ জন্ম. রাজাপুর গ্রাম, নোয়াখালী, ১ অক্টোবর ১৯২৪। রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯-এ বি.এ., ১৯৫১-তে এম.এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ও ১৯৫২-তে এল.এল.বি. পাস। নোয়াখালী আদালতে



আইন ব্যবসায় যোগদান। পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (৪ জানুয়ারি ১৯৪৮)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৪৮-এর মার্চের ও ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। উভয় আন্দোলনে কারানির্যাতন ভোগ। ১৯৫৩-তে আওয়ামী লীগে যোগদান। নোয়াখালী জেলা যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী অফিসের সভাপতি (১৯৫৪), নোয়াখালী সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি (১৯৫৪-১৯৬৪), নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য (১৯৬৪-১৯৭২), সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ)-এর নোয়াখালী জেলা শাখার সভাপতি (১৯৬৪-১৯৬৫), কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি (১৯৬৫-১৯৬৯), ঢাকা হাইকোর্ট বার কাউন্সিলের সদস্য (১৯৬৬-১৯৬৯) ও ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক)-র নোয়াখালী জেলার সভাপতি (১৯৬৯)। ১৯৫৪-র ৩০ মে ৯২-ক ধারা জারি করা হলে গ্রেফতার। ১৯৫৬-তে একটি উপ-নির্বাচনে প্রথম বার এবং মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় ১৯৬২ ও ১৯৬৫-তে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার নোয়াখালী জেলা থেকে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। উক্ত পরিষদেও আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের নেতা (১৯৬২-১৯৬৫) ও সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা (১৯৬৫-১৯৬৭)। ১৯৬৬-র ৪ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত। ঐ সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৬দফা কর্মসূচী উপস্থাপন। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে জেল জুলুম ভোগ। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর নোয়াখালী-৪ আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ। মুজিবনগর সরকারের সাহায্য ও পুনর্বাসন কমিটির সদস্য। স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টির জন্য এক সংসদীয় প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে নেপাল সফর। স্বাধীনতা লাভের পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী (১২ এপ্রিল ১৯৭২-১৬মার্চ ১৯৭৩) ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (১৭ মার্চ ১৯৭৩-২৭ জানুয়ারি ১৯৭৪)। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একজন সদস্য হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২) রচনায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ নোয়াখালী ১২ আসন থেকে সংসদ সদস্য ও ১৯৭৪-এর ২৮ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত। ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর সামরিক সরকার কর্তৃক সংসদ ভেঙে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উভয় পদে দায়িত্ব পালন। কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য (৭ জুন-১৪ আগস্ট ১৯৭৫)। ১৯৭৬-এ রাজনৈতিক দলবিধির (১৯৭৬) আওতায় আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। একই বছর ২৯ নভেম্বর গ্রেফতার। ১৯৭৮-এর ৫ মার্চ কাউন্সিল সভায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত। প্রায় তিন বছর এ পদে দায়িত্ব সম্পাদন। ১৯৭৯-র ১৮ ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদের নির্বাচনে নোয়াখালী-৫ ও নোয়াখালী-৮ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উভয় আসনে পরাজিত। ১৯৮১-১৯৮৭ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। ১৯৮৬-র ৭ মে নোয়াখালী-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য ও একই বছর সেপ্টেম্বর মাসে সংসদের বিরোধী দলের উপনেতা নির্বাচিত। একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ষাটের দশকে পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। ১৯৭১-এ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম পুরোধা হিসেবে কর্ম-সম্পাদন। মৃত্যু. ঢাকা, ১৭ অক্টোবর ১৯৮৭।

আবদুল মোত্তালেব মালিক, ডাক্তার (১৯০৫-১৯৭৭)॥



জন্ম. চুয়াডাঙ্গা, ১৯০৫। রাজনীতিবিদ। কলকাতা থেকে চক্ষু চিকিৎসাবিদ্যায় ডিপ্লোমা এবং ভিয়েনা থেকে চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ডিগ্রি লাভ। কলকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের চক্ষু বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। ১৯৩৬-এ মুসলিম লীগে যোগদান। বিভাগপূর্বকালে বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, নিখিল ভারত নাবিক ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি,

ইন্ডিয়ান সেইলার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং বিভাগ পরবর্তীকালে ইস্টার্ন পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও নিখিল পাকিস্তান ফেডারেশন অফ লেবারের প্রেসিডেন্ট। ১৯৫৩-১৯৫৪ পর্যন্ত আই.এল. ও'র গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। দেশবিভাগের পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য (১৯৩৬-১৯৪৭), বঙ্গীয় মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির সেক্রেটারি (১৯৪৬-১৯৪৭), বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (১৯৪৬-১৯৪৭) এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য (১৯৪৮-১৯৫৫), মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য (১৯৪৮-১৯৫৫), পাকিস্তান গণ পরিষদের সদস্য (১৯৪৭-১৯৫৩), পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের শ্রম, সমবায়, বন ও মৎস্য দফতরের মন্ত্রী (১৯৪৮-১৯৪৯) এবং পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ত, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সংখ্যালঘুবিষয়ক দফতরের মন্ত্রী (১৯৪৯-১৯৫১)। ১৯৫৫-১৯৫৮ পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডে, ১৯৫৮-১৯৬১ পর্যন্ত চীনে, ১৯৬১-১৯৬৫ পর্যন্ত ফিলিপাইনে ও ১৯৬৫-১৯৬৯ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। এরপর পুনরায় পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী। ১৯৬৯-এর আগস্ট থেকে ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের অধীনে স্বাস্থ্য, শ্রম, পূর্ত ও সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ১৯৭১-এর ৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা এবং বাঙালি নিধনে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে সাহায্য ও সহযোগিতা। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার অপরাধে বিশেষ আদালতে ১৯৭২-এ তাঁর বিচার অনুষ্ঠিত। আদালত কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দালালদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে ১৯৭৪-এ মুক্তিলাভ। মৃত্যু. ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৭।

আবদুল মোনায়েম (১৮৯২-১৯৪০)॥ জন্ম. ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, ১৮৯২। নাট্যকার। রেঙ্গুন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সম্মেলনী' নামক পত্রিকা সম্পাদনা। ত্রিশ দশকে চট্টগ্রাম থেকে সাপ্তাহিক 'জনমত' পত্রিকা সম্পাদনা প্রকাশিত গ্রন্থাবলি– নাটক: তুরস্ক বিপ্লব, সুলতানা রাজিয়া, মেবার পতন। মৃত্যু. ১৯৪০।

আবদুল মোমেন খান (১৮৯৯-১৯৭১)॥ জন্ম. হুমায়ুনপুর গ্রাম, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ, ১৮৯৯। গভর্নর। বাজিতপুরে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ১৯১৬-তে এন্ট্রান্স পাস। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১৮-তে আই.এ. এবং ১৯২০-এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ডিগ্রি গ্রহণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৪-এ পুনরায় আইন ডিগ্রি লাভ। ১৯৩৫-এ ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৪৭-এ পুনরায় জেলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত এবং ১৯৫৫ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত। পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের কার্য-নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিলর। ভাষা-আন্দোলনের বিরোধিতা (ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। ১৯৬২-তে ময়মনসিংহ–৮ নির্বাচনী এলাকা থেকে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদস্য নির্বাচিত। একই বছর জুন মাসে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৬২-র ২৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত। ১৯৬৯-এর ২৩ মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন। আইয়ুব খানের শাসনের অন্ধ অনুসারী। গভর্নর থাকাকালে আওয়ামী লীগের ছয় দফাসহ পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আদর্শ ও দ্বিজাতিতত্ত্বে আজীবন বিশ্বাসী। পাকিস্তানের আদর্শ ও তমদ্দুনের নিষ্ঠাবান ভক্ত। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি সংস্কৃতির বিরোধিতা করাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য। তাঁর প্রশাসনের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল বাঙালিদের স্বার্থবিরোধী। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণ-আন্দোলনের চাপে আইয়ুব খান তাঁকে গভর্নরের পদ থেকে পদচ্যুত করতে বাধ্য হন।



১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ১৩ অক্টোবর তাঁর বনানীস্থ বাসভবনে মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের গুলিতে আহত এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন।

আবদুল লতীফ, নবাব, খানবাহাদুর (১৮২৬-১৮৯৩)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৮২৬। শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক। কলকাতা মাদ্রাসা থেকে ইংরেজি, আরবি ও ফারসিতে সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ। ১৮৪৬-এ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা শুরু। এই সময়ে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জন্য গঠিত তদন্ত কমিশনের প্রধান মি. স্যামুলেস-এর কাজে সহযোগিতা। কমিশনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পরই কলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-আরবি অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৮৪৯-এ বাংলার তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত। ১৮৫৩-তে লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের উচ্চতর স্তরে প্রমোশন দিয়ে মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদে উন্নীত। ১৮৬২-তে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম স্তরে উন্নীত। তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় নীল চাষীদের প্রতি নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে বাংলার তৎকালীন লেফটেনান্ট গর্ভনর স্যার জন পিটার গ্রান্ট-কর্তৃক 'নীল কমিশন' (Indigo Commision) গঠন। ১৮৬২-তে লর্ড ক্যানিং-এর শাসনামলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হলে জন পিটার গ্রান্ট-কর্তৃক উক্ত সভার মৌলিক সদস্য মনোনীত। প্রাদেশিক বা ইম্পিরিয়েল আইন সভায় ঐ সময়ে একমাত্র মুসলিম সদস্য। ১৮৬৩-তে সিভিল ও মিলিটারি সার্ভিসসমূহের পরীক্ষক বোর্ডের অন্যতম সদস্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত। বাঙালি মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার ও মুসলমানদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের উৎকর্ষ ও বিকাশের পথ প্রশস্ত করার জন্য ১৮৬৩-তে 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা। ১৮৬৩-তে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠিত হলে এর 'জস্টিস অব দি পিস' নিযুক্ত এবং ১৮৭৫ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ১৮৬৫-তে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল আনীত হয় ও সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। প্রস্তাবিত এই বিলের কতিপয় ধারা মুসলিম আইনের পরিপন্থী ছিল। আইন পাস হলে মুসলমানদের ধর্মে আঘাত ও মুমলিম মহিলাদের সম্ভ্রমেও আঘাত আসতো; সুতরাং মুসলিম সমাজে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। এই পটভূমিকায় আবদুল লতীফের নেতৃত্বে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ফলে ব্যবস্থা পরিষদ ও সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনের ধারা থেকে মুসলমান সমাজকে রেহাই দেওয়া হয়। মিস মেরি কার্পেন্টারকে ১৮৬৭-তে সমাজবিজ্ঞান সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান। আলিপুরের অল্পবয়স্ক অপরাধীদের জন্য শোধনাগার (Reformatory for Juvenile Offenders) প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সহযোগিতা। ১৮৮২-তে সেন্ট্রাল টেক্সট বোর্ড কমিটির সদস্য নিযুক্ত। 'ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতি', 'অলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স', 'ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', 'বেথুন সোসাইটি' প্রভৃতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ১৮৮৪-তে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। ১৮৮৫-তে স্বল্প সময়ের জন্য ভুপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৮৭৭-এ 'খান বাহাদুর', ১৮৮০-তে 'নবাব', ১৮৮৩-তে 'সি.আই.ই.' এবং ১৮৮৭-তে ব্রিটিশ মহারানীর জুবেলি উপলক্ষে 'নবাব বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত। তুর্কি সুলতান কর্তৃক তৃতীয় শ্রেণি অর্ডার অব দি মজিদি (Order of the Mejidee of Third Class) খেতাবে ভূষিত। উনিশ শতকের ব্রিটিশ বাংলার এই বরেণ্য মুসলিম মনীষী আধুনিক শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি সমকালীন পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজকে প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার মাধ্যমে উজ্জীবিত করার জন্য দূরদর্শী সমাজহিতৈষী কর্মী হিসেবে স্মরণীয়। মৃত্যু. কলকাতা ১০ জুলাই ১৮৯৩।



আবদুল লতিফ বিশ্বাস (১৮৯২-১৯৬৪)॥ জন্ম. সোনাকন্দার ঝিটকা গ্রাম, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ, ১৮৯২। রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১৯-এ বি.এ. এবং ঢাকা ল কলেজ থেকে ১৯২১-এ এল.এল.বি. পাস। মানিকগঞ্জ ও কলকাতা বারে এবং ঢাকা হাইকোর্টে ওকালতি। ১৯২১-এ প্রজা



আন্দোলনে যোগদান। কৃষক প্রজাপার্টির অন্যতম নেতা। ১৯২৬-১৯২৮ পর্যন্ত বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এবং ১৯৩৭-১৯৪৬ পর্যন্ত বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লির সদস্য। কৃষক-শ্রমিক পার্টির (২৭ জুলাই ১৯৫৩) প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল সেক্রেটারি। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে মানিকগঞ্জ মহকুমা থেকে পূর্ববঙ্গ আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ববঙ্গীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভার রাজস্ব মন্ত্রী (৩এপ্রিল-২৯মে ১৯৫৪)। ১৯৫৫-তে পূর্ববঙ্গ পরিষদেও সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারের কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী (১১ আগস্ট ১৯৫৫-৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬)। ১৯৫৬-তে পাকিস্তান ইসলামিক রিপাবলিকের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং গণপরিষদে তা অনুমোদনের (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬) ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। আইয়ুব খাঁর সামরিক সরকার কর্তৃক তাঁর উপর 'এবডো' আইন প্রয়োগ (১৯৬০)। ১৯৬২-১৯৬৪ পর্যন্ত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (এন. ডি. এফ.) প্রভাবশালী সদস্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দখল ছিল। নয়া দৃষ্টিকোণ (১৯৬৫) তাঁর প্রকাশিক উপন্যাস। মৃত্যু. ঢাকা শহর ১৫ নভেম্বর ১৯৬৪।



আবদুল হক চৌধুরী (১৯২২-১৯৯৪): জন্ম. নোয়াজিশপুর গ্রাম, রাউজান, চট্টগ্রাম, ২৪ আগস্ট ১৯২২। ঐতিহ্যসন্ধানী গবেষক ও ইতিহাসবিদ। বংশপরিচয়ের দিক থেকে তিনি 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের রচয়িতা মধ্যযুগের কবি কোরেশী মাগন ঠাকুরের সপ্তম অধস্তন পুরুষ রাউজান স্কুলে পড়ালেখা করেছেন ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত। নোয়াজিশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। পরে ব্যবসায় এবং বিদ্যাচর্চায় আত্মনিয়োগ করে। বিশেষত ইতিহাস গবেষণায় তিনি বুৎপত্তি লাভ করেন। চট্টগ্রামের কৃতিসন্তান আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংস্পর্শে এসে তিনি চট্টগ্রাম জেলার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হন। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ' (১৯৭৫), 'চট্টগ্রামের চরিতাভিধান' (১৯৭৯), 'চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি' (১৯৮০), 'সিলেটের ইতিহাস প্রসঙ্গ' (১৯৮১), 'শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা' (১৯৮৪), 'চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা' (১৯৮৮), 'চট্টগ্রাম-আরাকান' (১৯৮৯), 'চট্টগ্রামের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৯৯২), 'প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী' (১৯৯৪), 'বন্দও শহর চট্টগ্রাম' (১৯৯৪), 'প্রবন্ধ বিচিত্রা: ইতিহাস ও সাহিত্য' (১৯৯৫) প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। চট্টগ্রাম সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে 'চট্টলতত্ত্ববিদ' উপাধি লাভ। ১৯৭১-এ তিনি চট্টগ্রামের রাউজান অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের ট্রাস্টি ছিলেন। মরণোত্তর একুশে পদক লাভ। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ২৬ অক্টোবর ১৯৯৪।

আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০)। জন্ম. সুধারাম গ্রাম, সন্দ্বীপ, নোয়াখালী, ১৬২০। কবি। এ পর্যন্ত কবির আটটি কবিতাগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে: ইউসুফ-জলিখা, লালমতী সয়ফুলমূলক, শিহাবুদ্দীন নামা, নূরনামা, নসীহৎনামা, চারি মোকাম ভেদ, কারবালা ও শহরনামা। ত্রিপুরা থেকে শুরু করে বরিশাল পর্যন্ত অঞ্চলে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এ থেকে কবির জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। 'লালমতী সয়ফুলমুলক' কবিতাগ্রন্থ উনিশ শতকের শেষভাগে মুদ্রিত হয়ে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। মাতৃভাষার প্রতি অপরিসীম দরদের জন্যে তাঁর দুটি পঙ্ক্তি প্রবাদতুল্য খ্যাতি পেয়েছে। পঙক্তি দুটি হলো: 'যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। / সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥ মাতৃভাষার মর্যাদার লড়াইয়ে এই কবির উপর্যুক্ত দুটি পঙক্তি সর্বদাই বাঙালিদের শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। মৃত্যু. ১৬৯০।

আবদুল হাকিম, খানবাহাদুর (১৯০৫-১৯৮৫)॥



জন্ম. হাজীগঞ্জ গ্রাম, মানিকগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর ১৯০৫. শিক্ষাবিদ ও লেখক. এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম. ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে আই.এ. পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. অনার্স (অঙ্ক) ও এম.এ. (অঙ্ক) ডিগ্রি লাভ। উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যান্ড গমন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কে বি.এ. অনার্স (১৯৩০) ও একই বিষয়ে এম.এ. (১৯৩৪) পাস। করটিয়া সাদত কলেজে ও কৃষ্ণনগর কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা। সরকারের শিক্ষাবিভাগে চাকরিতে যোগদান। সাবডিভিশনাল ও ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুল, স্পেশাল অফিসার অব প্রাইমারি এডুকেশন, ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুল, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রাইমারি এডুকেশন ইন বেঙ্গল, অ্যাসিটেন্ট ডিরেক্টর অব জেনারেল ইন ইস্টবেঙ্গল, ডিরেক্টর অব এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান প্রভৃতি পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৫৯-এর ৩০ জুন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামসের অধীনে চার খণ্ডে প্রকাশিত 'বাংলা বিশ্বকোষ' (১ম খণ্ড-১৯৭২, ২য় খণ্ড–১৯৭৫, তৃতীয় খণ্ড–১৯৭৩, চতুর্থ খণ্ড–১৯৭৬) সম্পাদনা করে খ্যাতি অর্জন। শিক্ষা সংক্রান্ত ও স্কুল পাঠ্য বহু গ্রন্থের প্রণেতা। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: আধুনিক শিক্ষক (১৯৩৯), গ্রামের উন্নতি (১৯৪০), শিশুর মন ও শিক্ষা (১৯৪৮) ভূগোল শিক্ষক (১৯৪৮), ইতিহাস শিক্ষক (১৯৪৮), সার্থক শিক্ষক (১৯৬০), পড়া ও লেখা শিখানো (১৯৬২), শিক্ষার সমন্বয় (১৯৬৩), বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র উপাখ্যান (১৯৬৩)। ভারত সরকারের ১৯৪৪-এ 'খানবাহাদুর' উপাধি এবং বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮২-তে একুশের পদকে ভূষিত. মৃত্যু. ঢাকা, ১৪ জুন ১৯৮৫

আবদুল হাকিম শাহ্ (১৮৩২-১৯০৪)॥ জন্ম. ভেড়াখালী গ্রাম, হরিণাকুণ্ড, ঝিনাইদহ, ১৮৩২। লোককবি। লেখাপড়ায় তেমন আগ্রহ না থাকায় বিদ্যাশিক্ষায় বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। আরবি, ফারসি ও বাংলাভাষা লিখতে পড়তে পারতেন। সংগীতের প্রতি ছিল অনুরাগ। অধিকাংশ সময় গানের আসরে কাটাতেন এবং অন্যান্য বয়াতিদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে গান গাইতেন। অন্যান্য সংগীত জানলেও ধুয়াগানের বয়াতি হিসেবে পরিচিত। আসরে গান গাওয়া ছাড়াও গান রচনা করতেন। তাঁর পির ছিল আবদুর রাহমান শাহ। এই পীরের সান্নিধ্যে এসে ফকিরি তত্ত্বে জ্ঞান লাভ। অসংখ্য গান রচনা করেছেন। মৃত্যু. ১৯০৪।

আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০)॥ জন্ম. চাড়ান গ্রাম, টাঙ্গাইল, ১৮৪৫। সাহিত্যিক, সাংবাদিক। তিনি এবং মীর মশাররফ হোসেন একই সময়ে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার এস্টেটের দুই অংশের ম্যানেজার ছিলেন। 'আহমদী' নামে একটি অসাম্প্রদায়িক পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মী। স্বদেশি আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) যোগদান করে দীর্ঘদিন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকেন। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'গাজী মিয়ার বস্তানী'-তে তিনি একটি প্রধান চরিত্র হিসেবে অঙ্কিত হয়েছেন। গ্রন্থ–কাহিনীকাব্য: উদাসী উদাসী, কিরণপ্রভা ও অরুণভাতি। মৃত্যু. ১৯১০।

আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মওলানা (১৮৮০-১৯৭৬)॥



জন্ম. ধানগড়া গ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ১২ ডিসেম্বর ১৮৮০। রাজনীতিবিদ। মক্তবে শিক্ষা গ্রহণ এবং মক্তবেই কিছুকাল শিক্ষকতা। ১৮৯৭-তে পির সৈয়দ নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে আসাম গমন। ১৯০৩-এ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের জন্য ১৯০৭-এ দেওবন্দ গমন। দুই বছর সেখানে অধ্যয়ন। আসামে প্রত্যাবর্তন। ১৯১৯-এ কংগ্রেসে যোগদানের মধ্য দিয়ে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ

এবং দশ মাস কারাদণ্ড ভোগ ১৯২৬-এ আসামে প্রথম কৃষক প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। ১৯২৯-এ আসামের ধুবড়ী জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসান চরে প্রথম কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠান। এখান থেকে নামের শেষে ভাসানী শব্দ যুক্ত। ১৯৩১-এ সন্তোষের কাগমারীতে, ১৯৩২-এ সিরাজগঞ্জের কাওরাখোলায় ও ১৯৩৩-এ গাইবান্ধায় বিশাল কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠান। ১৯৩৭-এ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান। একই বছর আসামে বাঙালি নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে 'লাইনপ্রথা' চালু হলে এই প্রথা বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪০-এ শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সঙ্গে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে (২২ ও ২৩ মার্চ ১৯৪০) যোগদান। ১৯৪৪-এ আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত। পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৪৭-এ আসামে পুনরায় গ্রেফতার। ১৯৪৮-এ মুক্তিলাভ এবং পূর্ববাংলায় আগমন। ১৯৪৯-এর ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত ও এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৪৯-১৯৫৭)। ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়ে ১৪ অক্টোবর (১৯৪৯) গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ। ১৯৫০-এর শেষের দিকে সরকারি নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন ধর্মঘট পালন ও মুক্তিলাভ। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৫২-র ৩০ জানুয়ারি ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরি হলে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত এবং এর অন্যতম প্রধান সদস্য নিযুক্ত। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন (ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)-এ সহযোগিতার জন্য গ্রেফতার। ১৬ মাস কারানির্যাতন ভোগ। পূর্ববঙ্গ পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে ১৯৫৩-র ৩ ডিসেম্বর কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও তাঁর দল নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের আহ্বায়ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন। নির্বাচন (৮-১১ মার্চ ১৯৫৪)-এ যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় অর্জন। যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা এ.কে. ফজলুল হক কর্তৃক পূর্ববঙ্গে সরকার গঠন (৪ঠা এপ্রিল ১৯৫৪) করার পর বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানীর বার্লিন যাত্রা। স্টকহলমে এ সম্মেলনে যোগদান। ৩০ মে (১৯৫৪) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ৯২-ক ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ববঙ্গে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন এবং তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ। দেশে আগমন করলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হবে বলে পূর্ববঙ্গের নবনিযুক্ত গভর্নর ইস্কান্দর মির্জার ঘোষণা। ১১ মাস লন্ডন, বার্লিন, দিল্লি ও কলকাতায় অবস্থানের পর তাঁর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে ১৯৫৫-র ২৫ এপ্রিল দেশে প্রত্যাবর্তন। পূর্ববাংলার খাদ্যজনিত দুর্ভিক্ষ রোধকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে ৫০ কোটি টাকা আদায়ের দাবিতে ১৯৫৬-র ৭ মে ঢাকায় অনশন ধর্মঘট শুরু। সরকার দাবি মেনে নিলে ২৪ মে (১৯৫৬) অনশন ভঙ্গ। একই বছর ১২ সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে মওলানা ভাসানী কর্তৃক সরকারের মার্কিন ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতির বিরোধিতা। নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ ও পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য তৎকর্তৃক সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ। ১৯৫৭-র ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনে ভাসানী 'পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি' বাতিলের দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করলে ১৮ মার্চ (১৯৫৭) আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ। একই বছর ২৫ জুলাই তাঁর নেতৃত্বে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠিত ও এর সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৫৭-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরকি আইন জারি করা হলে জেনারেল আইয়ুব খান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা ও ন্যাপসহ সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং ১২ অক্টোবর (১৯৫৭) মওলানা ভাসানীকে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার। ঢাকায় ৪ বছর ১০ অন্তরীন থাকেন। বন্দী অবস্থায় ১৯৬২-র ২৬ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত বন্যাদুর্গতদের সাহায্য, পাটের ন্যায্যমূল্য, মোহাজেরদের পুনর্বাসন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবিতে অনশন ধর্মঘট পালন। ৩ নভেম্বর (১৯৬২) মুক্তিলাভ। এন.ডি.এফ. (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট)-এর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। ১৯৬৩-র মার্চে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব

খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ একই বছর ২৪ সেপ্টেম্বর চীনের বিপ্লব দিবস (১ অক্টোবর)-এর উৎসবে যোগদানের জন্য পিকিংয়ের পথে ঢাকা ত্যাগ। চীনে সাত সপ্তাহ অবস্থান। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে তুং ও চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এর সঙ্গে পাকিস্তান ও চীনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা। ১৯৬৪-র ২৯ ফেব্রুয়ারি তৎকর্তৃক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি পুনরুজ্জীবিত ও দলের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ। একই বছর ২১ জুলাই 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (কপ) গঠনে ভূমিকা পালন। মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন (২ জানুয়ারি ১৯৬৫)-এ কপের প্রার্থী ফাতেমা জিন্নার নির্বাচনী প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ। ১৯৬৫-র ১৭ জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে আইয়ুব সরকারের পররাষ্ট্র নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। একই বছর ২৬ জুলাই তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ন্যাপের কাউন্সিল সভায় দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত। ১৯৬৬-তে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত ৬-দফা কর্মসূচির বিরোধিতা করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা। ১৯৬৭-র ২২ জুন জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের ঘোষণা করলে সরকারের সে পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্নে চীন ও রাশিয়ার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ১৯৬৭-র নভেম্বরে ন্যাপ দ্বি-খণ্ডিত হলে চীনপন্থি ন্যাপের নেতৃত্ব গ্রহণ। একই বছর ৩০ নভেম্বর ন্যাপের এ অংশের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা কর্মসূচীর প্রতি দৃঢ় সমর্থন প্রদান। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ এ মামলার সকল আসামির নিঃশর্ত মুক্তি দাবি। ৮ মার্চ (১৯৬৯) পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গমন। দেশে জনগণের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে ১০ মার্চ (১৯৬৯) পশ্চিম পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর। রাজনৈতিক সংকট মীমাংসার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আহূত গোলটেবিল বৈঠকে (২৫ ফেব্রুয়ারি-১০-১৩ মার্চ ১৯৬৯) যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে শ্রমজীবী ও চাকরিজীবীদের ঘেরাও আন্দোলনের প্রতি উৎসাহ প্রদান। এ গণ-আন্দোলনের প্রচণ্ডতার মুখে আইয়ুব সরকারের পতন (২৬ মার্চ ১৯৬৯)-এরপর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলে 'ভোটের আগে ভাত চাই', দেশে 'ইসলামিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব' সংঘটন, 'ইসলামিক সমাজতান্ত্রিক' কায়েম প্রভৃতি দাবি উপস্থাপন। ১৯৭০-এর ৬-৮ আগস্ট পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা সমাধানের দাবিতে সন্তোষে অনশন ধর্মঘট পালন। নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সে মোতাবেক সত্তরের ডিসেম্বরের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ন্যাপ প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিল। নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে ১২ নভেম্বর (১৯৭০) পূর্ব-পাকিস্তানের উপকূল অঞ্চলে এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় হলে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ কাজে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন থেকে ন্যাপ প্রার্থীরা সরে দাঁড়ান। ৪ ডিসেম্বর (১৯৭০) ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় সভাপতির ভাষণ দানকালে 'স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তান' দাবি উত্থাপন। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন (৩-২৫ মার্চ ১৯৭১)-এর প্রতি সমর্থন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে ভারত গমন। মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। ১৯৭২-এর ২২ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন। ২৫ ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক 'হক কথা' প্রকাশ। 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি'র (১৯৭২) তীব্র বিরোধিতা। মুজিব সরকারের ব্যাংক বীমা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ নীতি ও ১৯৭২-এর সংবিধানের প্রতি সমর্থন। ১৯৭৩-এর ১৫-২২ মে খাদ্যের দাবিতে ঢাকায় অনশন ধর্মঘট পালন। ১৯৭৪-এর ৮ এপ্রিল 'হুকুমতে রাব্বানিয়া' সমিতি গঠন। একই বছর জুন মাসে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে সন্তোষে গৃহবন্দী। খোন্দকার মোশতাক আহমদের সরকার (১৫ আগস্ট-৩ নভেম্বর ১৯৭৫) ও মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকার (৭ নভেম্বর ১৯৭৫-২৯ মে ১৯৮১)-এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ১৯৭৬-এর ১৫ মে ফারাক্কা মিছিলের নেতৃত্ব দান। একই বছর ১ অক্টোবর তাঁর নেতৃত্বে 'খোদাই খিদমতগার' সংগঠন গঠিত। দেশের নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির

জন্য সারা জীবন সংগ্রাম পরিচালনা। সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের আপসহীন সংগ্রামী। দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের মানসে দীর্ঘকাল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালান। বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন। দেশের মানুষের কাছে তিনি 'মজলুম জননেতা' হিসেবে পরিচিত। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন পৃষ্ঠপোষক হিসাবে খ্যাত। কাগমারীতে 'আফ্রো এশিয়া সাংস্কৃতিক সম্মেলন' (৯-১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭) অনুষ্ঠান তাঁর জীবনের এক অমর কীর্তি। প্রকাশিত গ্রন্থ: দেশের সমস্যা ও সমাধান (১৯৬২), মাও সে তুং-এর দেশে (১৯৬৩)। মৃত্যু. ঢাকা, ১৭ নভেম্বর ১৯৭৬।

আবদুল হালিম চৌধুরী (১৯১৮-১৯৯০)॥ জন্ম. মির্জাপুর স্ট্রিট, কলকাতা, ১৯১৮। সংগীতশিল্পী। পৈতৃক নিবাস জয়পাড়া গাজীকান্দা গ্রাম, দোহার, ঢাকা। কলকাতার এক মার্চেন্ট অফিসের একাউনটেন্ট আবদুল কাদের চৌধুরী তাঁর



পিতা। বাল্যকালে মায়ের কণ্ঠে গজলের সুর শুনে গানের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। কলকাতা মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হন (১৯৩৪)। পরীক্ষায় ফেল করায় পিতা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের বাসায় থাকেন। এ ঘটনার কিছুকাল পরে প্রথমে তাঁর মা, পরে বাবা মারা যান। জীবিকা নির্বাহের জন্য এক প্রেসে কম্পোজিটরের কর্ম গ্রহণ। একদা কলকাতার চাঁদনিচকে ঈদের চাঁদরাতে এক গানের অনুষ্ঠানে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের 'খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে' ইসলামিক গানটি গেয়ে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন। তাঁর সংগীতের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা সবর আলী তাঁর আহার, বাসস্থান ও গান শেখার ব্যবস্থা করে দেন। সুনীল দের কাছে রাগ সংগীতে ও মাধব ব্যানার্জীর কাছে তবলায় তালিম গ্রহণ (১৯৩৪-১৯৩৫)। মাধব ব্যানার্জীর সহায়তায় কলকাতার মালেদের জমিদারের বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের এক পালায় কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ লাভ। অনুষ্ঠানের রাতে তাঁর সুরেলা কণ্ঠে কীর্তন শুনে জমিদার পত্নী তাঁর প্রতি অভিভূত হয়ে তাঁকে তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় দেন। জমিদার বাড়িতে জমিদারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ই ওস্তাদ বয়েজ নাথের কাছে তিন বছর সংগীতশিক্ষা গ্রহণ। কবি তসের আলীর সুপারিশে 'মেখোলা রেকর্ডিং কোম্পানিতে' হারমোনিয়াম বাদকের চাকরি লাভ। কালীপদ চক্রবর্তী নামে একজন কীর্তনিয়ার কাছে কীর্তন ও রামপ্রসাদী গানের তালিম গ্রহণ। এ সময়ে বিখ্যাত দোতারাবাদক কানাইলাল শীল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পল্লীগীতি আব্বাসউদ্দীন আহমদের স্নেহ লাভ। হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানি থেকে কবি তসের আলীর দু'খানি গান 'আরে ও আল্লা কাদের গণি' ও 'খোদার নামে কোরবান হয়ে' আবদুল হালিম চৌধুরীর কণ্ঠে রেকর্ডিং হয়ে বেরোলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন (১৯৩৭)। কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন। ১৯৪০-১৯৪৩ পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের সংগীতশিল্পী। ১৯৪২-এ খালাতো বোন শামসুন নাহার বেগমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৪৩-এ কলকাতায় 'সঙ পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে' গায়ক হিসেবে চাকরি লাভ। এ সময়ে কবি জসীমউদদীনের বহু গানে কণ্ঠদান। কবির দু'খানি গান 'রসুল নামে কে এলো মদীনায়' ও 'নবী দীনের রসুল, ওই নাম হয় না যেনো ভুল' তাঁর কণ্ঠে রেকর্ডিং। সঙ পাবলিসিটি বিভাগের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় 'মেগাফোন গ্রামোফোন রেকর্ডিং কোম্পানি'তে ট্রেনার হিসেবে যোগদান (১৯৪৫)। এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯৪৬ এর অক্টোবর মাসে ঢাকা বেতারকেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পী হিসেবে যোগদান। ১৯৬০-১৯৬৫ পর্যন্ত 'ভয়েস অব আমেরিকার' বাংলা অনুষ্ঠানের সুরকার এবং ১৯৬৬-১৯৭২ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পী হিসেবে দায়িত্ব পালন। আধুনিক গান, পল্লীগীতি, মারফতি, মুরশিদি, নজরুল সংগীত, গজল, হামদ, না'ত, কোরাস গান ও বাংলা কাওয়ালির খ্যাতনামা গায়ক ও সুরকার। 'জানি তুমি যাবে চলে', 'স্বপন ফুরায়ে যায়', 'আকাশের এতো নীল', 'আজো মোর মনে পড়ে', 'যদি কোন দিন শোন ওগো তুমি', 'উতল বাদল হাওয়া', 'চাঁদ ছিল জেগে রাতের মিনারে',

'প্রেমের আখরে যে নাম লেখিছি' প্রভৃতি আধুনিক গানে সুর সংযোজন করে কণ্ঠদান। তাঁর সুর করা 'জিন্দেগী বরবাদ করে দে' গজলটি বাংলা সংগীত জগতের এক অমূল্য সম্পদ। তৎ কর্তৃক সুর আরোপিত হামদ 'নিয়ে চলো খোদা মানুষেরে তুমি' এবং না'ত 'ওগো মদিনা মনওয়ারা' ধর্মানুরাগীদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। 'জাগো দীপ্ত প্রাণ' শীর্ষক জনপ্রিয় কোরাসটির সংগীত পরিচালক। 'বন্ধু মোরে কয়া যাও' (শিল্পী মমতাজ আলী খান), 'একলা কেন শুকতারাগো' (শিল্পী আবদুল আলীম), 'মনে যদি ছিল রে বন্ধু যাইবারে ছাড়িয়া' (শিল্পী আবদুল আলীম) প্রভৃতি জনপ্রিয় পল্লীগীতিতে সুরারোপ। বাংলা কাওয়ালি গান জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। 'এই তো জীবন' ছায়াছবির সংগীত পরিচালক। 'গোধূলির পথে' ছবির গানে কণ্ঠদান। 'রাজা এলো শহরে' ও 'শীত বিকেল' ছবিতে অভিনয়। সংগীতে অবদান রাখায় 'একুশের পদক' লাভ (১৯৮১)। মৃত্যু. ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি ১৯৯০।

আবদুল হামিদ চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৬৮)॥ জন্ম ময়মনসিংহ, ১৮৮৮। রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী। পৈতৃক নিবাস নাগবাড়ি, টাঙ্গাইল। ভূ-স্বামী পরিবারে জন্ম। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ। ৪০ বৎসর ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের সদস্য এবং ঐ সময়ে ভাইস-চেয়ারম্যান ও পরে চেয়ারম্যান। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল বোর্ডের প্রথম সভাপতি। ১৯৩৬-এ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগ পুনর্গঠন করলে এবং ময়মনসিংহে চার সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল অফ অ্যাকশন গঠিত হলে তার সদস্য এবং মুসলিম লীগের আজীবন সদস্য। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য, ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত আইনসভার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট এবং বৎসরাধিককাল প্রেসিডেন্ট। অবিভক্ত বাংলা ও আসামের আইন পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে দু'বার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আজমীরের দরগা কমিটির সদস্য। ১৯৫১-তে কলকাতায় ডেপুটি হাই কমিশনারের দায়িত্ব পালন। এর আগে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের ডিরেক্টর। ১৯৬২-তে প্রথম বার এবং ১৯৬৫-তে দ্বিতীয়বার পূর্ব-পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর পুত্র। মৃত্যু. ঢাকা, ১৯৬৮

আবদুল হালীম গযনবী, স্যার (১৮৭৯-১৯৫৬)॥



জন্ম. দেলদুয়ার গ্রাম, টাঙ্গাইল, ১৮৭৯। রাজনীতিবিদ, সমাজ হিতৈষী। শিক্ষাজীবন মূলত অতিবাহিত হয় বিদেশে। বিখ্যাত জমিদার। দেশের নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলনে অংশগ্রহণ। নিজস্ব মতামতের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। সেজন্য ইংরেজরা তাঁকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্যার আবদুল করীম গযনবী থেকে পৃথক করার জন্য 'ভুল গযনবী' আখ্যা দেন। প্রথমে কংগ্রেসের সদস্য। পরে ১৯০৬-এ সুরাট কংগ্রেস সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নিয়ে মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেস ত্যাগ। ১৯২৬-১৯৪৫ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি বৎসর ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য। ১৯২৯-এ নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৩০-১৯৩২ পর্যন্ত গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য। জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সদস্য হিসেবে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিতে অনড় ভূমিকা পালন। বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য, বণিক সভার চেয়ারম্যান, কলকাতার শেরিফ। মৃত্যু. ১৯৫৬।

আব্দুল জব্বার খান (১৯১৫-১৯৯৩)॥ জন্ম. দফরপুর গ্রাম, গোয়ালপাড়া, আসাম, ১৫ এপ্রিল, ১৯১৫। পৈতৃক নিবাস উত্তর মসদগাঁও, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ। চলচ্চিত্রকার, প্রযোজক, পরিবেশক, স্টুডিও নির্মাতা, নাট্যকার, অভিনেতা, কাহিনীকার, সংগঠক। পিতা হাজী মোহাম্মদ জমশের খান, মাতা আববান খাতুন। আসামের ধুবড়ী এলাকায় তাঁর বাবা পাটের ব্যবসায় করতেন। সেখানেই স্কুলে থাকতেই জড়িয়ে পড়েন নাটকের সঙ্গে। পওে প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'সিন্ধু বিজয়' নাটকেও অভিনয়। নবম-দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই নাটকের মূল চরিত্রে অভিনয়। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' এবং 'শাপমুক্তি' চলচ্চিত্রের জন্য নির্বাচিত হলেও পিতার অনুমতি না পাওয়ায় সমবভপর হয়নি। 'সমাজপতি' ও 'মাটির ঘর' নাটকে অভিনয় করে স্বর্ণপদকলাভ। গৌহাটিতে পরিচালনা করেন 'টিপু সুলতান'। ১৯৪১-এ

আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে চাকরিতে যোগদান। ১৯৪৯-এ ঢাকায় 'কমলাপুর ড্রামাটিক এসোসিয়েশন' গঠন। এ সংগঠনের উদ্যোগে তিনি 'টিপু সুলতান' ও 'আলীবর্দী খান' নাটক মঞ্চায়ন। 'ঈশাখাঁ' (১৯৫০), 'প্রতিজ্ঞা' (১৯৫১), 'ডাকাত' (১৯৫৩), 'জগদীশ' (১৯৫৯) রচনা। ১৯৫৬-এ তার রচিত নাটক 'ডাকাত' (পরে উপন্যাস) অবলম্বনে তৈরি করেন 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্র। 'মুখ ও মুখোশ'ই এদেশে তৈরি প্রথম সবাক চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রের পরিচালক ও অভিনেতা। পরে 'জোয়ার এলো' (১৯৬২), উর্দুতে 'নাচঘর' (১৯৬৩), 'বনসারি' (১৯৬৮), 'কাচ কাটা হীরা' (১৯৭০), 'খেলারাম' (১৯৭৩) চলচ্চিত্র পরিচালনা। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও পরিবেশনার সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জুরি বোর্ড, অনুদান কমিটিত, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, ফিল্ম ইন্সিটিউট ও আর্কাইভের সদস্য। মৃত্যু. ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩।

আবদুল্লাহ আল মামুন (১৯৪২-২০০৮): জন্ম. আমড়াপাড়া, জামালপুর, ১৩ জুলাই ১৯৪২। অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক, চলচ্চিত্রকার। পিতা অধ্যক্ষ আব্দুল কুদ্দুস এবং মাতা ফাতেমা খাতুন। ১৯৬৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে এমএ পাস। বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে যোগ দিয়ে অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপক ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক (১৯৯১-২০০১) এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক (২০০১)। রচিত নাটক: **শপথ** (১৯৬৪), **সুবচন নির্বাসনে** (১৯৭৪), **এখন দুঃসময়** (১৯৭৫), **এবার ধরা দাও** (১৯৭৭), **শাহজাদীর কালো নেকাব** (১৯৭৮), **চারদিকে যুদ্ধ** (১৯৮৩), **এখনও ক্রীতদাস** (১৯৮৪), **কোকিলারা** (১৯৯০), **মেরাজ ফকিরের মা** (১৯৯৭)। উপন্যাস: **মানব তোমার সারা জীবন** (১৯৮৮), **হায় পার্বতী** (১৯৯১), **খলনায়ক** (১৯৯৭)। নাট্যসংগঠন থিয়েটার-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। নাটক ছাড়াও নির্মাণ করেছেন চলচ্চিত্র, টিভি সিরিয়াল। শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক' উপন্যাসের ধারাবাহিক নাট্যরূপের পরিচালক ও প্রযোজক হিসেবে তিনি পান প্রবাদপ্রতিম খ্যাতি। পরিচালিত চলচ্চিত্র: **সারেং বৌ** (১৯৭৮), **সখী তুমি কার**, **এখনই সময়**, **জোয়ারভাটা**, **শেষ বিকেলের মেয়ে**। পুরস্কার: নাটকের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৮), প্রথম জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে দু'বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং একুশে পদক (২০০০)। মৃত্যু. ঢাকা, ২১শে আগস্ট, ২০০৮।



আবদুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দী, স্যার (১৮৭০-১৯৩৫)॥ জন্ম. মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ১৮৭০। পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ, লেখক। ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৯৮-তে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. ও প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে আরবিতে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৮-এ মুসলিম আইনে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। লন্ডনের গ্রেজ ইন থেকে বার অ্যাট-ল ডিগ্রি লাভ। ফ্রান্স, জার্মান, অস্ট্রিয়া, কনস্ট্যানটিনোপল ও কায়রোতে অধ্যয়ন। ১৯২৬-এ ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ব্যবস্থাপক পরিষদে কেন্দ্রীয় মুসলিম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। নিখিল ভারত মুসলিম লেজিসলেটর সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও জয়েন্ট সেক্রেটারি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯১০-১৯২৬) ও ডেপুটি প্রেসিডেন্ট (১৯২৩-১৯২৬)। ১৯৩৪-এ নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির প্রার্থী হিসাবে পরিষদ সদস্য নির্বাচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যক্ষ ও পরে ঠাকুর আইন অধ্যাপক (১৯১১) রাজনৈতিক মতবাদের কারণে অধ্যাপনা ত্যাগে বাধ্য করা হয়। লন্ডন প্যান ইসলামিক সোসাইটির ও লন্ডনে মসজিদ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারি (১৯০৯)। কলকাতা খেলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট (১৯২৪)। মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান (১৯২০-১৯২৩)। **নবনূর**, **কোহিনূর** প্রভৃতি বাংলা সাময়িকপত্রের লেখক। মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী সম্পাদিত সাপ্তাহিক হাববুল মতীন পরিত্রকার ইংরেজি সংস্করণের সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: **দি সেইংস অব মুহম্মদ**, **ফার্স্ট স্টেপস ইন মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স**, **মহাম্মাডান ল অব ম্যারেজ**, **দি বিউটিজ অব ইসলাম**, **দি ওয়াকফ্ অব মুভেবলস**,

শাহ আলম নামা (হিস্টোরি অব দি এম্পারর শাহ আলম), হিস্টোরি অব মুসলিম লিগ্যাল ইনস্টিটিউশন্স (১৯১১) ইত্যাদি। মৃত্যু. ১৩ জানুয়ারি ১৯৩৫।

আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন (১৯৩০-১৯৯৮)॥ জন্ম. ফুলবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, ১ জানুয়ারি ১৯৩০। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞান লেখক, শিশুসাহিত্যিক, সচিব। আবদুল্লাহ আল-মুতী নামেই পরিচিত। বাবা শইখ শরফুদ্দীন এবং মাতা হালিমা শরফুদ্দীন।



১৯৪৫-এ ঢাকার মুসলিম হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় কলকাতা বোর্ডে ২য় স্থান। ১৯৪৭-এ ১১তম স্থান নিয়ে আইএ পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় সম্মানসহ স্নাতক হন ১৯৫২ সালে। ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়তার কারণে দ্বিতীয় শ্রেণি লাভ করলেও পরের বছর প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০-এ শিক্ষায় এমএ এবং ১৯৬২-এ পিএইচ.ডি. লাভ। অভিসন্দর্ভ-র শিরোনাম `Changes in Pakistan with Special References to High School Science Education'. লেখালেখি শুরু ছাত্রজীবন থেকেই। ১৯৪৭-এ 'মুকুল ফৌজ' আন্দোলনে যোগ দিয়ে পরবর্তী বছরে 'মুকুল' নামে কিশোর পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ। কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইত্তেফাক, আজাদ, মোহাম্মদী পত্রিকার নিয়মিত লেখক। জাতীয় শিশু-কিশোর সংস্থাসহ নানা সংঠনের উপদেষ্টা। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ (১৯৮৮-৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা (১৯৮৬-৯০) ও বিজ্ঞান শিক্ষা সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন। প্রথম ঢাকা মহাকাশ উৎসব 'বেক্সিমকো স্পেসফেস্ট ১৯৯৬'-এর প্রধান উপদেষ্টা, বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের দশম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন কমিটির চেয়ারম্যান (১৯৯৮), দ্বিতীয় ঢাকা মহাকাশ উৎসব 'স্পেসফেস্ট ১৯৯৯'-র উপদেষ্টা। ঢাকায় প্রস্তাবিত স্পেস সেন্টারের প্রধান উপদেষ্টা, মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান তথ্যকেন্দ্র ও গ্রন্থাগারের (১৯৯৭-৯৯) উপদেষ্টা। জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা সংস্কার ও আধুনিকরণের কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। যৌবনে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৪৮ ও ১৯৫৪-এ গ্রেফতার বরণ। কর্মজীবন শুরু করেন রাজশাহী কলেজে শিক্ষক হিসাবে। ১৯৭৫-এ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব হিসেবে যোগদান। শিক্ষা প্রশাসন ও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব পদ থেকে অবসর গ্রহণ ১৯৮৬ সালে। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিশু ও বিজ্ঞান-বিষয়ক: এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে (১৯৫৫), অবাক পৃথিবী (১৯৫৫), আবিষ্কারের নেশায় (১৯৬৯), রহস্যের শেষ নেই (১৯৬৯), বিজ্ঞান ও মানুষ (১৯৭৫), জানা-অজানার দেশে (১৯৭৬), সাগরের রহস্যপুরী (১৯৭৬), আয় বৃষ্টি ঝেঁপে (১৯৮০), এ যুগের বিজ্ঞান (১৯৮১), মেঘ বৃষ্টি রোদ (১৯৮১), ফুলের জন্য ভালোবাসা (১৯৮২), সোনার এই দেশ (১৯৮৩), তারার দেশের হাতছানি (১৯৮৪), বিচিত্র বিজ্ঞান (১৯৮৫), বিপন্ন পরিবেশ (১৯৮৫), প্রাণলোক: নতুন দিগন্ত (১৯৮৬), বিজ্ঞানের বিস্ময় (১৯৮৬), টেলিভিশনের কথা (১৯৮৮), বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা (১৯৮৮), কীটপতঙ্গের বিচিত্র জগত (১৯৮৮), কাজী মোতাহার হোসেন (১৯৮৮), বিজ্ঞান এগিয়ে চলে (১৯৯১), চোখ মেলে দেখ (১৯৯২), ফারিয়া-নাদিয়ার মজার সফর (১৯৯৬), পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে (১৯৯৬), আজকের বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ (১৯৯৬), মহাকাশে কী ঘটছে (১৯৯৭); শিক্ষা-বিষয়ক: শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৭৫), শিক্ষা ও বিজ্ঞান-নতুন দিগন্ত (১৯৯১), আমাদের শিক্ষা কোন পথে (১৯৯৬); অনুবাদ: আকাশের সঙ্গে মিতালী (১৯৫৬), মহাবীর পরমাণু (১৯৫৭), রহস্যটা জানতে হবে (১৯৫৮), সেকালের জীবজন্তু (১৯৫৮), তাপ (১৯৫৮), আলো (১৯৬১), শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন (১৯৬৫), বিশ্বসৃষ্টির মালমসলা (১৯৬৫), পরমাণুর রাজ্যে (মিনা শরফুদ্দীনের সঙ্গে, ১৯৭১)। সম্পাদনা: আধুনিক বিজ্ঞান (১৯৬৮), সাধারণ বিজ্ঞান ২য় খণ্ড (১৯৮৩), বাংলাদেশের বিজ্ঞানচিন্তা (১৯৮৮), আজকের বিজ্ঞান, সংবাদপত্রে বাংলাভাষা (যুগ্ম-সম্পাদনা, ১৯৮৯), Education for All (1968), Education is Progress (1969), Improvement of Teacher Education (1969), Cooperation of Education, Science and Culture in

South Asian Region (Joint Editor. 1987). Role of UNESCO in Scientific and Technological Development (Joint Editor. 1988), বাংলা একাডেমীর বিজ্ঞান বিশ্বকোষ (প্রধান সম্পাদক, ১ম খণ্ড), মাসিক কম্পিউটার বিচিত্রা (প্রধান সম্পাদক), শিশু একাডেমীর শিশুবিশ্বকোষ (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ)। পুরস্কার: শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য টিকিউএ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৬৯), ইউবিএল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯), ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৫৯), সাহিত্যে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৫), ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কার (১৯৮৩), একুশে পদক (১৯৮৫), স্বাধীনতা পদক (১৯৯৫), শিশু একাডেমী পুরস্কার, কুদরাত-এ-খুদা স্বর্ণপদক ১৯৭৯, শহীদুল্লা কায়সার স্মৃতি পুরস্কার ১৯৮২, আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৫, কাজী মাহবুবউল্লাহ স্বর্ণপদক ১৯৮৭, অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার ১৩৮৮, ১৩৯৪, ১৪০২, ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী পুরস্কার ১৪০০, আইডিই পদক ১৯৯৩। মৃত্যু. ঢাকা, ৩০ নভেম্বর ১৯৯৮।

আবদুর সবুর খান (১৯০৮-১৯৮২)॥ জন্ম. আট্টাকা, ফকিরহাট, বাগেরহাট ১০ অক্টোবর ১৯০৮। রাজনীতিবিদ। ১৯২৯-এ খুলনা জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক এবং ১৯৩৩-এ কলকাতা সিটি কলেজ থেকে বি.এ. পাস। ১৯৩৭-এ মুসলিম লীগে যোগদান এবং ১৯৩৮-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৪৬-এ মুসলিম লীগের মনোনয়নে খুলনা থেকে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত। পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৪৮-এ পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক। ১৯৫৪-র মার্চের পূর্ববঙ্গ পরিষদের নির্বাচনে খুলনা থেকে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর নিকট পরাজিত। ১৯৬২-তে খুলনা-২ আসন থেকে 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রথায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছরের জুন মাসে আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় যোগাযোগ মন্ত্রী হিসেবে যোগদান এবং প্রায় আট বছর এই দায়িত্ব পালন। ১৯৬৩-র ১৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের নেতা নির্বাচিত। ১৯৬৩-র ৫ এপ্রিল পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্ট এক আপিল মামলার রায়ে মন্ত্রীদের জাতীয় পরিষদের সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করলে জাতীয় পরিষদের সদস্য পদ হারান। ১৯৬৫-র ৬ জুন দ্বিতীয়বার জাতীয় পরিষদের নেতা নির্বাচিত। ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকারের পতন ঘটলে মন্ত্রিত্ব থেকে পদচ্যুত। ১৯৬৯-১৯৭১-পর্যন্ত মুসলিম লীগ (কাইয়ুম গ্রুপ)-এর সাধারণ সম্পাদক। আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচি, শেখ মুজিবুর রহমানের (আওয়ামী লীগের সভাপতি) নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ববাংলার স্বাধিকার ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে খুলনা-৪ ও ৬ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নিকট পরাজিত। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা-বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিপক্ষে প্রচার অভিযান চালান। দেশ স্বাধীন (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) হওয়ার পর ১৯৭২-এর ২২ ফেব্রুয়ারি দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার অপরাধে দালাল আইনে গ্রেফতার। পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগীদের বঙ্গবন্ধুর সরকার ক্ষমা প্রদর্শন করলে ১৯৭৩-এর ডিসেম্বর মাসে মুক্তিলাভ। ১৯৭৬-এর ৮ আগস্ট 'বাংলাদেশ মুসলিম লীগ' নামে সাবেক মুসলিম লীগ পুনরুজ্জীবন এবং মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৭৯-এর ১৮ ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা-৬, ৮ ও ১৪ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ। মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত। সুবক্তা ও দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান এবং কৃতি ফুটবলার। অবিভক্ত বঙ্গে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের একজন দক্ষ খেলোয়াড়। মৃত্যুর পূর্বে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি একটি জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট গঠন করে তার ওপর ন্যস্ত। মৃত্যু. ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি ১৯৮২।



আবদুস সাত্তার (১৯০৬-১৯৮৫)॥ জন্ম. দাড়কা গ্রাম, বোলপুর, বীরভূম, ১৯০৬ বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. (১৯২৮) ও বি.এল. (১৯২৯) পাস। কলকাতা জজকোর্টে আইন

ব্যবসায় যোগদান এবং একই সঙ্গে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক প্রজা পার্টির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ১৯৩৯-এ কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, ১৯৪০-১৯৪২-এ কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাইবুন্যালের অ্যাসেসার ও ১৯৪৫-এ কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা (১৪ আগস্ট ১৯৪৭)-র পর ১৯৫০-এ কলকাতা থেকে ঢাকায় আগমন। ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯৫৩-র ২৭ জুলাই শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠিত হলে তাতে যোগদান। ১৯৫৫-র জুন মাসে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৬-র ৯ জানুয়ারি গণ পরিষদের করাচি অধিবেশনে খসড়া শাসনতন্ত্র বিল (১৯৫৬) উত্থাপন করা হলে তার প্রতি জোরালো সমর্থন জ্ঞাপন ও শাসনতন্ত্র বিল পাসের পক্ষে ভোটদান। আই.আই. চুন্দ্রীগড়ের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রী (১৯৫৭), ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৫৭-১৯৬৮), পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি (১৯৬৮-১৯৬৯) ও পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (১৯৬৯-১৯৭২)। ১৯৭৩-এর শেষের দিকে পাকিস্তান থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। সরকারি চাকরিতে যোগদান। বাংলাদেশ জীবন বীমা কর্পোরেশনের পরিচালক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান (১৯৭৩-১৯৭৪) ও সাংবাদিকদের বেতন বোর্ডের চেয়ারম্যান (১৯৭৪-১৯৭৫)। ১৯৭৫-এর ১০ নভেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েমের বিশেষ সহকারী নিযুক্ত। আইন ও পার্লামেন্টারি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন। ১৯৭৭-এর ৩ জুন সামরিক প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক তাঁকে বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত। সামরিক সরকারের পক্ষে জনসমর্থন জোগানোর জন্য ১৯৭৮-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর নেতৃত্বে 'জাতীয়বাদী গণতান্ত্রিক দল' (জাগদল) গঠিত ও দলের আহ্বায়ক নিযুক্ত। একই বছর ১ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল' (বিএনপি) গঠিত হলে জাগদলের অস্তিত্ব বিলোপ করে তাতে যোগদান। এ নবগঠিত দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর একদল সদস্যের হাতে নিহত হলে ১৯৮১-র ৩ মে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ। ১৫ নভেম্বর (১৯৮১) প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। ১৯৮২-র ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দলের সভাপতি নির্বাচিত। একই বছর ১১ ফেব্রুয়ারি প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে তৎকর্তৃক মন্ত্রিসভা বাতিল। পরের দিন ১২ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন। ২৪ মার্চ (১৯৮২) এক সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত। সামরিক শাসন থেকে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয়। মৃত্যু. ঢাকা, ৫ অক্টোবর ১৮৮৫।

আবদুস সাত্তার (১৯১৮-১৯৭৯)। জন্ম. পাঁচখাইন গ্রাম, রাউজান থানা, চট্টগ্রাম, ১ মার্চ ১৯১৮। রাজনীতিবিদ। ১৯৩৩-এ রাউজানের মহামুনি হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাস। স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের সাক্ষাৎ লাভ এবং অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ। ১৯৩৪-এ ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজরে পড়ে কারাবরণ। বহরমপুর জেল থেকে পরীক্ষা দিয়ে আই.এ. পাস এবং ১৯৩৭-এ জেল থেকে মুক্ত হয়ে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বি.এ. পাস। ১৯৩৯-এ চট্টগ্রাম কৃষক সম্মেলনে নেতৃত্ব দান। এ বছরই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চট্টগ্রাম জেলা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হলে সভ্য নির্বাচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রগতিবাদীদের ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮-এ গ্রেফতার। জেলের অভ্যন্তরে রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘটে ৫৮ দিন অনশন পালন। ১৯৫৪-তে মুক্তিলাভ। ১৯৫৮-তে সামরিক শাসন জারি হলে আত্মগোপন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে আগরতলাস্থ মনুবাজার শরনার্থী শিবিরের পরিচালক নিযুক্ত। বাংলাদেশ কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব পালন। সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত। মৃত্যু. ১১ অক্টোবর ১৯৭৯

আবদুস সালাম (১৯১০-১৯৭৭)॥ জন্ম. দক্ষিণ ধর্মপুর গ্রাম, ছাগলনাইয়া, ফেনী, ১৯১০। সাংবাদিক। ফেনী হাই স্কুল থেকে ১৯২৬-এ মেট্রিক, চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯২৮-এ আই.এসসি., কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৩১-এ ইংরেজিতে বি.এ. (অনার্স) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২-এ ইংরেজিতে এম.এ. (প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান) ডিগ্রি লাভ। ফেনী কলেজের ইংরেজির প্রভাষকরূপে কর্মজীবন শুরু। পরে সরকারের আয়কর বিভাগ, সিভিল সাপ্লাই দফতর এবং অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস-এ কর্মকর্তা পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৪৯-এ সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ এবং 'পাকিস্তান অবজারভার' (১৯৪৯) এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান। ১৯৫০-এর ৩ জুন উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। বাংলা ভাষার সমর্থনে এবং ভাষার প্রশ্নে সরকারি নীতির বিরোধিতা করে ১৯৫২-র ১২ ফেব্রুয়ারি 'অবজারভার'-এ তীক্ষ্ণ ও জোরালো সম্পাদকীয় প্রকাশ করলে ঐ দিনই সরকার কর্তৃক পত্রিকার প্রকাশনা বাতিল এবং পরের দিন ১৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে গ্রেফতার। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। ফেব্রুয়ারির (১৯৫২) ভাষা-আন্দোলনে ভূমিকা রাখায় গ্রেফতার ও কারানির্যাতন ভোগ। ১৯৫৪-র মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে ফেনী উত্তর আসন থেকে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। যুক্তফ্রন্ট সরকার 'অবজারভার' পুনরায় প্রকাশের অনুমতি দান করলে রাজনীতি ত্যাগ এবং 'অবজারভার'-এর সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ। ১৯৬৩-১৯৬৪ পর্যন্ত পাকিস্তান সংবাদপত্র-সম্পাদক পরিষদ এর সভাপতি। এ সময়ে আইয়ুব সরকারের 'প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন অ্যাক্ট' বাতিল এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে (২২ জুন ১৯৬৭) 'অবজারভার'-এ বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় লিখে রবীন্দ্র-সংগীতের পক্ষ সমর্থন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বিবৃতি প্রদান (১৭ মে, ১৯৭১)। ১৯৭২-এ তৎকালীন সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় 'অবজারভার' এর সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ। বাংলাদেশ টাইমস এ নিয়মিত সম্পাদকীয় রচনা। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এর প্রথম মহাপরিচালক। দীর্ঘ ২২ বছর 'অবজারভার' এর সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন। আইয়ুব খানের 'প্রভু নয় বন্ধু' গ্রন্থে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থা যথাযথ প্রতিফলিত হয় নি বলে তিনিই প্রথম জোরালো কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিলেন। সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক। সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৬-এ 'একুশে পদক' লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭।



আবদুস সালাম (১৯২৫-১৯৫২)॥ জন্ম. লক্ষ্মীপুর গ্রাম, ফেনী। পিতার নাম ফাজিল মিয়া। বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। কর্মজীবনে সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগের পিয়ন। ঢাকায় ৩৬ বি, নীলক্ষেত ব্যারাকে বাস। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের সম্মুখের রাস্তায় ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শনরত ছাত্র জনতার উপর পুলিশ গুলি চালালে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নীত। হাসপাতালে দেড় মাসাধিক কাল চিকিৎসাধীন থাকার পর ৭ এপ্রিল মৃত্যুবরণ। মহান ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। তাঁর শহীদ স্মৃতি উত্তরকালে বাঙালির জাতীয়চেতনা ও দেশপ্রেম জাগ্রতকরণে দিশারি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এই চেতনার বলেই ১৯৭১-এ বাঙালিরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করে। মৃত্যু. ৭ এপ্রিল ১৯৫২।



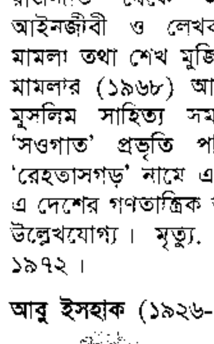
আবদুস সালাম খান (১৯০৬-১৯৭২)॥ জন্ম. ফরিদপুর শহর, ১৯০৬। পৈতৃক নিবাস রেজ্জাক গ্রাম, গোপালগঞ্জ। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২৯-এ

ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে



১৯৩০-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. ও ১৯৩১-এ এল.এল.বি. পাস। ওকালতি পেশায় যোগদান। কালক্রমে ঢাকা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। ত্রিশের দশকে মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ত্যাগ। ১৯৪৯-এর ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৩-১৯৫৫ পর্যন্ত এর সহ সভাপতি। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে গোপালগঞ্জ মহকুমা থেকে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম আওয়ামী লীগ রাখা হলে এর বিরোধিতা এবং সভাপতির পদে আসীন হয়ে একটি ক্ষীণাকৃতির আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্ব প্রদান (১৯৫৫-১৯৫৮)। ১৯৫৫-র ৭ জুন পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের পূর্ত ও যোগাযোগ মন্ত্রী নিযুক্ত। তাঁর মন্ত্রিত্বকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থান নির্বাচন ও এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। ১৯৫৬-র ১১ জুলাই মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ। আইয়ুব খানের সামরিক সরকার কর্তৃক তাঁর ওপর 'এবডো' আইন প্রয়োগ (১৯৬০)। ১৯৬৪-র ৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীনে আওয়ামী লীগ (১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর সামরিক সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত) পুনরুজ্জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। একই বছর মার্চ মাসে এ-দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোনীত। ১৯৬৬-র ১৯ মার্চ ঢাকায় হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা তৎ-কর্তৃক উদ্বোধন। এই সভায় শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ঐতিহাসিক ৬-দফা আওয়ামী লীগের কর্মসূচি হিসেবে গৃহীত। ১৯৬৬-১৯৬৭ পর্যন্ত ঢাকা হাইকোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি। পিডিএম (৩০ এপ্রিল ১৯৬৭)-কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ দ্বি-খণ্ডিত হয়ে পড়লে পিডিএম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট) সমর্থক আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা। ডাক (ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি) এর সদস্য হিসেবে ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক রাওয়ালপিণ্ডিতে আহূত রাজনীতিবিদদের গোলটেবিল বৈঠকে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১০-১৩ মার্চ ১৯৬৯)-এ পিডিএম-পন্থি আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব। ১৯৬৯-এর ২৪ জুন নূরুল আমীনের নেতৃত্বাধীনে পিডিপি (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি) গঠন ও এর পূর্ব-পাকিস্তান শাখার সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ফরিদপুর-২ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নিকট পরাজয় বরণ ও রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ। যশস্বী আইনজীবী ও লেখক। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তথা শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যদের মামলার (১৯৬৮) আসামি পক্ষের কৌঁসুলি। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা', 'সওগাত' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ। 'রেহতাসগড়' নামে একখানি উপন্যাস রচনা। এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু. ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)॥ জন্ম. শিরঙ্গল, নড়িয়া, শরিয়তপুর, ১ নভেম্বর ১৯২৬।



কথাসাহিত্যিক, অভিধানকার। পিতা মোহাম্মদ ইবাদুল্লাহ। শরিয়তপুর উপসী তারাপ্রসন্ন হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক (১৯৪২), ফরিদপুর সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১৯৪৪), করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (১৯৬০)। বাংলা সরকারের বেসরকারি সরবরাহ বিভাগের পরিদর্শকের চাকরি নিয়ে নারায়ণগঞ্জে যোগদান। নারায়ণগঞ্জ থেকে কলকাতা, পরে পাবনা। ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের সময় কর্মস্থল ছিল পাবনা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বেসরকারি সরবরাহ বিভাগ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। সহকারী পরিদর্শক হিসেবে আত্তীকৃত হন পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ সাল কর্মস্থল ছিল ঢাকা। ১৯৫৬-এ

পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগের পরিদর্শক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে করাচিতে বদলি। ১৯৬০-এ চাকরি অবস্থায় করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস করেন তিনি। ১৯৬৬-এ রাওয়ালপিন্ডিতে বদলি। ১৯৬৯-এ সহকারী কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ইসলামাবাদে বদলি। মুক্তিযুদ্ধের সময় ইসলামাবাদে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। পাকিস্তানে আটকে পড়া অবস্থা থেকে আফগানিস্তানে আশ্রয়লাভ। ভারত ও আফগানিস্তান সরকারের সহায়তায় ১৯৭৩-এ কাবুল ও নয়াদিল্লি হয়ে দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হন তিনি। দেশে ফেরার পর বাংলাদেশের নবগঠিত নিরাপত্তা বিভাগে যোগদান। জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) উপপরিচালক নিযুক্ত। ১৯৭৪-এ মিয়ানমারের (বার্মা) আকিয়াব শহরে বাংলাদেশ কনসুলেটে ভাইস কনসাল হিসেবে নিযুক্তি লাভ। ১৯৭৬-এ কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান। ১৯৮৯-এ এনএসআই-র খুলনা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ লাভ। ১৯৮৪-এর ১ নভেম্বর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। প্রথম গল্প 'রসের জলসায়' ১৯৪০-এ কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত। সাড়া জাগানো উপন্যাস 'সূর্য দীঘল বাড়ী' ১৯৫৫-এ প্রকাশিত। ১৯৮৯-এ এপ্রিলে এর কিশোর সংস্করণ প্রকাশিত। 'সূর্য দীঘল বাড়ী' বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনূদিত। এর চলচ্চিত্ররূপ আন্তর্জাতিক ৯টি পুরস্কার লাভ করে। গল্পগ্রন্থ 'মহাপতঙ্গ'-র ইংরেজি অনুবাদ 'Dragon Fly'-এর নাট্যরূপের জন্য 'সুইজারল্যান্ড আন্তর্জাতিক পুরস্কার' লাভ। গল্পগ্রন্থ: 'হারেম' (১৯৬২), 'মহাপতঙ্গ' (১৯৬৩), 'গল্পসংগ্রহ' (২০০৫), অভিধান: বাংলা একাডেমী সমকালীন বাংলা অভিধান (ক থেকে ঔ পর্যন্ত, ১৯৯৮), বাংলা একাডেমী সমকালীন বাংলা অভিধান-স্বরবর্ণ অংশ (১৯৯৩)। পুরস্কার: বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৩), সুন্দরবন সাহিত্য পদক (১৯৮১), একুশে পদক (১৯৮৭)। মৃত্যু. ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮)॥ জন্ম. দক্ষিণবাগ গ্রাম, গাজীপুর, ১৯১১। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ১৯২৪-এ স্থানীয় একডালা মাদ্রাসা থেকে জুনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় ও ১৯২৯-এ ঢাকা সরকারি মাদ্রাসা থেকে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কিছুদিন ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট



কলেজে অধ্যয়ন। পরে কলকাতায় গমন। সেখানে সাংবাদিকতার চাকরিতে যোগদান। দৈনিক সুলতানের সহ-সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৩১-এ সরকারের সেচ বিভাগে কেরানির চাকরি গ্রহণ। ১৯৪২-এ এই চাকরি পরিত্যাগ করে কটকে নির্মীয়মাণ বিমানঘাঁটি তদারকি অফিসের হেডক্লার্ক পদে যোগদান। কয়েক মাস পর এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুনরায় সাংবাদিকতার চাকরিতে প্রত্যাবর্তন। দৈনিক আজাদের সাব-এডিটর পদে নিযুক্ত লাভ। ১৯৪৮-এর অক্টোবরে পত্রিকাটি কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর এর সহকারী সম্পাদক পদে উন্নীত। ১৯৫০-এ আজাদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হলে তৎকর্তৃক পুস্তক ব্যবসায় সংস্থা কিতাবিস্তানের প্রতিষ্ঠা। ১৯৫০-১৯৫১-তে সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সম্পাদক। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্মলগ্ন থেকেই (২৫ জুলাই ১৯৫৭) রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ও কিছুকাল দলের ঢাকা জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন। ১৯৬১-তে বাংলা একাডেমীর অনুবাদ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৯৭২-এ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। পরে দৈনিক পূর্বদেশের সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান। পত্রিকাটি বন্ধ (১৯৭৫) হয়ে যাওয়ার পর দৈনিক সংবাদে চাকরি গ্রহণ। এ পত্রিকায় 'অল্পদর্শী' ছদ্মনামে 'বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা' কলাম রচনা। এ সময়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উচ্চপদে দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশ শান্তিপরিষদের সভাপতি, বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বাংলাদেশ আফ্রো-এশীয় লেখক ইউনিয়নের সহসভাপতি ও বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতি। ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী একজন প্রগতিশীল লেখক। উপন্যাস, ছোটগল্প

ও মননশীল প্রবন্ধ রচনা করে সুনাম অর্জন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: উপন্যাস– পরিত্যক্ত স্বামী (১৯৪৭), মুক্তি (১৯৪৮), ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩), পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪), সংকর সংকীর্তন (১৯৮০), প্রপঞ্চ (১৯৮০), দেয়াল (১৯৮৫); গল্পগ্রন্থ: জীবন (১৯৪৮), শেষ রাত্রির তারা (১৯৬৬), রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা (১৯৭৮), ল্যাংড়ী (১৯৮৪), নির্বাচিত গল্প (১৯৮৮); প্রবন্ধ গ্রন্থ: চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্য (১৯৬৪), Sociology of Bengal Politics (১৯৭৩), সোচ্চার উচ্চারণ (১৯৭৭), সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস (১৯৭৯), মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি (১৯৮৫), লোকায়ত সমাজ ও বাঙালি সংস্কৃতি (১৯৮৮), বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা (১৯৮৯)। উপন্যাসে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৮) লাভ। সাংবাদিকতায় অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক লাভ, ১৯৮৩। মৃত্যু. ঢাকা, ২৪ আগস্ট ১৯৮৮।

আবু তাহের, কর্নেল (১৯৩৮-১৯৭৬)॥ জন্ম. চট্টগ্রাম, ১৪ নভেম্বর ১৯৩৮। পৈতৃক নিবাস নেত্রকোণা জেলার কাজলা গ্রাম। পিতা মহীউদ্দীন আহমেদ রেলওয়ের কর্মকর্তা ছিলেন। মাতার নাম আশরাফুন্নেসা, স্ত্রীর নাম লুৎফা তাহের। মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ। ১৯৫৯-এ সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে বি.এ. পাস এবং ১৯৬০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. প্রথম পর্বে অধ্যয়ন। ১৯৫৯-এ চট্টগ্রামের মীরেশ্বরাই থানার দুর্গাপুর হাই স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর ১৯৬০-এ পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান। ১৯৬১-তে কমিশন লাভ। ১৯৬৫-তে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপে (কমান্ডো বাহিনী) যোগদান। একই বছর সেপ্টেম্বর মাসে পাক–ভারত যুদ্ধে প্রথমে কাশ্মীর ও পরে শিয়ালকোট রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ এবং আহত হয়ে বীরত্বের জন্য খেতাব লাভ। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত চট্টগ্রাম সেনানিবাসে দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়নে কর্মরত থাকাকালে বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে



গোপনে বাঙালি সৈনিকদের রাজনৈতিক সামরিক (PoliticoMilitary) প্রশিক্ষণ দান ১৯৬৯-এ আমেরিকার ফোর্ট ব্রাগ ও ফোর্ট বেনিং থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও উচ্চতর সমরবিদ্যায় অনার্স গ্রাজুয়েশন লাভ। ১৯৭০-এ কোয়েটার স্টাফ কলেজে যোগদান ও সিনিয়র টেকনিক্যাল কোর্সে অংশগ্রহণ। ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা চালাবার প্রতিবাদে স্টাফ কলেজ পরিত্যাগ করে গ্রেফতারবরণ। ১৯৭১-এর ২৫ জুলাই অ্যাবোটাবাদ থেকে পলায়ন এবং সীমান্ত অতিক্রম করে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ। ১১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৭১-এর ১৪ নভেম্বর কামালপুর শত্রুঘাঁটিতে আক্রমণ পরিচালনাকালে আহত হলে হাঁটুর ওপর থেকে বাম পা বিচ্ছিন্ন। ১৯৭২-এর এপ্রিল মাসে বিদেশ থেকে চিকিৎসা শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল পদে যোগদান। ১৯৭২-এর জুন মাসে ৪৪ তম ব্রিগেডের অধিনায়ক নিযুক্ত। কুমিল্লা সেনানিবাসের অধিনায়ক থাকাকালে প্রচলিত 'ব্যারাক আর্মি'র স্থলে উৎপাদনশীল 'পিপলস আর্মি' গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ। ১৯৭২-এর সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় সেনাবাহিনির ব্যাপারে নীতি-নির্ধারণের প্রশ্নে তৎকালীন মুজিব সরকারের সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ার সেনাবাহিনি থেকে পদত্যাগ। ১৯৭২-এ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সহ সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ এবং গণবাহিনী (গোপন) গঠন। ১৯৭৩-এ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ড্রেজার সংস্থার পরিচালক নিযুক্ত। ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর 'সিপাহি গণঅভ্যুত্থান'কে সংগঠিত করেন এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে সে অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদান। একই বছরের ২৪ নভেম্বর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার কর্তৃক গ্রেফতার। ১৯৭৬-এর ১৭ জুন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে এক সামরিক আদালতে তাঁর গোপন বিচার শুরু। একই বছর ১৭ জুলাই সামরিক আদালত কর্তৃক ফাঁসির রায় প্রদান এবং কয়েক দিন পরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর। লাশ গ্রামের বাড়িতে কবরস্থ। স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে 'বীরোত্তম' খেতাবে ভূষিত। 'কর্নেল তাহের' নামে সমধিক পরিচিত; তিনি ছিলেন দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা ও বিপ্লবী সংগঠক মৃত্যু. কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা, ২১ জুলাই ১৯৭৬।

আবু নঈম (১৯২৬-১৯৮৪)॥ জন্ম. চট্টগ্রাম, ১৯২৬। এসরাজ বাদক। ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি অনুরক্ত। প্রসিদ্ধ সেতারী প্রিয়দারঞ্জন সেনগুপ্তের নিকট পদ্ধতিগতভাবে উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীতে তালিম গ্রহণ। ম্যান্ডোলিন, গীটার, সেতার, তবলা বাদনেও পারদর্শী। ১৯৬০-এ তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্রে অনিয়মিত শিল্পী হিসেবে সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। ১৯৬৩-তে চট্টগ্রাম বেতার থেকে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন। ১৯৬৪-তে চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্রে 'নিজস্ব শিল্পী' হিসেবে যোগদান। স্বাধীনতার পর সংগীত প্রযোজক পদমর্যাদায় উন্নীত। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সংগীত বিদ্যাপীঠ আর্য সংগীত নিকেতনের প্রশিক্ষক। ১৯৬৪ থেকে চট্টগ্রামের 'ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস' সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ৬ নভেম্বর ১৯৮৪।

আবু নসর ওহীদ, শামসুল ওলামা মওলানা (১৮৭২-১৯৫৩)॥ জন্ম. হওড়াপাড়া মহল্লা, সিলেট শহর, ১৮৭২। পৈতৃক নিবাস হাসানাবাদ গ্রাম, ছাতক। শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ। ১৮৮৪-তে সিলেট সরকারি স্কুলে ভর্তি। ১৮৯২-এ এন্ট্রান্স পাস। কিছুকাল সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যয়নের পর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। ১৮৯৭-তে আরবিতে অনার্সসহ বি.এ. ও এম.এ. (আরবি) এবং পরে আইন পাস। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম আরবিতে এম.এ.। কোনো মাদ্রাসায় না পড়েও স্বীয় চেষ্টায় আরবি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন ও ঐ ভাষায় কাব্যরচনা। ১৯০১-এ আসামের কটন কলেজে আরবির অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯০৫-এ পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠিত হলে মুসলমান সমাজে শিক্ষার এক নতুন আগ্রহ সৃষ্টি। এই আগ্রহকে নতুন গতিবেগ দানের জন্য ঢাকা মাদ্রাসাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন নওয়াব সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ। ঢাকা মাদ্রাসায় আরবি-ফারসির সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা গ্রহণ। এই ব্যবস্থাকে সফল করার লক্ষ্যে ১৯০৫-এর ১ সেপ্টেম্বর মওলানা ওহীদের ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান। ১৯০৬-এ ঢাকা প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের জন্য কমিটি গঠিত এবং মওলানা ওহীদ এর সম্পাদক নিযুক্ত। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করার উদ্দেশ্যে ১৯০৬-১৯০৮ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন ইসলামিক ও প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন। কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ তুরস্ক, সিরিয়া, বৈরুত, প্যালেস্টাইন-এর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম সংগ্রহ। বুদাপেস্ট, প্যারিস, বার্লিন ও ভিয়েনার প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলন কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন। ১৯০৯-এ ডি.পি.আই. স্যার হেনরি শার্পের নেতৃত্বে মাদ্রাসা সংস্কার কমিটি গঠিত হলে কমিটির সদস্য নিযুক্ত এবং কমিটির কাছে শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনা পেশ। পরিকল্পনায় মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ইংরেজি, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ। লক্ষ্ণৌ, দেওবন্দ ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র ও মাদ্রাসার আলেমদের সঙ্গে আলোচনা এবং তাঁদের সম্মতিক্রমে নিউ স্কিম মাদ্রাসা পরীক্ষামূলক চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ। বাংলা সরকার কর্তৃক ১৯১৪-তে রিফর্ম মাদ্রাসা স্কিম অনুমোদন। নিউ স্কিম মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রবর্তন তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। ১৯১৯-এ ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) স্থাপিত হলে ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্টের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ। ১৯২১-এ ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজের প্রথম অধ্যক্ষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি পাঠক্রম কমিটির সদস্য। ১৯৩৭-এ সিলেটে প্রত্যাবর্তন ও সিলেট সদর কেন্দ্র থেকে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। স্যার সাদুল্লাহর মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল। কৃতবিদ্য পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান শিক্ষাবিদ ও দৃঢ়চিত্ত বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাতি ছাড়াও সেক্সপীয়রের বহু রচনা শেষ জীবন পর্যন্ত মুখস্থ রাখার এক দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী। মৃত্যু. ঢাকা, ৩১ মে ১৯৫৩।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (১৯১১-১৯৮৪)॥ জন্ম. বামুনিয়া গ্রাম, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ৩০ নভেম্বর ১৯১১। ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদ ও লেখক। ১৯২৬-এ হুগলী মাদ্রাসা থেকে মেট্রিক ও ১৯২৮-এ ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ. পাস। এরপর কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হুগলী কলেজ থেকে ১৯৩১-এ ইতিহাসে অনার্সসহ বি.এ. এবং ১৯৩৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. পাস। ১৯৩৬-এ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ১৯৩৭-এ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা পাস। ১৯৩৮-১৯৩৯ পর্যন্ত কলকাতা মাদ্রাসার গ্রন্থাগারিক। ১৯৩৯-১৯৪০ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের প্রভাষক। ১৯৪০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রভাষক পদে নিযুক্ত। ১৯৫০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের রিডার পদে যোগদান। ১৯৫২-১৯৭৬



পর্যন্ত এই বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। ১৯৭৫-১৯৭৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান। ১৯৭৯ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর। কর্মজীবনের অন্যান্য দিক: ১৯৫০-এ ইন্ডিয়ান হিস্টোরি কংগ্রেসের সেকশনাল প্রেসিডেন্ট। ১৯৫৩-১৯৫৪ ও ১৯৬৩-১৯৬৫ পর্যন্ত ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর। ১৯৬১-১৯৬৩ ও ১৯৭০-১৯৭১ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির ডিন, ১৯৬৯-১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। ১৯৭৩-১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের প্রেসিডেন্ট, ১৯৭৩-১৯৭৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ ইতিহাস কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৮২ থেকে আমৃত্যু বাংলা একাডেমীর সভাপতি। এছাড়া ১৯৫৪-১৯৫৫ পর্যন্ত লন্ডনের নাফিল্ড ফাউন্ডেশনের ফেলো, ১৯৭২-এ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং ফেলো, ১৯৭৭-১৯৭৮ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান ফেলো; ১৯৭৮-১৯৭৯ পর্যন্ত ভারতের জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর, ১৯৭৯-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী মেমোরিয়ালের নির্বাচিত লেকচারার এবং ১৯৮০-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাস্টিস ইব্রাহীম মেমোরিয়ালের নির্বাচিত লেকচারার মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও [illegible] জীবনবোধে বিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব হিসেবে খ্যাত। এদেশের বিভিন্ন সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকারের গণবিরোধী ও নিপীড়নমূলক নীতির বিরোধিতা করে বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান। বাঙালি সংস্কৃতির একজন নিষ্ঠাবান সমঝদার। সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। রচিত গ্রন্থ: Foundation of Muslim Rule in India (৩ সংস্করণ, এলাহাবাদ, ১৯৭৫), Descriptive Catalogue of Arabic, Persian and Urdu Manuscripts in Dacca University Library (২ ভল্যুম, ঢাকা ১৯৬৬), সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস (ঢাকা, ১৯৭৫, প্রবন্ধের বই), আলবেরুণীর ভারততত্ত্ব (অনুবাদ গ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৭৪)। ভারতের বিশেষ সম্মানজনক পুরস্কার 'যদুনাথ গোল্ড মেডেল' এবং ১৯৮০-তে প্রবন্ধ-গবেষণায় বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ৩ জুন ১৯৮৪।

আবু মাহমুদ (১৯২০-১৯৮৮)॥ জন্ম. নোয়াখালী, ১ অক্টোবর ১৯২০। অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক। পূর্ণনাম আবু নসর মুহম্মদ মাহমুদ। পৈতৃক নিবাস আজিমপুর, রামগঞ্জ, নোয়াখালী। পুলিশ অফিসার (দারোগা) গোলাম রহমান তাঁর পিতা।



ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে মেট্রিক (১৯৩৬), করটিয়া সাদত কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. (১৯৩৮) পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি.এ. অনার্স (১৯৪১) ও এম.এ. (১৯৪২) ডিগ্রি লাভ। ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৫৭-১৯৬২-তে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও 'Theory of Economic Planning" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ১৯৬২-এ পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। একই বছর পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনায় যোগদান ও রিডার পদে উন্নীত (১৯৬২); অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান (১৯৬৩-১৯৬৭)। ১৯৬৯-এ অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৮১-র ৩০ জুন অবসর গ্রহণ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ। তৎকর্তৃক এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে

মার্কসবাদী অর্থনীতি গৃহীত। আইয়ুব খানের শাসনামলে (১৯৫৮-১৯৬৯) পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে প্রদর্শনী করে এই শোষণের চিত্র দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন এবং শোষণ বন্ধ করার লক্ষ্যে 'দুই অর্থনীতি'-র দাবি উত্থাপন। এই দুঃসাহসী ভূমিকা পালনের জন্য ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ (কনভেশন)-এর অঙ্গ ছাত্র সংগঠন এন.এস.এফ. (জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন)-এর সদস্যদের দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রহৃত (১৯৬৬)। তাঁর ওপর এই নির্যাতন চালাবার প্রতিবাদে সারা পূর্ববাংলায় বিক্ষোভ প্রদর্শিত। মেহনতি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে দেশে সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য নিরলস সংগ্রাম পরিচালনা। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরোধিতাও ছিল তাঁর সংগ্রামী জীবনের আর একটি দিক। মার্কসবাদী পণ্ডিত হিসেবেও খ্যাত। 'মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা' (১ম খণ্ড–১৯৮৫) তাঁর রচিত একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মৃত্যু. ঢাকা, ২৯ আগস্ট ১৯৮৮।

আবু লোহানী (১৮৯২-১৯২৯)। জন্ম. ১৮৯২।



সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। পুরো নাম আবু সাঈদ মোহাম্মদ সিদ্দিক হোসেন খাঁ। পিতা শাখাওয়াত আলী খাঁ। পূর্ব পুরুষ আফগান-ইরান সীমান্ত এলাকার ক্ষুদ্র অঞ্চল লোহান থেকে সিরাজগঞ্জে আগমন। এজন্যে লোহানী পদবি ব্যবহার। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিবারটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালন। 'দি মুসলমান' ও 'খাদেম' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। 'দৈনিক সুলতান'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হলেও কার্যভার গ্রহণের পূর্বে মৃত্যুবরণ। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র (১৯১১) অন্যতম সংগঠক। ১৯১৭-১৮-এ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সহকারী সম্পাদকত্রয়ের অন্যতম। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র (১৯১৮) প্রকাশকের দায়িত্ব পালন। এ সূত্রে সেকালের বিদ্বৎজনের সংস্পর্শ লাভ। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্যসাধনায় নিমগ্ন। তাঁর অনেক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, গান, নাটক, জীবনী আল এসলাম, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, বঙ্গনূর, ইসলাম দর্শন, আঙুর, সওগাত, মোহাম্মদী, খাদেম, রেঙ্গুন টাইমস পত্রিকায় প্রকাশ। রচিত গ্রন্থ 'শপথ' (উপন্যাস), 'তাজমহলের ইতিহাস', 'বালক বীর' (জীবনী), কবিতা ও গান 'কাওসার', 'ভগ্নবীনা'; গল্প 'তোররা', 'ত্রিফলা'; নাটক 'চিতোর বিজয়', 'ফেরিদুঁ', 'চন্দ্রলোক', 'মোসলেম গৌরব' (শিশুনাট্য); অন্যান্য গ্রন্থ 'সিন্ধু বিজয় কাব্য', 'বোকার কাণ্ড', 'হযরত ফাতেমা জোহরা'। স্নাতক পাশ আবু লোহানী সিরাজগঞ্জের খ্যাতনামা আইনজীবী গোলাম আজম খাঁর কনিষ্ঠ কন্যা ফাতেমা খাতুনের সঙ্গে পরিণয় (১৯১৬)। ফাতেমা লোহানীর শিক্ষকতার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা। সন্তানদের মধ্যে ফতেহ লোহানী চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাংবাদিক; ফজলে লোহানী সাংবাদিক ও উপস্থাপক; হুসনা বানু খানম প্রথিতযশা সংগীতশিল্পী। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। মৃত্যু. কলকাতা, ৩ আগস্ট ১৯২৯।

আবুল কালাম আজাদ (১৯৩৩-১৯৭১)॥ জন্ম.



রামকৃষ্ণপুর গ্রাম, ভেড়ামারা কুষ্টিয়া, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩। শিক্ষাবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কতে এম.এসসি. (প্রথম শ্রেণিতে প্রথম), যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তরল পদার্থ সম্পর্কিত বলবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা, ফলিত গণিতে এম.এসসি. এবং 'মেঘবিজ্ঞানে' পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ১৯৫৮-র নভেম্বর মাসে সরকারি কলেজের অঙ্কের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬৮-১৯৬৯ পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজের গণিত বিভাগের প্রধান। ১৯৭০-এর ১০ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৭০-১৯৭১ পর্যন্ত ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্স সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি টিচিং-এ অধ্যাপনা। লন্ডনের রাজকীয় আবহাওয়া বিজ্ঞান সমিতির, যুক্তরাজ্যের ফলিত গণিত সমিতির এবং বোস্টনের আবহাওয়া বিজ্ঞান সমিতির ফেলো। প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। ১৯৫২-র ভাষা-

আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা প্রদান। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী আল-বদর বাহিনী কর্তৃক মিরপুর বধ্যভূমিতে নিহত।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮)॥



জন্ম. ধানীখোলা গ্রাম, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ৩ নভেম্বর ১৮৯৭। সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। এক সম্ভ্রান্ত জোতদার পরিবারে জন্ম। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৭১-তে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স ও ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১৯-এ দ্বিতীয় বিভাগে এফ.এ. পাস। কলকাতা রিপন কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) যোগদান করে কংগ্রেসের আহ্বানে বি.এ. পরীক্ষা বর্জন। গৌড়ীয় সুবর্ণ বিদ্যায়তন থেকে ১৯২১-এ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বাঙালি মুসলমান সমাজের কল্যাণসাধনের মানসে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ। ১৯২৩-এ কলকাতার 'দৈনিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯২৪-এ কলকাতার সাপ্তাহিক 'মুসলিম জগৎ' পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে যোগদান। ১৯২৫-১৯২৯ পর্যন্ত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' (১৯০৬)-এর সহকারী সম্পাদক (১৯২৪ থেকে সপ্তাহে এটি তিনবার প্রকাশিত)। সেই সময়ে একই সঙ্গে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'সওগাত' (১৯২৬)-এর সম্পাদনা বিভাগে কর্ম সম্পাদন। ১৯৩০-এ 'দৈনিক আজাদ' (৩১ অক্টোবর ১৯৩৬)-এর সম্পাদনা বিভাগে যোগদান। ১৯৪০-এ এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত দীর্ঘ বাইশ বছর আজাদ সম্পাদনা (১৯৪০-১৯৬২)। ১৯৬২-র নভেম্বর মাসে 'দৈনিক জেহাদ' (নভেম্বর ১৯৬২)-এর সম্পাদক পদে যোগদান। প্রায় দেড় বছর এ পত্রিকা সম্পাদনা। ১৯৬৪-র নভেম্বর মাসে প্রেস ট্রাস্ট অব পাকিস্তান পরিচালিত 'দৈনিক পাকিস্তান' (৬ নভেম্বর ১৯৬৪, পরে দৈনিক বাংলা)-এর সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসে এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ। ত্রিশের দশকে মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। বাঙালি মুসলমান সমাজকে ইসলামিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করার প্রয়াসে কলকাতায় 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' (১৯৪০)। প্রতিষ্ঠা এবং এর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত। ১৯৪৬-এ মুসলিম লীগের মনোনয়নে ময়মনসিংহ জেলা থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনে ভূমিকা পালন। বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকার রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শনরত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) তৎকর্তৃক ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারের উদ্বোধন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানি 'তাহযিব' ও 'তমদ্দুনের' প্রতি অনুরাগ প্রকাশ। ১৯৬৭-র জুন মাসে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের পদক্ষেপ নিলে, সরকারের সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ১৯৬৯-এ আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলনের সময়ে (জানুয়ারি-মার্চ) সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে 'সিতারা-এ-খেদমত' ও 'সিতারা-এ-ইমতিয়াজ' খেতাব বর্জন। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে বিবৃতি প্রদান (১৭ মে ১৯৭১)। একজন বিশিষ্ট লেখক। সাহিত্য-সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে বহু চিন্তামূলক সরস প্রবন্ধ রচনা। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্য সমালোচক হিসেবেও খ্যাত। বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারার ও নজরুল কাব্যের বিচার বিশ্লেষণ ও নব মূল্যায়নে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান। কাজী নজরুল ইসলামকে তৎকর্তৃক প্রথম 'যুব-প্রবর্তক' কবি বলে অভিহিত। বিদেশি সাহিত্যের বঙ্গানুবাদে সুনাম অর্জন। অনুবাদ সাহিত্যে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭০) এবং সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে একুশে পদক (১৯৭৬) লাভ। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: কচিপাতা (শিশুসাহিত্য, ১৯৩২), অনাবাদী জমি (তুর্গেনিভের ভার্জিন সয়েল-এর অনুবাদক, ১৯৩৮), ত্রিস্রোতা (তুর্গেনিভের তিনটি গল্পের অনুবাদ, ১৯৩৯), খরতরঙ্গ (তুর্গেনিভের টরেন্টস অব স্প্রিং-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত, ১৯৫৩),

দৃষ্টিকোণ (প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৬১) ইলিয়ড (হোমারের মহাকাব্য ইলিয়ড-এর বঙ্গানুবাদ, ১৯৬৭), পলাশী থেকে পাকিস্তান (ইতিহাস, ১৯৬৮), অতীত দিনের স্মৃতি (আত্মজীবনী ও স্মৃতিচারণ, ১৯৬৮)। সম্পাদনা: সেকাল ও একালের সেরা গল্প (১৯৬৩)। বাঙালি মুসলমান সমাজের সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ। দৈনিক আজাদ সম্পাদনা তাঁর জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি। ত্রিশের ও চল্লিশের দশকে অবিভক্ত বঙ্গে মুসলমান সমাজের নব জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয়। মৃত্যু. ঢাকা, ৪ মার্চ ১৯৭৮।

আবুল কাশেম (১৯১৩-১৯৭৬)॥ জন্ম. সাদুরটিয়া গ্রাম, মাইনকার চর, আসাম, ১৯১৩। রাজনীতিবিদ। ১৯৩৮-এ গৌহাটি কটন কলেজ থেকে বি.এ. অনার্স (দর্শন), করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬-এ এল.এল.বি. এবং ১৯৬০-এ এম.এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) পাস। আসাম মুসলিম লীগে যোগদানের ভিতর দিয়ে চল্লিশের দশকে রাজনীতি শুরু। ১৯৪৬-এ মুসলিম লীগের মনোনয়নে ধুবড়ী নির্বাচনী এলাকা থেকে আসাম প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির হুইপ নির্বাচিত। ১৯৪৭-এ আসামে আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠনের দায়ে কারাবরণ। ১৯৫০-এ পূর্ব-পাকিস্তানে আগমন এবং রংপুর জেলার উজিরপুরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন। ১৯৫২-তে পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৪-র পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর কাছে পরাজিত। ১৯৫৬-তে মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৬২-তে 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রথায় রংপুর-১ আসন থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর পরিষদের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত এবং ১৯৬৪ পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। ঐ সময়ে জাতীয় পরিষদে মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা। ১৯৬৫-র ২১ মার্চ মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথা সম্মিলিত বিরোধী দলের মনোনয়নে রংপুর-৬ আসন থেকে পুনরায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। কাউন্সিল মুসলিম লীগের অন্যতম সংগঠক। ১৯৬৪-১৯৬৭ পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের (কাউন্সিল) সভাপতি এবং ১৯৬৭-১৯৭১ পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাউন্সিল) সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চ মাসের আইয়ুব-বিরোধী গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৭০-এর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে রংপুর জেলা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কাছে পরাজয়। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের বিপক্ষে কর্মকাণ্ড পরিচালনা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের অর্থমন্ত্রী। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার অপরাধে বাংলাদেশ সরকার-কর্তৃক দালাল আইনে গ্রেফতার। ১৯৭৩-এর শেষের দিকে মুক্তিলাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬।

আবুল কাশেম ফজলুল হক, শেরে বাংলা (১৮৭৩-১৯৬২)॥



জন্ম. মাতুলালয়, সাতুরিয়া গ্রাম, বরিশাল, ১৬ অক্টোবর ১৮৭৩। পৈতৃক নিবাস একই জেলার চাখার গ্রাম। রাজনীতিবিদ। শিক্ষিত ও রাজনৈতিক মহলে 'শেরে বাংলা' নামে এবং বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে 'হক সাহেব' নামে পরিচিত। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ১৮৮৯-তে ডিভিশনাল বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৯১-তে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে এফ.এ. একই কলেজ থেকে ১৮৯৩-তে প্রথম বিভাগে বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯৫-তে গণিতশাস্ত্রে এম.এ. পাস। ১৮৯৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বি.এল. ডিগ্রি লাভ করে আইনজীবী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে শিক্ষানবিসি শুরু। শিক্ষানবিসি শেষ করে কিছুকাল কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়। ১৯০১-এ বরিশাল আদালতে ওকালতি ব্যবসায় যোগদান। একই সঙ্গে বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজে গণিতের অধ্যাপনা এবং সাপ্তাহিক 'বালক' নামের পত্রিকা সম্পাদনা। বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য নির্বাচিত। ১৯০৫-এ নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন (১৯০৬) প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত। স্যার সলিমুল্লার প্রতিনিধি রূপে সারা উপমহাদেশে পরিভ্রমণ করে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও

সম্মেলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে গঠিত হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ (৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬)। ১৯০৬-এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ। ১৯১১-তে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুনরায় হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু। স্যার সলিমুল্লাহর আহ্বানে ১৯১২-তে রাজনীতিতে যোগদান। ১৯১৩-তে ঢাকা বিভাগীয় কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। একই বছর মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯১৫-তে তৎকর্তৃক কৃষক-প্রজা আন্দোলন সূচনা। ১৯১৮-তে একই সময় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ও ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯১৯-এ কুখ্যাত রাউলাট অ্যাক্ট এর বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা। জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৩ এপ্রিল ১৯১৯) তদন্তের জন্য গঠিত বেসরকারি তদন্ত কমিটির সদস্য নিযুক্ত। একই বছর খেলাফত আন্দোলনে যোগদান। ১৯২০-এ কলকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও খেলাফত সম্মেলনে সভাপতিত্ব এবং উভয় সম্মেলনেই ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বর্জনের কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরোধিতা। একই বছর কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ও কবি কাজী নজরুল ইসলামের সহায়তায় সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ (১২ জুলাই ১৯২০-জানুয়ারি ১৯২১ প্রকাশ)। ১৯২২-এ খুলনার উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯২৩-এ স্বরাজ পার্টির নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চুক্তি সম্পাদন। ১৯২৪-এর ১ জানুয়ারি অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত। কংগেস আইনসভা বর্জন করায় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন। একই বছর জুন মাসে বাজেট অধিবেশনে মন্ত্রিসভার পতন ঘটায় মন্ত্রিত্ব থেকে পদচ্যুত। তাঁর ছয় মাস মন্ত্রিত্বকালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ স্থাপন। ১৯২৯-এ স্যার আবদুর রহিমকে সভাপতি করে কলকাতায় কৃষক প্রজা পার্টি গঠন এবং নিজে এর সহসভাপতি হন। ১৯৩০-১৯৩১-এ লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান। ১৯৩৫-এ কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি ও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত। ১৯৩৭-এর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ। নিজে পটুয়াখালী ও পিরোজপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত। স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত বেশির ভাগ সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করায় মুসলিম লীগের আসন সংখ্যা প্রজাপার্টির সমান আসনে পরিণত। ১ এপ্রিল (১৯৩৭) মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী হন। এ সরকারের আমলে ঋণ সালিশি বোর্ড (১৯৩৮) স্থাপন এবং প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৩৯) ও মহাজনি আইন (১৯৪০) প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক আইন পাস। ১৯৩৭-এর অক্টোবর মাসে লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনে যোগদান ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতির পদ গ্রহণ। উক্ত অধিবেশনে ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার অনুকূলে এক উদ্দীপনাময় ও হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করলে অধিবেশনের শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক 'শেরে বাংলা' উপাধিতে ভূষিত। ১৯৪০-এর ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে তৎকর্তৃক এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব উপস্থাপন যা 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত। সম্মেলনে গৃহীত এই প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের পূর্বাঞ্চলে ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন। ১৯৪১-এ মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে মুসলিম লীগ পরিত্যাগ। মন্ত্রিসভার মুসলিম লীগ সদস্যরা পদত্যাগ করলে হক-মন্ত্রিসভার পতন। ১১ অক্টোবর, ১৯৪১ কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও কৃষক-প্রজা পার্টির কোয়ালিশনে দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভা গঠন। এ মন্ত্রিসভা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা নামে খ্যাত। বাংলা গভর্নরের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে ১৯৪৩-এর ২৭ মার্চ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। ১৯৪৬-এর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে মুসলিম লীগের কাছে তাঁর দল কৃষক-প্রজা পার্টির শোচনীয় পরাজয়। নিজে বরিশাল সদর দক্ষিণ ও খুলনার বাগেরহাট কেন্দ্রদ্বয় থেকে নির্বাচিত। নির্বাচনের পর তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৮ সেপ্টেম্বর মহম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁকে মুসলিম লীগে ফিরিয়ে নেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল (১৯৫১-১৯৫৩)। ১৯৫৩-র ২৭ জুলাই কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠন এবং এর সভাপতি (১৯৫৩-১৯৫৬)। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গ পরিষদের নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য একই বছর ৩ ডিসেম্বর (১৯৫৩) নিখিল পাকিস্তান

আওয়ামী লীগের সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন। পূর্ববঙ্গ পরিষদের নির্বাচন (৮-১১ মার্চ)-এ যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়ী হলে (নিজে বরিশালের একটি আসন থেকে নির্বাচিত) তাঁর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠিত (৪ এপ্রিল ১৯৫৪)। কমিউনিস্টদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আদমজি শ্রমিক এলাকায় সংঘটিত দাঙ্গা দমনের ব্যর্থতা প্রভৃতি অজুহাতে ৩০ মে (১৯৫৪) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ৯২-ক ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল এবং তাকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত। কিছুদিন গৃহবন্দী থাকেন। ১৯৫৫-র ১ জুন পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ১১ আগস্ট মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৫৬-র শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং গণপরিষদে তা অনুমোদনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬)। ১৯৫৬-র ২৩ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত। ১৯৫৮-র ১ এপ্রিল এ পদ থেকে অপসারিত। সাধারণ মানুষের কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর রাজনীতির মূল দর্শন; বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী একজন অ-সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ হিসেবে খ্যাত। বাঙালির 'ডাল ভাত'-এর ব্যবস্থা করার জন্য এবং নিরক্ষর, পশ্চাদপদ, শোষিত-বঞ্চিত বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিরলস সংগ্রাম পরিচালনা। বাংলার দরিদ্র কৃষক সাধারণকে মহাজনি শোষণ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি অবিভক্ত বঙ্গে কৃষক-প্রজা পার্টির নেতৃত্বে থাকাকালীন সময়ে বাংলার রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত ও শোষিত শ্রেণির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। একজন লেখক বটেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: Bengal Today ১৯৪৪। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'হিলালী-পাকিস্তান' খেতাব প্রদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টর অব ল ডিগ্রি প্রদান (১৯৫৬)। মৃত্যু. ঢাকা, ২৭ এপ্রিল ১৯৬২।

আবদুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন (?-১৯৭২)॥ জন্ম. কাতিল গ্রাম, বাঘমারা, রাজশাহী। অনুবাদক, প্রবন্ধকার। মাদ্রাসার লেখাপড়া শেষে ইসলামি স্টাডিজে এম.এ. পাস। আরবি, ফারসি, উর্দুতে ব্যুৎপত্তি লাভ। দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষকতা ও অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। শান্তিনিকেতনে ১৯৩৯-এ আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইসলামিক স্টাডিজের 'নিযাম অধ্যাপক' নিযুক্ত। কয়েক বৎসর নওগাঁ কলেজের অধ্যক্ষ। বাংলা একাডেমীতে সহকারী অনুবাদক পদে দায়িত্ব পালন ও বাংলা ইসলামি বিশ্বকোষের সহকারী সম্পাদক। মওলানা আবদুল্লাহ হেল কাফী প্রতিষ্ঠিত 'তর্জমানুল হাদীস' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। ১৯৪৪-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রথম অধিবেশনে পুঁথি সাহিত্য শাখার সভাপতি। গ্রন্থ: পুঁথিসাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬৯), আরবি বাংলা অভিধান, সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড, ১৯৬৪-১৯৬৯), আরবি ছোটগল্প (অনুবাদ, ১৯৬৪), তহাফুতুল ফলাসিফা (অনুবাদ, ১৯৬৮) সত্যের সন্ধানে গাজ্জালী (সম্পাদনা] ১৯৬৩)। মৃত্যু. ১৯৭২।

আবুল কাসেম (১৮৭২-১৯৩৬)॥ জন্ম. বর্ধমান, ১৮৭২। রাজনীতিবিদ।



কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস করার পর ১৮৯৭ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত পিতৃব্য নবাব আবদুল জব্বারের ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন। নবাব আবদুল জব্বার সে-সময়ে ছিলেন ভূপালের প্রধানমন্ত্রী। ১৯০৪-এ কংগ্রেসের কনস্টিটিউশন কমিটির সদস্য নির্বাচিত। ১৯০৫-এ নির্বাচিত হন কংগ্রেসের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য। বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনাকারী অন্যতম নেতা। মুসলিম লীগের পাল্টা সংগঠন হিসেবে ১৯০৬-এ স্বদেশি মুসলমানদের সংগঠন 'বেঙ্গল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯০৬-এ প্রকাশিত The Musalman পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। এ ছাড়া Progress, Muslim Standard, নবযুগ, মোসলেম বাণী প্রভৃতি পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত। ১৯০৫-এর আগেই বাঙালি মুসলমানের মধ্যে তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা। সারা ভারতের খেলাফত কমিটির (১৯১৯) সদস্য হিসেবে খেলাফত আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন। ১৯২০-তে ভারত থেকে মৌলানা মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে যে

খেলাফত ডেলিগেশন ইংল্যান্ডে যায় তিনি ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। খেলাফত আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন। অপর কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে সম্পর্কিত না থাকলেও এরপর একাধিকবার কেন্দ্রীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

আবুল কাসেম, প্রিন্সিপাল (১৯২০-১৯৯১)॥ জন্ম. ছেদন্দী গ্রাম, চট্টগ্রাম, ২৮ জুন ১৯২০। ভাষাসৈনিক শিক্ষাবিদ ও লেখক। স্থানীয় বরমা হাইস্কুল থেকে ১৯৩৯-এ প্রথম বিভাগে মেট্রিক ও চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯৪১-এ প্রথম বিভাগে আই.এসসি. পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৪-এ পদার্থবিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বি.এসসি. অনার্স ও ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এসসি. (পদার্থবিজ্ঞান) ডিগ্রি লাভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। প্রায় আট বছর এ পদে দায়িত্ব পালন (১৯৪৫-১৯৫৩)। ১৯৪৭-এর ১ সেপ্টেম্বর তৎকর্তৃক 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন। মজলিসের পক্ষ থেকে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, না উর্দু' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ। এতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন। তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকা প্রকাশ (১৪ নভেম্বর ১৯৪৮) ও পরিচালনা (১৯৪৮-১৯৬১)। ১৯৪৮-এর ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকাসহ সারা পূর্ববাংলায় যে ছাত্র-ধর্মঘট পালিত হয় এবং ১৫ মার্চ (১৯৪৮) পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামীদের মধ্যে যে ৮-দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ (৩০ জানুয়ারি ১৯৫২)-এর অন্যতম সদস্য হিসেবে বাহান্নর ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। 'খেলাফতে রব্বানী পার্টি' (১৫২)-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫৪-র মার্চে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া-বোয়ালখালী নির্বাচনী এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দানের গুরুত্ব অনুধাবন করে 'বাংলা কলেজ' প্রতিষ্ঠা ও এর প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল (১৯৬২-১৯৮১)। সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, ইসলামি আদর্শ ও ইসলামি জীবন ব্যবস্থার উপর বহু গ্রন্থের প্রণেতা। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (১৯৪৭), একমাত্র পথ (১৯৪৯), মুক্তি কোন পথে (১৯৫২), বিবর্তনবাদ (১৯৫২), শ্রেণিসংগ্রাম (১৯৫৩), দু'টি প্রশ্ন (১৯৫৫), শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি (১৯৫৫), একুশ দফার রূপায়ণ (১৯৫৫), আধুনিক চিন্তাধারা (১৯৬৪), সংগঠন (১৯৬৪), ইসলামি রাষ্ট্রনীতি, কোরানিক অর্থনীতি প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি। ভাষা-আন্দোলনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। মৃত্যু, ঢাকা, ১১ মার্চ ১৯৯১।



আবুল কাসেম সন্দ্বীপ (১৯৪৪-১৯৯৫)॥ জন্ম. সারিকাইত গ্রাম, সন্দ্বীপ-চট্টগ্রাম, ১ এপ্রিল ১৯৪৪। স্বাধীন বাংলাবেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক। পিতা নুর আহমদ। কৃষক পরিবারে জন্ম। সাউথ সন্দ্বীপ হাই ইংলিশ স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৫৯) ও চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট আই. আই. কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৬৪) পাস। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বাংলায় বি.এ. অনার্স (১৯৬৮) এবং একই বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. (১৯৬৯) ডিগ্রি লাভ। চট্টগ্রামে ছাত্র রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। এদেশের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের (১৯৫২) একজন সক্রিয় সদস্য। গভর্নমেন্ট আই.আই. কলেজের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার নির্মাণ কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে চট্টগ্রামে দৈনিক পত্রিকা 'আজাদীর' সহ-সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৭০-এর জুন মাসে সাংবাদিকতার পেশা ত্যাগ করে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি কলেজের সহ-অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান। ষাটের দশকে (১৯৬৪ থেকে) চট্টগ্রাম বেতারের গীতিকার ও কথিকা লেখক। স্বাধীন বাংলা



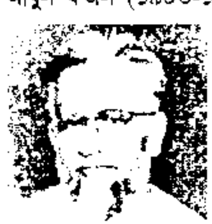
বিপ্লবী বেতারকেন্দ্রের (কালুরঘাট, চট্টগ্রাম) প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি এই বেতারকেন্দ্রের নাম ঘোষণা করেন এভাবে: 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র থেকে বলছি' (সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিট, ২৬ মার্চ ১৯৭১)। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম সংবাদ প্রচারক। ২৫ মার্চ রাত ১২ টার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। বঙ্গবন্ধুর এই 'ডিক্লারেশন অব ওয়ার অব ইন্ডিপেনডেন্টস' দেশের প্রায় প্রত্যেক টেলিগ্রাম-অফিসে পাঠানো হয়। এটিই ২৬ মার্চ বেলা ১-৩ টার মধ্যে চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র থেকে ভাষণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ. হান্নান কর্তৃক স্বকণ্ঠে প্রচার। একই দিন সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিটে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের টেলিগ্রামটি আবুল কাসেম সন্দ্বীপ কর্তৃক সংবাদ আকারে প্রচার। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অন্যতম নীতিনির্ধারকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বার্তা বিভাগেরও দায়িত্ব সম্পাদন। স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ঢাকা বেতারে যোগদান। স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন সুফলকেই ব্যক্তিগত জীবনে ভোগ না করার দৃঢ়তা ও মনোবল থেকে ১৯৭২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বেতারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের নবপ্রবর্তিত গণশিক্ষা প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে যোগদান। ত্যাগী, দেশপ্রেমিক ও দৃঢ় চিত্তের ব্যক্তিত্ব হিসেবে খ্যাত। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের একজন শব্দসৈনিক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। স্বাধীনতাযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করায় মুজিব সরকার (১৯৭২-১৯৭৫) কর্তৃক বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক (১৯৭৫) প্রদান। শেষ জীবনে সাভারে (ঢাকা) বাস। মৃত্যু. সাভার, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৫।

আবুল খায়ের (১৯২৯-১৯৭১)॥ জন্ম. কাঁঠালিয়া গ্রাম কাউখালী, বরিশাল, ১ এপ্রিল ১৯২৯। শিক্ষাবিদ, গবেষক। পিরোজপুর সরকারি স্কুল থেকে ১৯৪৫-এ প্রবেশিকা, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৪৭ এ আই.এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫০-এ ইতিহাসে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৫১-তে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. পাস।



১৯৫৩-১৯৫৪ পর্যন্ত চাখার ফজলুল হক কলেজে ও ১৯৫৫-তে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা। ১৯৫৫-র ১৫ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান। ১৯৫৯-এ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. এবং ১৯৬২-তে পিএইচ.ডি. উপাধি অর্জন। মৃত্যু. ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে ১৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী আল-বদর বাহিনীর হাতে নিহত।

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)॥ জন্ম. কেঁওচিয়া গ্রাম, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, ১ জুলাই ১৯০৩। সাহিত্যিক। এক নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলিম ধর্মীয় পরিবারে জন্ম। পিতা মৌলবী ফজলুল রহমান ছিলেন চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদের ইমাম। চট্টগ্রাম সরকারি নিউ স্কিম মাদ্রাসা থেকে মেট্রিক (১৯২৩), ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ. (১৯২৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (১৯২৮) এবং ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.টি. (১৯৩১) পাস। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. (১৯৪০)। ডিগ্রিলাভ কর্মজীবনের শুরু স্কুলশিক্ষক হিসেবে। কাজেম আলী হাই স্কুল (চট্টগ্রাম), সীতাকুণ্ড মাদ্রাসা, খুলনা জেলা স্কুল ও চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা (১৯৩২-১৯৪০)। ১৯৪১-এ কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলার প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৪৬-এ চট্টগ্রাম কলেজে বদলি। ১৯৫৬-তে অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৫৯-এর ১ জানুয়ারি এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯৭৩-এর ১৯ এপ্রিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত। ১৯৭৫-



এর ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব পালন একই বছর ২৬ নভেম্বর (১৯৭৫) রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত। মন্ত্রীর পদমর্যাদায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন। ১৯৭৭-এর ২৩ জুন এই পদ থেকে পদত্যাগ। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' (১৯২৬) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সমাজের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলেন, যার মূল কথা ছিল: 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' তাই বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্র-অনুগত্য থেকে মুক্তি দানের প্রয়াসে আন্দোলন পরিচালনা। আন্দোলনের মুখপত্র ছিল বার্ষিক 'শিখা' (১৯২৭)। মুসলিম সাহিত্যসমাজের সম্পাদক (১৯৩০)। শিখার ৫ম সংখ্যা (১৯৩১) সম্পাদনা। সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক হিসেবে ব্যপক খ্যাতি অর্জন। কথাশিল্পী হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। স্বদেশপ্রীতি, অসাম্প্রদায়িক জীবন চেতনা, সত্যনিষ্ঠা, মানবতা ও কল্যাণবোধ তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রতিপাদ্য। রচনাবলি: উপন্যাস–চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৯৪০), রাঙ্গা প্রভাত (১৯৫৭); গল্পগ্রন্থ–মাটির পৃথিবী (১৯৪০); শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৬৪), নির্বাচিত গল্প (১৯৭৮), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮)। নাটক–কায়েদে আজম (১৯৪৬), প্রগতি (১৯৪৮), স্বয়ম্বরা (১৯৬৬)। প্রবন্ধ-বিচিত্র কথা (১৯৪০), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬১), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন (১৯৬৫), সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র (১৯৬৮, সমকালীন চিন্তা (১৯৭০), মানবতন্ত্র (১৩৭৯), সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৭৪), শুভবুদ্ধি (১৯৭৪), একুশ মানে মাথা নত না করা (১৯৭৮), রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (১৯৭৯)। আত্মকাহিনী ও দিনলিপি–রেখাচিত্র (১৯৬৬), লেখকের রোজনামচা (১৯৬৯), দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২)। জীবনী ও স্মৃতিকথা–সাংবাদিক মজিবর রহমান (১৯৬৭), শেখ মুজিব: তাঁকে যেমন দেখেছি (১৯৭৮)। উপন্যাসে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২), প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৬৩) ও 'রেখাচিত্র' গ্রন্থের জন্য আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬) লাভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ (১৯৭৪)। 'মুক্তবুদ্ধির চির সজাগ প্রহরী' বলে আখ্যায়িত। সজাগ বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে আবুল ফজল ছিলেন নিঃশঙ্কচিত্ত। 'জাতির বিভিন্ন সংকট ও ক্রান্তিলগ্নে তাঁর নির্ভীক ভূমিকার জন্য জাতির বিবেক' বলে স্বীকৃতি লাভ। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ ও মমত্ববোধ। রবীন্দ্রনাথের গান পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৭-এর ২২ জুন রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ৪ মে ১৯৮৩।

আবুল বরকত (১৯২৭-১৯৫২)॥ জন্ম. বাবলা গ্রাম, মুর্শিবাদ, ১৩ জুন ১৯২৭। ভাষা-শহীদ। স্থানীয় তালিবপুর হাইস্কুল থেকে ১৯৪৫-এ মেট্রিক ও বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯৪৭-এ আই.এ. পাস। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট-১৯৪৭) পর ১৯৪৮-এ মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি। ১৯৫১-তে দ্বিতীয় শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি.এ. অনার্স পাস। স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম.এ. ক্লাসের ছাত্র। ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের সম্মুখের রাস্তায় সরকার কর্তৃক আরোপিত ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে বিক্ষোভ প্রদর্শনরত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে উক্ত হোস্টেলের ১২ নম্বর শেডের বারান্দায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের ভর্তি। তাঁর জীবন রক্ষার জন্য ডাক্তারদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে ঐদিন (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) রাত আটটায় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ। ঐ রাতেই তাঁর আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে আজিমপুর গোরস্তানে তাঁর লাশের দাফন। মহান রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের শহীদদের অন্যতম একজন। তাঁর ও অন্যান্য ভাষা শহীদের



আত্মদানের ফলে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ (১৯৫৬)। তাঁদের (ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের) শহীদ স্মৃতি উত্তরকালে বাঙালির জাতীয় চেতনা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত-করণে দিশারি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এই চেতনার বলেই ১৯৭১-এ বাঙালিরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করে। মৃত্যু ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)॥ জন্ম. ধানিখোলা গ্রাম, ময়মনসিংহ, ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮। সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। নাসিরাবাদ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক (১৯১৭), ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ. (১৯১৯), ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. (১৯২১), কলকাতা রিপন ল' কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে বি.এল. পাস। স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর কলকাতায় গমন। সেখানে সাংবাদিকতায় যোগদান। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সাপ্তাহিক 'ছোলতান' ও মওলানা আকরম খাঁর সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'র সহকারী সম্পাদক (১৯২৩-১৯২৬)। ১৯২৬-১৯২৯ পর্যন্ত মৌলভী মজিবুর রহমানের 'দি মুসলমান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা। ১৯২৯-১৯৩৮ পর্যন্ত মৌলভী মজিবর রহমানের 'দি মুসলমান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা। ১৯২৯-১৯৩৮ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জজকোর্টে ওকালতি। এরপর আবার সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর মাসে দৈনিক কৃষক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৪১-এর অক্টোবর মাসে এ.কে. ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে চাকরি লাভ। ১৯৪৬-১৯৪৮ পর্যন্ত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার সম্পাদক। রাজীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯২৩-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পরিচালিত স্বরাজ দলের অন্যতম কর্মী। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদান।

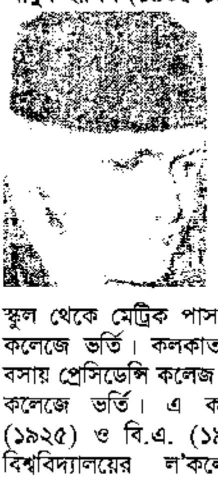


১৯৪৪ থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। কৃষক-প্রজা পার্টির অন্যতম নেতা এবং মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা-নেতা। ১৯৫৩-১৯৫৮ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচি ২১-দফার অন্যতম প্রণেতা। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৫-তে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৪-র যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ১৯৫৬-তে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, ১৯৫৬-১৯৫৭ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক কারণে ১৯৫৮-১৯৬২ পর্যন্ত কারাবরণ। এরপর রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ। পরবর্তী পর্যায়ে দীর্ঘদিন ইত্তেফাক, অবজারভার ও দি পিপলস পত্রিকার সংস্কৃতির বদলে পূর্ববাংলায় মুসলমান জীবনাভত্তিক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রস্তাব উত্থাপন। এই সংস্কৃতিকে সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রস্তাব উত্থাপন। এই সংস্কৃতিকে তৎকর্তৃক 'পাক-বাংলার কালচার' নামে আখ্যায়িত। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে ১৯৬৭-র জুন মাসে পাকিস্তান সরকার রেডিও টেলিভিশন থেকে তা প্রচার বন্ধের পদক্ষেপ নিলে সরকারের সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতির আদর্শের অনুসারী ও তাঁর একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পূর্ববাংলার স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে আপসহীন ভূমিকা পালন। ব্যঙ্গ-সাহিত্য রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। তাঁর ব্যঙ্গ রচনায় সমাজের মুখোশধারী মানুষের অন্তরের রূপ সার্থকভাবে উন্মোচিত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- উপন্যাস: সত্যমিথ্যা (১৯৫৩), জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), আবে হায়াত (১৯৬৮); গল্পগ্রন্থ: আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪), আসমানী পর্দা (১৯৬৪)। রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ: আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯), শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২)। স্মৃতিকথা: আত্মকথা (১৯৭৮)। শিশুসাহিত্য: ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া (১৯৪৯), গালিভরের সফরনামা (১৯৫৯)। ১৯৬০-এ ছোটগল্পে বাংলা

একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। মৃত্যু, ঢাকা, ১৮ মার্চ ১৯৭৯।

আবুল মা' আলী মহাম্মদ হামিদ আলী (১৮৭৫-১৯৫৬)॥ জন্ম, সুলতানপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম ১৮৭৫। কবি, মহাকাব্য রচয়িতা। আরবি, ফার্সি, উর্দুতে সুপণ্ডিত। নোয়াখালী জেলা স্কুল, কুমিল্লা জেলা স্কুল, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী শিক্ষক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: জয়নালোদ্ধার কাব্য (১৯০৭), কাসেম বধকাব্য বা শাহাদতে ইমাম কাসেম (১৯০৪), ভ্রাতৃবিলাপ (১৯০৩), কবিতাকুঞ্জ (গীতি কবিতা, (১৯০৮), সোহরাব বধকাব্য, পারস্য বীর (গদ্য) ইত্যাদি। Students Handbook of Persian Language তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ। মৃত্যু, ১৯৫৬।

আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪)॥ জন্ম, কাশিয়াড়া



গ্রাম, বর্ধমান, ২৭ জানুয়ারি ১৯০৫। চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ। অভিজাত জমিদার পরিবারে জন্ম। বর্ধমানের প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা আবুল কাসেম তাঁর পিতা। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে মেট্রিক পাস (১৯২৩)। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। কলকাতায় পড়ালেখায় মন না বসায় প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করে বর্ধমান রাজ কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে আই.এ. (১৯২৫) ও বি.এ. (১৯২৮) পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল'কলেজ থেকে বি.এল. ডিগ্রিলাভ (১৯৩১) করে বর্ধমান আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। অল্পকালের মধ্যেই একজন দক্ষ আইনজীবী হিসেবে সুনাম অর্জন। ১৯৩৬-এ বর্ধমান থেকে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৩৭-এ মুসলিম লীগে যোগদান। সার্বক্ষণিকভাবে দলের সাংগঠনিক কার্য পরিচালনার জন্য আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ। ১৯৩৮-এ বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ও ১৯৪২-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪৩-এর ৭ নভেম্বর কাউন্সিল সভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৪৪-এর নভেম্বর এক বছর পুনঃনির্বাচিত। মুসলিম লীগকে একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কঠোর পরিশ্রম। দলের সাংগঠনিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ। জেলা ও মহকুমা লীগের কমিটিসমূহ পুনর্গঠিত করে ও শতশত জনসভায় লীগের আদর্শ প্রচার করে নামসর্বস্ব মুসলিম লীগকে একটি শক্তিশালী দলে রূপান্তরিত। তাঁর কর্মকুশলতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও সাম্যবাদী আদর্শে মুগ্ধ হয়ে বাংলার মুসলমান তরুণসমাজ ব্যাপকভাবে লীগের পতাকাতলে সমবেত। ফলে, লীগ একটি গণসংগঠনে পরিণত হয় এবং ১৯৪৬-এর বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে মুসলিম লীগের অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ। তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী বামপন্থি গ্রুপের সৃষ্টি, যার পশ্চাতে ছিল দেশের ছাত্র ও যুব সমাজ। আবুল হাশিমের প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে পারেন নি। দলের কেন্দ্রীয় কমিটি ও সংসদীয় কমিটি তাঁদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তাঁরা আবুল হাশিমকে 'কমিউনিস্ট, 'পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী, 'স্বাধীন বাংলার প্রবক্তা' প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করে তাঁর রাজনৈতিক উত্থান প্রতিরোধ করে। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে রেটিনাইটিস পিগমেনটোসা নামক চোখের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অন্ধত্ববরণ। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান। ১৯৫০-এ কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আগমন। ১৯৫২-তে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য নিযুক্ত। বায়ান্নোর ২০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সংগ্রাম পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব। ভাষা-আন্দোলনে ভূমিকা রাখায় ২৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) গ্রেফতার। ১৬ মাস কারানির্যাতন ভোগের পর ১৯৫৩-তে জেল থেকে মুক্তিলাভ। খেলাফতে রব্বানী পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ। ১৯৫৬ পর্যন্ত এ পার্টির সভাপতি। এরপর পুনরায় মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৬০-এ ইসলামিক একাডেমির প্রথম পরিচালক নিযুক্ত। ১৯৬২-র ৫ সেপ্টেম্বর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ (কনভেনশন)-এর পূর্ব পাকিস্তান কমিটির প্রধান অর্গানাইজার নিযুক্ত। প্রায় দেড় বছর এ পদে দায়িত্ব পালন। মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় ১৯৬৫-র ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন কনভেনশন

মুসলিম লীগের প্রার্থী আইয়ুব খানের প্রতি সমর্থন প্রদান। পরে মুসলিম লীগের রাজনীতি পরিত্যাগ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতিসত্তার যে বিকাশ ঘটে তার একজন তাত্ত্বিক। ১৯৬৭-র ২২ জুন পাকিস্তান সরকারের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন রেডিও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন। সুবক্তা, ইসলামিক চিন্তাবিদ ও রাজনীতির পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন। আবুল হাশিম প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনামলে ইসলামিক একাডেমির পরিচালক নিযুক্ত হলেও আইয়ুব সরকারের বাঙালিবিরোধী কার্যক্রমের প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে অবস্থান করলেও পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কাজ করেননি। ইসলামিক তত্ত্বের লেখক হিসেবে খ্যাত। প্রকাশিত গ্রন্থ: The Creed of Islam 1950, As I See it 1965, Integration of Pakistan 1967, Arabic Made Eassy 1969, রব্বানী দৃষ্টিতে (১৯৭০), In Retrospection (1974) ইত্যাদি। মৃত্যু. ঢাকা ৪ অক্টোবর, ১৯৭৪।

আবুল হাশেম (১৮৯৮-১৯৮৫)॥ জন্ম. খাগড়বাড়িয়া গ্রাম, পাবনা, ২০ নভেম্বর, ১৮৯৮। সাহিত্যিক। পাবনা বনওয়ারীনগর হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস (১৯১৯)। রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. (১৯২১) ও তৃতীয় বিভাগে বি.এ. (১৯২৩) পাস। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.টি. ডিগ্রি লাভ (১৯৩০)। স্কুল শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু (১৯২৩)। বনওয়ারীনগর হাইস্কুল, নাসিরাবাদ হাই মাদ্রাসা, করটিয়া রোকেয়া মাদ্রাসা ও কলকাতার চেতলা হাইস্কুলে প্রায় সাত বছর (১৯২৪-১৯৩১) শিক্ষকতা। ১৯৩১-এ সাব-ইন্সপেক্টর অব স্কুল পদে সরকারের শিক্ষা বিভাগে চাকরি লাভ। ১৯৫৭-তে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু। সংবেদনশীলতা ও মানববোধ ছিল তাঁর জীবনদর্শন। তাঁর চেতনায় শাস্ত্রীয় ধর্ম ও মানবধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। কবিতা রচনায় সাফল্য লাভ। 'কথিক' (১৯৩৮) তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ। প্রকাশিত গ্রন্থ-কাব্য: মোস্তফানামা (চরিতকাব্য-১৯৬০) ও তকবির (১৯৬০)। উপন্যাস: আলো ও আলেয়া (১৯৬৫), শ্রান্ত বলাকা (১৯৭০)। গল্প: অরণ্যের বিভীষিকা (১৯৬২)। নাটক: মাস্টার সাহেব (১৯৪৭)। মৃত্যু. ২৪ জুন, ১৯৮৫।



আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (১৯২৬-১৯৭৫)॥ জন্ম. রাজশাহী শহর, ১৯২৬। রাজনীতিবিদ। ভূ-স্বামী পরিবারে জন্ম। কামরুজ্জামান নামে সমধিক পরিচিত। ১৯৪৬-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স-সহ স্নাতক এবং ১৯৫৬-তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল পাস। ১৯৪২-এ নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের রাজশাহী জেলা শাখার সম্পাদক, ১৯৪৩-১৯৪৫ পর্যন্ত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের সহ-সভাপতি। ১৯৫৬-তে রাজশাহী আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। একই বছর রাজশাহী মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্বাচিত এবং আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৫৫-১৯৬৪ পর্যন্ত রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক। ১৯৬২-র এপ্রিল মাসে প্রথমবার ও ১৯৬৫-র মার্চ মাসে দ্বিতীয়বার রাজশাহী থেকে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬২-১৯৬৪ ও ১৯৬৫-১৯৬৯ পর্যন্ত জাতীয় পরিষদে সম্মিলিত বিরোধী দলের সম্পাদক। ১৯৬৭-১৯৭০ পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ও ১৯৭০-১৯৭১ পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। আইয়ুব সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে ও ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা দাবির সমর্থনে ১৯৬৯-এর ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের সদস্য থেকে পদত্যাগ। আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলন চলাকালে দেশের রাজনৈতিক সংকটে মীমাংসাকল্পে রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব

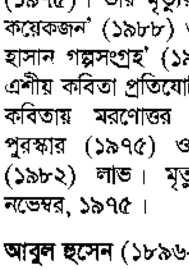


খাঁ কর্তৃক আহূত গোলটেবিল বৈঠকে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১০-১২ মার্চ ১৯৬৯) আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ। ১৯৭০-এর নির্বাচনে রাজশাহী-৬ আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭০ ও ১৯৭৩-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য। ১৯৭১-এ স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগরে গমন। একই বছরের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী নিযুক্ত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১-এর ২৩ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র, সাহায্য ও পুনবার্সন মন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত ত্রাণ ও পুর্নবাসনমন্ত্রী এবং ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত বাণিজ্যমন্ত্রী। ১৯৭৩-এর নির্বাচনে রাজশাহী-১০ ও রাজশাহী-১১ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭৪-এর ১৮ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ। একই বছরের ২০ জানুয়ারি কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত এবং ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এপদে অধিষ্ঠিত। একই বছরে ২৫ জানুয়ারি (১৯৭৫) মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হলে শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ। ১৯৭৫-এর ৭ জুন বাকশালের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নিযুক্ত। ঐ বছরের ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর একটি দলের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে মন্ত্রিত্ব হারান ও কারারুদ্ধ হন। একই বছরের নভেম্বর মাসে জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় কারাগারে প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে প্রবেশকারী সশস্ত্র বাহিনীর কতিপয় ব্যক্তির হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত। কামরুজ্জামান বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্থপতিদের একজন। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁর দান অপরিসীম। মৃত্যু. কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা, ৩ নভেম্বর ১৯৭৫।

আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫)॥ জন্ম. মাতুলালয়, বর্নি গ্রাম, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ, ৪ আগস্ট, ১৯৪৭। পৈতৃক নিবাস ঝনঝনিয়া গ্রাম, নাজিরপুর, পিরোজপুর। কবি ও সাংবাদিক। প্রকৃত নাম আবুল হোসেন মিয়া। আবুল হাসান তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম পুলিশ অফিসার (ও.সি.) আলতাফ হোসেন মিয়া তাঁর পিতা। ঢাকার আরমানিটোলা সরকারি স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এস.এস.সি. (১৯৬৩) ও বরিশাল ব্রজমোহন সরকারি কলেজ থেকে বিজ্ঞান শাখায় দ্বিতীয় বিভাগে এইচ.এস.সি. (১৯৬৫) পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে বি.এ. অনার্স ক্লাসে ভর্তি। বি.এ. সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ। ১৯৬৯-এর প্রথম দিকে দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার বার্তা বিভাগে চাকরি গ্রহণ। 'গণবাংলা'-র সহকারী সাহিত্য সম্পাদক (১৯৭২-১৯৭৩), দৈনিক 'জনপদ'-এর সহকারী সম্পাদক (১৯৭৩-১৯৭৪), দৈনিক 'গণকণ্ঠ'-এর সহ-সম্পাদক (১৯৭৪) হিসেবে দায়িত্ব পালন। সৃষ্টিশীল কবি হিসেবে খ্যাত। মাত্র এক দশক কাব্য-সাধনায় আধুনিক বাংলাকাব্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার। আত্মগত দুঃখবোধ, মৃত্যুচেতনা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গচেতনা, স্মৃতিমুগ্ধতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আবুল হাসানের কবিতায় সার্থকভাবে প্রতিফলিত। প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ: 'রাজা যায় রাজা আসে' (১৯৭২), 'যে তুমি হরণ কারো' (১৯৭৪) ও 'পৃথক পালঙ্ক' (১৯৭৫)। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কাব্যনাট্য 'ওরা কয়েকজন' (১৯৮৮) ও তাঁর গল্প সংকলন 'আবুল হাসান গল্পসংগ্রহ' (১৯৯০) প্রকাশিত। ১৯৭০-এ এশীয় কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার। কবিতায় মরণোত্তর বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৫) ও মরণোত্তর একুশে পদক (১৯৮২) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, হৃদরোগে, ২৬ নভেম্বর, ১৯৭৫।



আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮)॥ জন্ম. মাতুলালয়, পানিসারা গ্রাম, যশোর, ৬ জানুয়ারি, ১৮৯৬। পৈতৃক নিবাস কাউরিয়া গ্রাম, যশোর। চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক। বিশিষ্ট আলেম হাজী মোহাম্মদ মুসা তাঁর পিতা। যশোর জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাস (১৯১৪)। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই.এ. (১৯১৬) ও বি.এ. (১৯১৮) পাস। সকল পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯২০)। একই বছর



কলকাতা হেয়ার স্কুলে সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত। ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এর অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান। ১৯২২-এ বি.এল. ও ১৯৩১-এ মাস্টার অব ল ডিগ্রি লাভ। ১৯৩২-এ কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি পেশায় যোগদান। বাংলার বিধানসভা-কর্তৃক গ্রহীত ওয়াক্‌ফ আইনের মূল খসড়ার রচয়িতা। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মুক্তবুদ্ধিচর্চাকে প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ। এ সমাজের বক্তব্য ছিল: 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' এর সভ্যরা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলেন। আবুল হুসেন ছিলেন এ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। তাঁদের সাধনার ফলে মুসলমান যুব সমাজের মধ্যে উদার মননশীলতা ও সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে। সমাজের মুখপত্র ছিল 'শিখা' (১৯২৭-১৯৩১)। এর প্রথম বর্ষের সম্পাদক। মননশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাত। মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো প্রসারের জন্য লেখনী পরিচালনা। 'বাংলার বলশী' (১৯২৫), 'বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা' (১৯২৮) ও 'মুসলিম কালচার' (১৯২৮) আবুল হুসেনের তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থ। কৃষকদের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। তাদের দুঃখ-দুর্দশা চিহ্নিত করে ও মুক্তির পথ নির্দেশ করে 'বাংলার বলশী' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো রচিত। রুশ বিপ্লবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তৎকর্তৃক 'কৃষকের আর্তনাদ', 'কৃষকের দুর্দশা' ও 'কৃষি বিপ্লবের সূচনা' নামক প্রবন্ধ রচনা। মুক্তবুদ্ধি ও উদার চিন্তার অধিকারী আবুল হুসেন ছিলেন তাঁর সমকালের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এ দেশে অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। মৃত্যু. কলকাতা, ক্যান্সারে, ১৫ অক্টোবর ১৯৩৮।

আবু সাঈদ (?-১৯৭১)॥ জন্ম. রাজশাহী। রাজনীতিক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী। রাজশাহী জেলা সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকার রাজশাহীর প্রতিনিধি। রাজশাহী সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট কর্মী। ১৯৭১-এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলনকালে রাজশাহী সাংবাদিক-শিল্পী-সাহিত্যিক সংগ্রাম পরিষদ যে আন্দোলন চালায় তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাকবাহিনীর কয়েকজন সদস্য তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলের বন্দীশালায় হত্যা করে, ৫ জুলাই ১৯৭১।

আবু সাঈদ চৌধুরী, বিচারপতি (১৯২১-১৯৮৭)॥ জন্ম. নাগবাড়ী গ্রাম, টাঙ্গাইল, ৩১ জানুয়ারি ১৯২১। বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি ও বুদ্ধিজীবী। পিতা সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের স্পিকার আবদুল হামিদ চৌধুরী। জমিদার



পরিবারে জন্ম। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৪০), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. ও ল পাস। আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ইংল্যান্ড গমন। লন্ডনের লিংকনস ইন থেকে বার-এট ল ডিগ্রি লাভ। খ্যাতনামা ছাত্রনেতা। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক (১৯৪০), নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক (১৯৪০) ও নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের ব্রিটিশ শাখার সভাপতি (১৯৪৬)। ১৯৪৭-এ কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আগমন ও ১৯৪৮-এ ঢাকা হাইকোর্টে ওকালতি পেশায় যোগদান। ১৯৬০-এ পূর্ব-পাকিস্তানের অ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত। ১৯৬১-র ৭ জুলাই ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্তি লাভ। প্রায় দশ বছর এ পদে দায়িত্ব পালন। শাসনতন্ত্র কমিশনের সদস্য (১৯৬০-১৯৬১) ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি (১৯৬৩-১৯৬৮)। ১৯৬৯-এর ২০ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য জেনেভায় গমন। একই বছর মার্চ মাসে পূর্ববাংলায় অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে সেনাবাহিনীর উপর্যুপরি গুলিবর্ষণে ছাত্র-জনতা নিহত হওয়ার প্রতিবাদে উপাচার্যের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে জেনেভা হতে পাকিস্তান সরকারের নিকট পদত্যাগপত্র প্রেরণ। বিদেশি বেতারে ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার সংবাদ শুনে জেনেভা থেকে

লন্ডন আগমন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে ঢাকা থেকে ব্রিটিশ হাই কমিশন অফিস কর্তৃক সেখানে প্রেরিত টেলেক্স পড়ে জানতে পারেন বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নিষ্ঠুর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিস্তারিত তথ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ অবলম্বন। ২৩ এপ্রিল (১৯৭১) প্রবাসে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত নিযুক্ত। লন্ডনে দপ্তর স্থাপন করে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি রূপে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন। স্বাধীনতা লাভের পর লন্ডন থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। ১৯৭২-এর ১২ জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত। ১৯৭৩-এর ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২) অনুসারে পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। একই বছর ২৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ এবং একজন কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদায় সরকারের আন্তর্জাতিক বিষয়াদির বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত। প্রায় দেড় বছর এ পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৭৫-এর ৮ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাকশাল (কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) দলীয় সরকারের বন্দর জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত। একই বছর ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের হাতে নিহত হওয়ার পর খোন্দাকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হলে তাঁর (মোশতাক আহমদ) সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী (২০ আগস্ট-৬ নভেম্বর ১৯৭৫)। ৭ নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এলে মন্ত্রিত্ব থেকে চ্যুত। ১৯৭৮-এ জাতিসংঘের সংখ্যালঘু বৈষম্য প্রতিরোধ ও অধিকার সংরক্ষণ কমিশনের সদস্য নির্বাচিত। তিন বছর মেয়াদি এ পদে পরপর তিনবার নির্বাচিত। ১৯৮৫-১৯৮৬-তে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান। উদার গণতন্ত্রী, মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি গভীর আস্থাশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত সংগঠনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশিকোত্তম উপাধি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর-অব-ল ডিগ্রিলাভ। 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি' (১৯৯০) তাঁর রচিত একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। মৃত্যু. লন্ডন, ২, আগস্ট ১৯৮৭

আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২)। জন্ম. কলকাতা, এক অবাঙালি উর্দুভাষী পরিবারে, ১৯০৬। প্রাবন্ধিক, নন্দনতাত্ত্বিক, দার্শনিক। সেন্ট অ্যান্টনিজ মিশনারি স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এসসি.-তে ভর্তি। পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। স্বাস্থ্যগত কারণে এম.এসসি. পরীক্ষা অসমাপ্ত রেখে দর্শনে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। উচ্চতর গবেষণা বৃত্তি লাভ। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'Content of Errors in Perception and Thought'. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে এবং অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়ান স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা। সমাজ সচেতন সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে খ্যাতি অর্জন। 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' (১৯৪১)-এর আহ্বানে ১৯৪২-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলায় শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের প্রথম রাজ্য সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম। কৈশোরে উর্দু ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি পাঠ করে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহবোধ। এর থেকেই বাংলাভাষা শিক্ষার শুরু। অনলস সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমে কালক্রমে রবীন্দ্র-আলোচক, নন্দনতাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং বিশিষ্ট বাংলা গদ্যশৈলীর স্রষ্টা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৮), পান্থজনের সখা (১৯৭৩), পথের শেষ কোথায় (১৯৭৭)। অনুবাদ: গালিবের গজল থেকে (১৯৭৬)। সম্পাদনা: আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৪০) [হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহযোগে], পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা (১৯৫৭)। ১৯৭০-এ প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্যে 'ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কারে সম্মানিত। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে আবু সয়ীদ আইয়ুবের স্থান অতি উচ্চে। শিল্পীসুলভ সহৃদয়তা ও যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ তাঁর গদ্যের বৈশিষ্ট্য। চিন্তার কৌলীন্য ও গভীরতা এবং ভাষার প্রসাদগুণ ও লাবণ্য তাঁর রচনার প্রাণ। মৃত্যু. কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮২



আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯)। জন্ম গোবিন্দা গ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৬। শিক্ষাবিদ, কবি, লেখক। ১৯৫২-তে পাবনা জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক ও ১৯৫৪-তে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ. পাস। মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ত্রয়োদশ স্থান ও আই.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সপ্তম স্থান অধিকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮-তে বাংলায় বি.এ. অনার্স ও একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯-এ বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ। স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। ১৯৬৬-১৯৬৯-এ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বেঙ্গলি প্রেস অ্যান্ড লিটারারি রাইটিং-১৮১৮-১৮৩১' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কলেজ ও রাজশাহী সরকারি কলেজে কিছুকাল অধ্যপনা। ১৯৬২-তে সহকারী পরিচালক পদে জনসংযোগ পরিদপ্তরে (ইডেন বিল্ডিং-এ) যোগদান। প্রায় এক বছর এ পদে কর্মরত। ১৯৬৩-র ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬৫-র ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান। ১৯৭০-এ ২০ ডিসেম্বর সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে রাজশাহী বেতারে পাকিস্তানের পক্ষে অনুষ্ঠান করার দায়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসে কিছুদিন কারাভোগ। ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে যোগদান। ১৯৭৬-এর ২৬ জুন অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৭৮-এর ১ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগদান। ১৯৮৪-র ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক নিযুক্ত। এ পদে প্রায় দেড় বছর দায়িত্ব পালনের পর ১৯৮৬-র ১১ মার্চ বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের পদে যোগদান। মৃত্যুকাল অবধি এ পদে অধিষ্ঠিত। কবিতা, প্রবন্ধ ও গদ্যলিখে সুনাম অর্জন। সুবক্তা, টেলিভিশনের বাককুশল রসিক উপস্থাপক ও আলোচক হিসেবে খ্যাত। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: কাব্য-আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪), যেহেতু জন্মান্ধ (১৯৮৪), আক্রান্ত গজল (১৯৮৮); প্রবন্ধ-গবেষণা- শিল্পীর রূপান্তর (১৯৭৫), The Bengali Press and Literary Writing (১৯৭৭), কথা ও কবিতা (১৯৮১), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৫), সুহৃদ সাহিত্য স্বর্ণপদক (১৯৮৬), একুশে পদক (১৯৮৭, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্বর্ণপদক (১৯৮৯), সাদত আলী আকন্দ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১) লাভ। মৃত্যু ঢাকা, হৃদরোগে, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।



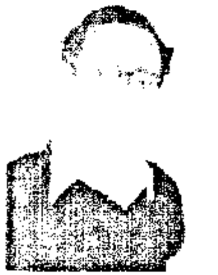
আবু হোসেন সরকার (১৮৯৪-১৯৬৯)। জন্ম. রংপুর, ১৮৯৪। রাজনীতিবিদ। কৈশোরেই স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান করলে ১৯১১-তে গ্রেফতারবরণ। ১৯১৫-তে মেট্রিক পাস। বি.এল. পাস করে রংপুরে ওকালতি শুরু। কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনে সংযুক্ত। কয়েকবার কারাবরণ। কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে ১৯৩৫-এ এ.কে. ফজলুল হকের কৃষকপ্রজা পার্টিতে যোগদান। ১৯৩৭-এ কৃষক প্রজা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। ১৯৫৩-র ২৭ জুলাই শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীনে কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠন। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৫-তে অল্পদিনের জন্য পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ১৯৫৫-র ৬ জুন থেকে ১৯৫৬-র ৩০ আগস্ট পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' ও 'সরকারি ছুটি দিবস' হিসেবে স্বীকৃতিদান এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে যেখানে ভাষাসৈনিকরা শহীদ হয়েছিলেন সে স্থানে কেন্দ্রীয় 'শহীদ মিনারের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা তাঁর সরকারের প্রধান কীর্তি। তাঁর সরকার কর্তৃক রেশনিং ব্যবস্থা



প্রত্যাহৃত হলে দেশে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যাভাব দেখা দেয়। খাদ্যের দাবিতে ঢাকায় ঐতিহাসিক ভুখা মিছিল অনুষ্ঠিত হলে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ (৩০ আগস্ট ১৯৫৬)। ১৯৫৬-১৯৫৮ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলের নেতা এবং একই সঙ্গে কৃষক-শ্রমিক পার্টির সভাপতি। আইয়ুব খানের সামরিক সরকার কর্তৃক তাঁর উপর এবডো আইন প্রয়োগ। ১৯৬২-তে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীনে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট সংগঠনে অংশগ্রহণ এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। মৃত্যু. ঢাকা ১৭ এপ্রিল ১৯৬৯।

আবেদ আলী খান, খানসাহেব (১৮৭২-১৯২৬)॥ জন্ম. আড়াইডাঙ্গা, মালদহ, ১৮৭২। গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু। পরে মালদহ জেলা স্কুলে কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা লাভ। বাকিপুরস্থ বিহার স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষালাভ। বাঁকিপুর ইন্ডিয়ান মোহামেডান ট্রেডিং কোম্পানিতে ম্যানেজার হিসেবে চাকরি জীবন শুরু। ১৮৯৯-তে বাংলা সরকারের পূর্ত বিভাগে চাকরি গ্রহণ। এই চাকরিসূত্রে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার প্রাচীন কীর্তি সংস্কারের দায়িত্ব নিয়ে মালদহ গমন। দীর্ঘদিন পূর্ত বিভাগের এ কাজে নিয়োজিত। ১৯১৭-তে খানসাহেব উপাধি লাভ। তাঁর স্মরণীয় কীর্তি: Memories of Gaur and Pandua 1912। গ্রন্থটি পরে এইচ. ই. স্টেপলটন কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত। অন্যান্য গ্রন্থ: উর্দু ও ফার্সি গজলের বই গুলশান-ই-হিন্দ, Prayer Book for Muslims এবং বাংলা ও উর্দু ভাষার শিশুদের জন্যে দুটি প্রাথমিক শিক্ষার বই। মৃত্যু. ১৪ নভেম্বর ১৯২৬।

আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০১-১৯৫৯)॥



বলরামপুর গ্রাম, তুফানগঞ্জ-কুচবিহার, ২৭ অক্টোবর ১৯০১। সংগীতশিল্পী। জোতদার পরিবারে জন্ম। পিতা জাফর আলী আহমদ ছিলেন তুফানগঞ্জ আদালতের উকিল। স্ত্রী লুৎফুন্নেসা। তুফানগঞ্জ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস। কুচবিহার কলেজে আই.এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। বি.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য। কলকাতায় বাংলা সরকারের রেকর্ডিং এক্সপার্ট এবং পরে অতিরিক্ত সঙ পাবলিসিটি অফিসার পদে দায়িত্ব পালন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর ঢাকায় আগমন এবং স্থায়ীভাবে বাস। পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগে এডিশনাল সঙ অর্গানাইজার। সহজাত সংগীতশিল্পী। কোন ওস্তাদের কাছে গানের তালিম গ্রহণ করেন নি। বাল্যকাল থেকে সংগীতের প্রতি ছিল তাঁর অদম্য ঝোঁক। অদ্ভুত সুন্দর ছিল তাঁর গলা। যে কোন গান দু'একবার শুনলেই তার সুর আয়ত্ত করতে পারতেন। নিজের সাধনায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে নিখুঁতভাবে গান গাওয়া শেখেন। সরকারি চাকরিতে যোগদানের পরপরই কলকাতায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সহচার্য লাভ এবং সংগীতজগতে প্রবেশ। কলকাতার গ্রামোফোন কোম্পানি হিজ মাস্টার্স ভয়েস থেকে নজরুলের 'কোন বিরহীর নয়ন জলে', 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়', শৈলেন রায়ের 'আজি শরতের রূপ দীপালি' এবং জিতেন মৈত্রের 'ওগো, প্রিয়া নিতি আসি' এ চারখানি গান রেকর্ড করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন। 'বেণুকার বনে কাঁদে', 'অনেক ছিল বলার', 'গাঙে জোয়ার এলো', 'বন্ধু আজো মনে রে পড়ে' প্রভৃতি নজরুল-গীতির রেকর্ড প্রকাশ। নজরুলকে দিয়ে ইসলামি গান লিখিয়ে তাতে কণ্ঠদান। সে কালের অধিকাংশ মুসলমান ছিল সংগীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। গান গাওয়া ও গান শোনা উভয় ছিল তাদের কাছে অধর্মের কাজ। আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে নজরুলের 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে', 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ', 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' প্রভৃতি ইসলামিক গান শুনে গানের প্রতি মুসলমান সমাজের আগ্রহ জাগে। এরপর পল্লীগীতিতে কণ্ঠদান। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, মুর্শিদি, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদী প্রভৃতি লোকগীতির অনন্যসাধারণ গায়ক। আধুনিক গান, কীর্তন আর রবীন্দ্র-নজরুল-দ্বিজেন্দ্রলাল-সজনীকান্তের গানের যুগে মন মাতানো ও প্রাণ নাচানো সুরে পল্লীগীতি গেয়ে তাকে কলকাতার অভিজাত সমাজে জনপ্রিয় করে তোলেন। 'ওকি গাড়িয়াল ভাই, 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে' প্রভৃতি ভাওয়াইয়া গান এবং 'আমার গহীন গাঙের নাইয়া' 'নদীর কূল নাই কিনারা নাই' প্রভৃতি ভাটিয়ালি গান তাঁর কণ্ঠে রেকর্ডিং হলে নজিরবিহীন জনপ্রিয়তা লাভ। তিনি সংগীতকে গ্রহণ করেছিলেন গণ-মানুষের কল্যাণসাধনের

মানসে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে সামাজিক সমস্যামূলক, জাতিগঠনমূলক ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন। গান গেয়ে অবিভক্ত বঙ্গে মুসলমান সমাজে নবজাগরণ আনেন। যুগস্রষ্টা পল্লীগীতির শিল্পী। বিশুদ্ধ উচ্চারণ ভঙ্গি, অনুপম সুরেলা কণ্ঠ, তাল-লয় ও মাত্রাজ্ঞান সমন্বিত হয়ে তাঁর কণ্ঠে পল্লীগীতির এক নতুন ব্যঞ্জনা লাভ। একজন লেখকও বটেন। 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' (১৯৬০) তাঁর রচিত একখানি সরস আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। সংগীত অবদান রাখায় পাকিস্তান সরকার কর্তৃক মরণোত্তর প্রাইড অব পারফরমেন্স (১৯৬০) ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মরণোত্তর স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৮১) প্রদান। মৃত্যু. ঢাকা, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৯।

আভা আলম (১৯৪৭-১৯৭৬)॥ জন্ম. মাদারীপুর, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭। পরে ময়মনসিংহ শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু। উচ্চাঙ্গ সংগীতের কণ্ঠশিল্পী। পিতা হরিপদ দে। সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্ম। পৈতৃক নাম আভা দে। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে গীতিকার ও সংগীতপিপাসু তরীকুল আলমের সঙ্গে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ (১৯৬৪) ও আভা আলম নাম ধারণ। প্রথমে পিতার কাছে সংগীতবিদ্যায় হাতেখড়ি। পরে ময়মনসিংহের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ মিথুন দের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম গ্রহণ। ১৯৫৯-এ তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন শুরু। বিভিন্ন সময়ে করাচি, রাওয়ালপিণ্ডি, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে সংগীত পরিবেশন। প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী মালিক-ই-মুশিকী রওশন আরা বেগমের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সংগীত প্রসার সমিতি, ছায়ানট, আলতাফ মাহমুদ সংগীত একাডেমি ও আতিক সংগীত একাডেমিসহ ঢাকার বিভিন্ন সংগীত ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সংগীত শিক্ষিকা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও



ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের উচ্চাঙ্গ সংগীত পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। নিখিল পাকিস্তান সংগীত সম্মেলনে ১ ঘণ্টাব্যাপী 'পুরিয়া ধানেশ্রী রাগ' পরিবেশন করে সংগীত অনুরাগীদের মন জয়। সংগীতে বিশেষ অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক (মরণোত্তর) লাভ, ১৯৭৮। মৃত্যু. ২১ নভেম্বর ১৯৭৬।

আমতুস সালাম (১৯০৭-১৯৮৫)॥ জন্ম. ১৯০৭, পাঞ্জাব, ভারত। গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলনের নেত্রী। গান্ধীজির আত্মিক কন্যা হিসেবে পরিচিত। ছোটবেলা পর্দাপ্রথায় জীবন কাটালেও তিনি পরে আশ্রমকন্যা হয়ে সত্যাগ্রহী হিসেবে দীক্ষিত হন। ছয় ভাই-বোন মিলে সবরমতী নদীর তীরে গান্ধী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৬-এর ৭ নভেম্বর মহাত্মা গান্ধীর শান্তিপদযাত্রায় অংশ নিতে নোয়াখালীতে এসেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তিনি রামগঞ্জের শিরণ্ডি গ্রামে হিন্দুদের কালীমূর্তির তিনটি লুণ্ঠিত খড়্গ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে অনশন করেন। ২৪ দিন অনশন শেষে ২১ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী তাঁর অনশন ভঙ্গ করান। দশঘরিয়া গ্রামে হিন্দুনারীদের জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরের খবর পেয়ে আমতুস সালাম তাদেরকে সান্ত্বনা দেন এবং গান্ধী ঐ গ্রামে যাওয়ার আগেই তাদের স্বধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। দেশভাগের পরে ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। কিন্তু আমতুস সালাম মানুষকে সেবা করার জন্য নোয়াখালীর গ্রামেই থেকে যান। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে আবার দাঙ্গা শুরু হলে নোয়াখালীর গ্রামে থাকা তাঁর জন্য সম্ভবপর হয়নি। তিনি মার্চ মাসে ঢাকা-কলকাতা হয়ে দিল্লি ফিরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ফেরার পথে শিয়ালদা স্টেশনে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী জওহেরলাল



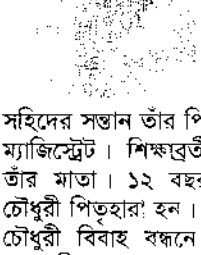
নেহেরুকে অবহিত করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল প্রকার সংখ্যালঘু নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। মৃত্যু. নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৫।

আমানত শাহ (১৭৬০-১৮৫০)॥ জন্ম. বিহার, আনুমানিক ১৭৬০-১৭৭০। সুফিসাধক। বড়পির আবদুল কাদের জিলানির বংশধর। পূর্বপুরুষেরা বাগদাদ থেকে ভারতের বিহারে আসেন। প্রথম জীবন অতিবাহিত হয় বিহারে। আনুমানিক ১৭৯৩-তে বিহার থেকে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে আগমন। জীবিকা নির্বাহের জন্য চট্টগ্রাম আদালতে চাপরাশির চাকরি গ্রহণ। জনজীবনের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করার ফলে লোক-সমাজে 'খানসাহেব' নামে পরিচিতি লাভ। আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। পরবর্তীকালে চাকরি ছেড়ে চট্টগ্রাম জেলখানার উত্তর পাশে লালদীঘির নিকটে আস্তানা স্থাপন। আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে অসংখ্য ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ। লোকের বিশ্বাস লোকান্তরিত আমানত শাহও আধ্যাত্মিক মহিমার অধিকারী এবং পার্থিব মানুষের কল্যাণ কামনায় নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার ওপরে অসংখ্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রতি বছর জিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখে তাঁর 'উরশ' (স্মৃতিবার্ষিকী) উৎসব হয়। মৃত্যু. আনুমানিক ১৮৪০-১৮৫০।

আমিনুল হক (১৯৩২-১৯৫০)॥ জন্ম. সোনাপুর, নোয়াখালী, ১৯৩২। আইনজীবী। এম.এ. (অর্থনীতি) ও এল.এল.বি. পাস। প্রথম জীবনে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে কমিশন অফিসার (পাইলট) পদে যোগদান। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো বলে চাকরি পরিত্যাগ করে আইন ব্যবসায় শুরু। ১৯৬২-তে হাইকোর্টে যোগদান। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। বিনা পারিশ্রমিকে আবদুর রাজ্জাক, কর্নেল তাহের, মেজর (অব.) এম.এ. জলিল, আসম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, কর্নেল (অব.) শওকত আলী, সাজেদা চৌধুরী, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত প্রমুখ রাজবন্দীর মামলা পরিচালনা। ১৯৯০-এর ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল নিযুক্ত। এ পদে দায়িত্ব পালনকালে সাবেক সামরিক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অস্ত্র ও অর্থ মামলায়, উপজেলা চেয়ারম্যান পদ বাতিল সংক্রান্ত রিট মামলায় ও জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজমের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত রিট মামলায় সরকারের পক্ষাবলম্বন। তাঁর সততা, দেশপ্রেম ও মানবিক গুণাবলি সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে (১৯৭১) তাঁর অবদান স্মরণীয়। দেশে আইনের শাসন, নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের একজন সাহসী সৈনিক। বাঙালি জাতীয়তাবাদের একজন দৃঢ় সমর্থক। আওয়ামী লীগের রাজনীতির একজন পৃষ্ঠপোষক। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার (১৯৬৮) অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক তাঁর অনুজ সহোদর। মৃত্যু. ঢাকা, হৃদরোগে, ১৩ জুলাই ১৯৯৫।

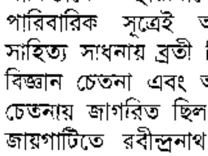


আমীর হোসেন চৌধুরী (১৯১০-১৯৬৪)॥ জন্ম. ভাগলপুর, বিহার, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯১০। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার দোহার থানার রায়পাড়া গ্রাম। পিতা তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, মাতা হোমায়েরা খাতুন। রাইপাড়ার জমিদার চৌধুরী মোহাম্মদ সহিদের সন্তান তাঁর পিতা। তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। শিক্ষাব্রতী রোকেয়ার ছোট বোন তাঁর মাতা। ১২ বছর বয়সে আমীর হোসেন চৌধুরী পিতৃহারা হন। ১৯৪০-এ আমীর হোসেন চৌধুরী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন খিদিরপুরের ব্যবসায়ী জানে আলমের কন্যা গুলশান আরার সঙ্গে। বাবার মৃত্যুর পর মা তাঁকে ও তাঁর ছোট বোন নূরীকে নিয়ে রোকেয়ার কাছে চলে যান।



ছাত্রজীবন থেকেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। রাজনৈতিক কারণে কয়েকবার কারাবরণও করেছেন ছাত্রজীবনে। 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণের আন্দোলনেও সম্পৃক্ত ছিলেন। বেকার হোস্টেলে থেকে ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়ন এবং ১৯৩৩-এ বি.এ. পাস। কর্মজীবন শুরু সরকারি চাকরিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনচেতা হওয়ার কারণেই সরকারি চাকরি ছেড়েই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'রিমা কেমিক্যাল' থেকে এলিওসিন পেটেন্ট ঔষুধ তৈরি করা হতো। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কারখানায় প্রস্তুত করা হতো জলনিরোধক পাটের জুতা, ব্যাগ, কার্পেট প্রভৃতি দ্রব্য। তিনি ছাপার কালিও তৈরি করেছিলেন। ১৯৫৬-এ পাট থেকে গবেষণা করে ডুরেক্সিন-এর উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি। কলকাতায় দাঙ্গা ও ১৯৪৭-এ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির পর পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীবাসের জন্য আগমন। পারিবারিক সূত্রেই আমীর হোসেন চৌধুরী সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন। তাঁর জীবনবোধ বিজ্ঞান চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল চেতনায় জাগরিত ছিল। তাঁর সাহিত্য সাধনার জায়গাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও মুকুন্দ দাস এ কারণে আদর্শ হয়ে ওঠেন। তাঁর রয়েছে একাধিক প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে—Nazrul and Rabindranath. Mukunda Das, West Disliked Rabindranath, নজরুল-কাব্যে রাজনীতি, Colur Printing and Textile Fabrics, Jet Black Umbrella Cloth. মৃত্যু. ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে শহীদ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪।

আমেনা বেগম (১৯২৭-১৯৮৯)॥ জন্ম. ফরিদগঞ্জ



গ্রাম, চাঁদপুর, ১৯২৭। রাজনীতিবিদ। কুমিল্লা নওয়াব ফয়জুন্নেসা স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৪০) ও ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৪২) পাস। ১৯৫০-এ আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৫৪-তে কুমিল্লা-সিলেট কেন্দ্র থেকে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা (১৯৬৬-১৯৭০)। ১৯৬৬-র জুলাই এ দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা নিযুক্ত। প্রায় সোয়া দুই বছর এ পদে দায়িত্ব পালন। দলের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদসহ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ কারাগারে আটক থাকাকালে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে ৬-দফা আন্দোলনকে সক্রিয় রাখার ব্যাপারে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান। এর স্বীকৃতিস্বরূপ স্থায়ীভাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ দাবি। দলের কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক এ দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় দল থেকে পদত্যাগ। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় লীগে যোগদান। ১৯৭০-এর ২০ আগস্ট এ দলের সিনিয়র সহ-সভানেত্রী নির্বাচিত। একই বছর ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ঢাকা-৯ আসন থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। ১৯৭৬-এ রাজনৈতিক দলবিধির (১৯৭৬) আওতায় জাতীয় লীগ পুনর্গঠিত করে এর সভানেত্রীর পদ গ্রহণ। মৃত্যু. ঢাকা, ৭ এপ্রিল ১৯৮৯।

আয়নুল হক খাঁ (১৮৯৫-১৯৭০)॥ জন্ম. নবঙ্গ গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, ১৮৯৫। সাহিত্যসেবী। সাতক্ষীরা প্রাণনাথ হাইস্কুল থেকে ১৯১৭-তে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৯-এ আই.এ. পাস করে উক্ত কলেজেই দর্শনে অনার্স নিয়ে বি.এ. অধ্যয়ন। কিন্তু ১৯২১-এ ফাইনাল পরীক্ষার আগেই অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং ছয় মাস কারাবরণ। দেশবন্ধুর স্বরাজ পার্টিতে যোগদান। পরে কলকাতা কর্পোরেশনে উচ্চপদে চাকরি গ্রহণ। উক্ত চাকরিতে দীর্ঘকাল থাকার পর অবসর গ্রহণ। ১৯৩৩-এ বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানে শেষদিন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন। ১৯৫০-এ উক্ত সমিতির নতুন নাম হয় 'নজরুল পাঠাগার'। তিনি তারও সম্পাদক হন। মৃত্যু. ১৯৭০।

আয়েত আলী খাঁ, ওস্তাদ (১৮৮৪-১৯৬৭)॥ জন্ম. শিবপুর গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৬ এপ্রিল ১৮৮৪। সংগীত কলাকার। দশ বছর বয়সে সংগীতশিক্ষা জীবন শুরু। প্রথম গুরু মেজোভাই ফকির

(তাপস) আফতাবদ্দিন খাঁ তারপর মাইহারে অগ্রজ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে সংগীতে তালিম গ্রহণ। প্রথমে সেতার ও পরে সুরবাহার যন্ত্রে সংগীত সাধনা। সেখান থেকে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কর্তৃক রামপুরে নিজগুরু ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর



নিকট প্রেরণ। অনেক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিয়ে ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর শিষ্যত্ব লাভ। গুরুর কাছে দীর্ঘ তেরো বছর সুর-সাধনা। সংগীত-জীবন সমাপনান্তে গুরুর আদেশে কর্মজীবন শুরু। প্রথমে মাইহার রাজ্যে সভাবাদক নিযুক্ত। সেখানে বড় ভাই ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর তত্ত্বাবধানে প্রাচ্যদেশীয় বাদ্যযন্ত্র দিয়ে একটা অর্কেস্ট্রা দল গঠন করে নাম দেন 'মাইহার স্ট্রিং ব্যান্ড'। পরে রামপুরের নবাবের দরবারে সভাসংগীতজ্ঞরূপে যোগদান। ১৯৩৫-এ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর সংগীত শিক্ষকরূপে কার্যভার গ্রহণ। কিছুকাল পর দেশে ফিরে সংগীতের বিকাশ, উন্নতি, প্রসার ও প্রচারকল্পে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন। তার সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার জন্য বাদ্যযন্ত্রের কারখানা খুলে অগ্রজ আলাউদ্দিন খাঁর ডাক নামানুসারে কারখানার নাম রাখেন 'আলম ব্রাদার্স'। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী সরোদ যন্ত্রের আধুনিক রূপ প্রদান এবং 'চন্দ্র সারং', 'মন্ত্রনাদ' ও 'মনোহরা' নামক তিনটি বাদ্যযন্ত্রে উদ্ভাবন। বারিষ, হেমন্তিকা, আওল-বসন্ত, ওমর-সোহাগ, শিব-বেহাগ, বসন্ত ভৈঁরো প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর স্রষ্টা। শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা ও প্রসারের জন্য ১৯৪৮-এ কুমিল্লায় ও ১৯54-তে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 'আলাউদ্দিন মিউজিক কলেজ' নামে দুটি সংগীত নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা। সংগীত প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬০-এ 'গভর্নর পদক', ১৯৬১-তে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার-কর্তৃক 'তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব এবং ১৯৬৬-তে 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' সম্মানে ভূষিত ১৯৭৬-এ মরণোত্তর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী পদক লাভ। মৃত্যু. ২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

আর. আহমদ (১৮৮১-১৯৬৫)॥ দন্তচিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী। শিক্ষা-ঢাকা, আলিগড়, স্টেট ইউনির্ভাসিটি অব আইওয়া-এ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৫১-তে দন্তচিকিৎসা বিদ্যায় গ্রাজুয়েট। বোস্টনে কিছুকাল পেশাগত কাজে নিয়োজিত। ১৯১৮-তে কলকাতায় দন্তচিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। ১৯২০-এ কলকাতা দন্তচিকিৎসা কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। ১৯২৮-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক দন্তচিকিৎসা কলেজের ফেলো নিযুক্ত। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: Indian Dental Journal, প্রেসিডেন্ট: ভারতীয় ডেন্টাল এসোসিয়েশন সদস্য: বঙ্গীয় দন্তশিক্ষা কমিটি, অনারারি সেক্রেটারি: বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগ, সদস্য: কলকাতা কর্পোরেশন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য মন্ত্রী। প্রকাশনা: Student's Hand-book of Operative Dentistry. মৃত্যু কলকাতা, ১৯৬৫।

আরকুম শাহ (১৮৭৭-১৯৪১)॥ জন্ম. ধরাধরপুর গ্রাম, দক্ষিণসুরমা, সিলেট, ১৮৭৭। মরমি কবি। পিতা মোহাম্মদ আছিন। প্রকাশিত গ্রন্থ: হকিকতে সিতারা (১৯৪০), আরকুম শাহ রচনাসমগ্র (সুমনকুমার দাশ সম্পাদিত, ২০১১)। রচনাসমগ্রে তাঁর ১১৫টি গান স্থান পেয়েছে। 'কৃষ্ণ আইলা রাধার কুঞ্জে' তাঁর বিখ্যাত গান। মৃত্যু. সিলেট, ১৯৪১।

আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০০-১৯৮৬)॥ জন্ম. লামচরি গ্রাম, বরিশাল, ৩ ডিসেম্বর, ১৯০০। দার্শনিক। পিতা এন্তাজ আলী মাতুব্বর। দুই পত্নী লালমন্নেসা ও সুফিয়া খাতুন। দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম। শিশুকালে পিতৃহীন হন। স্বগ্রামে মুন্সী



আবদুল করিমের মক্তবে সীতানাথ বসাকের 'আদর্শলিপি' অধ্যয়ন। দারিদ্র্যের কারণে মক্তবের পাঠ ত্যাগ। উত্তরকালে নিজের সাধনায় নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন এবং একজন স্ব-শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুধীসমাজের কাছ থেকে স্বীকৃতিলাভ। বাল্যকালে পৈতৃক পেশা কৃষিকাজে নিয়োজিত হন। কৃষিকাজের ফাঁকে আমিনের কাজ শেখেন। জমি জরিপের কাজকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ। লৌকিক দার্শনিক হিসেবে খ্যাত

জনজীবনের চিন্তা-চেতনা তাঁর রচনার ভাববস্তু। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানামুখী জিজ্ঞাসার যে চিত্র তাঁর লেখায় উপস্থাপিত হয়েছে তাতে তাঁর প্রজ্ঞা, মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির পরিচয় মেলে। প্রকাশিত গ্রন্থ: সত্যের সন্ধান (১৯৭৩), সৃষ্টি-রহস্য (১৯৭৮) ও স্মরণিকা (১৯৮২)। স্বউপার্জিত অর্থে জন্মস্থান লামচরি গ্রামে নিজের বাড়িতে আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরি (১৯৭৯) প্রতিষ্ঠা। স্থানীয় চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান। নিজের নামানুসারে এ বৃত্তির নাম রাখেন 'আরজ বৃত্তি' (১৯৭৯)। মানবকল্যাণে ব্যবহারের জন্য বরিশাল মেডিক্যাল কলেজকে মরণোত্তর দেহদান। বাংলাদেশ লেখক শিবির কর্তৃক হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৮) ও উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী বরিশাল শাখা কর্তৃক বরণীয় মনীষী হিসেবে সম্মাননা (১৯৮৫) প্রদান। এছাড়া বাংলা একাডেমী কর্তৃক নববর্ষের সংবর্ধনা জ্ঞাপন (এপ্রিল ১৯৮৫)। মৃত্যু. বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ, (মার্চ ১৯৮৬)।

আর্জুমন্দ আলী চৌধুরী (১৮৭০-১৯৪১)॥ জন্ম. ভাদেশ্বর গ্রাম, সিলেট, ১৮৭০। কবি ও সংগীতজ্ঞ। কর্মজীবনে স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর। কবি ও সংগীতজ্ঞ হিসেবে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী। মাত্র ৩০/৩৫ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে যান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: হৃদয় সংগীত ও প্রেম দর্পণ। মৃত্যু. ১৯৪১।

আর্নল্ড্ আড্রিয়ান্ বাকে (১৮৯৯-১৯৬৩)॥ জন্ম. হিল্ভারসাম, নেদারল্যান্ড, ৯ মে ১৮৯৯। সংস্কৃতজ্ঞ, সংগীতশাস্ত্রবিদ, অধ্যাপক। লাইডেন ও উট্রেক্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ এবং উট্রেক্ট্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে ডক্টরেট উপাধিলাভ। ভারতীয় সংগীত উপলব্ধি করার জন্য বিশ্বভারতীতে আট বছর শিক্ষানবিসি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা। পরবর্তীকালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কর্মরত। ভারতীয় সংগীত বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য দীর্ঘকাল ভারত ও নেপাল পরিভ্রমণ। ভারতবর্ষেই তিনি প্রায় ছাব্বিশ বছর কাটিয়েছিলেন। [illegible] রবীন্দ্রসংগীত, ইন্দোনেশীয় সংগীত বিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণা বর্তমান। কর্মজীবনে লন্ডনের 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' শিক্ষায়তনে ভারতীয় সংগীত বিভাগের অধ্যাপক এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের রিডার। গ্রন্থাবলি: Lectures on Indian Music (১৯৩৩), Cri Chaitanya Mahaprabhu (১৯৪৮) প্রভৃতি। মৃত্যু. ৮ অক্টোবর ১৯৬৩।



আর্নেস্ট্ বিন্ফিল্ড্ হ্যাভেল (১৮৬১-১৯৩৪)॥ জন্ম. ইংল্যান্ড, ১৮৬১। প্রথিতযশা চিত্রী ও চিত্রশিল্পের অধ্যাপক। লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অব্ আর্টস-এ শিক্ষা লাভ। এ-দেশীয় শিল্পীদের পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে অঙ্কন বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে ১৮৮৬-তে মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষের পদ নিয়ে এ দেশে আগমন। ১৮৯৬-১৯০১ পর্যন্ত কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট-এর অধ্যক্ষ। এ সময়ে ভারতীয় চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁরই অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথের আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে ভারতবর্ষীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি ও ছবির মেজাজ সব দিক দিয়ে পশ্চিমী রীতির চেয়ে ভিন্ন। হ্যাভেল্ আর্ট স্কুলে দেশীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনের সুবন্দোবস্ত করে দেন এবং নিজস্ব শিল্পরীতির বিকাশ ও শিল্পগোষ্ঠী গঠনে অবনীন্দ্রনাথকে পূর্ণস্বাধীনতা দান। ১৯০৭-এ 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' যাঁদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় হ্যাভেল তাঁদের অন্যতম। ১৯১০-এ ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সোসাইটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। ১৯১৬-১৯২৩ পর্যন্ত ডেনমার্কে ব্রিটিশ দূতাবাসে কর্মরত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি: Benaras the sacred City (১৯০৫), Monograph on stone Curving in Bengal (১৯০৬), Indian Sculpture and Painting (১৯০৮), Indian ArchitectureIts Psychology, Structure and History (১৯১৩), Ancient and Medieval Architecture in India (১৯১৫) প্রভৃতি। মৃত্যু. ১৯৩৪



আলতাফ মাহমুদ (১৯৩৩-১৯৭১)॥ জন্ম. ফকিরবাড়ি রোড, বরিশাল, ১৯৩৩। সংগীতশিল্পী। বরিশাল জিলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাস (১৯৪৮)। কিছুদিন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই.এসসি. ক্লাসে ও কলকাতা আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন।



কোনো ওস্তাদের কাছে গানের তালিম গ্রহণ করেননি। তাঁর সংগীত-প্রতিভা ছিল সহজাত। বাল্যকাল থেকেই সুকণ্ঠ গায়ক। ১৫-১৬ বছর বয়সে নিজের চেষ্টায় গণসংগীত আয়ত্ত। বরিশালের খ্যাতনামা বেহালাবাদক সুরেন রায়ের কাছে বেহালাবাদন শিক্ষাগ্রহণ। বরিশালে পাটচাষিদের এক সভায় 'ম্যায় ভুখা হুঁ' গানটি গেয়ে শ্রোতাদের মন জয় (১৯৪৯)। ১৯৫০-এ বরিশাল ছেড়ে ঢাকায় আগমন। যুবলীগের (১৯৫১) সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট 'পূর্ব-পাকিস্তান শিল্পী সংসদ'-এ যোগদান। সংসদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সমবেত ও একক কণ্ঠে গণসংগীত পরিবেশন করে জনপ্রিয়তা লাভ। কিছুদিনের মধ্যে এর সংগীত পরিচালক নিযুক্ত। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' (রচনাকাল-২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২) আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই গানটিতে সুর সংযোজন করে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ। বায়ান্নোর অমর একুশের প্রথম বার্ষিকীতে (১৯৫৩) ভাষা শহীদদের স্মরণে মোশাররফ উদ্দীন আহমদ রচিত 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে' গাজীউল হক রচিত 'ভুলবো না ভুলবো না একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবো না' ও আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্ রচিত 'মেয়েটার বর মরেছে আর বছর' গানের সুরারোপ করে ব্যাপক সুনাম অর্জন। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী সভায় গণসংগীত গেয়ে জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত। একই বছর (১৯৫৪) ৩০ মে পূর্ববাংলায় ৯২-ক ধারা আরোপ করা হলে তাঁর ওপর হুলিয়া জারি। আত্মগোপন অবস্থায় ছয় মাস অতিবাহিত। হুলিয়া প্রত্যাহৃত হওয়ার পর সাড়া জাগানো ছায়ানাট্য 'শিল্পীর সঙ্গী পরিচালনা ও সংগীতে কণ্ঠদান। ১৯৫৬-১৯৬৩ পর্যন্ত করাচিতে বাস। করাচির বেতারকেন্দ্র থেকে পূর্ববাংলার লোক সংগীতের ওপর অনুষ্ঠান 'ইত্তেহাদে ম্যুসিকি' পরিচালনা। এখানে অবস্থানকালে স্বকণ্ঠে গীত প্রায় ৩৫টি গানের রেকর্ড প্রকাশ। ১৯৬৩-তে করাচি ছেড়ে ঢাকায় আগমন ও স্থায়ীভাবে বসবাস। পূর্ববাংলার ছায়াছবির জগতের একজন বিখ্যাত সংগীত পরিচালক। 'ক্যায়সে কহুঁ', 'কার বউ', 'রহিম বাদশা ও রূপবান', 'বেহুলা', 'আগুন নিয়ে খেলা', 'দুই ভাই', 'সংসার', 'আঁকাবাঁকা', 'আদর্শ ছাপাখানা', 'নয়নতারা', 'শপথ নিলাম', 'প্রতিশোধ', 'কখগঘঙ', 'মিশর কুমারী', 'কুচবরণ কন্যা', 'সুয়োরানী দুয়োরানী ', 'আপন দুলাল', 'সপ্তডিঙ্গা' প্রভৃতি ছবির সংগীত পরিচালক। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চে গণআন্দোলন ও ১৯৭১-এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, মিছিলে ও পথসভায় গণসংগীত গেয়ে সংগ্রামমুখর জনতাকে উজ্জীবিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকায় বসে গণজাগরণমূলক গান রচনা করে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে প্রেরণ। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাদ্য ও আর্থিক সাহায্য প্রদান। ৩০ আগস্ট (১৯৭১) ঢাকার আউটার সার্কুলার রোডের বাসা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। দখলদার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত। এদেশের গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক। পূর্ববাংলায় বাঙালির জাতিসত্তার বিকাশ ও সাধারণ মানুষের কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর সংগীতচর্চার চালিকাশক্তি। মৃত্যু. ১৯৭১।

আলতাফ হুসাইন (১৯০০-১৯৬৮)॥ জন্ম. সিলেট, ১৯০০। প্রথমে আসামের গৌহাটি কলেজ, পরে সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ ও কলকাতার সিটি কলেজে পড়াশুনা। ১৯২৩-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাস। প্রভাষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। ১৯২৬-এ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনা কর্মে যোগদান। পরে চট্টগ্রাম ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা। ১৯৩৭-এ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ। ১৯৩৮-এ বেঙ্গল গভর্নমেন্টের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক পদে যোগদান। ১৯৪৫-এ সরকারি চাকরি ত্যাগ এবং দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৪৭-এর পর 'ডন'-এর সম্পাদক হিসেবে করাচিতে স্থায়ীভাবে বসবাস।

১৯৬৫-তে আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভার শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৬৮-এ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:আল্লামা ইকবালের 'শিকওয়াহ্' ও 'জওয়াব-ই-শিক-ওয়াহ'-র অনুবাদ, India-the Last Ten Years. মৃত্যু. ১৯৬৮।

আলতাব আলী (১৯১২-১৯৮০)॥ জন্ম. ময়মনসিংহ শহর, ১৯১২। রাজনীতিবিদ। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাস। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই ব্রিটিশ-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। শক্তিশালী সন্ত্রাসবাদী দল যুগান্তরের সদস্য। কৈশোর থেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় মেট্রিকের পরে আর পড়াশুনা সম্ভব হয়নি। যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়ই পিজেন্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টির সংস্পর্শ লাভ। সে সময়ে প্রধানত কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ও অন্যদের উদ্যোগে এই পার্টি গঠিত। ময়মনসিংহ শহরে ফয়েজউদ্দিন ও আবদুল জলিল এই দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের মাধ্যমে আলতাব আলীও এই দলের সংস্রবে আসেন। পরবর্তীকালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। ১৯৩৮-এ ময়মনসিংহ জেলায় যে কয়জন প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টির শাখা গড়ে তোলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হিসেবে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ। সে সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির উদ্যোগে ময়মনসিংহ জেলায় ছোট-বড় যে সব আন্দোলন সংঘটিত হয়, যথা-টংকপ্রথা-বিরোধী আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন সেগুলোতে নানাভাবে অংশগ্রহণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব-পাকিস্তান কমিটির সদস্য নিযুক্ত। এক সময়ে উক্ত কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৭-তে ন্যাপ গঠিত হবার পর ন্যাপে যোগদান এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত। জীবনের অনেক বছর কারাগারে ও আত্মগোপনে কাটিয়েছেন। মৃত্যু. ১৯৮০।

আলমগীর কবির (১৯৩৮-১৯৮৯)॥ জন্ম. রাঙ্গামাটি, ১৯৩৮। পৈতৃক নিবাস বরিশাল। চলচ্চিত্র পরিচালক। পি.ডব্লিউ.ডি'র কর্মকর্তা আবু সাইয়েদ আহমেদ তাঁর পিতা। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে গণিতে লেটার মার্কসসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এসসি. (১৯৫৪), ও ঢাকা বিশ্বদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বি.এসসি. অনার্স (১৯৫৮) পাস উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য লন্ডন গমন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। ইঞ্জিনিয়ারিং, সাংবাদিকতা ও চলচ্চিত্র বিষয়ে ডিগ্রি লাভের পর ১৯৬৩-তে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার দায়ে আইয়ুব সরকারের অধীনে তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ। ১৯৬৭-তে সাপ্তাহিক হলিডের সিনিয়র সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৬৮-তে মনজুরা ইব্রাহীমকে বিবাহ, ১৯৭৪-এ মনজুরার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ। পরের বছর (১৯৭৫) জয়শ্রীকে বিবাহ, ১৯৮২-তে জয়শ্রীর সঙ্গেও বিবাহ বিচ্ছেদ। ১৯৬৯-এ 'ঢাকা সিনে ক্লাব' প্রতিষ্ঠা। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ। 'স্বাধীন বাংলা বেতারের ইংরেজি সংবাদ পাঠক। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞকে ভিত্তি করে নির্মিত 'স্টপ জেনোসাইড'-এর চিত্রনাট্যকার ও ধারাভাষ্যকার (জহির রায়হানের সঙ্গে)। মুক্তিযুদ্ধের উপর একক প্রচেষ্টায় নির্মাণ করেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'লিবারেশন ফাইটার্স' (১৯৭১)। 'ধীরে বহে মেঘনা' (১৯৭৩), 'সূর্যকন্যা' (১৯৭৬), 'সীমানা পেরিয়ে' (১৯৭৭), 'রূপালী সৈকতে' (১৯৭৯), 'মোহনা' (১৯৮০), 'পরিণীতা' (১৯৮৬) ও 'মণিকাঞ্চন' (১৯৮৮) তাঁর নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র: 'প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ', 'কালচার ইন বাংলাদেশ', 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন', 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে'। চলচ্চিত্রের দক্ষ পরিচালক, আকর্ষণীয় সংলাপ রচয়িতা ও একজন বড় মাপের চিত্রনাট্যকার হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। চলচ্চিত্র শিল্পের সমালোচক এবং প্রাবন্ধিক। Cinema in Bangladesh (1979). This was Radio Bangladesh-1971. (1984) প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। বগুড়া থেকে ঢাকায় আসার পথে নগরবাড়ির ঘাটের পন্টুনে মোটর গাড়িতে বসে ফেরির জন্য অপেক্ষাকালে পেছন দিক থেকে একটি লরির ধাক্কায় মোটর গাড়িসহ



যমুনানদীতে পতিত। সহযাত্রী চলচ্চিত্র অভিনেত্রী টিনা খানসহ গাড়ির ভেতরে নদীতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ। মৃত্যু. ২০ জানুয়ারি ১৯৮৯।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)



জন্ম. রামনগর, রায়পুরা, নরসিংদী, ৬ মে ১৯৩২। কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গবেষক, শিক্ষাবিদ। পিতা গাজী আবদুস সোবহান, মাতা আমেনা খাতুন। নারায়ণপুর শরাফতউল্লাহ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭-এ প্রবেশিকা, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ১৯৪৯-এ উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। তিনি ১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩-এ বাংলায় স্নাতক সম্মান ও ১৯৫৪-এ স্নাতকোত্তর। ১৯৭০-এ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ঈশ্বরগুপ্তের জীবন ও কবিতা বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পাঁচটি সরকারি কলেজে অধ্যাপনা এবং পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের নজরুল অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। এছাড়া মস্কোর বাংলাদেশ দূতাবাসে সংস্কৃতি উপদেষ্টা, শিক্ষা সচিব, সংস্কৃতিবিষয়ক বিভাগ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এশিয়া কবিতা উৎসব আয়োজনে যুক্ত ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), শীতের শেষরাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২), কর্ণফুলী (১৯৬২), ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), খসড়া কাগজ (১৯৮৬), শ্যাম ছায়ার সংবাদ (১৯৮৬), জ্যোৎস্নার অজানা জীবন (১৯৮৬), যেখানে দাঁড়িয়ে আছি (১৯৮৬), স্বাগতম ভালোবাসা (১৯৯০), অপর যোদ্ধারা (১৯৯২), পুরানা পল্টন (১৯৯২), অন্তরীক্ষে বৃক্ষরাজি (১৯৯২), প্রিয় প্রিন্স (১৯৯৫), ক্যাম্পাস (১৯৯৪), অনূদিত অন্ধকার (১৯৯১), স্বপ্নশীলা (১৯৯২), কালো জ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা (১৯৯৬), বিশৃঙ্খলা (১৯৯৭); গল্প: জেগে আছি, ধানকন্যা, মৃগনাভি, অন্ধকার সিঁড়ি, উজান তরঙ্গে, যখন সৈকত, আমার রক্ত স্বপ্ন আমার; কবিতা: মানচিত্র, ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ, সূর্য জ্বালার স্বপন, লেলিহান পাণ্ডুলিপি; নাটক: এহুদের মেয়ে, মরোক্কোর জাদুকর, ধন্যবাদ, মায়াবী প্রহর, সংবাদ শেষাংশ; প্রবন্ধ: শিল্পের সাধনা, ফেরারী ডায়েরী (১৯৭৮)। পুরস্কার: বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ১৯৬৪, ইউনেস্কো পুরস্কার ১৯৬৫, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ১৯৭৭, আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৩, আবুল মনসুর আহমেদ সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৪, লেখিকা সংঘ পুরস্কার ১৯৮৫, রংধনু পুরস্কার ১৯৮৫, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৬, একুশে পদক ১৯৮৬, শেরে বাংলা সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৭, নাট্যসভা ব্যক্তিত্ব পুরস্কার ১৯৮৯, কথক একাডেমি পুরস্কার ১৯৮৯, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বর্ণপদক ১৯৯৪। মৃত্যু. ঢাকা, ৩ জুলাই ২০০৯৬।

আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ (১৮৬২-১৯৭২)॥ জন্ম. শিবপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৮৬২ (আনুমানিক)। সংগীত কলাকার। বড় ভাই ফকির (তাপস) আফতাবউদ্দিন খাঁর কাছে সংগীতে হাতেখড়ি। গ্রামের পাঠশালার পাঠ ত্যাগ করে সুরের সন্ধানে কিশোর বয়সে বাড়ি থেকে পলায়ন। যাত্রাদলের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ। কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা। সেখানে কেদারনাথ নামে এক ডাক্তারের অনুগ্রহে প্রখ্যাত সংগীত-সাধক নুলো গোপাল (গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য)-এর শিষ্যত্ব লাভ। বারো বছর ক্রমাগত সরগম সাধনার অঙ্গীকারের বিনিময়ে নুলো গোপাল-কর্তৃক শিষ্যত্বে বরণ। সাত বছর পর প্লেগ রোগে নুলো গোপালের মৃত্যু হলে কণ্ঠ-সংগীত ছেড়ে যন্ত্র-সংগীতের সাধনায় নিমগ্ন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই স্টার থিয়েটারের সংগীত পরিচালক হাবু দত্তের (অমৃতলাল দত্ত) কাছে বাঁশি পিকলু, সেতার, ম্যান্ডোলিন, ব্যাঞ্জো প্রভৃতি দেশি-বিদেশি যন্ত্রে দক্ষতা অর্জন। গোয়ানিজ ব্যান্ড-মাস্টার লবো সাহেবের কাছে পাশ্চাত্য রীতিতে এবং অমর দাসের কাছে দেশি পদ্ধতিতে বেহালাবাদন শিক্ষা গ্রহণ। লবো সাহেবের স্ত্রী কাছ থেকে 'স্টাফ নোটেশন' দেখে বাজাতে পারদর্শিতা লাভ। হাজারী ওস্তাদের



কাছে সানাই, নাকাড়া, টিকারা যন্ত্রে দক্ষতা অর্জন। এভাবে একজন সর্ববাদ্যবিশারদ হয়ে ওঠেন। কিছুদিন মিনার্ভা থিয়েটারে তবলাবাদকের চাকরিতে নিয়োজিত। পরে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার রাজা জগৎ কিশোরের দরবারে সংগীতজ্ঞ হিসেবে নিযুক্তি লাভ। সেখানে ওস্তাদ আহমদ আলী খাঁর কাছে সরোদ যন্ত্রের তালিম গ্রহণ। পরে তানসেন বংশীয় বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর কাছে সরোদ শিখবার জন্য রামপুরে যাত্রা। ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ রামপুরের নবাব হামেদ আলী খাঁর শিক্ষাগুরু ও দরবার-সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর দর্শনলাভ খুব সহজ ছিল না। একদিন নবাবের চলন্ত গাড়ির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নবাবের কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হন এবং নবাবের অনুগ্রহে ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর শিষ্যত্ব লাভ। গুরুর কাছে সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর 'সেনী ঘরানার' অত্যন্ত দুরূহ এবং সূক্ষ্ম সংগীত কলাকৌশল শিক্ষা গ্রহণ। ১৯১৮-তে নবাব-কর্তৃক মধ্যপ্রদেশের মাইহার রাজ্যে প্রেরণ। মাইহার রাজ্যের নবাবের সংগীতগুরু নিযুক্ত। তারপর থেকে মাইহারে স্থায়ীভাবে বসবাস। উপমহাদেশের রাগসংগীতকে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যে পরিচিত করার অগ্রপথিক। সরোদে 'দিরি দিরি' সুরক্ষেপণের পরিবর্তে 'দারা দারা' সুরক্ষেপণ প্রয়োগ চালু করেন। এ ধরনের সুরক্ষেপন পূর্বে অপ্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ সরকার-কর্তৃক 'খাঁ সাহেব' উপাধিতে ভূষিত। ১৯৫২-তে ভারতের সংগীত আকাদেমি পুরস্কার লাভ। ১৯৫৪-তে আকাদেমির 'ফেলো' নির্বাচিত। ১৯৫৮-তে'পদ্মভূষণ' ও ১৯৭১-এ 'পদ্মবিভূষণ' এবং ১৯৬১-তে বিশ্বভারতী-কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত। দিল্লি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক 'ডক্টর অব ল' উপাধিতে ভূষিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক মুসলিম হল কর্তৃক আজীবন হলের সদস্য পদে সম্মানিত। শান্তিনিকেতনে 'আমন্ত্রিত অধ্যাপক' হিসেবে কিছুকাল অধ্যাপনা। উপমহাদেশের কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবনের পরামর্শদাতা। 'আলাউদ্দিন ঘরানা' সংগীতের স্রষ্টা। হেমন্ত, দুর্গেশ্বরী, মেঘ-বাহার, প্রভাতকেলী, হেম-বেহাগ, মদন মঞ্জরী (মদিনা মঞ্জরী), আরাধনা প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর স্রষ্টা। মৃত্যু. 'মদিনা ভবন', মাইহার, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২

আলাওল (১৬০৭-১৬৮০)। জন্ম. জোবরা গ্রাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, ১৬০৭ (আনুমানিক). মতান্তরে ফতেয়াবাদ পরগনা ফরিদপুর। কবি ও পণ্ডিত। তাঁর পিতা ছিলেন ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের অমাত্য। ফতেয়াবাদেই কবির জীবনের বেশিভাগ সময় কাটে। জলপথে চট্টগ্রাম যাবার সময়ে আলাওল ও তাঁর পিতা পর্তুগিজ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। ঘটনাস্থলে পিতা নিহত হলে। তিনি কোনোক্রমে বেঁচে গিয়ে আরাকানে উপস্থিত হন। সেখানে আরাকান-রাজ উমাদারের রাজদেহরক্ষী অশ্বরোহী দলে ভর্তি এবং পরে সেনাধ্যক্ষের পদ লাভ। সে-সময়ে আরাকান রাজের সভায় অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ছিলেন। রাজদরবারের প্রতাপশালী অমাত্য মাগন ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আলাওলের জীবনের দিক্‌বদল ঘটে। মাগন ঠাকুর তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন। এ-পর্যন্ত আলাওলের পাঁচটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলো হলো: পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, হপ্ত পয়কর, সিকান্দরনামা ও তোহফা বা তত্ত্বোপদেশ। এ-ছাড়া কবি দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী'র উত্তরাংশ রচনা করেন। পদ্মবতী হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদুমাবত কাব্যের ভাবানুবাদ। তাঁর 'শিরী খুসরু' নামে আর একটি গ্রন্থ এবং কয়েকটি বৈষ্ণবীয় রূপকে লিখিত পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। সংস্কৃত, বাংলা, আরবি, ফারসি ও হিন্দি ভাষায় দক্ষতা ছিল। প্রাকৃতপিঙ্গল, যোগশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, তাসাউফ, সংগীতবিদ্যা, অশ্বচালনা প্রভৃতি শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল কাব্য রচনা আরম্ভ করার কিছুকাল পরেই মাগন ঠাকুর মারা যান। এ-সময়ে শাহ্ সুজা আওরঙ্গজেবের ভয়ে আরাকানের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯৬০-এ শাহ্ সুজা রোসাঙ্গ রাজের কোপে পড়ে নিহত হন এবং মীরজা নামের এক ব্যক্তির প্ররোচনায় আলাওল কারারুদ্ধ হন। দুমাস পরে মুক্তিলাভ। এ-সময়ে তিনি দুর্দশায় জীবন কাটান। প্রায় এগারো বছর পর আবার ভাগ্য ফেরে। রোসাঙ্গের কাজী সৈয়দ মাসুদ শাহর অনুগ্রহ পেয়ে আবার রাজানুগ্রহ লাভে সমর্থ হন। এ-সময়ে সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল কাব্য সম্পূর্ণ করে 'সিকান্দরনামা' রচনা করেন। আলাওলের রচনা অনুবাদ শ্রেণির

হলেও তাঁর অসামান্য ক্ষমতায় অনুবাদের গণ্ডী ছাড়িয়ে মৌলিক সৃষ্টির সৌন্দর্যে মহীয়ান হয়েছে। তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মৃত্যু. ১৬৮০।

আলাহেদাদ খান (১৮৩৪-১৮৯৭)॥ জন্ম. পৈতৃক নিবাস দাদরোখী গ্রাম, মানিকগঞ্জ, ১৮৩৪। চাকরিজীবী, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, সম্পাদক। বঙ্কিমচন্দ্র, যদুনাথ বসু প্রমুখের সঙ্গে ১৮৫৪-তে জুনিয়র স্কলারশিপ লাভ। কলকাতা মাদ্রাসা ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ। ১৮৬১-তে ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস-এর চাকরি নিয়ে ফরিদপুর গমন। ১৮৬১-তে তাঁর সম্পাদনায় 'ফরিদপুরে দর্পণ' (পাক্ষিক) প্রকাশিত। পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায় ফরিদপুর দর্পণ প্রকাশিত হয়েছিল এবং কলকাতায় পারিবারিক গ্রন্থাগারে পত্রিকার কপি ছিল। খ্যাতনামা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ভগবানচন্দ্র বসুর সঙ্গে মিলিতভাবে ফরিদপুরে প্রথম বাংলা স্কুল স্থাপন। বহু সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। পরবর্তীকালে বাংলার সুপারিনটেনডেন্ট অব পোস্ট অফিসে এবং সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল নিযুক্ত। তাঁর সহযোগিতায় কবি কায়কোবাদ প্রমুখ ডাক বিভাগে চাকরি পান। মৃত্যু. ১৮৯৭।

আলি রাজা॥ জন্ম. ওসখাইল গ্রাম, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। সাধক, তাত্ত্বিক ও পির। জনসাধারণের নিকট কানু ফকির নামে সুপরিচিত। সুফি কাব্য ও পদাবলি সংগীতের রচয়িতা। গ্রন্থাবলি-সুফি কাব্য: আগম, জ্ঞানসাগর, সিরাজকুলুব, ষট্চক্রভেদ। পদাবলি সংগীত: ধ্যানমালা। আলি রাজা মূলত ছিলেন সাধক। তাঁর সাধনার উৎস হিসেবে নিঃসারিত হয়েছে কবিতা। সে কবিতা আধ্যাত্মিকতার চেতনায় উদ্ভাসিত। জন্ম এবং মৃত্যু তারিখ জানা যায় না।

আলী আহমদ (১৯১০-১৯৮৭)॥ জন্ম. চর রোহিতা গ্রাম, লক্ষ্মীপুর, ১৯১০। গবেষক ও সংগ্রাহক। স্থানীয় আহমদিয়া হাই মাদ্রাসা থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স (১৯২৯), ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. (১৯৩২), কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৩৫) পাস। ঢাকার আরমানিটোলা ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.টি. (১৯৩৯) এবং বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. (১৯৪৫)



ডিগ্রি লাভ। বি.এ. পাস করার পর আহমদিয়া মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান (১৯৩৫)। ১৯৪০-এ কুমিল্লা জেলা স্কুলের ভার্নাকুলার শিক্ষক নিযুক্ত। ১৯৫৩ পর্যন্ত এ স্কুলে শিক্ষকতা। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে বাংলার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত লাভ। প্রায় দশ বছর এ কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৯৬৪-তে বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী উন্নয়ন অফিসার পদে যোগদান। ১৯৭২-এ এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ। একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান। ১৯৭৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষক পদে নিযুক্তি লাভ। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পরলন। নিবেদিত প্রাণ সংগ্রাহক ও বাংলা সাহিত্যের গবেষক। বাংলা একাডেমীর শহীদুল্লাহ গবেষণা কক্ষ গড়ে উঠেছে তাঁরই সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য পুঁথি-পুস্তক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা দ্বারা 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী' (১৯৮৫) গ্রন্থখানি তাঁর গবেষণাকর্মের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মৃত্যু. ঢাকা, ৮ জানুয়ারি, ১৯৮৭।

আলী আহমেদ খাঁ, ওস্তাদ (?-১৯৭৬)॥ জন্ম. শ্রীরামপুর গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সেতারবাদক (যন্ত্রশিল্পী)। শৈশব থেকে সংগীতের সাধনা অনুশীলন শুরু। ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর শিষ্য। দীর্ঘকাল সাধনা দ্বারা সেতার যন্ত্র বাদনে পারদর্শিতা অর্জন। কর্মজীবনে কলকাতায় অবস্থান। কলকাতা বেতারের একজন নিয়মিত সংগীতশিল্পী। কলকাতায় 'আলাউদ্দিন সংগীত সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রসার ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ। প্রতি বছর এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সমগ্র ভারতের শিল্পী সমন্বয়ে সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করে শাস্ত্রীর সংগীতের উন্নতিকল্পে অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯৭৬।

আলীবর্দী খাঁ (১৬৭৬-১৭৫৬)॥ জন্ম. ১৬৭৬। প্রকৃত নাম মীর্জা মহম্মদ আলী। চাকরির উদ্দেশ্যে দিল্লি থেকে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর নিকট আগমন। কিন্তু প্রত্যাখাত হয়ে

উড়িষ্যার নায়েব সুবা সুজাউদ্দিনের কাছে গমন।



সেখানে নায়েব সুবার দরবারের পরিষদ এবং কিছুকাল পর একটি জেলার ফৌজদার নিযুক্ত। ১৭২৭-এ মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর সুজাউদ্দিন বাংলার মসনদে আসীন হলে মীর্জা মহম্মদ আলীকে 'আলীবর্দী' উপাধি দিয়ে রাজমলের ফৌজদার নিযুক্ত। ১৭৩৩-এ বিহার বাংলার সঙ্গে যুক্ত হলে বিহারের নায়েব-সুবা পদে নিযুক্ত। ১৭৩৯-এ গিরিয়ার যুদ্ধে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ মসনদে বসলে আলীবর্দী-কর্তৃক বিদ্রোহ ঘোষণা এবং ১৭৪০-এ গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত। এই সময় 'সুজা-উল-মূল্‌ক্ হেসামুদ্দৌলা মহাবৎ জঙ্গ বাহাদুর' নাম গ্রহণ করে বাংলার মসনদে আসীন। ১৭৫৬ পর্যন্ত বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা। একবার বর্গির হামলায় দেশের শান্তি বিঘ্নিত হলে ১৭৪৪-এ কৌশলে বর্গি সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত-কে নিহত এবং ১৭৫৬-তে বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করে দেশে পুনরায় শান্তি স্থাপন। দেশের আর্থিক উন্নতির কথা ভেবে ইউরোপীয় বণিকদের উচ্ছেদ করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু তাদের শাসনে রেখেছিলেন। রাজনীতি ও রণনীতি উভয় ক্ষেত্রেই কৌশলী ও পারদর্শী ছিলেন। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁর দৌহিত্র। মৃত্যু. ১০ এপ্রিল ১৭৫৬।

আলীম আল রাজী (১৯২৫-১৯৮৫)॥ জন্ম.



করটিয়া গ্রাম, নাগরপুর, টাঙ্গাইল, ১৯২৫। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মোমতাজুল মোহাদ্দেসীন (রিসার্চ স্কলার ডবল গোল্ড মেডেলিস্ট)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. (ইতিহাস) ও বি.এল. পাস। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস ও আইনে দু'বার পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। এখান থেকে বার-এট-ল ডিগ্রি [illegible] পর্যন্ত লন্ডনের মুসলিম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন। ১৯৫৩-তে ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯৬৫-র ২১ মার্চ মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ময়মনসিংহ এনই-৪৬ আসন থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। সর্বজনীন ভোটাধিকার, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন, বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রে স্বাধীনতার দাবিতে জাতীয় পরিষদে সোচ্চার ও আপসহীন ভূমিকা পালন। ঢাকা সিটি ল' কলেজ (১৯৫৭), নাগরপুর ডিগ্রি কলেজ (১৯৬৬) ও লাউহাটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫৭-১৯৭২ পর্যন্ত সিটি ল'কলেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষ। ১৯৭০-র ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে টাঙ্গাইল-১ আসন থেকে পরাজিত। ১৯৭২-এ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানীপন্থি)-তে যোগদান ও এ দলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চের সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৩ ও টাঙ্গাইল-৬ আসনে পরাজিত। ১৯৭৪-এ ভাসানী ন্যাপের (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ। ১৯৭৪-১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সভাপতি। সাবেক নিখিল পাকিস্তান বার কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি। কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। ১৯৭৬-এ তাঁর নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ পিপলস্ লীগ' গঠিত ও নিজে এর সভাপতির দায়িত্ব পালন। টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দূরবীন' ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দি ওরিয়েন্টাল টাইমস' পত্রিকা সম্পাদনা। প্রথিতযশা ব্যঙ্গ-রসাত্মক বক্তা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। আইনশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ষাটের দশকে বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু. ঢাকা, ১৬ মার্চ ১৯৮৫।

আলোকময় নাহা (১৯৪০-১৯৯১)॥ জন্ম. জেলরোড, কাঁচিঝুলি, ময়মনসিংহ, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৪০। পূর্বপুরুষদের বাস ছিল বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী। পিতা হেরম্বচন্দ্র নাহা ও মাতা মালতী মালা নাহা। পিতামহ নাম রাধিকা মোহন নাহা ও পিতামহী সৌদামিনী নাহা। ময়মনসিংহ

শহরের সংগীতশিল্পী সুমিতা হোমরায় তাঁর স্ত্রী। লেখাপড়ায় হাতেখড়ি নিজ পরিবারেই। ১৯৫৪-এ মৃত্যুঞ্জয় স্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৫৬-এ আনন্দমোহন কলেজ থেকে আই.এসসি., ১৯৫৮-এ বি.এ. পাস। ছাত্রজীবনেই তিনি ঢাকার ছায়ানট ও



ঐকতান-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাশাপাশি শিক্ষাজীবনের সঙ্গে প্রগতিশীল ছাত্র-রাজনীতিকেও ধারণ করেছিলেন। ১৯৬১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জন। ১৯৬৩-এ ময়মনসিংহ জেলা জজ আদালতে আইনজীবী হিসেবে যোগদান। ১৯৬১-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ময়মনসিংহের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে, অর্থাৎ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলনমুখর দিনগুলোর মধ্যে প্রগতিশীল শিল্পী ও ছাত্র ইউনিয়নের সংস্কৃতি শাখার সদস্যদের নিয়ে গঠিত 'সাংস্কৃতিক স্কোয়াড'-এর নেতৃত্ব দান। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে মার্চের প্রথম সপ্তাহে ময়মনসিংহে গোলাম সামদানী কোরায়শী, পীযূষ ঘোষ, যতীন সরকার, মাহমুদ হাসান, সিরাজুল ইসলাম, রিয়াজুল ইসলাম, শামসুজ্জামান খান প্রমুখের সঙ্গে 'বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবির' প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'-ও উদ্যোক্তা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭৩-এ ময়মনসিংহে 'উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী'র আহবায়ক আলোকময় নাহা ও ওস্তাদ মিথুন দে। পরে ওস্তাদ মিথুন দে সভাপতি ও আলোকময় নাহা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৯১-এ তিনি ময়মনসিংহ শাখার সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ছিলেন সহ-সভাপতি। মৃত্যু. ময়মনসিংহ, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯১।

আশরাফ আলী খান (১৯০১-১৯৩৯)॥ জন্ম. পানাইল গ্রাম, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর, ১৯০১। কবি ও সাংবাদিক। গ্রামের হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি। দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নকালে অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-১৯২২) প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে কলেজের পাঠ ত্যাগ। এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। ১৯২৩-এ কলকাতায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কেরানির চাকরি লাভ। ১৯২৭-এর নভেম্বর মাসে তাঁর সম্পাদনায়



সাপ্তাহিক 'বেদুঈন' প্রকাশিত। পত্রিকাটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দান। ১৯২৮-১৯২৯-এর দৈনিক 'সোলতানের' সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন। এ পত্রিকা থেকে পদত্যাগ করে ঢাকায় আগমন (১৯২৯)। এখানে যুব আন্দোলন, মসজিদ রক্ষার আন্দোলন ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থেকে পুনরায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং নবপর্যায়ে 'বেদুঈন' প্রকাশ। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'নও-জওয়ান' প্রকাশিত। বিপ্লবের বেদনার ও সাম্যের কবি হিসেবে খ্যাত। 'ভোরের কুহু' (১৯২৯) ও 'কঙ্কাল' (১৯৩৫) তাঁর রচিত কবিতাগ্রন্থ। ইকবালের বিখ্যাত কাব্য 'শেকোয়া'র সার্থক বঙ্গানুবাদ (১৯৩৩) করে প্রসিদ্ধি লাভ। মৃত্যু. শেষ জীবন অভাব-অনটনের মধ্যে অতিবাহিত। দারিদ্র্যের দুঃসহ জ্বালায় কলকাতায় বিষপানে আত্মহত্যা, ১৯ নভেম্বর, ১৯৩৯।

আশরাফ-উজ-জামান খান (১৯১১-২০০৮)॥ জন্ম. দাদরোখী, ঝিটকা, মানিকগঞ্জ, ১০ অক্টোবর ১৯১১। সাহিত্যিক, সম্প্রচার সাংবাদিক ও বেতার-ব্যক্তিত্ব। পিতা খানবাহাদুর আক্রাম-উজ-জামান খান, মাতা সায়েমা বানু, স্ত্রী লুবনা খানম। কলকাতা



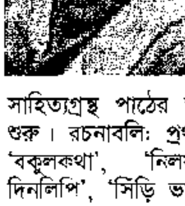
আর্টস কলেজ থেকে ডিপ্লোমা ইন কমার্শিয়াল আর্টস-এ সনদপ্রাপ্ত। ১৯৪০-এ কলকাতা অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সহকারী অনুষ্ঠান পরিচালক হিসেবে কর্মজীবনের শুরু। বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন ও

অবসরগ্রহণ। বেতারের মহাপরিচালক পদ থেকে অবসরের পর সেন্ট মার্গারেট টিউটোরিয়ালের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশে সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭১-এ ৭ ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারে বাঁধা দেওয়ায় সকল বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে বেতারকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসেন। এই অসমসাহসী কাজের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রকাশিত উপন্যাস: মঞ্জিল (১৯৪৮), শায়েরনামা (১৯৫৪); ছোটগল্প: অরণ্য পর্বত নদী ও সমুদ্র (১৯৬২), খেয়া নৌকার মাঝি (১৯৪৯); নাটক: সয়লাব (১৯৫৬); ভ্রমণকাহিনি: সীমান্ত মুসাফির; শিশুসাহিত্য: মহাযুদ্ধে বিভীষিকা, হতে হবে বীর পালোয়ান, অভিযানের গল্প; অনুবাদ: এলেম নতুন দেশে (উপন্যাস, ১৯৬০); স্মৃতকথা: ধূসর পাণ্ডুলিপি (২০০৭)। এয়াড়া তিনি 'আনোয়ারা' ও 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের সরল ভাষায় পুনর্কথন করেছেন। সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য একুশে পদক (২০১২) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮।

আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী (১৮৯৩-১৯৭৬)॥ জন্ম. সুয়াগাঙ্গী, কুমিল্লা ১৮৯৩। পিতা তফাজ্জল আহমদ চৌধুরী ছিলেন জমিদার। কলকাতার হেয়ার স্কুল ও সেন্ট জোভিয়ার্স স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ। ১৯১৭-এ রাজশাহী কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯২০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাস করে কুমিল্লা বারে আইনজীবী হিসেবে যোগদান। তারপর রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ১৯২১-এ খেলাফত কমিটির সভাপতি ও কংগ্রেস জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯২৩-এ কৃষক আন্দোলনে যোগদান। ১৯১৯-এ ত্রিপুরা জেলা কৃষক সমিতির উদ্যোক্তা ছিলেন। বামদ্রোহিতার জন্য পাঁচ বার কারারুদ্ধ হন। রাজনৈতিক জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (১৯৩৭-৪১) হিসেবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবক্তা। ১৯৩৯-এ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তিনি সুভাস বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক মনোনীত। ১৯৩৮-৪০-এ ছিলেন কুমিল্লা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯৪৩-এ সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় কংগ্রেস মনোনয়ন (বাংলা) বোর্ডের তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্য। মুর্শিদাবাদের তাওয়াবের নেতৃত্বে স্থাপিত হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সমিতির সদস্য। ১৯৫৪-৫৫-এ নেজামে ইসলামের প্রার্থী হিসেবে পূর্ববাংলা আইনসভার সদস্য নির্বাচিত এবং একে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষা সংস্কারে ব্রতী হন। ১৯৫৫-এ বাংলা একাডেমীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণদান। ১৯২৯-৩০-এ ছিলেন কুমিল্লা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। লবণ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের সময় কংগ্রেসের নির্দেশে তিনি পদত্যাগ করেন। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে 'মোসলেম ভারত', কৃষকপ্রজা পার্টির মুখপত্র সাপ্তাহিক 'নয়াবাংলা' ও 'দি মুসলমান' পত্রিকা পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন। ১৯২৪-এ কবি রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর সঙ্গে বিয়ে। রাজিয়া খাতুন চৌধুরী তাঁর 'চাষা' কবিতাটি রাজনীতিক স্বামীর এক চিঠির প্রত্যুত্তরে রচনা করেছিলেন। চারিত্রিক আদর্শ ছিল অনন্য সাধারণ। সত্যও ন্যায় নিষ্ঠায় প্রতি ছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। মৃত্যু. কুমিল্লা, ২৫ মার্চ ১৯৭৬।

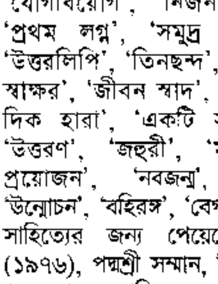


আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)॥ জন্ম. উত্তর কলকাতা, ৮ জানুয়ারি, ১৯০৯। কথাসাহিত্যিক। পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী। মাতা সরলাসুন্দরী দেবী। প্রথাগত শিক্ষালাভের সুযোগ না হলেও মায়ের প্রেরণায় বাড়িতে পত্রপত্রিকা ও সাহিত্যগ্রন্থ পাঠের অভ্যাস থেকে লেখালেখির শুরু। রচনাবলি: প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা', 'নিলয়-নিবাস', 'দিব্যহাসিনীর দিনলিপি', 'সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক', 'চিত্রকল্প', 'দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে', 'লীলা চিরন্তন', 'চাবি বন্ধ সিন্দুক', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'আর এক আশাপূর্ণা',



'এই তো সেদিন', 'অলয় আদিত্যের ইচ্ছাপত্র রহস্য', 'গজ উকিলের হত্যা রহস্য', 'ভূতুরে কুকুর', 'রাজকুমারের পোশাকে', 'মনের মুখ', 'মধ্যে সমুদ্র', 'যাচাই', 'ভুল ট্রেনে উঠে', 'নিমিত্তমাত্র', 'কখনো কাছে কখনো দূরে', 'নষ্টকোষ্ঠী', 'মজারু মামা', 'ষড়যন্ত্রের নায়ক', 'চশমা পাল্টে যায়', 'বিশ্বাস-অবিশ্বাস', 'কাঁটাপুকুর লেনের কমলা', 'নেপথ্য নায়িকা', 'জনম জনমকে সাথী', 'লঘু ত্রিপদী', 'শৃঙ্খলিতা', 'সানগ্লাস', 'শুক্তিসাগর', 'সুখের চাবি', 'সুয়োরানীর সাধ', 'সুরভি স্বপ্ন', 'যার বদলে যা', 'বালির নিচে ঢেউ', 'বলয়গ্রাস', 'যোগবিয়োগ', 'নির্জন পৃথিবী', 'ছাড়পত্র', 'প্রথম লগ্ন', 'সমুদ্র নীল আকাশ নীল', 'উত্তরলিপি', 'তিনছন্দ', 'মুখররাত্রি', 'আলোর স্বাক্ষর', 'জীবন স্বাদ', 'আর এক ঝড়', 'নদী দিক হারা', 'একটি সন্ধ্যা একটি সকাল', 'উত্তরণ', 'জহুরী', 'মায়াজাল', 'প্রেম ও প্রয়োজন', 'নবজন্ম', 'শশীবাবুর সংসার', 'উন্মোচন', 'বহিরঙ্গ', 'বেগবতী', 'আবহ সংগীত'। সাহিত্যের জন্য পেয়েছেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৭৬), পদ্মশ্রী সম্মান, বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম (১৯৮৯), সাহিত্য আকাদেমির ফেলোশিপ (১৯৯৪), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হরনাথ ঘোষ পদক (১৯৮৮), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৯৩), রবীন্দ্র পুরস্কার প্রভৃতি। মৃত্যু. কলকাতা, ১৩ই জুলাই, ১৯৯৫।

আশালতা সিংহ (১৯১১-১৯৮৩)॥ জন্ম. বিহারের ভাগলপুর, ১৯১১। ঔপন্যাসিক। বাল্যশিক্ষা গৃহাভ্যন্তরেই ঘটেছিল। সচ্ছল পারিবারিক পরিবেশ ও ভাগলপুরের সাহিত্য-সংস্কৃতির উদার পরিমণ্ডলে মানসিক বিকাশ ও প্রবণতাসমূহ পরিণতি পায়। তেরো বছর বয়সে বিয়ে হলে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের দুবরাজপুর গ্রামে চলে আসেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠা শুরু হয় ষোলো বছর বয়স থেকে এবং ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি সাহিত্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হন। বর্তমান শতকের তিরিশের দশকে তাঁর গল্প ও উপন্যাস সকলকে চমকে দিয়েছিল। সাহিত্যসাধনার বাইরে সংগীতের দিকেও ঝুঁকেছিলেন। সাহিত্যজীবনে খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই পেয়েছিলেন আধুনিক ও অ-নারীসুলভ গভীর মনোভঙ্গির জন্য। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচনা বেরুতো। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: মানসী অমিতার প্রেম, আবির্ভাব, ক্রন্দসী, কলেজের মেয়ে, স্বয়ম্বরা, বিয়ের পরে, শহরের মোহ, সমর্পণ, একাকী, ভুলের ফসল, নতুন অধ্যায়, দুই নারী, জীবনধারা, অভিযান, অন্তর্যামী, মধুচন্দ্রিকা। মৃত্যু. ১৯৮৩।



আশীষকুমার লোহ (১৯৩৭-১৯৯৪)॥ জন্ম. ময়মনসিংহ, ১০ অক্টোবর, ১৯৩৭। অভিনেতা। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে আই.এসসি. পাস। বেতার ও টিভির বিশিষ্ট নাট্যকার। নাট্যাভিনয়েও কুশলতার পরিচয় দান। বিটিভি-র (বাংলাদেশ টেলিভিশন) প্রথম ধারাবাহিকনাটক 'ত্রিরত্নের' (হীরা-চুনি-পান্না) হীরা চরিত্রে অভিনয় করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। বাংলা চলচ্চিত্রের একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা, চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতা। 'হারানো দিন' ছবিতে প্রথম অভিনয় (১৯৬০)। অভিনীত অন্যান্য ছবি, 'কারওয়াঁ', 'বেগানা', 'ভাওয়াল সন্ন্যাসী', 'কায়সে কহুঁ', 'নদী ও নারী', 'সুতরাং', 'অঙ্গার', 'অচেনা অতিথি', 'রূপালি সৈকতে', 'মৌচাক', 'সখী তুমি কার', 'কার বউ', 'আপন দুলাল', 'নয়ন তারা', 'অনেক দিন আগে', 'দুইপর্ব', 'বাদল', 'রাজার রাজা', 'জন্ম থেকে জ্বলছি', 'পাগলা রাজা', 'সোহাগ মিলন', 'আলী বাবা ৪০ চোর', 'মধুমালতী', 'শাস্তি', 'ঘরে বাইরে', 'পরিণীতা'। ছোট গল্পকার হিসেবেও সুনাম অর্জন। 'অনেক তারার আকাশ' (১৯৬৬) তাঁর একখানি সুপরিচিত গল্পসংকলন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এদেশের চলচ্চিত্রের প্রথম পেশাদার লেখক। কৌতুক অভিনেতা হিসেবে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। মৃত্যু. ঢাকা, ৩ নভেম্বর, ১৯৯৪।

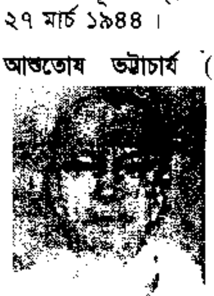


আশুতোষ চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪৪)॥ জন্ম. কদুরখিল গ্রাম, বোয়ালখালি, চট্টগ্রাম, ৫ নভেম্বর ১৮৮৮। লোকগীতির সংগ্রাহক ও কবি। পিতা কৈলাশচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। চট্টগ্রাম থেকে এন্ট্রান্স পাস। মোক্তারি পাস করে চট্টগ্রাম জেলা আদালতে আইন ব্যবসায়

যোগদান। কিছুকাল পরে মোক্তারি পেশা ত্যাগ করে আর.আর.এ.সি. ইনস্টিটিউশন, রাউজান-এ হেডপণ্ডিত পদে যোগদান। তাঁর রচিত 'চট্টলা ভূমি' নামক স্কুলপাঠ্য বই পাঠ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ ড. দীনেশচন্দ্র সেন মুগ্ধ হন। বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতিস্বরূপ ড. দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকগীতির সংগ্রাহক নিযুক্তি। চট্টগ্রাম জেলার গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণ করে বহু চিত্তগ্রাহী ও মর্মস্পর্শী পালা গান সংগ্রহ। সংগৃহীত পালাগান: 'নিজাম ডাকাতের পালা', 'কাফন চোরা', ভেলুয়া', হাতী খেদার গান', 'কমল সদাগরের পালা', সুজা তনযার বিলাপ', 'নছর মালুম', 'নূরুন্নেহা ও কবরের কথা', 'পরীবানুর হাঁইলা', 'দেওয়ান মনুহর', ও 'মজুনা'। এ-সকল পালাগান ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় সংকলিত। শুধু একজন লোকগাঁথার সংগ্রাহক নন, একজন স্বভাবকবি ও গীতিকারও। 'আদম আশক' তাঁর একখানি কাহিনীকাব্য। গাঁথা চিত্র: 'ব্যথার বাণী', 'ময়নার ত্যাগ', 'স্বপ্নের জয়'। গানের সংকলন: 'গীতিকা'। অভিধান: 'চট্টগ্রামী ভাষা ও সংস্কৃতি'। ওহীদুল আলমের সঙ্গে চট্টগ্রামের সাহিত্য মাসিক 'পূরবী' (১৯৩৬) সম্পাদনা। মৃত্যু. ২৭ মার্চ ১৯৪৪।



আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৪)॥ জন্ম. মাতুলালয়, ঝালুয়া গ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি ১৯০৯। লেখক ও অধ্যাপক। পৈতৃক নিবাস বকজোড়কান্দি গ্রাম, কিশোরগঞ্জ। পিতা মুরারিমোহন ভট্টাচার্য ছিলেন কিশোরগঞ্জ আদালতের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী। কিশোরগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক (১৯২৬) ও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ.



বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ থেকে ১৯৩১-এ দ্বিতীয় শ্রেণিতে বি.এ. অনার্স (বাংলা) ও ১৯৩২-এ প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. (বাংলা) ডিগ্রি লাভ। 'বাংলার লোকসাহিত্য' (১ম খণ্ড) গ্রন্থের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ (১৯৫৯)। কর্মজীবন শুরু আসানসোল রেলওয়ে স্কুলের ভার্নাকুলার শিক্ষক (১৯৩৩-১৯৩৭) হিসেবে। ১৯৩৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৪৭-এ কলকাতা যাদুঘরের ভারতের নৃতাত্ত্বিক জরিপ শাখার গবেষণা সহযোগী হিসেবে যোগদান। ১৯৫৫-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের বাংলার প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬১-তে রিডার, ১৯৬৭-তে রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও ১৯৭১-এ বিভাগীয় অধ্যক্ষ পদে উন্নীত। ১৯৭৭-এ অবসর গ্রহণ। বিশিষ্ট গবেষক। বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি, বাংলা মঙ্গলকাব্য ও বাংলা নাট্যসাহিত্যের গবেষণায় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' (১৯৩৬), 'বাংলার লোকসাহিত্য' (১ম খণ্ড-১৯৫৪, ২য় খণ্ড-১৯৬৩, ৩য় খণ্ড-১৯৬৫, ৪র্থ খণ্ড-১৯৬৬, ৫ম খণ্ড-১৯৬৯, ৬ষ্ঠ খণ্ড-১৯৭২), 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড-১৯৫৫, ২য় খণ্ড-১৯৬১), রবীন্দ্রনাট্য-ধারা (১৯৬৬) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ। কবিতা এবং ছোটগল্পেরও রচয়িতা। কাব্য: 'মধুমালা' (১৯৩৬), 'আজব বেদে' (ছড়া, ১৯৩৬), 'কাব্য সঞ্চয়ন' (১৯৪৩)। গল্পগ্রন্থ: মনের আগুন (১৯৩৬), বনতুলসী (১৯৬১)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী স্বর্ণপদক (১৯৫০) এবং এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বি. সি. এল. স্বর্ণপদক (১৯৮৩) লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯ মার্চ ১৯৮৪।



আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার (১৮৬৪-১৯২৪)॥ জন্ম. মলঙ্গা লেন, কলকাতা, ২৯, জুন ১৮৬৪। পৈতৃক নিবাস জীরাট-বলাগড়, হুগলী। আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (এম.বি.)। ১৮৭৯-তে কলকাতা সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পাস। প্রেসিডেন্সি কলেজে

ভর্তি। এ কলেজ থেকে ১৮৮২-তে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এফ.এ., ১৮৮৪-তে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. এবং ১৮৮৫-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে অঙ্কে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৮৮৬-তে প্রতি পেপারে গড়ে শতকরা ৯৬ ভাগ নম্বর পেয়ে পদার্থবিজ্ঞানে দ্বিতীয়বার এম.এ. পাস। একই বছর প্রেমচাঁদ-রায়চাদ বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দশ হাজার টাকা বৃত্তি এবং আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ। ভারতে শিক্ষিত অধ্যাপককে ইংল্যান্ডে শিক্ষিত অধ্যাপককের সমমর্যাদা প্রদানে ভারতীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অস্বীকৃত হওয়ায় শিক্ষা বিভাগের প্রস্তাবিত চাকরি প্রত্যাখ্যান। কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ওকালতিতে অসাধারণ পসার লাভ। ১৮৮৯-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য এবং সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত। ১৮৯৪-তে ডক্টর অব ল' ডিগ্রি লাভ। কিছুকাল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ১৮৯৮-১৯০৪-এ কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য, ১৮৯৯-১৯০৪-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ও ১৯০৩-১৯০৪-এ ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য। ১৯০৪-এ রাজনীতি ত্যাগ। একই বছর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত। একই সঙ্গে ১৯০৬-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত। দুই বছর মেয়াদি এ পদে ক্রমাগত চারবার দায়িত্ব পালন (১৯০৬-১৯১৪)। ১৯২১-এ পঞ্চম বার উপাচার্য পদে নিযুক্তি লাভ। শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধনে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুর্নগঠনে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান। বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাস চালু, বিজ্ঞান ও আইন কলেজ স্থাপন, স্কুল-কলেজে বাংলা পত্র চালু, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ক্লাস প্রবর্তন, দ্বারভাঙ্গা-সৌধ নির্মাণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ংকর্তৃক প্রতিষ্ঠা তাঁর অমর কীর্তি। আপত্তিকর শর্ত (সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে) ছিল বিধায় ষষ্ঠবার উপাচার্য নিয়োগের প্রস্তাব প্রত্যাখান। ইংরেজ গভর্নর লর্ড লিটন যখন (১৯২৩-১৯২৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করতে চান তখন অতি সাহসের সঙ্গে রাজশক্তির সহিত বাদানুবাদে অবতীর্ণ। এই তেজস্বিতার স্বীকৃতস্বরূপ জনগণের কাছ থেকে 'বাংলার বাঘ' উপাধি লাভ। তিনবার এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির কাউন্সিলের সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন। গণিত আইনশাস্ত্রে দক্ষতার পরিচয় প্রদান। গণিত শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা ও দুরূহ সমাধান ক্ষমতার স্বীকৃতি আছে 'ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস' ও 'ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন-এ। টেগোর 'ল' অধ্যাপকরূপে 'ল' অফ পারপিটুইটিজ' শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা। তাঁর প্রবন্ধের সংকলন 'জাতীয় সাহিত্য' একখানি মননশীল গ্রন্থ। ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, পালি ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন। সুবক্তা ও তার্কিক। তাঁর দেশপ্রেম, পাণ্ডিত্য, তেজস্বিতা ও মাতৃভক্তি সম্পর্কে বহুকাহিনী প্রচলিত। ভারতের ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সি.এস.আই. ও নাইট, নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক সরস্বতী, পূর্ববঙ্গের সুধীসমাজ কর্তৃক শাস্ত্রবাচস্পতি ও সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা)-এর মহাবোধি সোসাইটি থেকে সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্তী উপাধি লাভ। ১৯২৩-এ বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগ। পুনরায় ওকালতি পেশায় যোগদান। প্রসিদ্ধ ডুমরাঁয় মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য পাটনা গমন। সেখানে হঠাৎ পাকস্থলীর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন। মৃত্যু. পাটনা, ২৫ মে ১৯২৪।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৯)॥ জন্ম. ঢাকা, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২০। ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক। পিতা সরকারি চাকরির কারণে তত্কালীন পশ্চিম ও উত্তরবাংলার অনেক স্কুল-কলেজে পাঠগ্রহণ। সংবাদপত্রের সাহিত্য বিভাগে সম্পাদনার কাজে স্থিতি এবং কালক্রমে সম্পাদক। বাইশ বছর বয়সে হঠাৎই লেখার প্রেরণা। প্রথম জনপ্রিয় উপন্যাস 'চলাচল'। চলচ্চিত্রের সার্থক রূপায়ণ খ্যাতি ও যশের উৎস। 'পঞ্চতপা' উপন্যাস ও ছায়াচিত্রের লেখক হিসাবে খ্যাতি। বহু বাংলা এবং হিন্দি চলচ্চিত্রের কাহিনীকার। জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম সারির একজন। ছোটগল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসের সংখ্যা শতাধিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: কাল তুমি আলেয়া, অন্য নাম জীবন, অপরিচিতের মুখ,



আনন্দরূপ, আবার আমি আসবো, আরো একজন, আশ্রয়, একটি বিশ্বাসের জন্য, একাল ওকাল, খনির নুতন মনি, দিনকাল, নগর পারে রূপনগর, নিষিদ্ধ বই, পিন্টিদার গোপ্পো, পিন্টিদার পঞ্চবান, পিন্টিদার রিটায়ারমেন্ট, পুরুষোত্তম, বলাকার মন, বাসকশয়ন, মেঘের মিনার, রূপেরহাটে বিকিকিনি, লিডার বটে পিন্টিদা, শত রূপে দেখা, সজনীর রাত পোহালো, সবুজতরণ ছাড়িয়ে, সিকেপিকেতিকে, সোনার হরিণ নেই, পরকপালে রাজা রানী প্রভৃতি। বহু উপন্যাস হিন্দি ও ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মৃত্যুঃ কলকাতা ৪ মে ১৯৮৯।

আশেক আলী খান (১৮৯১-১৯৭৪)॥ জন্ম. গুলবাহার গ্রাম, কচুয়া, চাঁদপুর, ১৮৯১। শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক। বাবুরহাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক (১৯১১), কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই.এ. (১৯১৩), কলকাতা সিটি কলেজ থেকে বি,এ, (১৯১৮) এবং ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ডিস্টিঙ্কশনসহ বি.এ.বি.টি. (১৯১৯) পাস। চাঁদপুর জেলার প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট। বি.এ.পাস করার পর কিছুকাল চাঁদপুর গনি হাইস্কুলে শিক্ষকতা। স্কুল পরিদর্শক পদে চাকরি লাভ। ১৯১৯-এ সরকারি স্কুলে শিক্ষকতার কর্মে যোগদান। ১৯৪৬-এ সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। অবসর-জীবনে সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা পুর্নগঠনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি স্কুল টিচার্স কনফারেন্স রিসিপশন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন (১৯৪৯)। চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল, নারায়ণপুর হাইস্কুল, দরবেশগঞ্জ হাইস্কুল ও রঘুনাথপুর হাইস্কুলের সংগঠক ও হেডমাস্টার হিসেবে কর্ম সম্পাদন (১৯৪৭-১৯৫৯)। জন্মস্থান গুলবাহার গ্রামে নিজের বাড়িতে প্রথমে প্রাইমারি স্কুল, পরে নিজের নামে 'আশেক আলী খান হাইস্কুল' প্রতিষ্ঠা। তাঁর চেষ্টায় স্কুল সংলগ্ন স্থানে একটি মসজিদ ও একটি ডাকঘর স্থাপিত। কচুয়া থানায় এস.এস.সি. পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন। গ্রামোন্নয়নে তাঁর অবদান স্মরণীয়। কৃষিভূমিতে জলসেচ ও সার প্রয়োগ, হাঁস-মুরগির টিকাদান গ্রামের রাস্তাঘাট সংস্কার, গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি ও নিজের গ্রামে বিদ্যুৎ আনয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। মৃত্যু. ২ আগস্ট ১৯৭৪।



আসকার আলী (১৯০০-১৯৮৯)॥ জন্ম. রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ১৯০০। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, পরে জন্মস্থানের পার্শ্ববর্তী তৎকালীন জমিদার অধ্যুষিত অঞ্চল মুড়াপাড়ায় অবস্থিত মুড়াপাড়া ভিক্টোরিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯১৮-তে এই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে অষ্টম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পাস। ঢাকা কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে আই.এ. ও বি.এ. পাস করার পর ১৯২৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৯২৫-এ উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাত্রা। অধ্যয়ন-সূত্রে প্রায় আট বছর ইংল্যান্ডে বাস। ১৯২৯-এ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সসহ বি.এ. ডিগ্রি লাভ। এ ছাড়া ইংরেজি ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা পান। ১৯৩২-এ ইংল্যান্ডের লিঙ্কনস ইন থেকে বার-এট-ল ডিগ্রি অর্জন। ১৯৩৩-এ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। আইন বিভাগে সাদর আমন্ত্রিত হলো পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ। ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের ইচ্ছায় ১৯৩৪-এ বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে যোগদান। ১৯৫৬ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করার পর ঢাকা গভর্নমেন্ট কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসেবে অবসর গ্রহণ। খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে কিছুকাল ধ্বনিতত্ত্ব পড়ান। সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৫৬-তে রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান। তৎকালীন ঢাকা সিটি নাইট কলেজের (বর্তমানে ঢাকা সিটি কলেজ) প্রিন্সিপালরূপে ১৯৬৮ পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। এরপর কর্মজীবন



থেকে পুরোপুরি অবসর। বেশ কয়েকটি মূল্যবান স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা। টেক্সট বুক হিসেবে রচিত ইংরেজি বইগুলো বাংলাদেশের অধিকাংশ স্কুলেই তখন বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে পড়ানো হতো। 'মর্ডান ইংলিশ ট্রানস্লেশন অ্যান্ড গ্রামার' তাঁর একখানি উল্লেখযোগ্য স্কুল পাঠ গ্রন্থ। সুযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন: অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক কাজী দীন মুহম্মদ, প্রিন্সপাল তোফায়েল আহমদ। স্বদেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অভিজ্ঞতার আলোকে ছাত্রদের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটাতে যে-ভূমিকা পালন করেছেন তাতে এক অনন্য শিক্ষাবিদরূপে স্মরণীয়। মৃত্যু. ৬ অক্টোবর ৮৯।

আসফউদ্‌দৌলা রেজা (১৯২৬-১৯৮৩)॥ জন্ম. ধানকুণ্ডী গ্রাম, শেরপুর, বগুড়া, ১৯২৬। সাংবাদিক, সাহিত্যিক। সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্ম। পিতার নাম মোহাম্মদ আসগর হোসেন সরকার, মাতা ফেরদৌসমহল সিরাজী। পুরো নাম রেজাউল মোস্তফা মুহম্মদ আসফউদ্‌দৌল্লা। শৈশবে মাতামহ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী কাছে প্রতিপালিত। ১৯৪৩-এ চান্দাইকোনা হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করে কিছুকাল পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজে অধ্যয়ন। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৪৭-এ একই কলেজ থেকে বি.এ. পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম.এ. অধ্যয়নকালে পিতার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পড়াশুনা ত্যাগ। ১৯৫১-তে কিছুদিনের জন্য চান্দাইকোনা হাই স্কুলে শিক্ষকতা। একই বছর দৈনিক আজাদ পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগদান। সে সময় ঢাকার প্রাচীন পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সঙ্গে যুক্ত। 'মুখদুমী অ্যান্ড আহসানউল্লাহ পাবলিকেশন্স' ও 'মডার্ন পাবলিকেশন্স'-এর সঙ্গে যুক্ত। সরকারি তোষণ নীতি মেনে নিতে না পারায় 'দৈনিক আজাদ' ত্যাগ করে কিছুকাল



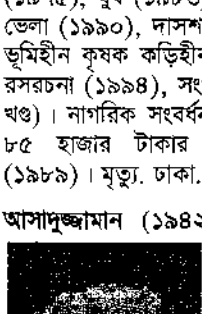
'দৈনিক সংবাদ'-এ সাংবাদিকতা। ১৯৫৪-তে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার সহকারী বার্তা-সম্পাদক পদে যোগদান। ১৯৭০-এ বার্তা-সম্পাদক পদে উন্নীত এবং ১৯৭২-এ উক্ত পত্রিকার যুগপৎ বার্তা ও কার্য-নির্বাহী সম্পাদক পদে আসীন। 'অভিযোগ' নামে উপন্যাস এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, সোভিয়েত মতবাদ, রাজনীতি ও সরকার, নিরস্ত্র সংগ্রাম প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থ রচনা। একজন বিশিষ্ট বেতার ব্যক্তিত্ব। ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথমে 'আমার দেশ' (১৯৫১), পরে 'বুনিয়াদী গণতন্ত্রের আসর' (১৯৬০) পরিচালনা। দক্ষ, নির্ভীক ও নিষ্ঠাবান সাংবাদিক হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। মার্কিন নীতির একজন দৃঢ় সমর্থক হিসেবে পরিচিত। মৃত্যু. ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩।

আসহাব উদ্দীন আহমদ (১৯১৪-১৯৯৪)॥ জন্ম. সাধনপুর গ্রাম, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ১৯১৪। রাজনীতিবিদ ও লেখক। সাধনপুর স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক (১৯৩২), চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. (১৯৩৪) ও একই কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বি.এ. (১৯৩৬) পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. (১৯৩৯) ডিগ্রি লাভ। চট্টগ্রাম কলেজ, লাকসাম নবাব ফয়জুন্নেসা কলেজ, ফেনী কলেজ ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যাপনা (১৯৩৯-১৯৫৩)। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে কুমিল্লায় নেতৃত্ব প্রদান। ১৯৫৩-তে অধ্যাপনার কর্ম পরিত্যাগ করে রাজনীতিতে যোগদান। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি (১৯৫৩-১৯৫৭)। ১৯৫৪-র ৮ মার্চ যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে বাঁশখালী এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৭-তে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য ও চট্টগ্রাম জেলা ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক। একই সঙ্গে তৎকালীন নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টিরও সদস্য। ১৯৬৭-তে পিকিংপন্থি কমিউনিস্ট



পার্টির (গোপন) চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত। প্রায় ১৫বছর গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির (মাওবাদী) রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা (১৯৬০-১৯৭৫)। সাম্যবাদী দলের (১৯৭০) সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। ১৯৮০-তে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে গণ-চীন সফর। একই বছর বামপন্থি রাজনীতির দলাদলি ও বিভেদে বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ। বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সঙ্গে যুক্ত। এর কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি। চট্টগ্রাম দৈনিক আজাদী ও দৈনিক পূর্বকোণ এবং ঢাকার দৈনিক সংবাদের কলাম লেখক। লেখন হিসেবেও সুনাম অর্জন। বামপন্থি চিন্তা-চেতনা, দেশাত্মবোধ ও মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা তাঁর লেখায় আন্তরিকতার সঙ্গে উপস্থাপিত। গ্রন্থঃ মেড ভেরী ইজি (১৯৪৯), বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর (১৯৪৯), ধার (১৯৫০), জান ও মান (১৯৫০), সের এক আনা মাত্র (১৯৬৮), Bande Votaram (১৯৭০), হাতের পাঁচ আঙ্গুল, ইন্দিরাদি সমীপেষু, আওয়ামী লীগের মীরজাফরী ঐতিহ্য (১৯৭০), দাঁড়ি সমাচার (১৯৭১), বিপ্লব বনাম অতিবিপ্লব, ভাতের বাঙলা কাপড়ের বাংলা, বামা সমাচার, লাঠি লাথি ও গণতন্ত্র (১৯৭৪), দ্বিপদ বনাম চতুষ্পদ, ইন্দিরা গান্ধীর বিচার চাই (১৯৭৫), ঘুষ (১৯৮৬), উজান স্রোতে জীবনের ভেলা (১৯৯০), দাসশাসন দেশশাসন (১৯৯১), ভূমিহীন কৃষক কড়িহীন লেখক (১৯৯২), সেরা রসরচনা (১৯৯৪), সংগৃহীত রচনাবলি (১ম-৪র্থ খণ্ড)। নাগরিক সংবর্ধনা পরিষদ (ঢাকা) কর্তৃক ৮৫ হাজার টাকার তোড়া উপহার প্রদান (১৯৮৯)। মৃত্যু. ঢাকা. ২৮ মে ১৯৯৪।

আসাদুজ্জামান (১৯৪২-১৯৬৯)॥ জন্ম. ধানুয়া গ্রাম, শিবপুর, ঢাকা, ১০.০৬.১৯৪২।



ছাত্রনেতা। আসাদ নামে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ। ১৯৬০-এ শিবপুর হাইস্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৬৩-তে সিলেট এম.সি কলেজ থেকে আই.এ. এবং ১৯৬৬-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস অনার্স নিয়ে বি.এ. এবং ১৯৬৭-তে এম.এ. (ইতিহাস) পাস। ঢাকা সিটি ল কলেজে এল.এল.বি ক্লাসে ভর্তি। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি মাসে কিছুদিন কুমিল্লার বাঞ্ছারামপুর থানার আসমাতুন্নেসা হাই স্কুলে শিক্ষকতা। তিনি ছিলেন তৎকালীন কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক এবং মওলানা ভাসানীর রাজনীতির অনুসারী। ঢাকা শহর ছাত্র ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং তৎকালীন ঢাকা হলের ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) শাখার সভাপতি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পর মওলানা ভাসানীর নির্দেশে কৃষক সমিতি সংগঠন করার জন্য শিবপুরে গমন। এক বছরের কম সময়ে মধ্যে শিবপুর মনোহরদী, রায়পুরা, নরসিংদী অঞ্চলে কৃষক সমিতির সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৬৮-র ২৯ ডিসেম্বর সরকারি জুলুমের প্রতিবাদে মাওলানা ভাসানী পূর্ব-পাকিস্তানের হাট-বাজারে হরতাল আহবান করলে শিবপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে হরতাল পালনের নেতৃত্ব গ্রহণ। সেদিন হাতিরদিয়া হাটে তাঁর নেতৃত্বে হরতাল পালন করা হয়। এতে পুলিশের বাধা ও গুলির মুখে তিনজন কৃষক কর্মী নিহত হন। আহত হন আসাদ নিজে। আহত অবস্থায় সাইকেল যোগে ঢাকা আসার পথে ঘোড়াশালের কাছে রাতের অন্ধকারে রাস্তার ধারে জঙ্গলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁরই এক কৃষক কর্মীর সহযোগিতায় ঢাকা আসেন হাতিরদিয়া ঘটনার খবর পত্রিকায় দেওয়ার জন্যে। এদিকে আইয়ুব খানের একনায়ক শাসনের মূলোচ্ছেদ করার সংকল্প নিয়ে ১৯৬৯-এ জানুয়ারি মাসে বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠন ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তৎপর হয়। কেন্দ্রী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২০ জানুয়ারি তারিখে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন চত্বরে এক ছাত্রসভা আহবান করে। সভায় শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ছাত্র যোগদান করে। তারা পূর্ব থেকে বহালকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুলিশ, ই.পি.আর. বাহিনীর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসকে উপেক্ষা করে সভা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে এক মিছিল বের করে। মিছিলের এক অংশ মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তা ধরে চাঁন খাঁ-র পুলের দিকে অগ্রসর হলে সশস্ত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে বেলা প্রায় দুটোর দিকে মূল ঘটনাস্থলের অনতিদূরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পূর্বদিকের

ফটকের পাশে ফুটপাতে জনৈক কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের পিস্তলের গুলিতে আসাদের বক্ষ বিদীর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পরের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয় এবং পল্টন ময়দানে এক বিশাল গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে লক্ষাধিক লোক নগ্নপদে মৌন মিছিল বের করে রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। নামাজ আদায়ের পূর্বে সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ আসাদ হত্যার প্রতিবাদে ২২ ও ২৩ জানুয়ারি 'শোক দিবস' এবং ২৪ জানুয়ারি 'প্রতিবাদ দিবস' পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। সে কর্মসূচি মোতাবেক ২২ তারিখে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মঘট পালন, কালো ব্যাজ ধারণ, ২৩ তারিখ মশাল মিছিল ও ২৪ তারিখে প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতাল পালিত হয়। কর্মসূচির শেষ দিনটি একটি স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। ফলে মাত্র দুমাসের মধ্যে আইয়ুব খানের একনায়ক শাসন ব্যবস্থা ও তাঁর সরকারের পতন ঘটে। আইয়ুব শাহীর পতনের প্রতীক হিসাবে দেশের সকল স্থানে জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইয়ুবের নাম-ফলক নামিয়ে আসাদের নাম সংযোজন করে। এভাবে ঢাকার আইয়ুব গেট আসাদ গেটে এবং ঢাকার আইয়ুব এভিনিউ আসাদ এভিনিউতে রূপান্তরিত হয়। আসাদ ছিলেন চরিত্রবান, সত্যবাদী, মিশুক, সদালাপী এবং নিষ্ঠাবান সংগঠক। তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক। মৃত্যু. ঢাকা. ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯।

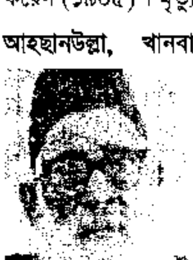
আসাদুজ্জামান খান (১৯১৬-১৯৯২)। জন্ম. কিশোরগঞ্জ, ১৯১৬। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. অনার্স (ইতিহাস), এম.এ. (ইতিহাস) ও ল' পাস। ১৯৩৮-১৯৩৯-এ সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি। ১৯৪১-এ বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (জুনিয়র)-এ যোগদান। ১৯৪৫-এ জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগদান। প্রায় ছয় বছর কাল মুন্সেফ পদে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৫১-তে চাকরি থেকে পদত্যাগ। ১৯৫২-তে আইনের পার্ট-টাইম প্রভাষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। একই সঙ্গে ঢাকা জেলা আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। কালক্রমে ঢাকা হাইকোর্টের একজন শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। ১৯৬৫-র ১৬ মে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর এলাকা থেকে মৌলিক গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ১১ জুন পরিষদে স্বতন্ত্র দল গঠন করে এর নেতৃপদ গ্রহণ। ১৯৬৭-র ১২ অক্টোবর উক্ত পরিষদের বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত। ১৯৬৯-এর ২৪ মার্চ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর এ দলের টিকিটে ময়মনসিংহ-১৫ আসন থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ মুজিবনগর গমন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৭২-এ সংবিধান প্রণয়ন কমিটিরন সদস্য হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২) রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ ময়মনসিংহ-২৬ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭৫-এর ২৬ জানুয়ারি শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পাটমন্ত্রী নিযুক্ত। একই বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাকশাল (কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ) গঠিত হলে এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিযুক্ত। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট রাষ্ট্র পতি শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের হাতে নিহত হওয়ার পর খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হলে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত। ৭ নভেম্বর (১৯৭৫) মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে মন্ত্রিত্ব থেকে পদচ্যুত। ১৯৭৯-র ১৮ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ-১৮ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ২৯ মার্চ আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের ও সংসদের বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত। ১৯৮২-র ২৪ মার্চ পর্যন্ত উভয় পদে দায়িত্ব পালন। অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ পার্লামেন্টারিয়ান। ষাটের দশকে বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু. ঢাকা, ২১ জানুয়ারি ১৯৯২।



আসাদুজ্জামান খান, গওহর (১৮৭২-১৯২২)। জন্ম. কলকাতা. পৈতৃক নিবাস দাদারোখী,

মানিকগঞ্জ, ১১ নভেম্বর ১৮৭২। কবি, সংগীতজ্ঞ, গবেষক। কলকাতা মাদ্রাসা ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভ। চলতি শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির আরবি ও ফার্সি পাণ্ডুলিপি বিভাগের 'রেসিডেন্ট রিসার্চ মৌলবী'। সোসাইটির উক্ত বিভাগের 'রিসার্চ অ্যান্ড ক্যাটালগ' বিভাগে ১৯১৭-১৯২১ পর্যন্ত ড. আবদুল্লাহ্ সোহারাওয়ার্দীর তত্ত্বাবধানে Printed Catalogue of Persian mss. পুনঃপরীক্ষা, সংশোধন ও নতুন ভুক্তি সংযোজন। তাঁর মৃত্যুর পর সোসাইটির বিশিষ্ট কর্মকর্তা W. Ivanow. এই ক্যাটালগ Concise Descriptive Catalogue of Persian mss. নামে প্রকাশ করেন। ১৮৯৫-এ ইংরেজি ভাষায় Indian Music: Vocal and Instrumental নামে মনোগ্রাফ রচনা। মনোগ্রাফটি কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে মুদ্রিত। এর কপি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে (লন্ডন) আছে। উর্দু ও ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখতেন, কবি-নাম: গাহর। ১৯১৪-এ ফার্সি গজলের বই তুহ্ফা-এ-আউয়াল প্রথম খণ্ড (পৃ.সংখ্যা ৪৪) কলকাতার ওসমানিয়া প্রেসে ছাপা হয়। বইয়ের একটি কপি ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। তাঁর উর্দু কবিতা সংকলনও কলকাতা থেকে ছাপা হয়েছিল বলে জানা যায়। গরহর তাঁর পিতা প্রখ্যাত পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক আদালত খানের খ্যাতনামা গ্রন্থ যেমন Vocabulary of the Thousand Words (6th Edition). Bagh O Bahar (9th Edition) প্রভৃতি সংশোধিত ও সংযোজিত আকারে পুনঃপ্রকাশ করেন (১৯০৫)। মৃত্যু এপ্রিল ৪, ১৯২২।

আহছানউল্লা, খানবাহাদুর (১৮৭৩-১৯৬৫)॥



জন্ম. নলতা গ্রাম, সাতক্ষীরা, ১৮৭৩। শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক। নলতার মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় ও টাকির উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। পরে ১৮৯০-এর ভবানীপুর লন্ডন মিশনারি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯২-তে হুগলী কলেজ থেকে এফ.এ. ১৮৯৪-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. এবং একই কলেজ থেকে ১৮৯৫-তে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাস। ১৮৯৬-তে সরকারের শিক্ষা বিভাগের চাকরিতে প্র[illegible] কলেজিয়েট স্কুলের সুপারনিউমারি টিচার। পরবর্তীকালে ফরিদপুরের ডেপুটি ইন্সপেক্টর, বাখরগঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর, চট্টগ্রামের ডিভিশনাল ইনপেক্টর অব এডুকেশন এবং সর্বশেষে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর পদে উন্নীত। এই দেশীয় মুসলমান অফিসারদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম আই.ই.এস-এ (ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস) অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯২৯-এ অবসর গ্রহণ। তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টায় তৎকালীন শিক্ষা বিভাগে মুসলিম শিক্ষার বিপুল সংস্কার সাধন। অনার্স ও এম.এ. পরীক্ষার নাম লিখবার পরিবর্তে রোল নম্বর লিখবার নিয়ম প্রবর্তন করে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব রহিত। উচ্চ মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক মাদ্রাসার শিক্ষার মান উন্নীত করে মাদ্রাসা পাস করা ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি। স্কুল-কলেজে মৌলভির পদ সৃষ্টি এবং পণ্ডিত ও মৌলভিদের বেতনের পার্থক্য রহিত। স্বতন্ত্র মক্তব পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও মুসলমান লেখকদের লেখা পুস্তক পাঠ্যসূচির সহায়ক পুস্তক হিসেবে ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন, স্কুল-কলেজে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণ, টেকস্ট বুক কমিটিতে মুসলমান সদস্য ভুক্তির ব্যবস্থা, পরীক্ষকদের মধ্যে মুসলমান পরীক্ষকের সংখ্যা নির্ধারণ, শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক ও কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমান পরিদর্শক ও কর্মচারীর সংখ্যা নির্ধারণ, ট্রেনিং কলেজে মুসলমান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নির্ধারণ এবং স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটিতে মুসলমানদের সংখ্যা নির্ধারণ করে মুসলমান সমাজের কল্যাণসাধন। তাঁর প্রচেষ্টায় নিউস্কিম মাদ্রাসার সৃষ্টি। কলকাতায় বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, রাজশাহীতে ফুলার হোস্টেল ও কলকাতায় মুসলিম ইনস্টিটিউট স্থাপনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য (১৯১৮), History of the Muslim Word (১৯৩১), আল ইসলাম (১৯৩০), শিক্ষক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমান (১৯৩১), ইসলাম রবি হজরত মোহাম্মদ (দ.) (১৯৫২), তরীকত শিক্ষা (১৯৩১), আমার জীবনধারা (১৯৪৬), ছুফি (১৯৪৭), সৃষ্টিতত্ত্ব (১৯৪৯), ছেলেদের মহানবী (১৯৫১) ইত্যাদি। মুসলমান লেখকদের উৎসাহিত করার জন্যে কলকাতায় মখদমী লাইব্রেরি ও 'এম্পয়ার বুক হাউস' প্রতিষ্ঠা। শিক্ষা বিভাগে নানা প্রকার উন্নতি সাধনের জন্যে 'খান বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত

এদেশের শিক্ষা সংস্কার এবং মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান। তাঁর অন্তর্জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মসাধনা ও সমাজসেবা। 'আহছানিয়া মিশন' তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ১৯৬০-এ বাংলা একাডেমী ফেলোশিপ লাভ। মৃত্যু. নলতা, সাতক্ষীরা, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)॥ জন্ম. গাছবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, ৩০শে জুন ১৯৪৩। কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক। পিতা হেদায়েত আলী ওরফে ধন মিয়া। মা আসিয়া খাতুন। নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিকুলেশন



(১৯৬০), চট্টগ্রাম নাজিরহাট কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস (১৯৬২)। ১৯৬৭-এ ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ। ১৯৭১-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর। ১৯৮৬-তে জার্মান ভাষার ওপর গ্যাটে ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ। ১৯৮০-এ কাঁটাবন বস্তিতে 'শিল্পী সুলতান কর্ম ও শিক্ষাকেন্দ্র' চালু। গ্রন্থ: জাগ্রত বাংলাদেশ (১৯৭১), বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (১৯৭২), বাংলা ভাষা: রাজনীতির আলোকে (১৯৭৫), বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা (১৯৭৭), বাঙালি মুসলমানের মন (১৯৮১), শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৮৯), Aspect of Social Harmony in Bangla Culture and Peace Song (১৯৯১), রাজনীতির লেখা (১৯৯৩), আনুপূর্বিক তসলিমা ও অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ (১৯৯৪), নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ (১৯৯৫), সঙ্কটের নানা চেহারা (১৯৯৬), সাম্প্রতিক বিবেচনা: বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (১৯৯৭), শরবর্ষের ফেরারী: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৭), শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত প্রবন্ধ (১৯৯৮), বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র (২০০১), উপলক্ষের লেখা (২০০১), আমার কথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ (২০০২), সেইসব লেখা (২০০৮), অনুবাদ: তানিয়া (মূল: পি. লিডভ) (১৯৬৭), সংশয়ী রচনা: বার্টাণ্ড রাসেল (১৯৮২), ফাউস্ট (মূল: ইয়োহান ভোলফ্‌ফন গ্যোতে) (১৯৮৬); কবিতা: জল্লাদ সময় (১৯৭৫), দুঃখের দিনের দোহা (১৯৭৫), একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা (১৯৭৭), লেনিন ঘুমোবে এবার (১৯৯৯)। উপন্যাস: সূর্য তুমি সাথী (১৯৬৭), ওংকার (১৯৭৫), একজন আলী কেনানের উত্থান-পতন (১৯৮৮), মরণবিলাস (১৯৮৯), অলাতচক্র (১৯৯৩), গাভী বিত্তান্ত (১৯৯৫), অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী (১৯৯৬), পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ (১৯৯৬), গল্প: নিহত নক্ষত্র (১৯৬৯), ইতিহাসগ্রন্থ: সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (১৯৭৯), জীবনী: যদ্যপি আমার গুরু (১৯৮৮)। ছড়া: দোলো আমার কনকচাঁপা (১৯৬৮), গো-হাকিম (১৯৭৭)। পুরস্কার: একুশে পদক (মরণোত্তর), হুমায়ুন কাদির স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮১। বাংলা একাডেমীর সাদত আলী আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার, ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার,। মৃত্যু. ঢাকা ২৮ জুলাই ২০০১।

আহমদ ফজলুল রহমান, স্যার (১৮৮৯-১৯৪৫)॥ জন্ম. জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৯। শিক্ষাবিদ ১৯০৮-এ জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পাস। বিলাত গমন। ১৯১২-তে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. অনার্স (ইতিহাস) পাস করার পর লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ দুবছর পলিটিক্যাল ইকনমির ওপর গবেষণা। এরপর দেশে প্রত্যাবর্তন। ১৯১৪-১৯২১ পর্যন্ত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের সহকারী সম্পাদক। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট (১৯২১-১৯২৭)। ১৯২৩ ও ১৯২৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েটদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভ্য। ১৯৩৪-১৯৩৬ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। ১৯৩৭-এ ভারতীয় (ফেডারেল) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিযুক্ত। ১৯৪২-এ সরকার-কর্তৃক নাইট উপাধিতে সম্মানিত। মৃত্যু. ১৯৪৫।

আহমদ মীর (১৯২৫-১৯৭৯)॥ জন্ম. মাতুলালয়, বালিগঞ্জ, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫। পৈতৃক নিবাস চুঁচুড়া, পশ্চিমবঙ্গ। কথাসাহিত্যিক। পিতৃদত্ত নাম মহিউদ্দিন আহমদ। আহমদ মীর তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম। হুগলী মোহসীন কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৪৫) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. (১৯৫৬) পাস। ১৯৫১-তে জন্ম-ভূমি পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ১৯৫২-র প্রথম দিকে সরকারের তথ্য দপ্তর থেকে প্রকাশিত



'মাহেনও' (১৯৪৯) মাসিক সাহিত্য-পত্রিকায় কেরানির চাকরি গ্রহণ। আট-নয় মাস চাকরি করার পর তা ছেড়ে দিয়ে 'স্পন্দন' নামক মাসিক সাহিত্যপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা (১৯৫৩-১৯৫৫)। ১৯৫৬-তে 'মার্কিন পরিক্রমা' নামক সাময়িকপত্রে চাকরি লাভ। এ চাকরিতে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি 'রমনা' নামক সচিত্র পাক্ষিক রম্য পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা (১৯৫৬-১৯৫৮)। ১৯৬১-তে 'রমনা'কে সাপ্তাহিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করে সম্পাদনা (১৯৬১-১৯৬৩)। ১৯৬২-তে পাকিস্তান সরকারের তথ্যও বেতার মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত 'পাক-জমহুরিয়াত' সাপ্তাহিক বাংলা সংবাদ সাময়িকীর সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৬৮-তে সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের ঢাকার আঞ্চলিক দফতরের উপ-পরিচালক ও ১৯৭৬-এ বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক পদে উন্নীত। 'বার্ডস অ্যান্ড বক্স' নামক প্রকাশনা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী। ছোটগল্পের একজন দক্ষ শিল্পী। আরণ্য পরিবেশ, রোমান্টিক চিত্তচাঞ্চল্য ও নরনারীর মনোলোকের রহস্য তাঁর গল্পে প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপিত। 'লালমোতিয়া' (১৯৬৫) বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ। অনুবাদে কৃতিত্ব প্রদর্শন। 'অ্যালান পো এর শ্রেষ্ঠ গল্প' (১ম ও ২য় খণ্ড-১৯৫৭, তাঁর অনুবাদকর্মের প্রধান নিদর্শন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা ও তাঁর প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাদি পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এদেশের প্রকাশনা শিল্পে সর্বপ্রথম সুরুচি ও সৌকর্যের উজ্জীবন ঘটায়। মৃত্যু. ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯।

আহমদ শরীফ (১৯২১-২০০০)॥ জন্ম. ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১, সুচক্রদণ্ডী, পটিয়া, চট্টগ্রাম। প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত। পিতা আব্দুল আজিজ ও মাতা মিরাজ খাতুন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর চাচা। ১৯৩৮-এ পটিয়া হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাস। ১৯৪০-এ ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৪২-এ চট্টগ্রাম কলেজ থেকে স্নাতক পাস করেন। ১৯৪৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। ১৯৬৭-এ 'সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ।



১৯৪৪-এ প্রিভেন্টিভ অফিসার হিসেবে দুর্নীতি দমন বিভাগে চাকরি দিয়ে পেশাগত জীবন শুরু। ১৯৪৫-এর আগস্ট মাস থেকে ১৯৪৮-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত লাকসামের পশ্চিমগাঁও নওয়াব ফয়জুন্নেসা কলেজে অধ্যাপনা। ১৯৪৮-এ ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৯-এর জুন পর্যন্ত ফেণী ডিগ্রি কলেজে অধ্যাপনা। ১৯৫০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সহকারী হিসেবে যোগদান। ১৯৫২ থেকে বাংলা বিভাগের অস্থায়ী প্রভাষক এবং ১৯৫৭-এ প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ লাভ। ১৯৬২-এ সাংবাদিকতা বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপকও ছিলেন। ১৯৬২-এ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতা তাত্ত্বিক সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে গঠিত 'নিউক্লিয়াস' (স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ)-এর সঙ্গে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯৬৫-এ 'ইতিহাসের ধারায় বাঙালি' প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' এবং 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটির কথা উল্লেখ ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ব সময় হতে তাঁর মৃত্যু অবধি দেশের সকল ক্রান্তিলগ্নে অগ্রসর ভূমিকা পালন। উপমহাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অসামান্য পণ্ডিত, বিদ্রোহী, অসাম্প্রদায়িক যুক্তিবাদী, দার্শনিক, বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব, প্রগতিশীল, মানবতাবাদী, মুক্তবুদ্ধির ও নির্মোহ চিন্তার অনন্য ধারক। ১৯৬৯-এ বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে কার্যভার গ্রহণ। ১৯৮৩-এর ৩১ অক্টোবরে অবসর গ্রহণ। একাধিকবার কলা অনুষদের ডিন নির্বাচিত হন। ১৯৮৪-এর ১ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নজরুল অধ্যাপক' পদে যোগদান এবং ১৯৮৫-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঐ পদে দায়িত্ব পালন। তাঁর প্রথম সম্পাদিত গ্রন্থ 'লায়লী মজনু' (১৯৫৭)। ১৯৫৯-এ মৌলিক গ্রন্থ 'বিচিত চিন্তা' প্রকাশ করেন। কুসংস্কার, ক্ষুধা, রোগ শোকে জর্জরিত, ধর্মান্ধতায় আচ্ছন্ন অবহেলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শাস্ত্র ও প্রথা বিরোধিতার কারণে ধর্মান্ধরা তাঁকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করে। ১৯৯৫-এ এক

অঙ্গিরতনামার মাধ্যমে মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: স্বদেশ অন্বেষা, মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, বাংলার সুফি সাহিত্য, বাঙালির চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা, বাংলার বিপ্লবী পটভূমি, এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা, নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রত্যয় ও প্রত্যাশা এবং বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য (দুই খণ্ড)। মৃত্যু. ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।

আহমেদুর রহমান। (১৯৩৩-১৯৬৫)॥ জন্ম. উচানিয়া গ্রাম, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৯৩৩। প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী। ১৯৪৪-এ চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথম হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির বৃত্তি লাভ। ১৯৪৫-এ সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের সরাইল শাখার সদস্য নিযুক্ত। ১৯৪৯-এ সরাইল অন্নদা হাইস্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৫৪-তে ঢাকা সলিমুল্লাহ নৈশ কলেজ থেকে আই.এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭-তে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৬০-এ এম.এ. (বাংলা) পাস। মেট্রিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের সামান্য কিছু আগে ঢাকা রেডিওতে আশি টাকা বেতনে নকলনবিসের চাকরি লাভ। স্বদেশি যুগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যে ১৯৫১-তে চাকরি থেকে বরখাস্ত। ১৯৫৮ পর্যন্ত দৈনিক মিল্লাতের সহকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্তি থাকার পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে ঐ সালেই দৈনিক ইত্তেফাকে সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান। ১৯৬১তে ঢাকায় রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালনের অন্যতম উদ্যোক্তা। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালনের বিরোধিতা করলে তৎকর্তৃক লেখনীর মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যের জোরালো জবাব দান এবং রবীন্দ্রনাথ 'বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ' এ-সত্য যুক্তি ও তথ্যের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন। দেশের যুব ও ছাত্র সমাজ এবং সুধীজন কর্তৃক তাঁর সে বক্তব্য আন্তরিকভাবে গ্রহণ। ১৯৬২-তে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্যে তাঁর উপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি। ছাত্রজীবনে পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'সংস্কৃতিসংসদের' কোষাধ্যক্ষ, পরবর্তীকালে ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ১৯৬৪-র জানুয়ারি মাসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির সদস্য। ইত্তেফাক-এ 'ভীমরুল' ছদ্মনামে 'মিঠেকড়া' উপ-সম্পাদকীয় রচনা। তাঁর এই কলামটি দেশবাসীর কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন অর্জন। মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ: আহমেদুর রহমান রচনাবলি। ইত্তেফাকের সহ-সম্পাদক পদে কর্মরত অবস্থায় বিদেশে গমনকালে কায়রোতে বিমান দুর্ঘটনায় দেশের অন্যান্য সাংবাদিকসহ নিহত। মৃত্যু. কায়রো, ২০ মে ১৯৬৫।



আহসান আলী (১৯৩৫-১৯৭১)॥ জন্ম. শেখের পুকুর গ্রাম, নওগাঁ, ১৯৩৫। সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। কৈশোরে পিতা মৃত্যু পর চাচার কর্মক্ষেত্র জামালপুর শহরে আগমন। খবরের কাগজ বিক্রি করে নিজের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ। এই খবরের কাগজ বিক্রির মধ্য দিয়েই সাংবাদিকতা ও রাজনীতিতে প্রবেশ। সংবাদ, ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান (বর্তমানে দৈনিক বাংলা) ও পূর্বদেশ (অধুনালুপ্ত)-এর জামালপুরস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা হিসেবে বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন এবং মুক্তিবাহিনীকে সক্রিয় সহযোগিতা দান। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ২৮ জুলাই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর জনৈক সহযোগীর হাতে জামালপুরে নিহত।

আহসানউল্লাহ মাস্টার (১৯৫০-২০০৪)॥ জন্ম. হায়দরাবাদ, পুবাইল, গাজীপুর, ৯ নভেম্বর ১৯৫০। সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ। শিক্ষাজীবন শুরু হায়দরাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। টঙ্গী হাইস্কুল থেকে ১৯৬৫-এ এস.এস.সি. পাস করে তৎকালীন কায়েদে আযম কলেজে, বর্তমান শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজে ভর্তি। সেখানে ১৯৬৭-এ উচ্চমাধ্যমিক ও ১৯৭০-এ ডিগ্রি পাস করে টঙ্গীর নোয়াগাঁও এমএ মজিদ মিয়া হাইস্কুলে



শিক্ষক হিসেবে যোগদান। ওই স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক (১৯৭৭-১৯৮৪) ও প্রধান শিক্ষকের (১৯৮৪-২০০৪) দায়িত্ব পালন। টঙ্গী শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৬২-এ হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন-এর বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। ১৯৬৬-এ ছয় দফা এবং ১৯৬৯-এ এগার দফার আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন তিনি। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে আটক ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। ভারতের দেরাদুনের তান্দুয়া থেকে গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে পুবাইল, টঙ্গী, ছয়দানাসহ বিভিন্ন জায়গায় গেরিলাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৮৩ ও ১৯৮৮-এ পুবাইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত। ১৯৯০-এ গাজীপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত। জাতীয় শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও পরে কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) চেয়ারম্যান ছিলেন। আওয়ামী লীগের সদস্য হিসাবে তিনি ২০০১-এ গাজীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত। তাঁর বড় ছেলে জাহিদ আহসান রাসেল বর্তমানে জাতীয় সংসদের সদস্য। মৃত্যু. টঙ্গিতে জনসভায় সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে নিহত, ৭ মে ২০০৪।

আহসান উল্লাহ, নবাব (১৮৪৬-১৯০১)॥ জন্ম. ঢাকা, ১৮৪৬। জমিদার ও দানবীর। পিতা নবাব আবদুল গনি। গৃহশিক্ষকের কাছে ফারসি ও ইংরেজি শিক্ষা লাভ। উর্দু ছিল তাঁর মাতৃভাষা। ১৮৭৭-এ খাজা পরিবারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ।



ঢাকায় সার্ভে স্কুল (যা পরবর্তীকালে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত) প্রতিষ্ঠা (১৮৭৬) তাঁর এক অক্ষয় কীর্তি। এ স্কুলে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দান। তাঁর অর্থ সাহায্যে (৪ লক্ষ টাকা) ঢাকায় প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১৯০১)। ঢাকা শহরবাসীর স্বাস্থ্যোন্নয়নকল্পে ১ লক্ষ, ঢাকার ইমামবাড়ি সংস্কারবাবদ ১ লক্ষ, ডাফরিন তহবিলে ৫০ হাজার, ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্ক প্রতিষ্ঠায় ১২ হাজার, ঢাকার নিকটবর্তী নদী সমূহ সংস্কারবাবদ ১৫ হাজার, ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে ১০ হাজার, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও ত্রিপুরা জেলার জমিদারিতে কুয়ো ও পুষ্করিণী খননবাবদ ৪০ হাজার, চাঁদপুর মসজিদ নির্মাণবাবদ ৫ হাজার, ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতাল সংস্কারবাবদ ২ হাজার, ঢাকার ঘোড়াদৌড় মাঠ উন্নয়নবাবদ ১৬ হাজার, পটুয়াখালী বেগম হাসপাতালে ৮ হাজার, কলকাতা ইলিয়ট মাদ্রাসায় ১০ হাজার, আলীগড় কলেজে ২ হাজার, লালবাগ মসজিদের সংস্কারবাবদ ৩ হাজার টাকা দান। গান-বাজনার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ। পিয়ানো, বেহালা ও সেতার বাদনে দক্ষতা প্রদর্শন। 'শাহীন' ছদ্মনামে কবিতা রচনা। 'কুল্লিয়াত-এ-শাহীন' নামে একটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ। দিলকুশা, শাহবাগ ও বেগুনবাড়িতে উদ্যান রচনা ও শখের চিড়িয়াখানা নির্মাণ। গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্য (১৮৯০-১৮৯৯)। ঢাকার অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। খানবাহাদুর (১৮৭১), নবাব (১৮৭৯), সি. আই. ই. (১৮৯১), নবাব বাহাদুর (১৮৯২) ও কে. সি. এস. আই. (১৮৯৭) উপাধি লাভ। মৃত্যু. ১৯০১।

আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)॥ জন্ম. শঙ্করপাশা গ্রাম, পিরোজপুর, ২ জানুয়ারি ১৯১৭। কবি ও সাংবাদিক। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। কবিতার নেশায় কলকাতা গমন ও সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান। দৈনিক



তকবীরের সহকারী সম্পাদক (১৯৩৭), মাসিক বুলবুলের সহকারী সম্পাদক (১৯৩৭-১৯৩৮) ও মাসিক সওগাতের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক (১৯৩৯-১৯৪৩) পদে দায়িত্ব পালন। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের স্টাফ আর্টিস্ট (১৯৪৩-১৯৪৮)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) কিছুকাল পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। দৈনিক আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক কৃষক, দৈনিক ইত্তেহাদ, সাপ্তাহিক প্রবাহ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রায় এক দশক সাংবাদিকতা। ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন্সের প্রোডাকশন অ্যাডভাইজার (১৯৫৭-১৯৬৪)।

১৯৬৪-র ১০ নভেম্বর দৈনিক পাকিস্তান (পরে দৈনিক বাংলা) পত্রিকার সাহিত্যপাতার সম্পাদক নিযুক্ত। প্রায় দুই দশক এ পদে দায়িত্ব পালন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানের নীতি ও আদর্শের সমর্থক। ১৯৬৭-র ২২ জুন পাকিস্তান সরকার বেতার ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে বিবৃতি প্রদান। আশির দশকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের এক সমাবেশে স্বরচিত কবিতা পাঠ (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩)। খ্যাতনামা কবি। সামাজিক বাস্তবতা, মধ্যবিত্ত মানুষের সংগ্রামী চেতনা ও সমকালীন যুগ-যন্ত্রণা তাঁর কবিতায় শিল্পসম্মতভাবে পরিস্ফুটিত। কবিতাগ্রন্থ: রাত্রিশেষ (১৯৪৭), ছায়াহরিণ (১৯৬২), সারাদুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি (১৩৮১), মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬), দুই হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (১৯৮১), বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫)। উপন্যাস ও শিশুসাহিত্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত। উপন্যাস: আরণ্য নীলিমা (১৯৬২), জাফরানী রং পায়রা, রানী খালের সাঁকো (১৯৬৫), শিশুতোষ গ্রন্থ: ছোটদের পাকিস্তান (১৯৫৪), বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর (১৯৭৭), ছুটির দিন দুপুরে (১৯৭৮)। বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১), ও একুশে পদক (১৯৭৮) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ১০ জুলাই ১৯৮৫।

ইউজিন্ বুর্নুফ (১৮০১-১৮৫২)॥ জন্ম. প্যারিস, ৮ এপ্রিল ১৮০১। সংস্কৃত ও পালিভাষার পণ্ডিত, অনুবাদক ও অধ্যাপক। পিতা জঁ লুই বুনুর্ফ গ্রিক ভাষায় ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। বাল্যকালেই বুর্নুফ ছাত্র হিসেবে মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। লুই ল্য গ্রঁ এবং একোল্ দে শার্ৎ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষে ১৮২৪-এ আইন ও সাহিত্যে স্নাতক হন। পিতার উপদেশে সংস্কৃত শিখতে থাকেন। এ-ব্যাপারে পিতা ব্যতিরেকে তাঁর গুরু ছিলেন প্রখ্যাত সংস্কৃত অধ্যাপক দ্য শেজি। সংস্কৃত ভাষার চর্চা এতদূর আকর্ষণ করেছিল যে, তিনি জীবিকা হিসেবে আইন ব্যবসায় গ্রহণ না করে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতবিদ্যার চর্চাকে সারাজীবন পাথের করেছিলেন। তাঁর প্রথম কীর্তি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাষা হিসেবে পালি ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করা। ১৮২৬-এ ক্রিস্টিয়ান রাসেন-এর সহযোগিতায় 'পালিবিষয়কে প্রবন্ধ' (১৮২৬) রচনা করে পালি যে পাহ্লবী বা ঐ জাতীয় কোন ভাষা নয়, বরং সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভাষা তা প্রমাণ করেন। ১৮২৭-এ পালি ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ। ১৮৪৪-এ প্রকাশিত হয় ফরাসিতে রচিত 'ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের ভূমিকা'। প্যারিসের এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত নেপাল থেকে সংগৃহীত ৮৮টি বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত পুঁথির ওপর ভিত্তি করে ঐ গ্রন্থ রচনা। ১৮২৯-এ প্যারিসের একোল্ নর্মাল-এ তুলনামূলক ব্যাকরণ বিষয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু, ১৮৩৩ পর্যন্ত প্রদত্ত তাঁর এই বক্তৃতামালা গ্রন্থাকারে কখনো প্রকাশিত হয়নি। ১৮৩৩-এ কলেজ দ্য ফ্রঁস-এ সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত। আমৃত্যু এখানে অধ্যাপনা। এ বছরেই জরথুস্ত্রীয় ধর্মপুস্তক জেন্দাবেস্তার একাংশের এক সুবিস্তৃত টীকা প্রকাশ। ভাগবত পুরাণের মূল সংস্কৃত পাঠ ও সংস্কৃত ফরাসি অনুবাদ তাঁর অক্ষয় কীর্তি, তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থ ১৮৪০ থেকে ১৮৪৭-এর মধ্যে প্যারিস থেকে প্রকাশ করেন। গ্রন্থাবলি: Essai Sur le Pali (১৮২৬), Observation Grammaticales sur quelques passages de le essai sur le Pali (১৮২৭), Introduction a L Histore du Bouddhisme Indian (১৮৪৪), Lotous de la Bonne Loi (১৮৫২), Commentaire sur le Vasena (১৮৩৩), Le Bhagabata purana (৩ খণ্ড: ১৮৪০, ১৮৪৪, ১৮৪৭) ইত্যাদি। মৃত্যু. ২৮ মে ১৮৫২।



ইউরি নিকলাইয়েভিচ্ রোয়ে রূগ (১৯০২-১৯৬০)॥ জন্ম. রাশিয়া, ১৬ আগস্ট ১৯০২। ভাষাবিদ, বৌদ্ধধর্ম বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক। জর্জ নিকোলাস ডি রোয়েরিখ নামেও পরিচিত। পিতা নিকলাই রোয়েরিখ বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর। শিক্ষালাভ রাশিয়া, ইংল্যান্ড, প্যারিস ও হার্ভার্ডে। ইংল্যান্ডে বসবাসকালে সংস্কৃত, ফার্সি, তিব্বতি ও চীনা ভাষা শিক্ষা। ১৯২৬-১৯২৯ পর্যন্ত পিতার নেতৃত্বে তিব্বত, চীন, তুর্কিস্তান, মঙ্গোলিয়ায়



প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে অংশগ্রহণ এবং ভারতের সঙ্গে ঐসব স্থানের প্রাচীন যোগাযোগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। ১৯৫৬-তে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতি ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক পদ গ্রহণ। দার্জিলিং ও হিমালয়ের কুলু উপত্যাকায় বহু বছর বসবাস। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। গ্রন্থাবলি: Trails to Inmost Asia (১৯৩৫), Bule Annals (১৯৪৯-১৯৫৩) ইত্যাদি। মৃত্যু. ২১ মে ১৯৬০।

ইউসুফ আলী চৌধুরী, মোহন মিয়া (১৯০৫-১৯৭১)॥ জন্ম. ফরিদপুর শহর, ১৯০৫। রাজনীতিবিদ। পিতা মঈজুদ্দীন বিশ্বাস। জমিদার পরিবারে জন্ম। ফরিদপুর ঈশান হাইস্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। স্কুলের ছাত্র থাকাকালে ভারতব্যাপী চলছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। লেখাপড়া ছেড়ে সমাজসেবা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ। ১৯২২-এ ফরিদপুরে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'খাদেমুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৩৭-এ এই প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তরিত। ১৯২৬-এ ফরিপুর পৌরসভার কমিশনার, ১৯৩৭-এ মুসলিম লীগের মনোনয়নে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য ও ১৯৩৮-এ ফরিদপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত। ১৯৩৮-১৯৫৩ পর্যন্ত প্রায় পনেরো বছর কাল জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান। ১৯৪৬-এ বঙ্গীয় বিধানসভার নির্বাচনে ফরিদপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। ১৯৪১-১৯৫৩ পর্যন্ত ফরিদপুর জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি, ১৯৪১-১৯৪৭ পর্যন্ত বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, ১৯৪৭-১৯৫২ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৫২-১৯৫৩ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি। ১৯৫৩-তে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত। একই বছরের ২৭ জুলাই এ. কে. ফজলুল হকের সঙ্গে কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠন। ১৯৫৭-১৯৫৮ পর্যন্ত উক্ত পার্টির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। নির্বাচনের পর ৩ এপ্রিল যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় যোগদান। ৩০ মে (১৯৫৪) কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা প্রয়োগ করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিলে গ্রেফতার ও কারানির্যাতন ভোগ। ১৯৫৫-এ কৃষক-শ্রমিক পার্টির মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৭-তে 'যুক্ত-নির্বাচন' প্রথার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টে 'যুক্ত নির্বাচন বিল' (১৯৫৭) উত্থাপন করলে সে বিলের প্রতি সমর্থন প্রদান এবং ভোটদান। পার্লামেন্টে বিলটি গৃহীত। ১৯৫৮-তে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর মৃত্যুসংক্রান্ত ব্যাপারে সরকার-কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার। একই বছর দেশে সামরিক আইন জারি করে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে মামলা প্রত্যাহার ও মুক্তিলাভ। ১৯৬২-১৯৬৯ পর্যন্ত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, ১৯৬৭-১৯৬৯ পর্যন্ত পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট ও ১৯৬৯-এ ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি, ১৯৬৯-১৯৭১ পর্যন্ত কাইয়ুম মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা। ১৯৭০-এর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ফরিদপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কাছে পরাজয় বরণ। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা ও বিপক্ষে কর্ম সম্পাদন। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা দানের জন্য গঠিত শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য। ১৯৫২-তে ঢাকায় বাংলা দৈনিক মিল্লাত (অধুনালপ্ত) প্রতিষ্ঠা। মৃত্যু. ২৬ নভেম্বর ১৯৭১।



ইউসুফ খান কোরায়শী (১৯১৭-১৯৬৭)॥ জন্ম. ঢাকা, ১৯১৭। কণ্ঠশিল্পী, গীতিকার ও সংগীত পরিচালক। শৈশব থেকে সংগীতের চর্চা শুরু। পিতা ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খানের কাছে সংগীতের তালিম গ্রহণ। দীর্ঘদিন অনুশীলন ও সাধনা দ্বারা উচ্চাঙ্গ সংগীতে দক্ষতা অর্জন। খেয়াল, ঠুমরী, গজল ও বাংলা গানে পারদর্শী।

সুরকার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ। একজন প্রখ্যাত উর্দু গীতিকার কবি কাজী নজরুল ইসলামের বহু গানের উর্দু অনুবাদক তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পী হিসেবে সংগীত প্রযোজক দায়িত্ব পালন। সংগীত শিক্ষকরূপে সুনাম অর্জন। বাংলাদেশের অনেক কৃতি সংগীত-শিল্পীর সংগীত-গুরু। অসংখ্য বাংলা গান ও সংগীতালেখ্যের সুর রচয়িতা। মৃত্যু. ১৯৬৭।

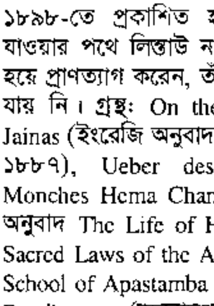
ইওহান্ গেঅর্গ্ ব্যুলর্ (১৮৩৭-১৮৯৮)॥ জন্ম. জার্মানির হানোভার প্রদেশের বোর্স্টল গ্রামে, ১৯ জুলাই ১৮৩৭। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, লিপিবিশেষজ্ঞ, পুথি-সংগ্রাহক, শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক। পিতা ছিলেন গ্রামের ধর্মযাজক। হানোভারে বিদ্যালয়ের শিক্ষা



সমাপ্ত করে ১৮৫৫-তে গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি, উদ্দেশ্য প্রাচ্যভাষা ও প্রত্নতত্ত্ব অধ্যয়ন। ১৮৫৮-তে গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ডক্টরেট উপাধিলাভ। এখানে অধ্যায়কালেই সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক টেওডোর বেনফির কাছে সংস্কৃত শিক্ষা শুরু। বেনফির পরামর্শে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্য প্যারিস, লন্ডন ও অক্সফোর্ড গিয়ে সংস্কৃতচর্চা অব্যাহত। লন্ডনে ফ্রীডরিশ মাক্সম্যুলর, টেওডোর গোল্ডস্ট্যুকর প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপিত। মাক্সম্যুলরের অনুরোধে তাঁর 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে দেন। ইংলন্ডে অবস্থানের সময়ে উইন্ডসরে অবস্থিত রাজগ্রন্থাগারে সহকারী নিযুক্ত এবং তিন বছর কাজ করার পর সমতুল্য পদ লাভ করে গটিঙ্গেনে চাকরি নিয়ে প্রত্যাবর্তন। ম্যাক্সম্যুলরের সহযোগিতায় ১৮৬৩-তে ভারতবর্ষে আগমন, এ দেশে সতেরো বছর অতিবাহিত। এই সপ্তদশ বর্ষ সময়ে পরিধিতে ভারতের শিক্ষাবিভাগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন: প্রথমে বোম্বাইয়ের সরকারি এলফিনস্টোন্ মহাবিদ্যালয়ে প্রাচ্য ভাষার অধ্যাপক, পর্যায়ক্রমে গুজরাট অঞ্চলের শিক্ষা-পরিদর্শক, পুনে সংস্কৃত শিক্ষাপর্ষদের অধ্যক্ষ, সরকারি পুঁথি সংগ্রাহাধিকর্তরিক ইত্যাদি। পশ্চিম ভারতে শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তার অবদান অসামান্য। ভারতে অবস্থানকালে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করা তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হয়ে দাঁড়ায়, একক প্রচেষ্টায় তদাবধি অজ্ঞাত প্রায় পাঁচ হাজার পুঁথি আবিষ্কার। গুজরাটি, মারাঠি প্রভৃতি একাধিক ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন। তিনি জর্মন হলেও তাঁর অধিকাংশ রচনা ভারতবাসীর সুবিধার্থে ইংরেজিতে প্রকাশ। জৈন ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক প্রামাণ্য গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃৎরূপে বিবেচিত। খারবেল ও মথুরা লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার করে বৌদ্ধ অপেক্ষা জৈন সাহিত্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণ। তাঁর আবিষ্কৃত পুঁথিসমূহের কালানুক্রম ও আভ্যন্তরীণ চারিত্র বিচার-বিশ্লেষণ করে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসকে কালানুপূর্বিকভাবে গ্রন্থনা করতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র ও তাঁর রচনাবলি যেমন তাঁর আবিষ্কার, তেমনি কলহন রচিত 'রাজতরঙ্গিণী'র প্রাচীনতম পুঁথির সন্ধান তিনিই দেন। বোম্বাইয়ে শিক্ষা বিভাগে কর্মরত থাকাকালে সটীক ও সুসম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি বিদ্বৎসমাজে প্রচারের জন্য 'বোম্বে স্যান্সক্রিট সিরিজ' গ্রন্থমালা প্রবর্তন। এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় পঞ্চতন্ত্র (১৮৬৮), দণ্ডী বিরচিত দশকুমারচরিত (প্রথম ভাগ, ১৮৭৩), বিলহন্ রচিত বিক্রমাঙ্কদেব চরিত (১৮৭৫)-প্রত্যেকটিই ব্যুলরের সম্পাদনায়, অধিকন্তু, 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত' তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। ১৮৭৬-এ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার রেমণ্ড ওয়েস্ট-এর সহযোগিতায় 'হিন্দু আইনের সংক্ষিপ্তসার' প্রকাশ। অদ্যবধি এই গ্রন্থ হিন্দু উত্তরাধিকার ও সম্পত্তিবণ্টন আইনের প্রামাণ্য বই হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর তর্কাতীত পাণ্ডিত্যের জন্য মাক্সম্যুলরের অনুরোধে তিনি মাক্সম্যুলর-সম্পাদিত 'সেক্রেড বুকস্ অব দ্য ইস্ট' গ্রন্থমালায় দুটি খণ্ড লিখে দেন। ১৮৮০-তে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ভারতবর্ষ থেকে চলে যান। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও ভারতবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত। এখানে কালক্রমে 'ভিয়েনা প্রাচ্যবিদ্যা ইন্সটিটিউট' নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং এই প্রতিষ্ঠান থেকে 'ভিয়েনা ওরিয়েন্টাল জর্নাল' নামে একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ। তাঁর সর্বশেষ অক্ষয় কীর্তি ভারতবিদ্যা-সংক্রান্ত একটি বিশ্বকোষ প্রণয়ন। তিরিশজন

ভারতবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ দ্বারা রচিত ভারতবর্ষের সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, ধর্ম, দর্শন, আইন, গণিত, জ্যোতিষ, সংগীত প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের উপর তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী রচনাসমূহ সংকলন ও সম্পাদনা করে সর্বমোট ১২টি খণ্ডে তা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন; তাঁর জীবদ্দশায় ৯টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল, বাকি খণ্ডগুলো প্রকাশিত হয়েছিল অধ্যাপক ফ্রান্টস্ কীলহর্নের সম্পাদনায়। ১৮৯৬-এ ভারতীয় লিপিতত্ত্ব বিষয়ে যে গবেষণা-নিবন্ধ জর্মন ভাষার রচনা করেছিলেন পরেই ইংরেজিতে তা অনুবাদ করেন। 'ইন্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি' নামে ঐ প্রবন্ধ তাঁর মৃত্যুর পর 'ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়্যারি' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯০৪) হয়। তাঁর আরেক উল্লেখযোগ্য রচনা 'ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব' ১৮৯৮-তে প্রকাশিত হয়। এ বছরই জুরিখ যাওয়ার পথে লিন্ডাউ নামক এক স্থানে জলমগ্ন হয়ে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় নি। গ্রন্থ: On the Indian Sect of the Jainas (ইংরেজি অনুবাদ, ১৯০৩; মূল জর্মন গ্রন্থ ১৮৮৭), Ueber des Leben des Iaina Monches Hema Chandra (১৮৮৯), ইংরেজি অনুবাদ The Life of Hemchandra, (১৯৩৬), Sacred Laws of the Aryas as Taught in the School of Apastamba Gautama. Vasistha & Baudhayan (অনুবাদগ্রন্থ, ২ খণ্ড: ১৮৭৯-১৮৮২), Grundriss der Indo-Arischen philologie and Alterthumskunde (Encyclopaedia of Indo-Aryan Research. ২১ খণ্ড: ১৮৯৬-১৯২০)। মৃত্যু. ৮ এপ্রিল ১৮৯৮।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০)॥ জন্ম. পিতার কর্মস্থল দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর, ২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৩; সংগীতশিল্পী ও সাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (বাংলার প্রথম সিভিলিয়ান) কন্যা। পাঁচ বছর বয়সে মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে বিলেতের ব্রাইটনে গমন (১৮৭৮)। প্রায় আড়াই বছর সেখানে কাটাবার পর দেশে প্রত্যাবর্তন (১৮৮০)। সিমলার অকল্যান্ড হাউসে ভর্তি ১৮৮১-তে সিমলা থেকে কলকাতায় এসে লরেটো হাউসে ভর্তি। ছয় বছর সেখানে পাঠ গ্রহণ করার পর ১৮৮৭-তে এন্ট্রান্স পাস এফ.এ. ও বি.এ. পাস করেন বাড়িতে পড়ে বি.এ. পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার (১৮৯১)। এ পরীক্ষায় (স্নাতক) মেয়েদের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়ায় পদ্মবতী পদক লাভ। মার্টিনিয়ার স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে ফরাসি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ। পিয়ানো ও বেহালা বাজানোয় দক্ষতা অর্জন। স্লেটোর কাছে পিয়ানো ও মনজাটোর কাছে বেহালা বাজানো শেখেন। ট্রিনিটি কলেজ অব মিউজিকের ইন্টারমিডিয়েট থিয়োরি পরীক্ষায় পাস করে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ; বাদ্রিদাস সুকুলের কাছে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী কণ্ঠসংগীত অনুশীলন; কিছুকাল সেতার বাজানোও শেখেন; ছাব্বিশ বছর বয়সে বাংলা সাহিত্যের বুদ্ধিদীপ্ত লেখক প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৮৯৯); ইন্দিরা দেবী যখন নিতান্ত বালিকা, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আশীর্বাদ করে রচনা করেন এক কবিতা-'আছে মা তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ'। রবীন্দ্র-সংগীতের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী। রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরলিপি রচনা তাঁর এক অমর কীর্তি। তাঁরই কণ্ঠ-ধৃত সুর থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক গান রচনা করেছেন, যেমন- 'বড় আশা করে', 'আজি শুভ-দিনে', 'সকাতরে ওই কাঁদিছে'। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১৯৪১) পর স্বামী প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বসবাস। তখন থেকে শান্তিনিকেতনের সংগীত ভবনে নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাদান। ১৯৫৬-এ কিছুকাল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে দায়িত্ব পালন। বেঙ্গল উইমেনস্ এডুকেশন লীগ, অল ইন্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স, হিরন্ময়ী বিধবা আশ্রম, সংগীত-সম্মিলনী প্রভৃতি সংগঠনের সভানেত্রী পদে অধিষ্ঠিত। লেখিকা হিসেবেও খ্যাত। বামাবোধিনী পত্রিকা, বঙ্গলক্ষ্মী, পরিচয়, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকায় সংগীত ও সাহিত্য বিষয়ক অনেক রচনা প্রকাশ। গ্রন্থাবলি: নারীর উক্তি (১৯২০), রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণী সঙ্গম (১৯৫৪), রবীন্দ্রস্মৃতি (১৯৫৯) সম্পাদিত গ্রন্থ: বাংলার স্ত্রী-আচার (১৯৫৬), পুরাতনী (১৯৫৭)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

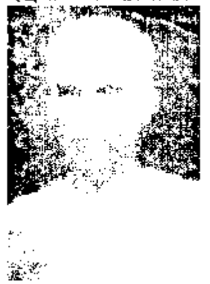


থেকে ভুবনমোহিনী পদক (১৯৪৪) ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট (১৯৫৭) ডিগ্রিলাভ। রবীন্দ্র-চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ রবীন্দ্র-ভারতী সমিতি-কর্তৃক প্রবর্তিত রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভের গৌরব সর্বপ্রথম লাভ (১৯৫৯)। মৃত্যু. ১২ আগস্ট ১৯৬০।

ইন্দুবালা দেবী (১৮৯৮-১৯৮৪)॥ জন্ম. অমৃতসর, ১৮৯৮। অভিনেত্রী, সংগীতশিল্পী। সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। শৈশবে মায়ের কাছে সংগীত ও অভিনয়ে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ। মা রাজবালা ছিলেন 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'-এ। সেখানে নানা রকম খেলা দেখাতেন। পেশাদার অভিনেত্রী ও গায়িকা হিসেবেও সেকালে তাঁর খ্যাতি ছিল। কাশীর প্রখ্যাত সারেঙ্গীবাদক ও গায়ক গৌরিশঙ্কর মিশ্র ইন্দুবালাকে খেয়াল টপ খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, দাদরা, কাজরী, চৈতী, হোরি প্রভৃতি সংগীতে তালিম দেন। পরবর্তীকালে জমিরুদ্দীন খাঁর ও কাজী নজরুল ইসলামের কাছে সংগীত শিক্ষা। ১৯২০-এ এইচ. এম. ভি. কোম্পানি থেকে তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড প্রকাশিত। ১৯২২-এ 'বিল্বমঙ্গল নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনয় জীবনের সূত্রপাত। ১৯২৭-এ কলকাতা বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় দিন থেকেই সংগীত পরিবেশন শুরু। ১৯৩১-এ প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী পরিচালিত 'যমুনা পুলিনে' ছবিতে প্রথম অভিনয়। ১৯৪৬ পর্যন্ত পঞ্চাশটির মতো বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি ও উর্দু ছবিতে অভিনয়। অভিনীত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছবি:রাধাকৃষ্ণ, চাঁদ সদাগর, সুলতানা, বাগী সিপাহী, সীতা, মীরবাঈ, রাজরানি প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য অভিনীত নাটক: অন্নপূর্ণার মন্দির, ধাত্রীপান্না, দুই পুরুষ, বিষবৃক্ষ, কারাগার, আলী বাবা, পৃথ্বিরাজ, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ: 'অতীত দিনের স্মৃতি' (১৩৭৯)। বাংলা, হিন্দি উর্দু প্রভৃতি ভাষায় গীত অসংখ্য গানের রেকর্ড প্রকাশ করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। গজল, ঠুংরী, খেয়াল, দাদরা, হোলি, শ্যামাসংগীত, কীর্তন, ভজন, দেশাত্মবোধক গান, প্রেমসংগীত, ইসলামী গানসহ নজরুলের অজস্র গান তাঁর কণ্ঠে রেকর্ডিং। নজরুলগীতির রেকর্ডের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মৃত্যু. ৩০ নভেম্বর ১৯৮৪।



ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১)॥ জন্ম. মাতুলালয়, পাণ্ডু গ্রাম, পৈতৃক নিবাস গঙ্গাটি কুর্মি, বর্ধমান, ১৪ মে ১৮৪৯। ঔপন্যাসিক। পাঁচু ঠাকুর নামেও পরিচিত। ১৮৬৯-এ ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে প্রথমে বীরভূমের হেতমপুর ও পরে বর্ধমানের ওকড়সা স্কুলে হেড মাস্টার হন। ১৮৭১-এ বি.এল. পাস। প্রথমে ১৮৭১-১৮৭৬ পর্যন্ত পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরে, পরে ১৮৭৬-১৮৮১ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টে এবং সবশেষে বর্ধমানে আমৃত্যু ওকালতি। ১৮৭৮-এ ইন্দ্রনাথের গদ্যপদ্য মিশ্রিত সরস চুটকি রচনা চুঁচুড়া থেকে পত্রিকা আকারে প্রকাশিত। পরে এই জাতীয় রচনা 'বঙ্গবাসী'তে মুদ্রিত। এ-সকল রচনা পরবর্তীকালে 'পাঁচু ঠাকুর গ্রন্থমালায় (পাঁচ খণ্ড) সংকলিত। এছাড়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিলেতি আচার-আচরণের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে ইন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন। 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' (১৮৭০) তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গকাব্য দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ ভারত-উদ্ধার (১৮৭৮)। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: কল্পতরু (১৮৭৪) ও ক্ষুদিরাম (১৮৮৮)। কল্পতরু বাঙ্গালায় প্রথম ব্যঙ্গ-উপন্যাস। ব্রাহ্মধর্মানুরাগীদের ব্যঙ্গ করে এটি রচিত। মৃত্যু. ২৩ মার্চ ১৯১১।



ইব্রাহীম খাঁ, প্রিন্সিপাল (১৮৯৪-১৯৭৮)॥ জন্ম. শাবাজ নগর গ্রাম, টাঙ্গাইল, ১৮৯৪। শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। তাঁর পিতার নাম শাবাজ খাঁ, মাতা রতন খানম। এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম। ১৯১২-তে পিংনা উচ্চ ইংরেজ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স, ১৯১৪-তে ময়মনসিংহের



আনন্দমোহন কলেজ থেকে এফ.এ. ১৯১৬-এ কলকাতা সেন্ট পলস কলেজ থেকে ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স, ১৯১৯-এ প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাস। শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। টাঙ্গাইলের করটিয়া ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ১৯২০-তে কংগ্রেসে যোগদান। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন (১৯২০-১৯২২)-এ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে করটিয়া ইংরেজি স্কুলকে জাতীয় বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত। ১৯২৪-এ আইন পাস করে ময়মনসিংহের জজকোর্টে ওকালতি পেশায় নিয়োজিত। ১৯২৬-এ করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর অর্থ-সাহায্যে করটিয়া সাদত কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৪৭ পর্যন্ত এই কলেজের অধ্যক্ষ। ১৯৩৭-এ মুসলিম লীগে যোগদান। একই বছর মুসলিম লীগের মনোনয়নে অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৪৬-এ মুসলিম লীগের টিকেটে মধুপুর-গোপালপুর কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি (১৯৪৭-১৯৭১)। ১৮৪৮-১৯৫২ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি। ১৯৫৩-তে গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৪-তে পূর্ববঙ্গ পরিষদেও নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হাতেম আলী তালুকদারের কাছে পরাজিত। ১৯৫৭-তে আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৬২-র ২৮ এপ্রিল মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় ময়মনসিংহ-২ আসন থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ক্ষমতাসীন কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বরের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের (কাইয়ুমপন্থি) মনোনয়নে টাঙ্গাইল জেলা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানি আদর্শের সমর্থন। ১৯৬৭-র ২২ জুন পাকিস্তান সরকার রেডিও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে বিবৃতি প্রদান বিভিন্ন সময়ে তিনি যে-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন তার মধ্যে রয়েছে ভুয়াপুর হাই স্কুল, ভুয়াপুর বালিকা বিদ্যালয়, ভুয়াপুর কলেজ, করটিয়া জুনিয়র গার্লস মাদ্রাসা ইত্যাদি মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী লেখক হিসেবে খ্যাত। অসংখ্য ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণকাহিনী ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করে অবিভক্ত বঙ্গের অনগ্রসর বাঙালি মুসলমান সমাজে সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ নির্মাণে স্মরণীয় ভূমিকা পালন। প্রকাশিত গ্রন্থ-নাটক: কামাল পাশা (১৯২৭), আনোয়ার পাশা (১৯৩০), ঋণ পরিশোধ (১৯৫৫), ভিস্তি বাদশা (১৯৫৭), কাফেলা। উপন্যাস: বৌ বেগম (১৯৫৮)। গল্পগ্রন্থ: আলু বোখরা (১৯৬০), উস্তাদ (১৯৬৭), দাদুর আসর (১৯৭১), মানুষ। স্মৃতিকথা: বাতায়ন (১৯৭৪), লিপি সংলাপ। ভ্রমণ কাহিনী: ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র (১৯৫৪)। শিশুসাহিত্য: ব্যাঘ্রমামা (১৯৫১), শিয়াল পণ্ডিত (১৯৫২), নিজাম ডাকাত (১৯৫০), বেদুঈনদের দেশে (১৯৫৬), ছোটদের মহানবী (১৯৬১), ইতিহাসের আগের মানুষ (১৯৬১), গল্পে ফজলুল হক (১৯৭৭), ছোটদের নজরুল ইত্যাদি। ব্রিটিশ আমলে 'খানসাহেব' ও খানবাহাদুর' এবং পাকিস্তান আমলে 'সিতারা-ই-ইমতিয়যাজ' উপাধি লাভ। ১৯৬৩-তে নাটকে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৭৬-এ একুশে পদক লাভ। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ সেবা ও রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন 'প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ' হিসেবে। মৃত্যু. ঢাকা, ২৯ মার্চ ১৯৭৮।

ইমাদুল্লাহ (১৯২৬-১৯৫৬)॥ জন্ম. বরিশাল শহর. ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬। যুবনেতা। পিতা আমিনুল্লাহ বরিশাল জেলা জজ আদালতে সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তিন ভাই, এক বোনের মধ্যে দ্বিতীয় বরিশাল জিলা স্কুলে শিক্ষাজীবনের শুরু। ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল. ডিগ্রি লাভ। বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর বরিশালের বাকেরগঞ্জের মহীপুর স্কুলে মাস তিনেক শিক্ষকতা। আইন পাঠকালে বরিশাল দেওয়ানি আদালতে কিছুদিন কেরানির চাকরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বামপন্থি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ বরিশালের



হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গার (১৯৪৯) মূল হোতাদের চিহ্নিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার। কয়েক মাস কারাভোগের পর মুক্তিলাভ। নূরজাহান বেগমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। নূরজাহান বেগম পরে স্বদেশরঞ্জন বোসের সঙ্গে বিবাহসূত্রে নূরজাহান বোস নামে পরিচিত হন। ১৯৫১-তে' পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগের' (১৯৫১) যুগ্ম-সম্পাদক ও ১৯৫৪-তে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। ২১ ফেব্রুয়ারির (১৯৫২) ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব। ১৯৫৪-র রেল ধর্মঘটের অন্যতম সংগঠক। আদর্শবান, নির্ভীক, প্রগতিশীল ও নিবেদিতপ্রাণ যুবনেতা। বামপন্থি রাজনীতির অন্যতম সংগঠক। মৃত্যু. মিটফোর্ড হাসপাতাল (ঢাকা), বসন্তরোগে, ৬ এপ্রিল ১৯৫৬।

ইভান্ পাভ্লভিক্ মিনায়েফ্ (১৮৪০-১৮৯০)॥ জন্ম. রাশিয়ার তামবোফ্, ৯ অক্টোবর ১৮৪০। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ এবং পালি ভাষা ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ের গবেষক। প্রথমিক শিক্ষা স্বগৃহে, মায়ের তত্ত্বাবধানে। বাল্যকালেই মাতৃভাষা রুশ এবং ফরাসি ও জর্মন ভাষা আয়ত্ত। তাম্বোফস্কি বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে সাংকৎ পিতেবুর্গে বিশ্ববিদ্যলয়ে প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের চীন-মাঞ্চুরিয়া শাখার ছাত্র হিসেবে অধ্যয়ন শুরু এবং স্নাতক হন ১৮৬১-তে। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষা শিখতে থাকেন। সংস্কৃতে আরো ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য ১৮৬৩-তে জার্মানি গমন এবং A. Weber. T. Benfy. F. Bopp প্রমুখ বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের অধীনে শিক্ষালাভ। জার্মানি থেকে লন্ডনে যান ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি পুঁথি অধ্যয়নের জন্যে, এবং সেখান থেকে ফ্রান্সে প্যারিসের জাতীয় পাঠাগারে পড়াশুনার জন্যে। সব মিলিয়ে পাঁচ বৎসর বাইরে ছিলেন, এ সময়ে পালি পুঁথির একটি বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করতে তিনি সক্ষম হন। ১৮৬৮-তে দেশে ফিরে পুনরায় সাংকৎ পিতেবুর্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। ১৮৬৯-এ সংস্কৃত ভাষার রিডার পদে উন্নীত। ইতোমধ্যেই ভারততত্ত্ববিদ হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ। ১৮৭১-এ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই তুলনামূলক ব্যাকরণের অধ্যাপক পদ লাভ। এর অল্প কিছুকালের মধ্যেই পালি ভাষা বিষয়ে গবেষণাসন্দর্ভ রচনা করে 'ডক্টরেট' ডিগ্রি লাভ। ১৮৭৩-এ ইন্দোয়োরোপীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণের অধ্যাপক পদে উন্নীত, আমৃত্যু এই পদেই কর্মরত। মিনায়েফকে রাশিয়ায় বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চার অন্যতম প্রবর্তক হিসেবে গণ্য করা হয়। গবেষণার মালমশলা সংগ্রহের জন্যে মোট তিন বার ভারতবর্ষে এসেছিলেন: প্রথমবারে ভারত, নেপাল ও সিংহল, দ্বিতীয় বারে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান এবং তৃতীয় বারে বোম্বাই, কলকাতা ব্রহ্মদেশ পরিদর্শন করেন। প্রথম বারে ভারত ভ্রমণের পর ১৮৭৮-এ তিনি রুশ ভাষায় 'সিংহল ও ভারত বিষয়ে জনৈক রুশীর 'ভ্রমণবৃত্তান্ত' প্রকাশ করেন। পালি ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দ গঠন বিষয়ে ১৮৭২-এ রুশ ভাষায় যে-বইটি প্রকাশ করেন, তা অনতিবিলম্বে ফরাসি ও ইংরেজিতে অনূদিত হয়। এই ইংরেজি অনুবাদ বহুকাল ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে পালি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকরূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ হিসেবে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। লন্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন তিনি। ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর সম্পাদনায় কয়েকটি পালি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। তিনি অকৃতদার পুরুষ ছিলেন। গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, অধ্যপনা ব্যতীত সারা জীবন আর কিছুই করেন নি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ তাঁর জীবদ্দশাতেই ছিল ১৩০টি। মৃত্যু. ক্ষয়রোগে, সাংকৎ পিতেবুর্গে শহরে, ১ জুন ১৮৯০।

ইমামুদ্দীন, মওলানা (১৭৮৮-১৮৫৯)॥ জন্ম. হাজীপুর, সন্দ্বীপ, নোয়াখালী, ১৭৮৮। আলেম ও ধর্মপ্রচারক। সৈয়দ আহমদ শহীদের একজন অনুরাগী ভক্ত। কর্মতৎপরতা প্রধানত নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে উপমহাদেশে মুসলমানদের জাগরনের বাণী প্রচার করেন সৈয়দ আহমদ শহীদ। মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ দূর করতে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। ১৮৩১-এ বালাকোটে শিখদের সঙ্গে এক বিরাট সংঘর্ষ হলে এই জেহাদে সৈয়দ আহমদ শহীদের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন মওলানা ইমামুদ্দীন। যুদ্ধ থেকে ফিরে বিভিন্নমুখী সমাজসেবার মাধ্যমে

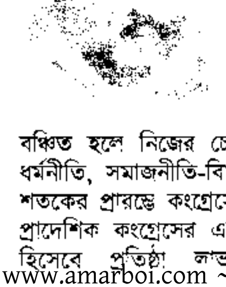
মুসলমানদের মধ্যে জাগরণের বাণী প্রচার করেন। মৃত্যু. ১৮৫৮-তে পবিত্র হজ্জ্ব উপলক্ষে মক্কা শরীফ গমন। হজ্জ্ব সমাধান করে জাহাজযোগে দেশে ফেরার পথে ১৮৫৯-এ জাহাজেই মারা যান। তাঁর লাশ জানাজান্তে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

ইলা মিত্র (১৯২৫-২০০২)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৮ অক্টোবর, ১৯২৫। আদি নিবাস বাগুটিয়া গ্রাম, ঝিনাইদহ। সংগ্রামী কৃষক নেতা। প্রকৃত নাম ইলা সেন। বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের অধীন বাংলার একাউনটেন্ট জেনারেল। কলকাতার



বেথুন স্কুল ও বেথুন কলেজে পাঠ গ্রহণ। ১৯৪৪-এ বি.এ. পাস। ১৯৫৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত বিষয়ে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। কৈশোরে সাঁতার, বাস্কেটবল ও ব্যাডমিন্টন খেলায়ও পারদর্শিতা অর্জন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুনিয়র অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ন। প্রথম বাঙালি মেয়ে হিসেবে ১৯৪০-এ জাপানে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকের জন্য নির্বাচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে অলিম্পিক বাতিল হয়ে যাওয়ায় অংশগ্রহণ করা হয়নি। খেলাধুলা ছাড়াও গান, অভিনয়সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সমান পারদর্শী। বেথুন কলেজে পড়াকালেই রাজনীতির সাথে পরিচয়। ১৯৪৩-এ কলকাতা মহিলা সমিতির সদস্য হন। হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধে ঐ বছরই মহিলা সমিতি আন্দোলনে ভূমিকা পালন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সঙ্গেও যুক্ত হন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ। ১৯৪৫-এ কমিউনিস্ট নেতা রমেন্দ্র মিত্রের সাথে। রমেন্দ্র মিত্র মালদহের নবাবগঞ্জ থানার রামচন্দ্রপুর হাটের জমিদার মহিমচন্দ্র ও বিশ্বমায়া মিত্রের ছোট ছেলে। কলকাতা ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি রামচন্দ্রপুর হাটে বসবাস। কৃষ্ণগোবিন্দপুর হাটে প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ। বৃহত্তর সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ। অল্পদিনেই তিনি এলাকার সবার 'রানীমা' হয়ে ওঠেন। কমিউনিস্ট রমেন্দ্র মিত্র জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য ও মোহ ত্যাগ করে কৃষকের পাশে দাঁড়ান। ইলা মিত্রও কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত রাজশাহীর নবাবগঞ্জ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দান। তেভাগা ও আধিয়ারী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান। ১৯৪৬-এ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে নোয়াখালীর দাঙ্গাবিধ্বস্ত গ্রাম হাসনাবাদে পুনর্বাসনের কাজে আত্মনিয়োগ। ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগের পর মিত্র পরিবারের জমিদারি অঞ্চল রামচন্দ্রপুর হাট রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইলা মিত্র ও রমেন্দ্র মিত্র পূর্ববঙ্গে থেকেই আন্দোলন পরিচালনা। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে শীর্ষ স্থানীয় হিন্দু নেতাদের প্রায় সকলেই দেশ ছাড়া হয়। সরকারের এই দমননীতির ফলে কমিউনিস্টও কৃষক আন্দোলনের নেতারা আত্মগোপন করে কাজ করতে থাকেন। ইলা মিত্র এবং রমেন্দ্র মিত্র নাচোলের চণ্ডীপুর গ্রামে আত্মগোপন। গ্রেফতার হয়ে চরম নির্যাতনের শিকার। অনূদিত গ্রন্থ: 'জেলখানার চিঠি', 'হিরোশিমার মেয়ে', 'মনে প্রাণে-২ খণ্ড', 'লেনিনের জীবনী', 'রাশিয়ার ছোটগল্প' প্রভৃতি। 'হিরোশিমার মেয়ে' বইটির জন্য 'সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার' লাভ। অ্যাথলেটিকে অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কার লাভ। স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসেবে স্বতন্ত্র সৈনিক সম্মানে ভারত সরকারের 'তাম্রপত্র পদক'-এ ভূষিত। মৃত্যু. কলকাতা, ১৩ অক্টোবর ২০০২।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)॥ জন্ম. সিরাজগঞ্জ, ১৩ জুলাই ১৮৮০। কবি, ঔপন্যাসিক ও রাজনীতিবিদ। গ্রামের পাঠশালা, স্থানীয় জ্ঞানদায়িনী মধ্য ইংরেজি স্কুল এবং সিরাজগঞ্জ বি.এল. হাইস্কুলে অধ্যয়ন। দারিদ্র্যের কারণে উচ্চশিক্ষা লাভ থেকে



বঞ্চিত হলে নিজের চেষ্টায় সাহিত্য ইতিহাস, ধর্মনীতি, সমাজনীতি-বিষয়ে জ্ঞান অর্জন। বিশ শতকের প্রারম্ভে কংগ্রেসে যোগদান এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী

আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১)-এ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু বিতর্কে বাংলা ভাষার পক্ষে দৃঢ় মত প্রকাশ বলকান যুদ্ধে তুরস্কার সাহায্য করার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে ১৯১২-তে যে মেডিক্যাল মিশন পাঠানো হয়, তিনি ছিলেন তার সদস্য। সেখানে আহত সৈনিকদের সেবায় আত্মনিয়োগ। তুরস্কের সুলতান কর্তৃক গাজী উপাধি লাভ। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৩)-এ সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯২৩-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল গঠিত হলে তাতে যোগদান। অনলস্রাবী সাহিত্য সৃষ্টি ও জ্বালাময়ী বক্তৃতাদানের কারণে কয়েকবার কারারুদ্ধ। মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী লেখক। তাঁর রচনারীতি সংস্কৃতানুসারী ও ক্লাসিক্যাল। ভাষা তৎসম ও সমাসবদ্ধ পদবহুল। তাঁর গদ্য রচনারীতিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ও পদ্য রচনারীতিতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রভাব পরিলক্ষিত। মাসিক নূর (১৯১৯) ও সাপ্তাহিক সুলতান (১৯২৩) প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি-কাব্য: অনল প্রবাহ (১৯০০), উচ্ছ্বাস (১৯০৭), উদ্বোধন (১৯০৭), নব উদ্দীপনা (১৯০৭), স্পেন বিজয় কাব্য (১৯১৪), সংগীত সঞ্জীবনী (১৯১৬), প্রেমাঞ্জলি (১৯১৬)। উপন্যাস: তারা-বাঈ (১৯১৮), রায়নন্দিনী (১৯১৮), নূরউদ্দিন (১৯২৩), ফিরোজা বেগম (১৯২৩), প্রবন্ধ: স্বজাতি প্রেম (১৯০৯), আদব কায়দা শিক্ষা (১৯১৪), স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১৯১৬), সুচিন্তা (১৯১৬), মহানগরী কর্ডোভা, তুর্কী নারী জীবন (১৯১৩)। ভ্রমণ কাহিনী: তুরস্ক ভ্রমণ (১৯১০)। মুসলমানদের নবজাগরণ ও দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অর্জন ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। এ-কারণেই জাতীয় জাগরণমূলক কাব্য সৃষ্টিতে ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত এবং নজরুল ইসলামের পূর্বসূরি। মুসলমানদের অন্ধকার কালে তাঁর কাব্য এবং অনলবর্ষী বক্তৃতা মুসলিম জাতিকে যেমন অনুপ্রাণিত করেছে, তেমনি আলোর পথ দেখিয়েছে। মৃত্যু. ১৭ জুলাই ১৯৩১

ইসরাইল খাঁ (?-১৯৭৭)॥ জন্ম. ভাবিরঘর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এসরাজবাদক ও বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা। শৈশবকালে সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সাধনা শুরু। ছোট মামা ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ। দীর্ঘ দশ বছর সাধনা দ্বারা এসরাজে পারদর্শিতা অর্জন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে মেজো মামা ফকির (তাপস) আফতাবউদ্দিন খাঁর নামে 'আফতাব মিউজিক্যাল হল' নামে একটি বাদ্যযন্ত্রের কারখানা স্থাপন এবং শিষ্যদের সংগীতে তালিম দান। মৃত্যু. ১৯৭৭।

ইসলাম খাঁ (১৫৬৯-১৬১৩)॥ ইসলাম খাঁ ফতেপুর সিক্রির বিখ্যাত পির শেখ সেলিম চিশতির পৌত্র। সম্রাট জাহাঙ্গীর পালিত ভ্রাতা। আসল নাম আলাউদ্দিন। শাহী চাকরিতে প্রবেশ করেছিলেন সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে দু'হাজারী মনসবদারিতে উন্নীত করে উপাধি দিয়েছিলেন ইসলাম খাঁ। ঢাকা আগমনের আগে রাজমহলে ছিলেন। আজিম খাঁ আমোদ-প্রমোদ মত্ত থাকায় তাঁর আমলে ঢাকার শাসন ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়লে মগ ও অসমিয়ারা এই সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে দিল্লি সম্রাট জাহাঙ্গীর আজিম খাঁর পরিবর্তে ১৬০৭-এ ইসলাম খাঁ চিশতীকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। তিনি যখন বাংলা সুবাদার নিযুক্ত হন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল আটত্রিশ বছর। মোগল যুগের ঢাকার পত্তন তিনি। ১৬১০-এ বাংলার সুবাদার হিসেবে ঢাকায় পদার্পণ করে এর নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর এবং সুবে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন এখানে। কথিত আছে, তিনি ঢাকায় এসে একদল ঢাকিকে ঢাক বাজাতে বলেছিলেন ও তাঁর চারজন অনুচরকে চারদিকে ঐ ঢাকের শব্দ শুনতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঠিক হলো, ঢাকের শব্দ যতদূর শোনা যাবে, নতুন রাজধানীর সীমানাও হবে ততদূর পর্যন্ত। তিনি যখন ঢাকায় আসেন তখন পুরনো ঢাকা পূর্বদিকে কিছু অংশ ছিল শহর। রাজধানী হওয়ার পর ও তার পরবর্তীকালে পূর্বদিকে যে-সব অঞ্চল বা এলাকা গড়ে ওঠে তা হলো—বাংলাবাজার, কলতাবাজার, দয়াগঞ্জ, পাটুয়াটুলী, নারিন্দা, তাঁতীবাজার, শাঁখারীবাজার, কুমারটুলী প্রভৃতি। আর অন্যান্য দিকে রহমতগঞ্জ, লালবাগ, নওয়াবগঞ্জ, মাহুতটুলী, মালীটোলা, কায়েতটুলী, পিলখানা, মীরপুর প্রভৃতি স্থান। মোগলেরা যেখান দুর্গ গড়তো সেখানে দুর্গকে ঘিরে গড়ে উঠতো বাজার। ঢাকায়ও তেমনি সেই পুরানো দুর্গকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল একটি বাজার যা পরিচিত ছিল 'পাদশাহী' বাজার নামে। এখন সে বাজারে নাম চকবাজার। ইসলাম খাঁ ছিলেন যোগ্য শাসক, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধা। এই প্রদেশে তখন যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল,

সেগুলো মোকাবেলা করার মতো তাঁর যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল তিনি ঢাকায় আসার পরে মগেরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা সকট রায় তাঁর আশ্রয় লাভের জন্যে এলে তিনি তাঁকে একজন সামন্তরূপে স্বীকৃতি দান করেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ চট্টগ্রামের নাম রাখা হয় ইসলামাবাদ। অসমীয়রা ইসলাম খাঁর সময়ে পাঁচশত নৌকার এক বহর নিয়ে ব্রহ্মপুত্রে উভয় পার্শ্বের লোকালয় লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত করতে করতে ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়। লোকেরা বাড়ি-ঘর ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইসলাম খাঁ এর মোকাবিলা জন্য তৈরি হয়ে নদীর তীরে কামান স্থাপন করেন এবং অসমীয়দের পরাজিত করেন। ইসলাম খাঁর সঙ্গে ঈশা খাঁর ছেলে মুসা খাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে মুসা খাঁ মোগল বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ইসলাম খাঁ ভাওয়ালে শিকার করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৬১৩-র ২১ আগস্ট প্রাণত্যাগ করেন।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ (১৮৫৮-১৯৩৫)॥ জন্ম. যশোর, ১৮৫৮। শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। ১৮৭৬-এ সরকারি বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স, ১৮৭৮-এ মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে চতুর্থ স্থান অধিকার করে বৃত্তিসহ এফ.এ. পাস। ১৮৮০-তে জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম গ্রেডে বৃত্তিসহ বি.এ. ১৮৮২-তে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. পাস। ১৮৮৫-তে সরকারি শিক্ষা বিভাগে চাকরিতে যোগদান। নড়াইল স্কুল ও কলকাতা হেয়ার স্কুলে প্রধান শিক্ষক (১৯০৩-১৯১৬)। পরে হুগলী নর্মাল স্কুলের হেড মাস্টার নিযুক্ত। প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর এবং শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর পদেও দায়িত্ব পালন। স্টক একচেঞ্জের ব্যবসায় করে প্রচুর অর্থ উপার্জন। ব্রিটিশ সরকার-কর্তৃক 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ। শিক্ষকতাকালে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক রচনা। সংস্কৃত, পালি, ইংরেজি ও দর্শন শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন বাংলা সাহিত্যে তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্যযোগ্য কীর্তি ১৬ বছরের একক সাধনায় পালি ভাষা থেকে খণ্ডে 'জাতক'-এর অনুবাদ। ঈশাচন্দ্রের গদ্য ঐশ্বর্যদীপ্ত ও ক্লাসিক রীতির অনুসারী। জনকল্যাণমূলক কাজে ও শিক্ষার প্রসারে অকাতরে অর্থ ব্যয়। মৃত্যু. ২৮ অক্টোবর ১৯৩৫।



ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭)॥ জন্ম. খিদিরপুর, কলকাতা, ১৫ মার্চ ১৮৫৬। কবি। পৈতৃক নিবাস গুলিটা, হুগলী। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ। কলকাতা হিন্দু স্কুলে শিক্ষালাভ। উত্তরপাড়ার জমিদারকন্যা কুসুমকুমারী দেবীর সঙ্গে পরিণয়। বোর্ড অফ রেভিনিউ অফিসে চাকরিতে যোগদান (১৮৭৬)। ১৮৮২-তে হুগলী জজকোর্টে সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্তি লাভ। ১৮৯৫-তে অগ্রজ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কলকাতা হাইকোর্টের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি লাভ। বাংলা কাব্যজগতে যে-কালে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব সে-কালে কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন। স্নেহ, আশা, নৈরাশ্য, ক্ষোভ, ভয় প্রভৃতি কবি হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তি তাঁর কবিতায় সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত। কাব্য: চিত্ত-মুকুর (১৮৭৮), বাসন্তী (১৮৮০), যোগেশ (১৮৮১), চিন্তা (১৮৮৭)। তাঁর উৎসাহ ও উদ্যোগে হুগলী সাবিত্রী প্রেস থেকে 'পূর্ণিমা' (১৮৯৩) নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। মৃত্যু. বিষপানে আত্মহত্যা, ১২ জুন ১৮৯৭।



ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)॥ জন্ম. শিয়ালডাঙ্গা, কাঁচড়াপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ১৮১২। কবি ও সাংবাদিক। ঈশ্বর গুপ্ত নামে সমধিক পরিচিত। পিতা হরিনারায়ণ দাশগুপ্ত শিয়ালডাঙ্গার কুঠিতে মাসিক আট টাকা বেতনে চাকরি করতেন। পিতার সীমিত আয়ের জন্য পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য না থাকায় ঈশ্বর গুপ্তকে ব্যথিত করেছে। দশ বছর বয়সে



তাঁর মাতৃবিয়োগ হলে পিতা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। বিমাতার সংসারে বাস করতে ঈশ্বর গুপ্তের মন চায়নি। তাই ১৮২২-এ পিতৃগৃহ ত্যাগ করে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় মাতামহের কাছে আশ্রয় গ্রহণ। কলকাতায় নিজের সাধনায় ইংরেজি, সংস্কৃত, বেদান্ত দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিত্য অর্জন। ১৮২৭-এ তাঁর বিয়ে হয়, কিন্তু স্ত্রী দেখতে কুৎসিত ছিলেন বিধায় তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও প্রেমচান তর্কবাগিশের আনুকূল্যে ১৮৩১-এর ২৮ জানুয়ারি সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর প্রকাশ। পরের বছর ১৮৩২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে এর সম্পাদনার ভার ত্যাগ। বছর তিনেক বিরতির পর ১৮৩৬-এর ১৩ আগস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে এটি পুনঃপ্রকাশিত। ১৮৩৯-এর ১৪ জুন তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটি দৈনিক রূপান্তরিত। আধুনিক বাংলার সমাজ গঠনে সংবাদ প্রভাকরের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত প্রথমে নব্যবঙ্গ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধর্মসভাগোষ্ঠীর পক্ষভুক্ত ছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধেও তিনি আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু নবপর্যায়ে সংবাদ প্রভাকর সম্পাদনার সময়ে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে। দেশের প্রগতিমূলক ভাবধারার সঙ্গে তিনি যুক্ত হন বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত যুগসন্ধির কবি হিসেবে পরিচিত। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ লুপ্ত, কিন্তু মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব তখনও হয় নি,—এই দুইয়ের মাঝখানে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অবলম্বনে খণ্ডকবিতা রচনার আদর্শ প্রবর্তন করেন। ব্যঙ্গবিদ্রূপই তাঁর রচনারীতির বিশেষত্ব। তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনই তাঁকে বিদ্রূপাত্মক করে তুলেছিল। একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর ন্যায্য পাওনা পাননি। সেই ক্ষোভ থেকে যখনই অবকাশ পেয়েছেন তখনই বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পর। জীবিতকালে প্রকাশিত গ্রন্থ: রামপ্রসাদ সেন কৃত কালীকীর্তন (১৮৩৩), কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত (১৮৫৫), প্রবোধ প্রভাকর (১৮৫৮)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর কবিতাগ্রন্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্র গুপ্ত সংগৃহীত কবিতার সংকলন (১৮৬২), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহ (১৮৮৫), কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত সংগ্রহ (১৮৯৯), মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত সংগ্রহ (১৯০১)। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকা: সংবাদ রত্নাবলী (১৮২৫), সংবাদ সাধুরঞ্জন (১৮৪৭)। মৃত্যু. ২৩ জানুয়ারি ১৮৫৯।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)॥ বীরসিংহ



গ্রাম, মেদিনীপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। লেখক, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতার একজন দোকান কর্মচারী। গ্রামের পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করে আট বছর বয়সে গ্রামের বাড়ি থেকে পিতার সঙ্গে পদব্রজে কলকাতায় গমন। সেখানে শিবচরণ মল্লিকের বাড়ির পাঠশালায় এক বছর অধ্যয়ন। ১৮২৯-এর ১ জুন কলকাতায় সরকারি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি। এ কলেজে একাদিক্রমে বারো বছর অধ্যয়ন এবং ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন। ১৮৩৯-এ এই সব বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ। ১৮৪১-এর ৪ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপ্ত। একই বছর ২৯ ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগে হেড পণ্ডিত পদে নিযুক্তি লাভ। এখানে পাঁচ বছর তিন মাস অধ্যাপনা করার পর ১৮৪৬-এর ৬ এপ্রিল সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান। সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর সংস্কারের প্রস্তাব কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যাখ্যান করলে কিছুদিনের মধ্যেই উক্ত পদ থেকে পদত্যাগ করে আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রত্যাবর্তন (১৬ জুলাই ১৮৪৭)। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও কলেজের পূর্নগঠন বিষয়ে তাঁকে অবাধ সুযোগ দেওয়া হবে, এ শর্তে পুনরায় এ কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ (ডিসেম্বর ১৮৫০)। পরের বছর ২২ জানুয়ারি (১৮৫১) কলেজের নবসৃষ্ট অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত লাভ সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কারসাধন। ইংরেজিকে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজিতে গণিত শিক্ষা ও বেদান্তের সঙ্গে মিলের লজিক পঠনের ব্যবস্থা

প্রবর্তন। দুরূহ 'মুগ্ধবোধ'-এর সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষার রীতি বাতিল করে স্বরচিত 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' (১৮৫১) ও 'ব্যাকরণ কৌমুদীর (১ম ভাগ-১৮৫৩, ২য় ভাগ-১৮৫৩, ৩য় ভাগ-১৮৫৪, ৪র্থ ভাগ-১৮৬২) সাহায্যে বাংলায় সংস্কৃত আয়ত্ত করার পদ্ধতি চালু। ছাত্ররা যাতো অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য অধিগত করতে পারে সেজন্য তৎকর্তৃক 'ঋজুপাঠ' (১ম ভাগ পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যানের বঙ্গানুবাদ, ১৮৫১; ২য় ভাগ রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের কতিপয় অংশের বঙ্গানুবাদ, ১৮৫২; ৩য় ভাগ হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহার থেকে বঙ্গানুবাদ, ১৮৫১) পাঠ্যতালিকাভুক্ত। অপরদিকে জনশিক্ষার প্রসারকল্পে বাংলা শিক্ষার জন্য 'বোধোদয়' (নানা ইংরেজি পুস্তক থেকে বঙ্গানুবাদ, ১৮৫১), 'বর্ণপরিচয়' (১ম ও ২য় ভাগ ১৮৫৫), 'কথামালা' (ঈসপ-এর গল্পের বঙ্গানুবাদ, ১৮৫৬), জীবনচরিত (চেম্বার্সের বায়োগ্রাফির বঙ্গানুবাদ (১৮৪৯), আখ্যানমঞ্জরী (ইংরেজি থেকে বঙ্গানুবাদ, ১৮৬৩) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা। জনশিক্ষা বিস্তারে তাঁর উৎসাহ লক্ষ করে ছোট লাট ফেডারিক হ্যালিডে কর্তৃক অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের স্কুল সমূহের বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত। এ দায়িত্ব লাভের পর ছুটির সময়ে গ্রাম-গ্রামান্তর পরিভ্রমণ করে ২০টি মডেল স্কুল ও ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলে ১৮৫৮-র নভেম্বর পাঁচশত টাকা মাসিক বেতনের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য সরকারি পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ। ১৮৫৬-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ১৮৫৮-তে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য নিযুক্ত। ১৮৫৯-এ ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল স্থাপনে ভূমিকা পালন। ১৮৬৪-তে এ প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয় হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন এবং বিদ্যাসাগর হন এর সেক্রেটারি। ১৮৭২-এ এটিকে দ্বিতীয় শ্রেণির, পরে ১৮৭৯-তে প্রথম শ্রেণির কলেজে পরিণত (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ)। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের নেতৃত্ব দান। বিধবা-বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীর প্রমাণ উপস্থাপন করে ১৮৫৫-র জানুয়ারি মাসে 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ। হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক বিধবা-বিবাহের তীব্র বিরোধিতা। প্রতিবাদীদের প্রতিউত্তর দানের জন্য ১৮৫৫-র অক্টোবর মাসে উপর্যুক্ত শিরোনামে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ। বিধবা-বিবাহ আইন পাসের জন্য ভারতের ব্রিটিশ সরকারের নিকট তৎকর্তৃক একটি আবেদনপত্র পেশ (৪ অক্টোবর ১৮৫৫)। উক্ত আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন বিধবা-বিবাহ আইনের একটি খসড়াও। ১৭ নভেম্বর (১৮৫৫) খসড়াটি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া কাউন্সিলে উপস্থাপিত। রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিরোধী পক্ষ থেকেও সরকারের কাছে বিপরীত আবেদনপত্র দাখিল (১৭ মার্চ (১৮৫৬)। বহুবিধ বিচার-বিশ্লেষণের পর ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক বিধবা-বিবাহ আইনের খসড়াটি গ্রহণ। ২৬ জুলাই (১৮৫৬) গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে এটি আইনে পরিণত। আইন অনুসারে প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন (ডিসেম্বর ১৮৫৬) সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে এ বিবাহ সম্পন্ন। বিভিন্ন স্থানে তাঁর নেতৃত্বে বহু বিধবা-বিবাহ নিষ্পন্ন। ১৮৭০-এ তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র এক বাল্যবিধবার পাণিগ্রহণ করলে তাঁর ব্রত সার্থকতা লাভ। বহু-বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম পরিচালনা। এ প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করে ১৮৭১-এর জুলাই মাসে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' শীর্ষক প্রথম পুস্তিকা এবং বহু-বিবাহ সমর্থনকারীদের মত খণ্ডন করে ১৮৭৩-র মার্চ মাসে উপযুক্ত শিরোনামে দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ। প্রতিপক্ষ পণ্ডিতমহল এ-সকল পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশের জন্য তাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলে তৎকর্তৃক 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে 'অতি অল্প হইল' (মে-১৮৭৩) এবং 'আবার অতি অল্প হইল' (সেপ্টেম্বর-১৮৭৩) শীর্ষক বিদ্রূপকৌতুকে পরিপূর্ণ দুইখানি প্রতিআক্রমণ রচনা। বহুবিবাহ রোধকল্পে আইন প্রণীত না হলেও এ প্রথার বিরুদ্ধে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। শিল্পগুণসমৃদ্ধ বাংলা গদ্যের স্রষ্টা হিসেবে খ্যাত। তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের গদ্যে লালিত্য ও ছন্দোমাধুর্যের অভাব ছিল। বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংলাগদ্যের মুক্তি সূচিত। গদ্যপ্রবাহে এক 'অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত' সঞ্চার করে এবং 'উচ্চবচ ধ্বনিতরঙ্গ' সৃষ্টি করে তাঁর হাতে এক সমৃদ্ধ গদ্যরীতির সূত্রপাত। 'অনন্যতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সঞ্চার' এই রীতির অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য, নিপুণ শব্দ নির্বাচন ও নিয়মিত

ছেদচিহ্নের প্রবর্তন এর বহিরঙ্গ বিদ্যাসাগরের কয়েকটি বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থের নাম: 'বেতালপঞ্চবিংশতি (হিন্দি বৈতাল পচ্চীসীর বঙ্গানুবাদ, ১৮৪৭), 'শকুন্তলা' (কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকের উপখ্যান ভাগের বঙ্গানুবাদ, ১৮৫৪), 'সীতার বনবাস' (ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বঙ্গনুবাদ, ১৮৬০), 'ভ্রান্তিবিলাস' (শেক্সপীয়রের Comedy of Erros-এর বঙ্গনুবাদ, ১৮৬৯)। মানবতাবাদ, কর্মবাদ এবং ইহলৌকিক চিন্তা-চেতনার প্রতি আস্থাশীল একজন ক্ষণজন্মা বাঙালি। বাঙালি হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করে সমাজ সংস্কারের এক অনন্যসাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি। দান-দাক্ষিণ্যের জন্যও খ্যাত। প্রবাসী মাইকেল মধুসূদনকে দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার। বাংলার গভর্নর কর্তৃক সম্মাননা লিপি প্রদান (১৮৭৭) ও ভারত সরকার কর্তৃক সি.আই.ই. উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু. কলকাতা. ২৯ জুলাই ১৮৯১।

উইলিয়াম ইয়েটস (১৭৯২-১৮৪৫)॥ জন্ম. ১৭৯২। শিক্ষাবিদ, ধর্ম-প্রচারক, বহু ভাষাবিদ ও অনুবাদক। ব্রিস্টলের ব্যাপটিস্ট কলেজে প্রাচ্য ভাষাসমূহ অধ্যয়ন। ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির পাদ্রি হিসেবে ১৮১৫-তে ভারতবর্ষে আগমন। কলকাতার শ্রীরামপুর মিশনে ড. উইলিয়াম কেরীর নিকট বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও তাঁর গ্রন্থাদি প্রণয়নে সহায়তা। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ। বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়াও আরবি, হিন্দি, হিব্রু ও চীনা ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন। স্কুল বুক সোসাইটির সক্রিয় সদস্য ও সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: সংস্কৃতাভিধানমিদং অর্থাৎ সংস্কৃত অভিধান (বাংলা ও ইংরেজি অর্থসহ, ১৮২০), পদার্থ-বিদ্যাসার (১৮২৫), জ্যোতিবিদ্যা (ডেভিড ব্রিউস্টার-এর গ্রন্থের অনুবাদ, ১৮৩৩), হিতোপদেশ (১৮৪১), সার সংগ্রহ (১৮৪৪), বাংলা ভাষার ভূমিকা: ওএনজার সম্পাদিত (১৮৪৭), বানিয়নস পিলগ্রিমস প্রগ্রেস, আইজাক ও ডানিয়েল, ধর্মপুস্তক আদিবাগ (বাইবেলের অনুবাদ), ধর্মপুস্তক অন্তভাগ (১৮৩৯)। বাংলা ব্যাকরণ ও গদ্য ভাষা নির্মাণে ইয়েটস-এর অবদান সামান্য নয়। অন্যদিকে, বাংলা পরিভাষা তৈরি ও বাংলায় পদার্থবিদ্যা-সংক্রান্ত পুস্তক রচনায় তিনি পথিকৃতের দাবিদার। মৃত্যু. ১৮৪৫।

উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)॥ জন্ম. নর্দানটনশায়ার, ইংল্যান্ড. ১৭ আগস্ট ১৭৬১ খ্রিশনারি ও বাংলায় গদ্যপাঠ্য পুস্তকের প্রবর্তক। পিতা এডমণ্ড কেরী, মাতা এলিজাবেথ কেরি। টমাস জোনসের কাছ থেকে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা থেকে শিক্ষা এবং বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানঅর্জন। ১৭৯৩-তে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারত আগমন। কলকাতায় এসে রামরাম বসুকে মুনশির পদে নিযুক্ত এবং বাংলা শিক্ষা। ১৭৯৪-তে মালদহের মদনবাটি নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত। এখানে আসার পরই স্থানীয় কৃষক-প্রজাদের পড়াশোনার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন। ১৭৯৭-তে বই ছাপার উদ্দেশ্যে দেশি হরফ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা। এ-সময়েই চার্লস উইলকিন্সের শিষ্য পঞ্চানন কর্মকারের সঙ্গে পরিচয়। নীলকুঠি বন্ধ হয়ে গেলে কুঠির মালিক উডনির কাছ থেকে খিদিরপুর গ্রাম ক্রয় এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু। শ্যার্লম্যান, ওয়ার্ড, গ্রান্ট প্রমুখ মিশনারি ১৭৯৯-র শেষের দিকে শ্রীরামপুরে এলে খিদিরপুরের সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগদান এবং ১৮০০-র জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা। অল্প কিছুদিন পরেই পঞ্চানন কর্মকারেরও মিশন প্রেসে যোগদান এবং তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮০০-র ১৮ মার্চ 'ম্যাথু রচিত সমাচার'-এর প্রথম পাতাটি বাংলা ভাষায় মুদ্রিত। ঐ বছরেরই আগস্ট মাসে 'মিশন সমাচার' মুদ্রিত। এটিই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ। ১৮০১-এর মে মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত এবং এখানে ত্রিশ বছর অধ্যাপনা। ইংরেজ কর্মচারীদেরকে বাংলাভাষা শিক্ষা দেবার উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করবার জন্য নিজেকে পাঠ্যপুস্তক রচনায় মনোনিবেশ এবং তাঁর অধীনস্থ পণ্ডিতদেরকেও এই কাজে উৎসাহ দান। কথোপকথন (১৮০১) ও ইতিহাসমালা (১৮১২) গ্রন্থদ্বয় তাঁর নিজস্ব রচনা। তাঁর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর থেকে প্রায় ৪০টি ভাষা উপভাষায় খ্রিস্টধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ। মারাঠা



(১৮০৫), সংস্কৃত (১৮০৬), পাঞ্জাবী (১৮১২) ও তেলিঙ্গা (১৮১৪) ভাষায় ব্যাকরণ রচনা এবং মারাঠা (১৮১৮), বাংলা (১৮১৮) ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অভিধান সংকলন। রামায়ণ সম্পাদনা (১৮০৬-১৮১০)। বাংলা হরফের সংস্কার, অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় হরফ তৈরি এবং এ-দেশীয় কৃষ্টি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্যে অমর হয়ে থাকবেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান 'এগ্রি-হার্টিকালচারাল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা। এটি ১৮২৩-এর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি ১৮২৪-এ সোসাইটির সভাপতি নিযুক্ত এবং সরকারি অনুবাদকের দায়িত্ব লাভ। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধশত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ নিউ টেস্টামেন্ট, বাংলা ব্যাকরণ, ওল্ড, টেস্টামেন্ট, কথোপকথন, ইতিহাসমালা, বাংলা-ইংরেজি অভিধান। উইলিয়াম কেরীর মূল পেশা ছিল পাদুকা-নির্মাণ। ভিন্ন পেশার এবং ভিন্ন ভাষার লোক হয়েও তিনি বাংলাভাষায় যে দক্ষতা অর্জন করেন তা অসাধারণ। গদ্য পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তক হিসেবে বাংলা গদ্যের বিকাশধারার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। মৃত্যু. ৯ জুন ১৮৩৪।

উইলিয়াম জোনস, স্যার (১৭৪৬-১৭৯৪)॥ জন্ম. ইংল্যান্ড, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৭৪৬। বহু ভাষাবিদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। অক্সফোর্ডের ছাত্র থাকাকালে প্রাচ্য ভাষা শিক্ষা। ১৭৭০-এ ফারসি ভাষায় লিখিত নাদির শাহের জীবনী ফারসি ভাষায় অনুবাদ। পরের বছরে ফারসি ভাষার ব্যাকরণ রচনা। অল্পকাল পরে একটি আরবি গ্রন্থের অনুবাদ। ক্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন। ১৭৮৩-তে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় আগমন। পরের বছর কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা (১৭৮৪) এবং আজীবন সভাপতি। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক। তার মধ্যে 'শকুন্তলা', 'হিতোপদেশ' ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল গীর্জায় তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ আছে। মৃত্যু. ১৭৯৪।



উইলিয়াম রোদেনস্টাইন (১৮৭২-১৯৪৫)॥ জন্ম. ইয়র্কশয়ারের ব্রাডফোর্ডে, ১৮৭২। ইংরেজ চিত্রকর, বুদ্ধিজীবী, রবীন্দ্রনাথ-ইয়েটস প্রমুখের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রয়্যাল কলেজ অব্ আর্ট-এর অধ্যক্ষ (১৯২০-১৯৩৫) দেগা-র স্টুডিওতে অপ্সরা মূর্তি দেখে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯১১-তে ভারত বর্ষে আগমন। এ সময়েই ঠাকুর পরিবারের সৃজনশীল বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য। ১৯১২-তে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডে গেলে ৩০ জুন রোদেনস্টাইনের গৃহে তাঁর নিমন্ত্রিত বন্ধুমণ্ডলীর সম্মুখে কবি 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে শোনান। তৎকালীন ইংরেজ কবিকুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার পিছনে রোটেনস্টাইনের অবদান আছে, এই কবিগণের কয়েকজনের চেষ্টাতেই কবির নাম নোবেল পুরস্কার কমিটিতে উত্থাপিত হয় এবং অবশেষে ১৯১৩-তে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর অঙ্কিত চিত্রমালার মধ্যে পেটার, সুইবার্ন, রদ্যাঁ, কনরাডের প্রতিকৃতি এবং 'সিক্স পোর্ট্রেটস অব রবীন্দ্রনাথ' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ১৯৩১-র 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু. ১৯৪৫।

উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৪)॥ জন্ম. বরিশাল, ২৯ মার্চ, ১৯২৯। নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক। কলকাতায় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের প্রবর্তক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স ডিগ্রি লাভ (১৯৪৯)। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়নকালে নিজস্ব নাট্যদল 'দ্য শেক্সপিয়ারিয়ানা' গঠন। কলেজ মঞ্চে 'রিচার্ড দ্য থার্ড' পরিচালনা ও এতে অভিনয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে জিওফ্রে কেন্ডালের আমন্ত্রণে 'শেক্সপিয়ারিয়ানা ইন্টান্যাশনালে' পেশাদার অভিনেতারূপে যোগদান (১৯৪৭)। 'মার্চেন্ট অব ভেনিসে' আন্তোনিও চরিত্রে প্রথম অভিনয় ১৯৫০-এ 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ গঠন কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন (১৯৫৩-১৯৫৯)। ১৯৫২ থেকে বাংলা নাটকে অভিনয় শুরু। কিছুকাল



'গণনাট্য সঙ্ঘের' মঞ্চ-নাটকে অভিনয় (১৯৫২)। ১৯৫৯-এ 'মিনার্ভা থিয়েটার' যোগদান। মঞ্চনাটকের অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। অভিনেত্রী শোভা সেনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯৫৯)। ১৯৭১-এ 'পিপলস্ লিটল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা। ষাটের দশকে দেশহিতৈষীতে 'সংগ্রামের একদিক' প্রবন্ধ রচনার জন্য ভারতরক্ষা আইনে কারারুদ্ধ। বামপন্থি রাজনৈতিক নাট্যকার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রেণিদ্বন্দ্বের রাজনৈতিক বিশ্লেষণে তাঁর নাটক সমৃদ্ধ। শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সুগভীর বেদনা তাঁর নাটকে আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্কিত। পথ নাটক রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন। চলচ্চিত্রের অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে সুনাম অর্জন। যাত্রাপালার রচয়িতা হিসেবেও দক্ষতার পরিচয় প্রদান। গ্রন্থ: নাটক-ছায়ানট (১৯৫৮), অঙ্গার (১৯৫৯), ফেয়ারী ফৌজ, ঘুম ভাঙার গান, কল্লোল, অজেয় ভিয়েতনাম, টোটা, তিতুমীর, মানুষের অধিকার (১৯৬৮), সূর্য শিকার (১৯৭১), টিনের তলোয়ার (১৯৭১), ঠিকানা (১৯৭১), ব্যারিকেড (১৯৭২), দুঃস্বপ্নের নগরী (১৯৭৪), জনতার আফিম, মালোপাড়ার মা, পেট্রোল বোমা, নীচের মহল, একলা চল রে, ক্রুশবিদ্ধ কুবা, এবার রাজার পালা, লেনিন কোথায়, লাল দুর্গ, স্তলিন, ৩৪, তীর নীল সাদা-লাল (১৯৭৯), আজকের শাজাহান (১৯৮৪), ফুলবানু (১৯৯৩), সত্তরের দশক (১৯৯৩)। যাত্রাপালা- রাইফেল, দিল্লি চলো, জালিয়ানওয়ালাবাগ, নীল রক্ত, জয় বাংলা, সমুদ্র শাসন, সন্ন্যাসীর তরবারি, ঝড়, মাওসেতুঙ, বৈশাখী মেঘ, সীমান্ত, তুরুপের তাস, মুক্তিদীক্ষা, অরণ্যের ঘুম ভাঙছে, সাদা পোশাক, কুঠার, বিবিঘর, স্বাধীনতার ফাঁকি, দামামা ওই বাজে। অন্যান্য রচনা-শেক্সপিয়রের সমাজচেতনা, স্তানিস স্লাভস্কি পথ, স্তানিস স্লাভস্কি থেকে ব্রেখট, চায়ের ধোয়া, জপেনদা জপেন যা, গিরিশ মানস, টুওয়ার্ডস-এ রিভিলিউশনারি থিয়েটার, আশার ছলনে ভুলি, প্রতিবিপ্লব। পরিচালিত ছবি-মেঘ, ঘুম ভাঙার গান, ঝড়, বৈশাখী মেঘ। যা অভিনীত ছবি-মাইকেল মধুসূদন, জনঅরণ্য, জয়বাবা ফেলুনাথ, হীরক রাজার দেশে, আগন্তুক, ভুবন সোম, কোরাস, কলকাতা '৭১, যোগাযোগ, নৌকাডুবি, যুক্তি তক্ক গপ্পো, পালঙ্ক, শ্রীমান পৃথ্বিরাজ, পদ্মানদীর মাঝি, সাত হিন্দুস্থানী, সৌকিন, গুপি... অশ্রম। দীনবন্ধু পুরস্কার, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ। পদ্মভূষণ উপাধি ও সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯ আগস্ট ১৯৯৪

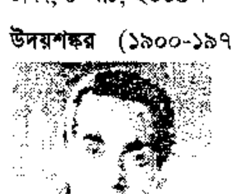
উত্তম কুমার (১৯২৬-১৯৮০)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৯২৬। অভিনেতা। আসল নাম অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। আই.এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। ১৯৪৭-এ কলকাতায় পোর্ট কমিশনার অফিসে কেরানির পদে চাকরি করার সময়ে হিন্দি ছায়াছবি 'মায়া সের'-এ একটি ছোট্ট চরিত্রে অভিনয়। অবশ্য ছবিটি মুক্তি পায় নি। প্রথম অভিনীত মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'দৃষ্টিদান' (১৯৪৮)। ১৯৪৯-এ 'কামনা' ছায়াছবিতে অরূপকুমার নামে নায়ক হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ। এরপর যথাক্রমে মর্যাদা (১৯৫০), ওরে যাত্রী (১৯৫১), সহযাত্রী (১৯৫১) এবং নষ্ট নীড় (১৯৫১) ছায়াছবিতে অভিনয় করার পর 'সঞ্জীবনী' ছবিতে 'উত্তকুমার' নামে প্রথম আত্মপ্রকাশ। ১৯৫২-তে 'বসু পরিবার' ছায়াছবিতে হৃদয়স্পর্শী অভিনয়। ১৯৫৩-তে 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছায়াছবিতে সুচিত্রা সেনের বিপরীতে অভিনয়। পরবর্তীকালে সুচিত্রা-উত্তম জুটির বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ। ১৯৫৩-১৯৫৫ পর্যন্ত স্টার থিয়েটার 'শ্যামলী' নাটকে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে অভিনয়। প্রথম প্রযোজিত-অভিনীত ছায়াছবি 'হারানো সুর' (১৯৫৭)-এর রাষ্ট্রপতি 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' সম্মান লাভ। এরপর বিচারক (১৯৫৯), খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন (১৯৬০), সপ্তপদী (১৯৬১), নায়ক (১৯৬৬) পৃথিবী আমারে চায় প্রভৃতি ছায়াছবিতে অভিনয়ের জন্য বিপুলভাবে প্রশংসিত। ১৯৬৭-তে 'ছোটি সি মুলাকাৎ' নামক হিন্দি ছায়াছবি প্রযোজনা। ১৯৭৩-এ শিল্পী সংসদের সভাপতি হিসেবে 'বনপলাশের পদাবলী' ছায়াছবিতে অভিনয়সহ এর পরিচালনা ও আবহসংগীত রচনা। হিন্দি 'অমানুষ' (১৯৭৪) ছায়াছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রের একজন বিশিষ্ট অভিনেতা হিসেবে সম্মানিত। ভারত সরকার-কর্তৃক ১৯৬৭-তে সেরা অভিনেতা হিসেবে 'ভরত' পুরস্কার দান। মৃত্যু. কলকাতা, ২৪ জুলাই ১৯৮০।



উদয়ন চৌধুরী (১৯১৮-২০০৪) : জন্ম. ওয়ারী, ঢাকা, ২৮ মে, ১৯১৮ : চলচ্চিত্রকার, প্রযোজক, কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক, সাংবাদিক, সম্পাদক। প্রকৃত নাম: ইসমাইল মোহাম্মদ: পিতা মুনশী আবদুল লতিফ ও মাতা সায়েরা খাতুন। ঢাকার মুসলিম হাইস্কুল থেকে ১৯৩৭-এ মেট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৪০-এ ইন্টারমিডিয়েট এবং কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৪-এ বি.এ পাস। ইন্টারমিডিয়েট পাসের পর প্রথমে কলকাতা ডাকবিভাগে এবং পরে মুম্বাই সেনাবাহিনীতে চাকরি (১৯৪০-৪১) করেন। পরে চাকরি ছেড়ে নাটক ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত। মুসলিম হাই স্কুলে পড়ার সময় স্কাউটিং লিডার হিসেবে 'সার্ভিস টু মাদারল্যান্ড' একাংকিকা রচনা করেন। কলকাতায় নাট্য বিষয়ক 'রোভিনা করপোরেশন' গঠন। ১৯৪৪-এ এই প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় 'জোয়ার' নামে নাটক রচনা ও পরিচালনা। এটি বাঙালি মুসলমান পরিচালিত প্রথম নাটক। ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে এসময় তিনি উদয়ন চৌধুরী ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী নাটক ছিল 'ওমর খৈয়াম'। ১৯৪৫-এ সহকারী পরিচালক হিসেবে চিত্রজগতে যোগদান। ১৯৪৬-এ চলচ্চিত্র নির্মাণের উদযোগ গ্রহণ এবং ১৯৪৭-এ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান 'ড্রিমল্যান্ড পিকচার্স' গঠন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে নিজের লেখা কাহিনী অবলম্বনে 'মানুষের ভগবান' নামে কুসংস্কার-বিরোধী ছবি পরিচালনা। ছবির বিষয়বস্তু উদার ও প্রগতিশীল হওয়ায় প্রশাসনিক মহলের হস্তক্ষেপে পরিচালক ও অন্য কুশলীদের বিভিন্ন মেয়াদে জেল হয় এবং সেন্সর সার্টিফিকেট বাতিল হয়। ছবিটি পরে পরিবর্তিত ও কর্তিত আকারে মুক্তি পায়। ১৯৫২-এ ঢাকায় এসে সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক মঞ্চায়ন করে আলোড়ন সৃষ্টি। কলকাতায় ১৯৫৬-১৯৫৯-এ 'রাজা রামমোহন রায়' (অসমাপ্ত) জীবনীচিত্র এবং ঢাকায় ১৯৬০-এ 'বিষকন্যা' (অসমাপ্ত) নামে বেদে জীবন নির্ভর চলচ্চিত্র পরিচালনা। ১৯৬৬-এ ঢাকায় উর্দু ছবি 'পুনম কি রাত'-এর নির্মাণ তত্ত্বাবধান এবং অভিনয়। ১৯৬৮-এ 'চোরাবালি' এবং ১৯৭০-এ 'নায়িকা' নামে চিত্র পরিচালনা। আরেকটি অসমাপ্ত ছবির নাম 'ডাক দিয়ে যাই' (১৯৮৩)। কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য নিয়ে নির্মিত সফল চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে 'এতটুকু আশা' (১৯৬৮), 'দীপ নেভে নাই' (১৯৭০), 'আলোর মিছিল (১৯৭৪), 'পুত্রবধূ' (১৯৮১), 'ভাঙাগড়া' (১৯৮১), গৃহলক্ষ্মী, লালুভুলু প্রভৃতি। কলকাতায় অবস্থানকালে 'নবযুগ', 'সত্যযুগ', রূপমঞ্চ-সহ বিভিন্ন পত্রিকায় রচনা প্রকাশ। পঞ্চাশের দশকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'কাফেলা' সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত এবং 'রঙ্গালয়' সম্পাদনা। ১৯৭৬-এ সাহিত্য মাসিক 'সমকাল' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। কলকাতা হতে প্রকাশিত নাটক 'জোয়ার' ও 'ওমর খৈয়াম' এবং প্রবন্ধ। 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস'। ঢাকা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ : 'নাট্যকলার ক্রমবিকাশ' (গবেষণা), হপ্তম্যানের তিনটি নাটক (অনুবাদ) আর্মস এ্যান্ড দি ম্যান' (অনুবাদ)। নামে-বেনামে এবং শিবলী নোমান ছদ্মনামে তাঁর সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতি নির্ভর অনেক লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংকলনে প্রকাশিত। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় জহির রায়হান, সৈয়দ হাসান ইমাম এবং অন্যদের নিয়ে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কলাকুশলী পরিষদ' গঠন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন। একাধিকবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ। মৃত্যু, ঢাকা, ৮ মার্চ, ২০০৪।



উদয়শঙ্কর (১৯০০-১৯৭৭)॥ জন্ম. কালিয়া, নড়াইল, ১৯০০। নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য পরিচালক। ১৯১৭-তে বম্বের জে. জে. স্কুল অফ আর্টস-এ ভর্তি। এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হলে লন্ডনে রয়েল স্কুল অফ আর্টস-এ ভর্তি। এখানে বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়াম রোদেনস্টাইনের কাছে কলাবিদ্যা শিক্ষা এবং দুটি পদকসহ ডিগ্রি লাভ। এই সময়ে মহাযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতবর্ষের সাহায্যার্থে কয়েকটি নাটক রচনা এবং তা রূপায়িত করার জন্য সংগীত ও নৃত্যের প্রতি



আগ্রহী সেই থেকে অনুশীলন শুরু। লন্ডনে থাকাকালে বন্ধুদের উৎসাহে স্থানীয় অনুষ্ঠানে নৃত্যকলা প্রদর্শন। এক অনুষ্ঠানে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী আনাপাবলোবা এঁর কলাজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দলে ভারতীয় নৃত্য শিক্ষাদানের জন্যে উদয়শঙ্করকে নিযুক্ত করেন। কিছুকাল পর এই দল ত্যাগ করে লন্ডন ও প্যারিসে স্বাধীনভাবে নৃত্য কলা প্রদর্শের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালনের অধিকারী। ১৯৩৪-১৯৩৫ পর্যন্ত নৃত্যদল নিয়ে বিশ্ব সফর। নৃত্যশিল্পের প্রসারকল্পে ভারতের আলামোড়ায় ১৯২৯-এ 'উদয়শঙ্কর ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার' নামক নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন। 'কল্পনা' নামক ছায়াছবি প্রযোজনা। ১৯৫৫-তে পশ্চিমবঙ্গ সংগীত-নৃত্য একাডেমির নৃত্য বিভাগের আচার্য মনোনীত। মৃত্যু. ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫)॥ জন্ম. মসূয়া গ্রাম, ময়মনসিংহ, ১০ মে, ১৮৬৩। শিশুসাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কালীনাথ রায়চৌধুরী ওরফে শ্যামসুন্দর মুন্সী তাঁর পিতা। পিতৃদত্ত নাম কামদারঞ্জন। শ্যামসুন্দর মুন্সী তাঁর এক নিকট আত্মীয় ময়মনসিংহের জমিদার হরিকিশোর চৌধুরী সকাতর অনুরোধে ৪/৫ বছরের কামদারঞ্জনকে হরিকিশোরের কাছে দত্তক দেন। হরিকিশোর নিজের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য যোজনা করে এবং শ্যামসুন্দর মুন্সীর বংশের পদবি রক্ষা করে দত্তক পুত্র কামদারঞ্জনের নতুন নামকরণ করেন 'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী'। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পাস (১৮৮০)। স্কুল জীবনেই চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা অর্জন। কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউট থেকে বি.এ. পাস (১৮৮৪)। তেইশ বছর বয়সে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধুমুখীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ (১৮৮৬)। বাংলা শিশুসাহিত্য রচনার পথিকৃৎ। গল্প, নাটক, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কবিতা, গান, মনোরম ছবি সবই তিনি উপহার দিয়েছেন ছোটদের। তাঁর সম্পাদনায় শিশুতোষ পত্রিকা 'সন্দেশ' (১৯১৩) প্রকাশিত। স্বরচিত গ্রন্থের স্ব-অঙ্কিত চমকপ্রদ চিত্র সংযোজন। 'বলরামের দেহত্যাগ' তাঁর অঙ্কিত একটি বিখ্যাত চিত্র। নানা রঙের হাফটোন ছবি ছাপার ব্যাপারে বর্তমান কালে যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তার পেছনে তাঁর অবদান অপরিসীম। গবেষণা করে নানারকম ডায়াফার্ম সৃষ্টি, রি-স্ক্রিন অ্যাডজাস্টার যন্ত্র নির্মাণ। ডায়োটাইপ ও রে-প্রিন্ট পদ্ধতির উদ্ভাবক। গ্রন্থপঞ্জিঃ ছোটদের রামায়ণ (১৮৯৪-১৮৯৫), সেকালের কথা (১৯০৩), ছোটদের মহাভারত (১৯০৯), মহাভারতের গল্প (১৯০৯), বিবিধ প্রবন্ধ, গল্পমালা ও ছড়া-কবিতা-গান। মৃত্যু. গিরিডি, ২০ ডিসেম্বর, ১৯১৫।



উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০)॥ জন্ম. ভাগলপুর, ১২ অক্টোবর ১৮৮১। কথাশিল্পী। ভাগলপুর জেলা স্কুল থেকে ১৮৯৯-তে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ.এ. ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাস। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল. ডিগ্রি লাভ। ১৯১৩-তে ভাগলপুরে ওকালতি শুরু। ১৯২৬-এ আইন ব্যবসায় ছেড়ে ভাগলপুর থেকে কলকাতায় আগমন। এরপর সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ। ১৯২৭-১৯৪১ পর্যন্ত 'বিচিত্রা' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা। এ-ছাড়া ১৩৫৮-১৩৬৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত আট বছর 'গল্পভারতী' নামক পত্রিকা সম্পদনা। রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসঃ শশিনাথ (১৯১২), রাজপথ (১৯২৫), অন্তরাগ (১৯৩২), স্মৃতিকথা (৪ খণ্ড, ১৯৫১-১৯৫২), বিগত দিন (১৯৫৭), শেষ বৈঠক (১৯৫৮), বিদুষী ভার্যা, অমলা, নাস্তিক, অমল তরু ইত্যাদি। সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৫-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', ১৯৫৮-তে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'নরসিংহদাস পুরস্কার' দান। ১৯৬০-এ 'আনন্দবাজার পুরস্কার' লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক 'লীলা লেকচারার' রূপে সম্মানিত। মৃত্যু. ৩০ জানুয়ারি ১৯৬০।



উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৮৭৫-১৯৪৬)॥ জন্ম. জামালপুর, ৭ জুন ১৮৭৫। পরবর্তীকালে হুগলীর মহেশতলায় বসতবাড়ি নির্মাণ। চিকিৎসাবিজ্ঞানী। কালাজ্বরের ঔষধ 'ইউরিয়া স্টিবামাইন' নামক ইনজেকশনের আবিষ্কারক। ১৮৯৩-তে হুগলী কলেজ



থেকে গণিতশাস্ত্রে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণিতে বি.এ. পাস। পরে এক সঙ্গে রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন। ১৮৯৪-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়নশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাস। ১৮৯৮-তে মেডিসিন ও সার্জারিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. বি. পাস এবং 'গুডিভ' ও 'ম্যাকলাউড পদক লাভ। ১৯০২-এ এম.ডি. পাস। ১৯০৪-এ শরীরতত্ত্ব-বিষয়ে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। 'কোর্টস পদক', 'গ্রিফিথ পুরস্কার' ও 'মিনটো পদক' লাভ। কর্মজীবনের প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের প্যাথলজি ও মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষকরূপে এবং ১৯০৫-১৯১২ পর্যন্ত কলকাতা ক্যাম্বল মেডিক্যাল স্কুলে মেডিসিনের শিক্ষকরূপে দায়িত্ব পালন। কিছুকাল কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনা। এরপর ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাক্ ওয়াটার ফিভার ও রসায়নশাস্ত্র-বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা সম্পাদন। ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করে দেশি ঔষধ প্রস্তুতে সফলতা লাভ। ১৯৩৪-এ ভারত সরকার-কর্তৃক 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত। ১৯৩৬-এ ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব। তিনি ছিলেন বিলেতের 'রয়্যাল সোসাইটি অফ মেডিসিনের' সভ্য। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখা 'ট্রিটিজ অন কালাজ্বর' নামক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু. ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯০৬)॥ জন্ম. খিদিরপুর, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ১৮৪৪। প্রথম কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। পিতা অ্যাটর্নি গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা সরস্বতী দেবী। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি (কলকাতা) শিক্ষা লাভ। রুস্তমজী জিজিভাই (বোম্বাই) বৃত্তি পেয়ে আইন অধ্যয়নের জন্য বিলেত গমন (১৮৬৪)। লন্ডনে 'ইন্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৬৫) প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা। এর প্রথম সম্পাদক। ১৮৬৮-তে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান (নভেম্বর ১৮৬৮)। অচিরেই এ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ। ব্যবহারাজীবী হিসেবে



তাঁর পারদর্শিতার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের ইংরেজ সরকার কর্তৃক তাঁকে চারবার স্যান্ডিং কাউন্সিল-এর পদে নিযুক্তি দান। 'হিন্দু উইলস অ্যাক্ট, ১৮৭০' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত (১৮৭১)। আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ সমর্থন (১৮৭৩)। 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের' প্রথম (বোম্বাই, ১৮৮৫) ও অষ্টম (এলাহাবাদ, ১৮৯২) অধিবেশনে সভাপতিত্ব। কংগ্রেসের কর্ম পরিচালনায় প্রচুর অর্থ দান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৮৫৭) সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য ও ফ্যাকাল্টি অফ ল'-এর সভাপতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৯৩-১৮৯৫) নির্বাচিত। উদারপন্থি রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী। ইংরেজদের সঙ্গে সখ্যের মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর রাজনীতির মূল আদর্শ। ব্যক্তিগত জীবনে সাহেবিয়ানা চালচলনে অভ্যস্ত। ধর্মবিষয়ে ছিলেন গোঁড়ামিমুক্ত। স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে তাতে বাধা দেননি। তবে তিনি নিজে স্বধর্ম (সনাতনধর্ম) ত্যাগ করেননি। ১৯০২-এ লন্ডনের উপকণ্ঠে ক্রয়ডনে বাড়ি (খিদিরপুর হাউস) নির্মাণ। বাকি জীবন সেখানে বাস। প্রিভি কাউন্সিলে আইন ব্যবসায়। 'ইন্ডিয়ান পলিটিকস' (১৮৯৮) তাঁর রচিত একখানি মূল্যবান রাজনৈতিক গ্রন্থ। মৃত্যু. ক্রয়ডন (লন্ডন), ২১ জুলাই ১৯০৬।

উল্লাসকর দত্ত (১৮৮৫-১৯৬৫)॥ জন্ম. কালীকচ্ছ গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৬ এপ্রিল ১৮৮৫। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিপ্লবী সদস্য। ১৯০৩-এ কলকাতা থেকে এন্ট্রান্স পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ড. রাসেলের এক অপমানজনক মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে

কলেজ ত্যাগ করে বারীন ঘোষের গুপ্ত বিপ্লবী



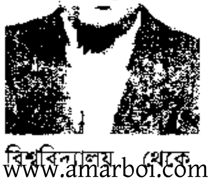
দলে যোগদান। এরপর থেকে বিপ্লবী দলের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নিয়োজিত। ১৯০৫-১৯১১ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগদান। এ-সময়ে বাড়িতে বোমা ফাটার একা দুর্ঘটনা ঘটলে আত্মগোপন। ১৯০৮-এর ২ মে মুরারিপুকুর বাগানে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে প্রেরিত। ১৯০৯-এ আলিপুর বোমার মামলায় ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত। পরে আপিলে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ রহিত হয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তর। ১৯২০-তে মুক্তির পর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত। উল্লাসকর দত্ত অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ১৯৪৮-এ দ্বিখণ্ডিত বাংলায় বসবাস না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসামের শিলচরে গমন। ভারত সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী পুরুষ হিসেবে ভাতা মঞ্জুর করলে তা গ্রহণে অস্বীকার। মৃত্যু মে ১৯৬৫।

ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬)॥ জন্ম. ঢাকা শহর, ৪ নভেম্বর ১৯২৫। পৈতৃক নিবাস পাবনা।



চলচ্চিত্র পরিচালক। ১৯৪৬-এ রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এ. এবং ১৯৪৮-এ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৯৫০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম.এ. কোর্স শেষ করেও পরীক্ষা না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ। এ সময়ে কলকাতার গণনাট্য সঙ্ঘে যোগদান এবং নাটক রচনা ও পরিচালনা। এ-বছরই মনোজ ভট্টাচার্য পরিচালিত ও বিমল রায় প্রযোজিত 'তথাপি' ছবির সহকারী পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ। তাঁর অভিনীত অন্যান্য ছবি: ছিন্নমূল (১৯৫১), কুমারী মন (১৯৬২), সুবর্ণরেখা (১৯৬৫), তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৭৩), যুক্তি তক্কো আর গপ্পো (১৯৭৪)। ১৯৫৫-তে বোম্বের ফিলিস্তান-এ কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে চাকরিতে যোগদান। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। প্রথম পরিচালিত ছবি নাগরিক (১৯৫২-১৯০৫৩)। কিন্তু ছবিটি নানা কারণে মুক্তি পায় ১৯৭৭-এ তাঁর মৃত্যু পর। প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি অযান্ত্রিক (১৯৫৮)। অযান্ত্রিকের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী চলচ্চিত্রকার হিসেবে খ্যাতি লাভ। ১৯৬৫-তে পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে যোগদান, পরে ভাইস প্রিন্সিপাল। পরিচালিত অন্যান্য পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি: বাড়ি থেকে পালিয়ে (১৯৫৯), মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০), কোমল গান্ধার (১৯৬১), সুবর্ণ রেখা (১৯৬৫), তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৭৩), যুক্তি তক্কো আর গপ্পো, (১৯৭৪)। তথ্যচিত্র: ওরাও (১৯৫৫), ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান (১৯৬৩), সায়েন্টিস্টস অফ টুমরো (১৯৬৭), পুরুলিয়ার ছৌ (১৯৭০)। স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র: ফিয়ার (১৯৬৪-১৯৬৫), রঁদেভু (১৯৬৫), আমার লেনিন (১৯৭০)। ইয়ে কিউ (১৯৭০), দুর্বার গতি পদ্মা (১৯৭১)। বিজ্ঞাপনচিত্র: সিজারস্ (১৯৬২)। ১৯৬৯-এ ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত। ১৯৭৩-এ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আগমন ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবি পরিচালনা ১৯৭৫-এ 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' ছবির শ্রেষ্ঠ কাহিনীর জন্য ভারতের জাতীয় পুরস্কার লাভ। সমসাময়িক কালের চলচ্চিত্র পরিচালদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণের কারণে যেমন ছিলেন প্রশংসিত তেমনি বিতর্কিত। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ঋত্বিক ঘটকের নাম নানাভাবেই উচ্চারিত হবে। মৃত্যু. ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬।

এ.এন.এম. মনিরুজ্জামান (১৯২৪-১৯৭১)॥



জন্ম. কাঁচেরকোল গ্রাম, যশোর, ১৯২৪। শিক্ষাবিদ। নড়াইল হাইস্কুল থেকে ১৯৪০-এ মেট্রিক, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৪২-এ আই.এসসি. ও ১৯৪৪-এ বি.এসসি. অনার্স (গণিত) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬-এ এম.এসসি.

(পরিসংখ্যান) ডিগ্রিলাভ। ১৯৪৮-এর ৮ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬১-র ১ ডিসেম্বর রিডার পদে উন্নীত। ১৯৬৭-১৯৭১ পর্যন্ত পরিসংখ্যান বিভাগে অধ্যক্ষ। কৃতি শিক্ষক ও খ্যাতনামা পরিসংখ্যানবিদ। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পরিসংখ্যান বিষয়ে তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগৃহে ঢুকে তাঁকে হত্যা করে।

এ.এফ.এম. আবদুল জলিল (১৯১৬-১৯৭৮)॥ জন্ম. পানতিতা গ্রাম, তেরখাদা-খুলনা, ১৯১৬। সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক। তেরখাদা মাদ্রাসা থেকে ১৯২৮-এ জুনিয়র পরীক্ষা, ১৯৩৩-এ খুলনা বি. কে. স্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৩৮-এ কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি.এ. ও ১৯৪৫-এ ল পাস। ১৯৪৪-এ প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। গ্রামের স্কুলে দু'বছর শিক্ষকতা করার পর সাত বছর বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে কর্মরত। ১৯৪৭-এ চেম্পারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেটের সনদ লাভ। দেশ বিভাগের (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর অ্যাডভোকেট হয়ে খুলনা আগমন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সদস্য। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৮-১৯৬২ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান আইনজীবী সমিতির কার্যকরী সংসদের সদস্য। ১৯৬৪-তে খুলনা জেলা বার সমিতির সেক্রেটারি নির্বাচিত। ১৯৬৯-এ খুলনা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত। রাজনৈতিক কারণে কয়েকবার কারাবরণ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি: ইউরোপীয় সভ্যতায় ইসলামের দান (১৯৪৭), ইবনে খালদুন (১৯৪৭), পারস্য সাহিত্য (১৯৪৯), মুসলিম সংস্কৃতি (১৯৪৯), মুসলিম আইন ও সমাজ ব্যবস্থা (১৯৪৯), আমার কথা (১৯৭০), আইয়ুব আমলে ভূত (১৯৭০), পূর্ববাংলার কৃষক বিদ্রোহ (১৯৭৫), সুন্দরবনের ইতিহাস (তিন খণ্ড, ১৯৭৬), পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালি। ১৯৬৮-তে বাংলা একাডেমীর স্পেশাল এওয়ার্ড ও ১৯৬৯-এ ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার লাভ। সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধূলা, রাজনীতি সব ব্যাপারেই আবদুল জলিল ছিলেন সমান উৎসাহী। মৃত্যু. ২ নভেম্বর ১৯৭৮।

একরামুদ্দীন (১৮৭২-১৯৪০)॥ জন্ম. কুর্লিয় গ্রাম, বায়না, বর্ধমান, ১৮৭২। লেখক। বর্ধমান রাজ কলেজ ও হুগলী কলেজের ছাত্র। বি.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। কলেজের পাঠ ত্যাগ করার পর সেটেলমেন্ট বিভাগে কানুনগো পদে চাকরি লাভ। পরে সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত। ১৯৭২-এ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। বীরভূম জেলার কয়থা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস। সমালোচক হিসেবে সাহিত্যাঙ্গনে প্রথম আবির্ভাব। পরে কথাসহিত্য ও নাটক রচনা। 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' (১৩২১) তাঁর বহুল উচ্চারিত ও আলোচিত গ্রন্থ। 'বির্সজন' কাব্যনাট্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল্যায়ন এর প্রতিপাদ্য। মুসলিম রবীন্দ্র-সমালোচকদের পথিকৃৎ। 'কৃষ্ণকান্তের উইল-এ বঙ্কিমচন্দ্র' (১৩৩৭) তাঁর অপর একখানি উল্লেখযোগ্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ। কথাসাহিত্যে রসপূর্ণ বাস্তবচিত্র অঙ্কনে দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় তাঁর সমকালে মুসলিম 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়' নামে স্বীকৃতি লাভ। 'কাচ ও মণি' (১৩৩৭) তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস। 'অনধিকার প্রবেশ' নামে একখানি সামাজিক প্রহসন রচনা। ব্যঙ্গ-কথা, গল্প এবং প্রবন্ধেরও রচয়িতা। সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর এ জাতীয় বহু লেখা প্রকাশিত। মৃত্যু. কয়থা গ্রাম, বীরভূম, ২০ নভেম্বর ১৯৪০।



এ.কে.এম. সিদ্দিক (১৯২৫-১৯৭১)॥ জন্ম. সোনাকান্দার ঝিটকা গ্রাম, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ, ১৯২৫। আইনজীবী। ডাকনাম হেনা মিয়া, পূর্ণ নাম আবুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক। পিতা আবদুল লতিফ বিশ্বাস (রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রী)। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি পাস। ঢাকা বার ও ঢাকা হাইকোর্টের ওকালতি। ১৯৬৯-১৯৭০ পর্যন্ত ঢাকা বারের সেক্রেটারি। প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে ১৪ ডিসেম্বর (১৯৭১) ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী আলবদর বাহিনীর হাতে নিহত।

এ কে এম আবদুর রউফ (১৯৩৫-২০০০)॥ জন্ম. বয়রা-নূরনগর, খুলনা, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৫। চিত্রশিল্পী, কূটনীতিক, মুক্তিযোদ্ধা, আর্কিভিস্ট। পিতা মো. কিনু শেখ, মাতা আমেনা বেগম। ১৯৫২-এ খালিশপুর হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাস। এবছর ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৫৪-এ ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক, ১৯৫৯-এ ঢাকা চারু ও কারুকলা কলেজ থেকে স্নাতক এবং ১৯৭১-এ লন্ডন কলেজ অব প্রিন্টিং থেকে প্রিন্টিং টেকনোলজিতে উচ্চতর কোর্স সম্পন্ন। ১৯৫৮-এ ঢাকাস্থ মার্কিন তথ্য সার্ভিস ও ব্রিটিশ তথ্য সার্ভিস কেন্দ্রে ফ্রিল্যান্স আর্টিস্ট ও চিত্রগ্রাহক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। কিছুদিন ফ্রাংকলিন প্রকাশনা সংস্থার প্রধান চিত্রশিল্পীর দায়িত্ব পালন। ১৯৬১-এ পূর্ব পাকিস্তান পানি উন্নয়ন বোর্ডের আর্ট ভিজুলাইজার পদে যোগদান। এবছরই পাকিস্তান সরকারের প্রথম চালুকৃত দশমিক মুদ্রার নকশা প্রণয়ন। ১৯৬৪-এ কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে ঢাকা কার্যালয়ে শিল্পী পদে এবং ১৯৬৫-এ একই দপ্তরের করাচি কার্যালয়ে উপ-পরিচালক পদে যোগদান। ১৯৭০-৭১-এ সরকারি মনোনয়নে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য লন্ডন গমন এবং পাকিস্তানের কূটনৈতিক দপ্তরে যোগদান। ১৯৭১-এ লন্ডনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ১৯৭১-এ ৭ মার্চ তাঁর ডিজাইন করা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা লন্ডনে অস্থায়ী বাংলাদেশে দূতাবাসে উত্তোলন করা হয়। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁর হাতে লেখা পত্রিকা 'বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা' প্রকাশিত। এ সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনসভা, মিছিল, সম্মেলনের প্রচ্ছদ পোস্টার অংকন। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৮ পর্যন্ত লন্ডনস্থ দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারির (শিক্ষা ও সংস্কৃতি) দায়িত্ব পালন। লন্ডনে অবস্থানকালে সমর দাসের সংগীত পরিচালনায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' অর্কেস্ট্রায়নের তত্ত্বাবধান। ১৯৭৮-এ দেশে ফিরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন নবগঠিত 'বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট এ্যান্ড আর্কাইভ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-কিউরেটর পদে যোগদান। ১৯৯২-এ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পরিচালক পদে যোগদান। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে তথ্য বিভাগের মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য চলচ্চিত্র নির্দশন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ কোর্স চালু এবং বিকল্পধারার চলচ্চিত্র আন্দোলনের ধারা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা। তাঁর আঁকা চিত্রকর্মের প্রদর্শনী হয়েছে লন্ডনসহ বিভিন্ন স্থানে। আব্বাস উদ্দীন আহমদের 'আমার শিল্পী জীবনের কথা', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র 'লালু সালু'; আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী' গ্রন্থের প্রচ্ছদসহ প্রায় তিন হাজার বইয়ের প্রচ্ছদ অংকন। ১৯৭২-এ প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের মূল হস্ত লিপিকর। পুরস্কার: একুশে পদক (২০১০)। মৃত্যু. ভারত, ১ এপ্রিল, ২০০০।

এ.কে. খান (১৯০৭-১৯৯১)॥ জন্ম. মোহরা চট্টগ্রাম, ১৯০৭। শিল্পপতি। পূর্ণনাম আবুল কাশেম খান। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অর্নাসসহ বি.এ. (১৯২৭) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বি.এল. ডিগ্রি লাভ। কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯৩৫-এ প্রাদেশিক জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্য নিযুক্ত। ১৯৩৯-এ এই পদ থেকে পদত্যাগ করে চট্টগ্রামে ব্যবসায় শুরু। কালক্রমে একজন খ্যাতনামা শিল্পপতি হিসেবে আবির্ভূত। 'এ. কে. খান শিল্পগোষ্ঠী'র প্রতিষ্ঠাতা। দেয়াশলাই ও কাঠের আসবাব পত্রে কারখানা, কাপড়ের কল ও জাহাজ ব্যবসায় এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত। ১৯৪৬-এ ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৭-১৯৫৩)। ১৯৫৮-র নভেম্বর মাসে জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের (সামরিক) শিল্প, পূর্ত, সেচ ও জ্বালানি দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৬২-র জুন মাস পর্যন্ত এ-পদে অধিষ্ঠিত। পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) তিনিই প্রথম বাঙালি শিল্পপতি। এ দেশে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন। মৃত্যু. গুলশান, ঢাকা, ৩১ মার্চ ১৯৯১।



এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া (১৯৪২-২০০৯) : ডাকনাম: সুধা মিয়া। জন্ম. ফতেপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২। পরমাণুবিজ্ঞানী; পিতা আব্দুল কাদের মিয়া এবং মাতা ময়েজুন্নেসা। গ্রামের প্রাইমারি বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণি ও পীরগঞ্জ থানার হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। ১৯৫২-এ রংপুর জেলা স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি। এ স্কুল থেকে ১৯৫৬-এ ডিসটিংকশনসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিকুলেশন পাস। ১৯৫৮-এ রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান লাভ। ১৯৬১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণিতে বি.এসসি. (অনার্স) এবং ১৯৬২-এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করে এম.এসসি. পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে পড়ার সময় থেকেই ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট হতে শুরু করেন রাজনীতির সঙ্গে । ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষে ফজলুল হক হলের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সহসভাপতি (ভিপি) নির্বাচিত। ১৯৬৩-এ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে আণবিক শক্তি কমিশনে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে যোগদান। ১৯৬৪-এ লন্ডনে ইমপেরিয়াল কলেজ থেকে ডিপ্লোমা লাভ। ১৯৬৭-এ লন্ডনের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধিলাভ। অভিসন্দর্ভ: Nuclear and Particle Physics. এবছরই ঢাকায় আণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্রে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান। ১৯৬৭-এর ১৭ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠা কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে বিয়ে। ১৯৬৯-এ ইতালির ট্রিয়েস্টের আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের এসোসিয়েটশিপ লাভ। এই সুবাদে ১৯৬৯-'৭৩ ও ১৯৮৩ সালগুলোয় ওই গবেষণা কেন্দ্রে প্রতিবার ৬ মাস ধরে গবেষণায় নিয়োজিত থাকার সম্মান লাভ। ১৯৬৯-এর নভেম্বর থেকে ১৯৭০-এর অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরের ড্যারেসবেরি নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরিতে পোস্ট ডক্টোরাল গবেষণায় নিয়োজিত ১৯৭২ ও ১৯৭৩-এর জন্য পরপর দু'বার বাংলাদেশ আণবিক শক্তি বিজ্ঞানী সংঘের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৮৩, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫-এ তিনি পরপর তিনবার ওই বিজ্ঞানী সংঘের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত চার বছর তিনি বাংলাদেশ পদার্থবিজ্ঞান সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৯৭-এ ওই বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ওই বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৯১-১৯৯২-এ বাংলাদেশ আণবিক শক্তি বিজ্ঞানী সংঘেরও সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত পরপর তিনটি দুবছরের মেয়াদকালের জন্য 'বাংলাদেশ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানজীবী সমিতি'র সভাপতি নির্বাচিত। এছাড়া ঢাকার রংপুর জেলা সমিতির আজীবন সদস্য এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত দুবছর মেয়াদকালের জন্য এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত; বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা এবং ঢাকার বৃহত্তর রংপুর কল্যাণ সমিতি; উত্তরবঙ্গ জনকল্যাণ সমিতি; রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন ফোরাম; বেগম রোকেয়া স্মৃতি সংসদ এবং রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার মির্জাপুর বছিরউদ্দিন মহাবিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭৫-এর ১২ মার্চ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির কার্লসরুয়ে শহরের 'আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে' আণবিক রিঅ্যাক্টর বিজ্ঞানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ। ১৯৭৫-এর ১ অক্টোবর থেকে ১৯৮২-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতের আণবিক শক্তি কমিশনের দিল্লির ল্যাবরেটরিতে গবেষণায় নিয়োজিত। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বিষয়ক সম্মেলনে যোগদান ও বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন। অজস্র গবেষণামূলক ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় এবং সাময়িকীতে প্রকাশিত। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ সাত বছর নির্বাসিত জীবনযাপন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও প্রকৌশলের ছাত্রদের জন্য দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাড়াও সমকালীন রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা। তিনি বাংলাদেশ



আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন এবং ১৯৯৯-এ অবসর গ্রহণ। তাঁর নামে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী শেখ হাসিনা দুইবার বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। গ্রন্থ: Funfamentals of Electr Magnetics (1982), Fundamentals of Thermodynamics (1988), Elementary Nuclear and Reactor Physics (1995), Basics of Sunperconductivity (1996), 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু কথা' (১৯৯৩), 'বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র' (১৯৯৫), 'বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান' (১৯৯৬), Some Thoughts of Science & Technology (1997)। মৃত্যু. স্কয়ার হাসপাতাল, ঢাকা, ৯ মে ২০০৯।

এম. ফজলুর রহমান (১৯১৯-১৯৬৯)॥ জন্ম শিকদারবাড়ি, তারুলি, ঝালকাঠি, ০১ জানুয়ারি ১৯১৯। পিতা ছাবেদ আলী শিকদার, মাতা করিমুননেছা, স্ত্রী মেহেরুননেছা খাতুন। প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসক। পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু। যশোর জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৩৪), ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এসসি. (১৯৩৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স (১৯৩৯), এম.এ. (১৯৪০) এবং এল.এল.বি. পাস করেন। ১৯৪৮-এ লন্ডন থেকে শিক্ষায় ডিপ্লোমা এবং এম.এ. ডিগ্রি লাভ। কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পরে ১৯৪৪-এ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ এবং ১৯৪৬-এ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৯-এ ময়মনসিংহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে উপাধ্যক্ষ এবং রাজশাহী শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ হন। এরপর খুলনা ব্রজলাল কলেজ এবং ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন। ১৯৬২-তে শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক ছিলেন। ১৯৬৩-তে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডেরও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন। ১৯৬৪-এ পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত। তখন যথাসময়ে বই সরবরাহের ব্যর্থ হওয়ায় এক ঠিকাদারের চুক্তি বাতিল করেন। ঐ ঠিকাদার গভর্নর মোনায়েম খাঁর আত্মীয় বিধায় এম. ফজলুর রহমান সরকারের রোষানলে পড়েন। তাঁকে ওএসডি করা হয়। পরে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য করা হয়। এই বদলি মেনে নিতে না পারায় তিনি মানসিক চাপে পড়েন এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হন। লন্ডনে চিকিৎকালে মৃত্যুবরণ করেন। রচিত গ্রন্থ: দেশবিদেশের শিক্ষা ১মখণ্ড (১৯৫২),আমাদের ছেলেমেয়ে (১৯৫৩)। মৃত্যু. লন্ডন, ৩১ নভেম্বর ১৯৬৯।



এন. এ. এম. ফয়জুল মহী (১৯৩৯-১৯৭১)॥ জন্ম. ফেনী, ১০ আগস্ট ১৯৩৯। শিক্ষাবিদ। ফেনী সরকারি হাইস্কুল থেকে ১৯৫৫-তে মেট্রিক, ফেনী কলেজ থেকে ১৯৫৭-তে আই.এ. ও ১৯৫৯-এ বি.এ. পাস। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ১৯৬২-তে বি.এড. এবং যুক্তরাষ্ট্রের নর্দার্ন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫-তে এম.এ. ও ১৯৬৮-তে ডক্টর অব এডুকেশন ডিগ্রি লাভ। ১৯৬২-১৯৬৫ পর্যন্ত ফেনী জি.এ. একাডেমি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ১৯৬৮-র ২৫ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিল্পকলা বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ঐ বছর ১১ ডিসেম্বর সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত। ফয়জুল মহী ছিলেন কৃতী ও ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। খেলাধূলা, সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি অনুরাগী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন সমর্থক। মুক্তিযোদ্ধাদের ও পাকিস্তানি বাহিনী-কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত অনেক পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দান। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর পাক-সৈন্যদের সহযোগী আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাস থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং ঢাকার মীরপুর বধ্যভূমিতে হত্যা করে।



এনায়েত করিম (১৯২৭-১৯৭৪)॥ জন্ম. জিঞ্জিরা, ঢাকা, ১৯২৭। কূটনীতিবিদ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৪৩-এ মেট্রিক (প্রথম বিভাগে প্রথম), ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৪৫-এ আই.এসসি. (প্রথম বিভাগে দ্বিতীয়), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৮-এ অর্থনীতিতে বি.এ. অনার্স (প্রথম শ্রেণিতে প্রথম) এবং ১৯৪৯-এ অর্থনীতিতে এম.এ. (দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম) পাস। পরবর্তীকালে চাকরি জীবনে 'লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস'-এ এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'ফ্লেচার স্কুল অব ল অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসিতে কূটনীতিবিদ্যায় শিক্ষা লাভ। পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ (৪ জানুয়ারি ১৯৪৮)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৪৮-এর ১১ মার্চের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৪৯-এ ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং কারাবরণ। ১৯৫০-১৯৫২-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে বাণিজ্য বিভাগে, পরে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা। ১৯৫৩-তে পররাষ্ট্র দফতরে চাকরিতে যোগদান। লন্ডন, কলকাতা, তেহরান ও বার্মায় পাকিস্তানি দূতাবাসের কাউন্সিলর, পররাষ্ট্র বিভাগের ভারত-সংক্রান্ত শাখার ডিরেক্টর এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিশনের ডেপুটি চিফ। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সমর্থনে সাড়া দিয়ে ১৯৭১-এর ৪ আগস্ট প্রকাশ্যে ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন। যুদ্ধকালীন সময়ে সে-দেশের বাংলাদেশ মিশনের প্রধান কর্মকর্তা। স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের চার্জ দ্য এফেয়ার্স নিযুক্ত। ১৯৭৩-এর ২৯ আগস্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব নিযুক্ত। মৃত্যু. ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪।



এন্টনি ফিরিঙ্গী (১৭৭০-১৮৩৬)॥ জন্ম. শ্যামনগর, কলকাতা, ১৭৭০। কবিয়াল। প্রকৃত নাম হেন্সম্যান এন্টনি। কবিগানের গায়ক হিসেবে এন্টনি ফিরিঙ্গী নামে সুপরিচিত। পর্তুগিজ। পশ্চিম-বাংলার ফরাসডাঙ্গা চন্দননগরে তাঁর জন্মস্থান না প্রথম আবাস সে সম্পর্কে বিতর্ক আছে। জন্মসূত্রে খ্রিস্টান হলেও আচারে-পোশাকে বাঙালি হিন্দুর জীবনযাপন। এক হিন্দু বিধবার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। প্রথমে তাঁর গানের বাঙালি বাঁধনদার ছিলেন গোরক্ষনাথ পরে নিজেই বাঁধতেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গান 'আমি ভজন সাধন জানিনে মা/নিজে ত ফিরিঙ্গী/যদি দয়া করে কৃপা কর,/হে শিবে মাতঙ্গী'। কলকাতা বউবাজার অঞ্চলে অবস্থিত 'ফিরিঙ্গী কালীর মন্দির'-এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এটি এন্টনি কবিয়ালের প্রতিষ্ঠিত বলে মত প্রচলিত। মৃত্যু. ১৮৩৬।

এফ. আর. খান, ডক্টর (১৯২৯-১৯৮২)॥ জন্ম. ঢাকা, ৩ এপ্রিল ১৯২৯। পৈতৃক নিবাস ভাণ্ডারীকান্দি গ্রাম, শিবচর, মাদারীপুর। স্থপতি। পুরোনাম ফজলুর রহমান খান। পিতা শিক্ষাবিদ খানবাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ। ১৯৪৪-এ আরমানিটোলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি। ফাইনাল পরীক্ষায় কয়েকটি পত্র দেবার পর পঞ্চাশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে ঢাকা আগমন। ঢাকার আহছানউল্লাহ্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে বাকি পত্রগুলোর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ। শর্ত ছিল কলকাতার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার নম্বর পাঠালে ফলাফল নির্ধারন করা হবে। তাঁর সার্টিফেকেটে লেখা আছে, B. E. Special. Calcutta Syllabus। প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৫২-তে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভের জন্য আমেরিকা গমন। 'ইলিনয়স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি'-তে অধ্যয়ন। একই সঙ্গে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেকানিক্স-এ এম. এস. করেন। ডক্টরেট উপাধিলাভের পর ১৯৫৬-তে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং তদানীন্তন সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ। পরে আমেরিকার আরকিটেকচারাল ফার্ম স্কিড মোর-এর আহ্বানে যুক্তরাষ্ট্রে গমন এবং এই



কোম্পানির শিকাগো অফিসের পরিচালক নিযুক্ত। উপরন্তু আমেরিকা আই.আই.টি. (ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি)-র স্থাপত্যকলার অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত। আমেরিকা এমিরিটাস প্রফেসর। বিশ্বের উচ্চতম গগনচুম্বী সিয়ারস টাওয়ার (Sears Tower)-এর নকশা প্রণয়নকারী। ১৯৭২-এ 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ রেকর্ড'-এ 'ম্যান অব দি ইয়ার' বলে আখ্যায়িত। পাঁচবার এই গৌরব লাভ। ১৯৭৪-এ আমেরিকার 'নিউজ উইক' ম্যাগাজিন শিল্প ও স্থাপত্যের ওপর প্রচ্ছদ কাহিনীতে তাঁকে মার্কিন স্থাপত্যের শীর্ষে (Man of the Top) অবস্থানকারী ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করে। আন্তর্জাতিক গগনচুম্বী ভবন ও নগরায়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। অন্যান্য অবদানের মধ্যে রয়েছে জন হ্যানকর সেন্টার (১০০ তলা), জেদ্দা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, হজ টার্মিনালের পঞ্চাশ হাজার বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট বৃহত্তম ছাদ কাঠামো এবং মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য মডেল অঙ্কন। নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, লি হাই বিশ্ববিদ্যালয় ও সুইস ফেডারেল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৭৩ ও ১৯৮০-তে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিলাভ। Studies in Islamic Architect-এর উপদেষ্টা। মুসলিম স্থাপত্য নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা করেছেন। Tube in Tube নামে স্থাপত্য শিল্পের এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন। এই পদ্ধতির দ্বারা অতি উচ্চ (কমপক্ষে একশত তলা) ভবন স্বল্প খরচে নির্মাণ করা সম্ভব। গগনচুম্বী ভবনের ওপর সাত খণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকের সম্পাদনা। একজন ক্ষণজন্মা বাঙালি। স্থাপত্য শিল্পে তাঁর মেধা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রবাসে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন। সমরাস্ত্র ক্রয়ের জন্য স্বাধীন বাংলা সরকারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। মৃত্যু. জেদ্দা, ২৬ মার্চ ১৯৮২।

এম. আর. আখতার মুকুল (১৯৩০-২০০৪)॥ জন্ম. চিংগাশপুর, মহাস্থানগড়, বগুড়া, ৯ আগস্ট ১৯৩০। মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের চরমপত্রের পরিচালক, লেখক ও কথক। দিনাজপুর মহারাজা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস (১৯৪৫) করেন। দিনাজপুর রিপন কলেজ থেকে আই.এ. পাস (১৯৪৭)। ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় তিনি ১৯৪৮-এ জননিরাপত্তা আইনে কারাবরণ এবং



১৯৪৯-এ জেলখানা থেকে সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে স্নাতক পাস। ১৯৫০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ক্লাসে ভর্তি এবং ১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। ১৯৫২-এর ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২টার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বৈঠকের সময় যে ১১ জন ছাত্র নেতা উপস্থিত হন তাদের মধ্যে অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান। সাপ্তাহিক 'নও বেলাল', 'পাকিস্তান টুডে', দৈনিক আমার দেশ ও দৈনিক সংবাদ প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯৫৩-এর ২৫শে ডিসেম্বর ইত্তেফাকের জন্মলগ্ন থেকে ১৯৬০-এর জুলাই পর্যন্ত এই পত্রিকায় রিপোর্টার। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১-এর এপ্রিল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ইউপিআই-এর ঢাকাস্থ সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন। একই সঙ্গে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দৈনিক পত্রিকায় এবং পরে দৈনিক পূর্বদেশের রিপোর্টার। ১৯৭১-এ প্রবাসী সরকারে যোগদান। তথ্য ও প্রচার দপ্তরের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭২-এর জুলাই মাসে তিনি বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক। ১৯৭৫-এর ১লা জানুয়ারি লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেস কাউন্সিলর হিসেবে যোগদান। ১৯৭৯-এর শেষের দিকে দেশে ফিরে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব হিসেবে যোগদান। ১৯৮৭-এর আগস্ট মাসে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের চরমপত্রের পরিচালক, লেখক ও কথক। 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। পুরস্কার: স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (২০০১) লাভ করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'চল্লিশ থেকে' ৭১', 'একুশের দলিল', 'শতাব্দীর কান্নাহাসি', 'আমি বিজয় দেখেছি'। মৃত্যু. ঢাকা, ২৭ জুন ২০০৪।

এম. আর. সিদ্দিকী (১৯২৬-১৯৯২)॥ জন্ম. সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম, ১ মার্চ ১৯২৬। রাজনীতিবিদ, পূর্ণনাম মোস্তাফিজুর রহমান

সিদ্দিকী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. কম. পাস (১৯৪৭)।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যের প্রভাষক নিযুক্ত (১৯৪৮)। ১৯৫৫-তে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট পাস। দেশে প্রত্যাবর্তন করে মেসার্স জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানিতে চিফ অ্যাকাউনটেন্ট পদে যোগদান। ১৯৫৮-তে এ. কে. খান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে ফাইন্যান্স ডিরেক্টর পদে চাকরি লাভ। ইস্টার্ন ইন্সুরেন্স কোম্পানি ও ইস্টার্ন লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং ডিরেক্টর। চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতির সদস্য এবং চট্টগ্রাম রেডক্রস সমিতির সহ-সভাপতি। ১৯৬২-র ২৭ এপ্রিল স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৪তে আওয়ামী লীগে যোগদান। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি (১৯৬৪-১৯৭২) ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সীতাকুণ্ড এলাকা থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে 'কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' (২৬ মার্চ ১৯৭১) প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ত্রিপুরা সেক্টরে যুব ক্যাম্প ও মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং ক্যাম্প সংগঠিত। আগস্ট (১৯৭১) মাসে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান (১৯৭১)। জাতিসংঘে প্রেরিত মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী নিযুক্ত (১৯ জানুয়ারি ১৯৭২)। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ সংসদ সদস্য নির্বাচিত। আওয়ামী লীগের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কর্মসূচির বিরোধিতা করলে দল থেকে বহিষ্কার (১৯৮০)। বিশিষ্ট শিল্পপতি। বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতির নির্বাচিত সভাপতি। (১৯৮৪-১৯৮৬)। বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে খ্যাত। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন মৃত্যু. ঢাকা ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।

এম. এ. আজম (১৯০৮-১৯৭৪) জন্ম. শকরা গ্রাম, লাকসাম কুমিল্লা, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮। পুরো নাম মোহাম্মদ আলী আজম। লেখক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এসসি. ডিগ্রি লাভ। উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি বৃত্তি নিয়ে ১৯৪১-এ আমেরিকা গমন। কলকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনা, (সাবেক) পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ (১৯৪৭), ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভের ডিরেক্টর, টেরিফ কমিশনের সদস্য আই.এল.ও-র শিল্প বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য, শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার কমিটির উপদেষ্টা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ১৯৩৫-এ বঙ্গ সাহিত্য মহামণ্ডল-কর্তৃক 'সাহিত্য বিশারদ' উপাধি লাভ। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই লেখার দক্ষতা অর্জন। ১৯৪৯-এ Royal Society of Arts (London) কর্তৃক ফেলো নিযুক্ত। বিদেশি পত্রিকায় রচনাদি প্রকাশিত। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ও আমেরিকা বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি-রূপক নাটক: This Century and After (১৯৫৫)। অনুবাদ: এই শতাব্দী ও তারপর (১৯৬০), বিশ্বনবীর দেশ (১৯৫৭)। উপন্যাস: সত্যের সৈনিক (১৯৬৬)। মৃত্যু. ৩০ জুলাই ১৯৭৪।

এম.এ. রশিদ (১৯১৯-১৯৮১)॥ জন্ম. বগাডুবি



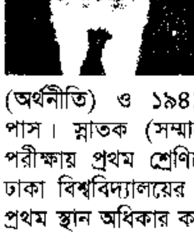
গ্রাম হবিগঞ্জ, সিলেট, ১৬ জানুয়ারি ১৯১৯। শিক্ষাবিদ। হবেগঞ্জ হাইস্কুল থেকে ১৯৩৬-এ মেট্রিক, সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে ১৯৩৮-এ আই.এসসি. ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ১৯৪২-এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি.ই. (প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান) পাস। ১৯৪৫-১৯৪৮ পর্যন্ত ভারত সরকারের বৃত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে কারিগরি বিদ্যায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ। উক্ত টেকনোলজি ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৪৭-এ মাস্টার অব সায়েন্স ইন সিভিল

ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৪৮-এ ডক্টর অব সায়েন্স ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ। ১৯৪২-১৯৪৫ পর্যন্ত আসাম সরকারের গণপূর্ত বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার। ১৯৪৮-এর ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯৪৯-১৯৫৪ পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধান। ১৯৫২-তে অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৫৪-র ১৮ সেপ্টেম্বর আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম বাঙালি হিসেবে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্তি। ১৯৫৮-র ২৩ ডিসেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য নিযুক্ত। ঐ কমিশনের প্রকৌশল শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রণয়নে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে ঢাকায় একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি প্রজেক্ট কমিটির সদস্য মনোনীত। ১৯৬১-র ১১ ডিসেম্বর নব-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পদে যোগদান। ১৯৬৬-১৯৬৮ পর্যন্ত ব্যাঙ্ককস্থ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ট্রাস্টি, ১৯৬৮-তে পাকিস্তান সরকারের জনশক্তি ও শিক্ষা কমিশনের সদস্য, ১৯৭০-এ জাতীয় পরীক্ষা কমিশনের সদস্য ১৯৭০-১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, ১৯৭১-এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিশনের সদস্য, ১৯৭২-এ বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বেতন কমিশনের সদস্য, ১৯৭৩-এ শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য। ১৯৭৫-১৯৭৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। মন্ত্রীর পদমর্যাদায় পূর্ত ও নগর উন্নয়ন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন। ১৯৮১-তে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক (ব্যক্তিগত চেয়ারে), বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির সভাপতি। কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন এবং ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিকীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। মৃত্যু. ৬ নভেম্বর ১৯৮১।

এম.এ. হক, কবিরত্ন (১৯২৯-২০০৬)ঃ জন্ম, ব্যাংকেরচর গ্রাম, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর, ১ জানুয়ারি ১৯২৯। সাহিত্যিক, সমাজসেবক। কামারগ্রাম কাঞ্চন একাডেমি থেকে ১৯৪৭-এ এন্ট্রান্স, খুলনা বি.এল. কলেজ থেকে ১৯৪৯-এ আই.এ. পাস। স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ। একাধিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। বহুবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং গুণিজন হিসাবে সংবর্ধিত। রচিত গ্রন্থঃ 'শুকতারা', 'পথদিশারী', 'এপার-ওপার', 'কচি মনের খোরাক', 'দরদে নবী', 'হক-বচন', 'ছন্দ-বন্ধ-বাগধারা', 'দেশের গান', 'দাদুর ছড়া', 'স্মৃতি-কথা', 'কাঙ্গাল পথিক', 'মুক্তির গান'। 'এপার-ওপার' গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পড়ে জসীমউদ্‌দীন এবং সুফী মোতাহের হোসেন মুগ্ধ হন এবং ভূয়সী প্রসংশা করে গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দেন। 'কচি মনের খোরাক' পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক স্কুল-পর্যায়ে দ্রুতপঠন হিসাবে যশোর শিক্ষাবোর্ডে পাঠ্য ছিল। মৃত্যু. ১৩ আগস্ট ২০০৬।



এম. এন. হুদা (১৯১৯-১৯৯১) জন্ম, জাঙ্গলিয়া গ্রাম, টাঙ্গাইল, ১ আগস্ট ১৯১৯। অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, মন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতি। পূর্ণনাম মীর্জা নূরুল হুদা। এক নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪০-এ বি.এ. অনার্স (অর্থনীতি) ও ১৯৪১-এ এম.এ. (অর্থনীতি) পাস। স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স গ্রাজুয়েটদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে রাজা কালীনারায়ণ বৃত্তি লাভ। ১৯৪৯-এ নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি অর্থনীতিতে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের রিডার নিযুক্ত। পরে অধ্যাপক পদে উন্নীত। পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (১৯৬২-১৯৬৫), পাকিস্তান অর্থনীতি সমিতির সভাপতি (১৯৬৫), পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী (১৯৬৫-১৯৬৯) এবং মুসলিম লীগ (কনভেনশন)-এর পূর্ব-পাকিস্তান কমিটির কোষাধ্যক্ষ (১৯৬৫-১৯৬৯)।



১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণ-আন্দোলনের চাপে আবদুল মোনেম খান পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত হলে (২২ মার্চ ১৯৬৯) এম.এন. হুদা গভর্নর নিযুক্ত হন (২৩ মার্চ ১৯৬৯)। (২৫ মার্চ (১৯৬৯) সারা পাকিস্তানব্যাপী সামরিক আইন জারি করা হলে এ পদ থেকে অব্যাহতি লাভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপনায় পুনরায় যোগদান। ১৯৭৫-এর ২৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মুহম্মদ সায়েমের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত। মন্ত্রীর পদমর্যাদায় পরিকল্পনা, শিল্প ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন। ১৯৭৯-তে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৮১-র ২৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত। ১৯৮২-র ২৩ মার্চ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং এই শোষণ বন্ধ করার লক্ষ্যে 'দুই অর্থনীতির' দাবি উত্থাপন (১৯৬২-১৯৬৪)। এই দুঃসাহসী ভূমিকা পালনের জন্য বাঙালিদের কাছ থেকে প্রচুর খ্যাতি অর্জন। পরে মত পরিবর্তন এবং আপসকামী ভূমিকা গ্রহণ করলে (১৯৬৪) পাকিস্তানিত শাসকদের কাছ থেকে মন্ত্রিত্ব লাভ (১৯৬৫)। মৃত্যু, ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৯১।

এম. ফাতেমা খানম (১৮৯৪-১৯৫৭)॥ জন্ম. তসবিভাঙ্গা গ্রাম, মানিকগঞ্জ, ১৮৯৪। রেলওয়ের পুলিশ ইন্সপেক্টর রইসউদ্দীন আহমদ তাঁর পিতা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পান নি। শৈশবে পিতৃগৃহে গৃহশিক্ষকের নিকটে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ। উত্তরকালে নিজের সাধনায় বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, আরবি, ফারসি ও হিন্দি ভাষা আয়ত্ত। এগারো বছর বয়সে মানিকগঞ্জের গড়পাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত পির পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়। ফাতেমা খানমের স্বামী আতোয়ার রহমানের পেশা ছিল ডাক্তারি হলেও পির প্রথার প্রতি তাঁর অধিক আকর্ষণ ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে পিরালি গ্রহণ করেন। পরিবারের ঐতিহ্যানুসারে আতোয়ার রহমান নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার বিরোধী হওয়ায় ফাতেমা খানমের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়। ১৯২০-এ তিনি সন্তান-সন্ততিসহ স্বামীগৃহ ত্যাগ করে ঢাকায় উর্দু রোডে বসবাস। 'আগা নবাবদেউড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে' শিক্ষয়িত্রীর চাকরি গ্রহণ। পরে পোস্তা গার্লস স্কুলে বদলি। ১৯২৬ পর্যন্ত এ স্কুলে শিক্ষকতা। কলকাতায় মুসলিম ট্রেনিং স্কুলে সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত। এখানে দুই মাস শিক্ষকতা করার পর বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে যোগদান। বেগম রোকেয়ার সঙ্গে মুসলিম নারীসমাজের মুক্তি-আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৩৪-এ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। এরপর দুই দশকেরও বেশি সময় জীবিত ছিলেন। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস। সৃজনশীল লেখিকা হিসেবে তাঁর প্রতিভা বিকশিত হবার সময়েই রোগাক্রান্ত হন। বাকি জীবনে আর সাহিত্যচর্চা ও সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর একমাত্র গল্প সংকলন 'সপ্তর্ষি' (১৯৬৪) প্রকাশিত। রক্ষণশীল সমাজ-পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করলেও তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত মানুষ। মৃত্যু. ঢাকা. ১ জুলাই, ১৯৫৭।



এম. মনসুর আলী, ক্যাপ্টেন (১৯১৯-১৯৭৫)॥ জন্ম. কুড়িপাড়া গ্রাম, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ, ১৯১৯। রাজনীতিবিদ। সিরাজগঞ্জ বি.এল. স্কুল থেকে মেট্রিক, পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজ থেকে আই.এ. কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৪১) এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. (১৯৪৫) ও ল' পাস। পাবনা বার-এ আইন ব্যবসায় যোগদান। পাবনা আইনজীবী সমিতির পর পর তিনবার নির্বাচিত সভাপতি। ১৯৪৬-১৯৫০ পর্যন্ত পাবনা জিলা মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি। একই সঙ্গে লীগের গার্ড বাহিনীর পাবনা জেলা শাখার ক্যাপ্টেন। সে সময় থেকে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী



নামে পরিচিত। ১৯৫১-তে আওয়ামী লীগে যোগদান ১৯৫৩-১৯৬৬ ও ১৯৭২-১৯৭৫ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারি মাসের ভাষা-আন্দোলনে পাবনায় নেতৃত্ব প্রদান এবং কারা নির্যাতন ভোগ। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন পূর্ববঙ্গ আইনসভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৬-র ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ-কংগ্রেস দলীয় পূর্ববঙ্গ কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত। আইন ও সংসদ-বিষয়ক মন্ত্রী (সেপ্টেম্বর ১৯৫৬-মার্চ ১৯৫৭), খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী (মার্চ ১৯৫৭-মার্চ ১৯৫৮) এবং বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী (মার্চ ১৯৫৮-অক্টোবর ১৯৫৮)। ১৯৫৮-তে সামরিক জান্তা-কর্তৃক নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার। ১৯৫৯-এর শেষের দিকে মুক্তিলাভ। ১৯৬৭-র ১২ নভেম্বর আওয়ামী লীগের অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। ১৯৭০-এর ১৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে পাবনা ১ আসন থেকে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত। বাংলাদেশ স্বাধীনস হবার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর অর্থ, শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু সরকারের পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভায় যোগাযোগ মন্ত্রী (১২ জানুয়ারি ১৯৭২-৭ জুলাই ১৯৭৪) এবং স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রী (৮ জুলাই ১৯৭৪-২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫)। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ পাবনা-১ আসন থকে পুনরায় জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭০ ও ১৯৭৩-এর জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য। ১৯৭৫-এর জানুয়ারি দেশে সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে এক দলীয় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত। ২৪ ফ্রেব্রুয়ারি (১৯৭৫) কৃষকশ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠিত হলে সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত। ১৫ আগস্ট (১৯৭৫) সামরিক বাহিনীর একটি দলের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে আত্মগোপন। ২৩ আগস্ট মোশতাক সরকার-কর্তৃক গ্রেফতার। জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় কারাগারের প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে প্রবেশকারী সশস্ত্রবাহিনীর কতিপয় ব্যক্তির হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত। বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। ষাটের দশকের ৬-দফাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম রূপকার। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু. কেন্দ্রীয় কারাগারে, ঢাকা, ৩ নভেম্বর ১৯৭৫।

এম. সাইফুর রহমান (১৯৩২-২০০০)॥ জন্ম মৌলভীবাজার, ১৯৩২। রাজনীতিবিদ, চার্টার্ড একাউনটেন্ট, মন্ত্রী। পিতা আব্দুল বাছিত। ১৯৪৯-এ মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে লেটার মার্কস পেয়ে মেট্রিক, ১৯৫১-এ সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯৫৩-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ। ১৯৫২-এ ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং কারাবরণ করেন। তিনি ১৯৫৩-এর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য লন্ডনে যান এবং ১৯৫৮-এ চাটার্ড একাউটেন্সি ডিগ্রি লাভ। ১৯৬৯-এ তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় বেতন কমিশনে প্রাইভেট সেক্টর থেকে একমাত্র সদস্য মনোনীত। ১৯৭৩ ও ১৯৭৫-এ বাংলাদেশ জাতীয় বেতন কমিশনের সদস্য। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য ও অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। ১৯৭৯-এ তিনি মৌলভীবাজার সদর আসন থেকে প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদ সদস্য মনোনীত হন। ১৯৯১-৯৬ মেয়াদে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সময় মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) প্রথা চালু। পরবর্তীকালে ১৯৯৬-এ সিলেট-৪ (জৈন্তা-গোয়াইনঘাট) ও মৌলভীবাজার-৩ আসন থেকে, ২০০১-এ সিলেট-১ ও মৌলভীবাজার-৩ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত। একই সময় তিনি অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪-৯৫-এ এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের ভাইস-চেয়ারম্যান, ১৯৮০-৮২ ও ১৯৯১-৯৫ সময়কালে তিনি বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামী উন্নয়ন ও ইফাড-এর বাংলাদেশ গর্ভনরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯-এ রাষ্ট্রপতির বিশেষ দূত হিসেবে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও



পাকিস্তান সফর করেন। ১৯৯৫-এ কলম্বিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে এবং একই বছর বসনিয়ায় অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনেও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। মৃত্যু. সিলেট যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু, ৫ সেপ্টেম্বার ২০০৯।

এস.এম. আলী (১৯২৮-১৯৯৩)॥ জন্ম. মৌলভীবাজার, সিলেট, ৮ ডিসেম্বর, ১৯২৮। পূর্ণনাম সৈয়দ মোহাম্মদ আলী। সাংবাদিক ও সম্পাদক। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মোস্তফা আলী তাঁর পিতা। বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর



পিতৃব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১-তে বি.এ. অনার্স (ইংরেজি) ও একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২-তে এম.এ. (ইংরেজি) ডিগ্রি লাভ। ছাত্রজীবনে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনপুষ্ট ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিতি লাভ। ১৯৪৮-এর রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে, ১৯৪৯-এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মঘটী চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সমর্থনে পরিচালিত ছাত্র আন্দোলনে, ১৯৫০-এর সংবিধানের মূলনীতি সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এবং ১৯৫২-র মহান রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। পাকিস্তান অবজারভার (১৯৪৯)-এর স্টাফ রিপোর্টার নিযুক্ত। ১৯৫২-র শেষের দিকে করাচির 'ডন' পত্রিকায় সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার পদে যোগদান। সেখান থেকে লন্ডন গমন। বিবিসি ও নিউজ ক্রনিকলে চাকরি গ্রহণ। ১৯৫৪-তে দেশে ফিরে আবার পাকিস্তান অবজারভার (পরে বাংলাদেশ অবজারভার)-এ সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে যোগদান। ১৯৫৮-১৯৬০ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। ১৯৬০-এর শেষের দিকে লাহোরের পাকিস্তান। টাইমস-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত। ষাটের দশকের মাঝামাঝি এশিয়া ম্যাগাজিন-এর সহকারী সম্পাদক এবং করাচির ডন-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ব্যুরোর প্রধান পদে নিযুক্তি লাভ। এ সময়ে ব্যাংককের ব্যাংকক পোস্ট দৈনিকের ম্যানেজিং এডিটরের দায়িত্ব পালন। পরবর্তী সময়ে সিঙ্গপুরের নিউনেশন পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ বৈদেশিক সম্পাদক এবং হংকং-এর হংকং স্টান্ডার্ড পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে কর্ম সম্পাদন ১৯৭৭-এ ম্যানিলাভিত্তিক প্রেস ফাউন্ডেশন অফ এশিয়ার নির্বাহী পরিচালক নিযুক্ত। ১৯৮১-তে কুয়ালালামপুরে (মালয়েশিয়া) ইউনেস্কোর রিজিওনাল কমিউনিকেশন অ্যাডভাইজার ফর এশিয়া পদে নিযুক্ত লাভ। এ পদ থেকে ১৯৮৮-তে অবসর গ্রহণ। ঢাকায় ফিরে এসে ১৯৮৯-তে বাংলাদেশ অবজারভার-এর সম্পাদকের পদে যোগদান। কিছুদিন পর এ পদ থেকে পদত্যাগ করে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ। ১৯৯১-র ১৪ জানুয়ারি তাঁর সম্পাদনায় 'দি ডেইলি স্টার' প্রকাশিত। সাংবাদিকতায় দেশে ও বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। সুবক্তা হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। মৃত্যু. ব্যাংকক, ক্যান্সার রোগে, ১৭ অক্টোবর, ১৯৯৩।

এস.এম. পারভেজ (১৯৩১-১৯৭৯)॥ জন্ম. ঢাকা শহর, ১৯৭৯। সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক। ১৯৫২-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থকে বি.এ. পাস করে পাকিস্তান অবজারভার-এর ফিচার সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিক জীবন শুরু। চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক 'চিত্রালীর



প্রতিষ্ঠাতা এবং আজীবন সম্পাদক। 'মাটির পাহাড়' নামক বাংলা ছবির প্রযোজনা। পরবর্তী সময়ে 'কারওয়া'ও বেগানা' নামে দুটি উর্দু ছবি পরিচালনা। শিশু-কিশোর সংগঠন চাঁদের হাটের প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা। চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি-র (বাচসাস) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আমৃত্যু এ সমিতির সভাপতি। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রথা চালুর অন্যতম উদ্যোক্তা। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার কমিটি, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আর্কাইভ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কমিটির সদস্য। 'নিউওয়েভ' ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'উত্তরণের' প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি। পাকিস্তান ফিল্ম ইন্সটিটিউট-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৬৪-তে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের

বিচারক মণ্ডলীর সদস্য। ১৯৭৬-১৯৭৮ পর্যন্ত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার কমিটির বিচারকমণ্ডলীর সদস্য। এস. এম. পারভেজ ছিলেন চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ। মৃত্যু. লন্ডন, ২ এপ্রিল ১৯৭৯।

এস.এম. ফজলুল হক (?-১৯৭১)॥ জন্ম. মোহনপুর গ্রাম নওগাঁ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এম.এসসি. ডিগ্রি লাভ। রাজশাহী সরকারি কলেজের গণিত বিভাগের প্রভাষক। তাঁর চেষ্টায় পার্শ্ববর্তী হাপানিয়া গ্রামে একটি উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ২৫ এপ্রিল পাকিস্তানি সেবাবাহিনীর সদস্যরা তাঁকে গ্রামের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে।

এস.এম. সুলতান (১৯২৪-১৯৯৪)॥ জন্ম. মাসিমদিয়া গ্রাম, নড়াইল, ১৯২৪। চিত্রশিল্পী। পিতা- মেছের ধাউড়িয়া। পিতৃদত্ত নাম লাল মিয়া। এক নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম। পিতার পেশা ছিল রাজমিস্ত্রিগিরি। পাঁচ বছর বয়সে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি। দারিদ্র্যের কারণে কৈশোরে স্কুলের পাঠ ত্যাগ করে পিতার রাজ মিস্ত্রি কাজের জোগানদার হিসেবে নিয়োজিত। এ সময়ে নিজে নিজেই ছবি আঁকতে শেখেন। কাঠ-কয়লা, কাঁচা হলুদ ও পুঁই গাছের ফলের রস দিয়ে ছবি আঁকতেন। এ-সকল ছবি স্থানীয় জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের দৃষ্টিতে পড়ে। পুরস্কারস্বরূপ তিনি লালমিয়াকে ছবি আঁকার কিছু রং কিনে দেন এবং স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। স্কুলের ছাত্র থাকাকালে বিখ্যাত রাজনীতিক ও শিক্ষাবিদ শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি এঁকে খ্যাতি লাভ। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাস করার পূর্বে লালমিয়া বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে যান। ধীরেন্দ্রনাথের পত্র নিয়ে তিনি কলকাতায় শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করেন। শাহেদ সোহরাওয়ার্দী লাল মিয়াকে নিজ গৃহে আশ্রয় দেন এবং তাঁর নাম রাখেন শেখ মুহম্মদ সুলতান (এস. এম. সুলতান)। শাহেদ সোহরাওয়ার্দী সুলতানকে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। এই খেয়ালি শিল্পী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আ[illegible] ছিল



বছর পরেই আর্ট স্কুল ত্যাগ করে ভবঘুরে জীবন শুরু। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) কাল। পাঁচ-দশ টাকার বিনিময়ে গোরা সৈন্যদের ছবি আঁকতেন, আর ভারতের শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতেন। ভারত বিভাগের (১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে পাকিস্তানে আগমন (১৯৫১)। লাহোরে বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক মাওলানা মাশরেকীর স্নেহলাভ এবং তাঁর অনুপ্রেরণায় খাকসার পার্টির সদস্য হন। বেশ কিছুকাল লাহোরের খাকসার ক্যাম্পে অবস্থান। করাচি আর্ট স্কুলে দুই বছর শিক্ষকতা। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শহর ভ্রমণ। সে-সব স্থানে ছবি এঁকে খ্যাতি অর্জন। ১৯৫৫-তে দেশে ফিরে এসে চিত্রা নদীর তীরে জন্মভূমি নড়াইলের মাসিমদিয়া গ্রামে স্থায়ী আবাস স্থাপন। যুগ প্রবর্তক চিত্রশিল্পী। কৃষক, জেলে, কামার, কুমোর তথা পল্লীর শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা, সংগ্রাম, সমস্যা-সংকট তাঁর চিত্রের ক্যানভাসে উদ্ভাসিত। চিত্রের অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে খড়ের ঘর, খালবিল, গাছপালা, সনাতন চাষের উপকরণ মাছ ধরার গ্রামীণ সরঞ্জাম, সংগ্রামের প্রতীক ঢাল, সড়কি, রামদা, বল্লম লাঠি। সুলতানের তুলিতে বাংলার কৃষক-কৃষাণী অঙ্কিত হয়েছে বীর হিসেবে। তাঁদের এঁকেছেন পেশিবহুল শক্তিশালী নর-নারী রূপে। কৃষক সমাজকে বলবান হিসেবে অঙ্কন করে চিত্রকলায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন। অকৃতদার এস এম, সুলতান ছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ, সংসার বিরাগী ও কৃষ্ণ-অনুরাগী। মৃত্যু. ১০ অক্টোবর ১৯৯৪।

এস. ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১)॥ জন্ম. বড়তাজপুর গ্রাম, শ্রীরামপুর, হুগলি, ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯০। সাহিত্যিক। পিতা শেখ বেলায়েত আলী ছিলেন শিলং (আসাম)-এর একজন ব্যবসায়ী। বড়তাজপুর পাঠশালায় শিক্ষাজীবন শুরু। ১৮৯৮-তে শিলং গমন। সেখানে মোখার হাইস্কুলে ভর্তি। এ স্কুল থেকে ১৯০৬-এ স্বর্ণপদক পেয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আলীগড় কলেজ থেকে ১৯০৮-এ আই.এ. এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১০-এ বি.এ. পাস। ১৯১২-তে আইন



অধ্যায়নের জন্য ইংল্যান্ড গমন। ১৯১৫-তে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ও বার অ্যাট-ল ডিগ্রি লাভের পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগদান। ১৯১৯-এ Bulletin of the Indian Rationalistic Society নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা। ১৯২৩-এ কলকাতা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত। ১৯২৫-এ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি নির্বাচিত। ১৯২৯-এর ১৫ ডিসেম্বর কলকাতা এলবার্ট হলে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে যে জাতীয় সংবর্ধনা দেয়া হয় সেই সংবর্ধনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন। সেই সংবর্ধনা সভায় অভিনন্দনপত্র পাঠ। মাসিক সাহিত্য পত্রিকা গুলিস্তাঁ (১৯২৫) প্রকাশ ও সম্পাদনা। ১৯৪৫-এর ৩১ অক্টোবর কলকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে অবসর গ্রহণ। পুনরায় আইন ব্যবসায় শুরু। সাত বছর বয়সে আড়াই বছর বয়স্কা পিতৃব্য-কন্যা আয়েশা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। লন্ডনে প্রবাসকালে নেলী নামের এক ইংরেজ-কন্যার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর আয়েশার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ (১৯১৫)। মিসেস নেলী কর্তৃক স্বামী এস. ওয়াজেদ আলিকে পরিত্যাগ (১৯২৮)। নেলীর সঙ্গে এস. শমশের আলীর (এস. ওয়াজেদ আলির ছোট ভাই) বিবাহ। ওয়াজেদ আলির এক বার্মিজ-কন্যার পাণিগ্রহণ (১৯২৯)। এ স্ত্রী ধর্মান্তরিত নাম বদরুন্নেসা। খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক ও গল্পকার এবং বিশিষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ- জীবনের শিল্প (১৯৪১), প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৯৪৩), ভবিষ্যতের বাঙালি (১৯৪৩), আকবারের রাষ্ট্র-সাধনা (১৯৪৯), মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ, ইকবালের পয়গাম। গল্প: গুলদাস্তা (১৯২৭), মাশুকের দরবার (১৯৩০), দরবেশের দোয়া (১৯৩১), বাদশাহী গল্প (১৯৪৪), গল্পের মজলিস (১৯৪৪), ভাঙ্গাবাঁশী। ভ্রমণকাহিনী: পশ্চিম ভারত (১৯৪৮)। মটরযোগে রাঁচির সফর (১৯৪৯), ঐতিহাসিক উপন্যাস: গ্রানাডার শেষ বীর (১৯৪০)। সত্য ও সুন্দরের সাধনায়, নীতিজ্ঞান, ধর্মবোধ ও প্রেমের শাশ্বত মহিমায়, মার্জিত রুচি ও পরিচ্ছন্ন রসবোধে তাঁর সাহিত্যকর্ম সমৃদ্ধ। হিন্দু ও মুসলমান মিলে-মিশে এক জাতি গঠন করা যায় কি-না সে অভিপ্রায়ে রচনা করেন 'ভবিষ্যতের বাঙালি' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বাংলাভাষীদের রাষ্ট্রগঠন সম্পর্কে ইঙ্গিত দান। মৃত্যু. কলকাতা, ১০ জুন ১৯৫১।

ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী (১৮৩২-১৮৮৫)। জন্ম. চিতওয়া গ্রাম, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ১৮৩২। শিক্ষাবিদ, প্রাচ্যবিদ্যাবিদ, কবি, দার্শনিক, সমাজসেবক। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাইনাল সেন্ট্রাল পরীক্ষায় পাস (১৮৫৭)। ইংরেজি ও



বিজ্ঞানে ছাত্রজীবনেই ব্যুৎপত্তি লাভ। প্রথম চাকরি মহিশুর রাজপরিবারের সদস্য শাহজাদা জালালুদ্দীনের (টিপু সুলতানের পৌত্র) মোসাহেব। ১৮৬২-তে বড় লাটের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অনুবাদ বিভাগে মীর মুন্সি নিযুক্ত। ১৮৬৪-তে Recipprocal Influence of European and Mahomedan Civilization সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা এবং প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ায় দুশো পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার লাভ। হুগলি কলেজের ইংরেজি ও আরবির অধ্যাপক হিসেবে ১৮৬৫ থেকে প্রায় নয় বছর কর্মরত। ১৮৭৪-এ ঢাকা মাদ্রাসা স্থাপিত হলে ঐ বছরেই সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে নিযুক্তি এবং আমৃত্যু ঐ পদে বহাল। স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের সমর্থক। আলীগড় মোহামেডান অ্যাঙ্গলো ওরিয়েন্টাল কলেজের (১৮৭৫) পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার এবং অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। কলকাতা ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক। স্বীয় ছাত্র সৈয়দ আমীর আলী সহযোগে সৈয়দ কেরামত আলীর ফারসি গ্রন্থ 'মখজুল উলম'-এর ইংরেজি অনুবাদ: Makhaz-I-Uloom or A Treaties on the Sciences (1867). Mahomedan Education in Bengal শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশ (১৮৬৭)। রামমোহন রায়ের 'তুহফাতুল মুওয়াহেদীন' নামক ফারসি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ (১৮৮৪)। স্বরচিত উর্দু কবিতা সংকলন দিওয়ান (১৮৮০) এবং ফারসি দিওয়ান (১৮৮৬)। উর্দু 'গাইড' এবং ফারসি 'দূরবীন' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ: দস্তর-এ-পার্সী আমুজ (ফারসি ব্যাকরণ), তদরিবতুল্লা'ব-কি-

ছিয়াগিল অ'বওয়ার (আরবি সাহিত্য), তরাকুল আজহার-ফি-সিয়রিল ফালাসিফাতিল কিবার (গ্রিক দার্শনিকদের ইতিহাস), দবিস্তান-ই-দানিশ আমুস (উর্দু পদার্থবিদ্যা), দস্তর-এ-পার্সি আমুস (ফারসি ছন্দ ও অলঙ্কার), আল মনাহিলুস সাফিয়া-ফি-মাসায়েলে জোগ্রাফিয়া (আরবি ভূগোল)। এ-ছাড়াও মূল আরবি প্রবন্ধ, আরবি ভাষার তর্কবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, উর্দু ভাষায় মনোবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব, নারীশিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থ, সংস্কৃততত্ত্ব এবং ফারসি ভাষায় ধর্মশাস্ত্র ইউরোপীয় দার্শনিকদের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে। ফারসি ভাষায় লিখিত তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনী 'দস্তনে ইব্রাৎ বার' (১৮৮০)-এর বাংলা অনুবাদ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী পত্রিকায় (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৮ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়েছে। সমাজ ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ঢাকার সমাজ সম্মিলনী (১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩)-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। কলকাতার মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি এবং ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলন (১৮৮৩), বেঙ্গল সোসাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ। কলকাতা মাদ্রাসায় ভালো করে বাংলা শিখলেও বাংলায় কখনও লেখেন নি। তবে বাংলাভাষার প্রতি কোনোরূপ বিরূপতাও ছিল না। অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিবাদী, উদারপন্থি, বহুভাষাবিদ, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক এই পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ আচার্য হরিনাথ দে তাঁর একটি তৈলচিত্র প্রস্তুত করেন। মৃত্যু. ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫।

ওমর আলী খান (?-১৯৮২)॥ জন্ম. শ্রীরামপুর গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এসরাজ বাদক। শৈশবে সংগীত-সাধনায় আত্মনিয়োগ। ফকির (তাপস) আফতাবউদ্দিন খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ও তবলায় তালিম গ্রহণ। পরে ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ও এসরাজ ও ক্ল্যারিওনেট যন্ত্রে তালিম গ্রহণ। উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সংগীত-জলসায় সংগীত পরিবেশন করে সুনাম অর্জন। ১৯৬৪-তে তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তান রাজশাহী কেন্দ্রে 'নিজস্ব শিল্পী' হিসেবে যোগদান। ১৯৮০-তে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। মৃত্যু. ১৯৮২।

ওয়াজেদ আলী খাঁ পন্নী (১৮৬৯-১৯৩৬ বঙ্গাব্দ)॥ জন্ম. করটিয়া গ্রাম, টাঙ্গাইল, ১৮৬৯। দানবীর, সমাজ-সংস্কারক ও বিদ্যোৎসাহী। জমিদার পরিবারে জন্ম। ডাকনাম চাঁদ মিয়া। পিতার নাম হাফিজ মোহাম্মদ আলী খাঁ পন্নী। সাদৎ আলী খাঁ পন্নী তাঁর পিতামহ। গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষা



গ্রহণ। নিজের সাধনায় আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ। রাজনীতিতে সুনাম অর্জন। ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেস কমিটি ও জেলা খেলাফত কমিটির সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য। ১৯২১-এ খেলাফত আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে একই বছর ডিসেম্বর মাসে গ্রেফতার ও ময়মনসিংহ জেলে অন্তরীণ। ১ বছর ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। সরকার জামিন মুচলেকায় তাঁকে মুক্তি দিতে চাইলে তৎকর্তৃক তা প্রত্যাখান। জেলখানায় টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হলে সরকার কর্তৃক স্বেচ্ছায় ও নিঃশর্তে তাঁকে মুক্তিদান (২ জুন ১৯২২)। রোগমুক্তি পর শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ। করটিয়ায় পিতামহের নামানুসারে সাদত কলেজ (জুলাই ১৯২৬) এ কলেজ স্থাপন করেন। পিতার নামে হাফিজ মোহাম্মদ আলী স্কুল স্থাপন। মসজিদ, লাইব্রেরি, মাদ্রাসা ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা। গরিব ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, রাস্তাঘাট সংস্কার ও নলকূপ স্থাপন তাঁর জনহিতকর কার্য। জমিদারির বার্ষিক আয়ের শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষাবিস্তার ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়। তাঁর জমিদারিতে প্রজাপীড়ন ছিল না, বরং দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় খাজনা মওকুফ হয়ে যেত। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য সাধারণ মানুষের কাছ থেকে 'দ্বিতীয় মহসিন' উপাধি লাভ। তাঁদের জমিদারি ছিল আটিয়া পরগণায়। এজন্য চাঁদ মিয়াকে আটিয়ার চাঁদ বলা হতো। মৃত্যু. ২৫ এপ্রিল ১৯৩৬।

ওয়াজেদ আলী শাহ (১৮২২-১৮৯৭)॥ জন্ম. লক্ষ্ণৌ, ১৩ জুলাই ১৮২২। অযোধ্য রাজ্যের শেষ নবাব। ইংরেজ সরকার-কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত এবং কলকাতার মেটিয়াবুরুজে বার্ষিক ১২ লক্ষ

তাঁকে বৃত্তিভোগী হয়ে নির্বাসিত জীবনযাপন। ১৮৫৭-১৮৫৮ পর্যন্ত সিপাহি বিদ্রোহের সংযুক্ত থাকার অভিযোগে ইংরেজ সরকার-কর্তৃক ফোর্টউইলিয়ামে কারারুদ্ধ। মুক্তির পর মেটিয়াবুরুজে বসবাস। লক্ষ্ণৌর ঠুংরিগানের অন্যতম প্রধান প্রচলন-কর্তা। বাংলার সংগীত-জগতেও অবদান অসামান্য। নিজে সংগীতজ্ঞ ও সংগীত রচয়িতা। তাঁর দরবারে বহু গুণী ব্যক্তির সংগীত পরিবেশন। এখানে থেকে বাঙালিদের মার্গ-সংগীত শিক্ষার সুযোগ লাভ। কবি হিসেবেও খ্যাতি অর্জন। ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী অবস্থায় 'আখতার' ছদ্মনামে 'হুজন-ই-আখতার' কাব্য রচনা। অন্যান্য গ্রন্থ: তারিখ-ই-পরীখানা, তারিখ-ই-মুমতাজ প্রভৃতি। নাজু, বাজি ও দুলহান নামক সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থের (৩ খণ্ড) রচয়িতা। নিজের গ্রন্থাদি মুদ্রণের জন্যে মেটিয়াবুরুজে ছাপাখানা স্থাপন। মৃত্যু. ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭।

ওয়াহিদুজ্জামান (১৯১২-১৯৭৬)॥ জন্ম. সীতারামপুর গ্রাম, গোপালগঞ্জ, ১৯১২। রাজনীতিবিদ। ডাকনাম ঠাণ্ডা মিয়া। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৩২-এ বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৫-এ এল.এল.বি. পাস। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের আন্ডার সেক্রেটারি। মুসলিম লীগের সদস্য হিসাবে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশনের সেক্রেটারি (১৯৩৮-১৯৪৫), কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার (১৯৪০-১৯৪৩), বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য (১৯৪২-১৯৪৬), পূর্ব-পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের মনোনীত সদস্য (১৯৪৮) ও নির্বাচিত সদস্য (১৯৫০), পাকিস্তান প্রথম গণ-পরিষদের সদস্য (১৯৫১-১৯৫৪). পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য (১৯৪৭-১৯৫৮), কনভেনশন মুসলিম লীগের নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য (১৯৬২-১৯৬৯)। ১৯৬২-র ২৮ এপ্রিল মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় ফরিদপুর-৩ আসন থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ১৩ জন আইয়ুব সরকারের মন্ত্রিসভার বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৬৫-র ২২ মার্চ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব। ১৯৬৩-র ৫ এপ্রিল পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে এক রিট মামলার রায়ে মন্ত্রীদের জাতীয় পরিষদের সদস্যপদ বাতিল করলে জাতীয় পরিষদের সদস্য পদ হারান। ১৯৬৫-র ২১ মার্চ মৌলিক গণতন্ত্রীদের (বি.ডি.) ভোটে এনই-৩৮, ফরিদপুর আসন থেকে পুনরায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণ-আন্দোলনের মুখে কনভেনশন মুসলিম লীগ দলীয় আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে (২৫ মার্চ ১৯৬৯) এবং কনভেনশন মুসলিম লীগও দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক অংশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন কাইয়ুম খান, অপর অংশের নেতা হন ফজলুল কাদের চৌধুরী। ওয়াহিদুজ্জামান ছিলেন কাইয়ুমপন্থি মুসলিম লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। এ পদে দায়িত্ব পালন কালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ৬দফা কর্মসূচি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা। ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ফরিদপুর-৬ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কাছে পরাজিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সহযোগী সংগঠন শান্তি কমিটির (১৯৭১) অন্যতম নেতা। ঢাকার জামান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশনের স্বত্বাধিকারী। মৃত্যু. ২১ অক্টোবর ১৯৭৬।



ওয়াহিদুল হক (১৯৩৩-২০০৭)॥ জন্ম. ভাওয়াল মনহরিয়া, কেরানিগঞ্জ, ঢাকা, ১৬ মার্চ, ১৯৩৩। সংগীতজ্ঞ, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক। পিতা আবু তাইয়েব মাজহারুল হক ১৯৪৬-এ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। মাতা মেওয়া বেগম। তাঁর ভাই রেজাউল হক সাংবাদিক ছিলেন। আরেক ভাই জিয়াউল হক ১৯৭১-এর



শহিদ। আরমানিটোলা সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭-এ স্নাতক। সাংবাদিকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। ষাটের দশকে ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পাকিস্তান অবজারভারে'র শিফট ইনচার্জ। পরে ইংরেজি দৈনিক 'দ্য মর্নিং নিউজ' ও 'দ্য ডেইলি স্টার' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক। ইংরেজি দৈনিক 'পিপলস'-এর সম্পাদক। দৈনিক 'জনকণ্ঠ' পত্রিকায় 'অভয় বাজে হৃদয় মাঝে' ও 'ভোরের কাগজ' পত্রিকায় 'এখনও গেল না আঁধার' নামে নিয়মিত কলাম লিখতেন। ১৯৬১-এ 'ছায়ানট'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠা। পরে এই সংগঠনের অন্যতম সহসভাপতি। মুক্তিযুদ্ধের সময় 'স্বাধীন বাংলা শিল্পী সংস্থা'র অন্যতম উদ্যোক্তা। জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ-এর কার্যকরী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সহসভাপতি এবং ১৯৯৯ থেকে আমৃত্যু সভাপতি। আবৃত্তি সংগঠন 'কণ্ঠশীলন' এবং শিশু আবৃত্তি সংগঠন 'শিশুতীর্থ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'আনন্দধ্বনি'-র প্রতিষ্ঠাতা। মুকুল ফৌজ কিশোর সংগঠনের উদ্যোক্তা। 'বাংলাদেশ ব্রতচারী সমিতি'-এর সহ-সভাপতি। 'বাংলাদেশ আবৃত্তি ফেডারেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটি পরে বাংলাদেশ ফিল্ম সোসাইটির-প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বসন্ত উৎসব উদ্‌পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। 'নালন্দা'র-কার্যকরী পরিষদের সদস্য। 'ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান'-এর অন্যতম সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'চেতনা ধারায় এসো', 'গানের ভিতর দিয়ে', 'সংস্কৃতিই জাগরণের প্রথম সূর্য'। আবৃত্তি ও গানের সিডি: 'সকল কাঁটা ধন্য করে', 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ', 'আছ অন্তরে', 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা' প্রভৃতি। ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রের আবহ সংগীত সম্পাদনা। পুরস্কার: জসীমউদ্‌দীন পদক, কাজী মাহবুবউল্লাহ ট্রাস্ট স্বর্ণপদক, বাংলা একাডেমী ফেলোশিপ (২০০০), একুশে পদক ২০০৮, স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১০। মৃত্যু. ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি ২০০৭।

ওহীদুল আলম (১৯১১-১৯৯৮)॥ জন্ম, ফতেয়াবাদ গ্রাম, হাটহাজারী, চট্টগাম, ১ জানুয়ারি ১৯১১। কবি ও শিক্ষাবিদ। পিতা মৌলভী নাসিহউদ্দীন, মাতা আজিজুন্নিসা কথাসাহিত্যিক মাহবুব উল আলম ও দিদারুল আলম তাঁর অগ্রজ। ওহীদুল আলমের শিক্ষাজীবনের শুরু হয় না বছর বয়েসে তাঁর মামার কাছে। ১৯২১-এ চট্টগ্রাম শহরে কিছু সময় মাদরাসায় প্রাথমিক স্তরের পাঠ নেন। পরে ফতেয়াবাদ ফিরে আসেন এবং মামার স্কুলে ভর্তি হন। তিনি ফতেয়াবাদ হাইস্কুল থেকে ১৯৩১-এ প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস করেন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯৩৪-এ প্রথম বিভাগে আই.এ. ও ১৯৩৬-এ বি.এ. পাস। ১৯৪০-এ ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.টি. পাস। ১৯৩৬-এ চট্টগ্রামের পাঠানটুলীর বিখ্যাত পাঠান পরিবারের কন্যা বেগম জেরিনা খানমের সংগে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৩৬-এ লোককবি ও লোকসাহিত্য সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরীও তিনি যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশ করেন সাহিত্যপত্র 'পূরবী'। ১৯৩৭-এ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় পূরবী সাহিত্য সম্মেলন। ১৯৩৮-এ জুলাই মাসে শিক্ষকতায় যোগ দেন সীতাকুন্ড হাই স্কুলে। ১৯৪৬-এ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'কর্ণফুলীর মাঝি'। এরপর চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক নয়াজামানা (১৯৪৬) ও দৈনিক পূর্ব-পাকিস্তানে এ নিউজ এডিটর হিসেবে কাজ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে পাটিয়ার রাহাত আলী হাইস্কুল, ফটিকছড়ি হাইস্কুল, চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টার মিডিয়েট কলেজ ও চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে যোগ দেন। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বর তিনি চট্টগ্রাম জুনিয়র ট্রেনিং কলেজের সুপারিস্টে পদে যোগ দেন এবং এ প্রতিষ্ঠান থেকেই ১৯৭২-এর ৪ এপ্রিল অবসর গ্রহণ করেন। রচিত গ্রন্থ: কবিতা: কর্ণফুলীর মাঝি (১৯৪৬), কাব্যসমগ্র (১৯৭৯); গল্প: জোহরার প্রতীক্ষা (১৯৫০), ছুটির গল্প (১৯৫০), জোহরার প্রতীক্ষা ও অন্যান্য গল্প (১৯৭৮) উপন্যাস: শামীমা (১৯৫৪) বীরশ্রেষ্ঠ সোনাগাজী; কিশোর উপন্যাস (১৯৮২) শিশুনাট্য: হালুয়া (১৯৫৪), দোপেঁয়াজা: নাট্যগুচ্ছ (১৯৮০)। স্মৃতিকথা: পৃথিবীর পথিক (১৯৭২), স্কুল কলেজে চৌত্রিশ বছর (১৯৭৩) জীবনী: আমাদের নেতা (১৯৫২), কবি দিদারুল আলম (১৯৭৭), ছোটদের আবুল ফজল (১৯৮৪)। ইতিহাস: চট্টগ্রামের ইতিহাস (১৯৮২), চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ (১৯৯১) চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য (১৯৬৪): চট্টগ্রামের শিক্ষা-সাধনা (১৯৬৪) কোষগ্রন্থ: বাঙলা জীবনীকোষ (১৯৮৬) ১৯৮৯-এ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও চট্টগ্রাম লেখক সংঘ

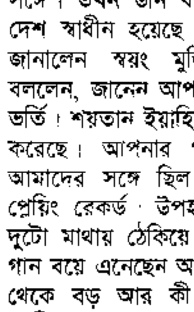
পুরস্কারে ভূষিত হন । মৃত্যু: সড়ক দুর্ঘটনায়, ২ জানুয়ারি ১৯৯৮ ।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৪-২০০০)॥ জন্ম. সোনামুখী, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ১২ অক্টোবর ১৯২৪ । রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও শিক্ষক । পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের কর্মী ও মা অনিলা দেবী ছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমজননী । প্রকৃত



নাম অনিমা বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৯৩৫-এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অনিমা' নামটি পরিবর্তন করে 'কণিকা' রাখেন । ডাকনাম 'মোহর' । ১৯৩৫ সালেই শিশুশিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ । শান্তিনিকেতনের শারদোৎসবে একটি অনুষ্ঠানে শিশুদের দলে অংশগ্রহণ । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সেই প্রথম ও শেষ মঞ্চাবতরণ; কারণ সেই অনুষ্ঠানটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের শেষ মঞ্চাভিনয় । ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় কণিকা ছিলেন শান্তি নিকেতনে । রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মতো 'সমুখে শান্তিপারাবার' গানটি যে বৃন্দদলে গাওয়া হয়, সেই দলে ছিলেন কণিকা । গানটি মৃত্যুর কয়েক বছর আগে রচনা করলেও, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তাঁর মৃত্যুর পরেই প্রকাশিত ও গীত হয় । ১৯৪২ সাল থেকে হিজ মাস্টার্স ভয়েসের শিল্পী । ১৯৪৩-এ বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষিকা হিসাবে যোগদান । পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর এমিরিটাস অধ্যাপকও হন । ১৯৪৩-এ আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পীরূপে যোগদান । ১৯৪৪-এ কলকাতায় গীতবিতান সংগীত বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা মঞ্চস্থ হলে তাতে প্রমদার চরিত্রে অভিনয় । এই অনুষ্ঠানেই বাঁকুড়ার বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ও পরের বছর পরিণয় । বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের কর্মী, রবীন্দ্র-বিশারদ ও 'আত্মকথা' বাদে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত সকল গ্রন্থের সহলেখক । বিভিন্ন রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্যের রেকর্ডেও অংশ গ্রহণ । ১৯৬১-এ রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত শ্যামা নৃত্যনাট্যে নামভূমিকায় তাঁর গান বিশেষ প্রশংসা ও জনপ্রিয়তার অধিকারী হয় । এছাড়া মায়ার খেলা-এ প্রমদা, চিত্রাঙ্গদা-এ চিত্রাঙ্গদা (সুরূপা) ও তাসের দেশ-এ হরতনী চরিত্রেও গীতাভিনয় । 'তথাপি' (১৯৫০), 'নিমন্ত্রণ' (১৯৭২) ও 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' (১৯৭২) ছবি তিনটিতে কণ্ঠ দান । ১৯৭৪, ১৯৭৮ ও ১৯৮৪-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা; ১৯৭৬, ১৯৮০ ও ১৯৮৬-এ ইংল্যান্ড এবং ১৯৮০ সালেই জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড-সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ । ১৯৭২-এ বাংলাদেশ ভ্রমণ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের স্মৃতি এমন– 'সেবার দেখা হল শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে । তখন উনি বাংলাদেশের হৃদয়ের মণি । দেশ স্বাধীন হয়েছে । বঙ্গভবনে ঢুকতে স্বাগত জানালেন স্বয়ং মুজিবুর রহমান । আমাকে বললেন, জানেন আপনার রেকর্ড ছিল আলমারি ভর্তি । শয়তান ইয়াহিয়ার দল সব ভেঙে তছনছ করেছে । আপনার গানের আমি খুব ভক্ত । আমাদের সঙ্গে ছিল আমার গাওয়া দুটি লং প্লেয়িং রেকর্ড । উপহার দিলাম ওঁকে । রেকর্ড দুটো মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, আপনার কণ্ঠের গান বয়ে এনেছেন আমাকে উপহার দিতে । এর থেকে বড় আর কী হতে পারে?' ১৯৮৪-এ সংগীত ভবনের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ । ১৯৯৩-এ গৌতম ঘোষ 'মোহর' নামে তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন । শেষজীবন কাটে শান্তি নিকেতনে । মৃত্যু. কলকাতা, ৫ এপ্রিল ২০০০ ।

কফিলউদ্দীন চৌধুরী (১৮৯৯-১৯৭২)॥ জন্ম. মজিদপুর-দয়াহাটা, বিক্রমপুর, ১৮৯৯ । রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী । কলকাতা রিপন কলেজ থেকে ১৯২৩-এ বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৫-এ বি.এল. ডিগ্রি লাভ । ১৯২৬-এ মুন্সীগঞ্জ



আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু এবং মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত । ১৯৩০-এ ঢাকা বারে যোগদান । ১৯৩২-এ ঢাকা জেলা বোর্ড এবং ১৯৩৬-এ উক্ত জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত । ১৯৩৭-১৯৪১ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য । ১৯৩৯-এ খাজা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং মুসলিম লীগ ত্যাগ । একই বছর ঢাকা জেলা

বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। ১৯৫০-এ পুনরায় জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪২, ১৯৪৬ ও ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। ১৯৫৩-র ২৭ জুলাই শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সঙ্গে কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠন। ১৯৫৪-এ পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে গদিচ্যুত করার লক্ষ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ কৃষক-শ্রমিক পার্টি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট (৩ ডিসেম্বর ১৯৫৩) গঠন করলে এর যুগ্ম-আহ্বায়ক নিযুক্ত। এ-নির্বাচনে পশ্চিম বিক্রমপুর থেকে পরিষদ সদস্য নির্বাচিত। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়ে যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ববঙ্গে সরকার গঠন করলে (৪ এপ্রিল ১৯৫৪) বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী নিযুক্ত। ৩০ মে (১৯৫৪) কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিলে মন্ত্রিত্ব থেকে পদচ্যুত। ১৯৫৬-র সেপ্টেম্বর মাসে কৃষক-শ্রমিক পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ-কংগ্রেস দলীয় পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬) এবং গণপূর্ত, সেচ ও বন দপ্তরের মন্ত্রী (১৯৫৬-১৯৫৭)। ১৯৫৬-১৯৫৮ পর্যন্ত জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের সদস্য। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি হলে গ্রেফতার। কয়েক মাস কারাভোগের পর মুক্তিলাভ। সামরিক সরকারের আদেশে ১৯৬৬-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা। জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-আন্দোলন চলাকালে ১৯৬২-র ৬ ফেব্রুয়ারি নিরাপত্তা আইনে আর একবার গ্রেফতার। ১৯৬৯-এর জুলাই মাসে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন। ১৯৭০-এ ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-১৫ আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকালে মুজিবনগর গমন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কর্মসম্পাদন। উদার, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল গভীর। এ দেশের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। মৃত্যু. ঢাকা, ১২ মে ১৯৭২।

কবীরউদ্দিন আহমেদ (১৮৭৬-?)॥ জন্ম. মালদহ, ১৮৭৬। রাজনীতিবিদ, আইনজীবী। শিক্ষা মালদহ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও কেম্ব্রিজ, লন্ডন। বার-এট-ল। ১৯১০-এ আইন পেশা শুরু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য। বঙ্গীয় কৃষি সম্মেলনের সভাপতি, ১৯১৭। প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও সংগঠক, ভারতীয় নাবিক ইউনিয়ন, কলকাতা, ১৯২২-১৯২৭। আইনসভার নির্বাচিত সদস্য ১৯২১-১৯৩৪ ; রাজশাহী বিভাগ থেকে পুর্ননির্বাচিত, ১৯৩৬। আইন সভায় পার্লামেন্টারি মুসলিম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও হুইপ। সদস্য, জাতীয় মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা। মৃত্যু, তারিখ অজ্ঞাত।

কমর আলী॥ জন্ম করুলডেঙ্গা গ্রাম, চট্টগ্রাম। সংগীতজ্ঞ ও কবি। একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ও কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ। নিজ-অঞ্চলের অধিবাসী হাড়ী সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে কীর্তন গাইতেন। বহু গান ও কবিতার রচয়িতা। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' নামক গ্রন্থে তাঁর রচিত গান ও কবিতা সংকলিত হয়েছে। তাঁর গানগুলো জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় ছিল।

কমল দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৭৪)॥ জন্ম. বেন্দা, কালিয়া, নড়াইল, ২৮ জুলাই ১৯১২। সংগীতশিল্পী, সুরকার ও সংগীত পরিচালক। পিতা তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। ১৯২৮-এ ক্যালকাটা একাডেমি থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি.কম. পাস করেন। 'মীরার ভজন'-এর সুরারোপের জন্যে ১৯৪৩-এ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরস অব মিউজিক' উপাধি লাভ। বাল্যকালে বড়ভাই অধ্যাপক বিমল দাশগুপ্তের কাছে খেয়াল গান দিয়ে সংগীত-জীবন শুরু। ডি.এল. রায়ের পুত্র দিলীপ রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে (কানা কেষ্ট) ও ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খাঁর কাছে খেয়াল, ঠুমরী, দাদরা ও গজলের তালিম গ্রহণ। ২৩ বছর বয়সে হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানির সংগীত পরিচালক ও সুরকার নিযুক্ত। কলাম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানিতেও কর্ম সম্পাদন। প্রথম বাঙালি যিনি উর্দু ভাষায় কাওয়ালি গান করেন। হিজ মাস্টার্স ভয়েসে এক



মাসে তিপ্পান্নটি গান রেকর্ড করে দৃষ্টান্ত স্থাপন। হায়দ্রাবাদের নিজামের গোল্ডেন জুবিলির বিশেষ গান রেকর্ড। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির 'মার্চিং সঙ' তাঁর সুরে রেকর্ড করা হয়। রেকর্ড। সংখ্যক গানে সুর করার জন্য ১৯৫৮-তে এইচ.এম.ভি-তে তাঁর সিলভার জুবিলি অনুষ্ঠিত। তাঁর সুরারোপিত গানের ডিস্কের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। রেডিওর অডিশন বোর্ডের প্রধান। ১৯৩৪ থেকে স্বাধীনভাবে কাজী নজরুল ইসলামের গানের সুরারোপ করতে থাকেন। প্রায় তিনশো নজরুলগীতির সুর রচয়িতা। স্বরলিপির শর্টহ্যান্ড পদ্ধতির উদ্ভাবক। আ-কার মাত্রিক পদ্ধতি ও স্টাফ নোটেশন পদ্ধতি স্বরলিপি স্থাপনে অভিজ্ঞ। ৪৭ বছর বয়সে ইসলাম ধর্মগ্রহণ ও প্রখ্যাত নজরুলগীতি-শিল্পী ফিরোজা বেগমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। রেডিও বাংলাদেশের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের প্রধান সংগীত পরিচালক। প্রায় আশিটি ছায়াছবির সংগীত পরিচালক। হিন্দি আধুনিক সংগীত 'গীত' প্রচারে অবদান অপরিসীম। ভজনগানে বিশেষ দক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মি. এলিস জনসন নামে এক আমেরিকান চিত্র-পরিচালক কর্তৃক তাঁর 'ওয়ার প্রপাগান্ডা' ছবির জন্য কমল দাশগুপ্তের কাছ থেকে 'ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক' গ্রহণ। বাংলা-হিন্দি-উর্দু-গজল, ভজন উচ্চাঙ্গ সংগীত, নাত, হামদ, নজরুলগীতিসহ সংগীতের সকল শাখায় সমান দক্ষতার অধিকারী। মৃত্যু. ঢাকা, ২০ জুলাই ১৯৭৪।

কমলা ঝরিয়া (১৯০৬-১৯৭৯)॥ জন্ম. ঝরিয়া শহর, বিহার। সংগীতশিল্পী। প্রকৃত নাম কমলা সিংহ। কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানিতে গান রেকর্ড করাকালে উক্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপক ভাগবতী ভট্টাচার্য তাঁর নামের শেষে সিংহ পদবির স্থলে ঝরিয়া অঞ্চলের কন্যা বলে ঝরিয়া উপাধি জুড়ে দেন। সেই থেকে কমলা ঝরিয়া নামে পরিচিতি লাভ। তাঁর বয়স যখন দশ বছর সে সময়ে তাঁর গানের গলা শুনে ঝরিয়ার রাজা তাঁর শেখার ব্যবস্থা করে দেন। সভা-গায়ক শ্রীনাথ দাস নন্দীর কাছে প্রথমে গানের তালিম গ্রহণ। পরে ওস্তাদ



জমিরুদ্দীন খাঁর কাছে মার্গ সংগীত অনুশীলন। নাট্যকার ও সুরকার তুলসী লাহিড়ীর সংস্পর্শে এসে তাঁর সাংগীতিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। কীর্তন, গজল, ঠুংরী, কাজরী, লোকগীতি প্রভৃতি গান আবেগময় কণ্ঠে গেয়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। কাজী নজরুল ইসলাম, তুলসী লাহিড়ী ও কে মল্লিকের কল্যাণে গান রেকর্ড করার সুযোগ লাভ। প্রথম রেকর্ড 'প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না এ মিনতি করি হে' প্রকাশিত হলে সংগীত রসিক সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন। তারপর দীর্ঘ ত্রিশ বছর বাংলা, হিন্দি, উর্দু, মারাঠি এবং পাঞ্জাবি ভাষায় বহু গান রেকর্ডিং। তাঁর গানের রেকর্ডের সংখ্যা চারশ'-এর ওপর। চলচ্চিত্রেও অভিনয়, মূলত গানের ভূমিকায়। কলকাতা বেতারকেন্দ্রের একজন নিয়মিত কণ্ঠশিল্পী হিসেবে বহু মর্মস্পর্শী গান পরিবেশন। ভারতের রাজদরবারেও সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর মন জয়। আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা ও কমলা ঝরিয়া মিলে বাংলা গানের রাজ্যে এক অসাধারণ জুটি গঠন। মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পূর্বে সংগীত জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ। মৃত্যু. কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৯।

কম্পরাম সিং (১৮৮৭-১৯৫০)॥ জন্ম. উত্তর পারিয়া গ্রাম, বালিয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, ১৮৮৭। কৃষক নেতা, খাপড়া ওয়ার্ডের শহীদ। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি লাহিড়ী হাটে জমিদারদের স্বেচ্ছাচারমূলক তোলা আদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠন, যা রাজনৈতিক ইতিহাসে 'তোলাবাটি' আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনে নেতৃত্বদানের অপরাধে গ্রেফতারবরণ এবং তিনমাস বন্দী জীবনযাপন। তোলাবাটি আন্দোলন শেষ হতে-না হতেই সমগ্র উত্তরবঙ্গে বর্গা চাষীদের তেভাগা আন্দোলনে সংগঠিত হয়; সে-আন্দোলনে অংশগ্রহণ। দিনাজপুরে বালিয়াডাঙ্গা, আটোয়ারি ও রানীশংকাইল থানায় এ-আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান। এই সময় তাঁর ওপর সরকারি হুলিয়া থাকায় দুই বছর আত্মগোপন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর মুসলীম লীগ শাসনামলে ১৯৪৯-এ পুনরায় গ্রেফতার। অন্যান্য কৃষক নেতা ও কর্মীর সঙ্গে রাজবন্দী হিসেবে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ডে অন্তরীণ। এই সময়ে রাজবন্দীদের ওপর মুসলিম লীগ সরকারের অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিবাদে এবং রাজবন্দি ও সাধারণ বন্দিদের মানবেতর পরিবেশ থেকে

মানবিক পরিবেশে উন্নীত করার দাবিতে রাজবন্দীরা যে প্রতিরোধ আন্দোলন করেন, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে তার নেতৃত্বদান। এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার লক্ষ্যে ১৯৫০-এর ২৩ এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে দরজা বন্ধ অবস্থায় পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। গুলির আঘাতে কম্পরাম সিংসহ সাত জন সেদিন নিহত হন। মৃত্যু. ২৩ এপ্রিল ১৯৫০।



করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২২)॥ জন্ম. পায়রাবন্দ, রংপুর, ১৮৫৫। কবি ও সমাজসেবী। উর্দুভাষী পরিবারে লালিত-পালিত হয়েও স্বীয় চেষ্টায় বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন। তিনি ছিলেন টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী। শিক্ষানুরাগী এবং সাহিত্যমনা হিসেবে খ্যাতি লাভ। আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী সম্পাদিত 'আহমদী' (১৯২৩) পত্রিকা সম্পূর্ণ তাঁরই অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত। মীর মশাররফ হোসেন তাঁরই এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন (১৮৮৪-১৮৯২)। তিনি তাঁর বিষাদ সিন্ধু (১৮৮৫) গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ করিমুন্নেসা খাতুনের নামে উৎসর্গ করেন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর মতিচূর (২য় খণ্ড, ১৯২১) গ্রন্থখানিও করিমুন্নেসার নামে উৎসর্গ করেন। বেগম রোকেয়া তাঁর সহোদরা বোন, পিতা ছিলেন রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদার জহির মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। বেগম রোকেয়া 'লুকানো রত্ন' প্রবন্ধে বলেছেন যে, করিমুন্নেসা খানম কবিতা লিখতেন। তিনি 'দুঃখ তরঙ্গিনী' ও 'মানস বিকাশ' নামে দুখানি গ্রন্থ (অপ্রকাশিত) রচনা করেন। তাঁর খ্যাতনামা পুত্রদ্বয় আবদুল হালিম গজনবী ও আবদুল করিম গজনবী। মৃত্যু. ১৯২২।



করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫)॥ জন্ম. শান্তিপুর, নদীয়া, ১৯ নভেম্বর ১৮৭৭। কবি। পিতা নৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন স্কুল-শিক্ষক। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তেরো বছর বয়সে পিতৃহীন হন। শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯৬) ও কলকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে এফ.এ. (১৮৯৯) পাস। কলকাতার জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি বি.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন (দু'বার ১৯০১, ১৯০২)। শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুল, গাইবান্ধা হাইস্কুল, কলকাতা শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা, এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন, হুগলী গভর্নমেন্ট ব্রাঞ্চ স্কুল ও উত্তর পাড়া গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে শিক্ষকতা। শৈশবেই কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত। স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রথম কাব্য 'বঙ্গ-মঙ্গল' (১৯০১) প্রকাশ। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার-কর্তৃক নিগৃহীত হওয়ার আশঙ্কায় এ-কাব্যের প্রথম সংস্করণে কবির নাম দেয়া হয় নি। রবীন্দ্রানুসারী কবি। প্রেমের স্বপ্ন সুন্দর রূপ, দাম্পত্যজীবনে লীলামাধুর্য, প্রকৃতির বর্ণগন্ধময় লাবণ্য ও বৈষ্ণব ভাবালুতা তাঁর কবিতায় সহজ-সুন্দরভাবে প্রকাশিত। ১৯৫১-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক 'জগত্তারিণী পদক' প্রদান। রচিত উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ: প্রসাদী (১৯০৪) ঝরাফুল (১৯১১), শান্তিজল (১৯১৩), ধানদূর্বা (১৯২১) শতনরী (১৯৩০), রবীন্দ্র-আরতি (১৯৩৭), গীতায়ন (১৯৪৯), গীতারঞ্জন (১৯৫১)। মৃত্যু. ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫।

কলিম শরাফী (১৯২৪-২০১০)। জন্ম. খয়রাদিহি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৮ মে ১৯২৪। সংগীতশিল্পী। পিতা সামি আহমেদ শরাফী ও মাতা আলিয়া বেগম। মাত্র চার বছর বয়সে মাতৃহারা হন। হাতেখড়ি হয় আরবি ওস্তাদজী আর বাংলা পণ্ডিত মশাইয়ের হাতে। ১৯২৯-এ পাঠশালায় ভর্তি। তাঁতিপাড়া প্রাইমারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা। ১৯৩৫-এ কলকাতায় অ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন মাদ্রাসা-ই-আলিয়াতে। কলকাতার সংগীত বিদ্যালয় 'দক্ষিণী' থেকে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০



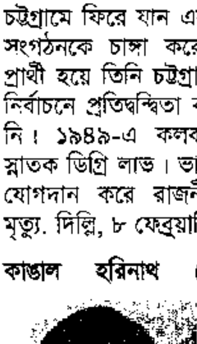
পর্যন্ত সংগীতশিক্ষা। ১৯৪৯-এ বিয়ে করেন কামেলা খাতুনকে। ১৯৫০-এ ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। ১৯৫৭-এ বিয়েবিচ্ছেদের পরে ১৯৬৩-এ আবার করেন নওশেবা খাতুনকে। দ্বিতীয় স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। ১৯৬৪-৬৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান টেলিভিশনে অনুষ্ঠান পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব। ১৯৬৯-৭২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান গ্রামোফোন কোম্পানির পরিচালক ও জেনারেল ম্যানেজার। ১৯৭৪-৭৬-এ বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশনের চিফ ইনফরমেশন অফিসার ও জেনারেল ম্যানেজার। ১৯৪৪-এ ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (আইপিটিএ)-তে যোগ দিয়ে কলকাতার হাজারা পার্কে হাজার হাজার দর্শকশ্রোতার উপস্থিতিতে প্রথম গণসংগীত পরিবেশন। ১৯৪৬-এ এইচএমভি থেকে গণসংগীতের প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত। এবছরই নিয়মিত শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন কলকাতা বেতারে। দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণের আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিশের হাতে নির্যাতিত। এরপর ১৯৪২-এ তিনি মেট্রিক পাস। পরীক্ষার পরই তিনি গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যুক্ত এবং গ্রেপ্তার বরণ। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি বীরভূম জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সেক্রেটারির দায়িত্ব গ্রহণ। পঞ্চাশের মন্বন্তর হিসেবে পরিচিত পাওয়া দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানায় কাজ করার সময় কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সংস্পর্শে আসেন, যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। মন্বন্তরে দল বেঁধে গান গেয়ে গেয়ে পীড়িত মানুষজনের জন্য অর্থ সাহায্য সংগ্রহ ও লঙ্গরখানায় খাদ্যবিতরণে আত্মনিয়োগ। ১৯৪৫-এ শরাফী ভর্তি হন হেতমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে। প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে কৃষ্ণনাথ কলেজ ছেড়ে তিনি ভর্তি হন ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে। অর্থনৈতিক কারণে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে ১৯৪৬-এ সিটি কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি। ১৯৪৬ সালেই শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে 'বর্ডার গার্ড'-এর দায়িত্ব পালন। ১৯৪৮-এ আবারও গ্রেফতার। ১৯৪৮ নাট্যসংস্থা 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত। ১৯৫০-এ ঢাকায় এসেই ক্যাজুয়াল আর্টিস্ট হিসেবে যোগ দেন রেডিওতে। ১৯৫১-এ ঢাকা ছেড়ে তিনি চলে যান চট্টগ্রামে। গড়ে তোলেন 'প্রান্তিক' সংগঠন। ১৯৫৬-এ শেরে বাংলার মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে সেকশন নাইনটি টু জারি করার ফলে কলিম শরাফীকে আত্মগোপন করতে হয়। সে বছরের শেষ দিকে ঢাকায় ফিরে 'হ-য-ব-র-ল' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা। এ সংগঠনের ব্যানারেই মঞ্চস্থ করেন 'তাসের দেশ' নাটক। ১৯৫৭-এ 'আকাশ আর মাটি' চলচ্চিত্রে প্রথমবারের মতো রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন। ১৯৫৮-এ তাঁর গান রেডিওতে সম্প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। স্বাধীনতা পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। কলিম শরাফী ১৯৬০-এ 'সোনার কাজল' চলচ্চিত্রে প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সহকারী পরিচালক ছিলেন জহির রায়হান। এ সময় কলিম শরাফীর সংগীত পরিচালনায় নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র 'ভেনিস' আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করে। 'সূর্যস্নান' ছবিতে 'পথে পথে দিলাম ছড়াইয়া রে' গানটি গেয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন। কবিয়াল রমেশ শীলের জীবন নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেন তিনি। ১৯৬৪-এ ঢাকায় প্রথম টিভি সেন্টার চালু হলে অনুষ্ঠান পরিচালক পদে যোগদান। ১৯৬৯-এ সত্যেন সেনের সঙ্গে উদীচীর কর্মকাণ্ডে যোগদান এবং ১৯৭৭ থেকে সভাপতির দায়িত্বপালন। ১৯৭৯-এ 'জাহিদুর রহিম স্মৃতি পরিষদ'-এর আহ্বায়ক। এই 'জাহিদুর রহিম স্মৃতি পরিষদ'ই 'জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ'-এ পরিণত হয়। ১৯৮৩-এর এপ্রিলে 'সংগীত ভবন' প্রতিষ্ঠা। 'স্মৃতি অমৃত' তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। তিনি শিল্পকলা একাডেমী কাউন্সিল ও শিশু একাডেমী কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার টিভি শিল্পী সংস্থা, বাংলাদেশ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থা ও নাগরিক নাট্যাঙ্গন-এর সভাপতি ছিলেন। প্রকাশিত ৫টি অ্যালবাম: 'এই কথাটি মনে রেখো', 'আমি যখন তার দুয়ারে', 'কলিম শরাফীর যত গান', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান' এবং 'জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কথা ও সুরে নবজীবনের গান'। ৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীদের সংগঠিত করেন। যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে গণআদালতে সম্পৃক্ত হওয়ায় ১৯৯১-এ রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় কলিম শরাফীকে আসামি করা হয়। পুরস্কার: একুশে পদক (১৯৮৫), স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৯৯), নাসিরউদ্দিন

স্বর্ণ পদক (১৯৮৮), 'বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ স্বর্ণ পদক' (১৯৮৭), সত্যজিত রায় পুরস্কার (১৯৯৫) এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র হতে 'কৃতি বাঙ্গালী সম্মাননা পদক' (১৯৮৮)-এ ভূষিত। বাংলা একাডেমী ফেলোশীপ, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, সিকোয়েন্স অ্যাওয়ার্ড অব অনার, রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী অ্যাওয়ার্ড, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গুণীজন সংবর্ধনা। বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত 'রবীন্দ্র পুরস্কার-২০১০'-এ ভূষিত। মৃত্যু. ঢাকা, ২রা নভেম্বর, ২০১০।

কল্পনা দত্ত যোশী (১৯১৩-১৯৯৫)॥ জন্ম. শ্রীপুর, চট্টগ্রাম, ২৭ জুলাই ১৯১৩। বিপ্লবী। পিতা নিবোদবিহারী দত্ত, মাতা শোভনবালা দত্ত। চট্টগ্রাম ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯২৯-এ মেট্রিক পাস। কলকাতা বেথুন কলেজ-এ বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত। শহীদ ক্ষুদিরাম এবং বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেথুন কলেজ-এ গড়ে ওঠা ছাত্রীসংঘে যোগদান। ১৯৩০-এ চট্টগ্রামে ফিরে পূর্ণেন্দু দস্তিদারের মাধ্যমে মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে পরিচিত। মাস্টারদা প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা-য় যোগদান। তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতৃবৃন্দ গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রমুখ বিচারাধীন বন্দী। সে-সময় নারীদের বিপ্লবী দলে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিন্তু মাস্টারদা এই সমস্ত নিয়মনীতি শিথিল করে কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-কে তাঁর দলে গ্রহণ করেন। কলকাতা থেকে ফেরার সময় তিনি গোপনে কিছু বিস্ফোরক নিয়ে আসেন, এছাড়াও গোপনে গান কঁনও তৈরি করেছিলেন। এই সময় বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের বিচার ও সাজা রুখতে তিনি বেশ কিছু সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি কোর্ট এবং জেলে ডিনামাইট দ্বারা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিলেন, যাতে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ পালাতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের উপর কিছু প্রতিবন্ধকতা আসে। এ-সময় তিনি প্রায়ই মাস্টারদার সঙ্গে ঘুরে গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। এরই সঙ্গে তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার গুলি চালনার প্রশিক্ষণ নিতেন। ১৯৩১-এ সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে চট্টগ্রামের ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব দেন। নির্দিষ্ট দিনের এক সপ্তাহ আগে পুরুষের ছদ্মবেশে একটি সমীক্ষা করতে গিয়ে তিনি ধরা পড়েন ও গ্রেফতার হন। জেলে বসে তিনি অপারেশন পাহাড়তলী এবং বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের আত্মহত্যার খবর শোনেন। জামিনে মুক্তি পেয়ে মাস্টারদার নির্দেশে কিছুদিন আত্মগোপন। ১৯৩৩-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি পুলিশ তাদের গোপন ডেরা ঘিরে ফেলে। কল্পনা এবং মনীন্দ্র দত্ত পালাতে সক্ষম হলেও মাস্টারদা বন্দী হন। কিছুদিন পর কল্পনা এবং তাঁর কিছু সহযোদ্ধা পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়; কল্পনা দত্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৯-এ মুক্তিলাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নাম দিয়েছিলেন 'অগ্নিকন্যা', জওয়াহেরলাল নেহেরু বলেছেন 'বাহাদুর লেড়কি'। ১৯৪৩-এ সিপিআই নেতা পি.সি.যোশীর সঙ্গে বিবাহ হয়। তিনি চট্টগ্রামে ফিরে যান এবং দলের মহিলা ও কৃষক সংগঠনকে চাঙ্গা করেন। ১৯৪৬-এ সিপিআই প্রার্থী হয়ে তিনি চট্টগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জয়ী হতে পারেন নি। ১৯৪৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে রাজনীতিতে অবদান রাখেন। মৃত্যু. দিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।



কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-১৮৯৬)॥ জন্ম. কুমারখালি, কুষ্টিয়া, ১৮৩৩। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার। বাল্যকালে কৃষ্ণনাথ মজুমদারের ইংরেজি স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন। অর্থাভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। ১৮৫৫-তে নিজগ্রামে একটি ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা। বেশ কিছুদিন ঐ



স্কুলে বিনাবেতনে শিক্ষকতা। পরে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। প্রথমে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ লিখতেন। ১৯৬৩-র এপ্রিল মাসে কুমারখালি থেকে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। পত্রিকাটি পরে পাক্ষিক ও সর্বশেষ সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এতে সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ মুদ্রিত হতো। এছাড়া কুসীদজীবী ও নীলকার সাহেবদের শোষণের কাহিনী ও প্রকাশিত হতো। ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও দেশি জমিদারদের হুমকি তাঁকে এ-কাজ থেকে বিরত করতে পারে নি। ১৮৭৩-এ কুমারখালি গ্রামে এ পত্রিকার নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত। আঠারো বছর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' সম্পাদনা করার পর সাংবাদিকতা পরিত্যাগ করে ধর্মসাধনায় মনোনিবেশ। ধর্মভাব প্রচারে জন্য 'কাঙাল ফিকির চাঁদের দল' নামে একটি বাউল গানের দল গঠন। গান রচনায় পারদর্শিতা প্রদর্শন। স্বরচিত গানে 'কাঙাল' ভণিতা ব্যবহার। তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা আঠারো। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বিজয় বসন্ত (১৮৫৯), চারু-চরিত্র (১৮৬৩), কবিতা কৌমুদী (১৮৬৬), অক্রুর সংবাদ (১৮৭৩), চিত্তচপলা (১৮৭৬), কাঙাল-ফিকির চাঁদ ফকিরের গীতাবলী (১৮৮৭-১৮৯৩)। ১৯০১-এ 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত। আমৃত্যু বঙ্গদেশে শিক্ষাপ্রসার ও সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা। মৃত্যু. ১৬ এপ্রিল ১৯৯৬।

কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ (১৯২১-১৯৭৫)॥



জন্ম. চাটমোহর পাবনা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২১। পৈতৃক নিবাস কলতা গ্রাম, মানিকগঞ্জ। সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক। পুলিশ অফিসার (দারোগা) কাজী আফাজউদ্দীন আহমদ তাঁর পিতা। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ৮ম থেকে ৯ম শ্রেণিতে উঠার পর পরই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। কলকাতা গমন এবং সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। ১৯৪১-এ দ্বিমাসিক সাহিত্যপত্র 'মৃত্তিকা' প্রকাশ। ১৯৪৬ পর্যন্ত এ পত্রিকা সম্পাদনা। মাসিক 'সওগাত' ও সাপ্তাহিক 'দেশের কথা'র সম্পাদনা-সূত্রে যুক্ত (১৯৪৩-১৯৪৪)। মাসিক 'মোহাম্মদীর' ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক (১৯৪৫-১৯৪৭)। দেশ বিভাগের (আগস্ট ১৯৪৭) পর পরই কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আগমন। পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'জিন্দেগী' (৪ সেপ্টেম্বর-১৯৪৭) প্রকাশ ও সম্পাদনা। দৈনিক 'ইনসাফ'-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। ১৯৫১-তে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের তথ্য বিভাগে সিনিয়র সাব-এডিটর পদে যোগদান। এ বিভাগের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক 'পাক-সমাচার' সম্পাদনা (১৯৫১-১৯৭২)। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার পক্ষে বিবৃতি প্রদান। ১৯৭২-এ বাংলাদেশ সরকারের তথ্য বিভাগ থেকে প্রকাশিত শিশু-কিশোর সাময়িকী 'নবারুণ'-এর সম্পাদক নিযুক্ত। একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। 'চর ভাঙা চর' (১৯৫১) তাঁর একখানি বিশিষ্ট উপন্যাস। নদীর ভাঙন ধারার পটভূমিতে রচিত এ উপন্যাসে জীবন-সমস্যার বাস্তবচিত্র আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্কিত। উপন্যাসে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৬৬)। মৃত্যু. ঢাকা, ২৬ মার্চ, ১৯৭৫।

কাজী আকরম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬৩)॥ জন্ম.



পায়গ্রাম খুলনা, ১৮৯৬। লেখক। পায়গ্রাম হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পাস (১৯১৫)। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। প্রথম বিভাগে বি.এ. (১৯১৯) পাস করার পর ইংরেজিতে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। কংগ্রেসের আহবানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠত্যাগ করে ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ। ১৯২২-এ এম.এ. (ইংরেজি) পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ। অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া কলেজ ও করটিয়া সাদত কলেজে অধ্যাপনা (১৯২৩-১৯৩০)। ১৯৩০-এ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ইংরেজি অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯৪০ পর্যন্ত এ কলেজে অধ্যাপনা। রাজশাহী কলেজে যোগদান। ১৯৫৩ পর্যন্ত এ কলেজে

অধ্যাপনা করার পর পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৬১-তে অধ্যাপনার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ। কবি, ইতিহাস রচয়িতা ও অনুবাদক হিসেবে খ্যাত। তাঁর রচিত 'ইসলামের ইতিহাস' (১৯২৪) গ্রন্থখানি তাঁর ইতিহাস চেতনার স্বাক্ষর। তাঁর কবিতায় দেশাত্মবোধ ও গ্রামবাংলার প্রকৃতি মনোজ্ঞভাবে প্রস্ফুটিত। 'নওরোজ' (১৯৩৮), 'পল্লীবাণী' (১৯৪৩), 'আমরা বাঙ্গালি' (১৯৪৫) প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট কবিতাগ্রন্থ। আরবি-ফারসি-উর্দু সাহিত্য অনুবাদে দক্ষতার পরিচয় প্রাদন। 'যুগবানী' (১৯৪৩), 'মসনবী রূমী' (১৯৪৮), 'করীমা-ই-সাদী' (১৯৪৮), 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' (১৯৬১) প্রভৃতি তাঁর অনূদিত গ্রন্থ। মৃত্যু. ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩।

কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৪৮)।



জন্ম. পোর্টব্লেয়ার, আন্দামান, ১৮৮৭। আদর্শ শিক্ষক, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কাণ্ডারী ও লেখক। পিতা কাজী আবদুল কাদীর পোর্টব্লেয়ার সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। যশোর জিলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক। যশোর জিলা স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ (১৯১০)। ঢাকা সরকারী মুসলিম হাইস্কুলে সিনিয়র শিক্ষকরূপে বদলি (১৯১১)। প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেশাল অফিসার স্টেপলটনের সহকারী। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের তর্কশাস্ত্রের শিক্ষক (১৯২৮)। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পি জে হার্টগের সচিবের দায়িত্ব পালন। স্কুল পরিদর্শক হিসেবে নোয়াখালী, কৃষ্ণনগর, কলকাতা, জলপাইগুড়ি ও বরিশালে অবস্থান। অবসর গ্রহণের পর (১৯৪৬) বরিশালে একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিজস্ব পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও সাফল্য অর্জন। অনগ্রসর বাঙালি মুসলিম সমাজকে শিক্ষা ও চিন্তায় উন্নত করতে আজীবন প্রয়াসী। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬)-এর উদ্যোক্তারূপে লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সমাজের সংস্কারসাধনে উদগ্রীব। শিখা গোষ্ঠীর কার্যক্রমে বিশেষ সম্পৃক্তি। যশোর জিলা স্কুলে আবুল হুসেনের শিক্ষক। এজন্যে আবুল হুসেনের ওপর তাঁর বিশেষ প্রভাব। প্রবন্ধ-সঙ্কলন 'আমাদের দুঃখ' (১৯৩৪) একমাত্র গ্রন্থ। প্রবন্ধগুলি 'শিখা', 'নওরোজ', 'দীপিকা', 'নব্যবাংলা', 'জয়তী' ও 'বুলবুল' পত্রিকায় প্রকাশিত; এর বাইরেও কিছু রচনা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। প্রবন্ধের ভাষা প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী ও নিরাভরণ। রচনায় মনন ও চিন্তাশক্তির দীপ্তি লক্ষযোগ্য। কাজী ইমদাদুল হকের অসমাপ্ত 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের অন্তিমাংশের এগারটি পরিচ্ছেদ রচনা। মৃত্যু. ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু, কলকাতা, ৩ নভেম্বর ১৯৪৮।

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)॥ জন্ম.



বাগমারা গ্রাম, পাংশা, রাজবাড়ী, ২৬ এপ্রিল ১৮৯৪। লেখক ও চিন্তাবিদ। পিতা কাজী সগীরউদ্দীন ছিলেন রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার। ১৯১৩-তে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯১৫-১৯১৭-তে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে যথাক্রমে আই.এ. ও বি.এ. এবং ১৯১৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. পাস। প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে মাতুল-কন্যা জমিলা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯২০-তে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলা অধ্যাপক নিযুক্ত। দীর্ঘদিন অধ্যাপনার পর কলকাতায় বদলি এবং সেখানে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের অধীনে টেক্সট বুক্স কমিটির সম্পাদক পদে বৃত। এই পদ থেকেই অবসর গ্রহণ। ১৯৬৫-তে নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'তরুণ পত্র' পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি নিযুক্ত। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকল্পে ১৯২৬-এ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। তিনি ছিলেন সমিতির অন্যতম স্তম্ভ ও নেতা। সাহিত্য সমাজের পত্রিকা 'শিখা'য় (১৯২৭) তাঁর মুক্ত চিন্তা ও যুক্তি ভিত্তিক বিভিন্ন লেখার জন্য ঢাকার নওয়াব পরিবার-কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে ঢাকা ত্যাগ ও স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস। রাজা রামমোহন রায়' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি গ্যেটেকে তাঁর জীবন-চেতনার আদর্শরূপে গ্রহণ। তাঁদের জীবনদর্শন ও সাহিত্য কর্মের ব্যাখ্যা-

বিশ্লেষণ, অনুশীলন অনুসরণ এবং সেই সঙ্গে বঙ্গের পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজে মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণা জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ। ইসলাম ধর্ম ও তার প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি গভীরতর আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস-নদীবক্ষে (১৯১৮); গল্পমীর পরিবার (১৯১৮); গদ্য রচনারবীন্দ্রকাব্য পাঠ (১৩৩৪), হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ (১৯৩৬) কবিগুরু গ্যেটে (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এবং উভয় খণ্ড প্রকাশিত, ১৯৪৬), Tagore's Role in the Reconstruction of Indian Thought (১৯৬১), সমাজ ও সাহিত্য (১৯৩৪), শ্বাশত বঙ্গ (১৯৫১), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (১ম খণ্ড, ১৩৬৯, ২য় খণ্ড, ১৩৭৬), নজরুল প্রতিভা (১৯৪৯)। ১৯৫৬-তে বিশ্বভারতী-তে প্রদত্ত বক্তৃতাবলি 'বাঙালার জাগরণ' নামে গ্রন্থিত হয়ে প্রকাশিত হয় ঐ বছরেই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপর ১৯৫৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা 'শরৎচন্দ্র ও তারপর' ১৯৬১-তে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। জীবনের শেষপর্বে প্রকাশিত গ্রন্থ 'মোহাম্মদ ও ইসলাম' (১৯৬৬) এবং পবিত্র কোরানের প্রাঞ্জল ও সুললিত বঙ্গানুবাদ। তাঁর সম্পাদিত 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' একখানি জনপ্রিয় বাংলা অভিধান। বিশ দশকে ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি একজন সজাগ বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও লেখক হিসেবে সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে নিজের প্রজ্ঞা ও সংবেদনশীলতাকে সক্রিয় রেখেছিলেন। তাঁর গদ্যরচনা প্রাঞ্জল ও বিশেষণধর্মী। মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার ছাপ তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় বিদ্যমান। ন্যায়নিষ্ঠা, উদার ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য খ্যাত। মৃত্যু., কলকাতা, ১৯ মে ১৯৭০।

কাজী আবদুল বারী (১৯৩৭-১৯৮৩)॥ জন্ম. অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ১৯৩৭। রাজনীতিবিদ। কৈশোরেই রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট। স্কুলের ছাত্র থাকাকালে ময়মনসিংহ শহরে ১৯৫২-তে ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ। কলেজে পড়ার সময়ে ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত। বারবার গ্রেফতারের ফলে কলেজের পড়াশুনা শেষ করা সম্ভব হয় নি। ১৯৫৭-তে ন্যাপ প্রতিষ্ঠা হবার পর ময়মনসিংহ জেলার ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৫৯-এ আত্মগোপন অবস্থায় গ্রেফতার। সামরিক আদালতে বিচারে তাঁকে বেত্রদণ্ড দেয়া হয়। এই দণ্ডাদেশ কার্যকর হবার ফলে শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়। শেষজীবনে পুরোপুরি বধির হয়ে গিয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিশোরগঞ্জ জেলা ন্যাপের সভাপতি। আদর্শবাদী, সৎ ও নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে অষ্টগ্রাম এলাকায় ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। মৃত্যু. ১৯৮৩।

কাজী আবুল কাসেম (১৯১৩-২০০৪)॥ জন্ম. উমেদপুর, যশোর ৭ মে ১৯১৩। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার পারকুলা গ্রামে। পিতা কাজী মকবুল আলী, মাতা মেহেরউন্নিসা খাতুন। ১৯২৬-এ দু'বার কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েও পাঠ নিতে পারেন নি। প্রথমবার বয়স কম ছিল বলে আর দ্বিতীয়বার অর্থাভাবে। পরে কলকাতায় শুভাকাঙ্ক্ষী এক বন্ধুর সহায়তায় 'এন মিত্র অ্যান্ড কোম্পানি' নামের কমার্শিয়াল আর্ট স্টুডিওতে শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগদান। এখানেই হাতে-কলমে কাজ শেখেন এবং ক্রমে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান চিত্রকর হয়ে ওঠেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত তাঁর আঁকা ছবি কলকাতার সেরা সব পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত। ভারতবর্ষ, বসুমতী, মোহম্মদী, সওগাত, বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকায় সেই প্রথমমুসলমান চিত্রকরের আবির্ভাব ঘটে। শিল্পকলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেয়েও ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পশ্চাদ্‌পদতা ডিঙিয়ে হয়ে উঠেছিলেন দক্ষ চিত্রকর। রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রী হিসেবেও তিনি উপমহাদেশের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। 'দোপেয়াজা' ছদ্মনামে আজাদ ও সওগাতসহ নানা পত্রিকায় তাঁর কার্টুন চিত্রাবলি রসবোধ ও তীক্ষ্ম সমাজচেতনায় উজ্জ্বল। ছোটদের বইয়ের অলংকরণেও তাঁর খ্যাতি ছিল। রম্য ও পাঠ্যপুস্তকের প্রচ্ছদ অলংকরণের বহু কাজ করেছেন তিনি। গ্রন্থসজ্জা, বই-ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ, শীর্ষচিত্র (হেডপিস) ও কমিকস স্ট্রিপ অংকনেও দক্ষতা অর্জন। ১৯৩৭-এ হাসিনা বেগমের সঙ্গে বিয়ে। তিনি গল্প-ছড়া আর গান রচনা করেছেন। তাঁর লেখা ১০০টির মতো



গানের থেকে ২৬টি নির্বাচন করে গানের বই 'গানগুলি মোর' বের হয়। পুরস্কার: শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৮), জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পুরস্কার ও নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮৯) শিল্পী এসএম সুলতান স্বর্ণ পদক (১৯৯৪), মাহবুবউল্লাহ-জেবন্নেসা কল্যাণ ট্রাস্ট স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী পুরস্কার ও বাংলাদেশ চারুশিল্পী সম্মাননা (১৯৯০), তমদ্দুন মজলিশ মাতৃভাষা পদক (২০০০)। মৃত্যু, ঢাকা, ১৯ জুলাই ২০০৪।

কাজী আব্বার আলী (১৯০১-১৯৯৪)॥ জন্ম. বাখরনগর গ্রাম, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১ জানুয়ারি ১৯০১। শিক্ষাবিদ। পিতা হাজী জৈনউদ্দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (১৯২৪) ও বি.এল. (১৯২৭) এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. টি. (১৯৩৪) ডিগ্রি লাভ। কুমিল্লা জেলা আদালতে আইন ব্যবসায় (১৯২৭-১৯৩২)। ১৯৩৪-এ সরকারি স্কুলে শিক্ষকতার কর্মে যোগদান। ঢাকা আরমানীটোলা সরকারি স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ফরিদপুর জেলা স্কুল, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও ঢাকা টেকনিক্যাল স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালন। সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের (১৯৬১) পর ঢাকার আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন। এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবেও কর্ম সম্পাদন। নিজ গ্রামে নিজস্ব সম্পত্তি দান করে বিদ্যালয় স্থাপন। নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক হিসেবে খ্যাত। এ দেশে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে (Direct Method) ভাষা শিক্ষাদানের আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক রীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপযোগী দ্রুতপঠন ও ব্যাকরণসহ ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন। গ্রন্থ: Twelve tales, Steps to English Grammar, Stories for Little Learners, Stories for the Young, Conduct in Islam, Beginner's English Grammar, Translation and Composition, English Primer (Direct Method)। শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখায় পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব প্রদান (১৯৬৮)। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলন চলাকালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নির্বিচারে ছাত্র-শিক্ষক হত্যার প্রতিবাদে প্রকাশ্য বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে খেতাব বর্জন। মুক্তিযুদ্ধের (১৯৭১) সময়ে ঢাকায় থেকে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান। শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখায় স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ (১৯৯৫)। মৃত্যু, ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৪।



কাজী আবদুল মান্নান (১৯৩০-১৯৯৪)॥ জন্ম. মীরচক, ইংরেজ বাজার, মালদহ, ভারত, ১ জানুয়ারি ১৯৩০। গবেষক ও অধ্যাপক। পিতা স্কুল-শিক্ষক কাজী আবদুল গফুর। হেমায়েত মেমোরিয়াল মাদ্রাসা (দাদনচক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক (১৯৪৫), মালদহ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. (১৯৪৭), রাজশাহী কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী করে বাংলায় বি.এ. অনার্স (১৯৪৯) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে বাংলায় এম.এ. (১৯৫১) পাস। 'The Emergence and Development of Dobhasi Literature in BengalÕ শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ (১৯৬৪)। সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ ও রাজশাহী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক (১৯৫২-১৯৫৮)। ১৯৫৮-র ১ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬৪-র ১ আগস্ট রিডার ও ১৯৭১-এর ৩ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক পদে উন্নীত। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারত গমন সেখানে নয় মাস অবস্থান। ভিজিটিং অধ্যাপক হিসাবে ভারতের বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন (জুলাই ১৯৭১-জানুয়ারি ১৯৭২)। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ভারত থেকে রাজশাহী



প্রত্যাবর্তন (২১ জানুয়ারি ১৯৭২)। পরের দিন ২২ জানুয়ারি (১৯৭২) পুনরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পূর্ব পেশায় যোগদান। বিভাগীয় প্রধান (জানুয়ারি ১৯৭২-সেপ্টেম্বর ১৯৭৩) ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান (অক্টোবর ১৯৭৩-সেপ্টেম্বর ১৯৭৬)। ১৯৮৯-র ১৭ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নজরুল অধ্যাপক' পদ লাভ। ১৯৯১-র ৩০ জুন অবসর গ্রহণ। দক্ষ অধ্যাপক, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিদীপ্ত বক্তা ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক হিসেবে খ্যাত। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক প্রয়াস ও সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় কৃতিত্ব প্রদর্শন। প্রকাশিত গ্রন্থ: আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (১৯৬১), The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal (১৯৬৬), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৯৭০), রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৮৯), আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ (১৯৯০)। সম্পাদনা: মশাররফ রচনা সম্ভার (১-৫ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫-১৯৮৫)। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা গ্রন্থের জন্য আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৬২)। মৃত্যু. রাজশাহী, ২২ মার্চ ১৯৯৪।

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)॥ গদাইপুর গ্রাম, খুলনা, ৪ নভেম্বর ১৮৮২। সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। খুলনা জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯৬), কলকাতা মাদ্রাসা থেকে এফ.এ. (১৮৯৮) ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. (১৯০০) পাস। কিছু



দিন ইংরেজিতে এম.এ. ও বি.এল. ক্লাসে অধ্যয়ন। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.টি. পাস (১৯১৪)। ১৯০৩-এ কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকের চাকরি গ্রহণ। ১৯০৬-এ আসামের শিলং-এ শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের অফিসে উচ্চমান সহকারী পদে দায়িত্ব পালন। ১৯০৭-এ ঢাকা মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় যোগদান। ১৯১১-তে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ভূগোলের অধ্যাপক ও ১৯১৪-তে ঢাকা বিভাগের মুসলিম শিক্ষার সহকারী পরিদর্শক নিযুক্ত। ১৯২১-এর মে মাসে ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হলে এর প্রথম সেক্রেটারি পদে নিযুক্তি লাভ। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। 'আবদুল্লাহ' (১৯৩৩) তাঁর একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। মুসলিম সমাজের নানা দোষত্রুটি এতে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত। এ উপন্যাসের ত্রিশটি পরিচ্ছেদ তাঁর নিজের রচনা। বাকি এগারোটি পরিচ্ছেদ তাঁর মৃত্যুর পর শিক্ষাবিদ আনোয়ারুল কাদির কর্তৃক তাঁর খসড়া অনুসরণ করে রচিত। মুসলিম সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে 'আবদুল্লাহ'র ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ। কবিতা, প্রবন্ধ ও শিশুসাহিত্যের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: উপন্যাস–'আবদুল্লাহ' (১৯৩৩); কাব্য–'আঁখিজল' ও 'লতিকা'; প্রবন্ধ: 'প্রবন্ধমালা'; শিশুতোষ গ্রন্থ 'নবীকাহিনী'। 'শিক্ষক' (১৯২০) নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র (১৯১১) অন্যতম স্থপতি। সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'র পরিচালনা কমিটির সভাপতি। বাঙালি মুসলমান সমাজের কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর সাহিত্য-সাধনার মূল লক্ষ্য। 'খান বাহাদুর' উপাধি লাভ (১৯২৬)। মৃত্যু. কলকাতা, ২০ মার্চ ১৯২৬।

কাজী ওবায়দুল হক (?-১৯৭১)॥ জন্ম. সরুলিয়া গ্রাম, সাতক্ষীরা, খুলনা। চিকিৎসক। যশোর জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক, রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে আই.এসসি. এবং পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাস। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজি বিভাগে যোগদান। (১৯৫৫)-তে যশোর শহরে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাক সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত. ৫ এপ্রিল ১৯৭১।

কাজী কাদের নেওয়াজ (১৯০৯-১৯৮৩)॥ জন্ম. মাতুলালয়, তালিবপুর গ্রাম, মুর্শিবাবাদ, ১৫ জানুয়ারি ১৯০৯। পৈতৃক নিবাস মঙ্গলকোট গ্রাম, বর্ধমান। কবি। স্থানীয় মাখরুন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স (১৯২৩) ও বহরমপুর কলেজ থেকে ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স (১৯২৯) পাস। কিছুকাল এম.এ. ক্লাসে অধ্যয়ন। ১৯৩২-এ বি.টি.পাস। পরের বছর (১৯৩৩) স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকরি লাভ। ১৯৪৬-এ সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে

পদোন্নতি লাভ। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর



পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন এবং নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষকতার কর্মে যোগদান। ১৯৫১-তে দিনাজপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত। ১৯৬৬-তে এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ। মাগুরা জেলার মুজদিয়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান। একজন বিশিষ্ট কবি। প্রেম ও পল্লীর শ্যামল প্রকৃতি তাঁর কবিতায় মনোজ্ঞভাবে প্রকাশিত। 'মরাল' (১৯৩৪) তাঁর বহুল সমাদৃত কবিতাগ্রন্থ। শিশুতোষ সাহিত্যেও খ্যাতিমান। 'দাদুর বৈঠক' (১৯৪৭) তাঁর একখানি সুপরিচিত শিশুরঞ্জক গদ্য রচনা। 'নীল



কুমুদী' (কাব্য-১৯৬০) ও 'দুটি তীরে' (উপন্যাস-১৯৬৬) তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬) ও প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. ৩ জানুয়ারি ১৯৮৩।

কাজী দীন মোহাম্মদ (১৯০৯-১৯৭৫)॥ জন্ম. টুঙ্গিপাড়া গ্রাম, গোপালগঞ্জ, ১৯০৯। লেখক। গোপালগঞ্জ সীতানাথ একাডেমি থেকে এন্ট্রান্স (১৯২৬) পাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে থেকে আই.এ. (১৯২৮) ও বি.এ. (১৯৩০) ডিগ্রিলাভ। ১৯৩২-এ বি.টি. পাস। কিছুদিন যশোর জেলার একটি স্কুলে শিক্ষকতা। বঙ্গীয় সরকারের জনসংযোগ দফতরে সহকারী পরিচালক পদে নিযুক্তি লাভ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রেষণে সিভিল ডিফেন্স বিভাগে প্রেরিত। সেখানে পোস্টিং এ.আর.পি. শাখার উপনিয়ন্ত্রক হিসেবে। যুদ্ধের পর আবার জনসংযোগ বিভাগে পূর্বপদে যোগদান। দেশবিভাগের (১৯৪৭) পর কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আগমন এবং পূর্ববঙ্গ সরকারের জনসংযোগ বিভাগে ফিল্ড পাবলিসিটি শাখার সহকারী পরিচালক পদে যোগদান। ১৯৬৫-তে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন। তাঁর 'গোলকচন্দ্রের আত্মকথা' একখানি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গাশ্রয়ী সাহিত্যকীর্তি। কৌতুক ও পরিহাসের সুরে সামাজিক অনাচার ও দুর্নীতির চিত্রাঙ্কনে দক্ষতার পরিচয় প্রদান। মননশীল প্রবন্ধ ও শিশুতোষ গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবেও পরিচিত। 'কেনাই ডাকু' (১৯৪১) ও 'ভিজা বিড়াল' (১৩৬৮) তাঁর শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। মৃত্যু. ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)॥ জন্ম. চুরুলিয়া গ্রাম, আসানসোল, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ (২৪ মে ১৮৯৯)। সাহিত্যিক। চুরুলিয়ার জনৈক সুফি সাধকের মাজারের খাদেম ও উক্ত মাজারে নিয়ন্ত্রণাধীন মসজিদের ইমাম কাজী ফকির

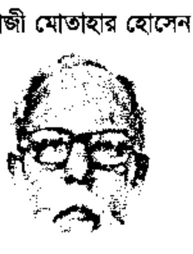


আহমেদ তাঁর পিতা। ফকির আহমদের মৃত্যুর ১৯০৭ পর কাজী পরিবার চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত। দশ বছর বয়সে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯০৯)। সংসারের চাপে ঐ মক্তবেই এক বছর শিক্ষকতা। বার বছর বয়সে লেটোর দলে যোগদান এবং দলের জন্য পালাগান রচনা। একজন দুরন্ত স্বভাবের বালক হিসেবে গ্রামবাসীর কাছে পরিচিতি লাভ। হৈ হুল্লোড় করে বেড়ানোই ছিল তাঁর স্বভাব। তাঁর জ্বালাতন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি কর্তৃক তাঁকে রানীগঞ্জের কাছে শিয়ারশোল রাজ স্কুলে ভর্তি। স্কুলের বাঁধাধরা জীবনের প্রতি অনাগ্রহ প্রদর্শন। সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার কিছুদিন পরে ১৩/১৪ বছর বয়সে স্কুল ত্যাগ ও বাড়ি থেকে পলায়ন। আসানসোল গিয়ে সেখানকার এক রুটির দোকানে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে চাকরি গ্রহণ। কাজী রফিজউদ্দিন নামে আসানসোল থানার একজন দারোগা একদিন তাঁর কণ্ঠে গান শুনে তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার কাজীর সিমলা গ্রামে নিয়ে গিয়ে ত্রিশাল বাজারে নিকটবর্তী দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে

দেন। ১৯১৪-র ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হবার পরেই কাউকে কিছু না বলে কাজীর সিমলা ত্যাগ করে রানীগঞ্জে প্রত্যাবর্তন। নিজের ইচ্ছায় পুনরায় শিয়ারশোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি। ক্লাসে ভাল ছাত্র ছিলেন বলে তাঁর স্কুলের বেতন ও বোর্ডিং-এর আহার ছিল ফ্রি, তদুপরি রাজবাড়ি থেকে মাসিক সাত টাকা বৃত্তি লাভ। প্রি-টেস্ট পরীক্ষাকালে পড়াশুনা ত্যাগ করে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে যোগদান (১৯১৭)। নৌসেনাতে তিন মাস ট্রেনিং গ্রহণ। করাচি সেনানিবাসে পোস্টিং। হাবিলদার পদে উন্নীত। অবসরকালে সাহিত্যচর্চা। গল্প, কবিতা, গান ও প্রবন্ধ লিখে কলকাতায় বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রেরণ। 'সওগাতের' মে-জুন ১৯১৯ সংখ্যায় তাঁর প্রথম গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকথা', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় (১৯১৯) প্রথম কবিতা 'মুক্তি' ও সওগাতের' কার্তিক সংখ্যায় অক্টোবর-নভেম্বর ১৯১৯প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' প্রকাশিত। ১৯২০-এর প্রারম্ভে বাঙালি রেজিমেন্ট ভেঙে দেয়া হলে করাচি ত্যাগ করে কলকাতায় আগমন এবং ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে আশ্রয় গ্রহণ। সে সময় দেশে ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২) চলছিল। সে অগ্নিঝরা আন্দোলনের পটভূমিকায় পূর্ণোদ্যমে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ। সাপ্তাহিক 'বিজলীর ২২ ডিসেম্বর-জানুয়ারি (১৯২২) সংখ্যায় তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হলে তাঁর কবিখ্যাতি চারিদিকে বিস্তার লাভ। সাহিত্যসেবার পাশাপাশি সাংবাদিকতা কর্মে আত্মনিয়োগ। সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' (১৯২০)-এর যুগ্ম-সম্পাদক। তাঁর সম্পাদনায় অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' (১৯২২) প্রকাশিত। এতে দেশের মুক্তির দিশারি হিসেবে 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দলের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে উৎসাহ প্রদান ও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে তৎকর্তৃক বহু অগ্নিঝরা সম্পাদকীয়, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ। 'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায় (২২ সেপ্টেম্বর ১৯২২) তাঁর 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় গ্রেফতার। কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁর বিচার অনুষ্ঠিত। উক্ত আদালত কর্তৃক তাঁকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান (৮ জানুয়ারি, ১৯২৩)। হুগলী জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন সময়ে কয়েদিদের ওপর জেল কর্তৃপক্ষের মিথ্যাচারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট পালন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ মনীষী কর্তৃক নজরুলকে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম ও পত্র প্রেরণ। প্রেসিডেন্সি জেলের ঠিকানায় প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম- 'Give up hunger strike. our literature claims you'। 'Addresee not foundÓ মন্তব্য করে ডাক কর্তৃপক্ষ সে টেলিগ্রাম হুগলী জেলে নজরুলে কাছে না পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে ফেরত পাঠায়। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নাটক নজরুলকে উৎসর্গ। কুমিল্লার বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে ৩৯ দিন পরে অনশন ভঙ্গ। ১৯২৩-এর ১৫ অক্টোবর জেল থেকে মুক্তিলাভ। ১৯২৪-এর ২৪ এপ্রিল কুমিল্লার গিরিবালা দেবীর (বিরজাসুন্দরীর জা) কন্যা আশালতা সেনগুপ্তার (ডাকনাম দুলি। বিবাহোত্তর নাম প্রমীলা) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। ১৯২৫-এ ফরিদপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান। এ সম্মেলনে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। নজরুলের কণ্ঠে তাঁর 'চরকার গান' শুনে গান্ধীজী মুগ্ধ হন। কংগ্রেসের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। কংগ্রেসের অঙ্গসংগঠন 'মজুর স্বরাজ পার্টির (১৯২৫) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। একই বছর তার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'লাঙল' (১৯২৫) পত্রিকা প্রকাশিত। ১৯২৬-এর ২ এপ্রিল রাজরাজেশ্বরী মিছিলকে কেন্দ্র করে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধলে এ বর্বরতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি কামনা করে 'লাঙল' পত্রিকায় অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ, গান ও কবিতা প্রকাশ। একই বছর নভেম্বর মাসে (১৯২৬) ফরিদপুর থেকে বঙ্গীয় বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তমিজুদ্দীন খানের কাছে পরাজিত। ১৯৩০-এ তাঁর চার বছরের প্রিয় শিশুপুত্র বুলবুল বসন্ত রোগে মারা গেলে শোকে মুহ্যমান হয়ে আত্মার প্রশান্তি লাভের জন্য বরদাকান্ত মজুমদারের কাছে অধ্যাত্মসাধনার দীক্ষা গ্রহণ। ১৯২৯-এর ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে তাঁকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান। সংবর্ধনা সভায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর সভাপতির ভাষণে নজরুলকে 'প্রতিভাবান বাঙালি কবি' বলে আখ্যায়িত। একই সভায় সুভাষচন্দ্র বসু কবিকে সম্ভাষণ করে বলেন, 'আমরা যখন যুদ্ধে যাব-তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব'। 'প্রলয় শিখা' কবিতাগ্রন্থে রাজদ্রোহমূলক কবিতা থাকার

অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ মামলা আনয়ন, আদালত কর্তৃক ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রদান। ১৯৩১-এর ৪ মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে জেল খাটার দায় থেকে অব্যাহতি লাভ ১৯৪০-এর অক্টোবর মাসে নবপর্যায়ে 'দৈনিক নবযুগ' প্রকাশিত হলে এর সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৪২-এর ১০ অক্টোবর মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত। যোগসাধনায় মনোনিবেশ। কিছুকাল পরে চৈতন্য ও বাকশক্তি লোপ পাওয়ায় তাঁর সাহিত্য-সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত এ অবস্থায় জীবনযাপন। বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ১৯৭২-এর ২৪ মে তাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে কলকাতা থেকে ঢাকায় আনয়ন। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অবদান অনন্যসাধারণ। বাংলা কাব্যজগতে 'বিদ্রোহী কবি' নামে খ্যাত। রবীন্দ্রযুগে যে-সব কবি রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম করে স্বাধীনভাবে কবিতা রচনা করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান শীর্ষে। জনপ্রিয়তায় রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। 'অগ্নিবীণা' (১৯২২), 'বিষের বাঁশি' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'ফণি-মনসা' (১৯২৭), 'জিঞ্জির' (১৯২৮), 'সন্ধ্যা' (১৯২৯) ও 'প্রলয়-শিখা' (১৯৩০) কবিতাগ্রন্থে কবির বিদ্রোহীরূপ পরিস্ফুট। পৌরুষ ও শক্তির চিত্তচাঞ্চল্যে গণচেতনা ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়, স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতা স্পৃহায়, মানবতা ও সাম্যবাদে বাণীবিন্যাসে এ-সকল কাব্যের কবিতাবলি সমুজ্জ্বল। রুদ্রবীণার ঝঙ্কারময় কবিতার পাশাপাশি কোমল-মধুর মানবিক প্রেমের কবিতা রচনা। 'দোলন-চাঁপা' (১৯২৩), 'ছায়ানট' (১৯২৪), 'পুবের হাওয়া' (১৯২৫), 'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৭), ও 'চক্রবাক' (১৯২৯), কাব্যে নজরুলের প্রেমিকরূপ প্রকাশিত। 'চিত্তনামা' (১৯২৫), ও 'মরু-ভাস্কর' (১৯৫৭) জীবনীমূলক কাব্য। 'ঝিঙেফুল' (১৯২৬), ও 'সাতভাই চম্পা' ছোটদের কবিতা-গ্রন্থ গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটক রচনাও সিদ্ধহস্ত। 'বাঁধনহারা' (১৯২৭), 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০) ও 'কুহেলিকা' (১৯৩১) তাঁর উপন্যাস। 'ব্যথার দান' (১৯২২), 'রিক্তের বেদন' (১৯২৫), ও 'শিউলিমালা' (১৯৩১) গল্পগ্রন্থ 'ঝিলিমিলি' (১৯৩০), 'আলেয়া' ও 'মধুমালা' (১৯৫৯), নাটক 'যুগবাণী' (১৯২২), 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' (১৯২৩), 'দুর্দিনের যাত্রী' (১৯২৬), ও 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধ-পুস্তক। গীতিকার, সুরকার ও গায়ক হিসেবে অসাধারণ সুনাম অর্জন। দেশাত্মবোধক গান, কোরাস গান, প্রেমসংগীত, শ্যামাসংগীত, ইসলামি সংগীত, পল্লীগীতি ও হাসির গানের দক্ষ স্রষ্টা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর দেশাত্মবোধক গান ছিল মুক্তিকামী জনতার প্রেরণার উৎস। 'বুলবুল' (প্রথম খণ্ড-১৯২৮, ২য় খণ্ড-১৯৫২), 'চোখের চাতক' (১৯২৯), 'চন্দ্রবিন্দু' (২য় সংস্করণ, ১৯৪৬), 'নজরুল-গীতিকা' (১৯৩০), 'নজরুল স্বরলিপি' (১৯৩১), 'সুরসাকী' (১৯৩১), 'জুলফিকার' (১৯৩২), 'বন-গীতি' (১৯৩২), 'গুলবাগিচা' (১৯৩৩), 'গীতি-শতদল' (১৯৩৪), 'সুরলিপি' (১৯৩৪), 'সুর-মুকুর' (১৯৩৪), ও 'গানের মালা' (১৯৩৪), তাঁর সংগীত-গ্রন্থাবলি। 'অগ্নিবীণা, 'বিষের বাঁশি', 'ভাঙার গান', 'প্রলয়শিখা', 'যুগবাণী ও 'চন্দ্রবিন্দু' ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। বাংলা একাডেমী থেকে ১২ খণ্ডে 'নজরুল রচনাবলি' (২০০৫) নামে তাঁর সমগ্র রচনাবলি প্রকাশিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণ-পদক' (১৯৪৫), ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' (১৯৬০), রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি-লিট' (১৯৬৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি-লিট' (১৯৭৪) ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশের পদক' (১৯৭৬) প্রদান। বাংলাদেশের জাতীয় কবি। মৃত্যু. ঢাকা, (২৯ আগস্ট ১৯৭৬) ১২ ভাদ্র ১৩৮৩।

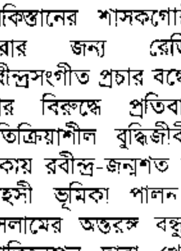
কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)॥ জন্ম. মাতুলালয়, লক্ষ্মীপুর গ্রাম, কুমারখালী-কুষ্টিয়া, ৩০ জুলাই ১৮৯৭। পৈতৃক নিবাস বাগমারা গ্রাম, পাংশা, ফরিদপুর। সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী। সেটেলমেন্টের আমিন কাজী গওহরউদ্দীন আহমদ তাঁর পিতা।



কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক (১৯১৫), রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এসসি. (১৯১৭), ঢাকা কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বি.এ. (১৯১৯) ও ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে পদার্থবিজ্ঞানে এম.এ. (১৯২১) পাস মেট্রিক পরীক্ষায় ১৫ টাকা, আই.এসসি. পরীক্ষায় ২০ টাকা ও বি.এ. পরীক্ষায় ৩০ টাকা করে মাসিক বৃত্তি লাভ। এম.এ. পড়ার সময়ে কলকাতার তালতলা নিবাসী মোহাম্মদ ফয়েজুর রহমানের কন্যা সাজেদা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ (১৯২১)। এম.এ. দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ডেমোনস্ট্রেটর নিযুক্ত (১৯২১)। ১৯২৩-এ সহকারী প্রভাষক পদ লাভ। ১৯৩৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতে এম.এ. পাস। ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ পুনর্বিন্যস্ত হয়ে 'গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগ' গঠিত হলে এর প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৫০-এ পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে এর রিডার ও বিভাগীয় প্রধানের পদ অলংকৃত। 'ডিজাইন অব এক্সপেরিমেন্টস' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ (১৯৫০)। এ অভিসন্দর্ভে তৎকর্তৃক গবেষণা কর্মে এক নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন, যা 'Hussasn's Chain RuleÓ নামে অভিহিত। ১৯৫৩-তে পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৬১-তে নিয়মিত অধ্যাপনার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ। একই বছর পরিসখ্যান বিভাগের 'সুপারনিউমারারি' অধ্যাপক পদে বৃত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব স্টাটিসটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর পরিচালক (১৯৬৪-১৯৬৬)। ১৯৬৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ইমেরিটার্স অধ্যাপক পদে নিযুক্তি দান। সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী হিসেবে খ্যাত। কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ আবুল হুসেন প্রমুখের সঙ্গে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬) প্রতিষ্ঠা। এর মুখপাত্র 'শিখা' (১৯২৭) পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের সম্পাদক। সাহিত্য সমাজের নেতৃত্বে পরিচালিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক: ধর্ম, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনায় সুস্থ মনন ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধের ঋজু পরিচয় উৎকীর্ণ 'সঞ্চয়ন' (১৯৩৭) তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের সংকলন: 'নজরুল কাব্য পরিচিত' (১৯৫৫), 'সেই পথ লক্ষ্য করে' (১৯৫৮), 'সিম্পোজিয়াম' (১৯৬৫), 'গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস' (১৯৭০), [illegible] তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ অসাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী এবং সেই আলোকে দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত গড়ে তোলার জন্য লেখনী পরিচালনা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতিদান ও শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালুর দাবিতে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ববাংলায় যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার একজন দৃঢ় পৃষ্ঠপোষক। বক্তৃতা, বিবৃতি ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে এ-সকল আন্দোলনে গতিদান। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ৬-দফাকে কেন্দ্র করে ষাটের দশকে পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের যে আন্দোলন সংঘটিত হয় তারও একজন বলিষ্ঠ সমর্থক। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালি-সংস্কৃতি খর্ব করার জন্য রেডিও-টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন (১৯৬৭)। প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের বিরোধিতার মুখে ঢাকায় রবীন্দ্র-জন্মশত বার্ষিকী (১৯৬১) পালনে সাহসী ভূমিকা পালন কবি কাজী নজরুল ইসলামের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দাবা খেলোয়াড়। প্রবন্ধসাহিত্যে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৬৬)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ (১৯৭৪)। 'জাতীয় অধ্যাপক' মর্যাদায় ভূষিত (১৯৭৫)। মৃত্যু ঢাকা, ৯ অক্টোবর ১৯৮১।

কাজী হাসান হাবিব (১৯৪৯-১৯৮৮)॥ জন্ম. উমেদপুর গ্রাম, যশোর, ১৯৪৯। চিত্রশিল্পী। ঢাকা চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ। কর্মজীবনে সরকারের তথ্য অধিদপ্তরের চিত্রশিল্পী পদে দায়িত্ব পালন। সমাজ সচেতন ও প্রগতিশীল চিত্রকর: বাংলার লৌকিক জীবন, শহরের ছিন্নমূল মানুষের জীবনাচরণ ও গ্রাম বাংলার নিসর্গ তাঁর চিত্রকলার ক্যানভাসে নিপুণভাবে অঙ্কিত বাংলাদেশের খ্যাতনামা কবিদের কবিতার স্তবক উদ্ধৃত করে তার তাৎপর্য অনুসারে চিত্রাঙ্কন করে প্রসিদ্ধি লাভ বইয়ের প্রচ্ছদ অঙ্কনে প্রতিভার পরিচয় প্রদান চিত্রশিল্পী



হিসেবে শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার ও প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে তিনবার জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পুরস্কার লাভ। শিল্পকলা একাডেমীতে তাঁর দুইটি একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত। মৃত্যু. ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৮।

কাজেম আলী মিঞা (১৮৫২-১৯২৬)॥ জন্ম. বাকলিয়া, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম, ১১ আগস্ট ১৮৫২। রাজনৈতিক নেতা, সমাজ-সেবক, শিক্ষাবিদ। 'কাজেম আলী মাস্টার' নামে সুপরিচিত। পিতা মুনশী কাছিম আলী ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে উকিল। তাঁর পিতা 'বীর পুরুষ' বলে খ্যাত। হুগলী থেকে এন্ট্রান্স পাস করে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় শিক্ষকতা শুরু। দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে ১৮৮৫-তে চিটাগাং মিডল ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা। এই স্কুল ছিল ভবিষ্যৎ ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। পরে পিতার সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে ১৮৮৩-তে চিটাগাং হাই ইংলিশ স্কুল স্থাপন। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান। চট্টগ্রামের কংগ্রেস-খেলাফত কমিটির নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভ। এই সময়ে চট্টগ্রামের জনসাধারণ-কর্তৃক বিশাল জনসভায় 'সেখ-এ-চাটগাম' উপাধি প্রদান। বার্মা অয়েল কোম্পানি ধর্মঘট, রেলওয়ে ধর্মঘট, অসহযোগ আন্দোলনে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রধান সহকর্মী ও পরামর্শদাতা। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন, খেলাফত কমিটি, চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটি, জমিওতুল ওলেমা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য। চট্টগ্রামের বহু স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। ১৮৯৩ থেকে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত। কিছুদিন কারাগারে বন্দী জীবনযাপন। কংগ্রেসের টিকিটে চট্টগ্রাম থেকে ভারতীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। অসাধারণ কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'খানবাহাদুর' উপাধি দেবার প্রস্তাব করলে খেতাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। সরকার-কর্তৃক 'কায়সার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক এবং 'সার্টিফিকেট অব অনার'-এ ভূষিত। ১৯১১-তে দিল্লিতে সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেকের সময়ও তাঁকে এই পদক দ্বিতীয় দফা দেয়া হয়। পরবর্তীকালে সরকার-কর্তৃক প্রাপ্ত উপাধি ত্যাগ। তিনি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় ভাষণ দিয়ে জনতাকে উদ্দীপ্ত করতে পারদর্শী ছিলেন। কখনও বিদেশি সরকারের সঙ্গে আপস করেন নি। দেশের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য চিরদিন সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯২৬-এ আইন সভার কাজে দিল্লিতে অবস্থানকালে মৃত্যুবরণ। মৃত্যু. দিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬।

কাদের জামেরী, ওস্তাদ (১৯১০-১৯৮৩)॥ জন্ম. শান্তিভাঙা পাড়া, কলকাতা, ১ জুলাই ১৯১০। উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী, সংগীত পরিচালক, সুরকার। সংগীতজ্ঞ পরিবারে জন্ম। পিতা গোলাম জানে খান প্রখ্যাত তবলা বাদক। শৈশবে পিতার মৃত্যুর পর রাগ সংগীতের দিকপাল বাদল খাঁ ও পিতৃব্য 'ঠুমরীর রাজা' হিসেবে খ্যাত ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খাঁর নিকট সংগীতের তালিম গ্রহণ। ১৯৩০-এ কলকাতার মঞ্চে সংগীতশিল্পী হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ। ১৯৩৩-এ প্রথম হিন্দি গানের অনুষ্ঠানে সংগীত পরিচালনা। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত ভজন, গীত, খেয়াল ও ঠুমরী পরিবেশন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানিতে তাঁর সুরারোপিত বহু গান প্রখ্যাত শিল্পীদের কণ্ঠে রেকর্ডিং হলে সুনাম অর্জন। কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানিতে ট্রেনার হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৫০-এ স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকা আগমন। ১৯৫১-র পহেলা এপ্রিল ঢাকা বেতারকেন্দ্রে 'নিজস্ব শিল্পী' হিসেবে যোগদান। ১৯৬৯-এ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ ও অনিয়মিত সুরকার ও প্রযোজক হিসেবে সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন। 'তোমার আমার' ও 'ভুলে নাগমে' ছায়াছবির সংগীত পরিচালক। ১৯৮০-তে সংকেত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী-কর্তৃক সংবর্ধিত ও 'সংকেত পদক'-এ ভূষিত। মৃত্যু. ঢাকা, ১২ নভেম্বর ১৯৮৩।



কাননবালা দেবী (১৯১৬-১৯৯২)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৯১৬। চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী ও গায়িকা। শৈশবে গৃহে কণ্ঠ-সংগীতে পারদর্শিতা অর্জন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী পিতা রতনচন্দ্র দাসের মৃত্যুর পরে কানন দেবীর পরিবার অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় পতিত। গান

গেয়ে বা অভিনয় করে অর্থোপার্জন দ্বারা যাতে



দারিদ্র্যের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পান, সেজন্য তুলসি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক তাকে ম্যাডান কোম্পানিতে নীত। দশ বছর বয়সে নির্বাক ছবি জয়দেবে (১৯২৬) রাধার ভূমিকায় অভিনয় করে পাঁচ টাকা সম্মানী লাভ। পূর্ণাঙ্গ সবাক চলচ্চিত্র জোরবরাতে (১৯৩১) নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়। এরপর ঋষির প্রেম, প্রহ্লাদ, কংসবধ, বিষ্ণুমায়া, শ্রীগৌরাঙ্গ, মা, কণ্ঠহার, বাসবদত্তা, মানময়ী গার্লস স্কুল, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণ সুদামা, মুক্তি, সাথী, বিদ্যাপতি, সাপুড়ে, অভিনেত্রী, পরাজয়, পরিচয়, শেষ উত্তর, যোগাযোগ, বিদেশিনী, পথ বেঁধে দিল, তুমি আর আমি, চন্দ্রশেখর, অনির্বাণ, বাঁধালেখা, অনন্যা, মেজদিদি, দর্পচূর্ণ, নববিধান, দেবত্র, রাজলক্ষ্মী, শ্রীকান্ত, শ্রীকান্ত ও অন্নদা দিদি ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন। পরিচয় (১৯৪১) ও শেষ উত্তর (১৯৪২) ছবিতে নায়িকা চরিত্রে অনন্য সাধারণ অভিনয়ের জন্য বি.এফ.জে. কর্তৃক শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মানে ভূষিত। ১৯৩৮-এ কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউট থেকে মেট্রিক পাস। ১৯৪৮-এ তৎকর্তৃক কলকাতায় শ্রীমতী পিকচার্স প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৯-এ চলচ্চিত্র জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ। ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি সংগীতচর্চায় ও আত্মনিয়োগ। রবীন্দ্রসংগীতে, নজরুলগীতি ও আধুনিক গানের দক্ষ গায়িকা। রবীন্দ্রসংগীত 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' ও নজরুলগীতি 'ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বন ফুল গো' গেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি। বাংলা চলচিত্রের কালজয়ী প্রতিভা। এ শিল্পে অনন্য অবদান রাখায় ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী (১৯৬৮) উপাধিতে ভূষিত। এছাড়া দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার লাভ (১৯৭৬)। মৃত্যু. কলকাতা, ১৭ জুলাই ১৯৯২।

কানাইলাল দত্ত (১৮৮৮-১৯০৮)॥ জন্ম. চন্দননগর, ৩১ আগস্ট ১৮৮৮। বিপ্লবী ও শহীদ। কৈশোরে বোম্বাইয়ের গিরগাও এরিয়ান এডুকেশন সোসাইটি স্কুলে পড়াশুনা। চন্দননগর দ্য প্লেক্স বিশ্বমন্দির (বর্তমানে কানাইলাল বিদ্যামন্দির) ও হুগলী মহসীন কলেজে অধ্যয়ন।



১৯০৮-এ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও রাজদ্রোহে কারাগারে থাকায় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ডিগ্রি কেড়ে নেয়। ব্রিটিশ-ভারতে বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিচালক চারুচন্দ্র রায়ের কাছে অস্ত্র চালনা শিক্ষা ও বিপ্লববাদে দীক্ষাগ্রহণ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) চলাকালে বিলেতি বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের অন্যতম কর্মী। নানা স্থানে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান। বি.এ. পরীক্ষার পরই কলকাতায় গুপ্ত বিপ্লবীদলের কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। এ-সময়ে অস্ত্র আইন লঙ্ঘন করে বোমা তৈরির অপরাধে পুলিশ অরবিন্দ ঘোষসহ অনেককে গ্রেফতার করে। ১৯০৮-এর ২ মে ১৫ নম্বর গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে গ্রেফতার। মানিকতলা বোমা মামলার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী নরেন গোসাঁইকে অপর বিপ্লবীসহকর্মী সত্যেন বসুর সহযোগিতায় জেলের ভিতরেই অস্ত্র সংগ্রহ করে ১৯০৮-এর ৩১ আগস্ট হত্যা। বিচারে ফাঁসিতে মৃত্যু দণ্ডাদেশ। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করেন নি। মৃত্যু. ১০ নভেম্বর ১৯০৮।

কানাইলাল শীল (১৮৯৫-১৯৭৪)॥ জন্ম. কইরাল



গ্রাম, ফরিদপুর, ১৮৯৫। দোতারাবাদক, গীতিকার ও সুরকার। প্রখ্যাত বেহালাবাদক বসন্তকুমার শীলের কাছে শৈশবে বেহালায় হাতেখড়ি। পরে বসন্ত শীলের গুরু মতিলালের কাছে বেহালায় পূর্ণ পাঠ গ্রহণ। যাত্রাদল, গাজীর গান, কবি গান ও কীর্তনীয়া দলে যোগ দিয়ে বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে পরিভ্রমণ। বকমপুরের কাছে বইমহটি ফকির বাড়িতে অবস্থানকালে দরবেশ দাগু শাহর মাজারে এক দোতারাবাদকের বাদন শুনে আকৃষ্ট ও প্রখ্যাত দোতারাবাদক তরচন সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ

শিক্ষা শেষে এক কৃষ্ণলীলা দলে যোগদান। ফরিদপুরের অম্বিকাপুরের এক অনুষ্ঠানে কবি জসীমউদ্দীনের সঙ্গে পরিচয়। জসীমউদ্দীনের সঙ্গে কলকাতায় গমন ও আব্বাসউদ্দীনের সঙ্গে পরিচয়। আব্বাসউদ্দীনের সহায়তায় গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদান। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে পরিচয় লাভ। নজরুলের গানের আসরে দোতরায় সহযোগিতা। অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রের নিয়মিত দোতারা শিল্পী। ১৯৪৯-এ তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র 'নিজস্ব শিল্পী' হিসেবে যোগদান। আমৃত্যু ঢাকা বেতারের সঙ্গে যুক্ত। একজন মরমি গীতিকার, সুরকার ও দোতারাবাদক। জনপ্রিয় লোকগানের রচয়িতা। দক্ষ দোতরা নির্মাতা। মৃত্যু. ঢাকা, ২০ জুলাই ১৯৭৪।

কামরুদ্দীন আহমদ (১৯১২-১৯৮২)॥ জন্ম.  ষোলঘর গ্রাম, বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯১২। লেখক, রাজনীতিক, কূটনীতিবিদ। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ১৯২৯-এ মেট্রিক, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯৩১-এ আই.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৪-এ ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স ও ১৯৩৫-এ এম.এ. (ইংরেজি) এবং ১৯৪৪-এ আইন পাস। কর্মজীবনের শুরুতে ঢাকা আরমানিটোলা স্কুলে শিক্ষকতা। প্রথম জীবনে পাকিস্তান আন্দোলনের একজন উৎসাহী কর্মী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর শাসক দল মুসলিম লীগের গণ-বিরোধী কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ। পরবর্তীকালে ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং সেই-সূত্রে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের (১৯৪৮, ১৯৫২) অন্যতম সদস্য। ১৯৫৪-তে আওয়ামী লীগে যোগদান এবং ১৯৫৫-তে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৭-তে রাজনীতি ত্যাগ করে কূটনীতিকের দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৫৭-১৯৫৮ পর্যন্ত কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার, ১৯৫৮-১৯৬১ পর্যন্ত বার্মায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এবং ১৯৬২-র পর থেকে আইন ব্যবসায় মনোনিবেশ। ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৭৬-১৯৭৮ পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ: A Social History of Bengal (1957), A Socio-political History of Bengal & The Birth of Bangladesh, পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি (১৯৭৬), বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ (২য় খণ্ড), স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং (১৯৮২), বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন আন্দোলনে কখনো প্রকাশ্যে কখনো নেপথ্যে থেকে নিজের দায়িত্ব পালন। মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) চলাকালে অক্টোবর মাসে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী-কর্তৃক গ্রেফতার এবং স্বাধীনতা লাভের পর ১৭ ডিসেম্বর (১৯৭১) মুক্তিলাভ। ষাটের দশকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ববাংলায় যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তার একজন তাত্ত্বিক। তাঁর এদেশের রাজনীতি ও সমাজ-সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থগুলো বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। মৃত্যু. ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২।

কামরুন্নাহার লাইলী (১৯৩৭-১৯৮৪)॥ জন্ম.  ডুমুরতলা গ্রাম, পিরোজপুর, ১৯৩৭। আইনজীবী, রাজনীতিবিদ। ১৯৫১-তে পিরোজপুর গার্লস স্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৫৩-তে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৫৬-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে বি.এ. অনার্স ও ১৯৫৭-তে এম.এ. পাস। ১৯৬৩-তে ল ডিগ্রি লাভ। ১৯৫৭-তে সাপ্তাহিক 'অবরুদ্ধা'র সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৫৮-তে কিছুদিন আনন্দময়ী গার্লস স্কুল শিক্ষকতা। ১৯৬১-১৯৬৪ পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেফাক-এর মহিলা বিভাগের সম্পাদক। ১৯৬৩-তে অ্যাডভোকেট হিসেবে ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বারে যোগদান। ১৯৭৩-এ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের প্রথম মহিলা সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭৭-এ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একমাত্র মহিলা নোটারি পাবলিক। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেত্রী এবং ডাকসুর নির্বাচিত সদস্য। ভাষা-আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন

ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ছাত্রাবস্থাতেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান ১৯৫৭-তে মওলানা ভাসানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য এবং ১৯৭০ পর্যন্ত ন্যাপ-এর সঙ্গে সংযুক্ত। বামপন্থি রাজনীতি করার জন্য ১৯৬০-এ তৎকালীন সরকার-কর্তৃক ঢাকা থেকে বহিষ্কৃত। ১৯৫৬-তে প্রতিষ্ঠিত পাক-চীন মৈত্রী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, পরে 'বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সমিতির'র সভানেত্রী। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী। মৃত্যু. ঢাকা, ১২ মে ১৯৮৪।

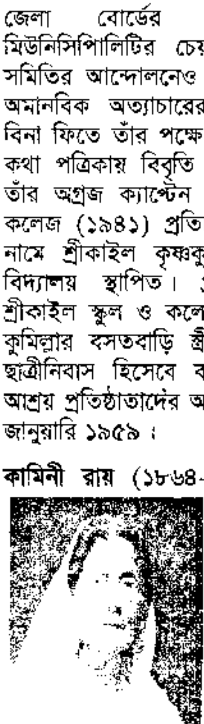
কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮)॥ জন্ম. তিনজিলা গোরস্তান রোড, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর ১৯২১। পৈতৃক নিবাস নারেঙ্গা গ্রাম, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। চিত্রকর। কলকাতা মডেল স্কুল ও কলকাতা মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ। ১৯৩৮-এ কলকাতা চারুকলা ইনস্টিটিউট ভর্তি। ১৯৪৭-এ ইনস্টিটিউট থেকে চিত্রকলায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আগমন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে ঢাকায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৮-১৯৬০ পর্যন্ত এই ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা। ১৯৬০-এ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কর্পোরেশনের ডিজাইন সেন্টারের চিফ আর্টিস্ট নিযুক্ত। ১৯৭৮-এ এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে (১৯৭১) মুজিবনগর সরকারের তথ্য বেতার দফতরের শিল্প বিভাগের প্রধান পদে দায়িত্ব পালন। এসময়ে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট নরঘাতক জেনারেল ইয়াহিয়ার রক্তপায়ী, হিংস্র ও রাক্ষুসে মুখমণ্ডল অঙ্কন করে আলোড়ন সৃষ্টি। চিত্রটির ক্যাপসন: 'এই জানোয়ারকে হত্যা করুন।' সমাজ-সচেতন ও প্রতিবাদী চিত্রশিল্পী। নরনারী (বিশেষত রমণীর শরীর), পশুপাখি (প্রধানত গরু ও শৃগাল, সাপ ও প্রকৃতি তাঁর চিত্রের উপাদান। এ-সবের প্রতীকে তাঁর চিত্রের ক্যানভাসে আবহমান বাংলার গ্রামীণ সমাজের সামগ্রিক রূপ, বাংলার নিসর্গ, শোষক-অত্যাচারী ও শোষকদের চেহারা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর গণহত্যা উজ্জ্বলভাবে মূর্ত। সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার আন্দোলন চলাকালে তাঁকে সাপ ও শেয়ালের সঙ্গী করে ও একচক্ষুবিশিষ্ট চেহারার আকৃতি দিয়ে তাঁর নিষ্ঠুর ও ভয়াল স্কেচ এঁকে অভূতপূর্ব খ্যাতি অর্জন। স্কেচটির ক্যাপশন: 'দেশ আজ বিশ্ব-বেহায়ার খপ্পরে।' ষাটের দশকে বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ও বিভিন্ন সামরিক শাসনবিরোধী সংগ্রামে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে কামরুল হাসানের চিত্রকলার বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। ঢাকা, রেঙ্গুন, রাওয়ালপিণ্ডি, লন্ডন প্রভৃতি স্থানে তাঁর ১০টি একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রেসিডেন্ট পুরস্কার ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা পদক প্রদান। পটুয়া কামরুল হাসান নামে খ্যাত। ১৯৮৮-র ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় কবিতা উৎসবে সভাপতিত্ব করাকালে উৎসব মণ্ডপে বসে 'দেশ আজ বিশ্ব-বেহায়ার খপ্পরে' স্কেচটির অঙ্কন সমাপ্ত করার কয়েক মিনিট পর হৃদরোগে আক্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। মৃত্যু. ঢাকা ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮



কামিনীকুমার দত্ত (১৮৭৯-১৯৫৯)॥ জন্ম. কুমিল্লা, ২৫ জুন ১৮৭৯ রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। পৈতৃক নিবাস: শ্রীকাইল, মুরাদনগর, কুমিল্লা। পিতা কৃষ্ণকুমার দত্ত চট্টগ্রাম কলেজিয়েট হাইস্কুলের প্রধান পণ্ডিত। ১৮৯৪-এ চট্টগ্রাম সরকারি হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৮৯৮-এ কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল. ডিগ্রি লাভের পর ১৯০১-এ কুমিল্লা বারে আইন ব্যবসায় যোগদান। এর মাঝে কিছুদিন মুন্সেফ হিসেবে চাকরি। আইনে তাঁর প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও মামলা



পরিচালনার দক্ষতা অসাধারণ। ছাত্রজীবনে ছিল যুগান্তর দলের সদস্য। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বিপ্লবী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। বামপন্থীদের মামলা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পরিচালনা করতেন। স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৭-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তখন কংগ্রেস সংসদীয় দলের উপনেতা ছিলেন। ১৯৩৮-এ কুমিল্লায় সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন এবং সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন। নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসন কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২-ও ভাষা-আন্দোলনে কুমিল্লায় ছাত্র-যুবকদের সহায়তাদান। ১৯৫৪-এ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৫-৫৬-তে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। কুমিল্লা জেলা বোর্ডের সদস্য ও কুমিল্লা মিউনিসিপিলিটির চেয়ারম্যান। ত্রিপুরা কৃষক সমিতির আন্দোলনেও যুক্ত। ইলা মিত্রের প্রতি অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন এবং বিনা ফিতে তাঁর পক্ষে মামলা পরিচালনা করার কথা পত্রিকায় বিবৃতি মারফত প্রকাশ করেন। তাঁর অগ্রজ ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীকাইল কলেজ (১৯৪১) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পিতার নামে শ্রীকাইল কৃষ্ণকুমার দত্ত উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত। গ্রামের সমুদয় সম্পত্তি শ্রীকাইল স্কুল ও কলেজের নামে দান করেন। কুমিল্লার বসতবাড়ি স্ত্রী মৃণালিনী দত্তের নামে ছাত্রীনিবাস হিসেবে ব্যবহৃত। কুমিল্লার অভয় আশ্রয় প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। মৃত্যু. কুমিল্লা, ৪ জানুয়ারি ১৯৫৯।



কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)॥ জন্ম. বাসণ্ডা, বরিশাল, ১২ অক্টোবর ১৮৬৪। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা। কবি। ১৮৮৬-তে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাস। কর্মজীবনে বেথুন কলেজে অধ্যাপনা। স্টাটুটারি সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৮৯৪)। ১৯০৯-এ স্বামীকে হারান। ১৯২২-১৯২৩ পর্যন্ত নারীশ্রমিক তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্য এবং ১৯৩২-১৯৩৩ পর্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসভানেত্রী। তাঁর কবিতায় জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-বেদনার সহজ-সরল ও সাবলীল প্রকাশ ঘটেছে। ব্যক্তিগত জীবনে স্বামীর অকাল-বিয়োগ তাঁকে মর্মাহত করেছে এবং সে বেদনার ছাপ তাঁর কাব্য-সাধনায় মূর্ত। কামিনী রায়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ: আলো ও ছায়া (১৮৮৯), নির্মাল্য (১৮৯১), পৌরাণিকী (১৮৯৭), গুঞ্জন (ছোটদের কবিতা সংগ্রহ, ১৯০৫), মাল্য ও নির্মাল্য (১৯১৩), অশোক-সংগীত (সনেট সংগ্রহ, ১৯১৪), অম্বা (নাট্যকাব্য, ১৯১৫), দীপ ও ধূপ (১৯২৯), জীবন পথে (১৯৩০)। ১৯২৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দান। মৃত্যু. ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩।



কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১)॥ জন্ম. আগলা-পূর্বপাড়া গ্রাম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা, ১৮৫৭। কবি। প্রকৃত নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী। বাল্যের গৃহশিক্ষা শেষ করে ঢাকায় সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে ভর্তি। উনিশ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর স্কুল ত্যাগ। কিছুকাল পর পিতৃবন্ধুর অর্থানুকূল্যে পুনরায় ঢাকা মাদ্রাসায় ভর্তি। এই ইনস্টিটিউশনে এন্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। ডাক-বিভাগে চাকরি গ্রহণ। আগলা পোস্ট অফিসে দীর্ঘকাল পোস্ট মাস্টার পদে দায়িত্ব পালন। বাংলা মহাকাব্য ধারার কবি হিসেবে খ্যাত। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশেষত নবীনচন্দ্র সেন তাঁর কাব্যগুরু। কিশোরকাল থেকে তাঁর সহজাত কবিত্ব শক্তির উন্মেষ ঘটে এবং মাত্র বার বছর বয়সে তৎকর্তৃক 'বিরহবিলাপ' (১৮৭০) কাব্যরচনা। গীতিকাব্য 'অশ্রুমালা' (১৮৯৫) ও মহাকাব্য 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) তাঁর বিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ। মহাশ্মশান মহাকাব্যের জন্য বিশেষ স্মরণীয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ও মারাঠা-শক্তির পতন এর

আখ্যানবস্তু। অন্যান্য কবিতাগ্রন্থ: 'কুসুমকানন' (১৮৭৩), 'শিবমন্দির' (১৯২১), 'অমিয় ধারা' (১৯২৩), 'মহরম শরীফ' (১৯৩২) ও 'শ্মশান-ভস্ম' (১৯৩৮)। নিখিল ভারত সাহিত্য সঙ্ঘ কর্তৃক ১৯২৫-এ কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যরত্ন উপাধিতে ভূষিত। ১৯৩২-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের মূল অধিবেশনে সভাপতিত্ব। মৃত্যু. ঢাকা ২১ জুলাই ১৯৫১।

কায়েস আহমেদ (১৯৪৮-১৯৯২)॥ জন্ম. বড় তাজপুর গ্রাম, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ২৫ মার্চ ১৯৪৮। কথাসাহিত্যিক। পুরো নাম শেখ কায়েসউদ্দিন আহমদ। দেশবিভাগে (১৯৪৭) পর ১৯৫০-এ পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে পিতার সঙ্গে ঢাকায় আগমন। কিশোরীলাল জুবিলী স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৬৪) ও জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৬৬) পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বি.এ. অনার্স শেষ ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। কিছুকাল দৈনিক গণকণ্ঠ ও দৈনিক সংবাদ-এ সাংবাদিকতা। গেণ্ডারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত। ১৯৮০-তে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে যোগদান। আমৃত্যু এ স্কুলে শিক্ষকতা। ছোটগল্পের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। সংখ্যালঘুদের জীবনচিত্র, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সামাজিক অপশক্তির দৌরাত্ম্য তাঁর গল্প ও উপন্যাসে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প–অন্ধ তীরন্দাজ (১৯৭৮), নির্বাসিত একজন (১৯৮৬), লাশকাটা ঘর (১৯৭৮), উপন্যাস– দিনযাপন (১৯৮৬); জীবনীগ্রন্থ– রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী (১৯৯০)। মৃত্যু. ঢাকা. ১৪ জুন, ১৯৯২।



কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, দেওয়ান (১৮২০-১৮৮৫)॥ জন্ম. কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ধ্রুপদ সংগীত গায়ক ও সংগীত রচয়িতা, কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা। মেডিকেল কলেজে কিছুকাল চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন। কৃষ্ণনগর জজকোর্টে শিক্ষানবিশ হিসেবে কিছুকাল কর্মরত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০-১৭৮২) পরবর্তী পঞ্চম পুরুষ নদীয়ার মহারাজ' শ্রীশচন্দ্রের

প্রথমে দেওয়ানি কাজে যোগদান, পরে কুমার সতীশচন্দ্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত। সতীশচন্দ্রের পোষ্যপুত্র রাজা ক্ষিতীশচন্দ্রের আমলে অবসর গ্রহণ। কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান হিসেবে দীর্ঘকাল যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে এই বংশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি। বাংলার প্রথম যুগের খেয়াল গায়কদের অন্যতম। কৃষ্ণনগর রাজদরবার থেকেই সংগীত শিক্ষার প্রেরণা লাভ। মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র খাজাঞ্চি প্রমুখ ওস্তাদের কাছে সংগীতশিক্ষা। সংগীত রচয়িতা হিসেবেও খ্যাতিলাভ। তাঁর স্বরচিত গানের সংকলন: 'গীতমঞ্জরী' (১৮৭৫)। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রামাণ্য চিত্র 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত' অর্থাৎ নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ (১৮৭৫) এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'আত্মজীবনচরিত' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু. ২ অক্টোবর ১৮৮৫।

কার্ল রিচার্ড পিশেল (১৮৪৯-১৯০৮)॥ জন্ম. জার্মানির ব্রেসলাউ-তে, ১৮ জানুয়ারি ১৮৪৯। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপক। ব্রেসরাউ, বার্লিন, লন্ডন ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ। তাঁর আগ্রহ ও অধ্যয়নের বিষয় ছিল সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষা। কালিদাস প্রণীত শকুন্তলার বাংলাদেশে প্রাপ্ত পাঠ সম্পাদনা করে ব্রেসলাউ-এর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধিলাভ। ১৮৭৫-এ কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৮৮৫-তে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯০২-এ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষায় প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত। প্রুশীয় সরকার মধ্য এশিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পদ উদ্ধারের জন্য যে-অভিযান চালান (১৯০৪-১৯০৭)। পিশেল তার নেতৃত্ব দেন এবং সংস্কৃতে লিখিত বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ হেমচন্দ্রের 'প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থ তাঁর অনন্য কীর্তি। গেল্ডনারসহযোগে রচিত 'বৈদেশিক আলোচনা' বইটিও অত্যন্ত মূল্যবান। প্রাকৃত সাহিত্য ও প্রকৃত ব্যাকরণ বিষয়ে বক্তৃতাদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভারতে আসার সময়ে পথিমধ্যে জাহাজে অসুস্থ হয়ে পড়েন, অবশেষে মাদ্রাজে প্রাণত্যাগ। প্রধান



রচনা: 'Sakuntala' (সম্পাদনা, ১৮৭৭), 'Hemachandra's Grammatic der Prakrit sprachen' (২য় খণ্ড: ১৮৮০), 'Vedische Studien' (গেল্ডনার সহযোগে, ১৮৮৯-১৯০১) ইত্যাদি। মৃত্যু. ডিসেম্বর, ১৯০৮।

কার্লো ফর্মিকি (১৮৭১-১৯৪৩)॥ জন্ম. ইতালীর নেপল্‌স্‌-এ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭১। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপক। ইতালি, অস্ট্রিয়া ও জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা। প্রথমে বোলোঞা ও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা, পরে ১৯১৩-তে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯২৫-এ সংস্কৃত ভাষার পরিদর্শক অধ্যাপক হিসেবে বিশ্বভারতীতে আগমন। দ্বিতীয়বার ভারত এসেছিলেন ১৯৩৩-এ। গ্রন্থাবলি: ইতালীর অনুবাদে অশ্ব ঘোষের জীবনীসহ 'বুদ্ধচরিত' (১৯১২), কালিদাসের রঘুবংশ, Upanishads as Landmarks in the History of India (১৯২৭) প্রভৃতি। মৃত্যু. ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৩।

কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার॥ জন্ম. ফুরসাইল, ঢাকা। জীবনকাল আনুমানিক উনবিংশ শতাব্দী। 'কিশোরী ভজন' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ভগবতের বহু শ্লোক অভিনব ব্যাখ্যাসহযোগে পাঠ করে খ্যাতি অর্জন।

কালিকারঞ্জন কানুনগো (১৮৯৫-১৯৭২)॥ জন্ম. কানুনগো পাড়া, বোয়ালকালি, চট্টগ্রাম, জুলাই ১৮৯৫। শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক। ১৯১৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. (ইতিহাস) ডিগ্রি লাভ। স্যার যদুনাথ সরকারের অধীনে ১৯২১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ১৯২৩-এ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে এবং পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা। ১৯৩৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত। ১৯৪৯ পর্যন্ত উক্ত পদে কর্মরত। একই বছর শেষের দিকে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৯৫৫ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: History of Sha Sher, History of Dara Shikoh, History of Juts, Rajput Policy of Akbar, The Bahmani Dynasty of Deccan, Muslim Conquest of Bengal, Studies in Rujput History, Bengal under the Mamluks and the House of Bulban. 'রাজস্থান কাহিনী' গ্রন্থের জন্য ১৯৬৬-তে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ১৯৭২।

কালিদাস রায়, কবিশেখর (১৮৮৯-১৯৭৫)॥ জন্ম. কড়ুই গ্রাম, বর্ধমান, ৯ জুলাই ১৮৮৯। কবি, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য-সমালোচক। ১৯১০-এ বহরমপুর কলেজ থেকে বি.এ. পাস। এরপর কিছুকাল কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. অধ্যয়ন। ১৯১৩-তে রংপুর জেলার উলিপুরে মহারানী স্বর্ণময়ী স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত। পরে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালন। এই স্কুলে সাত বছর শিক্ষকতা করার পর চব্বিশ পরগণা জেলার বড়িশা উচ্চ



বিদ্যালয়ের এগারো বছর সহকারী শিক্ষক। দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে কলকাতার ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এখানেই শিক্ষকতা। রবীন্দ্রনাথের অনুসারী কবি। তাঁর কাব্য-সাধনায় পল্লীপ্রীতি প্রগাঢ়। রোমান্টিক রসকল্পনা তাঁর কবিতার অপর প্রধান গুণ। আখ্যানমূলক কবিতা রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। কালিদাস রায়ের কবিতার ভাষা সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর, অথচ হৃদয়গ্রাহী। রচিত কবিতাগ্রন্থ: কুন্দ (১৯০৮), কিশলয় (১৯১১), পর্ণপুট (১ম ভাগ ১৯১৪, ২য় ভাগ ১৯২১), ব্রজবেণু (১৯১৫), বল্লব (১৯১৫), ঋতুমঙ্গল (১৯১৬), ক্ষুদকুঁড়া (১৯২২), রসকদম্ব (১৯২৩), লাজাঞ্জলি (১৯২৪), হৈমন্তী (১৯২৪), চিত্তচিতা (১৯২৫), আহরণী (সংকলন ১৯৩২), বৈকালী (১৯৪০) ব্রজবাঁশরী (১৯৪৫), আহরণ (সংকলন ১৯৫০), গাথাঞ্জাল (১৯৫৭), সন্ধ্যামণি (১৯৫৮), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৬৪) এবং পূর্ণাহুতি (১৯৬৮)। কালিদাস রায়ের রচিত প্রবন্ধ পুস্তকের মধ্যে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য, বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়, শরৎ সাহিত্য, সাহিত্য প্রসঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড) ও পদাবলী সাহিত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত চণক সংহিতা, রঙ্গচিত্র ও চালচিত্র গ্রন্থ রম্যসাহিত্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য। ১৯২০-তে রংপুর সাহিত্য পরিষদ-কর্তৃক 'কবিশেখর'

উপাধি প্রদান। ১৯৫৩-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান ১৯৬৩-তে সরোজিনী স্বর্ণপদক' ও 'আনন্দ পুরস্কার' লাভ। ১৯৬৩-তে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির দায়িত্ব পালন। ১৯৬৮-তে 'পূর্ণাহুতি' কবিতাগ্রন্থের জন্য 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' লাভ। এ ছাড়া বিশ্বভারতী-কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধি ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধি লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ২৫ অক্টোবর ১৯৭৫।

কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯৫৪)॥ জন্ম. হোগলাকার্তিকপুর, ফরিদপুর, ১৮৫৮। শিক্ষাবিদ। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে তাঁর দান অতুলনীয়। কলকাতা সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের নব্য ও প্রাচীন স্মৃতি উপাধি পরীক্ষার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি বিষয়ে এম.এ. পরীক্ষক। বহু বছর ঢাকা সারস্বত সমাজের সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন। প্রায় আশি বছর বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত থেকে বহু ব্যক্তিকে নানাভাবে জ্ঞানসমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৩১-এ 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯৫৪।

কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী॥ জন্ম. কুণ্ডী, রংপুর। জীবনকাল উনবিংশ শতাব্দী। কবি। তাঁরই উদ্যোগে মফঃস্বলে প্রথম মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও 'রংপুর বার্তাবহ' পত্রিকা প্রথম প্রকাশ। তাঁর মৃত্যুর পর পত্রিকাটি 'রংপুর দিকপ্রকাশ' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত বাংলা আদিনাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব'-কে পুরস্কৃত করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 'স্বভাব দর্পণ' ও 'প্রেমারসাষ্টক' গ্রন্থের রচয়িতা।

কালীচরণ তর্কালঙ্কার (১৮১৯-১৮৯২)॥ জন্ম. বিক্রমপুর, ঢাকা, ১৮১৯। বিক্রমপুরে ব্যাকরণ, পদার্থ ও স্মৃতি পাঠ। নবদ্বীপে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর কাছে সাত বছর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন। 'তর্কালঙ্কার' উপাধি লাভ। ঢাকায় ফিরে চতুষ্পাঠী স্থাপন। বিক্রমপুরের বহু পণ্ডিত-কর্তৃক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ। মৃত্যু. ১৮৯২।

কালীনাথ দাশ শীল॥ জন্ম. ঢাকা। জীবনকাল উনিশ শতক। সংগীত [illegible]

বনবাস' যাত্রা-পালা-রচয়িতা হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন। তাঁর রচিত অনেক সংগীত তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। কালীবাবু নামে সুপরিচিত। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

কালীপদ ভট্টাচার্য (?-১৯৭৮)॥ জন্ম. ধলঘাট গ্রাম, পটিয়া, চট্টগ্রাম। সাহিত্যিক। পাঁচটি মহাকাব্য ও দুটি খণ্ডকাব্য প্রকাশ। রচিত গ্রন্থ: জালালাবাদ যুদ্ধ, আজাদ হিন্দ নেতাজী, গান্ধীজীবনী সোভিয়েট ইতিহাস রাজশূল, পূণ্যচরিতায়ন, লেনিন চিরকালীন। গদ্য কবিতার যুগে প্রাচীন আঙ্গিকে মহাকাব্য রচনা করে সুধীজনের দৃষ্টি আকষর্ণ। মৃত্যু. ১৯৭৮।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০)॥ জন্ম. ভরাকর



গ্রাম, বিক্রমপুর, ২৩ জুলাই ১৮৪৩। সাহিত্যিক, সাংবাদিক। পিতা পুলিশ ইন্সপেক্টর শিবনাথ ঘোষ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত অধ্যায়। স্বীয় চেষ্টায় ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকার অর্জন। ১৮৬৩-তে কলকাতার ভবানীপুরে খ্রিস্টধর্মের ওপর বক্তৃতা দিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভারেন্ড ডাল প্রমুখ মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ। ১৮৬৫-তে ঢাকা আদালতে পেশকারের চাকরি গ্রহণ। ১৮৭৭-এর ২৮ মার্চ ভাওয়াল রাজ সরকারের চাকরিতে প্রবেশ ও পরে ম্যানেজার পদে উন্নীত। পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সভ্য। ব্রাহ্মযুবকদের মুখপত্ররূপে শুভ-সাধিনী (১২৭৭ বঙ্গাব্দ) সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং বঙ্গদর্শনের আদর্শে ঢাকা থেকে বান্ধব (১৮৭৪) পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা। বান্ধব পত্রিকাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় এক সাহিত্য আন্দোলনের সৃষ্টি। ভাওয়াল রাজএস্টেটের ম্যানেজার থাকাকালে সাহিত্য-সমালোচনী সভা প্রতিষ্ঠা করে নানাভাবে সমকালীন সাহিত্যিকদের সহায়তা প্রদান। কিন্তু ভাওয়ালের স্বাভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁর দ্বারা বারংবার নিগৃহীত হন। ১৮৯৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য নির্বাচিত ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য ও ঢাকা

সদর লোকাল বোর্ডের সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন। প্রৌঢ় বয়সে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন। এ সময়ে অধ্যাত্মবাদ ও বিজ্ঞানের মিশ্রণ ঘটানোর প্রয়াস চালান। অবসর-জীবনে ঢাকার আরমানিটোলায় গৃহ (বান্ধব কুটির) নির্মাণ করে বাস। বিদ্যাসাগরী রীতিতে গুরুগম্ভীর ভাষায় চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ। একজন অসাধারণ বাগ্মী হিসেবেও খ্যাত। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে 'রায়বাহাদুর' (১৮৯৭) এবং সি.আই.ই. (১৯০৯) উপাধি লাভ। বাংলার পণ্ডিতগণ-কর্তৃক বিদ্যাসাগর উপাধি দান। কালীপ্রসন্নের উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ: প্রভাতে-চিন্তা (১৮৭৭), নিভৃত-চিন্তা (১৮৮৩), ভক্তির জয় (১৮৯৫), নিশীথ-চিন্তা (১৮৯৬), জানকীর অগ্নিপরীক্ষা (১৯০৫), ছায়া দর্শন (১৯১০)। সংগীত ও কবিতা রচনায়ও দক্ষতা প্রদর্শন। 'একবারে না পারিলে দেখ শতবার' তাঁর একটি বহুল পঠিত কবিতা। মৃত্যু. ২৯ অক্টোবর ১৯১০।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)॥ জন্ম. জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ১৮৪০। লেখক, সমাজসেবক। ধনী জমিদার বংশে জন্ম। নন্দলাল সিংহের একমাত্র সন্তান। ছয় বছর বয়সে পিতৃহীন হন। বাল্যকালে হিন্দু কলেজে (১৮১৭) ভর্তি। ১৮৫৭-তে কলেজ ত্যাগ। গৃহে পণ্ডিত রেখে সংস্কৃত ও বাংলায় ভাষা শিক্ষা লাভ। উইলিয়াম কার্ক প্যাট্রিকের কাছে ইংরেজি অধ্যয়ন। হিন্দু কলেজে পাঠকালে কলকাতার বাগবাজারের বেণীমাধব বসুর কন্যার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৮৫৪)। কিছুদিন পরে স্ত্রীবিয়োগ হলে চন্দ্রনাথ বসুর কন্যার পাণিগ্রহণ। বঙ্গভাষার অনুশীলনের জন্য মাত্র তেরো বছর বয়সে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (১৮৫৩) প্রতিষ্ঠা। সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫) প্রকাশ। নাট্যাভিনয় ও নাট্যসাহিত্যের উন্নতিকল্পে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৬) স্থাপন। এই রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'বেণীসংহার' নাটকে অভিনয়ে। তাঁর অনূদিত 'বিক্রমোর্বশী' নাটকও এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত (১৮৫৭) নিজে পুরুরবার ভূমিকায় অভিনয়। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) প্রকাশিত হলে কালীপ্রসন্ন কর্তৃক সর্বাগ্রে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১)। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য রেভারেন্ড লঙ নামীয় এক ইংরেজ পাদরিকে আদালত এক হাজার টাকা জরিমানা করলে (২৪ জুলাই ১৮৬১) কালীপ্রসন্ন সিংহ আদালতে উপস্থিত হয়ে সে টাকা পরিশোধ করে লঙ সাহেবকে মুক্ত করেন। মাসিক পত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহের (১৮৫১) ৭ম সম্পাদনা (১৮৬০)। ১৮৬২-র নভেম্বর দৈনিক 'পরিদর্শক' (১৮৬১) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। বিধবা বিবাহকে উৎসাহদানকল্পে পুরস্কার ঘোষণা। তৎকর্তৃক সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রচার: 'যিনি বিধবা বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে কালীপ্রসন্ন বাবু এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন।' বহুবিবাহ-রোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৮৬৩-তে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অব দি পিস নিযুক্ত। বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট শিল্পী, অনুবাদক ও নাট্যকার। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) ও সংস্কৃত মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ (১৮৬৬) তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি। কলকাতার বাবু-সমাজের ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' এক অঅসাধারণ রচনা। কালীপ্রসন্ন সিংহের বড় অবদান সংস্কৃত বহুল পণ্ডিতী ভাষার বিরুদ্ধে কথ্যভাষাকে সাহিত্যে স্থাপন। 'হুতোম প্যাঁচার নকশায়' এ-ভাষা প্রয়োগ। প্যারীচাঁদ মিত্র সাধু ও কথ্য উভয় বাক্যরীতির মিশ্র প্রয়োগ করে যে 'আলালী ভাষা' সৃষ্টি করেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই ভাষাকে আরো সুন্দর ও মসৃণ করে তোলেন। তাঁর ব্যবহৃত রীতিতে কথ্য ও সাধু ক্রিয়াপদের মিশ্রণ নেই। কলকাতা ও কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মৌখিক ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগের প্রথম কৃতিত্ব। তাঁর ব্যবহৃত ভাষা 'হুতোমী বাংলা' নামে পরিচিত। অন্যান্য গ্রন্থ: বাবু (প্রহসন, ১৮৫৪), বিক্রমোবর্শী (অনুবাদক নাটক, ১৮৫৭), সাবিত্রী সত্যবান নাটক (নাটক ১৮৫৮), মালতীমাধব (অনুবাদ নাটক, ১৮৫৯)। মৃত্যু. কলকাতা, ২৪ জুলাই ১৮৭০।



কালী মীর্জা (১৭৫০-১৮২০)॥ জন্ম. গুপ্তিপাড়া, হুগলী, ১৭৫০। বঙ্গদেশে টপ্পা সংগীতচর্চার

প্রথম পর্যায়ের টপ্পাগীত রচয়িতা ও গায়ক। আসল নাম কালীদাস মুখোপাধ্যায়। টোলে সংস্কৃত শিখে ব্যুৎপত্তি অর্জন। পরে বারানসী গিয়ে সংগীত ও বেদান্তে শিক্ষালাভ। এ-ছাড়া লক্ষ্ণৌ ও দিল্লিতে ফার্সি ও উর্দু এবং সেখানকার সংগীতজ্ঞদের কাছে সংগীত শিক্ষাগ্রহণ। ফার্সি ভাষায় দক্ষ এবং বেশভূষা ও চালচলনে পশ্চিম ওস্তাদের মতো ছিলেন বলে মীর্জা নামে খ্যাত। বাংলায় নিধুবাবুর আগেই টপ্পা সংগীতে সুনাম অর্জন। রাজা রামমোহন রায়ের সংগীত-শিক্ষক। পরবর্তীকালে বর্ধমানের মহারাজা প্রতাপচাঁদের সভাগায়ক নিযুক্ত। এরপর কলকাতার গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয়ে দীর্ঘদিন কলকাতায় বাস করে কাশীবাসী হন। 'গীতি লহরী' বা কালিদাস মুখোপাধ্যায় (মীর্জা) মহাশয়ের 'গীতাবলী সংগ্রহে' (১৯০৪) তাঁর দুই শতাধিক গান রয়েছে। এ-ছাড়া দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালির গান (১৯০৫) ও কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব সম্পাদিত 'সংগীত রাগকল্পদ্রুম' (নতুন সংস্করণ ১৯১৬) নামক গ্রন্থে তাঁর গীত সংকলিত হয়েছে। মৃত্যু. ১৮২০।

কাশীরাম দাস॥ জন্ম. ইন্দ্রাণী পরগণাভুক্ত সিঙ্গি গ্রাম, বর্ধমান। সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ। আনুমানিক ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে জীবিত ছিলেন। কাশীরাম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাই কাশীরাম দেব কাশীরাম দাসে পরিণত হয়েছেন। তিনি মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেননি। আদি, সভা, বিরাট ও বন পর্বের অনুবাদ করে মৃত্যুবরণ। তাঁর কাব্যের রচনাকালে ১৫৫৮ থেকে ১৬০৫ পর্যন্ত। ১৮০১-এ জয় গোপাল তর্কালঙ্কার-কর্তৃক সংশোধিত কাশীদাসী মহাভারত শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান পাদ্রিদের দ্বারা প্রথম মুদ্রিত। ১৮৩৬-এ জয়গোপাল-কর্তৃক পুররায় সংশোধিত এবং মধুসূদন শীল, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ-সংশোধিত ও সম্পাদিত। এ জন্যই তাঁর মূল মহাভারতের রসাস্বাদন করা পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভারত পাঁচালী, স্বপ্নপর্ব, নলোপাখ্যান কাব্যেরও রচয়িতা। কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাভারতকাব্যের বাংলা অনুবাদকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যেমন ঘরে ঘরে পঠিত হয়, কাশীরাম দাসও ঠিক তেমনিই জনপ্রিয়।

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৩-১৯৫৪)॥ জন্ম. ভুগিলহাট, যশোর, রাজনীতিবিদ সাধারণ শিক্ষালাভের পর বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত। ১৯০৫-এ কলকাতায় প্রজ্ঞানন্দ স্বামীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর বিপ্লবকর্মে আত্মনিয়োগ 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি', 'বন্দে-মাতরম' প্রভৃতি পত্রিকার কর্মী ও লেখকরূপে রাজনৈতিক জীবন শুরু। 'হিতবাদী পত্রিকায় কাজ করার সময়ে 'মুক্তি কোন পথে' ও 'কংপন্থা' নামক দুটি বিপ্লবাত্মক পুস্তক রচনা করলে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি। বগুড়ায় আত্মগোপন। এক সময়ে উত্তর কলকাতায় 'যুবক সংঘ' ও 'মহেশালয়' নামক দুটি বিপ্লবী আড্ডা স্থাপন। 'মহেশালয়ে' বোমা তৈরি করা হতো। এ-সকল বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম প্রকাশিত হয়ে পড়লে বালুর ঘাটে গ্রেফতার এবং দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিপ্লব প্রচেষ্টায় সহায়তা দানের জন্য ১৯১৬-তে পুনরায় গ্রেফতার। ১৯১৯-এ মুক্তিলাভের পর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে প্রকাশিত 'স্যারভ্যান্ট' পত্রিকার পরিচালনায় সহায়তা প্রদান। এ সময়ে উল্লেখযোগ্য কর্ম 'সরস্বতী লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা ও 'শান্তিসেনা' গঠনের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ। ভুপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে একত্রে দৌলতপুরে 'সত্যাশ্রম' স্থাপন। ১৯২৩-এ ভূপেন দত্তের গ্রেফতারের পর আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯২৪-এ বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা-কর্তৃক ভ্রমক্রমে টেগার্টের পরিবর্তে আর্নেস্টিডে নিহত হলে গোপীনাথ ও অন্যান্যদের সঙ্গে গ্রেফতার। ১৯২৮-এ মুক্তি পেয়ে 'সরস্বতী গ্রন্থাগার' সংগঠনে মনোনিবেশ। ১৯৩০-এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ভূপেন দত্ত গ্রেফতার হলে চন্দননগরে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল ও ডালহৌসি স্কোয়ারে বোমা তৈরির কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ। কিছুকাল পরে পুনরায় গ্রেফতার। প্রথমে ১৯৩০-১৯৩৭ ও পরে ১৯৪০-১৯৪৫ পর্যন্ত কারাভোগ। মুক্তিলাভের পর কলকাতায় প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতীর নামে 'প্রজ্ঞানন্দ পাঠাগার' প্রতিষ্ঠা। রচিত গ্রন্থ: চন্দ্রগুপ্ত-গুরুচাণক্য (১৩৫৬) ও শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামী। মৃত্যু. ১২ ডিসেম্বর ১৯৫৪।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৮৮৭। কবি। পৈতৃক নিবাস উত্তরপাড়া। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমেই ইংরেজি ও পরে দর্শনে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। বি.এল. পাস। কিছুকাল হুগলী জেলা

আদালতে ওকালতি। পরে হেতমপুর ও শ্রীরামপুর কলেজে ও হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে অধ্যাপনা। ১৯২০-তে স্ত্রীর মৃত্যুর পর কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ। এই-সূত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং 'ভারতী কবি গোষ্ঠী'র অন্যতম কবিরূপে খ্যাতি অর্জন। একটি মাত্র কবিতাগ্রন্থ 'নতুন খাতা' (১৯২৩) প্রণয়ন করে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ। দাম্পত্য প্রণয়, পত্নী বিয়োগ-ব্যথা এবং গার্হস্থ্য জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতার বিষয়। এছাড়া কিছু ব্যঙ্গ এবং কিশোরপাঠ্য কবিতা রচনা। মৃত্যু. ১৯৩১।

কিরণশঙ্কর রায় (১৮৯১-১৯৪৯)॥ জন্ম. তেঁওতা, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, ১৮৯১। শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক। কলকাতা হিন্দুস্কুল থেকে প্রবেশিকা, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই.এ. ও অক্সফোর্ড নিউ কলেজ ইতিহাসে অনার্সসহ বি.এ. পাস।



বিলেত থেকে দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা (১৯১৪-১৯১৯)। ১৯১৯-এ পুনর্বার বিলেত গমন এবং ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে প্রত্যাবর্তন। ১৯২১-এ ন্যাশনাল কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত। পরে ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে উন্নীত। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) যোগদান করে রাজনীতিতে প্রবেশ। ১৯২৩-এ নবগঠিত স্বরাজ পার্টিতে যোগদান এবং অন্যতম পার্টি প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯২৯-এ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গ্রেফতার বরণ। ১৯৩৩-এ কংগ্রেসের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং কংগ্রেস-সদস্য হিসেবে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে যোগদান। রাজনীতির ক্ষেত্রে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বন্ধু। ১৯৪১-এ শরৎচন্দ্র বসু পরিচালিত প্রভিন্সিয়াল কোয়ালিশন পার্টিকে সমর্থন। ভারত বিভাগের (১৯৪৭) পূর্বে স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ। এক সময়ে আসাম কংগ্রেসের সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান বিধানসভার কংগ্রেস দলের নেতা। ভারতে গমন করে বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে যোগদান (১৯৪৮)। কিরণশঙ্কর রায় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অবদান রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'সপ্তপর্ণ'। মৃত্যু. কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৮-১৯৯৮)॥ জন্ম. ঢাকা শহর, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮। কবি ও সম্পাদক। পিতা বিজয়শঙ্কর সেনগুপ্ত ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রধান ছিলেন। মাতা মায়াময়ী দেবী; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মনীষী রজনীকান্ত গুপ্তের কন্যা। স্ত্রীর নাম বীণা বিশ্বাস; সোমেন চন্দের রাজনৈতিক সহকর্মী ও মাসীমা। ছেলেবেলার বন্ধু সোমেন চন্দের আহ্বানে ১৯৩৮-এ তিনি গঠিত ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘে যোগদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাস। কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকা প্রিয়নাথ স্কুলে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। পরে নারায়ণগঞ্জে কাকার ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৫০-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিলিফ অফিসের চাকরিতে যোগদান। কবিতাগ্রন্থ–স্বপ্ন বাসনা (১৯৩৮), স্বর ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫৩), মানুষ জানে (১৯৮৫), ছায়া হেঁটে যায় (১৯৯২)। প্রবন্ধগ্রন্থ–সময় ও সাহিত্য (১৯৫১), মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল (১৯৬৪), কবিতার রূপ রূপান্তর (১৯৮২), সোমেন চন্দের সুনির্বাচিত গল্প (১৯৮৩) কবিতার মানবিক উচ্চারণ ও অন্যান্য ভাবনা (১৯৯১), আগুনের অক্ষর: সোমেন চন্দের স্মারকগ্রন্থ (পবিত্র সরকারের সঙ্গে, ১৯৯২), চল্লিশের দশকের ঢাকা (সরদার ফজলুল করিমের সঙ্গে, ১৯৯৭)। সম্পাদনা করেছেন শতদল (ঢাকা হলের মুখপত্র, ১৯৩৮), শান্তি (মাসিক সাহিত্যপত্র, ঢাকা), সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (যুগ্ম সম্পাদক, প্রতিরোধ (পাক্ষিকপত্র, প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র, ঢাকা, সহ-সম্পাদনা ১৯৪২-৪৪),



সাহিত্য চিন্তা (১৯৭১-১৯৯৭)। মৃত্যু. কলকাতা, ১ মে ১৯৯৮।

কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-১৮৭৩)॥ জন্ম. কলকাতা, ২২ মে ১৮২২। প্রাবন্ধিক ও সমাজ-সংস্কারক। প্যারীচাঁদ মিত্রের অনুজ। হেয়ার স্কুল এবং হিন্দু কলেজের কৃতি ছাত্র। ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। ১৮৪২-এ শিক্ষা শেষ করে কিছুকাল ডাফ স্কুলের অবৈতনিক শিক্ষক ও এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। পরে সরকারি কেরানির পদ লাভ। ১৮৪৬-এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত। রাজশাহী ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে একাধিক্রমে



আট বছর দায়িত্ব পালন। এ-সময়ে ঐসব অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ১৮৫৪-তে কলকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত॥ শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের বিচারে দেশীয় বিচারকগণ ও অংশগ্রহণের অধিকারী হবেন এই মত সমর্থন করায় শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের বিরাগভাজন ও ১৮৫৮-র ২৮ অক্টোবর কর্ম থেকে অপসারিত। ১৮৫৯-এ 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' নামক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ। ১৮৬৫-র ১৮ মে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। একেশ্বরবাদ প্রচারকল্পে 'হিন্দু থিয়োফিলানথ্রফিক সোসাইটি' (১৮৪৩) এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, কৃষি-শিল্পের উন্নতি, বাল্যবিবাহ বর্জন ও বিধবা বিবাহ প্রচলনে সহায়তার উদ্দেশ্যে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সভা' (১৮৫৪) নামক দুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন। 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' প্রভৃতি পত্রিকায় তথ্যসমৃদ্ধ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে সুনাম অর্জন। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ: 'দি মিউটিনি' (১৮৫৮) হিন্দু কলেজে (১৮৬২), দি গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দি পিপল, মেময়ার অফ দ্বারকানাথ টেগোর (১৮৭০), ওড়িশা: পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট (১৮৬৬) ইত্যাদি। মৃত্যু. ৬ আগস্ট ১৮৭৩।

কুন্দনলাল সায়গলস (১৯০৪-১৯৪৭) জন্ম. জম্মু, ১১ এপ্রিল ১৯০৪

অভিনেতা। বিশ শতকের তিরিশের দশকে



সিনেমায় 'প্লেব্যাক' প্রচলনের আগে বাংলা গান গেয়ে এবং বাংলা ছবিতে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন। প্রমথেশ বড়ুয়ার বিখ্যাত ছবি 'দেবদাস'-এ গায়করূপে আত্মপ্রকাশ। পরে গীতকুশলী নায়করূপে প্রতিষ্ঠা লাভ। 'সাথী', 'জীবন-মরণ', 'পরিচয়', 'দিদি', 'দেশের মাটি প্রভৃতি ছায়াছবিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয়। হিন্দি 'তানসেন' ছবিতে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। 'তানসেন'-এর রাগাশ্রয়ী গানগুলো দীর্ঘদিন জনপ্রিয় ছিল। 'ঠুংরী' গেয়েও দক্ষতা প্রদর্শন। রবীন্দ্র-সংগীত, আধুনিক বাংলা গান ও রাগপ্রধান গানের কণ্ঠশিল্পী হিসেবে পারদর্শিতা প্রদর্শন। প্লেব্যাক প্রথা প্রবর্তিত হলে সিনেমায় তাঁর প্রভাব কমতে থাকে। ভারত-বিভাগের (১৯৪৭) পর পাঞ্জাবের জলন্ধর বেতারকেন্দ্রের নিয়মিত গায়ক হিসেবে যোগদান। তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গান 'আমারে ভুলিয়া যেও, মনে রেখো মোর গান।' মৃত্যু. ১৮ জানুয়ারি ১৯৪৭।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০)॥ জন্ম. মাতুলালয়, কোগ্রাম, বর্ধমান, ৩ মার্চ ১৮৮২। কবি। পৈতৃক



নিবাস শ্রীখণ্ড গ্রাম, বর্ধমান। পিতা পূর্ণচন্দ্র মল্লিক ছিলেন কাশ্মীর রাজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯০৫-এ বি.এ. পাস করে 'বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণ পদক' লাভ। কর্ম-জীবনে মাথুরন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৩৮-এ অবসর গ্রহণ। বাল্যকালেই কবিতা রচনায় হাতে খড়ি। বৈষ্ণব ভাবাদর্শ, বাংলার প্রকৃতি ও গার্হস্থ্য জীবনের আলেখ্য তাঁর কবিতায় সহজ-সরল ভাষায় অঙ্কিত। রচিত কবিতাগ্রন্থ: 'উজানি' (১৯১১), 'নবতুলসী' (১৯১১), 'শতদল' (১৯১১)', 'একতারা' (১৯১৪), 'বীথি' (১৯১৫),

'বনমল্লিকা' (১৯১৮), 'নূপুর' (১৯২০), 'রজনীগন্ধা' (১৯২১), 'অজয়' (১৯২৭), 'তূণীর' (১৯২৮), 'স্বর্ণসন্ধ্যা' (১৯৪৮) নাটক: দ্বারাবতী (১৯২০)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান। মৃত্যু. ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭০।

কুমুদশঙ্কর রায় (১৮৯২-১৯৫০)॥ জন্ম. তেঁওতা গ্রাম, মানিকগঞ্জ ১৮৯২। চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। কলকাতা থেকে বি.এসসি. ও এম.বি. পাস। এডিনবরা থেকে সি.এইচ.বি. ডিগ্রিলাভ। কর্মজীবনে প্রথমে ওহিল হিল স্যানটোরিয়ামে সহকারী সুপারিন্টেডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন। ১৯২০-এ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গেও যুক্ত। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল এইড অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটি'র সঙ্গে যুক্ত হওয়া। ১৯২২-এ এই সোসাইটির সংগঠক ও সম্পাদকের পদে নিযুক্তি লাভ। এই সোসাইটি যাদবপুরে হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়। হাসপাতালের বহু কটেজ, ওয়ার্ড ও ব্লক সংযুক্তিতে এবং এর ক্রমোন্নতিতে অবদান রেখেছেন। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও কলকাতা করপোরেশনের অল্ডারম্যান। ১৯৫০-এ মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে হাসপাতালের নতুন নামকরণ হয় 'কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল'। মৃত্যু. মাদ্রাজ, ২৪ অক্টোবর ১৯৫০।

কুলদারঞ্জন রায় (১৮৭৮-১৯৫০)॥ জন্ম. মসুয়া, ময়মনসিংহ, ১৮৭৮। শিশুসাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, আলোকচিত্রশিল্পী ও ক্রীড়াবিদ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন। কর্মসূত্রে ফটো এনলার্জমেন্টের ওপর স্বহস্তে রঙের কাজ করতেন। ক্রিকেট ও হকি খেলায় সুনাম অর্জন। অগ্রজ উপেন্দ্রকিশোরের প্রেরণায় সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ। ১৯১৩-তে 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত। হিন্দু পুরাণ কাহিনীর ভিত্তিতে শিশুতোষ গল্পকাহিনী রচনা করে খ্যাতি অর্জন। অনেক বিদেশি গল্পের অনুবাদক। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: রবিনহুড (১৯১৪), ওডেসিয়ুস (১৯১৫), ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৯১৭), পুরাণের গল্প (১৯১৮), [illegible] (১৯১৮), ইলিয়াড (১৯২১), ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র (১৯২২), পৌরাণিক গল্প (দুই খণ্ড, ১৯২৭), টালিসম্যান (১৯২৮), আশ্চর্য-দ্বীপ (১৯৩০) ইত্যাদি। মৃত্যু. ১৯৫০

কুসুমকুমারী দাশ (১৮৮২-১৯৪৮)॥ জন্ম. গৈলা, গৌরনদী, বরিশাল, ৪ জানুয়ারি ১৮৮২। কবি। পিতা চন্দ্রনাথ দাশ, মাতা ধনমণি দাশ। বরিশালে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত মেয়েদের স্কুলে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ শেষে কলকাতা বেথুন স্কুলে শিক্ষালাভ। স্কুলে পড়ার সময়



১৮৯৪-এ বরিশাল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউটের প্রধানশিক্ষক সত্যানন্দ দাশের সঙ্গে বিয়ে হয়। রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁদের পুত্র। বরিশাল ছাত্র সংঘের মাঘোৎসবে মহিলা দিবসের উপাসনায় আচার্যের দায়িত্ব পালন। পরে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায়ও তিনি আচার্যের দায়িত্ব পালন করতেন। শিশুদের জন্য 'কবিতা মুকুল' পুস্তক রচনা। 'পৌরাণিক আখ্যায়িকা' তাঁর গদ্যগ্রন্থ। 'প্রবাসী', 'ব্রহ্মবাদী', 'মুকুল' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রায়ই প্রকাশিত হতো। বিখ্যাত কবিতা: 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।' 'নারীত্বের আদর্শ' নামে প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯৪৮।

কৃত্তিবাস (১৩৮১-১৪৬১)॥ জন্ম. ফুলিয়া গ্রাম, নদীয়া, আনুমানিক ১৩৮১। কবি। 'বঙ্গদেশে প্রমাদ' পড়লে কৃত্তিবাসের পূর্ব-পুরুষ নরসিংহ ওঝা তাঁর পূর্ববঙ্গের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে চলে যান এবং সেখানে তৎকর্তৃক স্থায়ী নিবাস নির্মাণ। কৃত্তিবাস নরসিংহ ওঝা থেকে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। তিনি তাঁর পিতা বনমালীর জ্যেষ্ঠপুত্র। শিক্ষা লাভের জন্য এগারো বছর বয়সে উত্তরবঙ্গে গমন। 'বরেন্দ্র'র বিশিষ্ট পণ্ডিতদের কাছে বিদ্যার্জন। শিক্ষা শেষে কোনো এক গৌড়েশ্বরের রাজসভা অলঙ্কৃত। রাজাদেশে কৃত্তিবাস কর্তৃক তাঁর অমর কাব্য 'রামায়ণ' রচনা। বাঙালির আবেগ, অনুভূতি ও রুচির দিক লক্ষ্য রেখে সর্বজনবোধ্য পদ্যে মূল সংস্কৃত রামায়ণের ভাবানুবাদ হওয়ায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের ব্যাপক

জনপ্রিয়তা লাভ শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারিগণ কর্তৃক এটি প্রথম মুদ্রিত (১৮০২-১৮০৩)। মৃত্যু. আনুমানিক ১৪৬১।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৮৪০। শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। পিতা রামজয় তর্কালঙ্কার। ১৮৫৭-তে সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৮৬০-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাস। প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা, পরে বিদ্যালয়ের উপ-পরিদর্শক পদে দায়িত্ব পালন। ১৮৬২-তে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত। পরে সিনিয়র অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৮৭২-এ বি.এল. পাস। ১৮৭৩-এ অধ্যাপনা ছেড়ে কলকাতা হাইকোর্টে ও হাওড়া কোর্টে ওকালতি শুরু। ১৮৮৪-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত। ১৮৯১-তে রিপন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৯০৩-এ এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ। কঁৎ-এর পজিটিভিজম দর্শন ও নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী। তৎকালীন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী'র প্রথম সম্পাদক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য। 'দূরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' ও 'বিচিত্রবীর্য্য' (১৮৬২) নামক দুটি গদ্যগ্রন্থ রচনা। মূল ফরাসি থেকে 'পৌল ও ভর্জিনী' তাঁর একটি অনবদ্য অনুবাদ। রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থমালার চতুর্থ ভাগ সংকলন। এ ছাড়া সংস্কৃত কাব্যসমূহের ছাত্রপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশ করে ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষার পথ সহজ করেন। রমেশচন্দ্র দত্তের 'ঋগবেদ সংহিতা'র বঙ্গানুবাদেও তাঁকে সহায়তা প্রদান। মৃত্যু. ১৩ আগস্ট ১৯৩২।



কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪-১৯০৭)॥ জন্ম. সেনহাটি গ্রাম, খুলনা, ১৮৩৪। কবি ও সাংবাদিক। গ্রাম্য পাঠশালায় বাল্যশিক্ষা গ্রহণ। শৈশবে পিতার মৃত্যু হলে ঢাকায় তাঁর এক জ্ঞাতি গৌরচন্দ্র দাসের (ঢাকা জজ কোর্টের উকিল) কাছে আশ্রয় গ্রহণ। ঢাকা নর্মাল স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা। ঝালকাঠির কীর্তিপাশা বাংলা বিদ্যালয়ের প্রধানপ[illegible] যোগদান। কিছুদিন পরে এ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। ঢাকা নর্মাল স্কুলে পণ্ডিত পদে নিযুক্তি লাভ। স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় শিক্ষকতার কর্ম থেকে পদত্যাগ। মাসিক 'মনোরঞ্জিকা' (১৮৬০) ও মাসিক 'কবিতা কুসুমাঞ্জলি' (১৮৬০) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। ১৮৬১-তে সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশিত হলে এর সম্পাদকের পদ অলংকৃত। এ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ। এ নিয়ে পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে মতানৈক্য দেখা দিলে পদত্যাগ করেন। সাপ্তাহিক 'বিজ্ঞাপনী' (১৮৬৫) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। প্রায় দেড় বছর এ পদে দায়িত্ব পালন। 'ঢাকা প্রকাশের' মালিকের অনুরোধে পুনরায় এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। কিছুদিন পর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে ঢাকা ত্যাগ করে সেনহাটি গমন। আত্মসম্বিত ফিরে পাবার পর যশোর জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত (১৮৭৪)। এখানে ১৮৯৩ পর্যন্ত শিক্ষকতা করার পর অবসর গ্রহণ। যশোরে অবস্থানকালে 'বৈভাষিকী' (১৮৮৬) নামক একখানি সংস্কৃত-বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা। অবসর-জীবনে সেনহাটিতে বসবাস। উপদেশ ও নীতিমূলক কবিতা রচনায় প্রতিভার পরিচয় প্রদান। 'সদ্ভাবশতক' (১৮৬১) তাঁর বিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা পারস্যের কবি হাফিজ ও পারস্যের অপর কবি সাদীর কবিতার ভাবানুবাদ। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মোহভোগ' (১৮৭১) মহাভারতের 'নহুষ' উপাখ্যান অবলম্বনে নাটকাকারে রচিত। 'রাসের ইতিবৃত্ত' (১৮৬৮) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের আত্মজীবনীমূলক রচনা। শেষজীবনে ব্রহ্মধর্ম পরিহার করে সনাতনধর্মের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন। মৃত্যু. সেনহাটি, খুলনা, ১৩ জানুয়ারি ১৯০৭



কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২)॥ জন্ম. নদীয়া, কৃষ্ণনগর, ১৭১০। নদীয়ার বিখ্যাত জমিদার। কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর। তাঁর পিতার নাম রঘুরাম রায়। বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা

অর্জন। সংগীত এবং অস্ত্রবিদ্যায় ও পারদর্শী। রাজনীতির ক্ষেত্রে কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তাঁর শাসনামলে বাংলায় মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনে তাঁর হাত ছিল বলে অনুমান করা হয়। ইংরেজ-কর্তৃক 'মহারাজা' উপাধি প্রদান; এ ছাড়া ক্লাইভ কর্তৃক পাঁচটি কামান উপঢৌকন প্রদান। পরবর্তীকালে এ-সকল কামান কৃষ্ণনগর রাজপ্রসাদের শোভাবর্ধন করে। নবাব মীর কাশিমের আমলে খাজনা আদায়ের অবহেলার অভিযোগে মুঙ্গের দুর্গে বন্দী হন এবং পরে প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু ইংরেজদের সহায়তায় রক্ষা পান। বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী নরপতিরূপে খ্যাতিমান। তাঁর রাজসভায় গোপাল ভাঁড়, ভারতচন্দ্র রায়, হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণনন্দ বাচস্পতি, বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন্দ, রামপ্রসাদ প্রমুখ গুণীজনের সমাবেশ ঘটেছিল। এঁদের অনেকেই বৃত্তি বা নিষ্কর জমি পান। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশক্রমে ভারতচন্দ্র রায় তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। তাঁর রাজত্বকালে নাটোর থেকে বিশিষ্ট মৃৎশিল্পীগণ এসে কৃষ্ণনগরে মৃৎশিল্পের প্রসার ও উন্নতি ঘটান। বাংলায় জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলক। বর্গীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য 'শিবনিবাস' নামক স্থানে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন। মৃত্যু. ১৭৮২।

কৃষ্ণদয়াল বসু (১৮৯৭-১৯৭২)॥ জন্ম. রংপুর, ১৮৯৭। কবি, অনুবাদক, ব্যাকরণবিদ, ছান্দসিক। রংপুরের উলিপুর হাইস্কুলে অধ্যয়ন। কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটে অবস্থিত মিত্র ইনস্টিটিউশনের বাংলার শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ- কবিতা: মোহনা। শিশুপাঠ্য পদ্যগ্রন্থ: ঝুনুঝুনু। বাংলা বানান সম্পর্কিত গ্রন্থ: বর্ণশ্রী। কাব্যানুবাদ: কালিদাসের মেঘদূত। অনূদিত উপন্যাস: তুর্গেনিভের 'ভার্জিন সয়েল।' রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধানের সম্পাদনা কাজের অন্যতম পরামর্শদাতা। তাঁর ছন্দজ্ঞান ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছন্দের ত্রুটি ধরিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথও পত্রে স্বীকারোক্তি মারফত সংশোধন করতেন। মৃত্যু. ১৯৭২।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৫৩০-১৬১৫)॥ জন্ম. ঝামটপুর, কাটোয়া, আনুমানিক ১৫৩০। চৈতন্যজীবনীকার ও বৈষ্ণবভক্ত পণ্ডিত। গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়ন ... ফারসি ভাষা শিক্ষা। যৌবনে সংসার ছেড়ে বৃন্দাবন গমন। রঘুনাথ দাসের নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সাত বছরের কঠোর পরিশ্রমে রচিত ১০,৫০৩টি পয়ার ও ১,০১২টি শ্লোক-সম্বলিত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (আনু. ১৬১২)। 'কৃষ্ণামৃত' গ্রন্থের টীকাভাষ্য রচনা করে পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান। 'গোবিন্দলীলামৃত' ও 'ভাগবত শাস্ত্র-গূঢ় রহস্য' তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কৃষ্ণদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, শ্রীনিবাস-কর্তৃক বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থাদির সঙ্গে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি বাংলাদেশে আনার সময়ে বনবিষ্ণুপুরের দস্যুরাজা হাম্বীর-কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে কৃষ্ণদাস এই সংবাদ পেয়ে রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ-বিসর্জন দেন। মৃত্যু. ১৬১৫।

কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮-১৮৮৪)॥ জন্ম. কাঁশারীবাজার, কলকাতা, ১৮৩৮। পত্রিকা সম্পাদক ও রাজনীতিবিদ। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। অরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পাঁচ বছর (১৮৪৮-১৮৫৩) ও হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে তিন বছর (১৮৫৩-১৮৫৭) অধ্যয়ন। কিছুকাল চব্বিশ পরগনা জজকোর্টে অনুবাদকের পদে দায়িত্ব পালন। জেলা জজ তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হতে না পারায় চাকরিচ্যুত (১৮৫৭)। রাজনীতি ও সাংবাদিকতায় যোগদান। ১৮৫৮-তে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের (২৯ অক্টোবর ১৮৫১) সহকারী সম্পাদক ও ১৮৭৯-তে এর সম্পাদক নিযুক্ত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন। সিপাহি বিদ্রোহের জন্য ব্রিটিশ শাসকেরা এদেশবাসীর ওপর বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলে তা অপনোদনের জন্য কৃষ্ণদাস একটি পুস্তিকা (The Mutiny and the People or Statements of Native Fidelity) প্রকাশ করে (১৮৫৯) তাতে লিখেন: 'সিপাহি বিদ্রোহে জনসাধারণের সমর্থন ছিল না-কেবল সিপাহিরাই বিদ্রোহী হয়েছিলেন-যুদ্ধের সময় দেশবাসী ইংরেজদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। জমিদারদের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (৬ জানুয়ারি ১৮৫৩) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত



(নভেম্বর ১৮৬১)। আজীবন এ পদে দায়িত্ব পালন। তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় এটি একটি অসামান্য শক্তিশালী সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত। ফলে বিদ্বৎসমাজের কাছ থেকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন। ১৮৬৩-তে কলকাতার জাস্টিস অব দি পিস ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, ১৮৭২-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও ১৮৮৩-তে জমিদারদের প্রতিনিধি স্বরূপ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত। ব্রিটিশ শাসনের গুণানুরক্ত হলেও শাসকদের কোনো ব্যবস্থা দেশের জন্য অহিতকর হলে তার বিরোধিতা। আসামের কুলি আইন ও মুদ্রাযন্ত্র বিধির (১৮৭৮) প্রতিবাদ করে হিন্দু-প্রেট্রিয়টে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ। বাগ্মী হিসেবেও খ্যাত। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত আইন ও ইলবার্ট বিলের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করে ব্যবস্থাপক সভায় সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান। রায়বাহাদুর (১৮৭৭) এবং সি.আই.ই. (১৮৭৮) উপাধি লাভ। উনিশ শতকের মধ্যভাগের পরের আড়াই দশকে বাংলার রাজনীতি ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণাচার্য কাহ্নপা (৬৭৫-৭৭৫)॥ জন্ম. আনুমানিক ৬৭৫ খ্রি.। জীবনকাল আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে অষ্টম শতাব্দী। চর্যাপদের কবি। দেবপালের সমসাময়িক ও নাথপন্থি যোগী জালন্ধরীপা বা হাড়িপা'র শিষ্য। তিব্বতি ঐতিহ্যমতে উড়িষ্যার অধিবাসী। পরিণত বয়সে সোমপুর বিহারে নিবাস তৈরি। কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত। নাথপন্থি ও সহজিয়াপন্থিদের অনুসারী। সোমপুর বিহারের অন্যতম বিখ্যাত আচার্য। বজ্রযান সম্পর্কে লেখা ৫০টিরও বেশি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রাচীন বাংলার আদি গ্রন্থ 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ে' তাঁর ১৩টি গান সংকলিত। এছাড়া অপভ্রংশ ভাষায় লেখা তাঁর একটি 'দোহাকোষ' আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর রচিত 'হেবজ্র পঞ্জিকা' নামক একখানি পুঁথি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। মৃত্যু. ৭৭৫ খ্রি.।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড (১৮১৩-১৮৮৫)॥ জন্ম. মাতুলালয়, ঝামাপুকুর, কলকাতা, ২৪ মে ১৮১৩। পণ্ডিত, খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। আদি নিবাস বনগ্রাম, চব্বিশ পরগনা। এক দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। ১৮২৪-এ হিন্দু কলেজে অবৈতনিক ছাত্ররূপে ভর্তি। ডিরোজিওর শিষ্যত্ব গ্রহণ। তাঁর প্রভাবে



পড়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন। ১৮২৯-এ হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ। এরপর কলকাতার পটলডাঙ্গা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত। ১৮৩২-এ ডাফ সাহেবের কাছে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। ধর্মান্তরিত হওয়ার দরুন পটলডাঙ্গা স্কুলের চাকরি হারান। পরের বছর মিশনারি সোসাইটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মির্জাপুর স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত (১৮৩৩)। তাঁর যত্ন ও উদ্যোগে মধ্যবাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্তিত (১৮৩৬)। ১৮৩৭-এ খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকের পদ লাভ। কলকাতার সিমলা পল্লীতে ক্রাইস্ট চার্চ (১৮৩৯) স্থাপিত হলে আচার্য নিযুক্ত। ১৮৫২-তে বিশপ্স কলেজে তৃতীয় অধ্যাপকের পদ লাভ। কিছুকাল পরে দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদে উন্নীত। ১৮৬৮-তে অধ্যাপনার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ। রাজনীতিতে খ্যাতি অর্জন। ১৮৭৫-এ ইন্ডিয়ান লীগের ও ১৮৭৬-এ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের (ভারতসভা) সভাপতি নির্বাচিত। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভারতসভার সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত। ১৮৮০-তে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত। বিভিন্ন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন। ১৮৫১-তে বেথুনসভার এবং ১৮৬৭ ও ১৮৬৮-তে ফ্যাকালটি অব্ আর্ট সভার সভাপতি নিযুক্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং এশিয়াটিক সোসাইটি বেঙ্গল সোসাইটির সদস্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষার সংস্কৃত, তামিল, হিন্দি ও উড়িয়া ভাষার পরীক্ষক। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এনকোয়ারার (১৮৩১), হিন্দু ইউথ (১৮৩১), গভর্নমেন্ট গেজেট (১৮৪০), সংবাদ-সুধাংশু (১৮৫০), ইভাঞ্জেলিস্ট পত্রিকার সম্পাদক। জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে খ্যাত। গ্রন্থ: এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলিয়ানসিস (১৮৪৫-১৮৪৬), ষড়দর্শন সংবাদ (১৮৬১-১৮৬২), এরিয়ান উইটনেস (১৮৭৫)। বহুভাষাবিদ

পণ্ডিত। বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, ফরাসি, ল্যাটিন, গ্রিক, হিব্রু, উড়িয়া, তামিল ও গুজরাটি ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এল.এল.ডি. (১৮৭৬) ও ইংরেজ সরকার কর্তৃক সি.আ.ই.ই উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু. কলকাতা, ১২ মে ১৮৮৫।

কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক (১৮৮৭-১৯৭৭)। জন্ম. লাকসাম, কুমিল্লা, ১৮৮৭। অবিভক্ত বাংলার কৃষক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগঠক। সারা ভারত কৃষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ। এসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন। কুমিল্লায় কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত অসহযোগ আন্দোলন থেকে। কুমিল্লা জেলার লাকসামের হাসনাবাদে খাজনা বন্ধের আন্দোলনে মুখলেছুর রহমান, কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক, ফনী মজুমদার, আবদুল মালেক প্রমুখের নেতৃত্বে প্রায় তিন হাজার কৃষকের শোভাযাত্রা পরিচালনা (১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২)। শোভাযাত্রাকারীদের ওপর পুলিশ গুলিতে তিনজন কৃষক শহীদ ও ২৫-৩০জন আহত। এ ঘটনায় অন্যান্য নেতার সঙ্গে কারারুদ্ধ। আন্দোলনে এরাদুল্লাহ ও মুহম্মদ এয়াকুবের ভূমিকাও উজ্জ্বল। ভারতের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে তা অনন্য ঘটনা। কুমিল্লায় সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে (১৯৩৮) যোগদান। স্বামী সহজানন্দ, মুজফফর আহমদ, বঙ্কিম মুখার্জী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ইন্দ্রলাল যাজ্ঞিক, কমল সরকার সম্মেলনে অংশগ্রহণ। ললিতমোহন বর্মণ, ফনী মজুমদার ও মুহম্মদ এয়াকুবের সঙ্গে সক্রিয় ভূমিকা পালন। হিন্দু-মুসলিম একযোগে কৃষকের দাবি নিয়ে আন্দোলন কুমিল্লা কৃষক আন্দোলনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় (১৯৪৬) হিন্দু-মুসলিম স্বেচ্ছাসেবী ত্রিপুরা-নোয়াখালী সীমানায় পাহারা দিতে থাকে। দাঙ্গা কুমিল্লা জেলায় ছড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনাকে কুমিল্লার কৃষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে শক্তহাতে প্রতিরোধ; হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে হাসনাবাদ এলাকায় এনে আশ্রয় ও সাহায্যদানের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ। দেশবিভাগের পর উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নদীয়া জেলার জাগুলিয়াতে উদ্বাস্তু কলোনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ ও সেখানে বসবাস। হরিণঘাটা থানায় কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠা। নদীয়া জেলা কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কৃষক আন্দোলন পরিচালনার বৃত্তান্ত ডায়েরিতে লিপিবদ্ধকরণ। মৃত্যুর পর সেই ডায়েরি 'আমার জীবনে কৃষক আন্দোলন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ (সম্পা. কল্পতরু সেনগুপ্ত)। মৃত্যু. ১৯৭৭।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ॥ জীবনকাল, ১৫০০-এর মধ্যবর্তী সময়। দার্শনিক। মধ্যযুগীয় নবদ্বীপের অন্যতম ত্রিরত্ন এবং বঙ্গীয় তন্ত্রের যুগন্ধর পুরুষ। তাঁর রচিত 'তন্ত্রসার' বহুল সমাদৃত একখানি প্রামাণিক তান্ত্রিক গ্রন্থ। এতে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব,সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের তন্ত্রগ্রন্থের মূল বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ-ছাড়াও দীক্ষা, পূজা পদ্ধতি, হোম প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড, কুলাচার, বিভিন্ন দেবীর স্তোত্র, যন্ত্র, মণ্ডল, চক্র প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে। কথিত আছে, বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমূর্তি কৃষ্ণানন্দই সর্বপ্রথম কল্পনা করেন। তিনিই এ পূজার প্রচলন করেন। কৃষ্ণানন্দের নামাঙ্কিত 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী'ও একখানা তত্ত্বগ্রন্থ।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯)॥



জন্ম. দক্ষিণেশ্বর, চব্বিশ পরগণা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩। কথাশিল্পী। বাংলাসাহিত্যে 'দাদা মশাই' নামে খ্যাত। প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে, পরে উত্তরপাড়া, বরাহনগর, মীরাট ও আম্বালায় শিক্ষা লাভ। কাব্যাকারে লিখিত প্রথম গ্রন্থ 'রত্নাকার' (১৮৯৩)। ১৮৯৪-তে 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার' নামক তিনশত প্রাচীন কবি-সংগীতের একটি সংকলন প্রকাশ। সরকারি কাজে বিভিন্ন দেশ সফর। এই-সূত্রে ১৯০২-১৯০৫ পর্যন্ত চীনদেশে অতিবাহিত। এরপর চাকরি জীবন থেকে অবসর নিয়ে কাশীবাসী হন। ১৯৩৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান। একই বছর গোরক্ষপুর বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে তাঁর জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮-এ মীরাট সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক সংবর্ধিত। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৬-এ দিল্লি, ১৯২৭-এ মীরাট ও ১৯৩৪-এ নাগপুরে অনুষ্ঠিত

সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি। কৌতুক-রসিক লেখক হিসেবে খ্যাত। জবিন, সমাজ ও সংসারের বেদনাবিধুর দিকগুলো হাস্যরসের মাধ্যমে উপস্থাপনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। রচিত গ্রন্থ: উপন্যাস—কোষ্ঠীর ফলাফল (১৯২৯), ভাদুড়ী মশাই (১৯৩১), আই হ্যাজ (১৯৩৫)। গল্প গ্রন্থ: আমরা কি ও কে (১৯২৭, দুঃখের দেওয়ালী (১৯৩২)। রঙ্গকাব্য: কাশীর কিঞ্চিৎ (১৯১৫), উড়ো খৈ (১৯৩৪)। ভ্রমণ কথা: চীনযাত্রী (১৯২৫)। মৃত্যু. ২৯ নভেম্বর ১৯৪৯।

কেদারনাথ মজুমদার (১৮৭০-১৯২৬)॥ জন্ম. মাতুলালয়, কাপাসাটিয়া গ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৭ (১৮৭০)। পৈতৃক নিবাস গচিহাটা গ্রাম, কিশোরগঞ্জ। সাংবাদিক, লেখক, গবেষক। ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' (১৯১২) ও 'আরতি' নামক মাসিক পত্রিকার পরিচালক ও সম্পাদক। বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলন ও প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ও প্রধান সম্পাদক। গৌরীপুরে অনুষ্ঠিত 'পূর্ণিমা সাহিত্য সম্মেলন' তাঁরই প্রচেষ্টায় সফল হয়। ময়মনসিংহ., কিশোরগঞ্জ, জামালপুর ও শেরপুরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনে তাঁর উদ্যম স্মরণীয়। তিনি ছিলেন সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী। মায়ের নামে স্বগ্রামে একটি পাঠাগার স্থাপন। মায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য ময়মনসিংহ শহরে 'জয়দুর্গা এম.ই. স্কুল' (১৯১৭) স্থাপন। পরে এটি হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়ে 'জয়দুর্গা ইনস্টিটিউশন' নামে পরিচিত হয়। ১২৯৪-এ 'কুমার' নামক মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত। তাঁর উদ্যোগে ময়মনসিংহে 'সাহিত্য সভা' স্থাপিত। ময়মনসিংহ শহরে 'রিসার্চ হাউস' নামক গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ও অনন্য ভূমিকা পালন। তাঁর 'ময়মনসিংহের ইতিহাস' (১৯০৫) একখানি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ। রচিত গ্রন্থ: ঢাকার বিবরণ (১৯০৯), ময়মনসিংহের ইতিহাস (১৯০৫), সাময়িক সাহিত্য (১৯১৭), রামায়ণের সমাজ (১৯২৭), শুভ দৃষ্টি (১৯২৩), সমস্যা (১৯২৪), গদ্য সাহিত্য(১৯০১), চিত্র (১৯০৬), ময়মনসিংহ সহচর (১৯০৮), ময়মনসিংহের বিবরণ (১৯০৪)। মৃত্যু. ময়মনসিংহ, ১৯২৬।



কে. পি. বসু (১৮৬০-১৯১৪)॥ জন্ম. হরিশঙ্করপুর গ্রাম, ঝিনাইদহ, ২৪ নভেম্বর ১৮৬০। গণিতজ্ঞ। পূর্ণ নাম কালীপদ বসু। হরিশঙ্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু। পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তিলাভ। যশোর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স ও এফ.এ. কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে অঙ্কে লেটারসহ প্রথম বিভাগে বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এম.এ. (১৮৮২) পাস। কলকাতায় অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে সহকারী অডিটর পদে যোগদান। এক বছর চাকরি করার পর ১৮৮৩-তে কটকের রেভেন কলেজে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত। প্রায় সাত বছর এ কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৮৯০-এ ঢাকা কলেজে যোগদান। ১৮৯৪ পর্যন্ত এ কলেজে গণিতের অধ্যাপনা। এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। ১৯০৮-এ অধ্যাপনার পেশা পরিত্যাগ করে কলকাতায় প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ। গণিতশাস্ত্রের ওপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন। ১৯০২-এ কলকাতায় সর্বভারতীয় 'ম্যাথমেটিক্যাল কনফারেন্সে' তাঁর পঠিত 'হাউ টু টিচ অ্যারেথমেটিক্স' শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধটি অঙ্ক শাস্ত্রের এক অমূল্য সম্পদ। এ প্রবন্ধে প্রচলিত কড়াকিয়া ও গণ্ডাকিয়া পদ্ধতি বর্জন করে দশমিক পদ্ধতি চালুর সুপারিশ। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: শিশুতোষ পাটিগণিত (১ম ও ২য় শ্রেণির জন্য), শিশুরঞ্জন গণিত প্রশ্নমালা (৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণির জন্য), অ্যালজেবরা মেডইজি (মেট্রিক পর্যায়ের), মর্ডান জিওমেট্রি, ইন্টারমিডিয়েট অ্যালজেবরা, ইন্টারমিডিয়েট জিওমেট্রি এবং সহজ আধুনিক গণিত। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯১৪



কে. মল্লিক (১৮৮৮-১৯৫৯)॥ জন্ম. কুসুমগ্রাম, বর্ধমান, ২৪ মে ১৮৮৮। গায়ক। আসল নাম মুনশী মহাম্মদ কাশেম। এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্ম। ১৯০২-এ গ্রামের বাড়ি থেকে কলকাতায় আগমন। এক মাড়োয়ারির দোকানে কাজে যোগদান। পরে চামড়ার যাচনদার হিসেবে 'র‍্যালি ব্রদার্স কোম্পানিতে' চাকরি পেয়ে কানপুরে যান। সেখানে সংগীতজ্ঞ আবদুল হাই হাকিমের কাছে সংগীতে তালিমগ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মাসিক ২০ টাকা বেতনে চাকরি গ্রহণ (১৯১০)। এক সন্ধ্যায় কলকাতার সিন্দুরিয়া পট্টিতে এক বন্ধুর দোকানে বসে পাড়ার দোকানদারদের রজনীকান্তের 'আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে' গানটি গেয়ে শোনান। শ্রোতাদের ভিড়ে রাস্তার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তখন পুলিশ এসে তাঁর হারমোনিয়াম কেড়ে নেয়। গায়করূপে সৌভাগ্যের সূত্রপাত এখান থেকে। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের গান গেয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন। 'বেকা', 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' প্রভৃতি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে তাঁর গাওয়া অসংখ্য গানের রেকর্ড প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের 'আমার মাথা নত করে দাও হে', অতুলপ্রসাদের 'বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথায়', নজরুলের 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল' প্রভৃতি গান তাঁর কণ্ঠে রেকর্ডিং হলে সংগীত রসিক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি। বাংলা গানের রেকর্ডে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তার নাম রাখা হয় 'কে. মল্লিক'। 'পণ্ডিত শংকর মিশ্র' নামে বহু হিন্দি গান ও 'মুনশী মহাম্মদ কাশেম' নামে বেশ কিছু ইসলামিক গান রেকর্ডিং। নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঝরিয়ার রাজবাড়ির সভাগায়ক। বিখ্যাত গায়িকা কমলা ঝরিয়া তাঁরই অনুপ্রেরণায় কলকাতায় এসে গান শেখেন। শেষজীবন নিজ গ্রামে বাস। মৃত্যু. ১৯৫৯।



কেরামত আলী জৌনপুরী, মওলানা (১৮০০-১৮৭৩)॥ জন্ম. জৌনপুর, ভারত, ১৮০০। ধর্ম প্রচারক। হজরত আবুবকর সিদ্দিকের পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ। জৌনপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী নামে সমধিক পরিচিত। সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুরক্ত সাগরিদ। ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে জৌনপুর ছেড়ে কলকাতা আগমন এবং কলকাতা থেকে যশোর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট ও আসামের অনেক জায়গা ভ্রমণ করে ওয়াজের মারফত সংস্কার কাজ পরিচালনা। বিভিন্ন স্থানে সংস্কারমূলক কাজ সম্পন্ন করে ১৮৭৩-এ রংপুর শহরে আগমন এবং এই শহরের মুন্সিপাড়ায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অবস্থান। বিখ্যাত আলেম হিসেবে খ্যাত। ইসলাম ধর্ম ও শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল অসীম। পঞ্চাশটি গ্রন্থের প্রণেতা। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'মিফতাহুল জান্নাত'। সব বই উর্দু ভাষায় লিখিত। ইসলাম ধর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাশক্তির পরিচয় এ-সকল বইয়ে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে এ-দেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক দুরবস্থায় মওলানা কেরামত আলী ইসলামের 'সিরাতুল মোস্তাকীম,-এর পথ প্রদর্শন করেন। তাঁর মৃতদেহ রংপুর শহরের মুন্সিপাড়ায় সমাহিত করা হয়। সমাধি পাশে মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। ১০ নভেম্বর ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে ওরশ উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। মৃত্যু. ৩০ মে ১৮৭৩।

কেরামতুল্লা খাঁ॥ জন্ম. মেটিয়াবুরুজ, কলকাতা। যন্ত্রসংগীতশিল্পী। বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে যে কারু, চারু ও সংগীতশিল্পী দল যোগদান করে তাতে সরোদবাদক কেরামতুল্লা ও তাঁর অনুজ কৌকব খাঁ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯১৫-তে কৌকবের মৃত্যু হলে তাঁর স্থলে তিনি কলকাতা 'সংগীত সঙ্ঘের' প্রধান যন্ত্রসংগীত শিক্ষক নিযুক্ত। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-?)॥ জন্ম. মুড়াপাড়া গ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, ৬ জানুয়ারি ১৮৯২। যন্ত্রসংগীতশিল্পী। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। প্রথমে খোল বাদনে দক্ষতা লাভ ও পরে যথাক্রমে প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ যদুনাথ দাস ও ভগবান দাসের কাছে সেতার যন্ত্রে তালিম গ্রহণ। তবলা বাদনের প্রতি

বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে সেতার ছেড়ে তবলায় তালিম নেওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদের ওস্তাদ আতা হোসেনের শিষ্যত্ব গ্রহণ। কিছুকাল দিল্লি ঘরানার ওস্তাদ নথ্থু খাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ। ঢাকা বেতারকেন্দ্রের বিশিষ্ট শিল্পী। পাণ্ডিত্য ও গুণাবলির স্বীকৃতিস্বরূপ ইংরেজ সরকার-কর্তৃক 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত। ১৯৩০-১৯৪৫ পর্যন্ত বিধান-পরিষদের সদস্য। মৃত্যু. সঠিক তারিখ জানা যায় না।

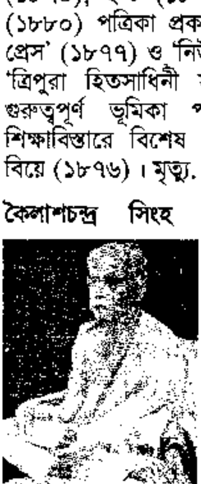
কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)॥ জন্ম. কলুটোলা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর, ১৮৩৮। ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের নেতা। পিতা প্যারীমোহন সেন। মাতা সারদাসুন্দরী দেবী। আদি নিবাস নৈহাটির নিকটবর্তী গরিকা গ্রাম। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এক শিক্ষিত ও বর্ধিষ্ণু বণিক পরিবারে জন্ম। শৈশবকালে পিতৃহীন হন। পাঠশালার পাঠ শেষ করে হিন্দু কলেজে ভর্তি (১৮৪৮)। এ কলেজে 'সিনিয়র স্কলারশিপের' দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। হিন্দু মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি। এ স্কুল উঠে গেলে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। স্বাস্থ্যহানির দরুন কলেজের পাঠ ত্যাগ। ১৮৫৫-তে কলুটোলায় একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষকে ধর্ম ও বিদ্যাশিক্ষা দান। ১৮৫৬-র ২৭ এপ্রিল বালীর বৈদ্য বংশীয় কন্যা গোলাপসুন্দরীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ধর্মবিষয়ে আলোচনার জন্য কলুটোলায় নিজ বাড়িতে 'গুড উইল ফ্রেটারনিটি' নামে একটি সভা স্থাপন। এই সভায় বক্তৃতা দেওয়া ও প্রার্থনা করা শেখেন। এ সময়ে 'রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা' নামক পুস্তক পাঠ করে বুঝতে পারেন যে তাঁর ধর্মমত ও ব্রাহ্মধর্মের মত এক। তাই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান। সেখানে যাতায়াত করতে করতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। বংশের প্রথা অনুসারে কুলগুরু মন্ত্র দিতে আসলে তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ। ১৮৫৭-তে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। উনিশ বছর বয়সে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত। ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপন, অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা, ধর্ম ও নীতি শিক্ষার নতুন প্রণালী প্রবর্তন ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনা করে ব্রাহ্মসমাজকে গতিশীল করে তোলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে 'বিধবা-বিবাহ নাটক'-এ অভিনয়। ১৮৫৯-এর ১ নভেম্বর কলকাতা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে (পরে পঞ্চাশ টাকা) চাকরি গ্রহণ, ১৯৬১-র ১ জুলাই চাকরি ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার আত্মনিয়োগ। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাইকে এক সার্বভৌম ধর্মে মিলিত হবার আহবান জ্ঞাপন। ১৮৬২-র ১৬ এপ্রিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে অভিষিক্ত। কুসংস্কারমূলক আচার-অনুষ্ঠান, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, উপবীত ধারণ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মদ্যপান, অবরোধ প্রথা বিলোপের পদক্ষেপ গ্রহণ। অসবর্ণ বিবাহ, পৈতা পরিত্যাগ, খ্রিস্টের প্রতি অনুরাগ, অব্রাহ্মণ আচার্য নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৮৬৬-এর ১১ নভেম্বর নব আদর্শে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা। এ নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শ প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ। তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বহু লোকের তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ। অনুসারীগণ কর্তৃক 'মহাপুরুষ', 'অবতার' প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত। ১৮৭০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বিলেত গমন। সেখানে বিভিন্ন সুধীমহলে বক্তৃতা করে তাঁদের মন জয়। স্বয়ং মহারানি ভিক্টোরিয়া রাজপ্রাসাদে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। বিলেতে ছ'মাস অবস্থানের পর ১৮ সেপ্টেম্বর (১৮৭০) দেশে প্রত্যাবর্তন। একই বছর 'ভারত-সংস্কার' নামক সভা স্থাপন। এর মুখপত্র হিসেবে 'সুলভ-সমাচার' নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি পত্রিকা প্রকাশ। পাক্ষিক 'ইন্ডিয়ান মিরর' সংবাদপত্রকে দৈনিক রূপান্তরিত। গরিব-দুঃখীদের কল্যাণের জন্য ভারত আশ্রম নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নারী-পুরুষে এক স্থানে বসে উপাসনা করার রীতি গ্রহণ করলেও মহিলারা পর্দার আড়ালে পৃথক স্থানে বসতেন। শিষ্যদের একাংশ পর্দা দূর করে দিয়ে প্রকাশ্যভাবে নারী-পুরুষে একত্রে বসে উপাসনা করার রীতি প্রবর্তনের দাবি তোলেন। কেশবচন্দ্র এ দাবি অগ্রাহ্য করলে অনুসারীদের এক বিরাট অংশের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ত্যাগ ও তাঁদের নেতৃত্বে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠিত (১৫ মে



১৮৭৮)। কেশবচন্দ্র তখন তাঁর সমাজের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নাম তুলে দিয়ে নতুনভাবে নাম রাখেন 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ'। তাঁর চেষ্টায় কলকাতায় 'অ্যালবার্ট হল' এবং নারীদের বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম ও গৃহকার্যে সুশিক্ষিতা করার অভিপ্রায়ে 'আর্য নারী সমাজ' নামে একটি সভা স্থাপন। 'নববিধান' নামক ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ (১৮৮১)। 'নব-বৃন্দাবন' নামক নাটক লিখে অভিনয়। গ্রন্থাবলি: 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান', 'প্রকৃত বিধান', 'বিধান-ভারত', 'নব সংহিতা'। মৃত্যু. কলকাতা, ৮ জানুয়ারি ১৮৮৪।

কৈলাশচন্দ্র নন্দী (১৮৪৮-১৮৮৪)। জন্ম. কালীকচ্ছ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৮৪৮। সাংবাদিক ও লোকহিতৈষী। পিতা দেওয়ান রামদুলাল নন্দী কালী-উপাসক, মালসী গান রচয়িতা। নন্দী পরিবার ভারতবর্ষে রাজনীতি, সমাজসেবা, স্বদেশী ও বিপ্লবী চেতনা, সংবাদপত্র সম্পাদনা, বুদ্ধিবৃত্তি, অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রেখে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। কুমিল্লা জিলা স্কুল ও ঢাকা কলেজে শিক্ষাগ্রহণ। ঢাকায় 'পূর্ব বাঙলা ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠাকালে (ডিসেম্বর ১৮৬৯) কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ভ্রাতা আনন্দচন্দ্র নন্দীসহ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ। ১৮৭০-এ দুর্গোৎসবের সময় বিজয়কৃষ্ণ, বঙ্গচন্দ্র, সাধু অঘোরনাথ প্রমুখকে নিয়ে স্বগ্রামে ব্রহ্মোৎসব করে পৈতৃক দুর্গামন্দিরকে ব্রহ্মমন্দিরে পরিণতকরণ। প্রধানত তাদের প্রচেষ্টায় গ্রামে ধর্মসভা স্থাপন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থে 'বঙ্গবন্ধু' (১৮৭০), 'ইস্ট' (১৮৭৫) ও 'পিলগ্রিমস জার্নাল' (১৮৮০) পত্রিকা প্রকাশ। ঢাকায় 'ইস্ট বেঙ্গল প্রেস' (১৮৭৭) ও 'নিউ প্রেস' (১৮৭৮) স্থাপন। 'ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা' (১৮৭২) প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। অন্তঃপুরবাসীদের শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ। ব্রাহ্মমতে বিয়ে (১৮৭৬)। মৃত্যু. ১৮৮৪।

কৈলাশচন্দ্র সিংহ (১৮৫১-১৯১৪)। জন্ম. কালীকচ্ছ গ্রাম, কুমিল্লা, ১৮৫১। ঐতিহাসিক, পুরাতত্ত্ববিদ। কালীকচ্ছ গ্রামের সাধক আনন্দচন্দ্র নন্দীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ। ১৮৬১-তে কুমিল্লা জেলা স্কুলে ভর্তি।



পনর বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় স্কুল ত্যাগ করে ত্রিপুরার রাজ সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ। পিতা গোলকচন্দ্র সিংহ ছিলেন ত্রিপুরাধিপতির রাজস্ব সচিব। বঙ্গদর্শন, ভারতী, বান্ধব, নব্য-ভারত, সাহিত্য, ঢাকা রিভিউ, সম্মিলনী প্রভৃতি পত্রিকায় বাংলার শিলালিপি, তাম্রশাসন, রাজবংশের ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ। ফলে ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাতি লাভ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক কলকাতায় আহ্বান এবং উড়িষ্যাস্থিত জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদান। দেড় বছর পর কলকাতা প্রত্যাবর্তন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ তখন সম্পাদক। প্রকাশনা: ত্রিপুরায় ইতিবৃত্ত (১৮৭৬), রাজমালা বা ত্রিপুরায় ইতিহাস (১৮৭৯), সেন রাজগণ (১৮৮৫) ও শ্রীদারুব্রহ্ম (১৮৮৬)। পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে তাঁর অবদান ঐতিহাসিকদের নিকট বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত। অন্যদিকে ত্রিপুরা, সিলেট, নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলের ইতিহাস আলোচনায় তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত ও রাজমালা অপরিহার্য হিসেবে স্বীকৃত। মৃত্যু. ১৯১৪।

কোরবান আলী (১৯২৪-১৯৯০)। জন্ম. কান্দিপাড়া গ্রাম, বিক্রমপুর, ১৯২৪। রাজনীতিবিদ। পিতা তমিজউদ্দিন সারেং। দুই ভার্যা-বেলা ও মমতাজ বেগম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. (১৯৪৭) ও ল (১৯৫০) পাস। ঢাকা জেলা আদালতে আইন



ব্যবসায় যোগদান ও আওয়ামী লীগ (১৯৪৯) সংগঠিত করার কাজে মনোনিবেশ। ১৯৫২-এর ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন ও কারা নির্যাতন ভোগ। ১৯৫৩-১৯৫৫ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ১৯৫৪-১৯৫৮ পর্যন্ত ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। ১৯৫৪-র ৮ মার্চ যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে লৌহজং-টঙ্গীবাড়ি আসন থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ৩০ মে ৯২-ক ধারা জারি করা হলে গ্রেফতার। ১৯৫৫-১৯৫৮ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ পরিষদের ডেপুটি

চিফ হুইপ। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশব্যাপী সামরিক আইন জারি করা হলে পুনরায় গ্রেফতার। প্রায় দুই বছর কারা নির্যাতন ভোগ। ১৯৬২-তে সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন চলাকালে আর একবার গ্রেফতার। ১৯৬৫-১৯৬৯ পর্যন্ত রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৭০-এ পুনরায় আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। একই বছর আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচার অভিযান পরিচালনা কমিটির প্রধান পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ। মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক উপদেষ্টা। ১৯৭২-১৯৭৪ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ সিরাজদীখান-টঙ্গীবাড়ি আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭৫-এর ২৬ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী নিযুক্ত। কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য (জুন-আগস্ট ১৯৭৫)। ১৫ আগস্ট (১৯৭৫) রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক বাহিনীর কিছুসংখ্যক সদস্যের হাতে নিহত হলে সরকারের পতন ঘটায় মন্ত্রিত্ব থেকে পদচ্যুত ও গ্রেফতার। প্রায় দুই বছর কারা নির্যাতন ভোগ। ১৯৭৯-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি মুন্সিগঞ্জ-২ আসন থেকে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। ১৯৮১-র ১৬ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৮৪-র ১৩ জুন লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান। প্রথমে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের এবং পরে পূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর পদে দায়িত্ব পালন। উদার গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে খ্যাত। এদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। সামরিক সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান করায় তাঁর রাজনৈতিক খ্যাতি খর্ব। মৃত্যু. ঢাকা, ২৩ জুলাই ১৯৯০।

কোরেশী মাগন ঠাকুর (১৬০০-১৬৬০)॥ জন্ম. চট্টগ্রাম (মতান্তরে আরাকান), ১৬০০ (আনুমানিক)। রোসাঙ্গ রাজসভার বাঙালি কবি। কবি কোরেশ বংশজাত সিদ্দিকী গোত্রভুক্ত মুসলমান। প্রকৃত নাম জানা যায় না, মাগন তাঁর ডাক নাম। 'ঠাকুর' আরাকানি রাজাদের সম্মানিত উপাধি। মাগন ঠাকুর ছিলেন রোসাঙ্গ-রাজ সাদ উমাদার এবং তাঁর পুত্র রোসাঙ্গ-রাজ চন্দ্র সুধর্মার প্রধানমন্ত্রী। আলাওল এই মাগন ঠাকুরের আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেছিলেন। আলাওল মাগন ঠাকুর সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁর মতো নানা গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি সে সময়ে রোসাঙ্গে আর কেউ ছিলেন না। বাংলা, আরবি, ফরাসি, বর্মি ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সংগীত, নাটক, কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। কবিতাগ্রন্থ: চন্দ্রাবতী। মৃত্যু. আরাকান, ১৬৬০।

ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০)॥ জন্ম. কাশী ৩০ নভেম্বর ১৮৮০। পৈতৃক নিবাস মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারঙ গ্রাম। শিক্ষাবিদ ও প্রবন্ধকার। আশৈশব কাশীতেই শিক্ষা লাভ। কাশীর কুইন্স কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম.এ. পাস করার পর



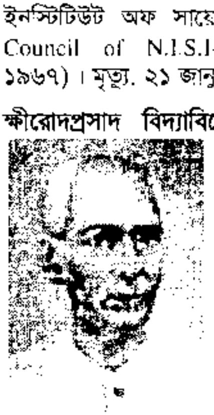
চম্বারাজ্যের শিক্ষা বিভাগে যোগদান। ১৯০৮-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষরূপে কর্মজীবন শুরু। ১৯৫৩-তে কিছুকাল বিশ্বভারতীয় অস্থায়ী উপাচার্য। ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মসাধনার গবেষণায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বাউল সংগীত সংগ্রহ। এছাড়া সন্তদের বাণী ও সাধনাতত্ত্ব সংগ্রহে দক্ষতার পরিচয় প্রদান। ১৯১৪-তে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত One Hundred poems of kabir গ্রন্থখানি তাঁর সংগৃহীত কবীরের বাণী অবলম্বনে প্রণীত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন প্রধান মর্মজ্ঞ ও ব্যাখ্যাতারূপেও খ্যাতিমান। 'কবীর' ১-৪ খণ্ড (প্রথম খণ্ড ১৯১০), তাঁর উল্লেখযোগ্য সংগৃহীত ও সম্পাদিত গ্রন্থ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচিত গ্রন্থ: মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার ধারা (১৯৩০), দাদু (১৯১৭), ভারতের সংস্কৃতি (১৯৪৩), বাংলার সাধনা (১৯১৭), জাতিভেদ (১৯৪৬), হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা (১৯৪৯), প্রাচীন ভারতে নারী

(১৯৫০), যুগগুরু রামমোহন (১৯৫২), বলাকা কাব্য পরিক্রমা (১৩৫৯) বাংলার বাউল (১৯৫৪), চিন্ময় বঙ্গ (১৯৫৭), Medieval Mysticism of India (১৯৩৬), Hinduism (১৯৬১),। এছাড়া গুজরাতি ভাষায় লিখেছেন তন্ত্রী সাধনা, শিক্ষণ সাধনা, চীন্-জাপান ও প্রবাস এবং হিন্দি ভাষায় লিখেছেন ভারতবর্ষ মে জাতিভেদ, সংস্কৃতিসঙ্গম নামক গ্রন্থ। ১৯৫২-তে বিশ্বভারতীর প্রথম 'দেশিকোত্তম' উপাধি পান এবং হিন্দি-চর্চার স্বীকৃতি-স্বরূপ সর্বভারতীয় সম্মান লাভ। মৃত্যু. ১২ মার্চ ১৯৬০।

ক্ষীরোদচন্দ্র দেব (১৮৯৩-১৯৩৭)॥ জন্ম. লাতুয়া, সিলেট, ১৮৯৩। রাজনীতিবিদ। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. ও বি.এল. পাস। ১৯২০-এ সিলেটে ওকালতি শুরু। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ। এ-সময় থেকেই সুরমা উপত্যকা অঞ্চলে নেতারূপে পরিচিতি। ষোলো বছর এ অঞ্চলে সকল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ১৯২৩-এ স্বরাজ দলে যোগ দিয়ে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে ভানুগাছে প্রায় এক সহস্র মণিপুরী কৃষকের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দান। দেড় বছর কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯৩২-এ মুক্তিলাভ। এরপর কংগ্রেসে যোগদান এবং ১৯৩৭-এ আসাম ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেস দলের সহকারী নেতা নির্বাচিত। সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ স্থাপনে সহায়তা প্রদান। জনশক্তি, শ্রীভূমি, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা। মৃত্যু. ১৯৩৭।

ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)॥ জন্ম. নৈলা, ফরিদপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮। ১৯২০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. পাস। পরে পি.আর.এস. হন ও মোয়াট স্বর্ণপদক লাভ। ১৯২০-১৯৪৭ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ১৯৪৭-১৯৬৯ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ১৯৬১ থেকে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকরূপে আমৃত্যু কর্মরত। ১৯৩৫-এ মনোবিশ্লেষণের জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন। যন্ত্রটি আমেরিকার Stoelting and Co. কর্তৃক নির্মিত হয় এবং উদ্ভাবকের নামানুসারে নামকরণ হয় 'Mukherjee Aesthesiometer'। ভারতীয় বিজ্ঞান (১৯৩৭) ও ভারতীয় দর্শন (১৯৪৭) মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের ফেলো (১৯৫৫), Council of N.I.S.I-এর সদস্য (১৯৬৬-১৯৬৭)। মৃত্যু. ২১ জানুয়ারি ১৯৭১।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)॥



জন্ম. খড়দহ, চব্বিশ পরগণা, ১২ এপ্রিল ১৮৬৩। নাট্যকার। বারাকপুর গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৮১), জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিশন থেকে এফ.এ. (১৮৮৩), মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি.এ. (১৮৮৮) ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়নে এম.এ. (১৮৮৯) পাস। জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে রসায়নবিদ্যায় অধ্যাপনা (১৮৯২-১৯০৩)। অলৌকিক রহস্য (১৯০৯) নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা (১৯০৯-১৯১৫)। ১৯০৩-এ কলেজের অধ্যাপনা পরিত্যাগ করে নাট্য-সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ। রঙ্গনাট্য, গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন। তাঁর রঙ্গনাট্য আলিবাবা (১৮৯৭), গীতিনাট্য বেদৌরা (১৯০৩), কিন্নরী (১৯১৮) এবং নাট্যকাব্য কুমারী (১৮৯৯) উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক রচনায়ও দক্ষতার পরিচয় প্রদান। দেশপ্রেম এ-সকল নাটকের প্রদান উপজীব্য। ঐতিহাসিক নাটক: বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য (১৯০৩), পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭), চাঁদবিবি (১৯০৭), নন্দকুমার (১৯০৮), অশোক (১৯০৮), বাঙ্গালার মসনদ (১৯১০), বঙ্গে মারাঠা (১৯১৭), আলমগীর (১৯২১)। পৌরণিক নাটক: সাবিত্রী (১৯০২), দুর্গা (১৯১৩), মন্দাকিনী (১৯২১)। নারায়ণী (১৯০৪), ও গুহামধ্যে (১৯২০) তাঁর রচিত উপন্যাস। মৃত্যু বিকনা গ্রাম, বাঁকুড়া, ৪ জুলাই ১৯২৭ (১৮ আষাঢ় ১৩৩৪)।

ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮)॥ জন্ম. মৌরনি গ্রাম, মেদিনীপুর, ৩ ডিসেম্বর ১৮৮৯। বিপ্লবী বীর। অল্প বয়সেই মাতাপিতাকে হারিয়ে বড় বোনের কাছে লালিত-পালিত শিক্ষাজীবনের শুরু তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুলে। পরবর্তী সময়ে

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময়ে



সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সান্নিধ্য লাভ এবং ১৯০২-এ যুগান্তর দলে যোগদান করে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ। বিলাতি দ্রব্য বয়কট, বিলাতি লবণের নৌকা ডোবানো প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯০৬-এ মেদিনীপুরের এক প্রদর্শনীতে বিপ্লবী পত্রিকা 'সোনার বাংলা' বিলি করার সময়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েও পুলিশকে মেরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এই অভিযোগে পরে গ্রেফতার। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। কিন্তু বয়স নিতান্তই অল্প বলে সরকার কর্তৃক মামলাটি প্রত্যাহার। বিপ্লবীদের গোপন সংস্থায় অর্থের প্রয়োজনে ১৯০৭-এ মেলব্যাগ লুট। বিপ্লবী দল-কর্তৃক কলকাতার তদানীন্তন অত্যাচারী চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর উপর এ কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব পড়ে। নিরাপত্তার জন্য সরকার কর্তৃক কিংসফোর্ডকে মজফফরপুর বদলি। ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকীর মজফফরপুর গমন। ১৯০৮-এর ৩০ এপ্রিল রাত ৮ টার সময় কিংসফোর্ডের গাড়ি ভেবে মজফফরপুরের ইউরোপীয় ক্লাব থেকে ফেরা একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করার ফলে আরোহী দুজন ইউরোপীয় মহিলা নিহত হন। পরের দিনই ক্ষুদিরাম বসুকে গ্রেফতার করা হয় ও বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আদেশ শুনে ক্ষুদিরাম বসু হাসিমুখে বলেন যে, মৃত্যুতে তাঁর কিছুমাত্র ভয় নাই। মাত্র আঠারো বছর বয়সের এই তরুণ উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শহীদ। মৃত্যু. ফাঁসিকাষ্ঠে ১১ আগস্ট ১৯০৮।

ক্ষেত্র গুপ্ত (১৯৩০-২০১০)॥ জন্ম. পিরোজপুর, ১ মে ১৯৩০। পিতা মৃন্ময় গুপ্ত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, অভিনেতা এবং স্বদেশী। দেশবন্ধু ও নেতাজির সমর্থক বলে জেল ও গৃহবন্দিত্ব। মাতা সরযূ দেবী ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে গ্রেপ্তার। পিরোজপুর বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক, সুরেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এসসি. (১৯৪৮), সিটি কলেজ থেকে স্নাতক, বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বাংলায় এম.এ. (১৯৫৩) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ। ৬টি স্বর্ণ পদকসহ অজস্র পুরস্কার লাভ। ডি.ফিল. ও পরে ডি.লিট. উপাধি লাভ। পিরোজপুর ছাত্র-কংগ্রেসের সভাপতি, ১৯৪৪-'৪৫ থেকে নেতাজিপন্থী ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্তি, ১৯৪৭-এ কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন ছাত্র-সংগঠন বিপিএসএফে যোগদান, ছাত্রাবস্থায় ১৯৪৯-এ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য-পদ প্রাপ্তি। নিবর্তনমূলক আইনে আটক হয়ে জেল-হাজতে; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রথম কমিউনিস্ট সভাপতি। ১৯৫৪-এ লেকচারার পদে যোগ দেন চারুচন্দ্র কলেজে। ১৯৫৫-এ জ্যোৎস্না বসুর সঙ্গে পরিণয়। ১৯৫৬-তে আসেন কলকাতা সিটি কলেজে, ১৯৬৫-তে লেকচারার পদে আসেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বিদ্যাসাগর অধ্যাপক হিসেবে ১৯৯৫-এ অবসর গ্রহণ। ১৯৮৭-এ ইউজিসি কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত। সর্বভারতীয় পর্যায়ে বাংলার অধ্যাপকদের মধ্যে ইউজিসি অধ্যাপক হিসেবে ভবতোষ দত্ত তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত রবীন্দ্রভারতীর বাংলা বিভাগের সভাপতি; ২৬জন এম.ফিল. ও ৬৩ জন পি.এইচডি. গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক। ইংরেজিতে লিখিত সংবিধান বা আইনের বঙ্গানুবাদকল্পে সরকার কর্তৃক গঠিত অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ১৩ বছর। ১৯৯৩-এ গঠিত সর্বভারতীয় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন বাংলা-বিদ্যা সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদের সভাপতি। রচিত গ্রন্থাবলি: প্রাচীন কাব্য: সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নব্যমূল্যায়ন (১৯৫৯), কবি মুকুন্দরাম (১৯৬৪); বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস (২০০০), বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ৭খণ্ড (১৯৮২-২০০৭); মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প (১৯৬৩), নাট্যকার মধুসূদন (১৯৬২), কবি মধুসূদন এবং তাঁর পত্রাবলি (১৯৬৩), মধুবিচিত্রা (১৯৬৩); বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: শিল্পরীতি (১৯৭৪), বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিপত্র (১৯৮১), বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবতা এবং (১৯৮১), বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক মন (১৯৯০), বঙ্কিমী ব্যঙ্গ-প্রসঙ্গ (১৯৯০), পুনশ্চ বঙ্কিম (১৯৯০); রবীন্দ্রগল্প অন্য রবীন্দ্রনাথ (১৯৮৩), রবীন্দ্রনাথ- ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব

(১৯৮৬), ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ (১৯৮৬), Structures and Variations: Tagor's Novels (১৯৯১); কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার (১৯৫১), সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার (১৯৬১), নজরুলের কবিতা অসংযমের শিল্প (১৯৯৪), জীবনানন্দের কবিতার শরীর (১৯৯৪); সত্যজিতের সাহিত্য (১৯৯২), সত্যজিতের গল্প (২০০২), সত্যজিতের চিত্রনাট্য (২০০৩); বাংলা সংস্কৃতি ও যোগাযোগের সমস্যা (১৯৮৩), সংযোগের সন্ধানে লোকসংস্কৃতি (১৯৯২), উচ্চশিক্ষায় সংযোগসমস্যা (১৯৯৪), লোকসৃষ্টির নন্দনতত্ত্ব (২০০১), বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি (২০০০), Folklore: A Modern Challenge (২০০১); বাংলাদেশ: সাহিত্য ও সংস্কৃতি (২০০৬); ১৯৪৭ (১৯৮৯), বাঙালের বঙ্গদর্শন (১৯৯২), সাবধান তালিবান (২০০২)। মৈনুদ্দিন ছদ্মনামে রাজনৈতিক নিবন্ধ রচনা করতেন। পুরস্কার-পদক: এশিয়াটিক সোসাইটির সুকুমার সেন পদক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যাসাগর পুরস্কার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্য পুরস্কার, বাংলাদেশের মধুসূদন পুরস্কার, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল স্মারক পুরস্কার। মৃত্যু: কলকাতা; ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১০।

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী যোগশাস্ত্রী (?-১৯০৩)॥ জন্মতারিখ অজ্ঞাত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আদি প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৩-এ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র অবস্থায় কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশ করে লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। ১৮৭২-এ বালেশ্বরের কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট জন বিম্‌স কর্তৃক একটি সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব উত্থাপন। পরবর্তীকালে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয়নি। এই প্রস্তাব অনুসরণ করে ক্ষেত্রপাল-কর্তৃক সাময়িকপত্রে আন্দোলন শুরু। ১৮৯৩-র ২৩ জুলাই শোভাবাজারের কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার' প্রতিষ্ঠা। বিনয়কৃষ্ণ সভাপতি, ক্ষেত্রপাল সম্পাদক হন। সভার বিবরণী লেখা ও মুখপত্র প্রকাশ ইংরেজিতে চলতো। ইংরেজির বাহুল্যের জন্য কতিপয় সদস্য কর্তৃক আপত্তি উত্থাপন ও উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাব অনুসারে অ্যাকাডেমির নাম হয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' (২৯ এপ্রিল ১৮৯৪)। এরপর ক্ষেত্রপাল-কর্তৃক পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন। এক বছর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকা সম্পাদনে কৃতিত্ব প্রদর্শন ও বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ। রচিত গ্রন্থাবলি: চন্দ্রনাল (১৮৭৩), হীরক অঙ্গুরীয় (প্রহসন ১৮৭৫), হেমচন্দ্র (নাটক ১৮৭৬), মুরলী (উপন্যাস ১৮৮০) ইত্যাদি। মৃত্যু. ১৯০৩।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায়বাহাদুর (১৮৮০-১৯৬১)॥



জন্ম. ধুলগ্রাম, যশোর, ১৮৮০। শিক্ষাবিদ ও লেখক। ১৮৯৯-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাস। ১৯০১-১৯২৮ পর্যন্ত রাজশাহী কৃষ্ণনগর এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা। এরপর ১৯৩২ পর্যন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক এবং ১৯৩২-১৯৪৬ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনুলাহিড়ী অধ্যাপক'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক, বোম্বাইয়ে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভাপতি। রচিত গ্রন্থসমূহ: নীলাম্বরী, কানের দুল, কীর্তন পদামৃত মাধুরী, কীর্তন-গীতি প্রবেশিকা ইত্যাদি। সংগীতে বিশেষ দখল ছিল। আধুনিককালে শহরাঞ্চলে কীর্তন গান প্রচলনকারীদের অন্যতম। মৃত্যু. ১৯৬১।

খতিসা॥ আনুমানিক জন্ম, বলরামপুর, সিলেট। সংগীত রচয়িতা। আসল নাম আবদুল মজিদ। একজন বিশিষ্ট সংগীত রচয়িতা। তাঁর গান রচনাগুণে ও সুরের নৈপুণ্যে জনগণের হৃদয় জয় করে। প্রকৃত নামের বদলে তাঁর রচনায় 'খতিসা' ভণিতা ব্যবহার করতেন। তাঁর রচিত সংগীতগ্রন্থের নাম 'আসিফ নামা'। আসিফ নামার সর্বত্র 'খতিসা' ভণিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। জন্ম ও মৃত্যু. তারিখ অজ্ঞাত।

খন্দকার আবদুল হামিদ (১৯১৮-১৯৮৩)॥ জন্ম.

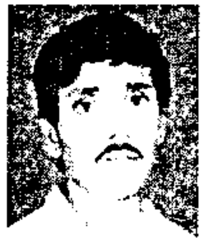


শেরপুর শহর, ১ মার্চ ১৯১৮। সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। ১৯৪০-এ কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান। ১৯৪৬-১৯৪৮ পর্যন্ত কলকাতার দৈনিক

'ইত্তেহাদ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, ১৯৫৩-১৯৫৬ পর্যন্ত ঢাকার দৈনিক 'মিল্লাত' ও ১৯৬৯-এ দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান ১৯৫৩-তে রাজনীতিতে যোগদান পঞ্চাশের দশকে আওয়ামী লীগ (১৯৪৯), ষাটের দশকে মুসলিম লীগ (১৯০৬), সত্তর ও আশির দশকে ডেমোক্রেটিক লীগ (১৯৭৬) ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (১৯৭৮) রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে ও ১৯৬৫-তে মুসলিম লীগের (কাউন্সিল) মনোনয়নে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৪-তে ৯২-কে ধারায় গ্রেফতার। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে কোয়ালিশন পার্লামেন্টারি পার্টির সেক্রেটারি। ষাটের দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর কলাম লেখক। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ-বিরোধী ভূমিকা পালন। পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে গমন এবং স্বাধীনতা-বিরোধী বক্তব্য প্রদান। স্বাধীনতার পর 'দালাল' আইনে গ্রেফতার। ১৯৭৩-এর শেষের দিকে মুক্তিলাভ। 'ইত্তেফাক'-এর সিনিয়র 'লিডার রাইটার' পদের যোগদান। এ পত্রিকায় 'স্পষ্টভাষী' ছদ্মনামে 'মঞ্চে-নেপথ্যে' কলাম এবং একই সময়ে 'মর্দে মুমীন' ছদ্মনমে 'দৈনিক আজাদ'-এ উপসম্পাদকীয় রচনা। ১৯৭৯-র ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত এবং মন্ত্রিসভায় যোগদান। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের যুব উন্নয়ন মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বাধীন সরকারের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রম, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী। এরপর সম্পাদকীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে 'দৈনিক দেশ'-এ যোগদান এবং 'স্পষ্টভাষীর কলাম' শিরোনামে উপসম্পাদকীয় রচনা। বিভিন্ন সময়ে কৃষি ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্য ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবক্তা। ১৯৭৭-এ সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য 'একুশে পদকে' ভূষিত। মৃত্যু. ঢাকা, ২৩ অক্টোবর ১৯৮৩।

খন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম (?-১৯৪৬)॥ জন্ম. সেহরাতৈল, টাঙ্গাইল। প্রথমে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী হাইস্কুলের হেড মৌলবী ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানার আরবি ও ফারসি প্রুফ-রিডার। অবসর গ্রহণের পর কলকাতার 'দারুল ইসারত' নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। সম্পূর্ণ কোরান শরিফ বাংলায় অনুবাদ এবং আমপারার কাব্যানুবাদ করেন। মৃত্যু. ১৯৪৬।

খন্দকার নাজিরউদ্দিন জেহাদ (১৯৬৯-১৯৯০)॥



জন্ম. নবগ্রাম, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯। শহীদ। উল্লাপাড়া। মার্চেন্ট পাইলট হাইস্কুল থেকে ১৯৮৬-তে এস.এস.সি. (দ্বিতীয় বিভাগ) ও উল্লাপাড়া সরকারি আকবর আলী কলেজ থেকে ১৯৮৮-তে এইচ.এস.সি. (দ্বিতীয় বিভাগ) পাস। আকবর আলী কলেজে বি.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। উল্লাপাড়া সরকারি আকবর আলী কলেজ শাখার ছাত্রদলের সভাপতি ও ছাত্রদলের উল্লাপাড়া থানা শাখার সভাপতি। এরশাদ সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনে দাবিতে ১৯৯০-এর ১০ অক্টোবর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দল, বি.এন.পি'র (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) নেতৃত্বাধীন ৭ দল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) নেতৃত্বাধীন ৫ দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আহ্বানে ঢাকায় সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালিত হলে জেহাদের উল্লাপাড়া থেকে ঢাকায় এসে তাতে যোগদান। পুলিশ ধর্মঘটকারীদের ওপর গুলি চালালে 'দৈনিক বাংলার' মোড়ে বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে জেহাদের মৃত্যুবরণ। ঐদিন অপরাহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁর লাশকে সামনে রেখে ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রছাত্রী সংসদ), ছাত্রলীগ, ছাত্রদলসহ ২২টি ছাত্রসংগঠনের সমন্বয়ে 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য' গঠিত। ছাত্রঐক্য, ৮ দল, ৭ দল, ৫ দলসহ অন্যান্য সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলের তীব্র আন্দোলনের মুখে ৬ ডিসেম্বর (১৯৯০) এরশাদ সরকারের পতন ঘটলে আট বছরের (১৯৮৩-১৯৯০) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সফলতা লাভ এ

আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে জীবন উৎসর্গ করে জেহাদের দেশপ্রেমের এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন। তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক ২ টাকা মূল্যের একটি স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ (১০ অক্টোবর ১৯৯১)। মৃত্যু. ঢাকা, ১০ অক্টোবর ১৯৯০।

খয়রাত হোসেন (১৯১১-১৯৭২)॥ জন্ম. লোরাকুঠি গ্রাম, নীলফামারী, ১৯১১। রাজনীতিবিদ। রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে বি.এ. পাস। ছাত্রজীবনে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সংযুক্ত। ১৯৩৮-১৯৪৭ পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর। ১৯৪০-এর ২২ ও ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত। ১৯৪৬-এ রংপুর জেলা থেকে মুসলিম লীগের মনোনয়নে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। ১৯৪৬-১৯৪৭-এ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসামে মুসলিম উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করলে উক্ত আন্দোলনে যোগদান। আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করলে আসাম সরকার-কর্তৃক গ্রেফতার। প্রায় সাত মাস কারাভোগের পর ১৯৪৭-এর জুলাই মাসে মুক্তিলাভ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর পূর্ববঙ্গে নাজিমুদ্দিন সরকারের গণ-বিরোধীনীতির প্রতিবাদে ১৯৪৮-এ মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ। ১৯৪৯-এর ২৩ জুন পূর্ববাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ-কর্তৃক ঢাকায় আওয়ামী লীগ গঠিত হলে তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ ও পরিষদের অধিবেশন বর্জন এবং ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন এবং আঠারো মাস কারাভোগ। ১৯৫৩-তে আওয়ামী লীগের সহসভাপতি নির্বাচিত এবং ১৯৬৪ পর্যন্ত এ-পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৫১-১৯৫৬ পর্যন্ত রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। ১৯৫৪-র মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। কিছুকাল পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ডিরেক্টর। ১৯৫৬-র ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ-কংগ্রেস দলীয় পূর্ববঙ্গ কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত। পাঁচ দুই বছর কৃষি, পশু-চিকিৎসা ও পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন। ১৯৫৮-তে সামরিক সরকার কর্তৃক গ্রেফতার। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্রায়নের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন পরিচালনার জন্য ১৯৬২-তে এন.ডি.এফ. গঠন। ফ্রন্টের সদস্য হিসেবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং ১৯৬৪-এর ৬ মার্চ এন.ডি.এফ.-এর অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৭০-এর ২ আগস্ট আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে ন্যাশনাল লীগ গঠিত হলে উক্ত দলের সহসভাপতি নির্বাচিত। একজন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ হিসেবে খ্যাত। দেশে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম পরিচালনা। ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক। মৃত্যু অক্টোবর ৩. ১৯৭২।

খাজা কায়সার (১৯১৮-১৯৮৫)॥ জন্ম. আহসান মঞ্জিল, ঢাকা ১৯১৮। লেখক, কূটনীতিক। ঢাকা নওয়াব পরিবারে জন্ম,। ১৯৩৪-এ ঢাকার সরকারি মুসলিম হাইস্কুল থেকে চতুর্থস্থান অধিকার করে মেট্রিক পাস। ১৯৩৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিতে অনার্স ডিগ্রি লাভ। ১৯৪১-এ ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে যোগদান। দেশ বিভাগের পর ১৯৫০-এ পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগদান। ১৯৫০-১৯৬২ পর্যন্ত পিকিং, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে পাকিস্তানি কূটনীতিক মিশনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৬২-তে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে পাকিস্তানের হাই কমিশনার নিযুক্ত। ১৯৬৫ ও ১৯৬৬-তে পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন। ১৯৬৮ ও ১৯৬৯-এ সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়েতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। ১৯৭২-১৯৭৬ পর্যন্ত বার্মায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং একই সঙ্গে সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন। ১৯৭৬-১৯৮২ পর্যন্ত জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবেত কর্মরত। ১৯৭৮-এ বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ করলে তার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ত্র অবরোধ-সংক্রান্ত ৪২১ নম্বর প্রস্তাবের আওতায় গঠিত নিরাপত্তা পরিষদ কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত ১৯৮৪-র মে মাসে চীনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত এবং

আমৃত্যু বহাল। আধুনিক চীনের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক বিপ্লবের ওপর যুগ্মভাবে একটি বই লিখেছেন। মৃত্যু. ১৪ মার্চ ১৯৮৫।

খাজা নাজিমুদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪)॥ জন্ম. আহসান মঞ্জিল, ঢাকা, ১৯ জুলাই ১৮৯৪। রাজনীতিবিদ। লন্ডনের ট্রিনিটি কলেজ থেকে এম.এ. ও মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পাস। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে যোগদান। ১৯২২-এ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত। ১৯২৯ পর্যন্ত এপদে দায়িত্ব পালন। ১৯২৩-১৯২৯ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য। ১৯২৯-১৯৩৪-এ অবিভক্ত বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৩৪-এ মে মাসে বঙ্গীয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৩৭-এর এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় বিধানসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে নিজেদের জমিদারি এলাকা পটুয়াখালী কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কৃষক-প্রজা পার্টির প্রার্থী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কাছে পরাজিত। কিছুদিন পর উত্তর কলকাতা থেকে একটি উপ-নির্বাচনে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত। একই বছর মে মাসে (১৯৩৭) শেরে বাংলার নেতৃত্বে গঠিত কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ দলীয় বঙ্গীয় কোয়ালিশন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত। মুসলিম লীগ কোয়ালিশন ত্যাগ করলে ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ। এপর ১৯৪৩-এর মাচ পর্যন্ত বঙ্গীয় বিধানসভায় বিরোধী দল ও মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা। ১৯৪৩-এর ২৪ এপ্রিল তাঁর নেতৃত্বে অবিভক্ত বঙ্গে সরকার গঠিত। ১৯৪৬-এর ২১ এপ্রিল পর্যন্ত এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী। ১৯৩৭-১৯৪৭ পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। ১৯৪৬-এ বঙ্গীয় বিধানসভার ও কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি ও কেন্দ্রীয় পরিষদের বিরোধী দলেরল সহকারী নেতা নির্বাচিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর পূর্ববঙ্গের (পূর্ব-পাকিস্তান) প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৪৮-এর ১১ মার্চ ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবিতে ধর্মঘট পালন করলে তাদের সঙ্গে সমঝোতামূলক এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর (১৫ মার্চ ১৯৪৮)। বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে পূর্ববঙ্গ পরিষদে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে বলে এতে অঙ্গীকার প্রদান। মুহম্মদ আলী জিন্নাহর (পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল) মৃত্যুর পর ১৯৪৮-এর ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত। দুই বছর এক মাস এ পদে দায়িত্ব সম্পাদন। লিয়াকত আলী খান (পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী) নিহত হওয়ার পর ১৯৫১-র ২৪ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৫২-র ২৭ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে মুসলিম লীগ আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে উর্দুকে পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা করা হবে বলে মত প্রকাশ। তাঁর এ বক্তব্য ছাত্রদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির (১৫ মার্চ ১৯৪৮) পরিপন্থী। এ বক্তব্যের প্রতিবাদে ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পূর্ববাংলায় তীব্র আন্দোলন সংঘটিত (ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) ১৯৫৩-র ১৭ এপ্রিল গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তাঁর মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করলে গদিচ্যুত। প্রায় দশ বছর রাজনীতি থেকে বিরত। ১৯৬২-র ২৭ অক্টোবর তাঁর নেতৃত্বে কাউন্সিল মুসলিম লীগ গঠিত। এ দলের সভাপতির পদ গ্রহণ। সর্বজনীন ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকারের দাবিতে সংগ্রাম পরিচালনা। সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ) গঠন (জুলাই ১৯৬৪) ও দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে (জানুয়ারি ১৯৬৫) কপের প্রার্থী হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহকে (মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ভগিনী) মনোনয়ন দানের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। খেলাধুলার প্রতি উৎসাহী। ১৯৩৮-১৯৪০ পর্যন্ত ভারতীয় হকি ফেডারেশনের এবং ১৯৩৭-১৯৪৬ পর্যন্ত কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি। তাঁর উদ্যোগে কলকাতা থেকে প্রথম মুসলিম ইংরেজি দৈনিক স্টার অব ইন্ডিয়া প্রকাশিত। কলকাতা মুসলিম বণিক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সি.আই.ই. (১৯২৫), কে.সি.আই.ই. (১৯৩৪) ও স্যার উপাধি প্রদান। মুসলিম লীগের আহবানে ১৯৪৬-এ এই সব খেতাব ত্যাগ। ১৯৫৮-তে নিশান-এ-পাকিস্তান খেতাব লাভ। খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকার নওয়াব পরিবারের সন্তান। ব্রিটিশ আমলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথমদিকে



শিক্ষা বিল, ঋণসালিশি বিল ও পল্লীউন্নয়ন বিল পাসের ব্যাপারে তাঁর অবদান স্মরণীয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নার রাজনৈতিক আদর্শের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী। পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বক্তব্য দিয়ে ও '৫২ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আন্দোলনের বিরোধিতা করে জনপ্রিয়তা হারান। ষাটের দশকে আইয়ুববিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে হারানো জনপ্রিয়তা খানিকটা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। ইসলামি সংস্কৃতি ও ইসলামি শাসন ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক। মৃত্যু. ঢাকা, ২২ অক্টোবর ১৯৬৪।

খাজা শাহাবুদ্দীন (১৮৯৯-১৯৭৭)॥ জন্ম. আহসান মঞ্জিল, ঢাকা ১৮৯৯। রাজনীতিবিদ। খাজা নাজিমুদ্দীনের কনিষ্ঠভ্রাতা। স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। পরে নিজের অধ্যবসায়ে রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ। ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি (১৯২৮-১৯৪৪), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার (১৯৩০-১৯৩৮), বঙ্গীয় গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য (১৯৩৬), বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের চিফ হুইপ (১৯৩৭-১৯৪১) ও খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় সরকারের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প মন্ত্রী (১৯৪৩-১৯৪৬)। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের চিফ হুইপ, ১৯৪৮-এ পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের আভ্যন্তরীণ, তথ্য বেতার মন্ত্রী ও ১৯৫১-এ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত। ১৯৫৪-১৯৬৪ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সউদি আরব ও নাইজেরিয়ায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। ১৯৬৫-র ২৪ মার্চ আইয়ুব খাঁর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার দফতরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ। রবীন্দ্রনাথের গান পাকিস্তানের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে রেডিও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৯৬৭-র ২২ জুন তৎকর্তৃক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিবৃতি প্রদান। এই বিবৃতির বিরুদ্ধে বাঙালিরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠার ফলে তা বাস্তবায়ন করা পাকিস্তান সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ আইয়ুব সরকারের পতন ঘটলে মন্ত্রিত্ব হারান। মৃত্যু. করাচী, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭।



খাজা হাসান আসকারী, নবাব (১৯২১-১৯৮৪)॥ জন্ম. আহসান মঞ্জিল, ঢাকা, ১৯২১। রাজনীতিবিদ। স্যার সলিমুল্লাহর পৌত্র এবং নবাব হাবীবুল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস। ১৯৪৪-এ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ট্যাংক ব্রিগেডে যোগদান এবং কমিশন লাভ। বার্মা সেক্টরে দায়িত্ব পালন। যুদ্ধে আহত হয়ে চাকরি ত্যাগ। দেশভাগের (১৯৪৭) পর পুনরায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে যোগদান। ১৯৬১-তে অবসর গ্রহণ এবং রাজনীতিতে প্রবেশ। ১৯৬২-র ২৮ এপ্রিল মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় ঢাকা সিটি থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ঐ বছর ২৯ জুন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের পূর্ত ও যোগাযোগ মন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৬৫-র ২১ মার্চ মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ঢাকা সিটি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থীর কাছে পরাজয় বরণ। ১৯৬৫-র মার্চ মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ। ১৯৬৮-র ২২ সেপ্টেম্বর ক্ষমতাসীন কনভেনশন মুসলিম লীগের পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত। এ ছাড়া ষাটের দশকে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একজিকিউটিভ কমিটির সদস্য, পূর্ব-পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের সদস্য, স্যার সলিমুল্লাহ এতিমখানার সভাপতি এবং ধানমণ্ডী স্কুলের প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর পাকিস্তান গমন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস। মৃত্যু. করাচী ৯ আগস্ট ১৯৮৪।

খাদেম হোসেন খাঁ (১৯২৩-১৯৯১)॥ জন্ম. শিবপুর গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২০ ফেব্রুয়ারি

১৯২৩ : সংগীতশিল্পী। এক সুবিখ্যাত সংগীত পরিবারে জন্ম। পিতা ওস্তাদ নায়েব আলী খাঁ; পিতৃব্য সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, ওস্তাদ আফতাবউদ্দীন খাঁ ও ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ। শিবপুর হাইস্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন। শৈশবে গৃহে পিতার কাছে প্রথমে উচ্চাঙ্গসংগীত ও পরে এস্রাজে তালিম গ্রহণ। আফতাবউদ্দীন খাঁর কাছে তবলাবাদন শিক্ষা। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সঙ্গে তবলাসঙ্গত করে স্বর্ণপদক লাভ (১৯৩৪)। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর কাছে সেতার ও বেঞ্জু বাদনে দক্ষতা অর্জন। মাইহারে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর (মাইহার সংগীত কলেজের অধ্যক্ষ) কাছে যন্ত্রসংগীতে তালিম গ্রহণ। কলকাতায় তানসেন বংশীয় ওস্তাদ দবিরউদ্দীন খাঁর কাছে উচ্চাঙ্গসংগীত অনুশীলন। কিছুকাল ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরের জমিদার প্রখ্যাত সুরসাধক বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাছে মেঘনাদযন্ত্রে তালিম গ্রহণ। দেশবিভাগের (১৯৪৭) পূর্বে অনিয়মিত শিল্পী হিসেবে ঢাকা বেতারে যোগদান। পরে এই বেতারকেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পী হিসেবে নিযুক্তি লাভ। বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে কলকাতায় অনুষ্ঠিত তানসেন সংগীত সম্মেলনে যোগদান (১৯৫০)। নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর (১৯১৯-১৯৫৫) নৃত্যদলের সংগীত পরিচালক হিসেবে গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড, বেলজিয়াম, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ। বিবিসি ও তেহরান টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এককভাবে সেতার বাজিয়ে সুনাম অর্জন। বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (১৯৫৫) প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। এ একাডেমির যন্ত্রসংগীত বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন। জসীমউদ্দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ', কাজী নজরুল ইসলামের 'সিন্ধু', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ', ময়মনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে সুরারোপ। চলচ্চিত্রের যন্ত্রসংগীতশিল্পী হিসেবেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। 'আজান' ছায়াছবির সংগীত পরিচালক। মৃত্যু. ১০ ডিসেম্বর ১৯৯১



খাদেমুল বাশার (১৯৩৫-১৯৭৬)॥ জন্ম. বগুড়া, ১৯৩৫। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান। সাতক্ষীরা প্রাণনাথ স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং রাজশাহী কলেজ থেকে



আই.এসসি. পাস। ১৯৫৩-তে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ফ্লাইং ব্রাঞ্চে ক্যাডেট হিসেবে যোগদান। সামরিক একাডেমি থেকে গ্রাজুয়েশন লাভের পর ফাইটার স্কোয়াড্রনে যোগদান। ১৯৬০ পর্যন্ত কাজ করার পর একই বছর পি. এফ. এ-র নবগঠিত বোমারু স্কোয়াড্রনে যোগদান করে ১৯৭০ পর্যন্ত কর্মরত। পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে থাকাকালে দক্ষতা ও নৈপুণ্যের জন্য খ্যাতি লাভ। ১৯৬৯-১৯৭০ পর্যন্ত পাকিস্তান বিমান বাহিনীর দুটি বোমারু স্কোয়াড্রনের একটির অধিনায়ক। তিনিই একমাত্র বাঙালি অফিসার যিনি এই সম্মান লাভ করেছিলেন। বিমান বাহিনীতে অসাধারণ অবদানের জন্যে টি.বি.টি. খেতাবে ভূষিত। ১৯৭০-এ উইংকমান্ডার পদে উন্নীত এবং একটি রাডার স্কোয়াড্রন কমান্ডারের দায়িত্ব দিয়ে ঢাকায় বদলি। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং একজন বৈমানিক হওয়া সত্ত্বেও রংপুর ও দিনাজপুর জেলা সমন্বয়ে গঠিত ৬ নম্বর সেক্টরে স্থলযুদ্ধ পরিচালনা। স্বাধীনতার পর রংপুর ব্রিগেড কমান্ডার নিযুক্ত, ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারিতে গ্রুপ ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত। ১৯৭২-এর জুলাই মাসে বিমান বাহিনীতে প্রত্যাবর্তনের পর ঢাকা বিমান ঘাঁটির অধিনায়ক নিযুক্ত; এ সময়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ঘাঁটি পুনর্গঠন। ১৯৭৩-এর অক্টোবরে এয়ার কমোডর পদে উন্নীত এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অপারাশেন ও প্রশিক্ষণের সহকারী স্টাফ প্রধান নিযুক্ত। ১৯৭৬-এ বিমান বাহিনীর স্টাফ প্রধান নিযুক্ত। ১৯৭৬-এর ৩ মে এয়ার ভাইস মার্শাল পদে উন্নীত। একই দিন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত এবং পেট্রোলিয়াম, খাদ্য, বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয় ও পর্যটন বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ অবদানের জন্য 'বীরোত্তম', উপাধিতে

ভূষিত। খাদেমুল বাশার ছিলেন এমন একজন বৈমানিক যিনি সব ধরনের বিমান চালনায় সক্ষম ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতাউত্তর বাংলদেশ বিমান বাহিনী পুর্ণগঠনে বিশেষ অবদান রাখেন। মৃত্যু. ঢাকা বিমান ঘাঁটিতে বিমান দুর্ঘটনা, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।

খান আতাউর রহমান (১৯২৮-২০০৪)॥ জন্ম. ১১ ডিসেম্বর ১৯২৮, রামকান্তপুর, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ। চলচ্চিত্রাকার, অভিনেতা, সুরকার, গায়ক, গীতিকার, প্রযোজক, সংলাপ রচয়িতা, কাহিনীকার। বাবা জিয়ারত হোসেন খান, মাতা যোহরা খাতুন।



তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে ১৯৩৭-এ ঢাকা জিলা সংগীত প্রতিযোগিতায় খান আতা প্রথম স্থান দখল করেন। ১৯৪৩-এ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশান পরীক্ষা পাস করেন। ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষা দেন ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৪৫ এ। এরপর ১৯৪৬-এ তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। অল্প কিছুদিন পরেই মেডিকেল কলেজ ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। ১৯৪৯-এ তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে মুম্বাই যান চলচ্চিত্রে কাজ করার জন্য। এসময় তিনি জ্যোতি স্টুডিওতে ক্যামেরাম্যান জাল ইরানির শিক্ষানবিশী করেন। ১৯৫০-এর করাচিতে গিয়ে রেডিও পাকিস্তান-এ সংবাদপত্র পাঠক হিসেবে যোগদান। এসময় তিনি সারঙ্গী বাদক জওহারি খানের কাছ থেকে তালিম গ্রহণ। ১৯৫২-এ খান আতা একটি পোল্যান্ডীয় জাহাজে করে লন্ডন পাড়ি জমান। সেখানে অনেক বাঙালি অনুষ্ঠানে গায়ক এবং অভিনেতা হিসেবে তিনি অংশগ্রহণ এবং লন্ডনের সিটি লিটারেরি ইনস্টিটিউটে তিনি থিয়েটার ডিপার্টমেন্টে ভর্তি। পরের বছরেই ইউনেস্কো বৃত্তি নিয়ে নেদারল্যান্ডে গমন। ১৯৫৫-এ আবার লন্ডনে ফিরে এসে থিয়েটার রয়াল, ইউনিটি থিয়েটার, আরভিং থিয়েটারে সকল স্থানীয় গ্রুপের সঙ্গে কাজ করতে থাকেন। এসময় তিনি কিছুদিন বিবিসি'র সঙ্গে ও কাজ করেছেন ১৯৫৭-তে ঢাকায় ফিরে পাকিস্তান অজারভারে চাকরি নেন। ১৯৫৮-এ পাকিস্তানি পরিচালক আখতার জং কারদার পরিচালিত ছবি 'জাগো হুয়া সাভেরা'তে মূল চরিত্রে রূপদান। তাঁর বিপরীতে ছিলেন তৃপ্তি মিত্র। সহকারী পরিচালক ছিলেন জহির রায়হান। তাঁর অভিনীত প্রথম বাংলা ছবি 'এদেশ তোমার আমার" মুক্তি পায় ১৯৫৯ সালে। ১৯৬০-এ জহির রায়হানের সঙ্গে গড়ে তোলেন লিটল সিনে সার্কেল। সূর্যস্নান ছবিতে ১৯৬২-তে তিনি উপহার দেন 'পথে পথে দিলাম ছড়াইয়া রে' এর মতো গান। যাতে কণ্ঠ দেন কলিম শরাফী। সূর্যস্নান ছবির গীতিকার হিসেবে এবং কাঁচের দেয়াল ছবির সংগীত পরিচালক হিসেবে পাকিস্তান ফিল্ম ফেস্টিভাল এ ১৯৬৫-এ তিনি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া সংগীত পরিচালক ছিলেন বাহানা, সাগার, আখেরি স্টেশান, মালা প্রভৃতি উর্দু ছবিতে। ১৯৬৯-এ জহির রায়হানের পরিচালনায় জীবন থেকে নেয়া-তে অভিনয় করেন। এই ছবিতে তিনি এ খাঁচা ভাংবো আমি কেমন করে শীর্ষক গানের কথা লিখেন এবং নিজেই কণ্ঠ দেন। চরচ্চিত্রের জন্য প্রায় ৫০০ গানের রচয়িতা। তিনি 'বাংলার কবি জসীমউদ্দীন', 'গঙ্গা আমার গঙ্গা', 'গানের পাখি আব্বাসউদ্দিন' প্রভৃতি তথ্যচিত্রও তৈরি করেছেন। পরিচালিত উল্লেযোগ্য চলচ্চিত্র: অনেক দিনের চেনা, সিরাজউদ্দৌলা', 'সাত ভাই চম্পা', 'অরুণ বরুণ কিরণমালা', 'আবার তোরা মানুষ হ', 'সুজন পাখি', 'দিন যায় কথা থাকে', 'পরশ পাথর', 'এখনো অনেক রাত'। তাঁর দুই স্ত্রী মাহবুবা রহমান ও নীলুফার ইয়াসমীন। নীলুফার ইয়াসমীন কণ্ঠশিল্প হিসেব বিখ্যাত। দুই সন্তান রুমানা ইসলাম ও আগুন কণ্ঠশিল্পী হিসেবে ক্যাতি অর্জন করেছেন। মৃত্যু. ঢাকা, ১ ডিসেম্বর ২০০৪।

খান জাহান আলী (?-১৪৫৯)॥ জন্ম. চতুর্দশ শতাব্দী (আনুমানিক)। ধর্মপ্রচারক। বারোজন ধর্মপ্রচারক শাহজালালের সময়ে যশোরে ভৈরব-তীরে এসে প্রথম যে আস্তানা গেড়েছিলেন তাঁদের প্রধান ছিলেন খান জাহান আলী। যশোর-খুলনার খাঞ্জলী পির বা খান জাহান আলী, জৈনপুর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা খাজা জাহান আলী একই ব্যক্তি। তিনি ১৪০০ খ্রি. জৈনপুরের রাজ্যভার তার পালিত পুত্রের হস্তে অর্পণ করে বঙ্গে আগমন করেন এবং সুন্দরবনের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি বাগেরহাটের নাম রেখেছিলেন খলিফাতাবাদ তিনি যখন বাগেরহাটে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করেছিলেন

তখন তাঁর শিষ্য সংখ্যা ছিল ৩৬০ জন। এই শিষ্যদের জন্য বাগেরহাট অঞ্চলে ৩৬০টি মসজিদ ও দিঘি খনন করেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ষাটগম্বুজ মসজিদ। তাঁর এই মহৎ কীর্তিচিহ্নগুলো যশোর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একই সঙ্গে জনহিতকর কাজ ও ইসলাম ধর্মপ্রচার খান জাহান আলীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভৈরব নদীর তীরে মুড়লীতে একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং এটিকে শহরে পরিণত করেন। তিনি অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ, দিঘি খনন ও রাস্তাঘাট তৈরি করে এখানকার অধিবাসীদের হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। খান জাহান আলী বর্তমানে একজন পির হিসেবে পরিচিত। এই পীরের নিকট হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক শিরনি মানত করে এবং তা তাঁর কালাপাহাড় ও ধলাপাহাড় কুমির দুটিকে খাওয়ালেই খাঞ্জালী পিরকে তুষ্ট করা হয় বলে তারা মনে করে। খান জাহানের পয়গ্রাম নিবাসকালে পিরালি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। ঠাকুর দিঘির ঘাটের কাছে একটি বেষ্টন প্রাচীরের মধ্যে একটি এক গম্বুজ ইমারত দেখা যায়। এর ভেতরেই খান জাহান আলী বা খাঞ্জালী পির চিরনিদ্রার নিদ্রিত। মৃত্যু. ২৩ অক্টোবর ১৪৫৯।

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১)॥ জন্ম. চারিগ্রাম, মানিকগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর ১৯০১। সাহিত্যিক। স্থানীয় পাঠশালায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠকালে মাতার ও পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠকালে পিতার পরলোকগমন। চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হয়ে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় গমন ও বই বাঁধাইয়ের কাজ গ্রহণ। কলকাতায় একটি নাইট স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন। কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতায় যোগদান ও সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ। ১৯২৩-এ সাপ্তাহিক 'মুসলিম জগৎ' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নিযুক্ত। এ পত্রিকায় 'বিদ্রোহ' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশের দায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত। হুগলী জেলে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে একই কামরায় বাস। এ সময়ে উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপিত। পাকিস্তান সৃষ্টির (১৪ আগস্ট ১৯৪৪) পর কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আগমন। ঢাকার বাংলা বাজারে পুস্তক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'আলহামরা লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা (১৯৪৮)। পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও এর আদর্শের প্রতি অত্যুৎসাহী মনোভাব প্রকাশ। পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত ভাষা কমিটির (১৯৪৯) সদস্য হিসেবে তৎকর্তৃক বাংলা ভাষার অনৈসলামিক অনুষঙ্গ দূর করার সুপারিশ। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাকিস্তানের 'তাহযিব-তমদ্দুনের' পরিপন্থী এ বক্তব্য উপস্থাপন করে ১৯৬১-তে পূর্ববাঙলায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের বিরোধিতা করে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান। ১৯৬৭-তে পাকিস্তান সরকার রেডিও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বিবৃতি দান। কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও জীবনী গ্রন্থের প্রণেতা। কবি নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যকর্মের উপর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'যুগস্রষ্টা নজরুল' (১৯৫৭) রচনা করে খ্যাতি অর্জন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলিঃ শিশুতোষ গ্রন্থ:মুসলিম বীরাঙ্গনা (১৯৩৬), আমাদের নবী (১৯৪১), খোলাফায়ে রাশেদিন (১৯৫১), সোনার পাকিস্তান (১৯৫৩),, বাব' আদম (১৯৫৭), আরব্য রজনী (১৯৫৭), স্বপন দেখি (১৯৫৯), শাপলা শালুক (১৯৬২), কাব্য–পালের নাও (১৯৫৬), আর্তনাদ (১৯৫৮), হে মানুষ (১৯৫৮); উপন্যাস-অনাথিনী (১৯২৬)। নয়া সড়ক (১৯৬৭); গল্পগ্রন্থ-ঝুমকোলতা (১৯৫৬)। শিশুসাহিত্য রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন। তাঁর প্রত্যেকটি রচনা ভাবে ও ভাষায় সমৃদ্ধ। সরল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থের কাহিনীগুলো বর্ণিত। 'হে মানুষ' তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রন্থ। এতে মানুষের জয়গান সাবলীল পদ্যে বাণীমণ্ডিত। যুগস্রষ্টা নজরুল গ্রন্থের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬০), শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬০) ও একুশে পদক (১৯৭৮) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১।



খান মোহাম্মদ ফারাবী (১৯৫২-১৯৭৪)॥ জন্ম. ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৮ জুলাই ১৯৫২। কবি ও লেখক। শিক্ষাজীবন শুরু হয় ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলে। এ-স্কুল থেকে প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং প্রথম গ্রেডের বৃত্তি লাভ। ১৯৬৯-এ সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুল থেকে এস.এস.সি. পরীক্ষায় মানবিক শাখায় দ্বিতীয় স্থান এবং ১৯৭২-এ ঢাকা কলেজ

থেকে এইচ.এস. সি. পরীক্ষায় মানবিক শাখায় দ্বিতীয় স্থান লাভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি। অধ্যয়ন কালেই মৃত্যু। গণমুখী কবিতা, মননশীল প্রবন্ধ ও সুখপাঠ্য গল্প রচনা করে খ্যাতি অর্জন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ সংকলন: কবিতা ও অন্যান্য (১৯৭৬)। গল্পগ্রন্থ: মামার বিয়ের বরযাত্রী (১৯৭৬)। নাটক: আকাশের ওপারে আকাশ (১৯৮১)। শান্তনু কায়সার সম্পাদিত 'খান মোহাম্মদ ফারাবী রচনা সমগ্র' বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত (১৯৯২)। ১৯৭৭-এ মুনীর চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। নিখিল বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকবার শ্রেষ্ঠ। তার্কিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ। মৃত্যু. ১৫ মে ১৯৭৪।



খায়রুল কবির (১৯২১-১৯৯৭)॥ জন্ম. ঘোড়াশাল, নরসিংদী, ১৯২১। সাংবাদিক ও ব্যাংকার। সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। বি.এ. পাস করার পর কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদ (১৯৩৬) পত্রিকার স্পোর্টস রিপোর্টার পদে যোগদান (১৯৪৪)। বিভাগ (১৯৪৭) পরবর্তীকালে পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েট প্রেসের করাচি অফিসে সাংবাদিকতার কর্মে প্রবেশ। এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে মুসলিমলীগ ট্রাস্টের পত্রিকা ঢাকার দৈনিক 'জিন্দেগী' (১৯৪৭)-কে তৎকর্তৃক দৈনিক 'সংবাদ' (১৭ মে ১৯৫১)-এ রূপান্তরিত। এ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক (১৯৫১-১৯৫৪)। ১৯৫৪-তে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে চাকরি লাভ। পকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে কয়েক বছর দায়িত্ব পালন। দেশে সামরিক আইন জারি (৭ অক্টোবর ১৯৫৮) করা হলে এ চাকরি থেকে পদত্যাগ করে বার্তাসংস্থা এপিপি (অ্যাসোসিয়েট



প্রেস অব পাকিস্তান)-তে আবার যোগদান। ষাটের দশকে তদানীন্তন ইউনাইটেড ব্যাংকে যোগদান এবং এর পূর্ব-পাকিস্তান শাখার সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার (১৯৭১) পর কিছুদিন বিসিসিআই ব্যাংকে কর্ম সম্পাদন। জনতা ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার (১৯৭২) পর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব লাভ। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটলে খোন্দকার মোশতাক আহমদের সরকার কর্তৃক গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ। জেল থেকে মুক্তিলাভের পর কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিযুক্ত লাভ। এ-পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর কিছুকাল সিটি ব্যাংকের পরিচালকের দায়িত্ব পালন। পরে ইউনাইটেড ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে যোগদান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৯১-র ২৭ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নরসিংদী-২ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং ব্যাংক ও বীমা ব্যবসায়ের অগ্রকর্মী। 'সংবাদ' (১৯৫১)-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে এ দেশে পরিচ্ছন্ন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার ধারা প্রবর্তনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন। তাঁরই উদ্যোগে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে খাঁটি বাংলা নামের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে 'সংবাদ' (১৯৫১) প্রকাশিত। ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাব স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। এর আজীবন সদস্য। মৃত্যু. ফুসফুসের ক্যান্সারে, মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল, সিঙ্গাপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।



খালেদ মোশাররফ (১৯৩৮-১৯৭৫)॥ জন্ম. মোশাররফগঞ্জ গ্রাম, ওসমানপুর থানা, জামালপুর, ১৯৩৮। মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৫৩-তে কক্সবাজার স্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৫৫-তে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ. পাস। ১৯৫৪-তে ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৫-তে কাকুল মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে যোগদান। ১৯৫৭-তে কমিশন লাভ। ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ৪র্থ ইস্টবেঙ্গল

রেজিমেন্টে রংপুর, মোগলহাট, লালমনিরহাট এবং হিলিতে অবস্থান গ্রহণ। এ-সময় ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্ট পদে অধিষ্ঠিত। কমিশন প্রাপ্তির পর থেকে ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ট্রেনিং স্কুলে নানা প্রশিক্ষণ গ্রহণ। যুদ্ধের পর কাকুল মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ইন্সট্রাক্টর নিযুক্ত। এখান থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ এবং মেজর পদে উন্নীত। ১৯৬৮-তে কোয়েটা স্টাফ কলেজ থেকে পি. এস. সি. ডিগ্রি লাভ। পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য সঙ্গে সঙ্গে খারিয়াতে ৫৭ ব্রিগেডের 'ব্রিগেড মেজর' নিযুক্ত। ১০৭০-এর মার্চে ঢাকায় বদলি। প্রশিক্ষণের জন্য প্রথমে জার্মানি, পরে লন্ডন গমন। ১৯৭১-এর ২৪ মার্চ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ। দায়িত্ব বুঝে নেবার পরপরই কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক শমশেরনগর যাত্রা। পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর শাফায়াত জামিলের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের প্রাককালীন দেশের বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা। ২৫ মার্চ শমশেরনগর পৌঁছে দেখতে পান চারপাশে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অবস্থান। ২৬ মার্চ শাফায়াত জামিলের কাছ থেকে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার খবর লাভ। সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকারে শমশেরনগর ত্যাগ এবং ২৭ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গমন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান। ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের একত্রীকরণ এবং কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন। ঐ দিন রাতেই সব অবাঙালি অফিসারদের বন্দী করেন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্যই পি.আর. পুলিশ এবং ছাত্র-জনতাকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়োজিত। ৩০ মার্চ মেজর শফিউল্লাহর ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ তাঁর প্রতিরক্ষায় যোগদান। যুদ্ধের কৌশলগত কারণে সম্মিলিত বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে স্থানান্তরকরণ। এপ্রিলের মাঝামাঝি পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে বিশেষ করে বিমান আক্রমণে টিকতে না পেরে পশ্চাদপসরণ এবং ২৭ এপ্রিল স্বীয় বাহিনী নিয়ে ভারতে গমন। ৩০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত। যুদ্ধের সময় লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত। ২৩ অক্টোবর শত্রুপক্ষের গুলিতে গুরুতরভাবে আহত। গুলি মাথায় খুলি ভেদ করে যায়। লক্ষ্ণৌ সামরিক হাসপাতালে অস্ত্রোপাচার এবং দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর আরোগ্য লাভ। বাংলাদেশ স্বাধীন (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) হওয়ার পর ১৯৭২-এর জানুয়ারির প্রথম দিকে ঢাকায় আগমন এবং আর্মি হেড কোয়ার্টারে স্টাফ অফিসার নিযুক্ত। পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিফ অফ জেনারেল স্টাফ নিযুক্ত। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'বীরোত্তম' খেতাবে ভূষিত (১৯৭২)। খালেদ মোশাররফ ছিলেন সাহসী যোদ্ধা। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান নিহত হলে তার প্রতিবাদে ৩ নভেম্বর (১৯৭৫) তৎকর্তৃক এক সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটন। ৭ নভেম্বর (১৯৭৫) তাঁর প্রতিপক্ষের অপর একটি পাল্টা অভ্যুত্থানের ফলে নিহত হন। মৃত্যু. ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫।

খালেদ রশীদ (১৯৩৪-১৯৭১)॥ জন্ম. সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ১৯৩৪। শিক্ষাবিদ। পদার্থবিদ্যায় এম.এসসি. ডিগ্রি লাভ। খুলনা মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগদান; মহাবিদ্যালয়টি সরকারি হবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ত্যাগ। জড়িয়ে পড়েন খুলনার প্রগতিশীল সংস্কৃতি সেবায়। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'সন্দীপন'-এর পুরোধা হিসেবে সমস্ত দায়িত্বভার পালন এবং 'সেতু' পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মহাবিদ্যালয় গড়ার কাজে মনোযোগ দান; যার ফলশ্রুতিতে ১৯৬৯-এ সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ের জন্ম। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ। শৈশবে টাইফয়েডে আক্রান্ত হওয়ায় বাম পা কৃশ হয়ে পড়ে এবং তিনি ঈষৎ খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। এই দৈহিক অক্ষমতা নিয়েও ১৯৭১-এর২৫ মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত খুলনার ডুমুরিয়া অঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সক্রিয় যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান। মৃত্যু. আগস্ট মাসের শেষের দিকে ডুমুরিয়া থানার শোভনা গ্রাম থেকে পাক সেনারা ধরে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে।

খোদেজা খাতুন (১৯১৭-১৯৯০)॥ জন্ম. মণ্ডলধরণ গ্রাম, বগুড়া, ১৫ আগস্ট ১৯১৭। শিক্ষাবিদ ও লেখিকা বগুড়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৩৩), ঢাকা ইডেন কলেজ

থেকে আই.এ. (১৯৩৫) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (১৯৩৭) পাস। ১৯৩৯-এ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৯৪১-এ কলকাতা লেডি ব্রাবোন কলেজে বাংলার প্রভাষিকা নিযুক্ত। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট দেশ বিভাগের পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ইডেন কলেজে অধ্যাপনায় যোগদান। ১৯৬০-১৯৬৮ পর্যন্ত এ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা। ১৯৬৮-১৯৭২ পর্যন্ত রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা। ১৯৭২-এর মার্চ মাসে ঢাকা ইডেন কলেজের অধ্যক্ষা পদে নিযুক্তি লাভ। একই বছর ১৫ আগস্ট এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯৭৭-১৯৮৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের সভানেত্রী। সাহিত্যে সাধনা করে খ্যতি অর্জন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলিঃ কবিতাগ্রন্থ-বেদনার এই বালুচের (১৯৬৩)। গল্পগ্রন্থ-শেষ প্রহরের আলো (১৯৬৯), একটি সুর একটি গান। কিশোর গল্পগ্রন্থ-রূপকথার রাজ্যে (১৯৬৩)। প্রবন্ধগ্রন্থ-সাহিত্য ভাবনা, আমার দীর্ঘতম ভ্রমণ। রম্যরচনা-আরণ্য মঞ্জরী (১৯৭১)। লোকসাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ-বগুড়ার লোকসাহিত্য (১৯৭০)। সম্পাদিত গ্রন্থ-শতপুষ্পা (১ম খণ্ড-কবিতা সংকলন, ১৯৮৪, ২য় খণ্ড-ছোটগল্প সংকলন, ১৯৮৯; ৩য় খণ্ড-প্রবন্ধ সংকলন, (১৯৯০)। শিক্ষাবিদ হিসেবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার (১৯৬৭) ও লেখিকা হিসেবে নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০।



খোন্দকার মোশতাক আহমদ (১৯১৯-১৯৯৬)॥ জন্ম. দশপাড়া গ্রাম, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১৯১৯। রাজনীতিবিদ। পিতা দশপাড়ার পির হাজী খোন্দকার কবিরুদ্দীন আহমদ। কলকাতা খিদিরপুর একাডেমিতে শিক্ষাজীবন শুরু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল. ডিগ্রি লাভ। ১৯৪২-এ রাজনীতিতে যোগদান। পাকিস্তান আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী হিসেবে ১৯৪৬-এ কারাদণ্ড ভোগ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনে (২৬ এপ্রিল ১৯৪৯) শাসক দল মুসলিম লীগের বিরোধী প্রার্থী শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেওয়ায় গ্রেফতার। পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের (২৩ জুন ১৯৪৯) প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-সম্পাদক। ভাষা-আন্দোলন কমিটির (১৯৫২) একজন সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে (ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং কারানির্যাতন ভোগে।



১৯৫৪-র মার্চে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে দাউদকান্দি-হোমনা এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ২৯ মে পূর্ববাংলায় ৯২-ক ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হলে গ্রেফতার। মুক্তিলাভের পর যুক্তফ্রন্ট সংসদীয় দলের চিফ হুইফ নিযুক্ত (১৯৫৫)। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে পুনরায় গ্রেফতার। ১৯৬৪-র ৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীনে আওয়ামী লীগ (১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর সামরিক সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা) পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। এ দলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য (১৯৬৪-১৯৬৭, ১৯৭২-১৯৭৫)। ১৯৬৬-তে ঐতিহাসিক ৬ দফার পক্ষে প্রচার কার্যে অংশগ্রহণ করার দায়ে আর একবার গ্রেফতার। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় ১৯৬৭-র ১২ নভেম্বর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি নিযুক্ত। তিন বছর জেলে আটক থাকার পর ১৯৬৮-র শেষের দিকে মুক্তিলাভ। আইয়ুব-বিরোধী গণআন্দোলনকে (জানুয়ারি-মার্চ ১৯৬৯) সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য ৮টি রাজনৈতিক দলের (আওয়ামী লীগ, মস্কোপন্থি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলাম প্রভৃতি) সমন্বয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (৮ জানুয়ারি ১৯৬৯) গঠিত হলে এর পূর্ব-পাকিস্তান কমিটির আহবায়ক নিযুক্ত। রাজনৈতিক সঙ্কট মীমাংসাকল্পে রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক আহূত গোলটেবিল বৈঠকে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১০-১২ মার্চ ১৯৬৯) আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে যোগদান। ষাটের দশকে ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে দুই ব'র

পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭০ ও ১৯৭৩-এর জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্ট বোর্ডের সদস্য। উভয় নির্বাচনে কুমিল্লার দাউদকান্দি এলাকা থেকে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে (১৯৭১) মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদীয় দফতরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)-পর তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন সরকারের আইন ও পার্লামেন্টারি বিষয়ক মন্ত্রী (২৭ ডিসেম্বর ১৯৭১-১১ জানুয়ারি ১৯৭২) ও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিদ্যুৎ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ (১২ জানুয়ারি ১৯৭২-২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫) এবং বাণিজ্য (২৬ জানুয়ারি-১৪ আগস্ট ১৯৭৫) মন্ত্রী। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২) রচনায় অবদান রাখেন। শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্বে গঠিত কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাকশাল, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য (৭ জুন-১৪ আগস্ট ১৯৭৫)। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের হাতে রাষ্টপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে দেশে সামরিক আইন জারি এবং খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হন। তাঁর শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি 'জয় বাংলা' বাতিল করে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' শ্লোগান চালু, 'বাংলাদেশ বেতার' নাম পরিবর্তন করে রেডিও বাংলাদেশ' রাখা হয় এবং এক দলীয় 'বাকশাল' ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার জাতীয় নেতাকে (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, কামরুজ্জামান ও মনসুর আলী) হত্যা করা হয়। পাল্টা এক সামরিক অভ্যুত্থানে ৬ নভেম্বর (১৯৭৫) ক্ষমতাচ্যুত। ১৯৭৬-এর অক্টোবর মাসে ডেমোক্রেটিক লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন এবং এর সভাপতি নির্বাচিত। একই বছর ২৯ নভেম্বর সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে গ্রেফতার। লে. জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে দুইটি দুর্নীতি মামলা দায়ের। সামরিক আদালত কর্তৃক পাঁচ বছর কারাদণ্ড প্রদান। ১৯৮০-র ২৬ মার্চ জেল থেকে মুক্তিলাভ। 'মুজিব-হত্যা', জেল-হত্যা প্রভৃতি অভিযোগে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। নিঃসঙ্গ অবস্থায় পুলিশ প্রহরায় ঢাকার আগামসি লেনের নিজস্ব বাড়িতে বাস। মৃত্যু. ঢাকা, ৫ মার্চ ১৯৯৬।

খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯২৩-১৯৯৫)।



জন্ম. কড়িপাড়া, গ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ৩ মে ১৯২৩। লেখক। পিতা খোন্দকার ওয়াসিউজ্জমান। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এম.এ. ডিগ্রিলাভ। দেশভাগের (১৯৪৭) পূর্বে কলকাতায় আজাদ (১৯৩৬) ও ইত্তেহাদে (১৯৪৬) সাংবাদিকতা। বিভাগোত্তরকালে ঢাকা থেকে সাপ্তাহিক যুগের দাবি (১৯৪৮) প্রকাশ ও সম্পাদনা। ১৯৫৪-তে পত্রিকাটি কমিউনিস্ট পার্টিকে দান। যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিলের (৩০ মে ১৯৫৪) পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক যুগের দাবি প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা। ভাষা-আন্দোলনের (মার্চ ১৯৪৮ ও ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) অন্যতম নেতা। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে ইউরোপে অবস্থান। ভাসানীর নেতৃত্বাধীনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠনে (২৫ জুলাই ১৯৫৭) সক্রিয় ভূমিকা পালন। চীন ও রাশিয়ার আদর্শগত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ন্যাপ দ্বি-খণ্ডিত হলে (নভেম্বর ১৯৬৭) মস্কোপন্থি ন্যাপের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ১৯৭০-এর ১৭ ডিসেম্বরের সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ন্যাপের টিকেটে পুরাতন ঢাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। আওয়ামী লীগে যোদগান। মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) চলাকালে ভারত গমন এবং যুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান। আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য (১৯৭৮-১৯৮১)। জীবনের শেষ পর্যায়ে ধর্মচর্চায় আত্মনিয়োগ। একজন বিশিষ্ট লেখক। সমকালীন রাজনীতিকে আশ্রয় করে বহু সরস গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থঃ ভাসানী যখন ইউরোপে (১৯৫৭), কতো ছবি কতো গান (১৯৬৮), মুজিববাদ (১৯৭২), রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন। মৃত্যু. বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা, ১৭ নভেম্বর ১৯৯৫।

খোন্দাকার শামসুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী (১৮০৮-১৮৭০)॥ জন্ম. সর্বমঙ্গলা, বর্ধমান, ১৮০৮। প্রাবন্ধিক ও কবি। মুসলমানদের মধ্যে ইনিই প্রথম বাংলা গদ্য লেখক। গদ্যে-পদ্যে লিখিত তাঁর 'উচিত শ্রবণ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৬০-এ। মীর মশাররফ হোসেনের রচনাবলি প্রকাশিত হয় তারও নয় বছর পরে। তাই প্রথম মুসলিম গদ্য লেখক হিসেবে তাঁর দান অনস্বীকার্য। অন্যান্য গ্রন্থঃ ভাবলাভ, সুরতজান। সংগীতবিদ্যায়ও অনুরাগ ছিল। মৃত্যু. ১৮৭০।

গওহর জামিল (১৯২৮-১৯৮০)॥ জন্ম. সিরাজদীখান গ্রাম, বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ, ১৯২৮। নৃত্যশিল্পী। নৃত্যপরিচালক। হিন্দু পরিবারে জন্ম। পিতৃদত্ত নাম গণেশ নাথ। নৃত্যশিল্পী অভিনেত্রী রওশন জামিলের সঙ্গে বিবাহের পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও গওহর জামিল নাম ধারণ। ভাস্কর দেব, উদয়শঙ্কর, মারুথাপ্পা পিনাই ও রামনারায়ণ মিত্রের কাছে নৃত্যকলা শিক্ষাগ্রহণ; ভারত নাট্যম ও কথক নৃত্যে পারদর্শিতা অর্জন। বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর নৃত্যকলা বিভাগে কিছুকাল শিক্ষকতা। নৃত্যশিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। ঢাকায় নৃত্যকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাগো আর্ট সেন্টার (১৯৫৯) স্থাপন। এর পরিচালক ও অধ্যক্ষ। ছায়াছবির নৃত্য পরিচালক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। লন্ডনে 'সাপুড়ে নৃত্য' ও পিকিং-এ 'পল্লীমেলা' নৃত্য পরিবেশন করে সুনাম অর্জন। আনারকলি, চাঁদসুলতানা, সামান্য ক্ষতি, ইতিহাসের একটি পাতা, কাঞ্চনমালা, ভবঘুরে ও ওমর খৈয়াম নৃত্যনাট্য পরিচালনা করে এ দেশের নৃত্যশিল্পের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ। ঢাকায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত। মৃত্যু. ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮০।

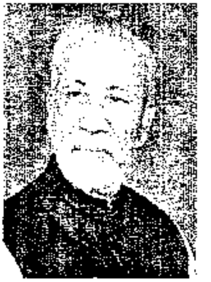


গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮)॥ জন্ম. জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭। চিত্রশিল্পী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ। সেন্ট জেভিয়ার্স বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। পরে চিত্রশিল্পে শিক্ষা অর্জন। ১৯০৭-এ ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর ওরিয়েন্টাল আর্ট গঠন করে তার সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত। বাংলায় কারুশিল্পের ব্যবহার ও প্রচারের উদ্দেশ্য ১৯১৬-তে 'বেঙ্গল হোম ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা। অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সম্পাদক। ১৯০৫-এ স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। প্রথমে হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অঙ্কন শিক্ষা গ্রহণ। শিল্পীজীবনে জাপানি শিল্পী ইওকোহামা টাইফানের দ্বারা প্রভাবিত। দৃশ্যচিত্র, বর্ণনামূলক চিত্র, প্রতিকৃতি, বিমূর্ত চিত্র, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ও রিয়েলেস্টিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। পদ্ধতিগত ব্যাপারে তাঁর শিল্পকলায় ইউরোপীয় জল রং ও জাপানি কালিতুলি এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটেছে। চিত্রে কালিতুলির ব্যাপারে তিনি এদেশের পথিকৃৎ। ১৯২০-তে তাঁর শিল্পকলায় কিছু পরিবর্তন আসে। তিনি আধুনিক ফরাসি শিল্পের নানা উপাদান সাঙ্গীকরণের প্রয়াস পান। এ ব্যাপারে ও তিনি এ দেশের প্রথম শিল্পী। কলকাতার তৎকালীন সম্ভ্রান্ত সমাজকে লক্ষ্য করে তৎকর্তৃক অনেক ব্যঙ্গ ও কৌতুকচিত্র অঙ্কিত। নাট্যশিল্পী হিসেবে সুনাম অর্জন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে তাঁর অভিনয় বিশেষ শিল্প দক্ষতার পরিচায়ক। মঞ্চসজ্জা দৃশ্যপর্ব রচনা ইত্যাদিতে অভিনবত্বের পরিচয় দান। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে চিত্রালঙ্কার করেন। ১৯৬৪-তে রবীন্দ্র-ভারতী সমিতি-কর্তৃক গগনেন্দ্রনাথের নির্বাচিত চিত্রের প্রতিলিপির একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-ভারতী ও শান্তিনিকেতনের কলাভবনে তাঁর চিত্রাবলি সংরক্ষণ করা হয়েছে। 'ভোঁদড় বাহাদুর' তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। এছাড়া 'নব হুল্লোড়' তাঁর রচিত একটি ব্যঙ্গচিত্র। মৃত্যু. ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮।



গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (?-১৮৩১): জন্ম, বহড়া, হুগলী। বাঙালি পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা, মুদ্রাকর, পুস্তক প্রকাশক ও গ্রন্থকার। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনে কিছুকাল কম্পোজিটররূপে কর্মরত। পরে কলকাতায় পুস্তক প্রকাশনা ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ১৮১৬-তে নিজের সম্পাদিত সচিত্র প্রথম বাংলা গ্রন্থ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গল' ফেরিস অ্যান্ড কোম্পানির ছাপখানা থেকে মুদ্রিত করে প্রকাশ। ১৮১৮-তে কলকাতায় 'বাঙ্গালা গেজেটি প্রেস বা আপিস' নামক একটি মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে হরচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বাংলা গেজেট' প্রকাশ। পরে মুদ্রণালয়টি স্বগ্রামে স্থানান্তর। রচিত, সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ: এ গ্রামার ইন ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি (১৮১৬), দায়ভাগ (১৮১৬-১৮১৭), দ্রব্যগুণ (১৮২৪), চিকিৎসার্ণব (১৮২০), শ্রীভগবদ্‌গীতা। মৃত্যু, ১৮৩১।

গাজীউল হক (১৯২৯-২০০৯): জন্ম: নিচিন্তা গ্রাম, ছাগলনাইয়া, নোয়াখালী, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯। ভাষাসংগ্রামী, গীতিকার, আইনজীবী। পিতা মওলানা সিরাজুল হক ও মাতা নূরজাহান বেগম। পিতা ছিলেন কংগ্রেস ও খেলাফত



আন্দোলনের কর্মী এবং মা নূরজাহান বেগম ছিলেন গৃহিণী। গ্রামের মক্তবে তিনি প্রথমে পড়াশুনা শুরু করেন এবং পরে কাশিপুর স্কুলে ভর্তি। এই স্কুল থেকে তিনি উচ্চ প্রাইমারি বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৪১-এ বগুড়া জেলা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি। এই স্কুলে পড়ার সময়েই তিনি শিক্ষক সুরেনবাবুর সান্নিধ্যে এসে দেশপ্রেমে দীক্ষিত হন। ১৯৪৬-এ এই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস করেন। এরপরই বগুড়া আজিজুল হক কলেজে আইএ ভর্তি। কলেজে ভর্তি হয়েই অধ্যক্ষ ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সংস্পর্শে এসে বাম রাজনীতিতে সম্পৃক্ত। ১৯৪৪-এ বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগ বগুড়া জেলা শাখার যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত এবং ঐ বছর কুষ্টিয়ার নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কনফারেন্সে যোগদান। ১৯৪৬-এ তিনি ধুবড়িতে অনুষ্ঠিত আসাম মুসলিম লীগ কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা এবং নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট। ১৯৪৭-এ তিনি পূর্ব-পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের ঈশ্বরদী কনফারেন্সে উত্তরবঙ্গ শাখার যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ওই বছর ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় গণতান্ত্রিক যুবলীগের দুদিনব্যাপী কর্মী সম্মেলনের গাজীউল হক বগুড়ার পাঠচক্র 'শিল্পায়নে'র সদস্যদের সঙ্গে অংশ নেন। ১৯৪৮-এ তিনি পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের বগুড়া শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময় থেকেই 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' সংগ্রাম শুরু হয়। ১১ মার্চ গাজীউল হক বগুড়া কলেজ থেকে ছাত্রদের মিছিল নিয়ে বগুড়া শহর প্রদক্ষিণ করেন। বগুড়া জিলা স্কুল ময়দানে সেদিনের সভার সভাপতি ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌। সভাপতি হিসেবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির পক্ষে দীর্ঘ সময়ব্যাপী যুক্তি ও তথ্যনির্ভর ভাষণ দেন। ১৯৪৮-এ গাজীউল হক বগুড়া কলেজ থেকে আই.এ. পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয়ে অনার্স ভর্তি হয়ে আবাসিক ছাত্র হন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের। এসময় তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে কারাবরণ করেন। ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন-বেতন কর্মচারিগণ ধর্মঘট আহ্বান করলে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে তিনিও এর সমর্থন করেন। ১৯৪৯-এর দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় তিনি কাজ করেন। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি ভুখা মিছিল বের হলে গাজীউল হকও শরিক হন। ১৯৫১-এ বি.এ. অনার্স পাস করে এম.এ. ভর্তি হন। ১৯৫৩-এ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রে ভর্তি হন। ১৯৫৬-এ তিনি একসঙ্গে ১১ পেপার আইন পরীক্ষা দেন। ১৯৫৭-এ বগুড়া বারে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। '৬২'র শিক্ষা-আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৩-এর মার্চ মাসে পূর্ব-পাকিস্তান ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ের সনদ লাভ করেন। ১৯৭২-এ তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে যোগদান দেন। ১ মার্চ ১৯৭৩ থেকে

১৫ মে ২০০৩ সাল বাংলা একাডেমীর আইন উপদেষ্টা। ১৯৯৬-এ থেকে চার বছর বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন সর্বোচ্চ আদালতে একজন দক্ষ আইনজীবী হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৫০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে আবদুল মতিন এই কমিটির আহ্বায়ক হন। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি ১৯৫০-এর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস ঘোষণা করে। ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলন নতুন করে সংঘটিত হয় এবং চূড়ান্ত পরিণতি পায়। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে বাঙালি আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে ওইদিন অযাচিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ করা যায় সর্বস্তরের মানুষের 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে। শ্লোগানে সোচ্চার হয় ছাত্রজনতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ঢাকার অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। বায়ান্নর ২১ শে ফেব্রুয়ারি ছিল যেন আগুনঝরা ফাগুনের দিন। ১৪৪ ধারা জারির ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবাদী ছাত্র আসতে থাকে। জমায়েত হতে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। সকাল সাড়ে এগারোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন গাজীউল হক। ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি অংশ নিয়ে বগুড়ার মুসলিম লীগকে শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করেন এবং কাগমারী সম্মেলনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠনে আওয়ামী লীগের সর্বাঙ্গীণ প্রতিকূলতা প্রতিরোধে মাওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে কাজ করেন। ঐ বছর ২১ ফেব্রুয়ারি পালন বন্ধের জন্য সরকার ধরপাকড় শুরু করে। ১৯ ফেব্রুয়ারি গাজীউল হকসহ কয়েকজন নেতাকর্মীকে বগুড়া থেকে গ্রেফতার করা হয়। এবার প্রায় ২৯মাস কারাগারে থাকতে হয়। ১৯৬২-র শিক্ষা-আন্দোলন, ১৯৬৪-র সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রথমে স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠক হিসেবে ও পরে জাতীয় পর্যায়ের লেখক এবং সংগঠকের ভূমিকায় তাঁকে পাওয়া গেছে। তাঁকে পাওয়া গেছে ১৯৮০-র দশক জুড়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে। বগুড়ায় ১৯৬৯-এর ১১ দফা আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল বিড়ি শ্রমিক ও মজদুরগণ। গাজীউল হকও ১১ দফা আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র ভূমিকা পালন করেন। হিলিতে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে একটি খণ্ডযুদ্ধে অংশগ্রহণের পর কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র 'জয়বাংলা' পত্রিকার বিক্রয় বিভাগের দায়িত্বসহ আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে রণাঙ্গনের সংবাদ প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সরকার ১৪৪ ধারা জারি ভঙ্গকারীদের অন্যতম ছিলেন গাজীউল হক। গাজীউল হকের 'ভুলব না ভুলব না ভুলব না এই একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না' গানটি গেয়ে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত প্রভাতফেরি করা হতো। তিনি রাষ্ট্রভাষা পদক ও সম্মাননা স্মারক, শেরেবাংলা জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যও ছিলেন তিনি। প্রকাশিত গ্রন্থ: জেলের কবিতা (১৯৫৯), এখানে ও সেখানে, একটি কাহিনী, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম (১৯৭১), এগিয়ে চলো (১৯৭১), Bangladesh Unchained (1971), Media Laws & Regulation in Bangladesh (1992), মোহাম্মদ সুলতান (১৯৯৪), বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন (১৯৯৬)। পুরস্কার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব লজ, পাবনা থিয়েটার পুরস্কার ১৯৭৭, বগুড়া জিলা স্কুলের ১৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংবর্ধনা ১৯৭৯, অন্নদাশঙ্কর রায় পুরস্কার ১৯৯৭, বগুড়া প্রেস ক্লাব সংবর্ধনা ১৯৯৭, চট্টগ্রাম ইয়ুথ কয়ার ভাষাসৈনিক পদক ১৯৯৭, বগুড়ার ভাষাসৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবন্ধু পরিষদ সোনালী ব্যাংক সংবর্ধনা ১৯৯৭, বাংলা

একাডেমী ফেলোশিপ ১৯৯৯, তমদ্দুন মজলিস মাতৃভাষা পদক, ২০০০, দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ সংবর্ধনা ২০০০, একুশে পদক ২০০০, জাহানারা ইমাম পদক ২০০১, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট প্রদত্ত ভাষা-আন্দোলনের-সুবর্ণ জয়ন্তী সম্মাননা পদক ২০০৩, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সম্মাননা পদক ২০০৩, বঙ্গবন্ধু পদক ২০০৩, শের-ই-বাংলা জাতীয় পুরস্কার ২০০৪, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পুরস্কার ২০০৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন সম্মাননা পদক ২০০৬। মৃত্যু. ঢাকা, ১৭ জুন ২০০৯।

গিয়াসউদ্দিন আহমদ (১৯৩৫-১৯৭১)॥ জন্ম. ভেলাবো গ্রাম, নরসিংদি, ঢাকা, ১৯৩৫। শিক্ষাবিদ। ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুল থেকে ১৯৫০-এ প্রবেশিকা, নটরডেম কলেজ থেকে ১৯৫২-তে আই.এ. ১৯৫৫-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইহিহাসে বি.এ.



অনার্স ও ১৯৫৬-তে এম.এ. (ইতিহাস) পাস। সব পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফল লাভ। ১৯৫৭-র নভেম্বর মাসে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ইতিহাসের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৫৮-র আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬২-তে স্থায়ী পদ লাভ। ১৯৬৪-তে কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যে গমন। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস থেকে আন্তর্জাতিক ইতিহাসে অনার্স পাস করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পূর্বেকার চাকরিতে যোগদান। ১৯৬৮'র জানুয়ারি মাসে সিনিয়র প্রভাষক পদে উন্নীত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলের হাউস টিউটর। প্রগতি চেতনার অধিকারী সম্পর্কে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি গভীর আস্থাশীল ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে (১৯৭১) সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন নানাভাবে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ক্ষতিগ্রস্ত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতেন। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হল থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী আলবদর-বাহিনী কর্তৃক অপহৃত এবং মীরপুর বধ্যভূমিতে নিহত।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)॥ জন্ম. বাগবাজার, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ১৮৪৪। নট, নাট্যকার ও রঙ্গালয় পরিচালক। কিছুকাল পাঠশালায় পড়াশুনা করার পর গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ও হেয়ার স্কুলে লেখাপড়া। ১৮৬২-তে এন্ট্রান্স পরীক্ষায়



অনুত্তীর্ণ। পরবর্তীকালে ইংরেজি ও হিন্দু পুরাণে জ্ঞান অর্জন। হিন্দু পুরাণে জ্ঞান অর্জন। 'অ্যাটকিনসন টিলকন' কোম্পানিতে 'বুক-কিপারে'র শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগদান। ১৮৬৭-তে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের গীতিকার হিসেবে নাট্যজগতের সঙ্গে প্রথম সংযুক্ত। দুবছর পর 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করে সুনাম অর্জন। ১৯৭১-এ ন্যাশনাল থিয়েটার নামে জোড়াসাঁকোতে প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা। দর্শনীগ্রহণ ব্যাপারে দলের লোকদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় সেখান থেকে পদত্যাগ করে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের' অবৈতনিক অভিনেতা হিসেবে যোগদান। ১৮৭৬-এ ইন্ডিয়ান লীগের হেডক্লার্ক ও ক্যাশিয়ার নিযুক্ত। পরে পার্কার কোম্পানির বুক কিপার। ১৮৭৭-এ তাঁর রচিত 'আগমনী' নাটক গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত। ১৮৮০-তে এই থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত। সওদাগরি অফিসের চাকরি ত্যাগ করে তাঁর জীবন বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতির জন্য উৎসর্গ। ১৮৮৩-১৯০৭ পর্যন্ত স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর প্রভৃতি রঙ্গালয় পরিচালনা। ১৯০৮-এ মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত এবং আমৃত্যু এই দায়িত্ব পালন। ১৮৮৪'র ২০ সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে তাঁর 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মুগ্ধ হন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করেন। এই ঘটনার পর রামকৃষ্ণ

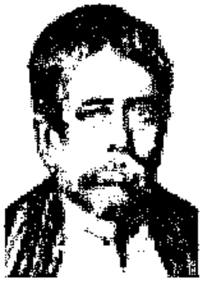
দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ। বাংলানাট্য জগতের যুগস্রষ্টা নট ও নাট্যকার গিরিশ ঘোষ প্রায় ৮০টি নাটক রচনা করেছেন। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক এ তিন ধারার নাটক রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। গীতি নাটকে ব্যবহৃত তাঁর উদ্ভাবিত ছন্দই 'গৈরিশছন্দ' নামে পরিচিত। রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক-পৌরাণিক নাটক: রাবণবধ (১৮৮১), অভিমন্যুবধ (১৮৮১), সীতার বনবাস (১৮৮১), লক্ষ্মণ বর্জন (১৮৮২), রামের বনবাস (১৮৮২), সীতাহরণ (১৮৮২), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮২), জনা (১৮৯৪), চরিত নাটক: চৈতন্যলীলা (১৮৮৬), বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, শঙ্করাচার্য (১৯১০); রোমান্টিক নাটক: মুকুলমুঞ্জুর (১৮৯২), আবু হোসেন (১৮৯৬), সামাজিক নাটক: প্রফুল্ল (১৮৮৯), মায়াবসান (১৮৯৭), বলিদান (১৯০৫), ঐতিহাসিক নাটক: সিরাজদ্দৌলা (১৯০৫), মীর কাসিম (১৯০৬), ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭)। পৌরাণিক নাটক 'জনা', চরিত নাটক 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' এবং ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। প্রেম, ভক্তি ও বৈরাগ্য-লীলা পৌরাণিক নাটকের ভাববস্তু। কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, কন্যাদায় সমস্যা সামাজিক নাটকের উপজীব্য। স্বদেশি আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) পটভূমিকায় রচিত ঐতিহাসিক নাটকে দেশাত্মবোধ ও প্রাচীন ভারতের আদর্শ রূপায়িত। মৃত্যু. ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১২।

গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া বিদ্যাবিনোদ (১৮৯১-১৯৬৩)॥



জন্ম. দক্ষিণ জোয়ারা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, ১৮৯১। সাহিত্যিক। পালি ও সংস্কৃত শিক্ষায় ব্রতী হন এবং আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় স্বর্ণপদক নিয়ে পাস। কিছুদিন পর রেঙ্গুন গমন। সেখানে বার্মা ভাষা শিখে পত্র-পত্রিকায় বার্মা ভাষায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ। কয়েক বছর পর কলকাতায় আগমন ১৯২৩-এ ৩২ বছর বয়সে মেট্রিক এবং ১৯৩৫-এ কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই.এ. পাস। জগৎজ্যোতি, বসুমতি, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় বৌদ্ধ দর্শনের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ। বার্মার রেঙ্গুন থেকে মদনমোহন (১৯৩০) এবং কলকাতা থেকে অন্ধের দৃষ্টি (১৯৩৮) নামে দুটি উপন্যাস প্রকাশিত। ভারত বিভাগের (১৯৪৭) পর চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন। পটিয়া ও বোয়ালখালি থানার কয়েকটি উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। ১৯৬০-এর ডিসেম্বরে গবেষক হিসেবে বাংলা একাডেমীতে যোগদান। এ সময়ে 'ধম্মপদ' ও 'জাতকের গল্প' রচনা। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি ধম্মপদ, জাতকের গল্প, মদনমোহন, অন্ধের দৃষ্টি, প্রতীত্যসমুৎপাদ, আর্যপথ। মৃত্যু. ৩০ মে ১৯৬৩।

গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০)॥ জন্ম. পাঁচদোনাগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ১৮৩৫। বাংলায় কোরান শরিফের প্রথম অনুবাদক ও সাহিত্যিক।



ভাই গিরিশচন্দ্র নামে পরিচিত। ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা অর্জন। কর্মজীবনের শুরুতে ময়মনসিংহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে কিছুকাল নকলনবিশ। পরে কিছুদিন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে শিক্ষকতা। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ। ময়মনসিংহে কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকার্য তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং ১৮৭১-এ এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। কেশবচন্দ্রের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ইসলাম ধর্ম অনুশীলন। 'সুলভ সমাচার' ও 'বঙ্গবন্ধু' নামক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। এছাড়া মাসিক 'মহিলা' (১৩০২) নামক পত্রিকার সম্পাদক। ১৮৭৬-এ আরবি ভাষা ও ইসলামিক ধর্মশাস্ত্র পাঠের উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ গমন। লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে ১৮৮১-১৮৮৬ পর্যন্ত ছয় বছরের সাধনা ও পরিশ্রমে টীকাসহ 'কোরান শরিফের' প্রথম বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত। ১৯৩৬-এ এই গ্রন্থের ৪র্থ সংস্করণে মওলানা আকরম খাঁ একটি মূল্যবান ভূমিকা লেখেন। ধর্মীয় বিষয়ের উপর অন্যান্য গ্রন্থ: তাপসমালা (১৮৮০-১৮৯৬), মহাপুরুষ রচিত (১৮৮২-১৮৮৭), এবং 'হাদিস বা মেসকাত মসাবিহের' (১৮৯২-১৮৯৮)। তাঁর রচিত গোলেস্তাঁ ও বুস্তার হিতোপাখ্যানমালা (১ম ও ২য় ভাগ) তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তি ছিল। রামমোহন রচিত ইসলাম-বিষয়ক গ্রন্থ 'তুহফাৎ-

উল-মুয়াহহিদীন'নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখেন 'বনিতা বিনোদন' নামক পুস্তক। এছাড়া তাঁর রচিত 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও জীবনী' নামক পুস্তকটিও বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন। লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের (১৯০৫-১৯১১) একজন দৃঢ় সমর্থক হিসেবে পরিচিত। এ ব্যবস্থা পূর্ববঙ্গের জন্য কল্যাণকর বলে মত প্রকাশ। মৃত্যু. ১৫ আগস্ট ১৯১০।

গিরীন চক্রবর্তী (১৯১২-১৯৬৫)॥ জন্ম. ১৯১২। কণ্ঠশিল্পী। পল্লীগীতি ও নজরুল ইসলামের গানের গায়ক হিসেবে সুনাম অর্জন। দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বেতারকেন্দ্রে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন। কয়েকটি ছায়াবির সংগীত পরিচালক হিসেবেও বিশেষ খ্যাতি লাভ। মৃত্যু. ডিসেম্বর ১৯৬৫ (৬ পৌষ ১৩৭২)।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪)॥ জন্ম. মাতুলালয়, ভবানীপুর কলকাতা, ১৮ আগস্ট ১৮৫৮। পৈতৃক নিবাস পানিহাটি। কবি। পিতা ও স্বামীর কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা লাভ। পরিণত বয়সে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা গ্রহণ। দশ বছর বয়সে কলকাতার বহুবাজারের জমিদার বংশের সন্তান নরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। ১৮৮৪-তে স্বামীর মৃত্যু। কবিতা রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। প্রেম, প্রকৃতি বাৎসল্য ও গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ তাঁর কবিতার ভাববস্তু। 'কবিতাহার' (১৮৭৩), 'ভারত-কুসুম' (১৮৮২), 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭), ও 'আভাষ' (১৮৯০) তাঁর প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ। 'অশ্রুকণা' বাংলা সাহিত্যের একখানি উল্লেখযোগ্য শোককাব্য। মৃত স্বামীর স্মরণে রচিত এ কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতায় বেদনার সুর প্রবাহিত। 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ' (১৮৯২), 'শিখা' (১৮৯৬), 'অর্ঘ্য' (১৯০২), 'স্বদেশিকা' (১৯০২), ও 'সিন্দুগাঁথা' (১৯০৭) তাঁর রচিত নাট্যকাব্য। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবের' পদ্যানুবাদ গিরিন্দ্রমোহিনী দাসীর অন্যতম কীর্তি। 'জাহ্নবী' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা (১৯০৭-১৯০৯)। মৃত্যু. ১৬ আগস্ট ১৯২৪।



গীতা দত্ত (১৯৩০-১৯৭২)॥ জন্ম. ফরিদপুর, ২৩ নভেম্বর ১৯৩০। সংগীতশিল্পী। গ্রামোফোন রেকর্ড ও ছায়াছবির অসংখ্য গানের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী। প্রকৃত নাম গীতা রায়চৌধুরী। পিতা দেবেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন জমিদার। মাতা অমিয়া দেবী। শৈশবকাল থেকে গানের চর্চা শুরু। ১৯৪২-এ বারো বছর বয়সে পিতা-মাতার সঙ্গে বোম্বে চলে যান। পরে বোম্বেতে স্থায়ীভাবে বসবাস। ১৯৪৭-এ তিনি মেট্রিক পাস করেন। প্লে-ব্যাক গায়িকা হিসেবে সুনাম অর্জন। বোম্বের খ্যাতিমান সুরকার হনুমান প্রসাদ একবার গীতার গান শুনে মুগ্ধ হন। তিনি ১৯৪৬-এ গীতাকে 'ভক্ত প্রহ্লাদ' নামের একটি চলচ্চিত্রে কোরাসে মাত্র দুই লাইন গান গাওয়ার সুযোগ দেন। তাতেই তিনি নিজের প্রতিভার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। পরের বছরে গীতা নেপথ্যগায়িকা হিসাবে 'দো ভাই' (১৯৪৭) ছবিতে কণ্ঠ দেন। এই ছবির মাধ্যমে তিনি হিন্দি ছবির জগতে গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। এই ছবির সুরকার শচীনদেব বর্মণ শিল্পী গীতা দত্তের কণ্ঠের বাঙালি টানকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছিলেন 'দো ভাই' ছাড়াও 'দেবদাস' (১৯৫৫) এবং 'পেয়াসা' (১৯৫৭) ছবিতে। 'পেয়াসা' ছবিতে 'আজ সাজন মুঝে অঙ্গ লাগা লে' বাঙালি কীর্তন গানকে গীতা সফলভাবে হিন্দিতে গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। বিশিষ্ট প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা গুরু দত্তকে বিয়ে করেন (১৯৫৩) তিনি গীতা রায়চৌধুরী থেকে হয়ে ওঠেন গীতা দত্ত। তাঁর গাওয়া কয়েকটি কালজয়ী গান হলো, তুমি যে আমার (হারানো সুর ১৯৫৮), এই সুন্দর স্বর্ণালি সন্ধ্যায় (হসপিটাল ১৯৬০), নিশি রাত বাঁকা চাঁদ আকাশে (পৃথিবী আমারে চায় ১৯৫৭), ওগো সুন্দর জানো নাকি (ইন্দ্রাণী ১৯৫৮), এই মায়াবী তিথি (সোনার হরিণ ১৯৫৯), আমি শুনেছি তোমারি গান (স্বরলিপি ১৯৬১) প্রভৃতি। শচীনদেব বর্মণ ছাড়াও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ও পি নাইয়ার, সুধীন দাশগুপ্ত, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অনিল বাগচী প্রমুখের সুরে তিনি বাংলা ও হিন্দি গান গেয়ে তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬৪-এর ১০ অক্টোবর স্বামী



গুরু দত্ত আত্মহত্যা করলে গীতা দত্ত মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। এরপর তিনি সংগীতজগত থেকেও বিদায় নেন। মৃত্যু. হরকিষণদাস হাসপাতাল, বোম্বে, ২০ জুলাই ১৯৭২।

গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭–১৯৩৭)॥ জন্ম. ওড়াকান্দি, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭। সমাজসংস্কারক ও ধর্মপ্রচারক। মতুয়া ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর পিতা। মাতার নাম শান্তিদেবী ঠাকুর। স্ত্রীর নাম সত্যভামা ঠাকুর। পদ্মবিলা গ্রামের দশরথ বিশ্বাসের পাঠশালায় প্রাথমিক পাঠ, মোল্লাকান্দি গ্রামে গোলক কীর্তনিয়ার পাঠশালায় সংস্কৃতভাষার পাঠ এবং আড়কান্দি গ্রামের মকুব মিয়ার মক্তবে ফারসিভাষার পাঠগ্রহণ। ছয় ফুটের বেশি উচ্চতার ও গৌরবর্ণের শারীরিক গঠনসম্পন্ন গুরুচাঁদের হাত হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ছিল। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনি আজীবন পরিশ্রম করেন। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও তিনি একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮৭২-এর ভারতের প্রথম আদমশুমারিতে নমঃশূদ্রদের 'চণ্ডাল' পরিচয় লিপিবদ্ধ হলে নমঃশূদ্রদের পেশা ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। বংশানুক্রমিকভাবে প্রধানত কৃষিজীবী এই জনগোষ্ঠীকে 'চণ্ডাল' বলায় সরকারিভাবে তাদের পেশা শুধু পরিচ্ছন্নকর্মীর মধ্যে সীমিত হয়। এই পরিচয় লিপিবদ্ধ হওয়ার পর ফরিদপুর কারাগারে নমঃশূদ্র কয়েদিদের দিয়ে পরিচ্ছন্নকর্মীদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। কোনো কোনো জায়গায় নমঃশূদ্র কৃষকদের পালকি ব্যবহার করতে, জুতা পরতে এবং বারোয়ারি স্থাপনায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হতে থাকে। ১৮৭৩-এ পিতা হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে গুরুচাঁদ ঠাকুর সাংগঠনিকভাবে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন। ঐ অঞ্চলের নমঃশূদ্র সমাজপতিদের সংগঠিত করেন এবং ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি এলাকার বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করার ঘোষণা দেন। ১৮৮১-এ তিনি বাগেরহাট জেলার দত্তডাঙা গ্রামে নমঃশূদ্র সম্মেলনের আয়োজন করেন, সেই সম্মেলনেও এটি আলোচনার বিষয় হয়। এই সম্মেলনে বাংলা ও আসাম প্রদেশ থেকে পাঁচ হাজার প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এভাবে জনমত গঠনের পর এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ ও প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে ১৯১১ সাল নাগাদ নমঃশূদ্রদের 'চণ্ডাল' পরিচয়ের অবসান ঘটে। এর ফলে সব ধরনের সামাজিক অধিকারসহ যাবতীয় সরকারি চাকরিতে নমঃশূদ্রদের ঘোষিত প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। তাঁর উদ্যোগে ১৯০৮-এ সর্বপ্রথম নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আট ব্যক্তি সরকারি চাকরি লাভ করেছিলেন। ১৯১৯ সাল নাগাদ তিনি দাবি তুলেছিলেন জনসংখ্যার ভিত্তিতে নমঃশূদ্রদের চাকরির কোটা নির্ধারণ করা হোক। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে তিনি নিজ উদ্যোগে নমঃশূদ্র এলাকাগুলোতে প্রায় ১৮০০ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে নমঃশূদ্র সমাজ আধুনিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায় এবং আধুনিক ভারতের জাগরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে। নমঃশূদ্রদের বেশ কয়েকটি উপশ্রেণি বিলুপ্ত করে তিনি একটি বৃহত্তর নমঃশূদ্র সমাজ গঠনে সফল হয়েছিলেন। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থাকে মজবুত করতে তিনি সমবায় ভিত্তিকে নানমুখী কর্মকাণ্ডে সকলকে যুক্ত হতে আহ্বান জানান। আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে আসার জন্যও সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। ড. সি.এস. মিডের অনুপ্রেরণায় গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা-বিবাহপ্রথা চালু করেন এবং পরে বাল্যবিবাহপ্রথা রোধ করার জন্য ব্যাপক গণসংযোগ অব্যাহত রাখেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা ব্যতিক্রমী ছিল। তিনি ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনকে বা ১৯২০-এর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আহ্বান তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন, যোগাযোগ রেখেছিলেন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিল, প্রথমত, দেশ যুক্ত হোক বা ভাঙুক তাতে অস্পৃশ্যসাধারণের কিছু যায়-আসে না; এবং দ্বিতীয়ত, অস্পৃশ্য সাধারণের সঙ্গে সরকারের কোনো সহযোগ নেই, তাই অসহযোগের প্রশ্ন ওঠে না। তিনি বলতেন, কংগ্রেসের উচিত দেশের সব মানুষকে এক মনে



করা এবং তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন। গুরুচাঁদ তাঁর মতামত প্রকাশের লক্ষ্যে ১৯০৭-এ 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' নামে ওড়াকান্দি থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকায় মতুয়াধর্ম সম্পর্কে এবং নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের জাগরণ-আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে বহু রচনা প্রকাশিত হয়। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে কবিগানের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতেও গুরুচাঁদ ঠাকুর বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় নমঃশূদ্র সমাজের মধ্য থেকে তারকচন্দ্র সরকারের মতো বহু খ্যাতিমান কবিয়ালের জন্ম হয়। মৃত্যু. ওড়াকান্দি, গোপালগঞ্জ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭।

গুরুদাস তালুকদার (১৮৯৬-১৯৮০)॥ জন্ম. পীরগাছা, রংপুর, ১৮৯৬। রাজনীতিবিদ। রংপুর থেকে মেট্রিক পাস করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি শেষবর্ষের ছাত্র থাকাকালে পড়াশুনা ছেড়ে স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান। ফলে পিতার সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বত্ব ত্যাগ। ১৯২১-এ কংগ্রেসকর্মী হিসেবে দিনাজপুর শহরে আগমন। ১৯২২-এ ব্রিটিশ সরকারের হাতে বন্দী। ৮৪ বছরের জীবনকালে মোট ৩৭ বছর জেলে ও আত্মগোপন অবস্থায় কাটান। সর্বশেষ গ্রেপ্তার হন ১৯৭৮-এ। এ সময় তাঁকে এক বছরের মতো অন্তরীণ রাখা হয়। এ শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষ দিকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪৬-১৯৪৭-এ রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকদের যে তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হয় সে আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান। তাঁকে কৃষকেরা ভালবেসে সম্বোধন করতো 'রাজাবাবু' বলে এবং সাঁওতালরা 'রাজা মারাং' বলে। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধসহ প্রতিটি গণ-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। রাজনীতি ছাড়াও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। তিনি ছিলেন নাট্য অভিনেতা। ১৯১৩ থেকে ১৯২০ অবধি নিয়মিত অভিনয় করেছেন। মৃত্যু. ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার (১৮৪৪-১৯১৮)॥ জন্ম. নারিকেলডাঙ্গা, কলকাতা, ২৬ জানুয়ারি ১৮৪৪। পৈতৃক নিবাস বড়ে গ্রাম, চব্বিশ পরগণা। শিক্ষাবিদ ও আইনজ্ঞ। কার ঠাকুর কোম্পানির অফিসের কর্মচারী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতা। বাল্যকালে পিতৃহীন হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য (১৮৯০-১৮৯৩)। ১৮৫৯-এ কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ.এ. (১৮৬২), বি.এ. (১৮৬৪), এম.এ. (গণিত, ১৮৬৫), বি.এল. (১৮৬৬) এবং ল অনার্সের (১৮৭৬) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। শিক্ষাশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত। পরে বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা ও মুর্শিদাবাদ নবাবের আইন উপদেষ্টা। ১৮৭২-এ ব্যবহারজীবীরূপে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান। ১৮৭৭-এ ডি.এল. উপাধি লাভ। ১৮৭৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত। এই অধ্যাপকরূপে প্রদত্ত বক্তৃতামালা 'হিন্দু ল অফ ম্যারেজ অ্যান্ড স্ত্রীধন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। 'দত্তক গ্রহণে ধর্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা' ও 'বৃত্তিদানবিষয়ক হিন্দু আইন'– এই দুই বিষয়ে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে ডক্টর অব ল ডিগ্রি লাভ। ১৮৭৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও আইন পরীক্ষক নিযুক্ত। তিন বছর সিন্ডিকেট সদস্যরূপে কর্মরত। ১৮৮৭-তে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত। ১৮৮৮-১৯০৪ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। ১৮৯০-এর ২ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত। চার বছর (১৮৯০-১৮৯৪) এ পদে অধিষ্ঠিত। কলকাতা ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই ইনস্টিটিউট বা সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং অফ ইয়ংম্যান নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। ১৮৯৭-এ 'ডন' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। ১৯০২-এ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য নিযুক্ত। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে (১৯০৫-১৯১১) জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯১২-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ফ্যাকালটির ডিন নিযুক্ত। ১৯০৪-এ তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে 'স্যার' এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট'



উপাধি লাভ। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিক্ষা (১৯০৭), জ্ঞান ও কর্ম (১৯১০), এ ফিউ থট্স অন এডুকেশন (১৯০৪), দি এডুকেশন প্রোবলেম ইন ইন্ডিয়া (১৯১৪) প্রভৃতি। মৃত্যু. ২ ডিসেম্বর ১৯১৮।

গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১)॥ জন্ম. বীরশ্রী



গ্রাম, সিলেট, ১০ মে ১৮৮২। সমাজকর্মী, সাহিত্যিক। ১৮৯৯-এ শ্রীহট্ট গভর্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান এবং ১৯০১-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ। তারপর বিলাত গমন। সেখানে ১৯০৪-এ আই.সি.এস. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ। একই বছর কেম্ব্রিজ ইমানুয়েল কলেজে অধ্যাপনার কর্মে যোগদান। ১৯০৫-এর শেষভাগে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মেম্বার হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। ঐ বছরই এস.ডি.ও. পদে যোগদান। পরে বঙ্গীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ ও স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের সচিবের পদে উন্নীত। হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রূপে কুখ্যাত কামুনগাছি গুলি চালনার মামলায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ রায়ে ইউরোপীয় এস.পি.ও ইউরোপীয় সামরিক কর্মচারীর তীব্র সমালোচনা করার ফলে ইউরোপীয় মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি। ১৯২৯-এর শেষভাগে ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পদে নিযুক্ত থাকাকালে গ্রামে সংস্কারের আন্দোলন শুরু। গ্রামের আবর্জনা দূরীকরণ, শিক্ষিত সমাজের শ্রমের মর্যাদা বিষয়ে শিক্ষাদান প্রভৃতি ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। ১৯৩০-এর মে মাসে ডান্ডি অভিযানের (লবণ আইন অমান্য আন্দোলন) পর মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হলে সমবেত জনতার ওপর গুলিবর্ষণের হুকুমদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে বীরভূমে বদলি। ১৯৩১-এ 'Rural Heritage Preservation Society of Bengal নামে এক নতুন আন্দোলন সংগঠনের কাজ শুরু। মৃত পত্নীর নাম অনুসারে ১৯২৫-এ 'সরোজনলিনী শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠা। 'সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতি' তাঁর আর এক কীর্তি। ১৯৩২-এ ব্রতচারী নৃত্যসংঘ প্রতিষ্ঠা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে এই ব্রতচারী সংঘসহ লন্ডনে আন্তর্জাতিক লোকনৃত্য উৎসবে যোগদান। ১৯৪১-এ দক্ষিণ ভারতে 'সাউথ ইন্ডিয়া ব্রতচারী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা। 'সার্বভারতীয় ব্রতচারী সমাজ' প্রতিষ্ঠা। ১৯৪১-এ কলকাতার অদূরে জোকা গ্রামে 'ব্রতচারী গ্রাম' নাম দিয়ে ব্রতচারী জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। স্বভাব কবি হিসেবে খ্যাত। তাঁর রচিত গ্রন্থ: শ্রীহট্টের লোকসংগীত (ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক সহযোগে, সম্পাদনা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৬), ভজার বাঁশী (১৯২২), চাঁদের বুড়ী (১৯৩৩), পটুয়া সংগীত (১৯৩৯), ব্রতচারী সখা (১৯৩৩) প্রভৃতি। গ্রাম-উন্নয়ন ও ব্রতচারী আন্দোলনের অগ্রপথিক। মৃত্যু. ২৫ মে ১৯৪১।

গুল মোহাম্মদ খাঁ, ওস্তাদ (১৮৭৬-১৯৭৯)॥



জন্ম. তিরহুত শহর, দ্বারভাঙা, ১৮৭৬। উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতশিল্পী। পিতা ওস্তাদ আহমদ খাঁ। কৈশোর কাটে পাটনায়। পিতার কাছে সংগীতে হাতে খড়ি। দীর্ঘ আট বছর ধ্রুপদ ও খেয়াল অনুশীলন। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্য ওস্তাদ হায়দার বকসের কাছে সংগীতের তালিম গ্রহণ। পিতা ও পিতৃব্যের কল্যাণে ডাগর ঘরানা বা ডাগরবাণীতে ধ্রুপদ ও খেয়ালে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন। বিশ বছর বয়সে তিনি যখন আগ্রার বাসিন্দা তখন মথুরা-বৃন্দাবনের মুরসান গ্রামের চান্দ খাঁ সাহেবের কন্যা সাকুরান বিবির সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সপরিবার ঢাকা আগমন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস। উপমহাদেশের বিভিন্ন সংগীত জলসায় অংশগ্রহণ করে প্রশংসা অর্জন। ঢাকায় উচ্চাঙ্গসংগীত বিস্তারে ও বিকাশে পথিকৃতের ভূমিকা পালন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি শিক্ষা কেন্দ্র ও আসর চালু। ওস্তাদ মুনশী রইসউদ্দীন, দীপালি নাগ, রানী সোম, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, ফেরদৌসী রহমান, রওশন আরা, উৎপলা সেন প্রমুখ খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী তাঁর কাছে খেয়াল শেখেন। ১৯৩৯-এ ঢাকা বেতারকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুরিয়া রাগে খেয়াল

পরিবেশন। ঢাকা বেতারের নিয়মিত শিল্পী। সংগীত শিক্ষকরূপে এই বেতারের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত। পুরিয়া, মালকোশ, পুরিয়া ধানেশ্রী, মুলতানী-এগুলোই ছিল তাঁর প্রিয় রাগ। ১৯৫৫-তে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি পুরস্কার লাভ। ১৯৭৭-এ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক স্বীকৃতি সংবর্ধনা প্রদান। সংগীতে অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার-কর্তৃক 'একুশে পদক'-এ ভূষিত। মৃত্যু. ঢাকা, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯।

গেরাসিম্ লিয়েবেদেফ্ (১৭৪৯-১৮১৭)॥ জন্ম. ইয়ার স্লাভ্ল্ নগরী, রাশিয়া, ১৭৪৯। সংগীতজ্ঞ, পর্যটক, ভারততত্ত্ববিদ, বাংলা মঞ্চের জন্মদাতা। পুত্র গেরাসিমকে পিতা যখন তাঁর কর্মস্থল রাজধানী শহর সাংকৎ পিরের্বুর্গে-এ নিয়ে আসেন তখন গেরাসিম্ পনের বছরের কিশোর। এই শহরে যে তেরো বছর ছিলেন তাতে সংগীত শিক্ষা ব্যতিরেকে অন্য কোনো লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি। তিনি স্বশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। মাতৃভাষা রুশ ব্যতীত তিনি ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, সংস্কৃত, তামিল, হিন্দুস্থানি ও বাংলাভাষা জানতেন। এ সমস্ত ভাষা কোনটা-বা ব্যবহারিক প্রয়োজনে, কোনোটা-বা আত্মিক তাগিদে নিজের চেষ্টায় শিখেছিলেন। লিয়েবেদেফের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময় কলকাতায় অতিবাহিত দশ বৎসর এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী ষোল বৎসর (১৮০১-১৮১৭)। কলকাতাতে তাঁর পেশা ছিল সংগীত, মাদ্রাজেও তাই। মাদ্রাজে তিনি তামিল ভাষা শিখেছিলেন। আর কলকাতায় এসে শেখেন সংস্কৃত, হিন্দুস্তানি ও বাংলা। সংগীত-চর্চা থেকে তাঁর অভিনিবেশ ক্রমশ ভাষা ও সংস্কৃতি-চর্চার দিকে যায়। পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের কাছে বাংলা শিখেছিলেন। পরে ইংরেজি থেকে দুটি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন: 'দ্য ডিসগাইজ' ও 'লভ্ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর'। অনুবাদের পর গোলকনাথ দাসের পরামর্শে ও সহায়তায় তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রী জোগাড় করে তাঁদের তালিম দিতে থাকেন যাতে তা মঞ্চস্থ করা যেতে পারে। অভিনয়ের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে তৎকালীন কলকাতায় একমাত্র যে থিয়েটার ছিল তা ভাড়া নিতে যান। কিন্তু থিয়েটারের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তা ভাড়া দিতে অসম্মতি জানান। তখন লিয়েবেদেফ ২৫ নম্বর ডোমটোলায় জনৈক জগন্নাথ গাঙ্গুলির বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানেই নিজের খরচে তাঁর 'দ্য বেঙ্গলি থিয়েটার' স্থাপন করেন। গেরাসিম্ লিয়েবেদেফকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক বলা হয়, তার কারণ তিনিই প্রথম এদেশে বাঙালি দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য মঞ্চে অভিনয় করান। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন ইংরেজদের থিয়েটারে কেবল ইংরেজি নাটক অভিনীত হতো এবং বাঙালি দর্শকদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। লিয়েবেদেফ তাঁর নবনির্মিত দ্বিতল প্রেক্ষাগৃহ 'বেঙ্গলী থিয়েটারে' 'দ্য ডিসগাইজ' নাটকের স্বকৃত বঙ্গানুবাদ 'সংবদল্য' মঞ্চস্থ করেছিলেন। এরপর ইংরেজদের চক্রান্তে তাঁর মঞ্চগৃহ ভস্মীভূত হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলায় তাঁকে যুক্ত করে হাজতবাস পর্যন্ত করানো হয়। প্রমাণ না থাকলেও ইংরেজরা তাঁকে রুশ গুপ্তচর বলে সন্দেহ করেছিল। লিয়েবেদেফ অবশেষে এদেশ ত্যাগ করেন। ১৮০১-এ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে তিনি সাংকৃৎ পিতের্বুর্গে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। বাংলা হরফসম্বলিত ছাপাখানা এটিই প্রথম। সেখান থেকে ১৮০৫-এ তাঁর রুশগ্রন্থ বেরোয়: 'পূর্বে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের জীবনধারা, তাঁদের পবিত্র ধর্মাচার ও প্রচলিত রীতিনীতির পক্ষপাতশূন্য পর্যবেক্ষণ'। ১৮০২-এ তাঁকে বাৎসরিক ১৮০০ রুবল বেতনে পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রশাসনিক দপ্তরে ('কলেগিয়া') এশিয়া ডেস্কে চাকরি দেওয়া হয়। এখানেই তিনি আমৃত্যু কর্মরত ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল অনুবাদকের। ১৮১৭-র ১ জানুয়ারি সম্রাট তাঁকে 'সন্ত ভ্লাদিমির চতুর্থ শ্রেণি' খেতাব দ্বারা সম্মানিত করেন। রচনাবলি: Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects (১৮০১), বেসপ্রিসত্রাস্তনয়ে সজেৎ সানিয়ে সিস্‌তিয়েম্ ভাসতো চনই ইন্দিই ব্রামগিয়েনফ, সভিয়াশশিয়েন্নিখ অব্রয়াদফ ইখ ই ন্যারোদনিখ্ অবিচায়েয (১৮০৫)। তাঁর অনূদিত নাটকের মোট দুটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। কয়ক বছর পূর্বে তার একটি কলকাতা থেকে পুস্তকাকারে ও অন্যটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পাণ্ডুলিপি' গবেষণাপত্রে মুদ্রিত হয়ে বেরিয়েছে। মৃত্যু. সাংকৎ পিতের্বুর্গ, রাশিয়া, ১৫ জুলাই ১৮১৭।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯৫-১৯৮১)॥ জন্ম. লোনসিং গ্রাম, শরীয়তপুর, ১৮৯৫। প্রকৃতি বিজ্ঞানী। পিতা অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য, মাতা শশিমুখী দেবী। বাল্যকালে পিতাকে হারিয়ে যজন-যাজনের আয় দিয়ে জীবিকা নির্বাহ। লোনসিং হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স

পাস (১৯১৩)। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন



কলেজে এফ.এ. ক্লাসে ভর্তি। দারিদ্র্যের জন্য দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে কলেজের পাঠ ত্যাগ করে গ্রামের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। প্রথমে স্থানীয় পণ্ডিতসার স্কুলে ও পরে লোনসিং স্কুলে শিক্ষকতা (১৯১৫-১৯১৯)। এ সময়ে বনে-বাদাড়ে ও ঝোপঝাড়ে ঘুরে ঘুরে কীট-পতঙ্গের জীবন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন। এরপর বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের কাশীপুরস্থ (কলকাতা) পাটকলের টেলিফোন অপারেটরের চাকরিগ্রহণ (১৯১৯)। বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের মাধ্যমে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে পরিচয়। প্রকৃত বিজ্ঞানের ওপর গোপালচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে আচার্য বসু তাঁকে তাঁর 'বসুবিজ্ঞান মন্দিরের' সহকারী গবেষক পদে নিয়োগ করেন। (১৯২১)। ১৯৬৫ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন। একজন বিশিষ্ট প্রকৃতি বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কীট-পতঙ্গের (পিঁপড়ে, মাকড়সা, চামচিকা, টিকটিকি, আরশোলা কাকড়া, বিছা, শুয়োপোকা, ব্যাঙাচি, প্রজাপতি) জীবনযাত্রা প্রণালী, তাদের আচার-আচরণ, ক্রীড়া-কৌতুক, প্রজনন প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণায় মৌলিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। গোপালচন্দ্রের রচনা বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণায়ও দক্ষতা প্রদর্শন। তিন দশকের অধিককাল যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' (১৯৪৮)-এর মুখপাত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' (১৯৪৮) পত্রিকা সম্পাদনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'বাংলার মাকড়সা' (১৯৪৯), 'করে দেখ' (১ম খণ্ড-১৯৫৩, ২য় খণ্ড-১৯৫৬), 'মহাশূন্যে অভিযান' (১৯৫৮), 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু' (১৯৭৬), 'বাঙলার কীট-পতঙ্গ' (১৯৭৫), 'মনে পড়ে' (আত্মজীবনী, ১৯৭৭), 'পশুপাখি কীট-পতঙ্গ' (১৯৮২), 'বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার' (১৯৮৪?), 'বাঙালার গাছপালা' (১৯৮৬), 'বিজ্ঞান অমনিবাস' (১৯৮৭), 'আধুনিক আবিষ্কার', 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা খবর', 'বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংবাদ', 'মানব কল্যাণে পারমাণবিক শক্তি', 'আণবিক, বোমা' (অনুবাদ), 'মহাশূন্যে অভিযান' ও 'জীববিজ্ঞান' (পাঠ্যপুস্তক)। আনন্দ পুরস্কার (১৯৬৮), বাঙালার কীট-পতঙ্গ গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার (১৯৭৫), আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতিফলক (১৯৭৪) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এসসি. ডিগ্রি (১৯৮১) লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ৮ এপ্রিল ১৯৮১।

গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩)॥ জন্ম.



বিদগাঁও গ্রাম, মুন্সীগঞ্জ। ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২। সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। নোয়াখালী আদালতের আইনজীবী সীতানাথ হালদার তাঁর পিতা। নোয়াখালী স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস (১৯১৮)। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ. ডিগ্রি লাভ। ইংরেজিতে অনার্সে প্রথম শ্রেণি অর্জন (১৯২২)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯২৪)। বি.এল. পাস (১৯২৫) করে কলকাতা থেকে নোয়াখালী প্রত্যাবর্তন ও নোয়াখালী আদালতে কিছুদিন আইন ব্যবসায়। নোয়াখালী ছেড়ে কলকাতায় এসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় চাকরি গ্রহণ (১৯২৬)। একই সময়ে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'ওয়েলফেয়ার' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। পূর্ববাংলার উপভাষা সম্পর্কে গবেষণা (১৯২৬-১৯২৮)। ফেনী কলেজে অধ্যাপনা (১৯২৯-১৯৩০)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগে গবেষণা-সহকারী (১৯৩০-১৯৩২)। ব্রিটিশ-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় ১৯৩২-এ গ্রেফতার। পাঁচ বছর দশ মাস কারাভোগের পর ১৯৩৭-এ মুক্তিলাভ। এরপর কংগ্রেসের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা সম্পাদনায় সহযোগিতা প্রদান। ১৯৪০-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। কৃষকসভার সভাপতির পদ গ্রহণ। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক (১৯৪০-১৯৪২)। 'পরিচয়' সম্পাদনা (১৯৪৪-১৯৪৮, ১৯৫২-১৯৬৭)। নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরূপে ১৯৪৯-এ

কারাবাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য (১৯৫২-১৯৫৮) ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য (১৯৫৪-১৯৬৮)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (১৯৭১) প্রতি সমর্থনজ্ঞাপন ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান। বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে খ্যাত। তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস– 'একদা' (১৯৩৯), 'অন্যদিন' (১৯৫০) ও 'আর একদিন' (১৯৫০) বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস। এতে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের পটভূমিকা নায়কের জীবনজিজ্ঞাসা রূপায়ণে দক্ষতা প্রদর্শন। বামপন্থি ভাবুক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪২), 'বাঙালি সংস্কৃতির রূপ' (১৯৪৭), 'বাঙালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' (১৯৫৬), 'বাঙলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি' (১৯৫৬), 'বাঙালির আশা ও বাঙালির ভাষা' (১৯৭২) প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থে তাঁর ব্যাপক অধ্যয়ন, গভীর চিন্তন, অগাধ মনীষা ও অসাধারণ রচনাকুশলতার পরিচয় মেলে। তাঁর শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থ 'সংস্কৃতির রূপান্তর' দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে লেখা মানব সংস্কৃতির বিকাশের এক অভিজ্ঞান। 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা'য় (১ম খণ্ড-১৯৫৭ ও ২য় খণ্ড-১৯৬৮) নবমূল্যায়নে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস উপস্থাপন। 'ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা' (১৯৬১) ও 'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা' (১৯৬৬) গ্রন্থে ইংরেজি ও রুশ সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান। 'রূপনারায়ণের কূলে' (প্রথম খণ্ড-১৯৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৭৯) তাঁর চিত্তাকর্ষক আত্মজীবনী। মৃত্যু. কলকাতা, ৩ অক্টোবর ১৯৯৩।

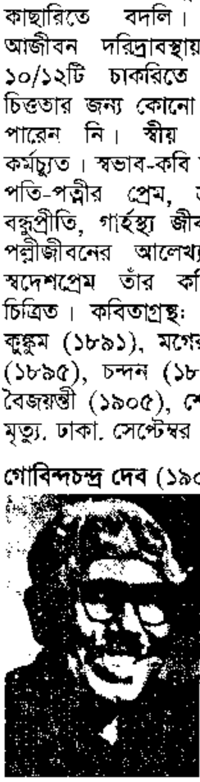
গোপীনাথ সাহা (১৯০৬-১৯২৪)॥ জন্ম. শ্রীরামপুর, হুগলী, ১৯০৬। বিপ্লবী। বাল্যে শ্রীরামপুরে শিক্ষালাভ। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) অনুপ্রাণিত হয়ে স্কুল ত্যাগ। পরে হুগলী বিদ্যামন্দির, কলকাতার সরস্বতী লাইব্রেরি ও প্রেস, দৌলতপুর সত্যাশ্রম, বরিশাল শঙ্কর মঠ, উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে এসে বিপ্লব সংঘটনের কাজে আত্মনিয়োগ। বিপ্লবীদের নির্দেশে কলকাতার তৎকালীন অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে ১২ জানুয়ারি ১৯২৪ তারিখে চৌরঙ্গী অঞ্চলে টেগার্ট ভ্রমে কিলবার্ন কোম্পানির ডে সাহেবকে গুলি করে হত্যা করেন। গ্রেপ্তার হওয়ার পর আত্মপক্ষ সমর্থনে সম্মত না হয়ে স্বীকার করেন টেগার্টকে হত্যা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বিচারে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ। মৃত্যু. ১ মার্চ ১৯২৪।

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮)॥ জন্ম. জয়দেবপুর, ভাওয়াল-গাজীপুর, ৪ মাঘ ১২৬১। (জানুয়ারি ১৮৫৫)। কবি। এক দরিদ্র কায়স্থ পরিবারে জন্ম। পাঁচ বছর বয়সে পিতা রামনাথ দাসের পরলোক গমন। ভাওয়াল-রাজ কালীনারায়ণ রায়ের অন্নে ও অনুগ্রহে লালিত-পালিত ও শিক্ষা প্রাপ্ত। জয়দেবপুর মাইনর স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাস করে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি। শব ব্যবচ্ছেদের ভয়ে চিকিৎসাবিদ্যালয় পরিত্যাগ। ভাওয়ালের কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি নিযুক্ত। জনৈক প্রজাপীড়ক কর্মচারীকে ভাওয়াল-রাজ কর্তৃক কঠোর দণ্ড প্রদান না করার প্রতিবাদে চাকরি ত্যাগ (১৮৭৭)। কাজের সন্ধানে ময়মনসিংহে আগমন। সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের জমিদার মহারাজ কমলকৃষ্ণ সিংহের খাজাঞ্চি পদে নিযুক্তি লাভ (১৮৭৯)। পরের বছর মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজ কেশবচন্দ্র আচার্য চৌধুরীর কার্যকারক নিযুক্ত (১৮৮০)। ১৮৮২-তে ময়মনসিংহ প্রবেশিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে যোগদান। স্কুলটি উঠে গেলে ময়মনসিংহ সাহিত্য সমিতির অধ্যক্ষ নিযুক্ত ১৮৮৪-তে শেরপুরে 'চারুবার্তা' পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ। ১৮৮৬-তে শেরপুরের জমিদার হরচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্তৃক তাঁর জমিদারির কৃষি বিভাগের ইন্সপেক্টর নিযুক্ত। ১৮৮৮-তে হরচন্দ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারি পদে যোগদান। কলকাতার সাপ্তাহিক 'নবযুগ' পত্রিকায় ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় (কালীনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর ইনি রাজা হন) ও রাজমন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষের অনেক অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৮৯২)। ওই প্রবন্ধ গোবিন্দচন্দ্রের রচিত বলে কালীপ্রসন্ন ঘোষ রাজার কর্ণগোচর করেন। গোবিন্দচন্দ্রের বক্তব্য অনুসারে কথিত প্রবন্ধটির লেখক তিনি নন, অন্য



কেউ। কালীপ্রসন্ন ঘোষের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে রাজা তাঁকে জয়দেবপুর থেকে নির্বাসন দেন। (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৮৯২)। গোবিন্দচন্দ্র জয়দেবপুর ত্যাগ করে কর্মস্থল শেরপুর চলে যান। তিনি 'মগের মুলুক' (১৮৯২) নামে একখানি ব্যঙ্গকাব্য রচনা করে তাকে তাঁর জন্মভূমি জয়দেবপুর থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করার প্রতিশোধ নেন। ভাওয়াল রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর উপর রাজার অমানুষিক পৈশাচিক কাহিনী এতে অগ্নিময়ী ভাষায় উপস্থাপিত। প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর প্রায় সাত বছর পর বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণগ্রাম নিবাসী মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা প্রেমদাসুন্দরীর পাণিগ্রহণ (১৮৯২) ব্রাহ্মণগ্রামে শ্বশুরালয়ে গৃহ নির্মাণ করে তথায় বাস। ১৮৯৫-এ কলকাতায় নব্য ভারত প্রেসের কার্যাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত। ১৮৯৬-এ মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী বাঁশহাটি কাছারির নায়েব নিযুক্ত। ১৮৯৮-এ বেগুনবাড়ি কাছারিতে বদলি। ১৯০২-এ কর্মত্যাগ। আজীবন দরিদ্রাবস্থায় দিন যাপন। জীবনে ১০/১২টি চাকরিতে নিয়োজিত। অব্যবস্থিত চিত্ততার জন্য কোনো চাকরিই দীর্ঘকাল করতে পারেন নি। স্বীয় ত্রুটির জন্য অনেকবার কর্মচ্যুত। স্বভাব-কবি হিসেবে খ্যাত। নারীভক্তি, পতি-পত্নীর প্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ, সন্তানবাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি, গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী, পল্লীজীবনের আলেখ্য, জাতীয় উদ্দীপনা ও স্বদেশপ্রেম তাঁর কবিতায় নিরাভরণ ভাষায় চিত্রিত। কবিতাগ্রন্থঃ প্রেম ও ফুল (১৮৮৭), কুঙ্কুম (১৮৯১), মগের মুলুক (১৮৯২), কস্তুরী (১৮৯৫), চন্দন (১৮৯৬), ফুলরেণু (১৮৯৬), বৈজয়ন্তী (১৯০৫), শোক ও সান্ত্বনা (১৯০৯)। মৃত্যু. ঢাকা. সেপ্টেম্বর ১৯১৮।

গোবিন্দচন্দ্র দেব (১৯০৭-১৯৭১)॥ জন্ম. লাউতা



গ্রাম, সিলেট, ১৯০৭। দার্শনিক, শিক্ষাবিদ। ১৯২৫-এ সিলেটের বিয়ানীবাজার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স, ১৯২৭-এ কলকাতার রিপন (পরে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজ থেকে এফ.এ. ১৯২৯-এ সংস্কৃত কলেজ থেকে দর্শনে অনার্সসহ বি.এ. এবং ১৯৩১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. (দর্শন) পাস। ১৯৪৪-এ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Reason. Intution and Reality শিরোনামে অভিসন্দর্ভ দাখিল করে ডক্টরেট উপাধিলাভ। এম.এ. পাস করার পর কিছুকাল ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের উপর গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন বোম্বাই-এর অমলনারে অবস্থিত রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। সেখান থেকে ফিরে কলকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনা শুরু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) শুরু হওয়ার পর ঐ কলেজ কলকাতা থেকে দিনাজপুর স্থানান্তরিত হলে অধ্যাপক হিসেবে দিনাজপুরে আগমন। ১৯৪৫-এ ঐ কলেজ আবার কলকাতায় স্থানান্তরিত হলে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দিনাজপুরে নতুনভাবে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ প্রতিষ্ঠা। এ কলেজের অধ্যক্ষরূপে কয়েক বছর কাজ করার পর ১৯৫৩-র জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যাপনায় যোগদান। ১৯৫৭-তে ঢাকা হলের হাউস টিউটর নিযুক্ত। এরপর জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট এবং ১৯৬৩-তে দর্শন বিভাগে অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত। এ-বিভাগের অধ্যাপক (প্রফেসর) হন ১৯৬৭-তে। এরপরই ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া প্রদেশের উইলক্সবার কলেজে গমন। এক বৎসর সেখানে অবস্থানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন। ১৯৭০-এর অক্টোবরে আবার চলে যান উইলক্সবারে। ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে সেখানে অবস্থানের সময়ে তাঁর প্রচারিত সমন্বয়ী ও মানবতাবাদী দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর গুণগ্রাহীগণ কর্তৃক তাঁর স্মরণে 'দ্য গোবিন্দদেব ফাউন্ডেশন ফর ওয়ালর্ড ব্রাদারহুড' নামক প্রতিষ্ঠান গঠন। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকা থেকে ফিরে আবার অধ্যক্ষ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে যোগদান। ১৯৬৪-তে তাঁরই আপ্রাণ চেষ্টার ফলে ও অর্থানুকূল্যে ঢাকায় দর্শনের চর্চা ও প্রচারার্থে 'দর্শন ভবন' স্থাপিত। ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি। তদানীন্তন পাকিস্তান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেসের সম্পাদক হিসেবেও বহুকাল দায়িত্ব পালন। তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা-সংস্কার কমিশনের সদস্য মনোনীত। বাংলা একাডেমীর কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য। যুক্তরাজ্যের 'দি ইউনিয়ন অব দ্য স্টাডি অব গ্রেড

রিলিজিন্‌স্‌' এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফিলসফি অব সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন'-এর সভ্য। তাঁর ডক্টরেট থিসিস Idealism and Progress নামে ১৯৫২-তে কলকাতা থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। অন্যান্য গ্রন্থ Idealism: A New Defense and a New Application (১৯৫৮), Aspiration of the Common Man (১৯৬৩), The Philosophy of Vivekananda and Future of the Man (১৯৬৩), আমার জীবনদর্শন (১৯৬৭), তত্ত্ববিদ্যাসার (১৯৬৬), এবং Buddha the Humanist (১৯৬৯)। এ ছাড়া তাঁর বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ছিলেন সুদক্ষ। ডক্টর দেব বিশিষ্ট দার্শনিক হিসেবে দেশে বিদেশে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ভাববাদ, ধর্ম, বিজ্ঞান, যুক্তি প্রভৃতিকে একটি অখণ্ডরূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এই সমন্বয়বোধই তাঁর দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৯৭১-এ মার্চ মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ঢাকার রাজপথে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মিছিলে নেমে সেই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা। মৃত্যু. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী-কর্তৃক নিহত, ২৫ মার্চ ১৯৭১।

গোবিন্দদাস (১৫৩৪-১৬১৩)॥ জন্ম. তেলিয়াবুধুরী গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, আনুমানিক ১৫৩৪। চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবীয় পদকর্তা। পিতার নাম চিরঞ্জীব কবিরাজ, মাতা সুনন্দা। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগের ফলে শ্রীখণ্ডে পণ্ডিত ও অর্থশালী মাতামহ দামোদর দাসের আবাসে চলে যান। সংস্কৃতশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন। প্রথম শ্রীখণ্ডে, পরে বুধুরী গ্রামে বাস। জীবনের প্রথম পাদে শক্তি-উপাসক ছিলেন; চল্লিশ বছর বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ। গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ, মাথুর ও অভিসারের পদ রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন। ভক্তিপ্রাণতায়, চিত্রধর্মিতায়, অনুভূতির গভীরতায়, নাটকীয়তায় ও ছন্দোময়তায় তাঁর বৈষ্ণব পদাবলী ঋদ্ধ। বিদ্যাপতির মত ব্রজবুলি ভাষায় অলঙ্কার সমৃদ্ধ পদ রচনা করায় তাঁকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয়ে থাকে। তাঁর ভক্তি-রসাপ্লুত পদাবলীতে মুগ্ধ হয়ে জীব গোস্বামী তাঁকে 'কবীন্দ্র' উপাধি দেন। কবি হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরবর্তীকালে 'কবিরাজ' নামে আখ্যাত হন। মৃত্যু. আনুমানিক ১৬১৩।

গোলাম আম্বিয়া খান লোহানী (১৮৯২-১৯৩৮)॥



জন্ম. সিরাজগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর ১৮৯২। বিপ্লবী। সিরাজগঞ্জ থেকে প্রবেশিকা পাস করার পর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন। ১৯১০-এ উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন গমন। লন্ডন অবস্থান কালেই বিপ্লবী জীবনের শুরু। সেখানে শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সংস্পর্শ লাভ। ১৯১৭-তে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত। এ সময়ে মাসিক ১২ পাউন্ড বেতনে লন্ডনস্থ যুদ্ধবিরোধী (প্রথম মহাযুদ্ধ) সংগঠন ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সিভিল লিবারটিজ-এর প্রচারক হিসেবে কর্মরত। ১৯১৪-১৯২০ পর্যন্ত লন্ডনে অবস্থান। ১৯২১-এর মে মাসের শুরুতে ইউরোপে অবস্থানরত প্রবাসী বিপ্লবীদের বৈঠকে যোগদানের জন্য মস্কো গমন। ১৯১২-এর পর প্যারিসে অবস্থানকালে প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'দি মাসেস অব ইন্ডিয়া'র সম্পাদনা ও তা বিশেষভাবে ভারতে পাঠানোর কাজে নিযুক্ত। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত থাকার কারণে ফরাসি সরকার তাঁর প্যারিসে অবস্থানের অনুমতি প্রত্যাহার করে নিলে ১৯২৫-এর নভেম্বর মাসে মস্কো গমন। ১৯১৯-এ লেনিনের উদ্যোগে গঠিত 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' (কমিটান)-এ সক্রিয় ভূমিকা পালন। মস্কোস্থ 'কৃষক আন্তর্জাতিক' (পিজেন্টস্‌ ইন্টারন্যাশনাল)-এও কাজ করেন। এছাড়া বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য গঠিত সংগঠন 'মোপার' সঙ্গে যুক্ত। মস্কোর প্রাচ্য দেশীয় ইনস্টিটিউট-এ বাংলা ভাষার শিক্ষক। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের ওপরে ক্লাস নিয়েছেন। শ্রমিকদের জন্য 'মস্কো ওয়ার্কার্স ইউনিভার্সিটি' এবং 'কমিউনিস্ট ইউনিভার্সিটি অব দি ওয়াকিং পিপল অব ইস্ট'-এ শিক্ষকতা। মস্কো পাবলিশিং হাউস-এর সঙ্গে ও যুক্ত। ভারতবর্ষের অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক গতিধারার ওপর

অনেক তথ্যনির্ভর তাত্ত্বিক রচনা প্রকাশ। তাঁর রচিত বেশ কিছুসংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'কমিটার্নের' তাত্ত্বিক মুখপত্র 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' ও পাক্ষিক পত্রিকা 'ইমপ্রেবার'-এ। মৃত্যু. ১৯৩৮।

গোলাম মকসূদ হিলালী (১৯০০-১৯৬১)॥ জন্ম. ফুলবাড়ি, সিরাজগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর ১৯০০। শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। ১৯১৮-তে সিরাজগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৪-এ ফারসিতে এবং ১৯৩২-এ আরবিতে এম.এ. পাস। এবং যথাক্রমে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় এবং প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার ও স্বর্ণপদক লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯৪৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.ফিল. ডিগ্রি লাভ। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'ইরান ও ইসলাম: তাদের পারস্পরিক প্রভাব'। ১৯২৬-এ টাঙ্গাইলের করটিয়া কলেজে ফারসি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত। পাবনা জজ-কোর্টের দুই বছর আইন ব্যবসায় (১৯২৮-১৯৩০)। এ-পেশার সঙ্গে মানসিকতার সঙ্গতি না ঘটায় পুনরায় করটিয়া কলেজে অধ্যাপনার পেশায় যোগদান। ১৯৩৪-১৯৩৭-এ কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে, ১৯৩৭-১৯৩৯-এ চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে এবং ১৯৩৯-১৯৪০-এ পুনরায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা। ১৯৪০-১৯৪১ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুলসমূহের সহকারী পরিদর্শক (ডেপুটেশনে)। ১৯৪১-১৯৪৩ পর্যন্ত পুনরায় চট্টগ্রাম কলেজে এবং ১৯৪৩-১৯৫৬ পর্যন্ত রাজশাহী সরকারি কলেজে অধ্যাপনা এবং অধ্যাপক পদ লাভ। রাজশাহী কলেজে কর্মরত থাকাকালে বেশ কিছুকাল বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের কিউরেটর। ১৯৫৭-র ৩০ নভেম্বর সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। অবসর গ্রহণের পর ১৯৫৭-১৯৫৮ পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ। ১৯৫৯-এ বাংলা একাডেমীতে গবেষণাধ্যক্ষের পদে যোগদান। স্বাস্থ্যগত কারণে ঐ বছরই একাডেমির চাকরিতে ইস্তফা দান এবং পুনরায় সিরাজগঞ্জ কলেজে অধ্যক্ষের পদে যোগদান। বাংলা ও ইংরেজিসহ ১৮টি ভাষা জানতেন। জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানের প্রসারণ ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সংগীতানুরাগী, মানবতাবাদী, মুক্তবুদ্ধিচর্চার, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও নারীস্বাধীনতায় বিশ্বাসী গোলাম মকসূদ হিলালী ছিলেন একনিষ্ঠ ধার্মিক। ধর্মের গোঁড়ামি তাঁর মেধাকে অবরুদ্ধ করতে পারেনি। বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ইসলামি জীবন ও প্রজ্ঞার প্রসার সম্পর্কে তিনি নির্মোহভাবে গবেষণা করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: হালিদা হানুন (১৯৩৩), আলবেরুনী (১৯৩৭), A Mannual of Persian Grammar (ফারসি ভাষার ব্যাকরণ, ১৯৩৪), Asher-i-Tar-an-or-the Persian Verses of Rantaram Mukharji (অনুবাদ, ১৯৩৮), Islam's Attitude Towards Non-Muslims (ইসলামি আদর্শ সংবলিত, ১৯৫২), হজরতের জীবন-নীতি (ধর্মীয় দর্শন, ১৯৬৫) Perso-Arabic Elements in Bengali (অভিধান, ১৯৬৭), Iran & Islam: Their reciprocal Influence (অভিসন্দর্ভ, ১৯৬৩-তে এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান ঢাকা'র জার্নালে প্রকাশিত), হিলালী রচনাবলি (১ম খণ্ড, ১৮৮১)। মৃত্যু. সিরাজগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬১।



গোলাম মুস্তাফা (১৯৩৫-২০০৩)॥ জন্ম. দপদপিয়া, পিরোজপুর ২ মার্চ, ১৯৩৫। মঞ্চ, বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রাভিনেতা, লেখক ও আবৃত্তিকার। পিতা মোহাম্মদ ইসমাইল ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রারার। স্ত্রী হোসনে আরা বিজু এবং কন্যা সুবর্ণা মুস্তফা চলচ্চিত্র, মঞ্চ, বেতার ও টেলিভিশনের অভিনেত্রী। ১৯৫০-এ মেট্রিক, ১৯৫২-এ খুলনার দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজ থেকে আই.এ., ১৯৫৫-তে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে বিএ পাস। ১৯৫৫-এ কর্মজীবনের শুরু স্কুলের শিক্ষক হিসেবে। পরে 'মে এ্যান্ড বেকার' কোম্পানিতে কিছুদিন চাকরির পর হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরির শ্রম কল্যাণ অফিসার হন। ১৯৬০-এ এহতেশামের 'রাজধানীর বুকে' ছবিতে যুক্ত হওয়ার পর অভিনয়ই পেশা হয়ে দাঁড়ায়। অভিনয়, আবৃত্তি, ছবি আঁকা এবং গান গাওয়া



শুরু করেন কৈশোরেই। ১৯৪৫-এ 'টিপু সুলতান' এবং 'পল্লীমঙ্গল' নাটকে অভিনয় করে প্রশংসিত। ১৯৫৬-৫৭-এ বড় ভাই পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এ কে এম মুসার মাধ্যমে সরকারী প্রচারচিত্র 'ওয়ান এফর অব ল্যান্ড'-এ অভিনয় করেন। ছবিটি ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত। এহতেশাম পরিচালিত 'রাজধানীর বুকে' (১৯৬০) ছবিতে ভিলেন হিসেবে অভিনয় করে নির্মাতা-দর্শকদের নজর কাড়েন। নায়ক হিসেবে অভিনয় 'বন্ধন' (১৯৬৪), 'নাচঘর' (১৯৬৩), 'ফির মিলেঙ্গে হামদোনো' (১৯৬৬), 'বেগানা' (১৯৬৬), 'চাওয়া-পাওয়া' (১৯৬৭), ও 'সোনার খেলনা' (১৯৭৫) ছবিতে। তবে ভিলেন হিসেবে বাংলা ও উর্দু ছবিতে তাঁর অভিনয় অবিভক্ত পাকিস্তানের উভয় অংশে সমাদৃত। অভিনীত উল্লেখ্যযোগ্য আরো চলচ্চিত্র হলো 'চান্দা' (১৯৬২), 'হারানো দিন' (১৯৬১), 'কারওয়া' (১৯৬৪), 'নদী ও নারী' (১৯৬৫), 'কার বউ' (১৯৬৬), 'বলাকা মন' (১৯৭২), 'রক্তাক্ত বাংলা' (১৯৭৩), 'ধীরে বহে মেঘনা' (১৯৭৩), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩), 'শ্লোগান' (১৯৭৩), 'কে আসল কে নকল' (১৯৭৫), 'সূর্যগ্রহণ' (১৯৭৫), 'সূর্যকন্যা' (১৯৭৬), 'পিঞ্জর' (১৯৭৭), 'সারেং বউ' (১৯৭৭), 'ফকির মজনু শাহ' (১৯৭৮), 'সূর্য সংগ্রাম' (১৯৭৮), 'সখি তুমি কার', 'এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী' (১৯৮০), 'আনার কলি' (১৯৮০), 'স্বামী', 'কলমীলতা' (১৯৮১), 'চন্দ্রনাথ' (১৯৮৪), 'শুভদা' (১৯৭৬), 'রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত' 'স্ত্রী' (১৯৮৮) প্রভৃতি। ১৯৬৯-৭১-এর গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ বিভিন্ন সংগঠন ও স্থানে আবৃত্তিকার হিসেবে, প্রশিক্ষক হিসেবে অবদান রাখেন। আবৃত্তির ক্যাসেটের মধ্যে রয়েছে 'গাহি সাম্যের গান' ও 'উদ্যান ও বিবিধ কুসুম' উল্লেখযোগ্য। বহু বেতার, টেলিভিশন ও মঞ্চ নাটকে অভিনয় করেছেন। তাঁর লেখা গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনেও যুক্ত। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত। মৃত্যু, ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩।

গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪)॥ জন্ম. মনোহরপুর গ্রাম, শৈলকুপা-ঝিনাইদহ, ১৮৯৭। সাহিত্যিক। ১৯১৮-তে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ পরে বি.টি. পাস। সরকারি স্কুলে শিক্ষক। ১৯৪৯-এ ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ।



পাকিস্তান আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর এর 'তাহযীব-তমদ্দুনের' প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন। শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলে তার প্রতি সমর্থন প্রদান। পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত ভাষা সংস্কার কমিটির (১৯৪৯) সচিব। এ পদে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাভাষার অনৈসলামিক অনুষঙ্গ দূর করায় বিষয়ে অত্যুৎসাহী মনোভাব প্রকাশ। কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য-কর্ম হিন্দু-পুরাণনির্ভর বিধায় তা পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শের বিরোধী এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা ইসলামের মূলভিত্তি একত্ববাদের ধারক ও বাহক বিধায় তা পাকিস্তানের জাতীয় চেতনার পরিপন্থী নয় এ যুক্তি প্রদর্শন করে নজরুল ইসলামকে বর্জনের ও রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ। গদ্য ও পদ্য উভয় শ্রেণির রচনাতেই পারদর্শিতা প্রদর্শন। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু প্রধানত ইসলাম ও প্রেম। কবিতার ভাষা সুললিত ও ছন্দ গতিশীল। পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রচুর ইসলামি সংগীত ও দেশাত্মবোধক গান রচনা। সুকণ্ঠগায়ক হিসেবেও খ্যাত। রক্তরাগ (১৯২৪), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্যকাহিনী (১৯৩২), সাহারা (১৯৩৬), হাস্নাহেনা (১৯৩৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯), তারানা-ই-পাকিস্তান (১৯৫৬), বনি আদম (১৯৫৮), গীতিসঞ্চয়ন (১৯৬৮) প্রভৃতি তাঁর কবিতাগ্রন্থ। গদ্যরচনার মধ্যে রসুলুল্লাহর জীবনীমূলক গ্রন্থ বিশ্বনবী (১৯৪২) বহুল সমাদৃত। ইসলাম ও জেহাদ (১৯৪৭), ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৪৬), আমার চিন্তাধারা (১৯৫২), পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তাঁর অন্যান্য গদ্যগ্রন্থ। ১৯৫২-তে যশোর সাহিত্য সঙ্ঘ কর্তৃক কাব্য সুধাকর ও ১৯৬০-এ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু. ঢাকা. ১৩ অক্টোবর ১৯৬৪।

গোলাম রহমান (১৯৩১-১৯৭২)॥ জন্ম. কলকাতা, ২৯ নভেম্বর ১৯৩১। শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক ১৯৪৭-এ কলকাতার মডার্ন স্কুল

থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯৪৯-এ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি। ১৯৫০-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুখে ঢাকা আগমন। জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু পড়াশোনা বেশি এগোয়নি। পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা গ্রহণ। শুরুতে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদ ও দৈনিক ইনসাফ-এ ছোটদের পাতা ও সাহিত্য সাময়িকী সম্পাদনার দায়িত্ব পালন। ১৯৬০-এ ঢাকা থেকে স্বীয় সম্পাদনায় 'মধুমালা' নামে ছোটদের জন্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। এক সময়ে পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক নির্বাচিত। ঢাকা থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রিকার সঙ্গে কখনো-না-কখনো যুক্ত ছিলেন। সাংবাদিকতা ছাড়া শেষের দিকে নানা ধরনের ব্যবসায়ও করেছেন। ছোটদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। এর মধ্যে রকম ফের, বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি, আজব দেশে এলিস, বুদ্ধির ঢেঁকি, পানুর পাঠশালা, চকমকি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড়দের জন্য রচিত গ্রন্থ: নেতা ও রানী, আমাদের বীর সংগ্রামী, জীবনের বিচিত্রা। চেনামুখ নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন। বাংলা একাডেমী থেকে চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 'গোলাম রহমান রচনাবলি'। ১৯৬৯-এ শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। ১৯৭২-এর ১১ জানুয়ারির মধ্যরাতের পর কয়েকজন তরুণ অবাঙালিদের ক্যাম্প পাহারা দেবার নাম করে তাঁকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায়। পরদিন ধোলাইখালের পাড় থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত্যু. ঢাকা, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২।

গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (১৮১৪-১৯২৪)॥ জন্ম. মাইজভাণ্ডারী গ্রাম, চট্টগ্রাম, ১২ অক্টোবর অক্টোবর ১৮১৪ (২৭ আশ্বিন ১২২১)। সুফিসাধক। পূর্ব পুরুষের আদিনিবাস বাগদাদ। সেখান থেকে তাঁদের দিল্লি ও গৌড় হয়ে চট্টগ্রাম আগমন। পনেরো বছর বয়সে মাদ্রাসায় ভর্তি। দুই বছর স্থানীয় পাঁচলাইশ মাদ্রাসায়, তিন বছর ফটিকছড়ি মাদ্রাসায় এবং পাঁচ বছর চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ। পঁচিশ বছর বয়সে মাদ্রাসা ত্যাগ করে স্রষ্টার আরাধনায় নিমগ্ন। পিতৃব্য শাহ আহমদউল্লাহ তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু। আটাশ বছর বয়সে গুরুর নিকট থেকে খেলাফত লাভ। গৃহত্যাগ। বার বছরকাল বিভিন্নস্থান পরিভ্রমণ। গুরুর মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর বয়সে গদ্দিতে আসীন। হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিপুল সংখ্যক লোক কর্তৃক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ। তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত। তাঁর জীবন ও ধর্মীয় আদর্শকে আশ্রয় করে শিষ্যগণ কর্তৃক অসংখ্য আধ্যাত্মিক সংগীত রচনা। এগুলো মাইজভাণ্ডারী সংগীত নামে পরিচিত। প্রতি বছর (২৭ আশ্বিন) অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি জন্ম তারিখে এবং (২২ চৈত্র) এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে মৃত্যুদিনে তাঁর মাজারশরিফ মাইজভাণ্ডারে 'উরস' অনুষ্ঠিত হয়। গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী নামে খ্যাত। মৃত্যু. ৪ এপ্রিল ১৯২৪ (২ চৈত্র ১৩৩০)।

গোলাম সামদানী কোরায়শী (১৯২৯-১৯৯১)॥



জন্ম. কাউরাট গ্রাম, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা, ৫ এপ্রিল ১৯২৯। পূর্বপুরুষের বাস ময়মনসিংহ গৌরীপুরের বীর আহাম্মদপুর গ্রাম। বাবা মৌলভী বাবু শেখ আবু আছল মোহাম্মদ আবদুল করিম কোরায়শী। মা আলতাফুন্নেসা। ময়মনসিংহ কাতলাসেন থেকে ১৯৫০-এ আলিম ১ম শ্রেণিতে ৮ম স্থান অর্জন। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৫২-এ জামাতে উলা (ফাজেল) ১ম শ্রেণিতে ৩য় স্থান ও ১৯৫৪-এ এম.এ. (কামিল) ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান। ১৯৫৬-এ নাসিরাবাদ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (ময়মনসিংহ) থেকে আই.আই.-তে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯-এ বাংলায় বি.এ. (অনার্স) ও ১৯৬০-এ এম.এ. ডিগ্রি লাভ। কর্মজীবনে ধানীখোলা বাজার, ঈদগাহ্ মাঠ মসজিদের ইমাম এবং ১৯৫৫-এ ধানীখোলা হাই মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন। বাংলা একাডেমীতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকল্পে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার সম্পাদনা সহকারী হিসেবে (১৯৬১-৬৮) যোগদান। ময়মনসিংহ নাসিরাবাদ কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে (১৯৬৮-৯১) দায়িত্ব পালন। সাপ্তাহিক ময়মনসিংহ বার্তা সম্পাদনা। বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ময়মনসিংহ সাহিত্য পরিষদ, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (১৯৮৪-৯১) ময়মনসিংহ শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব

পালন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যও নির্বাচিত হন প্রবন্ধগ্রন্থ: আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সাহিত্য ও ঐতিহ্য, ইসলাম ও আমেরিকা, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম, আসামির কাঠগড়ায়; পিতৃভাষা, ঐতিহ্য অন্বেষা। জীবনী: ছোটদের দুদুমিয়া, ছোটদের বঙ্গবন্ধু (১৯৯০)। যখন একাকী, দিনলিপি, সিন্ধুর এক বিন্দু, শিক্ষা ও কর্ম জীবন, দুই খণ্ড (১৯৮৩-৯০)। গল্প-সংকলন: শ্রীগোলের আত্মকাহিনী প্রথম গদ্য রচনা (১৯৪৩), লেখার দোকান, কালকেতু উপাখ্যান প্রভৃতি। নাটক: টুপিচোর, আমাদের দেশ, গাধার কলজে, সাতটি নক্‌শা, সাপের ছোবল, উটের মাংস। ছড়া: গোবদা সাধুর কোর্তা, ওলোট পালট, আগডুম বাগডুম। অনুবাদ: কালিলা ও দিমনা (১৯৬৫), হেজাজের সওগাত, মুঝে ভি শেকায়েত নেহী (১৯৬৫), আল-মুকাদ্দিমা (দুই খণ্ড, ১৯৮১-৮২), তারিখ-ই-ফিরোজশাহী (১৯৮২), তোহ্ফা, ফতেহাবাদের আউলিয়া কাহিনী, অশাস্ত্রীয় পুরাণ, শব্দার্শ অধ্যায়ন, আমার অভিযোগ। সম্পাদনা: পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকল্প, পদ্মাবতী, তোহফা, আওয়াল। মৃত্যু. ময়মনসিংহ, ১১ অক্টোবর, ১৯৯১।

গৌড়ীয় শঙ্কর (জীবনকাল ষোড়শ শতকের শেষভাগ এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগ)॥ তাঁর প্রকৃত নাম সম্ভবত শঙ্কর আগমাচার্য। 'তারারহস্যবৃত্তি' তাঁর রচিত তন্ত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি সাধারণভাবে এবং উপাসনার উপযোগী আচারাদি বিশেষ আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া শিববচনমহারত্ন, শৈবরত্ন, কুলমূলাবতার, ক্রমস্তব তাঁর রচিত গ্রন্থ। তারারহস্যবৃত্তি ১৬৩০-এ রচিত। এ গ্রন্থের রচনাকালের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে, ষোড়শ শতকের শেষভাগ এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যবর্তীকালেই শঙ্করের জীবনকাল।

গৌরচন্দ্র বালা (১৯২৩-২০০৫)॥ জন্ম. উল্লাবাড়ি গ্রাম, কদমবাড়ী, রাজৈর, মাদারীপুর, আগস্ট, ১৯২৩। আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী। পিতা রাজমোহন বালা, মাতা নারায়ণী বালা। জলিরপাড় পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা। খালিয়া রাজারাম ইনস্টিটিউট থেকে মেট্রিক (১৯৪৩), খুলনার দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১৯৪৫), কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৪৭) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. (বাংলা) পাস (১৯৪৯)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি. ডিগ্রি লাভ



(১৯৬১)। ১৯৪৯-এ কলকাতায় পোস্টাল বিভাগে চাকরি। ১৯৫২-এর ২৯ জুন গোপালগঞ্জ জেলার পাটিকেলবাড়ীর অঞ্জলি বালার সঙ্গে বিয়ে। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের শরিক দল তফশিলী ফেডারেশনের প্রার্থী হিসেবে মাদারীপুর মহকুমা ও ভাঙ্গা থানা এলাকা থেকে গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৫-এ পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হিসেবে সংবিধান প্রণ নে ভূমিকা পালন। ১৯৫৬-এ প্রথমে বনমন্ত্রী ও পরে খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত আইউব-বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন। ছয় দফার পক্ষে বঙ্গবন্ধুর সহযোগী হিসেবে জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ। ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মনোনয়ন বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম বেসরকারি জোনের কার্যকরি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন। ভারতে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী শহর বনগাঁওতে অবস্থান করে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহযোগিতা দান। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ও ১৯৭৩-এ আওয়ামী লীগের নমিনেশন বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। উল্লাবাড়ী গ্রামে একটি প্রাথমিক ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। তিনি ফরিদপুর জজ কোর্ট, ঢাকা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট বার কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ফরিদপুর সৎকার সমিতির সভাপতি। মৃত্যু. ফরিদপুর, ১৮ জুন ২০০৫।

গৌরদাস বসাক (১৮২৬-১৮৯৯)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৮২৬। সমাজ সংস্কারক, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী। হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট ছাত্র। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং উনিশ শতকে কলকাতার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম কৃতিপুরুষ। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে দায়িত্ব পালন। বালেশ্বর, মালদহ, বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা।

'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় এ-সকল মূল্যবান



প্রবন্ধাদি প্রকাশিত। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন দান। বেলগাছিয়ার প্রথম বাংলানাট্যশালায় অভিনীত 'রত্নাবলী'র অভিনয়ে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, বিলেতের ফিলসফিক্যাল সোসাইটি, বুদ্ধিস্ট টেক্সট সোসাইটি এবং বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। এশিয়াটিক সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারিরূপে কিছুকাল কর্মরত। ১৮৪৭-এর ৩১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সভা 'পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটি'র সভাপতি। ডিস্ট্রিক চ্যারিটেবল সোসাইটি ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশনের সদস্য। বরাহনগরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন। অবসর গ্রহণের পর কলকাতার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও জে.পি.ও.। মৃত্যু. ১৮৯৯।

গৌরপদ সরকার (১৯০১-১৯৯৫)॥ জন্ম.



কাইনমারী, মোংলা, বাগেরহাট, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০১। কবিয়াল, সমাজসেবী। মা ফুলমতি সরকার গায়িকা হিসেবে এলাকায় পরিচিত। বাবা সনাতন সরকার ছিলেন কৃষক। দারিদ্র্যের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-বঞ্চিত। শিশু বয়সে আত্মীয় বাড়িতে রাখাল হিসেবে কাজের সামান্য অবসরে নিজের উদ্যোগে শিক্ষাচর্চা শুরু। প্রথম থেকেই কবিতা, বিশেষ করে অন্ত্যমিলের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ। কিশোর বয়স থেকে ছড়া, পদ-পাঁচালি রচনা শুরু। কবিয়াল পূর্ণানন্দ সরকারের কাছে কবিতাচর্চার তালিম নেন। পরে ফরিদপুরের কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কাছে শাস্ত্র-পুরাণাদি অধ্যয়ন করে ব্যুৎপত্তি অর্জন। ১৯৪৪-এ বঙ্গ-আসাম আর্য প্রতিনিধি সভার সত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন বিভাগে ভর্তি এবং 'সিদ্ধান্ত বিশারদ' উপাধি রচিত গান সাতশ'র অধিক গান। যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল এলাকায় কবিগান পরিবেশন। ধুয়া-পাঁচালিতে শব্দ-পদের অভিনবত্ব ছিল। ১৯৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নোয়াখালিতে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ। লক্ষ্মীপুর জেলায় অবস্থান করে ছয় মাস দাঙ্গাপীড়িতদের সেবাদান। এ সময় লাশের স্তূপ থেকে অপ্রকৃতিস্থ একটি কন্যাশিশু উদ্ধার ও আশ্রয় দান। ১৯৪৭-এ ধর্মপ্রচারক হিসেবে বাগেরহাট শহর এবং উত্তরবঙ্গে দায়িত্ব পালন। কিছুদিন পর বাড়ি ফিরে নতুন করে কবিগান পরিবেশনা ও রচনায় মনোনিবেশ। কাইনমারী গ্রামে গেড়াটানা পাঠশালা স্থাপন। কবিগানের মাধ্যমে বিধবা-বিবাহের পক্ষে ও ভ্রূণহত্যার বিরুদ্ধে জনমত গঠন। ১৯৪৮-এ একই গ্রামের নটবর মণ্ডলের কন্যা ছায়ারানীর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৬৪-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সপরিবার ভারতের ছত্তিশগড়ের টংক জেলায় আশ্রয়লাভ। ১৯৭১-এ স্বাধীনতালাভের পর দেশে ফেরার উদ্যোগ নিলেও ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে তা হয়ে ওঠেনি। মৃত্যু. টংক, ছত্তিশগড়, ভারত, ২৮ নভেম্বর ১৯৯৫।

ঘনরাম চক্রবর্তী (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ)॥ জন্ম. কৃষ্ণপুর, বর্ধমান। ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। স্থানীয় রামবাটি গ্রামের ভট্টাচার্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন। ছাত্র থাকাকালীন কাব্যশক্তির স্ফুরণ ঘটায় গুরুর কাছ থেকে 'কবিরত্ন' উপাধি লাভ। বর্ধমানের তৎকালীন মহারাজ কীর্তিচন্দ্র-কর্তৃক রাজ কবির সম্মান প্রদান। রাজার আদেশে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা। ১৭১১-তে কাব্যরচনা সমাপ্ত। গায়ক কবি হিসেবেও সুনাম অর্জন। 'সত্যনারায়ণ রসসিন্ধু' নামক একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান-মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দু পৌরাণিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বাংলার লোকঐতিহ্যের সমন্বয় সাধন। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কাহিনীর নায়ক লাউসেন। ধর্মঠাকুরের পূজা মর্ত্যলোকে প্রচার করার জন্য কর্ণসেনের ঔরসে মানবরূপে তাঁর আবির্ভাব।

চণ্ডীচরণ মুনশী (১৭৬০-১৮০৮)॥ জন্ম. ১৭৬০। ফোর্টউইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। ১৮০৫-এ তৎকর্তৃক কাদির বখ্স রচিত ফারসি গ্রন্থ 'তুতীনামা'র বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থটি 'তোতা ইতিহাস' নামে প্রথমে শ্রীরামপুর মিশনারি প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পরে ১৮২৫-এ

লন্ডন থেকে পুনর্মুদ্রিত। তিনি ভগবদ্গীতার অনুবাদক। মৃত্যু. ২৬ নভেম্বর ১৮০৮।

চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬)॥ জন্ম. বাসণ্ডা, বাখরগঞ্জ, ১৮৪৫। আইনজীবী ও সাহিত্যিক। ১৮৬৩-তে বরিশাল সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাস। কিছুকাল কলকাতার ফ্রিচার্চ ইনস্টিটিউশনে (ডাফ কলেজ) অধ্যয়ন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বরিশালে আইন ব্যবসায় শুরু। রামতনু লাহিড়ী, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতার সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৮৭০-এ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। কর্মজীবনে প্রথমে ওকালতি, পরে মুন্সেফ ও সাব-জজ পদে দায়িত্ব পালন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে খ্যাতি। মহারাজ নন্দকুমার (১৮৮৫), দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৮৮৬), অযোধ্যার বেগম (১৮৮৬), ঝাঁসীর রানী (১৮৮৮) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। মহারাজ নন্দকুমার গ্রন্থের জন্য তৎকালীন সরকার-কর্তৃক দণ্ডিত। জীবনগীতি নির্ণয় ও লঙ্কাকাণ্ড নামক দুটি কাব্যেরও রচয়িতা। 'আঙ্কল টমস্ ক্যাবিন'-এর বঙ্গানুবাদ 'টমকাকার কুটীর' (১৮৮৫) তাঁর আর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মৃত্যু. ১০ জুন ১৯০৬।



চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (১৮৩৬-১৯১০)॥ জন্ম. শেরপুর গ্রাম, শেরপুর। ৩ নভেম্বর ১৮৩৬। সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক, গবেষক ও পণ্ডিত। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের পাঠশালায়। খ্যাতনামা পণ্ডিত রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট ব্যাকরণপাঠ। বঙ্গদেশে সংস্কৃতচর্চার দুই মূল কেন্দ্র বিক্রমপুর ও নবদ্বীপে অধ্যয়ন এবং স্মৃতি ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ। ১৮৬৫-তে টোলের পাঠ সমাপ্ত। শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে অধ্যাপকদের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ তর্ক করার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকার অর্জন চন্দ্রকান্তের তীক্ষ্মমেধা ও শাস্ত্রালোচনার পারঙ্গমতায় মুগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীকর্তৃক তাঁকে তর্কালঙ্কার উপাধি প্রদান। ১৮৮৩-এ কলকাতার সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত ১৮৮৭-এ মহারানি ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উপলক্ষে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত। ১৮৯৩-এ মৌলিক গবেষণার জন্য বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সভ্য মনোনীত। সোসাইটি কর্তৃক 'গোভিল গৃহ্যসূত্র' নামক জটিল ও টীকাভাষ্যহীন সংস্কৃত পুস্তক সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ। এ গ্রন্থের সম্পাদনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। অগাধ পাণ্ডিত্য, বিপুল শ্রম ও একাগ্র নিষ্ঠার দ্বারা এর একটি নির্ভরযোগ্য ভাষ্য নির্মাণ। ১৮৯৬-এর ২ নভেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ। অবসর-জীবনে বেদান্ত দর্শনের উপর সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা ও তার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীগোপাল বসুমল্লিক প্রদত্ত পাঁচ হাজার টাকার বার্ষিক বৃত্তি লাভ। ষড়দর্শনে ব্যুৎপত্তি ছাড়াও মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন। কলাপ ব্যাকরণে বৈদিক অংশ ছিল না, 'কাতন্ত্রছন্দঃ প্রক্রিয়া' নামক ব্যাকরণ লিখে সে অভাব পূরণ। হিন্দু দর্শন বিষয়ক বক্তৃতা পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত ও গুণীসমাজ কর্তৃক প্রশংসিত। চন্দ্রকান্ত লিখিত বৈদিক ব্যাকরণ 'কুসুমাঞ্জলি'র টীকা ম্যাক্স-মূলার, বেন্ডেল, ডক্টর রোস্ট, অধ্যাপক ঝাওয়েল, ডক্টর যেযর প্রমুখ মনীষীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ও প্রশংসা লাভে সক্ষম হয়েছে। চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের পুস্তকসংখ্যা প্রায় চল্লিশটির মতো। তন্মধ্যে বৈশেষিক সূত্রভাষ্য (১৮৮৭), কাতন্ত্রছন্দঃ প্রক্রিয়া (১৮৯৬), উদ্বাহচন্দ্রালোক (১৮৯৭), শুদ্ধি চন্দ্রালোক (১৯০৩), ঔর্দ্ধ্বদেহিকচন্দ্রলোক, (১৯০৬) ও গোভিল গৃহ্যসুত্র (১৯০৭-১০) উল্লেখযোগ্য। এই অসাধারণ পণ্ডিত স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে উদার ও আধুনিক মত পোষণ করতেন। স্বলিখিত 'শিক্ষা' গ্রন্থে 'স্ত্রীশিক্ষা' জাতীয়ভাবে সম্পন্ন হোক এই ইচ্ছাটাই তিনি পোষণ করে গেছেন। মৃত্যু. ২ ফেব্রুয়ারি ১৯১০।

চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯-১৯৪৬)॥ জন্ম. রাঘবপুর গ্রাম, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা, ১৮৮৯। ময়মনসিংহ গীতিকার সংগ্রাহক ও লেখক। দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য বিদ্যাশিক্ষা। গ্রামের এক মুদির দোকানে মাসিক এক টাকা বেতনে কর্মগ্রহণ



কাজের প্রতি মনোযোগ না থাকায় দোকান থেকে বিতাড়িত মাসিক দুই টাকা বেতনে গ্রামের এক তালুকদারের তহশিলদার নিযুক্ত। কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত ময়মনসিংহের 'সৌরভ' (১৯১২), পত্রিকায় লোকসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে সুধীসমাজে পরিচিতি লাভ। কেদারনাথের সহায়তায় মাসিক আট টাকা বেতনে ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদারের গোমস্তার চাকরি লাভ। চাকরির সুযোগে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে পল্লী গীতিকা সংগ্রহ। খাজনা আদায়ের প্রতি মনোযোগ না থাকায় চাকরি থেকে বরখাস্ত। ১৯১৪ ফেব্রুয়ারি-মার্চ (১৩২০-ফাল্গুন) সংখ্যায় 'সৌরভে' তাঁর 'মহিলা কবি চন্দ্রাবতী' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ। দীনেশচন্দ্র কর্তৃক তাঁকে মাসিক সত্তর টাকা বেতনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা গানের সংগ্রাহকের পদে নিযুক্তিদান। গীতিকা সংগ্রহের কাজে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় প্রদান। তাঁর সংগৃহীত পালাগানঃ ময়মনসিংহ গীতিকা–মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারাম, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ান মদিনা, ধোপার পাট; পূর্ববঙ্গ গীতিকা–মইষাল বন্ধু, ভেলুয়া, কমলারানী, দেওয়ান ঈসা খাঁ, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, আয়না বিবি, শ্যামরায়, শিলাদেবী, আন্ধা বন্ধু, বগুলার বারমাসী, রতন ঠাকুর, পীর বাতাসী, জিবালনি, সোনারায়ের জন্ম, ভারাইয়া রাজা। দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদানায় এগুলো 'মৈয়মনসিংহ গীতিকা' (১৯২৩) ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (১৯২৬) নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হলে দেশে ও বিদেশে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন। গীতিকা সংগ্রহ ছাড়াও চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক বহু সংখ্যক কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা। মৃত্যু. ময়মনসিংহ, ১৯৪৬।

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০)॥ জন্ম. কৈকালা গ্রাম, শ্রীরামপুর, হুগলী, ৩১ আগস্ট ১৮৪৪। শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, সাহিত্যিক। ১৮৬১-তে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি থেকে এন্ট্রান্স পাস। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। ১৮৬৩-তে এফ.এ. পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান লাভ। ১৮৬৫-তে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার। ১৮৬৬-তে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাস। ১৮৬৭-তে আইন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান দখল করে বি.এল. ডিগ্রি লাভ। কলেজ ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ইংরেজিতে প্রবন্ধাদি রচনা করে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন এবং দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৬৪-তে সৈয়দ হোসেন বেলগ্রামির (পরবর্তী জীবনে নিজামের রাজ্যে শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত) সহযোগিতায় 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন' নামে একটি ইংরেজি মাসিক প্রকাশ ও সম্পাদনা। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হওয়ার পর ন্যূনাধিক বৎসরকাল ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে শিক্ষকতা। তারপর কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি (১৮৭৫-১৮৭৬)। বৎসরখানেক পরেই পেশা পরিবর্তন করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়ে ঢাকায় আগমন, কিন্তু চাকরির অবস্থা অসম্মানজনক হওয়ায় দু'মাস পরেই চাকরি ত্যাগ। এরপরে রাজস্থানের জয়পুরে গমন এবং মহারাজা কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান। ১৮৭৯-তে বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত। ১৮৮৭-র জানুয়ারি মাসে বাংলা সরকারের অনুবাদকের কাজে যোগদান। ১৯০৪-এ অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন। ১৮৯৬-তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত। চন্দ্রনাথ বসু মূলত শিক্ষাব্রতী ও প্রাবন্ধিক। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রথম দিকের রচনা সবই ইংরেজিতে লিখিত। বাংলা ভাষার চর্চায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এবং তার পর থেকে কেবল বাংলাতেই লিখেছেন। দর্শনচিন্তা ও মননচর্চায় তাঁর খ্যাতি ছিল অসাধারণ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম সুহৃৎ এই মনীষী অকপটে ও অকুতোভয়ে সারা জীবন নিজের বিশ্বাস ও সততা নির্ভর করে চলেছিলেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও কবি নবীন চন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর মসীযুদ্ধ সমকালীন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদী লেখক। হিন্দুর ধর্ম-কর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধরাজি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। সাহিত্য-সমালোচক হিসেবেও খ্যাত। প্রকাশিত গ্রন্থ: শকুন্তলাতত্ত্ব (১৮৮১), পশুপতি সম্বাদ (১৮৮৩), হিন্দুত্ব (১৮৮৫), হিন্দু বিবাহ (১৮৮৭), ত্রিধারা (১৮৯০), বর্তমান (১৮৯৯), সাবিত্রীতত্ত্ব (১৯০৮), বতালে বহু রহস্য (১৯০৩), পৃথিবীর সুখ-দুঃখ (১৯০৮)। মৃত্যু. কলকাতা, ২০ জুন ১৯১০

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৩-১৯৭৯)॥ জন্ম, রামদিয়া



গ্রাম, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ, ডিসেম্বর ১৮৯৩। শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী। পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু, মাতা সৌদামিনী দেবী। পাঁচ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ ও দশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ। গ্রামে স্কুল না থাকায় পিসির বাড়িতে শিক্ষার হাতেখড়ি। পরে বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ফুকরা উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি। চোখে মারাত্মক অসুখ দেখা দিলে দশম শ্রেণির পরে বিদ্যালয়-ত্যাগ। ১৯০৯-এ ভয়াবহ বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সেবায় আত্মনিয়োগ। নগদ অর্থ সংগ্রহ করে পঞ্চাশটি গ্রামের ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৯১০-এ রামদিয়া গ্রামে শ্মশান প্রতিষ্ঠা। ১৯১৩-এ তাঁর আহ্বানে রামদিয়ায় বিশাল জনসভায় যশোর-খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলের ব্যাপক মানুষের যোগদান। ১৯১৪-এ নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, গয়া, কাশী ও হরিদ্বার ভ্রমণ। নবদ্বীপের প্রভুপাদ নবগোপাল গোস্বামীর কাছে দীক্ষালাভ। ১৯১৫-এ গোপালগঞ্জ অঞ্চলের সকল মজা পুকুর ও খাল সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ। ১৯১৯-এর ঘূর্ণিঝড়ে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা। ১৯২০-এ পাণ্ডুখালির বাঁধ নির্মাণ করে এলাকার ফসলী জমি রক্ষা। তাঁর উদ্যোগে ১৩টি খাল খনন করা হয়। ১৯২৫, ১৯২৬ ও ১৯২৭-এ গোপালগঞ্জ এলাকার তিনটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসনে ভূমিকা পালন। ১৯২৭-এ বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে প্রবাহিত সকল নদনদীর কচুরিপানা পরিষ্কার করার কাজে নেতৃত্ব দান। এই কাজে জেলা বোর্ডের অনুদানের অপচয় হওয়ার অভিযোগ তুলে তৎকালীন চেয়ারম্যান মোহন মিঞা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলায় তাঁকে সহযোগিতা করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও হুমায়ুন কবির। মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত। 'জলার মাছের স্বত্ব প্রজার' এই নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে স্থানীয় জমিদারদের মামলা ও নির্যাতনের শিকার। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান এবং ১৯৩০-এ খুলনা ও বহরমপুর কারাগারে ছয় মাসের অন্তরীণ থাকা। এসময় পাকস্থলীর আলসারে আক্রান্ত। ১৯[illegible]-এ [illegible]পুরে বিশাল কৃষক-সম্মেলনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁকে 'ফরিদপুরের গান্ধী' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৮-এ তাঁর আহ্বানে বরিশালের বৈরুন গ্রামের সভায় আভা গান্ধীর পিতা অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দেবেন ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতার যোগদান। ১৯৪২-এ রামদিয়া গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। কলেজের আজীবন সভাপতি ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। একই বছর রামদিয়া শ্রীকৃষ্ণ শশীকমল বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা। ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৪৬-এ রামদিয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৬-এ কলকাতায় দাঙ্গার ঢেউ এই এলাকায় লাগলেও তাঁর উদ্যোগে নিরসন। ১৯৪৭-এ তাঁর বিরুদ্ধে ৪টি মিথ্যা মামলায় ৯ বছর ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ছিলেন তাঁর পক্ষের উকিল। আপিলে বেকসুর খালাস পেলেও নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে ১৯৪৮-এ ৩ বছর কারাবাস। ১৯৫১-এর ২৯ সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ। ১৯৫২-তে পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলার বগুলায় শ্রীকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। মেদিনীপুর জেলার পশং গ্রামে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়কে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে রূপান্তর, নিম্ন বুনিয়াদি বালিকা বিদ্যালয়, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, আশ্রম, কালিমন্দির হরিজন আশ্রম ও ছাত্রবাস নির্মাণ। ১৯৫৫-তে ট্যাংরাখালি বঙ্কিমচন্দ্র সরদার মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৭-এ কলকাতায় তৎকালীন মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কলকাতায় সাক্ষাত। তাঁর অনুরোধে দেশে প্রত্যাবর্তন। পরে কলকাতা গিয়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থীদের সেবা ও জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ। ১৯৭২-এ নদীয়ার বেতাই-এ ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজ প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ১৯৭২-এর মার্চ মাসে ফিরে এসে দেশগঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৭৫-এর শুরুতে চিকিৎসার জন্য কলকাতা গমন। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবার নিহত হলে আর দেশে ফেরেননি। তাঁর সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তা ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'স্কুল-কলেজ স্থাপন, গ্রামের জলাভাব দূরীকরণ, গ্রাম্য কলহের নিবারণ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ– কত অসংখ্য কাজ যে তিনি করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অথচ ইহার কোনটির জন্যই তিনি

খ্যাতিলাভের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার ন্যায় নীরব কর্মী, দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সাধক এ দেশে খুবই বিরল, নাই বলিলেই চলে।' তাঁর বাণী ছিল, 'ওঠো, জাগো, মৃত্যুর পর সুযোগ আসবে বহুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবার।' তাঁর নামে এলাকায় একটি খাল ও সড়ক রয়েছে। মৃত্যু. কলকাতা, ২ জুন ১৯৭৯।

চন্দ্রমাধব ঘোষ (১৮৩৮-১৯১৮)॥ জন্ম. ষোলঘর গ্রাম, শ্রীনগর, বিক্রমপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। বিচারপতি। ডেপুটি কালেক্টর রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর তাঁর পিতা। হিন্দু কলেজের ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর যাঁরা প্রথম বার এন্ট্রান্স পাস করেন তিনি তাঁদের একজন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ. পাস। ১৮৫৯-এ প্লিডারসিপ ডিগ্রি লাভ। বর্ধমান জেলা আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান (১৮৬০)। কিছুদিন পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্তি লাভ। ১৮৬২-তে চাকরি ত্যাগ করে কলকাতা সদর দেওয়ানি আদালতে পুনরায় ওকালতি পেশায় যোগদান। কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে মন্টিগু সাহেবের স্থলে আইনের অধ্যাপক পদে দায়িত্ব পালন। ১৮৮৩-তে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। একই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও আইন ফেকালটির প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত। ঐ বছর ১২ জানুয়ারি (১৮৮৩) কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি পদে যোগদান। ১৮৯২-তে ওকালতি পরীক্ষক সমিতির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত। ১৯০৬-এর ১১ মে থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি স্যার ফ্রান্সিস উইলিয়াম ম্যাকলিনের অনুপস্থিতকালে অস্থায়ীভাবে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে দায়িত্ব পালন। একই বছর সামাজিক সমিতির সভাপতির পদে বৃত। ১৯০৭-এর ২ জানুয়ারি বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ। হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক আন্দোলন চলাকালে অ্যানি বেশান্তের গ্রেফতারের প্রতিবাদে কলকাতা টাউন হলে যে সভা হয় তাতে সভাপতিত্ব (১৯১৭)। পরবর্তীকালে অ্যানি বেশান্তকে কংগ্রেসের সভানেত্রী পদে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে কংগ্রেসের চরমপন্থি ও মধ্যপন্থিদের মধ্যে যে বিরোধ বাধে তাঁর মধ্যস্থতায় সেই বিরোধের মীমাংসা (২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৭)। ন্যায়পরায়ণ, তেজস্বী ও বিচক্ষণ বিচারপতি হিসেবে খ্যাত। আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় প্রদান। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ১৯১৮।



চন্দ্রাবতী (১৫৫০-১৬০০)॥ জন্ম. পাতোয়ারী গ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ১৫৫০। জীবনকাল ষোড়শ শতাব্দী। প্রথম বাঙালি নারী কবি। পিতা মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাস। মাতা সুলোচনা। তাঁর জীবনের দুঃখ-কাহিনী বিষয়ে একটি গাথা থেকে জানা যায়, একই গ্রামের ব্রাহ্মণ যুবক জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীর সহপাঠী। শৈশব থেকে উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পরিণত বয়সে দুপক্ষের অভিভাবকের সম্মতিক্রমে বিয়ে স্থির হয়। এমন সময়ে জয়ানন্দ এক মুসলমান মেয়ের প্রেমে পড়ে মুসলমান হয়ে যান। কিছুদিন পরে অনুতপ্ত হয়ে জয়ানন্দ ফিরে আসেন চন্দ্রাবতীর কাছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে সুন্ধা নদীতে আত্মহত্যা করেন। চন্দ্রবতী আর বিয়ে করেননি। পিতা বংশীদাস কন্যার জন্য একটি শিবমন্দির তৈরি করেন। ফুলেশ্বরী নদীর তীরে। তিনি শিব আরাধনায় সময় কাটাতেন। জয়ানন্দের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরই শোকাভিভূত চন্দ্রাবতীও দেহত্যাগ করেন। রচিত কাব্য: মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালা, রামায়ণ। ড. দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৩২-এ চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' প্রকাশ করেন। লৌকিক, মানবিক ও কিছু মৌলিক উপাদান সংযোগের ফলে এই রামায়ণ কাব্যটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। জন্ম ও মৃত্যু. কিশোরগঞ্জ, ১৬০০।

চম্পা গাজী॥ জন্ম. ছতরপটুয়া গ্রাম, চট্টগ্রাম। সংগীতজ্ঞ। প্রসিদ্ধ সংগীতশিল্পী হিসেবে স্বীকৃত। বহু গানের রচয়িতা। 'রাগনামা' ও তালনামা' গ্রন্থে তাঁর রচিত বহু সংগীত মুদ্রিত আছে। একটি প্রসিদ্ধ গান—'যদি আসে প্রাণ প্রিয়া হিয়ার উপর থুইয়া/এই রূপ যৌবন দিমু ঢালি'। তাঁর রচিত গান চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। জন্ম ও মৃত্যু. তারিখ অজ্ঞাত।

চারুচন্দ্র দত্ত (১৮৭৭-১৯৫২)॥ জন্ম. কুচবিহার, ১৮৭৭। লেখক, বিপ্লবী ও প্রশাসক। প্রাথমিক শিক্ষা কুচবিহারে। ১৮৯০-তে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে ১৮৯৫-তে

আই.সি.এস. পরীক্ষা দিতে লন্ডন গমন। ১৮৯৭-তে আই.সি.এস. পরীক্ষায় পাস করে দেশে ফিরে বোম্বাইয়ে প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে জজ পদ লাভ। বোম্বাইয়ে স্বাদেশিকতায় দীক্ষা গ্রহণ। এখানে কয়েকটি জনসেবা সংঘ এবং দেশীয় শিল্প ও ব্যায়ামকেন্দ্র স্থাপন।



ঠানায় চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালে বিপ্লবগুরু অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সেখানে অরবিন্দের প্রতিষ্ঠিত ভবানী-মন্দিরের কর্মী হিসেবে নিযুক্ত। ১৯০৬-১৯০৭ পর্যন্ত অরবিন্দ ও বারীন্দ্র ঘোষ কারাগারে থাকাকালে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে কুচবিহারে প্রায় দুই বছর অন্তরীণ। ১৯১০-এ পুনরায় বোম্বাইয়ে কাজে যোগদান। ১৯২৫-এ অবসর গ্রহণ। ১৯৩১-এ 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশিত হলে এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। এবং 'পুরানো কথা' (১ম খণ্ড ১৯৩৬, ২য় খণ্ড ১৯৬৬) 'নামক একটি স্মৃতিকথায় তাঁর আই.সি.এস. জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এ সময়ে কিছুকাল শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেন। ১৯৪০-এ অরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদান। লেখক হিসেবেও সুনামের অধিকারী। পুরনো কথা (দুইখণ্ড) ছাড়াও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা। সেগুলো হলো কৃষ্ণ রাও (গল্প সংকলন), দেবারু, দুনিয়াদারি, মায়ের আলাপ প্রভৃতি। মৃত্যু. পণ্ডিচেরী, ১৯৫২।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮)॥ জন্ম. চাঁচর, মালদহ, ১১ অক্টোবর ১৮৭৭। আদি নিবাস যশোর। কথাশিল্পী, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য-সমালোচক। ১৮৯৯-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাস। ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যান্ড পাবলিশিং হাউসে



কর্মজীবন শুরু। কৃতি সম্পাদক, রুচিশীল প্রকাশক ও দক্ষ অনুবাদক হিসেবে খ্যাতি লাভ। কিছুকাল 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা। বিশেষ সুনাম অর্জন 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদকরূপে। ১৯০৯-১৯২৪ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত। বাংলা ভাষা ও শব্দতত্ত্বে দক্ষতার জন্য ১৯১৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯২৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক পদে যোগদান। ১৯২৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ভারতী সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক। উপন্যাস: আগুনের ফুলকি (১৯১৪), স্রোতের ফুল (১৯১৫), পরগাছা (১৯১৭), দুই তীর (১৯১৮), হেরফের (১৯১৮), পঙ্কতিলক (১৯১৯), দোটানা (১৯২০), আলোকপাত (১৯২০), রূপের ফাঁদ (১৯২৫), সরবাঁধা (১৯৩৭), অগ্নিহোত্রী (১৯০৮) প্রভৃতি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচকরূপে জনপ্রিয়তা অর্জন। উল্লেখ্যযোগ্য সমালোচনাগ্রন্থ: রবিরশ্মি (দুইখণ্ড)। মৃত্যু. ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৮।

চারু মজুমদার (১৯১৫-১৯৭২)॥ জন্ম. হাগুরিয়া গ্রাম, রাজশাহী, ১৯১৫। পৈতৃক নিবাস শিলিগুড়ি। রাজনীতিবিদ। জমিদার পরিবারে জন্ম। শিলিগুড়ি। হাইস্কুল থেকে ১৯৩৩-এ মেট্রিক পাস। পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি।



ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পূর্বে সাম্যবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে লেখাপড়া ত্যাগ করে জলপাইগুড়ি জেলায় তেভাগা কৃষি আন্দোলনে যোগদান। ব্রিটিশ শাসনামলে ছয় বছর আত্মগোপন অবস্থায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা। এ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ। ১৯৪২-এ জলপাইগুড়িতে গ্রেফতার। দুই বছর কারাভোগের পর ১৯৪৪-এ মুক্তিলাভ। উত্তরবঙ্গে চা-বাগান শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ। ১৯৪৮-এর ২৬ মার্চ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হলে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার। ১৯৫২-তে মুক্তিলাভ। ১৯৫৭-তে নকশাল বাড়ি কেষ্টপুরে চা-বাগিচার মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অভিযোগে গ্রেফতার। প্রায় চার মাস কারা নির্যাতন ভোগ। ১৯৬২-তে চীন-ভারত যুদ্ধের সময়ে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেফতার ১৯৬৩-তে

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পরাজিত। চীন ও রাশিয়ার আদর্শগত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পিকিংপন্থি নেতৃবৃন্দ সি. পি. আই. (এম) গঠন করে (১৯৬৪) তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা। ১৯৬৫-তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে গ্রেফতার। একই বছর মুক্তিলাভের পর সি.পি.আই (এম)-এর নামে একটি বিশেষ ঘোষণাপত্র প্রকাশ। সি.পি.আই. (এম) নেতৃবৃন্দ কর্তৃক একে দলীয় কর্মসূচির পরিপন্থী আখ্যায়িত করে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার। পরে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের নির্বাচনে (১৯৬৭) কংগ্রেসকে পরাজিত করে বামফ্রন্ট জয়ী হলে সি.পি.আই. (এম)-এর বামফ্রন্ট সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সি.পি.আই. (এম)-এর সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধলে সি.পি.আই. (এম) ত্যাগ। বামফ্রন্ট সরকারের অভিষেক অনুষ্ঠান (জুন ১৯৬৭) শেষ হওয়ার পর পরই তাঁর ও কানু সান্যালের নেতৃত্বে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি এলাকায় সশস্ত্র কৃষক-বিদ্রোহ সংঘটিত। কৃষকদের জমির মালিকানার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তরাঞ্চল, কেরালা ও পূর্ব উড়িষ্যার এই চরমপন্থি সশস্ত্র আন্দোলনের ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ। ১৯৬৮-তে কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, নাগী রেড্ডি (অন্ধ্র প্রদেশের চরমপন্থি নেতা) প্রমুখের সহযোগিতায় তৎকর্তৃক কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন গঠন। ১৯৬৯-এর ১ মে কলকাতা ময়দানে এক জনসভায় কানু সান্যাল কর্তৃক সি.পি.আই. (এম.এল.) গঠনের কথা ঘোষণা। চারু মজুমদার এ-দলের সভাপতি নির্বাচিত। সারাভারতে একজন বিপ্লবী নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ। তাঁর পরিচালিত আন্দোলন নকশাল আন্দোলন নামে খ্যাত। নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ (১৯৬৭) থেকে এ আন্দোলনের উৎপত্তি। শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা কায়েমের আশায় অনেক প্রতিভাবান যুবক ও যুবতীর তাঁর নেতৃত্বাধীন এই উগ্রবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। 'শ্রেণিশত্রু খতমের' নামে তাঁর অনুসারীরা (নকশালীরা) প্রতিপক্ষ অনেক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে, জোতদার ও ভূ-স্বামীকে হত্যা করে বরেণ্য নেতা, শিক্ষাবিদ ও মনীষীদের ভাস্কর্য ভেঙে ফেলে এবং বহু স্কুল-কলেজ পুড়িয়ে দেয়। চীন সরকার প্রথমে চারু মজুমদারকে 'ভারতবর্ষের কৃষিবিপ্লবের আলোকবর্তিকা' বলে আখ্যায়িত করলেও পরে তাঁর কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করে। ভারত সরকার কর্তৃক নকশালদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর দমন-নীতি প্রয়োগ। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি সময়ে সি.পি.আই. (এম.এল.)-এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টি। চারু মজুমদারের নেতৃত্বকে অস্বীকার করে অসীম চট্টোপাধ্যায় ও সন্তোষ রাণার দলত্যাগ। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ আনয়ন। তাঁর উপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি। কয়েক বছর পলাতক জীবন-যাপন। আত্মগোপন অবস্থায় ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করলে অনুসারীদের আর এক অংশের দলত্যাগ। এ-সকল কারণে নকশাল আন্দোলনের গতি মন্থর হয়ে যায়। ১৯৭২-এর ১৬ জুলাই কলকাতার এন্টালী রোডের এক বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার। ২৮ জুলাই (১৯৭২) হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষণা প্রচার। মৃত্যু. কলকাতা, ২৮ জুলাই ১৯৭২।

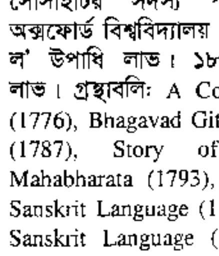
চার্লস উইলকিন্স, স্যার (১৭৪৯-১৮৩৬)॥ জন্ম.



সমারসেটশায়ারের অন্তঃপাতী ফ্রোম গ্রাম, ইংল্যান্ড, ১৭৪৯। বাংলাদেশের ছাপাখানা ও মুদ্রণ শিল্পের জনক। ভারত তত্ত্ববিদ, অনুবাদক। পারিবারিক দুঃস্থতার কারণে স্বদেশে উচ্চশিক্ষা লাভে অসমর্থ। ১৭৭০-এ একুশ বৎসর বয়সে অর্থোপার্জনের তাগিদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'রাইটার'-এর চাকরি নিয়ে কলকাতায় আগমন। প্রথম নিয়োগ ছিল কলকাতায়, এখানে দু'বছর অবস্থান। তার পর মালদহে বদলি করা হয় কোম্পানির কুঠির অধ্যক্ষ-সহকারী হিসেবে। মালদহে কিছুকাল অবস্থানের পর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। হুগলী ও কলকাতাতেই তাঁর কর্মস্থল সীমাবদ্ধ থাকে। কলকাতায় এসে অল্পকালের মধ্যেই বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন। এ সময়ে তাঁর অন্যতম সহকর্মী ন্যাথনিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড-এর উপদেশে সংস্কৃতি ও ফারসি শিক্ষা শুরু।

কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে পৃথিবীখ্যাত প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম জোন্স তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান সহায়ক হিসেবে তাঁকে গণ্য করেছিলেন। স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ প্রাচীন সংস্কৃত লিপির পাঠোদ্ধার ও সংস্কৃত গবেষণার পথিকৃৎ। তবু বঙ্গসংস্কৃতিতে চার্লস উইলকিন্সের চিরস্মরণীয় অবদান অন্যত্র, এবং তা হলো ছাপার হরফ নির্মাণ। হ্যালহেড সাহেব ইংরেজিতে বাংলা ভাষায় যে ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন সেই 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বাংলা মুদ্রাক্ষরের প্রয়োজন পড়ে। এর আগে ইউরোপে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে বাংলা লিপির কিছু নমুনা পাওয়া গেলেও সেগুলোর মূলে ছিল কাঠ থেকে খোদাই-করা হস্তলিখিত হরফের ব্লক। বাংলা লিপির ধারাবাহিকভাবে মুদ্রণোপযোগী সামগ্রিক কৌশল উদ্ঘাটন অজ্ঞাত ছিল; এই কৌশল উদ্ভাবনাই চার্লস্-এর অনন্য সাধারণ কৃতিত্ব। তৎকালে প্রচলিত অচালনশীল বাংলা ব্লকের স্থলে চালনশীল বাংলা হরফ নির্মাণ ও কাঠের তৈরি সেই হরফের জায়গায় ধাতু নির্মিত অক্ষর তৈরি-এ দুটোই তাঁর স্থায়ী কীর্তি। তাঁর ভূমিকা ছিল একাধারে ধাতুশিল্পবিদ, খোদাইকর, ছাঁচনির্মাতা ও মুদ্রণকুশলীর। এ-কাজে তাঁর সহকারী ছিলেন তাঁরই এক বাঙালি কর্মচারী পঞ্চানন কর্মকার। বাংলা মুদ্রণাক্ষর নির্মাণের পর হ্যালহেডের পূর্বোক্ত ব্যাকরণগ্রন্থ হুগলীতে মাস্টার এন্ড্রুজের ছাপাখানায় ১৭৭৮-এ মুদ্রিত হয় এবং উইলকিন্স উদ্ভাবিত ধাতু-নির্মিত চালনশীল বাংলা হরফের প্রথম নমুনা এ গ্রন্থেই পাওয়া যায়। ১৭৭৯-তে তাঁর প্রস্তাবানুযায়ী কোম্পানি-কর্তৃক কলকাতায় নিজস্ব ছাপাখানা স্থাপন এবং তাঁকে পরিচালক নিযুক্ত। ১৭৮৪ পর্যন্ত এই পদে আসীন। উল্লেখ্য, তিনি বাংলা মুদ্রণাক্ষরের আরো উৎকর্ষ সাধন ছাড়াও ফারসি ও সংস্কৃত হরফ তৈরি করেছিলেন। ফ্রান্সিস গ্লাডউইন সংকলিত ইংরেজি-ফারসি অভিধান তাঁর তত্ত্বাবধানে তাঁরই তৈরি অক্ষর ব্যবহার করে ১৭৮০-তে মালদহে ছাপা হয়। বিদ্যানুশীলনে চার্লসের প্রথম সাফল্য লক্ষ করা যায় ফারসি থেকে অনূদিত ও ১৭৭৬-এ লন্ডন থেকে প্রকাশিত A Code of Gentoo Laws গ্রন্থে। তাঁর আরেক কীর্তি ভগবদ্গীতা'র ইংরেজি অনুবাদ, ১৭৮৫-তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির খরচে লন্ডন থেকে প্রকাশিত। ভূমিকা লিখেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। ইউরোপীয় ভাষায় গীতার অনুবাদ এই-ই প্রথম, এবং পরবর্তীকালে রুশ, জার্মান ও ফারসি ভাষাতেও গীতার যে অনুবাদ বেরুতে পেরেছিল তারও আকর গ্রন্থ ছিল উইলকিন্সের ইংরেজি অনুবাদ। ১৭৮৪-র ১৫ জানুয়ারি উইলিয়ম জোন্সের উদ্যোগে কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপিত হওয়ার পেছনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৭৮৬-এ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। সেখানে নিজের বাড়িতেই একটি প্রেস স্থাপন এবং দেবনাগরি হরফ তৈরি। সংস্কৃত 'হিতোপদেশ'-এর স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ নিজের ছাপাখানাতেই মুদ্রিত। ১৮০০-তে পুনরায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি গ্রহণ। পূর্ববর্তী বৎসর (১৭৯৯) লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে একটি গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁকে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত এবং আমৃত্যু উক্ত পদেই অধিষ্ঠিত। ১৮২৩-এ লন্ডনে 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপনের পিছনেও তাঁর প্রত্যক্ষ অবদান ছিল। কোম্পানির সিভিলিয়ানদের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলেতে হেইলবারি কলেজ স্থাপন করলে তাঁকে পরিদর্শক ও পরীক্ষক নিযুক্ত। ১৭৮৮-তে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য পদ লাভ। ১৮০৫-এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব সিভিল ল' উপাধি লাভ। ১৮৩৩-এ 'নাইট' উপাধি লাভ। গ্রন্থাবলি: A Code of Gentoo Laws (1776), Bhagavad Gita (1785), Hitopadesa (1787), Story of Sakuntala from Mahabharata (1793), A Grammar of the Sanskrit Language (1808), Radicals of the Sanskrit Language (1815). মৃত্যু. ১৩ মে ১৮৩৬।

চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু (১৮৭০-১৯২৫)॥ জন্ম. পটলডাঙ্গা, কলকাতা, ৫ নভেম্বর ১৮৭০। পৈতৃক নিবাস তেলিরবাগ গ্রাম, মুন্সিগঞ্জ। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নী ভুবনমোহন দাশ তাঁর পিতা। ভবানীপুর লন্ডন মিশনারি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস (১৮৮৬) প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে



১৮৯০-তে বি.এ. ডিগ্রি লাভ। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেয়ার জন্য লন্ডন গমন, এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য (১৮৯২)। মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে প্রত্যাবর্তন (১৮৯৩)। কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান ও কালক্রমে ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। রাজনীতিবিদ হিসেবেও অভূতপূর্ব খ্যাতি অর্জন। অনুশীলন বিপ্লবী দলের সৃষ্টির পরপরই এতে যোগদান ও এ দলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নিযুক্ত। ১৮৯৬-তে পিতৃঋণের দায়ে আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত। ১৯০৫-এ 'স্বদেশি মণ্ডলী' স্থাপনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন ও স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান। ১৯০৬-এ বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রস্তাব রচয়িতা। ১৯০৭-এ রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পালের মামলায় তাঁদের পক্ষ সমর্থন। ১৯০৯-এ আলীপুর বোমা-মামলার আসামি অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন। এ মামলায় জয়লাভ। অরবিন্দকে অভিযোগ থেকে খালাস করে আনায় ব্যারিস্টার হিসেবে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন। একই বছর ডুমরাও মামলা গ্রহণ। ১৯১০-এ ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি যুগান্তর দলের নেতা পুলিন দাসের পক্ষ সমর্থন। ১৯১৩-তে দেউলিয়া থেকে নিষ্কৃতি লাভ। ১৯১৪-তে দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি পক্ষ সমর্থন। ১৯১৭-তে ভারত সচিব মন্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিত্ব। ১৯১৮-তে বোম্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান ও দিল্লি কংগ্রেসের রাউলাট কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা। ১৯১৯-এ কলকাতায় মনুমেন্টের পাদদেশে এক জনসভায় সত্যাগ্রহের শপথ গ্রহণ, ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদান। কংগ্রেস-পরিচালিত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৩ এপ্রিল ১৯১৯) তদন্ত কার্যে যোগদান। অমৃতসর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান এবং নতুন শাসন-সংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান ও প্রস্তাব উত্থাপন। ১৯২০-এ কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীর অসহযোগ নীতির বিরোধিতা। একই বছর নাগপুরে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে যোগদান ও মত পরিবর্তন করে গান্ধীর অসহযোগ নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন ১৯২১-এ গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে বহু সহস্র টাকা মাসিক আয়ের ব্যারিস্টারি পেশা ত্যাগ করে সার্বক্ষণিক রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ। বঙ্গদেশে অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-১৯২২) নেতৃত্ব গ্রহণ। তাঁর অধীনে কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর যোগদান। এ সময়ে ভারত সরকার কর্তৃক প্রখ্যাত মিউনিশন্স বোর্ডঘটিত মোকদ্দমায় প্রচলিত নিয়ম উপেক্ষা করে শ্বেতাঙ্গ অ্যাডভোকেট জেনারেলের অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হয়ে তাঁকে সরকারি কৌসুলি নিযুক্ত। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় এ দায়িত্বও পরিত্যাগ। এ অসামান্য ত্যাগের জন্যে বাংলার জনসাধারণ কর্তৃক 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত। একই বছর সংশোধিত ফৌজদারি আইনে গ্রেফতার। কারাগারে বন্দী থাকাকালে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত। আইন অমান্য করায় ১৯২২-এ ছয় মাসের বিনাশ্রম-কারাদণ্ডে দণ্ডিত। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব এবং সরকারি নীতির বিরোধিতা করা জন্য আইন-সভায় প্রবেশের পক্ষে অভিমত প্রদান। গান্ধী কারাগারে ছিলেন; কিন্তু তাঁর অনুসারীদের বিরোধিতায় দেশবন্ধুর এ নীতি কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যান। কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করে ১৯২৩-এ মতিলাল নেহেরুর সহযোগিতায় 'স্বরাজ্যদল' গঠন। তাঁর নেতৃত্বে এই দল ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত। স্বরাজ্যদলের উত্থানে কংগ্রেস তার রাজনীতির ভুল বুঝতে পেরে দেশবন্ধুর পথ অনুসরণ করে কংগ্রেসেরও আইন-সভায় প্রবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। একই বছর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার মানসে মুসলমান নেতাদের সঙ্গে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) নামে এক ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন। ১৯৩০-এর নির্বাচনে স্বরাজ্য দলেল বিশেষ সাফল্য লাভ। ১৯২৪-এ তারকেশ্বরের মোহান্তের অনাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ পালন। একই বছর কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচিত। চাকরির ক্ষেত্রে অবহেলিত মুসলমানদের অধিক হারে চাকরিদানের নীতি গ্রহণ। ১৯২৪-এ সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করে সুভাষচন্দ্র, সুরেন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতাকে গ্রেফতার করলে কলকাতায় রসা রোডের নিজ বাড়িতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক আহবান। এবার গান্ধী উপলব্ধি করেন যে, স্বরাজ্য দলকে দমনের জন্যই এই অর্ডিন্যান্স। এরপর থেকে তৎকর্তৃক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দেশবন্ধুকে অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন। একজন ক্ষণজন্মা রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, হিন্দু-

মুসলমানের ঐক্য ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন ছিল তাঁর রাজনীতির মূল দর্শন। এদেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রতিষ্ঠা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সি.আর. দাশ ব্যারিস্টারির আয়ে বিলাসী জীবন যাপন করলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে কাজ করে গেছেন। কবি হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। বিখ্যাত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'নারায়ণ' (১৯১৪-১৯২২) তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে এ পত্রিকায় বহুলেখা প্রকাশ। মালঞ্চ (১৮৯৫), মালা (১৯০৪), সাগর-সংগীত (১৯১৩), অন্তর্যামী (১৯১৫) ও কিশোর-কিশোরী তাঁর রচিত কবিতাগ্রন্থ। পত্নী বাসন্তী দেবীর সহযোগিতায় বাঙ্গালার কথা (১৯২১-১৯২২) নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ। মৃত্যু. দার্জিলিং, ১৬ জুন ১৯২৫।

চিত্তরঞ্জন সাহা (১৯২৭-২০০৭) সৃজনশীল প্রকাশনা শিল্পের পথিকৃৎ। গ্রন্থমেলার উদ্যোক্তা। জন্ম. লতিফপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, ১ জানুয়ারি ১৯২৭। বাবা কৈলাশচন্দ্র সাহা, মাতা তীর্থবাসী সাহা। ১৯৪৩-এ রামেন্দ্র হাই স্কুল থেকে মেট্রিক এবং ১৯৪৮-এ চৌমুহনী কলজে থেকে বি.এ. পাস। ১৯৫১-এ চৌমুহনীতে বইয়ের দোকান পরিচালনার মধ্য দিয়ে ব্যবসায়-জীবন শুরু। কিছুকাল পরে 'বাসন্তী প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা ক্রয়। এর নাম বদলে রাখা হয় 'ছাপাঘর'। পাশাপাশি 'বাঁধাইঘর' নামে একটি পুস্তক বাঁধাই-প্রতিষ্ঠানও স্থাপন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি ঢাকায় ব্যবসা সম্প্রসারিত। 'ঢাকা প্রেস' ও 'গ্রন্থঘর' প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৭-এ ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করনে পাঠ্যপুস্তক ও নোটবইয়রে প্রকাশনা সংস্থা 'পুঁথিঘর লিমিটেড'। ১৯৭১-এ কলকাতায় আশ্রিত বাঙালি সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে বাংলাদেশের লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশের লক্ষে 'স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ 'মুক্তধারা'র জন্ম। প্রতিষ্ঠানের প্রথম দুটি প্রকাশনা হলো 'বাংলাদেশ কথা কয়' এবং 'রক্তাক্ত বাংলা' নামের দুটি সংকলন। 'মুক্তধারা' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের ৩২টি গ্রন্থ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২-এর ৮ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীর বর্ধমান হাউসের সামনে বটতলায় একটুকরো চটের উপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বিক্রির আয়োজন করে। সেই সূত্র ধরেই আজকের বাংলা একাডেমী অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রচলন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত একাই বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে মুক্তধারার মেলা চলে। ১৯৭৬-এ আরো কয়েকটি প্রকাশনা এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৭৮-এ বাংলা একাডেমী এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৭৯-এ যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি। চিত্তরঞ্জন সাহা এই সমিতির অন্যতম সংগঠক। 'বইয়ের খবর' ও 'সাহিত্যপত্র' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ। পঁচাত্তর-পরবর্তী সামরিক সরকারে আমলে ফরাশগঞ্জ দফতর থেকে গ্রেফতার ও পরে মুক্তি। প্রকাশনাশিল্পে অবদানের জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংবর্ধনা, বাংলা একাডেমী ফেলোশিপ ও একুশে পদক (২০০৫)। মৃত্যু. ঢাকা, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৭।



চিশতি শাহ্ হেলালুর রহমান (১৯৪৯-১৯৭১) জন্ম. রহমান নগর, বগুড়া, ১৯৪৯। ছাত্রনেতা ও সাংবাদিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭০-এ দর্শনে বি.এ. অনার্স পাস। পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সম্পাদক (১৯৭০-১৯৭১) ও 'আজাদ'-এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ রিপোর্টার (১৯৭০-১৯৭১)। ষাটের দশকে ৬ দফা ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী। ১৯৬৯-এ গণ-আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৭১-এর ২৩ মার্চ স্বাধীন বাংলা দিবসে ঢাকায় পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্যারেডে নেতৃত্বদান। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ। ইকবাল হল (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল)-এ পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে নিহত।



চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)॥ জন্ম. নবদ্বীপ ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৪৮৬। আদি নিবাস সিলেট। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতন্য। নিমাই, গৌরাঙ্গ, গৌরহরি, মহাপ্রভু প্রভৃতি নামেও পরিচিতি। বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। জগন্নাথের পিতা উপেন্দ্র মিশ্রের নিবাস ছিল সিলেট জেলার ঢাকা-দক্ষিণ গ্রাম। বিদ্যার্জনের জন্য জগন্নাথের সিলেট থেকে নবদ্বীপে আগমন। এখানে শচীদেবীকে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন। চৈতন্য জন্মগ্রহণ করার পূর্বে তাঁর মাতা শচীদেবীর কয়েকটি সন্তানের মৃত্যু। বেঁচে থাকেন জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ ও কনিষ্ঠপুত্র চৈতন্য। চৈতন্যের বাল্যকালে টোলের পাঠ শেষ করে সন্ন্যাসী হয়ে বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ। লেখাপড়া শিখলে চৈতন্যও ভাইয়ের পথ অনুসরণ করবে এ আশঙ্কায় পিতামাতা কর্তৃক তাঁকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। লেখাপড়া শেখার প্রতি চৈতন্যের তীব্র আগ্রহ জ্ঞাপন। লেখাপড়া শেখার প্রতি চৈতন্যের তীব্র আগ্রহ প্রকাশ। শেষ পর্যন্ত পুত্রের জেদ মেনে নিয়ে জগন্নাথ মিশ্র কর্তৃক চৈতন্যকে টোলে প্রেরণ। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন। প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ শেষ করে বাড়িতে টোল খুলে অধ্যাপনা শুরু। পিতার মৃত্যুর পর (১৫০২) বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। আর্থিক সঙ্কটে পড়ে পিতৃপুরুষের সম্পত্তির সন্ধানে জলপথে সিলেট গমন। তাঁর অনুপস্থিতিকালে সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু। টাকাকড়ি নিয়ে সিলেট থেকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন। স্ত্রী মৃত্যু-সংবাদ শুনে ব্যথিত হয়ে ভক্তি-অনুশীলনে মনোনিবেশ। মাতার অনুরোধে দ্বিতীয়বার সনাতন রাজপণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। চৈতন্যের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তার লাভ। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী, পুরীর বাসুদেব সার্বভৌম ও কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বিদ্যার প্রতিযোগিতায় পরাজিত [illegible] বয়সে পিতৃপিণ্ড দানের জন্য গয়ায় গমন (১৫০৮)। সেখানে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবভক্ত ঈশ্বরপুরীর কাছে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ। দীক্ষা গ্রহণের পর চৈতন্যের মনে প্রবল ভক্তির ভাবাবেগ উদয়। কৃষ্ণপ্রেমে আসক্ত হয় গৃহে প্রত্যাবর্তন। অধ্যাপনা ত্যাগ করে নিজে নাম-সংকীর্তন করতে ও অপরকে করাতে লাগলেন। ছাত্র ও শিষ্যদের নিম্ন পদ গেয়ে সংকীর্তন শিক্ষা প্রদানঃ 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন'। অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত প্রমুখ বৈষ্ণবভক্ত চৈতন্যদেবের সঙ্গে যোগ দিলে বৈষ্ণবদের প্রভাব বৃদ্ধি। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' সংকীর্তন শুরু। কৃষ্ণ প্রেমের বন্যায় 'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে (নদীয়া) ভেসে যায়' অবস্থায় পরিণত। হিন্দুদের মধ্যে যারা বৈষ্ণবমতের বিরোধী ছিল, তারা চৈতন্যদেবের কার্যকলাপকে হিন্দুধর্ম-বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে নবদ্বীপের শাসক চাঁদ কাজীর নিকট অভিযোগ করলে কাজী কর্তৃক বৈষ্ণবদের কীর্তন বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান। সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হলে চৈতন্যের দলবল নিয়ে সংকীর্তন করতে করতে নগর পরিভ্রমণ। সংকীর্তন শোভাযাত্রা কাজীর বাড়ির কাছে পৌঁছলে কাজী ক্ষমা চেয়ে চৈতন্যদেবের ভক্ত হন। কাজী কর্তৃক সংকীর্তন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। এ ঘটনার পর চারদিকে চৈতন্যের জয়জয়কার শুরু। চব্বিশ বছর বয়সে মাঘমাসের শুক্লপক্ষের একরাতে (২৬ জানুয়ারি ১৫১০) সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায়ে গৃহত্যাগ করে কাটোয়ায় গমন। সেখানে কেশব ভারতী নামক একজন প্রসিদ্ধ আচার্যের কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ। গুরু কেশব ভারতী শিষ্যের নাম রাখেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সন্ন্যাস নেওয়ার পর চৈতন্য ভক্তির ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লে শিষ্যরা বৃন্দাবন যাত্রার ছলে তাঁকে ভুলিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের ঘরে তোলেন। সেখান থেকে পুরী গমন। ঐ স্থান থেকে প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন। ১৫১০-১৫১২ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থানসমূহ দর্শন। এ সময়ে রামানন্দ রায় ও পরমানন্দপুরী তাঁর ভক্তিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা নেন। বৃন্দাবন গিয়ে অনেক লুপ্ত তীর্থস্থান উদ্ধার। সেখানে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব ও গোপালভট্টকে বৈষ্ণব



ধর্মে দীক্ষিতকরণ। তাঁরা 'ছয় গোসাঁই' নামে পরিচিত। চৈতন্যদেবের নির্দেশে তাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে অবতীর্ণ হন। এরপর অরণ্য পথে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন ভ্রমণ। ১৫১৬-তে নদীয়ায় আগমন। একই বছর নীলাচলে গিয়ে সেখানে বছরখানেক অবস্থান। শেষ আঠারো বছর পুরীতে বসবাস। শেষ জীবনে সর্বদা কৃষ্ণধ্যানে দিব্যভাবে বিভোর অবস্থায় দিন যাপন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' আছে রথের সামনে নাচবার সময়ে চৈতন্যদেবের পায়ে ইটের টুকরো বিদ্ধ এবং পরে তা বিষাক্ত ক্ষতে পরিণত। এ ব্যাধিতেই তাঁর দেহাবসান। বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের নেতা। প্রাচীন বৈষ্ণবধর্মের দ্বৈতবাদ অস্বীকার করে তৎকর্তৃক অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদের আদর্শে বৈষ্ণবধর্মকে নবরূপ দান। তাঁর মতানুসারে ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বর লাভ সম্ভব। ঈশ্বর প্রেমময় ও করুণার আধার। প্রেমাস্পদে ও সর্বজীবে মায়া ও মমতারূপে তাঁর প্রকাশ। ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদের ন্যায় ভালবাসলে তাঁকে লাভ করা যায়। রাধাকৃষ্ণের (জীবাত্মা-পরমাত্মা) প্রেমের রূপকল্পে তৎকর্তৃক ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেমের লীলামাধুর্য উপস্থাপন। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবতত্ত্ব হিন্দু ধর্মের নব সংস্করণ। বর্ণাশ্রম প্রথাকে অস্বীকার করে গীতার ভক্তিবাদকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে তৎকর্তৃক হিন্দুধর্মকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা। তাঁর উদ্ভাবিত বৈষ্ণবধর্মের একটি সামাজিক তাৎপর্য বিদ্যমান। জাতিভেদ প্রথায় নিপীড়িত হিন্দুরা ইসলামের সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকলে চৈতন্যের ধর্মীয় আন্দোলন দ্বারা তা রোধ। ধর্মসাধনায় নর্তন-কীর্তন ও শোভাযাত্রার প্রবর্তন এবং জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করায় বৈষ্ণবতত্ত্ব সমাজের নির্যাতিত মানুষের কাছে প্রবল আবেগের সঞ্চার। বর্ণাশ্রম প্রথায় নিপীড়িত বাঙালি হিন্দু-সমাজ কর্তৃক চৈতন্যবাদ গ্রহণ। অনেক মুসলমানেরাও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কেবল ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে নয় বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনেও এক বৈপ্লবিক ঘটনা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবতত্ত্বকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব কবিরা রচনা করে পদাবলী/গান। বৈষ্ণবদের কীর্তনের জন্য রচিত হলেও প্রেমমূলক গীতিকবিতা হিসেবে এর মূল্য অসাধারণ বৈষ্ণবতত্ত্বের অনেক শিক্ষাগুরু কর্তৃক চৈতন্যদেবকেও ঈশ্বররূপে বিশ্বাস করে তাঁর প্রতি ভক্তি প্রকাশের জন্য তাঁর প্রশংসামূলক জীবনী রচনা। বৈষ্ণবতত্ত্বকে কেন্দ্র করে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যেন নতুন ধারার সৃষ্টি হয় সাহিত্যের ইতিহাসবিদগণ কর্তৃক তাকে 'চৈতন্য যুগ' বলে আখ্যায়িত। চৈতন্যদেবের ভক্তদের মতে তিনি কৃষ্ণের অবতার; কিন্তু তাঁর দেহকান্তি ও আচরণ বিরহিণী রাধার মতো। তাই তাঁকে বলা হয় রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। মৃত্যু. ২৯ জুন ১৫৩৩।

চৌধুরী জহুরুল হক (১৯৪৭-২০০৮)॥ জন্ম. মনেয়াবাদ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, ১.৩.১৯৪৭। অধ্যাপক, সাহিত্যসাধক ও গবেষক। পিতা ফজলুল হক চৌধুরী ও মাতা মসউদা খানম। মাধ্যমিক শিক্ষা মাদ্রাসায়। প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে প্রবেশিকা পাস (১৯৬২)। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৬৪) ও বাংলায় স্নাতক সম্মান (১৯৬৮) এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯৬৯)। নিজামপুর কলেজ চট্টগ্রাম (১৯৭০), মুরারিচাঁদ কলেজ সিলেট (১৯৭০) ও চট্টগ্রাম কলেজে শিক্ষকতার (১৯৭১-১৯৭৫) পর ১৯৭৫-এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন। আমৃত্যু এখানেই অধ্যাপনারত ছিলেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ১৯৬০-এর দশকে 'চোঙ্গা গল্প' নামে নতুন সাহিত্যধারা প্রবর্তন প্রচেষ্টায় দৃষ্টি আকর্ষণ। মাহবুবুল আলম চৌধুরী রচিত একুশের প্রথম কবিতার পূর্ণ পাঠ উদ্ধার তাঁর অন্যতম বিশেষ অবদান। বেতার ও টিভি নাটক রচনা করেছেন বেশ কিছু। প্রকাশিত গ্রন্থ— ছোটগল্প: চোঙ্গাগল্প (১৯৬৯), কথার কথা (১৯৭০), শাড়ির রঙে রঙ (২০০২); নাটক: কল্পিত কল্পনা (১৯৮৩); প্রবন্ধ ও গবেষণা: কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন রচিত একশৃঙ্গ নাটক বা ভগবান বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজীবনী (১৯৮৭), সুচরিত চৌধুরীর কবিতা (২০০১), প্রসঙ্গ: একুশের প্রথম কবিতা; শিশুসাহিত্য: ছোটদের গল্প (১৯৭০); সম্পাদনা: ইংগিত (১৯৬৫), সাতসতেরো (১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭৬, ১৯৭৮), ঐতিহ্য (১৯৬৯), চোঙ্গাগল্প (১৯৭৩), এবনে গোলাম নবীর পাঠশালার স্মৃতি ও অন্যান্য (১৯৯৯) একুশের শ্রেষ্ঠ সংকলন হিসেবে ঐতিহ্য কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রথম পুরস্কার লাভ করে (১৯৬৯)। তাঁর রচনাসমগ্র তিন খণ্ডে প্রকাশিত (২০০৯-২০১০)। মাইনুল হাসান চৌধুরীর

অনুবাদে কল্পিত কল্পনা ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে Grudge or Fantasy শিরোনামে। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অবদানের জন্যে অবসর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সম্মাননা (২০০৫), সুখেন্দু স্মৃতি নাট্যপদক (মরণোত্তর,২০০৯) সহ বিভিন্ন সম্মাননা অর্জন। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ৩.১.২০০৮।

চৌধুরী শামসুর রহমান (১৯০২-১৯৭৭)॥ জন্ম. চম্পকনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৯০২। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ১৯২৬-এ 'দৈনিক সুলতান'-এ সাংবাদিক হিসেবে যোগদান। ১৯২৭-এ সাপ্তাহিক 'মুসীলম বাণী'-তে যুগ্ম সম্পাদক, সাপ্তাহিক 'হানাফী-তে



সহ-সম্পাদক এবং ১৯২৯-এ হানাফীর প্রধান সম্পাদক পদে যোগদান। ১৯৩৮-এ সরকারি চাকরিতে যোগদান করে 'বাংলার কথা' ও 'বেঙ্গল উইকলী'তে সহ-সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৬০-এ গণসংযোগ বিভাগে সহকারী পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। জীবনী, উপন্যাস, গল্প, অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ৩০টি গ্রন্থ রচনা। প্রবন্ধঃ মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্রিকা, পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামের আলো (১৯৫৬), শেরে বাংলা ফজলুল হক (১৯৬২), ছেলেদের কায়দে আজম (১৯৫৪)। স্মৃতিকথাঃ পঁচিশ বছর (১৯৫৮), উপন্যাসঃ মস্তানগড় (১৯৬২), ছবি। গল্পঃ ফুটপাত (১৯৬৮)। অনুবাদঃ নিষিদ্ধ ফল (১৯৬০), তাসকিরাতুল ওয়াকিয়াত (১৯৬৮), টমাস জেফারসন (১৯৫৮), প্রজাপতির বিচিত্র কথা (১৯৬২), মেক্সিকো (১৯৬৭), অভ্যন্তরে (১৯৬৯)। ভ্রমণ কাহিনীঃ মুসাফির (১৯৫০)। মৃত্যু. ঢাকা, ৩ জানুয়ারি ১৯৭৭।

ছবি বিশ্বাস (১৯০০-১৯৬২)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৩ জুলাই ১৯০০। পিতা ভূপতিনাথ বিশ্বাস। চলচ্চিত্র ও নাট্যাভিনেতা। অন্নপূর্ণার মন্দির ছায়াছবিতে প্রথম অভিনয় (১৯৩৬)। পরবর্তীকালে চোখের বালি, কাবুলিওয়ালা, প্রতিশ্রুতি, শুভদা, জলসাঘর, দেবী, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও হেড মাস্টার ছবিতে অনুপম অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন। মঞ্চ নাটকের অভিনয়েও প্রসিদ্ধি লাভ। সমাজ, ধাত্রীপান্না, মীর কাসিম, দুইপুরুষ ও বিজয়া নাটকে মনোরম অভিনয়। প্রতিকার



(১৯৪৪) এবং যার যেথা ঘর (১৯৪৯) ছায়াছবির পরিচালক। অভিজাত ও ব্যক্তিত্ববান চরিত্রে হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। সংগীত-নাটকে আকাদেমি কর্তৃক শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান প্রদান (১৯৫৯)। মৃত্যু. মোটরগাড়ি দুর্ঘটনায়, ১১ জুন ১৯৬২।

জগদিন্দ্রনাথ রায়, মহারাজ (১৮৬৮-১৯২৬)॥



জন্ম. হরিশপুর গ্রাম, নাটোর, ২৬ অক্টোবর ১৮৬৮। জমিদার ও লেখক। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ শ্রীনাথ রায়ের পুত্র। পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন ব্রজনাথ। আঠারো মাস বয়সে নাটোরের নিঃসন্তান বিধবা রানী ব্রজসুন্দরী (রাজা গোবিন্দনাথের স্ত্রী) কর্তৃক তাঁকে দত্তক গ্রহণ। রাজবাড়িতে আনয়নের পর তাঁর নাম রাখা হয় জগদিন্দ্রনাথ রায়। ১৮৭৭-এ বড়লাট লর্ড লিটন কর্তৃক জগদিন্দ্রনাথের মহারাজ উপাধি অনুমোদন। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস (১৮৮৬)। রাজশাহী কলেজে এফ.এ. ক্লাসে ভর্তি। এখানে দুই বছর অধ্যয়ন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় এফ.এ. পরীক্ষা না দিয়ে কলেজের পাঠত্যাগ। রোগমুক্তির পর রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ ও রাজনীতিতে প্রবেশ। ১৮৯৪-তে প্রথমবার ও ১৮৯৭-তে দ্বিতীয়বার রাজশাহী বিভাগে মিউনিসিপ্যালটিসমূহের পক্ষ হতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। বেঙ্গল ল্যান্ড হোলডার্স অ্যাসোসিয়েশনের (১৯০১) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। কলকাতায় রানি ভবানী স্কুল স্থাপন করে সেখানে দুই বছর শিক্ষকতা। নাটোর স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নাটোর ও ময়মনসিংহের মধুপুরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন। লেখক ও সাহিত্য

পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। প্রথমে 'মানসী', পরে 'মর্মবাণী' এবং সর্বশেষে 'মানসী ও মর্মবাণী' সাহিত্যপত্র সম্পাদনা। গান, কবিতা ও ইতিহাস-গ্রন্থ রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান। গ্রন্থ: সন্ধ্যাতারা (কবিতা গ্রন্থ, ১৯১৭), নূরজাহান (ঐতিহাসিক-গ্রন্থ, ১৯১৭), শ্রুতি-স্মৃতি (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)। মৃত্যু. সড়ক দুর্ঘটনায়, ৫ জানুয়ারি ১৯২৬।

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)॥ জন্ম. আমলাপাড়া, কুষ্টিয়া। কথাসাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস খোর্দ মেঘচারমি গ্রাম, ফরিদপুর। কুষ্টিয়া আদালতের আইনজীবী কৈলাশচন্দ্র গুপ্ত তাঁর পিতা। কলকাতা সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিক পাস (১৯০৫)। কলকাতা রিপন কলেজে ভর্তি। এফ.এ. পরীক্ষা না দিয়ে কলেজের পাঠ ত্যাগ (১৯০৭)। কলকাতা কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে শর্টহ্যান্ড ও টাইপ-রাইটিং শিক্ষা গ্রহণ। সিউড়ি (বীরভূম) জজকোর্টে টাইপিস্টের চাকরি লাভ (১৯০৮)। সেখানে ৪/৫ বছর চাকরি করার পর উড়িষ্যার সম্বলপুরে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে পুনরায় টাইপিস্টের চাকরি গ্রহণ (১৯১৩)। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায় চাকরিতে ইস্তফা দান। কলকাতায় 'Jago's InkŌ নামে ফাউন্টেনপেনের কালি তৈরির এক কারখানা খোলেন। এ ব্যবসায় উন্নতি করতে না পেরে ১৯২৭-এ বোলপুরের চৌকি আদালতে আবার টাইপিস্টের চাকরিতে যোগদান। সেখানে ১৭ বছর চাকরি করার পর ১৯৪৪-এ অবসর গ্রহণ। এরপর কুষ্টিয়ায় বাস। দেশবিভাগের (১৯৪৭) পর কুষ্টিয়া ত্যাগ করে কলকাতায় গমন ও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস। ছোটগল্পের বিশিষ্ট শিল্পী। গভীর জীবনবোধ, সুঠাম কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যে তাঁর ছোটগল্প সমৃদ্ধ। মনোবৈকল্য ও মনোবিশ্লেষণ এবং দুঃখময়তার নিপুণ বর্ণনায় জগদীশ গুপ্তের শিল্পকর্ম এক অসাধারণ সৃষ্টি। সামাজিক অন্যায়-অবিচারের চেয়ে অদৃষ্টলিপিই দুঃখময়তার কারণ বলে তাঁর গল্পে বিশ্লেষিত। গল্পগ্রন্থ: বিনোদিনী (১৯২৭), রূপের বাহিরে (১৯২৯), শ্রীমতী (১৯৩০), উদয়লেখা (১৯৩২), শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী (১৯৩৪), মেঘাবৃত অশনি (১৯৪৭), স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৫০)। উপন্যাস: অসাধু সিদ্ধার্থ (১৯২৯), লঘুগুরু, দুলালের দোলা (১৯৩১), নিষেধের পটভূমিকায় (১৯৫২), কলঙ্কিত তীর্থ (১৯৬০)। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯৫৭।



জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭)॥ জন্ম. রাঢ়িখাল গ্রাম, বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮। প্রখ্যাত পদার্থ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। পিতা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসু। স্ত্রী। অবলা বসু (দুর্গামোহন দাশের কন্যা)। পিতার কর্মক্ষেত্র ফরিদপুরে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ। কলকাতায় প্রথমে হেয়ার স্কুলে, পরে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে অধ্যয়ন। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস। ১৮৮০-তে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ। ডাক্তারি পড়ার জন্য ইংল্যান্ড গমন। লন্ডনে মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে এক বছর চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়ন। ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে ডাক্তারি পড়া ত্যাগ করে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি। ১৮৮৪-তে বিজ্ঞান অনার্সসহ (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান) বি.এ. পাস। একই বছর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. ডিগ্রি লাভ। দেশে প্রত্যাবর্তন। ১৮৮৫তে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত। অধ্যাপনার ফাঁকে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় মনোনিবেশ। আকাশ-তরঙ্গ ও বৈদ্যুতিক চুম্বক-তরঙ্গের উপর গবেষণা করতে গিয়ে বেতার বার্তার সূত্র আবিষ্কার। বিনাতারে শব্দ প্রেরণের 'ক্রিস্টাল রিসিভার' নামক যে বেতার যন্ত্রটি তিনি আবিষ্কার করেন তার সাহায্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে কলকাতার ইন্টালি কনভেন্ট রোডস্থ তাঁর বাসভবনে সাংকেতিক শব্দ প্রেরণ। এছাড়া নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে অদৃশ্য-আলোকেও দৃশ্য-আলোকের সকল ধর্ম বর্তমান এ তত্ত্ব প্রমাণ। বিবিধ পরীক্ষার মাধ্যমে আরো প্রমাণ করেন যে, অদৃশ্য-আলোক ইট-পাটকেল, ঘর-বাড়ি ভেদ করে অনায়াসেই চলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে জৈব ও অজৈব পদার্থের উত্তেজনার ফলে



সাড়ার সমতা সম্পর্কে গবেষণা। এ গবেষণায় তিনি ধাতু, উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশির উপর নানা পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উত্তেজনায় ঐ তিন ভিন্ন জাতীয় পদার্থ একইভাবে সাড়া দেয়। তৃতীয় পর্যায়ে জড় ও প্রাণীর মধ্যগত বস্তু হিসেবে উদ্ভিদের উপর প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উত্তেজনার ফলাফল সম্পর্কে গবেষণা। নিজের তৈরি ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম সঞ্চালনকে বহুগুণে বর্ধিত করে দেখান যে, তথাকথিত অনুত্তেজনীয় উদ্ভিদও বৈদ্যুতিক আঘাতে সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়। এ-সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য স্ফিগ্‌মোগ্রাফ, পোটোমিটার ফোটোসিনথেটিক বাবলার প্রভৃতি স্বয়ংলেখ যন্ত্র আবিষ্কৃত। এ-সকল যন্ত্রের দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদেরও জীবন বা অনুভূতি আছে। ১৯১৫-তে অধ্যাপনার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ। অতপর ইমিরেটারস অধ্যাপক পদ লাভ। ১৯১৭-র ৩০ নভেম্বর তৎকর্তৃক কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা। সেখানে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালনা। ১৮৯৬-তে লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে ও লন্ডনে রয়্যাল ইনস্টিটিউটে 'অদৃশ্য-আলোক' সম্পর্কে এবং ১৯০০-তে প্যারিসে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কংগ্রেসে 'জীব ও জড় পদার্থের উপর বৈদ্যুতিক ঐক্য' সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান। রয়্যাল সোসাইটির সদস্য (১৯২০), লীগ অব নেশন্সের ইন্টেলেকচুয়্যাল কো-অপরারেশন কমিটির সদস্য (১৯২৬-১৯৩০), ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (১৯২৭), ভিয়েনার একাডেমি অব সায়েন্সের বৈদেশিক সদস্য (১৯২৮) ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি (১৩২৩-১৩২৫)। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.এসসি. (১৮৯৬), ভারত সরকার কর্তৃক নাইট (১৯১৫) ও ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সি.এস.ই. (১৯১৯) উপাধি প্রদান। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী। অদৃশ্য-আলোকের ধর্ম, বেতার যন্ত্র ও গাছে প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল আসন লাভ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন। বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়গুলো সহজ ও সাবলীলভাবে বাংলায় প্রকাশ। বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ 'অব্যক্ত' (১৯২১) নামক গ্রন্থে সংকলিত। ইংরেজি রচনাবলি: Responses in the Living and Non-living (1902), Plant Responses as a Means of Physiological Investigation (1906), Comparative Electrophysiology (1907), Physiology of the Asent of Sap (1923), Physiology of Photosynthesis (1924), Nervous Mechanism of Plants (1925), Collected Physical Papers (1927), Motor Mechanism of Plants (1928), Growth and Tropic Movement in Plants (1929)। মৃত্যু. গিরিডি, ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭।

জগদ্বন্ধুসুন্দর (১৮৭১-১৯২১)॥ জন্ম. ডাহাপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিতার কর্মস্থলে, ১৯ এপ্রিল ১৮৭১। পৈতৃক বাস গোবিন্দপুর,



ফরিদপুর। বৈষ্ণব ধর্মগুরু, সমাজ-সংস্কারক ও লেখক। পিতা দীননাথ চক্রবর্তী ন্যায়রত্ন, মাতা বামাসুন্দরী দেবী। ছোটবেলায় পিতা মৃত্যুবরণ করলে পাবনায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে পড়ালেখা শুরু। ১৮৭৮-এ তিনি ফরিদপুরে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়িতে ফিরে আসেন। ১৮৭৯-তে পিতৃবিয়োগ। ১৮৮৪-তে ফরিদপুর জিলা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি। ১৮৮৬-তে ফরিদপুর জিলা স্কুল ছেড়ে রাঁচীতে গিয়ে পাঠগ্রহণ। পরে পাবনা জিলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি। নামকীর্তন ও মৃদঙ্গধ্বনির প্রতি আকর্ষণ বোধ। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখার পর অসমাপ্ত। বৃন্দাবনসহ তীর্থস্থান পরিভ্রমণ। ১৮৮৯-এ ভারতের বাকচরে শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা। ১৮৯৯-এ ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা। ফরিদপুর শহরের বুনো বাগদীদের অস্পৃশ্যতা মোচন করে 'মোহান্ত সম্প্রদায়'-এ রূপান্তর। ১৯০২ থেকে মৌনাবলম্বন ও নিভৃতবাস। এ-সময় ভক্তদের অনুরোধে মাঝে-মাঝে দোলায় চেপে ভ্রমণ করতেন। ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরে তাঁর আশ্রম রয়েছে। আমেরিকায় 'শ্রীকৃষ্ণ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা। প্রচারিত মহানাম—'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ। চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন॥' তাঁর অনুসারীরা 'মহানাম সম্প্রদায়' বলে পরিচিত। রচিত গ্রন্থ: চন্দ্রপাত, হরিকথা, শ্রীমতী সংকীর্তন, শ্রীশ্রীনামসংকীর্তন, পদাবলী, বিবিধ সংগীত ও ত্রিকালগ্রন্থ। সম্পাদিত পত্রিকা: মাসিক মহাউদ্ধারণ। মৃত্যু. ফরিদপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২১।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭)॥ জন্ম. ব্রডমিড, ইংল্যান্ড, ১৮ আগস্ট ১৭৯৪। শ্রীরামপুর মিশনারি গোষ্ঠীর অন্যতম ব্যক্তিত্ব। পিতা শ্রীরামপুর স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জোশুয়া মার্শম্যান। ১৭৯৯-তে পিতার সঙ্গে কলকাতায় আগমন। বাল্যকাল কাটে শ্রীরামপুর মিশনে এবং এখানেই শিক্ষালাভ। ১৮১৮-তে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত। ১৮১৯-এ আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের যাজক-সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৮২২-১৮৫২ পর্যন্ত শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শ্রীরামপুর মিশনারি কলেজ পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। প্রায় ত্রিশ বছর কাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে অবদান রাখেন। দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ, ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া ও গভর্নমেন্ট গেজেট পত্রিকা সম্পাদনা। বাংলা, হিন্দি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা অর্জন। জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত। তৎকালে রেল, তার ও শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা। রচিত গ্রন্থাদি: 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (২য় খণ্ড), 'পুরাবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' (১৮৩৩), 'জ্যোতিষ গোলাধ্যায়', 'সদ্‌গুণ ও বীর্যের ইতিহাস' (১৮২৯), 'ঈশপ্‌স্ ফেবলস' ক্ষেত্রবাগান বিবরণ, 'Murray's Grammar প্রভৃতি। ১৮৫২-তে ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশ প্রত্যাগমন। মৃত্যু. ৮ জুলাই ১৮৭৭।



জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৭৭৫-১৮৪৬)॥ জন্ম. বজরাপুর গ্রাম, নদীয়া, ৭ অক্টোবর ১৭৭৫। পণ্ডিত, সাহিত্য ও সংস্কৃতসেবী। পিতার নিকট সংস্কৃত, সাহিত্য ও ফারসি শিক্ষা গ্রহণ। কর্ম-জীবনের প্রথম তিন বছর প্রাচ্যতত্ত্ববিদ হেনরি টমাস কোলব্রুকের সংস্কৃত শিক্ষকরূপে দায়িত্ব পালন। ১৮০৫ থেকে ১৮২৩ পর্যন্ত শ্রীরামপুর মিশনে উইলিয়াম কেরীর অধীনে কর্মরত। এ সময় কিছুকাল মিশন স্কুলে শিক্ষকতা। এছাড়া ১৮১৮ থেকে ১৮২৩ পর্যন্ত জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত। এই পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন রচনায় কঠিন সংস্কৃতবহুল শব্দকে দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী করে সহজ বাংলায় রূপদান। ১৮২৪-এ সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হলে এই কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এখানে অধ্যাপনা। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও তারাশঙ্কর তর্করত্নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাধাকান্ত দেব প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভার সদস্য এবং এই সভার দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষা কাজ সম্পাদন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: শিক্ষাসাগর (২ সং১৮১৮), বিল্বমঙ্গল-কৃত হরিভক্তিমূলক সংস্কৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ/কৃষ্ণবিষয়ক শ্লোক (১৮১৭), কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সম্পাদনা-চণ্ডী (১৮১৯), চিঠিপত্র, দরখাস্ত ইত্যাদির নমুনার সংকলনপত্রের ধারা (১৮২১), রামায়ণের সম্পাদনা: বাল্মীকিকৃত রামায়ণ (শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮৩০-১৮৩৪-এ প্রকাশিত), কাশীরাম দাসের মহাভারতের সম্পাদনা: মহাভারত (১৮৩৬), পারসিক শব্দের অভিধান: পারসিক অভিধান (১৮৩৮), বাংলা ভাষার অভিধান: বঙ্গাভিধান (১৮৩৮) প্রভৃতি। মৃত্যু. ১৩ এপ্রিল ১৮৩৬।



জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬)॥ জন্ম. পিতার কর্মক্ষেত্র কেন্দুয়ায়, কিশোরগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর ১৯১৪। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। পিতা পুলিশ বিভাগের জমাদার তমিজুদ্দীন আহমদ। আদি নিবাস পাবনা। ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রপিতামহের ময়মনসিংহ জেলায় আগমন। প্রথমে দরীরামপুর, পরে মুক্তাগাছায় ও সবশেষে ময়মনসিংহ শহরে বাড়ি নির্মাণ। ময়মনসিংহ মৃত্যুঞ্জয় হাই স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। কলকাতায় সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি (১৯৩৩)। এ ইনস্টিটিউশনে পঞ্চম বর্ষে অধ্যয়নকালে কলকাতা যাদুঘরে সর্বভারতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এক চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁর ছয়টি জলরঙের চিত্র প্রদর্শিত। এ ছয়টি চিত্রই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে গৃহীত এবং পুরস্কার হিসেবে 'গভর্নরস গোল্ড মেডেল' লাভ। ১৯৩৮-এ ফাইন আর্টসে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতক

ডিগ্রি লাভ। একই বছর কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত। ১৩৫০ (১৯৪৩ খ্রি.) এর দুর্ভিক্ষের সময়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের স্কেচ অঙ্কন করে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আগমন। নর্মাল স্কুলের ড্রইং শিক্ষক নিযুক্ত। কামরুল হাসান, শফিউদ্দীন আহমদ, আনোয়ারুল হক, শফিক-উল-আমীন, খাজা শফিক আহমেদ প্রমুখ শিল্পীবন্ধুর সহযোগিতায় ঢাকা সরকারি আর্ট স্কুল (বর্তমানে বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট) প্রতিষ্ঠা (১৯৪৮)। সরকারের তথ্য বিভাগের প্রধান শিল্পী পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৪৯-এর ১ মার্চ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদে যোগদান। ১৯৫১-তে ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও তুরস্ক সফর ও সে সব দেশে তাঁর ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠান। ১৯৬৩-তে ঢাকা আর্ট স্কুলকে আর্ট কলেজে উন্নীতকরণে ও ১৯৬৫-তে পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে চারুকলা অনুষদ প্রতিষ্ঠায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। ১৯৬৭-তে আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯৭০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা আর্ট কাউন্সিল ভবনে (বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী) নবান্ন চিত্র প্রদর্শনীর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। এ প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য ৬৫ ফুট দীর্ঘ কাগজের স্ক্রল-এ অঙ্কন করেন শাশ্বত বাঙালি জীবনের এক আকর্ষণীয় চিত্রকর্ম। একই বছর আরব লীগের আমন্ত্রণে মিসর, সিরিয়া, জর্ডান ও লেবানন ভ্রমণ। ফিলিস্তিনি গেরিলা যোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিদর্শন করে তার ওপর চিত্র অঙ্কন। আরব ফিলিস্তিনিদের গেরিলা ক্যাম্পে সে সব ছবির প্রদর্শনী করে গেরিলা যোদ্ধাদের উৎসাহিত। ১৯৭০-এর ১২ নভেম্বর এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস দেশের উপকূল অঞ্চলে আঘাত হানলে যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য মনপুরা সফর। তার ওপর ভিত্তি করে ৬ ফুট কাগজের স্ক্রল-এ অঙ্কন করেন আর এক অপূর্ব চিত্রকর্ম। চিত্রটির নামকরণ করেন 'মনপুরা-৭০'। মনপুরার ধ্বংসযজ্ঞ ও বেদনা তাঁর এ ছবিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ চিত্রে মানুষ ও গরু-ছাগলের মৃতদেহ একসঙ্গে স্তূপকার হয়ে রয়েছে। সে ধ্বংসস্তূপের ওপর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে একমাত্র জীবিত একটি মানুষ, এক বলিষ্ঠ যুবক। ১৯৭১-এর মার্চে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন, বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান সামরিক সরকারের নিপীড়নের প্রতিবাদে 'হেলালে ইমতিয়াজ' উপাধি বর্জন। সে সময় স্বাধীনতার বক্তব্য সম্বলিত পোস্টার-ফেস্টুনে সজ্জিত চিত্রশিল্পীদের এক বিরাট মিছিলের নেতৃত্ব দান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে (১৯৭১) পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঢাকা ত্যাগ এক পাড়াগাঁয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। ১৯৭৩-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯৭৪-এ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক পদ প্রদান। তাঁর উৎসাহে ও পরামর্শে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা (১৯৭৪)। একাডেমির পরিচালনা পরিষদের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত। ১৯৭৫-এ তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় এবং সরকারি উদ্যোগে সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত। সোনারগাঁয়ে লোকশিল্প যাদুঘর ও লোকশিল্পী গ্রাম প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর আজীবনের এক স্বপ্ন। ক্ষণজন্মা চিত্রশিল্পী। প্রকৃতি ও মানুষ তাঁর চিত্রের প্রধান আকর। কালো কালির বলিষ্ঠ রেখায় নিপীড়িত, শ্রমজীবী ও সংগ্রামী মানুষের চিত্র অঙ্কন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন। জীবনমুক্তির ব্যঞ্জনায় তাঁর চিত্রকলা এক অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁর বিদ্রোহ শীর্ষক চিত্রে এর পরিচয় সুস্পষ্ট; একটি গাভীর প্রতীকে এ চিত্রটি অঙ্কিত। অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। ষাটের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় (বর্তমানের বাংলাদেশ) যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংঘটিত হয় সে আন্দোলনের একজন পৃষ্ঠপোষক। তাঁর অঙ্কিত ছবির মধ্যে ১১৫০টি ছবির সন্ধান লাভ। ১৯৭৫-এ ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালায় ৭০টি ছবি সংরক্ষিত। জাতীয় যাদুঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জয়নুল আবেদিন গ্যালারি। প্রায় ৭০০ ছবি তাদের সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' পুরস্কার লাভ (১৯৫৯)। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক 'ডি-লিট' উপাধি প্রদান। মৃত্যু, ঢাকা, ফুসফুসের ক্যান্সার রোগে, ২৮ মে ১৯৭৬।

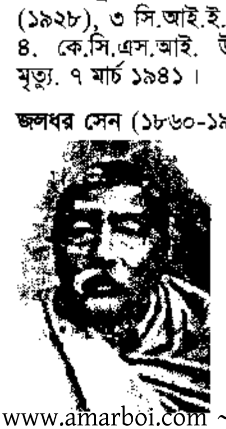
জয়েনউদ্দিন (১৫শ শতক)॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি। গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১) সভাকবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'রসুল বিজয়'। এটি মৌলিক রচনা নয়; কোনো ফারসি কাব্যের অনুসরণে লিখিত। এ কাব্যে মহানবীর বিজয় কাহিনী বর্ণিত। 'রসুল বিজয়' বাংলা সাহিত্যের মুসলিম রচিত বিজয়-কাব্যধারার আদি কাব্য হিসেবে পরিচিত।

জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন (১৮৫১-১৯৪১)॥ জন্ম. ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড, ৭ জানুয়ারি ১৮৫১। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক। প্রাথমিক শিক্ষা সেন্টবীম ও শ্রীউসবরী বিদ্যালয়ে। পরে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন। এখানে গণিত-শাস্ত্রের সঙ্গে সংস্কৃত ও হিন্দুস্তানি ভাষা শিক্ষা।



পরে কেম্ব্রিজ ও জার্মানির হালে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। ভারতীয় ভাষা শিক্ষা ও অনুশীলনে বিশেষ উৎসাহী। ১৮৭৩-এ ভারতে আগমন। ১৮৭৩-১৮৮৮ পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নানা অঞ্চলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, স্কুল পরিদর্শক, কালেক্টর ও অহিফেন এজেন্ট। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি, মৈথিলি, মগহি, ভোজপুরি, ছাওগড়ি, বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন। ১৮৭৭-এ রংপুরের উপভাষা সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৮৮১-১৮৮২-তে এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রথম বিদ্যাপতির পদাবলি সম্বলিত An introduction to the Maithili Language of North Bihar ১৮৮৩-১৮৮৭-র মধ্যে কলকাতা থেকে আট খণ্ডে প্রকাশিত হয় Seven Garmmars of the Dialects and subdialects of the Bihar Language নামক গ্রন্থ। এই পর্যায়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: Maithili Grammar for an Introduction to the Maithili Dialect of the Bihari Language of North Bihar. বিহারের জনজীবনের উপর আঞ্চলিক শব্দসম্বলিত রচিত তথ্যবহুল গ্রন্থ: Bihar Peasent Life. ১৮৮৫-তে কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ১৮৯৫-১৮৯৬-এ আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় তুলনামূলক আলোচনাসমৃদ্ধ On the Phonology of the Modern Indo-Aryan Vernaculars নামক সন্দর্ভ জার্মানির প্রাচ্যবিদ্যা সমিতির মুখপত্র ZDMG-তে প্রকাশিত। ভারতে ভাষা-সমীক্ষার প্রয়োজনে তাঁরই তত্ত্বাবধানে গঠিত Linguitic Survey of India সংস্থার পক্ষে ১৮৯৮-১৯০২ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ। ১৯০৩-এ সরকারি কাজ থেকে অবসর নিয়ে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন। জীবনের শেষ আটত্রিশ বছর মূলত ভারততত্ত্ব ও ভারতীয় বিদ্যাচর্চায়ই অতিবাহিত। ১৯০৩-১৯২৮-এর মধ্যে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তৎকালীন ভারতে প্রচলিত ১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষার বিবরণ সম্বলিত Linguistic Survey of India নামক ভাষা সমীক্ষামূলক গবেষণাকর্ম মোট বিশ খণ্ডে প্রকাশিত। কাশ্মীরি ভাষা সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Essays on Kashmiri Grammar (১৮৯৯), A Manual of the Kashmiri Language (১৯১১) ও চার খণ্ডে প্রকাশিত A Dictionary of the Kashmiri Language (১৯১৬-১৯৩২) উল্লেখযোগ্য। সম্পাদিত গ্রন্থ: The Kashmiri Ramayana, Comprising the Sriramavataracarita and the Lava-Kusayudha Carita of Divakara Prakasa Bhatta (১৯৩০)। এ ছাড়া তাঁর সম্পাদনায় হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সীর 'পদুমাবতে'র একটি সংস্করণ প্রকাশিত। গিয়ার্সন ভারতবর্ষের যে বহুবিচিত্র ভাষা মানচিত্র গড়ে তুলেছেন, তা ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীদের ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের আলোচনার প্রামাণিক ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়। সম্মান: ১. সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি-ডাবলিন, অক্সফোর্ড, পাটনা ও হালে (জার্মানি) বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত। ২. ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত Order of Merit উপাধি প্রদান (১৯২৮), ৩ সি.আই.ই. উপাধি লাভ (১৮৮৪), ৪. কে.সি.এস.আই. উপাধি লাভ (১৯১২)। মৃত্যু. ৭ মার্চ ১৯৪১।

জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯)॥ জন্ম. কুমারখালী গ্রাম, কুষ্টিয়া, ১৩ মার্চ, ১৮৬০। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। কুমারখালী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস (১৮৭৮)। কলকাতায় জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি। এল. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে



প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি। ১৮১৮-তে গোয়ালন্দ স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত। এ স্কুলের শিক্ষকতাকালে স্ত্রী, কন্যা ও মাতাকে হারিয়ে মনের প্রশান্তি লাভের জন্য হিমালয় যাত্রা। কিছুদিন দেরাদুনে শিক্ষকতা। হিমালয় থেকে ফিরে এসে ১৮৯১-তে মহিষাদল রাজ স্কুলে শিক্ষকতার কর্মে যোগদান। ১৮৯৪-তে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ। ১৮৯৯-তে শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় আগমন। কিছুদিন সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে দায়িত্ব পালন(১৮৯৯)। ১৯০৭-এর ডিসেম্বরে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯০৯-এ এই পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন। সন্তোষের রাজের গৃহশিক্ষক ও দেওয়ান হিসেবে দুই বছর সন্তোষে অবস্থান (১৯০৯-১৯১১)। এক বছর 'সুলভ সমাচার' সম্পাদনা (১৯১১)। এরপর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯১৩ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর এ পত্রিকা সম্পাদনা। ভ্রমণ কাহিনীর লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। তাঁর হিমালয় ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের বৃত্তান্ত তাঁর 'প্রবাসচিত্র' (১৮৯৯) ও 'হিমালয়' (১৯০০) গ্রন্থে সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় বিবৃত। গল্প ও উপন্যাস রচয়িতা হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ ও প্রেম-বিরহের নিটোল চিত্র হিসেবে তাঁর কথাসাহিত্য এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। 'নৈবেদ্য' (১৯০০), 'কাঙ্গালের ঠাকুর' (১৯২০), 'বড় মানুষ' (১৯২৯) প্রভৃতি তাঁর গল্পগ্রন্থ। 'দুঃখিনী' (১৯০৯), 'অভাগী' (১ম খণ্ড-১৯১৫, ২য় খণ্ড-১৯২২ ও ৩য় খণ্ড-১৯৩২), 'উৎস' (১৯৩২) প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস। 'কাঙ্গাল হরিনাথ' (১ম খণ্ড-১৯১৩ ও ২য় খণ্ড-১৯১৪) জলধর সেন রচিত জীবনী গ্রন্থ। 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী' ও 'প্রথম নাথের কবিতাগ্রন্থাবলী' তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' সহসভাপতি (১৯১২-১৯১৩ ও ১৯৩৬-১৯৩৭)। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান (১৯২২)। মৃত্যু. কলকাতা, ১৫ মার্চ ১৯৩৯।

জসিমউদ্দীন আহমেদ (১৯৩৫-১৯৬৪)॥ জন্ম. ডুরিআঙ্গুল লেন, পিলখানা, ঢাকা, ১ জানুয়ারি ১৯৩৫। গিটার ও বেঞ্জোবাদক। ১৯৬২-তে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ। পিতার অনুপ্রেরণায় প্রথমে বেঞ্জোবাদন শিক্ষা গ্রহণ। পরে প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ধীর আলী মিয়ার কাছে বাঁশি ও গিটার যন্ত্রে তালিম গ্রহণ। ১৯৪৬ থেকে একজন বাদ্যযন্ত্রী হিসেবে তদানীন্তন অল ইন্ডিয়া রেডিও ঢাকা কেন্দ্রে যোগদান। ১৯৫৬ থেকে এককভাবে বেঞ্জো, গিটার ও বাঁশি পরিবেশন শুরু। বুলবুল ললিতকলা একাডেমি ও সুরভি সংগীত নিকেতনের সংগীত শিক্ষক। ১৯৪৯-১৯৫২ পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 'ঢাকা শিল্পী সঙ্ঘ' পরিবেশিত বিভিন্ন নৃত্যনাট্যের সংগীত পরিচালক। 'প্রাথমিক যন্ত্রসংগীত শিক্ষা' নামে সংগীত বিষয়ক একটি গ্রন্থের রচয়িতা। মৃত্যু. ঢাকা, ৩১ আগস্ট ১৯৬৪।

জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)॥ জন্ম মাতুলালয়, তাম্বুলখানা গ্রাম, ফরিদপুর, ১ জানুয়ারি ১৯০৩। পৈতৃক নিবাস গোবিন্দপুর গ্রাম, ফরিদপুর। কবি। পিতা ফরিদপুর শহরের হিতৈষী পাঠশালার শিক্ষক আনসারউদ্দীন মোল্লা। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে



মেট্রিক পাস। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ. (১৯২৯) পাস। ১৯৩১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৩১-১৯৩৭ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট। ১৯৩৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৪৩ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৪৪-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের পাবলিসিটি বিভাগের অফিসার নিযুক্ত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগের Additional Song Publicity Organiser পদে যোগদান। ১৯৬২-তে প্রচার বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ। ঢাকার কমলাপুরে নিজের নির্মিত বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস। ১৯৭৬-এর ১৩ মার্চ মৃত্যুমুখে পতিত। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে ১৪ মার্চ (১৯৭৬) ফরিদপুরের

অম্বিকাপুর গ্রামে তাঁর দাদীর কবরের পার্শ্বে সমাহিত। পল্লী-কবি বলে খ্যাত। ছাত্র-জীবনেই তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশ ঘটে। কলেজে অধ্যয়নকালে 'কবর' কবিতা রচনা করে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত চিত্র তাঁর কবিতায় কুশলতার সঙ্গে অঙ্কিত। এ অঙ্কন রীতিতে আধুনিক শিল্প-চেতনার ছাপ সুস্পষ্ট। নক্সী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪) ও মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩) তাঁর বিখ্যাত গাথাকাব্য। রাখালী (১৯২৭), বালুচর (১৯৩০), ধানখেত (১৯৩৩), রূপবতী (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫৮) ও সুচয়নী (১৯৬১) তাঁর জনপ্রিয় খণ্ড-কবিতার সংকলন। গদ্যশিল্পী হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। যাঁদের দেখেছি (স্মৃতিকথা, ১৯৫২), ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (স্মৃতিকথা, ১৯৬১), ও জীবন কথা (আত্মজীবনী, ১৯৬৪) তাঁর সুখপাঠ্য গদ্যগ্রন্থ। হাসু (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশী (১৩৫৬), ডালিমকুমার (১৯৫১) রসালো শিশুতোষ গ্রন্থ। চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরীর দেশ (১৯৬৭), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮ প্রভৃতি তাঁর সুপরিচিত ভ্রমণকাহিনী। পদ্মাপাড় (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), মধুমালা (১৯৫১), পল্লীবধূ (১৯৫৬) ও গ্রামের মায়া তাঁর নাটক। বাঙ্গালীর হাসির গল্প (১ম খণ্ড-১৯৬০ ও ২য় খণ্ড-১৯৬৪) গল্পগ্রন্থ। বোবা কাহিনী (১৯৬৪) উপন্যাস। রঙ্গিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫), গাঙ্গের পাড় (১৯৬৪), জারিগান (১৯৬৮) প্রভৃতি তাঁর গানের সংকলন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত। 'নক্সী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯) কাব্যটি 'ফিল্ড অব দি এমব্রডারি কুইল্ট' নামে ইংরেজিতে অনূদিত ও প্রকাশিত। প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। ষাটের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান সরকার রেডিও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের পদক্ষেপ নিলে সরকারের সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন। বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনের (১৯৬৬-১৯৭১) অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার একজন দৃঢ় সমর্থক হিসেবে পরিচিত। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি প্রদান। সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদক (১৯৭৬) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ১৩ মার্চ, ১৯৭৬।

জহর গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৩-১৯৬৯)॥ জন্ম. সেতুপুর, চব্বিশ পরগনা, ১৯০৩। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা। ইন্টালী মাইনর স্কুলে অধ্যয়ন। ছাত্রজীবনে অভিনয় ছাড়াও ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলায় উৎসাহী। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মঞ্চে শতাধিক নাটকে অভিনয়। এছাড়াও সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক: দুই পুরুষ, মানময়ী গার্লস স্কুল, পথের দাবি, এন্টনী কবিয়াল ইত্যাদি। তিন শতাধিক ছায়াছবিতে অভিনয়। অভিনীত কয়েকটি ছায়াছবি: মানময়ী গার্লস স্কুল, কণ্ঠহার, নন্দিনী, শহর থেকে দূরে, অভয়া ও শ্রীকান্ত, সাহেব বিবি গোলাম, চিড়িয়াখানা, নিষ্কৃতি, মহাদান ইত্যাদি। মৃত্যু. ৭ জুন ১৯৬৯।



জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)॥ জন্ম. মজুপুর গ্রাম, ফেনী, ১৯ আগস্ট ১৯৩৫। পিতা কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক (পরে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ) মওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ। কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক। বাল্যে ও কৈশোরে কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউট ও আলিয়া মাদ্রাসায় বিদ্যাশিক্ষা। দেশভাগের (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। স্থানীয় আমিরাবাদ হাইস্কুল থেকে ১৯৫০-এ মেট্রিক ও ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৫৩-তে আই.এস.সি. পাস। সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন বলে বিজ্ঞান ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্সে ভর্তি। ১৯৫৮-তে বি.এ. অনার্স পাস। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। ১৯৫২-তে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায় গ্রেফতার। মুক্তিলাভের পর অটোগ্রাফি শেখার জন্য কলকাতায় প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল ফটোগ্রাফি স্কুলে ভর্তি। ১৯৫৬-র



শেষের দিকে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ। ১৯৬১-তে চিত্রনায়িকা সুমিতা দেবী এবং ১৯৬৮-তে চিত্রনায়িকা সুচন্দার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৬১-তে মুক্তি পায় তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'কখনো আসেনি' এরপর থেকে একে একে পরিচালনা করেন 'সোনার কাজল' (১৯৬২), 'কাঁচের দেয়াল' (১৯৬৩), 'বাহানা' (১৯৬৫), 'বেহুলা' (১৯৬৬), 'আনোয়ারা' (১৯৬৭), 'সঙ্গম' (১৯৬৪), 'জীবন থেকে নেয়া' (১৯৭০)। শুরু করেছিলেন ইংরেজি ছবি 'লেট দেয়ার বি লাইট'। এর কাজ শেষ না হতেই শুরু হলো স্বাধীনতাযুদ্ধ (১৯৭১)। চলে গেলেন কলকাতা এবং তৈরি করলেন বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'Stop Genocide'। একজন মসিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। Bangladesh Liberation Council of Intelligensia-এর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত (১৯৭১)। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১-এর স্বল্প সময়ে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অসাধারণ কর্ম সম্পাদন। তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানে তৎকর্তৃক প্রথম রঙিন (টেকনিকালার) ছবি 'সঙ্গম' তৈরি আবার প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবিও তাঁর সৃষ্টি উর্দু ছবি 'বাহানা' তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি। তাঁর 'কাঁচের দেয়াল' শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে 'নিগার'সহ একাধিক পুরস্কার লাভ করে। খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। তাঁর 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) উপন্যাসে আবহমান বাংলার জনজীবন, 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৮) উপন্যাসে সংগ্রামমুখর নাগরিক জীবন ও একুশ উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিকতা এবং 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯) উপন্যাসে বিপর্যস্ত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কিত। 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৯৬০), 'আর কত দিন' (১৯৭০), 'কয়েকটি মৃত্যু' (১৯৬৫) ও 'তৃষ্ণা' (১৯৫৫) তাঁর অন্যান্য উপন্যাস। তাঁর উপন্যাসের ভাষা ঋজু ও সাবলীল এবং স্থানে স্থানে কাব্যগুণমণ্ডিত। অনেক সরস ছোটগল্পেরও রচয়িতা। মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর গল্পগুলোতে আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্কিত। 'সূর্যগ্রহণ' (১৯৫৫) তাঁর সুপরিচিত গল্পগ্রন্থ হাজার বছর ধরে উপন্যাসের জন্য ১৯৬৪-তে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। ১৯৭২-এ উপন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার প্রদান। সাহিত্য মাসিক 'প্রবাহ' এবং ইংরেজি সাপ্তাহিক 'এক্সপ্রেস' পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ছাত্রজীবনে। স্বাধীনতার পরপরই ঢাকায় আগমন। এসেই শুনতে পান অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সার নিখোঁজ। আল-বদর বাহিনীর শিকার হয়েছিলেন তিনি। দেশের আরও বুদ্ধিজীবীর মর্মান্তিক হত্যায় মর্মাহত হন। তাঁরই চেষ্টায় গঠিত হয় বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটি। নিজেই তদন্তের কাজ শুরু করেন। সেই সঙ্গে ক্যামেরায় তুলতে থাকেন ছবি। মৃত্যু. ১৯৭২-এর ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে নিখোঁজ শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। লাশও পাওয়া যায় নি।

জহিরুদ্দীন (১৯১৭-১৯৮০)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৯১৭। পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার কুতুলপুর। রাজনীতিবিদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. এবং মুসলিম লীগের রাজনীতিতে যোগদান। অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম লীগ গার্ড বাহিনীর সালারে-আলা। পাকিস্তান আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর ঢাকায় আগমন। ঢাকা বারে যোগদান। মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৮-এ মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ এবং সরকারবিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ফলে লীগ সরকারের কোপানলে পড়ে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত সময়কালে চারবার কারানির্যাতন ভোগ। ১৯৫০-এ আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৫৫-তে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান গণপরিষদে সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৬-র ১৮ সেপ্টেম্বর শহীদ সোহারাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন সরকারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৫৭-তে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হলে গ্রেফতার। কয়েক মাস কারাভোগের পর মুক্তিলাভ। ১৯৬৭-তে পি.ডি.এম.-পন্থি আওয়ামী লীগে যোগদান এবং আওয়ামী লীগের এ অংশের শীর্ষস্থানীয় নেতা। ১৯৬৯-এ পুনরায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা



স্থাপন করে মূল আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন। ১৯৭০-এর ২৬ জুন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নিযুক্ত। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে ঢাকার মিরপুর আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করে পাকসেনাদের সহযোগিতা প্রদান। ১৯৭৫-এ খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হলে পাকিস্তানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত। ১৯৭৮-এ বার্মায় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত। সুবক্তা ও দক্ষ আইনজীবী হিসেবে খ্যাত। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার (১৯৬৮-১৯৬৯) প্রধান আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম প্রধান কৌসুলি। মৃত্যু. রেঙ্গুন, ২৯ নভেম্বর ১৯৮০।

জহুর আহমদ চৌধুরী (১৯১৬-১৯৭৪)॥ জন্ম. কাট্টালি গ্রাম, চট্টগ্রাম, ১৯১৬। রাজনীতিবিদ। ১৯৪৪-এ গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভের পর শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ। চট্টগ্রাম ডাক-শ্রমিক ইউনিয়ন ও চট্টগ্রাম বন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৪৬-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলনে, ১৯৪৭-এ সিলেটের গণভোটে, ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ধর্মঘটে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। ১৯৪৯-এর ২৩ জুন আওয়ামী লীগ গঠিত হবার সময় থেকেই এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৫১-তে তাঁর শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ শাখা স্থাপন। এ বছরেই চট্টগ্রামে পাদ্য আন্দোলন পরিচালনা করে কারাবরণ। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে চট্টগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন ও কারানির্যাতন ভোগ। ১৯৫৩-তে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও ১৯৫৭-তে এ দলের শ্রম সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৫২-তে চট্টগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান, ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য, ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও ১৯৭৩-এ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৬-তে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি ৬ দফা



আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারা নির্যাতন ভোগ। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসভবন (৩২ নম্বর রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা) থেকে পাক-সামরিক বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হবার পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ওয়ারলেসযোগে চট্টগ্রামে জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে প্রেরণ করেন। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে লিবারেশন কাউন্সিলের পূর্বাঞ্চলে শাখার চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান। প্রথমে ২৭ ডিসেম্বর (১৯৭১) থেকে ১২ জানুয়ারি (১৯৭২) পর্যন্ত তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্য, শ্রম, সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী। পরে ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ৩০ জুন ১৯৭৪ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী। একজন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ হিসেবে খ্যাত। এদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ষাটের দশকে বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে এবং স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন তাঁর মূল্যবান অবদান স্মরণীয়। মৃত্যু. ঢাকা, ১ জুলাই ১৯৭৪।

জহুর হোসেন চৌধুরী (১৯২২-১৯৮০)॥ জন্ম. চট্টগ্রাম শহর, ২৭ জুন, ১৯২২। সাংবাদিক। পৈতৃক নিবাস রামনগর, ফেনী। পিতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাদাত হোসেন চৌধুরী। মাতামহ খানবাহাদুর আবদুল আজিজ। দুই বছর বয়সে মাতৃহীন হন। মাতামহী কর্তৃক লালিত-পালিত। ১৯৪২-এ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ বি.এ. পাস। কর্মজীবন শুরু ১৯৪৫-এ কলকাতার 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায়। দৈনিক 'আজাদ' ও ইংরেজি সাপ্তাহিক 'কমরেড'-এ কিছুদিন সাংবাদিকতা, কয়েক বছর বাংলা সরকারের জনসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে আগমন এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান



অবজারভার'-এ সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান। ১৯৫১-তে 'সংবাদ' পত্রিকায় যোগদান এবং দীর্ঘকাল এই পত্রিকার সম্পাদক ১৯৫৪-'৭১। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন ও প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্থপতি। 'পাক-চীন মৈত্রী সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 'পাক-সোভিয়েট মৈত্রী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (১৯৫৭) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে সোভিয়েট আদর্শের একজন দৃঢ় সমর্থক। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর 'কাউন্টার পয়েন্ট' নামে একটি ইংরেজি সাময়িকী প্রকাশ। কিছুকাল পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে 'সংবাদ'-এ 'দরবারে জহুর' নামে নিয়মিত কলাম লিখে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন। সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য ১৯৮১-তে জেবুন্নেসা-মাহবুবউল্লাহ স্বর্ণপদক এবং ১৯৮২-তে মরণোত্তর 'একুশ পদক' লাভ। জহুর হোসেন চৌধুরী ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র রায়ের সঙ্গে পরিচিতি হন এবং তাঁর প্রেরণায় বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রচারের জন্যে সচেষ্ট হন। তাঁর কিছু রচনা হাবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন নাহার মাহমুদ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'বুলবুল'-এ প্রকাশিত হয়। দেশে পাকিস্তান সরকারের গণবিরোধী চক্রান্ত এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন। সমকালীন রাজনীতির উপর তাঁর তির্যক ও বিশ্লেষণমূলক রচনার অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন। বিশেষ করে ১৯৬৬-১৯৬৭-তে ধারাবাহিকভাবে 'সংবাদ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'দেশ কোন পথে' শিরোনামে সম্পাদকীয় উল্লেখযোগ্য রচনা। মৃত্যু. ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৮০।

জহুরুল ইসলাম (১৯২৮-১৯৯৫)॥ জন্ম. ভাগলপুর গ্রাম, বাজিতপুর-কিশোরগঞ্জ, ১৯২৮। শিল্পপতি ও দানবীর। কলকাতা রিপন স্কুল থেকে মেট্রিক পাস। মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজে কিছুকাল আই.এ. অধ্যয়ন। ১৯৪৯-এ পূর্ববঙ্গ সরকারের গণপূর্ত বিভাগে নিম্নমান সহকারী পদে যোগদান। ১৯৫১-তে সরকারি চাকরি ত্যাগ করে সাব-কন্ট্রাক্টর হিসেবে ঠিকাদারি ব্যবসায় শুরু। কয়েক বছরের মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণির ঠিকাদার ব্যবসায়ী হিসেবে আবির্ভূত। শিল্পায়ন, গৃহায়ন ও অন্যান্য ব্যবসায় নিয়োজিত। 'ইসলাম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা ও এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তিনটি জুট মিল, জুট মিলের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা, দুইটি ব্যাঙ্ক, পাওয়ার পাম্প ও কৃষি কাজের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা, ঠিকাদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন', ঔষধ প্রস্তুত কারখানা, বেসরকারি গৃহনির্মাণ সংস্থা 'ইস্টার্ণ হাউসিং' প্রভৃতি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী। দেশের সেরা ধনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। উদার, অসাম্প্রদায়িক, দানশীল, শিক্ষা-সাহিত্য ও ধর্মানুরাগী হিসেবে খ্যাতি অর্জন। 'বাজিতপুর জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল' এবং 'বাজিতপুর আফতাব বহুমুখী কৃষি প্রকল্প' স্থাপন তাঁর বিশিষ্ট কীর্তি। বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িতকে অন্নদান এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা অর্থদান। 'সিরাজুদ্দৌলা' নাটকের সংলাপ, নজরুলের অনেক কবিতা ও মধুসূধনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁর মুখস্থ ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাক-হানাদার বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য লন্ডন গমন (আগস্ট ১৯৭১)। মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থ সাহায্যসহ নানাভাবে সহায়তা প্রদান। মৃত্যু. সিঙ্গাপুর, হৃদরোগে, ১৯ অক্টোবর ১৯৯৫।

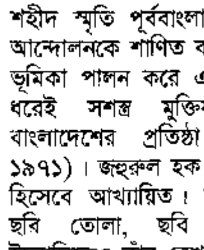
জহুরুল হক, সার্জেন্ট (১৯৩৫-১৯৬৯)॥ জন্ম. সোনাপুর, নোয়াখালী, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ও শহীদ। ১৯৫৩-তে নোয়াখালী জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাস এবং একই বছর পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান। কালক্রমে সার্জেন্ট পদে



উন্নীত। ১৯৬৭-র ডিসেম্বর মাসে সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় গ্রেফতার এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক। ১৯৬৮-র ৬ জানুয়ারি ২ জন সি.এস.পি. অফিসারসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার। এ সম্পর্কে সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়, 'গতমাসে (ডিসেম্বর, ১৯৬৭) পূর্ব-পাকিস্তানে উদ্ঘাটিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।' সরকার এই ষড়যন্ত্রকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র'

বলে অভিহিত করে। একই অভিযোগে ১৭ জানুয়ারি (১৯৬৮) শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার। ৩৫ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের। মামলার সরকারি নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিচার।' এই মামলার ৩৫জন আসামির মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ১, আর সার্জেন্ট জহুরুল হক ছিলেন ১৭ নম্বর আসামি। প্রথমে আসামি দের দেশরক্ষা আইন থেকে মুক্তি দিয়ে আর্মি, নেভি অ্যান্ড এয়ারফোর্স অ্যাক্টে পুনরায় গ্রেফতার করে সেন্ট্রাল জেল থেকে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৬৮-র ১৯ জুন মামলার শুনানি শুরু হয়। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছিল: 'অভিযুক্তরা ভারতীয় অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটিয়ে কেন্দ্র থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিল।' মামলার স্থান নির্ধারিত হয় ঢাকা ক্যান্টমেন্টের অভ্যন্তরে সিগনাল অফিসার মেসে। মামলার শেষ তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯। প্রবল গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের মানুষ যখন তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করছে, আইয়ুব খান যখন রাজনৈতিক দলগুলোকে গোল টেবিল বৈঠকে বসতে প্রস্তাব করেছেন ঠিক সে সময়ে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে কুর্মিটোলা ক্যান্টমেন্টে। সার্জেন্ট জহুরুল হক বন্দীনিবাসে প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত পাকিস্তানি সৈন্যের হাতে গুলিবিদ্ধ হন। ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ক্যান্টনমেন্ট সৈনিকদের খাবারের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহের জন্যে বাঙালি শিশুরা ভিড় করলে অবাঙালি সৈনিকরা কয়েকজন শিশুকে ধরে এনে বন্দী শিবিরের সামনে প্রহার শুরু করে। কয়েকজন বন্দী প্রতিবাদ জানালে হাবিলদার মনজুর শাহ বন্দীদের নিজ কামরায় ফিরে যেতে আদেশ করে। সার্জেন্ট জহুরুল হক সে আদেশ উপেক্ষা করে মনজুর শাহ্‌র সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হন। এতে মনজুর শাহ্‌ রাগান্বিত হয়ে রাইফেলে বেয়োনেট লাগিয়ে ধেয়ে আসে। জহুরুল হক পাস কাটিয়ে আক্রমণকারীর হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নেয় এবং বিজয়ী বীরের মতো কামরার দরজায় গিয়ে রাইফেল ফেরত দেন পরদিন ভোরবেলা জহুরুল হক ঘর থেকে বের হলে মনজুর শাহ্‌ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। গুলি পেটে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাত ৯-৫৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সার্জেন্ট জহুরুল হক ছিলেন স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক সৈনিক। তাঁর সহকর্মীদের ভাষায় তাঁকে কখনো কাঁদতে দেখা যায় নি। কোনো কারণে কারো কাছে মাথা নত করেন নি। এজন্যে সহকর্মী বন্ধুরা তাঁকে 'মার্শাল' বলে ডাকতেন। তাঁর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে আইয়ুব-বিরোধী গণ-আন্দোলন আরো গতি লাভ করে। গণ-বিক্ষোভের মুখে আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে (২৫ মার্চ ১৯৬৯)। তাঁর শহীদ স্মৃতি পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে শাণিত করে তোলার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে এবং এ আন্দোলনের পথ ধরেই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা লাভ (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)। জহুরুল হক বাঙালি জাতির সূর্যসন্তান হিসেবে আখ্যায়িত। সাঁতার কাটা, খেলাধুলা, ছবি তোলা, ছবি আঁকা, কাঠের কাজ ইত্যাদিতেও তাঁর নেশা ছিল। তাঁর অঙ্কিত চিত্র ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। মৃত্যু. ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

জাকির হোসেন (১৮৯৮-১৯৭১)॥ জন্ম. রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম, ২ নভেম্বর ১৮৯৮। আমলা ও গভর্নর। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, আলীগড় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। ১৯২৩-এর ২৬ সেপ্টেম্বর ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে যোগদান।



দীর্ঘকাল মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে ও আলীপুরে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন ১৯৪৩-এ কলকাতা বন্দরের শিপিং মাস্টার নিযুক্ত। ১৯৪৬-১৯৪৭ পর্যন্ত ঢাকার এস. পি.। ১৯৪৭-এর ১ এপ্রিল প্রেসিডেন্সি বিভাগে পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল নিযুক্ত। ঐ বৎসর ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পূর্ব-পাকিস্তানের পুলিশের প্রথম ইন্সপেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৫২-র জানুয়ারি মাসে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস

কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত। ১৯৫৭-তে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসন আমলে ১৯৫৮-র ১১ অক্টোবর পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত। ১৯৬০-এর ১৪ জুন আইয়ুব খাঁর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৬২-র ১২ জুন পর্যন্ত মন্ত্রীর পদে বহাল। জাকির হোসেন তাঁর সুদীর্ঘ চাকরি জীবনে বড় বড় সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক সরকারের প্রতিনিধি থাকাকালে রাজনীতিবিদদের নানাভাবে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়ন করেন। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ২৪ মে ১৯৭১।

জানে আলম চৌধুরী (১৮৮৪-১৯৬৭)॥ জন্ম. মুরাদনগর, কুমিল্লা, ১৮৮৪। তবলাবাদক। প্রকৃত নাম মাহবুবুর রহমান। ডাকনামেই সুপরিচিত। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর শিষ্য। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ সহচর্য লাভ। তবলাবাদক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রেও পারদর্শিতা অর্জন। মৃত্যু. ১৯৬৭।

জাহাঙ্গীর তারেক (১৯৪৩-২০১০): জন্ম. বরিশাল, ৩০ জুন ১৯৪২। শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ। পিতা ফজরুর রহমান, মাতা রওশন আর বেগম। বেতাগী হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯৫৮), ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১৯৬০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে বিএ অনার্স (১৯৬১) এবং এমএ (১৯৮৪) পাস। এরপর প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরাসি সাহিত্যে এমএ (১৯৭১) এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ (১৯৭২৩)। তুলনামূলক সাহিত্যে ডি.লিট. ডিগ্রি অর্জন করেন সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে। এরপর ফ্রান্সের ৯৮৪-১৯৮৫ 'টেকনিক্স অব মডার্ন এডুকেশন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ। ইউনিভার্সিটি অব মিউনিকের আলেক্সান্দার ফন হুমবোল্ট ফাউন্ডেশনে রিসার্চ ফেলো (১৯৯১-৯২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ছিলেন। তারেক 'আন্তর্জাতিক নজরুলচর্চা কেন্দ্র'-এর জাতীয় কমিটির কো-চেয়ারম্যান এবং 'ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট'-এর উপদেষ্টা ছিলেন। অনূদিত গ্রন্থ: শব্দার্থ-বিজ্ঞানের ভূমিকা (১৯৯৭, প্রিন্সিপলস অব সিম্যান্টিক্স-স্টিফেন উলম্যান), গুস্তাভ ফ্লোবেরের মাদাম বোভারি (১৯৯৭) ও ছাড়া তিনি অনুবাদ করেছেন কারিগরি বিদ্যার দিশারী (১৯৬৮, ট্রেইল ব্লেজার্স অব টেকনোলজি হারল্যান্ড ম্যাঞ্চেস্টার), সামাজিক সংকটে বিজ্ঞানের ভূমিকা, (১৯৬৭, ক্যান সায়েন্স সেভ আস ও জর্জ এ লুন্ডবার্গ)। জাহাঙ্গীর তারেকের মৌলিক রচনা এবং গবেষণাপত্রও অনেক। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত সিম্বলিস্ট লিটারেচার, নজরুল ইনস্টিটিউট প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গানের ওপর ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ ভাষায় বিভিন্ন রচনা। বাংলা একাডেমীর বেঙ্গলি-ইংলিশ ও ইংলিশ-বেঙ্গলি ডিকশনারি দুটিরও অন্যতম সম্পাদক ছিলেন জাহাঙ্গীর তারেক। তিনি 'সিডা'র লিগ্যাল রিফর্ম প্রকল্পাধীন ইংলিশ-বাংলা লিগ্যাল লেক্সিকনের ওপরও কাজ করেছেন। । মৃত্যু: ঢাকা, ২৯ জুন ২০১০।

জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪)॥ জন্ম. সুন্দরপুর গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, ৩ মে ১৯২৯। শহীদ জননী। পিতা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ আব্দুল আলী। কলকাতা লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে বি.এ. পাস (১৯৪৭)। ইঞ্জিনিয়ার শরিফুল আলম ইমামের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। শিক্ষিকা হিসেবে কর্মময় জীবনের শুরু। ময়মনসিংহ শহরের বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুলে প্রথম শিক্ষকতা। ১৯৫১-তে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান। ১৯৬০ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড. (১৯৬০) ও বাংলায় এম.এ. (১৯৬৫) ডিগ্রি লাভ। ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গমন। ১৯৬৬-তে দেশে প্রত্যাবর্তন করে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপিকা হিসেবে যোগদান। ১৯৬৮ পর্যন্ত সেখানে অধ্যাপনা। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁর প্রথম সন্তান রুমীর যুদ্ধে যোগদান। রুমী ও তাঁর সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনে সহযোদ্ধার মতো অংশগ্রহণ। বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও খাদ্য দেয়া, গাড়িতে অস্ত্র আনা-নেয়া ও তা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দেয়া, খবর আদান-প্রদান প্রভৃতি ছিল



তাঁর মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা। যুদ্ধের শেষ দিকে রুমী পাক-হানাদার বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার এবং নির্মম অত্যাচারের পরে নিহত। পুত্র হারানোর শোকে শরিফুল ইমামের হার্টফেল করে মৃত্যুবরণ। মুক্তিযুদ্ধের ওপর জাহানারা ইমামের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'একাত্তরের দিনগুলি' (১৯৮৬) প্রকাশিত হলে তা সর্বত্র সমাদৃত। প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ: গজ কচ্ছপ (১৯৬৭), সাতটি তারার ঝিকিমিকি (১৯৭৩), নিঃসঙ্গ পাইন (১৯০৯), ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস (১৯৯১), প্রবাসের দিনগুলি (১৯৯২)। সাহিত্যকৃতির জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯০) লাভ। বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন (১৯৭৯-১৯৮৩)। আশির দশকের শুরুতে ওরাল ক্যান্সারে আক্রান্ত। অধ্যাপক গোলাম আযমকে ১৯৯১-র ২৯ ডিসেম্বর জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর ঘোষণা করা হলে জনমনে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় তার পটভূমিকায় ১৯ জানুয়ারি (১৯৯২) ১০১ সদস্যবিশিষ্ট 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠিত হলে এর আহ্বায়ক নির্বাচিত। পরবর্তীকালে ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৯২) বিভিন্ন রাজনৈতিক, যুব, ছাত্র, নারী, শ্রমিক, কৃষক ও সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠিত হলে এরও আহ্বায়ক নির্বাচিত। তাঁর নেতৃত্বে এ কমিটি কর্তৃক সরকারের কাছে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোলাম আযমের বিচারের দাবি উত্থাপন। সরকার এ দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হলে তাঁর সভানেত্রিত্বে ২৬ মার্চ (১৯৯২) স্বাধীনতা দিবসে সরকারি বাধানিষেধ উপেক্ষা করে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণ-আদালতের মাধ্যমে গোলাম আযমের বিচার অনুষ্ঠান। লাখো মানুষের উপস্থিতিতে এই গণ-আদালত কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (১৯৭১) বিরোধিতা, পাক-হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা, হত্যা, লুট, ধর্ষণসহ ১২টি অভিযোগে গোলাম আযমকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় প্রদান: 'গোলাম আযমের অপরাধ মৃত্যুদণ্ড তুল্য।' এ রায় কার্যকর করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন। গণ-আদালত অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান জাহানারা ইমাম, অন্যান্য বিচারক ও সাক্ষীসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক মামলা দায়ের (২৭ মার্চ ১৯৯২): সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক এ-সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির জামিন দান। গণআদালতের রায় ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচারের দাবিতে তৎকর্তৃক দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা। তাঁর এ দুঃসাহসিক কর্ম প্রক্রিয়ার ফলে বাঙালিদের অন্তরে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ শাণিত হয়ে ওঠে। ২ এপ্রিল (১৯৯৪) চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গমন। সেখানে ক্যান্সারে পরলোকগমন। কীর্তিখ্যাত বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ লক্ষ শহীদের বেদনাবিধুর মাতৃহৃদয় এবং সন্তান বিয়োগের চিরন্তন যাতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে যাঁকে কেন্দ্র করে তিনি জাহানারা ইমাম। তিনি হয়ে উঠেছেন তাদেরই প্রতীক শহীদ রুমীর মাতা পরিণত হয়েছেন শহীদ জননীতে। মৃত্যু. ২৬ জুন ১৯৯৪।

জাহেদুর রহিম (১৯৩৫-১৯৭৮)॥ জন্ম. বগুড়া শহর, ১৯৩৫। পৈতৃক নিবাস লোচনাপাড়া গ্রাম, শাহজাদপুর-সিরাজগঞ্জ। রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি লাভ (১৯৫৭)। বুলবুল ললিত কলা একাডেমিতে



রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা গ্রহণ। বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, ছায়ানট, অগ্নিবীণা, মূর্ছনা, আলতাফ মাহমুদ সংগীত নিকেতন, নজরুল পরিষদ প্রভৃতি সংগীত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। ১৯৭৩-এর বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের সংগীত প্রযোজক নিযুক্ত। ১৯৭৭-এর ১৬ ডিসেম্বর সামরিক সরকার কর্তৃক তাঁকে উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত। রবীন্দ্র-সংগীতের অনন্যসাধারণ কণ্ঠশিল্পী। ষাটের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান সরকার দেশ থেকে রবীন্দ্রসংগীত উচ্ছেদের যে অভিযান আরম্ভ করেছিল তার প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে সভা-সমিতি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় প্রদান। সরকারি ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' রবীন্দ্রনাথের এ গানটি গেয়ে তা এদেশের মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলার

গৌরব অর্জন। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় (বর্তমানে বাংলাদেশ) যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল। রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে সে আন্দোলন উজ্জীবিত রাখার ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। মৃত্যু, ঢাকা, ১৮ জুন ১৯৭৮।

জিকরুল হক (১৯১৩-১৯৭১)॥ জন্ম, সৈয়দপুর, রংপুর, ১৯১৩। রাজনীতিবিদ। পিতা ডা. জেয়ারতউল্লাহ। কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাস করে প্রথমে দারওয়ারী হাসপাতালে, পরে হাজারীহাট হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন। কিছুকাল পরে সরকারি চাকরি পরিত্যাগ করে সৈয়দপুরে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস শুরু। ১৯৫৪-র পূর্ববঙ্গ পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সে নির্বাচনে সৈয়দপুর এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়লাভ। আওয়ামী লীগে যোগদান। সৈয়দপুর পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান। সৈয়দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সম্পাদক পদে বারো বছর দায়িত্ব পালন। সৈয়দপুর মহাবিদ্যালয় ও সৈয়দপুর হাসপাতাল নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন। সৈয়দপুরের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'শিল্প-সাহিত্য সংসদ'-এর ১৬ জানুয়ারি সৈয়দপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ষাটের দশকে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনে (৪-২৫ মার্চ ১৯৭১) সৈয়দপুরে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান। মৃত্যু, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুতে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ সৈয়দপুরে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে নিহত।

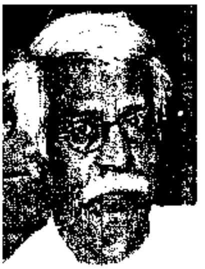


জিতেন ঘোষ (১৯০১-১৯৭৬)॥ জন্ম, কুমারভোগ গ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা ১৯০১। লেখক ও রাজনীতিবিদ। ১৯১৭-তে কাজির পাগলা অভয়কুমার তালুকদার হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাস। ১৯২০-তে আই.এ. পাস করার পর বি.এ.-তে ভর্তি। এ সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-১৯২২) ডাকে কলেজ ত্যাগ। স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায়ই 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যুক্ত এবং বিক্রমপুরের বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রদের ভিতর বিপ্লবী গ্রুপ গঠন। সক্রিয়ভাবে ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান। ১৯২৫-এ বিপ্লবী পার্টির সংগঠক হিসেবে বার্মা গমন এবং সেখানে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী গ্রুপ গঠন। বার্মায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩০-এ দেশে প্রত্যাবর্তন। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯৩১-এ গ্রেফতার। সাত বছর বিনা বিচারে আটক থাকার পর ১৯৩৮-এ মুক্তিলাভ। এ বছরই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। ১৯৩৯-এ পার্টির পূর্ণ সভ্য পদ লাভ। এরপর কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ। কৃষকদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা। ১৯৪০-এ ১৭ জন কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে আবার গ্রেফতার। ১৯৪১-এর শেষের দিকে মুক্তিলাভ। মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন সংগঠন। ১৯৪২-এ পুনরায় গ্রেফতার এবং প্রায় এক বছর পর মুক্তিলাভ। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময়ে চাঁদা তুলে বিক্রমপুরে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা। বিক্রমপুরে তাঁতি ও জেলেদের মধ্যে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ ও শ্রম তুলনাহীন। ১৯৪৭-এ ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর ১৯৪৮-এর শেষের দিকে গ্রেফতার এবং ১৯৫৩-র শেষ ভাগে মুক্তিলাভ। ১৯৫৭-তে রেকর্ড বর্গার অধীনস্থ আন্দোলন শুরু। হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে এই আন্দোলনে জয়যুক্ত হলে দেশের ১৫ হাজার কৃষকের জমির পূর্ণ মালিকানা লাভ। এ সময়ে বেশ কিছুদিন অন্তরীণ জীবন যাপন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও বিশেষ ভূমিকা পালন। বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে বস্ত্র, টাকা ও খাদ্য সংগ্রহ। ১৯৭৫-এ বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠিত হলে এই



সংগঠনের কৃষক ফ্রন্ট জাতীয় কৃষক লীগের নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত (বাকশাল)। একজন লেখকও বটেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'জেল থেকে জেলে', 'গরাদের আড়াল থেকে', 'অগ্নিদিনের বার্মা', 'এই লেনিনের দেশ', 'রক্তাক্ত উষা', 'সম্মুখে বিজয়'। মৃত্যু: কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬।

জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮): জন্ম: দোহারপাড়া, পাবনা, ১৮ নভেম্বর ১৯৩৬। অধ্যাপক, কবি, নাট্যকার ও নাট্য-বিশেষজ্ঞ। পিতা মোহাম্মদ হাকিম উদ্দিন শেখ ও মাতা রহিমা খাতুন। গোপালচন্দ্র ইনস্টিটিউশন থেকে মাধ্যমিক (১৯৫২)।



পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৫৬), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক সম্মান (১৯৫৮), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ (১৯৬১)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এফ.এ. এবং ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট ইন শেকসপিয়ার থিয়েটার অর্জন। তোলারাম কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা। পরে চট্টগাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। নাট্যসংগঠন 'নাগরিক-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দীর্ঘ ২৪ বছর এ সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ – কবিতা: একতারাতে কান্না (১৯৬৩) কৌটোর ইচ্ছেগুলো (১৯৬৭), দূর থেকে দেখা (১৯৭৭), আমার পলাতক ছায়া (১৯৮২), লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভালবাসা ভালবাসা; নাটক: শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ (১৯৭০), এলেবেলে (১৯৮১), সাদা গোলাপে আগুন ও পংকজ বিভাস (১৯৮২); রূপান্তরিত ও অনূদিত নাটক: দ্বার রুদ্ধ (যৌথভাবে, ১৯৭০), প্রজাপতি নির্বন্ধ (যৌথভাবে, ১৯৭৩), ডক্টর ফস্টাস (১৯৮১), তাইরে নাইরে না (১৯৯২), অ্যান্টিগোনে (১৯৯২), উন্মাদ সাক্ষাৎকার, মুক্তি মুক্তি; প্রবন্ধ ও গবেষণা: নাট্য বিষয়ক নিবন্ধ (১৯৮১), নাট্য ও নাটক (১৯৮৫), থিয়েটারের কথা (১ম-১৯৮৫, ২য়-১৯৯০, ৩য়-১৯৯৪, ৪র্থ-১৯৯৬, ৫ম-২০০৪), বাংলাদেশের থিয়েটার ও অন্যান্য রচনা (১৯৯১), স্ট্যানিসলাভস্কি ও তাঁর অভিনয়তত্ত্ব, নাট্যকলার বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার (১৯৯৫), বিশ্বনাট্যকলার ইতিহাস। দূর থেকে দেখা কাব্যগ্রন্থটি Far from Away শিরোনামে লীলা রায়ের অনুবাদে প্রকাশিত (১৯৭৯)। নাটকে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৭৭)। ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু: ঢাকা, ২ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

জিয়াউর রহমান (১৯৩৬-১৯৮১): জন্ম: বাগবাড়ি, বগুড়া, ১৯ জানুয়ারি ১৯৩৬। মুক্তিযোদ্ধা, রাষ্ট্রপতি, রাজনীতিবিদ। পিতা মনসুর রহমান ছিলেন একজন কেমিষ্ট। মাতা জাহানারা খাতুন ছিলেন করাচি বেতারকেন্দ্রের নজরুল সংগীতশিল্পী। তাঁর



সহধর্মিনী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী (১৯৯১-১৯৯৬, ২০০১-২০০৬)। জিয়া করাচি একাডেমী স্কুল থেকে মেট্রিক পাস (১৯৫২)। অতঃপর করাচি ডি.জে. কলেজে ভর্তি। ১৯৫৩-তে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে যোগদান। ১৯৫৫-তে সেনাবাহিনীতে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদে কমিশন লাভ। পাঞ্জাব রেজিমেন্টে দুই বছর চাকরি করার পর ১৯৫৭-তে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বদলি। বিশেষ গোয়েন্দা কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে দায়িত্ব পালন। ১৯৬৫-তে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় খেমকারান সেক্টরে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা। সেই যুদ্ধে ফার্স্ট ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানিকে নেতৃত্ব দান। ১৯৬৬-তে কাকুলস্থ পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমীর প্রশিক্ষক নিযুক্ত। ১৯৬৯-এ জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন কমান্ড হিসেবে নিযুক্তি লাভ। ১৯৭০-এর অক্টোবর মাসে চট্টগ্রামে নবগঠিত অষ্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে একই পদে

বদলি। ঐ পদে কর্মরত অবস্থাতে পূর্ববাংলায় নিরস্ত্র জনতার ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণের পর ঐ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ (২৬ মার্চ ১৯৭১)। ১৯৭১-এর ২৭ মার্চ চট্টগ্রামস্থ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার (২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে) ভিত্তিতে তাঁর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত (১৭ এপ্রিল ১৯৭১)। আগস্ট মাসে রৌমারীতে ১ম, ২য় ও ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানদের নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ব্রিগেড গঠন। এই ব্রিগেড পরে 'জেড ফোর্স' নামে পরিচিত। স্বাধীনতা লাভের পর কুমিল্লা ব্রিগেডের কমান্ডার। ১৯৭২-এর জুন মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ-অব-স্টাফ নিযুক্ত। ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারিতে কর্নেল, ১৯৭৩-এর মাঝামাঝি ব্রিগেডিয়ার এবং ১০ অক্টোবর (১৯৭৩) মেজর জেনারেল পদে উন্নীত। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক দেশদ্রোহী সদস্যের হাতে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে দেশে সামরিক আইন জারি করে খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির হন ২৫ আগস্ট জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর চিফ-অব-স্টাফ পদে নিযুক্তি লাভ করেন। ৪ নভেম্বর (১৯৭৫) ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে ঢাকা সেনানিবাসে সংঘর্ষ বাধলে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে পদত্যাগ। এ সংঘর্ষের ফলে খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদচ্যুত এবং বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি হন। ৭ নভেম্বর (১৯৭৫) 'সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থানে'র মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের চিফ-অব-স্টাফ পদে পুনঃপ্রত্যাবর্তন এবং উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৬-এর ১ নভেম্বর উলশী-যদুনাথপুরের বেতনানদীতে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে 'খাল খনন কর্মসূচি'র উদ্বোধন। ১৯৭৬-এর ২৯ নভেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৭৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারি সহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-সাংবাদিকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ অবদান রাখবেন তাঁদের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ 'একুশের পদক' প্রবর্তন। ১৯৭৭-এর ২১ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ। ১৯৭৭-এর ২১ মে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিসংবলিত ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা। তাঁর ও তাঁর এই কর্মসূচির প্রতি জনসাধারণের আস্থা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ১৯৭৭-এর ৩০ মে দেশে 'হ্যাঁ' ও 'না'-সূচক গণভোট গ্রহণ। ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮৫৬ জন ভোটারের মধ্যে গণভোটে অংশ নেয় ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯ হাজার ৮৬৯ জন। জিয়াউর রহমানের ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৫২টি 'হ্যাঁ'-সূচক ভোট লাভ করার ঘোষণা। ১৯৭৭-এর ৮ জুন লন্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণের পর সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র পরিবর্তে 'বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম', 'সমাজতন্ত্রে'র পরিবর্তে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' এবং 'বাঙালি জাতীয়তাবাদে'র পরিবর্তে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' সংযোজন করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত চার রাষ্ট্রনীতির শাসনতন্ত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন এবং স্বাধীনতা-বিরোধী নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলাম ও মুসলিম লীগকে রাজনীতি করার সুযোগ প্রদান। ১৯৭৭-এর ১১ ডিসেম্বর মহিলা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন। তাঁর অনুপ্রেরণায় উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার কর্তৃক নতুন রাজনৈতিক দল 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল' (জাগদল) গঠন। ১৯৭৮-এর ১ মে জাগদল, ভাসানী ন্যাপ, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি), মুসলিম লীগ, তফসিলি ফেডারেশনের সমন্বয়ে 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' গঠন ও ফ্রন্টের চেয়ারম্যান মনোনীত। ১৯৭৮-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ১৯৭৮-এর ৩ জুন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন 'গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের' মনোনীত প্রার্থী জেনারেল (অব.) এম.এ.জি. ওসমানীকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। ১৯৭৮-এর ২৮ আগস্ট জাগদলে যোগদান। ১৯৭৮-এর ১ সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' (বি.এন.পি.) গঠন ও দলের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত। তাঁর শাসনামলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য (১৯৭৮-১৯৮০) নির্বাচিত। 'যুব সমাজকে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত করার

লক্ষ্যে যুব কমপ্লেক্স' গঠন। ১৯৭৮-এর ১ ডিসেম্বরে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৭৯-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি ৩০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বাধীন বি.এন.পি'র ২০৮টি আসন লাভ। সংসদে সংবিধানের বিতর্কিত ৫ম সংশোধনী গৃহীত (৫ এপ্রিল ১৯৭৯) হলে তৎকর্তৃক দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার (৭ এপ্রিল ১৯৭৯)। ১৯৭৯-এর ৩১ জুলাই লুসাকায় কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান। ১৯৮০-র জানুয়ারিতে মক্কার তায়েফে অনুষ্ঠিত ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ। ১৯৮০-র ১৯ ফেব্রুয়ারি সাভারের জিরাবো গ্রামে 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' উদ্বোধন। ১৯৮০-র ২৬ আগস্ট জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একাদশতম অধিবেশনে ভাষণদান। ১৯৮০-র ১২ ডিসেম্বর 'যৌতুক প্রথা'-বিরোধী আইন পাস। ইসলামি সম্মেলন সংস্থার তিন সদস্য বিশিষ্ট 'আলকুদ্স' কমিটির সদস্য নিযুক্ত। ইসলামি সম্মেলন সংস্থার নয় সদস্য বিশিষ্ট শান্তি মিশনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন। ১৯৮১-এ জামায়াতের আমীর এবং পূর্ববাংলার মানুষের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিরোধী গোলাম আজমকে বাংলাদেশের ফেরার অনুমতি ও নাগরিকত্ব প্রদান। ১৯৮১-র ২৭ মার্চ ইরাক-ইরান যুদ্ধ অবসানে ইসলামি মধ্যস্থতা কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে জেদ্দা গমন। ১৯৮১-র ২১ এপ্রিল দক্ষিণ এশিয়া ফোরাম (SAARC) প্রস্তাব ও পরিকল্পনা উত্থাপন। ১৯৮১-এর ২২ এপ্রিল মরক্কোয় জেরুজালেম সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান। ১৯৮১-র ১২ মে ইসলামি মিশনের পক্ষ থেকে ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধের উদ্দেশ্যে বাগদাদ ও তেহরান গমন। শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি নিজেকে একজন পরিশ্রমী ও জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। সামরিক শাসন থেকে এক ধরনের সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণও তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁর শাসনামলে বেশ কয়েকটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। শেষ অভ্যুত্থানে নিহত। মৃত্যু. ৩০ মে ১৯৮১।

জীবন আলী॥ জন্ম. খালমোহনা গ্রাম, চট্টগ্রাম। সংগীতশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ। 'জীবনপণ্ডিত' নামে সুপরিচিত। একজন প্রখ্যাত সংগীত শিক্ষক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের, বিশেষত হাড়ী-সম্প্রদায়ের লোকদের বাজনা শেখাতেন। জীবন আলী ও রামতনু ভনিতায় 'রাগতালের পুঁথি' নামের একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)॥ জন্ম. বরিশাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯। কবি। ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম, আদি নিবাস গাওপাড়া গ্রাম, বিক্রমপুর। পিতা বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সত্যানন্দ দাশ। বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক (১৯১৫), বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. (১৯১৭) পাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স (১৯১৯) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. (১৯২১) ডিগ্রি লাভ। ১৯২২-১৯২৮-এ কলকাতা সিটি কলেজে, ১৯২৯-এ বাগেরহাট কলেজে ও ১৯২৯-১৯৩০-এ লাবণ্য গুপ্তের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। কিছুকাল বেকার জীবন যাপন। ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কিছুদিন কর্ম সম্পাদন। কিছুকাল ব্যবসায় করার পর ১৯৩৫-এ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনা। কলকাতা গমন। ১৯৪৭-এ 'দৈনিক স্বরাজ'-এর সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা। ১৯৫১-১৯৫২-তে খড়গপুর কলেজ ও ১৯৫২-তে বড়িষা কলেজে ও ১৯৫৩ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনা। কাব্যসাধনার প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা প্রভাবিত হলেও জীবনানন্দ দাশ তাঁর পরিণত রচনায় নিঃসংশয় মৌলিকতার পরিচয় দেন এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একজন প্রধান কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যময় প্রকৃতি তাঁর কাব্যে রূপময় হয়ে উঠেছে। আধুনিক নাগরিক জীবনের হতাশা, নিঃসঙ্গতা, বিষাদ ও সংশয়ের চিত্র তাঁর কবিতায় দীপ্যমান। স্বচ্ছ, সুন্দর, শান্ত ও স্নিগ্ধ রোমান্টিক কবিতার স্রষ্টা হিসেবে তিনি স্মরণীয় ও বরণীয়। তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতা ষাটের



দশকে বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সংগ্রামী জনতাকে তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থঃ 'ঝরা পালক' (১৯২৮), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭) ও 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১) 'কবিতার কথা' (১৯৫৬) তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ। 'মর্মগত, সুমিত, নিরাবেগ ও সুস্থির গদ্যরীতির জন্যে তিনি বিশিষ্ট।' তিনি একজন কথাসাহিত্যিকও। মৃত্যুর পর প্রকাশিত উপন্যাসঃ মাল্যবান (১৯৭৩), সতীর্থ (১৯৭৪)। সুকুমার ঘোষ সুবিনয় মুস্তাফীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় তাঁর গল্প সংকলন 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' (১৩৭৯)। জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত রচনাবলী খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। মৃত্যু. কলকাতা, ট্রাম দুর্ঘটনা, ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪।

জুলফিকার খান (১৭৯০-১৮৫৪)॥ জন্ম. দাদরোখী গ্রাম, মানিকগঞ্জ, ১৭৯০। প্রাথমিক শিক্ষা ঢাকায় লাভ। পনরো বছর বয়সে পিতা বসির খান কর্তৃক উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা মাদ্রাসায় প্রেরণ। এখানে তিনি ভাল ফার্সি শেখেন। বাংলা ছাড়াও হিন্দুস্থানি ও ইংরেজি জানতেন। ১৮১০-এ কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ লাইব্রেরির প্রাচ্যবিদ্যা শাখার গ্রন্থাগারিকের সহকারী নিযুক্ত। ক্রমে প্রাচ্যবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন এবং ঐ শাখার গ্রন্থাগারিকের পদ লাভ। জুলফিকার খানের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আছালত খান পিতার পদে বহাল হন। মৃত্যু. ১৮৫৪।

জেব-উন-নেসা জামাল (১৯২৬-১৯৯৫)॥ জন্ম. রাজশাহী, ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬। গীতিকার। পৈতৃক নিবাস বগুড়া। পিতা ডা. কসিরুদ্দিন তালুকদার। স্বামী সৈয়দ জামালুদ্দিন। বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী জিনাত রেহানা তাঁর কন্যা। বগুড়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্লস



স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৪১) পাস। কলকাতা লেডী ব্রেবোর্ন কলেজে ভর্তি এ কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৪৩) ও বি.এ. (১৯৪৫) পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. (১৯৬৫) ডিগ্রি লাভ। ঢাকা বেতারের কণ্ঠশিল্পী, কথিকা পাঠক ও অনুষ্ঠানে পরিচালক। এর মহিলা মহফিল, স্কুল ব্রডকাস্ট, বুনিয়াদি গণতন্ত্রের আসর প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পরিচালনা। গীতিকার হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। প্রেমমূলক, দেশাত্মবোধক ও মরমি গান রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান। প্রকাশিত গানের সংকলনঃ আমার যতো গান (১৯৭৯), আরজি (১৯৮৫), গান এল মোর মনে (১৯৯৩), জাদুর পেন্সিল (১৯৮৯) ও সাগরের তীর থেকে (১৯৯৪)। পরিশীলিত ও জীবননিষ্ঠ গল্পকার ও গল্প সংকলনঃ হারানো দিনের গল্প (১৯৯৪)। অনুবাদঃ বেল সাহেবের টেলিফোন আবিষ্কার। মৃত্যু. ধানমণ্ডি, ঢাকা, ১ এপ্রিল ১৯৯৫।

জেমস্ কীথ, রেভারেন্ড (১৭৮৪-১৮২২)॥ জন্ম. ১৭৮৪। মিশনারি, ব্যাকরণবিদ। ১৮১৬-তে লন্ডন মিশনারি সোসাইটি মিশনারি রূপে কলকাতায় আগমন। ঐ সোসাইটির অন্য মিশনারি হেনরি টাউনলির সহযোগিতায় কলকাতায় মিশন ও স্কুল প্রতিষ্ঠা। উইলিয়াম কেরির Agri Horticultural Society of India-র অন্যতম সদস্য পরিচালক। ১৮২০-এ প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার ব্যাকরণ' জেমস্ কীথের স্মরণীয় কীর্তি। এটি বাংলা ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত প্রথম ব্যাকরণ। বইয়ের পুরো নাম 'A Grammar of the Bengalee Language, Adapted to the Young in Easy Questions and AnswerÕ "বালকদিগের শিক্ষার্থে স্পষ্ট প্রশ্নোত্তর ধারাতে বঙ্গভাষার ব্যাকরণ'। ব্যাকরণটি স্কুল-ছাত্রদের জন্য সরল ভাষায় লেখা। কলকাতা স্কুল সোসাইটি বইটির প্রথম সংস্করণের পাঁচশত কপি কিনে নেয় পরবর্তী তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করে। হ্যালহেড বা কেরীর তুলনায় কীথের রচনা প্রাঞ্জল, মৌলিক। তবে এ প্রশ্ন কোন কোন পণ্ডিত উত্থাপন করেছেন যে, পূর্বসূরিদের মত তিনিও দেশীয় কোনো পণ্ডিতের সাহায্য নিয়েছেন; তা না হলে এদেশে আসার মাত্র চার বছরের মধ্যে এমন চমৎকার বাংলা জানা ও সুন্দর গদ্যশৈলী আয়ত্ত করা সহজ নয়। 'একজন দারোগা ও মালী এই উভয়ের কথোপকথন' নামে অপর একটি খ্রিস্ট-ধর্মপ্রচারমূলক গ্রন্থ রচনা। মৃত্যু. ১৮২২।

জোবেদা খানম (১৯২০-১৯৮৯)॥ জন্ম. আজহারবাগ, কুষ্টিয়া, ৫ মার্চ, ১৯২০। লেখিকা।

স্কুল পরিদর্শক খন্দকার আজহারুল ইসলাম তাঁর



পিতা। কঠোর পর্দা প্রথার মধ্যে পিতৃগৃহে বাংলা ভাষা শিক্ষা গ্রহণ। তেরো বছর বয়সে ডা. আবদুর রহিম খানের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ (১৯৩৪)। স্বামীর কর্মক্ষেত্র কলকাতায় বসবাস। স্বামীর উৎসাহে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে মেট্রিক পাস। কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি লাভ। ১৯৪১-এ স্বামীকে হারিয়ে বৈধব্যবরণ। কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা করতে করতে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে আই.এ. ও বি.এ. পাস। ১৯৪৬-এ কলকাতা ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. টি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ঢাকার কামরুন্নেসা স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা নিযুক্ত। ১৯৫০-এ প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন-এ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ। কিছুকাল ঢাকার বাংলা বাজার বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। ১৯৫৪-তে সরকারি চাকরিতে যোগদান। সহকারী স্কুল পরিদর্শক (১৯৫৪-১৯৫৫), ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের ইন্সট্রাক্টর (১৯৫৫-১৯৬১), জাতীয় পূর্ণগঠন সংস্থার সহকারী পরিচালক (১৯৬১-১৯৭১) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্পেশিয়ালিস্ট (১৯৭১-১৯৭৬)। ১৯৭৬-এ বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রথম পরিচালক নিযুক্ত। প্রায় সাত বছর এ পদে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৮৩-র জুলাই মাসে এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত। ১৯৮৫-র জুন পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। গল্প, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য রচনা করে সুনাম অর্জন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: উপন্যাস/অভিশপ্ত প্রেম (১৯৫৯), দু'টি আঁখি দু'টি তারা (১৯৬৩), আকারে রং (১৯৬৪), বনমর্মর (১৯৬৭), অনন্ত পিপাসা (১৯৬৭); গল্প/ খুকুর অ্যাডভেঞ্চার (১৯৬৭), একটি সুরের মৃত্যু (১৯৭৪), জীবন একটি দুর্ঘটনা (১৯৮১); নাটক/ঝড়ের স্বাক্ষর (১৯৬৭, ওরে বিহঙ্গ (১৯৬৮); শিশুসাহিত্য/ছোটদের একাঙ্কিকা (১৯৬৩), গল্প বলি শোন (১৯৬৬), মহামানুষ (১৯৭৪), সুলতানা (১৯৮২), শাহরিয়ারের অ্যাডভেঞ্চার (১৯৮৪), বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯৮৮)। বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সদস্য, ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান (১৯৭২-১৯৮৫)। অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার লাভ (১৯৮৩)। মৃত্যু ঢাকা, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৮৯।



জোশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭)॥ জন্ম. ওয়েস্টা বেরিলি, উইল্ট শায়ার, লন্ডন, ২০. ৪, ১৭৬০। শ্রীরামপুর মিশনারি গোষ্ঠীর অন্যতম ব্যক্তিত্ব। কয়েকটি ভারতীয় ভাষা ছাড়াও গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু ও সিরিয়াক ভাষায় দক্ষতা অর্জন। কর্মজীবনে প্রথমে লন্ডনে পুস্তক ব্যবসায়ীর দোকানে কর্মরত। পরে কিছুকাল তাঁতের কাজে নিযুক্ত। ১৭৯১-এ যাজকতায় দীক্ষিত। ১৭৯৪-এ শিক্ষকতা। পরে মিশনারি কাজে নিয়োজিত। ১৭৯৯-এ মিশনারি রূপে পরিবারের ভারতে আগমন এবং শ্রীরামপুর মিশনের কাজে যুক্ত। শ্রীরামপুর স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমে তা শ্রীরামপুর কলেজে রূপান্তরিত। চীনা ভাষা লিখে এই ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ। কেরীর সহযোগিতায় সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ। সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ', 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' ও 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্যোক্তা। ১৮৩৪-এ কেরীর মৃত্যুর পর শ্রীরামপুর মিশনের নেতৃত্ব গ্রহণ। মৃত্যু মে ১২. ১৮৩৭।

জ্ঞান চক্রবর্তী (১৯০৭-১৯৭৭)॥ জন্ম. দোগাছি



গ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা, ১৯০৫। রাজনীতিবিদ। স্কুলে পড়াকালীন সময়ে বারো-তেরো বছর বয়সে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত। ঢাকার গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন 'বাণী সঙ্ঘ'র সঙ্গে যুক্ত। তাঁকে কেন্দ্র করে 'বাণী সঙ্ঘ'-মধ্যে একটি পৃথক গ্রুপ সৃষ্টি, বিপ্লবীদের কাছে যা 'জ্ঞান ঠাকুরের গ্রুপ' নামে পরিচিত। এসবের মধ্যেও

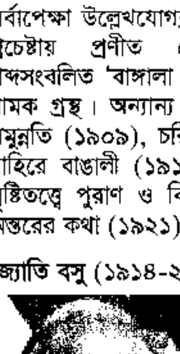
প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। পরে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এসসি. পাস ও ১৯৩০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এসসি. ক্লাসে ভর্তি। কিন্তু গোপন বিপ্লবী কর্মের জন্যে ঐ বছরই গ্রেফতার। কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলখানায় কয়েকদিন অবস্থানের পর দুর্গম অরণ্যঘেরা বকসা বন্দী শিবিরে প্রেরণ। ১৯৩৮-এ দেউলী বন্দী শিবির থেকে মুক্তিলাভ। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যোগদান এবং ঐ বছরই পার্টির সভ্যপদ লাভ। ১৯৩৮-এ ঢাকা জেলা কম্যুনিস্ট পার্টির পরিচালনায় 'গণসাহিত্যচক্র' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন। ঐ প্রকাশনী থেকে দশটি বই প্রকাশ। তাঁর উদ্যোগে ঢাকায় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' গড়ে ওঠে। এই সঙ্ঘের সক্রিয় কর্মী রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সৈয়দ নুরুদ্দিন, অজিত গুহ প্রমুখ। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ। তিনি ছিলেন অকৃতদার। ৭২ বছর জীবনের ২৫ বছরই অতিক্রান্ত হয় জেলখানায়, নয় বছর আত্মগোপন অবস্থায়। একজন লেখকও বটেন। রচিত গ্রন্থ: ঢাকা জেলার কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ', 'অমর লেনিন', 'কৃষকনেতা জিতেন ঘোষ'। মৃত্যু. ঢাকা, ১১ আগস্ট ১৯৭৭।

জ্ঞান দাস (ষোড়শ শতাব্দী)॥ জন্ম. কাঁদড়া গ্রাম, বর্ধমান। চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলির কবি। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব। গোবিন্দ দাস বলরাম দাসের সমসাময়িক কবি। জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে কাটোয়া ও খেতুরির বৈষ্ণব মহোৎসবে যোগদান করে বৃন্দাবন গমন। বৃন্দাবনে জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনের সান্নিধ্য লাভ। সংগীতজ্ঞ ও নতুন কীর্তন পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসেবে সুনামের অধিকারী। পদকর্তা রূপেই সমধিক খ্যাত। তাঁর রচিত পদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য, মাধুর্য ও সূক্ষ্মতা একমাত্র চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গেই তুলনা হতে পারে। আক্ষেপানুরাগ, রূপানুরাগ ও মাথুরবিষয়ক পদ রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন। বাংলা ও ব্রজবুলি কিংবা এ দুয়ের মিশ্র ভাষায় রাধার তপস্বিনী ভাব, অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার তীব্র জ্বালা, মিলনের জন্য ব্যাকুলতা, মিলনের গভীর উল্লাস ও বিরহের মর্মস্পর্শী আর্তি চিত্রণে গভীর শিল্পবোধের পরিচয় প্রদান। রচিত গ্রন্থ: মাথুর ও মুরলী শিক্ষা। কাঁদড়ায় তাঁর নামে একটি মঠ আছে। সেখানে প্রতি বছর জ্ঞানদাস স্মরণে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১৮৭২-১৯৩৯)॥ জন্ম. সিকদার বাগান, কলকাতা, ১৮৭২। অভিধানপ্রণেতা ও সাহিত্যিক। পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে শৈশব জীবন, শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন কাটে। শিক্ষা শেষে এলাহাবাদের পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেলের গোপনীয় পত্র ব্যবহার ও রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কেরানি পদে নিযুক্তি লাভ। এ সময়ে 'প্রবাসী' পত্রিকার বিশিষ্ট সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য লাভ। সেই-সূত্রে 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে সাহিত্যিক জীবন শুরু। ১৯১০-এ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে চব্বিশ পরগনার উত্তরাংশে আগড়াপাড়া নামক স্থানে বসবাস। এই অবসর জীবনের সূচনা থেকেই অভিধানের জন্য উপকরণ সংগ্রহ। ১৯৭২-এ মিরাটে অনুষ্ঠিত 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে'র প্রথম সভাপতি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি ২০ বছরের একক প্রচেষ্টায় প্রণীত ৫০ হাজারেরও বেশি শব্দসংবলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (১৯১৬) নামক গ্রন্থ। অন্যান্য গ্রন্থ: ঋদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধি ও সমুন্নতি (১৯০৯), চরিত্র গঠন (১৯০৯), বঙ্গের বাহিরে বাঙালী (১৯১৫), ইব্রীয় ধর্ম (১৯১৯), সৃষ্টিতত্ত্বে পুরাণ ও বিজ্ঞান (১৯১৯), প্রাণীদের অন্তরের কথা (১৯২১)। মৃত্যু. ১৯৩৯)।



জ্যোতি বসু (১৯১৪-২০১০): জন্ম. মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা, ৮ জুলাই ১৯১৪। রাজনীতিবিদ, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। প্রকৃত নাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বসু। পিতা ডা. নিশিকান্ত বসু, মাতা হেমলতা বসু। পূর্বপুরষের বাস নারায়ণগঞ্জ জেলায় সোনারগাঁ উপজেলার বারদী গ্রামে। ১৯২০-এ ছয় বছর বয়সে ধর্মতলার লোরেটো স্কুলে ভর্তি



হন ১৯২৫-এ দ্বিতীয় শ্রেণিতে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি। এই স্কুল থেকেই সিনিয়র কেমব্রিজ (নবম শ্রেণি) পাস। মেট্রিক পাস করার পর ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সাম্মানিক (অনার্স)-সহ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। স্নাতক পাসের পর ১৯৩৫-এ আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার্থে যুক্তরাজ্যে গমন। লন্ডনে অবস্থানকালে সেখানকার ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে গড়ে ওঠা লন্ডন মজলিশের প্রথম সম্পাদক। মিডল টেম্পলে ব্যারিস্টারি পাঠ ও যোগ্যতা অর্জনের পর ১৯৪০-এর ১ জানুয়ারি দেশে ফিরে আসা। এবছরই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ। রাজনৈতিক জীবন শুরু শ্রমিক নেতা হিসাবে। কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতির জন্য তালিকাভুক্তি। বাসন্তী ঘোষের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন। অল্পদিন পরেই স্ত্রী বিয়োগ হয়। ১৯৪১-এ মাতার মৃত্যু। ১৯৪৮-এ বিয়ে হয় কমল বসুর সঙ্গে। ১৯৪৬-এ মাত্র বত্রিশ বছর অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রাদেশিক আইনসভায় সদস্য নির্বাচিত। এই সময় থেকেই আইনসভায় বিরোধী নেতার ভূমিকা পালন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বামপন্থীরাই বিরোধী দলে ছিল। এই সময় একাধিকবার বিভিন্ন কারণে কারারুদ্ধও হতে হয় বসু-সহ তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় বিরোধী নেতাদের। ১৯৪০-এর দশকে জলপাইগুড়ির দোমহনিতে রেল শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু। এখানকার কৃষক ও চা শ্রমিকদের সংগঠন তৈরি ও তেভাগা আন্দোলনে অবদান রাখেন। দোমহনি থেকেই বেঙ্গল আসাম রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতা হিসেবে ১৯৪৬-এর গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের হুমায়ুন কবিরকে মাত্র আট ভোটে পরাজিত করে বিধায়ক নির্বাচিত। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি মোট তিনটি আসন পেয়েছিল। ১৯৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে কমিউনিস্ট পার্টির নতুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি বা 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি'র সদস্য মনোনীত। ১৯৪৮-এর ২৬ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণার পরদিন গ্রেপ্তার। ১৯৫২-এর ১৮ জানুয়ারি বিধানসভার নির্বাচনে জয়লাভ ও বিরোধীদলীয় নেতা মনোনীত। ১৯৫৩-এ কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৬২-এর নির্বাচনে পুনরায় জয়লাভ ও বিরোধীয়দলীয় নেতা। ১৯৬৭-এর ৪র্থ সাধারণ নির্বাচনে অ-কংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকারে পশ্চিমবঙ্গের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ। ১৯৬৯-এর মধ্যবর্তী নির্বাচনে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে আবারো উপমুখ্যমন্ত্রী। ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত। ১৯৭৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত একটানা তেইশ বছর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন। ভারতের দীর্ঘতম মেয়াদের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কৃতিত্ব তাঁর। ২০০৮-এ ২৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'ভারতরত্ন' প্রদান করতে চাইলে তা গ্রহণে অসম্মতি। ২০০৭-এর ১৭ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জ্যোতি বসুকে সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধি প্রদান। ২০০৮-এর ৪ সেপ্টেম্বর বাড়িতে পড়ে গিয়ে কপালে ও মাথায় আঘাত পান। ৭ সেপ্টেম্বর ভর্তি হন হাসপাতালে। ১২ নভেম্বর আবার বাড়িতে পড়ে গিয়ে আহত হন। ২০০৯-এর ১৩ মে বাথরুমে পড়ে গিয়ে বাঁ পায়ে আঘাত পান। মৃত্যু. কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি ২০১০।

জ্যোতিঃপাল মহাথেরো (১৯১৪-২০০৪)॥ জন্ম. কেমতলী, বরইগাঁও, লাকসাম, কুমিল্লা। ৫ জানুয়ারি ১৯১৪। বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। মাতা দ্রৌপদীবালা সিংহ। পিতা চন্দ্রমণি সিংহ। স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ। আচার্য ধর্মাধার মহাস্থবিরের তত্ত্বাবধানে পাহাড়তলী মহামুনি পালি কলেজে এবং পরে কলকাতা ও নালন্দা বিদ্যাভবনে পালি ভাষা-সাহিত্য এবং বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বাংলা, ইংরেজি, পালি, সংস্কৃত, হিন্দি, বর্মি প্রভৃতি ভাষা জানতেন। পনেরো বছর বয়সে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হন। ধর্ম ও বিনয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৮-এ তিনি উপসম্পদা তথা ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি ৩৩ বছর ধরে পালি ভাষার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে: পুগ্গল



পঞ্চপ্রতি, কর্মতত্ত্ব, ব্রহ্মবিহার, বোধিচর্যাবতার, মালয়েশিয়া ভ্রমণ কাহিনী, সাধনার অন্তরায়, বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা, সৌম্য সাম্যই শান্তির উৎস, প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান-পতন, বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে, ব্রহ্মবিহার, চর্যাপদ, বুদ্ধের জীবন ও বাণী, গুরুদেব গুণালংকার মহাস্থবিরের জীবনী, রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিকাশ ও পঞ্চ বুদ্ধ অনাথালয়, পালি-বাংলা অভিধান (২ খণ্ড) প্রভৃতি । বরইগাঁও ও বৌদ্ধবিহার পালি পরিবেণ, সমাজকল্যাণ কেন্দ্র, বয়ন বিদ্যালয়, বরইগাঁও অনাথ আশ্রম, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, উচ্চ বালক বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁর সাংগঠনিক পারদর্শিতার সাক্ষ্য দেয়। বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের অন্যতম সংগঠক। এই সংঘের পরিচয়ে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতে গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় তিনি একে একে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, চীন, জাপান, হংকং, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের জন্য কাজ করেন। বৌদ্ধ কৃষ্টি সংঘের সভাপতি হিসেবে তিনি জাপান, রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৭৯-এ মঙ্গোলিয়ার এমন একটি সম্মেলনে তাঁকে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ শান্তি পদকে ভূষিত করা হয়। জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর অন্যতম বড়ো কাজ হলো শান্তরক্ষিত মহাস্থবির (১৯০৪—১৯৯৭) সংকলিত দুই খণ্ডের পালি-বাংলা অভিধান সম্পাদনা। মৃত্যু. বিশ্বশান্তি প্যাগোডা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, ২০০৪।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২)॥ জন্ম. ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৯১২। কথাশিল্পী। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরেই স্কুল জীবন অতিবাহিত। মেট্রিক পাস করার পর কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি। কলেজে পড়ার সময় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। বি.এ. পড়ার সময় গ্রেফতার। বিচারাধীন বন্দী হিসেবে কুমিল্লা জেলে কিছুকাল



কাটান। পরে 'ডেটিন্যু' ও 'হাম ইনটার্ন'-এ কিছুকাল অতিবাহিত। প্রথমে জে. ওয়াল্টার টমসনের প্রচার বিভাগে কর্ম সম্পাদনা। এরপরে দমদম বিমান ঘাঁটিতে চাকরি গ্রহণ। একসময় সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ। দৈনিক আজাদ ও যুগান্তর পত্রিকায় সাংবাদিকতা। পরে 'জনসেবক' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ: খেলনা (১৯৪৬)। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস: সূর্যমুখী (১৯৫২)। অন্যান্য গ্রন্থ-উপন্যাস: মীরার দুপুর, বারো ঘর এক উঠান, লাস্ট চ্যাপ্টার, এই তার পুরস্কার, হৃদয়জ্বালা, তিনপরী ছয় প্রেমিক, সাঁকোর ওপরে নীরা, জীবনের স্বাদ, শেষ বিচার, কলকাতার নট (১৯৭৫)। গল্পগ্রন্থ: শালিক কি চড়ুই, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প। মৃত্যু. ১৯৮২।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)॥ জন্ম. জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ৪ মে ১৮৪৯। নাট্যকার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র/সপ্তম সন্তান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতা। কেশবচন্দ্র সেন স্থাপিত কলকাতা কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স (১৮৬৪) পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। এ কলেজে এফ.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। হিন্দুমেলা (১৮৬৭) উপলক্ষে 'উদ্বোধন' শীর্ষক জাতীয়ভাবের কবিতা রচনা (১৮৬৮)। এর কিছুদিন পরে কলকাতা নিবাসী শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ (৫ জুলাই (১৮৬৮)। কুড়ি বছর বয়সে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত (১৮৬৯)। একটানা পনেরো বছর এপদে দায়িত্ব পালন (১৮৬৯-১৮৮৪)। 'ব্রাহ্মধর্ম বোধিনীসভা' (১৮৭২) ও 'আদি ব্রাহ্মণসমাজ সংগীত বিদ্যালয়ের' (১৮৭৫) প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। জাতীয়চেতনা জাগ্রত করার জন্য তাঁর উদ্যোগে 'সঞ্জীবনী সভা' স্থাপিত। বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য 'সারস্বত সমাজ' (১৮৭২) নামে আর একটি সঙ্ঘ গঠন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি 'ভারতীয়' পত্রিকা প্রকাশ (জুলাই ১৮৭৭)। হিন্দু মেলার 'সংশ্লিষ্ট সম্পাদক' পদে বৃত (১৮৭৪-



১৮৭৫)। ১৮৮৪-র ১৯ এপ্রিল কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা। পত্নীবিয়োগের পর ব্রহ্মসংগীত রচনায় আত্মনিয়োগ। কিছুকাল পাট ও নীলের ব্যবসায় ও স্টিমার (সরোজিনী) পরিচালনা। এ-সকল করেছিলেন বাঙালিদের ব্যবসার প্রতি আগ্রহ জাগাবার জন্য। নন্দিত নাট্যকার। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (প্রহসন, ১৮৭২), 'পুরুষবিক্রম নাটক' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'হঠাৎ নবাব' (প্রহসন, ১৮৮৪), 'অলীক বাবু' (১৯০০) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। দেশাত্মবোধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের প্রধান উপজীব্য। নারী-স্বাধীনতায় কটাক্ষ করে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' রচিত। পরে স্ত্রী-স্বাধীনতার এমন পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন যে সস্ত্রীক ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে ঘুরে বেড়াতে কুণ্ঠিত হন নি। গীতিকার, স্বরলিপিকার, অনুবাদক ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও খ্যাত। তাঁর 'স্বরলিপি গীতিমালা' (১৮৯৭) বাংলা সংগীতের স্বরলিপির একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ। 'বীণাবাদিনী' (১৮৯৭) ও 'সংগীত প্রকাশিকা' (১৯০১) নামক পত্রিকা প্রকাশ। বিশুদ্ধ সংগীতচর্চার জন্য কলকাতায় স্থাপন করেন 'ভারত সংগীত সমাজ'। ইংরেজি, ফরাসি, মারাঠি ও সংস্কৃত থেকে অনেক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে দক্ষতার পরিচয় প্রদান। প্রতিভাবান বাঙালি। সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান স্মরণীয়। তাঁর সজ্ঞ গড়ার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। বাঙালির মনে স্বাদেশিকভাব জাগ্রত করার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন। শেষ জীবন রাঁচীতে অতিবাহিত। মৃত্যু. ৪ মার্চ ১৯২৫।

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (১৯২০-১৯৭১)॥ জন্ম. বড়বাসা, ময়মনসিংহ শহর, ১০ জুলাই ১৯২০। অধ্যাপক। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ১৯৩৬-এ প্রবেশিকা, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯৩৯-এ আই.এসসি. পাস। ১৯৪২-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. এবং ১৯৪৩-এ দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৯৬৭-তে লন্ডন কিংস কলেজ থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। কর্মজীবন শুরু ১৯৪৩-এ কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজে অধ্যাপনা মাধ্যমে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজের ইংরেজির প্রভাষক। ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান। ১৯৬৮-তে রিডার পদে উন্নীত। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুররতা এম. এন. রায়ের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমে বিশ্বাসী একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে খ্যাত। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন সময়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা। পিএইচ.ডি.'র জন্য লিখিত Classical Myths in plays of Swinburne Sturge Moore and Eliot নামের থিসিস ১৯৮২-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বিচিত্র বিদ্যায় উৎসাহী। সজ্জন ও সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবী হিসাবে খ্যাতি অর্জন। মৃত্যু. ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত হলে ২৭ মার্চ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নীত এবং সেখানে ৩০ মার্চ মৃত্যুবরণ।



জোহরা বেগম কাজী (১৯১২-২০০৭)॥ জন্ম. ১৫ অক্টোবর ১৯১২, রাজনান, মধ্যপ্রদেশ, ভারত। প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ। পিতা ডাক্তার কাজী আব্দুস সাত্তার ও মাতা আঞ্জুমান নেসা। পৈতৃক বাস গোপালপুর, কালকিনি, মাদারীপুর। নরসিংদির সাবেক এমপি রাজউদ্দিন ভুঁইয়া তাঁর স্বামী। ১৯২৯-এ আলিগড় মুসলিম মহিলা স্কুল থেকে প্রথম বাঙালি মুসলিম আলিগড়িয়ান হিসাবে মেট্রিক পাস। দিল্লির লেডি হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৩৫-এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.বি.বি.এস. পাস। স্থানীয় হাসপাতালে ডাক্তার হিসেবে কর্মজীবন শুরু। পরে বিলাসপুর সরকারি হাসপাতাল যোগদান। মহাত্মা গান্ধীর 'সেবাগ্রাম'-এ অবৈতনিকভাবে দায়িত্বপালন। ১৯৪৮-এ ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে যোগদান। এসময় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে অনারারি কর্নেল হিসাবেও



দায়িত্ব পালন। মিডফোর্ড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গাইনোকোলজি বিভাগের প্রধান ও অনারারি প্রফেসর ছিলেন। ১৯৭৩-এ চাকরি থেকে অবসর নেবার পর হলিফ্যামিলি রেডক্রিসেন্ট হাসপাতালে কনসালটেন্ট হিসাবে সেবাদান। বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে অনারারি অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন। পুরস্কার ও স্বীকৃতি: তমঘা-ই-পাকিস্তান (১৯৬৪), একুশে পদক, (২০০৮), বেগম রোকেয়া পদক, (২০০২)। মৃত্যু. ঢাকা, ৭ নভেম্বর ২০০৭।

টেওডোর বেনফি (১৮০৯-১৮৮১)॥ জন্ম. জার্মানির গটিঙ্গেন-এ, ২৮ জানুয়ারি ১৮০৯। তুলনামূলক ব্যাকরণ বিদ্যা এবং বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত, সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক। প্রথম জীবনে ফ্রাঙ্কফুর্টে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, পরে গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ব্যাকরণের অধ্যাপক। ১৮৪৪-এ জার্মান অনুবাদ ও টীকাসহ মূল সামবেদ প্রকাশ। পরে পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ (১৮৫৯) করেন এবং ইউরোপীয় লোককাহিনীর আদি উৎস যে পঞ্চতন্ত্র তা বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করেন। প্রধান রচনা: Die Hymmen des Samaveda (১৮৪৮), Das Pantschatantra (১৮৫৯)। মৃত্যু. ৩০ জুন ১৮৮১।

ডলি ইব্রাহিম (১৯৪৮-১৯৯১)॥ জন্ম. পিতার



কর্মস্থল যশোর, ১ জুলাই ১৯৪৮। আদি নিবাস ঢাকা। পিতা ডাক্তার মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মাতা অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. অনার্স (বাংলা) ও এম.এ. (বাংলা) ডিগ্রি লাভ। মঞ্চ, চলচ্চিত্র, বেতার ও টেলিভিশনের বিশিষ্ট অভিনয়-শিল্পী। তেরো বছর বয়সে মা অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিমের পরিচালনায় অভিনীত 'চরিত্রহীন' নাটকে 'ঝি'য়ের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয়। বেতার ও টেলিভিশনে বহু সংখ্যক নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ে সৃজনশীলতা পরিচয় প্রদান। চলচ্চিত্রের অভিনয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন। 'সূর্য দীঘল বাড়ি' ছায়াছবির প্রধান চরিত্রে জয়গুনের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ। পরবর্তীকালে 'দহন' নামক আর একটি চলচ্চিত্রে একটি ক্ষুদ্র চরিত্রে অভিনয়। আলোকচিত্র শিল্পী হিসেবেও প্রসিদ্ধ লাভ। আলোকচিত্রের প্রতিযোগিতায় জাতিসঙ্ঘ পুরস্কার লাভ। সাতদিন নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা। প্রথমে রাজিউদ্দীন আহমেদ রাজুর সঙ্গে (রাজনীতিবিদ), পরে আনোয়ার হোসেনের (আলোকচিত্রশিল্পী) সঙ্গে এবং সর্বশেষে আনিসুল হকের (বিজ্ঞাপনী সংস্থার কর্ণধার) সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। শেষের বিয়েও টেকেনি। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্ব থেকেই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন। মৃত্যু. ঢাকা, ৩ জুলাই ১৯৯১।

তফাজ্জল হোসেন (১৯১১-১৯৬৯)॥ জন্ম.



ভাণ্ডারিয়া গ্রাম, পিরোজপুর, ১৯১১। সাংবাদিক ও সম্পাদক। ডাকনাম মানিক মিয়া। পিরোজপুর সরকারি হাই স্কুল থেকে মেট্রিক ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বি.এ. পাস। পিরোজপুর আদালতে কেরানির চাকরি লাভ। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহায়তায় তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকারের জনসংযোগ বিভাগের বরিশাল জেলা শাখার জনসংযোগ অফিসার পদে নিযুক্তি লাভ। কিছুকাল পর সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ। সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক তাঁকে কলকাতায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসের সেক্রেটারি নিয়োগ। সেই সময় থেকেই সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ও রাজনৈতিক মতাদর্শে সোহরাওয়ার্দীর ভাব-শিষ্যত্ব গ্রহণ। পাকিস্তান অর্জনের প্রাক্কালে (আগস্ট ১৯৪৭) তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রিত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সোহরাওয়ার্দী পরাজিত হলে মুসলিম লীগে তাঁর (মানিক মিয়ার) অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ায় লীগের অফিস সেক্রেটারির পদ থেকে পদত্যাগ। সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দৈনিক ইত্তেহাদ (১৯৪৬) পত্রিকার পরিচালনা বোর্ডের সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান। প্রায় এক বছর এ পদে দায়িত্ব পালন ১৯৪৮-এর শেষের দিকে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে কলকাতা ত্যাগ করে

ঢাকায় আগমন। ১৯৪৯-এর ২৩ জুন আওয়ামী লীগ গঠিত হলে দলীয় মুখপাত্র হিসেবে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রকাশিত। ১৯৫১-র ১৪ আগস্ট এ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৫৩-র ২৪ ডিসেম্বর তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ইত্তেফাক দৈনিকে রূপান্তরিত। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হলে তা লঙ্ঘনের অভিযোগে ১৯৫৯-এর ২৮ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার। প্রায় এক বছর কারানির্যাতন ভোগ। ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারির সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র-বিক্ষোভের ইন্ধন যোগাবার অভিযোগে ৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৬২) পুনরায় গ্রেফতার। ১৯৬৬-তে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন। ইত্তেফাক ৬ দফার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকলে আইয়ুব সরকারের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত। ১৬ জুন (১৯৬৬) গ্রেফতার। একই দিন সরকার কর্তৃক ইত্তেফাকের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং এর ছাপাখানা নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত। প্রেসটি বাজেয়াপ্ত করায় তাঁর অপর দুইটি পত্রিকা 'ঢাকা টাইমস' ও 'পূর্বাণী' বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৭-র ২৯ মার্চ অসুস্থ অবস্থায় পুলিশ হাসপাতাল (ঢাকা) থেকে মুক্তিলাভ। গণ-আন্দোলনের চাপে ১৯৬৯-এর ১০ ফেব্রুয়ারি সরকার কর্তৃক ইত্তেফাকের প্রকাশনার ওপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার। ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) তাঁর সম্পাদনায় ইত্তেফাক পুনঃপ্রকাশিত। ১৯৬৩-তে আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউটের পাকিস্তান শাখার সভাপতি নির্বাচিত। কিছুকাল। পাকিস্তান প্রেস কোর্ট অব অনার সংস্থার সেক্রেটারি পদে দায়িত্ব পালন। এছাড়া দুই বছর কাল পি. আই. এ'-র (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজ) ডিরেক্টর (১৯৫৬-১৯৫৮)। বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভীক সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসেবে খ্যাত। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হয়রানি ও প্রলোভন তাঁকে তাঁর বিশ্বাসের অবস্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। দেশে নির্ভেজাল পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, পূর্ববাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের কবল থেকে বাঙালিদের মুক্ত করার জন্য ইত্তেফাকের 'মঞ্চে নেপথ্যে' উপ-সম্পাদকীয় কলামে মুসাফির ছদ্মনামে বিরামহীন লেখনী পরিচালনা। ষাটের দশকে বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের [illegible] তাত্ত্বিক ও পৃষ্ঠপোষক। বাঙালিদের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। ১৯৬১-তে এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালনের বিরোধিতা করলে তাঁদের সে পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির অন্যতম প্রধান সদস্য হিসেবে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালন। অসাম্প্রদায়িক শোষণহীন ও নিপীড়নমুক্ত সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উছিলা করে ১৯৬৪-র জানুয়ারিতে এক অশুভ শক্তি পূর্ববাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধলে সে দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য দুঃসাহসী ভূমিকা পালন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারী এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক সহকর্মী ও বন্ধু। ইত্তেফাকের প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের কাজে ১৯৬৯-এর ২৬ মে ঢাকা থেকে রাওয়ালপিণ্ডি গমন এবং সেখানে ৩১ মে (১৯৬৯) রাতে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত। মৃত্যু. ৩১ মে ১৯৬৯।

তমিজউদ্দীন খান (১৮৮৯-১৯৬৩)॥ জন্ম. খানখানাপুর গ্রাম, ফরিদপুর, ১৮৮৯। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। ১৯১১-তে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. অনার্স (ইংরেজি) এবং ১৯১৩-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাস। ১৯১৪-তে বি.এল. ডিগ্রি লাভ। এরপর ফরিদপুর জেলা আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু এবং কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত। ফরিদপুর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও খেলাফত কমিটির সহ-সভাপতি ১৯২০-তে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান এবং আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে কলকাতা ন্যাশনাল কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে ১৯২১ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত কারাভোগ ১৯২৬-এ প্রথমবার ও ১৯২৯-এ



দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের মনোনয়নে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯২৬-এর নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৩০-এ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান। এ সময় থেকে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু। ১৯৩৭-এ মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে তৃতীয়বার বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। এবারের নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। ১৯৩৭-১৯৪১ পর্যন্ত বঙ্গীয় সরকারের ফজলুল হক মন্ত্রিসভার কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম দফতরের মন্ত্রী ও ১৯৪৩-১৯৪৫ পর্যন্ত খাজা নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী। পাকিস্তান আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন এবং ১৯৪৫-১৯৪৬ পর্যন্ত ভারতীয় আইন সভার সদস্য। ১৯৪৬-এ চতুর্থবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। কিছুকাল বঙ্গীয় আইন সভার স্পিকার। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান গণ-পরিষদের সহসভাপতি এবং ১৯৪৮-এর ২৩ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর গণ-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৫৪-এর ২৪ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক গণ-পরিষদ বাতিল। এর প্রতিবাদে তমিজউদ্দীন খান কর্তৃক সিন্ধু হাইকোর্টে মামলা দায়ের। সিন্ধু হাইকোর্ট কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে রায় প্রদান। এই রায়ের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টে আপিল দায়ের। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ১৯৫৫-র জুন মাসে নতুন গণ-পরিষদ গঠিত। ১৯৫৮-এর অক্টোবর মাসে দেশে সামরিক শাসন জারির আগে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি। আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯৬২-র শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে ২৮ এপ্রিল (১৯৬২) ফরিদপুর-ঢাকা আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং ৮ জুন (১৯৬২) উক্ত পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন। সাহিত্যানুরাগী হিসেবে পরিচিত। 'বিবাহে রাজনীতি' ও 'গাঁয়ের গোলাপ' তাঁর রচিত উপন্যাস। ব্রিটিশ শাসনামলে 'পয়গাম' ও 'মদীনা' নামে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা। বঙ্গীয় প্রজা সমিতির অন্যতম নেতা এবং জমিদারি প্রথার বিরোধিতা করে এই ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্যে সংগ্রাম পরিচালনা। ভারতীয় মুসলমানদের পুনর্জাগরণ ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং এই বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। মৃত্যু. ১৯ আগস্ট ১৯৬৩।

তরীকুল আলম (১৮৮৯-১৯৩২)॥ দার্জিলিং শহর, ১৮৮৯। পৈতৃক নিবাস চন্দনবাড়ি গ্রাম, দিনাজপুর। সমালোচক ও গল্পকার। ১৯০২-তে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বি.এ. পরীক্ষায় স্বর্ণপদক সহ অনার্স নিয়ে পাস। এম.এ. পরীক্ষাতেও স্বর্ণপদক লাভ। ছাত্র অবস্থায় চাকরি জীবনে প্রবেশ। চাকরি করতে করতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ভোলার মহকুমা হাকিম। স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থক। ইংরেজ আমলে সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশ প্রীতির জন্যে চাকরিতে ইস্তফা প্রদান। কিন্তু সরকার কর্তৃক পুনরায় চাকরিতে বহাল। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস/বেগম। ছোটগল্প/সমবায় সমিতি। মৃত্যু. দিল্লি ১১ নভেম্বর ১৯৩২।

তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭)॥ জন্ম. কলকাতা, ৪ মার্চ ১৮৫৬। কবি। ১৮৬২-তে পরিবারের সকলের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। ১৮৬৯-১৮৭৩ পর্যন্ত ইউরোপে বাস। প্রথমে ফ্রান্সের নীসের এক পাসিয়ঁনাতে এবং পরে কেমব্রিজে পড়াশুনা। কলকাতায় ফিরে সংস্কৃতিতে শিক্ষা



লাভ। ফরাসি কবির কাব্যালোচনা প্রথম রচনা। ÍLelonte de lisle বেঙ্গল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। কয়েকজন ফরাসি কবির কবিতার অনুবাদ। উল্লেখযোগ্য কাব্য: A Sneaf Gleaned in French Field (১৮৯৬)। অপর উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ: Ancient Ballads and Legends of Hindustan (১৮৮২)। ১৮৭৮-এ Binaca নামে একটি উপন্যাস বেঙ্গল ম্যাগাজিন পত্রিকায় প্রকাশিত। রচিত ফরাসি উপন্যাস: 'Le Journal de Madem Moiselled ' Arvers নামক গ্রন্থ প্যারিস থেকে ১৮৭৯-তে প্রকাশিত। ৩০ আগস্ট ১৮৭৭।

তসলিমউদ্দীন আহমদ (?-১৯৭১)॥ জন্ম. রাজশাহী। আয়কর আইনজীবী, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ। রাজশাহীতে আয়কর আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন। মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা

প্রদান। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করার অপরাধে পাকবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার এবং হত্যা. ১৯ নভেম্বর ১৯৭১।

তসলিমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭)॥ জন্ম. দার্জিলিং, ৩০ এপ্রিল, ১৮৫২। ইসলামিক চিন্তাবিদ ও লেখক। পৈতৃক নিবাস চন্দনবাড়ি গ্রাম, পঞ্চগড়। দিনাজপুরের বিখ্যাত টি (Tea) পরিবারের সন্তান। রংপুর জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. (১৮৭৭), ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল. (১৮৮২) ডিগ্রি লাভ। পূর্ণিয়া, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে ওকালতি করে ১৮৮৯-তে স্থায়ীভাবে রংপুর আদালতে যোগদান। উত্তরকালে একজন দক্ষ আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপন্ন একজন ইসলামি চিন্তাবিদ রূপে সুনাম অর্জন। কোরআন শরিফের বঙ্গানুবাদ তাঁর প্রধান কীর্তি। তাঁর অনূদিত 'কোরআন'-এর প্রথম খণ্ড ১৯২২-এ, দ্বিতীয় খণ্ড-১৯২৩-এ ও তৃতীয় খণ্ড-১৯২৪-এ প্রকাশিত। 'জন্মোৎসব' (১৯২৫), 'সাহাবিরা' (১৯২৬) ও 'সম্রাট পয়গম্বর' (১৯২৮) তাঁর মৌলিক গ্রন্থ। 'জন্মোৎসব' কবিতাগ্রন্থ ও 'সম্রাট পয়গম্বর' হজরত মোহাম্মদের জীবনচরিতমূলক গ্রন্থ। 'সাহাবিরা'য় আটাশজন মুসলিম সাহাবিয়ার জীবনী বর্ণিত। ১৯১২-তে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক খানবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত। মুসলমানদের সর্ববিষয়ে উন্নতির চিন্তাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত 'ইসলাম' নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। মৃত্যু. রংপুর, ২৪ মার্চ, ১৯২৭।

তসের আলী (?-১৯৭১)॥ জন্ম. জয়পুর গ্রাম, দোহার, ঢাকা। জারিগায়ক। পুরো নাম মুন্সি তসের আলী খন্দকার। ওয়াহেদ আলীর কাছে মরমি, বিচ্ছেদ, বাউল আর ভাটিয়ালী গানের তালিম গ্রহণ। কলকাতার অনেক নামী-দামি সংগীতগুরুর কাছে গানের তালিম গ্রহণ। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে পরিচয় লাভ এবং তাঁর উৎসাহে গান রচনা শুরু। একজন স্বভাব কবি হিসেবে সুনাম অর্জন। টুইন গ্রামোফোন কোম্পানির অনুরোধে 'নাতিনের মেজবানী' নামে একটি জনপ্রিয় গীতিনাট্য রচনা ও একটি গানের দল গঠন করে তা রেকর্ড করেন। ১৯৩৬-এ তাঁর গানের প্রথম রেকর্ড বের হয়। কবি জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে পরিচয় এবং সে সূত্রে সরকারের 'সঙ-পাবলিসিটি' বিভাগে চাকরি গ্রহণ। গায়ক আব্বাসউদ্দীনের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব। জারি গানের এক নতুন ধারার প্রবর্তক। জারি গানের ধুয়া ধরার মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য নিহিত। বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানির থেকে তাঁর গীত চুরাশিটি গানের রেকর্ড বের হয়েছে। 'জারি সঙ্কলন' ও হাল জামানার জারি' তাঁর রচিত জারি গানের দুটি সঙ্কলন। মৃত্যু. ২১ ডিসেম্বর ১৯৭১।

তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫)॥ জন্ম. দরদরিয়া গ্রাম, কাপাসিয়া, গাজিপুর, ২৩ জুলাই ১৯২৫। রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬-এ অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণিতে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৬৪-তে জেল



থেকে পরীক্ষা দিয়ে ল' পাস। ছাত্রজীবন থেকেই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। চল্লিশের দশকে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় সদস্য। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ।১৯৪৮ ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ।১৯৫২ উভয় কমিটির সদস্য। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণের দায়ে গ্রেফতার ও কারানির্যাতন ভোগ পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ (এপ্রিল ১৯৫১)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৫১-১৯৫৩ পর্যন্ত এ সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সদস্য। ১৯৫৩-তে আওয়ামী লীগে যোগদান ও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৪-র মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে কাপাসিয়া অঞ্চল থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত একই বছর জুন মাসে ৯২-ক ধারায় গ্রেফতার ১৯৫৫-র ২৭ অক্টোবর কাউন্সিল সভায় আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক ও সমাজ সেবা সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৮-র, ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারির পর আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে

গ্রেফতার ও ১৯৫৯-এ মুক্তিলাভ। ১৯৬২-তে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত এনডিএফ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট)-এর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৬৪-র ২৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। একই বছর ৮ মার্চ কাউন্সিল সভায় দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত। এপ্রিল (১৯৬৪) মাসে গ্রেফতার। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে (২ জানুয়ারি ১৯৬৫) সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ। ১৯৬৬-র ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে যোগদান। এ সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উপস্থাপন। ১৯৬৬-র ১৯ মার্চ কাউন্সিল সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। প্রায় ছয় বছর এ পদে দায়িত্ব পালন। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ৬ দফার প্রচারাভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। ৮ মে (১৯৬৬) দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার। গণ-আন্দোলনের চাপে ১৯৬৯-এর ১২ ফেব্রুয়ারি সরকার কর্তৃক মুক্তিদান। গণ-আন্দোলনে (জানুয়ারি-মার্চ ১৯৬৯) নেতৃত্বের ভূমিকা পালন। বিরোধী দল ও সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক আহূত গোলটেবিল বৈঠকে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১০, ১১ ও ১২ মার্চ ১৯৬৯) আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে যোগদান। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৫ আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম পরিচালক। ২৫ মার্চ (১৯৭১) রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর সশস্ত্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে গণহত্যা শুরু করলে ঢাকা ত্যাগ করে ভারত গমন। ১২ এপ্রিল (১৯৭১) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ। ১৭ এপ্রিল (১৯৭১) মুজিবনগরে এ সরকারের আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য তাঁর সরকার কর্তৃক সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধের ডাক। সে আহবানে সাড়া দিয়ে দলে দলে ছাত্র-জনতা, ইপিআর, পুলিশ ও বাঙালি সৈনিকদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান। এদের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন। মুক্তিবাহিনীর জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের ব্যাপারে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ভারত, রাশিয়া, পূর্ব জার্মান ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ তাঁর সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান। বাংলাদেশের সর্বত্র মুক্তিবাহিনী গেরিলাযুদ্ধের কৌশলে আক্রমণ চালিয়ে পাক হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তোলে। ৩ ডিসেম্বর (১৯৭১) পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ড কর্তৃক বাংলাদেশে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা। ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উক্ত যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে বাংলাদেশের চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা লাভ। ২৩ ডিসেম্বর (১৯৭১) তাজউদ্দীনের সরকারের মুজিবনগর থেকে বিমানযোগে ঢাকায় আগমন এবং তেজগাঁ বিমানবন্দরে বিপুল সংবর্ধনা লাভ। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। ১২ জানুয়ারি তাঁর নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হলে তাজউদ্দীন আহমদের অর্থমন্ত্রীর পদ লাভ। ১৯৭২-এর ১১ এপ্রিল শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য নিযুক্ত ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২) রচনায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ ঢাকা-২২ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭৪-এর ২৬ অক্টোবর মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতা দখল করে দেশে সামরিক আইন জারি করলে ২৩ আগস্ট গ্রেফতার। অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগকে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক-প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম পরিচালনা। ষাটের দশকে পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উজ্জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দৃঢ় আস্থাশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে খ্যাত। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী থাকাকালে ব্যাংক, বীমা ও বৃহৎ শিল্প

প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের একজন সুযোগ্য সহকর্মী। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। মৃত্যু. ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী অবস্থায় কারাগারের প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে প্রবেশকারী সশস্ত্র বাহিনীর কতিপয় ব্যক্তির হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৩ নভেম্বর ১৯৭৫-এ নিহত।

তারকচন্দ্র সরকার, কবিরসরাজ (১৮৪৭-১৯১৪)॥ জন্ম. জয়পুর গ্রাম, নড়াইল, ১৮৪৭, (অগ্রহায়ণ ১২৫৪) কবিয়াল। পিতা কাশীনাথ সরকার কবিয়াল ছিলেন। মাতার নাম অন্নপূর্ণা। পাঠশালায় সামান্য শিক্ষা লাভ। শৈশবে পিতার নিকট কবিগানের তালিম গ্রহণ। উনিশ শতকের শেষার্ধে পূর্ববঙ্গের কবিগানে তিনি যে বিশিষ্টতা দান করেন, তা কলকাতা পর্বের কবিগানের চেয়ে বহু দিক দিয়ে স্বতন্ত্র ও উন্নত ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের নিকট মতুয়াধর্মে দীক্ষাগ্রহণ। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' নামে তিনি কাব্যাকারে হরিচাঁদ ঠাকুরের (১৮১২-১৮৭৮) জীবনী লেখেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭) কর্তৃক 'প্রেমিক চূড়ামণি' উপাধি দান। ইতিনার ভট্টাচার্য পাড়ার পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বর্ণপদকসহ 'সুকবি' উপাধিতে ভূষিত। যশোরের কালিয়ার পণ্ডিতবর্গ প্রদত্ত উপাধি 'কবিরসরাজ'। শেষোক্ত উপাধিটি তাঁর নামের সঙ্গে ব্যবহৃত। তাঁর লেখা বহু কবিগানের মধ্যে 'শ্রীহরিদর্শন' ও 'মতুয়াসুহৃদ' পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: মহাসঙ্কীর্তন (কলকাতা, ১৯১০), শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত (কলকাতা, ১৯১৭)। বাংলা একাডেমী থেকে তাঁর জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত। মৃত্যু. জয়পুর, ডিসেম্বর ১৯১৪ (অগ্রহায়ণ, ১৩২১)।



তারাপদ চক্রবর্তী (১৯০৮-১৯৭৫)॥ জন্ম. কোটালিপাড়া গ্রাম, গোপালগঞ্জ ১৯০৮। কণ্ঠশিল্পী ও সংগীতাচার্য। পিতার কাছে সংগীতে হাতেখড়ি। সাতকড়ি মালাকার ও গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর নিকট সংগীতে তালিম গ্রহণ। এর কিছুকাল পর কলকাতা [illegible] সাহায্যে ১৯৩১-এ কলকাতা বেতারে তবলা বাদকের চাকরি লাভ। ক্রমে উচ্চাঙ্গ সংগীতের কণ্ঠশিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন। বাংলা খেয়াল ও বাংলা ঠুমরী গানের প্রবর্তক। তবলাবাদনেও দক্ষতার পরিচয় প্রদান। সংগীতকলাকার ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ প্রমুখের সঙ্গে তবলাসঙ্গত করে প্রশংসা অর্জন। 'সংগীতাচার্য', 'সংগীত রত্নাকর', 'সংগীতার্ণব' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত। ১৯৭২-এ সংগীত নাটক আকাদেমির সদস্য নির্বাচিত এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আকাদেমি পুরস্কার লাভ। ১৯৭৩-এ ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' খেতাবে ভূষিত। খেতাব গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ। বিশ্বভারতীর নির্বাচন-বোর্ডের সদস্য। 'সুরতীর্থ' নামে সংগীত গ্রন্থের প্রণেতা। মৃত্যু. কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫।



তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)॥ জন্ম. লাভপুর গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ২৩ আগস্ট ১৮৯৮। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। জমিদার পরিবারে জন্ম। এন্ট্রান্স পাস করে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি। কলেজে পাঠকালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারানির্যাতন ভোগ (১৯২১)। গান্ধীবাদী কংগ্রেস কর্মীরূপে বীরভূমের গ্রাম-শহরে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা। ১৯৩০-এ কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য গ্রেফতার। প্রায় এক বছর জেল-জুলুম ভোগ। চল্লিশের দশকে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। কর্মজীবনে প্রথমে কিছুকাল কানপুরে চাকরি। ১৯৫২-তে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত। আট বছর বিধানসভার সদস্য ও ছয় বছর রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭০-এ বঙ্গীয়



সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বাসে দ্বন্দের জমিদার শ্রেণির পরাভব ও শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শ্রেণির বিজয়, যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে কৃষিসভ্যতার বিরোধাসে বিরোধে গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ভাঙন ও শিল্পকেন্দ্রিক শহুরে অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা, গ্রামীন সমাজের শাসন-সংস্কার ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ, জমিদার ও ধনী চাষির সঙ্গে গরিব চাষির বিরোধিতাসে বিরোধে প্রবলের কাছে গরিবের আত্মসমর্পন, পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, অর্থনৈতিক বৈষম্যের নির্লজ্জ বিস্তার, যুব সম্প্রদায়ের ক্রোধ, অস্থিরতা, বিদ্রোহাসব মিলিয়ে গোটা রাঢ় অঞ্চলের গ্রামীন জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং তারই মাঝে গোটা মানুষের অভ্যুদয় নিপুণভাবে উপস্থাপিত। চৈতালী ঘূর্ণি (১৯৩১), ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), কালিন্দী (১৯৪০), জলসাঘর, কবি (১৯৪২), গণদেবতা (১৯৪২), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩), হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, (১৯৪৭), আরোগ্য নিকেতন (১৯৫৩), পঞ্চপুত্তলী (১৯৫৬), রাধা (১৯৫৭) তারাশঙ্করের প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস। মানব চরিত্রের নানান জটিলতা ও নিগূঢ়র হস্য তাঁর উপন্যাসে জীবন্তভাবে প্রকাশিত। গল্পকার হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার ও ডাকহরকরা প্রভৃতি সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র তাঁর গল্পে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত। রসকলি, বেদেনী, ডাকহরকরা প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প। তারাশঙ্করের গল্পের সংকলন তিন খণ্ডে সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৭৭-১৯৭৯)। তাঁর বহু গল্প ও উপন্যাস অবলম্বনে সার্থক চলচ্চিত্র নির্মিত। দুই পুরুষ, কালিন্দী ও আরোগ্য নিকেতন এ দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যকৃতির জন্য শরৎস্মৃতি পুরস্কার (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), জগত্তারিণী স্মৃতিপদক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), রবীন্দ্র-পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার এবং পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ উপাধি লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

তালিম হোসেন (১৯১৮-১৯৯৯)॥ জন্ম. চাকরাইল, বদলগাছি, নওগাঁ, ১৯১৮। কবি পিতার নাম তৈয়বউদ্দিন চৌধুরী। স্ত্রী মাফরুহা চৌধুরী খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক সম্মান। সাংবাদিকতার পেশায় নিয়োজিত। মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। মাহে নও ও পূর্বাচল পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ। তাঁর প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ: দিশারী (১৯৫৬), শাহীন (১৯৬২), ইসলামী কবিতা (১৯৮১), নূহের জাহাজ (১৯৮৩)। শিশুতোষ গ্রন্থ: ধাই কিরি ধাই কিরি (১৯৮১)। অনুবাদ: স্বর্গচারণ (উপন্যাস, ১৯৫৯), দানবীর এন্ড্রু কার্নেগী (জীবনী, ১৯৬২)। ইসলামি ভাবধারার কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। ১৯৬৫-এ বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৭০-এ সিতারা-ই-ইমতিয়াজ পুরস্কার, ১৯৮২-এ একুশে পদক, ১৯৯২-এ বাংলা সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৩-এ চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমি পুরস্কার পান। মৃত্যু. ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।



তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১)॥ জন্ম. চাঁদপুর গ্রাম, (মতান্তরে হায়দরপুর গ্রাম), চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৭৮২। কৃষক পরিবারে জন্ম। ইংরেজ শাসনবিরোধী লড়াইয়ে শহীদ। আসল নাম মীর নিসার আলী। তিতুমীর নামে প্রসিদ্ধ। বাল্যকাল থেকে শরীরচর্চা অনুশীলন। পরিণত বয়সে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী পালোয়ান হিসেবে খ্যাতি অর্জন। আরবি, ফারসি ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন। এ-সকল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান ও আলাপ-আলোচনায় পারদর্শী। ১৮২২-এ হজ্বব্রত পালনের জন্য মক্কায় গমন। সেখানে ওহাবী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহম্মদ বেরেলভীর সাক্ষাৎ লাভ। ওহাবী মতবাদ গ্রহণ করে ১৮২৭-এ দেশে প্রত্যাবর্তন। এ মতবাদের আলোকে ইসলামের সংস্কার সাধনের জন্য চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলায়



প্রচার শুরু। তাঁতি ও কৃষকদের মধ্যে তাঁর প্রভাব বিস্তার লাভ। দরিদ্র কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করলে জমিদারদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। এ সময়ে মিস্কিন শাহ নামক একজন ফকির তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ায় তাঁর শক্তিবৃদ্ধি। পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তারাগনিয়ার জমিদার রাজনারায়ণ, নাগপুরের জমিদার গৌরপ্রসাদ চৌধুরী ও গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের পক্ষাবলম্বন। জমিদার ও নীলকরদের জুলুমের বিরুদ্ধে তিতুমীর তাঁর অনুসারীদের ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ করলে স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু। পুঁড়ার জমিদারবাড়ি আক্রমণ করে পরাজিত। এতে ভীত না হয়ে নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে টাকী ও গোবরডাঙ্গার জমিদারদের নিকট কর দাবি। জমিদারদ্বয় কর্তৃক তিতুমীরকে কর প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। গোবরডাঙ্গার জমিদারের প্ররোচনায় মোল্লাহাটির কুঠিয়াল ডেভিস তিতুমীরকে দমন করতে এসে পরাজিত। গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিহত। এবার তিতুমীরকে শায়েস্তা করতে এসে বারাসতের কালেক্টর আলেকজাণ্ডার পরাজিত ও বসিরহাটের দারোগা নিহত। তাঁর এ সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রজাদের উপর হিন্দু-জমিদারদের অত্যাচার বৃদ্ধি। জমিদারগণ কর্তৃক মুসলমান প্রজাদের দাড়ির ওপর কর আরোপ। তিতুমীর কর্তৃক জমিদারদের 'দাড়ির খাজনা' (Beard Tax) ধার্যের তীব্র প্রতিবাদ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের কাছে তৎকর্তৃক এর প্রতিকার দাবি। আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর বিক্ষোভ ঘনীভূত। প্রকাশ্যে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধ আরম্ভ এবং নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনার জন্য ১৮৩১-এর ২৩ অক্টোবর নারিকেলবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ। তথায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও তাঁর অনুসারীদের সামরিক প্রশিক্ষণ দান। তাঁর ভাগিনেয় মাসুম খাঁকে তাঁর সেনাপতি নিযুক্ত। তিতুমীরের সঙ্গে এবার সংঘর্ষে নেমে নদীয়ার কালেক্টর পরাজিত। গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক কর্তৃক তিতুমীরের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ। কর্নেল হার্ডিং-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সৈন্যদের বাঁশের কেল্লা আক্রমণ। কামানের গোলার আঘাতে কেল্লা ধ্বংস ও যুদ্ধক্ষেত্রে তিতুমীর শহীদ হন (১৯ নভেম্বর ১৮৩১)। ৩৫০ জন মুজাহিদ বন্দী হন। বিচারে ১৪০ জনের কারাদণ্ড ও মাসুম খাঁর ফাঁসি হয়। তিতুমীর দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা পুরুষ হিসেবে খ্যাত। সামন্তদের নিপীড়ন থেকে গরিব চাষিদের নিষ্কৃতি প্রদান ও ইংরেজ শাসকদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনা করে ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ। ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধনের জন্যও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। মৃত্যু. নারিকেলবাড়িয়া, ১৯ নভেম্বর ১৮৩১।

তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯)॥ জন্ম. নলডাঙ্গা গ্রাম, রংপুর, ১৮৯৭। নাট্যকার ও অভিনেতা। পিতা সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। জমিদার পরিবারে জন্ম। বি.এ. ও বি.এল. পাস করে প্রথমে রংপুরে ও পরে কলকাতার আলিপুর কোর্টে ওকালতি। তাঁর



রচিত দুইটি গান জমিরুদ্দিন খাঁ রেকর্ডিং করলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ। কালে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' ও 'মেগাফোন' গ্রামোফোন কোম্পানিতে সংগীত পরিচালক পদে নিযুক্তি লাভ। আইনব্যবসায় ত্যাগ করে চলচ্চিত্র ও নাট্যাভিনয়ে যোগদান। মার্কসের দৃষ্টি দিয়ে নাট্যরচনায় সার্থকতা লাভ। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় গ্রাম বাংলার দরিদ্র মানুষের অভাব-অনটন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও তাদের উপর ধর্মীয় ও সামাজিক নিপীড়নের আলেখ্য অবলম্বনে 'দুঃখীর ইমাম' (১৯৪৭) ও ছেঁড়াতার' (১৯৫০) নাটক রচনা করে ব্যাপক সুনাম অর্জন। 'মায়ের দাবি' (১৯৪১), 'পথিক' (১৯৫১), 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' (১৯৫৯) তাঁর অন্যান্য নাটক। উত্তর বাংলার কৃষক সমাজের বাস্তব জীবনচিত্র এ-সকল নাটকের উপজীব্য। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯৫৯।

তোফায়েল আহমদ (১৯২০-২০০২) শিক্ষাবিদ, লোকসংস্কৃতি গবেষক ও লোকশিল্প সংগ্রাহক। জন্ম. বড়ালিয়া গ্রাম, লক্ষ্মীপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২০। পিতা নুরুল হক স্কুল শিক্ষক। মাতা শাহেদাত বানু। ১৯৩৮-এ গ্রামের স্কুল থেকে

মেট্রিক পাস। ১৯৪০-এ কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং পরে একই কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ। ১৯৪৪-এ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ পাস করেন। ছাত্রজীবনে বেকার হোস্টেলের সাধারণ সম্পাদক এবং কারমাইকেল হোস্টেলের সহ-সভাপতি। ১৯৪৪-এ কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু হয়। কিছুদিন চাখার এ.কে.ফজলুল হক কলেজে অধ্যাপনা। ১৯৪৬-এ টাঙ্গাইল করটিয়া সাদত কলেজে যোগদান। ১৯৫০-এ উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন। ১৯৬৬-এ রাজশাহীতে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের আবাসিক পরিচালক হিসেবে যোগদান। ১৯৮০-এ তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তৎকালীন বাংলাদেশ পরিষদের প্রধান হিসেবে অবসর গ্রহণ। করটিয়ায় থাকাকালেই তাঁর লোকশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ শুরু হয়। ১৯৫০ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকা এবং মেলায় ঘুরে ঘুরে ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের লুপ্তপ্রায় নিদর্শন সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা। ১৯৭১-এ পাকসেনারা সেই সংগ্রহশালার নিদর্শনগুলো পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয়। স্বাধীনতার পর আবার নতুন উদ্যমে তিনি সংগ্রহ আরম্ভ করেন এবং ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন তাঁর শখের ও স্বপ্নের 'মিনি মিউজিয়াম'। ১৯৭৪-এ ঢাকার লালমাটিয়ায় তাঁর নিজের বাড়ি 'বাংলা ঘর'-এ ফিরে এসে সংগ্রহশালাটি নতুন করে সাজান এবং ক্রমাগত লোকঐতিহ্যের নিদর্শন সংগ্রহ অব্যাহত। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পরামর্শে সোনারগাঁও-এ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং জাদুঘর স্থাপন সংক্রান্ত মূল পরিকল্পনা প্রণয়ন। প্রথম নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলেও নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে যোগদান হয়নি। বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দুই মেয়াদে জাতীয় কারুশিল্প পরিষদের সভাপতি। ১৯৮৭-এ কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউট-এর রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ আয়োজিত 'ক্রাফটস অফ বাংলাদেশ' শিরোনামের প্রদর্শনীর প্রবেশপথে স্থান পায় তোফায়েল আহমদ সংগৃহীত কারুশিল্পের নিদর্শন 'বাঁশমালিদের বিয়ের ডালি'। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে এবং 'কারিকা'-র উদ্যোগে পরিচালিত 'ফোক ক্রাফট সার্ভে অ্যান্ড ডিজাইন ডক্যুমেন্টেশন' প্রকল্পে গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন। এ সময় ১৩৬টি থানার প্রায় দেড় হাজার গ্রাম পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে সেসব এলাকার লোক ও কারুশিল্প, শিল্পী, তাদের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ। উক্ত প্রকল্পের কাজের জন্য সংগৃহীত উপকরণের মূল কপি কার্ড ইনডেক্সসহ কারিকায় এবং অনুলিপি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ১৯৯৪-এ বিশ্ব কারুশিল্প পরিষদের আমন্ত্রণে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেন। ১৯৯৭-এ থাইল্যান্ড, ওমান ও সিঙ্গাপুর সফর। ১৯৯৯-এ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ভ্রমণ। যুক্তরাষ্ট্রের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনে আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ানদের পাউ আউ উৎসব ও ফোকলাইফ ফেস্টিভ্যাল পরিদর্শন। তাঁর সংগ্রহশালা 'বাংলা ঘর লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহ' একটি প্রযত্ন পরিষদের ওপর ন্যস্ত। তাঁর সংগ্রহশালা থেকে নির্বাচিত ১২৮টি নিদর্শন নিয়ে বাংলা একাডেমী থেকে ২০০৪-এ 'লোকশিল্প অ্যালবামঃ তোফায়েল আহমদের বাংলা ঘর থেকে নির্বাচিত সংগ্রহ' শিরোনামে অ্যালবাম প্রকাশ। ২০০৮-এ এটি এশিয়াটিক সোসাইটির নিকট হস্তান্তর। প্রকাশিত গ্রন্থ: লোকশিল্পের ভুবনে, Early Annals of The Golden Fibre (Booklet) ১৯৫৭, আমাদের প্রাচীন শিল্প (১৯৬৪), লোকশিল্প (১৯৮৫), আটিয়ার চাঁদ (১৯৯১, সম্পাদিত), যুগে যুগে বাংলাদেশ (১৯৯২), ঢাকার বাণিজ্যিক কারুকলা (১৯৯৩), লোকঐতিহ্যের দশ দিগন্ত (১৯৯৯) প্রভৃতি। পুরস্কারঃ বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ পুরস্কার (১৯৯৭), 'শীলু আবেদ কারুশিল্প পদক' (১৯৯৮), জাতীয় জাদুঘর সম্মাননা (২০০০), বাংলা একাডেমী সম্মানসূচক ফেলো (২০০১)। মৃত্যু. ঢাকা, ২৮ মার্চ ২০০২।

তোরাব আলী (১৮৯৮-১৯৭২)॥ জন্ম. পৈলানপুর, পাবনা শহর, ১৮৯৮। শিশুরঞ্জক লেখক। পাবনা জেলা থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক (১৯১৮) ও পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এফ.এ. (১৯২০) পাস। আলীগড় কলেজে দু'বছর বি.এ. ক্লাসে অধ্যয়ন (১৯২০-১৯২২)। কলকাতা সিটি কলেজ থেকে

পরীক্ষা দিয়ে বি.এ. পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯২৪)। ১৯২৬-এ এ.জি. বেঙ্গল অফিসে উচ্চমান সহকারী পদে চাকরি লাভ। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা। দেশভাগের (১৯৪৭) পর কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আগমন। এ.জি. পূর্ববঙ্গ দপ্তরে ভবিষ্যৎ-তহবিল শাখায় সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে যোগদান। ১৯৬৪-তে অবসর গ্রহণ। একজন বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক। মুসলিম ধর্মনেতাদের চরিত্র অবলম্বনে শিশুবোধ জীবনী রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন। ছোটদের মোস্তফা (১৯৩৬), ছোটদের আওরঙ্গজেব (১৯৩৮), গল্পে ওমর ফারুক (১৯৩৯) ও গল্পে আলী মরতাজা (১৯৪০) তাঁর জনপ্রিয় শিশুতোষ জীবনচরিত। মৃত্যু. পাবনা, ১ জুলাই ১৯৭২।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, মহারাজ (১৮৮৯-১৯৭০)॥



জন্ম. কাপাসাটিয়া, ময়মনসিংহ, ১৮৮৯। ১৯০৮-এ মেট্রিক পরীক্ষার আগে বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য গ্রেফতার হলে এখানেই প্রথাগত শিক্ষার সমাপ্তি। সে সময় ছয় মাস কারাভোগ। ১৯০৬-এ 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগদান। এবং ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান গঠন করে নিজ জেলায় বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরি। ১৯০৯-এ ঢাকায় আগমন এবং ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিশ খুঁজতে শুরু করলে আত্মগোপন করে আগরতলার উদয়পুর পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে ঘাঁটি তৈরি। ১৯১২-তে গ্রেফতার। এই সময়ে পুলিশ একটি হত্যা মামলায় জড়ালে প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯১৩-১৯১৪-তে মালদহ, রাজশাহী ও কুমিল্লায় ঘুরে গুপ্ত ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা। ১৯১৪-তে কলকাতায় গ্রেফতার এবং বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার আসামি করে আন্দামানে প্রেরণ। ১৯২৪-এ ছাড়া পেয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরামর্শে দক্ষিণ কলকাতা জাতীয় স্কুলের ভার গ্রহণ। ১৯২৭-এ গ্রেফতার হয়ে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে প্রেরিত। ১৯২৮-এ নোয়াখালির হাতিয়া দ্বীপে অন্তরীণাবদ্ধ। একই বছরে মুক্তি পেয়ে উত্তর ভারত গমন। চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখের সঙ্গে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মিতে যোগদান। বিপ্লবী দলের আদেশে ব্রাহ্মদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ব্রহ্মদেশে গমন। ১৯২৯-এ লাহোর কংগ্রেসে যোগদান। ১৯৩০-এ গ্রেফতার হয়ে ১৯৩৮-এ মুক্তিলাভ। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে রামগড় কংগ্রেসে যোগদান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টায় ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যর্থ হন। এ সময়ে চট্টগ্রামে গ্রেফতার হন। ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেফতার। ১৯৪৬-এ মুক্তি পেয়ে নোয়াখালিতে সংগঠন গড়ার চেষ্টা। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার পর ঢাকায় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৮-তে সামরিক শাসন জারি হলে সামরিক সরকার কর্তৃক তাঁর নির্বাচন অগ্রাহ্য। তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ, এমনকি সামাজিক কাজকর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ। ১৯৭০ পর্যন্ত স্বগ্রামে স্বেচ্ছা নির্বাসনে জীবনযাপন। তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ: 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' পুস্তকটি ১৯৬৮-তে প্রকাশিত। গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'আমি ১৯০৮ সন হইতে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত ৩০ বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছি, ৪/৫ বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়াছি। ... জেলখানার পেনাল কোডে যেসব শাস্তির কথা লেখা আছে এবং যেসব শাস্তির কথা লেখা নাই তাহার প্রায় সবগুলি সাজাই ভোগ করিয়াছি।' তাঁর অন্য আর একটি গ্রন্থ 'গীতায় স্বরাজ'। 'মহারাজ' নামে খ্যাত। মৃত্যু. ১৯৭০-এ চিকিৎসার জন্যে কলকাতা গমন। সে সময় সংবর্ধনার জন্যে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হলে ঐ একই বছরের ৯ আগস্ট তারিখে মৃত্যুবরণ।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)॥ জন্ম. রাহুতা গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, ১৮৪৭। কথাশিল্পী। চুঁচুড়ায় ডাফ সাহেবের স্কুল ও তেলিনীপাড়া স্কুলে শিক্ষা লাভ। বীরভূমের দ্বারকা, রানীগঞ্জের উখড়া এবং শাহজাদপুর স্কুলে শিক্ষকতা। ১৮৬৮-তে কটকে পুলিশ সাব-

ইন্সপেক্টর নিযুক্ত। এ সময় ওড়িয়া ভাষা শিখে 'উৎকল শুভকরী' নামক ওড়িয়া মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। ১৮৭০-এ উইলিয়াম হান্টার-কর্তৃক 'বেঙ্গল গেজিটিয়ার' সংকলন অফিসে করণিক নিযুক্ত। কিছুকাল কাজ করার পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রদেশের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রধান করণিক এবং কালক্রমে বিভাগীয় পরিচালকের একান্ত সচিব পদে অধিষ্ঠিত। ১৮৮১-তে ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগে যোগদান। ১৮৮৬-তে কলকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর পদে নিযুক্তি লাভ। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। রচিত গল্প-উপন্যাস: কঙ্কাবতী (১৮৯২), ভূত ও মানুষ (১৮৯৬), ফোকলা দিগম্বর (১৯০০), মুক্তামালা (১৯০১), ময়না কোথায় (১৯০৪), মজার গল্প (১৯০৫), পাপের পরিণাম (১৯০৮), ডমরু-রচিত (১৯২৩)। প্রবন্ধ: ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা (১৯০৩)। মৃত্যু. ৩ নভেম্বর ১৯১৯।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭)॥



জন্ম. উলাইল গ্রাম, ঢাকা, ১৮৭৭। শিশুসাহিত্যিক। স্কুলের পড়া শেষ করে একুশ বছর বয়সে পিতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদে গমন। সেখানে পাঁচ বছর বাস। এ সময়ে 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাবলি প্রকাশিত। পরে তৎকর্তৃক 'সুধা' নামক পত্রিকা প্রকাশ। পিতৃষ্বসার জমিদারি দেখাশুনা করার জন্য ময়মনসিংহে এসে দীর্ঘ দশ বছর ধরে গ্রাম ও বাংলার লুপ্তপ্রায় কথাসাহিত্য সংগ্রহ ও তার ওপর গবেষণা। দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শে এইসব সংগৃহীত উপাদানকে রূপকথা, রসকথা, ব্রতকথা ও গীতিকথা।এই চারটি ভাগে ভাগ করে প্রকাশ। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ও পরিষদ কর্তৃক 'পথ-এর সম্পাদক। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতির ও সভাপতি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ঠাকুর দাদার ঝুলি, ঠাকুর মা'র ঝুলি, দাদা মশায়ের থলে, ঠান দিদির থলে, খোকা বাবুর খেলা, আমাল বই, কিশোরদের মন, বাংলার সোনার ছেলে, পৃথিবীর রূপকথা, সবুজ লেখা। বাংলায় বিজ্ঞানের বহু পরিভাষা রচনা। রূপকথার লেখকরূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ। মৃত্যু. ১৯৫৭।

দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬)॥ জন্ম. আটি গ্রাম, কুষ্টিয়া, ১৮৫২। সাধক কবি। গৃহে গুরুমহাশয়ের নিকট বাংলা, আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষালাভ। নিজ পল্লীর নিভৃত কুঞ্জে সারাজীবন বাস। সনাতন রীতিনীতি ও বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল। আল্লাহ-রাসূল ও মক্কা-মদিনার প্রতি ভালবাসা, পত্নীর বিয়োগজনিত ব্যথা, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি কামনা দেশাত্মবোধ ও মানবপ্রীতি তাঁর কাব্যের ভাববস্তু। অধিকাংশ কাব্যই গীতিধর্মী। ভাষা সহজ-সরল ও প্রকাশভঙ্গি প্রাঞ্জল। প্রধান প্রধান কবিতাগ্রন্থ: ভাঙ্গাপ্রাণ (১৯০৫), আশেকে রসুল (১৯০৭) ও শান্তিকুঞ্জ (১৯১৭)। এক সময়ে আশেকে রসুল (১৯০৭) ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ঘরে ঘরে পঠিত হতো। মৃত্যু. আটি গ্রাম, ১৯৩৬।

দানেশ পণ্ডিত (১৮০৮-১৮৭০)॥ জন্ম. শুলক বহর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম, ১৮০৮। কবি। কবিরাজ চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি।কাব্য: জ্ঞান বসন্তের বাণী, তানবিউল গাফেলিন, হেদায়েতুল মোমেনিন, আকায়েদ নামা, বাহার দানেশ। মৃত্যু. ১৮৭০।

দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭)॥ জন্ম.



মাতুলালয়, কৃষ্ণনগর, ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩, (২ নভেম্বর ১২৫৯, ফাল্গুন বঙ্গাব্দ)। পৈতৃক নিবাস শান্তিপুর, নদীয়া। ঔপন্যাসিক। কৃষ্ণনগর থেকে মেট্রিক পাস করার পর বহরমপুর কলেজে অধ্যয়ন। বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ছাড়াও সংস্কৃতে দক্ষতা অর্জন। ১৮৮২-তে 'প্রবাহ' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা। ১৮৯৩-তে অনুসন্ধান সমিতির পাক্ষিক মুখপত্র 'অনুসন্ধান'-এর ৭ম খণ্ড সম্পাদনা। কিছুকাল 'জ্ঞানাঙ্কুর' এবং ইংরেজি দৈনিক 'নিউজ অফ দি ডে' সম্পাদনা। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের উপসংহার মৃন্ময়ী (১৮৭৪) রচনার মাধ্যমে উপন্যাস সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ। রচিত উপন্যাস: বিমলা (১৮৭২), দুই ভগ্নী (১৮৮১),

মা ও মেয়ে (১৮৮৪), শান্তি, যোগেশ্বরী (১৮৯৮), সোনার কমল (১৯০১), নবাব নন্দিনী (১৯০১), অন্নপূর্ণা (১৯০২), সপত্নী (১৯০৪), ললিতমোহন (১৯০৫) ইত্যাদি। তাঁর উপন্যাস অতি-নাটকীয়তায় ও রোমান্সের আতিশয্যে রঞ্জিত। ১৮৯৩-তে ১৫টি টীকা সমন্বিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'-র অনুবাদ। মৃত্যু. আগস্ট ১৯০৭ (৩১ শ্রাবণ ১৩১৪)।

দাশরথি রায়, দাশু রায় (১৮০৬-১৮৫৭)॥ জন্ম. বাঁধমুড়া গ্রাম, কাটোয়া মহকুমা, বর্ধমান, ১৮০৬। পাঁচালিকারক। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। মাতুলালয় পীলা গ্রামে বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত। কর্মজীবনে সাকাই গ্রামের নীলকুঠিতে কেরানির পদে দায়িত্ব পালন। স্বভাবজ কবি প্রতিভার গুণে পদ্যরচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। এক সময় অক্ষয় বাঈ বা অক্ষয় কাটানীর কবির দলের যোগদান। ১৮৩৬-এ তৎ কর্তৃক পাঁচালির আখড়া স্থাপন। নবদ্বীপের বিদ্বজ্জন-কর্তৃক শ্রেষ্ঠ পাঁচালিকাররূপে প্রশংসিত হন। বর্ধমানের মহারাজা, কলকাতার শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। দাশরথি রায়ের পাঁচালি কাব্যগুণমণ্ডিত। লোকশিক্ষা, সমাজচেতনা ও ধর্মবোধ জাগানোর আকর হিসেবে তাঁর পাঁচালী ঋদ্ধ। প্রায় ৬৮টি পালাগান রচনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দাশরথি রায়ের পূর্ণাঙ্গ রচনাবলি প্রকাশিত। মৃত্যু. ১৮৫৭।

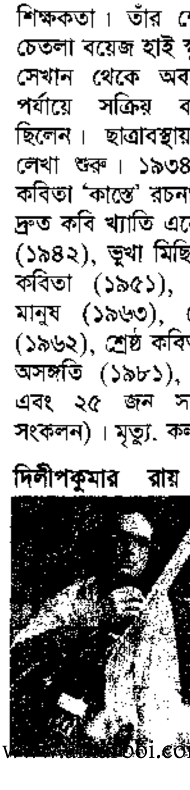
দিদারুল আলম (১৯০৩-১৯২৯)॥ জন্ম. ফতেপুর গ্রাম, চট্টগ্রাম, ১৯০৩। কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও সমাজসেবী। প্রথমে গ্রামের স্কুলে ও পরে



চট্টগ্রাম শহরে নিউ স্কিম মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ১৯২১-এ মাদ্রাসা ত্যাগ। এখানেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত। ১৯২৪-এ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শামসুল আলমের সঙ্গে রেঙ্গুন গমন। পূর্ববর্তী বৎসর চট্টগ্রাম শহর থেকে 'যুগের আলো' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ। রেঙ্গুন থেকে পত্রিকাটি মাসিক হিসেবে প্রকাশ। 'ফায়ার দেশ' নামে একটি উপন্যাস 'যুগের আলো'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। কলকাতার সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকায় কবিতা মুদ্রিত। বার্মার জীবন সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশালী হলেও সেখানে জীবন সুখে কাটে নি। অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও প্রগতিশীল চিন্তার জন্য রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর শত্রুতে পরিণত হন এবং মিথ্যা মামলা, গুণ্ডার আক্রমণ ও নানা প্রকার সামাজিক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবুও রেঙ্গুন ত্যাগের কথা ভাবেননি। কিন্তু ১৯২৮-এ দেশে ফিরতে বাধ্য হন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে। মৃত্যু. ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৯।

দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫)॥ জন্ম. আলিপুর, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৩। কবি, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ। স্কটিশ চার্চ কলেজে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে পেশা হিসেবে প্রথমে সাংবাদিকতাকে গ্রহণ। সাপ্তাহিক অগ্রগতি, অলকা, হিন্দুস্থান কোয়ার্টলি (সহকারী সম্পাদক), দৈনিক কৃষক (সাব-এডিটর), মাতৃভূমি (কার্যনির্বাহী সম্পাদক) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ১৯৪৭ পর্যন্ত কর্মরত। তার পরে বেছে নেন শিক্ষকতা। পরবর্তী তিরিশ বছর স্কুলে শিক্ষকতা। তাঁর শেষ কর্মস্থল ছিল কলকাতা চেতলা বয়েজ হাই স্কুল। ১৯৭৮-এর ১ অক্টোবর সেখান থেকে অবসর গ্রহণ। জীবনের এক পর্যায়ে সক্রিয় বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় কলেজে থাকতে কবিতা লেখা শুরু। ১৯৩৪-এ তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় কবিতা 'কাস্তে' রচনা। এই কবিতাই তাঁকে অতি দ্রুত কবি খ্যাতি এনে দেয়। কবিতাগ্রন্থ: কবিতা (১৯৪২), ভুখা মিছিল (১৯৪৪), দিনেশ দাসের কবিতা (১৯৫১), অহল্যা (১৯৫৪), কাঁচের মানুষ (১৯৬৩), শ্রেষ্ঠ কবিতা/প্রথম পর্যায়ে (১৯৬২), শ্রেষ্ঠ কবিতা/ দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৭০), অসঙ্গতি (১৯৮১), রাম গেছে বনে (১৯৮২) এবং ২৫ জন সাম্প্রতিক কবি (সম্পাদিত সংকলন)। মৃত্যু. কলকাতা, ১৩ মার্চ ১৯৮৫।

দিলীপকুমার রায় (১৮৯৬-১৯৮০)॥ জন্ম.



কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ২২ জানুয়ারি ১৮৯৬। সংগীতজ্ঞ। পিতা কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। বাল্যকালে মাতৃহীন হন। পিতার মৃত্যুর (১৯১৩) পর ধনী পিতামহের গৃহে বাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি

কলেজ থেকে অঙ্কে প্রথম শ্রেণিতে অনার্সসহ বি.এ. (১৯১৮) পাস। ইল্যান্ড গমন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কে ট্রাইপসের প্রথম ভাগ পাস। কিছুদিন আইন অধ্যয়ন। জার্মান ও ইতালির সংগীত শেখার জন্য বার্লিন গমন। ১৯২২-এ দেশে প্রত্যাবর্তন। আব্দুল করিম খাঁ, ফয়েজ খাঁ, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রমুখ ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম গ্রহণ। ভারতীয় মার্গ সংগীতে পারদর্শিতা লাভের জন্য সারা ভারত ভ্রমণ (১৯২২-১৯২৭)। ১৯২৭-এ সংগীত সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে ইউরোপ গমন। ১৯২৮-এ অরবিন্দ ঘোষের শিষ্যত্ব গ্রহণ। ১৯২৮-১৯৫০ পর্যন্ত অরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে বাস। সংগীতের ন্যায় যোগসাধনাও তাঁর জীবনের অঙ্গ হয়ে দাড়ায়। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, হিমাংশু দত্ত, নিশিকান্ত প্রমুখ গীতিকারের গান স্বকণ্ঠে গেয়ে খ্যাতি অর্জন। রবীন্দ্রসংগীতের সুরের অনড় রীতি ভেঙ্গে তাতে একটা বৈচিত্র্য আনার প্রয়াস চালান। সে অনুমতি মেলেনি বলে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া ছেড়ে দেন। তাঁর গানের রেকর্ড সংখ্যা প্রায় একশ'। ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে ইউরোপের বহু দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও মিশরে সংগীতের উপর বক্তৃতা প্রদান (১৯৫৩)। দেশে ফিরে বন্ধু জি.ভি. মেহতার আমন্ত্রণে পুনায় গিয়ে তাঁর গৃহে বাস করতে থাকেন। ক্রমে সে বাসগৃহটি তার চেষ্টায় 'শ্রীহরিকৃষ্ণ মন্দির'-এ পরিণত। সেখানে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন। আধুনিক সংগীতের সমালোচনার অন্যতম পথিকৃৎ। গীতসাগর, সাংগীতিকী, ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা, সুরবিহার, হাসির গানের স্বরলিপি, গীতিমঞ্জরী, দ্বিজেন্দ্রগীতি প্রভৃতি তাঁর সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: মনের পরশ, রঙের পরশ, তীর্থঙ্কর, আবার ভ্রাম্যমাণ, উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, দোলা, তরঙ্গ রোধিবে কে, বহুবল্লভ, পত্রাবলী, অনামী, আনন্দ ও জলাতঙ্ক, আমার বন্ধু সুভাষ, ছায়ার আলো, সাদা কালো, ভাগবতী কথা, আশ্চর্য, দুধারা, দ্বিচারিণী, ভূস্বর্গ চঞ্চল, মধুমুরলী, ভিখারিণী, রাজকন্যা, অঘটনের শোভাযাত্রা। সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রম্যাঁ রলাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ মনীষীর সান্নিধ্য লাভ। 'সংগীত রত্নাকর' উপাধিতে ভূষিত। সংগীত নাটক একাডেমির সদস্য পদ লাভ (১৯৬৫)। মৃত্যু. ৭ জানুয়ারি ১৯৮০।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩): জন্ম. চৌবেড়িয়া গ্রাম নদীয়া, ১৮৩০। প্রখ্যাত নাট্যকার। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ শেষ করার পর পিতা কালাচাঁদ মিত্রের তদবিরে স্থানীয় জমিদারের সেরেস্তায় মাসিক আট টাকা বেতনে চাকরি লাভ (১৮৪০)। লেখাপড়ার প্রতি তীব্র ঝোঁক ছিল। পাঁচ বছর চাকরি করার পর পিতার অমতে তা ত্যাগে করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বাড়ির থেকে পালিয়ে কলকাতায় আগমন। সেখানে পিতৃব্য নীলমণি মিত্রের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ। গৃহভৃত্যের কাজ করে জীবন ধারণ ও পড়াশুনার খরচ যোগাড়। প্রথমে লঙ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে, পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে অধ্যয়ন। ব্রাঞ্চ স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ। হিন্দু কলেজে ভর্তি (১৮৫০)। কলেজের সব পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ। কলেজের শেষ পরীক্ষা না দিয়ে ১৮৫৫-তে ১৫০ টাকা বেতনে পাটনায় পোস্ট-মাস্টার পদে চাকরি লাভ। দেড় বছরের মধ্যে পোস্টাল ইনসপেক্টর পদে উন্নীত। নদীয়া ও ঢাকা বিভাগে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন। ১৮৬৯-১৮৭১ পর্যন্ত কলকাতায় পোস্ট-মাস্টার জেনারেলের সহকারী। ১৮৭১-এ লুসাই যুদ্ধের সংবাদ ডাকযোগে পাঠাবার বন্দোবস্ত করার জন্য কাছাড় গমন। সে সময়ে ডাক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল হগের অপ্রীতিভাজন হওয়ায় পোস্টমাস্টার জেনারেলের সহকারীর পদ থেকে অপসারিত। ১৮৭২-এ ইস্ট-ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ইন্সপেক্টর পদে যোগদান। সাহিত্য জীবনের শুরু কবিতা দিয়ে। ঈশ্বর গুপ্তের সংস্পর্শে এসে তাঁরই অনুপ্রেরণায় কবিতা লিখে 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (১৮৪৭) পত্রিকায় প্রকাশ। তাঁর 'সুরধুনী কাব্য' (১ম ভাগ-১৮৭১ ও ২য় ভাগ-১৮৭৬) ও 'দ্বাদশ কবিতা' (১৮৭২) সেকালে জনপ্রিয়তা অর্জন। নাট্যকাররূপেই দীনবন্ধু মিত্র সমধিক খ্যাত। কর্মজীবনে সরকারি কাজে গ্রাম-গঞ্জে ঘোরার ফলে বহু লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। মানবচরিত্র ও বাংলার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে লাভ করেন ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। মানুষ হিসেবে ছিলেন সংবেদনশীল মনের অধিকারী। অন্যের দুঃখে সহজে ব্যথিত হতেন।



তাঁর নাটকে এ সবের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। নীলকর সাহেবদের বীভৎস অত্যাচারে লাঞ্ছিত নীল চাষিদের দুরবস্থা অবলম্বনে রচনা করেন 'নীল দর্পণ' (১৮৬০) নাটক। এটি প্রকাশিত হওয়ার পর পরই নীলকরদের বিরুদ্ধে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এর ইংরেজি অনুবাদ করেন, সেই অনুবাদ লঙ সাহেব প্রকাশ করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এ নাটকের অভিনয় দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতো ছুড়ে মারেন/আর সে জুতোই অভিনেতা পুরস্কার হিসেবে মাথায় তুলে নেন। প্রহসন রচনায়ও দক্ষতার পরিচয় প্রদান। কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকদের মদ্যপান ও বারবনিতাসঙ্গকে ব্যঙ্গ করে 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) ও সমাজের প্রাচীনপন্থিদের বহুবিবাহ লিপ্সাকে ব্যঙ্গ করে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) প্রহসন রচনা। 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'জামাই বারিক' (১৮৭২), 'কমলে কামিনী' ১৮৭৩) তাঁর অন্যান্য নাটক। মৃত্যু. ১ নভেম্বর ১৮৭৩।

দীনেশচন্দ্র গুপ্ত (১৯১১-১৯৩১)॥ জন্ম. যশোলং গ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর ১৯১১। বিপ্লবী ও শহীদ। নসু নামেও পরিচিত। স্কুলে পাঠকালে ঢাকা জেলায় বিপ্লবী সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হলে মেদিনীপুর পর্যন্ত প্রসার লাভ। এই সংগঠনের মেদিনীপুরের তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিধনে সাফল্য অর্জন। ১৯৩০-এর ৮ ডিসেম্বর বিপ্লবী বিনয় বসুর নেতৃত্বে দীনেশ ও বাদল কর্তৃক কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ এবং কারা বিভাগের তৎকালীন ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যা। পরে অফিস কক্ষে হামলা চালিয়ে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইউরোপিয়ান কর্মচারীকে গুরুতরভাবে জখম। এরপর গ্রেফতার এড়ানো উদ্দেশ্যে এই তিনজন বিপ্লবী কর্তৃক প্রথমে পটাশিয়াম সায়েনাইড নামের বিষ খেয়ে ও পরে মাথায় গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা। বাদল ঘটনাস্থলে মারা যান, বিনয় ও দীনেশকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যায় হয়।



হাসপাতালে বিনয় বসু মারা যান। বিচারে দীনেশের ফাঁসি হয়। কারাগারে ফাঁসির প্রতীক্ষায় থাকাকালীন কয়েকটি পত্র রচনা। বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের ঘটনা সম্বলিত এই পত্রগুলো সাহিত্যিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ বলে সুধী মহলে স্বীকৃত। কলকাতার লালদীঘি বিনয়-বাদল-দীনেশের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। মৃত্যু. আলিপুর জেলা, ৭ জুলাই ১৯৩১।

দীনেশচন্দ্র মজুমদার (১৯০৭-১৯৩৪)॥ জন্ম. বসিরহাট, চব্বিশ পরগনা, ১৯০৭। বিপ্লবী ও শহীদ। ১৯২৪-এ প্রবেশিকা, ১৯২৬-এ আই.এ. ও ১৯২৮-এ বি.এ. পাস করে আইন অধ্যয়ন। কলেজে পড়ার সময়ে যোগাভ্যাস ও ব্যায়াম শিক্ষা। ১৯২৬-এ খুলনার সেনহাটির রসিকলাল দাসের নিকট দীক্ষা নিয়ে যুগান্তর বিপ্লবী দলের সদস্য পদ গ্রহণ। ১৯২৮-১৯২৯ পর্যন্ত বিপ্লবী দলের প্রসার ও উন্নতিসাধনে কর্ম সম্পাদন। এ সময়ে দলনেতার নির্দেশে বগুড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রসার ঘটান। এ ছাড়া ছাত্র সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য প্রদান এবং সঙ্ঘের মেম্বারদের লাঠি খেলা শিক্ষাদান। ১৯৩০-এর ২৫ আগস্ট সেনহাটির অনুজা সেন ও অতুল সেনকে সঙ্গে নিয়ে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার চার্লস টের্গার্টকে আক্রমণ। বোমার আঘাতে অনুজা সেনের মৃত্যুবরণ, অতুল সেনের পলায়ন এবং নিজে বন্দী হন। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ১৯৩২-এ অপর দু'জন বিপ্লবীসহ মেদিনীপুর জেল থেকে পলায়ন। এই বছর তাঁর নেতৃত্বে দু'বার ওয়াটসনকে হত্যার চেষ্টা পরিচালনা। এ সময়ে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার কুইনের নেতৃত্বে পুলিশ বিপ্লবীদের ধরার চেষ্টা করলে তাঁর গুলিতে কুইন নিহত। বিপ্লবী কর্মের প্রয়োজনে গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্ক থেকে কৌশলে অর্থ সরিয়ে সে অর্থ দ্বারা অস্ত্র কেনার চেষ্টা। ১৯৩৩-এর ২২ মে পুলিশ সংবাদ পেয়ে কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে তাঁর গোপন বাসস্থান আক্রমণ করলে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের গুলি বিনিময়। পরিশেষে অপর দুই সঙ্গী জগদানন্দ ও নলিনীসহ গ্রেফতার। বিচারে প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদান। মৃত্যু. ৯ জুন ১৯৩৪।



দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)॥ জন্ম, মাতুলালয়, বগজুড়ী গ্রাম, ঢাকা, ৩ নভেম্বর, ১৮৬৬। শিক্ষক ও গবেষক, পৈতৃক নিবাস-সুয়াপুর গ্রাম, ঢাকা। পিতা মানিকগঞ্জ আদালতের উকিল। ঈশ্বরচন্দ্র সেন। সুয়াপুর গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করে ১৮৭৩-এ মানিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে ভর্তি। বারো বছর বয়সে কুমিল্লা কালেক্টরির হেড ক্লার্ক উমানাথ সেনের কন্যা বিনোদিনীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ (১৮৭৮)। মানিকগঞ্জ থেকে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কুমিল্লা গভর্নমেন্ট স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি (১৮৭৯)। পরের বছর এ স্কুল ত্যাগ করে ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি। এর কিছুকাল পর পিতা রোগাক্রান্ত হলে আর্থিক সঙ্কটে পড়ে; বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়ে কলেজিয়েট স্কুল ত্যাগ করে ঢাকার জগন্নাথ স্কুলে ভর্তি। এ স্কুল থেকে তৃতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাস (১৮৮২)। ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি। এ কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে এফ.এ. পাস (১৮৮৫)। ঢাকা কলেজে বি.এ. ক্লাসে অধ্যয়নকালে পিতা ও মাতার মৃত্যু ঘটলে কলেজের পাঠ ত্যাগ করে কর্মজীবনে প্রবেশ (১৮৮৭)। হবিগঞ্জ (সিলেট) স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্তি লাভ। এ স্কুলে শিক্ষকতা করা কালে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ইংরেজিতে অনার্সসহ দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ. পাস (১৮৮৯)। এরপর কুমিল্লা শম্ভুনাথ ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান। কিছুকাল পরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত (১৮৯০)। এ সময়ে পল্লী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহ। এ-সকল পুঁথি থেকে উপকরণ গ্রহণ করে রচনা করেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সুশৃঙ্খল ও তথ্যসমৃদ্ধ ধারাবাহিক ইতিহাসমূলক গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬)। এ অসাধারণ গ্রন্থ রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে অভিনন্দন-পত্র লাভ। পুঁথি সংগ্রহ, তা পাঠ ও বিশ্লেষণ, গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি কাজে অস্বাভাবিক পরিশ্রমের দরুন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য কুমিল্লা ত্যাগ করে কলকাতায় গমন (১৮৯৭)। প্রায় আড়াই বছর রোগ ভোগের পর আরোগ্য লাভ। ১৯০৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষার বাংলা বিষয়ের পরীক্ষক ও ১৯০৯-এ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার নিযুক্ত। ১৯১০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য মনোনীত। ১৯১১-তে তাঁর 'History of Bengali Language and Literature' শীর্ষক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে পাশ্চাত্যের বহু মনীষীর কাছে থেকে ভূয়সী প্রশংসা লাভ। 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' (১৯১৪) তাঁর আর একখানি উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ। ১৯১৩-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশীপ' লাভ। এর আওতায় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' (১৯২৩) ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (১৯২৬) সম্পাদনা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন। ১৯২০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হলে সে বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৩২-এ সে-পদ থেকে অবসর গ্রহণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি-লিট' (১৯২১) ডিগ্রি ও 'জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক' (১৯৩১) ও ভারত সরকার কর্তৃক 'রায়বাহাদুর' (১৯২১) উপাধিতে ভূষিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন। তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ইতিহাস গ্রন্থ। আবেগময়, প্রাঞ্জল ও কাব্যমণ্ডিত ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ও 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সম্পাদনা তাঁর বঙ্গ-সংস্কৃতি সেবার আর এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এদেশে উদার ও অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির ভিত্তি রচনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি স্মরণীয় বাঙালিদের অন্যতম। মৃত্যু. বেহালার 'রূপেশ্বর' ভবন, ২০ নভেম্বর, ১৯৩৯।





দীপক চৌধুরী (১৯১৫-১৯৭৩)॥ জন্ম. কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ১৯১৫। প্রকৃত নাম নীহাররঞ্জন ঘোষাল। কথাশিল্পী। কৃষ্ণনগর শহরে স্কুলের শিক্ষা গ্রহণ। পরে ঢাকায় এসে কলেজে ভর্তি। কলেজে পড়ার সময় সাহিত্য-চর্চা শুরু। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পরে

পশ্চিমবঙ্গে গমন : 'পাতালে এক ঋতু' উপন্যাস রচনার মাধ্যমে পাঠক মহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ . সজনীকান্ত দাস কর্তৃক তাঁর 'শনিবারের চিঠি'তে এই উপন্যাসটি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ । লেখাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ । ১৯৫৬-তে অসুস্থ হয়ে কলকাতা থেকে দার্জিলিং গমন । প্রায় চল্লিশখানা গ্রন্থ রচনা : উপন্যাসঃ বোরখা, পাতালে এক ঋতু (১ম খণ্ড ১৯৫৩, ২য় খণ্ড ১৯৫৫), শঙ্খবিষ (১৯৫৪), ঝড় এলো (১৯৫৬), এই গ্রহের ক্রন্দন (১৯৫৭), কেষ্ট নগরের পুতুল (১৯৫৭), রোয়াক (১৯৫৮), দাগ (১৯৫৯), ক্রোশে ক্রোশে সূর্য (১৯৫৯), ফরিয়াদ (১৯৫৯), নীল সোনার বসতি (১৯৫৯), কুমারী কন্যা (১৯৫৯), মনের মধ্যে মন (১৯৬০), পতঙ্গ মন (১৯৬২), রোটে পিণ্ড (১৯৬৪), খড়ি মাটির স্বর্গ (১৯৬৭), মধুঋতু (১৯৬৭), ঘেরাও (১৯৬৯) ইত্যাদি । কবিতাগ্রন্থঃ লাইটপোস্ট (১৯৫৪) । অনুবাদঃ উন্মত্ত (১৯৬৪), উত্তরণ (১৯৬৫) ইত্যাদি । গল্পগ্রন্থঃ গল্প সংগ্রহ (১৯৬০) । মৃত্যু. ২২ জুন ১৯৭৩ ।

দুদু মিয়া/মুহম্মদ মহসীন (১৮১৯-১৮৬০)॥ জন্ম. বাহাদুরপুর গ্রাম, শিবচর থানা, মাদারীপুর, ১৮১৯ । পিতা ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবর্তক হাজী শরিয়তুল্লাহ । দুদু মিয়ার আসল নাম মুহম্মদ মহসীন । শৈশবে পিতার কাছে শিক্ষা লাভ । পিতার আগ্রহে মাত্র বারো বছর বয়সে হজব্রত পালন । আরব দেশে পাঁচ বছর লেখাপড়ার পর দেশে প্রত্যাবর্তন । পিতার কাছে আরো উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এবং আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন । ফরায়েজী মতবাদের প্রচার ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ । ১৮৪০-এ হাজী শরিয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজী সম্প্রদায়ের নেতা নির্বাচিত । ওয়াহাবী আদর্শে বিশ্বাসী দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরিদপুর জেলায় ফরায়েজী আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ । তাঁর সাংগঠনিক ব্যবস্থার ফলে ফরায়েজী আন্দোলন ধর্মীয় অবস্থান থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে উন্নীত । তাঁর নেতৃত্বে এ দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের স্বীয় অধিকারের দাবিতে জাগরণ । হিন্দু জমিদার ও নীলকর সাহেবরা মুসলমান প্রজাদের উপর জুলুম চালায় । হিন্দু জমিদারগণ কর্তৃক তাঁদের বিভিন্ন পুজা-পার্বণের জন্যে মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে বে-আইনি কর আদায় । এসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে হিন্দু জমিদারগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে দুদু মিয়ার আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু । ১৮৪১-এ কানাইপুরের জমিদারের সঙ্গে এবং ১৮৪২-এ ফরিদপুরের জমিদারের সঙ্গে ফরায়েজীদের সংঘর্ষ হয় । কানাইপুরের জমিদার ভীত হয়ে ফরায়েজীদের সঙ্গে এই মর্মে আপস করেন যে, তিনি ফরায়েজীদের উপর অত্যাচার এবং বে-আইনি কর আদায় করবেন না । ফরিদপুরের জমিদার মদন ঘোষ ফরায়েজীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত । এই ঘটনার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক ১১৭ জন । ফরায়েজীকে গ্রেফতার তন্মধ্যে ২২ জনের ৭ বছর মেয়াদে জেল হয়, অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাওয়াতে দুদু মিয়ার মুক্তিলাভ । এ-সকল ঘটনার পর অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকদের মধ্যে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি পায় । ১৮৪৬-এ দুদু মিয়ার অনুচর কাদির বক্সের নেতৃত্বে ফরিদপুর জেলার পাঁচচরে ডানলপের নীলকুঠি আক্রমণ ও অগ্নি সংযোগ । আগেই খবর পেয়ে ডানলপের পলায়ন ও আত্মরক্ষা । দুদু মিয়ার প্রতাপে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে । ১৮৫৭-তে সিপাহি বিদ্রোহের কালে গ্রেফতার । আলীপুর জেলে বহুদিন নজরবন্দী অবস্থায় কাটান । আলীপুর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৮৫৯-এর শেষের দিকে ঢাকা আগমন । এখানেই বসবাস । দুদু মিয়া ছিলেন একজন সুদক্ষ সংগঠক । তাঁর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার ফলেই ফরায়েজী আন্দোলন পূর্ববাংলার সব জেলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে । জনসাধারণের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অসাধারণ । কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা এ সম্পর্কে একবার লেখেন যে, দুদু মিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার লোক জমায়েত করতে সক্ষম ছিলেন । তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আলেম ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন । মৃত্যু. ঢাকা. ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬০ ।

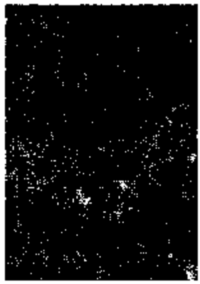
দুদ্দু শাহ্ (১৮৪১-১৯১১)॥ জন্ম. বেলতলা, হরিণাকুণ্ডু, যশোর, ১৮৪১ । মরমি কবি । হরিশপুর গ্রামের শ্রীনাথ পাঠশালায় শিক্ষাজীবন শুরু । মেধাবী ছাত্ররূপে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা এবং কোরান মুখস্থ করেন । তিরিশ বছর বয়সে কুষ্টিয়া গমন এবং লালন শাহ্-র শিষ্যত্ব গ্রহণ । তাঁর সংস্পর্শে এসে সংগীত রচনায় মনোযোগ দান । লালনের প্রিয় শিষ্য দুদ্দু শাহ্-র সঙ্গে পাঞ্জুশাহ্-র অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল . তাঁর গানগুলোতে সুফিতত্ত্বের মর্মবাণী ধ্বনিত হয়েছে

দুদ্দু শাহ্ তাঁর গানে বহু পরিভাষা ব্যবহার করেছেন : যেমনাদিল-কাবা, দিল-মক্কা, দিল-কেতাব। মৃত্যু. ১৯১।

দুর্গামোহন দাশ (১৮৪১-১৮৯৭)॥ জন্ম. তেলিরবাগ, মুন্সীগঞ্জ, ১৮৪১। সমাজসেবক। বরিশাল আদালতের খ্যাতনামা উকিল কাশীশ্বর দাশ তাঁর পিতা। শৈশবে মাতৃহীন হন। কলকাতায় কালীঘাটে বাল্যশিক্ষা গ্রহণ। বরিশাল ইংরেজি স্কুলে ভর্তি॥ এ স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ। সেখান থেকে ল' পাস করে বরিশাল আদালতে ওকালতি পেশায় যোগদান। ১৮৭০-এ কলকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ। উত্তরকালে হাইকোর্টের একজন শীর্ষস্থানীয় উকিল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত। পাঠ্যাবস্থাতেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে। পেশাগত জীবনের শুরুতে তাতে দীক্ষিত হন। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৭৮) প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর প্রচেষ্টা ও অর্থানুকূল্যে বরিশালে ব্রাহ্মমন্দির স্থাপিত। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তাঁর প্রচেষ্টায় বরিশালে দুটি কায়স্থ বাল-বিধবার পুর্নবিবাহ অনুষ্ঠিত। পূর্ববঙ্গে বিধবা-বিবাহ এই প্রথম। উত্তরকালে বহু অর্থ ব্যয়ে আরো অনেক বিধবার বিবাহ দেন। এজন্য হিন্দু সমাজের কাছ থেকে বহু গ্লানি ভোগ। পিতার মৃত্যুর পর দুর্গামোহন তাঁর অল্পবয়স্কা বিধবা বিমাতাকে পুর্নবিবাহ দেন। নিজের স্ত্রী মারা গেলে অতুলপ্রসাদ সেনের বিধবা মাতাকে বিবাহ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্যতীত বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য তাঁর মতো আর কেউ এত অর্থ ব্যয় করেন নি। বাল-বিধবা ও কুলীন কন্যাদের শিক্ষাদানের জন্য কলকাতায় 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' (১৮৭৩) ও 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' (১৮৭৬) প্রতিষ্ঠা। বর্ষার সময়ে সর্বসাধারণের শবদাহের অসুবিধা দূর করার জন্য নিজ গ্রাম তেলিরবাগে পাকা শ্মশান নির্মাণ। কলকাতা পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত (১৮৭৬)। তাঁর পুত্রদের মধ্যে এস. আর. দাশ ও বিচারপতি জ্যোতিষরঞ্জন দাশের নাম উল্লেখযোগ্য খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও দার্শনিক পণ্ডিত প্রসন্নকুমার রায় তাঁর জামাতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। উদার, মহৎ, সংস্কারপন্থি ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে খ্যাত। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে ও দেশে নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান স্মরণীয়। মৃত্যু. কলকাতা, ১৮৯৭।



দুর্বিন শাহ (১৯২০-১৯৭৭)॥ জন্ম. নোয়ারাই গ্রাম, ছাতক, সুনামগঞ্জ, ১৯২০। লোকসংগীত সাধক। পিতা সফাত আলী, মাতা হাসিনা বানু। প্রকাশিত গ্রন্থ: পাক বঙ্গ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ গীতি (১৯৭০) ও ৬ খণ্ডে প্রেমসাগর পল্লীগীতি এবং দুর্বিন শাহ রচনাসমগ্র (সুমনকুমার দাশ সম্পাদিত, ২০১০)। মৃত্যু. ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭।



দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা (১৯১৯-১৯৯০)॥ জন্ম. স্নানঘাট গ্রাম, হবিগঞ্জ, ১৯ জুলাই ১৯১৯। কবি। জমিদার পরিবারে জন্ম। হবিগঞ্জ, সরকারি স্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত। অধ্যয়নের পর কলকাতা Govt. School of Fine Arts এ ভর্তি। কিছুদিন পর আর্ট স্কুলের পাঠ ত্যাগ করলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। সাহিত্যচর্চা ও সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ। সাহিত্যিক জীবনে হবিগঞ্জ শহরে বসবাস। কবি হিসেবে খ্যাত। প্রেম, গণমুখী চিন্তা-চেতনা ও মানবকল্যাণবোধ তাঁর কবিতার ভাববস্তু। গল্পকার হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। বাংলার লোকজ ঐতিহ্য তাঁর ছোট গল্পে সার্থকভাবে উপস্থাপিত। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: কবিতা॥ 'অঞ্জলি' (১৯৪৩), 'বৈরী নিসর্গে যদি' (১৯৭৪), 'তিন সত্যিতে কথা দিলাম' (১৯৮২), 'দুর্লভ স্বপ্নের পদাবলী' (১৯৮৪); গল্প॥ 'গেঁগেরামের গল্পের আসর' (১৯৮৯), 'অনামী অহংকার' (১৯৮৯)। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ



হিসেবেও পরিচিত। 'লিপিতত্ত্বের নতুন আলোকে ব্রাহ্মী অথবা ব্রাহ্মীলিপি ও সম্রাট প্রিয়দর্শী' (১৯৮৭) তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ। জাতীয় ঐতিহ্য পুরস্কার লাভ (১৯৯০)। মৃত্যু. পশ্চিম জার্মান, ক্যান্সারে, ১৩ জুন ১৯৯০।

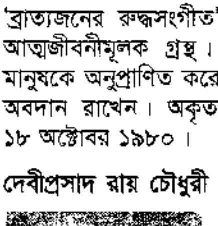
দেওয়ান নাসিরুদ্দিন আহমদ (১৮৯০-১৯৩৭)॥ জন্ম. শিকারপুর গ্রাম, রাজশাহী, ১৮৯০। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সমাজসেবী। ঢাকা মাদ্রাসায় জমাতে-উল পর্যন্ত অধ্যয়ন। আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষায় দক্ষতা অর্জন। কলকাতার 'সুলতান' পত্রিকার প্রথমে ম্যানেজার, পরে সম্পাদক। ইসলাম আলম, নবনুর পত্রিকা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য প্রদান। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। বহু মাদ্রাসা, হাইস্কুল ও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলা কো-অপারেটিভ সোসাইটি সমূহের অবৈতনিক সংগঠক। আসানসোলের 'রত্নাকর' পত্রের পরিচালনায় ভূমিকা পালন। তিনি ছিলেন ইসলাম প্রচারক। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: পুষ্পহার, হাসির তরঙ্গ, পতিভক্তি (৭ম সং ১৯৩১), সমাজ সংস্কার, রমজান সাহিত্য (১৯০৯), পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও ইমাম মেহেদী, ইসলামি নাম ও আকীকা। মৃত্যু. ৩০ মার্চ ১৯৩৭।

দেওয়ান ফজলে রব্বী (১৮৪৮-১৯১৭)॥ জন্ম. সালার গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, ১৩ আগস্ট ১৮৪৮। রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক। প্রাথমিক শিক্ষা স্বগ্রামেই সম্পন্ন। এরপর মুর্শিদাবাদ শহরে বিভিন্ন ওস্তাদের নিকট বিভিন্ন ভাষা অধ্যয়ন। ১৮ বছর বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত। আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন। শিক্ষা সমাপনের পর পরই মুর্শিদাবাদের নওয়াব নাজেমের অনুরোধে নেজামত সরকারের চাকরি গ্রহণ। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার তৎকালীন নওয়াব নাজেমের আহবানে ১৮৬৯-এ ইংল্যান্ড গমন। ১৮৭৪-এর মার্চে নেজামতের বিশেষ কার্যে ইংল্যান্ড থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন। নবাব নাজেমের জ্যেষ্ঠপুত্র ভাবী নবাব পিতার অনুমতিক্রমে তাঁকে 'আমীনে মহালাতে'র পদে নিযুক্ত। কিছুদিন পর 'নায়েবে দেওয়ানে'র পদে এবং আরো কিছুদিন পর নেজামত সরকারের দেওয়ানের পদে উন্নীত। অল্প বয়সেই ফারসি ভাষার লেখক হিসেবে খ্যাতি লাভ। রচিত কয়েকটি বই: কেতাব তস্দীকনু নেহাদ, কেতাব হাকীকতে মোসলমানানে বাঙ্গালা, তারিখে হিন্দুস্থান। ১৯১৭।

দেবব্রত বিশ্বাস (১৯১১-১৯৮০)॥ জন্ম. মাতুলালয়, বরিশাল শহর, ১৯১১। রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী। পৈতৃক নিবাস কিশোরগঞ্জ। পিতার নাম দেবেন্দ্রকিশোর বিশ্বাস, মাতা অবলা দেবী। এক ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম। শৈশব ও বাল্যকাল কাটান কিশোরগঞ্জ শহরে, বাকি জীবন কলকাতায়। কিশোরগঞ্জ হাইস্কুল থেকে মেট্রিক (১৯২৭) ও কলকাতা সিটি কলেজ থেকে আই.এ. (১৯২৯) পাস। কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৩১) ও একই কলেজ থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. (১৯৩৩) ডিগ্রি লাভ। ১৯৩৫-এ হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে চাকরি গ্রহণ। ১৯৫৬-তে ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো জাতীয়করণ করা হলে লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কেরানির পদ লাভ। ১৯৭৭-এ এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ। প্রথাগতভাবে কোনো গুরুর কাছে গান শেখেন নি। বাল্যকালে মা ও বাবার মুখে ব্রহ্মসংগীত শুনে শুনে গান শেখেন। কলেজে পাঠকালে কলকাতায় ব্রাহ্মবিবাহ ও ব্রাহ্মশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সমবেতকণ্ঠে ব্রহ্মসংগীত গাইতেন। যে সব ব্রহ্মসংগীত গাইতেন তার অধিকাংশই ছিল রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতের সুরের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কবির অন্যান্য শাখার গান শেখার প্রতি আগ্রহ জন্মে। স্বরলিপি দেখে দেখে নিজেই রবীন্দ্রনাথের প্রেম, প্রকৃতি, দেশাত্মবোধক ও অন্যান্য পর্যায়ের গান গাওয়া শেখেন। কালক্রমে রবীন্দ্রসংগীতের একজন অনন্যসাধারণ কণ্ঠশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সংগীতানুরাগীদের মধ্যে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতকে 'একঘেয়ে প্যানপ্যানানি প্রাণহীন গান' বলে মনে করতেন তাঁদের সে ধারণা নিরসন করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। উদাত্ত ও জোরালো কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে রবীন্দ্রসংগীতের ভাব নির্জীব নয়, তা সজীব, গতিশীল ও শক্তিময়। শান্তিনিকেতনের বাইরের পরিমণ্ডলে



একমাত্র রবীন্দ্রসংগীতের প্রবক্তা। পঙ্কজকুমার মল্লিকের পর রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে নিবেদিত কণ্ঠ। পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রেশনে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে বিতর্কিত রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী হিসেবে আবির্ভূত হন। রক্ষণশীল রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীবৃন্দ কর্তৃক সত্তরের দশকে একঘরে হন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠক গণনাট্য সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট নেতা। লেখক হিসেবেও পরিচিত। চীন ভ্রমণের (১৯৫৩) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে রচনা করেন 'অন্তরঙ্গ চীন' (১৯৭৮) নামক গ্রন্থ। 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত' (১৯৭৮) তাঁর একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। ১৯৭১-এ গান গেয়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। অকৃতদার। মৃত্যু. কলকাতা, ১৮ অক্টোবর ১৯৮০।



দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী (১৮৯৯-১৯৭৫)॥ জন্ম. রংপুর, ১৮৯৯। ভাস্কর্য শিল্পী। রংপুরেই শৈশব জীবন অতিবাহিত। প্রধানত আর্টে শিক্ষা লাভ। শিক্ষা শেষে মাদ্রাজ আর্ট কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান, পরে কলেজের অধ্যক্ষরূপে দীর্ঘ আটাশ বছর দায়িত্ব পালন। এরপর সেখানকার ললিতকলা একাডেমিতে সাত বছর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ। ভাস্কর্য-শিল্পী হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি লাভ। এ ছাড়া ছবি অঙ্কনেও দক্ষতা প্রদর্শন। এক সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জের পত্নী রানি মেরী-কর্তৃক তাঁর আঁকা 'সুমাত্রা দ্বীপের পাখি' নামক একখানি ছবি প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয়। ১৯৫৫-তে টোকিওতে অনুষ্ঠিত শিল্পবিষয়ক এক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম: বল্লভপুরের মাঠ, পোড়াবাড়ি, রিকসাওয়ালা প্রভৃতি গ্রন্থ। তাঁর শিল্পকর্মের কয়েকটি নিদর্শন: পাটনার 'শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ', মাদ্রাজের 'ড্রায়ামপ অফ লেবার', কলকাতার চৌরঙ্গীর মোড়ে অবস্থিত 'গান্ধীমূর্তি' ইত্যাদি। ১৯৫৮-তে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট. উপাধিতে সম্মানিত। মৃত্যু. ১৪ অক্টোবর ১৯৭৫



দেবু ভট্টাচার্য (১৯৩০-১৯৯৪)॥ জন্ম. পিতার কর্মক্ষেত্র মুরাদনগর, ১ আগস্ট ১৯৩০। সংগীতশিল্পী। পৈতৃক নিবাস খুলনা। পুলিশ অফিসার কেশবলাল ভট্টাচার্য তাঁর পিতা। প্রকৃত নাম দেবদাস ভট্টাচার্য। দেবু ভট্টাচার্য নামে পরিচিত। খুলনা জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৪৬) পাস করে কলকাতা স্কুল অব আর্ট-এ ভর্তি। এ ইনস্টিটিউশন থেকে ডিগ্রি কোর্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বাল্যকালে মা'র কাছে সংগীত শিক্ষার হাতেখড়ি। উত্তরকালে একজন বিশিষ্ট সুরকার ও সংগীত পরিচালক হিসেবে আবির্ভূত। আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ করে সংগীত পরিচালক তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রায় বংশীবাদক হিসেবে যোগদান। 'ফানকার' ছবির সংগীত পরিচালনার অফার পেয়ে তিমিরবরণের বোম্বে থেকে করাচি গমন (১৯৫৪)। সঙ্গে যান তাঁর সহকারী হিসেবে দেবু ভট্টাচার্য ও ঘনশ্যাম। ছবির কাজ শেষ করে তিমিরবরণ ও ঘনশ্যাম ভারতে ফিরে যান। তৎকালীন পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে দেবু ভট্টাচার্য করাচিতে থেকে যান। করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডির চিত্রপুরী সংগীত পরিচালক হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। দেড় শতাধিক ছবির সংগীত পরিচালনা। 'বেটি', 'বদনাম' ও 'বানজারান' ছায়াচিত্রের সংগীত পরিচালনায় সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন। বেতার ও টিভিতে নিজের সুরাশ্রিত বহু গান পরিবেশন। ১৯৭৪-এ করাচি ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন এবং স্থায়ীভাবে বাস। চিরকুমার দেবু ভট্টাচার্য আধুনিক বাংলা গানেরও একজন দক্ষ সুরকার। 'বধূ বিদায়' ছবিতে সংগীত পরিচালনা। 'একটুখানি দেখ, একখান কথা বল', 'আমি নদীর মতো কত দূরে', 'নোটন নোটন পায়রাগুলো', 'আমি বৃষ্টির কাছ থেকে কাঁদতে শিখেছি' প্রভৃতি জনপ্রিয় গানে তৎকর্তৃক সুর সংযোজন। মৃত্যু. ঢাকা, ৩০ জুন ১৯৯৪।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)॥ জন্ম. জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ১৫ মে ১৮১৭। ধর্মবেত্তা, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা।

প্রথমে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে



পড়াশুনা। এ সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। ১৮৩১-এ হিন্দু কলেজে ভর্তি। সেখানে কিছু দিন অধ্যয়নের পর পিতার বিষয়কর্ম ও ব্যবসায়ে শিক্ষানবিসি শুরু। ইউনিয়ন ব্যাংক ও কার ঠাকুর কোম্পানির সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে। বিষয়কর্মের কর্তৃত্ব পেয়ে বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদের প্রতি আকৃষ্ট হন ও বিলাসী হয়ে ওঠেন। ১৮৩৫-এ পিতামহীর মৃত্যুকালে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়; তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে এবং মূর্তি-পূজার প্রতি তাঁর বিরাগ জন্মে। এ সময় ঈশোপনিষদের একটি শ্লোক (তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ) তাঁকে প্রভাবিত করে এবং তিনি উপনিষদ পাঠে ব্রতী হন। তাঁর বিষয়-স্পৃহা হ্রাস পায় এবং তিনি ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ধর্মতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে ৬ অক্টোবর ১৮৩৯-এ 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' স্থাপন। দ্বিতীয় অধিবেশনে এর নাম পরিবর্তিত করে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৪০) রাখা হয়। ১৮৪০-এ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন। বিনা বেতনে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক উপদেশ দেয়া এই পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথের অর্থে ও অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত (১৮৪৩)। ১৮৪৩-এর ২১ ডিসেম্বর ২০ জন বন্ধুসহ ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষা গ্রহণ এবং ব্রাহ্মসমাজের (১৮২৮) ধর্মমত প্রচারে ব্রতী। পিতার মৃত্যুর (১৮৪৬) পর অপৌত্তলিক মতে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের দুইটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 'কার ঠাকুর কোম্পানি' ও 'ইউনিয়ন ব্যাংক' ফেল করলে (১৮৪৮) ব্যবসায় সংক্রান্ত পিতৃঋণ পরিশোধের ব্যাপারে সততা প্রদর্শন। ১৮৫৩-তে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক হন। ১৮৫৯-এ ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৬০-এ ব্রাহ্মমতে দ্বিতীয়া-কন্যার বিয়ে সম্পাদন। এই বিয়েতে শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি বর্জনের ফলে সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি। হিন্দু পূজা-পার্বণাদি বর্জন করে মাঘোৎসব (১১ মাঘ), বসন্তোৎসব (১ ফাল্গুন), নববর্ষ (১ বৈশাখ), দীক্ষাদিন (৭ পৌষ) প্রভৃতি উৎসবের প্রবর্তন। ১৮৬৭-তে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত। একই বছরে বীরভূমের ভুবনডাঙায় একটি বিস্তৃত ভূ-খণ্ড কিনে সেখানে একটি আশ্রম স্থাপন। ভুবনডাঙ্গার সেই আশ্রমই আজকের শান্তিনিকেতন। বাল্য ও বহুবিবাহ বিরোধী এবং বিধবাবিবাহে উৎসাহী। কিছুদিন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ সোসাইটি বন্ধ হয়ে গেলে কয়েকজন বন্ধু নিয়ে ১৮৫১-তে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন গঠন ও সম্পাদক নিযুক্ত। ১৮৫৪ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক রূপে দরিদ্র গ্রামবাসীদের চৌকিদারি ট্যাক্স থেকে পরিত্রাণের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্বায়ত্তশাসনের দাবিসম্বলিত একটি দরখাস্ত পেশ। শিক্ষা আন্দোলনেও অংশগ্রহণ। বেথুন সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নিজ কন্যাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করা, বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ। কেশবচন্দ্রের (ব্রাহ্মসমাজের আচার্য) সমাজ-সংস্কারমূলক কাজের প্রতি দেবেন্দ্রনাথ বেশিদিন সায় দিতে না পারায় ১৮৬৫-তে কেশবচন্দ্র তাঁর অনুবর্তীদের নিয়ে আলাদা হয়ে যান এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে নতুন সমাজ গঠন করেন (১৮৬৬)। পূর্বেকার কলকাতা-ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮) আদি ব্রাহ্মসমাজ নাম ধারণ করে। দেবেন্দ্রনাথ এর কার্যভার রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মনীষীর উপর অর্পণ করে ধর্মসাধনায় মগ্ন থাকেন। সৎ, ঋজু চরিত্রের অধিকারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃঋণের বিশাল বোঝা নিজের মাথায় নিয়ে তা পরিশোধ, সামাজিক ও সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন এবং ধর্ম ও দর্শনের অনুশীলন এ-সকল একসঙ্গে নির্বাহ করে বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ধর্ম, দর্শন সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতি বিষয়েবহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা। তাঁর রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থাবলি: বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, Vedantic Doctrines Vindicated (১৮৪৫), ব্রাহ্মধর্ম (১৮৫০), ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী (১৮৬৪), ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি, স্বরচিত জীবনচরিত (১৮৯৮), পত্রাবলি। মৃত্যু. ১৯ জানুয়ারি ১৯০৫।

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০)॥ জন্ম. গাজীপুর, উত্তর প্রদেশ, ১৮৫৮। আদি নিবাস বলাগড়, হুগলী। কবি। পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ

সেন। বাঙালি বৈদ্য পরিবারে জন্ম। পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স (১৮৭২), কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে



প্রথম বিভাগে এফ.এ. (১৮৭৪) পাস। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ. (১৮৮৬) ও একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে ইংরেজিতে এম.এ. (১৮৯৩) ডিগ্রি লাভ। ল' পাস। ১৮৯৪-তে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগদান। ১৯০০-তে কলকাতায় 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন। পরে এই বিদ্যালয় 'কমলা হাইস্কুল' নামে রূপান্তরিত। এছাড়া 'শ্রীকৃষ্ণ মিশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তার মুখপত্ররূপে 'শ্রীকৃষ্ণ রিভিউ' প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে 'ভারতী' পত্রিকায় স্বরচিত কবিতা প্রকাশ। প্রকৃতির রূপমাধুরী, নারী মহিমা ও গার্হস্থ্য জীবন তাঁর কবিতার ভাববস্তু। পুষ্পবিষয়ক কবিতা ও সনেট রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান। শেষ জীবনের কবিতায় ভক্তিরসের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত। প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ: ফুলবালা (১৮৮০), ঊর্মিমালা (১৮৮১) নির্ঝরিণী (১৮৮১), অশোকগুচ্ছ (১৯০০), হরিমঙ্গল (১৯০৫), গোলাপগুচ্ছ (১৯১২) ও কার্ত্তিকমঙ্গল (১৯১২)। স্বাস্থ্যহানি ঘটায় শেষ জীবনে দেরাদুনে বাস। মৃত্যু. দেরাদুন, ২১ নভেম্বর ১৯২০।

দোম আন্তোনিয়ো॥ জীবনকাল ১৭শ শতকের শেষার্ধ। বঙ্গদেশে খ্রিস্ট ধর্মের প্রথম প্রবর্তক ও প্রচারক। পুরো নাম দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো। তৎকালীন যশোর-ফরিদপুর অঞ্চলের অন্তর্গত ভূষণা নামক রাজ্যের রাজপুত্র। ১৬৬৩-তে আরাকান অঞ্চলের মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের দ্বারা বন্দী হয়ে আরাকানে নীত। ফাদার দো রোজারিয়ো নামক জনৈক পর্তুগিজ কর্তৃক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত। আন্তনি ও ফাদার দো রোজারিয়োর স্মরণার্থে দীক্ষার সময় 'দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো' নাম গ্রহণ। ভূষণায় ফিরে নিজের স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনদের খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা দান। খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পিতার জমিদারির অন্তর্গত কোষভাঙা নামক স্থানে মিশন স্থাপন। পরে এই কেন্দ্র ভাওয়াল রাজ্যের অন্তর্গত নাগরী নামক স্থানে স্থানান্তরিত। ভাওয়ালে খ্রিস্ট ধর্মের আদিত প্রবর্তক। বাংলা গদ্যের অন্যতম আদি নিদর্শন 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' নামক গ্রন্থ রচনা। এই পুস্তক ১৯৩৭-এ সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

দৌলত উজির বাহরাম খান (ষোড়শ শতাব্দী)॥ জন্ম. ফতেহাবাদ, চট্টগ্রাম, জীবকাল ষোড়শ শতাব্দী। কবি। বাহরাম খান তাঁর প্রকৃত নাম। দৌলত উজির উপাধি। তিনি চট্টগ্রামের জাফরাবাদের শাসনকর্তা নিজাম শাহের দেওয়ান ছিলেন। কারবালার কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'জঙ্গনামা' বা 'মক্তুল হোসেন' তাঁর প্রথম কাব্য। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'লায়লী-মজনু' (রচনাকাল ১৫৪৩-১৫৫৩)। কাব্যটি ফারসি কবি জামীর 'লায়লী মজনু' কাব্য অবলম্বনে রচিত। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে বাহরাম খানের 'লায়লী-মজনু' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একখানি বিশিষ্ট কাব্য। বাহরাম খান আরবি-ফারসি ভাষা এবং ইসলামি ধর্মশাস্ত্রের মতো হিন্দু-ধর্মশাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষায়ও পারদর্শী ছিলেন।

দৌলত কাজী (আনুমানিক ১৬০০-১৬৩৮)॥ জন্ম. সুলতানপুর গ্রাম, রাউজান, চট্টগ্রাম, আনুমানিক ১৬০০। মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট কবি। বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি ও ব্রজবুলি ভাষায় অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। আরাকান রাজ চন্দ্র সুধর্মের সমর-সচিব আশরাফ খাঁর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কবি সাধনের 'মৈনাসত' কাব্য অবলম্বনে 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্য রচনা। বাংলা ও ব্রজবুলি এ দুয়ের মিশ্র ভাষায় রচিত এ কাব্যে তাঁর অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় মেলে। রামায়ণ, মহাভারত ও বৈষ্ণব পদাবলী থেকে অনুষঙ্গ ব্যবহারে কৃতিত্ব প্রদর্শন। কাব্যটির তৃতীয় খণ্ড রচনাকালে দৌলত কাজীর জীবনাবসান ঘটে। পরে কবি আলাওল কর্তৃক এর বাকি অংশ রচনা। দৌলত কাজী ছিলেন সুফি-মতাবলম্বী মুসলমান। মৃত্যু. আনুমানিক ১৬৩৮।

দৌলতননেছা খাতুন (১৯২২-১৯৯৭)॥ জন্ম. সোনাতলা, বগুড়া, ১৯২২। পিতা ইয়াছিন আলী মাতা নছিরননেছা। পৈতৃক বাস মাগুরা। স্টেশন

মাস্টার পিতা ইয়াছিন আলী 'স্বর্গোদ্যান' ও 'হীরার ফুল' নামের দুটি উপন্যাস রচনা করে পরিচিত। ১৯৩০-এ মাত্র ৮ বছর বয়সে তৃতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তাঁর বিয়ে হয় গাইবান্ধার ডা. হাফিজুর রহমানের সঙ্গে। বিয়ের পরেও চার বছর পিতার কাছে



থেকে তিনি পড়াশোনা করেন। স্বামীর সংসারে গিয়ে ১৯৩৮-এ মেট্রিক, ১৯৪০-এ ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৪২-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে বি.এ. এবং ১৯৫৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেন। কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদান এবং গুপ্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। ১৯৩২-এ লবণ আইন ভঙ্গ করার অপরাধে গ্রেফতার বরণ। তাঁর বাড়ি ক্রোক করা হয় এবং চিকিৎসক স্বামীকেও বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। এরপরেও তিনি অনেকবার পুলিশি হয়রানির শিকার হন: একবার গ্রেফতার এড়াতে তিনি নদীতেও ঝাঁপ দিয়েছিলেন। ১৯৫১-এ বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকায় হ্যাজাক আলোতে বামপন্থী পূর্বপাকিস্তান যুবলীগের যে সম্মেলন হয়, তাতে তিনি সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলনে তিনি অংশ নেন। ১৯৫৪-এ যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরূপে যে আটজন নারী পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন, বগুড়া-দিনাজপুর এলাকা থেকে নির্বাচিত দৌলতননেছা খাতুন তাঁদের একজন। যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল হলে তাঁকে এক বছর কারাগারে রাখা হয়। ১৯৫৭-এ চীনে বিশ্ব মহিলা সম্মেলনে যোগদান। ১৯৬২-তে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৬৪-তে সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যু হয়। ১৯৭১-এ স্বাধীনতাযুদ্ধে সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭৯-এ জিয়াউর রহমানের শাসনামলে কুড়িগ্রাম-গাইবান্ধা আসনে মহিলা সাংসদ মনোনীত। তাঁর উত্থাপিত 'যৌতুক নিরোধ বিল' সংসদে পাস হয়। রাজনীতি ও সমাজসেবার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চা করতে। 'বঙ্গশ্রী', 'দেশ', 'নবশক্তি', 'বিচিত্রা' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত। রচিত গ্রন্থ: উপন্যাস—পথের পারশ (১৯৫৭), ঝরনা নাটক (১৯৬৯), বধূর লাগিয়া (১৯৬২), নাসিমা ক্লিনিক (১৯৬৪), কুসুমপুরের ছোটবৌ (১৯৮৮), বিবস্ত্র ধরণী (১৯৮৯) প্রভৃতি। পুরস্কার: নূরুননেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী পুরস্কার (১৯৭৭), আশরাফ হোসেন সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৪), আবদুর রাজ্জাক সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৫) প্রভৃতি। মৃত্যু. গাইবান্ধা, ৪ আগস্ট ১৯৯৭।

দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৭৯৪। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র ও রবীন্দ্রনাথের পিতামহ। জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন ঠাকুরের দত্তক পুত্র। রামলোচন অপুত্রক ছিলেন বলে দ্বারকানাথকে



পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। রামমণি ঠাকুর তাঁর পিতা। শেরবোন নামক একজন ইংরেজ-ফিরিঙ্গির স্কুলে ও পরে উইলিয়াম অ্যাডামসের নিকট ইংরেজি শিক্ষা লাভ। ব্যবহারশাস্ত্রের লেখাপড়া করে কিছুকাল আইন ব্যবসায়। পরে সুপ্রিম কোর্টে জমিদারের প্রতিভূরূপে কর্ম সম্পাদন। প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জন। নতুন জমিদারি ক্রয়। ১৮২৩-এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধীনে চব্বিশ পরগনার নিমক মহলের দেওয়ান নিযুক্ত। ছয় বছর পর শুল্ক, লবণ ও অহিফেন বোর্ডের দেওয়ান পদে উন্নীত। পরে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় শুরু। 'ম্যাকিনটস অ্যান্ড কোং'-এর অংশীদার ও কমার্শিয়াল ব্যাংকের পরিচালক। ১৮২৯-এর ৭ আগস্ট ইউনিয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও ১৮৩১-এর ১৪ জুলাই এ ব্যাংকের অন্যতম পরিচালক নিযুক্ত। কয়েকটি বীমা কোম্পানির পরিচালক। ১৮৩৪-এর ১ আগস্ট ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে কার ও ঠাকুর কোম্পানি নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও এর পরিচালক নিযুক্ত. ব্যবসায়সূত্রে রেশম ও নীল রপ্তানি, কয়লাখনি ক্রয়, চিনির কল স্থাপন এবং জাহাজ মেরামত ও নির্মাণের কারখানা স্থাপন। কয়েকটি জাহাজের মালিক হন। তারমধ্যে 'দ্বারকানাথ' নামে একটি জাহাজ প্রাচ্যে যাত্রী ও ডাক চলাচলে নিয়োজিত হয়। দেশের বিভিন্ন জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত। রাজা রামমোহন

রায়ের ঘনিষ্ঠ সহচর ও ব্রাহ্মধর্মের সমর্থক। ১৮১৯-এ রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভার' সদস্য হন এবং অ্যাংলো হিন্দু স্কুলে একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একজন দৃঢ় সমর্থক। ইংরেজরা এদেশে স্থায়ীভাবে উপনিবেশ স্থাপন করলে দেশের যথেষ্ট উন্নতি হবে বলে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ইংরেজ ভক্ত হলেও শাসকমণ্ডলীর জনস্বার্থবিরোধী বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। ১৮২৩-এ মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপের ব্যবস্থা করা হলে রামমোহনের সঙ্গে যে ৬ জন বাঙালি-ব্যক্তিত্ব প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে এবং পরে ইংল্যান্ডের রাজার কাছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন তাঁদের একজন। দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে ১৮৩৫-এ উক্ত বিধি প্রত্যাহৃত। ১৮২৯-এ রামমোহনের সহযোগে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' ও 'বঙ্গদূত' নামক পত্রিকা প্রকাশ। 'বেঙ্গল হরকরা' নামক পত্রিকারও অংশীদার। সতীদাহ-প্রথা বিলুপ্তির দাবিতে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেশব্যাপী আন্দোলন পরিচালনা। এ আন্দোলনের ফলে লর্ড বেন্টিংক কর্তৃক ১৮২৯-এ কঠোর আইন দ্বারা এ কুপ্রথা রহিত। সতীদাহ-রদ আইনের জন্য লর্ড বেন্টিংককে অভিনন্দন জ্ঞাপন। সমাজে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৮৩৩ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত হিন্দু কলেজের অন্যতম পরিচালক। ১৮৪০-এ হিন্দু কলেজের অধীনে 'বাংলা পাঠশালা' স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা। মেডিক্যাল কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদেরকে পারিতোষিক দানের ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৮৩৫-এ কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন। ডিস্ট্রিক চ্যারিটেবল সোসাইটিতে এক লক্ষ টাকা দান। ১৮৩৮-এ প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডারসের' প্রধান উদ্যোক্তা। ব্যবসার-সূত্রে ১৮৪২-এ বিলেত গমন। বিলেতে রাজকীয় সম্মান লাভ। রাজদরবারেও বিশেষ সংবর্ধিত। ইংল্যান্ডে তাঁর ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনযাত্রা দেখে সম্ভ্রান্ত ইংরেজগণ কর্তৃক তাঁকে প্রিন্স আখ্যা দান। 'বেঙ্গল কোল কোং' স্থাপন। 'জাস্টিস অফ দি পীস' রূপে সম্মানিত। ১৮৪৫-এ দ্বিতীয়বার বিলেত গমন। চারজন মেডিকেল ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য সঙ্গে নিয়ে যান। মৃত্যু. লন্ডন, ১৮৪৬।

দ্বিজ বংশীদাস (ষোড়শ শতাব্দী)॥ জন্ম. পাতোয়ারী গ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। জীবনকাল ষোড়শ শতাব্দী। কবি। পৈতৃক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। কবির এক পূর্বপুরুষ চক্রপাণি রাঢ় দেশ থেকে এসে ব্রহ্মপুরের তীরে বসতি স্থাপন। বংশীদাস সংস্কৃত, পুরাণ, আগম, তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। মনসার গীত গেয়ে অতি কষ্টে সংসার নির্বাহ। রামায়ণের অনুবাদক হিসেবে খ্যাত চন্দ্রাবতী তাঁর কন্যা। পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি। ১৫৭৫-এ দ্বিজ বংশীদাস তাঁর মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন বলে অনুমেয়। বেহুলার দুঃখের চিত্র ও চাঁদ সদাগরের চরিত্রের দৃঢ়তা এ কবির কাব্যে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত। পদ্মার চক্রান্তে চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্র সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করলে পুত্রশোকে সনকার মাতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠলেও চাঁদ সদাগর অটল থাকেন। মৃত পুত্রদের জলে ভাসিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়ে তিনি বলেন, 'কানীর উচ্ছিষ্ট পুত্র শীঘ্র কর পার'। মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাসই চাঁদ সদাগরের দৃপ্ত পৌরুষ সহজ ও নিরলঙ্কার ভাষায় অধিকতর উজ্জ্বলভাবে অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছেন। মনসামঙ্গল ছাড়াও কৃষ্ণ গুণার্ণব, রামগীতা ও চণ্ডী নামে তিনটি বৃহৎ কাব্য রচনা করেছেন বলেও জানা যায়।

দ্বিজদাস দত্ত (১৮৪৯-১৯৩৫)॥ জন্ম, কালিকচ্ছ, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৮৪৯। শিক্ষাব্রতী ও সরকারি কর্মকর্তা। বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের পিতা। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কুমিল্লা শহরে 'সর্বধর্ম সমন্বয় সমিতি' গঠন। বেদ, উপনিষদ ইংরেজিতে অনুবাদ করে যশস্বী হন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর হাট-বাজার-গ্রামে সহজ ভাষায় বক্তৃতা করতেন। বক্তৃতার মর্মকথা শহরবাসী শোষণকারী গ্রামের লোকই জমির মালিক। তুলনামূলক ও বিশ্বধর্মতত্ত্বে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধনা তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থ: পাট বা নালিতা (১৯১১), ঋগ্বেদ (১৯২১), ভোটের কথা (১৯২৩), বৈদিক বর্ণ বা জাতিতত্ত্ব (১৯২৫), কোরানের সুরা ও বেদের সূত্র সংগ্রহ (১৯২৬), সর্বধর্ম সমন্বয় (১৯৩৩) প্রভৃতি। মৃত্যু. ১৯৩৫।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)॥ জন্ম. জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ১১ মার্চ ১৮৪০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কবি, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও বাংলায় শর্টহ্যান্ড ও স্বরলিপির

উদ্ভাবক। গৃহে বাল্যশিক্ষা শুরু। পরে সেন্ট



পলস স্কুল ও হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ। ১৮৫৫-তে কলেজ ত্যাগ। সারাজীবন বাড়িতে জ্ঞানানুশীলন। ১৮৬৭-র ১২ এপ্রিল স্বদেশি চেতনার প্রতীক 'হিন্দুমেলা'য় যোগদান। দ্বিজেন্দ্রনাথের পরামর্শে, নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে এবং গণেন্দ্রনাথের ঠাকুরের আনুকূল্যে ও উৎসাহে এই স্বদেশি মেলা (হিন্দু মেলা) প্রতিষ্ঠিত। ১৮৭০-১৮৭৩ পর্যন্ত হিন্দু মেলার সম্পাদক। পোশাক, ভাষায় ও আচরণে সর্বদা দেশি ভাব অনুসরণ। স্বদেশি সংগীত রচনা করে খ্যাতি অর্জন। হিন্দু মেলার জন্য রচিত। 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।' তাঁর এই দেশাত্মবোধক গানটির সেকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ। ব্রহ্মসংগীতের রচয়িতা হিসেবেও খ্যাত। চিত্রাঙ্কনে কুশলতার পরিচয় প্রদান। ১৮৭৭-এ তাঁর সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত। সাত বছর এ পত্রিকা সম্পাদনা। ১৮৮৪ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনা। সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' (১৮৮১) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৪-তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৮৯৭-১৯০০ পর্যন্ত পরিষদের সভাপতি। ১৯১৩-তে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ৭ম অধিবেশনের মূল সভাপতি। ১৮৬৬-১৮৭১ পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। ন্যাশনাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' সাহিত্য সভার বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। থিওসফিক্যাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর (১৯০৫) পর জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে গমন এবং আমৃত্যু সেখানেই বসবাস। একজন বিশিষ্ট কবি। স্বপ্নপ্রয়াণ (১৮৭৩)-এর কবি হিসেবে খ্যাত। এটি একটি রূপক-কাব্য। কবির স্বপ্নজগতে পরিক্রমণের চিত্র এতে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত। রচিত অপর কাব্য: কাব্যমালা (১৯২২)। দার্শনিক প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। প্রবন্ধ পুস্তক: ব্রাহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মসাধন (১৯০০), আচার্যের উপদেশ (২ খণ্ড, ১৯০০-১৯০২), গীতাপাঠ (১৯১৫), নানাচিন্তা (১৯২০), প্রবন্ধমালা (১৯২০)। মেঘদূতের পদ্যানুবাদ (১৮৬০) করে সুনাম অর্জন। বাংলা গানের স্বরলিপি ও বাংলা রেখাক্ষর বর্ণমালার (শর্টহ্যান্ড) লিখন পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তক হিসেবে খ্যাত। মৃত্যু. ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। জন্ম. কৃষ্ণনগর, নদীয়া ১৯



জুলাই ১৮৬৩। কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান কার্তিকেয় রায় তাঁর পিতা। ডি.এল. রায়. নামে পরিচিত। কবি ও নাট্যকার। ১৮৭৮-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ.এ. ও হুগলী কলেজ থেকে বি.এ. পাস। ১৮৮৪-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাস। ১৮৮২-তে ছাত্রাবস্থায় প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'আর্যগাথা' প্রকাশ। কিছুকাল ছাপরায় রেভেলগঞ্জ মুখার্জি সেমিনারিতে শিক্ষকতা। এরপর সরকারি বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলেত গমন। বিলেতে পাশ্চাত্য সংগীতের তালিম গ্রহণ এবং ইংরেজি কবিতাগ্রন্থ 'Lyrics of Ind.' প্রকাশ। এছাড়া প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় ও রঙ্গালয়ের কলাকৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন। ১৮৮৬-তে দেশে ফিরে সরকারি চাকরিতে যোগদান। চাকরি জীবনে সেটেলমেন্ট অফিসার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আবগারি বিভাগের পরিদর্শক এং ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার বিভাগের সহকারী পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন। দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য ১৯১৩-তে চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ। কবি, নাট্যকার ও গীতিকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন। বাংলা কবিতায় নতুন ধরনের আঙ্গিক ও ছন্দের সৃষ্টি করে এবং ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনা করে রবীন্দ্র-যুগে মৌলিকতার পরিচয় প্রদান। বাংলা নাটকে সার্থক দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র সৃষ্টির প্রথম কৃতিত্ব তাঁর। দেশপ্রেম ও সামাজিক দোষ-ত্রুটি সমালোচনা তাঁর নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রহসন তথা সকল শ্রেণির নাটক রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলো সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাজাহান (১৯০৯) তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক। গীতিকার ও সুরকার হিসেবেও স্বকীয়তার পরিচয় প্রদান। বাংলা সমবেত কণ্ঠসংগীতের প্রবর্তক। গানে দেশি ও পাশ্চাত্য সুর ব্যবহার। তাঁর স্বদেশি গানগুলো বাংলা গীত-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। 'ধনধান্যপুষ্প', 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'যে দিন সুনীল জলধি হ'তে' প্রভৃতি দেশাত্মবোধক গান রচনায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান। হাসির গান রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয়। রঙ্গ, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক বিষয়বস্তুর জন্য হাসির গানগুলোর ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন। বিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'পূর্ণিমা সম্মিলন' (১৯০৫)-এ র প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন বিরূপ সমালোচক। রচিত গ্রন্থ: কাব্য| আর্যগাথা (১ম ভাগ ১৮৮২, ২য় ভাগ ১৮৯৩), মন্দ্র (১৯০২), আলেখ্য (১৯০৭), ত্রিবেণী (১৯১২)। ব্যঙ্গকবিতা|আষাঢ়ে (১৮৯৯), হাসির গান (১৯০০)। কাব্যনাট্য|পাষাণী (১৯০০)। ঐতিহাসিক নাটক| প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), মেবারপতন (১৯০৮) নূরজাহান (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহল-বিজয় (১৯১৬)। সামাজিক নাটক|পরপারে (১৯১২), বঙ্গনারী (১৯১৬)। নকশা ও প্রহসন|এক ঘরে (১৮৮৯), কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), পুনর্জন্ম, (১৯১১), আনন্দ-বিদায় (১৯১২)। রোমান্টিক ও পৌরাণিক নাটক: সোহ্‌রাব-রুস্তম (১৯০৮), সীতা (১৯০২)। অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকই মোগল ও রাজপুত ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে গদ্য সংলাপে রচিত। চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহল-বিজয় (১৯১৬), এ দু'খানি নাটকের কাহিনী প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে গৃহীত। ইতিহাস নিষ্ঠা অপেক্ষা সমকালীন বঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় উচ্ছ্বসিত দেশপ্রেম এ-সকল নাটকে বর্ণিত। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও ১৯১৩-এর মে মাসে (১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে) পত্রিকাটি প্রকাশের আগেই পরলোকগমন। মৃত্যু. ১৭ মে ১৯১৩।

ধীর আলী মিয়া (১৯২০-১৯৮৪)॥ জন্ম. বাঁশবাড়ি গ্রাম, টঙ্গীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ, ১ জানুয়ারি ১৯২০। বংশীবাদক, সংগীত পরিচালক সুরকার ও অর্কেস্ট্রা পরিচালক। টঙ্গীবাড়ি প্রাইমারি স্কুলের পাঠ শেষ করে স্থানীয় সোনারঙ হাইস্কুলে ভর্তি। এ স্কুলে কয়েক ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন।



বংশীবাদন ও সংগীতের প্রতি অনুরাগবশত স্কুলের পাঠ ত্যাগ। প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ পিতৃব্য সাদেক আলীর কাছে শৈশবকাল থেকে বংশীবাদনের তালিম গ্রহণ। সে সঙ্গে ক্ল্যারিওনেট, গিটার, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদনে দক্ষতা অর্জন। ১৯৪৫-এ অল ইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রে অনিয়মিত বংশীবাদক হিসেবে অংশগ্রহণ। ১৯৪৮-এর ১ এপ্রিল তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে 'নিজস্ব শিল্পী' হিসেবে যোগদান। ১৯৫২-তে সংগীত প্রযোজক ও ১৯৭৮-এ উপ-প্রধান সংগীত পরিচালক পদে উন্নীত। ১৯৮৩-র ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা বেতারের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। 'ঢাকা অর্কেস্ট্রা' নামে অর্কেস্ট্রাদলের সংগঠক। লাহোরে অনুষ্ঠিত 'অল পাকিস্তান রেডিও মিউজিক কনফারেন্স' ও ভারতে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন'-এ অংশগ্রহণ। সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে ভারত, রাশিয়া ও আফগানিস্তান সফর। বুলবুল ললিত কলা একাডেমি (বাফা) ও আর্টস কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ কোর্সের শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন। দেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি 'মুখ ও মুখোশ'-এর সহকারী সংগীত পরিচালক। হিজ মাস্টার্স ভয়েস এবং ঢাকা গ্রামোফোন কোম্পানি কর্তৃক তাঁর সুরারোপিত ও সংগীত পরিচালিত কয়েকটি গানের ডিস্ক প্রকাশ। নাচঘর, উজালা, জোয়ার এলো, কাঞ্চন মালা, আবার বনবাসে রূপবান, দস্যুরাণী, কাজল রেখা প্রভৃতি ছায়াছবির সংগীত পরিচালক। আধুনিক বাংলা গানে লোকসংগীতের সুর সংযোজন করে তৎকর্তৃক বাংলা গানের রাজ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন। 'মনরে ভবের নাট্যশালায়-মানুষ চেনা দায়', 'কলসী কাঁখে ঘাটে যায় কোন রূপসী', 'বাসন্তী রঙ শাড়ি পরে কোন বধূয়া চলে যায়', 'নিশি জাগা চাঁদ হাসে কাঁদে আমার মন', 'ঐ বাঁকা চাঁদ কেন উঁকি দিয়ে জানালায়', 'ওরে আমার ঝিলাম নদীর পানি', 'বন্ধুর প্রেমে হইলাম পাগল', 'সালাম লহ দেশের মাটি', 'আমার সোনার দেশ' প্রভৃতি জনপ্রিয় গানে সুর সংযোজন। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের

পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে (২২ জুন ১৯৬৭) সরকারের সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। সংগীতের ক্ষেত্রে অবদান রাখায় তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৬৫-তে 'তমঘায়ে ইমতিয়াজ' খেতাবে ভূষিত। মৃত্যু. ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৪।

ধীরাজ ভট্টাচার্য (১৯০৫-১৯৫৯)॥ জন্ম, পাঁজিয়া



গ্রাম, কেশবপুর, ঝিনাইদহ, জানুয়ারি ১৯০৫। অভিনেতা, পুলিশ ও সাহিত্যিক। পিতা ললিতমোহন ভট্টাচার্য ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক। নিজ গ্রাম পাঁজিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে মেট্রিক ১৯২৩-এ। আশুতোষ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস। ১৯২৪-এ 'সতীলক্ষ্মী' নির্বাক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অভিনয় জীবন শুরু। পিতার ইচ্ছায় অভিনয় ছেড়ে পুলিশ বিভাগে চাকরিতে যোগদান। কলকাতায় কিছুদিন চাকরি করার পরে রাঙ্গামাটি জেলার টেকনাফ থানায় বদলি। এখানে মগ জমিদার ওয়াং থিনের কন্যা মাথিনের সখ্য লাভ। পিতার ইচ্ছায় চাকরি ছেড়ে কলকাতায় গমন। কথিত আছে তাঁর বিরহে মাথিন অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। যে কূপে পানি আনতে গিয়ে তাদের দেখা হত, সেটি 'মাথিনের কূপ' নামে পরিচিত। ১৯২৪-এ সরস্বতী চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে। ১৯২৯-এ পুলিশের চাকরি ত্যাগ। অভিনয়ে আত্মনিয়োগ। অভিনীত নির্বাচ চলচ্চিত্র হলো, 'গিরিবালা', 'বাসবদত্ত', 'কালপরিণয়', 'মৃণালিনী', এবং রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে 'নৌকাডুবি'। সবাক চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'যমুনা পুলিন', 'চাঁদ সদাগার', 'দক্ষযক্ষ', 'রাজ নটি', 'বসন্তসেনা', 'বাসব দত্তা', 'নরনারায়ণ', 'কৃষ্ণসুদামা', 'অসমাপ্ত', 'ভৈরব মন্ত্র', 'রানী ভবানী', 'সমাধান', 'মরণের পর' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে অভিনয়। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'যখন নায়ক ছিলাম', 'যখন পুলিশ ছিলাম', 'মন নিয়ে খেলা', 'সাজানো বাগান', 'মহুয়া মিলন' প্রভৃতি। মৃত্যু. কলকাতা, ৪ মার্চ, ১৯৫৯।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১)॥ জন্ম,



রামরাইল গ্রাম, কুমিল্লা, ২ নভেম্বর, ১৮৮৬। আইনজীবী, রাজনীতিবিদ। পিতা কসবা আদালতের সেরেস্তাদার জগবন্ধু দত্ত। নবীনগর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ১৯০৪-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯০৬-এ এফ.এ. পাস। কলকাতার রিপন কলেজ থেকে ১৯০৮-এ বি.এ. পাস। ছাত্রাবস্থায় আইনজীবী কৃষ্ণকমল দাস মুন্সীর কন্যা সুরবালার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ (১৯০৬)। ১৯১০-এ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯১০-এর ১ মার্চ থেকে ১৯১১-এর ২ জানুয়ারি পর্যন্ত কুমিল্লার বান্দরা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন। ১৯১১ থেকে আইন ব্যবসায় শুরু। ১৯০৫-এ বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই মূলত রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। ১৯১৯-এ ময়মনসিংহে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ। ১৯২১-এ কুমিল্লায় 'মুক্তি সঙ্ঘ' নামে একটি সংস্থা গঠন। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-'২২) অংশগ্রহণ করে সাময়িকভাবে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্বেচ্ছাসেবক দলের কার্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৯২৩-এ কুমিল্লায় 'অভয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংযুক্ত। ১৯২৯-এ কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বভারতীয় আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের স্বার্থে আইন ব্যবসায় সাময়িকভাবে পরিত্যাগ। ১৯৩০-এর ২ জুলাই আইন অমান্যের দায়ে গ্রেফতার। ১৯৩১-এর ২ ফেব্রুয়ারি শর্তাধীনে মুক্তিলাভ। ১৯৩৭-এ কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে বঙ্গীয় আইনসভায় সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪০-এর ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডাকঘরের সামনে প্রকাশ্যে যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি তোলার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাবজেলে প্রেরণ কারা অভ্যন্তরে একতরফা বিচারে নয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কুমিল্লা, দমদম ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পর্যায়ক্রমে কারাভোগের পর মুক্তিলাভ। ১৯৪২-এর 'ভারত

ছাড়' আন্দোলনে পুনরায় গ্রেফতার। ১৯৪৩-এ মুক্তিলাভ। ১৯৪৫-এর জুনে বঙ্গীয় বিধানসভার অধিবেশনে বাজেট আলোচনাকালে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক উত্থাপিত একটি ছাঁটাই প্রস্তাব অধিকসংখ্যক ভোটে গৃহীত। ফলে খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। বাংলার ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৪৬-এ কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪৮-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি গণ-পরিষদের অধিবেশনে পরিষদের ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দু গৃহীত। পরিষদ পরিচালনার নিয়ম-কানুনে আরো বলা হয়েছিল যে, উপর্যুক্ত দুই ভাষা (ইংরেজি ও উর্দু) ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম ব্যক্তি যিনি ভাষার প্রশ্নে গণ-পরিষদের ঐ অধিবেশনে সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন এবং গণ-পরিষদের ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে সমান মর্যাদা দানের দাবি জানান। তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। এরপর বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে পূর্ববাংলায় ভাষা-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ভাষা-আন্দোলনের একজন পথ প্রদর্শক হিসেবে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালির ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৯৫৪-তে পূর্ববঙ্গ আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। গণসমিতি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত (৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬) পূর্ববঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভার মেডিক্যাল, পাবলিক হেলথ ও সোস্যাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন (সেপ্টেম্বর ১৯৫৬-অক্টোবর ১৯৫৮)। ১৯৬০-এ আইয়ুব খানের সামরিক সরকার কর্তৃক তাঁর ওপর 'এবডো' আইন প্রয়োগ। ১৯৬৪-তে আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে East Pakistan Public Safety Ordinance-এর আওতায় গ্রেফতার। ১৯৬৫-র ১০ মার্চ পর্যন্ত বিনা বিচারে কারাভোগ। এরপর সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত না হলেও প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ২৭ মার্চ (১৯৭১) রাতে পাকিস্তান বাহিনী তাঁর বাসভবন থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। এরপর থেকে নিখোঁজ।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১)॥ জন্ম. চাতরা-শ্রীরামপুর, হুগলী, ৫ অক্টোবর, ১৮৯৪। সাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস ভাটপাড়া, চব্বিশ পরগনা। আইনবিদ ভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর পিতা। বারাসত স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯০৯), রিপন কলেজ থেকে আই.এসসি. (১৯১২), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ. (১৯১৬) ও ইংরেজিতে এম.এ. (১৯১৮) পাস। ১৯২০-এ দ্বিতীয়বার অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। বঙ্গবাসী কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর ১৯২২-এ লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগে যোগদান। ১৯৫১ পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। এর মাঝে উত্তর প্রদেশ সরকারের প্রচার ডিরেক্টর ও প্রেস অ্যাডভাইজার পদে দায়িত্ব পালন (১৯৪০-১৯৪৪)। ১৯৪৫-এ লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার ও ১৯৪৯-এ অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান পদে উন্নীত। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা (১৯৫১-১৯৫৫)। ১৯৫২-তে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে মস্কো-ইকনমিক কনফারেন্সে যোগদান। হল্যান্ডের ইনস্টিটিউট অফ সোসাল স্টাডিজ-এর আমন্ত্রণে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে হেগে 'Sociology of Culture' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান (১৯৫৩-১৯৫৪)। বান্দুং সম্মেলনের ইকনমিক কো-অপারেশন অফ এশিয়ান কান্ট্রিস সেমিনারে তিনদিন বক্তৃতা প্রদান (১৯৫৫)। প্রথম সভাপতি ইন্ডিয়ান সোসিওলজি কনফারেন্স (১৯৫৭)। অবসর-জীবনে দেরাদুনে বাস (১৯৫৫-১৯৬১)। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা ইত্যাদির বিশিষ্ট স্রষ্টা। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব প্রয়োগের পুরোধা। স্বকীয় চিন্তা, রচনার পরিচ্ছন্নতা, বিষয় উপস্থাপনের ঋজুতা ও স্বতঃস্ফূর্ত মননময় গদ্যশৈলীর জন্য বাংলা সাহিত্যে আসন লাভ। বাংলা উপন্যাসে চেতনা প্রবাহ রীতির অন্যতম প্রবক্তা। ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সংগীতের একজন বিশিষ্ট



সমালোচক। গল্প ও উপন্যাস: রিয়ালিস্ট (১৯৩৩), অন্তঃশীলা (১৯৩৫), আবর্ত (১৯৩৭), মোহনা (১৯৪৩)। গদ্যগ্রন্থ: আমরা ও তাঁহারা (১৯৩১), চিত্তয়সী (১৯৩৪), সুর ও সংগীত (১৯৩৭), কথা ও সুর (১৯৩৮), বক্তব্য (১৯৫৭)। ইংরেজি গ্রন্থ: Modern Indian Culture (১৯৩০), Personality and Social Science (১৯৩৪), Basic Concepts of Sociology. Tagore/A Study (১৯৪৪), Indian Music. On Indian History, Musical Memory, Views and Counterviews, Diversities, The Problems of Indian Youth. মৃত্যু. কলকাতা, ক্যান্সার রোগে, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬১।

নওয়াজেশ আহমদ (১৯৩৫-২০০৯)। জন্ম. পারিল, মানিকগঞ্জ, ১৯৩৫। আলোকচিত্রী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী। বাংলাদেশে প্রথম আলোচিত্র অ্যালবাম প্রকাশ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ জিনতত্ত্বে পিএইচডি উপাধি



লাভ। বাংলাদেশে চা নিয়ে ১০ বছর গবেষণা। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) উপদেষ্টা হিসেবে লাওস, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার সহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন। ১৯৩৫-এ মানিকগঞ্জ জেলার পারিল নওয়াদা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ জিনতত্ত্ব নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি শেষে তিনি ১০ বছর চা গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র অ্যালবামের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ (১৯৭৫), পোর্ট্রেট অব বাংলাদেশ (১৯৮৩), বার্মা (১৯৮১), কোয়েস্ট অব রিয়েলিটি (১৯৮৬), ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার্স অব বাংলাদেশ (১৯৯৭) ও গৌতম (বৌদ্ধদের জীবনকাহিনীভিত্তিক), 'ছিন্নপত্র', 'ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে'। গ্রন্থ: "মহাবনস্পতি পদাবলী", "অশ্বত্থের সন্ধানে", বাংলার বুনোফুল' প্রভৃতি। মৃত্যু: ঢাকা, ২৪ নভেম্বর ২০০৯।

নওয়াজিশ খাঁ (?-১৭৬৫)॥ জন্ম. সুখছড়ি, সাতকানিয়া চট্টগ্রাম। কবি। তাঁর বংশধর আতাউল্লা পণ্ডিতের কাছে রক্ষিত বংশতালিকা থেকে জানা যায়: ১৬৩৮-এ জীবিত ছিলেন। পারস্য উপাখ্যান অবলম্বনে গুল-ই-বকাউলি কাব্য রচনা। বাণী গ্রামের জমিদার বৈদ্যনাস রায়ের অনুরোধে এই গ্রন্থটি রচিত। এছাড়া 'পাঠান প্রশংসা', 'জোরওয়ার সংকীর্তন', 'বায়ানত বা ধাব উপক্ষি বা বয়ান' নামক কাব্য রচনা। বৈষ্ণব কবিতার ঢঙে বহু গীতিকবিতাও রচনা। মৃত্যু. ১৭৬৫।

নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)॥ জন্ম. ধনবাড়ি গ্রাম, ময়মনসিংহ, ১৮৬৩। রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক। জমিদার পরিবারে জন্ম। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনার পর কলকাতার সেন্ট জিভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. পাস। অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলমান



মন্ত্রী। বাংলার শাসন পরিষদ ও ভাইসরয়ের আইন পরিষদের সদস্য, আসাম, বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য, কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, স্যানিটারি বোর্ড অব বেঙ্গল, ইম্পিরিয়াল রিলিজিয়াস এনডাউমেন্ট কমিটির সদস্য ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। বেঙ্গল মোসলেম ফেডারেশন গঠন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রেসিডেন্ট। মুসলিম জাগরণের উদ্দেশ্যে তিনি জনৈক সাংবাদিককে একটি প্রেস কিনে দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের (১৯২১) অন্যতম প্রদান উদ্যোক্তা। শুধু রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, কবিও ছিলেন। গ্রন্থ: ঈদুল আজহা (১৯০০), মিলাদ শরীফ (১৯০৩)। ১৮৯৬-তে খান বাহাদুর, ১৯১১-তে নওয়াব, ১৯১৩-তে সি. আই. ই. এবং ১৯২৪-এ নবাব বাহাদুর উপাধি লাভ। মৃত্যু. ১৯২৯।

নওশর আলী খান ইউসুফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪)॥ জন্ম. চাড়ান গ্রাম, টাঙ্গাইল, ১৮৬৪। সমাজহিতৈষী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে (১৮৬৯)। দেলদুয়ার স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৭৭)। দেলদুয়ারের জমিদার-কন্যা রহমতুন্নেসার অর্থানুকূল্যে ঢাকার পোগজ স্কুলে

সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি। এ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৮১) পাস করে ঢাকা কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে ১৮৮৭-তে এফ.এ. পাস।



টাঙ্গাইল মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) মুসলিম সমাজে তিনিই প্রথম এফ.এ. পাস ব্যক্তিত্ব। বি.এ. ক্লাসে অধ্যয়নকালে পাকুল্লার জমিদার-কন্যা রহিমন্নেসার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ (১৮৮৮)। ১৮৮৯-তে পাকুল্লার সাব-রেজিস্ট্রার পদে নিযুক্তি লাভ। পরের বছর (১৮৯০) ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ। সব বিষয়ে পাস করলেও গড়-সীমায় পৌঁছতে না পারায় গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ থেকে বঞ্চিত। ১৯১১-তে সাব-ডেপুটি রেজিস্ট্রার হিসেবে পদোন্নতি লাভ। টাঙ্গাইলের মুসলিম বাসিন্দাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ পদে বৃত। ১৯১৯-এ অবসর গ্রহণ। ছাত্র-জীবন থেকেই সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ। 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১) তাঁর প্রথম প্রকাশিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ছাত্রাবস্থাতেই এর রচনাকার্য শুরু। এতে তাঁর সমাজ-জ্ঞান, স্বজাতিপ্রীতি, দেশচেতনা, মানব হিতৈষণা, শিক্ষানুরাগ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকবোধ বর্ণিত। 'শৈশব কুসুম' (১৮৯৫) তাঁর কবিতা-সংকলন। 'দলিল রেজিস্টারি শিক্ষা' (১৮৯৭) ও 'উচ্চ বাংলা শিক্ষা বিধি' (১৯০১) শিক্ষামূলক গ্রন্থ। মৃত্যু. চাড়ান, ৯ মে ১৯২৪।

নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮)॥ জন্ম. কলকাতা, আদি নিবাস মাহেশ, হুগলী, ৬ জুলাই ১৮৬৬। বাংলা ভাষায় প্রথম বিশ্বকোষ রচয়িতা। কর্মজীবনে কিছুকাল 'তপস্বিনী' ও 'ভারত' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা। পরে লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। ১৮৮৪-তে ইংরেজি ও বাংলায় 'শব্দেন্দু মহাকোষ' নামক অভিধান সংকলন ও প্রকাশ। এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য। ভারতীয় পুরাতত্ত্বে অসাধারণ



পাণ্ডিত্যের জন্য 'প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব' উপাধিতে সম্মানিত। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সংগ্রহে উড়িষ্যা ও অন্যান্য স্থানে ব্যাপক ভ্রমণ। অনেক তীর্থস্থান ও দুর্গম অঞ্চল থেকে বহু শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ। দীর্ঘদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' সম্পাদনা। এশিয়াটিক সোসাইটির ফিললজিক্যাল কমিটির সভ্য। কায়স্থ সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'কায়স্থ' নামক পত্রিকা সম্পাদনা। সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত 'পদাবলী', জয়নারায়ণের 'কাশী পরিক্রমা', ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী' ইত্যাদি গ্রন্থ সম্পাদনা। কর্ণবীর (১৮৮৪) নামে ম্যাকবেথের অনুবাদ। 'ধর্মবিজয়' ও 'শঙ্করাচার্য' নামক দুটি নাটক রচনা। বহু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ। তাঁর ব্যক্তিগত পুঁথির সংগ্রহ নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ খোলা হয়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দীর্ঘ ২৭ বছরের পরিশ্রমে প্রণীত 'বিশ্বকোষ' (২২ খণ্ড, শেষ খণ্ড-১৯১১) নামক গ্রন্থ। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' তাঁর অপর আর একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ। মৃত্যু. ১৯৩৮।

নজমুল হক সরকার (১৯৩২-১৯৭১)॥ জন্ম. হরিরামপুর গ্রাম, রাজশাহী, ১৯৩২। রাজনীতিবিদ। রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে বি.কম. এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি. ডিগ্রি লাভ। ১৯৬১-তে রাজশাহী আদালতে ওকালতি পেশায় যোগদান এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯৬৯-১৯৭০ পর্যন্ত রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের মনোনয়নে লালপুর-চারঘাট নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এর মার্চে রাজশাহীতে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'রাজশাহী জেলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হলে এর আহবায়ক নির্বাচিত এবং অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দান। মৃত্যু. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত।

নজীর আহমদ চৌধুরী (১৮৯১-?)॥ জন্ম. কমর মঞ্জিল, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ১৮৯১। সাংবাদিক, লেখক। চট্টগ্রামের সিনিয়ার মাদ্রাসা থেকে ১৯১৫-তে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পরীক্ষা

দেওয়ার পর কিছুদিন উক্ত মাদ্রাসা-স্কুলে শিক্ষকতা। পরে কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এ. অধ্যয়ন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে কলেজ ত্যাগ। কলেজ ছেড়ে দেবার পর পরই 'আল এসলাম' ও 'মোহাম্মদী'র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ শুরু। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে এক বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মুক্তিলাভের পর 'জামানা'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান। 'জামানা' বন্ধ হলে ১৯২৪-এ পুনরায় 'মোহাম্মদী'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান। রচিত গ্রন্থ: ফারুক চরিত (১৯২৬)। মৃত্যু. তারিখ অজ্ঞাত।

নন্দকুমার রায় (১৭০৫-১৭৭৫)॥ জন্ম. ভদ্রপুর, বীরভূম, ১৭০৫। মহারাজ। পিতা পদ্মনাথ রায় মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে আমিন ছিলেন, নন্দকুমার পরে পিতার সহকারী নিযুক্ত হন। সংস্কৃত, বাংলা, ফারসি ও রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ শিখে নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে হিজলি মহিষাদলের আমিন নিযুক্ত। নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে হুগলীর ফৌজদারের দেওয়ান নিযুক্ত। এ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তাঁর আচরণ সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল না; ফরাসিদের চন্দননগর ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তাঁর যোগসাজশ ছিল বলে ধারণা করা হয়। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর নানা উচ্চপদে নিযুক্তি লাভ। মীরজাফরের আমলে ক্লাইভের মুন্সি ও দেওয়ান পদ লাভ। ১৭৫৮-তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে বর্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার লাভ। রাজস্ব আদায়ের অধিকার নিয়ে তৎকালীন রেসিডেন্ট ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে বিরোধের সূচনা। এ সময় মীরজাফর ইংরেজদের বিরোধিতা করলে তাঁকে সহায়তা প্রদান। এরপর মীরজাফর পদচ্যুত হন। মীরজাফর দ্বিতীয়বার নবাবি পেলে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত হন। মীরজাফরের সুপারিশে দিল্লির বাদশাহ কর্তৃক 'মহারাজ' উপাধি প্রদান। মীরজাফরের মৃত্যুর পর ক্ষমতা হারান। এ সময় কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত দেওয়ান রেজা খাঁ নানাভাবে বাংলায় উৎপীড়ন শুরু করলে নন্দকুমার এবং তাঁর সমর্থকরা বিভিন্ন প্রমাণাদিসহ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে বিলেতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত পেশ করেন। রেজা খাঁ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর হেস্টিংসের উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দুর্নীতির অভিযোগ এনে নন্দকুমার কোম্পানির নিকট দরখাস্ত করেন। এতে হেস্টিংস ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করেন। নন্দকুমার এক সময়ে বুলাকিদাস নামে এক মহাজনের নিকট কতকগুলো অলংকার বিক্রয়ের জন্য দেন। ঐ অলংকার লুণ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় বুলাকিদাস তাঁর মূল্যবাবদ একখানি অঙ্গীকারপত্র লিখে দেন। সেই অঙ্গীকারপত্রের বলে নন্দকুমার বুলাকির মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি থেকে ঐ টাকা আদায় করে নেন। হেস্টিংস বুলাকিদাসের সম্পত্তির আমমোক্তার মোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তিকে হাত করে অঙ্গীকার পত্র জাল বলে সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করেন। মোকদ্দমায় সরকার বাদী হয়। সুপ্রিম কোর্টে হেস্টিংসের দায়ের করা এই মামলার বিচারক প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে ছিলেন তাঁর (হেস্টিংস) বন্ধু। ১৭৭৪-এর ৮ জুন এই মামলা শুরু হয় এবং ১৭৭৫-এর ১৬ জুন নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। কলকাতার তৎকালীন অধিবাসীবৃন্দ তাঁর ফাঁসির আদেশ রহিত করার জন্য আবেদন করেন কিন্তু তা উপেক্ষা করে কলকাতার রেসকোর্সের কাছে কুলীবাজারের মোড়ে এই দণ্ডাদেশ কার্যকর হয়। মৃত্যু. ৫ আগস্ট ১৭৭৫।

নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬)॥ জন্ম. মুঙ্গের, খড়গপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩। আদি নিবাস তারকেশ্বরের নিকটবর্তী জেজুর গ্রাম। চিত্রশিল্পী। পিতা চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন। মুঙ্গেরের খাল-খনন কাজের পরিদর্শক, পরে দ্বারভাঙ্গা রাজস্টেটের স্থপতি। দ্বারভাঙ্গায়



প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ। কলকাতা সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯০৩-এ এন্ট্রান্স পাস। কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে ফার্স্ট আর্ট ক্লাসে ভর্তি। দুইবার এফ.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য। প্রেসিডেন্সি কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি। এ সময়ে চিত্রাঙ্কনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। বাড়িতে পিসতুতো ভাই অতুল মিত্রের (আর্ট স্কুলের ছাত্র) কাছ থেকে অঙ্কনের দু-একটি পদ্ধতি শেখেন। আর্ট স্কুলে ভর্তির অভিপ্রায়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের পাঠ ত্যাগ। অবনীন্দ্রনাথের (আর্ট স্কুলের ভাইস-

প্রিন্সিপাল) চেষ্টায় আর্ট স্কুলে ভর্তি। আর্ট স্কুলে পাঁচ বছর শিক্ষা গ্রহণের পর বৃত্তি লাভ। নন্দলালের আর্ট স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হবার আগেই অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল ছেড়ে যান। তিনি নন্দলালকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে চিত্রাঙ্কন করার আহবান জানান। গুরুর আহবানে সাড়া দিয়ে নন্দলাল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে যান। সেখানে তিন বছর শিল্পচর্চা। এ সময়ে ভগিনী নিবেদিতা রচিত 'Indian Myths of Hindoos and Buddhists' বইয়ের চিত্রাঙ্কন করে সুনাম অর্জন। ভারতীয় প্রাচ্য কলামণ্ডলীর প্রদর্শনীতে তাঁর আঁকা ছবি 'শিবসতী' প্রদর্শিত হবার পর পাঁচশত টাকা পুরস্কার লাভ। ১৯১০-এ লেডি-হেরিংহ্যামের সহকারীরূপে অজন্তা গুহাচিত্রের নকল করার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯১৪-তে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যোগদান। কিছুকাল পরে কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় প্রাচ্যকলামণ্ডলীতে ফিরে আসেন। ১৯১৬-তে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা ক্লাবে শিল্প শিক্ষাদানে নিয়োজিত। জাপানি চিত্রশিল্পী আরাইসান ভারত ভ্রমণে এসে বিচিত্রার অতিথিরূপে বাস করা কালে নন্দলাল তাঁর কাছে দূরপ্রাচ্যের কালিতুলির নানা আঙ্গিক আয়ত্ত করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আমন্ত্রণে 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' অলংকৃত করেন মহাভারতের কাহিনী চিত্রিত করে (১৯১৯)। ১৯২৩ থেকে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বসবাস। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যক্ষ। ১৯২৪-এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন, জাপান, মালয়, ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ। মহাত্মা গান্ধীর আহবানে কংগ্রেসের লখনউ অধিবেশনে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ভারত শিল্পের প্রদর্শনী সজ্জিত, কংগ্রেসের ফৈয়জপুর অধিবেশনে কারুময় মঞ্চ ও তোরণ রচনা, কংগ্রেসের হরিপুর অধিবেশনে পল্লীজীবনের বিভিন্ন দিক চিত্রে রূপায়িত (১৯৩৫-১৯৩৭)। ১৯৪৩-এ বরোদারাজের কীর্তিমন্দির চিত্রভূষিত করার দায়িত্ব লাভ। শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে এবং চীনা ভবনে অপূর্ব ভিত্তিচিত্র অঙ্কন। যুগস্রষ্টা চিত্রশিল্পী। লোকায়ত ও ধ্রুপদ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির সংমিশ্রণে বাংলার চিত্রশিল্পকে নবরূপ দান। পৌরাণিক জগৎ থেকে মাটির পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু তাঁর চিত্রকলার মধ্য দিয়ে। তাঁর ধ্যানীবুদ্ধ ছবিটির মধ্যে বুদ্ধদেবের ধ্যানমগ্নতাই শুধু নয়, তাতে বুদ্ধের রক্ত-মাংসের অস্তিত্বও বিদ্যমান। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘের কলকাতা শাখা কর্তৃক নন্দলাল অঙ্কিত চিত্রের একটি অ্যালবাম প্রকাশ (১৯৫৬)। রচিত গ্রন্থাবলি: শিল্পকথা, শিল্পচর্চা, রূপাবলী (তিন খণ্ড), ফুলকারী (তিন খণ্ড), Ornamental Art. Pictures from the Life of Buddha. Paintings. Six Sketch of Nandalal Bose। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট (১৯৫০), বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট. (১৯৫৩) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট. (১৯৫৭) উপাধি প্রদান। দাদাভাই নওরজী স্মৃতি পুরস্কার লাভ (১৯৫৮) ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধি প্রদান (১৯৫৪)। মৃত্যু. ১৬ এপ্রিল ১৯৬৬।

নবীনচন্দ্র দাস (১৮৫৩-১৯১৪)॥ জন্ম. আলমপুর, পটিয়া, চট্টগ্রাম, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩। সাহিত্যিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও এল.এল.বি. পাস। চট্টগ্রাম কলেজের আইনের অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু। রংপুর জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে 'বিভাকর' ও 'প্রভাত' নামক দুটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা। তাঁর সম্পাদনা ও পরিচালনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'প্রভাত'। সংস্কৃত কবিতাগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করার জন্য নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলীর পণ্ডিতবর্গ-কর্তৃক 'কবিগুণাকর' এবং চট্টল ধর্মমণ্ডলী কর্তৃক 'বিদ্যাপতি' উপাধিতে ভূষিত। 'কাব্যরত্নাকর' উপাধিও লাভ। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরতার্জুন, আকাশ-কুসুম, শিশুপাল বধ, চারুচর্যা শতক, শোকগীতি, Miracles of Buddha, Ancient Geography of India. মৃত্যু. ২১ ডিসেম্বর ১৯১৪।

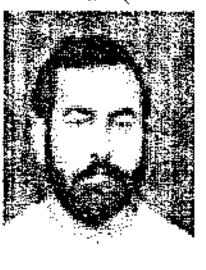
নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)। জন্ম, নোয়াপাড়া, চট্টগ্রাম, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭। কবি। চট্টগ্রাম স্কুল থেকে ১৮৬৩-তে প্রবেশিকা, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৬৫-তে এফ.এ. ও জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে ১৮৬৮-তে বি.এ. পাস। কর্মজীবনের প্রথমে কলকাতার হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা। ১৮৬৮-তে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে চাকরি লাভ। ১৯০৪-এ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। ছাত্রাবস্থায় কবিতা রচনা করে প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ। দেশপ্রেম ও

আত্মচিন্তামূলক কবিতা-সংকলন 'অবকাশরঞ্জনী'



(১৮৭১) নবীনচন্দ্র সেনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) নামক ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) ও 'প্রভাস' (১৮৯৬) এই কাব্যত্রয়ীতে তাঁর কবি-প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। কাব্য তিনখানির নায়ক কৃষ্ণ। 'রৈবতকে' কৃষ্ণের আদি, 'কুরুক্ষেত্রে' মধ্য ও 'প্রভাসে' অন্তলীলার কাহিনী বর্ণিত। এই আখ্যায়িকা মহাকাব্যের লক্ষণযুক্ত। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' একখানি সুখপাঠ্য বই এবং তা এদেশের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের একখানি প্রামাণিক দলিল। নবীনচন্দ্র অপরূপ বর্ণনা শক্তির অধিকারী। অসংযত উদ্দাম ও ভাবোন্মাদনা তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মহৎ ও মহত্ত্বের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। খৃষ্টের জীবনী রচনা। মোহাম্মদের জীবনী রচনার ইচ্ছাপোষণ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: ক্লিওপেট্রা, ভানুমতী, প্রবাসের পত্র, খৃষ্ট ও অমিতাভ, গীতা ও চণ্ডী'র অনুবাদ। আত্মজীবনী: আমার জীবন। মৃত্যু. ২৩ জানুয়ারি ১৯০৯।

নরেন বিশ্বাস (১৯৪৫-১৯৯৮)॥ জন্ম. মাঝিগাতি,



কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর ১৯৪৫। উচ্চারণবিদ, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ। পিতা নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মাতা হরিদাসী বিশ্বাস। তিনি গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দী মিড হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক (১৯৬০), রামদিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১৯৬২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বিএ সম্মান (১৯৬৫) এবং এমএ (১৯৬৬) পাস। ১৯৬৬-এ ময়মনসিংহের পাকুন্দিয়া কলেজের প্রভাষক হিসেবে যোগদান। ১৯৬৭-এ মাদারীপুর নাজিমউদ্দিন কলেজে যোগদান। ১৯৭৬ সাল থেকে আমৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের জন্য 'নাটক', 'কথিকা', 'জীবন্তিকা', 'নক্সা' প্রভৃতি রচনা, পাঠ এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ। যুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত। 'কণ্ঠশীলন' ও 'শব্দরূপ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭২-এ ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' অবলম্বনে 'মা' নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন। ১৯৭৪-এ তিন মাস কারাবরণ। ঢাকা শহরের বিভিন্ন নাটক, আবৃত্তি ও কথনশিল্পের প্রশিক্ষক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। রচিত গ্রন্থ: 'বাংলা উচ্চারণ অভিধান', 'প্রসঙ্গ বাংলাভাষা', 'প্রসঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি', 'ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব', 'কাব্যতত্ত্ব অন্বেষা', 'অলঙ্কার অন্বেষা', 'বাংলা উচ্চারণ সূত্র', 'বাংলা উচ্চারণ তত্ত্ব ও প্রয়োগবিধি তত্ত্ব' প্রভৃতি। নাটক: 'নিহত কুশীলব', 'রৌদ্রদিন', 'ক্রুশবিদ্ধ যীশু', 'তামসীর ফাঁসি' প্রভৃতি। 'প্রিয় পঙ্‌ক্তিমালা' ও 'উচ্চারণ শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতামালা ক্যাসেট দু'টি এছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ২০টি ক্যাসেট প্রকাশিত। 'ঐতিহ্যের অঙ্গীকারে' শিরোনামে ১৩টি ক্যাসেটগুচ্ছের জন্য 'শব্দরূপ' সংগঠনের পরিচালক হিসেবে ১৯৯৪-এ কলকাতার 'আনন্দ পুরস্কার'-এ ভূষিত। মৃত্যু: ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ১৯৯৮।

নরেন দত্ত, ক্যাপ্টেন (১৮৮৪-১৯৪৯)॥ জন্ম.



শ্রীকাইল গ্রাম, কুমিল্লা, ১৮৮৪। চিকিৎসক, সমাজসেবক। দরিদ্র স্কুল শিক্ষক কৃষ্ণকুমার দত্ত তাঁর পিতা। ছয় বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ। ক্ষেতমজুরি ও মুদির দোকানে কাজ করে এবং টিউশনি ও শাক-সবজি বিক্রি করে শিক্ষার খরচ যোগাড়। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে এফ.এ. পাস। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. ডিগ্রি লাভ। মেডিক্যাল কলেজের পড়ার খরচ চালাবার জন্য খিদিরপুর ডকে রাতে ডক-কুলির কাজ করতেন, কলেজের অধ্যক্ষ কালভার্ট সাহেব নরেন দত্তের এই উদ্যম ও কষ্টসহিষ্ণুতার কথা জানতে পেরে তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেন এবং ডাক্তারি পাস করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই সুপারিশে প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) চলাকালে

ইমার্জেন্সি কমিশন পেয়ে আই. এম.এফ.-এ চাকরি লাভ। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সৈনিক ইউনিতে দীর্ঘদিন কাজ করার পর দেশে প্রত্যাবর্তন। সাংগঠনিক দক্ষতার জোরে ১৯২৩-১৯২৪-এ নানা সংকটজনক অবস্থা থেকে 'বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি'কে রক্ষা করে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা। এছাড়া র‍্যাডিকেল লাইফ ইন্সিওরেন্স, ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও ভারতীয় প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কোম্পানি গঠন। শ্রীকাইল কলেজ প্রতিষ্ঠা। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সহায়তা প্রদান। মৃত্যু. ৬ এপ্রিল ১৯৪৯।

নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১)॥ জন্ম. ঠনঠনিয়া, কলকাতা, ৭ জুলাই ১৮৮৮। কবি, ঔপন্যাসিক ও শিশুসাহিত্যিক। মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে মেট্রিক পাস। ছাত্রাবস্থায় গুপ্ত বিপ্লবীদলে যোগদান। পরে সাহিত্য ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ। 'প্রবাহিনী' পত্রিকায় প্রথম রচনা 'অভিমন্যু বধ কাব্য' প্রকাশিত। রচিত প্রথম গল্প 'চতুর্বেদাশ্রম', প্রথম উপন্যাস 'গরমিল' ও প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'বসুন্ধরা'। বাংলা সাহিত্যে 'ভারতী', 'কল্লোল' ও 'কৃত্তিবাস' এ-তিন যুগের লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম। পত্রিকার সম্পাদকরূপেও খ্যাতিমান। ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'পাঠশালা' ১৯৩৬ থেকে দীর্ঘ পনেরো বছর সম্পাদনা। সাপ্তাহিক 'নাচঘর' ও প্রথম চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক 'বায়োস্কোপ' সম্পাদনা ও পরিচালনা। রচিত অন্যান্য উপন্যাসঃ যাদুঘর (১৯৩০), আকাশ কুসুম, মানুষের মন। গল্পগ্রন্থঃ বোঝাপড়া (১৯২০), সুহাসিনী (১৯৩৮)। কিশোরপাঠ্য গ্রন্থঃ অনেক দিনের কথা, আনন্দমেলা। ভ্রমণ কাহিনীঃ রাজপুতের দেশে, সাহেব বিবির দেশে। পদ্যে মেঘদূত ও ওমর খৈয়ামের বাংলা তর্জমার (১৯২৬) জন্য সর্বাধিক খ্যাতিমান। শিশুসাহিত্যের জন্য ১৯৬৪-তে মৌচাক পুরস্কার, ১৯৭১-এ শিশির কুমার পুরস্কার এবং ভুবনেশ্বরী স্বর্ণপদক লাভ। দু'বার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি, বেঙ্গল পি.ই.এন. শিশুসাহিত্য পরিষদ ও শরৎ সাহিত্য পরিষদের সভাপতিরূপেও দায়িত্ব পালন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা প্রভাষক বোর্ডের সদস্য ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মৃত্যু. ১৯ এপ্রিল ১৯৭১।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫)॥ জন্ম. সদরদি গ্রাম, ফরিদপুর, ৩০ জানুয়ারি ১৯১৬ কথাশিল্পী। স্থানীয় ভাঙ্গা হাইস্কুল থেকে ১৯৩৩-এ মেট্রিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে



১৯৩৫-এ আই.এ. পাস। ১৯৩৯-এ কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ। বেশ কিছুকাল গৃহশিক্ষকতা করে জীবিকা নির্বাহ। এ সময়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গ লাভ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে চেকারের কাজে নিযুক্ত। যুদ্ধ শেষে কলকাতায় ন্যাশন্যাল ব্যাংকে যোগদান। পরে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। 'দৈনিক কৃষক', 'সত্যযুগ' প্রভৃতি কাগজে কাজ করে ১৯৫০-এ 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই পত্রিকায় সাংবাদিকতা। ১৯৪৭-এ ভারত বিভাগের পর স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস। প্রথম কবিতা 'মুক' প্রকাশিত ১৯৩৬-এ 'দেশ' পত্রিকায়। ২/৩ বছরের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একত্রে 'জোনাকি' কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ। 'নিরিবিলি' একমাত্র কবিতাগ্রন্থ। বইয়ের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। গল্পগ্রন্থঃ রস, সন্ধান, চোর, এক পোয়া দুধ, একটি প্রেমের গল্প, পালঙ্ক, দ্বিবচন, শ্বেতময়ূর, চাঁদমিয়া, দ্বৈরথ, সংসার প্রভৃতি। উপন্যাসঃ দ্বীপপুঞ্জ, অসমতল, হলদে বাড়ি, দেহমন, দূরভাষিণী, রূপমঞ্জরী, উল্টোরথ, সুখ-দুখের ঢেউ, শুক্লপক্ষ, চেনা মহল, চড়াই-উৎরাই, তিনদিন তিনরাত্রি, সূর্যসাক্ষী, অসবর্ণা, মহানগর, রূপসজ্জা, হেডমাস্টার, অক্ষরে অক্ষরে, চিলেকোঠা, সন্ধ্যারাগ, উপনগর ইত্যাদি। প্রবন্ধগ্রন্থঃ শিল্পীর স্বাধীনতা, সাহিত্য প্রসঙ্গ, আত্মকথা, ফিরে দেখা, গল্প লেখার গল্প। মহানগর, হেডমাস্টার, পালঙ্ক চলচ্চিত্রে রূপায়িত। হেডমাস্টার ফরাসি ভাষায় ও মহানগর কানাড়ি ও মারাঠি ভাষায় অনূদিত। কবিতা দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও নরেন্দ্রনাথ মিত্র কথাসাহিত্যের সফল লেখক। মধ্যবিত্ত জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা, বিড়ম্বনা ও মূল্যবোধের সংকট তাঁর গল্প-উপন্যাসে দীপ্তভাবে উপস্থাপিত। ছোটগল্প রচনাতেই সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন। বিষয়ে ও রচনারীতিতে তাঁর ছোটগল্প সমুজ্জ্বল। মৃত্যু. কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫।

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী (১৮৮০-১৯৪৩)॥



জন্ম. গাছা গ্রাম, টঙ্গী, গাজীপুর। উদ্যান রচয়িতা। জমিদার মহিমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর পিতা। জয়দেবপুরের বলধার জমিদার হরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী নিঃসন্তান হওয়ায় তৎকর্তৃক নরেন্দ্রনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ (১৮৯৪)। প্রকৃতিপ্রেমিক, সাহিত্য ও সংগীতানুরাগী নরেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক ঢাকার ওয়ারীতে তিন একর জমির ওপর বোটানিক্যাল গার্ডেন 'সাইকী' রচনা (১৯০৯-১৯৩৬)। দ্বিতীয় বাগান 'সিবলি' রচনা (১৯৩৮-১৯৪০)। এ বাগানদ্বয়ই বলধা গার্ডেন নামে খ্যাত। দেশ-বিদেশ থেকে সংগৃহীত ৬৭২ প্রজাতির মোট ১৫হাজার দুর্লভ বৃক্ষরাজি দ্বারা এ উদ্যান রচনা করে প্রকৃতি প্রেমের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন। ১৯২৮-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলধা গার্ডেন পরিদর্শন করে মন্তব্য করেছিলেন: 'বাংলাদেশে অনেক রাজ্য, জমিদার অভিজাতদের প্রাসাদেই তো ঘুরলাম, কিন্তু গাছপালা দিয়ে এমনভাবে সাজানো বাড়ি তো কোথাও দেখিনি। নরেন, কালিকলম দিয়ে সারা জীবন যা করেছি, তুমি গাছপালা দিয়ে তাই করে চলেছ।' বাগান ছাড়াও বলধা ভবনে তৎকর্তৃক একটি আকর্ষণীয় যাদুঘর ও একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রন্থাগার স্থাপন। ১৯৪০-এর জুন মাসে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্ররোচনায় গৃহভৃত্য কর্তৃক তাঁর একমাত্র পুত্র নিহত হলে শোকাক্রান্ত হয়ে বাগান রচনার আগ্রহ ত্যাগ। এর তিন বছর পর ভগ্নহৃদয়ে দেহত্যাগ। বলধা গার্ডেনের পরিচালনার ভার অর্পিত হয় একটি কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের উপর। ১৯৬২-তে বন বিভাগ কর্তৃক এর রক্ষাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ। বলধা গার্ডেন ঢাকার গৌরব ও দর্শনীয় স্থান। মৃত্যু. ঢাকা, ১৩ আগস্ট ১৯৪৩।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪)॥ জন্ম. মাতুলালয়, বগুড়া, ৩ মে ১৮৮২। পৈতৃক নিবাস বাঁশী, টাঙ্গাইল। আইনজীবী ও ঔপন্যাসিক। পিতা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। স্ত্রী লাবণ্য প্রভা। মুঙ্গের জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯৭) এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ. (১৮৯৯) ও বি.এ. (১৯০১) পাস। ১৯০৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে



দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাস। প্রেসিডেন্সি কলেজের সরকারি রিসার্চ স্কলার (১৯০২-১৯০৫)। গবেষণার বিষয় ছিল: 'নব্য জার্মান ও ভারতীয় দর্শন'। ১৯০৬-এ ওকালতি পাস করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। এ সময়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) অংশগ্রহণ এবং কংগ্রেসের একজন সুপরিচিত কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। প্রাচীন ভারতের ব্যবহার ও সমাজনীতি সম্পর্কে গবেষণা করে ১৯১৩-তে এ ডি.এল. ডিগ্রি লাভ। ১৯১৫-তে ঢাকা আইন কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত। ১৯২১-১৯২৪ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন (১৯২১-১৯২৪)। ১৯২৪-এ কলকাতায় পুনরায় ওকালতি শুরু। ১৯২৫-১৯২৬ পর্যন্ত নবগঠিত 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্টস্ পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৩৪-এ 'লেবার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার' প্রেসিডেন্ট। ১৯৫০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৫১-তে আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকায় ইউনেস্কোর এক অধিবেশনে যোগদান। ১৯৫৬-তে ভারতীয় আইন কমিশনের সদস্য নির্বাচিত। আধুনিক বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে সুনাম অর্জন। তাঁর গল্প-উপন্যাস সুপাঠ্য এবং তাতে সাধারণ মানুষের প্রতি সমবেদনা আন্তরিকভাবে অঙ্কিত। যৌনভাবাশ্রিত ক্রিমিনাল মনোবৃত্তি বাংলা উপন্যাসে প্রথম তাঁর হাতেই রূপায়িত। ঢাকায় বাসকালে একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এই গোষ্ঠী গল্প-উপন্যাস-কবিতায় 'বাস্তব' 'বা' আধুনিক ভঙ্গি' চিত্রণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। রচিত উপন্যাস: অগ্নি-সংস্কার (১৯১৯), দ্বিতীয় পক্ষ (১৯১৯), শুভা (১৯২০), শান্তি (১৯২১), পাপের ছাপ (১৯২২), দত্তগিন্নী, কাঁটার ফুল, মিলন পূর্ণিমা, দূরের আলো। রূপের অভিশাপ, ঠানদিদি নরেশচন্দ্রের বিখ্যাত গল্প। এ ছাড়া নাটক ও আইনসংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা। নাটক: আনন্দমন্দির (১৯২৩), ঠকের মেলা (১৯২৫), ঋষির মেয়ে (১৯২৬) ও নারায়ণী (১৯২৯)। Evolution of Law নামে আইনের একখানি

প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা। Abbey of Bliss নামে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ অনুবাদ।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৮৮৮-১৯৪৭)॥ জন্ম. মাতুলালয়, নয়নন্দ গ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি, ১৮৮৮। পৈতৃক নিবাস-পাইকপাড়া গ্রাম, বিক্রমপুর। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক। চার বছর বয়সে পিতৃহীন হলে খুল্লতাত অক্ষয়চন্দ্র কর্তৃক প্রতিপালিত। পাইকপাড়া পাঠশালায়



প্রাথমিক শিক্ষা লাভ। সোনার গাঁয়ের জি. আর. ইনস্টিটিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস (১৯০৫)। ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি। টিউশনি করে উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্বাহ। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯০৭-এ. এফ.এ. ১৯০৯-এ ডিস্টিংশনসহ বি.এ. এবং ১৯১২-তে ইতিহাসে এম.এ. (তৃতীয় শ্রেণি) ডিগ্রি লাভ। চাকরির সন্ধানে কলকাতায় গমন। চাকরির ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়ে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য 'ভারতে মূর্তি পূজার ইতিহাস' শীর্ষক গবেষণা-প্রবন্ধ রচনা; কিন্তু বৃত্তি লাভে ব্যর্থ হন। এরপর 'A Forgotten Kingdom of Eastern Bengal' শিরোনামে আর একটি প্রবন্ধ রচনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই প্রবন্ধটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করে মুগ্ধ হন। ঢাকা যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হলে, ১৯১৪-এর জুলাই মাসে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুপারিশের ভিত্তিতে এর কিউরেটর হিসেবে নিযুক্তি লাভ। আজীবন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত। বাংলাদেশের পুরাকীর্তি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণায় অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন। 'Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of BengalÕ (১৯২২) গ্রন্থের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ (১৯২২)। মুদ্রাতত্ত্ব ও মূর্তিতত্ত্বের গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ (১৯৩৪)। 'Iconography of Buddhist & Brahmanical Sculptures in Dhaka Museum'(1929). ÔCatalogue of Coins of Syed A. S. M. Taifoor, DhakaÕ (1936) ÔCatalogue of Coins of Hakim Habibur Rahman khanÕ (1936) তাঁর অন্যান্য গবেষণামূলক গ্রন্থ। সম্পাদনা শুকুর মোহাম্মদ বিরচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' (১৯২৫), কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণের 'আদিকাণ্ড' (১৯৩৬), কবি ভবানীদাস বিরচিত 'ময়নামতীর গান' (১৯১৪) ও 'মীনচেতন' (১৯১৫)। কবিতা, গল্প ও নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন। 'হাসি ও অশ্রু' (১৯১৫) তাঁর গল্পগ্রন্থ। 'বীর বিক্রম' (ইবসেনের Warriors of Heligoland নাটকের বাংলা ভাষান্তর, ১৯১৫), তাঁর অনূদিত নাটক। 'মূর্খ শতক' (১৯৪৩) তাঁর রচিত কবিতা-কবিতা-গ্রন্থ। বহু স্কুল-পাঠ্য পুস্তক রচনা। তার মধ্যে 'প্রবেশিকা ভারত ইতিহাস' (১৯৩৭), 'প্রাথমিক ইংল্যান্ডের ইতিহাস' (১৯৩৭) উল্লেখযোগ্য। তিনি স্মরণীয় বাঙালিদের মধ্যে অন্যতম। ইতিহাসের গবেষণায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ঢাকা যাদুঘরের প্রতিষ্ঠা ও দক্ষ পরিচালনা তাঁর অনন্য কীর্তি। মৃত্যু. ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭।

নলিনী দাস (১৯১০-১৯৮২)॥ জন্ম. ভোলা, ১ জানুয়ারি ১৯১০। বিপ্লবী, স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক। ১৯২৮-এ ভোলা সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাস করে বরিশাল বি. এম. কলেজ আই.এসসি. ক্লাসে ভর্তি। পরীক্ষার পূর্বে কলকাতা মেছুয়া



বাজার হাঙ্গামার মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলে আত্মগোপন। ১৯২১-এ কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির আহবানে পালিত হরতালে অংশগ্রহণ। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে হরতালে অংশগ্রহণের দায়ে গ্রেপ্তার। ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার। মামলায় খালাস পেলেও তৎকালীন সরকার-কর্তৃক 'ডেটিনিউ' করে প্রেসিডেন্সি জেলে প্রেরণ। ১৯৩১-এ হিজলী ক্যাম্পে আটক। সে বছর ডিসেম্বর মাসে হিজলী জেল থেকে পলায়ন। বরিশাল, কলকাতা ও চন্দননগরের বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ১৯৩২-এ চন্দননগর পুলিশ কর্তৃক তাঁর বাসস্থান

ঘেরাও। তাঁর সঙ্গে তখন ছিলেন টেগার্ট হত্যা মামলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি দীনেশ মজুমদার এবং মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পলাতক ও ওয়াটসন হত্যা প্রচেষ্টা মামলার আসামি বীরেন রায়। এ-তিন বিপ্লবীর সঙ্গে চার ঘণ্টা ধরে পুলিশের সঙ্গে গুলিবিনিময়। আহত অবস্থায় নলিনী দাসের পলায়ন। ১৯৩৩-এর জুন মাসে কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে নলিনী দাস, দীনেশ মজুমদার ও শ্রীজগদানন্দ মুখার্জি আগ্নেয়াস্ত্রসহ পুলিশের সঙ্গে গুলিবিনিময়রত অবস্থায় ধৃত। বিচারে দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি হয়। নলিনী দাস ও জগদানন্দকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ। এ সময়েই কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত। ভারতব্যাপী আন্দোলনের মুখে ১৯৩৮-এর ১৯ জানুয়ারি আন্দামান থেকে কলকাতায় আনীত। ১৯৩৮-১৯৪৬ পর্যন্ত সব রাজবন্দীকে মুক্তি দেয়া হলেও নলিনীদাসসহ ৩০ জন রাজবন্দীকে 'ভয়ানক বিপ্লবী ব্যক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করে আটক রাখা হয়। ১৯৪৬-এ কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালে জেলে বসেই দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন। ১৯৪৬-এ এর ৩০ সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ। ১৯৫০-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ কালে এক মিথ্যা মামলায় ১০ বছর করাদণ্ড প্রদান। হাইকোর্ট থেকে মুক্তি পেলেও জেল গেটে পুনরায় গ্রেপ্তার। ১৯৫৫ পর্যন্ত বিনাবিচারে রাজবন্দী হিসেবে আটক। এরপর মুক্তিলাভ, কিন্তু পুনরায় গ্রেপ্তার। ১৯৫৬-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্দী জীবনযাপন। ১৯৫৬-এর শেষের দিকে পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক মুক্তি প্রদান। ১৯৫৮-তে আইয়ুব সরকার-কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি। আত্মগোপন অবস্থায় বরিশালের গ্রামে গ্রামে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ। সত্তর বছরের জীবনে তেইশ বছর আন্দামান, ব্রিটিশ-ভারতীয় জেলে ও পাকিস্তানের কারাগারে অতিবাহিত কুড়ি বছর নয় মাস কেটেছে পলাতক অবস্থায়। জনগণের কল্যাণে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দুর্গামোহন ট্রাস্টের নিকট প্রদান। রচিত গ্রন্থ: স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী। মৃত্যু. ১৯ জুন ১৯৮২।

নলিনীরঞ্জন সরকার (১৮৮২-১৯৫০)॥ জন্ম. সাজিউরাগ্রাম, নেত্রকোণ, ১৮৮২। অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ। ১৯০২-এ ময়মনসিংহ সিটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে অধ্যয়ন। পরে কলকাতায় এসে স্বদেশি আন্দোলনের



স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ শুরু। ১৯১১-তে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটিতে চাকরি গ্রহণ। তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার গুণে নানা সমস্যার আক্রান্ত ইন্সিওরেন্স সোসাইটিটি ধীরে ধীরে সংকট কাটিয়ে ওঠে এবং তিনি সোসাইটির পূর্ণ কর্তৃত্বে বহাল হন। ১৯২৩-এ স্বরাজ্য পার্টির সমর্থন পেয়ে ময়মনসিংহ থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত। পার্টির সংসদীয় দলের চিফ হুইপ ও কর্মসচিব পদে দায়িত্ব পালন। ১৯২৮ পর্যন্ত স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে যুক্ত। ১৯২৮-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন। ১৯৩১-এ বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সহসভাপতি নির্বাচিত। পরে এর সভাপতির পদ লাভ এবং ১৯৩৫ পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৩২-এ কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত। ১৯৩৫-মেয়র এবং সর্বভারতীয় বণিক সভা বা ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৩৭-এ এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত বঙ্গীয় সরকারের মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত। রাজবন্দীদের মুক্তি ও সেজন্যে গান্ধীজীর সঙ্গে তৎকালীন বাংলা সরকারের প্রত্যক্ষ আলোচনার ব্যবস্থা এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্যে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সমান চাকরির হার নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। ১৯৩৯-এ বাংলা সরকারের যুদ্ধনীতির বিরোধিতা এবং সরকারিনীতির প্রতিবাদে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ। ১৯৪১-এ বড়লাটের কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন। ১৯৪৩-এ বাণিজ্য ও খাদ্যমন্ত্রী নিযুক্ত এ সময়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন। এ বছর গান্ধীজীর অনশন সম্পর্কে সরকারি নীতির প্রতিবাদে মন্ত্রীপদ ত্যাগ। ১৯৪৮এর ২৬ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত ১৯৪৯-এর জুন-জুলাই মাসে অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী। মৃত্যু. ২৫ জানুয়ারি ১৯৫০।

নসরুল্লাহ্ খাঁ (১৫৬০-১৬২৫)॥ ফতেখাঁর কূল, রামু, কক্সবাজার, ১৫৬০ (আনুমানিক) কবি। পিতা মনসুর খাঁ খোন্দকার, পিতামহ কাজী ইসহাক খাঁ। রামু অঞ্চলের নরপতি ফতেহ্ খাঁর মাধ্যমে কবির পিতা সম্মানিত। পিতামহ নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ও গুণী। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কাব্যরচনা। উত্তরাধিকার নেই। রচিত চারখানা কাব্য: 'জঙ্গনামা', 'মুসার সোয়াল', 'শরীয়ৎনামা', 'হিদায়িতুল ইসলাম'। ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর কাব্যকীর্তি সম্পাদনা করেছেন। মৃত্যু. ১৬২৫ (আনুমানিক)।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী (১৯৪০-১৯৮৯)॥ জন্ম. কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ১৯৪০। পৈতৃক নিবাস টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। গবেষক ও লেখিকা। গোয়েন্দা পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তা গোলাম সারোয়ার তাঁর পিতা। প্রখ্যাত বামপন্থি লেখক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর স্বামী। রাজশাহী পি.এন. বালিকা বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক (১৯৫৫), রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৫৭), ঢাকা সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৫৯) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. (১৯৬১) পাস ঢাকা সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের বাংলা বিভাগে প্রভাষক (১৯৬১-১৯৭৫)। ১৯৭৫-এ অধ্যাপনার কর্ম পরিত্যাগ। বাংলা একাডেমীর বৃত্তিধারী গবেষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা। এই অভিসন্দর্ভের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ (১৯৭৯)। ১৯৮৪-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের বাংলার প্রভাষক নিযুক্ত। ঢাকার শিশু-কিশোর নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। তৎকর্তৃক ঢাকা লিটল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা (১৯৭৮)। গবেষক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় তাঁর লেখা সমৃদ্ধ। বাংলা উপন্যাসের রাজনৈতিক ধারাকে মার্কসীয় দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে খ্যাতি অর্জন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: গবেষণা-প্রবন্ধ–বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি (১৯৮০), সাহিত্যের সামাজিকতা (১৯৮৫); উপন্যাস–সামনে সময় (১৯৮১), ঘরের ছায়া (১৯৮৪); গল্প অন্য নায়ক (১৯৮৫), বাড়ি থেকে পালিয়ে (১৯৮৭), মেঘ কেটে গেলে (১৯৮৮), নাটক–ঘুম নেই (১৯৭৯), অন্য রকম অভিযান (১৯৮১), ওরা ছিল বাগানে (১৯৮৯), যেমন খুশি সাজো (১৯৯১)। সম্পাদনা–মোহাম্মদ মোর্তজা রচনাবলি (১৯৮৫)। মৃত্যু. ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।



নাজমুল করিম (১৯২২-১৯৮২)॥ জন্ম. লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ১ আগস্ট ১৯২২। শিক্ষাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী। পৈতৃক নিবাস ফাল্গুনকরা গ্রাম, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। পিতা স্কুল ইন্সপেক্টর আবু রশিদ নিজামউদ্দিন আহমেদ। স্ত্রী অধ্যক্ষা জাহানারা। ঠাকুরগাঁও হাই স্কুল থেকে ১৯৩৯-এ প্রথম বিভাগে মেট্রিক, ১৯৪১-এ ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. ১৯৪৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. (অনার্স) ও ১৯৪৬-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৯৫৩-তে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকার ও সমাজবিজ্ঞান এ দুটি বিষয়ে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন। ১৯৬৪-তে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। গবেষণার বিষয় ছিল: The Muslim Political Elite in Bengal। কর্মজীবনে ১৯৪৬-১৯৪৮ পর্যন্ত ফেনী কলেজে ও ১৯৪৮-১৯৫০ পর্যন্ত ঢাকা কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক। ১৯৫০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক নিযুক্ত ১৯৫৬-এ রিডার পদে উন্নীত। তাঁর চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনেস্কোর যৌথ সহযোগিতায় ১৯৫৭-এর ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রবর্তন। এই নতুন বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ। বত্রিশ বছর রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা। ১৯৮২-র ১৫ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ। রচিত গ্রন্থ: The Dynamics of



Bangladesh Society ও The Changing Society of India. Pakistan and Bangladesh. 'সমাজ-সমীক্ষণ' (১৯৭২) নামে একটি পাঠ্য বই রচনা। দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকায় সমাজতত্ত্ববিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিতি। বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানচর্চায় পথিকৃতের দায়িত্ব পালন। ১৯৫৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান মিউজিয়াম তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানের ভাবাদর্শের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ। সেজন্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেন নি। মৃত্যু. ঢাকা. ১৮ নভেম্বর ১৯৮২।

নাজিম মাহমুদ (১৯৩৫-১৯৯৮)॥ জন্ম. টোনা



গ্রাম, লোহাগড়া, নড়াইল, ১৭ নভেম্বর ১৯৩৫। মাতা রওশন আরা বেগম, পিতা আইনজীবী আবদুল হাকিম পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার স্পিকার ছিলেন। স্ত্রী জেবুন্নিসা। আবৃত্তিকার, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক; খুলনার বি কে স্কুল থেকে ১৯৫১-এ মেট্রিক, জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৫৩-এ আই.এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭-এ ইংরেজি বিভাগ থেকে বি.এ. (অনার্স) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬১-এ এম.এ. পাস। কর্মজীবন শুরু কলেজের অধ্যাপনা দিয়ে। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা। পদোন্নতি পেয়ে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে বহাল ছিলেন। ১৯৯২ থেকে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৫-এ র ৩০ সেপ্টেম্বর অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর খুলনায় তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'অগ্রণী শিল্পী সংঘ'। যৌবনের উষালগ্নে খুলনা ও ঢাকার 'অগ্রণী শিল্পী সংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন। পরিণত যৌবনে ১৯৬৩-এ র শুরুতে খুলনায় সন্দীপন নামের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮১-এ র ২০ সেপ্টেম্বর আবৃত্তি সংগঠন 'স্বনন' প্রতিষ্ঠা। স্বৈরাচার এরশাদ শাহীর আমলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮২ ও ১৯৮৪-এ দুইবার রবীন্দ্রমেলা আয়োজনের কৃতিত্ব তাঁর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা গড়ে তোলার প্রস্তাবক। মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য 'সাবাস বাংলাদেশ', রাজশাহী আর্ট কলেজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ—চেতনার সৈকতে (গণসংগীত, ১৩৭৫), যখন ক্রীতদাস: স্মৃতি '৭১ (স্মৃতিকথা, ১৯৯০), ভালবাসার কথা (কাব্য, ১৯৮৯), উজির ঘোড়ার গপ্পো (অনুবাদ নাটক, ১৯৯০)। সম্পাদনা গ্রন্থ—চির নতুনের ডাক (১৯৮৮), বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি (রবীন্দ্রসংগীত মেলার আলোচনাচক্র, ১৩৯১)। খুলনা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকা 'দি ওয়েভ'-এর সম্পাদক ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। মৃত্যু. ঢাকা, ১৭ মে ১৯৯৮।

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান (১৯০৬-১৯৮২)॥ জন্ম. বগুড়া, ১৯০৬। লেখক ও শিক্ষাবিদ। সরকারি কলেজে অধ্যাপনা ও পরে রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ-উপন্যাস: জীবনের জয়যাত্রা, দুর্বিপাক। গল্প: সোনালী স্বপন, পয়সা, স্বর্গীয় পলিটিকস। ভ্রমণ কাহিনী: দূরে দূরান্তরে, গ্রেট ব্রিটেন। বিবিধ: শিশুমানস বিজ্ঞান। গবেষণামূলক গ্রন্থ: বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। এ ছাড়া শিক্ষা বিষয়ে কিছু ইংরেজি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা। নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান গল্প উপন্যাস রচনা করলেও গবেষণাধর্মী রচনার জন্যেই তাঁর খ্যাতি সমধিক। মৃত্যু. ২৩ আগস্ট ১৯৮২।

নাজীর আহমদ (১৯২৫-১৯৯০)॥ জন্ম. আশেক



লেন, ইসলামপুর-ঢাকা, ১৯২৫। বেতার ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতিসেবী; ঢাকার বিখ্যাত 'মীর্জা পরিবারের' সন্তান। ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি শিল্পী হামিদুর রহমানের ভ্রাতা। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিক, জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এসসি. ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. পাস। অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রে ঘোষক হিসেবে নিযুক্তি লাভ (১৯৪৯)। এই কেন্দ্রের বাংলা

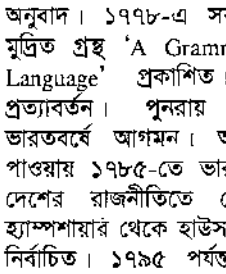
ভাষার প্রথম মুসলমান ঘোষক। ১৯৪৬-এ ঢাকা বেতারকেন্দ্রে যোগদান। ১৯৪৭-এর আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে ঐ দিন রাত বারোটায় তাঁর কণ্ঠেই প্রথম ঘোষিত হয় 'পাকিস্তান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস, ঢাকা'। এ সময়ে গান, গীতিনকশা ও নাটক রচনা করে ঢাকা বেতারের শূন্যতা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন। ১৯৪৮-এর মার্চে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের উপর ভিত্তি করে তৎকর্তৃক নির্মিত হয় এ দেশের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র 'ইন আওয়ার মিডস্ট' (১৯৪৮)। ১৯৪৯-এ পূর্ববঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রযোজক হিসেবে বিবিসি'তে যোগদান। তৎকর্তৃক পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্যে বিবিসি'র বাংলা অনুষ্ঠান 'আঞ্জুমান' চালু। পূর্ববঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৫৩-তে লন্ডন থেকে ঢাকায় ফিরে এসে সরকারের জনসংযোগ বিভাগের চলচ্চিত্র ইউনিটের প্রধান পদে যোগদান। ঢাকায় স্থায়ী চলচ্চিত্র স্টুডিও (১৯৫৫), চলচ্চিত্র ল্যাবরেটরি (১৯৫৬) ও এফডিসি (১৯৫৭) প্রতিষ্ঠায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। তাঁর নির্মিত 'সালামত' (১৯৫৪) প্রামাণ্য চিত্রটি পূর্ববাংলার চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মাইল-ফলক হিসেবে বিবেচিত। ১৯৬২-১৯৬৫ পর্যন্ত জার্মান, লন্ডন ও করাচিতে বাস। ১৯৬৫-র মার্চে বিবিসি'র বাংলা বিভাগে পুনরায় যোগদান ; ১৯৬৭-র জুলাই পর্যন্ত এখানে দায়িত্ব পালন। ১৯৬৭-১৯৭১ পর্যন্ত করাচিতে ব্যবসায়। ১৯৭২-এ করাচি ছেড়ে লন্ডন গমন ; সেখানে একটি উঁচু মানের মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন। মঞ্চাভিনয়ে দক্ষতা প্রদর্শন। চল্লিশের দশকে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের চরিত্রে ও 'নার্সিং হোম' নাটকে বিক্রমাদিত্যের চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন। গান, কবিতা, নাটক, গল্প ও প্রবন্ধের রচয়িতা হিসেবেও পরিচিতি লাভ। মৃত্যু. লন্ডন, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০।

নাথিনিয়েল ব্রাশি হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩০)॥ জন্ম. ওয়েস্টমিনিস্টার, অক্সফোর্ড শায়ার, লন্ডন, ২৫ মে ১৭৫১। বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচয়িতা। হ্যারো পাবলিক স্কুল ও অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে শিক্ষা লাভ। ১৭৭২-এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে মুহুরির চাকরি লাভ। ঐ বছর নভেম্বরে কলকাতা আগমন। ছাত্রাবস্থায় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ উইলিয়াম জোনসের প্রভাবে আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষা। ১৭৭৪-এর ডিসেম্বরে কলকাতার 'কোর্ট অফ রিকোয়েস্ট'-এ



কমিশনারের চাকরি প্রত্যাখ্যান। ১৭৭৫-এর শেষের দিকে সুপ্রিম কোর্টে দোভাষীর কাজ করেন। ভারতের তৎকালীন বড় লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের উপদেশে ১৭৭৬-এ হিন্দু আইনের সংক্ষিপ্তসার 'A Code of Gentoo Laws' অনুবাদ। ১৭৭৮-এ সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ 'A Grammar of the Bengal Language' প্রকাশিত। এরপর ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন। পুনরায় ১৭৮৪-তে সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আগমন। আশানুরূপ চাকরি না পাওয়ায় ১৭৮৫-তে ভারতবর্ষ ত্যাগ। এরপর দেশের রাজনীতিতে যোগদান। ১৭৯১-তে হ্যাম্পশায়ার থেকে হাউস অব কমন্স-এর সদস্য নির্বাচিত। ১৭৯৫ পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য। ১৮০৯-এ বন্ধু হেস্টিংসের সুপারিশক্রমে লন্ডনস্থ ইন্ডিয়া অফিসে চাকরি লাভ। শেষ জীবনে সম্পূর্ণ বধির হয়ে যান। অবসর মুহূর্তে কবিতা লিখতেন। 'মর্নিং ক্রনিকল'-এ বহু রচনা প্রকাশিত। মৃত্যু. ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)॥ জন্ম.



বালিয়াডাঙ্গি গ্রাম, দিনাজপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮। পৈতৃক নিবাস বাসুদেবপাড়া গ্রাম, বরিশাল। কথাসাহিত্যিক। পুলিশ অফিসার (দারোগা) প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পিতা। পিতৃদত্ত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যিক নাম। দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ. ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি.এ. পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯৪১)। ১৯৪২-১৯৪৬ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি কলেজে ও

১৯৪৬-১৯৫৭ পর্যন্ত কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনা। ১৯৫৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান। 'সাহিত্যে ছোটগল্প' বিষয়ক অভিসন্দর্ভ রচনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ (১৯৬০)। ১৯৬৭-তে রিডার পদে উন্নীত। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। বাংলার নিসর্গ ও নদ-নদীর প্রখর তরঙ্গমালা, বাঙালির আদিম ও আরণ্যক জীবন তাঁর উপন্যাসে রোমান্টিকতার নিরিখে মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত। ইতিহাসবোধ ও স্বাদেশিকতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার উপজীব্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: **উপনিবেশ** (১ম খণ্ড-১৯৪৪, ২য় খণ্ড-১৯৪৫ ও ৩য় খণ্ড-১৯৪৭), **সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী** (১৯৪৪), **মন্ত্রমুখর** (১৯৪৫), **মহানন্দা** (১৯৪৬), **স্বর্ণসীতা** (১৯৪৬), **ট্রফি** (১৯৪৯), **শিলালিপি** (১৯৪৯), **লালমাটি** (১৯৫১), **কৃষ্ণপক্ষ** (১৯৫১), **পদসঞ্চার** (১৯৫৫), **বৈতালিক** (১৯৫৫), **অসিধারা** (১৯৫৭), **ভাটিয়ালী** (১৯৫৭), **বিদূষক** (১৯৫৯), **অমাবস্যার গান** (১৯৬৫) ইত্যাদি। শক্তিমান ছোটগল্পকারও। নাটকীয় ব্যঞ্জনায় তাঁর ছোটগল্প সমৃদ্ধ। **স্বনির্বাচিত গল্প** (১৯৫৪), **শ্রেষ্ঠ গল্প** (১৯৫৫), **গল্প সংগ্রহ** (১৯৫৭), **সাপের মাথায় মণি** (১৯৫৯) প্রভৃতি তাঁর গল্প সংকলন। নাটক: **রামমোহন** (১৯৫২), **ভাড়াটে চাই** (১৯৬২), **আগন্তুক** ইত্যাদি। ব্যঙ্গরচনা: **সুনন্দার জার্নাল** (১৯৬৬)। প্রবন্ধ: **সাহিত্যে ছোটগল্প**, **বাংলাসাহিত্য পরিচয়** (১৯৫৬), **বাংলা গল্পবিচিত্র** (১৯৫৮), **কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ** (১৯৬৫), **ছোটগল্পের সীমারেখা** (১৯৬৯) ইত্যাদি। মৃত্যু. ৬ নভেম্বর ১৯৭০।

নারায়ণ দেব (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী)॥ আনুমানিক জীবনকাল পনের শতকের শেষভাগ থেকে ষোল শতকের মাঝামাঝি। পূর্ববঙ্গের প্রাচীনতম মনসামঙ্গল রচয়িতাদের অন্যতম কবি। কায়স্থভূক্ত সম্প্রদায়। পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক রাঢ় থেকে এসে কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত বোর গ্রামে বসতি স্থাপন। তাঁর রচিত 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যখানি আসাম অঞ্চলে পাওয়া যায়। অসমীয়দের মতে নারায়ণ দেব আসামের দরঙ্গরাজ্যের সভাকবি। উপাধি ছিল 'কবিবল্লভ'। কবির পদ্মাপুরাণ চাঁদ সদাগরের উপাখ্যান অবলম্বনে তিন খণ্ডে রচিত। তাঁর নামে 'কালিকা পুরাণের' একটি পুঁথিও পাওয়া যায়।

নিজামুদ্দীন আহমদ (১৯২৯-১৯৭১)॥ মাওয়া গ্রাম, বিক্রমপুর-মুন্সীগঞ্জ, ১৯২৯। শহীদ সাংবাদিক। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ। স্থানীয় কাজীর পাগলা অভয়কুমার তালুকদার স্কুল থেকে মেট্রিক ও মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ থেকে আই.এ. পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২-তে অর্থনীতিতে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ। ছাত্রজীবন থেকেই সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত। লাহোরের সিভিল ও মিলিটারি গেজেট, ঢাকায় দৈনিক মিল্লাত, সাবেক এ. পি. পি. প্রভৃতি পত্রিকা ও সংবাদ সংস্থায় সাংবাদিকতা। ১৯৫৯-এ তদানীন্তন 'পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল' সংস্থায় যোগদান। তাঁর প্রচেষ্টায় ঢাকায় এই সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ সংস্থার শাখা দপ্তর স্থাপিত। কালক্রমে এর সম্পাদক নিযুক্ত এবং ১৯৬৯ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জেনারেল ম্যানেজার। ইউ. পি. আই. বি. বি. সি. এবং অ্যাসোসিয়েটে প্রেস অব আমেরিকার ঢাকাস্থ সংবাদদাতা। এ ছাড়া যক্ষ্মা সমিতি, কেন্দ্রীয় পাট বোর্ড, সেন্সর বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সদস্য। কলেজে পাঠকালেই ছাত্রনেতা হিসেবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। ১৯৬৫-তে ক্ষমতাসীন কনভেনশন মুসলিম লীগের মনোনয়নে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে পশ্চিম বিক্রমপুর থেকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে সমস্ত বিদেশি সাংবাদিক অধিকৃত বাংলাদেশে (পূর্ব-পাকিস্তান) আগমন করতেন তাঁদের কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস কার্যকলাপের সংবাদ কৌশলে সরবরাহ। এ ছাড়া নিউয়র্ক টাইমস-এর সাংবাদিক মি. ম্যাকস ব্রাউন কে স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রামাণ্য ছবি তোলার জন্যে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যান। কড়া সেন্সরশিপের মধ্যেও গোপনে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ বহির্বিশ্বে সরবরাহ করতেন। ফলে ফরমান আলীর দপ্তরে তাঁকে দু'বার ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় ও ভয় দেখানো হয়। মুক্তিবাহিনীর হাতে



মুন্সীগঞ্জের পতন ঘটলে (৫ ডিসেম্বর ১৯৭১) বি.বি.সি থেকে সেই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র জেনারেল ফরমান আলী-কর্তৃক টেলিফোনযোগে নিজামুদ্দীনকে হুমকি প্রদান। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে ১৯৭১-এর ১২ ডিসেম্বর দুপুর বেলা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর দোসর আলবদরের সদস্যরা তাঁকে তাঁর ঢাকার রোকনপুরের বাসা থেকে ধরে হত্যা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন। সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখায় জন্য বি.বি.সি.-কর্তৃক দীর্ঘ সময়ব্যাপী তাঁর স্মৃতির প্রতিশ্রদ্ধা নিবেদন। সাংবাদিকতায় মরণোত্তর একুশে পদক লাভ (১৯৯৩)। মৃত্যু. ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১।

নিতুন কুণ্ডু (১৯৩৫-২০০৬)॥ জন্ম, দিনাজপুর, ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫। চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও শিল্প-উদ্যোক্তা। পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু। লেখাপড়ায় হাতেখড়ি ১৯৪২-এ স্থানীয় বড়বন্দর পাঠশালায়। ১৯৪৭-এ দিনাজপুর শহরের গিরিজানাথ হাইস্কুলে ভর্তি।



১৯৫২-এ মেট্রিকুলেশন পাস। ছোট্ট বয়সেই ছবি আঁকার প্রতি আকর্ষণ। বাবা শখ করে ছবি আঁকতেন। ছবি আঁকার প্রতি টান থেকেই তিনি আর্ট কলেজে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫৩-এ ঢাকায় আসেন। আর্ট কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তখনও সিনেমা হলগুলোর সামনে বাঁশ বেঁধে তার ওপর উঠে বিরাট বিরাট ছবি আঁকতেন তিনি। ১৯৭১-এ তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাবাস বাংলাদেশ' ঢাকার সার্ক ফোয়ারা এবং চট্টগ্রামের 'সাম্পান' ভাস্কর্যটি ছিল নিতুন কুণ্ডুর নির্মিত। উল্লেখযোগ্য কাজ: ম্যুরাল (পিতল), পাকিস্তান এয়ারলাইন অফিস, হোটেল শেরাটন, ঢাকা; ম্যুরাল (তেল রং) জনতা ব্যাংক, ঢাকা; ম্যুরাল (কাঠ, লোহা, পিতল) মধুমিতা সিনেমা হল, ঢাকা; সাবাস বাংলাদেশ, স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য, রাজশাহী ১৯৯২; সার্ক ফোয়ারা, ঢাকা ১৯৯৩; সাম্পান, চট্টগ্রাম বিমানবন্দর ২০০১; জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটের সম্মুখে ফোয়ারা, স্বাধীনতাযুদ্ধের পোস্টার ডিজাইন ১৯৭১; 'ইন্দিরা মঞ্চ', (স্বাধীনতাযুদ্ধের পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্মিত মঞ্চ), ঢাকা ১৯৭২; বিভিন্ন জাতীয় ট্রফির (প্রতিযোগিতার পুরস্কার) নকশা ও নির্মাণ, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের নতুন কুঁড়ি পুরস্কার, প্রেসিডেন্ট শিশু-কিশোর ফুটবল কাপ, শিল্পমেলা ট্রফি, এশিয়া কাপ ক্রিকেট পুরস্কার, একুশে পদক ও বায়তুল মোকাররম মসজিদের অভ্যন্তরের লাইটিংয়ের কারুকাজ ইত্যাদি। দেশে-বিদেশে অসংখ্য চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ। ১৯৬৫-এ জাতীয় চিত্রকলা পুরস্কার, ১৯৯২-এ বঙ্গবন্ধু পুরস্কার এবং ১৯৯৭-এ একুশে পদক লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৬।

নিধু বাবু রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯)॥ জন্ম. মাতুলালয়, চাপ্তা গ্রাম, হুগলী, ১৭৪১। পৈতৃক নিবাস কলকাতার কুমারটুলি। বাংলায় টপ্পা সংগীতের প্রবর্তক। কলকাতায় এক পাদ্রির কাছে ইংরেজি শিক্ষালাভ। ১৭৭৬-এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে চিরনছাপরায় গমন এবং সেখানে এক মুসলমান গায়কের কাছে হিন্দুস্তানী টপ্পা শিক্ষা গ্রহণ। ১৭৯৪-তে কলকাতায় ফিরে বাংলা টপ্পা গান রচনায় মনোনিবেশ। ১৮০৮-এ সংগীত সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠানে কুলুইচন্দ্র সেন প্রবর্তিত আখড়াই গান সংশোধন করে একটি নতুন ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে সংগীত শিক্ষা প্রদান। বাংলা টপ্পা সংগীতের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ইংরেজি জানা একজন অভিজ্ঞ কবিয়াল। প্রথম স্বাদেশিক সংগীতের রচয়িতা। তাঁর রচিত 'নানান দেশের নানান ভাষা/বিনে স্বদেশি ভাষা মিটে কি আশা' দেশাত্মবোধক এ গানটি তাঁকে অমর করে রেখেছে। ১৮৩২-এ তাঁর রচিত ৯৬টি গান সংবলিত 'গীতরত্ন' সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙালির গান' নামক গ্রন্থে তাঁর রচিত ৪৫০টি গান সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া 'সংগীত রাগ কল্পদ্রুম' নামক গ্রন্থে ১৫০টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিধু বাবুর রচিত টপ্পা গানেই আধুনিক বাঙলা কাব্যের আত্মকেন্দ্রিক লৌকিক প্রণয়ের সুর প্রথম ধ্বনিত। মৃত্যু. ১৮৩৯।

নিবারণ পণ্ডিত (১৯১৫-১৯৮৪)॥ জন্ম, সগড়া গ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ১৯১৫। গণসংগীত রচয়িতা।

স্থানীয় রশিদাবাদ পাঠশালার শিক্ষক ভগবানচন্দ্র পণ্ডিত তাঁর পিতা। কৃষক পরিবারে জন্ম। রশিদাবাদ পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ। কিশোরগঞ্জ হাই স্কুলে ভর্তি। এ স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। পিতৃবিয়োগ এবং কয়েক বছর উপর্যুপরি অজন্মায় ফলে



দারিদ্র্যে পতিত হয়ে স্কুলের পাঠ ত্যাগ। রশিদাবাদ পাঠশালায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। দুই বছর শিক্ষকতা করেও কোনো প্রকার বেতন না পেয়ে এ পেশা পরিত্যাগ। বিড়ির ফ্যাক্টরিতে বিড়ি বাঁধার কাজ গ্রহণ। মালিকের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে এ কাজে ইস্তফা দিয়ে নিজেই বিড়ি বেঁধে তা বিক্রি করে সংসার পরিচালনা। কিছুকাল পর পুঁজি খুইয়ে ব্যবসায় পাততাড়ি গুটিয়ে কিশোরগঞ্জ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল-লেখকের কাজ গ্রহণ। ১৯৩৯-এ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও লতিফাবাদ ইউনিয়ন লেখক সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত। টংক, হাজং ও তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কৃষক-শ্রমিকের শোষণমুক্তির লক্ষ্যে গণসংগীত ও গণকবিতা রচনা। তাঁর 'টংক কথা', 'হাজং আন্দোলনের গান', 'জনযুদ্ধের ডাক' প্রভৃতি গণসংগীত ময়মনসিংহ অঞ্চলে কৃষক সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন। স্বরচিত গান পরিবেশনের জন্যে 'গানের স্কোয়ার্ড' গঠন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে গান রচনা। লীগ সরকারের দমননীতির কবলে পড়ে আত্মগোপন। ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি গ্রেপ্তার। একই বছর ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে মুক্তিলাভ। লীগ সরকারের অত্যাচার ও উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ২৭ ডিসেম্বর (১৯৫০) সঙ্গোপনে সপরিবার কিশোরগঞ্জ ত্যাগ করে ভারত গমন। কোচবিহারের ডাউয়াগুরি গ্রামে বসতবাড়ি নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস। কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুনরায় গানের স্কোয়ার্ড গঠন। ১৯৬৫-তে চীন ও রাশিয়ার আদর্শগত দ্বন্দ্বে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিভক্ত হলে সিপিএম-এর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ১৯৭২-এ বিধান-সভার নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসি সরকার গঠিত হলে রাজনৈতিক নির্যাতন ভোগ। ১৯৭৮-এ ডাউয়াগুড়ি গ্রামসভা নির্বাচনে জয়লাভ। লোকসংগীতের গানগুলো একদিকে যেমন শিল্পগুণে সমৃদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণা ও গণচেতনায় ঋদ্ধ। কঙ্কণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় তাঁর গানের সংকলন 'নিবারণ পণ্ডিতের গান' (১৯৮৬) প্রকাশিত। মৃত্যু. ডাউয়াগুড়ি, ১ নভেম্বর, ১৯৮৪।

নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১)॥ জন্ম. বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৮৮৩। বিচারবিভাগের কৃতী কর্মচারী নফরচন্দ্র ভট্ট তাঁর পিতা। ঔপন্যাসিক। বাল্যজীবন ভাগলপুরে কাটে। সাধারণ শিক্ষালাভের পর পারিবারিক জীবন শুরু। অকাল বৈধব্যের ফলে



সাহিত্য-সাধনাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ। ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে তাঁর অনুপ্রেরণায় ও অনুরূপা দেবীর উৎসাহে উপন্যাস লেখা আরম্ভ। 'উচ্ছৃঙ্খল' তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন। রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: অন্নপূর্ণার মন্দির (১৯১৩), দিদি (১৯১৫), আলেয়া (১৯১৭), বিধিলিপি (১৯১৯), শ্যামলী (১৯১৯), বন্ধু (১৯২১), পরের ছেলে (১৯২৪), দেবত্র (১৯২৭), অনুকর্ষ (১৯৪১)। বিবিধ: আমার ডায়েরী (১৯২৭), যুগান্তরের কথা (১৯৪০)। প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। 'দিদি' নিরুপমা দেবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচিত। ১৯৩৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক 'ভুবন মোহিনী স্বর্ণপদক' ও ১৯৪৩-এ 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান (১৯৩৬-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে (১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে) বর্ধমান সাহিত্য পরিষদ-কর্তৃক সংবর্ধিত। শেষ জীবনে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। এই-সূত্রে বৃন্দাবনে বাস এবং সেখানেই মৃত্যু। মৃত্যু. ৭ জানুয়ারি ১৯৫১।

নির্মলকুমার সেন (১৮৯৮-১৯৩২)॥ জন্ম. কোয়েপাড়া গ্রাম, চট্টগ্রাম, ১৮৯৮। বিপ্লবী। মেট্রিক পাস করার পর ডাক্তারি পড়ার জন্য চট্টগ্রাম এল.এম. স্কুলে ভর্তি। পরে লেখাপড়া

ছেড়ে চট্টগ্রামের গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য হিসেবে যোগদান। ১৯২০-এ বিপ্লবী দলের পক্ষ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য ব্রহ্মদেশে গমন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান। ১৯২৪-এ গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে ৩ বছর কারাগারে আটক



থাকেন। মুক্তিলাভে পর পুনরায় বিপ্লবী দলে সক্রিয় অংশগ্রহণ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন। ১৯৩০-এর ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ করার পর গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য পলায়ন। ১৯৩২-এর ১৩ জুন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী কর্তৃক বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারসহ নির্মল সেনকে ধরার জন্য ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রী চক্রবর্তীর বাড়ি ঘেরাও। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে নির্মল সেনের গুলিবিনিময়ের কালে সূর্য সেন ও প্রীতিলতার পলায়ন। নির্মল সেনের সঙ্গী অপূর্ব সেনের গুলিতে ব্রিটিশ অফিসার ক্যাপ্টেন ক্যামরুন নিহত। সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নির্মল সেনের মৃত্যুবরণ। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ১৩ জুন ১৯৩২।

নির্মলেন্দু চৌধুরী (১৯২২-১৯৮১)॥ জন্ম. বেহেলী গ্রাম, সুনামগঞ্জ, ১৯২২। পল্লীগীতি গায়ক। সিলেটে স্কুল ও কলেজ জীবনে ফুটবল, বাস্কেট বল, ভলিবল খেয়োয়াড় হিসেবে খ্যাতি অর্জন। লোকসংগীতের শিল্পী হিসেবে উত্তরকালে ব্যাপক পরিচিতি লাভ।



সংগীতানুরাগী পিতা-মাতার কাছে বাল্যকালে গান শেখার প্রেরণা লাভ। লোকগীতির প্রতি আকৃষ্ট হন মাঝি-মাল্লার মুখে গান শুনে। তাঁর নিজের ভাষায়: 'লোকসংগীতের সুর, ভাটিয়ালীর টান, এইসব আমার ভিতর লুকিয়েছিল সেই শৈশব থেকে। খুব আবেগপ্রবণ ছিলাম। নদীর শান-বাঁধানো ঘাটে বসে শুনতাম, মাঝ নদী দিয়ে নৌকা নিয়ে যাওয়া গান. সেই গানের জন্য পাগল হতাম। তখনই সেই সুর আমার ভিতরে গেঁথে যায়।' ময়মনসিংহের শিল্পী আবদুল মজিদ ও আবদুর রহিমের কাছে গান ও দোতারা বাদনে শিক্ষা গ্রহণ। শান্তিনিকেতনের অশোকবিজয় রাহার কাছে রবীন্দ্র-সংগীতে তালিম গ্রহণ. গ্রাম বাংলার পল্লীগানকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখেন। প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন এবং ভারতীয় গণ-নাট্যের সঙ্গে যুক্ত। নিপীড়িত মানুষের জন্যে কারাবরণ। রবীন্দ্র ভারতীতে অধ্যাপনা। ওয়ারশ-তে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সম্মেলনে লোকগীতি পরিবেশন করে স্বর্ণপদক লাভ। ছায়াছবি নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ও সংগীত পরিচালক। লং প্লে রেকর্ডে ময়মনসিংহের প্রচলিত 'চাঁদ বিনোদ' (মলুয়া) গীতিনাট্য পরিচালনা। 'এপার বাংলা ওপার বাংলার গান' বইয়ের লেখক। 'লোকভারতী' নামে একটি লোকসংগীত বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু. ১৮ এপ্রিল ১৯৮১।

নির্মলেন্দু লাহিড়ী (১৮৯১-১৯৫০)॥ জন্ম. দিনাজপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১। অভিনেতা। রামতনু লাহিড়ীর বংশধর এবং নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাগিনেয়। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে আই.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। ১৯১২-১৯২১ পর্যন্ত



কলকাতা কর্পোরেশন প্রেসে চাকরি। কৈশোরে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের সংস্পর্শে এসে অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট এবং অভিনয়াদির বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ। সংগীতেও অনুরাগী। গিরিশচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত হন। প্রথমে অপেশাদার নট হিসেবে ওল্ড ক্লাবে শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ বিখ্যাত নাট্যাভিনেতার সঙ্গে অভিনয়ে অংশগ্রহণ। পরে পেশাদার অভিনেতারূপে ম্যাডান থিয়েটারে যোগদান। ১৯২২-এর ১৮ নভেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে প্রথম অভিনয়। ১৯২৪-এ 'পাপের পরিণাম' নামক একটি নির্বাক চলচ্চিত্রে নায়কের ভূমিকা অভিনয়। এরপর 'নিউ মনোমোহন' থিয়েটার নামে একটি ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার পার্টি গঠন। এই পার্টিতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং এক সময়

রেঙ্গুনে নাটক অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন। 'বঙ্গেবর্গী' নাটকে ভাস্কর পণ্ডিত, 'গৈরিক পতাকা' নাটকে শিবাজী এবং 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সিরাজ চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক সুনাম অর্জন। এছাড়া 'কণ্ঠহার' নামক ছায়াছবিতে মধু চাকরের ভূমিকায় সার্থক অভিনয়। ১৯৫০-এর ১৫ জানুয়ারি 'স্বাধীনতা' নাটকে দয়ালের ভূমিকায় শেষ অভিনয়। ১৯৩১-এ 'সারস্বত মহামণ্ডলের পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক 'বাণীবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু. ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০।

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (১৯০৯-১৯৭৩)॥ জন্ম. বাদুড়বাগান, কলকাতা, ২৪ মার্চ ১৯০৯। পৈতৃক নিবাস চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বসিরহাটের শিবহাটি গ্রাম। কবি। পিতৃবন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে বাল্যকাল কাটে শান্তিনিকেতনে।



কৈশোরে অধ্যাত্মভাবের প্রভাবে কাটোয়ায় স্বামী অভয়ানন্দের আশ্রমে কিছুকাল বসবাস। সে সময়ে দীক্ষা নেবার বাসনা প্রকাশ। স্বামীজী অসম্মতি জানালে দেশে প্রত্যাবর্তন, ১৯৩৪ থেকে পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ ঘোষের আশ্রমে বাস। তার আগে গয়া, বুদ্ধগয়া, প্রয়াগ, কাশীধাম প্রভৃতি ধর্মীয় সাধনা-কেন্দ্রে ব্যাপকভাবে তীর্থভ্রমণ। অরবিন্দের আশ্রমে প্রথমে রান্নার কাজ, পরে কিছুদিন আশ্রমের স্কুলে বাংলা ভাষার শিক্ষক। এরপর কাব্য ও শিল্পসাধনায় আত্মনিয়োগ। কিশোর বয়সে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর কাছে ছবি আঁকা শেখেন। তাঁর শিল্প সাধনার অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে অরবিন্দ আশ্রমের আর্ট-গ্যালারিতে ও ডাইনিং রুমের দেয়ালে দেয়ালে। প্রথমে কবিতাগ্রন্থ অলকানন্দার (১৯৪০) জন্য রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ। রচিত কবিতাগ্রন্থ: পঁচিশ প্রদীপ (১৯৪৫), ভোরের পাখি ১৯৪৬), বৈজয়ন্তী (১৯৪৭), দিগন্ত (১৯৫১), বন্দেমাতরম (১৯৪৭), নবদীপন (১৯৫১), দিনের সূর্য (১৯৫১), শিখা শততল (১৯৭৩), লীলায়ন (১৩৮০)। ইংরেজি কবিতাগ্রন্থ Dream Cadences (১৯৪৬)। মৃত্যু. অরবিন্দের আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ২০ মে ১৯৭৩।

নীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬-১৯৬৬)॥ জন্ম. যশোর, ১৮৯৬। শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস। স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পেলেও বিলেতি পোশাক পরে কলেজে আসার শর্ত মানতে না পেরে কাজে যোগদান থেকে বিরত। পরে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনার কর্মে যোগদান। বাংলা ভাষায় শেক্সপীয়রের নাটক মঞ্চস্থ করে সুখ্যাতি অর্জন ও শেক্সপীয়রের ওপর আলোচনার উদ্দেশ্যে কলকাতায় শেক্সপীয়র পরিষদ স্থাপন। ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি, জার্মান ও রুশ ভাষায় অভিজ্ঞ। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসুর ইচ্ছায় মানিকতলা অবৈতনিক শ্রমজীবী নৈশবিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষাদান। প্রথমে গান্ধীবাদে বিশ্বাসী, পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে এসে তাঁর অনুসারী। ১৯২৮-১৯৩০ পর্যন্ত অরবিন্দের দ্বারা প্রভাবিত। এক সময় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। ১৯৪৮-১৯৪৯-এ পার্টির সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় এর সংস্পর্শ ত্যাগ। তবে মার্কসবাদে বিশ্বাস হারাননি। 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সোভিয়েত ইউনিয়নে দু'বছর অবস্থান করে রুশ ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদে কাজ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন। পুনর্বার মস্কো গিয়ে কিছুকাল বাংলা ভাষায় অধ্যাপনা। মস্কোয় বহু শিশুপাঠ্য পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। উল্লেখযোগ্য অনুবাদ-নাটক 'বেলুগিনের বিবাহ'। ১৯৬৬-তে দিল্লির 'ইনস্টিটিউট অব রাশিয়ান কালচার' এর অধ্যাপক নিযুক্ত। তাঁর 'সাহিত্য বীক্ষা' নামক গ্রন্থখানি প্রবন্ধের সংকলন। শেক্সপীয়র সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ' শেক্সপীয়র: হিজ অডিয়েন্স অ্যান্ড হিজ রীডার্স' (১৯৬৫)। অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' ও 'ম্যাকবেথ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেক্সপীয়র পড়ানোর জন্য ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। মৃত্যু. ২৯ অক্টোবর ১৯৬৬।

নীলরতন সরকার, স্যার (১৮৬১-১৯৪৩)॥ জন্ম. নেত্রা গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, ১ অক্টোবর ১৮৬১। আদি নিবাস যশোর। চিকিৎসাবিদ। খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অগ্রজ। ১৮৭৬-এ জয়নগর থেকে প্রবেশিকা পাস। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল



থেকে ডাক্তারি পাস করে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনরূপে কর্মজীবন আরম্ভ। মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে এফ.এ. এবং বি.এ. পাস। কিছুকাল চাতরা হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালন। চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ১৮৮৫-তে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি এবং ১৮৮৮-তে এম. বি. পাস। পরে এম.এ. ও এম.ডি. উপাধি লাভ। চিকিৎসাশাস্ত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন। ১৮৯৩-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত। ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স ও ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের ডিন ও স্নাতকোত্তর কলা, বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগের সভাপতি। ১৯০৮-এ বুক অ্যান্ড ইক্যুইপমেন্টের পরিচালক নিযুক্ত। ১৯১৬-তে রাধাগোবিন্দ কর ও সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সহায়তায় বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ (বর্তমানে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) নামক প্রথম বেসরকারি চিকিৎসাবিদ্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। কিছুকাল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত। ১৯১৯-এ সদস্য পদ ত্যাগ। ১৯১৯-১৯২১ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ১৯১২-১৯২৭ পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। নীলরতন সরকারের স্মৃতি রক্ষার্থে পরবর্তীকালে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলকে 'নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে' রূপান্তর করা হয়। এ দেশে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থার উদ্যোক্তারূপে বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল, যাদবপুর কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মৃত্যু. ১৮ মে ১৯৪৩।

নীলু দাস (১৯৩০-২০০৩)॥ জন্ম. নিচতুলন্দর, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ১৯৩০। পিতা বৈকুণ্ঠ দাস, মাতা সরোজিনী দাস। স্ত্রী বকুলরানী দাস। প্রাথমিক শিক্ষাজীবন কেটেছে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে মাতুলালয়ে। ১৯৫১-এ ঈশ্বরগঞ্জের চরনিখনা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক, ১৯৫৪-এ ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে আই.এ.। ১৯৫৪-এ পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে টেলিগ্রাফিস্ট পদে চাকরি গ্রহণ। স্টেশন মাস্টার হিসেবে অবসর গ্রহণ ১৯৮৯-এ। চাকরিসূত্রে লালমনিরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, মোহনগঞ্জ, ঢাকা, গৌরীপুর, নেত্রকোণা প্রভৃতি অঞ্চলে থাকার অভিজ্ঞতা। ষাটের দশকে 'সমকাল', 'মাহেনও', 'মোহাম্মদী', 'আজাদী', 'সৃজনী', 'পূর্বদেশ', 'মেঘন', 'ময়ূরকণ্ঠ' প্রভৃতি পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। 'চৈতালি কাল' তাঁর বিখ্যাত গল্প। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু মানুষের অসহায়তা ও অসংগতি। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'নীলু দাসের গল্প' (আমিনুর রহমান সুলতান সম্পাদিত, ২০০২)। মৃত্যু. আঠারবাড়ি, ঈশ্বরগঞ্জ, ১০ ডিসেম্বর ২০০৩।



নীলুফার ইয়াসমীন (১৯৪৮-২০০৩)। জন্ম. পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮। ডাকনাম নীলা। পৈতৃক বাস মুকুন্দপুর, সাতক্ষীরা। বাবা অবিভক্ত বাংলার একজন সিভিল সার্ভিস অফিসার। মা মুর্শিদাবাদের স্বনামধন্য ওস্তাদ কাদের বখ্শের ছাত্রী। মায়ের কাছে সংগীতে হাতেখড়ি। বাসায় গ্রামোফোন রেকর্ডপ্লেয়ার ছিল। সংগীতশিক্ষার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায়ও তাঁর ছিলো সমান মনোযোগ। আদমজী কটন মিলস্ স্কুল, বাংলাবাজার গার্লস স্কুল, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ ও সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। ১৯৬৩-এ মেট্রিক। ১৯৬৫-এ ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৬৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে বি.এ. (অনার্স) এবং ১৯৭০-এ এম.এ. পাস। প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার, শিল্পী ও অভিনেতা খান আতাউর রহমানের সঙ্গে ১৯৬৯-এ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পুত্র আগুন কণ্ঠশিল্পী। বড় বোন ফরিদা ইয়াসমীন, মেজো বোন ফওজিয়া খান, সেজো নাজমা ইয়াসমীন হক, সাবিনা ইয়াসমীন প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী। উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখা শুরু ওস্তাদ পি সি গোমেজের কাছে ১৯৬৪-এ। ১৯৮৪ পর্যন্ত উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখেন। তারপর উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ-র সুযোগ্যা ছাত্রী মীরা ব্যানার্জির কাছে তালিম গ্রহণ। এরপর প্রখ্যাত সারেঙ্গী বাদক ওস্তাদ সগীরউদ্দীন খাঁ, মুরশিদাবাদের স্বনামধন্য ওস্তাদ এ দাউদ সাহেব ও প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দীর্ঘকাল তালিম গ্রহণ। আরো পরে প্রখ্যাত



কণ্ঠশিল্পী শেখ লুৎফর রহমান ও সুধীন দাশ-এর কাছে নজরুল-সংগীত শিক্ষা গ্রহণ। উচ্চাঙ্গ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, টপ্পা, ঠুমরি, কীর্তন, রাগপ্রধান,আধুনিক গান-- গানের ভুবনের এসকল শাখাতে অবাধ বিচরণ। ১৯৮৪-এ কলকাতার 'অগ্নিবীণা'-র আমন্ত্রণে কলকাতা গমন করেন। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের আমন্ত্রণে দিল্লি ও কলকাতায় সংগীত পরিবেশন করেন। এ-ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, পাকিস্তান ভ্রমণ করেন এবং সংগীত পরিবেশন করে প্রচুর প্রশংসা অর্জন। শুভদা, অরুণ-বরুন-কিরণমালা, জোয়ার ভাটা, আবার তোরা মানুষ হ, সুজন সখী, যে আগুনে পুড়ি, জীবন-তৃষ্ণা , জলছবি প্রভৃতি ছবিতে কণ্ঠদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের নজরুল সংগীত বিষয়ের শিক্ষক হিসাবে ১৯৯৫ থেকে আমৃত্যু নিয়োজিত। 'সুজন সখী' চলিচ্চত্রে কণ্ঠদানের জন্য ১৯৭৫-এ বাংলাদেশ চলিচ্চত্র সাংবাদিক সংস্থার পুরস্কার, 'শুভদা' চলিচ্চত্রে গানের জন্য ১৯৮৬-এ জাতীয় চলিচ্চত্র পুরস্কার ও বাংলাদেশ চলিচ্চত্র সাংবাদিক সংস্থার পুরস্কার, ২০০৪-এ মরণোত্তর 'একুশে পদক' এবং ২০০৩-এ 'নজরুল পদক' প্রভৃতি। মৃত্যু. ঢাকা, ১০ মার্চ ২০০৩।

নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১)॥ জন্ম. কিশোরগঞ্জ। ১৪ জানুয়ারি ১৯০৩। ইতিহাসবিদ, শিল্প-সাহিত্যের সমালোচক। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ ময়মনসিংহে। বি.এ. পাস সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬-এ ইতিহাসে এম.এ.-তে রেকর্ড মার্কসসহ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। ১৯২৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ ফেলো হিসেবে যোগদান। ১৯২৯-এ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ। ১৯৩৪-এ বিলেত যাত্রা, সেখান থেকে হল্যান্ডে গমন। হল্যান্ডের লাইডেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. ও ডি.ফিল. উপাধি লাভ। ১৯৩৬-এ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক (১৯৪৫-১৯৫৬) এবং



আমেরিকা ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক (১৯৫২-১৯৫৪)। ভারতীয় রাজ্যসভার মনোনীত সদস্যরূপে ১৯৬৫ পর্যন্ত কর্মরত। Times of India সংবাদপত্র গোষ্ঠীর পরিচালক। বাংলার ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ভারতীয় শিল্পকলার একজন বিশেষজ্ঞ। ইংরেজি গ্রন্থ: Brahminical Gods in Burma (1942), Maurya and Sunga Art (1945), An Introduction to Study of Theravada to Buddhism in Burma (1947), Indo-Burmese Art (1947), An Artist in Life, Idea and Image in Indian Art, Mughal Paintings, Metal Sculptures of Bengal, Nationalism in India. বাংলা গ্রন্থ: রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪৩), বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ (১৯৪৫), বাংলা নদনদী (১৯৪০), বাঙালীর ইতিহাস (১৯৪৯), প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন (১৯৪৯), গ্রিফিথ পুরস্কার (১৯৪৮), আশুতোষ স্বর্ণপদক (১৯৪৯) ও সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৬৮) লাভ। ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধি প্রদান (১৯৬২)। বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ (১৯৪৮)। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসে পাণ্ডিত্যের জন্যে সবিশেষ খ্যাতি লাভ। বিশেষত 'বাঙালীর ইতিহাস' নামক গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি তাঁকে ব্যাপক খ্যাতি এনে দেয়। মৃত্যু. কলকাতা, ৩০ আগস্ট ১৯৮১।

নূতনচন্দ্র সিংহ (১৯০০-১৯৭১)॥ জন্ম. গহিরা-রাউজান, চট্টগ্রাম, ১ ডিসেম্বর ১৯০০। কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ছয় বছর বয়সে অক্ষরজ্ঞান অর্জনের জন্য জগৎপুর পূর্ণানন্দ আশ্রমে গমন। আট বছর বয়সে পিতার সঙ্গে বার্মায় যান। সেখানে মুদির দোকানে কাজে নিয়োজিত। এরপর আকিয়াব গমন। তথায় সাবান ও ঔষধ তৈরির ব্যবসায় আরম্ভ। এই ব্যবসায় প্রচুর অর্থোপার্জন। বিহারের কুণ্ডধাম তীর্থ দর্শনের জন্য যান। তীর্থ দর্শন করে দেশে ফিরে কুণ্ডেশ্বরী বিগ্রহ স্থাপন। পরে কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয় নামে একটি আয়ুর্বেদ ঔষধ কারখানা প্রতিষ্ঠা। কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়,



কুণ্ডেশ্বরী মহিলা মহাবিদ্যালয়, কুণ্ডেশ্বরী ভবন, ভজনঘর ইত্যাদির প্রতিষ্ঠাতা। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিমুক্ত একজন মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব। জনসেবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নিহত, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১।

নূর আহমদ (১৮৯০-১৯৬৪)॥ জন্ম. আলকরণ, চট্টগ্রাম, ১৮৯০। সাহিত্যিক। এম.এ. বি.এল. পাস। একাধিক্রমে তিরিশ বছর চট্টগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান। কয়েকবার জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: Rising of Islam, Glorious Role of Islam, A Short History of Two Hundred Muslim Historians, Islam & Its Founder as Judge by Non-Muslim Persons, A Book of Useful Knowledge. মৃত্যু. ১৯৬৪।

নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯৪-১৯৭৫)॥ জন্ম. শাহপুর গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, ১৮৯৪। ঔপন্যাসিক। সরকারি চাকুরে খোন্দকার হাবিবুস সোবহান তাঁর পিতা। অভিজাত ও রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে জন্ম। কঠিন অবরোধপ্রথার দরুন



প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত। পারিবারিক গণ্ডীর ভেতরেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ। আইনজীবী কাজী গোলাম আহমদের সঙ্গে পরিণয়ের (১৯১২) পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণের এবং সাহিত্যচর্চা ও ইংরেজি শেখার সুযোগ লাভ। স্বামীর ছোট ভগিনী ফাতেমা খাতুনের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ। কথাশিল্পী হিসেবে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ১৯২৩-এ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'স্বপ্নদ্রষ্টা' প্রকাশিত। এ পারিবারিক উপন্যাসখানিই তাঁর সাহিত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'আত্মদান' (১৯২৫) তাঁর একখানি 'ভাগ্যচক্র', 'বিধিলিপি', ও 'নিয়তি' নূরন্নেছা খাতুনের আখ্যায়িকামূলক রচনা। 'জানকী বাঈ বা ভারতে মোসলেম বীরত্ব' (১৯২৪) তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'ঐতিহাসিক রচনা' মোসলেম বিক্রম ও বাংলার মোসলেম রাজত্ব (১৯২৬) ১৯২৯-এ 'নূরন্নেছা গ্রন্থাবলি' প্রকাশিত। দীর্ঘকাল বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সঙ্ঘের সভানেত্রী। 'নিখিল ভারত সাহিত্য সঙ্ঘ' কর্তৃক 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত। ১৯৫২-তে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস। মৃত্যু. ঢাকা, ৬ এপ্রিল, ১৯৭৫।

নূর মোহাম্মদ, ল্যান্সনায়েক (?-১৯৭১)॥ জন্ম. মহিষখোলা, নড়াইল, যশোর। বীরশ্রেষ্ঠ। স্থানীয় প্রথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে হাই স্কুলে ভর্তি। সেখানকার লেখাপড়া শেষ না করে ১৯৫৯-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস-এ



যোগদান। স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাক্কালে দিনাজপুর থেকে যশোরে বদলি। বদলি স্থলে যোগদানের আগেই ছুটি কাটানোর সময়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগদান। ১৯৭১-এর ৫ সেপ্টেম্বর সুতিপুরে নিজস্ব প্রতিরক্ষার সামনে গোয়ালহাটি গ্রামে একটি স্ট্যান্ডিং পেট্রোল পাঠানো হয়। অধিনায়ক ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ, সঙ্গে আরো চারজন সৈনিক। সকাল সাড়ে নটার দিকে হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পেট্রোলটি তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। পেছনে নিজস্ব প্রতিরক্ষা থেকে পাল্টা গুলিবর্ষণ করা হয়। তবু পেট্রোলটি উদ্ধার সম্ভব হয় না। এক সময়ে সিপাহি নান্নু মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে নূর মোহাম্মদ সঙ্গে সঙ্গে নান্নু মিয়াকে কাঁধে তুলে নেন এবং হাতের এল.এম.জি. দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করলে শত্রুপক্ষ পশ্চাৎপসরণ করতে বাধ্য হয়। হঠাৎ করেই শত্রুর মর্টারের একটি গোলা এসে লাগে তাঁর কাঁধে। ধরাশায়ী হওয়া মাত্র আহত নান্নু মিয়াকে বাঁচানোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। হাতের এল.এম.জি. সিপাহি মোস্তফাকে দিয়ে নান্নু মিয়াকে নিয়ে যেতে বললেন এবং মোস্তফার রাইফেল চেয়ে নিলেন যতক্ষণ না তাঁরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে সক্ষম হন ততক্ষণে ঐ রাইফেল দিয়ে শত্রুসৈন্য ঠেকিয়ে রাখবেন এবং শত্রুর মনোযোগ তাঁর

দিকেই কেন্দ্রীভূত করে রাখবেন। অন্য সঙ্গীরা মিনতি করলেন তাঁদের সঙ্গে যাবার জন্যে। তিনি রাজি হলেন না। বললেন, তাঁকে বহন করে নিয়ে যেতে গেলে সবাই মারা পড়বে। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই রণক্ষেত্র ত্যাগ করবেন না। বাকিদের অধিনায়কোচিত আদেশ দিলেন তাঁকে রেখে চলে যেতে। তাঁকে রেখে সন্তর্পণে সরে যেতে পারলেন বাকিরা। এদিকে সমানে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন রক্তাক্ত ভূলুণ্ঠিত নূর মোহাম্মদ। একদিকে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী, সঙ্গে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র, অন্যদিকে মাত্র একজন অর্ধমৃত সৈনিক (ই.পি. আর.) সম্বল একটি রাইফেল ও সীমিত গুলি। এই অসম অবিশ্বাস্য যুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের এমন ক্ষতিসাধন করেন যে তারা এই মৃত্যুপথযাত্রী যোদ্ধাকে বেয়নেট দিয়ে বিকৃত করে চোখ দুটো উপড়ে ফেলে। পরে প্রতিরক্ষার সৈনিকেরা এসে পাশের একটি ঝাড় থেকে উদ্ধার করে তাঁর মরদেহ। যেসব অমর শহীদের আত্মদানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতার পর তাঁকে 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করা হয়। মৃত্যু. ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

নূর হোসেন (১৯৬১-১৯৮৭)॥ জন্ম. নারিন্দা, ঢাকা, ১৯৬১। শহীদ। পৈতৃক নিবাস ঝাটিবুনিয়া গ্রাম, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর। বেবিটেক্সির ড্রাইভার মজিবর রহমান তাঁর পিতা। ঢাকার বনগ্রামের রাজাসুন্দরী প্রাইমারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা। ঢাকার গ্রাজুয়েট স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। স্কুলের পাঠ ত্যাগ করে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ। ঢাকা মিনিবাস সমিতি চালিত বাসের সুপারভাইজর হিসেবে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন। স্বাধীনতালাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর থেকে ঢাকার বনগ্রামে বাস। আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট কর্মী। ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের বনগ্রাম শাখার প্রচার সম্পাদক। মিটিংয়ে, মিছিলে ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন।



১৯৮৭-র ১০ নভেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ-এরশাদ সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী জোট ও দল (আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন আট দলীয় জোট ও বি.এন.পি'র নেতৃত্বাধীন সাত দলীয় জোট এবং ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃত্বাধীন পাঁচ দলীয় জোট) কর্তৃক ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি পালন: পুলিশের গুলিতে জিপিওর সামনে জিরো পয়েন্টে নূর হোসেন নিহত: তখন তাঁর বুকে ও পিঠে লেখা ছিল 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক: স্বৈরাচার নিপাত যাক'। এই বিরোচিত জীবনদানের ফলে নূর হোসেনের সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে মর্যাদা লাভ। উত্তরকালে এরশাদ সরকারের পতনের (৬ ডিসেম্বর ১৯৯০) আন্দোলনে তাঁর শহীদ স্মৃতি আন্দোলনকারীদের প্রাণে বিপুল শক্তি ও সাহস যোগায়। মৃত্যু. ঢাকা, ১০ নভেম্বর ১৯৮৭।

নূরুল আমীন (১৮৯৩-১৯৭৪)॥ জন্ম. মাতুলালয়, শাহবাজপুর গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৮৯৩। পৈতৃক নিবাস বাহাদুরপুর গ্রাম, ময়মনসিংহ। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। বাহাদুরপুর এম.এ. স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ। ১৯১৫-তে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯১৭-তে আই.এ. ও ১৯১৯-এ বি.এ. পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রে ভর্তি। বি.এল. ডিগ্রি লাভের পর ১৯২৪ থেকে ময়মনসিংহ জজকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু। ১৯২৯-এ ময়মনসিংহ লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৩০-এ জেলা বোর্ডের সদস্য এবং ১৯৩২-এ ময়মনসিংহ পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে যোগদান এবং দীর্ঘকাল ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। ১৯৪৩-এ বঙ্গীয় কাউন্সিল সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪৪-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সহসভাপতি নির্বাচিত। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে ময়মনসিংহ



জেলা থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। ব্যবস্থাপক সভার স্পিকার নির্বাচিত। অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ আইনসভার স্পিকার। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী। পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৭-১৯৫৪)। ১৯৪৮-এর ১২ সেপ্টেম্বর পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী নিযুক্ত। ঐ পদে পাঁচ বছর অধিষ্ঠিত। টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনে (২৬ এপ্রিল ১৯৪৯) সরকার-বিরোধী প্রার্থী (পরবর্তীকালে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক) শামসুল হক ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ দলের প্রার্থীকে পরাজিত করে জয়লাভ করলে তৎকর্তৃক অন্যান্য উপ-নির্বাচন বন্ধ ঘোষণা। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র করলে, উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের বিরোধিতা। ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার মিছিলের উপর পুলিশ কর্তৃক গুলি বর্ষণ। রাজপথে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ। এ সকল ভাষা সৈনিককে পুলিশ গুলি করে হত্যা করায় নূরুল আমীনের জনপ্রিয়তা খর্ব। তাঁর শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক গণ-অসন্তোষের দরুন ১৯৫৪-এর পূর্ববঙ্গ পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিকট নূরুল আমীন ও মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভার সদস্যদের পরাজয়বরণ। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী ও ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজের কাছে নূরুল আমীন নিজে পরাজিত হন। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারির পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতা হিসেবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা। পরবর্তীকালে ১৯৬২-তে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এন. ডি. এফ) গঠিত হলে এতে যোগদান এবং আইয়ুব সরকারের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হন। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪-র ৮ মার্চ এন ডি. এফ-এর সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৬৫-র ২১ মার্চ মৌলিক গণতন্ত্র-প্রথায় এন. ই-৫২ (ময়মনসিংহ) আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ১২ জুন জাতীয় পরিষদে সংযুক্ত বিরোধীদলের নেতা নির্বাচিত। ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারির পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদে বহাল পালন। ১৯৬৭-র ৩০ এপ্রিল এন. ডি. এফ. জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের (৮ দফা পন্থি) সমন্বয়ে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পি. ডি. এম.) গঠিত হলে এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত। ১৯৬৯-র ৮ জানুয়ারি ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন এবং এর একজন শীর্ষ স্থানীয় নেতা হিসেবে আইয়ুব-বিরোধী গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক আহূত গোল-টেবিল বৈঠকে (২৫ ফেব্রুয়ারি ও ১০-১২ মার্চ, ১৯৬৯) এন.ডি.এফ.-এর প্রতিনিধিত্ব। একই বছর ২৪ জুন (১৯৬৯) তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পি.ডি.পি) গঠিত এবং এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত। শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি এবং এই কর্মসূচির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা। পাকিস্তানে ইসলামিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে মত প্রকাশ। ১৯৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যে দুটি মাত্র আসন জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ পায়নি তার একটি তিনি পান। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা। পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে সমর্থন প্রদান ও তাদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ। ১৯৭২এর ২২ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩-এর ১৩ আগস্ট পর্যন্ত পাকিস্তানের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। আমৃত্যু পাকিস্তানি আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মৃত্যু. পাকিস্তান, ২ অক্টোবর ১৯৭৪।

নূরুল ইসলাম (১৯২৭-১৯৮৪)॥ জন্ম. গোমদণ্ডী গ্রাম, বোয়ালখালি, চট্টগ্রাম, ১৯২৭। সাংবাদিক। ১৯৫০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. এবং ১৯৫২-তে আইনশাস্ত্রে এল. এল, বি. ডিগ্রি লাভ। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। ১৯৪৯-এ ছাত্র থাকাকালেই সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত এবং স্টাফ রিপোর্টার ও সহ-সম্পাদক হিসেবে 'দৈনিক আজাদী'-তে যোগদান। এরপর 'পাকিস্তান অবজারভার' ও 'সংবাদের' স্থানীয় প্রতিনিধি এবং পরে এপিপির চট্টগ্রামস্থ ব্যুরো প্রধান হিসেবে ১৯৭০ পর্যন্ত কর্মরত। তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক

'পিপলস' প্রকাশিত ও প্রকাশক হিসেবে চট্টগ্রাম থেকে ইংরেজি দৈনিক 'পিপলস ভিউ' প্রকাশ। 'ইস্ট পাকিস্তান ইয়ার বুক' ও 'অ্যানুয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স' নামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ। দু'বার চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং সে সময়ে পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যকরী সংসদের সদস্য। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রোটারি ক্লাব এবং মূক ও বধির সমিতির সভাপতি। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ৮ জুলাই ১৯৮৪।

নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী (১৯৩০-১৯৮৪)॥



জন্ম. নারিংপুর গ্রাম, শাহারাস্তি, চাঁদপুর, ২৮ জানুয়ারি ১৯৩০। সাংবাদিক, সাহিত্যিক। সোয়াখালী বাহতরা হাই মাদ্রাসা থেকে ১৯৪৫-এ মেট্রিক, ইসলামিয়া কলেজ, ঢাকা থেকে ১৯৪৭-এ ইন্টারমিডিয়েট পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি। কিন্তু বিশেষ কারণে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। ১৯৪৯-এ রেকর্ড সংখ্যক মার্কস পেয়ে সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় পাস। বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় ২৭ বৎসর কলামিস্ট, বার্তা-সম্পাদক, সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৫০-এ দৈনিক ইনসাফ-এ যোগদান। এরপর দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক আমার দেশ, দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক আজাদ-এ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন। দৈনিক পূর্বদেশ-এর ১ আগস্ট ১৯৬৯ থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। ১৯৬৫-১৯৭০ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রডাকশন লিমিটেড-এর বাংলা বিশ্বকোষ রচনার সম্পাদক ও নিবন্ধকার। ২৯ এপ্রিল ১৯৭২-৮ মে ১৯৭৩ পর্যন্ত তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেন্স বিভাগের পরিচালক; ৪ জানুয়ারি ১৯৭৩-১৫ জুন ১৯৭৫ পর্যন্ত দৈনিক বাংলা ও সাপ্তাহিক বিচিত্রার সম্পাদক-প্রশাসক, ১৭ জুন ১৯৭৫-২২ আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেফাক-এর সম্পাদক, ২৩ আগস্ট ১৯৭৫-১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ পর্যন্ত দৈনিক বাংলা ও সাপ্তাহিক বিচিত্রার দ্বিতীয়বার সম্পাদক, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭-১৭ জুন ১৯৭৮ পর্যন্ত বার্তার সম্পাদক এবং ১৮ জুন ১৯৭৮-১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪ পর্যন্ত তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেন্স বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন। 'লুইপা' ছদ্মনামে আওয়াজ পত্রিকায় রাজধানীর রোজনামচা, ঝিনুক-এ দর্পণ, ইত্তেফাক-এ এই নগরীর আজাদ-এ এই জনপদ ও দৃশ্যদিগন্ত এবং পূর্বদেশ-এ দৃষ্টিপথ কলামে জনপ্রিয় উপ-সম্পাদকীয় রচনা। প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থঃ কালো ঘোড়া সাদা ঘোড়া (১৯৮৪)। মৃত্যুর আগে লোককাহিনী ভিত্তিক 'মাটি কথা কয়' নামে বইয়ের পাণ্ডুলিপি রচনা। ১৯৭৬-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কর্তৃক প্রদত্ত 'বাইসেন্টিনিয়াল স্বর্ণপদক' প্রদান। মৃত্যু. ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪।

নূরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৮৯)॥ জন্ম. বুড়োইচ



গ্রাম, যশোর, ২৫ নভেম্বর ১৯০৬। নাট্যকার। জমিদার পরিবারে জন্ম। পিতা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নুরুল আরেফিন। ঢাকা মুসলিম গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে মেট্রিক (১৯২৪), ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এসসি. (১৯২৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (১৯২৯) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল. (১৯৩৬) পাস। চাঁদপুর নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অজিহউদ্দিন আহমদের কন্যা আমেনা খাতুনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯৩৬)। কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯৪৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯৪৮-এ উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যান্ড গমন। ১৯৫১-তে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে এম.এ ডিগ্রি অর্জন। লন্ডনে অবস্থানকালে বি.বি.সি.-র বাংলা অনুষ্ঠানের শিশুদের আসর পরিচালনা ও শেষের দিকে এক বছর পাকিস্তান দূতাবাসের শিক্ষা অফিসার। বিলেত থেকে দেশে ফিরে এসে কিছুকাল সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত থাকার পর পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপনায় যোগদান। ১৯৭২-এ অধ্যাপনার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ। পাকিস্তানের 'তাহজিব-তমদ্দুন' ও এর রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার দৃঢ় সমর্থক (১৯৪৭-১৯৭১)। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বিবৃতি প্রদান। সামাজিক সঙ্কটের পটভূমিকায় অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক নাট্য-চরিত্র অঙ্কন করে খ্যাতি অর্জন। রূপান্তর (১৯৪৭), নেমেসিস (১৯৪৮), যদি এমন হতো (১৯৬০), নয় খান্দান (১৯৬২), আলোছায়া (১৯৬২), শতকরা আশি (১৯৬৭), আইনের অন্তরালে (১৯৬৭), যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০) প্রভৃতি তাঁর রচিত নাটক। রম্য-সাহিত্যের রচয়িতা হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। বহুরূপী (১৯৫৮) নরসুন্দর (১৯৬১), হিং টিং ছট (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৭০) প্রভৃতি তাঁর রম্য-গ্রন্থ। নাটকে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬১) লাভ। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৬৭) ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশে পদক (১৯৭৮) প্রদান। মৃত্যু. ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০।

নেপাল নাগ (১৯০৯-১৯৭৮)॥ জন্ম. গেণ্ডারিয়া, ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৯। বামপন্থি রাজনীতিবিদ। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। পিতা ছিলেন ছোটখাট ঠিকাদারি ব্যবসায়ী। স্কুলে অধ্যয়নকালে অনিল রায়ের নেতৃত্বাধীন ঢাকার গোপন বিপ্লবী দলে রাজনীতিতে যোগদান। ১৯৩১-এ গ্রেফতার। রাজস্থানের দেউলি বন্দী নিবাসে সাত বছর আটক থাকেন। কারাগারে মার্কসবাদী পণ্ডিত রেবতী বর্মণের কাছে কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ। ১৯৩৮-এ জেল থেকে মুক্তিলাভ। নারায়ণগঞ্জের সুতাকল এলাকায় বলিষ্ঠ শ্রমিক আন্দোলন, বিশাল শ্রমিক ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলে সেখানকার অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯৪০-এর জুনে পুনরায় গ্রেফতার। একই বছর ডিসেম্বরে মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় স্বগৃহে অন্তরীণ। কয়েক দিনের মধ্যেই অন্তরীণের বেড়াজাল ডিঙিয়ে গোপনে নারায়ণগঞ্জের সুতাকল অঞ্চলে গমন। সেখানে আত্মগোপন অবস্থায় শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দান। ১৯৪৩-এ যুক্তবাংলার প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে পার্টির প্রাদেশিক শাখার সদস্য নির্বাচিত পার্টির তরফ থেকে কলকাতা ও শহরতলীতে সুতাকল শ্রমিকের মধ্যে সংগঠন করার দায়িত্ব লাভ। ঢাকার বিশিষ্ট মহিলা কমিউনিস্ট কর্মী নিবেদিতা চৌধুরীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯৪৩)। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর 'রহমান ভাই' নাম গ্রহণ করে দীর্ঘকাল আত্মগোপন অবস্থায় 'পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টি'র (মার্চ ১৯৪৮) রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা (১৯৪৮-১৯৬২)। 'পূর্ব-পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' (অক্টোবর ১৯৪৭)-এর প্রতিষ্ঠাতা ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ১৯৫০-এ 'পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির (১৯৫৪-এ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা) সম্পাদক নির্বাচিত। মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট মহাসম্মেলনে 'পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির (গোপন) প্রতিনিধিত্ব (১৯৬০)। পরের বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেসেও পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (গোপন) প্রতিনিধিত্ব (১৯৬১)। অগ্নিবর্ষী বক্তা। পূর্ববাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৪৯-এ রেল ধর্মঘট-প্রয়াস, ১৯৫২-তে বাংলা ভাষার দাবিতে ছাত্র-জনতার বিপ্লবী অভ্যুদয় এবং ১৯৫৪-তে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ক্ষেত্রে নেপাল নাগের উদ্যোগ ও কাজ স্মরণীয়। ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ (১৯৬২)। কলকাতায় বাস। মৃত্যু. কলকাতা, ৪ অক্টোবর ১৯৭৮।



নেয়ামাল বাসির (১৯৩২-১৯৮৫)॥ জন্ম. তালিবপুর, মুর্শিদাবাদ, ২৬ এপ্রিল, ১৯৩২। অনুবাদক। এক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্ম। তালিবপুর এইচ.ই. স্কুলে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর তালিবপুর ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। প্রিয়নাথ হাইস্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে মেট্রিক (১৯৫১) ও জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৫৪) পাস। করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি.এ. অনার্স (১৯৬২) ও একই বিষয়ে এম.এ. (১৯৬৩) ডিগ্রি লাভ। [illegible]-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



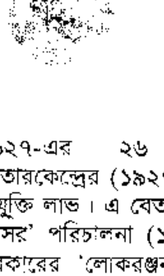
থেকে যথাক্রমে সাংবাদিকতা থেকে ফারসিতে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন সাংবাদিকতায় দ্বিতীয় শ্রেণি লাভ ও ফারসিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। ১৯৭৮-এ ইরানের মাশহাদের ফেরদৌসী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদেশি ছাত্রদের মধ্যে প্রাক-পিএইচ.ডি. ফারসি ভাষা কোর্সের পরীক্ষায় ৯০% নম্বর পেয়ে শীর্ষ স্থান অধিকার। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে ছাত্র ও যুব রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। যুব লীগ (১৯৫১) প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। ঐতিহাসিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার দায়ে কারানির্যাতন ভোগ। ছাত্র ইউনিয়নের (১৯৫২) ঢাকা নগর শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন। সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবনের শুরু। 'নতুন দিন' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক (১৯৫৫-১৯৫৮) ও দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯৫৮-১৯৫৯)। ১৯৫৯-এ করাচিতে রেডিও পাকিস্তানের সংবাদ-অনুবাদকের কাজে যোগদান। রেডিও পাকিস্তান করাচি কেন্দ্রে বাংলা সংবাদ পাঠক (১৯৫৯-১৯৬৪)। এর সংবাদ-ভাষ্য রচনা ও পাঠ (১৯৬৫-১৯৬৬)। করাচির ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বাংলা মুখপত্র মাসিক 'সন্ধানের' সম্পাদক (১৯৬৪-১৯৬৫)। ১৯৬৬-র ২১ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে জাতীয় পরিষদের অনুবাদক নিযুক্ত। একই বছর অক্টোবর মাসে ঢাকায় বদলি। ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের উর্দুশিক্ষা আসর পরিচালনা (১৯৬৭-১৯৬৯)। ১৯৭২-এ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক-সম্পাদক পদে উন্নীত। উর্দু সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ করে খ্যাতি অর্জন। প্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থ: 'লন্ডনে এক রাত' (১৯৫৬) [উপন্যাস];, সাজ্জাদ জহিরের লন্দকী একরাত; 'দুপছায়া' (১৯৬৯) [ছোটগল্প], কুদরতুল্লাহ শাহাবের মাজী; 'বানরের শ্বেত-অস্থি ডাইনী দমন' (১৯৭৬) [শিশুতোষ লোকগল্প], চীনা ভাষার ইংরেজি-অনুবাদ থেকে ভাষান্তরিত, মূল: ওয়াং সিং পেই; 'যোগাযোগ-প্রক্রিয়া' (১৯৭৭) [তত্ত্বমূলক আলোচনা গ্রন্থ] ড. ডেভিড কে. বার্লোর ইংরেজি গ্রন্থ 'The process of Communication'। অনুবাদ ও সম্পাদনা: 'উর্দুর সেরা গল্প' (১৯৫৮)-আতোয়ার রহমানের সহযোগে: 'উর্দু ছোটগল্প' (১৯৭০) ইত্যাদি কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের রচয়িতা হিসেবেও পরিচিত। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৮০)। মৃত্যু. ঢাকা, ৩০ নভেম্বর, ১৯৮৫।

নেলী সেনগুপ্তা (১৮৮৬-১৯৭৩)॥ জন্ম. কেম্ব্রিজ, ইংল্যান্ড, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৬। রাজনৈতিক নেত্রী। ১৯০৪-এ সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস। ১৯০৯-এ ভারতবর্ষের খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯১০-এ স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় এসে কংগ্রেসে যোগদান। ১৯২১-এ স্বামীর সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ঐ বছরের ২১ জুলাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে হরতালে অংশগ্রহণ, জনসভায় বক্তৃতা দান। আইন ভঙ্গ করায় কারাবরণ। ১৯২৮-এ মতিলাল নেহেরুর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যোগদান। ১৯৩১-এ দিল্লিতে নিষিদ্ধ জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার, দিল্লি কোর্টে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা প্রদান এবং চার মাসের জেলভোগ। বেআইনি ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩৩-এর ১ এপ্রিল কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ এবং কলকাতায় নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতা করে কারাবরণ। ১৯৪০-এ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪৬-এ বিপুল ভোটে পুনঃনির্বাচিত। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের প্রতিবাদ। স্বাধীনতার (১৯৪৭) পর গান্ধীজীর পরামর্শে পাকিস্তানের চট্টগ্রামে আগমন। সেখানে প্রয়াত স্বামী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের (১৮৮৫-১৯৩৩) বাসস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস। পূর্ববঙ্গ কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগদান। '৫২-র রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ১৯৫৪-তে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৮-তে সামরিক আইন জারি হওয়ার পর স্বগৃহে অন্তরীণ। অসুস্থতার জন্য ১৯৭০-এ চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় গমন। ১৯৭৩-এ ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে ঐ দেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত কলকাতায় মৃত্যু. ২৩ অক্টোবর ১৯৭৩



নোয়া মিয়া (১৮৫২-১৮৮৩)॥ জন্ম. বাহাদুরপুর, মাদারীপুর, ১৮৫২। ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা। ফরায়েজি আন্দোলনের প্রসিদ্ধ নেতা দুদু মিয়ার দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৬৪-তে আবদুল গফুর নোয়া মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হন। দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে ফরিদপুরের জমিদারগণ পুনরায় কৃষকদের উপর অত্যাচর শুরু করে। এরই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান নোয়া মিয়া। দুদু মিয়া যেসব সংস্কার ও বিধি-ব্যবস্থা চালু করেছিলেন নোয়া মিয়া তা বজায় রেখে ফরিদপুরে ফরায়েজি আন্দোলনকে চাঙ্গা করে তোলেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন' (তৃতীয় ভাগ) নামক আত্মজীবনীতে মাদারীপুর মহকুমার শাসক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন: 'তাঁর সময়েও ফরিদপুর জেলার অধিকাংশ প্রজাই 'ফরায়েজি মুসলমান' ছিল। ...নোয়া মিয়ার মুখের কথা তাহাদের পক্ষে বেদ। ...এ অঞ্চলে নোয়া মিয়া ইংরেজ রাজ্যের উপর একপ্রকার আপনার রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।' কালক্রমে এই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। সরকারি আমলাদের কূটকৌশল ও জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলীর অনুসারীদের সঙ্গে বিরোধে (জুম্মার নামাজ ও অন্যান্য বিষয়ে) ফরায়েজি আন্দোলন ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। নোয়া মিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ে কম গুরুত্ব দিয়ে ধর্মীয় বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। মৃত্যু. ১৮৮৩।

পঙ্কজকুমার মল্লিক (১৯০৫-১৯৭৮)॥ জন্ম. কলকাতা, ১০ মে ১৯০৫। কণ্ঠশিল্পী। ১৯২১-এ মেট্রিক পাস করে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি। এ কলেজে বি.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। স্কুলে অধ্যয়নকালে এক জ্ঞাতি ভগ্নিপতির কাছে সংগীতে তালিম গ্রহণ।



১৯২৭-এর ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা বেতারকেন্দ্রের (১৯২৭) সংগীত পরিচালক পদে নিযুক্তি লাভ। এ বেতারকেন্দ্রের 'সংগীত শিক্ষার আসর' পরিচালনা (১৯৩২-১৯৭৫)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'লোকরঞ্জন শাখার' উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব পালন (১৯৫৩-১৯৬৭)। ১৯৭৫-এর ২ সেপ্টেম্বর বেতারকেন্দ্রের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। রবীন্দ্রসংগীতের কণ্ঠশিল্পী, সুরকার, শিক্ষক ও প্রচারক হিসেবে পথিকৃতের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের গানে তবলা-সঙ্গতের প্রবর্তক হিসেবেও খ্যাত। রবীন্দ্রসংগীত জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। অপরদিকে রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল ইসলাম, বাণীকুমার, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায় ও গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গানেরও বিশিষ্ট গায়ক ও সুরকার। এছাড়া অনুপম কণ্ঠে নিজের সুরাশ্রিত পদকীর্তন, ভজন, পল্লিগীতি, দেশাত্মবোধক গান, শ্যামাসংগীত ও হিন্দি গান পরিবেশন করে সুনাম অর্জন। চলচ্চিত্রের দক্ষ পরিচালক। দেনাপাওনা, কপালকুণ্ডলা (বাংলা ও হিন্দি), চণ্ডীদাস, মুক্তি (বাংলা ও হিন্দি), জলজলা (হিন্দি), দেবদাস, গৃহদাহ, ভাগ্যচক্র, জীবনমরণ, দেশের মাটি, কাশীনাথ (বাংলা ও হিন্দি), দিদি (বাংলা ও হিন্দি), বড়দিদি (বাংলা ও হিন্দি), অভিজ্ঞান, মীনাক্ষী (বাংলা ও হিন্দি), চিত্রাঙ্গদা (বাংলা ও হিন্দি), লৌহকপাট ইত্যাদি ছায়াচিত্রের সংগীত-পরিচালক। রবীন্দ্রসংগীতসহ অজস্র বাংলা ও হিন্দি গান গ্রামোফোন রেকর্ডিং। অভিনেতা হিসেবেও পরিচিতি লাভ। ডাক্তার ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থনজ্ঞাপন। গান গেয়ে টাকা সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধের তহবিলে দান। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার যুগ আমার গান' (১৯৮০) একখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮।

পঞ্চানন কর্মকার (?-১৮০৪)। । জন্ম. হুগলী, ত্রিবেণী, জন্মতারিখ অজ্ঞাত। বাংলা মুদ্রণাক্ষরের জনক, মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে প্রযুক্তিবিদ হিসেবে চিরস্মরণীয় পুরুষ। তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা প্রথমে ছিলেন হুগলী জেলার অন্তঃপাতী জিরাট-বালাগড়ের অধিবাসী, পরে ত্রিবেণীতে গিয়ে বসবাস শুরু। বৃত্তিতে এঁরা ছিলেন কর্মকার, কিন্তু আরো পূর্বে একেবারে আদিতে পঞ্চাননের প্রাকপুরুষেরা ছিলেন 'মল্লিক' উপাধিধারী এবং বৃত্তিতে ছিলেন লিপিকর-তাম্রপটে, অস্ত্রশস্ত্রে অলঙ্করণ বা নামাঙ্কনে এঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই শিল্পীমন ও কলাবৃত্তি মধ্যবর্তী বহু প্রজন্ম অতিক্রম করে এসে পঞ্চাননের মধ্যে পুনরায় জাগ্রত হয়েছিল। পঞ্চানন যখন ত্রিবেণীতে,

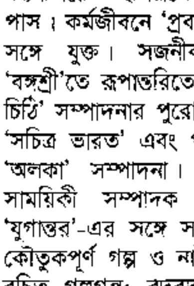
হুগলীতে তখন এন্ড্রুজ সাহেবের ছাপাখানা চালু হয়েছে। ১৭৭৮-এ ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের লেখা 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' চার্লস উইলকিন্স-এর তত্ত্বাবধানে ঐ প্রেস থেকে ছাপা হতে যাচ্ছে; গ্রন্থের মধ্যে ব্যবহার্য বাংলা টাইপ তৈরির পদ্ধতি নিয়ে উইলকিন্স যখন পরিশ্রম করছেন তখন পঞ্চানন তাঁর ব্যবহারিক প্রযুক্তিজ্ঞান নিয়ে সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। বইটি ছাপাতে ছেনিকাটা ঢালাই করা চালনশলী ধাতব হরফ ব্যবহার করা হয়েছিল, আর এই হরফ তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল উইলকিন্স ও পঞ্চাননের যুগ্ম প্রচেষ্টায়। ১৭৭৯-তে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের উৎসাহে উইলকিন্সের পরিচালনাধীনে কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হলে পঞ্চাননকে কলকাতায় নিয়ে যান উইলকিন্স। ১৭৮৫-তে পুরোদমে এই সরকারি ছাপাখানা চালু ছিল, পঞ্চানন সেখানে কাজ করতেন। হরফ নির্মাণের কলাকৌশল তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। ১৭৯৯-র দিকে তাঁর সঙ্গে উইলিয়াম কেরীর যোগাযোগ ঘটে, এবং কেরী তাঁকে শ্রীরামপুর মিশনের প্রেসে নিয়ে আসেন। একটি পুরনো মেশিন ও পঞ্চাননকে নিয়ে ১৮০০-তে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কাজ শুরু হয়। পঞ্চাননের তৈরি হরফেই কেরীর অনূদিত নিউ টেস্টামেন্ট বাংলায় ১৮০১-এ মুদ্রিত হয়েছিল। কালক্রমে এই প্রেস এশিয়ার বৃহত্তম অক্ষর তৈরির কারখানায় অর্থাৎ টাইপ-ফাউন্ড্রিতে পরিণত। ভারতবর্ষের নাগরী ভাষায় হরফ নির্মাণও (১৮০৩) পঞ্চাননের কৃতিত্ব; কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণের জন্য তিনি তা তৈরি করেছিলেন। পরে পঞ্চানন-কর্তৃক সুন্দরতর ও পূর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র আরেক সাঁট বাংলা হরফ তৈরি। এ দেশের ছাপাখানায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁর তৈরি হরফের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পঞ্চানন তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকারকে সযত্নে তাঁর সমস্ত জ্ঞান ও কলাকৌশল শিখিয়ে যান; মনোহর পরিশ্রম, সাধনা ও মেধার বলে আরবি, ফারসি, গুরুমুখি, মারাঠি, তেলুগু, বর্মি, চৈনিক প্রভৃতি অন্ততপক্ষে চৌদ্দটি বিভিন্ন ভাষার হরফ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৃত্যু. ১৮০৪।

পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭৬)॥ জন্ম. রতনদিয়া, ফরিদপুর, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭। পৈতৃক নিবাস সাতবাড়িয়া, পাবনা। সাংবাদিক ও গল্পকার। ১৯১৫-তে পাবনা জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাস। ১৯২০-তে বি.এ. পাস করে



কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম.এ. অধ্যয়ন। এ সময়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান। ১৯২১-এ বিশ্বভারতীর কলাভবনে ভর্তি; স্বাস্থ্যগত কারণে পড়াশুনা ত্যাগ। ১৯২৩-এ নন-কলেজিয়েট ছাত্ররূপে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. পাস। কর্মজীবনে 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যুক্ত। সজনীকান্ত দাস 'উপাসনা'কে 'বঙ্গশ্রী'তে রূপান্তরিতে করার সময়ে 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদনার পুরো দায়িত্ব লাভ। ১৯৩৮-এ 'সচিত্র ভারত' এবং পরে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে 'অলকা' সম্পাদনা। ১৯৪৫-এ 'যুগান্তর'-এর সাময়িকী সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৬৪ পর্যন্ত 'যুগান্তর'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ছোট ছোট সরস কৌতুকপূর্ণ গল্প ও নাট্য রচনায় সুনাম অর্জন। রচিত গল্পগ্রন্থ: বুদবুদ (১৯৩৬), ট্রামের সেই লোকটি (১৯৪৪), ব্ল্যাক মার্কেট (১৯৪৫), মারকে লেঙ্গে (১৯৫০) ইত্যাদি। নাটক: দুষ্মন্তের বিচার (১৯৪৩), ঘুঘু (১৯৪৪)। মৃত্যু. ২৬ জুন ১৯৭৬।

পরিমল দত্ত (১৯০১-১৯৯১) জন্ম কুমিল্লা, ১ জানুয়ারি ১৯০১।



রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও সাধক। পৈতৃক নিবাস গৌতমপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পিতা অসিতচন্দ্র দত্ত ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। বাবার চাকরি সুবাদে শৈশবের দিনগুলি কাটে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে। কুমিল্লা জেল স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা তারপর কলকাতায় রিপন কলেজিয়েট ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। আসামের গোয়ালপাড়া ধুবাড় সরকারি হাই স্কুল থেকে ১৯১৭-এ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১৯-এ প্রথম বিভাগে আই.এ পাস করেন। তারপর স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন। ছাত্র

বয়স থেকেই সংগীত সাধনা ও শরীরচর্চার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। ১৯২০-২১-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সন্ধীর অহসনে অসহযোগ ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ডা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দ্যেগে কুমিল্লা শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় ১৯২৩-এ কুমিল্লায় অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশীয় শিক্ষা, কৃষি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে দেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল অশ্যমের আদর্শ ও উদ্দেশ্য। দেশীয় শিল্পের বিকাশে চরকা ও খাদির প্রচার ও প্রসারে অভয় আশ্রম কর্মকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯২৬-এ পরিমল দত্ত অভয় আশ্রমে আসেন এবং আশ্রমের আদর্শ ও জনাহিতকর কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হন। দীর্ঘদিন আশ্রমের সভাপতি (১৯৮৪-৯১) হিসেবে আশ্রমের উন্নয়ন ধারাকে গতিশীল রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৩০-এ গান্ধী ভাঙীতে সবল আইন অমান্য করেন। কুমিল্লা লবণ আইন অমান্য করে গ্রেফতার হন তার মধ্যে পরিমল দত্তও ছিলেন। তাঁর ভগ্নি রবীন্দ্রসংগীতচর্চা করতেন। তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হনও অনুশীলন শুরু করেন। শান্তি-নিকেতন ও বিশ্বভারতীয় নিবিড় সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্র ভাবধারায় বিশেষ অনুপ্রণিত হন। জেলসেবা ও রবীন্দ্রসংগীত সাধনা তাঁর জীবনবেদ হয়ে ওঠে। আজীবন রবীন্দ্রসংগীতচর্চা ও সাধনা করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের সুর, তাল ও লয় সম্বন্ধে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। এজন্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীরে ভাষায় তাঁকে গান্ধর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। রবীন্দ্রসংগীত প্রশিক্ষক হিসেবেও অনন্যা ছিলেন। সহজ-সরল, সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত অকৃতদার এই মানুষটি সত্যি ছিলেন নিরহঙ্কার ও নিক্ষোভ। মৃত্যু, অভয় আশ্রয়, কুমিল্লা, ১২ জানুয়ারি ১৯৯১।

পাগলা কানাই (১৮০৯-১৮৮৯)॥ জন্ম. লেবুতলা গ্রাম, ঝিনাইদহ, ১৮০৯। দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম। আজীবন বেড়বাড়ি নিবাসী। এখানে তাঁর মাজার বর্তমান। কবি, জারি ও ধুয়াগান রচয়িতা। প্রকৃত নাম কানাই শেখ। পাগলা কানাই নামে খ্যাত। নিরক্ষর কিন্তু স্বভাবকবি বলে মুখে মুখে গান রচনা। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক গানে বিশেষ পারদর্শী। যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে গান গেয়ে বেড়াতেন তাঁর রচিত গানগুলো আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ। একটি গানের স্তবক: 'এক বাপের দুই বেটা, তাজা মরা কেহ নয়। সকলেরই এক রক্ত একঘরে আশ্রয়।' তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কালাচাঁদ বয়াতি, হাকিম শাহ, করিম বিশ্বাস, ইন্দু বিশ্বাস ও করমদ্দী। তাঁর ২৪০টি গান ড. মযহারুল ইসলাম রচিত 'কবি পাগলা কানাই' (১৩৬৬) গ্রন্থে সংকলিত। মৃত্যু. ১৮৮৯।

পাঞ্জু শাহ (১২৫৮-১৩২১)॥ জন্ম. শৈলকুপা গ্রাম, ঝিনাইদহ, আগস্ট ১২৫৮। মরমি সাধক ও কবি। পারিবারিক রক্ষণশীলতার জন্যে বাল্যকালে আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষাচর্চা। বাংলা ভাষায় প্রতি প্রবল অনুরাগবশত গোপনে বাংলাভাষাচর্চা। সাধক হিরাজতুল্লাহর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সাধক জীবন শুরু। সুফিতত্ত্বের অনুসারী পাঞ্জু শাহ কর্তৃক বহু ভাবসংগীত রচনা। এই মানবতাবাদী মরমি কবির গানের একটি স্তবক: 'মানুষের করণ মানুষ ভিন্ন নয় ওরে মন। ১৮৭০-তে 'ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর' শীর্ষক কখানা সুফিতত্ত্বমূলক কাব্য রচনা। পাঞ্জু শাহ রচিত মরমি গানের সংখ্যা প্রায় দুই শত তাঁর গানে বাউল প্রভাব লক্ষণীয়। গানগুলো তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণের মুখে মুখে ফিরছে। পাঞ্জু-পুত্র খোন্দকার রফিউদ্দীন কর্তৃক প্রণীত 'ভাবসংগীত' নামক একখানা গ্রন্থে কিছু গান সংকলিত। এছাড়া ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক কর্তৃক রচিত 'মরমি কবি পাঞ্জুশাহ: জীবন ও কাব্য' (১৯৯০) গ্রন্থে তাঁর ২০২টি গান সংকলিত। মৃত্যু. হরিশপুর (২৮ শ্রাবণ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ)



পান্নালাল ঘোষ (১৯১১-১৯৬০)॥ জন্ম. বরিশাল শহর, ১৯১১। বংশীবাদক। সংগীত তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য। ১৪ বৎসর বয়সে বংশীবাদন শিক্ষারম্ভ। কিছুকাল পর কলকাতার এক ছায়াচিত্র কোম্পানিতে চাকরি গ্রহণ। অমৃতসরের প্রসিদ্ধ হারমোনিয়াম বাদক খুশী আহমেদের নিকট হারমোনিয়াম বাদনে তালিম গ্রহণ। ১৯৩৮-এ 'সরই-কলা-নৃত্য' দলের সঙ্গে বিদেশ সফর। প্রসিদ্ধ সংগীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ। ১৯৪৭-এ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর শিষ্যত্ব

গ্রহণ। কিছুকাল পর আকাশবাণীর দিল্লি কেন্দ্রে সংগীত নির্দেশনার কাজে নিযুক্ত। বাদ্যযন্ত্রের সংস্কার সাধন করে সফলতা ও খ্যাতি অর্জন। খেয়াল অঙ্গের বাদনে সিদ্ধহস্ত। বিভিন্ন সপ্তকের জন্য তিনটি বাঁশি ব্যবহার করতেন। তাঁর গানের বহু গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত। উপমহাদেশের অন্যতম বংশীবাদক হিসেবে স্বীকৃত। মৃত্যু. ২০ এপ্রিল ১৯৬০।

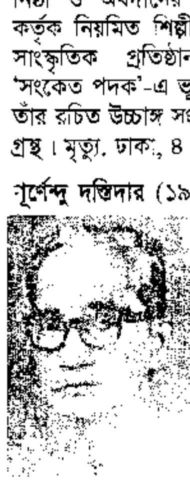
পাহাড়ী সান্যাল (১৯০৬-১৯৭৪)॥ জন্ম. দার্জিলিং, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা। প্রকৃত নাম নগেন্দ্রনাথ সান্যাল। শৈশব ও যৌবনের প্রথম পর্ব লক্ষ্ণৌ শহরে কাটান। দেড় বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ। পিতা ছিলেন একজন



সংগীতজ্ঞ এবং সেনা বিভাগে হিসাব পরীক্ষক। বাল্যকালে পিতার কাছে সংগীতে অনুপ্রেরণা লাভ। দশ বছর বয়সে ঘটে পিতৃবিয়োগ। পিতৃস্নেহে মানুষ করে তোলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা। সংগীতের প্রতি অনুরাগবশত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলবিদ্যা পাঠ ত্যাগ করে লক্ষ্ণৌ ফিরে এসে সংগীতচর্চায় আত্মনিয়োগ। লক্ষ্ণৌ সংগীত কলেজ থেকে 'উপাধি' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। একুশ বছর বয়সে মোরাদাবাদ হাই স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। রেওয়ার কুমারের গৃহ-শিক্ষকতার কর্ম গ্রহণ। ১৯৩১-এ ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৩/৪ দিন পর একমাত্র পুত্র সন্তান ও স্ত্রীর পরলোক গমন। রেওয়ার কুমার সাহেবের একান্ত সচিব পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৩৩-এ কলকাতায় আগমন এবং নিউ থিয়েটার্সে অভিনেতা হিসেবে যোগদান। ছায়াছবিতে আত্মপ্রকাশ মীরাবাঈ চিত্রে। কলকাতা ও বোম্বাইর চিত্রপুরীতে বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে প্রায় দেড় শত ছায়াছবিতে অভিনয়। বড় দিদি ছবিতে সুরেন, বিদ্যাসাগর, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও কেদার রাজা ছবিতে নাম-ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয়। নিউ থিয়েটার্সে অভিনয়কালে মীনা দেবীকে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ। শেষ বয়সে ১৯৭৩-এ বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে 'আসামি হাজির' নাটকে অপূর্ব অভিনয় করে মঞ্চানুরাগীদের মন জয়। বাংলা, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা ছাড়াও ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন। মৃত্যু. ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪।

পি. সি. গোমেজ. ওস্তাদ (১৯০৪-১৯৮৪)॥ জন্ম. বক্সনগর, নবাবগঞ্জ থানা, ঢাকা, ১৯০৪। সংগীতজ্ঞ ও সংগীত শিক্ষক। পুরো নাম পাসকালাস চালর্স গোমেজ। ছোটবেলায় গির্জায় প্রার্থনা-সংগীতে অংশগ্রহণ করে প্রশংসা অর্জন। ১৯২২-এ কলকাতায় ভবানীপুরের এক সংগীত বিদ্যালয়ে সংগীত সাধনা শুরু। সংগীত শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার আন্দোলনেও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ। ইন্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার (আই.পি.টি)-এ একজন সক্রিয় সদস্য। পরে দিল্লির পণ্ডিত মোহনলাল শর্মার 'নয়ে সড়ক' সংগীত স্কুলে ভর্তি। প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ বনোয়ারী লাল শর্মা ও ওস্তাদ পীর খাঁর নিকট সংগীতে তালিম গ্রহণ। ১৯৬০-এ বোম্বে গমন এবং বিখ্যাত তবলাবাদক ওস্তাদ আমীর খাঁর কাছে তবলাযন্ত্রের পাঠ গ্রহণ ও পারদর্শিতা অর্জন। ১৯৬২-তে দেশে প্রত্যাবর্তন ও সংগীত শিক্ষক। তাঁর কাছে তালিমপ্রাপ্ত অনেক শিল্পী বাংলাদেশে সংগীত ভুবনে প্রতিষ্ঠিত। সংগীতক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ও অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার-কর্তৃক নিয়মিত শিল্পী-ভাতা প্রদান। ১৯৭৯-তে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সংকেত গোষ্ঠী-কর্তৃক 'সংকেত পদক'-এ ভূষিত। 'রাগ রংগ বিলাসিনী' তাঁর রচিত উচ্চাঙ্গ সংগীতবিষয়ক একটি মূল্যবান গ্রন্থ। মৃত্যু. ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৪।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার (১৯০৯-১৯৭১)॥ জন্ম. ধলঘাট গ্রাম, পটিয়া-চট্টগ্রাম, ২০ জুন ১৯০৯। লেখক ও রাজনীতিবিদ। পিতা চন্দ্রকুমার দস্তিদার (প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক ও চট্টগ্রাম আদালতের চাকরিজীবী), মাতা কুমুদিনী দস্তিদার। স্ত্রী শান্তি দস্তিদার। চট্টগ্রাম



কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯২৫) ও চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এসসি. (১৯২৭) পাস। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি। মাস্টারদা

সূর্য সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত যুব বিদ্রোহের (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন) সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ কলকাতায় গ্রেফতার (ডিসেম্বর ১৯৩০)। বন্দীজীবন দীর্ঘায়ত হতে শুরু করলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া পরিত্যাগ। দেউলি জেল থেকে ডিস্টিংশনসহ বি.এ. পাস (১৯৩৪)। এরপর বি.এল. ডিগ্রি লাভ। ১৯৪০-এ জেল থেকে মুক্তি পান। চট্টগ্রাম আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান ও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ১৯৪৮-এর মার্চ নবগঠিত পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব-পাকিস্তান শাখার সদস্য নিযুক্ত। একই বছর পুনরায় গ্রেফতার। ১৯৫৪-র নির্বাচনে আটক অবস্থাতেই চট্টগ্রাম জেলার হিন্দু আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস প্রার্থী বিনোদবিহারী দত্তকে পরাজিত করে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৫-র ৯ জুন জেল থেকে মুক্তিলাভ। পূর্ববঙ্গ পরিষদে তৎকর্তৃক চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের (১৮ এপ্রিল ১৯৩০) স্মারক স্তম্ভ নির্মাণের প্রস্তাব উত্থাপন। প্রস্তাবটি ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত (১৯৫৬)। ১৯৫৭-র ২৬ জুলাই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হলে তাতে যোগদান। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে আবার গ্রেফতার। ১৯৬২-তে মুক্তিলাভ। ঐ বছর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চট্টগ্রাম শহর কমিটির সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে আর একবার গ্রেফতার। ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে গণ আন্দোলনের চাপে মুক্তিলাভ। এবং মস্কোপন্থি ন্যাপের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ। ১৯৭০-এর ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১১ আসন থেকে ন্যাপের মনোনয়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সুলতান আহম্মদের কাছে পরাজিত। একজন সমাজমনস্ক লেখক হিসেবে খ্যাত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিয়াল রমেশ শীল (১৯৬৩), স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রামে (১৯৬৭) বীরকন্যা প্রীতিলতা। অনূদিত গ্রন্থ: শেখভের গল্প (১৯৬৩), মোপাশাঁর গল্প। মৃত্যু: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারত গমনের পথে ভিজিটলঙ-এ পথশ্রমে ক্লান্ত অবস্থায় পরলোক গমন, ৯ মে ১৯৭১।

পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩১-১৯৯৭)॥ জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার নাকোলে, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১। কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক,



শিশুসাহিত্যিক, চিত্র-পরিচালক ও চিত্রশিল্পী। পিতা পুলিনবিহারী পত্রী, মা নির্মলা দেবী। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পারিবারিক কলহের কারণে পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। ১৯৪৯-এ ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে ভর্তি হন বাণিজ্যিক শিল্পকলা বা কমর্শিয়াল আর্টের ছাত্র হিসেবে। যদিও নানা কারণে এই পাঠক্রম শেষ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ছেলেবেলায় বাগনানের বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা অমল গাঙ্গুলির সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট পার্টির নানান সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কলকাতায় অভিভাবক কাকা নিকুঞ্জবিহারী পত্রীর চলচ্চিত্র পত্রিকা চিত্রিতা ও সাহিত্যপত্র দীপালি-তে তাঁর আঁকা ও লেখার সূচনা হয়। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হয়ে পড়লে রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চা উভয়েই একসঙ্গে চালাতে থাকেন। ১৯৫১-এ তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ একমুঠো রোদ প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮-এ প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস দাঁড়ের ময়না মানিক পুরস্কার লাভ করে। তাঁর অন্যান্য কবিতাগ্রন্থগুলি হল শব্দের ঠিকানা (১৯৭৫), সূর্যোদয় তুমি এলে (১৯৭৬) আমাদের তুমুল হৈ-হল্লা (১৯৮০) ও গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল (১৯৮১), আমিই কচ আমিই দেবযানী ইত্যাদি। উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভোমরাগুড়ি, মালতীমঙ্গল ইত্যাদি। রূপসী বাংলার দুই কবি তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ। পূর্ণেন্দু পত্রী কলকাতা সম্বন্ধে প্রায় এক ডজন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শহর কলকাতার আদি পর্ব, বঙ্গভঙ্গ, কি করে কলকাতা হল, ছড়ায় মোড়া কলকাতা, কলকাতার রাজকাহিনী, এক যে ছিল কলকাতা ইত্যাদি। ছোটদের জন্য লিখেছেন আলটুং ফালটুং, ম্যাকের বাবা খ্যাঁক, ইল্লীবিল্লী, দুষ্টুর রামায়ণ, জুনিয়র ব্যোমকেশ, যজাম্বো দি জিনিয়াস, প্রভৃতি হাসির বই। আমার ছেলেবেলা নামে তাঁর একটি স্মৃতিকথাও রয়েছে। ১৯৬৫-এ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প অবলম্বনে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র স্বপ্ন নিয়ে মুক্তি পায়। এরপর

রবীন্দ্রনাথের কাহিনি অবলম্বনে স্ত্রীর পত্র ও মালঞ্চ সহ পাঁচটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন তিনি। এছাড়াও নির্মাণ করেন সাতটি তথ্যচিত্র। স্ত্রীর পত্র চলচ্চিত্রটির জন্য তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চিত্রনির্মাতা ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৭৪-এ সমরেশ বসুর কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত তাঁর ছেঁড়া তমসুক চলচ্চিত্রটিও একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছিল। পরিচালনা: স্বপ্ন নিয়ে (১৯৬৬), স্ত্রীর পত্র (১৯৭২), ছেঁড়া তমসুক (১৯৭৪), অবনীন্দ্রনাথ (১৯৭৬), পটচিত্র (তথ্যচিত্র, ১৯৭৭), মালঞ্চ (১৯৭৯), কালীঘাট (তথ্যচিত্র, ১৯৮১), গীতগোবিন্দম্ (১৯৮১), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৮১), ক্ষীরের পুতুল (তথ্যচিত্র, ১৯৮২)। সাহিত্যকর্মের জন্য বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত হন। মৃত্যু ১৯ মার্চ ১৯৯৭।

প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫)॥ জন্ম. কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ১৮২৩। আদি নিবাস হুগলী জেলায়। শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কার। ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙ্গার পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত। ১৮৩৮-এ হেয়ার সাহেবের স্কুল থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় মাসিক আট টাকা বৃত্তি লাভ। হিন্দু কলেজে ভর্তি। সেখানে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ। ১৮৪৩-এ হিন্দু কলেজের শিক্ষা শেষ করে কিছুকাল হুগলী ব্যাঙ্কে চাকরি করার পর হুগলী স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগদান। ১৮৪৬-১৮৫৪ পর্যন্ত বারাসত গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এখানে কৃষিবিদ্যালয় স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন। কুলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে আট বছর দায়িত্ব পালন। তাঁর চেষ্টায় স্কুলটির নাম পরিবর্তিত হয়ে হেয়ার স্কুল হয়। ১৮৬৩-তে প্রেসিডেন্সি কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। ১৮৬৭-তে স্থায়ী অধ্যাপক এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এ পদে কর্মরত। সমাজ সংস্কারে অনন্য ভূমিকা পালন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারকল্পে বারাসত ও চোরা-বাগানে একাধিক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন। বিধবা-বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরকে সহায়তা প্রদান। মদ্যপান রহিত করার উদ্দেশ্যে ১৮৬৩-র ১৫ নভেম্বর 'বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি' বা সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন। সভার পক্ষে দি ওয়েলউইশার (১৮৬৫) ও হিতসাধক (১২৭৪) এ দুটি পত্রিকা সম্পাদনা। পত্রিকায় সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা-বিষয়ক যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো তার অধিকাংশই তাঁর লেখা। এ ছাড়া 'এডুকেশন গেজেট' নামক পত্রিকা সম্পাদনা। ইডেন হিন্দু হোস্টেল স্থাপনেও তাঁর অবদান যথেষ্ট। নারী শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কর্ম। ১৮৭৩-এ বড় লাট নর্থব্রুক এদেশে প্রচলিত কিশোর পাঠ্য পুস্তকের উপযোগিতা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেন তাতে প্যারীচরণ সরকারের লেখা শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলো সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিবেচিত হয়। তাঁর রচিত এই জাতীয় পুস্তকের একটি তালিকা: First Book of Reading, Second Book of Reading, Third Book of Reading, Fourth Book of Reading, Fifth Book of Reading, Sixth book of Reading, Child's First Grammar, Geography of Bengal for Beginners, Primary Geography, Geography of India, Second Geography part I & II, Geographical Chart of the World. Companion to the Atlas. Native Child's, Arithmetical Tablel. Historical Chart of England, The Well Wisher From 1865-68, The Tree of Intemperance, আদর্শ শিক্ষাব্রতী। প্যারীচরণ সরকারকে তৎকালে শিক্ষিত সমাজে The Arnold of the East রূপে অভিহিত করা হতো। মৃত্যু. ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫।



প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)॥ জন্ম. কলকাতা, ২২ জুলাই, ১৮১৪। এক বণিক পরিবারে জন্ম। পিতা রামনারায়ণ মিত্র কাগজ ও হুন্ডি ব্যবসায়ী। শৈশবে একজন গুরুমহাশয়ের নিকট বাংলা, পরে আর একজন মুনশির নিকট ফারসি শেখেন। ইংরেজি শিক্ষা লাভের জন্য হিন্দু কলেজের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি (১৮২৭)। এ কলেজের কৃতি ছাত্র। ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৩৬) সাব-লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্তি লাভ (১৮৩৬), এর লাইব্রেরিয়ান ও সেক্রেটারি পদে উন্নীত (১৮৪৮)। আমদানি ও রপ্তানি এবং চালের ব্যবসায় করে প্রচুর

অর্থোপার্জন। 'প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যান্ড সন্স' (১৮৫৫) নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী। 'বেঙ্গল টি কোম্পানি' ও 'ভারং টি কোম্পানি' বোর্ডের ডিরেক্টর। দেশোন্নতিবিধায়ক সভা-সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদেও দায়িত্ব পালন। 'জ্ঞানোপার্জিকা সভার' (১৮৩৮) যুগ্ম-সম্পাদক, 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির' (১৮৪৩) সম্পাদক, 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' (১৮৫১) কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, 'পশুক্লেশ নিবারণী সভার' (১৮৬১) সম্পাদক (১৮৮১-), 'বঙ্গদেশিয় সামাজিক বিজ্ঞান সভার' যুগ্ম-সম্পাদক (১৮৬৭-১৮৭৫), 'কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের' অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৬৩-), এবং 'বঙ্গীয় আইন পরিষদের' সদস্য (১৮৬৮-১৮৭০)। তাঁর যত্ন ও চেষ্টায় আইন পরিষদে পশুক্লেশ-নিবারণ আইন (১৮৬৯) গৃহীত। কৃষিবিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান। 'এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির' (১৮২০) সহকারী-সভাপতি (১৮৫৭-১৮৮১)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করে 'The Zamindar and Royats' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা। গরিব চাষিদের রক্ষাকবচ হিসেবে দেশে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন। কৃষি-বিষয়ক আধুনিক জ্ঞান ইংরেজি জার্নাল থেকে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য তাঁর প্রস্তাবানুসারে 'এগ্রিকালচারাল সোসাইটি' কর্তৃক একটি অনুবাদ সমিতি গঠন (১৮৫০)। প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্পাদনায় এ সমিতি থেকে 'ভারতবর্ষীয় কৃষি-বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' নামক পুস্তক প্রকাশিত। 'কৃষি-বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' নামক পুস্তক প্রকাশিত। 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১) ও 'Agriculture in Bengal' (১৮৮১) তাঁর কৃষি-বিষয়ক বিশিষ্ট গ্রন্থ। প্যারীচাঁদের আর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় মহিলাদের হিতকারী 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) প্রকাশ ও সম্পাদনা। এ পত্রিকায় 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। ১৮৫৭-তে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত। সমাজ-আলেখ্য হিসেবেও এটি সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। সেকালের কলকাতার বিত্তবান সমাজের সন্তানদেও নীতিহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা এতে নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কিত। গ্রন্থটিতে কথ্যভাষার ব্যবহার করে বাংলা সাহিত্যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেন প্যারীচাঁদ। [illegible] নাম হয়েছিল 'আলালী ভাষা' সাধু ও কথ্যভাষার সংমিশ্রণরীতিই এই ভাষার বিশেষত্ব। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ: মদ খাওয়ার কী দায়, জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯), রামারঞ্জিকা (১৮৬০), গীতাঙ্কুর (১৮৬১), যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫), অভেদী (১৮৭১), ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত (১৮৭৮), এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্বাবস্থা (১৮৭৮), আধ্যাত্মিকা (১৮৮০) ও বামাতোষিণী (১৮৮১)। প্রথম জীবনে প্রচলিত হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। পরে ব্রহ্মবাদী হয়ে ওঠেন। স্ত্রীর মৃত্যুর (১৮৬০) পর প্রেততত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। 'থিওসফিক্যাল সোসাইটির' বঙ্গীয় শাখার সভাপতি নির্বাচিত (১৮৮২)। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অন্যতম হোতা প্যারীচাঁদ মিত্র সমাজসচেতন ব্যক্তিত্ব হিসেবে যেমন দায়িত্বভার পালন করেছেন, তেমনি সংস্কৃতবহুল বাংলাভাষার পরিবর্তে সাহিত্যে চলিত রীতির ব্যবহার এবং বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করেন। পাদ্রি লঙ তাঁকে 'ডিকেন্স অব বেঙ্গল' বলতেন। মৃত্যু. কলকাতা, ২৩ নভেম্বর, ১৮৮৩।

প্রজেশকুমার রায় (১৯০৯-১৯৬২)॥ জন্ম. রহিমাপুর গ্রাম, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ৩ জুলাই ১৯০৯। কবি, সাংবাদিক, অনুবাদক ও শিশুসাহিত্যিক। শৈশবেই পিতামাতৃহীন। স্থানীয় বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস। সুনামগঞ্জ শহরে বুলচান্দ স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। ১৯৩০ সাল থেকে 'স্বাধিকার', 'যুগশক্তি', 'পল্লিবাণী', 'কমলা', 'জনশক্তি', 'শ্রীভূমি'তে কবিতা প্রকাশ। ১৯৩৭-এ সিলেটে কালীপ্রসন্ন দাসের সম্পাদনায় 'বলাকা' নামের মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরি হয়, তাতে কবি অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০) ও কবি মৃণালকান্তি দাশের (১৯১৫-১৯৮০) সঙ্গে যুক্ত। সুনামগঞ্জ থেকে পত্রিকা 'সাদেক' পত্রিকা সম্পাদনা। ১৯৩৫-এ বিপ্লবী তরুণ সংঘের কর্মকাণ্ডে যোগদান। দেশভাগের পরে ঢাকায় আসায় কবিতাচর্চার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। 'ইত্তেফাক', 'সংবাদ', 'সৈনিক', 'খেলাঘর', 'দেশ', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'বসুমতী', 'কবিতা', 'আনন্দবাজার



পত্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ ও কলাম রচনা। 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় যোগদান। 'ইত্তেহাদ' বন্ধ হয়ে গেলে ভবেশচন্দ্র নন্দী সম্পাদিত অর্ধসাপ্তাহিক 'আমার দেশ' পত্রিকায় যোগদান এবং 'কাটোয়াল' ছদ্মনামে কলাম রচনা। ১৯৫৬-এ সিলেটের নুরুল রহমানের 'নয়ানিশানা' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। কিছুদিন পরে 'নয়ানিশানা' ছেড়ে ঢাকায় ফেরা। ১৯৬২-এর এপ্রিলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ এলাকার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় রাজশাহী এবং ঢাকা শহরে দাঙ্গা হয়। ৩০ এপ্রিল 'মাহেনও'-সহ বিভিন্ন পত্রিকা অফিস ঘুরে 'আমার দেশ' অফিসে থেকে বাসায় ফেরার পথে মদনমোহন বসাক রোডে দাঙ্গাকারীদের ছুরিকাঘাতে শহিদ হন। তাঁর মৃত্যুর পরে সিলেটের 'যুগভেরী' পত্রিকায় যষ্টিমধু ছদ্মনামে উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত। কবিতাগ্রন্থ: 'যাত্রারম্ভ' (১৯৩৪), 'চাঁদ ও রাহু' (১৯৩৫), 'সীমান্তের চিঠি' (১৯৪২), 'জনসমুদ্র', 'নতুন কবিতা', 'একটি ফুলের গুচ্ছ' (১৯৪৫); ছড়াগ্রন্থ: 'এক যে ছিল'। জীবদ্দশায়ই 'দীপান্বিতা' নামে কবিতা-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ। ভবেশচন্দ্র নন্দী ১৯৬৭-এ এটি প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতা সম্পর্কে ১৯৩৪-এ কবি বুদ্ধদেব বসুর তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় লেখেন—'প্রজেশকুমার রায়ের কবিত্ব স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। এঁর লেখা সত্যি ভালো লাগল। প্রথিতযশা ব্যক্তির কাটা তিলক নেই তাঁর কপালে, ছাপা বাঁধাই অনাড়ম্বর। ...তবু তাঁর লেখা মনে দাগ কাটে, মাথা তুলে নিজের পরিচয় দিতে পারে। এঁর শব্দচয়নে সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় আছে। বিষয় নির্বাচনে তিনি বৈশিষ্ট্য খোঁজেন না, নিতান্ত আর দৈনন্দিন তুচ্ছতাকে অনেক সময় অপরূপ করে তুলেছেন। এর এক টুকরো উপমা হঠাৎ এসে চমকে দেয় যেন।' 'যাত্রারম্ভ' ও 'চাঁদ ও রাহু' কবিতাগ্রন্থদুটি পড়ে সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় বলেছেন, 'আমি গদ্যকবিতার জাতবৈরী হলেও আপনার কয়েকটি কবিতা আমার মৈত্রী লাভ করেছে। আপনার দুখানি বই ভালো হয়েছে; কারণ দুখানি বই-ই খাঁটি। কয়েকটি কবিতা মুগ্ধচিত্তে পড়েছি।' তাঁর সম্পর্কে 'কবি প্রজেশকুমার রায়' (শামসুর করিম কয়েস সম্পাদিত, ২০১১) স্মারকগ্রন্থ এবং 'প্রজেশকুমার রায় : কবি ও কবিতা' (সালেহ চৌধুরী সম্পাদিত, ২০১২) দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত। মৃত্যু. দাঙ্গায় ছুরিকাঘাতে শহিদ, ঢাকা, ৩০ এপ্রিল ১৯৬২।

প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, স্বামী (১৮৮৪-১৯২১)॥



জন্ম. গলাচিপা, পটুয়াখালী, ১২ আগস্ট ১৮৮৪। পৈতৃক নিবাস উজিরপুর, বরিশাল। আসল নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিপ্লবী গুরু। ১৯০১-এ প্রবেশিকা পাস। ঢাকায় এফ.এ. অধ্যয়ন। কর্মজীবনে নিজগ্রাম উজিরপুরে দু'বছর শিক্ষকতা। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) যোগদান। বরিশালে ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করার সময় অশ্বিনীকুমার দত্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ। তৎকালের বরিশালের সবচেয়ে শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠন 'স্বদেশবান্ধব সমিতি'র সহ-সম্পাদক নিযুক্ত। বরিশালের বিপ্লবী ঘাঁটি 'যুগান্তরের' বিশিষ্ট সদস্য। ১৯০৮-এ বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে অশ্বিনীকুমার গ্রেফতার হলে 'স্বদেশবান্ধব সমিতি'র দেড় শতাধিক শাখার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯০৯-এ এই প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বেআইনি ঘোষিত হলে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পড়াশোনা ও অধ্যাত্ম সাধনায় নিয়োজিত হন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস ও রাজনীতিতে জ্ঞান অর্জন। ১৯১৩-তে কাশীর শঙ্করাচার্য সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত। ১৯১৬-তে কাশীর বিপ্লবগুরু সন্দেহে পুলিশ কর্তৃক ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার হয়ে বরিশালে অন্তরীণ। পরে বরিশাল শঙ্করমঠে থাকার অনুমতি লাভ। তাঁর পরিচালনায় এই মঠই পরে যুগান্তর দলের কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। এরপর সরকার কর্তৃক মেদিনীপুরের মহিষাদলে অন্তরীণ। এখানে বহু লোক কর্তৃক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ। রচিত গ্রন্থ: রাজনীতি, বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, কর্মতত্ত্ব, সবলতা ও দুর্বলতা। মৃত্যু. ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২১।

প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, স্বামী (১৮৯৬-১৯৪১)॥ জন্ম, বাজিতপুর, রাজৈর, মাদারীপুর, ২৯ জানুয়ারি ১৮৯৬। সাধক, বিপ্লবী ও সমাজসংস্কারক। প্রকৃত নাম বিনোদ ভূঞা। পিতা বিষ্ণুচরণ ভূঞা ও মাতা সারদাদেবী। গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ। ১৯০৫-এ মাদারীপুরের বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস ও সন্তোষ দত্তের সংস্পর্শে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান।

১৯১৩-তে বাজিতপুর রাজকুমার অ্যাডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশনে দশম শ্রেণিতে ভর্তি। তাঁর আগ্রহে প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ১৯১৩-তে গোরক্ষপুরের মহাযোগী



গম্ভীরনাথজীর কাছে ব্রহ্মচর্য পালনের দীক্ষালাভ। ১৯১৪ সালে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারবরণ ও ফরিদপুর জেলে বন্দি। ১৯১৬-এ মাত্র ২০ বছর বয়সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় চারটি বাণী– 'এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ যুগ মাহমিলনের যুগ, এ যুগ মহাসমন্বয়ের যুগ, এ যুগ মহামুক্তির যুগ।' ১৯১৭-এ বাজিতপুরে আশ্রম স্থাপন। প্রতিবছর মাঘী পূর্ণিমায় এখানে উৎসব ও মেলা হয়। ১৯১৯-এ প্রচণ্ড ঘূর্ণি-ঝড়ে মাদারীপুর, খুলনা ও সাতক্ষীরায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণকার্য পরিচালনা। খবর পেয়ে প্রচুর অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেন বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ১৯২১-এ 'আচার্য প্রফুল্ল সংঘ' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা। ১৯২২-এ সাতক্ষীরার আশাশুনিতে এবং কলকাতায় বাগবাজারে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৩-এ উত্তরবঙ্গে বন্যায় রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ প্রভৃতি জেলায় দুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৪-এ নওগাঁ সেবাশ্রম গঠিত। সকল আশ্রম পরিচালনা, নানাবিধ জনসেবামূলক কাজ, দুস্থের সাহায্য প্রভৃতির জন্য ব্রহ্মচারী মহারাজের কাম্বের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। তাঁকে এই কাজের জন্য আশ্রমগুলোতে ঘুরে দেখতে হয়। কাজের প্রয়োজনে অর্থ-সংগ্রহের তাগিদে তাকে কলিকাতায় আসতে হয়। ১৯২৪-এ প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভমেলায় স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরির কাছে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ এবং স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ নাম ধারণ। ১৯২৬-এ পুরী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ' ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রধান তীর্থকেন্দ্র শাখা প্রতিষ্ঠা করে তীর্থযাত্রীদের সকলভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে চলছে। ঢাকা-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এর শাখা রয়েছে। ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য ... প্রেমের প্রতীক হিসেবে নন্দিত। মৃত্যু. কলকাতা, সমাধি মাদারীপুর, ৮ জানুয়ারি ১৯৪১

প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬)॥ জন্ম ১৩ মার্চ



১৯১৫, মুন্সিগঞ্জ। কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক। পারিবারিক পরিচয়ে তিনি বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী। বাবার নাম আশুতোষ সোম ও মায়ের নাম সরযূবালা সোম। প্রকৃত নাম রাণু সোম। সংগীতশিল্পী হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। রাণু সোম নামে তাঁর একাধিক গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। ১২ বছর বয়সে প্রথম তিনি গ্রামাফোন ডিস্কে রেকর্ড করেন। প্রতিভা বসুর প্রথম ছোটগল্প মাধবীর জন্য প্রকাশিত হয় ১৯৪২-এ এবং প্রথম উপন্যাস মনোলীনা প্রকাশিত হয় ১৯৪৪-এ। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও শিশুপাঠ্য রচনাসহ শতাধিক গ্রন্থ রচনা। 'ছোটগল্প' ও 'বৈশাখী' নামে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা। উল্লেখযোগ্য রচনা– উপন্যাস: মনোলীনা (১৯৪৪), সেতুবন্ধ (১৯৪৭), সুমিত্রার অপমৃত্যু, মনের ময়ূর (১৯৫২), বিবাহিতা স্ত্রী (১৯৫৪), মেঘের পরে মেঘ (১৯৫৮), মধ্যরাতের তারা (১৯৫৮), সমুদ্রহৃদয় (১৯৫৯), বনে যদি ফুটল কুসুম (১৯৬১), সমুদ্র পেরিয়ে (১৯৭৫) ইত্যাদি। ছোটগল্প: মাধবীর জন্য (১৯৪২), বিচিত্র হৃদয় (১৯৪৬), প্রতিভা বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প ইত্যাদি। প্রবন্ধ: মহাভারতের মহারণ্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক ও আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত। মৃত্যু. কলকাতা, ১৩ অক্টোবর, ২০০৬।

প্রতুলচন্দ্র সরকার, পি. সি. সরকার (১৯১৩-



১৯৭১)॥ জন্ম. টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩। যাদুকর, লেখক। যাদুকর পি.সি. সরকার নামে সমধিক খ্যাত। ১৯২৯-এ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা, ১৯৩৩-এ গণিতে অনার্সসহ বি.এ. পাস। তাঁর পরিবারে ... চর্চা ছিল ... গণপতি চক্রবর্তী তাঁর

যাদুবিদ্যা শিক্ষার শুরু। আই.এ. পড়ার সময়ই যাদু প্রদর্শন করে সুনাম অর্জন। ১৯৩৩-এ যাদুকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। ১৯৩৪-এ প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। ৭০টির মতো দেশে যাদু প্রদর্শন করে প্রভূত সুনাম অর্জন এবং বহু পুরস্কার লাভ। অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশন, বি.বি.সি., শিকাগোর ডাবলিউ. জি.এন.টি.ভি. এবং নিউইয়র্কের এন.বি.সি.-তে যাদু প্রদর্শন। ১৯৬২-তে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারের আমন্ত্রণে সে দেশ ভ্রমণ এবং মস্কো ও লেনিনগ্রাদে যাদু প্রদর্শন করে সুনাম অর্জন। বহু প্রাচীন যাদু খেলার মূল সূত্র আবিষ্কার। এক্স-রে আই, করাত দিয়ে মানুষ কাটা, ওয়াটার অফ দি ইন্ডিয়া প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য খেলা। এই সব অবিস্মরণীয় ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জার্মান, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশ থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকর হিসেবে স্বীকৃতি লাভ। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৬। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ ছেলেদের ম্যাজিক, ম্যাজিকের কৌশল, দেশে দেশে হিপনোটিজম মেস্‌মেরিজম্‌, সম্মোহনবিদ্যা প্রভৃতি। তিনিই প্রথম রাজকীয় পোশাক এবং আকর্ষণীয় পাগড়ি পরে যাদু প্রদর্শনের প্রচলন করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ স্টেজ ম্যাজিকের জন্য দু'বার 'দি ফিনিক্স অ্যাওয়ার্ড' লাভ। 'গোল্ডবার' পুরস্কার, জার্মানির 'সুবর্ণ লরেল মালা' এবং ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ও আন্তর্জাতিক রোটারি ক্লাবের সদস্য। ভারত সরকার তাঁর নব-আবিষ্কৃত খেলার পেটেন্ট করে দিতেন। মৃত্যু. ১৯৭০-এর ১৩ ডিসেম্বর. জাপান গমন এবং সেখানে আশাহিকাওয়ার নিকটবর্তী জিগেৎসু শহরে পরলোকগমন, ৬ জানুয়ারি ১৯৭১।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য (১৮৬১-১৯৪৪)॥ জন্ম. রাড়ুলি, খুলনা, ২ আগস্ট ১৮৬১। রসায়নশাস্ত্রবিদ, প্রাবন্ধিক। এক উচ্চবিত্ত ভূস্বামী পরিবারে জন্ম। ১৮৭৯-তে কলকাতার আলবার্ট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করে মেট্রোপলিটান ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন। ১৮৮২-তে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি নিয়ে লন্ডন গমন ও সেখান থেকে বি.এসসি. পাস। ১৮৮৭-তে রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এসসি. ডিগ্রি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হোপ পুরস্কার লাভ। ১৮৮৯-তে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত, ১৯১১-তে বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক পদে উন্নীত। অবসর গ্রহণের পর ১৯১৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের 'পালিত অধ্যাপক'। ঘি, সরিষার তেল-এ দুটি স্নেহজাতীয় খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল পদার্থ কতটা পরিমাণে আছে তা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণয় করে এ দেশের রসায়নশাস্ত্রের গবেষণায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন (১৮৯৪)। লেবুর রস বিশ্লেষণ করে সাইট্রিক অ্যাসিড, গবাদি পশুর হাড় থেকে ফসফেট অব সোডা ও সুপার ফসফেট অব লাইম এবং পারদের উপর অ্যাসিডের ক্রিয়ার দ্বারা মার্কিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কার তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। ১৯০১-এ রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা। ১৯২৪-এ তাঁর অর্থ সাহায্যে ও উদ্যোগে 'ইন্ডিয়া কেমিক্যাল সোসাইটি' স্থাপিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্র বিভাগের উন্নতির জন্যে দুই লক্ষ টাকা দান। এ ছাড়া নানা কল্যাণমূলক কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয়। ১৯২৪-১৯৪৪ পর্যন্ত যাদবপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি। ১৯৩১-এ মিউনিক শহরের ডয়টসে একাডেমি র ও ১৯৪৩-এ লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত। এ ছাড়া ১৯১০-এ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান সভার মূল সভাপতি এবং ১৯২০-এ অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান সভার মূল সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থঃ 'Life and Experience of a Bengali Chemist', 'History of Hindu Chemistry' (প্রথম খণ্ড ১৯০২, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৯), 'মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' এবং 'অন্ন সমস্যায় বাঙালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার'। 'আত্মচরিত' (১৯০৬) তাঁর জীবনচরিতমূলক গ্রন্থ। ১৯১১-তে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সি.আই.ই. ও ১৯২০-তে নাইট উপাধিতে ভূষিত। স্বদেশবাসী কর্তৃক আচার্য উপাধিতে আখ্যায়িত। ইতিহাস, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজি ও বাংলা বিজ্ঞানবিষয়ক বহু মূল্যবান



প্রবন্ধ প্রকাশ। সমাজ সংস্কারের প্রতিও তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। চিরকুমার ও ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী প্রফুল্লচন্দ্র রায় হিন্দু সমাজের জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বাঙালিদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোন্নতিবিধানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। অসহযোগ আন্দোলনের সময় (১৯২১) থেকে গান্ধীজীর ভক্ত হন এবং তাঁর খদ্দর প্রচারের একজন প্রধান উদ্যোক্তা। মৃত্যু. ১৬ জুন ১৯৪৪।



প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮)॥ জন্ম. বিহার গ্রাম, বগুড়া, ১৮৮৮। বিপ্লবী শহীদ। কিশোর বয়সে রংপুরে অধ্যয়নকালে সেখানে নিজের বাড়িতে কুস্তির আখড়া স্থাপন। ১৯০৩-এ 'বান্ধব সমিতি'তে যোগদান এবং গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য হিসেবে কর্ম সম্পাদন। স্বদেশি আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) সময়ে রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষাদান এবং বিপ্লবীকর্মে উৎসাহ প্রদান। ১৯০৬-এ কলকাতার বিপ্লবী নেতা বারীন ঘোষের সংস্পর্শ লাভ। বারীন ঘোষ কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট র‍্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মানিকতলার বাগানে বোমার আড্ডায় বিপ্লবীদের সঙ্গে বসবাস শুরু। ১৯০৮-এ কলকাতার তৎকালীন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড মজফ্ফরপুরের জজরূপে বদলি হলে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে মজফ্ফরপুরে প্রেরণ। ৩০ এপ্রিল ইউরোপিয়ান ক্লাব থেকে একটি ফিটন গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার সময় কিংসফোর্ড গাড়িতে আছেন ভেবে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। কিংসফোর্ড গাড়িতে না থাকায় বেঁচে যান। গাড়ির আরোহী দু'জন ইউরোপীয় মহিলা নিহত হন। ট্রেনে কলকাতায় পালিয়ে যাওয়ার সময় দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ধৃত হওয়ার মুহূর্তে রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা। বিপ্লবী কর্ম প্রচেষ্টায় তিনি দ্বিতীয় শহীদ। তাঁর ছদ্মনাম ছিল দীনেশ রায়। কিছুদিন পর বিপ্লবী সহকর্মীরা দারোগা নন্দলালকে হত্যা করে প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মৃত্যু. ১ মে ১৯০৮।



প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩)॥ জন্ম কলকাতা, ৭ জুলাই ১৯০৫। কথাসাহিত্যিক। আদি নিবাস ফরিদপুর। পিতা রাজেন্দ্রলাল সান্যাল (কলকাতার ওয়াউকিঙ্গ কোম্পানির অংশীদার)। চার বছর বয়সে পিতৃহীন। বাল্য ও কৈশোর মাতুলালয়ে দুঃখ-দুর্ভোগের মধ্যে অতিবাহিত। স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল (কলকাতা) ও সিটি কলেজে (কলকাতা) শিক্ষা লাভ। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) যোগ দিয়ে কিছুকাল কারাবরণ। মুক্তিলাভের পর সেনাবাহিনীতে কেরানির কাজ গ্রহণ। এ চাকরি ত্যাগ করে প্রথমে ছাপাখানার ম্যানেজার হন, পরে ডাক বিভাগে কর্ম গ্রহণ। কিছুকাল মাছের কারবারে নিয়োজিত। যুগান্তর পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক (১৯৩৭-১৯৪২)। বিজলী, স্বদেশ ও উপাসনা পত্রিকা সম্পাদনা। কিছুকাল আনন্দ বাজার পত্রিকার বার্তা বিভাগের দায়িত্ব পালন। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (১৯৫৬ ও ১৯৫৭), কলকাতা হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও হিমালয়ান ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসেবে কাগমারী (টাঙ্গাইল) সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান (১৯৫৭)। গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, যৌবনের প্রাবল্য, জাতীয় আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশভাগ, সমাজ-সংসারের স্বার্থপরতা এবং দরিদ্র মানুষের জীবনসংগ্রামের চিত্র তাঁর কথাসাহিত্যে আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্কিত। প্রবোধকুমার পরিব্রাজক। দেশভ্রমণের নেশা তাঁর চিরকালের। ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশে ভ্রমণ। ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা: মহাপ্রস্থানের পথে, দেবাত্মা হিমালয়, রাশিয়ার ডায়েরি। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: প্রিয়বান্ধবী (১৯৩১), আঁকাবাঁকা (১৯৩৯), নদ ও নদী (১৯৪০), শ্যামলীর স্বপ্ন (১৯৪৩), উত্তরকাল (১৯৪৯), হাসুবানু

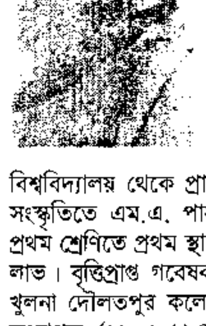
(১৯৫০), বসন্ত বাহার (১৯৬৭)। গল্পগ্রন্থ: যাযাবর (১৯২৮), চেনা ও জানা (১৯৩১), নিশিপদ্ম (১৯৩৩), অবিকল (১৯৩৩), অঙ্গার (১৯৩৭), কয়েক ঘণ্টা মাত্র (১৯৩৯)। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ: জলকল্লোল, বৃহস্পতির বৈঠক। মতিলাল স্মৃতি পুরস্কার (১৯৬০), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বর্ণপদক (১৯৬৬) ও আনন্দ পুরস্কার (১৯৮০) লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ১৯৮৩।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬)॥ জন্ম. শ্রীকোল গ্রাম, মাগুরা ১৮ নভেম্বর ১৮৯৮। পৈতৃক বাসস্থান খুলনা। পণ্ডিত, সাহিত্যের গবেষক, শিক্ষাবিদ। ১৯১৪-তে মাগুরা হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯১৮-তে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. এবং



১৯২০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম.এ. (প্রথম শ্রেণিতে প্রথম) পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯২১-এ স্যার আশুতোষ কর্তৃক বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ে প্রেরণ। সেখানে সিলভ্যা লেভির শিষ্যত্ব গ্রহণ। ১৯২২-এ অধ্যাপক লেভির আগ্রহে নেপাল গমন এবং নেপালের রাজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা। ১৯২৩-১৯২৬ পর্যন্ত প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোট ও চীনা ভাষা এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও শাস্ত্র বিষয়ে অধ্যয়ন এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা। তাঁর এই অধ্যয়ন ও গবেষণার ফল ফরাসি ভাষায় তিন খণ্ডে 'চীন দেশে বৌদ্ধশাস্ত্র' এবং দুই খণ্ডে 'সংস্কৃত চীনা অভিধান' গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থের জন্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Docteur-es-Letters ডিগ্রি লাভ। ১৯২৬-এ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। চর্যাপদ সংগ্রহ ও গবেষণার জন্য দ্বিতীয়বার নেপাল গমন। ১৯৩০-১৯৪৫ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা। ১৯৪৫-এ বিশ্বভারতীর চীনাভবনে গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান। ১৯৪৭-এ পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। ১৯৪৮-১৯৫১ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এবং পরে বিদ্যাভবনের গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হলে তার ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৯৫৪-তে বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিযুক্ত। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: দোহা কোষের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ, চর্যাপদের মূলপাঠ ও ব্যাখ্যা, Studies in the Tantaras ইত্যাদি। Sino-Indian Studies নামক চীন-ভারত সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা সম্পাদনা। আজীবন জ্ঞান সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে এই উপমহাদেশের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জটিল ও দুরূহ বিষয়সমূহের ওপর আলোকপাত তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান। মৃত্যু. ১৯ জানুয়ারি ১৯৫৬।

প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৮৭-১৯৮৬)॥ জন্ম. চুলতা গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৭ এপ্রিল ১৮৮৭। পৈতৃক নিবাস মণিঅন্ধ গ্রামে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ছান্দসিক। স্কুলজীবন কুমিল্লা শহরে অতিবাহিত। সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে বি.এ. অনার্স (ইতিহাস) ও কলকাতা



বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম.এ. পাস। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ। বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ছাত্র (১৯২৮-১৯৩২)। খুলনা দৌলতপুর কলেজের ইতিহাস ও বাংলার অধ্যাপক (১৯৩২-১৯৪২)। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনায় যোগদান। এর বিদ্যাভবনের রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও রবীন্দ্র-ভবনের অধ্যক্ষ (১৯৪২-১৯৫১), বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (১৯৫১-১৯৬২) এবং পুনর্গঠিত রবীন্দ্র-ভবনের রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ (১৯৬২-১৯৬৫)। ১৯৬৫-তে অধ্যাপনার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ। বিশ্বভারতীর এমেরিটাস অধ্যাপক (১৯৬৫-১৯৮৬)। বাংলা ছন্দের নিপুণ বিশ্লেষক। বাংলা ছন্দের ইতিহাস রচনায়, রবীন্দ্রনাথ ও অন্য প্রধান কবিদের ছন্দ বিশ্লেষণে, অন্য ছান্দসিকদের ছন্দ আলোচনার বিচারে, বাংলা ছন্দের ব্যাকরণ ও পরিভাষা

নির্মিতিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান। এছাড়া ইতিহাস, শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য, রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। প্রকাশিত ছন্দ-গ্রন্থাবলি: বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান (১৯৩১), ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৯৪৫), ছন্দ-পরিক্রমা (১৯৬৫), ছন্দ-জিজ্ঞাসা (১৯৭৪), বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা (১৯৭৭), বাংলা ছন্দ-চিন্তার ক্রমবিকাশ (১৯৭৮), ছন্দ-সোপান (১৯৮০), বাংলা ছন্দ-সাহিত্য (১৯৮০), বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ (১৯৮১), নতুন ছন্দ-পরিক্রমা (১৯৮১), বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তার অগ্রগতি (১৯৮৯)। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের সম্পাদনা। ইতিহাস ও সাহিত্যের সমালোচনামূলক গ্রন্থাবলি: ধর্মবিজয়ী অশোক (১৯৪৭), ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত (১৯৪৯), ভারত-পথিক রবীন্দ্রনাথ (১৯৬২), রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি (১৯৬২), ভারতাত্মা কবি কালিদাস (১৯৭৩)। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯৮৬।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)॥



জন্ম. মাতুলালয়, ধাত্রী গ্রামে, বর্ধমানে, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩। পৈতৃক নিবাস গুরুপ গ্রাম, হুগলী। কথাসাহিত্যিক। পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় (ই.আই. রেলের সিগনালার)। জামালপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স (১৮৮৮), পাটনা কলেজ থেকে এফ.এ. (১৮৯১) ও বি.এ. (১৮৯৫) পাস। কিছুকাল সিমলা সরকারি টেলিগ্রাফ অফিসে কেরানি পদে কর্ম সম্পাদন। আইন পড়ার জন্য বিলেত গমন (১৯০১)। ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে প্রত্যাবর্তন (১৯০৩)। দার্জিলিং, রংপুর ও গয়া আদালতে আইন ব্যবসায় (১৯০৩-১৯১৬)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত (১৯১৬)। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। ছোটগল্পের বিশিষ্ট শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের সমকালে যাঁরা ছোটগল্প রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম সরল ও অনাবিল হাস্যরসের গল্পলেখক-রূপেই তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। সাধারণ আটপৌরে জীবনের লঘু ও দুর্বল দিক তাঁর গল্পে হাস্যরসচ্ছটাযোগে উপস্থাপিত। রসময়ীর রসিকতা, বাস্তুসাপ, বলবান জামাতা, দেবী, আদরিণী, মাস্টার মশাই, ফুলের মূল্য প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প। ঔপন্যাসিক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। রত্নদীপ (১৯১৫) তাঁর একখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। গল্পাঞ্জলি (১৯১৩), গল্পবীথি (১৯১৬) প্রভৃতি তাঁর সুপরিচিত গল্প-সংকলন। ব্যঙ্গকাব্য: অভিশাপ (১৯৩০)। জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সহযোগে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকা সম্পাদনা। মৃত্যু. কলকাতা, ৫ এপ্রিল, ১৯৩২।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫)॥



জন্ম. রানাঘাট, নদীয়া, ২৫ জুলাই ১৮৯২। রবীন্দ্রজীবনীকার। পিতা নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (স্থানীয় উকিল)। স্ত্রী সুধাময়ী দেবী। রানাঘাট পালচৌধুরী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ। পিতার শরীর অসুস্থ হওয়ায় সপরিবার গিরিডি গমন এবং সেখানকার ন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি (১৯০৬)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) যোগ দেওয়ায় স্কুল থেকে বহিষ্কার (আগস্ট ১৯০৭)। কলকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রবর্তিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার (১৯০৮)। শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন (১৯০৯)। সেখানকার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক নিযুক্ত। এ শিক্ষায়তনে ১৯১০ জুন থেকে ১৯১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষকতা। রবীন্দ্রনাথের বিদেশে অবস্থানকালে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় আশ্রমের শিক্ষকতার কর্ম পরিত্যাগ। কলকাতা সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্তি লাভ (১৯১৭)। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুনরায় শান্তিনিকেতনে আগমন। পাঠভবনের শিক্ষকতা ও গ্রন্থাগারের কার্যভার গ্রহণ (১৯১৮)। বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের অধ্যাপক (১৯২৬-১৯৪১)। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারিকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ (১৯৫৪)। রবীন্দ্রনাথের সুবিস্তৃত, সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত জীবনচরিত 'রবীন্দ্রজীবনী' (১ম খণ্ড-১৯৩৩, ২য় খণ্ড-১৯৪৮, ৩য় খণ্ড-১৯৫২, ৪র্থ খণ্ড-১৯৫৬) রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। এতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব

ও সাহিত্যকীর্তি, সমাজ-শিক্ষা-ধর্ম-রাষ্ট্র প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) চিন্তাধারার বিশ্লেষণ নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত। গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ হিসেবেও খ্যাত। অন্যান্য গ্রন্থ: প্রাচীন ইতিহাসের গল্প (১৯০৯), ভারত পরিচয় (১৯২০), ভারতে জাতীয় আন্দোলন (১৯২৫), বাংলা দশমিক বর্গীকরণ (১৯৩৫), বঙ্গ পরিচয় (১ম খণ্ড-১৯৩৬, ২য় খণ্ড-১৯৪২), জ্ঞান-ভারতী (১ম খণ্ড-১৯৪০, ২য় খণ্ড-১৯৪২), বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ (১৯৫৯), রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য (১৯৭২), নব জ্ঞান ভারতী (১৯৭৬)। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী প্রভাতকুমার অসাম্প্রদায়িক, জাতিভেদবিরোধী ও মানবতাবাদী পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত। রবীন্দ্রজীবনীকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সর্বাধিক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লট (১৯৭৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৭৭) ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট (১৯৭৯) ডিগ্রি লাভ। মৃত্যু. শান্তিনিকেতন, ১৯৮৫।

প্রভাবতীদেবী সরস্বতী (১৮৯৬-১৯৭২)॥ জন্ম. খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, চব্বিশ পরগনা, ১৮৯৬। কথাশিল্পী। পিতার কর্মস্থল দিনাজপুরের বাল্যকাল কাটে। প্রথাগত শিক্ষা লাভ হয় নি। তবে পারিবারিক শিক্ষার ফলে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। 'ট্রেনিং সার্টিফিকেট পেয়ে উত্তর কলকাতার একটি স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আগ্রহে কলকাতা কর্পোরেশনের স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' নামক পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ। প্রথম উপন্যাস 'বিজিতা' ১৯২৮-এ ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। উপন্যাসখানি পরে বাংলায় 'ভাঙাগড়া', হিন্দিতে 'ভাবী' এবং মালয়ালাম ভাষায় 'কুলদেবম্' নামে ছায়াছবিতে চিত্রায়িত হয়। এ ছাড়া তাঁর 'পথের শেষে' নামক একটি উপন্যাস 'বাঙলার মেয়ে' নামে নাটকে রূপান্তরিত হয়ে বিশেষ সফলতার সঙ্গে দীর্ঘদিন অভিনীত হয়। গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে তিনি প্রায় তিন শতাধিক পুস্তকের রচয়িতা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস: অন্বা (১৯২২), আয়ুষ্মতী (১৯২৩), আমার কথা (১৯২৪), জাগরণ (১৯২৬), সংসার পথের যাত্রী, শুভা, অপরাধের জের, ব্রতচারিণী, রাঙা বৌ, মহীয়সী নারী, ব্যথিতা ধরিত্রী। গল্পগ্রন্থ: বিধবার কথা ইত্যাদি। এ ছাড়া কৃষ্ণা রোমাঞ্চ সিরিজ, ইন্টারন্যাশনাল সার্কাস প্রভৃতি ছোটদের জন্য লিখিত তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'লীলা পুরস্কার' প্রদান। নবদ্বীপে বিদ্বজ্জন সভা কর্তৃক 'সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু. ১৪ মে ১৯৭২।



প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)॥ জন্ম. পিতার কর্মক্ষেত্র যশোর, ৭ আগস্ট, ১৮৬৮। সাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস হরিপুর গ্রাম, পাবনা। পিতা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দুর্গাদাস চৌধুরী। জমিদার পরিবারে জন্ম। কলকাতা হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ.এ. পাস। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনে বি.এ. অনার্স (১৮৮৯) ও ইংরেজিতে এম.এ. (১৮৯০) ডিগ্রি লাভ। স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। আইন পড়ার জন্য ইংল্যান্ড গমন (১৮৯৩)। বার-এট-ল. পাস করে দেশে প্রত্যাবর্তন। স্বল্পকাল কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ (১৮৯৯)। কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনা। দক্ষিণেশ্বর ও গোপাল লাল এস্টেটের রিসিভার এবং ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার পদে দায়িত্ব পালন। ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত। 'বীরবল' ছদ্মনামে অনেক রচনা প্রকাশ। বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট শিল্পী। মার্জিত নাগরিক রুচি, প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি, অপূর্ব বাকচাতুর্য ও স্মিত রসিকতায় তাঁর গদ্যরচনা সমৃদ্ধ। বাংলা গদ্যের চলিত রীতিকে তৎকর্তৃক প্রথম সাহিত্যসৃজনে প্রয়োগ। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হালখাতা' তাঁর চলিত রীতির প্রথম গদ্য রচনা (১৯০২)।



মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সবুজ-পত্র'(১৯১৪-১৯২৭/বৈশাখ ১৩২১/শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) সম্পাদনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। একে কেন্দ্র করে চলিত ভাষার একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। 'সবুজ-পত্র' কেন্দ্রিক ভাষা ও সাহিত্যাদর্শ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে বলিষ্ঠ সমর্থন লাভ। রবীন্দ্রনাথের কথ্য ভাষায় লেখা উপন্যাস 'শেষের কবিতা' 'সবুজ-পত্রে' প্রকাশিত হলে প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষার আন্দোলনের ব্যাপক সফলতা অর্জন। রবীন্দ্র-যুগে আর্বিভূত হলেও তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রবর্তক হিসেবে ও বিদ্রূপাত্মক প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর তেল-নুন-লাকড়ি (১৯০৬), বীরবলের হালখাতা (১৯১৬), নানাকথা (১৯১৯), আমাদের শিক্ষা (১৯২০), রায়তের কথা (১৯২৬), নানাচর্চা (১৯৩২), প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম খণ্ড-১৯৫২ ও ২য় খণ্ড-১৯৫৩) প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। কবিতা ও ছোটগল্পের রচয়িতা হিসেবেও খ্যাত। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে ইতালীয় সনেটের প্রবর্তক হিসেবে স্থান লাভ। সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩) ও পদচারণ (১৯১৯) তাঁর কবিতাগ্রন্থ। চার ইয়ারী কথা (১৯১৬), আহুতি (১৯১৯), নীল লোহিত ও গল্পসংগ্রহ (১৯৪১) তাঁর গল্পগ্রন্থ। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (১৯২৬) ও কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (১৯৩৭) সভাপতির দায়িত্ব পালন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ (১৯৩৮)। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' সম্পাদনা। মৃত্যু. শান্তিনিকেতন, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ (১৬ ভাদ্র, ১৩৫৩)।

প্রমথনাথ চৌধুরী (১৯০১-১৯৮০)॥ জন্ম. বেনারস শহর, ১৯০১। পৈতৃক নিবাস পাবনা। সংগীতশিল্পী। মনোরঞ্জন রায়ের কাছে তবলাবাদন শিক্ষার মধ্য দিয়ে সংগীত শিক্ষাজীবনের শুরু। খেয়াল ও ঠুংরী গায়িকা সুবালা দেবীর নিকট কণ্ঠসংগীতে তালিম গ্রহণ। জ্ঞানদা গোস্বামী ও দিলীপ কুমার রায়ের কাছে ধ্রুপদ ও খেয়ালের পাঠ গ্রহণ। ওস্তাদ খলিফা বাদল খাঁর অন্যতম শিষ্য। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা লাভ। লক্ষ্ণৌর মরিস কলেজে তিন বছর সংগীতের অনুশীলন। কিছুকাল কলকাতায় অবস্থান এবং কবি কাজী নজরুল ইসলাম, তানসেন বংশীয় ওস্তাদ শওকত আলী খাঁ, ওস্তাদ দবীর খাঁ এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় ও তাঁদের কাছ থেকে সংগীত বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন। ১৯৪০-এ পিতৃভূমি পাবনার হরিহরপুর গ্রামে প্রত্যাবর্তন ও সংগীত বিষয়ে শিক্ষকতা শুরু। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। কবি-গৃহের সংগীত পরিবেশে রবীন্দ্রসংগীতে ব্যুৎপত্তি অর্জন। মৃত্যু. ১৯৮০।

প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫)॥ জন্ম. জোয়াড়ী গ্রাম, নাটোর, ১১ জুন ১৯০১। সাহিত্যিক। জমিদার পরিবারে জন্ম। পিতা নলিনীনাথ বিশী (বৃহৎ রাজশাহী জেলার প্রথম গ্রাজুয়েট ও প্রভাবশালী জমিদার কেশবনাথ বিশীর দত্তক পুত্র), মাতা সরোজবাসিনী দেবী, স্ত্রী সুরুচি দেবী।



শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু (১৯১০)। সেখানে একনাগাড়ে সতেরো বছর অধ্যয়ন। মেধা, প্রখর বুদ্ধি, অধ্যয়ননিষ্ঠা, কবি-প্রতিভা প্রভৃতি গুণাবলির জন্য রবীন্দ্রনাথের স্নেহ লাভ। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে মেট্রিক (১৯১৯) ও আই.এ. (১৯২৭) পাস। রাজশাহী কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. (১৯২৯) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯৩২)। রামতনু লাহিড়ী গবেষণা বৃত্তি পেয়ে তিন বছর গবেষণাকার্যে নিয়োজিত থাকেন (১৯৩৩-১৯৩৬)। সেই গবেষণার ফসল 'রবীন্দ্র-কাব্য প্রবাহ' (১৯৩৯) গ্রন্থ। ১৯৩৬-এ কলকাতা রিপন কলেজে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯৪৬ পর্যন্ত এ কলেজে অধ্যাপনা। 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক (১৯৪৬-১৯৪৯)। ১৯৫০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্তি লাভ। রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (১৯৬৩-১৯৬৬)। ১৯৭১-এ অধ্যাপনার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন নিপুণ বিশ্লেষক হিসেবে খ্যাত। মধুসূদন ও বঙ্কিম সাহিত্যের একজন দক্ষ আলোচক। কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচনায়ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয়

প্রদান। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ও সামাজিক উপন্যাস এবং ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসাশ্রিত সামাজিক নাটকের একজন বিশিষ্ট স্রষ্টা। প্রকৃতি ও নারীপ্রেম তাঁর কবিতায় মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত। গ্রন্থ: কাব্য/ দেয়ালী (১৯২৩), বসন্ত সেনা (১৯২৭), যুক্তবেণী (১৯৪৮), হংস মিথুন (১৯৫০), উত্তর মেঘ (১৯৫৩), কিংশুক বহ্নি (১৯৫৯), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৬১)। উপন্যাস/পদ্মা (১৯৩৬), জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার (১৩৭), অশ্বত্থের অভিশাপ (১৯৪৭), চলনবিল (১৯৫১), কেরী সাহেবের মুন্সী (১৯৫৮), লালকেল্লা (১৯৬৩), বঙ্গভঙ্গ (১৯৮৩)। গল্প/গল্পের মতো (১৯৪৫), গালি ও গল্প (১৯৪৫), ধনেপাতা (১৯৫২), ছোটগল্প সংগ্রহ (২য় খণ্ড), স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৬০)। নাটক/ঋণংকৃত্যা (১৯৩৫), ঘৃতং পিবেৎ (১৯৩৬), মৌচাকে ঢিল (১৯৩৮), গবর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টর (১৯৪৩), পারমিট (১৯৪৭), ভূতপূর্ব স্বামী (১৯৪৭)। প্রবন্ধ/রবীন্দ্র-কাব্য প্রবাহ (১৯৩৯), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৯৫৪), রবীন্দ্র-নাট্য প্রবাহ (১৯৫৫), রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (১৯৫৫), রবীন্দ্র বিচিত্রা (১৯৫৫), রবীন্দ্র সরণী (১৯৬৫), শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৫), বঙ্কিম সরণী (১৯৬৬), মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ (১৯৭৪)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র-পুরস্কার (১৯৬০) ও বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮২), ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত জগত্তারিণী পুরস্কার (১৯৮৩) লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ১০ মে ১৯৮৫।

প্রমথনাথ রায় (১৯০০-১৯৪৪)॥ জন্ম. কিশোরগঞ্জের বনগ্রামে, ১৯০০। বহুভাষাবিদ, অধ্যাপক ও লেখক। বনগ্রাম স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাস করে বিহারের অন্তর্গত হাজারিবাগ মিশনারি কলেজে ভর্তি। আই.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। কর্মজীবনে প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা। পরে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। প্রখ্যাত ইতালীয় অধ্যাপক তুচ্চি ভারতে এলে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় এবং পরে তাঁরই উদ্যোগে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য ইতালি সরকারের বৃত্তি লাভ। ১৯৩২-৫ ইতালি যুদ্ধে এবং রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাতিন ভাষা ও সাহিত্যে ডি.লিট. ডিগ্রি লাভ। লাতিন ছাড়াও হিস্পানি, ফরাসি ও জার্মান ভাষা শিক্ষা। দেশে ফিরে (১৯৩৬) পূর্ববর্তী কর্মস্থল বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ও অন্যান্য বিদেশি ভাষার অধ্যাপকরূপে যোগদান। রোমে থাকাকালীন ভারতীয় ছাত্রসমিতির সম্পাদক এবং মুসোলিনি-সুভাষচন্দ্র বসু ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের দোভাষী। কাশী থেকে প্রকাশিত বাংলা মাসিক পত্র 'উত্তরা'য় এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত রামানন্দ চ্যাটার্জির 'মর্ডান রিভিউ' ইংরেজি মাসিকে নিয়মিত লিখতেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: নিরালা (ছোটগল্প), বাংলা ভাষার আজ ও কাল (প্রবন্ধসংকলন) Mussolini, the Cult of Italian Youth এবং P.B. Shelly/the Romantic. মৃত্যু. খাদ্যের বিষক্রিয়ায়, কাশী, জুন ১৯৪৪।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭৩-১৯৪৯)॥ জন্ম. সন্তোষ, টাঙ্গাইল, ১৮৭৩। গীতিকবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ সম্ভব না হলেও ইংরেজি সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে মিলে 'সাহিত্য সঙ্গত' নামক



সাহিত্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন। 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'মানসী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ। 'সুহৃৎ' নামক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা। সৌহার্দ্যের নিদর্শনস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ 'কণিকা' কাব্য প্রমথনাথের নামে উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথের নামে প্রমথনাথ উৎসর্গ করেন তাঁর 'পদ্মা' কাব্য। কবিতাগ্রন্থ: পদ্মা (১৮৯৮), দীপালী (১৯০১), গীতিকা (১৯০০), গান (১৯০২), গৌরাঙ্গ (১৯০২), গীতি, আরতী (১৯০২), দীপ্তি, কবিতা (১৯০৫), যমুনা (১৯০৫), গল্প (কাব্যকাহিনী, ১৯০৫), দেশশক্তি (১৯০৫), গাথা (১৯০৫), আখ্যায়িকা, গৌরব গীতিকা, গৈরিক (১৯১৩), পাথার (১৯১৪), চিত্র ও চরিত্র (১৯১৫), পাথেয় (১৯১৫), পাষাণ (১৯১৫), লীলা, তাজ (১৯২১), স্মরণ (১৯৩৭)। রবীন্দ্র অনুগত কবি হিসেবে পরিচিত। নাটক: ভাগ্যচক্র (১৯১৩), হাম্বির

(১৯১৫), আক্কেল সেলামী (১৯১৬), চিতরোদ্ধার (১৯১৮), জয়পরাজয় (১৯১৮), দিল্লি অধিকার (১৯২৪)। মৃত্যু. ৬ জানুয়ারি ১৯৪৯।

প্রমথেশ বড়ুয়া (১৯০৩-১৯৫১)॥ জন্ম. গৌরীপুর, আসাম, ২৪ অক্টোবর ১৯০৩। গৌরীপুরের জমিদার রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া তাঁর পিতা। চলচ্চিত্র অভিনেতা ও পরিচালক। ১৯২০-তে কলকাতা হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস। ১৯২৪-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এসসি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯২৮-এ মনোনীত সদস্য হিসেবে আসাম আইন সভায় যোগদান। ১৯৩০-এ উক্ত আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। আইন সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলের চিফ হুইপ। ১৯২৯-এ চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন। একই বছর ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম লিমিটেড বোর্ড অব ডাইরেক্টরের সভ্য নিযুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানের 'পঞ্চশর' ছায়াছবিতে অভিনয়। ১৯৩০-এ ইউরোপে গমন এবং প্যারিসে চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিক্ষা লাভ। এই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত। ১৯৩১-এ 'বড়ুয়া ফিল্ম' নামে নিজস্ব চিত্রসংস্থা নির্মাণ এবং এই প্রতিষ্ঠানের 'অপরাধী' ছায়াছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়। এই ছবিতে যে কৃত্রিম আলোকচিত্রের সাহায্য নেয়া হয় তার প্রবর্তকও তিনি। 'বাংলা-১৯৮৩' নামক সবাক ছায়াচিত্রের পরিচালক। ১৯৩৩-এ 'নিউ থিয়েটার্স' নামক চলচ্চিত্র সংস্থায় যোগদান। 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'মুক্তি', 'জিন্দেগী' প্রভৃতি চলচ্চিত্র নির্মাণ করে খ্যাতির শিখরে আরোহণ। 'দেবদাস' ও 'গৃহদাহ' ছবিতে পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে কাজ করে সুনাম অর্জন। সুরকার হিসেবে খ্যাতি লাভ। এ ছাড়া বিলিয়ার্ড ও টেনিস খেলায়ও উৎসাহী ছিলেন। ১৪টি বাংলা, ৭টি হিন্দি ছবি পরিচালনা। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ১৯৫১।



প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (১৮৯৩-১৯৭২)॥ জন্ম. কলকাতা, ২৯ জুন ১৮৯৩। সংখ্যাতত্ত্ববিদ ও নৃতাত্ত্বিক। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অন্তরঙ্গ সহচর। প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভের পর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। কেম্ব্রিজ থেকে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সে প্রথম শ্রেণিসহ ট্রাইপস লাভ। পরে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে যোগদান। এই-সূত্রে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানে অধ্যাপনা আরম্ভ। পরে এই কলেজের অধ্যক্ষ এবং অবসর গ্রহণের পর এমিরিটাস অধ্যাপক পদে নিযুক্তি লাভ। মূলত পদার্থবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হলেও বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও দক্ষতার পরিচয় প্রদান। নৃতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান। 'Analysis of Race Mixture in BengalÕ নৃতত্ত্ববিষয়ক তাঁর একখানি প্রসিদ্ধ গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভ। এই গবেষণা সূত্রটি 'মহলানবীশ ডিসট্যান্স' নামে খ্যাত। ১৯২২-এ এ বিষয়ে 'The Statistical Analysis of Anglo-Indian StatureÕ নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ। আবহাওয়াতত্ত্বেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। এ বিষয়ে একাধিক মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে অনেক নতুন তথ্যের উদ্ভাবন। ১৯২২-এ তৎকালীন বঙ্গীয় সরকারের আগ্রহে বন্যার উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষণাকর্ম সম্পাদন। এই গবেষণা ওড়িষ্যার হীরাকুঁদ বাঁধ নির্মাণে সহায়ক হয়। সংখ্যাতত্ত্বের গবেষণায় বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন। জীবনের উল্লেখযোগ্য কীর্তি 'Indian Statistical Institute' নামক বিজ্ঞান সংস্থার প্রতিষ্ঠা। আজীবন এই সংস্থার পরিচালক। সংখ্যাতত্ত্বে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (F.R.S) মনোনীত। প্রশান্ত মহলানবীশ ছিলেন মূলত বৈজ্ঞানিক। তবে সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রতিও উৎসাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে ১৯২১-১৯৩১ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের কর্মসচিবরূপে দায়িত্ব পালন। মৃত্যু. ২৮ জুন ১৯৭২।



প্রিয়দারঞ্জন রায় (১৮৮৮-?)॥ জন্ম. নয়াপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম, ১৬ জানুয়ারি ১৮৮৮। রসায়নশাস্ত্রবিদ। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯০৪-এ প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করে রায়বাহাদুর গোলকচন্দ্র বৃত্তি লাভ। ১৯০৬-এ চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই.এ., ১৯০৮-এ

রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় অনার্সসহ কলকাতা



প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাস। ১৯১১-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম.এ. (রসায়ন) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক ও মতিলাল স্বর্ণপদক লাভ। ১৯১৪-১৯১৮ পর্যন্ত সিটি কলেজে অধ্যাপনা। এরপর সহকারী অধ্যাপকরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে যোগদান। এখানে ১৯১৯-১৯২৮ পর্যন্ত অধ্যাপনা। মৌলিক প্রবন্ধ রচনায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন এবং ডি.এসসি. ডিগ্রি লাভ। ১৯৩৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা অধ্যাপক, ১৯৪৬-এ পালিত অধ্যাপক ও রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: বিশ্বের উপাদান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি, রসায়ন ও সভ্যতা, বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ, অতিকায় অপুর অভিনয় কাহিনী। মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

প্রিয়নাথ বৈরাগী (১৮৮৬-১৯৫৭)॥ জন্ম. ইন্দুরকানী, বরিশাল, ৩ জুন ১৮৮৬। খ্রীষ্টসংগীত রচয়িতা, সুরশিল্পী ও সাধকপুরুষ। পিতা শ্রীনাথ বৈরাগী, মাতা স্বর্ণকুমারী। পূর্ব পুরুষদের নিবাস বরিশালের গৈলাগ্রামে। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণ। বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে বংশীয় উপাধি বর্জন করে 'বৈরাগী' উপাধি গ্রহণ। এক পর্যায়ে তাঁরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। শ্রীরামপুর মিশন স্কুলে পড়াশুনা শুরু। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং এফ.এ. পাস করেন। পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়ায় সংসারের দায়িত্ব কাঁধে পড়ে। সুন্দরবনের বনকর বিভাগে চাকরিতে যোগদান। পরে নোয়াখালীতে একটি মিশন স্কুলে শিক্ষকতা। ১৯১৫-এ ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা লাভের জন্য শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি। পরে বরিশালে, খুলনা, কলকাতা, কটক ও শ্রীরামপুরে বিভিন্ন মিশনে দায়িত্ব পালন। ১৯১২-এ ইচ্ছাময়ী মোহান্তি নামে এক বিদুষী নারীকে বিয়ে করেন। ১৯২৫-এ চাকরি ত্যাগ করে বরিশালে পৈতৃক ভিটায় চলে আসেন। গৌরনদীতে রোমান ক্যাথলিক কুঠিতে বাইবেল ও বাইবেল বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক অনুবাদের কাজ নেন। বরিশাল ও ফরিদপুরের গ্রামাঞ্চলে তখন 'পাগলা সমিতি' নামে একটি সংস্থা কার্যকরী ছিল। তাঁরা পাগলা অর্থাৎ ঈশ্বরের নামে উন্মত্ত। তাঁরা কোনোস্থানে সমবেত হতেন এবং ঈশ্বরের প্রশংসার ও প্রেমে আকুল হয়ে সংগীতে, নৃত্যে, প্রার্থনায় আত্মনিবেদনের আকুতিতে মেতে উঠতেন। প্রিয়নাথের রচিত গান গেয়ে ভক্তরা আবেগ বিহ্বল হয়ে, অশ্রু সংবরণ করতে পারতো না। ১৯৩৫-এ বঙ্গীয় ব্যাপ্টিস্ট সংঘের মিশনারি হিসেবে মিশনের দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৩৮-এ ঢাকায় বদলি হন। ঢাকায় অবস্থানকালে বেশ কিছু সংখ্যক গান রচনা। ১৯৪৮-এ কর্মজীবন থেকে আসর গ্রহণ। 'অবকাশরঞ্জন' নামে গ্রন্থে তাঁর কবিতা, গান, গল্প ও রসরচনা সংকলিত। খ্রীষ্টানদের কবিগানের দল প্রতিষ্ঠা করে এবং গান রচনা করে তাদের দ্বারা গাওয়াতেন। শেষজীবন কাটে শ্রীরামপুরে। অসাধারণ বাগ্মী। খ্রীষ্টীয় যেকোন উৎসব এবং সেবক সমিতির অনুষ্ঠানে তাঁর গান এখনো গীত হয়। মৃত্যু. শ্রীরামপুর, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৭।

প্রীতিকুমার মিত্র (১৯৪২-২০০৭)॥ জন্ম. কালীচরণপুর,



ঝিনাইদহ, ৮ নভেম্বর ১৯৪২। গবেষক ও লেখক। পৈতৃক নিবাস নিবাস পোড়াহাটি গ্রাম, ঝিনাইদহ। মাতার নাম অমিয়বালা গুহরায়। পিতার নাম প্রদ্যুৎকুমার মিত্র। তিন বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটলে মাতুলালয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস। স্ত্রীর নাম সুমিতা ভৌমিক। প্রাথমিক শিক্ষা কালীচরণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (১৯৫০-১৯৫৪), মাধ্যমিক শিক্ষা ঝিনাইদহ সদর হাইস্কুলে (১৯৫৫-১৯৬০), উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজে (১৯৬০-১৯৬২), বিএ অনার্স (ইতিহাস, ১৯৬৫) এবং এমএ (ইতিহাস, ১৯৬৬) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিএ অনার্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণি পান। ১৯৭৭-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন এবং ১৯৮৫-এ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম: 'Dissent in Modern India (1815–1930): Concentrating on Two Rebel

Poets—Michael Madhusudan Datta and Kazi Nazrul Islam'। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক জগদীশ পি শর্মা। ১৯৬৭-এর আগস্ট মাসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ কলেজে ইতিহাসের প্রভাষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। ১৯৬৮-এ তিনি ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হিসেবে নিয়োগ পান, নভেম্বর ১৯৬৮ থেকে আগস্ট ১৯৭০ পর্যন্ত লাহোর ও করাচিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং চট্টগ্রামে তাঁর কর্মস্থলে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ট্রেড অ্যান্ড কমার্স ডিপার্টমেন্ট-এ স্টাফ অফিসার হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭৪-এর ১লা এপ্রিল সহকারী অধ্যাপক হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগ দেন। ১৯৭৭-এর আগস্ট থেকে ১৯৮৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত আমেরিকা থাকার পর ১৯৮৫-এর জানুয়ারি মাসে দেশে ফিরে আসেন। মাত্র কয়েক মাস অননুমোদিতভাবে বিদেশে থাকার কারণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এরপর ১৯৮৫-এর নভেম্বর মাসে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এখানে ১৯৯০-এ তিনি সহযোগী অধ্যাপক পদে এবং ১৯৯৭-এ তিনি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। ২০০০-এর ১লা জানুয়ারি থেকে তিন বছর তিনি এই প্রতিষ্ঠানে পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ড. মিত্রের গবেষণার এলাকা বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস। এ বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ তিনি বাংলাদেশে, ভারতে, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থাপন করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের উপরে লেখা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'দি ডিসেন্ট অব নজরুল ইসলাম: পোয়েট্রি অ্যান্ড হিস্টরি'। গ্রন্থটি ২০০৭-এ অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস (দিল্লি) প্রকাশ করে। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই: 'চিন্তার স্বাধীনতার ইতিহাস' (অনুবাদ, ঢাকা, ২০০৭) এবং 'বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস: ভাববিদ্রোহ ও বুদ্ধিসংস্কার' (প্রবন্ধ সংকলন, ঢাকা, ২০১০)। মৃত্যু: রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৮ অক্টোবর ২০০৭।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২)॥ জন্ম. চট্টগ্রাম, ৫ মে ১৯১১। বিপ্লবী। চট্টগ্রাম থেকে মেট্রিক পাস করার পর ঢাকার ইডেন কলেজে ভর্তি। ১৯২৯-এ ইডেন কলেজ থেকে আই.এ.-



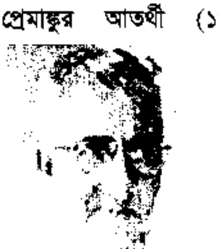
তে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক বিশ টাকা বৃত্তি পেয়ে কলকাতা বেথুন কলেজে পড়ার জন্য গমন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষায় ডিস্টিংশনসহ পাস। এরপর চট্টগ্রামের নন্দন কানন অপর্ণাচরণ মধ্য ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত। ইডেন কলেজে পড়ার সময়ে বিপ্লবী সংগঠন 'দিপালী সঙ্ঘ'র সঙ্গে সংযুক্ত। বেথুন কলেজের ছাত্রী থাকাকালে ছাত্রী সঙ্ঘের সক্রিয় কর্মী। ক্রমে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের চারজন মেয়ে ও অন্য কয়েকজন ছাত্রী নিয়ে একটি চক্র গঠন। ১৯৩০-এ সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ঐ চক্রকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কলকাতার গোপন কারখানা থেকে বোমা বানানোর খোল আনার জন্য। সুটকেসে লুকিয়ে বোমার খোল আনেন। চট্টগ্রামের ১৯৩০-এর অস্ত্রাগার দখল পরবর্তী বিপ্লবী কার্যক্রমে ঐ খোলের বোমাগুলোই ব্যবহৃত। ১৯৩২-এর ১৩ জুন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র ধলঘাটের গোপন ঘাঁটিতে সূর্য সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। গোপন-সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ কর্তৃক বাড়ি ঘেরাও। বিপ্লবী নির্মল সেনের অব্যর্থ গুলিতে ইংরেজ ক্যাপ্টেন ক্যামারুন নিহত। দুই তরফের গুলি বর্ষণের ফলে নির্মল সেনেরও মৃত্যুবরণ। বাড়ির পেছন দিয়ে সূর্য সেন ও প্রীতিলতার পলায়ন। বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ ক্লাবের বাইরে একটি ফলকে ইংরেজিতে লেখা ছিল 'কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ'। ঐ ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য মাস্টারদা সূর্য সেন তাঁর অনুসারীদের জানিয়ে দিলেন যে, ১৯৩২-এর ২৩ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করা হবে এবং তার নেতৃত্বভার প্রীতিলতার উপর অর্পিত হয়েছে। প্রীতিলতা কর্তৃক এই কাজ অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন। অনেক ইংরেজ নরনারী হতাহত। বিপ্লবী সাথীদের পেছনে পেছনে বিজয়িনীর গর্বে ফেরার সময়ে নালার মধ্যে আত্মগোপনকারী জনৈক ইংরেজ যুবকের গুলিতে আহত অবস্থায়

পটাশিয়াম সায়োনাইড ভক্ষণ। স্বহস্তে লিখিত যে বিবৃতি তাঁর মৃতদেহের পোশাকের মধ্যে পাওয়া যায় তার এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'আমরা দেশের মুক্তির জন্যে এই সশস্ত্র যুদ্ধ করিতেছি। অদ্যকার পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ স্বাধীনতাযুদ্ধের একটি অংশ। ব্রিটিশ জোরপূর্বক আমাদের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইয়াছে।... সশস্ত্র ভারতীয় নারী সমস্ত বিপদ ও বাধাকে চূর্ণ করিয়া এই বিদ্রোহ ও সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিবেন এবং তাহার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিবেন—এই আশা লইয়া আমি আজ আত্মদানে অগ্রসর হইলাম।' পূর্ববাংলায় ষাটের দশকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ৬ দফাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রীতিলতার বীরত্ব ও আত্মত্যাগ আন্দোলনকারীদের শক্তি ও সাহস যুগিয়েছিল। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩২।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ (১৮৩১-১৯১৮)॥ জন্ম. সুরাট, গুজরাট, ১৮৩১। দানবীর ও সমাজসেবক। ১৬ বছর বয়সে পিতার সহকারী রূপে ব্যবসায় সংক্রান্ত শিক্ষা লাভ। তুলার ব্যবসায়ে অগাধ সম্পদের অধিকারী। জীবনভর সামাজিক কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয়, মোট ষাট লক্ষ টাকা দান। তাঁর প্রদত্ত দুই লক্ষ টাকার সুদ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' নামে গবেষণা-বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৮৬৮-তে এই বৃত্তি প্রথম প্রদত্ত হয়। মৃত্যু. জুলাই ১৯১৮।



প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪)॥ জন্ম. ফরিদপুর, ১ জানুয়ারি ১৮৯০। স্থায়ী নিবাস কলকাতা। চিত্রপরিচালক, সাংবাদিক ও কথাশিল্পী। ছেলেবেলায় ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। এরপর ডাফ স্কুল, কেশব একাডেমি, সিটি কলেজ স্কুল এবং ব্রাহ্ম বয়েজ বোর্ডিং এন্ড ডে স্কুলে পড়াশুনা। অল্প বয়সেই বোম্বাই গমন. ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁর কাছে সেতার বাদন শিক্ষা। কলকাতার চৌরঙ্গী এলাকায় এক ক্রীড়া সামগ্রীর দোকানে চাকরি গ্রহণ। কিছুদিন পর সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ। বৈঠক, যাদুঘর, হিন্দুস্থান, ভারতবর্ষ, সংকল্প, নাচঘর, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা। এছাড়া বেতার জগতের প্রথম সম্পাদক। সিনেমা জগতের সঙ্গে সংশ্লিস্ট। পুনর্জন্ম নামক কথাচিত্রে অভিনয় এবং কয়েকটি ছায়াছবি পরিচালনা। পরিচালিত ছায়াছবিঃ দেনা-পাওনা, কপালকুণ্ডলা, দিকশূল, ভারত-কী-বেটী, সরলা, সুধার প্রেম, ইহুদী-কী-লাড়কী ইত্যাদি। একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। তাঁর রচনাগুলো সাধারণত ছোট অথবা বড় গল্প কিংবা আত্মকথা জাতীয়। কাহিনী অভিজ্ঞতাশ্রিত ও বাস্তবঘেঁষা। রচনারীতি কথ্য ভাবাশ্রিত ও ব্যঙ্গাত্মক। প্রকাশিত গ্রন্থঃ আনার কলি (১৯২৫), বাজীকর (১৯২১), চাষার মেয়ে (১৯২৪), কল্পনা দেবী (১৯৩১), দুই রাত্রি (১৯২৭), তখত তাউস, মহাস্থবির জাতক (১ম খণ্ড-১৯৪৪, ২য় খণ্ড-১৯৪৭ ও ৩য় খণ্ড-১৯৫৪)। মৃত্যু. ১৩ অক্টোবর ১৯৬৪।



প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)॥ জন্ম. কাশী, ১৯০৪। কবি, কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক। পিতা রেলের চাকুরে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র। লেখাপড়া কলকাতা ও ঢাকাতে। কলকাতা সাউথ সুবার্বন স্কুলের ছাত্র। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে কিছুদিন বিজ্ঞান অধ্যয়ন। স্কুল শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবনের শুরু। কিছুকাল পরে শিক্ষকতার কর্ম ত্যাগ করে 'কল্লোল' পত্রিকায় যোগদান। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মুরলীধর বসুর সহযোগিতায় 'কালি কলম' পত্রিকা প্রকাশ। 'বাংলার কথা', 'বঙ্গবাণী', 'সংবাদ' প্রভৃতি পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে দায়িত্ব পালন। কল্লোলগোষ্ঠীর বিশিষ্ট লেখক। উত্তর-তিরিশের আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের স্থপতিদের মধ্যে একজন। পরা-বাস্তবতাভিত্তিক গণমানুষের প্রতি সংবেদনশীল যে সাহিত্যধারা কল্লোলগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তার প্রতিফলন ঘটেছে



প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে ও গল্প-উপন্যাসে। জীবনের দুঃখ ও হতাশাকে রূপায়ণে কুশলতার পরিচয় প্রদান। সাধারণ মানুষের প্রতি অনুরাগই তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থ: কাব্য/প্রথমা (১৯৩২), সম্রাট (১৯৪০), ফেরারী ফৌজ (১৯৪৮), সাগর থেকে ফেরা (১৯৫৬), হরিণ চিতা চিল (১৯৫৯), কখনো মেঘ। উপন্যাস/পাঁক (১৯২৬), মিছিল (১৯৩৩), উপনয়ন (১৯৩৪), আগামীকাল (১৯৩৪), প্রতিশোধ (১৯৪১), কুয়াশা, প্রতিধ্বনি ফেরে, মনুদ্বাদশ। গল্প/পঞ্চশর (১৯২৯), বেনামী বন্দর (১৯৩০), পুতুল ও প্রতিমা (১৯৩২), মৃত্তিকা (১৯৩২), অফুরন্ত (১৯৩৫), ধূলিধূসর (১৯৪৩), মহানগর (১৯৪৩), জল পায়রা (১৯৫৭), শ্রেষ্ঠ গল্প, নানা রঙে বোনা (১৯৬০), নির্বাচিত (১৯৭৭)। মৃত্যু. কলকাতা, পাকস্থলীর ক্যান্সারে, ৩ মে ১৯৮৮।



ফকির শাহাবুদ্দীন (১৯২৪-১৯৮৯)॥ জন্ম. ঘাগুটিয়া গ্রাম, কাপাসিয়া, গাজীপুর, ১৯২৪। রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (অনার্স), এম.এ. এবং এল.এল.বি. পাস। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। ১৯৫৫-তে হাইকোর্টে ও ১৯৫৮-তে সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জুনিয়র হিসেবে প্রায় ছয় বছর আইন ব্যবসায় সম্পাদন। ১৯৬২-তে পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত। আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা। ১৯৭০-এর ১৭ ডিসেম্বর কাপাসিয়া এলাকা থেকে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি রূপে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া সফর এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন। জাতিসঙ্ঘে প্রেরিত (সেপ্টেম্বর ১৯৭১) মুজিব নগর সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য সচিব। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২) রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন। সংবিধানের বিধি মোতাবেক ১৯৭৩-এ বাংলাদেশের প্রথম এটর্নি জেনারেল নিযুক্ত। মৃত্যু. ঢাকা, ২৮. নভেম্বর, ১৯৮৯।



ফজলুর রহমান (১৯০৫-১৯৬৬)॥ জন্ম. সাইনপুকুর গ্রাম, দোহার, ঢাকা, ১৯০৫। রাজনীতিবিদ। এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৯-এ ইতিহাসে এম.এ. এবং ১৯৩৩-এ বি-এল ডিগ্রি লাভ। ঢাকা বারে আইন ব্যবসায় যোগদান। এই সময়ে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। ১৯৩৭-এ প্রথমবার ও ১৯৪৬-এ দ্বিতীয়বার ঢাকা শহর থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪৩-এ ব্যবস্থাপক সভার চিফ হুইফ এবং ১৯৪৬-এ বঙ্গীয় সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের (১৫ আগস্ট ১৯৪৭-১৫অক্টোবর ১৯৫১) শিক্ষা, বাণিজ্য ও শরনার্থী পুনর্বাসন, খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের (১৯ অক্টোবর ১৯৫১-১৭ এপ্রিল ১৯৫৩) শিক্ষা ও বাণিজ্য এবং আই আই চুন্দ্রীগড়ের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের (১৮ অক্টোবর-১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৭) বাণিজ্য, অর্থ ও আইন বিষয়ক মন্ত্রীরূপে দায়িত্ব পালন। ১৯৫৪-র ৮ মার্চ মুসলিম লীগের টিকেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৫-র ৩১ মে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পাকিস্তান দ্বিতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও খাজা নাজিমুদ্দীনের নিষ্ঠাবান ভক্ত ফজলুর রহমান একজন বন্ধু

রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের ভাবাদর্শ ও 'তাহযীব তমদ্দুনের' প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার এবং আরবি হরফে বাংলা লেখার অন্যতম প্রবক্তা। বাঙালিদের প্রবল আন্দোলনের মুখে তাঁর এই পদক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত। আইয়ুব খানের সামরিক সরকার কর্তৃক ১৯৬০-এ তাঁর উপর 'এবডো' আইন প্রয়োগ। মৃত্যু. ১৯৬৬।

ফজলুর রহমান খান (১৯৩৯-১৯৭১)॥ জন্ম. মোহনগঞ্জ গ্রাম, ময়মনসিংহ, ২ মার্চ ১৯৩৯। শিক্ষাবিদ। মোহনগঞ্জ হাই স্কুল থেকে ১৯৫৪-তে মেট্রিক, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে আই.এসসি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০-এ



বি.এসসি ও ১৯৬২-তে মৃত্তিকাবিজ্ঞানে এম.এসসি. ডিগ্রি লাভ। ১৯৬৩-র ১ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬৪-১৯৬৮ পর্যন্ত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে A Study on the Nutrient Metabolism in Soil at High Moisture Levels বিষয়ে গবেষণা। ১৯৬৮-র ২৫ জুলাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ১৯৬৮-র ১ আগস্ট পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকাবিজ্ঞানের অধ্যাপনায় যোগদান। ১৯৬৮-র ১৫ আগস্ট সিনিয়র প্রভাষক পদে উন্নীত। মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তায় বিশ্বাসী। মৃত্যু. ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গুলি করে হত্যা করে।

ফজলুল কাদের চৌধুরী (১৯১৯-১৯৭৩)॥ জন্ম. গহিরা গ্রাম, চট্টগ্রাম, ২৬ মার্চ ১৯১৯। রাজনীতিবিদ। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. এবং কলকাতা ইউনির্ভাসিটি ল কলেজ থেকে এল.এল.বি. পাস। ১৯৩৮-এ মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪১-এ নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৪২-এ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা আইনে গ্রেফতার। পাকিস্তান আন্দোলনে

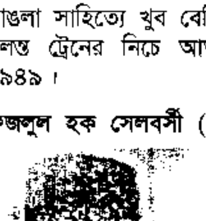


অংশগ্রহণ। ১৯৪৩-১৯৪৮ পর্যন্ত মুসলিম লীগ চট্টগ্রাম জেলা শাখার সম্পাদক। ১৯৪৮-১৯৫৮ পর্যন্ত মুসলিম লীগের উক্ত জেলা শাখার সভাপতি। ১৯৫৪-র মার্চে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পূর্ববঙ্গ আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। পুনরায় মুসলিম লীগের সঙ্গে সংহতি ঘোষণা। যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার। ১৯৫৯-এ চট্টগ্রাম বন্দরের কমিশনার নিযুক্ত। ১৯৬২-র ২৮ এপ্রিল মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১১ জুন (১৯৬২) আইয়ুব খাঁর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি ও পূর্তমন্ত্রী নিযুক্ত। এ বছর আগস্ট থেকে একই সঙ্গে শিক্ষা ও তথ্য দফতরের এবং পরের বছর ফেব্রুয়ারি থেকে শ্রম ও সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন। কনভেনশন মুসলিম লীগ (১৯৬২) গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং ৫ সেপ্টেম্বর (১৯৬২) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত। সুপ্রিম কোর্ট মন্ত্রীদের আইন সভার সদস্য পদ বাতিল ঘোষণা করে রায় প্রদান করায় ১৯৬৩-র মে মাসে জাতীয় পরিষদের সদস্য পদ হারান। ২৮ অক্টোবর (১৯৬৩) মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ। উপ-নির্বাচনে পুনরায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ২৯ নভেম্বর (১৯৬৩) জাতীয় পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত। প্রায় আড়াই বছর এ পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৬৫-র ২১ মার্চ পুনরায় মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৬-র ২১ মার্চ দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করার অভিযোগে মুসলিম লীগ (কনভেশন) থেকে বহিষ্কার। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণ-আন্দোলনের মুখে ২৬ মার্চ আইয়ুব সরকারের পতনের পর কনভেনশন মুসলিম লীগ দ্বিখণ্ডিত হলে এক অংশের সভাপতি নির্বাচিত। কনভেনশন মুসলিম লীগের এ অংশ ফ. কা. চৌধুরী (ফজলুর কাদের চৌধুরী) পন্থি মুসলিম লীগে নামে আখ্যায়িত। শেখ মুজিবুর রহমান (আওয়ামী লীগের সভাপতি) কর্তৃক পরিচালিত ৬-দফা কর্মসূচি ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী

আন্দোলনের বিরোধিতা করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কাছে পরাজয়বরণ। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা। চট্টগ্রামে রাজাকার বাহিনী ও শান্তি কমিটি গঠনে ভূমিকা পালন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর দালালির দায়ে গ্রেফতার। ১৯৭২-এর ২২ জানুয়ারি থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক। নিজ জেলার জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সমাজসেবা ও উন্নয়মূলক কাজের জন্য স্বীকৃত। মৃত্যু. ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৮ জুলাই ১৯৭৩।

ফজলুল হক (১৯১৬-১৯৪৯)॥ জন্ম. জঙ্গলবাড়ি গ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ১৯১৬। গল্পকার। ১৯৩২-এ ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। ১৯৪০-এ দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাস। আবু সয়ীদ আইয়ুবের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। ১৯৪৩ থেকে সাহিত্য অঙ্গনে পদচারণা। প্রথম গল্প 'মাস্টার' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত। পরের গল্প প্রকাশিত হয় হুমায়ুন কবির সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়। তিনি মোট পাঁচটি গল্প রচনা করেন। কিন্তু স্বল্প রচনার মধ্যেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। শওকত ওসমান লিখেছেন, 'শিল্পোত্তীর্ণ সদর্থক পেশল জীবন বোধের এমন কাহিনী বাঙলা সাহিত্যে খুব বেশি মেলে না।' মৃত্যু. চলন্ত ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪৯।

ফজলুল হক সেলবর্সী (১৮৯৩-১৯৬৮)॥ জন্ম. সেলবরস গ্রাম, সুনামগঞ্জ, সিলেট, ১৮৯৩। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ। শৈশবে পিতামাতা উভয়কেই হারিয়ে স্বগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত তালুকদার পরিবারে প্রতিপালিত হন। সুনামগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণি পযন্ত অধ্যয়ন। সব শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে হিন্দুপ্রধান শিক্ষক মুসলমানদের সম্বন্ধে অশোভন উক্তি করলে তার প্রতিবাদে স্কুল ত্যাগ। ১৯১৫-তে কলকাতা গমন এবং সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'তে সাংবাদিকতায় যোগদান। এরপর একে একে নবযুগ, আল-এসলাম, যুগভেরী, তকবির, পয়গাম, সংবাদ, নাজাত প্রভৃতি পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে দায়িত্ব পালন। মোহাম্মদীর সম্পাদনায় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান। ছাত্রজীবন থেকেই বিপ্লবী চিন্তার অধিকারী। ভারতে মুসলিম শাসন কায়েম ছিল তাঁর লক্ষ্য। জামালউদ্দীন আফগানীর 'প্যান ইসলামিজমে' বিশ্বাসী। আনোয়ার পাশা তাঁর আদর্শ। কলকাতায় 'আনোয়ার ছাত্র সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। 'জেহাদ পার্টি' নামক সন্ত্রাসবাদী দলের সংগঠক। রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) যোগদান। ১৯২১-এ রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁর নামে তিনটি ওয়ারেন্ট বের হয়। রাজশক্তির কাছে আত্মসমর্পন না করে বিপ্লবী কার্যকলাপ চালাবার জন্যে ১৯২২-এ আফগানিস্তানের পথে বঙ্গদেশ ত্যাগ। পথে গ্রেফতার। ১৯২৪-এ আসাম জেল থেকে মুক্তিলাভ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতা 'সেন্ট হেলেনা' ও আল্লামা ইকবালের 'তরানা-ই-মিল্লী'র বঙ্গানুবাদ সুধীজনের প্রশংসা অর্জন। মৃত্যু. সেলবরস, ৮ নভেম্বর ১৯৬৮।



ফজলে নিজামী (১৯৩৩-১৯৮৪)॥ জন্ম. কুমিল্লা শহর, ১৯৩৩। রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী। ১৯৪৮-এ কুমিল্লা ইউসুফ এইচ.ই. স্কুল থেকে মেট্রিক এবং ১৯৫৪-তে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই.কম. পাস। ঢাকার কায়েদে আজম কলেজে বি.কম. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। শৈশবকাল থেকেই সংগীতের প্রতি অনুরাগী এবং রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন। ১৯৫০ থেকে ঢাকা বেতারের নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী। ১৯৬৩-তে ঢাকা মিউজিক কলেজে রীবন্দ্রসংগীতের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। মিউজিক কলেজের স্টাফ কাউন্সিলের সেক্রেটারি। কিছুকাল বুলবুল ললিতকলা একাডেমি র রবীন্দ্রসংগীত বিভাগে অধ্যাপনা। মৃত্যু. ঢাকা, ২২ আগস্ট ১৯৮৪।

ফজলে লোহানী (১৯২৮-১৯৮৫)॥ জন্ম. সিরাজগঞ্জ, ১২ মার্চ ১৯২৮। টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব। এক শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মুসলিম পরিবারে জন্ম। পিতা আবু লোহানী বি.এ.

(কলকাতার ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' এর সহকারী সম্পাদক), মাতা ফাতেমা লোহানী (কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষিকা), ভ্রাতা অভিনেতা ফতেহ লোহানী। ছয় বছর বয়সে পিতৃহীন হন। সিরাজগঞ্জ বি.এল. স্কুল থেকে মেট্রিক ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এসসি. পাস। ১৯৪৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে এম.এসসি. ক্লাসে ভর্তি। তাঁর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'অগত্যা' (১৯৪৯) প্রকাশিত। দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৫১)-এর প্রতিষ্ঠাতা সহকারী সম্পাদক। কর্তৃপক্ষ ভাষা-আন্দোলনের (ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) অনুকূলে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে 'সংবাদ'-এর চাকরি থেকে পদত্যাগ (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। দৈনিক 'আজাদ' (১৯৩৬), 'পাকিস্তান অবজার্ভার' (১৯৪৯) ও লন্ডনে অবস্থানকালে এলিজাবেথ নাম্নী এক ইংরেজি মহিলার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ষাটের দশকে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (পিকিংপন্থি) রাজনীতিতে যোগদান। মওলানা ভাসানীর সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী পন্থি) প্রার্থী হিসেবে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। টেলিভিশনে শিক্ষা ও বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপস্থাপন ও পরিচালনা করে খ্যাতি অর্জন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে তাঁর পরিচালিত ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'যদি কিছু মনে না করেন' (১৯৮০-১৯৮৫) শ্রোতামহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ। মৃত্যু. হৃদরোগে, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল (ঢাকা), ৩০ অক্টোবর ১৯৮৫।



ফজিলতুন্নেসা (১৮৯৯-১৯৭৭)॥ জন্ম. করটিয়া, টাঙ্গাইল, ১৮৯৯। পিতা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ছিলেন করটিয়া জমিদার বাড়ির একজন সামান্য বেতনের কর্মচারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী হিসেবে গণিতে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। গণিতশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিলেত গমন। সেকালের কলকাতার বেকার হোস্টেল, সওগাত অফিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্র সমাজ তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। ১৯৩৫-এ কলকাতার বেথুন কলেজে গণিতের অধ্যাপিকা নিযুক্ত। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত ঢাকার ইডেন গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ। ১৯৫৩-তে ইডেন কলেজে শহীদ মিনার নির্মাণে বাধা দান। শিক্ষাবিদ ও কৃতি ছাত্রী হিসেবে সেকালে মুসলমান সমাজে স্বনামধন্য ছিলেন। নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি নিয়ে শিখা, সওগাত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গল্প রচনা। তাঁর লেখাঃ মুসলিম নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (সওগাত, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯২৯), নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ (শিখা, ১৯২৮), মুসলিম নারীর মুক্তি (সওগাত আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯২৯)। মৃত্যু. ঢাকা, ১৯৭৭।



ফণিভূষণ মজুমদার (১৯০১-১৯৮১)॥ জন্ম. সেনদিয়া গ্রাম, রাজৈর, মাদারীপুর, ১৯০১। রাজনীতিবিদ। জমিদার পরিবারে জন্ম। মাদারীপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক, বাঁকুড়া ওয়েসিলিয়ান মিশন কলেজ থেকে আই.এ., কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. ও কলকাতা রিপন কলেজ থেকে ল পাস। ১৯২০-এ বিপ্লবী রাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। গুপ্ত সমিতি সেবাদলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। বিপ্লবী পরিচয় গোপন রেখে কংগ্রেসের সভ্যরূপে রাজনৈতিক তৎপরতা চালান। ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময়ে কলকাতা থেকে গ্রেফতার। ১৯৩৮ পর্যন্ত কারাভোগ। ১৯৪০-এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ। এই আন্দোলনে



সুভাষচন্দ্রের অন্যতম প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করার দায়ে গ্রেফতার এবং এক বছর কারাভোগ। ১৯৪১-এর ২৬ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রের দেশ ত্যাগের সময় আবার গ্রেফতার এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর জেল ভোগ। ১৯৪৫-এ কারামুক্তির পর আই.এন.এ.-র মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর ১৯৪৮-এ গ্রেফতার। আওয়ামী লীগের (১৯৪৯) জন্মলগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৫৪-র নির্বাচনে মাদারীপুর-গোপালগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ঐ বছর ৯২-ক ধারায় কারাবরণ। ১৯৫৮-তে সামরিক আইন জারির পর গ্রেফতার এবং ১৯৬২-তে মুক্তিলাভ। ১৯৬৫-তে আইয়ুব সরকার কর্তৃক আর একবার গ্রেফতার এবং ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনের চাপে মুক্তিলাভ। ১৯৭০-এর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ফরিদপুর-১৯ আসন থেকে পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের (১৭ এপ্রিল ১৯৭১) উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও যশোর-ফরিদপুর সেক্টরের চেয়ারম্যান। স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান। তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার (ডিসেম্বর ১৯৭১-জানুয়ারি ১৯৭২) এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার (জানুয়ারি ১৯৭২-আগস্ট ১৯৭৫) সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন (১৯৭১-১৯৭৫)। ১৯৭৩-এর নির্বাচনে মাদারীপুর মহকুমা থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭৫-এ বাকশালের (কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং এর অঙ্গ সংগঠন জাতীয় কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৭৫-এ খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হলে মোশতাক সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী (১৫ আগস্ট-৭ নভেম্বর ১৯৭৫)। ১৯৭৮-১৯৮১ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও ১৯৮১-তে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। ১৯৭৯-র ১৮ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর-১১ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা হিসেবে খ্যাত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। মৃত্যু. ঢাকা, ৩০ অক্টোবর ১৯৮১।

ফতেহ লোহানী (১৯২৬-১৯৭৫)। জন্ম. কলকাতা, ১৯২৬। পৈতৃক নিবাস পাবনা। চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা, সাহিত্যিক, অনুবাদক। এক শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মুসলিম পরিবারে জন্ম। পিতা আবু লোহানী বি.এ. (১৮৯২-১৯২৯) ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি মুসলমান' (১৯০৬) এর সহকারী সম্পাদক। মাতা বেগম ফাতেমা লোহানী ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষিকা। ৮ বছর বয়সে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর কলকাতায় শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয় মায়ের তত্ত্বাবধানে। কলকাতার বিশপ ক্যাথিড্রেল মিশন স্কুল থেকে মেট্রিক, রিপন কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ. পাস। কিশোর বয়সেই কলকাতায় মুকুন্দদাসের স্বদেশি যাত্রা দেখে মুগ্ধ হয়ে অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ। প্রথম অভিনয় কলকাতার বাণী থিয়েটারের মঞ্চে 'রামের সুমতি' নাটকে কিশোর রামের ভূমিকায়। কলেজে অধ্যয়নকালে কলকাতার 'আলোক তীর্থ' শৌখিন নাট্য সংস্থায় যোগদান। তৎকালীন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার বিমল রায়ের নির্মীয়মাণ হিন্দি ছবি 'হামরাহী'র একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়ে অভিনেতা কিরণকুমার নামে ১৯৪৬-এ প্রথম চলচ্চিত্র অঙ্গনে প্রবেশ। হিমাদ্রি চৌধুরী নামে ওবায়দুল হক পরিচালিত 'দুঃখে যাঁদের জীবন গড়া' (১৯৪৬) ছবিতে অভিনয়। ১৯৪৭-এ ভারত বিভাগের পর ঢাকায় আগমন। ১৯৫৮-তে এফ.ডি.ডিম. প্রতিষ্ঠার পত্তে পূর্ব বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। নির্মিত প্রথম ছবি 'আকাশ আর মাটি'। এরপর 'আসিয়া' (১৯৬০) আর 'সাতরঙ' (উর্দু ১৯৬৫)। বছরের সেরা ছবি হিসেবে 'আসিয়া'-র জন্য প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ। পঁচিশটি ছবিতে এবং অজস্র নাটকে অভিনয়। অভিনীত ছবি: রাজা এলো শহরে (১৯৬৪), বেহুলা (১৯৬৬), আগুন নিয়ে খেলা (১৯৬৭), এতটুকু আশা (১৯৬৮), বাল্যবন্ধু (১৯৬৮), মোমের আলো (১৯৬৮), মায়ার সংসার (১৯৬৯), প্রতিকার (১৯৬৯), মিশরকুমারী (১৯৭০), তানসেন (১৯৭০),



আঁকাবাঁকা (১৯৭০), অন্তরঙ্গ (১৯৭০), ঘূর্ণিঝড় (১৯৭০), স্বরলিপি (১৯৭০), দর্পচূর্ণ (১৯৭০), দীপ নেভে নাই (১৯৭০), অপবাদ (১৯৭৩), ডাকু মনসুর (১৯৭৪), অন্তরালে (১৯৭৪), আলো তুমি আলেয়া (১৯৭৫), দুই রাজকুমার (১৯৭৫), দুই রাজকুমার (১৯৭৫), এক মুঠো ভাত (১৯৭৫)। দক্ষ আবৃত্তিকার হিসেবেও প্রশংসিত। গল্পকার ও অনুবাদক হিসেবেও খ্যাতিমান। মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'মানুষ', 'ক্যাম্বিস' ইত্যাদি গল্প উল্লেখযোগ্য। অনূদিত গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'রল্ডম্যান এন্ড দি সি'-ও বাংলা অনুবাদ 'সমুদ্র সম্ভোগ'। ঢাকার ইডেন কলেজের অধ্যাপিকা উর্দুভাষী রাজিয়া রহমতের (পৈতৃক নিবাস ভারতের ফয়সবাদ) সঙ্গে বিয়ে হয় (১৯৬৩)। ১৯৭১-এ ঢাকা বেতারে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মৃত্যু. 'কুয়াশা' ছবির শুটিং উপলক্ষে কাপ্তাই অবস্থান কালে, ১২ এপ্রিল ১৯৭৫।

ফয়জুননেসা চৌধুরানী, নওয়াব (১৮৩৪-১৯০৩)॥ জন্ম. পশ্চিম গাঁ, লাসকাম, কুমিল্লা, ১৮৩৪। কবি, সমাজসেবী। শৈশবে ওস্তাদ তাজউদ্দীনের কাছে শিক্ষালাভ। কঠিন পর্দপ্রথার অন্ত রালে থেকেও বাংলা, আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন। মহম্মদ গাজীর সঙ্গে বিয়ে। পরে সম্পর্ক ছেদ। ১৮৮৫-তে মায়ের মৃত্যুর পরে জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে থেকেই সমাজ উন্নয়ন এবং দীন-দরিদ্রের কল্যাণে আত্মনিয়োগ। ১৮৭৩-এ নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য কুমিল্লায় ফয়জুননেসা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। এছাড়া নিজগ্রামে সিনিয়র মাদ্রাসা স্থাপন করেন, যা পরে ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত। কেবল মেয়েদের চিকিৎসার জন্য ১৮৯৩-তে 'ফয়জুননেসা জেনানা হাসপাতাল' স্থাপন। লাকসাম দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁর দানে প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯৯-তে কুমিল্লা কলেজ স্থাপনে অর্থ প্রদান। রাস্তাঘাট ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে অর্থ সাহায্য। হজ্জব্রত পালন করতে গিয়ে মক্কায় একটি স্কুল ও বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠা। দেশে ফিরেও প্রতিষ্ঠানদুটির জন্য অর্থ সাহায্য প্রেরণ। অনেক সম্পত্তি ওয়াকফ্ করে যান, যা থেকে অনেক মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীরা অর্থসাহায্য পায়। উর্দুভাষী পরিবারে জন্ম নিয়েও জ্ঞানচর্চা করেন বাংলায়। কাব্যঃ রূপজালাল (১৮৭৬)। মহারানী ভিক্টোরিয়া-কর্তৃক নওয়াব উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যুঃ কুমিল্লা, ১৯০৩।



ফয়েজউল্লা॥ জন্ম. মেখল গ্রাম, হাটহাজারী. চট্টগ্রাম, ১৩০১ হিজরী। আলেম। হাটহাজারী মাদ্রাসা দারুল-উল-মঈনুল ইসলামের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পরে ভারতের দেওবন্ধ মাদ্রাসায় তিন বছর ও সাহারানপুর মাদ্রাসায় দুই বছর অধ্যয়ন। দেশে ফিরে হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকপদে যোগদান। পরে একই মাদ্রাসায় মুফতী ও মহাদ্দিস পদে উন্নীত। ফারসি ও উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলিঃ আল ফায়সালা, আল মনজুমউলু মুখতামার, ইরসাদুল উম্মাহ, রাফেউল আসকালাতা। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ১৯৭৭।

ফররুখ আহমদ (১৮১৮-১৯৭৪)॥ জন্ম. মাঝআইল গ্রাম, যশোর, ১০ জুলাই ১৯১৮। কবি। পিতা পুলিম ইন্সপেক্টর সৈয়দ হাতেম আলী। খুলনা জিলা স্কুল থেকে ১৯৩৭-এ মেট্রিক, কলকাতা রিপন কলেজ থেকে ১৯৩৯-এ আই.এ. পাস। স্কটিশচার্চ কলেজে দর্শনে স্নাতক সম্মান ও পরে সেন্টপল কলেজে ইংরেজি বিভাগে অধ্যয়ন। ছাত্রজীবনে বামপন্থী রাজনীতিতে দীক্ষা। এ সময় র‍্যাডিকেল হিউম্যানিজম আন্দোলনের নেতা এম.এন. রায়ের অনুসারী। ১৯৩৪-এ আই.জি. (প্রিজন) অফিসে, ১৯৪৪-এ সিভিল সাপ্লাই অফিসে, ১৯৪৫-৪৭-এ জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মে ও 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে এবং ১৯৪৭-৭৪-এ ঢাকা বেতারে 'স্টাফ রাইটার' পদে চাকরি। বামপন্থী রাজনীতি ত্যাগ করে ইসলামের মৌল আদর্শকে গ্রহণ। ১৯৫২-ও ভাষা-আন্দোলনে সমর্থন দান। পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামো ও আদর্শের প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন। রবীন্দ্র-সংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে ১৯৬৭-র ২২



জুন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে এক বিবৃতিতে রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্র-সংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে মন্ত্রীর সেই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (১৯৭১) বিরোধিতা করে বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদান এবং পাকিস্তানের সংহতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে কবিতা রচনা। মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী কবি। পাকিস্তানবাদ, ইসলামিক আদর্শ এবং আরব ইরানের ঐতিহ্য তাঁর কবিতায় উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত। আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগ নৈপুণ্যে, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে তাঁর কবিতা এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। ব্যঙ্গকবিতা ও সনেট রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাতসাগরের মাঝি (কাব্য, ১৯৪৪), সিরাজাম মুনীরা (কাব্য, ১৯৫২), নৌফেল ও হাতেম (কাব্যনাট্য, ১৯৬১), মুহূর্তের কবিতা (সনেট সংকলন, ১৯৬৩), পাখির বাসা (শিশুতোষ গ্রন্থ, ১৯৬৫), হাতেমতায়ী (কাহিনী কাব্য, ১৯৬৬), নতুন লেখা (শিশুতোষ গ্রন্থ, ১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০), হে বন্য স্বপ্নেরা, হাবেদা মরুর কাহিনী। ১৯৬০-এ বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৬১-তে পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরমেন্স', ১৯৬৬- তে 'হাতেমতায়ী' গ্রন্থের জন্য আদমজী পুরস্কার এবং ১৯৬৬ তে 'পাখির বাসা' গ্রন্থের জন্য 'ইউনেস্কো' পুরস্কার লাভ। মরণোত্তর 'একুশের পদক'-এ ভূষিত। মৃত্যু, ঢাকা ১৯ অক্টোবর ১৯৭৪।

ফরিদ আহমদ (১৯২৩-১৯৭১)॥ জন্ম, ধলিরছড়া গ্রাম, কক্সবাজার, ১৯২৩। রাজনীতিবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৫-এ ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স, ১৯৪৬-এ ইংরেজিতে এম.এ এবং ১৯৪৭-এ ল পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এথলেটিক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৪৭-১৯৪৮ এ ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা পাকিস্তান সরকারের



ভাষানীতির প্রতিবাদে এবং ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে অধ্যাপনার চাকরিতে ইস্তফা দান। রাজনীতি ও আইন ব্যবসায়ে যোগদান। ঢাকা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক (১৯৫৪-১৯৬৯)। ১৯৫৪ তে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য এবং ১৯৫৫ তে নেজামে ইসলাম পার্টির মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান দ্বিতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত। পূর্ববঙ্গ পরিষদে যুক্তফ্রন্ট পার্টির চিফ হুইপ এবং ১৯৫৭-এর অক্টোবর ডিসেম্বর-এ চুন্দ্রীগড় মন্ত্রীসভার শ্রমমন্ত্রী। ১৯৫৬ তে কক্সবাজার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ১৯৬২ র ১৯ মে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় উপ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। জাতীয় পরিষদে সরকারবিরোধী জোট পাক পিপলস গ্রুপের মুখপাত্র। ১৯৬৪ তে 'কপ' (কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি) গঠনে ভূমিকা পালন। সম্মিলিত বিরোধী দলের (কপ) মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ফাতেমা জিন্নার পক্ষে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ (১৯৬৪)। ১৯৬৫-র ২১ মার্চ মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দ্বিতীয়বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সরকার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করলে এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন এবং আদলত তাঁকে নির্বাচতি ঘোষণা করে রায় প্রদান করে। ১৯৬৭ র ৩০ এপ্রিল পি.ডি.এম এর অন্যতম নেতা নিযুক্ত। 'ডাক' (ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি)-এর বিশিষ্ট সদস্য হিসেবে ১৯৬৯ এর আইয়ুব-বিরোধী গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আহূত গোলটেবিল বৈঠকে (ফেব্রুয়ারি মার্চ ১৯৬৯) নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে যোগদান। ১৯৬৯-এর ২৪ জুন নতুন রাজনৈতিক সংগঠন পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি) গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন এবং দলের অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত ৬ দফাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা। পাকিস্তানে ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে মত প্রকাশ। ১৯৭০-এর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে কক্সবাজার জেলা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নিকট পরাজয়বরণ।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা। দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা এবং পাক সৈন্যদের সাহায্যকারী শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ১৯৭১-এর ২১ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর সাথে সহযোগিতার দায়ে জনসাধারণ কর্তৃক ধৃত ও বিক্ষুব্ধ জনতার প্রহারে নিহত। সুবক্তা ও খ্যাতনামা আইনজীবী। দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে খ্যাতি অর্জন। মৃত্যু, ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

ফিওদর ইম্পোলিতভিচ শের্বাৎস্কি (১৮৬৬-১৯৪১)॥ জন্ম, পোল্যান্ডের কেলৎসে, ১৯ অক্টোবর ১৮৬৬। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্যে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত, প্রাচ্যবিদ। সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, জাতিতে রুশ, পারিবারিক বাসস্থান সাংকৎ পিতের্বুর্গ (বর্তমানে লেনিনগ্রাৎ) নগরী। রাজকার্য ব্যাপদেশে পিতার পোল্যান্ডে বসবাসকালে জন্ম। সাংকৎ পিতেবুগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিনায়েফ ও অধ্যাপক ওলেন্দনবুর্গের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়াদি অধ্যায়ন। পরে ভিয়েনা ও বনে এসে অধ্যাপক বুলর ও অধ্যাপক ইয়াকোবির কাছে সংস্কৃত ও ভারতীয় দর্শনের চর্চা। পরে গবেষণা ব্যাপদেশে মঙ্গোলিয়া ও ভারত ভ্রমণ। ভারতবর্ষে পুনে শহরে থাকাকালীন এদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের নিকট শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে। চাকরিজীবনে সুদীর্ঘকাল সাংকৎ পির্তেবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক রূপে কর্মরত। জীবদ্দশায় বৌদ্ধ মহাযান ধর্মমত বিষয়ে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে বিবেচিত। গ্রন্থাবলী : জর্মন ভাষায় রচিত Uber Das Haihayendracarita (১৮৯৯), রুশ ভাষায় The Indian Theory of Poetry (১৮৯৯), রুশ ভাষায় Theory of Knowledge and logic in the Doctrine of the Later Bulddhism (১৯২৭) ইংরেজিতে The Conception of Buddhist Nirvana (১৯২৭) Buddhist Logic (২ খণ্ড; ১৯৩৫) ইত্যাদি। মৃত্যু ১৯৪১-১৯৪২-এর কোনো এক সময়ে জর্মন সেনাবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাতে।

ফুলঝুরি খাঁ, ওস্তাদ (১৯২০-১৯৮২)॥ জন্ম, বিটঘর গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১৯২০। এস্রাজবাদক, সংগীতশিল্পী। আসল নাম ইয়ার রসুল খাঁ। পিতা লতিফ রসুল খাঁ। মায়ের নাম



কামেলেন্নেসা। তাঁর মা ছিলেন বিখ্যাত সংগীতবিদ আফতাবউদ্দীন খাঁর (ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বড়ো ভাই) বড়ো মেয়ে। মাতামহ আফতাবউদ্দিন খাঁর কাছে তবলা যন্ত্রে প্রথমে পাঠ গ্রহণ। পরে ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ও পাঁচ বছর এসরাজ যন্ত্রে তালিম গ্রহণ। মাইহার রাজ্যে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে দীর্ঘদিন সংগীতে তালিম গ্রহণ। মাইহারের নবাবের দরবারে এক জলসায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সরোদবাদনের সাথে তবলাসঙ্গত করে সংগীতরসিকদের মন জয়। তাঁর হাতে তবলার বোল শুনে মাইহারের মহারাজও অভিভূত ও মুগ্ধ হন। মাইহার রাজপুরুষদের ভাষায় : 'তোমার (ইয়ার রসুল খাঁ) আঙ্গুল তবলার ঝুরি থেকে তাল ও মাত্রার ফুল ছিটোয়।' তবলা বাদনে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় মহারাজ তাঁকে উপাধি দেন 'ফুলঝুরি খাঁ'। তারপর থেকে ফুলঝুরি খাঁ নামেই পরিচিতি লাভ। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর 'মাইহার অর্কেস্ট্রা' দলের সংগীত সদস্য। নৃত্য শিল্পী উদয়শঙ্করের নৃত্যদলের সংগীতশিল্পী হিসেবে দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে যন্ত্রসংগীত শিক্ষক। পরে শিলচরে গমন। সেখানে সংগীত স্কুল খুলে শিষ্যদের সংগীতে তালিম দান। ১৯৫১-তে ঢাকায় আগমন এবং ঢাকার বেতার কেন্দ্রে 'নিজস্ব শিল্পী' হিসেবে যোগদান। রবীন্দ্র সংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে (২২ জুন ১৯৬৭) সরকারের সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ১৯৭৮-এ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশে পদকে ভূষিত। মৃত্যু, ঢাকা ১৯৮২।

ফেরদৌসদৌলা, বাবুল (?-১৯৭১)॥ জন্ম, মালোপাড়া, রাজশাহী। কবি, মুক্তিযোদ্ধা। ফেদ ইন বেগম ছদ্মনামে বিপ্লব আর স্বাধীনতার কবিতা লিখতেন। ১৯৭১-এর মার্চ মাসে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আহূত অসহযোগ

আন্দোলনকালে হাতবোমা তৈরি করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তৎকালীন পাক সরকারকে আতঙ্কিত করে তুলেছিলেন। রাজশাহীতে মুক্তিযোদ্ধাদের সপক্ষে গোপনে কাজ করতেন। মৃত্যু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আমর্স ফোর্স এর কমান্ডার তাঁকে ধরে নিয়ে পদ্মাপাড়ের বধ্যভূমিতে গুলি করে হত্যা করে, ২৬ নভেম্বর ১৯৭১।

ফ্রান্টস্ বোপ্ (১৭৯১-১৮৬৭)॥ জন্ম, জার্মানির মাইনটস্ শহরে, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৭৯১। তুলনামূলক ব্যাকরণবিদ্যার প্রবর্তক, সংস্কৃতজ্ঞ, বহুভাষাবিদ, অধ্যাপক। বাল্য ও কৈশোর কাটে ভাভেরিয়ায়, এখানেই অধ্যাপক কার্ল হ্বিন্ডিশমান-এর অনুপ্রেরণায় সংস্কৃত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট। প্রাচ্যভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮১২-তে বাভেরিয়া সরকারের একটি বৃত্তি নিয়ে ইয়োরোপে সংস্কৃতচর্চার প্রধান কেন্দ্র প্যারিসে গমন। দ্য সাসি, দ্য শেজি, বুর্নুফ প্রমুখ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত, আরবি ও পারসি শিক্ষা। এ সময়ে প্যারিসের সরকারি পাঠাগারে শ্রীরামপুর থেকে সংগৃহীত যাবতীয় পুঁথি পাঠাগারের ব্যবহারের জন্য তালিকাবদ্ধ করেন। ১৮১৬-তে তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয় ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে পুরু কার্ল হিন্ডিশমানের তত্ত্বাবধানে। বইটির বিষয়বস্তু ছিল সংস্কৃত ভাষার ধাতুরূপের প্রকৃতি। স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রমুখ প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতবর্গ সংস্কৃত ও য়োরোপীয় বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যে জ্ঞাতি সম্পর্কের কথা প্রচার করেছিলেন বোপের বিশ্লেষণাত্মক গবেষণায় তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই আবিষ্কারের ফল সুদূরপ্রসারী। প্যারিসে সরকারি গ্রন্থাগারে গবেষণার সময়ে মহাভারতের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক কিছু কাহিনীর অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রায় সাত-আট বছর প্যারিসে অবস্থান করে লন্ডন গমন এবং সেখান থেকে ১৮২০-তে সংস্কৃত, গ্রিক ল্যাটিন ও টিউটনীয় ভাষার ব্যাকরণসমূহের এক তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশ। ১৮২১-এ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে তাঁর লন্ডন থেকে বার্লিন গমন এবং আমৃত্যু সেখানেই অবস্থান। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর ১৮২৪-১৮২৭ সময়কালের মধ্যে জর্মন ভাষায় সুবৃহৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা, তিন খণ্ডে তা প্রকাশিত। বোপের শ্রেষ্ঠ অবদান ছ খণ্ডে রচিত সংস্কৃত জেন্দ গ্রিক লাটিন, লিথুনীয়, গথীয়, জর্মন ও স্লাভ ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ। ১৮৩৩ থেকে ১৮৫২ র মধ্যে প্রকাশিত এই ছ খণ্ড ব্যাকরণালোচনা তাঁকে তুলনামূলক ব্যাকরণবিদ্যার পথিকৃৎরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর প্রধান গ্রন্থরাজি : Das Cpnjugations system der Sanskrit sprache in Vergleichung mit Jenen der griechische, lateinichen, peresischen und germanischen sprache (1816), Nalas : German Sanskritum Mahabharat (1819), Analytical Comparison of the Sanskrit, Greek, Latin and Teutonic Languages (1820), Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zen, Grichischen, Lateinschen, Litthauischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen (৬ খণ্ড: ১৮৩৩-১৮৫২)। মৃত্যু, বার্লিন, ২৩ অক্টোবর ১৮৬৭।

ফ্রিডরিশ্ ফন্ শ্লেগেল্ (১৭৭২-১৮২৯)॥ জন্ম, জার্মানির অন্তর্গত হনোভার শহরে, ১০ মার্চ ১৭৭২। জর্মন লেখক, সমালোচক, প্রাচ্যবিদ, আউগুস্ট শ্লেগেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক। পিতা অ্যাডলফ শ্লেগেল ছিলেন ধর্মযাজক। প্রথম দিকে জীবিকা হিসেবে ব্যবসায় বেছে নিলেও দ্রুত সে পথ ত্যাগ করে জ্ঞান সাধনার দিকে মনোনিবেশ করেন, বিশেষত ধ্রুপদী সাহিত্য সংস্কৃতির দিকে। ইয়েনা শহরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আউগুস্ট শ্লেগেলের সঙ্গে সাহিত্যপত্র 'ডাস আটেনাউস' সম্পাদনা (১৭৯৮-১৮০০) ও পত্রিকার মারফত রোমান্টিক ভাবান্দোলন প্রচার শুরু। রোমান্টিক উপন্যাস 'লুসিন্ডে' রচনা করেন ১৭৯৯-তে এবং একটি রোমান্টিক ট্র্যাজেডি ১৮০২। ১৮০২-এ প্যারিসে অবস্থানকালে আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন নামে জৈনিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা এবং প্যারিসের গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রায় দু'শ' সংস্কৃত পুঁথি পাঠ; এর অব্যবহিত সুফল দেখা যায় ১৮০৮-এ তাঁর প্রকাশিত 'ভারতের সাহিত্য ও জ্ঞান ভাণ্ডার' গ্রন্থে। পরবর্তীকালে



জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে পারিবারিক কারণে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে এবং ১৯০৮-এ রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ। এরপর থেকে ভিয়েনা শহরে বসবাস। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: Die Griechen und Romer (১৭৭৯), Geschichte der Poesie der Grichen (১৭৯৮), Lucinde (১৭৯৯), Die Sprache und Weisheit der Indier (১৮০৮), Geschichte der alten und neuen Literature (২য় খণ্ডে ১৮১৫) ইত্যাদি। মৃত্যু. ড্রেসডেন শহরে, ১২ জানুয়ারি ১৮২৯।

ফ্রিডরিশ মাক্সম্যুলর্ (১৮২৩-১৯০০)॥ জন্ম. প্রুশিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আনহাল্ট রাজ্যের রাজধানী ডেসাউ শহরে (বর্তমানে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র), ৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। সংস্কৃতজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, অনুবাদক, অধ্যাপক।



পিতা হ্বিলহেলম মাক্সম্যুলর ছিলেন কবি ও গ্রন্থাগারিক। মাত্র চার বছর বয়ঃক্রমকালে পিতার মৃত্যুর পর আর্থিক কৃচ্ছ্রতার মধ্যে তার বাল্যকাল অতিবাহিত। শৈশবে মাক্সম্যুলর সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ মেধার পরিচয় দিলেও জৈনিক শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে জীবিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংগীতসাধনা পরিত্যাগ। ১৮৩৬-এ স্থানীয় বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে ১৮৪১-এ লাইপ্‌টসিগ হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এরপরে লাইপ্‌টসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন বিভিন্ন প্রাচীন য়োরোপীয় ভাষা শিক্ষার উদ্দেশে। গ্রিক, লাতিন ইত্যাদির সঙ্গে সদ্যস্থাপিত সংস্কৃত পাঠক্রমও অধ্যয়ন। ১৮৪৩-এ এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। অনতিকালপরে (১৮৪৪) তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বিষ্ণু শর্মা রচিত সংস্কৃত 'হিতোপদেশ' গ্রন্থের জর্মন অনুবাদ। এ বছরেই তিনি বার্লিন চলে আসেন আরো ভালোভাবে সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে। বার্লিনে অধ্যাপক ফ্রান্টস বোপ্ ও দার্শনিক ফ্রীডরিশ শেলিংয়ের কাছে যথাক্রমে সংস্কৃত ও দর্শন অধ্যয়ন। এক বছর পরে প্যারিসে এসে প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ইউজীনবুর্নুফ-এর তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত অধ্যয়ন করতে থাকেন। তাঁর সারা জীবন যে-বিষয়ের পঠন পাঠন ও বিশ্লেষণে অতিবাহিত হবে সেই ঋগ্বেদচর্চার দিকে তাঁকে বুর্নুফই চালিত করেছিলেন। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে প্রাচীন সংস্কৃত সংগ্রহ অনুধাবনের উদ্দেশ্যে প্যারিস থেকে বিলেত চলে আসেন ১৮৪৬-এর জুন মাসে। এখানে থাকার সময়েই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন প্রমুখের চেষ্টায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ মাক্সম্যুলর সম্পাদিত ঋগ্বেদ প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে রাজি হয়। গ্রন্থটি মুদ্রণের ব্যবস্থা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়ে হওয়ার ফলে মাক্সম্যুলর ১৮৪৮-এর মে মাসে লন্ডন থেকে অক্সফোর্ড চলে আসে। আমৃত্যু অক্সফোর্ডেই বসবাস। ১৮৫০-এ অক্সফোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও ১৮৫৪-তে প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত। ১৮৫৯-এ তাঁর 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়; এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে দেন বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রাচ্যবিদ ইউহান গেঅর্গ বুলের। ১৮৬৮-তে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীয় বিভাগ পরিবর্তন করে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান। ১৮৬১-১৮৬৩ পর্যন্ত লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দান করে ইংল্যান্ডে ভাষাবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ভিত্তি স্থাপন। অনুরূপভাবে তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও তুলনামূলক পুরাণ আলোচনারও পথিকৃৎ। তাঁর সম্পাদিত ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড ১৮৪৯-এ প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৩-এ। ঋগ্বেদের সম্পাদনা ও ভাষ্য রচনা তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি; বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হিসেবে সমগ্র পৃথিবীতে আদৃত। ১৮৭৫-এ 'সেক্রেড বুক অব দ্য ইস্ট' গ্রন্থমালা সম্পাদনা ও প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ। সর্বমোট ৫১ খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থমালার ৪৮টি খণ্ড জীবৎকালেই প্রকাশ করে যেতে পেরেছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মরিটস হ্বিন্টারনিটস এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে আলোচিত নাম ও বিষয়সূচির বিস্তারিত যে নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে দেন তা পরে দু'খণ্ডে প্রকাশিত। লক্ষণীয় এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত ৪৯ খণ্ডের মধ্যে ২১টি ছিল বৈদিক-ব্রাহ্মণ ধর্ম সম্পর্কে, ১০টি ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে, ২টির বিষয় ছিল জৈন ধর্ম ও সাহিত্য এবং অবশিষ্ট খণ্ডসমূহ ছিল পারসিক,

ইসলাম ও চৈনিক ধর্মসংক্রান্ত। ১৮৯৪-তে বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে তাঁর কতিপয় বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশ। ১৮৯৮-তে প্রকাশিত হয় তার সুবিশাল 'সিক্স সিস্টেমস অব ইন্ডিয়ান ফিলজফি'। এ বছরেই তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। ভারতপ্রেমিক এই মনীষী তাঁর ভারতপ্রেমের অপরাধে কখনো ভারতবর্ষে আসতে পারেন নি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অনুসৃত শাসনপদ্ধতির কড়া সমালোচক হওয়ায় এই শাস্তি তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। প্রুশিয়া ও ইতালি সরকার কর্তৃক 'নাইট' উপাধি প্রধান। সুইডেন, ফ্রান্স, বাভেরিয়া ও তুরস্ক সরকার কর্তৃক খেতাব প্রদান। ১৮৯৬-তে মহারানি ভিক্টোরিয়া কর্তৃক 'প্রিভি কাউন্সিলর' নিযুক্ত। ১৮৯২-তে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের নবম অধিবেশনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত। তাঁর প্রধান কীর্তির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলি বিবেচিত: Hitopadesa (১৮৪৪), Meghadutam (১৮৭৪), Essays on Comparative Mythology (১৮৫৬), A History of Ancient Sanskrit Literature (১৮৫৯), A Sanskrit Grammar (১৮৬৬), Reigveda Samita (১৮৬৯), Rigeveda with Sayan's Commentary (৬ষ্ঠ খণ্ড: ১৮৪৯-৭৩), The Science of Language (২য় খণ্ড: ১৮৬১, ১৮৬৩), The Upanishadas (১৮৭৯), Rigveda (কেবল মূল পাঠ, ২য় খণ্ড, ১৮৭৩), Physical Religion (১৮৮১), IndeaÍWhat Can it Teach Us (১৮৮৩), Natural Religion (১৮৮৯), Introduction to the Science of Religion (১৮৯৩), The Six Systems of Hindu Philosophy (১৮৯০), Three Lectures on the Vedanta Philosophy (১৮৯৪), My Indian Friends (১৮৯৯), Essays on Mythology and Folklore (১৯০০), এবং অসমাপ্ত My Autobiography (১৯০১)। মৃত্যু. অক্সফোর্ড, ২৮ অক্টোবর ১৯০০।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)॥ জন্ম. কাঁঠালপাড়া গ্রাম, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ২৬ জুন ১৮৩৮ (১৩ আষাঢ় ১২৪৫)। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের স্থপতি। পিতা ডেপুটি কালেক্টর যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৪৪-এ পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুর গমন এবং সেখানকার ইংরেজি স্কুলে ভর্তি। ১৮৪৯-এ মেদিনীপুর থেকে কাঁঠালপাড়ায় প্রত্যাবর্তন। একই বছর



পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা মোহিনীদেবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। হুগলী কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্তি (১৮৪৯)। কলেজের জুনিয়ার ও সিনিয়ার বিভাগের বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার। ১৮৫৬-তে আইন পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। ১৮৫৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে তাতে অংশগ্রহণ এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। ১৮৫৮-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি.এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ। সে পরীক্ষায় ১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কেউ সব বিষয়ে পাস করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু নামে অন্য একজন পরীক্ষার্থী ৫টি বিষয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁরা দুজনেই Mental and Moral Science এ সাত নম্বর কম পেয়ে ফেল করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের অধিবেশনে এঁদের সাত নম্বর অতিরিক্ত দিয়ে বি.এ. পাস করিয়ে দেওয়া হয়। একই বছর (১৮৫৮) যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত লাভ। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর (১৮৫৯) পর ১৮৬০-এ রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ১৮৬৯-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এল. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার। খুলনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, মেদিনীপুর, বারাসাত, হাওড়া, আলিপুর প্রভৃতি স্থানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে সুদীর্ঘ ৩৩ বছর চাকরি করার পর ১৮৯১-তে অবসর গ্রহণ। কলকাতার পটলডাঙ্গায় বাড়ি ক্রয় করে তথায় বসবাস। ১৮৫২-তে 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা লিখে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ। ১৮৫৬-তে তাঁর কবিতাগ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' প্রকাশিত। এরপর কাব্যচর্চা পরিত্যাগ করে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ। মোগল পাঠানের যুদ্ধের পটভূমিকায় নরনারীর প্রেমের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫-তে প্রকাশিত। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্স, — ইংরেজি রোমান্সের আদর্শে রচিত। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) দ্বিতীয় উপন্যাস। রোমান্টিক উপন্যাস হিসেবে এর স্থান

অতি উচ্চে। দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) রচিত। বঙ্কিমের হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদী ধ্যান-ধারণা ও স্বাজাত্যবোধ এ উপন্যাসে প্রথম প্রকাশিত। সামাজিক সমস্যার আলোকে 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) প্রণীত। উভয় উপন্যাসেই রূপজমোহ ও বিধবা বিবাহের কুফল বর্ণিত। 'রজনী'তে (১৮৭৭) মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষিত। 'রাজসিংহ' (১৮৮২) ও 'আনন্দমঠে' (১৮৮২) হিন্দুর বাহুবল ও বীরত্ব রূপায়িত। 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারামে' (১৮৮৭) নিষ্কাম ধর্মের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত। চরিত্র চিত্রণের কুশলতায়, কাহিনী বিন্যাসের চাতুর্যে ও ভাষার ঐশ্বর্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলো এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সমন্বয় সাধনকারী হিসেবে খ্যাত। বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর অবদান অপরিসীম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতানুসারী ভাষা ও টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালী কথ্য বাকভঙ্গি নতুনভাবে বিন্যস্ত করে বাংলা গদ্যকে প্রাণস্পর্শী ও সুষমামণ্ডিত ভাষায় রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব তাঁর। বাংলা ভাষায় তুলনামূলক সমালোচনা সাহিত্যের প্রথম রচয়িতাও তিনি। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা। 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ভাগ–১৮৮৭ ও ২য় ভাগে–১৮৯২), 'ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন' (১৮৮৮), 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' (১৯০২) প্রভৃতি তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম কীর্তি 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা (১৮৭২-১৮৭৬)। তাঁর সম্পাদনার গুণে পত্রিকাটির অতি উচ্চমান লাভ। এই সাহিত্যপত্রকে কেন্দ্র করে একটি লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টি। উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্মবোধক ও স্বাজাত্যবোধের ঋত্বিক। বাংলা ভাষায় শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনার প্রথম কৃতিত্ব তাঁর। নিষ্ঠাবান হিন্দু। গীতার অনুশীলন তত্ত্বের (জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্ম) ভিত্তিতে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণের অভিপ্রায়ে লেখনী পরিচালনা। সাহিত্যের রসবেত্তাদের কাছ থেকে 'সাহিত্যসম্রাট' ও হিন্দু ধর্মানুরাগীদের কাছ থেকে 'ঋষি' আখ্যা লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, বহুমূত্ররোগে, ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ (২৬ চৈত্র ১৩০০)।

বজলুল করিম (১৯১৮-১৯৭৪)॥ জন্ম. শ্রীরামপুর গ্রাম, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৯১৮। সংগীতশিল্পী। ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর নিকট তবলায় হাতেখড়ি। কলকাতায় ওস্তাদ আলী আহমদ খাঁ ও ওস্তাদ কেরামত আলী খাঁর কাছে দীর্ঘদিন সংগীতে তালিম গ্রহণ। দেশ বিভাগের পূর্বে মেগাফোন কোম্পানি ও হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। ১৯৪৮-এ পূর্ব-পাকিস্তানে আগমন ও ঢাকা বেতারকেন্দ্রের 'নিজস্ব শিল্পী' হিসেবে যোগদান। মৃত্যু. ঢাকা, ১৯ জুলাই ১৯৭৪।

বড়ু চণ্ডীদাস (১৩৭০-১৪৩৩)॥ জন্ম. ছাতনা বাঁকুড়া, মতান্তরে বীরভূমের নান্নুর গ্রাম, ১৩৭০ (আনুমানিক)। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা। প্রকৃত নাম অনন্ত, বড়ু কৌলীন্য উপাধি। চণ্ডীদাস তাঁর দীক্ষা গ্রহণান্তর গুরুপ্রদত্ত নাম। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আনুমানিক ১৪০০-তে রচিত। বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রাম নিবাসী শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ও গোয়ালঘরের মাচার ওপর থেকে গ্রন্থটি আবিষ্কৃত। বইটির সর্বত্র বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। কাব্যের নামপত্র পাওয়া যায়নি। বসন্তরঞ্জন কাব্যটির নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। তৎ-কর্তৃক ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এটি সম্পাদনা করে প্রকাশিত। 'চর্যাপদের' পর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই' বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় নিদর্শন। কাব্যটি ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি এবং শিল্পরীতির দিক থেকে পদাবলী সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে এটি রচিত। বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের কবি বলে তাঁর সৃষ্ট রাধা ও কৃষ্ণ বৈষ্ণবতত্ত্বের জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রতীক নয়, তারা এই পৃথিবীরই রক্ত মাংসে গড়া মানুষ এবং তাদের প্রেমও আধ্যাত্মিক প্রেম নয়, মানবিক প্রেম। এর বংশী ও বিরহ খণ্ডে উচ্ছ্বসিত গীতিময়তার পরিচয় মেলে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাংলা সাহিত্যের বাঁক বদলের অভিধায় চিহ্নিত। মৃত্যু. ১৪৩৩ (আনুমানিক)।

বদরুন্নেসা আহমদ (১৯২৭-১৯৭৪)॥ জন্ম. কলকাতা, ৩ মার্চ ১৯২৭।



রাজনীতিবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬১-তে এম.এড. এবং ১৯৬৩-তে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ১৯৫৪-১৯৫৮ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য, ১৯৫৯-১৯৭২ পর্যন্ত মহিলা সমিতির সহ-সভানেত্রী, ১৯৭০-১৯৭২ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা, ১৯৭২-এ বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির সভানেত্রী এবং ঢাকার লালমাটিয়া মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৫৪-তে ৯২ (ক) ধারার শাসনামলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে কারাবরণ। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ। মুজিব নগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে পাক-সামরিক জান্তার নৃশংসতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপক জনমত গঠন। আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ১৯৭৩-এর নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্য নির্বাচিত। ঐ বছর ৩ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। এ দেশের নারীমুক্তি আন্দোলনে তাঁর অবদান অপরিসীম। বাঙালিদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। মৃত্যুর পর তাঁর নামানুষারে ঢাকাস্থ বকশীবাজার মহিলা কলেজের নামকরণ করা হয় বদরুন্নেসা কলেজ। ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ। মৃত্যু. লন্ডন, ২৫ মার্চ ১৯৭৪।

বনফুল, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯)॥ জন্ম. মণিহারপুর, পূর্ণিয়া-বিহার, ১৯ জুলাই ১৮৯৯। কথাসাহিত্যিক। আদিনিবাস শিয়ালখালা, হুগলী। পিতা ডা. সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যিক ছদ্মনাম বনফুল। পূর্ণিয়ার সাহেবগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক (১৯১৮), হাজারীবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আই.এসসি. (১৯২০) পাস।



কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি। পরে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. (১৯২৭) পাস। কলকাতায় একটি ল্যাবরেটরিতে কিছুকাল শিক্ষানবিসি। এরপর মুর্শিদাবাদে আজিমগঞ্জ হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার পদে যোগদান। কিছুকাল চাকরি করার পর ভাগলপুরে গিয়ে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস শুরু। শেষ জীবনে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস। 'শনিবারের চিঠিতে' ব্যঙ্গ কবিতা ও প্যারডি লিখে সাহিত্যজগতে প্রবেশ (১৯১৮)। 'প্রবাসীতে' একপাতা আধপাতার গল্প লিখে গল্পের আঙ্গিকে পরিবর্তন এনে খ্যাতি অর্জন। একই সঙ্গে উপন্যাসও রচনা। ছোটগল্পের শিল্পী হিসেবে সমধিক খ্যাত। তাঁর গল্প আকারে ক্ষুদ্র, অথচ বক্তব্যে সম্পূর্ণ। আঙ্গিকের উৎকর্ষে, ব্যঙ্গ রসিকতায়, আখ্যানবস্তুর মৌলিকতায়, মননশীলতায় ও চরিত্র চিত্রণের নিপুণতায় বনফুলের ছোটগল্প এক অভিনব সৃষ্টি। বাস্তব জীবন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র উপাদান তাঁর গল্প ও উপন্যাসে নিপুণভাবে প্রস্ফুটিত। গল্পগ্রন্থ: 'বনফুলের গল্প' (১৯৩৬), 'বনফুলের আরো গল্প' (১৯৩৮), 'বাহুল্য' (১৯৪৩), 'বিন্দুবিসর্গ' (১৯৪৪), 'অদৃশ্যলোকে' (১৯৪৭), 'অনুগামিনী' (১৯৪৭), 'বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৪৮), 'তন্বী' (১৯৫২), 'নরমঞ্জরী' (১৯৫৪), 'ঊর্মিমালা' (১৯৫৫), 'বনফুলের গল্প সংগ্রহ' (১ম ভাগ ১৯৫৫, ২য় ভাগ ১৯৫৭), 'সপ্তমী' (১৯৬০), 'দূরবীন' (১৯৬১)। উপন্যাস: 'তৃণখণ্ড' (১৯৩৫), 'বৈতরণী-তীরে' (১৯৩৬), 'কিছুক্ষণ' (১৯৩৭), 'দ্বৈরথ' (১৯৩৭), 'মৃগয়া' (১৯৪০), 'নির্মোক' (১৯৪০), 'সে ও আমি' (১৯৪৩), 'জঙ্গম' (১৯৪৩), 'অগ্নি' (১৯৪৬), 'মানদণ্ড' (১৯৪৮), 'নবদিগন্ত' (১৯৪৯), 'কষ্টিপাথর' (১৯৫১), 'লক্ষ্মীর আগমন' (১৯৫৪)। কবিতাগ্রন্থ: 'বনফুলের কবিতা' (১৯২৯), 'ব্যঙ্গ কবিতা' (১৯২৯), 'অঙ্গারপর্ণী' (১৯৩৩), 'চতুর্দশী' (১৯৪৭), 'করকমলেষু' (১৯৪৯)। জীবনী-নাটক রচনায় পথিকৃৎ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অবলম্বনে 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী অবলম্বনে

'বিদ্যাসাগর' (১৯৪২) নাটক রচনা। 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯।

বনমালী রায় (১৮৬২-১৯১৪)॥ জন্ম. তারাশ, পাবনা, ১৮৬২। জমিদার, সমাজসেবী। পাবনা জিলা স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা। ১৮৯৩-তে বেশ কিছুকাল বৃন্দাবন ও মথুরায় ভক্তের জীবনযাপন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক 'রাজর্ষি' উপাধিতে ভূষিত। মথুরায় রাধাকুঞ্জে একটি বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা। সমাজসেবী ও দানশীল ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত। সিরাজগঞ্জে কুসুম্বী ও বনওয়ারীনগরে স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মিলনায়তন প্রতিষ্ঠা। প্রতি বছর প্রায় এক লক্ষ করে টাকা দান। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান। ১৮৯৪-এ রায়বাহাদুর খেতাব লাভ। পাবনার বনমালী ইনস্টিটিউট তাঁর স্মৃতি বহন করছে। মৃত্যু. ২৩ নভেম্বর ১৯১৪।

বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯)॥ জন্ম. রাধানগর গ্রাম, পাবনা, ১৫ ডিসেম্বর ১৯০৬। কবি, ঔপন্যাসিক, শিশুসাহিত্যিক। এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। পিতা মুন্সী উমেদ আলী ছিলেন পাবনা জজকোর্টের একজন নিম্ন পদের কর্মচারী। পাবনার মজুমদার একাডেমি থেকে ১৯২৩-এ মেট্রিক পাস করে কলকাতা আর্ট অ্যাকাডেমিতে ভর্তি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়া হয়নি। ১৯২৫-এ ইসলাম দর্শন পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগদান। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর থেকে স্বীয় বাসভবন রাধানগরে বসবাস এবং ছোটদের পত্রিকা কিশোর পরাগ, শিশু বার্ষিকী, জ্ঞানের আলো প্রভৃতি সম্পাদনা। ১৯৬৪-র পর প্রথমে ঢাকা বেতারে ও পরে রাজশাহী বেতারে চাকরি। বিশিষ্ট কবি। কবিতায় পল্লী প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান। প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ রূপ বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। ময়নামতীর চর (১৯৩২), অনুরাগ (১৯৩২) প্রভৃতি



কবিতাগ্রন্থে কবি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। গদ্যে ও পদ্যে বহু সরস শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা। শিশুতোষ গ্রন্থ: চোর জামাই (১৯২৭), মেঘকুমারী (১৯৩২), মৃগপরী (১৯৩৭), বোকা জামাই (১৯৩৭), কামাল আতাতুর্ক (১৯৪০), ডাইনী বউ (১৯৫৯), রূপকথা (১৯৬০), কুঁচবরণ কন্যা (১৯৬০), ছোটদের নজরুল (১৯৬০), শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা (১৯৬৩)। চিত্রশিল্পী হিসেবেও খ্যাতি অর্জন। শিশুসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে ১৯৬২-তে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৬৫-তে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. রাজশাহী, ১৭ জুন ১৯৭৯।

বরুণ রায় (১৯২২-২০০৯)। জন্ম. সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার বেহেলী গ্রামের জমিদার পরিবারে, ১০ নভেম্বর ১৯২২। প্রকৃত নাম প্রসূন কান্তি রায়। বাবা করুণাসিন্ধু রায় (প্রজা বাবু) আসাম প্রাদেশিক পরিষদের এমএলএ ছিলেন। কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া মোগরা হাইস্কুল থেকে ১৯৪২-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বিদ্যালয়ে পড়াকালে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। মাত্র ২০ বছর বয়সে ১৯৪২-এ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সদস্য পদ লাভ। ১৯৪২-এ স্বাধীনতা দিবস পালন করার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ থেকে ১৯৪৭-এ আই.এ. পাস। ১৯৪৮-এ সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজে বিএ প্রথম বর্ষে ভর্তি। এ সময় পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশনের কাজে সার্বক্ষণিক হিসেবে নিযুক্তি। ১৯৪৯-এ পুনরায় গ্রেপ্তার। ৫২'র ভাষা-আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। একটানা ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কারাবাস। মুক্তি পেলেও রাখা হয় নজরবন্দি করে। ১৯৫৪-এর নির্বাচনে বিপুল ভোটে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৮-এ আইয়ুব খান সামরিক ফরমান জারি করলে গ্রেপ্তার ও ৫ বছর কারাবাস। ১৯৬৮-৬৯-এ গণআন্দোলনের সময় প্রকাশ্যে চলাফেরা থেকে বিরত থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম



সংগঠক। ১৯৭১-এর 'ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের' যৌথ গেরিলা বাহিনীর সংগঠকের দায়িত্ব পালন। ১৯৮০-এ জিয়াউর রহমানের আমলে আবার গ্রেপ্তার। ১৯৮৬-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৫ দলের মনোনয়নে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে সুনামগঞ্জ-১ আসন থেকে জয়লাভ। ১৯৮৭-এ এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন চলাকালে আবার গ্রেপ্তার। ১৯৯০-এ বার্ধক্যের কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর। শেষ বয়সে মণি সিংহ-ফরহাদ স্মৃতি ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত। স্ত্রী শীলা রায় শিক্ষা আন্দোলনের নেত্রী। তেভাগা আন্দোলন, ভাষা-আন্দোলন, ভাসান-পানি আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ সহ কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী জনতার মুক্তির সংগ্রামের প্রায় প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কারভোগ। শুধু পাকিস্তান আমলেই ১৪ বছর জেলে কাটিয়েছেন। মৃত্যু. সুনামগঞ্জ, ০৮ ডিসেম্বর ২০০৯।

বলদেব পালিত (১৮৩৫-১৯০০)॥ জন্ম. কোণাগ্রাম, হালিশপুর, ১৮৩৫। কবি। ১৮৪১-এ আফগান যুদ্ধে পিতা বিশ্বনাথ পালিতের মৃত্যু ঘটলে সরকার কর্তৃক নাবালক বলদেবের শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ। দানাপুর ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ। সংস্কৃত, ইংরেজি ও ইতিহাসে দক্ষতা অর্জন। দানাপুরেই সামরিক বিভাগের পেনসন-পে অফিসে চাকরি লাভ। ১৮৬৬-তে দানাপুরে একটি মধ্য ইংরেজি স্কুল স্থাপন। বিহারের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠায় অর্থ সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা দান। তাঁরই অর্থে বাঁকিপুরে টি.কে. ঘোষেজ একাডেমি এবং গয়া ও আরায় তিনটি স্কুল স্থাপিত। বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দের সার্থক প্রবর্তক। রচিত কবিতাগ্রন্থ: কাব্যমঞ্জুরী (১৮৬৮), কাব্যমালা (১৮৬৯), পালিত কবিতাবলি (১৮৭০), ভর্তৃহরি (১৮৭২) ও কর্ণার্জুন কাব্য (১ম ভাগ ১৮৭৫)। মৃত্যু. ৭ জানুয়ারি ১৯০০।



বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯)॥ জন্ম. জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ৬ নভেম্বর ১৮৭০। কবি ও প্রাবন্ধিক। বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৮৬-তে হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস। স্বদেশি বস্ত্রের ব্যবসায় নিয়োজিত। সুরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের তাঁর সঙ্গে এ ব্যবসায় যোগদান। জীবনের শেষ দিকে আর্যসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মিলনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ। ছাত্রবস্থায় প্রথম রচিত প্রবন্ধ 'একরাত্রি' জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত ও প্রথম কবিতা 'সন্ধ্যা' এই পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত। সাহিত্য রচনায় খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত। জীবিতকালে তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত। প্রবন্ধগ্রন্থ: চিত্র ও কাব্য (১৮৯৪)। কাব্য: মাধবিকা (১৮৯৬) ও শ্রাবণী (১৮৯৭)। প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি একালেও অম্লান। 'সংস্কৃত কাব্য ও ললিতকলার সমালোচনায়, নিভৃত মনের ভাবুকতায় এবং সৌন্দর্যমুগ্ধতায় বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনাবলি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। মৃত্যু. ২০ আগস্ট ১৮৯৯।



বসন্তকুমার পাল (১৮৯০-১৯৭৫) : জন্ম. ধর্মপাড়া গ্রাম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, ৫ নভেম্বর ১৮৯০। পিতা বঙ্কবিহারী পাল পেশায় কুম্ভকার, মাতা রায়রঙ্গিণী পাল। পার্শ্বস্থ চাঁদপুর গ্রামে কেদারনাথ মজুমদারের পাঠশায় শিক্ষার হাতেখড়ি। চাঁদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। ১৯০৮-এ 'অরুণ' নামে হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ। কুমারখালী এম.এন. উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯১০-এ মেট্রিক। পাবনা এডওয়ার্ড মহাবিদ্যালয়ে আই.এ. শ্রেণিতে ভর্তি হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অসমাপ্ত। ১৯১৪-এ চাপড়া মাইনর স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। এরপর পাবনা জিলা স্কুলে শিক্ষকতা। অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড অব ব্যাপ্টিস্ট মিশন স্কুলে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা। ১৯১৭-এ পাবনার সুজানগর এম.ই. স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা



হিসেবে নিয়োগ লাভ। ১৯১৮-এ পাবনা জিলা স্কুলে ফিরে আসেন। এসময় 'যুবরাজ', 'পাবনা', 'বগুড়া হিতৈষী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত। ১৯১৯-এ ইস্টার্ন রেলওয়ের ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের করণিক হিসেবে চাকরি গ্রহণ। ১৯২০-এ রাজনন্দিনী পালের সঙ্গে বিয়ে। ১৯৫০-এ অবসর গ্রহণ। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থীদের সেবায় আত্মনিয়োগ। আজীবন দারিদ্র্য-দুঃখের সঙ্গে বাস করেও লালনচর্চা অব্যাহত। প্রকাশিত গ্রন্থ: মহাত্মা লালন ফকির (১৯৫৪), তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৯৭২)। এছাড়া 'কাঙাল হরিনাথের জীবনী'র পাণ্ডুলিপি ১৯৫৭-এ রানাঘাটের একটি প্রেস থেকে হারিয়ে যায়। 'অর্ঘ্য' নামের কবিতাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত। মৃত্যু. নদীয়া, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৫।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (১৮৬৫-১৯৫২)॥ জন্ম.



বেলিয়াতোড় গ্রাম, বাঁকুড়া, ১৮৬৫। সংগ্রাহক। অভিজাত ও বিদ্যানুরাগী পরিবারে জন্ম। পিতা রামনারায়ণ রায়। শিল্পী যামিনী রায় তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা। পুরুলিয়া জেলা স্কুলে অধ্যয়ন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালার প্রথম পণ্ডিত। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে আটশত পুঁথি সংগ্রহ। এ-সকল পুঁথি সাহিত্য পরিষদকে দান। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ তাঁর প্রধান কীর্তি। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কালিয়া গ্রাম নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়াল ঘরের মাচা থেকে বসন্তরঞ্জন কর্তৃক এটি সংগৃহীত। স্বকৃত টীকা ও জ্ঞাতব্য তথ্যসহ উত্তমরূপে সম্পাদনা করে ১৯১৬-এ তৎকর্তৃক এই মহামূল্যবান গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত। পুঁথির আদ্যন্তবিহীন খণ্ডিতাংশে কবির পরিচয়, রচনাকাল, পুঁথির সর্বত্র বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। বসন্তরঞ্জন কাব্যটি নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। ঐতিহাসিক রাখালচন্দ্র দাস কালনির্ণয় করে বলেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' পুঁথি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাংলা পুঁথি'। কাব্যখানি আনুমানিক ১৪০০-এ রচিত। চর্যাপদের পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় নিদর্শন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলা হলে উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বসন্তরঞ্জনকে সেখানকার অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯১৯-১৯৩২ পর্যন্ত সেখানে অধ্যাপনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক বিদ্বদ্বল্লভ উপাধি প্রদান। মৃত্যু. ৯ নভেম্বর ১৯৫২।

বায়েজীদ বোস্তামী (?-৮৭৪)॥ জন্ম. বোস্তাম শহর, ইরান, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী। শিশুকালে পিতৃহীন হয়ে মাতার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত। তাঁর মাতৃভক্তি কিংবদন্তির ন্যায় সুবিদিত। একশত তেরজন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট মারফতি বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ। সিন্ধুর আবু আলী তাঁর প্রধান গুরু। ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আগমন। ঐ জেলার নাসিরাবাদ নামক গ্রামের পর্বত চূড়ায় খানকা স্থাপন। আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বহু লোক তাঁর দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত। খানকার নিকটবর্তী পুকুরে বড় বড় মাছ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কচ্ছপের বাস। এগুলো সম্পর্কে নানা রকমের কল্পকাহিনী প্রচলিত। চট্টগ্রাম থেকে বগুড়ার মহাস্থান গড়ে পদার্পণ। তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর গৌড় গমন। এখানে কিছুদিন অবস্থানের পর বোস্তাম প্রত্যাবর্তন। তাঁর অলৌকিক কেরামতি সম্পর্কে বহু জনশ্রুতি বিদ্যমান। মৃত্যু. বোস্তাম, ৮৭৪।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯)॥ জন্ম.



ক্রয়ডন, লন্ডন, ৫ জানুয়ারি ১৮৮০। সাহিত্যিক, বিপ্লবী। অগ্রজ দেশবরেণ্য নেতা অরবিন্দ ঘোষ। ক্রয়ডনে তাঁর নামকরণ হয় ইম্যানুয়েল ম্যাথিউ ঘোষ। একবছর বয়সে মা ও দিদির সঙ্গে ভারতে আগমন। দেওঘরে মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর সাহচর্যে তাঁর কৈশোর অতিবাহিত। ১৯০১-এ দেওঘর বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। দেওঘর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বসু ও সখারাম গণেশ দেউস্করের দ্বারা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ। পাটনায় কিছুকাল এফ.এ. অধ্যয়ন। পরে ঢাকা কলেজে

পড়াশুনা। ১৯০২-এ বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের কাছে বিপ্লববাদে দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এরপর বিপ্লবী দল সংগঠনের জন্য অরবিন্দের নির্দেশে কলকাতায় আগমন। ১৯০৪ থেকে সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে মনোনিবেশ। ১৯০৬-এ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতায় বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ। বিপ্লবের কর্মপন্থা নিয়ে পি. মিত্র ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তাঁদের সংস্রব ত্যাগ এবং মানিকতলার মুরারিপুকুর রোডের বাগান বাড়িতে বোমা তৈরির এক গুপ্ত কারখানা স্থাপন। বারীন্দ্রের নেতৃত্বে শুরু হয় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড। তাঁর নির্দেশেই ছোটলাট অ্যানড্রু ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা করা হয় এবং কলকাতার তদানীন্তন অত্যাচারী চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য তাঁর পরামর্শেই ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর মজফ্ফরপুর গমন। ১৯০৮-এ দলের লোকজনসহ মানিকতলার বাগানবাড়িতে গ্রেফতার। আলিপুর আদালতে বিচারে প্রথমে প্রাণদণ্ডাদেশ, পরে আপিলে আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ১৯০৯ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত কারারুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়া হলে বারীন্দ্রের মুক্তিলাভ। বিপ্লবী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত। ১৯২০-তে 'বিজলী' পত্রিকা প্রকাশ। মুক্তির পর কিছুকাল পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের আশ্রমে কাটান। ১৯২৮ থেকে স্থায়ীভাবে বাংলায় বসবাস। ১৯৩৩-এ ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি ডন অব ইন্ডিয়া' প্রকাশ। ১৯৫০-এ 'দৈনিক বসুমতি' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের 'রামানন্দ লেকচারার' নিযুক্ত। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ 'মানবাধিকার ও তার ক্রমবিকাশ', 'দ্বীপান্তরের বাঁশি', 'পথের ইঙ্গিত', 'ভারত কোন পথে', 'আমার আত্মকথা', 'অগ্নিযুগ', 'ঋষি রাজনারায়ণ', "The Tale of My Exile, Sir Aurobind'। মৃত্যু, ১৮ এপ্রিল ১৯৫৯।

বারীণ মজুমদার (১৯১৯-২০০২)॥ জন্ম, রাধানগর, পাবনা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯। সংগীতের পণ্ডিত। পিতা নিশেন্দ্র মজুমদার ছিলেন শিল্পী ও নাট্যকার। মা সেতার বাজাতেন। স্ত্রী ইলা মজুমদার ও পুত্র বাপ্পা মজুমদারও সংগীতশিল্পী। পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে সংগীতশিক্ষার প্রেরণা লাভ।

উপমহাদেশের কিং



থেকে স্নাতক। ও
গ্রহণ। দেশভাগে
সবাই ভারতে
পারলেন। দুষ্কৃতকা
নিয়ে যায়, দখল হ
পরে একটা ক্যা
তোলার ব্যবসায়।
হারিয়ে ছেড়ে দিলে
সংগীত নিয়ে কি
বুলবুল একাডেমী
হিসাবে যোগদান
কোর্স চালু করে
শ্রেণীর শিল্পী হিসা
করেন। ১৯৬০-এ
সঙ্গে বিয়ে। ১৯
কাকরাইলে ১৬জন
নিয়ে দেশের প্র
প্রতিষ্ঠা। নিজের হ
থেকেই একসময়ে
থেকে ১৯৭৪ সাল
অডিশন ও গ্রেডেশ
পালন। ১৯৮৬-এ
প্রতিষ্ঠা। সংগীত
'সুর লহরী' রচনা
পত্রিকা। সংগী
তৎকালীন পাকি
দিবসের বেসাম
ইমতিয়াজ' পদব
বাংলাদেশ সরকা
১৯৮৮-এ বেগম
মাহাবুবউল্লাহ জন
১৯৯০-এ ছায়ানট
পুরস্কার, ১৯৯৭-
জনকণ্ঠ গুণীজন স
একাডেমী ফেলো

াতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ থেকে বীন্দ্র পদক লাভ করেন। ২০০২-এ পান াধীনতা দিবস পুরস্কার। মৃত্যু. ঢাকা, ৩ মক্টোবর ২০০১।

বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৭৮)॥ জন্ম. খানখানাপুর, ফরিদপুর, ১৯০৬। নাট্যকার ও অভিনেতা। স্কুল শিক্ষক ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য তাঁর পিতা। ভূস্বামী পরিবারে জন্ম। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) অংশগ্রহণ



করায় রাজবাড়িতে গ্রেফতার। আশুতোষ ও বিপন কলেজে অধ্যয়ন। জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেয়ায় বি.এ. পড়ায় ছেদ পড়ে (১৯৩১)। কিছুকাল 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' চাকরি ১৯৩১-১৯৩২)। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান পার্টির সদস্যপদ লাভ (১৯৪২)। কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। পরবর্তীকালে বিবাহবিচ্ছেদ টে। নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম পুরোহিত। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় গ্রাম বাংলার কৃষক সমাজের দুঃখ দুর্দশা এবং তাদের ংগ্রামের ব্যর্থতা ও সফলতার আলেখ্য বলম্বনে 'নবান্ন' (১৯৪৪) নাটক রচনা করে ভূত খ্যাতি অর্জন। 'জনপদ' (১৯৪৫), 'কলঙ্ক' ১৯৪৬), 'মরাচাঁদ' (১৯৪৬), 'অবরোধ' ১৯৪৭), 'গোত্রান্তর' (১৯৬০) তাঁর অন্যান্য াটক। সমাজের নীচের তলার মানুষের জীবনচিত্র এ-সকল নাটকের উপজীব্য। মার্কসের ষ্টি নিয়ে যাঁরা নাট্যরচনায় সার্থকতা লাভ রেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান শীর্ষে। 'গণনাট্য ংঘের' মঞ্চে 'নবান্ন' নাটকের প্রধান সমাদ্দারের মিকায় অভিনয় করে নাট্যামোদী সমাজের মন য়। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭৮।

জয় গুপ্ত॥ জন্ম. ফুল্লশ্রী গ্রাম, বরিশাল, পঞ্চদশ তক। কবি। বিজয় গুপ্ত মঙ্গলকাব্যের ধারার ন্যতম প্রাচীন কবি। তিনি মনসামঙ্গলকাব্যের াদিকবি হিসেবে স্বীকৃত। বিজয় গুপ্ত তাঁর দ্মাপুরাণ কাব্যটি সম্ভবত ১৪৮৪-১৪৮৫-তে চনা শুরু করেন। কবিতাগ্রন্থটি ১৮৯৬-তে রিশালে প্রথম ছাপা হয়। মৃত্যু. পঞ্চদশ শতক।

বিজয় সরকার (১৯০৩-১৯৮৫)॥ জন্ম. ডুমদিগ্রাম, নড়াইল, ফেব্রুয়ারি ১৯০৩, (৭ ফাল্গুন ১৩০৯)। কবিয়াল ও গীতিকার। প্রকৃত নাম বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী। পিতা নবকৃষ্ণ অধিকারী কৃষিজীবী। দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। প্রথম জীবনে স্থানীয় একটি



তহশিল অফিসে চাকরি গ্রহণ। কাজের ফাঁকে সংগীতচর্চা ও যাত্রাদলে বিবেকের অভিনয়। গোপালগঞ্জের দুখাদুর গ্রামের বিখ্যাত কবিয়াল মনোহর সরকারের (রাঙাকর্তা নামে পরিচিত) সঙ্গে ২ বৎসর এবং খুলনার বিখ্যাত কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কাছে ১ বৎসর কবিগানের তালিম ও তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের কবিগানে বিশেষ উৎকর্ষ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান অতুলনীয়। কবিগানের মধ্যে ভাটিয়ালি সুরে রচিত ধুয়াগান পরিবেশনে তাঁর খ্যাতি শিখরস্পর্শী। কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, আব্বাসউদ্দীন আহমেদ প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। তাঁর রচিত কবি, সংখীসংবাদ ও ধুয়া গানের সংখ্যা প্রায় চারশত। তাঁর গানের একাধিক সংকলন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত। মৃত্যু. চব্বিশ পরগনা, ৬ নভেম্বর ১৯৮৫, (১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৯২)।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২)॥ জন্ম. খানাকুল গ্রাম, ফরিদপুর, ২০ অক্টোবর ১৮৬১। কবি, ভাষাবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক। নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও বিজ্ঞানে এবং সংস্কৃত, পালি, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী।



আইন পাস করে সম্বলপুরে ওকালতি শুরু। প্রায় চল্লিশ বছর একটানা ওড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য সোমপুরের রাজার আইন উপদেষ্টা। বঙ্গবাণী (১৯২১-১৯২৭), শিশুসাথী (১৯২৮) এবং বাংলা (১৯৩২) পত্রিকা সম্পাদনা। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা।

চোখের রোগে আক্রান্ত হয়ে অন্ধ হয়ে যান। ব্যঙ্গকবিতা রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান। ছন্দের গাঁথুনিতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য বঙ্গানুবাদে দক্ষতা প্রদর্শন। রচিত কবিতাগ্রন্থ: কবিতা (১৮৮৯), যুগপূজা (১৮৯২), ফুলশর (১৯০৪), যজ্ঞভস্ম (১৯০৪), পঞ্চকমলা (১৯১০), হেয়ালি (১৯১৫) ইত্যাদি। পালি ও সংস্কৃত থেকে অনূদিত কাব্য: থেরীগাথা (১৯০৫), গীতগোবিন্দ (১৯০৬)। কথাসাহিত্য: তপস্যার ফল (১৯১২)। গদ্য ও পদ্যে রচিত গ্রন্থ: কথানিবন্ধ (১৯০৫)। প্রবন্ধগ্রন্থ: প্রাচীন সভ্যতা (১৯১৫) ও জীবন বাণী (১৯৩৩)। ওড়িয়া থেকে অনুবাদ: সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাবলি (১৯২৬)। ইংরেজি গ্রন্থ: Elements of Social Anthropology, Aborigines of Central India, Orissa in the Making, History of the Bengali Language. মৃত্যু. ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪২।

বিদ্যাপতি (আনুমানিক ১৩৮০-১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ)॥



জন্ম. অনুমান করা হয় দ্বারভাঙা জেলার সীতামঢ়ী মহকুমার বিসফি গ্রাম, ১৩৮০ (আনুমানিক)। কবি। এক বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। তাঁর কৌলিক উপাধি ঠক্কর বা ঠাকুর। বংশ পরম্পরায় তাঁরা ছিলেন মিথিলার উচ্চ রাজকর্মচারী। শস্ত্র, শাস্ত্র, রাজ্যশাসন ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী। মিথিলার রাজা কীর্তি সিংহ কর্তৃক সভাপণ্ডিত নিযুক্ত। পরবর্তী রাজা দেব সিংহ ও শিব সিংহের রাজসভার কবি। তাঁর কবিখ্যাতি মূলত ব্রজবুলি ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক পদ (পদাবলী)-এর জন্য। পদাবলী ছাড়াও সংস্কৃতে অনেক গ্রন্থ রচনা। যেমন, মহারাজ কীর্তি সিংহের প্রশস্তিমূলক রচনা 'কীর্তিলতা'। কীর্তি সিংহের রাজত্বকালে রচিত 'কীর্তিপতাকা'। রাজা শিব সিংহের আদেশে রচিত 'পুরুষপরীক্ষা'। রানি বিশ্বাস দেবীর আদেশে লিখিত 'শৈভসর্বস্বহার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী'। স্মৃতিকথামূলক 'লিখনাবলী' ও 'ভাগবত' নামেও দুটি গ্রন্থ রচনা। মিথিলার কবি হলেও তাঁর পদাবলী বঙ্গদেশে জনপ্রিয়। 'ব্রজবুলি' তাঁর পদাবলীর বাহন। বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষার ধ্বনি মাধুর্য ও সংগীতময়তা মনোমুগ্ধকর। বিষয়ের লালনে, ধ্বনি, শব্দ ও অলঙ্কার ব্যবহারে নাগরিক বৈদগ্ধ ও মননশীলতার পরিচয় প্রদান। বিদ্যাপতি চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি। তাই তাঁর রাধা মানবীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। রাধার বয়ঃসন্ধির দৈহিক সুষমা ও লাস্যময়তা বিদ্যাপতির পদাবলীতে অঙ্কিত। ভাব সম্মিলন, ভাবোচ্ছ্বাস ও বিরহের পদ রচনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী।

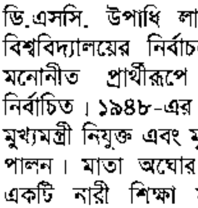
বিধানচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯৬২)॥ জন্ম. পাটনা,



বিহার, ১ জুলাই ১৮৮২। চিকিৎসক, অন্যতম কংগ্রেস নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। পৈতৃক নিবাস চব্বিশ পরগনার টাকী, শ্রীপুর। পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বিধানচন্দ্র মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশজাত। জীবনের প্রথম বিশ বছর পাটনায় অতিবাহিত। ১৮৯৭-তে পাটনা কলেজ থেকে গণিতে অনার্সসহ বি.এ. পাস করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি। ১৯০৬-এ এল.এম.এস. এবং ১৯০৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ডি. ডিগ্রি লাভ। ১৯০৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য বিলেত গমন। ১৯১১-তে লন্ডনের এম.আর.সি.পি.এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার। একই বছর এফ.আর.সি.এস. উপাধি লাভ করে দেশে প্রত্যাবর্তন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান। একই সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু। ১৯১৬-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য নির্বাচিত। ১৯১৯-এ তৎকালীন কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে মেডিসিনের অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯২৩-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাবে রাজনীতিতে যোগদান। স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনে জয়ী হয়ে তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। একই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পর্ষদের সভাপতি নির্বাচিত। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠার পর এর সম্পাদক ও কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৯২৯-এ নিখিল ভারত

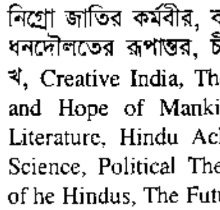
কংগ্রেস কমিটি সদস্য নিযুক্ত। ১৯৩০-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নিযুক্ত। ১৯৩১-এ আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে বোম্বাই থেকে কলকাতা ফেরার পথে ওয়ার্ধা স্টেশনে গ্রেফতার। একই বছর কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত এবং ১৯৩২-এ উক্ত পদে পুনর্বার নির্বাচিত। ১৯৩৪-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রথম বেসরকারি সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৩৫-এ রয়্যাল সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন ও ১৯৪০-এ আমেরিকান সোসাইটি চেস্ট ফিজিসিয়ানে ফেলো এবং ১৯৪১-এ বাংলা স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ফেলো মনোনীত। ১৯৪২-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত। দুই বছর এ পদে দায়িত্ব পালন (১৯৪২-১৯৪৪)। ১৯৪৪-এ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। একই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.এসসি. উপাধি লাভ। ১৯৪৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরূপে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪৮-এর ২৩ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন। মাতা অঘোর কামিনীর নামে পাটনায় একটি নারী শিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠা। দুর্গাপুর অঞ্চলকে একটি বৃহৎ শিল্প এলাকায় পরিণত করা তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি। জীবদ্দশায় উপ-মহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রূপে স্বীকৃতি লাভ। ১৯৬১-তে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে 'ভারতরত্ন' উপাধি লাভ। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর বাসভবনে একটি রোগ নির্ণয় গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যু. ১ জুলাই ১৯৬২।

বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯)॥ জন্ম. মালদা, ২৬ জানুয়ারি ১৮৮৭। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর, ঢাকা। সমাজতাত্ত্বিক। ১৯০১-এ মালদা জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৯০৫-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক এবং ১৯০৬-এ এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ইতিহাস এবং



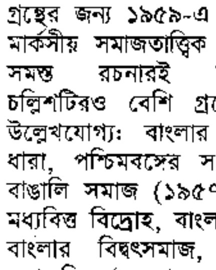
অর্থনীতি তাঁর পড়াশুনার মূল বিষয়। রাষ্ট্রনীতি, দর্শন ও সমাজতত্ত্বসহ সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়েও পাণ্ডিত্য অর্জন। বিদেশে শিক্ষার জন্য সরকারি বৃত্তি ও ডেপুটির চাকরি পেয়েও প্রত্যাখ্যান। ১৯০৭-১৯১১ পর্যন্ত বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে মালদহে বহু বিদ্যালয় স্থাপন। ১৯০৯-এ এলাহাবাদ পাণিনি কার্যালয়ের গবেষক নিযুক্ত। ১৯২৬-১৯৪৯ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও 'আর্থিক উন্নতি' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। কিছুকাল যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রেক্টর-এর দায়িত্ব পালন। ১৯৩০-১৯৩১-এ মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক। তাঁর The Positive Background of Hindu Sociology গ্রন্থটি জাতীয়চেতনাপ্রসূত রচনা। এ গ্রন্থে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার চিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপন। পুস্তকটিতে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সমাজতত্ত্বের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: নিগ্রো জাতির কর্মবীর, বর্তমান জগৎ (১৩ খণ্ড), ধনদৌলতের রূপান্তর, চীনা সভ্যতার অ আ ক খ, Creative India, The Science of History and Hope of Mankind, Love in Hindu Literature, Hindu Achievements in Exact Science, Political Theories and Institution of he Hindus, The Futurism of Young Asia, Sociology of Population, The Positive Background of Hindu Sociology, Economic Development, Sociology of Races, Cultures and Human Progress, Villages and Towns as Social patterns ইত্যাদি। মৃত্যু. স্বাধীন ভারতের বাণী প্রচারের জন্য আমেরিকা সফরকালে, ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯।

বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০)॥ জন্ম. গোড়াপাড় গ্রাম, যশোর, ১৪ জুন ১৯১৭। সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্য সমালোচক, সাহিত্যিক ও গবেষক। ছদ্মনাম 'কালপেঁচা'। আশুতোষ কলেজ থেকে বি.এ. পাস। কর্মজীবনের সূচনা সাংবাদিকতা দিয়ে। Forward, সাপ্তাহিক



অরণি, দৈনিক বসুমতী, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা। দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সক্রিয় সদস্য ও কর্মী। তাঁর রচিত 'ল্যাবরেটরি' নাটক এক সময়ে এই সঙ্ঘের দ্বারা অভিনীত। '৩০৪' নামে একটি উপন্যাসও রচনা। 'ডাস্টবিন' তাঁর ছোটগল্পের সংকলন। জীবনের শেষ দিকে রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ। ১৯৫৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা'র প্রথম বক্তা। ১৯৫৮-১৯৬০ পর্যন্ত রকফেলার রিসার্চ স্কলার হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গবেষণা। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (১৯৫৭) গ্রন্থের জন্য ১৯৫৯-এ 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' লাভ। মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ তাঁর সমস্ত রচনারই উল্লেখযোগ্য চরিত্র। চল্লিশটিরও বেশি গ্রন্থের প্রণেতা, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য: বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ (১৯৫৭), মেট্রোপলিটান মন, মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, বাংলা নবজাগৃতি (১৯৪৮), বাংলার বিদ্বৎসমাজ, সাময়িকপত্রে বাংলা সমাজচিত্র (১ম খণ্ড ১৯৬২, ৩য় খণ্ড ১৯৮০, ৪র্থ খণ্ড ১৯৬৩, ৫ম খণ্ড ১৯৮১), অটোমেটিক জীবন ও সমাজ (১৯৭৮), বাংলার লোকসংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্ব (১৯৮৩) প্রভৃতি। মৃত্যু. কলকাতা, ২৫ জুলাই ১৯৮০।

বিনয় বসু (১৯০৮-১৯৩০)॥ জন্ম. রাইতভোগ গ্রাম, বিক্রমপুর, ১৯০৮। বিপ্লবী। পিতা রেবতীমোহন বসু। ধনী পরিবারে জন্ম। ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের ডাক্তারি পড়া ছাত্র। ১৯৩০-এ গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় বেড়াতে যান। সেখানে গুপ্ত



রাজনৈতিক দল 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' এর বিশিষ্ট নেতা ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের অনুপ্রেরণায় সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে দীক্ষা গ্রহণ। অবিভক্ত বঙ্গের অত্যাচারী পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে হত্যার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। এর অল্পদিন পরেই লোম্যান ঢাকা ভ্রমণে আসেন। তিনি অসুস্থ বন্ধু (ঢাকার জেল পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট)-কে দেখতে মিটফোর্ড হাসপাতালে যান। হাসপাতালের সিঁড়ির গোড়ায় বিনয় রিভলবার দিয়ে লোম্যানকে হত্যা করে পালিয়ে যান। পুলিশ তাঁকে ধরার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালায়। সরকার তাঁর নামে পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি দেয়: 'লোম্যান হত্যাকারী বিনয় বসুকে যে ধরিয়ে দেবে-তাকে নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।' এমনি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বিনয় দরিদ্র মুসলমান কৃষকের বেশ ধারণ করে ঢাকা থেকে কিছুটা পথ পদব্রজে, বাকিটা স্টিমার ও ট্রেনে চড়ে কলকাতায় যান এবং সেখানে কয়েক মাস অজ্ঞাতবাসে থাকেন। আত্মগোপন করে থাকার জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য দলীয় নেতৃবৃন্দ তাঁকে গোপনে ইটালী পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তৎকর্তৃক সে প্রস্তাব প্রত্যাখান। দেশে থেকে তিনি দলের কর্মসূচী বাস্তবায়নের পক্ষে কাজ করতে চান। 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' এবার তাঁকে কারাগার বিভাগের জুলুমবাজ ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা করার দায়িত্ব দেয়। সঙ্গে দেওয়া হয় দলের অপর দুই কৃতি বিপ্লবী বাদল গুপ্ত (জন্ম. পূর্ব শিমুলিয়া, বিক্রমপুর, ১৯১২) ও দীনেশ গুপ্ত (জন্ম. যশোলঙ্গ গ্রাম, বিক্রমপুর, (১৯১১)-কে। তাঁরা উভয়েই স্কুলের ছাত্র। ১৯৩০-এর ৮ ডিসেম্বর বিনয় বসুর নেতৃত্বে তাঁরা রিভলবার নিয়ে ইংরেজ পুরুষদের শাসনকেন্দ্র কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং এ আক্রমণ চালান। সিম্পসন নিহত হন। তাঁদের গুলিতে রাজস্ব-সচিবের অফিস ও পাসপোর্ট অফিস তছনছ হয়ে যায়। এ যুদ্ধ 'বারান্দা যুদ্ধ' নামে খ্যাত। পুলিশ ও গোর্খা সৈন্যরা রাইটার্স বিল্ডিং ঘিরে ফেলে। গ্রেফতার এড়াবার জন্য বিনয়-বাদল-দীনেশের পটাশিয়াম সাইনাইট সেবন। ঘটনাস্থলেই বাদল গুপ্তের পরলোকগমন। বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্তকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। সেখানে ১৩ ডিসেম্বর (১৯৩০) বিনয় বসুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারের রায় অনুসারে ১৯৩১-এর ৭ জুলাই দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। বিনয়-বাদল-দীনেশ খ্যাতনামা বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক। ইংরেজদের শাসন থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাঁরা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দেন এবং শহীদ হন।

বিনয়বাঁশী জলদাস (১৯১২-২০০২)॥ জন্ম. গোমদণ্ডী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, ১৯১২। কিংবদন্তিতুল্য ঢোলবাদক। পিতা উপেন্দ্র জলদাস, মাতা স্বরবালা জলদাস। যাত্রাদলে নাচ ও গান করতেন। মৃগঙ্গ, বেহালা, দোতারা ও তবলাবাদনেও পারদর্শী। কবির গানের দোহার। পালাকীর্তনের গায়ক। জেলে পরিবারের সন্তান। আট বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে মা ও দু ভাই প্রথমে কাকা হৃদয়কৃষ্ণের পরিবারে আশ্রয় লাভ। পরে মামাবাড়িতে জেলে পরিবারে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে-ওঠা। ছেলেবেলায় চন্দ্রমণি জলদাসের কাছে বাল্যশিক্ষা লাভ; পাশাপাশি ঢুলী লক্ষিন্দরের কাছে নাচ ও ঢোলবাদনের তালিম গ্রহণ। ১৯৩৫-এ তেইশ বছর বয়সে পুনরায় পৈতৃক ভিটায় প্রত্যাবর্তন। জেলে পেশার পাশাপাশি বাজিয়ে দলের সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠানে ঢোল বাজিয়ে বাড়তি আয়ের চেষ্টা। বায়েন হিসাবে খ্যাতি অর্জন। ১৯৩৮-এর দিকে শহরে মনসা পুথির আসরে ঢোল বাজিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের মন জয় করে পুরস্কার লাভ। সে বছর পটিয়ার শীল-পাড়ায় কবিয়াল রমেশ শীলের কবিগান শুনে দারুণভাবে প্রভাবিত এবং সাম্যবাদী আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দোহার পদ গ্রহণ। ১৮৪৪-এ বিয়ে করেন সুরবালা জলদাস দাসকে। ১৯৪৫-এ কলকাতা মোহাম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে কবিয়াল রমেশ শীলের দোহার হিসেবে যোগদান। একই বছর নেত্রকোণায় 'সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে'ও রমেশ শীলের সঙ্গে ঢোলবাদন। ১৯৪৬, ১৯৪৮ ও ১৯৫২-তো আবার কোলকাতায় রমেশ শীলের সঙ্গে ঢোলবাদন। ১৯৫১-তে চট্টগ্রামে পূর্বপাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৯৫৪-তে ঢাকায় পূর্বপাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৯৫৭-তে টাঙ্গইলে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ১৯৬১-তে ঢাকায় বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর লোকসংগীত ও শিল্প উৎসবে কবিয়াল রমেশ শীলের সঙ্গে ঢোলবাদন। ১৯৭২-এ চট্টগ্রামের পাহাড়তলিতে কবিয়াল রাইগোপাল সরকারের দোহার হিসেবে কৃতিত্ব প্রদর্শন। ১৯৭৬-এ চট্টগ্রাম মুসলিম হলে চট্টগ্রাম লোকগাথা সম্প্রদায়ের 'আমিনা সোন্দরী' পালায় ঢোলবাদন। ১৯৭৭-এ চট্টগ্রামের জেলেপাড়ায় নিজের লেখা পুথিপাঠ। এবছরই চট্টগ্রামে অঙ্গন গ্রুপ থিয়েটারে যোগদান। ১৯৯০-তে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উদীচীর 'লোকসংগীত উৎসব'-এর উদ্বোধকের দায়িত্ব পালন। ১৯৯১-তে 'শ্রীশ্রীগোবিন্দমহারাজ সম্প্রদায়' নামে কীর্তনিয়া দল গঠন। ১৯৯৪-তে কলকাতায় '১৪০০ সাল উদযাপন কমিটি'র সভাপতি অন্নদাশঙ্কর রায়ের আমন্ত্রণে অংশগ্রহণ এবং ঢোলবাদন। ১৯৯৪-তে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা) আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী ঢোলবাদন কর্মশালায় নেতৃত্বদান। ১৯৯৮-তে চট্টগ্রাম লোকসংস্কৃতি উৎসব উদ্বোধন। ১৯৯৯-তে যশোরে অনুষ্ঠিত উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সম্মেলন উদ্বোধন। ২০০১-এ বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের চট্টগ্রাম লোকসংস্কৃতি উৎসব উদ্বোধন। একই বছর চট্টগ্রাম মুসলিম হলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে ঢোলবাদন। বিভিন্ন সময়ে অজস্র গান রচনা করেছেন। ১৯৯২-তে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে শামসুজ্জামান খানের পরিচালনায় বিনয়বাঁশীর জীবন ও কর্ম নিয়ে ভিডিওচিত্র গৃহীত। ১৯৯৯-তে 'বিনয়বাঁশী' নামে শৈবাল চৌধুরীর পরিচালনায় তথ্যচিত্র নির্মিত। পুরস্কার ও সম্মাননা: চট্টগ্রাম উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী গুণিজন সংবর্ধনা (১৯৯১), সিটি কোলকাতা ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন সংবর্ধনা (১৯৯১), চট্টগ্রাম একুশে মেলা পরিষদ সম্মাননা (১৯৯৯), বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক (২০০১)। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ৫ এপ্রিল ২০০২।

বিনোদবিহারী দত্ত (১৮৯২-১৯৭৬)॥ জন্ম. কানুনগোপাড়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, ২ জুলাই ১৮৯২। শিক্ষাবিদ। এম.এ., পি.আর.এস., পিএইচ.ডি. উপাধি অর্জন। প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার, কলেজসমূহের পরিদর্শক প্রভৃতি পদে কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ: Town Planning in Ancient India। মৃত্যু. ২ মার্চ ১৯৭৬।

বিপিনচন্দ্র দাস (১৯০৬-১৯৬৯)॥ জন্ম. গৌরীপুর, ময়মনসিংহ, ১৯০৬। সেতারবাদক, উচ্চাঙ্গ সংগীতের কণ্ঠশিল্পী। ওস্তাদ এনায়েত খাঁর কাছে সেতারে তালিম গ্রহণ। পরে কেষ্টগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওস্তাদ দবীর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ। খেয়াল গানে পারদর্শিতা অর্জন। যন্ত্রসংগীত ও কণ্ঠসংগীতে দক্ষ। মৃত্যু. ক্যান্সার রোগে, ১৩ আগস্ট ১৯৬৯।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)॥ জন্ম. পৈল গ্রাম, সিলেট, ৭ নভেম্বর ১৮৫৮। রাজনীতিবিদ ও বাগ্মী। শৈশবে সিলেট শহরে একজন মৌলভীর কাছে লেখাপড়া শিক্ষা। ১৮৭৪-এ হিন্দু বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাস। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট। ১৯৭৭-এ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। ধর্মান্তরিত হওয়ার দরুন পিতা কর্তৃক ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা। ১৮৭৯-তে কটকের একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে কিছুকাল কাজ করার পর সিলেট, কলকাতা, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা। এরপর কলকাতায় এসে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতির দীক্ষাগুরু। ১৮৮৫ থেকে কংগ্রেসের প্রগতিশীল শাখার সঙ্গে যুক্ত। ১৮৮৭-তে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয় অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব। ১৮৯৮-তে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়তে বিলেত গমন এবং এক বছর অক্সফোর্ডে কাটান। এ সময় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে সুবক্তা হিসেবে খ্যাতি অর্জন। দেশে ফিরে ১৯০১-এর ১২ আগস্ট 'নিউ ইন্ডিয়া' নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ। ১৯০২-এ আসামের চা বাগানের কুলিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রবন্ধ রচনা ও সেখানকার অত্যাচারী সাহেবদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে আসাম থেকে বহিষ্কৃত। ১৯০৬-এর ৬ আগস্ট তাঁর সম্পাদনায় ইংরেজি 'দৈনিক বন্দে মাতরম্' পত্রিকা প্রকাশিত। অরবিন্দের মামলায় সাক্ষ্যদান করতে অস্বীকার করায় ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ। ১৯০৭-এ মাদ্রাজের সমুদ্র উপকূলে স্বরাজের দাবি উত্থাপন করে যে বক্তৃতা দেন তা দেশবাসীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯০৮-এ দ্বিতীয়বার বিলেত গমন। ইংল্যান্ডে 'স্বরাজ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'বাঙলাদেশে বোমার নিদান' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখার জন্য কারাদণ্ড ভোগ। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময়ে চরমপন্থি সংগ্রামের পথ বর্জন করে অ্যানি বেশান্তের 'হোমরুল আন্দোলন'কে সমর্থন দান। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-১৯২২) বিরোধিতা। রচিত গ্রন্থ: শোভনা, ভারত সীমান্তে রুশ, মহারানি ভিক্টোরিয়ার জীবনী, জেলের খাতা, Indian Nationalism, Nationality and Empire, Swaraj and the Present Situation, The Basic of Social Reform, The Soul of India, The New Spirit, Studies of Hinduism ইত্যাদি। তার সম্পাদনায় প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকা: পরিদর্শন, দি হিন্দু রিভিউ, দি ডেমোক্রেট, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইত্যাদি। স্বদেশি আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পালের অগ্নিস্রাবী লেখা ও অনলবর্ষী বক্তৃতা বিশ শতকের প্রথম দশকে দেশবাসীকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পথ সুগম করে তোলে। মৃত্যু. ২০ মে ১৯৩২।



বিপিনবিহারী নন্দী (১৮৭০-১৯৩৭)॥ জন্ম. খাইন গ্রাম, পটিয়া, চট্টগ্রাম, ২৫ জানুয়ারি ১৮৭০। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: সপ্তকাণ্ড রাজস্থান, শিখা, অর্ঘ্য, নারী, চন্দ্র ও চন্দ্রধর। মৃত্যু. ২১ জুলাই ১৯৩৭।

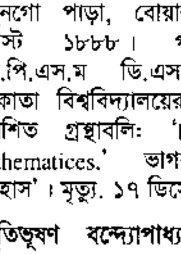
বিবি তাহেরণ লেছা॥ জন্ম. তারিখ অজ্ঞাত। ১৮৬০-এর দশকে দিনাজপুরের বোদা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। সাম্প্রতিককালে ডক্টর গোলাম মুরশিদ এক গবেষণা প্রবন্ধে তাহেরণ লেছার (নেছা) একটি গদ্যরচনা উদ্ধার করে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তাহেরণ লেছাই প্রথম মুসলমান গদ্যলেখিকা, 'এমনকি তাবৎ মহিলা লেকখের মধ্যেও একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করতে পারেন।' প্রথম মুসলমান গদ্যলেখক শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীর 'উচিৎ-শ্রবণ' (১৮৬০)-এর গদ্য ছিল আড়ষ্ট ও দুর্বোধ্য। শেখ আজিমুদ্দীনের 'কুড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ের' (দ্বি মু ১৮৬৮) রচনাভঙ্গিও তাই। কিন্তু তাহেরণ লেছার গদ্যে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের সুস্পষ্ট প্রভাব ও ছন্দস্রোত লক্ষ করা যায়। অর্থের দিক দিয়েও এ গদ্যে অস্পষ্টতা নেই। বিবি তাহেরণের গদ্যশৈলী 'শব্দাড়ম্বরপূর্ণ' হলেও ধ্বনি সামঞ্জস্য ও অর্থের দিক দিয়ে ঘনিষ্ঠ অন্বয়বিশিষ্টতার কারণে সাবলীল। বামাবোধিনী পত্রিকার ১৮৬৫-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় পত্রিকার সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে লিখিত ও 'বামা রচনা, বিভাগে প্রকাশিত রচনাটির অংশবিশেষ এ রকম: 'বিবেচনা করিতে গেলে এমন কোন গর্হিত কর্মই

নাই যে তাহা মূর্খ দ্বারা হয় না। এই অসার সংসারে, মূর্খ হইয়া কুলকামিনীগণের কলেবর ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। অজাত ও মৃতপুত্র কেবল একবার দুঃখদায়ক, কিন্তু মূর্খ সন্তান যে কত দুঃখদায়ক ইহা কাহার না চিত্তক্ষেত্রে জাগরিত হইয়াছে?... পুত্র বিদ্বান হইলে সে যেমন তৎপ্রভাবে পিতৃকুলোজ্জ্বল করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করে; পুত্রি বিদ্যাবতী হইয়া সৎপথালম্বিনী হইলে, সে যে তদ্রূপ পিতৃ এবং স্বামী উভয় কুল সমুজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে ইহাতে সংশয় কি?'

বিভূতিচন্দ্র (একাদশ শতক)॥ জীবনকাল: একাদশ শতক। দার্শনিক। বাংলার রাজা রামপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল বিহারের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বিভূতিচন্দ্র 'অমৃত-কর্ণিকা' নামে 'নানসংগীতের' একটি টীকা রচনা করেন।

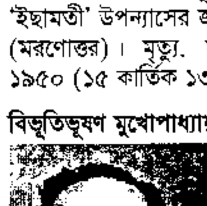
বিভূতিভূষণ দত্ত (১৮৮৮-১৯৫৮)॥ জন্ম. কানুনগো পাড়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, ১৫ আগস্ট ১৮৮৮। গণিতবিদ। এম.এ., আর.পি.এস.ম ডি.এসসি. ডিগ্রি অর্জন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: 'History of Hindu Mathematices.' ভাগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস'। মৃত্যু. ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫৮।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)॥



জন্ম. মাতুলালয়, মুরারিপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪। ঔপন্যাসিক। পৈতৃক নিবাস ব্যারাকপর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা মৃণালিনী দেবী। বাল্য ও কৈশোর দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। পিতার পেশা ছিল কথকতা ও পৌরোহিত্য। স্থানীয় বনগ্রাম স্কুল থেকে ১৯১৪-তে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস। কলকাতা রিপন কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে ১৯১৬-তে প্রথম বিভাগে আই.এ. এবং ১৯১৮-তে ডিস্টিংশনে বি.এ. ডিগ্রি লাভ। প্রথমে গৌরী দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯১৮)। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর তেইশ বছর পর ১৯৪০-এ রমা দেবীকে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ। কর্মজীবনের হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া স্কুলে, সোনারপুর হরিনাভি স্কুলে, কলকাতা খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে ও ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী গোপালনগর স্কুলে শিক্ষকতা। শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালে বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণের জনপ্রিয়তা অসাধারণ। বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিকতার মধ্যে তাঁর মৌলিকতা ও সরস নবীনতা এক বিস্মকর ঘটনা। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনাচরণের সজীব ও নিখুঁত চিত্র তাঁর উপন্যাসে মেলে। প্রকৃতি ও মানব জীবনকে অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড সত্তায় ধারণ করেছেন তাঁর সাহিত্যে। তাঁর রচনায় তাই প্রকৃতি শুধু প্রাকৃতিক বর্ণনায় পর্যবসিত নয়, এর মধ্যে রয়েছে গভীর জীবনদৃষ্টি। বিভূতিভূষণ ভাষা মধুর ও কাব্যধর্মী। গীতিকবির ব্যক্তিত্ব সাপেক্ষে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছোটগল্পগুলোর মধ্যে পরিস্ফুট। গ্রন্থাবলি— উপন্যাস: 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯), 'অপরাজিত' (১৯৩১), 'দৃষ্টি প্রদীপ' (১৯৩৫), 'আরণ্যক' (১৯৩৮), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'ইছামতী' (১৯৪৯)। ছোটগল্প সংগ্রহ: 'মেঘমাল্লার' (১৯৩১), 'মৌরীফুল' ১৯৩২) 'যাত্রাবদল' (১৯৩৪), 'কিন্নর দল' (১৯৩৮)। আত্মজীবনীমূলক রচনা: 'তৃণাঙ্কুর' (১৯৪৩)। 'পথের পাঁচালী ও 'অপরাজিত' বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ বিশেষ। 'পথের পাঁচালী' ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত। 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' লাভ (মরণোত্তর)। মৃত্যু. ঘাটশীলা, ১ সেপ্টেম্বর-১৯৫০ (১৫ কার্তিক ১৩৫৭)।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৮৭)॥ জন্ম.



পাণ্ডুল গ্রাম, দ্বারভাঙ্গা, বিহার, ১৮৯৬। কথাসাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস চাকতা গ্রাম, শ্রীরামপুর হুগলী। পিতা বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়। পিতামহ মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের নীলকুঠিতে চাকরির ব্যাপদেশে দ্বারভাঙার পাণ্ডুল গ্রামে গমন এবং সেখানে বসতি স্থাপন। সে

সময় থেকে মুখোপাধ্যায় পরিবারের ঐ স্থানে স্থায়ীভাবে বাস। দ্বারভাঙ্গা রাজ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯১২), কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই.এ. এবং পাটনা কলেজ থেকে বি.এ. ও বি.এল ডিগ্রি লাভ। দ্বারভাঙ্গা রাজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সেখানকার রাজ প্রেসের ম্যানেজার এবং পাটনা থেকে প্রকাশিত দ্বারভাঙ্গার রাজ পরিবারের একটি ইংরেজি দৈনিকের ম্যানেজার পদে দায়িত্ব পালন। বাংলা ছোটগল্পে একজন বিশিষ্ট শিল্পী। শিশু-মনস্তত্ত্ব ও সাধারণ বাঙালি পরিবারের স্নিগ্ধ-মধুর আলেখ্য তাঁর ছোটগল্পে সার্থকভাবে রূপায়িত। হাস্যরস বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের মূল উপাদান। গল্পগ্রন্থ: রানুর প্রথম ভাগ (১৯৩৪), রানুর দ্বিতীয় ভাগ (১৯৩৮), রানুর তৃতীয় ভাগ (১৯৪০), রানুর কথামালা (১৯৪১), বরযাত্রী (১৯৫২)। উপন্যাস: নীলাঙ্গুরীয় (১৯৪২)। মৃত্যু. ৩০ জুলাই ১৯৮৭।

বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১)॥ জন্ম. ১৮ মার্চ ১৯১২। কথাসাহিত্যিক। পিতা সতীশচন্দ্র মিত্র, স্ত্রী আভা মিত্র। আদি নিবাস ফতেপুর গ্রাম, নদীয়া। ১৯২৯-এ প্রবেশিকা পাস। আশুতোষ কলেজ (কলকাতা) থেকে আই.এ., বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. (১৯৩৮) ডিগ্রি লাভ। রেল বিভাগের চাকরি গ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। ১৯৫৫-তে রেল বিভাগের ডেপুটি চিফ কন্ট্রোলার পদে উন্নীত। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে লেখার কাজে পূর্ণ মনোনিবেশ। সরস গল্প ও উপন্যাস লিখে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। কলকাতার উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবন-চিত্র তাঁর উপন্যাসে সার্থকভাবে অঙ্কিত। সাহেব বিবি গোলাম, কড়ি দিয়ে কিনলাম, বেগম মেরী বিশ্বাস প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কড়ি দিয়ে কিনলাম উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ (১৯৬৪)। গল্পগ্রন্থ: দিনের পর দিন, শ্রেষ্ঠ গল্প। সম্পাদক: কালিকলম। মৃত্যু. কলকাতা, ২ ডিসেম্বর ১৯৯১।



বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৯০৯। কবি, প্রাবন্ধিক ও চিত্র সমালোচক। বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ মিত্র ইনস্টিটিউট স্কুলে। ১৯৩২-এ সেন্ট পলস কলেজ থেকে ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৩৪-এ এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৯৩৫-এ অধ্যাপক হিসেবে রিপন কলেজে যোগদান। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজ, মওলানা আজাদ কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা। ১৯২৩-এ 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের ফলে যে নতুন সাহিত্য উদ্যম ও ব্যতিক্রমী শিল্পচেতনার জন্ম নেয় সেই নতুন সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্যতম। 'কল্লোল' পত্রিকা বন্ধ হওয়ার পর (১৯৩০) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' (১৯৩১) পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। ১৯৪৭ পর্যন্ত এ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর একজন। ১৯৪৮-এ চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'সাহিত্য পত্র' প্রকাশ। প্রকাশিত গ্রন্থ– কবিতা: উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩), চোরাবালি (১৯৩৭), সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪), তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮), স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬৩), সেই অন্ধকার চাই (১৯৬৭), রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে (১৯৭৩), দিবানিশি (১৯৭৬), চিত্ররূপমত্ত পৃথিবীর (১৯৭৬), উত্তরে থাকো মৌন (১৯৭৭), আমার হৃদয়ে বাঁচো (১৯৮২) প্রভৃতি। প্রবন্ধ: সাহিত্যের ভবিষৎ (১৯৫২), এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য (১৯৬৮), রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতা সমস্যা (১৯৬৬), মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা (১৯৬৭) প্রভৃতি। অনুবাদ: এলিয়টের কবিতা (১৯৫০)। ১৯৫৫-তে 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার এবং ১৯৭২-এ 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভ। তিরিশের কাব্যধারায় বিষ্ণু দের মধ্যেই প্রথম রাবিন্দ্রিক কাব্যবলয় অতিক্রমণের সার্থক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মার্কসীয় তত্ত্বকে জীবনাবেগ ও শিল্পসম্মত করে উপস্থাপনা ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য অপরিসীম। মৃত্যু. ৩ ডিসেম্বর ১৯৮২।



বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)॥ জন্ম. নিমতলা, কলকাতা, ২৫ মে ১৮৩৫। কবি। পিতা দীননাথ চক্রবর্তী। চার বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ। সংস্কৃত কলেজে তিন বছর



অধ্যয়ন। গৃহে সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন। উনিশ বছর বয়সে অভয়া দেবীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। অল্পকাল পরে অভয়া দেবী দেহত্যাগ করলে কাদম্বরী দেবীকে বিবাহ। পূর্ণিমা (১৮৫৯), সাহিত্য সংক্রান্তি (১৮৬৩) ও অবোধ বন্ধু (১২৭৫) নামক মাসিক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা। আধুনিক বাংলা গীতি কবিতার স্রষ্টা। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ও গীতোচ্ছ্বাস বিহারীলালের কবিতায় প্রথম বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গুরু হিসেবে তাঁর খ্যাতি। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁকে বাংলা গীতিকাব্য ধারার 'ভোরের পাখী' বলে আখ্যায়িত। প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ: স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮), সংগীত শতক (১৮৬২), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), প্রেমপ্রবাহিনী (১৮৭০) ও সারদামঙ্গল (১৮৭৯)। বিহারীলালের সব কাব্যই বিশুদ্ধ গীতিকাব্য। মনোবীণার নিভৃত ঝঙ্কারে এ গুলোর সৃষ্টি। বাঙালি কবি মানসের বহির্মুখী দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মৃত্যু. কলকাতা, ২৪ মে ১৮৯৪।

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৯০৫-১৯৭৫)॥



জন্ম. গৌরীপুর, ময়মনসিংহ, ১৯০৫। সংগীতজ্ঞ। পিতা জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ছিলেন গুণী সংগীতজ্ঞ ও শাস্ত্রীয় সংগীতের পৃষ্ঠপোষক। সংগীতময় পরিবেশের প্রভাবে শৈশবকাল থেকে সংগীতের প্রতি অনুরক্ত। পিতার দরবার সংগীতজ্ঞ শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট সংগীতের তালিম গ্রহণ। পরে ওস্তাদ আবদুল্লাহ খাঁর কাছে কণ্ঠসংগীত, বিখ্যাত সরোদ বাদক ওস্তাদ আমীর খাঁ ও ওস্তাদ এনায়েত খাঁর কাছে সেতার ও সুরবাহার এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, কেরামতুল্লাহ খাঁ, খয়েরুদ্দিন খাঁ, দবীর খাঁ, মোহাম্মদীন খাঁ, মামুদ খাঁ, মেহেদী হোসেন খাঁ, সগীর খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ, এস. চৌধুরী, হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সংগীতজ্ঞের নিকট ধ্রুপদ, ধারাম, আলাপ, বীণা, সরোদ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে শিক্ষাগ্রহণ। মেগাফোন গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে প্রথম বীণা বাদনের ডিস্ক প্রকাশিত। আকাশবাণীর অডিশন কমিটির সদস্য। সংগীত নাটক একাডেমির প্রতিনিধি। ১৯৫৬-তে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে থেকে 'ফেলো অব দি একাডেমি' সম্মান লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ৪ জুলাই ১৯৭৫।

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (১৯২৯-১৯৮৫)॥ জন্ম,

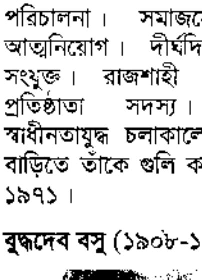


সানপুকুরিয়া গ্রাম, সাতপাড়, গোপালগঞ্জ। শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী। পিতা যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মাতা তারামণি বিশ্বাস। স্ত্রী কণিকা বিশ্বাস ১৯৭৩-এ জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭-এ সানপুকুরিয়া পাঠশালায় শিক্ষাজীবন শুরু। ১৯৪৮-এ সাতপাড় উচ্চবিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাস। ১৯৫১-এ রামদিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলেজ থেকে আই.এ. পাস। ১৯৫৪-এ বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ থেকে বি.এ. পাস এবং ভেন্নাবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান। পরের বছর কোটালীপাড়া জুনিয়র হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান। একই বছর কদমবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান। ১৯৫৭-এ সাতপাড় দীননাথ গয়ালীচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান। ১৯৫৯-এ বি.টি. পাস। ১৯৬০-এ সাতপাড় স্কুলে প্রধানশিক্ষক হিসেবে যোগদান। ১৯৬২-ও শিক্ষা আন্দোলনে গোপালগঞ্জ অঞ্চলে ভূমিকা পালন। ১৯৬৩-তে সাতপাড়ে তিনদিনব্যাপী তফশিলি সম্মেলন আহ্বান। ১৯৬৫-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাস এবং এলাকায় 'নাইট স্কুল' স্থাপন। ১৯৬৬-তে সাতাপাড় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৭-তে সাতপাড় নজরুল কলেজ প্রতিষ্ঠা ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৬৮-তে সাতপাড় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৯-এ 'জাতীয় গণমুক্তি দল' গঠন করেন এবং কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ ১৯৭০-এ

সাতপাড়ে জাতীয় গণমুক্তি দলের সম্মেলন আয়োজন। 'দিশারী' নামে সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ। কোটালীপাড়া আসন থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ। ১৯৭২-এ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জাতীয় গণমুক্তি দল বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৭৩-এ নজরুল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সংসদ সদস্য স্ত্রী কণিকা বিশ্বাস এবং নিজের জীবনে অনিশ্চয়তার কথা ভেবে গ্রামে ফেরা। ৩ নভেম্বর জাতীয় চার নেতা হত্যার পর ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণ। ১৯৭৮-এ 'নিখিল ভারত' নামের পত্রিকা সম্পাদনা। তাঁর অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। মৃত্যু. হৃদয়পুর, পশ্চিমবঙ্গ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার (?-১৯৭১)॥ জন্ম. রাজশাহী। আইনজীবী, রাজনীতিক, সমাজসেবক। ব্রিটিশ যুগের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অন্যতম কর্মী বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান। বিনা অর্থে বহু রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা। সমাজসেবামূলক কাজ কর্মে আত্মনিয়োগ। দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার সঙ্গে সংযুক্ত। রাজশাহী প্রেস ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাক সেনাবাহিনী তাঁর বাড়িতে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে, ৩ এপ্রিল ১৯৭১।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)॥ জন্ম. কুমিল্লা, ৩০ নভেম্বর ১৯০৮। কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, অনুবাদক ও সম্পাদক। পৈতৃক নিবাস মালখানগর, মুন্সীগঞ্জ। ঢাকা বারের উকিল ভূদেবচন্দ্র বসু তাঁর পিতা। বুদ্ধদেবের জন্মের চব্বিশ ঘণ্টা পরে তাঁর মাতা বিনয় কুমারীর (১৬) ধনুষ্টঙ্কার রোগে পরলোকগমন। মাতামহ-মাতামহীর কাছে প্রতিপালিত। পুলিশ অফিসার (দারোগা) চিন্তাহরণ সিংহ তাঁর পিতামহ। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম ভাগ কাটে পিতামহের কর্মস্থল কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ঢাকায়। ১৯২৩-এ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি। এ স্কুল থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার (১৯২৫)। ঢাকা সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আই.এ. পাস (১৯২৭)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০-এ ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে বি.এ. অনার্স ও ১৯৩১-এ প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. (ইংরেজি) ডিগ্রি লাভ। ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতা গমন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস। বিক্রমপুরের প্রতিভা সোমের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ (১৯৩৪)। অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কলকাতা রিপন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা, ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা, ১৯৫২-তে দিল্লি ও মহিশুরে ইউনেস্কোর প্রকল্প উপদেষ্টা, ১৯৫৩-তে যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গের পেনসিলভেনিয়া 'কলেজ ফর উইমেন'-এ শিক্ষকতা ও ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা। উচ্চমানের সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক হিসেবে খ্যাত। ঢাকার পুরানা পল্টন থেকে তাঁর ও অজিত দত্তের যৌথ সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'প্রগতি' (১৯২৭-১৯২৯) ও কলকাতা থেকে তাঁর ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের যৌথ সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক 'কবিতা' (১৯৩৫) পত্রিকা প্রকাশিত। 'কবিতা পত্রিকা' পঁচিশ বছর (১০৪টি সংখ্যা) সম্পাদনা। তৃতীয় বর্ষ ১ম সংখ্যা (১৯৩৭) থেকে বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন এবং ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা (১৯৪১) থেকে বুদ্ধদেব বসু একাই এর সম্পাদক। আধুনিক বাংলা কবিতার সমৃদ্ধি, প্রসার ও তা জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে 'কবিতা'র অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৩৮-এ হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' সম্পাদনা। ১৯৪২-এ ফ্যাসীবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের আন্দোলনে যোগদান। পঞ্চাশের দশক থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির একজন সমর্থক হিসেবে পরিচিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। বুদ্ধদেব বসুর গদ্য ও পদ্যের রচনাশৈলী স্বতন্ত্র ও মনোজ্ঞ। রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক কাব্য ধারার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। গদ্যশিল্পী হিসেবে সমধিক সৃজনশীল প্রতিভার



পরিচয় প্রদান। পরিমার্জিত সংগীতময়তা ও পরিশীলিত স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁর গদ্যের বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সমালোচনামূলক সাহিত্য রচনায়ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান। ইংরেজি সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। বাংলা গদ্যরীতিতে ইংরেজি বাক্য গঠনের ভঙ্গি গ্রথিত করে বাংলা ভাষাকে অধিকতর সাবলীলতা দান। আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: কবিতা– মর্মবাণী (১৯২৫), বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), পৃথিবীর পথে (১৯৩৩), কঙ্কাবতী (১৯৩৭) দময়ন্তী (১৯৪৩), দ্রৌপদীর শাড়ী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৬৩), মরচেপড়া পেরেকের গান (১৯৬৬), একদিন:চিরদিন (১৯৭১), স্বাগত বিদায় (১৯৭১)। উপন্যাস– সাড়া (১৯৩০), সানন্দা (১৯৩৩), লাল মেঘ (১৯৩৪), পরিক্রমা (১৯৩৮), কালো হাওয়া (১৯৪২), তিথিডোর (১৯৪৯), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১), মৌলিনাথ (১৯৫২), নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৬০), পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭), রাত ভর বৃষ্টি (১৯৬৭), গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮), বিপন্ন বিস্ময় (১৯৬৯), রুক্মি (১৯৭২)। গল্প–অভিনয়, অভিনয় নয় (১৯৩০), রেখাচিত্র (১৯৩১), হাওয়া বদল (১৯৪৩), শ্রেষ্ঠগল্প (১৯৫২), একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু (১৯৬০), হৃদয়ের জাগরণ (১৯৬১), ভালো আমার ভেলা (১৯৬৩), প্রেমপত্র (১৯৭২)। প্রবন্ধ–হঠাৎ আলোর ঝলকানি (১৯৩৫), কালের পুতুল (১৯৪৬), সাহিত্যচর্চা (১৯৫৪), রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্যে (১৯৫৫) স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭), সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩), প্রবন্ধ–সংকলন (১৯৬৬), কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬)। ভ্রমণ কাহিনী–সব পেয়েছির দেশে (১৯৪১), জাপানি জার্নাল (১৯৬২), দেশান্তর (১৯৬৬)। নাটক– মায়া-মালঞ্চ (১৯৪৪), তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬), কলকাতার ইলেক্ট্রা ও সত্যসন্ধ (১৯৬৮)। স্মৃতিকথা– আমার ছেলেবেলা (১৯৭৩), আমার যৌবন (১৯৭৬)। অনুবাদ কালিদাসের মেঘদূত (১৯৫৭), বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা (১৯৬০), হেল্ডার্লিনের কবিতা (১৯৬৭), রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা (১৯৭০)। সম্পাদনা– আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৬৩)। ১৯৬৭-তে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাট্যের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৭০-এ পদ্মভূষণ উপাধি ও ১৯৭৪-এ 'স্বাগত বিদায়' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, হৃদরোগে, ১৮ মার্চ ১৯৭৪।

বুলবুল আহমেদ (১৯৪১-২০১০)॥ জন্ম. আগামসি লেন, ঢাকা ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪১। প্রকৃত নাম তাবাররুক আহমেদ। পিতা মোহাম্মদ খলিল আহমেদ ও মাতা মরহুমা মোসাম্মদ মোসলেমা বেগম। বুলবুল আহমেদের পিতা ইনকামট্যাক্স বিভাগে চাকরি করতেন। বুলবুল আহমেদ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট, নটরডেম কলেজ থেকে বিএ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন। ঢাকা কলেজে পড়ার সময়েই অভিনয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন বুলবুল আহমেদ। তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংকে, অধুনা জনতা ব্যাংকে চাকরি ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৬৮ সাল থেকে টিভি নাটকে অভিনয়। ১৯৭২-এ ইউসুফ জহিরের 'ইয়ে করে বিয়ে' ছবিতে সহনায়কের চরিত্রে অভিনয়। এর আলমগীর কবিররের 'সূর্যকন্যা', 'সীমানা পেরিয়ে', 'রূপালি সৈকতে', 'মোহনা' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে অভিনয়। 'সীমানা পেরিয়ে' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ। এছাড়া 'বধূবিদায়' (১৯৭৮), 'শেষ উত্তর' (১৯৮০) ছবিতে অভিনয়ের জন্য পেয়েছিলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। ১৯৮৭-এ 'রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত' চলচ্চিত্র পরিচালনা ও প্রযোজনা। চারটি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং বারোটি শাখায় বাচসাস পুরস্কার লাভ করে। অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র: সূর্যকন্যা, সিমানা পেরিয়ে, রূপালি সৈকতে, মোহনা, জীবন নিয়ে জুয়া, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত, ভালো মানুষ, শেষ উত্তর, দেবদাস, মহানায়ক, হারানো মানিক, কলমীলতা, এখনই সময়, দি ফাদার, লাভ ইন আমেরিকা, নওজোয়ান, ঘর সংসার, সোনার হরিণ, স্মৃতি তুমি বেদনা, ওয়াদা, শহর থেকে দূরে, বধূ বিদায়, অঙ্গার, অচেনা অতিথি, সোহাগ, পুরস্কার, অপমান, শুভদা, সময় কথা বলে, জন্ম



থেকে জলছি, স্বামীসহ দুই শতাধিক চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। স্ত্রী ডেইজি আহমেদও একজন অভিনেত্রী। মৃত্যু. ঢাকা ১৯ জানুয়ারি ২০১০।

বুলবুল চৌধুরী (১৯১৯-১৯৫৪)॥ জন্ম. বগুড়া শহর, ১ জানুয়ারি ১৯১৯। পৈতৃক নিবাস চুনতি গ্রাম, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। নৃত্যশিল্পী ও লেখক। আসল নাম রশীদ আহমদ চৌধুরী। পিতা পুলিশ ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ আজমউল্লাহ। ১৯৩৪-এ মানিকগঞ্জ হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই.এ., এবং ১৯৪৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. পাস। কলকাতার নৃত্যশিল্পী প্রতিভার (বিবাহোত্তর নাম আফরোজা) সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ (১৯৪৩)। ১৯৩৪-এ মানিকগঞ্জের একটি বিচিত্রা অনুষ্ঠানে 'চাতক নৃত্য' পরিবেশনের ভেতর দিয়ে নৃত্যকলায় হাতেখড়ি; 'কলকাতা কৃষ্টি কেন্দ্র'র প্রতিষ্ঠাতা; রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী'র নৃত্য রূপায়ণে সাফল্য অর্জন। এরপর বুলবুল চৌধুরী নাম গ্রহণ। ১৯৩৬-এ সাধনা বসুর সহশিল্পীরূপে কয়েকটি নৃত্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। কলকাতা কৃষ্টি কেন্দ্র ভেঙে দিয়ে ১৯৩৭-এ মাহমুদ নূরুল হুদার সহযোগে 'ওরিয়েন্টাল ফাইন আর্টস এসোসিয়েশন' গঠন। পৌরাণিক ও লোককাহিনী, ঐতিহাসিক চরিত্র, সমকালীন ঘটনা ও সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে নৃত্য-নাট্য তৈরি ও পরিবেশন। ১৯৩৪-এ সিভিল ডিফেন্স অর্গানাইজেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে এবং ১৯৪৫-১৯৪৮-এ ওরিয়েন্ট এয়ার ওয়েজের চিফ পাবলিসিটি অফিসার পদে দায়িত্ব পালন। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় নিজস্ব নৃত্যদল গঠন। ভারতের নানা জায়গায় নৃত্য পরিবেশন। ১৯৫০-এ সদলবল ঢাকা আগমন; ১৯৫০-১৯৫২ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে এবং ১৯৫২-১৯৫৩ পর্যন্ত ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড ও বেলজিয়ামে নৃত্যনাট্য প্রদর্শন। সুরস্রষ্টা তিমিরবরণ তাঁর সংগীত সংযোজক; বুলবুল চৌধুরীর নাচ দেখে ইরানের শাহেন শাহ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, সাম্যবাদী নেতা রজনী পাম দত্ত প্রমুখ রাষ্ট্রনায়ক ও মনীষী বিমুগ্ধ হন। এঁদের দ্বারা বুলবুল চৌধুরী 'মহৎ নৃত্যশিল্পী' রূপে আখ্যায়িত। অমৃত বাজার, আনন্দ বাজার, পাকিস্তান টাইমস, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান (ইংল্যান্ড), ডেইলি টেলিগ্রাম (লন্ডন), দি আইরিশ টাইমস (আয়ারল্যান্ড) প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় তাঁর নৃত্যের ভূয়সী প্রশংসা করে সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ। অসংখ্য নৃত্যনাট্য রচনা করে পরিবেশন। দেশাত্মবোধ, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, হিন্দু-মুসলিম মিলন কামনা, সাম্প্রদায়িকতার প্রতি ঘৃণা, ঐতিহ্যপ্রীতি প্রভৃতি তাঁর নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু। আবাহন, চাঁদনী রাতে, বিষের বাঁশী, ফসল উৎসব, প্রবীর পতন, জীবন ও মৃত্যু, শিকারী, ভবঘুরের দল, বিদায় অভিশাপ, উত্তরা অভিমন্যু, ব্রজ বিলাস, ভারত ছাড়, জেলে সোহরাব রুস্তম, ইরানের পান্থশালায়, প্রেরণা, আনারকলি, চাঁদ সুলতানা, হাফিজের স্বপ্ন, মন্বন্তর প্রভৃতি নৃত্যনাট্য রচনা ও পরিবেশন। এ-সকল নৃত্যনাট্য দেশ এবং বিদেশে প্রশংসিত। গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবেও খ্যাত। প্রকাশিত উপন্যাস: প্রাচী (১৯৪২)। তাঁর মাহমুদ নুরুল হুদা কর্তৃক ১৯৫৫-তে ঢাকায় বুলবুল ললিতকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যু. কলকাতা, ক্যান্সার রোগে, ১৭ মে ১৯৫৪।



বেণীমাধব বড়ুয়া (১৮৮৮-১৯৪৮)॥ জন্ম. মহামুনি গ্রাম, রাউজান-চট্টগ্রাম, ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৮৮। শিক্ষাবিদ ও লেখক। পিতা কবিরাজ রাজচন্দ্র তালুকদার। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯০৬-এ এন্ট্রান্স, চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯০৮-এ এফ.এ. ও বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯১১-তে পালিতে অনার্সসহ বি.এ. পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যাল থেকে ১৯১৩-তে স্বর্ণপদকসহ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. (পালি) ডিগ্রি লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাশের অস্থায়ী প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯১৪-তে ভারত সরকারের স্টেট স্কলারশিপ লাভ করে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের উপর গবেষণার জন্য বিলেত গমন। 'Indian Philosophy Its Origin and Growth from Vedas to the Buddha' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯১৭-তে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. ডিগ্রি লাভ। লন্ডন থেকে দেশে ফিরে আসার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯২০-এ এ

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদে বৃত। ১৯২৫-এ অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৪৮ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি, শিলালিপি, ভাস্কর্য ও কলা এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট গবেষক ও পণ্ডিত। পালি ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ: A Prolegomenon to the History of Buddhist Phiosophy (১৯১৮), The Ajivakas (১৯২০), A History of Pre-Buddhistic Indian Philosphy (১৯২১), Barhut Inscriptions (১৯২১), Old Brahmi Inscription in the Udayagiri and Khandagiri Caves (১৯২৬), Asoka Edicts in New Light (১৯২৬), Gaya and Budda Gaya (১ম খণ্ড ১৯৩১, ২য় খণ্ড ১৯৩৪), Barhut (১ম–৩য় ১৯৩৪-১৯৩৭), Inscription of Asoka (১ম ভাগ-১৯৪৩, ২য় ভাগ ১৯৪৭), Asoka nad His Inscriptions (১৯৪৬), Studies in Buddhism (১৯৪৭), Philosophy of Progress (১৯৪৮), Ceylon Lectures (১৯৮৬), The Religion of Asoka, লোকনীতি (১৯১২), মণিরত্নমালা (১৯১৩), গৃহীবিনয় (১৯১৪), মহাসতিপট্‌ঠানসুত্তন্ত (১৯১৪), বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি (১৯২৩), বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ (১৯৩৬), মধ্যমণিকায় (১৯৪০)। এ-সকল গ্রন্থ মনন কর্মে দীপ্ত ও জ্ঞানের আকার স্বরূপ। ১৯১৪-তে বৌদ্ধপণ্ডিতদের আমন্ত্রণে শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ। সখোনে শ্রীলঙ্কার ইতিহাস ও প্রাচীন সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে আটটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। শ্রীলঙ্কার পণ্ডিতগণ কর্তৃক 'ত্রিপিটকাচার্য' উপাধিতে ভূষিত। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক 'বিমলাচরণ লাহা স্বর্ণপদক' প্রদান। মৃত্যু. কলকাতা, ২৩ মার্চ ১৯৪৮।

বেদুইন শমসের/শমসের আলী (১৯১৯-১৯৬৪)॥



জন্ম. গোপালপুর গ্রাম, ফরিদপুর, ১৯১৯। ঔপন্যাসিক। ফরিদপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই.এসসি. এবং বি.এসসি. পাস। প্রথম জীবনে পুলিশ বিভাগে চাকরি। পরে ঢাকা বারে আইন ব্যবসায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: রিকসাওয়ালা (১৯৫০), বুড়িগঙ্গার বুকে (দ্বি-স, ১৯৫৬), বেঈমান (১৯৪৪), দিশাহারা (১৯৬৩), তার ও ঝংকার (১৯৫৬)। মৃত্যু. ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

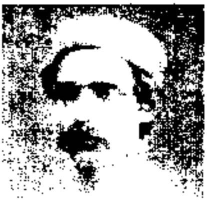
বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩)॥



জন্ম. মাতুলালয়, ধানুয়া গ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, ১৯০৩। পৈতৃক নিবাস ইলমদী গ্রাম, ঢাকা। কবি। পনেরো বছর বয়সে স্কুল ত্যাগ করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদান। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) সক্রিয় অংশগ্রহণ। সন্ত্রাবাদী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯২১-এ গ্রেফতার এবং দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ অবস্থায় দিনযাপন। পরবর্তীকালে মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনে যোগদান। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯২৭-এ স্বীয় সম্পাদনায় 'নওরোজ' পত্রিকা প্রকাশ। দৈনিক আজাদ-এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। দৈনিক নবযুগ পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কর্ম-সম্পাদন। বন্দীর বাঁশী ও বৈশাখী (১৯৬২) তাঁর কবিতাগ্রন্থ। আশ্চর্য আর আশ্চর্য (১৯৫৭), কমলমণি, ইসলাম ও কম্যুনিজম, কোরানের গল্প তাঁর অন্য গ্রন্থ। ১৯৬২-ও ২৮ এপ্রিল মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় ঢাকা-৬ আসন থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে (২২ জুন ১৯৬৭) সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী কবি। কাব্যরীতির ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের অনুসারী। ১৯৬৪-তে কবিতায় বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. ঢাকা ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩।

ব্যোমকেশ মুস্তাফী (১৮৬৮-১৯১৬)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৮৬৮। পিতা অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবী। বাগবাজার ব্রার্ডান ইন্সটিটিউশন ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ। কলকাতা হাইকোর্টে চাকরি করে জীবিকা

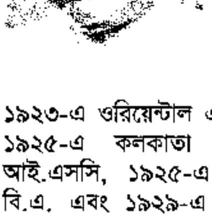
নির্বাহ। ১৮৮৪-তে 'তপস্বিনী' ও ১৮৮৫-তে 'ভারত' নামক পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত। বাংলা বিশ্বকোষ সম্পাদনায় নগেন্দ্রনাথ বসুকে সহায়তা প্রদান। বাংলা আঞ্চলিক শব্দ সংকলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। বিশ্বকোষে নাট্যশালা, প্রাচীন ও লৌকিক সাহিত্য এবং বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে নিবন্ধাদি রচনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক (১৮৯৯-১৯১৫)। তাঁর সম্পাদনায় বঙ্গ নিবাসী, ভারত সংবাদ, সাপ্তাহিক বসুমতী, মালা প্রভৃতি সাময়িকপত্রিকা প্রকাশিত। গ্রন্থ: ব্যাটরানিবাসী কবি ঠাকুর দাস দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী (১৮৯৮), নববর্ষে অলঙ্কার (১৯২৩) রোগশয্যার প্রলাপ (শ্রীরোগাতুর ছদ্মনামে লিখিত), ললাট লিখন (উপন্যাস সংগ্রহ) ইত্যাদি। মৃত্যু. ১ এপ্রিল ১৯১৬।



ব্রজেন দাস (১৯২৭-১৯৯৮)॥ জন্ম. কুচিয়ামোড়া, মুন্সিগঞ্জ, ৯ ডিসেম্বর ১৯২৭। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম চ্যানেল-বিজয়ী সাঁতারু। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের স্কুলে। মেট্রিক পাস ঢাকার কে.এল. জুবিলি স্কুল থেকে ১৯৪৬-এ। কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই.এ. এবং বি.এ. পাস করেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি সাঁতার শেখেন ছোটোবেলা থেকেই। বুড়িগঙ্গা নদীতেই তিনি সাঁতার কাটতেন। ১৯৫০-এর দশকের সূচনায় বি.এ. পাস করার পর কলকাতা থেকে ঢাকায় ফেরা। ১৯৫৩-এ পূর্ব পাকিস্তান ক্রীড়া ফেডারেশন প্রথম বারের মতো দেশব্যাপী সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতায় দেশের মধ্যে সেরা সাঁতারু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই যোগ্যতার সুবাদে ১৯৫৮-এ ইংলিশ চ্যানেশ সাঁতার প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের হয়ে আমন্ত্রণ লাভ। এই প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি হিসেবে শীতলক্ষ্যা ও উন্মত্ত মেঘনা নদীতে সাঁতার কাটতে থাকেন। এক পর্যায়ে সাঁতার কেটে তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত যান। ইংলিশ চ্যানেল প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ভূমধ্য সাগরের কাপ্রি থেকে নেপল্‌স পর্যন্ত সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ। এর ফলে সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য যে আত্মবিশ্বাসের দরকার হয়, তা অর্জন করতে সক্ষম হন। ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার প্রতিযোগিতায় ২৩টি দেশের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া থেকে তিনি একমাত্র প্রতিযোগী। ১৯৫৮-এর ১৮ আগস্ট মধ্যরাতে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়, শেষ হয় ১৯ আগস্ট বিকেলে। অনেক প্রতিযোগী মাঝপথেই ক্লান্ত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে সরে গেলেও ব্রজেন দাস তাঁর সংকল্পে অটুট থাকেন এবং ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম লেখাতে সক্ষম হন। এরপর থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত তিন বছরে তিনি মোট ছয় বার ইংলিশ চ্যানেল পর হন। ১৯৬১-র সর্বশেষ অভিযানে তিনি সময় নিয়েছিলেন মাত্র দশ ঘণ্টা। এর নিকটবর্তী রেকর্ড, যেটা তিনি ভেঙেছিলেন, তা হলো ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট। ব্রজেন দাস তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৬-এ জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার এবং ১৯৯৯-এ মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন। মৃত্যু. ঢাকা, ১ জুন ১৯৯৮।



ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯০৭-১৯৭৬)॥ জন্ম. গঙ্গানগর গ্রাম, গয়ঘর, শরীয়তপুর, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭। যাত্রা পালাকার। পিতা হরিকিশোর দে, মাতা ক্ষীরোদসুন্দরী দেবী। বাল্যশিক্ষা শুরু গ্রামের পাঠশালায়। ১৯১৭-এ কলকাতার ওরিয়েন্টাল একাডেমিতে ভর্তি। ১৯২৩-এ ওরিয়েন্টাল একাডেমি থেকে মেট্রিক, ১৯২৫-এ কলকাতা সিটি কলেজ থেকে আই.এসসি, ১৯২৫-এ একই কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯২৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. পাস। ১৯৩০-এ অরিয়েন্টাল ট্রেনিং একাডেমিতে শিক্ষকতায় যোগদান। ১৯৩১-এ হাওড়ার বাইনান বামনদাস উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হন। ১৯৩৩-এ নীহারকণার সঙ্গে বিয়ে। ১৯৩৭-এ বি.টি. পাস এবং শরীয়তপুরের কার্তিকপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে



যোগদান। ১৯৪৫-এ পশ্চিমবঙ্গে ইচ্ছাপুর নর্থল্যান্ড উচ্চবিদ্যালয়ের অতিরিক্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান, ১৯৫২-তে প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত। ১৯১৯-তে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে প্রথম পালা 'চন্দ্রশেখর' রচনা। ১৯২৫-এ 'স্বর্ণলংকা' পালা রচিত এবং বাণী নাট্যসমাজে অভিনীত। ১৯৩১-এ পেশাদার দলের জন্য 'বজ্রনাভ' পালা রচনা। ১৯৩৬-এ ময়মনসিংহ গীতিকার পালা অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত সংলাপে নারীমুক্তির বক্তব্য নিয়ে 'চাঁদের মেয়ে' রচনা। ১৯৪১-এ সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির কুফল নিয়ে 'রক্ততিলক' পালা রচনা। ১৯৪৬-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভগ্নিপতি কামিনীকুমার দে-র মৃত্যুর পরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক 'শেষ নবাব' পালা। বিখ্যাত পালা: দেবতার গ্রাস (১৯৪২, নট্ট কোম্পানি), সমাজের বলি (১৯৪৪, নট্ট কোম্পানি), মায়ের ডাক (১৯৪৫, প্রভাস অপেরা), শেষ নমাজ (১৯৪৬, আর্য অপেরা), ধরার দেবতা (১৯৪৮, নিউ গণেশ অপেরা), কোহিনূর (১৯৫০, নট্ট কোম্পানি), ধর্মের বলি (১৯৫১, আর্য অপেরা), গাঁয়ের মেয়ে (১৯৫১, সত্যনারায়ণ অপেরা), ভাগ্যের বলি (১৯৫৯, নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা), সোহরাব রুস্তম (১৯৫৯, অম্বিকা নাট্য কোং), সোনাই দিঘি (১৯৫৯, সত্যম্বর অপেরা), বর্গী এলো দেশে (১৯৬০, নবরঞ্জন অপেরা), কবি চন্দ্রাবতী (১৯৫৯, বীণাপাণি অপেরা), সুলতানা রিজিয়া (১৯৬৭, নট্ট কোম্পানি), করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর (১৯৬৮, নট্ট কোম্পানি), পতিঘাতিনী সতী (১৯৬৯, বৈকুণ্ঠ যাত্রাসমাজ), মৃত্যুঞ্জয় সূর্য সেন (১৯৬৯, ভারতী অপেরা), মুজিবের ডাক (১৯৭২), আঁধারের মুসাফির (১৯৭২, নট্ট কোম্পানি), নটী বিনোদিনী (১৯৭২, নট্ট কোম্পানি), সতী করুণাময়ী (১৯৭৫, নব অম্বিকা অপেরা), বিদ্রোহী নজরুল (১৯৭৪, নব অম্বিকা অপেরা), ভারতপথিক রামমোহন (১৯৭৪, নট্ট কোম্পানি), সীতার বনবাস (১৯৭৫, মোহন অপেরা) প্রভৃতি। পুরস্কার ও উপাধি: 'পালাসম্রাট' উপাধি লাভ (১৯৬৭), 'লোকনাট্যগুরু' উপাধি লাভ ('অভিনয়' পত্রিকা, ১৯৭৬)। মৃত্যু. কলকাতা, ১২ মার্চ ১৯৭৬।

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৭৪-১৯৫৭)॥ জন্ম. বলিহার, রাজশাহী, ১৮৭৪। সাহিত্যিক ও সংগীতানুরাগী। ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদারপত্নী কর্তৃক তাঁকে দত্তক গ্রহণ। সংগীত, অভিনয়, খেলাধুলা, যাদুবিদ্যা, কবিরাজি, গার্ডেনিং প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। সংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধ ও শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক রামচন্দ্র চক্রবর্তী ও মুরারীমোহন গুপ্তের নিকট মৃদঙ্গ; আবদুল্লাহ খাঁ, ইমদাদ খাঁ, আমীর খাঁ, শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হনুমান দাসজীর কাছে এসরাজ এবং প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ দক্ষিণাচরণ সেনের নিকট উচ্চাঙ্গ সংগীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ। পরিণত বয়সে সংগীত শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে মনোনিবেশ। দুষ্প্রাপ্য সংগীত গ্রন্থ ও বহু ধ্রুপদ গানের সংগ্রাহক। অহোবল রচিত 'সংগীত পারিজাত' গ্রন্থের অনুবাদক। সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন। কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্যে শার্ঙ্গদেব রচিত সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। দানবীর হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর মোট দানের পরিমাণ পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সংগঠনে পাঁচ লক্ষ টাকা দান। অরবিন্দ ঘোষ তাঁরই চেষ্টায় উক্ত শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ভারত সংগীত সমাজের অন্যতম সদস্য। নাট্যশিল্পী ও উঁচুদরের নাট্যরসিক। গৌরীপুরে এক বিরাট প্রেক্ষাগৃহের নির্মাতা এবং দেড়শ বিঘা জমির উপরে 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' স্থাপন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'রাজা' উপাধি দানের প্রস্তাব করলে তৎকর্তৃক সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। মৃত্যু. ২৯ নভেম্বর ১৯৫৭।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২)॥



জন্ম. বালি, হুগলী, ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১। গবেষক ও পণ্ডিত। পিতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত। এক বছর বয়সে পিতৃহীন, বারো বছর বয়সে মাতৃহীন। চুঁচড়া ইউনাইটেড ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে এন্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। অর্থাভাবে স্কুলের পাঠ ত্যাগ করে কলকাতায় আগমন। সেখানকার বউবাজারের Canns Fonetic School-এ টাইপরাইটিং শেখেন। ১৯০৯-এ কলকাতার এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অল্প বেতনে মুদ্রাক্ষরিকের চাকরি গ্রহণ। এরপর

শর্টহ্যান্ড শিখে জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানিতে চাকরিতে যোগদান। ১৯২৯-এর জানুয়ারি মাসে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত। এরপর গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ। ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির অনারারি সদস্য নিযুক্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৯৩৩-১৯৩৪, ১৯৪৫-১৯৪৮), সহকারী সম্পাদক (১৯৩৪-১৯৩৫), সম্পাদক (১৯৪০-১৯৪৪, ১৯৪৯-১৯৫০)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক (১৯৩৮-১৯৩৯)। স্যার যদুনাথ সরকারের কাছে ইতিহাস রচনার প্রণালী শেখেন। পুরাতন বাংলা সংবাদপত্র থেকে সেকালের সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের বিবরণ সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে রচনা করেন সংবাদপত্রে সে কালের কথা (১ম খণ্ড ১৯৩২, ২য় খণ্ড ১৯৩৪, ৩য় খণ্ড ১৯৩৫), বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৯৩৩), বাংলা সাময়িকপত্র (১৯৩৯), বঙ্গীয় নাট্যশালা (১৯৪৩), বাংলা সাময়িক সাহিত্য (১৯৪৪), প্রভৃতি গ্রন্থ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' (১০ খণ্ড, ১৯৩৯-১৯৫১) নামক গ্রন্থ। 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'' (১১ খণ্ড) সম্পাদনা তাঁর আর এক বিশিষ্ট কীর্তি। এ ছাড়া এককভাবে মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলি এবং সজনীকান্ত দাসের সহযোগিতায় দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী, বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, রামমোহন গ্রন্থাবলী, মধুসূদন গ্রন্থাবলী, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী, রামেন্দ্র গ্রন্থাবলী, পাঁচকড়ি রচনাবলী, বলেন্দ্র রচনাবলী ও ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী সম্পাদনা। মোঘল যুগের ইতিহাস রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান। এতদ্বিষয়ক গ্রন্থ: নূরজাহান (১৯১৬), মোঘল যুগের স্ত্রী শিক্ষা (১৯১৯), মোঘল মহিষী (১৯২০), জাহানআরা (১৯২০), দিল্লিশ্বরী (১৯২৮)। ১৯২৯-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদক এবং ১৯৪৫-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান। মৃত্যু. ৩ অক্টোবর ১৯৫২।

ভবানন্দ মজুমদার॥ জীবন কাল ১৬শ–১৭শ শতক। নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সপ্তম পূর্বপুরুষ। পিতা রামচন্দ্র বাগোয়ানের নিঃসন্তান জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের পালিত পুত্র হিসেবে তাঁর সম্পত্তি ও জমিদারির উত্তরাধিকারী হন। সে-সূত্রে ভবানন্দ মজুমদারের জমিদারি লাভ। পূর্ব নাম দুর্গাদাস। সংস্কৃত, আরবি ফারসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন। অসাধারণ বুদ্ধিমান ও কূটকৌশলী। কালক্রমে হুগলীর ফৌজদারের সহায়তায় ঢাকার নবাবকে সন্তুষ্ট করে 'কানুনগো' পদ ও 'মজুমদার' উপাধি লাভ। রাজা মানসিংহকে যশোরের প্রতাপাদিত্য দমনে সহায়তা করে পুরস্কারস্বরূপ মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ১৬০৬-এ বাগোয়ান প্রভৃতি চৌদ্দটি পরগনার শাসনভার প্রাপ্তি। বারাণসীতে অন্নপূর্ণা মূর্তি ও মন্দির স্থাপন।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)॥ জন্ম. নারায়ণপুর গ্রাম, উখড়া পরগনা, ১৭৮৭। রক্ষণশীল হিন্দু নেতা ও সাহিত্যিক। ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা থাকায় বিশপ রেজিন্যান্ড প্রমুখ ইউরোপীয়দের অধীনে চাকরি গ্রহণ। ১৮২৮-এ জুরি নিযুক্ত। সাংবাদিক হিসেবেও বিশেষ খ্যাতিলাভ। 'সম্বাদ কৌমুদী' (৪ ডিসেম্বর ১৮২১) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। পত্রিকাটির ১৩ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর ধর্মমত নিয়ে রামমোহন রায় ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় এ পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করে ১৮২২-এর ৫ মার্চ 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামক পত্রিকা প্রকাশ। রামমোহনের সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনকে খর্ব করাই ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপত্র হিসেবে ১৮২৯ থেকে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সপ্তাহে দুবার প্রকাশ। ১৮৩০-এ রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ধর্মসভা স্থাপিত হলে তার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত। সতীদাহের পক্ষে থাকলেও দেশীয় শিল্প বাণিজ্যে বিদেশি অর্থ বিনিয়োগের বিরোধিতা। তৎকালীন ইয়ং বেঙ্গলদের উচ্ছৃঙ্খল আচার-ব্যবহারকে তীব্রভাবে নিন্দা জ্ঞাপন। প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য বাংলায় অনেক গ্রন্থ রচনা। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ব্যঙ্গ রচনার স্রষ্টা হিসেবে খ্যাত। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩)। এতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কলকাতার রীতিবর্ণন। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' (১৮২৩) পঞ্চতন্ত্রের বঙ্গানুবাদ। 'প্রমথনাথ শর্ম্মণ' ছদ্মনামে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫)। এটি একখানি উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ-চিত্র। এর নায়ক কলকাতার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি, কিন্তু তিনি অশিক্ষিত। সমাজের আচার-ব্যবহার ও নৈতিক চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক এ-

গ্রন্থ রচনা। নববিবি বিলাস (১৮৩১) নামক গ্রন্থখানি ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে লিখিত। ভবানীচরণের অন্যান্য গ্রন্থ: দূতীবিলাস (১৮২৫), শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার (১৮৩১), আশ্চার্য উপাখ্যান (১৮৩৪) ইত্যাদি। বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপময় সরস সামাজিক নকশা রচনায় তিনিই প্রথম সার্থক শিল্পী। মৃত্যু. কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮।

ভারতচন্দ্র, রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০)॥ জন্ম. পেঁড়ো গ্রাম, ভুরশুট পরগণা, হাওড়া, ১৭১২। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ছিলেন ভুরশুট পরগণার জমিদার। আঠারো শতকের বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম কবি। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র ভুরশুট আক্রমণ করে পেঁড়ো গ্রামসহ ভবানীপুর গড় দখল করে নেন। এর ফলে নরেন্দ্রনারায়ণ হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েন। তখন ভারতচন্দ্র মঙ্গলঘাট পরগণার নওয়াপাড়ায় মাতুলালয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। অত এলাকার তাজপুর গ্রামে এক সংস্কৃত টোলে ব্যকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপত্তি অর্জন। চৌদ্দ বছর বয়সে তাজপুরের নিকটবর্তী সারদা গ্রামের কেশরকুণী আচার্যের বালিকা কন্যার পাণিগ্রহণ। পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন। অভিভাবকদের অজ্ঞাতে দার গ্রহণ করায় অগ্রজদের দ্বারা তিরস্কৃত হন। এতে অভিমানাহত হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুনশীর বাড়িতে আশ্রয় লাভ। সেখানে ফারসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন। কয়েক বছর পর পেঁড়ো গ্রামে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। পৈতৃক জমিদারি উদ্ধারকল্পে অগ্রজদের পরামর্শে বর্ধমানের রাজদরবারে যান। কর্মচারীদের চক্রান্তে পড়ে কারারুদ্ধ হন। কারাগার থেকে পালিয়ে কটকে যান। সেখানকার মহারাষ্ট্রীয় সুবাদার শিব ভট্টের আনুকূল্যে শ্রীক্ষেত্রে বাস করার সুযোগ লাভ। সেখানে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন। শ্যালিকা পতির অনুরোধে সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন। ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে বসবাসের জন্য যান। ইন্দ্রনারায়ণ ভারতচন্দ্রের কবিত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কাব্যালোচনার উপযুক্ত স্থান নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় পাঠান। কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক সভাকবি নিযুক্ত। মূলজোড়ে বসতি স্থাপন। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা। 'অন্নদামঙ্গল' তাঁর কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই কাব্য সৃষ্টি করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ। 'অন্নদামঙ্গল' কৃষ্ণচন্দ্রের আরাধ্য দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কাব্য হলেও ভারতচন্দ্র তাঁর পূর্ববর্তী অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের কবির মতো কাল্পনিক নায়ক নায়িকার চরিত্র অঙ্কন না করে ভবানন্দের মতো একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে নায়কের স্থানে বসিয়েছেন। ভারতচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি এবং বাংলা কাব্যে ছন্দ ও ধ্বনি ব্যঞ্জনার এক নতুন রীতির প্রবর্তক। ভাষার লালিত্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে ও অলঙ্কার ব্যবহারের নৈপুণ্যে অন্নদামঙ্গল একখানি উচ্চমানের কাব্য। পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) সমসাময়িককালের বাঙালি সমাজের অবক্ষয় এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার কৃত্রিম চাকচিক্য ও বিকৃত রুচি ভারতচন্দ্রের কাব্যে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত। তাঁর অন্যান্য রচনা: বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী, সত্যপীরের কথা, নাগাষ্টক ইত্যাদি। মৃত্যু ১৭৬০।

ভিনসেন্ট লেসনী (১৮৮১-১৯৫৩)॥ জন্ম. চেকোশ্লোভাকিয়ায়, ১৮৮১। প্রাচ্যবিদ, অধ্যাপক। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, মারাঠা ও বাংলা ভাষার ব্যুৎপন্ন। প্রাগ শহরে চার্লস ইউনিভার্সিটিতে ভারতবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের ডিন। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে দুবার বিশ্বভারতীতে আগমন, ১৯২২-১৯২৩ ও ১৯২৭-১৯২৮। চেক ভাষায় কবির বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ। দীর্ঘকাল প্রাগের প্রাচ্যবিদ্যা ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং সেখানে ভারতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠা। রচনাবলি: The Stage of Development of Prakrit Dialects in Bhasa's Plays and the Dating of his Works (1917), Rabindranath Tagore: His Personality and Works (১৯১৭), (চেক ভাষায় ১৯৩৭, ইংরেজিতে ১৯৩৯) ইত্যাদি। মৃত্যু. ১৯৫৩।

ভিয়েরা নেভিকভা (১৯১৮-১৯৭২)॥ জন্ম. মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮। পুরো নাম ভিয়েরা আলেকজান্দ্রাভনা নেভিকভা। রুশ অধ্যাপিকা, বাংলা ভাষা সাহিত্য বিশেষজ্ঞ। লেনিনগ্রাদ-এ শিক্ষাজীবন সমাপ্ত। ১৯৩৫-এ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যা অনুষদে পড়াশুনা (১৯৩৫-১৯৪০)। অধ্যাপক দাউদ আলী দত্তের

(প্রমথনাথ দত্ত) কাছে বাংলা শিক্ষা। ১৯৪০-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ আলেক্সিয়েই পেত্রোভিক বরান্নিকফ-এর অধীনে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপরে গবেষণা করে ১৯৫৩-তে পি.এইচডি. উপাধি লাভ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অবরুদ্ধ লেলিনগ্রাদ থেকে মস্কোয় ফিরে বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ভারতবিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত। ১৯৪৬-এ যুদ্ধবিধ্বস্ত মাতৃভূমি শহরে ফিরে গিয়ে পুনরায় গবেষণা কজে আত্মনিয়োগ। পরবর্তীকালে লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রধান (১৯৫২-১৯৭২) এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিযুক্ত। ১৯৫৬-তে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ লাভের জন্য কলকাতা এসেছিলেন। কর্মরত অবস্থাতেই এক দুর্ঘটনায় তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। রচনাবলি: উনবিংশ শতকের বাংলা গদ্য সংকলন (১৯৬০-এ রুশ ভাষায়), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: জীবন ও সাহিত্যকর্ম (১৯৬৯: রুশ ভাষায় পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ), রবীন্দ্র রচনাবলি (রুশ ভাষায় ৮ খণ্ডে ও ১২ খণ্ডে, সম্পাদনা)। এতদ্ব্যতীত অগ্রন্থিত প্রায় অর্ধশতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা। ১৯৭১-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' ভূষিত। সোভিয়েত সরকারের নিকট থেকেও পদক দ্বারা সম্মানিত। মৃত্যু. মস্কো, লেলিনগ্রাদগামী ট্রেন দুর্ঘটনায়, ১০ এপ্রিল ১৯৭২।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৯৮)॥ জন্ম. হরীতকীবাগান লেন, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। শিক্ষাবিদ ও লেখক। খ্যাতনামা পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ তাঁর পিতা। আদি নিবাস নতিবপুর, হুগলী। নয়বছর বয়সে ১৮৩৫-এ কলকাতা



গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্তি। সেখানে সাহিত্য শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। ইন্ডিয়ান একাডেমিতে, নবীনমাধব দেবের স্কুলে ও ভোলানাথের স্কুলে দুই বছর অধ্যয়ন। তের বছর বয়সে ১৮৩৯-এ হিন্দু কলেজে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহাধ্যায়ী। ১৮৪১-এ জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মাসিক আট টাকা ও ১৮৪৩-এ সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করে মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ। ১৮৪৫-এ হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করে পেশাগত জীবনে প্রবেশ। হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে (১৮৪৬) প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত। ১৮৪৭-এ 'চন্দননগর সেমিনারি' নামে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করে সেখানে শিক্ষকতা। ১৮৪৯-এর ১ জানুয়ারি কলকাতা মাদ্রাসার দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্তি লাভ। একই বছর ১৮ অক্টোবর হাওড়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান। ১৮৫৬-তে হুগলী নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৮৬২-তে সহকারী স্কুল ইন্সপেক্টর, ১৮৬৩-তে এডিশন্যাল স্কুল ইন্সপেক্টর ও ১৮৭৭-এ ইন্সপেক্টর অফ স্কুল পদে উন্নীত। মাসিক পনের শত টাকা বেতনে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত। সরকারি চাকরিতে থাকাকালীন ১৮৬৪-তে শিক্ষাবিষয়ক মাসিকপত্র 'শিক্ষা দর্পণ' (১৮৬৪) পরিচালনা। ১৮৬৮-তে 'এডুকেশন গেজেট' (১৮৫৬) নামক সরকারি সাময়িকপত্রের সম্পাদনার ভার গ্রহণ। দীর্ঘকাল অতি সুখ্যাতির সঙ্গে এ পত্রিকা পরিচালনা। ১৮৮২-তে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাসদ পদে নির্বাচিত। একই বছর সরকারের শিক্ষা কমিশনের সদস্য পদে বরিত। ১৮৮৩-তে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। বাকি জীবন চুচুঁড়ায় কাটান। কিছুকাল কাশীতে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন। বেদান্তচর্চার জন্য চুচুঁড়ায় পিতার নামে 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী' স্থাপন। মায়ের নামে 'ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়' স্থাপন। সংস্কৃত ভাষার উন্নতির জন্যে 'বিশ্বনাথ স্ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা। স্কুল পরিদর্শক থাকাকালে বিহারে বহু হিন্দি স্কুল স্থাপন। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী বিহারের আদালত সমূহে ফারসির বদলে হিন্দি ভাষা প্রবর্তিত। বাংলাগদ্যের বিশিষ্ট শিল্পী। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৮) ও 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৯৫), তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ। এ-সকল গ্রন্থে তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় মেলে। 'শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৬?), 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' (১ম ভাগ-১৮৫৮, ২য় ভাগ-১৮৫৯), 'পুরাবৃত্ত সার' (১ম খণ্ড-১৮৫৮), 'ইংলন্ডের ইতিহাস' (১৮৬২), 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' (১৮৬২) ও 'পুষ্পাঞ্জলি' (প্রথম ভাগ-১৮৭৬) তাঁর স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। সরকারের কাছ থেকে সি.আই.ই. উপাধি লাভ (১৮৭৭)। উনিশ

শতকের বিশিষ্ট মনীষী। সাহিত্য, ধর্ম, শাস্ত্র, সমাজ, শিক্ষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান। মৃত্যু. চুঁচুড়া, ১৫ মে ১৮৯৪।

ভেরিয়ার এলউইন (১৯০২-১৯৬৪)॥ জন্ম. ডোভার, ইংল্যান্ড, ১৯০২। পণ্ডিত ও লেখক। ১৯২৪-এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৯২৬-এ ধর্মতত্ত্বেও প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. এবং ১৯৪৪-এ ডি.এসসি. ডিগ্রি লাভ। ১৯২৭-এ খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘের সদস্য হিসেবে ভারত আগমন। ১৯৩২-১৯৪৬ এবং ১৯৪৯-১৯৫৩ পর্যন্ত অযাজকীয় জীবন গ্রহণের মাধ্যমে ভারতের আদিম উপজাতীয়দের মাঝে বসবাস। ১৯৫৪-তে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ। ১৯৪৬-১৯৪৯ পর্যন্ত ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত। ১৯৫৪-তে নেফার উপজাতীয়দের সম্পর্কে পরামর্শ দান। ১৯৪৩-১৯৪৯ পর্যন্ত 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' সাময়িকীর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন উপজাতি এবং লোকসাহিত্য সম্পর্কে বহু গবেষণামূলক গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: দি আগারিয়া, দি বইগা, বান্দো হাইল্যান্ডার, মারিয়া মার্ডার অ্যান্ড সুইসাইড, দি মুরিয়া অ্যান্ড দেয়ার ঘোটলু, দি ডন অব ইন্ডিয়া ফ্রিডম (১৯৩২), মাহাত্মা গান্ধীর ফিলফী অব ট্রুথ, ফোক টেলস অব মহাকোশল, ফোক সংগস অব ছত্তিশগড়, মিথস অব মিডল ইন্ডিয়া (১৯৪৯), দি ট্রাইব্যাল মিথস অব ওড়িষ্যা। মৃত্যু. ১৯৬৪।

মকসেদ আলী সাঁই (?-১৯৮১)॥ জন্ম. হরিশঙ্করপুর, কুষ্টিয়া। লালনগীতি-শিল্পী ও সংগ্রাহক। শৈশবকাল থেকেই বাউল গানের প্রতি আকৃষ্ট ও লালন শাহের গানচর্চা শুরু। অচিরেই লালনগীতিতে পারদর্শিতা অর্জন। লালন শাহের গান প্রচলন, প্রসার ও জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। লালন সম্প্রদায়ে তাঁর জন্ম এবং তিনিই ঐ সম্প্রদায়ের প্রথম শিক্ষিত বাউল ও বাউল গানের শিল্পী। আধুনিক গানের ধাঁচে যাঁরা বাউল গানকে কণ্ঠ দিতে চেয়েছিলেন তৎকর্তৃক তার বিরোধিতা। লালন শাহের মাজার থেকে গান সংগ্রহ করে সাধারণ্যে তুলে ধরেন। ১৯৭১-এ স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। স্বাধীনতার পর রেডিও বাংলাদেশের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে 'নিজস্ব শিল্পী' হিসেবে যোগদান। কয়েক বছর পর চাকরি ছেড়ে আবার কুষ্টিয়ায় প্রত্যাবর্তন। সংগীতে নিবেদিতচিত্ত এক অসাধরণ শিল্পী। মৃত্যু. ১৯৮১।

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী (১৯২৩-২০০৬)॥ জন্ম. কাদিরপুর গ্রাম, কুলাউড়া, মৌলবীবাজার। পিতা ক্ষীরোদবিহারী সোম ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। মা মাধুরী সোম ছিলেন সংগীতশিল্পী। পিতার কর্মস্থল গৌহাটির পানবাজার গার্লস হাই স্কুল থেকে মেট্রিক,



গৌহাটি কটন কলেজ থেকে আই.এ. ও ডিস্টিংশনসহ বি.এ. (১৯৪১) পাস করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আসামের নওগাঁয় বেঙ্গলি গার্লস মিডল ইংলিশ স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান। ১৯৪৫-এ সিলেটের বিশ্বনাথ পরগণার আকিলপুরের জমিদারপৌত্র শৈলেন্দ্রকুমার চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে। ১৯৪৭-এ সিলেট গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষকতায় যোগদান। ১৯৫২-এ ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে বি.টি. পাস। ১৯৫৪-এ চট্টগ্রামের ডা. খাস্তগীর গার্লস স্কুলে যোগদান এবং ১৯৬০-এ প্রধানশিক্ষকের পদে উন্নীত। ১৯৬২-এ খুলনা বিভাগের সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত। ১৯৬১-এ ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে তিনি প্রথম শ্রেণিতে এম.এড. পাস। ১৯৬২-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ.। ১৯৬৫-এ ময়মনসিংহ মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপক পদে ও ১৯৬৭-এ ঢাকার এডুকেশন একসটেনশন সেন্টারে বাংলা ভাষার বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান। ১৯৭২-এ 'রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক' বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি. উপাধি অর্জন। ১৯৭৮-এ সরকারি বদরুন্নেসা কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান এবং ১৯৮১-এ অবসর গ্রহণ। গ্রন্থ: সুশিক্ষক (১৯৭৮), বাংলা শিক্ষা পদ্ধতি (১৯৮২), শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কথা (১৯৮৬), শিক্ষায় মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (১৯৮৮), শিশুর জীবন বিকাশ (১৯৯২), রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক (১৯৮৩),

রবীন্দ্রভাবনা (১৯৯২)। গল্পগ্রন্থ: জাগ্রত যে ভালো (১৯৮৪), বিষকন্যা (১৯৮৪), সোনার খাঁচা (১৯৮৯)। পুরস্কার: লেখিকা সংঘ পদক (১৯৮২), অনন্যা বিশেষ সম্মাননা পদক (১৯৯৯) প্রভৃতি। মৃত্যু. ১১ জুন, ২০০৬, ঢাকা।

মণিকৃষ্ণ সেন (১৯০৩-১৯৯১)॥ জন্ম. রংপুর, ১৯০৩। রাজনীতিবিদ। ১৯২৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও ল' পাস। ছাত্রজীবনে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান। ১৯২১-এ কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন ও গ্রেফতার। জেল থেকে মুক্তিলাভের কিছুকাল পর পুঠিয়া ষড়যন্ত্র মামলায় পুনরায় গ্রেফতার। চার বছর জেলভোগের পর হাইকোর্টের রায়ে মুক্তিলাভ। রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানের জন্য আবার গ্রেফতার। রাজপুতনার দেউলি ক্যাম্পে বিনাবিচারে আট বছর আটক। মুক্তিলাভের পর ১৯৩৮-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। রংপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পার্টির তৎপরতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে আত্মগোপন। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময়ে রংপুর জেলায় তৎকর্তৃক ১৩৫টি লঙ্গরখানা পরিচালনা। উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। একদা জোতদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর আঘাতে গুরুতররূপে আহত। ১৯৫৪-র মার্চের পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের রংপুরে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে গ্রেফতার। প্রায় দশ বছর কারাভোগের পর গণ আন্দোলনের (জানুয়ারি-মার্চ ১৯৬৯) চাপে ১৯৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তিলাভ। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। রংপুর জেলায় আটটি মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং সেন্টার ও ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্বদান। স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ। ১৯৭৩-এ পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত। ১৯৮৪-তে তাঁর সম্পত্তির এক বিরাট অংশ জনকল্যাণের জন্য দান। রংপুরে তাঁর মাতার নামে 'প্রমদাসুন্দরী সেবাকল্যাণ ট্রাস্ট' ও পিতার নামে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা। নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট রাজনীতিবিদ। সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য তার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালিত। মৃত্যু. রংপুর থেকে বেড়াবার জন্য কলকাতায় গমন। মৃত্যু. কলকাতা, ২৮ অক্টোবর ১৯৯১।



মণি সিংহ (১৯০১-১৯৮৪)॥ জন্ম. সুসং দুর্গাপুর, নেত্রকোণা, ২৮ জুন ১৯০১। রাজনীতিবিদ। পিতা কালীকুমার সিংহ প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। কৃষকনেত্রী অণিমা সিংহ তাঁর স্ত্রী। সুসং দুর্গাপুরের জমিদাররা তাঁর মাতুল বংশ। পিতার মৃত্যুর পর আড়াই বছর বয়সে বিধবা মাতার সঙ্গে মাতুলালয়ে আগমন ও সেখানে লালন-পালন। সুসং দুর্গাপুরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলকাতা গমন। ১৯১৪-তে অনুশীলন দলে যোগদান। এক দশক পরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ। ১৯২৫-এ মার্কসবাদে দীক্ষা গ্রহণ ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। ১৯২৮-এ কলকাতার মেটিয়াবুরুজে কেশরাম কটন মিলে শ্রমিকদের ১৩ দিনব্যাপী ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়ে দাবি আদায়। ১৯৩০-এর ৯ মে কলকাতায় প্রথম গ্রেফতার। জেল, অন্তরীণ প্রভৃতি ভোগের পর ১৯৩৭-এর নভেম্বরে মুক্তি পেয়ে সুসং দুর্গাপুরে আগমন। সে অঞ্চলের কৃষকদের সংগঠিত করে টংক প্রথার বিরুদ্ধে জঙ্গি কৃষক আন্দোলন পরিচালনা। ১৯৪৫-এ নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কৃষাণসভার ঐতিহাসিক সম্মেলনের অন্যতম সংগঠক ও অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে পূর্ব-পাকিস্তানে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ। ময়মনসিংহ জেলার হাজং কৃষকদের নিয়ে আবার টংক (এই ব্যবস্থায় নগদ টাকার পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ জমিদারদের দিতে হতো) আন্দোলন শুরু। এই আন্দোলনের সশস্ত্র রূপ ধারণ (১৯৫১-তে টংক প্রথা বাতিল)। পাকিস্তান



সরকার কর্তৃক তাঁর উপর হুলিয়া জারি ও তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সব সম্পত্তি ক্রোক। গ্রেফতার এড়াবার জন্য আত্মগোপন। একটানা প্রায় বিশ বছর আত্মগোপন অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালনা। ১৯৫১-তে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলনে পার্টির পূর্ব-পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৪-তে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষণা। ১৯৫৬-তে পার্টির তৃতীয় সম্মেলনে (গোপনে অনুষ্ঠিত) ও ১৯৬৮-তে পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (গোপনে অনুষ্ঠিত) দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ষাটের দশকে চীন ও রাশিয়ার আদর্শগত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট রাজনীতিতে ভাঙ্গন দেখা দিলে রাশিয়ার নীতি অনুসরণ। ১৯৬৭-র ৬ নভেম্বর আত্মগোপন অবস্থায় গ্রেফতার। গণআন্দোলনের চাপে ২২ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) মুক্তিলাভ। একই বছর জুলাই মাসে পুনরায় গ্রেফতার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর (২৬ মার্চ ১৯৭১) কয়েক দিন পরে ১৯৭১-এর ৭ এপ্রিল সাধারণ কয়েদিদের সাহায্য ও সহযোগিতায় রাজশাহী কারাগার থেকে বের হয়ে আসেন। মুজিবনগরে গমন ও মুক্তিযুদ্ধ পার্টির প্রতিনিধিরূপে বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত। স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টির সভাপতি নির্বাচিত। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কোপন্থি) ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত ত্রিদলীয় ঐক্য জোটের অন্যতম নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন। ১৯৭৫-এর জুন তাঁর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক গঠিত বাকশাল (কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ)-এ একীভূত। একই বছর ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের হাতে নিহত হলে বাকশাল রাজনীতির অবসান ঘটায় তাঁর নেতৃত্বে রাজনীতি দলবিধি (১৯৭৬)-র আওতায় ১৯৭৬-এর ১২ অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) পুনরুজ্জীবিত। সামরিক শাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সংস্কারমূলক কর্মসূচী তথা খালকাটা, নদী-খনন ইত্যাদির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ১৯৭৭-এ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বগুড়া ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সেনাবিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে (১৪ অক্টোবর ১৯৭৭) গ্রেফতার (১৭ অক্টোবর ১৯৭৭)। ১৯৭৮-এর ১৮ নভেম্বর রাজনীতি দলবিধি (১৯৭৬) প্রত্যাহার করা হলে কমিউনিস্ট পার্টি পুনরায় বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং মণি সিংহ কর্তৃক আবার পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ। ১৯৭৮-এর ৩ জুনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ঐক্য জোটের (আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি দলের সমন্বয়ে গঠিত) মনোনীত প্রার্থী জেনারেল (অব.) এম.এ.জি. ওসমানীর এবং ১৯৮১-এর ১৪ নভেম্বরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক মুজাফফর আহমদের পক্ষে প্রচারভিযানে অংশগ্রহণ। সামরিক প্রেসিডেন্ট লে. জেনারেল হুসাইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন চালাবার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ঐক্য তথা ১৫ দলীয় জোট (আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ইত্যাদি) গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ১৯৮০-তে পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে দ্বিতীয়বার পার্টির সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৮৪-র ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী অবস্থায় জীবনযাপন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি দৃঢ় আস্থাশীল একজন খাঁটি কমিউনিস্ট নেতা। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম পরিচালনা। দেশের স্বাধীনতা অর্জন, গণতন্ত্র কায়েম ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। তাঁর লেখা 'জীবন সংগ্রাম' (১ম খণ্ড ১৯৮৩, ২য় খণ্ড ১৯৯২) আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। মৃত্যু. কাঁঠালবাগান, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯০।

মতিউর রহমান (১৯৪১-১৯৭১)॥ জন্ম. ঢাকা, ২৯ অক্টোবর ১৯৪১। বীরশ্রেষ্ঠ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পাস করার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সারগোদায় পাবলিক স্কুলে ভর্তি এবং সেখান থেকে ডিস্টিংকশনসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিক

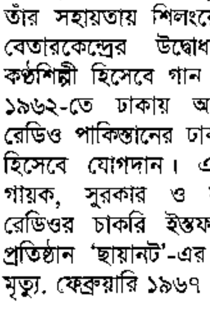
পাস। রিসালপুর পি.এ.এফ. কলেজ থেকে



১৯৬২-তে কমিশন লাভ এবং জেনারেল ডিউটি পাইলট নিযুক্ত। ১৯৬৩-তে করাচির মৌরিপুরে জেট কনভারসন কোর্স সমাপ্ত করে পেশোয়ারে গিয়ে জেট পাইলট হন। ১৯৬৪-তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে পেশোয়ারে কর্মরত অবস্থায় ছিলেন ফ্লাইং অফিসার। এরপর মিগ কনভারসন কোর্সের জন্যে পুনরায় সারগোদায় গমন। সেখানে ১৯৬৭-এর ২১ জুলাই তারিখে একটি মিগ-১৯ বিমান চালনার সময়ে আকাশে সেটা হঠাৎ বিকল হয়ে গেলে অপূর্ব দক্ষতায় প্যারাসুটযোগে মাটিতে অবতরণ। এ সময়ে ইরানের রানি ফারাহ দিবার সম্মানে পেশোয়ারে যে বিমানমহড়া অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনিই একমাত্র বাঙালি পাইলট ছিলেন। রিসাপুরে ফ্লাইং ইন্স্ট্রাক্টর হিসেবে দু'বছর কাজ করার পর ১৯৭০-এ বদলি হয়ে এলেন জেট ফ্লাইং ইন্স্ট্রাক্টর হয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় ছুটিতে আগমন। পঁচিশে মার্চের ঘটনায় মর্মাহত হয়ে দৌলতকান্দিতে জনসভা করেন এবং বিরাট মিছিল নিয়ে ভৈরব বাজারে গমন। পাক-সৈন্য দ্বারা ভৈরব আক্রান্ত হলে বেঙ্গল রেজিমেন্টে ই.পি.আর.-এর সঙ্গে থেকে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা। এর পরই কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে একটি জঙ্গি বিমান দখল এবং সেটা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ১৯৭১-এর ২০ আগস্ট শিক্ষার্থী মিনহাজ রশীদের কাছ থেকে টি-৩৩ বিমানটি ছিনতাই করে উড়ে যাবার সময়ে ভারতীয় সীমান্ত থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে বিমানটি বিধ্বস্ত। তাঁর মৃতদেহ ঘটনাস্থল থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। মিনহাজ রশীদের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে মিনহাজ রশীদ পেলেন সর্বোচ্চ খেতাব 'নিশানে হায়দার' এবং পাকিস্তানি প্রচারযন্ত্র দিনের পর দিন বাংলার বীর সন্তান মতিউরকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যায়িত করলো। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'যে জাতি একদিন স্বাধীনতার আলোর স্পর্শ লাভ করবেই-তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। স্বাধীনতাকামী জাতিকে অবশ্যই আত্মত্যাগ করতে হয়; বাংলা মায়ের তিরিশ লক্ষ বীর সন্তান আজ রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই শহীদদের মধ্যে মতিউর রহমান 'বীরশ্রেষ্ঠ'। মৃত্যু. ২০ আগস্ট ১৯৭১।

মতিউর রহমান, ওস্তাদ (১৯০০-১৯৬৭)॥ জন্ম. ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৯০০। বেহালাবাদক, কণ্ঠশিল্পী, সুরকার ও সংগীত শিক্ষক। মতি মিঞা নামে সমধিক পরিচিত। পিতা ও পিতামহ এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর উৎসাহে শৈশবকাল থেকে সংগীত সাধনা শুরু। পিতা সওদাগর মিঞার কাছে ক্ল্যারিওনেট ও বেহালা যন্ত্রে তালিম গ্রহণ। প্রসিদ্ধ সংগীতকলাকার ওস্তাদ আহমেদ আলী খাঁর কাছে সরোদ যন্ত্রে ও সংগীতগুরু কামিনীকুমার ভট্টাচার্যের কাছে খেয়াল গানে তালিম গ্রহণ। ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ও সংগীত জীবনের দীর্ঘদিন সংগীত-সাধনায় তাঁর কাছে অতিবাহিত। বেহালা যন্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম গ্রহণ। শিলংয়ের এক সংগীত-জলসায় প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁর সহায়তায় শিলংয়ে প্রতিষ্ঠিত হন। শিলং বেতারকেন্দ্রের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রথম কণ্ঠশিল্পী হিসেবে গান গাইবার গৌরব অর্জন। ১৯৬২-তে ঢাকায় আগমন এবং তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে 'নিজস্ব শিল্পী' হিসেবে যোগদান। একাধারে বেহালা-বাদক, গায়ক, সুরকার ও সংগীত শিক্ষক। পরে রেডিওর চাকরি ইস্তফা দিয়ে সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ছায়ানট'-এর অধ্যক্ষরূপে যোগদান। মৃত্যু. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭।

মতিউল ইসলাম (১৯১৪-১৯৮৪)॥ জন্ম.



গুণিয়াউক গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৫ নভেম্বর, ১৯১৪। কবি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জর্জস্কুল থেকে মেট্রিক পাস। কলকাতায় গমন এবং সেখানে থেকে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ঢাকার অম্বিকাচরণ

স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর পুনরায় কলকাতায় গিয়ে রেলওয়েতে কেরানিগিরি চাকরি গ্রহণ। এখানে কিছুকাল কাজ করার পর ইন্ডিয়ান কাস্টমসে উচ্চমান কেরানির চাকরিতে প্রবেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে টেলিপ্রিন্টার অপারেটর হিসেবে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগদান। যুদ্ধশেষে কলকাতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি বিভাগে সুপারভাইজার নিযুক্ত। দেশবিভাগের (১৯৪৭) পর চট্টগ্রাম ও করাচি বন্দরের আমদানি রফতানি নিয়ন্ত্রকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ। প্রেম, সৌন্দর্য ও প্রকৃতির কবি হিসেবে খ্যাত। ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান। তাঁর কবিতা প্রধানত রোমান্টিকতায় লালিত। প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ: মাটির কন্যা (১৯৪৮), কায়েদে আজম তোমার জন্যে (১৯৫০), প্রিয়া ও পৃথিবী (১৯৫৫), সপ্তকন্যা (১৯৫৭), পুষ্পবীথি (১৯৬২) ইত্যাদি। কবিতায় বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৭৬)। মৃত্যু. ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৯ অক্টোবর, ১৯৮৪।

মতিউর রহমান, মোহাম্মদ (১৮৯২-১৯৬৫)॥



জন্ম. হোসেন্দি, কিশোরগঞ্জ, ১০ মার্চ ১৮৯২ (২৮ ফাল্গুন, ১২৯৮)। শিক্ষাবিদ ও গবেষক। পিতা মুন্সী মোহাম্মদ হানিফ, মাতা, মোছাম্মৎ মমরোজউন্নেছা। পরিবারের প্রধান আয় ছিল কৃষি। কিশোরগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক (১৯১৩), জগন্নাথ কলেজে আই.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন (১৯১৩-১৯১৪)। বাজিতপুর জুনিয়র মাদ্রাসা, পাঁচভাগ মাদ্রাসা, ওসমানপুর জুনিয়র মাদ্রাসা, হয়বতনগর মাদ্রাসা, নিকলি হাইস্কুল, কোদালিয়া এস.আই. হাইস্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা। ইতিহাস-গবেষণায় দক্ষতা প্রদর্শন। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'ঐতিহাসিক অভিধান' (১৯৬৭) সংকলন তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি। স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা। গ্রন্থ: পুষ্প রহস্য (১৯২১), উদ্ভিদ রহস্য (১৯২৬), ময়মনসিংহের ভূগোল (১৯২৮), দেওয়ান ঈসা খাঁ (১৯৫১), ঐতিহাসিক অভিধান (১৯৬৭)। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ পাকুন্দিয়া আলহক সাহিত্য সমিতি কর্তৃক স্বর্ণপদক প্রদান (৩ নভেম্বর ১৯২৯)। মৃত্যু. হোসেন্দি, ১৮ অক্টোবর ১৯৬৫।

মতিনউদ্দীন আহমদ (১৯০০-১৯৮০)॥ আটগ্রাম,



করিমগঞ্জ-সিলেট, ১০ জুন, ১৯০০। সাহিত্যিক। জমিদার পরিবারে জন্ম। করিমগঞ্জ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯১৮), সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে এফ.এ. (১৯২০) ও কলকাতা রিপন ল' কলেজ থেকে বি.এল. ডিগ্রি লাভ (১৯২২) পাস। রিপন ল' কলেজ থেকে বি.এল. ডিগ্রি লাভ (১৯২৬)। সিলেট আদালতে কিছুদিন আইন ব্যবসায় করার পর আসাম জুনিয়র সিভিল সার্ভিসে যোগদান। সাব-ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্তি লাভ (১৯২৭)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর আসাম ছেড়ে ঢাকায় আগমন ও পূর্ব-পাকিস্তান সিনিয়র সিভিল সার্ভিসে যোগদান। ১৯৫৮-তে রাজস্ব বোর্ডের স্পেশাল অফিসারের পদ থেকে অবসর গ্রহণ। পাকিস্তান লেখক সংঘের (১৯৫৯) পূর্ব-পাকিস্তান শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৩-তে হজব্রত পালন। রম্যরচনাকার, হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গ-গল্পের রচয়িতা। গল্পগ্রন্থ: তিন চেরাগ (১৯৬৭), উপন্যাস: বুদ্বুদ (১৯৬১), ভ্রমণ কাহিনী: হৃদয় দিয়ে দেখা (১৯৬৩)। অনুবাদ গ্রন্থ: বিজন বনের রূপকথা (১৯৫৯), অশান্ত পৃথিবী (১৯৬০), শত জীবনের কথা (১৯৬২), ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট (১৯৬৪) ইত্যাদি। মৃত্যু. ৩ জুলাই, ১৯৮০।

মতীয়র রহমান খান (১৮৭২-১৯৩৭)॥ জন্ম. পারিল গ্রাম, মানিকগঞ্জ, ১৮৭২। সাহিত্যিক। এন্ট্রান্স পাস করে ঢাকা কলেজে ভর্তি। বি.এ. পাসের আগেই দিনাজপুরের শিবগঞ্জ মধ্য ইংরেজি স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান। এরপর কলকাতা লায়েক জুবিলি স্কুলে ও কলকাতা মাদ্রাসায় কিছুকাল শিক্ষকতা। ১৯০৭-এ সেটেলমেন্ট বিভাগে কানুনগো নিযুক্ত। লন্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। এক পর্যায়ে 'মিহির ও সুধাকর' সম্পাদনা। মতীয়র রহমান খান কবিতা, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ ও রম্যরচনা প্রভৃতি বিভিন্ন আঙ্গিকে সাহিত্য রচনা

করেছেন। কবিতা: মোসলেম বধ, সোহরাব বধ, দিল্লি গাথা। উপন্যাস: যমুনা, নব-কুমুদ, মোক্ষপ্রাপ্তি। ভ্রমণ–কাহিনী: প্রবাসের স্মৃতি, আগ্রা কাহিনী। ব্যঙ্গাত্মক রচনা: গূঢ়তত্ত্ব, গুপ্তসভা, মহাপ্রভু। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় 'যমুনা' উপন্যাস রচনা। আহম্মদ শাহ আবদালীর সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিশ্বাস রাও-এর কন্যা যমুনার প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে এটি রচিত। মৃত্যু. ১৯৩৭।

মতিয়ুর রহমান (১৯৫৭-১৯৬৯)॥ জন্ম. ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি ১৯৫৭)। শহীদ। পিতা আজহার আলী মল্লিক (ব্যাংক কর্মচারী)। ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণির ছাত্র। তিনি ছিলেন বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্র। কিশোর বয়সেই একজন সচেতন নাগরিকের বোধ এবং সচেতনা অর্জন করেছিলেন। ১৯৬৯-এর ২৪ জানুয়ারি স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা সেক্রেটারিয়েট অবরোধ করলে তাতে যোগদান। সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের সামনে পাকিস্তানি সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে নিহত। অকুতোভয় এই কিশোর মিছিলের পুরোভাগে থেকে বাঙালির অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগ পূর্ববাংলায় আইয়ুববিরোধী আন্দোলনকে তীব্র গতিদান করে এবং এই গণআন্দোলনের মুখে একনায়ক আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে (২৫ মার্চ ১৯৬৯)। মতিয়ুর বাঙালি স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। মৃত্যু. ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯।



মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪)॥ জন্ম. কলুটোলা, কলকাতা, ১৭৯২। সমাজসেবক ও দাতা। পাঁচ বছর বয়সে পিতৃহীন হন। স্থানীয় নিত্যানন্দ সেনের পাঠশালায় কিছুকাল অধ্যয়ন। চলনসই ইংরেজি ও গণিত জানতেন। ... কর্মজীবন শুরু। প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ামে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের সরবরাহ দিতেন এবং কিছুদিন কেরানির চাকরি করেন। শিশি-বোতল ও ছিপির ব্যবসাও করেন। পরে কালিখালের কাস্টমস দারোগা হন। ১৮২০ থেকে ১৮৩৪ পর্যন্ত বিভিন্ন ইউরোপিয়ান প্রতিষ্ঠানে মুৎসুদ্দির কাজ করেন। এরপর জাহাজি শিল্পে মনোনিবেশ দান। তিনিই সর্বপ্রথম আন্তর্দেশীয় জাহাজি শিল্পে বাষ্পীয় পোতেরন প্রচলন করেন। এ ছাড়া আমদানি-রফতানির ব্যবসায়ও সাফল্য অর্জন। পরবর্তীকালে প্রায় ১২/১৩টি জাহাজের মালিক হন। নিজের সামাজিক প্রতিপত্তির কারণে 'ধর্মসভা'র একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হন। তাঁর সামাজিক প্রতিপত্তির মূলে ছিল উদার দানশীলতা। ১৯৪৩-এ 'শীলস ফ্রি কলেজ' প্রতিষ্ঠা করে ইহুদি শিক্ষদের পরিচালনায় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রচলন করেন। এ ছাড়া অন্যান্য জনহিতকর কাজেও অকাতরে অর্থদান করেন। ১৮৪৬-এর ১ মার্চ 'হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন' ও ১৮৫৩-র মে মাসে 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ' স্থাপনে অর্থ সহায়তাদান। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য নিজের জমি দান। এ ছাড়া ১৮৪৬-এ বেলঘরিয়া অতিথিশালা ও গঙ্গায় স্নানার্থীদের জন্য মতিলাল ঘাট তৈরি করে দেন। মৃত্যু. ২৯ মে ১৮৫৪।



মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮)॥ জন্ম. বিল্বগ্রাম, নদীয়া। পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। ১৮২৯-এ কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শ্রেণিতে ভর্তি। এ কলেজ থেকে ১৮৪২-এ জজ পণ্ডিতের সার্টিফিকেট লাভ। হিন্দু কলেজ সংলগ্ন পাঠশালায় দুই মাসকাল শিক্ষকতা। এক বছর বারাসত গভর্নমেন্ট বিদ্যালয়ে প্রথম পণ্ডিতের পদে দায়িত্ব পালন (১৮৪২)। ১৮৪৩-১৮৪৫-এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ও ১৮৪৬-এ কৃষ্ণনগর কলেজে পণ্ডিতের কার্য সম্পাদন। ১৮৪৬-এর জুন সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৮৫০-এর নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত পদে যোগদান। এ পদে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালনের পর ১৮৫৫-র ডিসেম্বর মাসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত। বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় কলকাতায় 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামক ছাপাখানা স্থাপন (১৮৪৭)। ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' এ যন্ত্রে মুদ্রিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ। ১৮৪৯-এ কলকাতায় বেথুন

কর্তৃক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলে বিনা বেতনে ছাত্রীদেরকে শিক্ষাদান ও শিশুপাঠ্যগ্রন্থ 'শিশুশিক্ষা' রচনা। ১৮৫০-এ 'সর্ব্ব-শুভঙ্করী' নামক পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে শিক্ষিত সমাজের প্রশংসাভাজন হন। ছাত্রাবস্থায় 'রসতরঙ্গিনী' (১৮৩৪) ও 'বাসবদত্তা' (১৮৩৬) নামক কবিতাগ্রন্থ রচনা। তাঁর অন্যতম সাহিত্যকর্ম 'শিশুশিক্ষা' (১ম-২য় ভাগ-১৮৪৯ ও ৩য় ভাগ-১৮৫০) নামক শিশুতোষ গ্রন্থ। 'পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল' এ গ্রন্থের প্রথম ভাগের একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় শিশুতোষ কবিতা। কবি-প্রতিভার জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ কর্তৃক 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি প্রদান। পরে 'তর্কালঙ্কার' উপাধি পান। মৃত্যু. কান্দী, কলেরা রোগে, ৯ মার্চ ১৮৫৮।

মধুসূদন সরস্বতী (১৫২৫-১৬৩২)॥ জন্ম. উনসিয়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ, ১৫২৫। বেদান্তবাদী দার্শনিক। আসল নাম ছিল কমলজনয়ন। গুরুত্ব দেয়া নাম মধুসূদন। নবদ্বীপে ছিলেন হরিরাম তর্কবাগীশের ছাত্র, গদাধর চক্রবর্তীর সতীর্থ। জীবনের দীর্ঘ সময় কাশীধামে অবস্থান। কথিত আছে মধুসূদন সম্রাট আকবরের সভায় বিশেষ সম্মানিত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত দর্শন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: ১. অদ্বৈতসিদ্ধি, ২. বেদান্ত কাব্যলতিকা, ৩. অদ্বৈত মঞ্জরী, ৪. অদ্বৈতরত্ন রক্ষণ, ৫. আনন্দ মন্দাকিনী, ৬. প্রস্থানভেদ। মধুসূদনের দর্শন গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান 'অদ্বৈতসিদ্ধি'। বেদান্ত দর্শনের প্রতি বাঙালির বিমুখতার যে 'কলঙ্ক', মধুসূদন তা' দূর করে অদ্বৈত বেদান্তের ইতিহাসে বাঙালি মনীষাকে গৌরবোজ্জ্বল করে রেখেছেন। মধুসূদনের গীতাভাষ্যও বাঙালির গৌরবের বস্তু। মৃত্যু. ১৬৩২।

মনসুর বয়াতি॥ ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী। লোককবি এবং গায়ক। তাঁর সময়কাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। মুখে মুখে গাথাগান রচনা করতেন এবং সুর দিয়ে পরিবেশন করতেন। 'দেওয়ানা মদিনা' তাঁর অসামান্য সৃষ্টি। এই গাথাগানটি ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার আইঘর নিবাসী চন্দ্রকুমার দে (১৮৮২-১৯৫০) সংগ্রহ করেছিলেন। পরে এই গাথাগানটি ড. দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় প্রকাশিত

মনা সর্দার (?-১৮২০)॥ উনিশ শতকের ময়মনসিংহের কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহের বিপ্লবী নেতা। ময়মনসিংহের সুসং আলপ সিংহ পরগনার 'হাতি খেদা' আন্দোলনে নেতৃত্বদান। গারো ও হাজংদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ায় নির্মম অত্যাচারী জমিদারদের হাতে ধৃত। এই গণনায়ককে কলমাকান্দা জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী কর্তৃক হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা, ডিসেম্বর ১৮২০।

মনিয়ার-উইলিয়াম্স, স্যার (১৮১৯-১৮৮৯)॥



জন্ম. বোম্বাই শহর, ১২ নভেম্বর ১৮১৯। অধ্যাপক, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ। পিতা কর্নেল মনিয়ার উইলিয়মস, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি সার্ভেয়ার জেনারেল। মনিয়ার-উইলিয়ামসের পিতৃবিয়োগ ঘটে শৈশবেই, ফলে বাল্যশিক্ষা ঘটে মায়ের তত্ত্বাবধানে স্বগৃহে। পরে অক্সফোর্ডে ভর্তি এবং সেখান থেকে ১৮৩৭-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এরপরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'রাইটার' পদে মনোনয়ন লাভ করে শিক্ষানবিশির জন্য হেলবেরি কলেজে প্রবেশ। এখানে পড়ার সময়ে সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট। ইতোমধ্যে তাঁর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা ভারতে সৈন্য বিভাগে চাকরিরত অবস্থায় বেলুচিস্তানে এক যুদ্ধে মারা গেলে পারিবারিক কারণে মণিয়ার উইলিয়ামস ভারত গমনের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে স্বদেশেই সংস্কৃত শিক্ষা ও অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকার্জনে মনস্থ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক হোরেস হেম্যান উইলসনের ছাত্রত্ব লাভের সৌভাগ্য অর্জন। ১৮৪৪-এ অক্সফোর্ড থেকে স্নাতন হবার পর হেলবেরি কলেজে প্রাচ্য ভাষার অধ্যাপক পদে যোগদান। কলেজটি ১৮৫৮-তে বন্ধ করে দেবার পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত। হেলবেরি কলেজের বিলুপ্তি ঘটার কিছুকাল পরে চেল্টেনহ্যাম কলেজে অধ্যাপনা করে ১৮৬০-এ অক্সফোর্ডে সদ্যপ্রয়াত হোরেস হেম্যান উইলসনের শূন্য পদটিতে প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপকরূপে যোগদান। অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়াম্স অক্সফোর্ডে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট'

নামে ভারতবিদ্যা বিষয়ক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠনের সংকল্প করেন এবং সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের পূর্বশর্তরূপে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞানলাভের উদ্দেশে ১৮৭৫-এ সর্বপ্রথম ভারতে আগমন। পরে আরো দু'বার (১৮৭৬ ও ১৮৮৩) ভারতে এসে বইপত্র ও অর্থ সংগ্রহ এবং ১৮৮৩-তে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ভবনের ভিত্তি স্থাপন। আনুষ্ঠানিকভাবে ইনস্টিটিউট ১৮৯৬-তে উদ্বোধন। নিজের সংগৃহীত ভারতবিদ্যাসংক্রান্ত তিন হাজার বই ও পুঁথি এই প্রতিষ্ঠানে দান। আজীবন 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট'-এর প্রধান অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করে ছিলেন। ১৮৮৭-তে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। পূর্ববর্তী বছরে, ১৮৮৬-তে সরকারের 'নাইট' উপাধিতে এবং ১৮৮৭-তে কে.সি.এস.আই. উপাধিতে ভূষিত। পাণ্ডিত্যের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.সি.এল., জার্মানির টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে L.L.D. উপাধি লাভ। গবেষণা ও অনুবাদ গ্রন্থের রচয়িতা ও একাধিক অভিধানের সংকলক। তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত কর্ম A Dictionary: English Sanskrit and Sanskrit English Dictionary প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৫১ ও ১৮৭২-এ। এতদ্ব্যতীত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ: An Elementary Grammar of Sanskrit Manual for Composition (1862), A Practical Grammar of the Sanskrit Language (১৮৭৭), Hinduism (১৮৭৭), Religious Thought and Life in Ancient India (১৮৮৩), Buddhism (১৮৮৯) প্রভৃতি। মৃত্যু. দক্ষিণ ফ্রান্সের কান্‌শহর, ১১ এপ্রিল ১৮৮৯।

মনিরউদ্দীন ইউসুফ (১৯১৯-১৯৮৭)॥ জন্ম. মাতুলালয়, জাওয়ার গ্রাম, তাড়াইল-কিশোরগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯। পৈতৃক নিবাস বৌলাই গ্রাম, কিশোরগঞ্জ। অনুবাদক ও লেখক। জমিদার পরিবারে জন্ম। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৩৮) ও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৪০) পাস। কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বি.এ. অনার্স অধ্যয়ন। ১৯৬২-তে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের পাবলিক রিলেশন বিভাগে চাকরি লাভ। এ সংস্থা থেকে প্রকাশিত 'কৃষি সমাচার' পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৭৯-তে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। উর্দু ও ফার্সি সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ করে খ্যাতি অর্জন। পারস্যের মহাকবি ফেরদৌসীর 'শাহনামা'র বঙ্গানুবাদ তাঁর বিশিষ্ট কীর্তি। 'ফেরদৌসীর শাহনামা' (১৯৯১) নামে এটি ছয় খণ্ডে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত। কবি এবং প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থবলি: অনুবাদ– ইকবালের কাব্যসঞ্চয়ন (১৯৬০), দীওয়ান-ই-গালিব (১৯৬৪), কালামে রাগিব (১৯৬৭), রুমীর মসনবী (১৯৬৭)। প্রবন্ধ-গবেষণা-উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬৮), বাংলা সাহিত্যে সুফী প্রভাব (১৯৬৯), আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি (১৯৭৮), সংস্কৃতিচর্চা (১৯৮০), বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব (১৯৮৪), নব মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ (১৯৮৯), এক ঝাঁক পায়রা (১৯৮৮)। আত্মজীবনী– আমার জীবন আমার অভিজ্ঞতা (১৯৯২)। অনুবাদে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৮) ও সাহিত্যে একুশে পদক (মরণোত্তর, ১৯৯৩) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭।



মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা (১৮৭৫-১৯৫০)॥ জন্ম. আড়ালিয়া গ্রাম, চট্টগ্রাম, ১৮৭৫। রাজনীতিবিদ, লেখক, সাংবাদিক ও সমাজসেবক। পিতা মুন্সি মতিউল্লাহ পণ্ডিত। ১৮৯৫-তে হুগলি মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে জামায়াত-এ-উলা পাস। রংপুর মুন্সীপাড়া জুনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় যোগদান। ১৮৯৮-এ কদমপুর (রংপুর) মাদ্রাসার হেড মৌলবী নিযুক্ত। ১৯০১-এ সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) মাদ্রাসায় যোগদান। 'খতম', 'জিয়ারৎ', 'মৌলুদখানি' প্রভৃতি বিষয়ক মোল্লাগিরি কাজের প্রতি আস্থা না থাকায় মাতৃভাষা বাংলাচর্চায় আত্মনিয়োগ। রাজশাহীর মীর্জা ইউসুফ আলী (সৌভাগ্য স্পর্শমণির



গ্রন্থকার) সাহায্য ও সহযোগিতায় সাপ্তাহিক 'সুলতান' (১৯০৪) পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা। বঙ্গভঙ্গ রহিত আন্দোলনের সমর্থনে এ পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ ও মন্তব্যাদি প্রকাশ। ১৯০৬-এ কংগ্রেসে যোগদান। এ দলের অন্যতম প্রধান সভ্য হিসেবে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১), খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০) ও ভারত ছাড় আন্দোলন (১৯৪২)-এ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। আইন অমান্য আন্দোলনে কারা নির্যাতন ভোগ। বহুদিন মাসিক 'আল-এসলাম' (১৯১৫) পত্রিকা সম্পাদনা। ইরানি ভাষায় প্রকাশিত 'হাবলুল মতিন' (১৯১২) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা। ১৯২৩-এ নবপর্যায়ে সাপ্তহিক 'সুলতান' প্রকাশ করে সম্পাদনা। দৈনিক 'সুলতান' (১৯২৮)-এর প্রধান পরিচালক। অবিভক্ত ভারতে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের বাংলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি। ত্রিশের দশকে বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা দলে যোগদান। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে চট্টগ্রামে দক্ষিণ (মধ্য) নির্বাচনী এলাকা থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। খাঁটি মুসলিম ও খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অসারতা প্রতিপন্ন করে আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনা (১৯৪২-১৯৪৩)। আজাদ হিন্দু ফৌজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার দায়ে ১৯৪৪-এর ১৩ অক্টোবর চট্টগ্রামে গ্রেফতার। লাহোর সেন্ট্রাল জেলে আটক (১৯৪৪-১৯৪৫)। সমাজসেবক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন। আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলা, ইসলাম মিশন, খাদেমুল ইসলাম সমিতি, চট্টগ্রাম কদম মোবারক এতিমখানা, ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) জাতীয় বিদ্যালয়, আড়ালিয়া শামসুজ্জামান বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১) প্রতিষ্ঠারও অন্যতম উদ্যোক্তা। ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করে সুনাম অর্জন। ভারতে মুসলমান সভ্যতা, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, তুরস্কের সুলতান, ভারতে ইসলাম প্রচার, মুসলমানের অভ্যুত্থান, সমাজ সংস্কার, খগোল শাস্ত্রে মুসলমান, কনস্টানটিনোপোল, আওরঙ্গজেব, মোসলেম বীরঙ্গনা, কোরানে স্বাধীনতার বাণী, ইসলামের উপদেশ, ইসলামের পুণ্যকথা প্রভৃতি প্রবন্ধে মুসলিম জাগরণের বাণী উচ্চারিত। সুবক্তা হিসেবেও খ্যাত। চট্টগ্রাম জেলার অপর নাম ইসলামাবাদ অনুসারে ইসলামাবাদী উপাধি লাভ। মৃত্যু. বাইনজুড়ি গ্রাম, চট্টগ্রাম, ২৪ অক্টোবর ১৯৫০।

মনীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯)॥ জন্ম. রাজশাহী, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯০২। ছদ্মনাম 'যুবনাশ্ব'। কথাসাহিত্যিক ও কবি। ১৯১৯-এ চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক এবং ১৯২৩-এ ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস। ১৯২৭-এ আয়কর বিভাগের চাকরিতে যোগদান ও ১৯৫১-তে ইস্তফা দান। এরপর আমৃত্যু আয়কর আইনজ্ঞ। মুর্শিবাদের বহরমপুরে জীবনের শেষ বছরগুলো স্থায়ীভাবে বসবাস। 'বর্তিকা' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন আমৃত্যু সম্পাদনা। 'যুবনাশ্ব' কল্লোল যুগের লেখক। পূর্ব-বঙ্গীয় উপ-ভাষায় রসোত্তীর্ণ কবিতা রচনা। বস্তির মনুষ্যেতর জীবনের রূপকার হিসেবে অনন্য। গ্রন্থাবলি—কথাসাহিত্য: পটল ডাঙ্গার পাঁচালী, (১৯৫৬), কনখল। কবিতা: শিলালিপি, (১৯৩৯), যদিও সন্ধ্যা, বিদুষী বাক, একচক্রা। আত্মজৈবনিক রচনা: মান্ধাতার বাবার আমল। মৃত্যু. বহরমপুর, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৯।

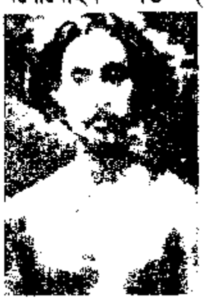


মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭)॥ জন্ম. ডোঙ্গাঘণ্টা গ্রাম, যশোর, ২৪ জুলাই ১৯০১। কথাসাহিত্যিক। পিতা রামলাল বসু। আট বছর বয়সে পিতৃহীন হন। কলকাতা রিপন কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস (১৯১৯)। বাগেরহাট কলেজ থেকে এফ.এ. ক্লাসে ভর্তি। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-২২) যোগদান করে কলেজ বর্জন। ১৯২২-এ এফ.এ. পাস। কলকাতা সাউথ সুবার্বন কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বি.এ. পাস (১৯২৪)। কলকাতা সাউথ সুবার্বন স্কুলে শিক্ষকতার কর্মে যোগদান। পুস্তক প্রকাশক ব্যবসায়ী হিসেবেও পরিচিতি লাভ। একজন



খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। গ্রাম বাংলার নিসর্গ ও গ্রামীণ মানুষের জীবনাচরণ তাঁর কথাসাহিত্যের মূল ভিত্তি। সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও মানুষের জীবন সংগ্রামের আলেখ্য উপস্থাপনে শিল্পকুশলতার পরিচয় প্রদান। আত্মস্বার্থহীন মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি তাঁর গল্প-উপন্যাসে আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্কিত। মনোজ বসুর লেখা সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থ–উপন্যাসঃ ভুলি নাই (১৯৪২), সৈনিক (১৯৪৬), জলজঙ্গল (১৯৫১), বৃষ্টিসৃষ্টি (১৯৫৭), আমার ফাঁসি হ'ল (১৯৫৯), রক্তের বদলে রক্ত (১৯৫৯), মানুষ গড়ার কারিগর (১৯৫৯), রূপবতী (১৯৬০), বন কেটে বসত (১৯৬১), নিশিকুটুম্ব (১৯৬৩), পথ কে রুখবে (১৯৬৯)। গল্পগ্রন্থঃ বনমর্মর (১৯৩২), নববাঁধ (১৯৩৩), দেবী কিশোরী (১৯৩৪), পৃথিবী কাদের (১৯৪০), একদা নিশীথ কালে (১৯৪২)। নাটকঃ প্লাবন, নূতন প্রভাত, রাখিবন্ধন, শেষলগ্ন। মৃত্যু. কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭।

মনোমোহন দত্ত (১৮৭৮-১৯০৯)॥ জন্ম. সাতমোড়া গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জানুয়ারি ১৮৭৮। ১০ মাঘ, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ। সাধক ও ভাবসংগীত রচয়িতা। পূর্বপুরুষ ঢাকা জেলার সোনার গাঁয়ে বৈদ্য বংশজ পরাক্রমশালী জমিদার।



পরবর্তীকালে সাতমোড়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস। পিতা পদ্মনাভ দত্তের পেশা ছিল কবিরাজি। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন ইংরেজি স্কুলে অধ্যয়ন। দুইবার মোক্তারি পরীক্ষায় অকৃতকার্য (১৮৯৬) ও (১৮৯৯)। সৌদামিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ (১৯০১)। ১৮ বৎসর বয়সে পারিবারিক গুরু আনন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ও সাধক জীবনের শুরু। 'মনোমোহেন সাধু' নামে পরিচিত। একজন স্বভাব কবি। জীবনের শ্রেষ্ঠ সহচর ছিলেন ফকির (তাপস) আফতাবউদ্দিন খাঁ। মনোমোহন দত্ত রচিত সকল গানের সুরকার ফকির আফতাবউদ্দিন খাঁ। কোরআন শরিফ ও বাইবেল নিয়মিত পাঠ করতেন। গীতা বেদান্তে সমান ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ। আধ্যাত্মিক সাধনার রীতিনীতি পালনের পর অবসর সময়ে সংগীত ও কবিতা এবং তত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা। মলয়া, পথিক, পাথেয়, ময়না প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'মলয়া' গ্রন্থটি মনোমোহন, লবচন্দ্র ও আফতাবউদ্দিনের আদ্যাক্ষর নিয়ে 'ম-ল-য়া' নামকরণ। অনেক গানে লালন শাহের গানের সাদৃশ্য বিদ্যমান। লালন শাহ ও অন্যান্য খ্যাতনামা বাউল কবির গান তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করে থাকবে বলে প্রতীয়মান হয়। 'মলয়া'র প্রায় সব গানেই আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত। তাঁর কবিতা ও গানের ভাব আধ্যাত্মিক-সাধনার জটিলতত্ত্বে ভরা। মৃত্যু. সাতমোড়া, অক্টোবর ১৯০৯ (২০ আশ্বিন ১৩১৬ বঙ্গাব্দ)।

মনোরমা বসু (১৮৯৭-১৯৮৬)ঃ জন্মঃ বানারীপাড়া, বরিশাল, ১৮ নভেম্বর ১৮৯৭। সমাজসেবী, সংগঠক ও নেত্রী। পিতা নীলকণ্ঠ রায় ও মাতা প্রমদাসুন্দরী। ছোটবেলায় বড় ভাই ও পিতার মৃত্যু হলে অসহায় মায়ের পরিবারে দারিদ্র্যের



সঙ্গে লড়াই। ফলে লেখাপড়ার সামান্য সুযোগ লাভ। এগারো বছর বয়সে ক্ষুদিরামের ফাঁসির ঘটনায় প্রথম দেশপ্রেমের অঙ্কুর জাগ্রত। চোদ্দো বছর বয়সে গৌরনদীর বাঁকাই গ্রামের জমিদার বিপত্নীক চিন্তাহরণ বসুর সঙ্গে বিয়ে। স্বামীর প্রত্যক্ষ সমর্থনে স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত। জমিদার বাড়ির বিধি-নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করে গ্রামের নারী সমাজকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সপরিবার বরিশালে বসবাস শুরু। এখানে অবস্থান কালে কংগ্রেস দলের কর্মী ও নারী নেতৃরূপে সাংগঠনিক কাজের বিস্তৃতি। বরিশালে মহিলা সমিতির শাখা গড়ে তুলে সমাজ সেবায় ব্রতী। তদানীন্তন পূর্ববাংলায় এটিই ছিল প্রথম মহিলা সংগঠন। ১৯৩২-এ কংগ্রেসের ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ। দুস্থ মহিলাদের জন্যে 'মাতৃমন্দির আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু এটি পরিচালনার দায়িত্ব পালন। ১৯৪০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ও

সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ। সেই সময় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে এবং ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মধ্যে সেবা ও পুনর্বাসনের কাজে আত্মনিয়োগ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ দিনগুলিতে শান্তি রক্ষা ও বিপন্নের সেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও গণতান্ত্রিক অধিকার ও সমাজ-প্রগতির সংগ্রামে অবিচলভাবে নিরন্তর কর্মতৎপরতা। ১৯৪৮-এ বরিশালে খাদ্য আন্দোলনে সংগঠিত করায় এক বছর কারাভোগ। পরে নিরাপত্তা আইনে আরও তিন বছর কারাভোগ। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামরিক শাসনের প্রচণ্ড দমন পীড়নের পরিস্থিতিতে আত্মগোপনে থেকে মাতৃমন্দির আশ্রম পরিচালনা, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পল্লী কল্যাণ পাঠাগার স্থাপন, শিশুসংগঠন মুকুল মিলন খেলাঘর গড়ে তোলার সক্রিয় ভূমিকা। ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলিতে নারীসমাজকে সংগঠিত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধেও ছিল অগ্রণী ভূমিকা। বার্ধক্য সত্ত্বেও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের দায়িত্ব পালন। দেশপ্রেম, সমাজসেবা, কল্যাণব্রত ও মানবমুক্তির লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ এই নারী ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আদর্শনিষ্ঠ। দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে ছিলেন প্রিয় 'মাসিমা'। আমৃত্যু ছিলেন ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ। জীবনাবসান: বরিশাল. ১৬ অক্টোবর ১৯৮৬।

মফিজ চৌধুরী (১৯১৪-১৯৯৩)॥ জন্ম. মঙ্গলবাড়ি



গ্রাম, জয়পুরহাট বগুড়া, ১৯১৪। মন্ত্রী ও লেখক। জোতদার পরিবারে জন্ম। বগুড়া জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এসসি. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে এম.এসসি. (১৯৩৭) ডিগ্রি লাভ। শ্রেষ্ঠ গবেষণা কর্মের জন্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমেস্ট্রির কুপার স্বর্ণপদক লাভ (১৯৪৩)। রসায়নের উপর মৌলিক অভিসন্দর্ভ রচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের লেহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ (১৯৪৯)। লন্ডনের রয়্যাল একাডেমি অব কেমেস্ট্রির সদস্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের সিগমা সোসাইটির ফেলো। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৫৬-তে সরকারি চাকরি পরিত্যাগ করে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা স্থাপন। তাঁর কারখানার নাম ইঞ্জিনিয়ারিং সোসাইটি। পিটাক, শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ, স্টান্ডার্ড ইনস্টিটিউট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র সমিতির প্রথম ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। ১৯৬৭-তে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগদান। এ দলের মনোনয়নে জয়পুরহাট-পাঁচবিবি-ক্ষেত্রতলা নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত (৭ ডিসেম্বর ১৯৭০)। ১৯৭১-এ মুজিবনগর গমন এবং সেখান থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা প্রদান। স্বাধীন বাংলা সরকার কর্তৃক জাতিসংঘে প্রেরিত প্রতিনিধি দলের সদস্য। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভায় যোগদান (১৩ এপ্রিল ১৯৭২)। প্রায় দুই বছর পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ, বাণিজ্য ও কারিগরি গবেষণা দফতরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ জয়পুরহাট এলাকা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত। অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক। প্রাচীন গ্রিক ও শেক্সপীয়রের নাটকের বঙ্গানুবাদে দক্ষতার পরিচয় প্রদান। প্রকাশিত গ্রন্থ: অনুবাদ–কিং লিয়র, রোমিও জুলিয়েট, আন্তনি ও ক্লিওপেট্রা (১৯৯২)। স্মৃতিকথা–বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় (১৯৯১)। মৃত্যু. ১৯৯৩।

মফিজুল্লাহ কবির (১৯২৫-১৯৮৬)॥ জন্ম.



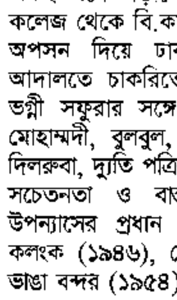
আটিয়াটুলি গ্রাম, নোয়াখালি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫। ইতিহাসবিদ ও অধ্যাপক। লক্ষ্মীপুর মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে হাই মাদ্রাসা (১৯৪১) পাস। হুগলী আই.আই. কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে আই.এ পাস (১৯৪৩)। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অনার্স ক্লাসে ভর্তি। ১৯৪৬-এ দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. অনার্স (ইতিহাস) ও ১৯৪৭-এ প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. (ইতিহাস) ডিগ্রি লাভ। ১৯৪৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। 'বুয়াইহিদ ডাইনাস্টি অব বাগদাদ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ (১৯৫৩)। পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনায় যোগদান। কালক্রমে উক্ত বিভাগের রিডার ও অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৭৬-১৯৮১ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য পদে দায়িত্ব পালন। আদি ও মধ্যযুগের মুসলিম এবং খালজি ও তুঘলক আমলে ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ। বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চায়ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পরিচালনায় কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়নের জন্যে গঠিত অথেনটিকেশন কমিটির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ববোধের পরিচয় প্রদর্শন। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইতিহাস ও খিলাফত (১৯৭৪), মুসলিম সভ্যতা (১৯৮৫), মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ (১৯৮৭), Buwayhid Dynasty of Bagdat. Experiences of an Exile at Home: Life in Occupied Bangladesh (1972)। সম্পাদনা: আরব জাতির ইতিহাস (সৈয়দ আমির আলী A Short History of the Saracens-এর বঙ্গানুবাদ, ১৯৬৪)। মৃত্যু. ঢাকা, সড়ক দুর্ঘটনায়, ৮ আগস্ট ১৯৮৬।

মবিনউদ্দীন আহমদ (১৯১২-১৯৭৮)॥ জন্ম. পারিল-নওয়াধন গ্রাম, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, ১৯১২। কথাশিল্পী। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন। গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে পিতৃব্য দলিলউদ্দিন আহমদের (ঢাকার সাব ডেপুটিকালেক্টর) তত্ত্বাবধানে থেকে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি। ১৯২৯-এ মেট্রিক পাস। ১৯৩১-এ জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.কম. পাস করে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় গমন। আলীপুর সদর জজের আদালতে পেশকারের চাকরি লাভ। চাকরি এবং একই সঙ্গে পড়াশোনা চালিয়ে ১৯৪৫-এ সিটি কলেজ থেকে বি.কম. পাস। দেশ বিভাগের পর অপসন দিয়ে ঢাকায় আগমন। ঢাকা জজ আদালতে চাকরিতে যোগদান। জ্ঞাতি বিধবা-ভগ্নী সফুরার সঙ্গে বিয়ে (১৯৩৯)। সওগাত, মোহাম্মদী, বুলবুল, মৃত্তিকা, মাহেনও, ইমরোজ, দিলরুবা, দ্যুতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। সমাজ-সচেতনতা ও বাস্তব জীবনবোধ তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: কলংক (১৯৪৬), হোসেন বাড়ির বৌ (১৯৫২), ভাঙা বন্দর (১৯৫৪), কুদরৎ খাঁর ভিটে (১৯৫৫), সুখচর (১৯৫৬), বুনো শয়তান (১৯৫৬), মুসলিম জাহানের রূপালী কাহিনী (১৯৫৯), রূপ হতে রূপে (১৯৬০), সাহানা (১৯৪৮)। ১৯৬১-তে ছোটগল্পের জন্যে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. ঢাকা ১৬ মার্চ ১৯৭৮।

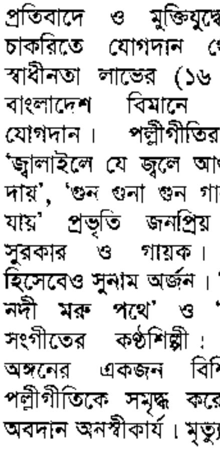


মমতাজ আলী খান (১৯২৩-১৯৯০)॥ জন্ম. ইরতা কাশিমপুর গ্রাম, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ, ১৯২৩। পল্লীগীতি-শিল্পী। জোতদার আফসারউদ্দীন খান তাঁর পিতা। স্কুলে পাঠকালে পিতার কেনা কলের গানের গান শুনে সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। সুরেলা কণ্ঠে খালি গলায় গান গেয়ে পাড়া-পড়শিদের শোনাতেন। স্থানীয় স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পাঠকালে গান শেখার জন্য কলকাতায় গমন। সেখানে ওস্তাদ নেসার হোসেন খানের কাছে সংগীতে তালিম গ্রহণ। এরপর প্রথমে একজন নাপিতের কাছে, পরে ওস্তাদ নেসার হোসেন খানের কাছে দোতারা বাজানো শেখেন। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর সহায়তায় সরকারের 'সং পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে' যন্ত্রী হিসেবে চাকরি লাভ। কিছুকাল ওস্তাদ আবদুল হালিম চৌধুরীর কাছে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ ও প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে আই.এ. পাস। একদা 'সং পাবলিসিটি'র এক অনুষ্ঠানে তাঁর কণ্ঠে 'আমার বন্ধুরে আগে বলিস সজনী/আমি জন্মের মতো যমুনাতে যাই' এই ভাটিয়ালি গানটি শুনে কবি জসীমউদ্দীন (সং পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের অর্গানাইজার) তাঁর প্রতি খুশি হয়ে তাঁকে দশ টাকা পুরস্কার ও 'সং পাবলিসিটি



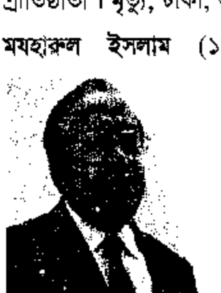
ডিপার্টমেন্টে' গায়কের চাকরি দেন। কলকাতা বেতারের গায়ক হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কণ্ঠ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯৪৩)। কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন। গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে 'ও শ্যাম বন্ধুরে' ও 'রাধে ভাবিলে কি হবে, শ্যাম তোমায় ফাঁকি দিয়েছে' এ দু'খানি গান তাঁর কণ্ঠে রেকর্ডিং হলে খ্যাতি অর্জন। 'সং পাবলিসিটি বিভাগের' চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা বেতারের স্টাফ আর্টিস্ট পদে যোগদান। দাঙ্গার বছর (১৯৪৬) কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন এবং ঢাকা বেতারের নিজস্ব শিল্পী নিযুক্ত। ১৯৬৫-তে পশ্চিম পাকিস্তানে পি.আই.এ. (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজ)-এর আর্টস একাডেমিতে সংগীতশিল্পী হিসেবে যোগদান। ১৯৭১-এর ১৫ মার্চ ছুটি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় আগমন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার প্রতিবাদে ও মুক্তিযুদ্ধের (১৯৭১) সমর্থনে চাকরিতে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর বাংলাদেশ বিমানে সংগীতশিল্পী হিসেবে যোগদান। পল্লীগীতির খ্যাতনামা শিল্পী। 'জ্বালাইলে যে জ্বলে আগুন, নিবানো যে ভীষণ দায়', 'গুন গুনা গুন গান গাহিয়া নীল ভোমরা যায়' প্রভৃতি জনপ্রিয় পল্লীগীতির রচয়িতা, সুরকার ও গায়ক। চলচ্চিত্রের কণ্ঠশিল্পী হিসেবেও সুনাম অর্জন। 'আকাশ আর মাটি', 'যে নদী মরু পথে' ও 'দয়াল মুরশিদ' ছবির সংগীতের কণ্ঠশিল্পী। এদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বাংলা পল্লীগীতিকে সমৃদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মৃত্যু, ৩১, আগস্ট ১৯৯০।

মমতাজ বেগম (১৯২৩-১৯৬৭)॥ জন্ম হাওড়া,



শিবপুর, কলকাতা, ২০ মে ১৯২৩। ভাষা-সংগ্রামী, শিক্ষাবিদ। প্রকৃত নাম কল্যাণী রায়চৌধুরী। বাবা রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায়চৌধুরী কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। মা মাখনমতি দেবী কলকাতা মিউনিসিপালিটি পরিচালিত স্কুলে শিক্ষক। ১৯৩৮-এ মেট্রিক, ১৯৪২-এ বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. পাস। ১৯৫১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড. এবং ১৯৬৩-এ এম.এড. ডিগ্রি লাভ। ১৯৪৩-এ কলকাতায় স্টেট ব্যাংকে যোগদান। আবদুল মানাফের সঙ্গে বিবাহসূত্রে মমতাজ বেগম নামধারণ। ১৯৪৭-এ ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান। ১৯৫১-এ নারায়ণগঞ্জের মর্গ্যান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান। একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রহত্যার পর ২২ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ চাষাড়া মাঠের জনসভায় নেতৃত্বদান। এতে সরকারের রোষানলে পতিত। ২৯ ফেব্রুয়ারি মিথ্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর মুক্তির দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হলে ঢাকা কারাগারে প্রেরণ। এতে আন্দোলন বেগবান হয়। চাষাড়া রেলস্টেশনের কাছে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে ২০ জন আহত হয়। ১ মার্চ শহরের কালিরবাজারে এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হলে সরকারের নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। কারাগার থেকে মুচলেকা দিয়ে মুক্তিলাভে অস্বীকার করলে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। স্বাভাবিকবাবে মুক্তি পেয়ে ১৯৫৩-এ ঢাকা মিউনিসপ্যালিটি স্কুল পরিদর্শক পদে যোগদান। পরে ঢাকায় আনন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয় ও অহমদ বাওয়ানী জুট মিল বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্বপালন। ১৯৬৪-ও দাঙ্গা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। শিক্ষক-আন্দোলনে নেতৃত্বদান। 'শিশুনিকেতন'-এর প্রতিষ্ঠাতা। মৃত্যু, ঢাকা, ৩০ মার্চ ১৯৬৭।

মযহারুল ইসলাম (১৯২৮-২০০৯)॥ জন্ম.



চরনবীপুর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৮। কবি, প্রাবন্ধিক, ফোকলোরবিদ, শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি। পিতা মোহাম্মদ আলী সরকার, মাতা সালেহা খাতুন। স্ত্রী নূরজাহান মযহার। চয়ন ইসলাম এমপি তাঁর পুত্র। তালগাছি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক (১৯৪৫), সিরাজগঞ্জ কলেজ থেকে (১৯৪৭), রাজশাহী কলেজ থেকে বাংলায় বি.এ. অনার্স (১৯৫০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. (১৯৫১), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

'কবি হেয়াত মামুদ' শিরোনামে গবেষণা করে পিএইচডি (১৯৫৮), যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'A History of Folkltale collectios in India and Pakistan' শিরোনামে গবেষণা করে পিএইচডি (১৯৬৩) উপাধি অর্জন। ১৯৫২-এ ঢাকা কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান। ১৯৫৩-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ লাভ। ১৯৫৬-এ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আহ্বানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের ঊর্ধ্বতন প্রভাষক হিসেবে যোগদান। ১৯৫৮-এ রিডার পদে উন্নীত। ১৯৬৪-এ অধ্যাপক পদ লাভ। ১৯৬৭-তে শাহ মখদুম হলের প্রাধ্যক্ষ হন। ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৭২-এর ২২ মার্চ বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান। ১৯৭৪-এর ১৯ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ লাভ। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পরে ১৯৭৫-এর ১৯ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার এবং টানা ৩ বছর কারাবন্দী জীবন যাপন। ১৯৮৪-তে বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি প্রতিষ্ঠা ও সভাপতি পদে অধিষ্ঠান। ১৯৮৭-তে জাতীয় কবিতা পরিষদ গঠন এবং পরে পৃষ্ঠপোষকতা দান। ১৯৮৭-তে স্প্যারো এপারেলস নামে পোশাক নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন। ১৯৮৬-৮৮-তে বিজিএমই-র সহসভাপতি নির্বাচিত। ১৯৯১-এ জাতীয় চার নেতা পরিষদ প্রতিষ্ঠা। ১৯৯১ এবং ১৯৯৬-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন লাভ। বিভিন্ন সময়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লিও জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, তামিলনাড়ুও আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন। কবিতাগ্রন্থ: মাটির ফসল (১৯৫৫), বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি (১৯৭০), আর্তনাদে বিবর্ণ (১৯৭০), যেখানে বাঘের থাবা (১৯৭৮), অপরাহ্ণে বিবস্ত্র প্রাতঃরাশ (১৯৭৯), দুঃসময়ের ছড়া (১৯৮৮), উজানে ফেলার প্রতিধ্বনি (১৯৮৯), সাম্প্রতিক ছড়া (১৯৯৭), রাজবারান্দায় তুমি (১৯৯৮), সন্ত রণে নিরন্তও (২০০৬)। গবেষণাগ্রন্থ: কবি পাগলা কানাই (১৯৫৯), সাহিত্য পথে (১৯৬০), কবি হেয়াত মামুদ (১৯৬১), A History of Folktale Collections in India and Pakistan (১৯৭০), ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠনপাঠন (১৯৬৭), লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস (১৯৭০), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (১৯৭৪), ফোকলোরচর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (১৯৮২), Social Change and Folklore (১৯৮৫), Folklore: The Pulse of the People (১৯৮৪), ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (১৯৯৪), বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য (১৯৯৫), রবীন্দ্রনাথ: কবি সাহিত্যশিল্পী ও কর্মযোগী (১৯৯৬), আঙ্গিকতার আলোকে ফোকলোর (১৯৯৯), বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি (২০০০), রবীন্দ্রনাথ নজরুল ও বাঙালি সংস্কৃতি (২০০৬), জীবন স্বপ্ন ও বাস্তবতার টানাপোড়েন (২০০৭) প্রভৃতি। বাংলা একাডেমী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের নিয়মিত পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি গবেষণামূলক 'ফোকলোর' এবং সৃজনশীল 'মেঘবাহন' পত্রিকা সম্পাদনা। পুরস্কার: বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৭), দাউদ পুরস্কার (১৯৭০)। মৃত্যু. ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ২০০৩।

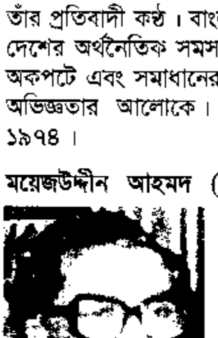
মযহারুল হক (১৯১১-১৯৭৪)॥ জন্ম. সোনাপুর



গ্রাম, নোয়াখালি, ১ জানুয়ারি ১৯১১। শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২-এ ইকনমিকস অ্যান্ড পলিটিকস-এ বি.এ. অনার্স এবং ১৯৩৮-এ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফস-এ এম.এ. পাস। ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাবৃত্তি লাভ। গবেষণাপত্রের নাম ছিল Rural Credit and Rural Indebtedness in Bengal। ১৯৩৯-এর আগস্ট মাসে জগন্নাথ কলেজের অর্থনীতির প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৪০-এর ২৫ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান। ১৯৪৬-এর ১ আগস্ট সিনিয়র লেকচারার পদে উন্নীত। ১৯৪৯-এর মার্চ মাসে বিলাত গমন। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ East India Company's Land Policy and Management in Bengal শিরোনামে গবেষণা

করে ১৯৫২-তে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ১৯৫৪-র ২০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের রিডার পদে উন্নীত। ১৯৫৪-১৯৫৬-এ বিভাগীয় প্রধান, ১৯৫৪-১৯৬২-এ ফজলুল হক হল-এর প্রভোস্ট, ১৯৪৮-এ প্রোক্টর এবং ১৯৪৯-১৯৬২-এ ইউওটিসি (UOTC)-র কমান্ডডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন। 'ইস্ট বেঙ্গল' সিভিল সার্ভিস স্টাডিজের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থার পরিচালনা পরিষদের সদস্য, ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান, পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের কৃষিঋণ বিভাগের উপদেষ্টা, পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটির উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য, পাকিস্তান অর্থনীতি সমিতির সভাপতি এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার প্রতিনিধিত্ব। একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের টেনিস টুর্নামেন্টে বিজয়ী। ১৯৩৩-১৯৩৪-এ সলিমুল্লাহ হল ক্রীড়া সমিতির সম্পাদক এবং ১৯৩৩-এ হল-সংসদের ম্যাগাজিন সম্পাদক। অধ্যাপনা জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের সভাপতি। শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে ছিলেন আপসহীন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা বাঙালিদের শোষণের বিরুদ্ধে উচ্চকিত ছিল তাঁর প্রতিবাদী কন্ঠ। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে তুলে ধরেছেন অকপটে এবং সমাধানের নির্দেশ করেছেন বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে। মৃত্যু. ঢাকা, ২২ মে ১৯৭৪।

ময়েজউদ্দীন আহমদ (১৯৩৩-১৯৮৪)॥ জন্ম.



বড়হরা গ্রাম, কালিগঞ্জ, গাজীপুর, ১ মার্চ ১৯৩৩। রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪-তে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. এবং ১৯৫৫-তে এল.এল.বি. পাস। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা। ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক (১৯৭০-১৯৭২), আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য (১৯৭০-১৯৭৫, ১৯৭৭-১৯৭৮), পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০), স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ (১৯৭১), ঢাকা জেলা (উত্তর) আওয়ামী লীগের সভাপতি (১৯৭২-১৯৭৫), জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত (৭ মার্চ ১৯৭৩), বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতির ভাইস-প্রেসিডেন্ট (১৯৭৭-১৯৮৪) এবং বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৮৪-র ২৭ সেপ্টেম্বরের হরতালে সমর্থনে কালিগঞ্জে একটি মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে স্থানীয় নিজ দলীয় অফিসে গমনকালে দুষ্কৃতিকারীর হাতে নিহত। মৃত্যু. ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪।

মরিটস হিবন্টারনিটস (১৮৬৩-১৯৩৭)॥ জন্ম. অস্ট্রিয়া রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত হর্ন শহরে, ২৩ ডিসেম্বর ১৮৬৩। ভারততত্ত্ববিদ, অধ্যাপক, গবেষক ও মানবতাবাদী। শৈশবেই বিরল মেধা ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন প্রাক-বিদ্যালয় পূর্বেই হিব্রুর ন্যায় প্রাচীন ও দুরূহ ভাষা পড়তে ও লিখতে শিখে। ১৮৮০-তে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ভাষাতত্ত্ব ও দর্শন অধ্যয়নের জন্য। এ সময়ে গেঅর্গ ব্যুলর ফ্রীডরিশ ম্যুলর, অয়গেন হুলটশ প্রমুখ বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদের অনুপ্রেরণায় ভারতবিদ্যার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট। পাঠ্যসূচীর বাইরে কেবল নিজের কৌতূহল ও উৎসাহে সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন। সংস্কৃত বিদ্যাচর্চাই সে সময় থেকে তাঁর কৌতূহল ও চর্চার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৮৬-তে তিনি জার্মান ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় বিবাহরীতি ও ইন্দো-য়োরোপীয় জনগোষ্ঠীর বিবাহপদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে যে গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করেন তার জন্য পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। এই গবেষণাসন্দর্ভ ১৮৯২-তে ভিয়েনা বিজ্ঞান একাডেমি পত্রিকায় প্রকাশ। এ সময়ে অক্সফোর্ড থেকে জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃতবেত্তা পণ্ডিত ও ভাষাতাত্ত্বিক ফ্রিডরিশ মাক্সম্যুলর তাঁর বন্ধু গেঅর্গ বুলরকে অনুরোধ করেন একজন যোগ্য সহকারী খুঁজে দেওয়ার জন্য। ব্যুলর তখন হিবন্টারনিটসকে মনোনীত করে ম্যাক্সম্যুলরের নিকট পাঠিয়ে দেন। ১৮৮৮-তে হিবন্টারনিটস

অক্সফোর্ডে আসেন এবং ১৮৯২ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে গুরুকে সাহায্য করে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ সম্পূর্ণ করে তোলেন। অক্সফোর্ড আগমনের উদ্দেশ্য সফল হলেও তিনি সংস্কৃতচর্চার সুবিধের জন্য সেখানেই থেকে যান। এ সময়ে (১৮৯২) তিনি বিবাহ করেন। সংসার চালাবার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চাকরি তাঁকে করতে হয়েছে- স্কুলমাস্টারি, গৃহশিক্ষকতা, ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট লাইব্রেরিতে অস্থায়ী গ্রন্থাগারিক, কখনো-বা জার্মান ভাষার শিক্ষক। ১৮৯৫-তে বিখ্যাত বডলিন লাইব্রেরিতে রক্ষিত সংস্কৃত পুস্তকাদির তালিকা প্রণয়ন করতে শুরু করেন, তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ পরে আরেকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক আর্থার ব্যারিডেল কিথ সমাপ্ত করেন; পরে এই গ্রন্থপঞ্জি উভয়ের নামেই ১৯০৫-এ প্রকাশিত। তিনি লন্ডনে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত পুঁথিসমূহের তালিকা প্রস্তুত করে ১৯০২-এ প্রকাশ করেন। ১৮৯৯ পর্যন্ত অক্সফোর্ডে বাস করার পর সাংসারিক কৃচ্ছ্রতার জন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হয়। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে (প্রাগ এখন চেকোস্লোভাকিয়ায় হলেও তখন অস্ট্রিয়া রাজ্যে ছিল) আর্য-ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে প্রভাষকের পদ লাভ করে অক্সফোর্ড ত্যাগ। ১৯০২-এ তিনি সহকারী অধ্যাপক এবং ১৯১১-তে প্রধান অধ্যাপকের মর্যাদা লাভ। ইতোমধ্যে ১৯২১-এ রবীন্দ্রনাথ যখন প্রাগ সফরে যান তখন হিন্টারনিটস প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের ডিন। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তিনি ১৯২২-এর ডিসেম্বর মাসে পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে বিশ্বভারতীতে আসেন এক বছরের জন্য (১৯২৩-এর অক্টোবর পর্যন্ত)। তাঁর ভারতবাস তাঁর নিজের জন্য ও ভারতীয় বিদ্বৎসমাজের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। পরবর্তীকালে পুনে শহরে অবস্থিত 'ভাণ্ডারকর ও ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট' স্থাপনে তাঁর সহযোগিতা, পরিকল্পনা ও কর্মদক্ষতা বিশেষ অবদান রেখেছিল। বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার অবকাশে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন, বিষয় সর্বত্রই ভারতবিদ্যা। ১৯২৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সর্বমোট ছটি 'রিডারশিপ লেকচার' পান। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল: বেদেরকাল, প্রাচীন ভারতের ধর্মসাহিত্য, প্রাচীন ভারতের গাথা সাহিত্য, ভারতীয় সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং জ্যোতিষ। এই বক্তৃতামালা পরে ১৯২৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Some problems of Indian Literature নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ১৯২৩-এ দেশে ফিরে অধ্যাপনার পূর্বতন পদে যোগদান এবং ১৯৩৪ পর্যন্ত কর্মরত। এখান থেকে 'আর্খিভ ওরিয়েন্টালনি' নামে ভারতচর্চাবিষয়ক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের (১৯৩৪) পরও তাঁর ভারতচর্চা অব্যাহত ছিল। মরিটস হিন্টারনিটসের (Morz Winternitz) গ্রন্থ ও গবেষণা-প্রবন্ধের সংখ্যা পাঁচ শ'রও বেশি। তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থটি প্রথমে জর্মন ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত (১৯০৫-১৯২২) হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধক্রমে তিনি এর ইংরেজি অনুবাদ প্রস্তুত করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা যথাক্রমে ১৯২৭, ১৯৩৩ ও ১৯৫৯-এ প্রকাশিত। মৃত্যু. হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাগ শহরে, ৯ জানুয়ারি ১৯৩৭।

মলয়ঘোষ দস্তিদার (?-১৯৮২)॥ জন্ম. নয়াপাড়া গ্রাম, চট্টগ্রাম। কণ্ঠসংগীতশিল্পী, গীতিকার ও সুরকার। পিতার উৎসাহে শৈশবকাল থেকে সংগীতচর্চা শুরু। গঙ্গাপদ বাবু উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রথম গুরু। তারপর ধ্যান সেন, চুনু বাবু ও সমীরণ বাবুর কাছে সংগীতে তালিম গ্রহণ। তৎকালীন বিপ্লবী গায়ক তেজেন বাবুর অনুপ্রেরণায় ইংরেজ বিদ্বেষী গান গেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ। কিছুকালের জন্য কারাবরণ। ১৯৪০-এ চট্টগ্রামের আর্য সংগীত সমিতি আয়োজিত সংগীত প্রতিযোগিতায় ভজন ও আধুনিক গানে প্রথম স্থানের অধিকারী। ১৯৪১-এ অল ইন্ডিয়া রেডিও ঢাকা কেন্দ্রে কণ্ঠদান। কলম্বিয়া গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি তাঁর লেখা ও সুরারোপিত কিছু গানের রেকর্ড বের করে। একাধারে গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় প্রথম গান রচয়িতা। তখন থেকেই চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের যাত্রারম্ভ। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র ও ১৯৬২-তে সঙ্কেত সাংস্কৃতি গোষ্ঠী কর্তৃক 'সঙ্কেত পদকে' ভূষিত। মৃত্যু. ১৯৮২।

মশিউর রহমান (১৯২০-১৯৭১)॥ জন্ম. সিংহঝুলি গ্রাম, যশোর, ১৯২০। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। ১৯৪৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে বি.এল. ডিগ্রি লাভ। যশোর জেলা



আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু। ১৯৪৫-এ মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪৬-এ বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে যশোর জেলা মুসলিম লীগের প্রচার অভিযান পরিচালনা। ১৯৪৮-এ যশোর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত। তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটায় ১৯৪৯-এ চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ। এরপর আওয়ামী লীগে (১৯৪৯) যোগদান। ১৯৫২-তে যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি নিযুক্ত। ১৯৪৮-এর মার্চ মাসের এবং ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারি মাসের ভাষা-আন্দোলনে যশোরে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। এজন্য কারা নির্যাতন ভোগ। ১৯৫৩-১৯৬৬ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। ১৯৫৪-র মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে যশোর দক্ষিণ-পশ্চিম নির্বাচনী এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৬-র ১৮ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেস দলীয় পূর্ববঙ্গ কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত। প্রচার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (১৯৫৬-১৯৫৭), বিচার ও সংসদবিষয়ক (১৯৫৭-১৯৫৮) এবং রাজস্ব ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (১৯৫৮) বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন। ১৯৫৮-তে সামরিক সরকার কর্তৃক গ্রেফতার। প্রায় ছয় মাস কারা ভোগের পর জামিনে মুক্তিলাভ। ১৯৬৪-র ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীনে আওয়ামী লীগ (১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর সামরিক সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা) পুনরুজ্জীবিত। আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনে শেখ মুজিবুর রহমানের সহযোগী। ১৯৬৭-র ৩০ এপ্রিল পিডিএম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট) গঠিত হয়। পিডিএম-কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হলে পিডিএম পন্থি আওয়ামী লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত। ১৯৬৯-এ পিডিএম পন্থি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে পুনরায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করে মূল আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৭০-এর ২৬ জুন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে যশোর-৩ নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ তারিখে পাকিস্তানি বাহিনী তোপ দাগিয়ে যশোরে তাঁর বাড়ি ধ্বংস করে এবং তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। সামরিক জান্তার কর্মকর্তারা তাঁকে পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার পক্ষে এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে বার বার চাপ প্রয়োগ করে। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি। পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বাঙালি জাতীয়বাদী নেতা হিসেবে খ্যাত। এদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু. যশোর, ২৫ এপ্রিল ১৯৭১।

মশিহুর রহমান (১৯২৪-১৯৭৯)॥ জন্ম. খগাখড়ি



বাড়ি, ডিমলা, রংপুর, ৯ জুলাই ১৯২৪। রাজনীতিবিদ। জোতদার পরিবারে জন্ম। পিতা ওসমান গণি। মেট্রিক পাস করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি। ইংরেজ অধ্যক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় মেডিক্যাল স্কুলের পাঠ ত্যাগ। মাত্র ২৯ বছর বয়সে রংপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৬০ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত। রাজনৈতিক জীবনের শুরু মুসলিম লীগের মাধ্যমে। এক সময় পাকিস্তান মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনের বিরোধিতা। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (২৫ জুলাই ১৯৫৭) যোগদান এবং পার্টির অন্যতম সংগঠক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত। মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় ১৯৬২-র ২৮ এপ্রিল রংপুর-৫ আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। পরিষদে ছিলেন বিরোধী দলের ডেপুটি লিডার। এই দায়িত্বের মধ্যে থাকাকালে আইয়ুব সরকার কর্তৃক গ্রেফতার (১৯৬৩)। ১৯৬৫-র ২১ মার্চ মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে রংপুর ৫ আসন

থেকে পুনরায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত আইয়ুব-বিরোধী গণ-আন্দোলন চলাকালে গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা' দাবির সমর্থনে ১৯৬৯-এর ১২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য পদে ইস্তফা। ষাটের দশকের মধ্যভাগে (১৯৬৬) শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচীর বিরোধিতা। দেশে সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা। পাঞ্জাবের টোবাটেক সিং-এ ন্যাপের এক কৃষক সম্মেলনে (২৩ মার্চ, ১৯৭০) দেশে বলবৎকৃত সামরিক শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করে বক্তৃতা করার দায়ে গ্রেফতার। সামরিক আদালত কর্তৃক ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান সামরিক আইন পরিচালক জেনারেল ইয়াহিয়া খান দণ্ড মওকুফ করলে জেল থেকে মুক্তিলাভ (১৩ জুলাই, ১৯৭০)। ১৯৭০-এর ২ আগস্ট ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (পিকিংপন্থি) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। একই বছর ৭ ডিসেম্বর রংপুর জেলা থেকে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কাছে পরাজিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে প্রথমে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ। পরে সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানি বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা। স্বাধীনতার পর দালাল আইনে গ্রেফতার। ১৯৭৪-এর মার্চে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মুক্তিলাভ। একই বছর জুন মাসে পুনরায় গ্রেফতার। ১৯৭৫-এর ২৪ আগস্ট মুক্তি পান। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মৃত্যুর পর ১৯৭৭-এ বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি নির্বাচিত। পরে দলসহ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে যোগদান (১ মে ১৯৭৮) এবং ১৯৭৮-এর ১ সেপ্টেম্বর সামরিক প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল (বিএনপি) গঠিত হলে তাতে যোগদান: ১৯৭৯-র ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত। মশিহুর রহমান 'যাদু মিয়া' নামে সমধিক পরিচিত। দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান এবং বাগ্মী হিসেবে খ্যাতি ছিল। মৃত্যু. পি.জি. হাসপাতাল, ঢাকা, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত রোগে, ১৩ মার্চ ১৯৭৯

মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী (১৯১৮-১৯৮৪)॥ জন্ম. সুনামগঞ্জ, ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮: মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। ১৯৩৪-এ সিলেট সরকারি হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস, ১৯৩৮-এ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ এবং ভূগোলে মাস্টার্স ডিগ্রির প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এই সময় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং সাফল্য অর্জন। কিন্তু ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ না দিয়ে ১৯৩৯-এর জুলাই মাসে ব্রিটিশ ভারতীয় সামরিক একাডেমি দেরাদুন থেকে সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৪০-এর ৫ অক্টোবর রাজকীয় কমিশন লাভ। ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ক্যাপ্টেন এবং ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ২৩ বছর বয়সে তদানীন্তন ব্রিটিশ বাহিনীর সর্বকনিষ্ঠ মেজর হয়ে ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মার রণাঙ্গনে তাঁর বাহিনীকে ১৫ কোরের অধীনে সমাবেশ ও পরিচালনা এবং এই যুদ্ধাঞ্চলে তিনি ছিলেন অশ্বেতাঙ্গ অধিনায়কদের মধ্যে অন্যতম। আই.সি.এস.-এ যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ায় ১৯৪৬-এ ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসের জন্য মনোনীত। কিন্তু সামরিক বাহিনীতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সিনিয়র অফিসার কোর্সে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অধীনে উত্তীর্ণ এবং 'সিলেকশন র‍্যাংক' এ লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে মনোনীত। ১৯৪৭-এ অন্তর্বর্তীকালীন ভারত সরকারের কূটনৈতিক পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত; কিন্তু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। ১৯৪৭-এর ৭ অক্টোবর পাকিস্তান আগমনের পরদিনই লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গঠনরত বিভিন্ন বিভাগের কার্যনীতির সমন্বয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অধীনস্থ বিভাগের অফিসার নিয়োগ, পদোন্নতি, সংখ্যা নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে দায়িত্ব পালন। ১৯৪৮-এ কোয়েটা স্টাফ কলেজে স্টাফ কোর্সে যোগদান। স্টাফ কলেজ থেকে পি.এস.সি. ডিগ্রি লাভের পর ১৯৪৯-এর জানুয়ারি মাসে সেনাবাহিনীর তদানীন্তন চিফ অব দি জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল হাটনের সহকারী নিযুক্ত। পরবর্তী



পর্যায়ে এসিস্ট্যান্ট অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল পদে অফিসার পদপ্রার্থী নির্বাচন-সম্পর্কীয় বিষয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত। একবছর এ দায়িত্ব পালন করার পর রাইফেল কোম্পানির পরিচালকরূপে চতুর্দশ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের নবম ব্যাটেলিয়নে যোগদান। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস (ই.পি.আর.) এর অতিরিক্ত কমান্ডেন্ট হিসেবে পূর্ববাংলা সরকারের অধীনে নিযুক্ত। তৎকর্তৃক ই.পি.আর-এর অবাঙালিদের নিয়োগ বন্ধ এবং প্রথমবারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ই.পি.আর.-এ নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ। ই.পি.আর.-এর অস্থায়ী নিয়োগ থেকে ফিরে এসে জেনারেল স্টাফ অফিসার গ্রেড-১ রূপে নিয়োজিত। ১৯৫৬-তে কর্নেল পদে উন্নীত। জেনারেল হেড কোয়ার্টর-এর জেনারেল স্টাফ ও মিলিটারি অপারেশনের ডেপুটি ডাইরেক্টরের দায়িত্ব পালন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ দশ বছর এই পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৬৭-র ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে কর্নেল হিসেবে অবসর গ্রহণ। ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগদান। একই বছরের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত এবং তাঁকে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ১৯৭১-এর ২৬ ডিসেম্বর জেনারেল পদে উন্নীত। ১৯৭২-এর ৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল পদ বিলুপ্ত হওয়ায় সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ। এ বছর ১২ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের জাহাজ চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌ ও বিমান চলাচল মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত। ১২ এপ্রিল মন্ত্রী পদে পুনঃনিয়োগের পর আগের দায়িত্ব ছাড়াও ডাক, তার, টেলিফোন ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ। ১৯৭৪-এর ১ মে মন্ত্রিসভা থেকে অব্যাহতি লাভ। ১৯৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী বিল গৃহীত হলে এবং এ সংশোধনীর ফলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশে সংসদীয় সরকারের স্থলে এক দলীয় (বাকশাল) রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার চালু হলে, এ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ ও সংসদ সদস্য থেকে পদত্যাগ। ১৯৭৫-এর ২৯ আগস্ট দেশে সামরিক শাসন চলাকালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ এবং ৩ নভেম্বর পদত্যাগ। ১৯৭৬-এর ৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় জনতা পার্টি গঠন। ১৯৭৮-এর ৩ জুন অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক ঐক্য জোটের প্রার্থীরূপে এবং ১৯৮১-র ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক কমিটির প্রার্থী রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উভয় নির্বাচনেই পরাজয়বরণ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি অবিচল আস্থাশীল একজন মহান নেতা হিসেবে খ্যাত। জেনারেল ওসামনী একজন সুদক্ষ সেনানায়ক। কখনো আপস না করে নিজের বিশ্বাসে অবিচল থেকেছেন। বাঙালি সৈনিকদের জন্য পদ সংরক্ষণ, পাকিস্তান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মার্চ-সংগীতরূপে কাজী নজরুল ইসলামের 'চল্ চল্ চল্, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটির সরকারি অনুমোদন আদায় তাঁর চাকরি জীবনের প্রধান কীর্তি। এছাড়া পাকিস্তান সামরিক বাদ্যযন্ত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্যপুষ্প ভরা' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' বাংলা গানের প্রচলন এবং সৈনিকদের দ্বারা ব্রতচারী নৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাঁর প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। এজন্য তাঁকে 'ফাদার অব দি বেঙ্গল রেজিমেন্ট' হিসেবে সম্মান করা হয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি চিরকুমার ও তীক্ষ্ণ মেধা ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মৃত্যু. লন্ডন, ক্যান্সার রোগে, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪।

মহসীন আলী দেওয়ান (১৯৩৯-১৯৭১)॥ জন্ম. ভুটিয়াপাড়া গ্রাম, জয়পুর হাট, ১ জানুয়ারি ১৯৩৯। শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। বগুড়া আজিজুল হক কলেজ থেকে বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ছাত্রজীবনে বগুড়া আজিজুল হক কলেজের বাংলার প্রভাষক, বগুড়া শেরপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। সাপ্তাহিক 'বগুড়া বুলেটিন' ও সান্ধ্য দৈনিক 'জনমত' এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক। বগুড়া প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। গাল্পিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। 'গল্পের

'চিড়িয়াখানা' নামে ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশিত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন নেতা। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ৩ জুন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে বগুড়া শহর থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (১৯৪৮-১৯৭১)॥ জন্ম. রহিমগঞ্জ গ্রাম, বাবুগঞ্জ থানা, বরিশাল, ১৯৪৮। বীরশ্রেষ্ঠ। ১৯৬৬-তে আই.এসসি. পাস। ঐ বছরই বিমান বাহিনীতে যোগদানেরচেষ্টা করে চোখের অসুবিধার জন্য ব্যর্থ হন।



১৯৬৭-তে পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে ক্যাডেট হিসেবে যোগদান এবং ১৯৬৮-র ২ জুন ইঞ্জিনিয়ার্স কোরে কমিশন লাভ। ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানে ১৭৩ নম্বর ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ানে কর্তব্যরত ছিলেন। ৩ জুলাই পাকিস্তানে আটকে পড়া আরো তিনজন অফিসারসহ পলায়ন। পরে পশ্চিবঙ্গের মালদহ জেলার মেহেদীপুরে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে যোগদান। বিভিন্ন রণাঙ্গনে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনের কারণে তাঁকে রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ দখলের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১০ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর, লেফটেন্যান্ট কাইয়ুম, লেফটেন্যান্ট আউয়াল ও পঞ্চাশ জনের মতো মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের পশ্চিমে বারঘরিয়া এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৪ ডিসেম্বর ভোরে মাত্র ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বারঘরিয়া এলাকা থেকে ৩/৪টি দেশি নৌকায় করে রেহাইচর এলাকা দিয়ে মহানন্দা নদী অতিক্রম করেন। নদী অতিক্রম করার পর উত্তর দিক থেকে একটি একটি করে প্রত্যেকটি ট্রেঞ্চের শত্রু খতম করে দক্ষিণে এগুতে থাকেন। এমনভাবে আক্রমণ পরিকল্পনা করেছিলেন যে উত্তর থেকে শত্রু নিপাত করার সময় দক্ষিণ দিক থেকে শত্রু কোনোকিছু আঁচ করতে না পারে। এভাবে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটির পর একটি ট্রেঞ্চ দখল করে এগিয়ে চলেন। জয় যখন সুনিশ্চিত তখন ঘটে বিপর্যয়। হঠাৎ বাঁধের ওপর থেকে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সের ৮/১০ জন সৈনিক দৌড়ে চর এলাকায় এসে যোগ দেয়। এর পরই শুরু হয় পাকিস্তান বাহিনীর প্রবল আক্রমণ, সঙ্গে অবিরাম ধারায় গুলিবর্ষণ। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর জীবনের পরোয়া না করে সামনে এগিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের কয়েকজন সহযোদ্ধা মহানন্দ নদী সাঁতরিয়ে এসে জানায় যে ক্যাপ্টেনের (মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর) কপালে গুলি লেগেছে। শুরু হয় দুই পক্ষের মরণপণ যুদ্ধ। ঐদিনই বিকেলে শত্রুর অবস্থানের ওপর এমন হামলা চালানো হয় যে পাকিস্তানি সৈন্যরা যুদ্ধাবস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। চরদখলের পর ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ দেহ উদ্ধার করে সোনা মসজিদের আঙিনায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। স্বাধীনতার ঊষালগ্নে বিজয় সুনিশ্চিত করেই তিনি শহীদ হয়েছিলেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে ছুটে এসেছিলেন পাকিস্তানের দুর্গম এলাকা অতিক্রম করে, পালিয়ে এবং প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। তাঁর মতো বীর সন্তান-প্রসবিনী এই দেশ তাই মাত্র নয় মাস যুদ্ধের পর স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলোয় স্নাত হয়েছিল। তাঁকে দিয়েছে বীরশ্রেষ্ঠের সম্মান। মৃত্যু. চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মহীউদ্দীন (১৯০৬-১৯৭৫)॥ জন্ম. খড়িয়া খালপাড় গ্রাম, দোহার ঢাকা, জানুয়ারি ১৯০৬। গ্রামের পাঠশালায় দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। আট বছর বয়সে পিতার মৃত্যু ঘটলে জীবিকা অর্জনের জন্য কলকাতায় গমন (১৯১৪)। কর্মজীবন



শুরু হয় মির্জাপুরের এক পুস্তক বাঁধাই কারখানায়। কম্পোজ ও প্রুফ রিডিং শিখে বিভিন্ন প্রেসে কর্ম সম্পাদন। নিজ চেষ্টায় ইংরেজি ও বাংলায় দক্ষতা অর্জন। দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হন। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) যোগদান। ১৯২৫-এ প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফফর আহমদের সান্নিধ্যে এসে সাম্যবাদে দীক্ষা গ্রহণ। ১৯২৮-এ খিদিরপুর জাহাজি শ্রমিকদের আন্দোলনে যোগদান। মাসিক জাহাজি' (১৯২৮) ও সাপ্তাহিক 'নাবিক' (১৯৩১) পত্রিকা সম্পাদনা। ১৯৩৬-এ ইন্ডিয়ান

কোয়ার্টার্স মাস্টার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারি নির্বাচিত। ১৯৪০-এ তৎকর্তৃক ইন্ডিয়ান সেলার্স ইউনিয়ন গঠন এবং বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহসভাপতি নির্বাচিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন এবং স্থায়ীভাবে বাস। মাসিক 'অন্ন চাই, আলো চাই' (১৯৪৯) পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা। 'ইস্ট পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবারের' রিসার্চ অফিসার (১৯৫৪-১৯৫৭)। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৫৬-র জুন মাসে অক্সফোর্ডের খ্রিস্টচার্চ কলেজে অনুষ্ঠিত 'Study Conference on Human Performance' সম্মেলনে যোগদান। আদমজী জুট ওয়ার্কস ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট (১৯৫৪-১৯৫৫)। একজন সাম্যবাদী কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ। নির্যাতিত, বুভুক্ষু ও দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের মুক্তির বাণী তাঁর কবিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত। পথের গান (১৯৩৬), স্বপ্ন সংঘাত যুদ্ধ বিপ্লব (১৯৪২), অন্ধকারে ষড়যন্ত্র (১৯৪২), এলো বিপ্লব (১৯৪২), দিগন্তের পথে একা (১৯৬০), গরীবের পাঁচালী (১৯৬২) প্রভৃতি তাঁর কবিতাগ্রন্থ। নূতন সূর্য (১৯৪৬) আলোর পিপাসা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস। নিরুদ্দেশের যাত্রী (১৯৫৩) গল্প-সংকলন। রক্তাক্ত পৃথিবী (১৯৪২) নাটক। প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস (১৯৭০), 'জরথুস্ত্র বলেন' (১৯৭২), আধুনিক জগৎ মানবজ্ঞান (১৯৭৩), বিবর্তন (১৯৭৫) প্রভৃতি অনূদিত গ্রন্থ। Under The Shadow of an Anarchic World (১৯৪২), The Word (১৯৬৫), The Poem of the Padma and the Prose of the Thems তাঁর ইংরেজি কবিতাগ্রন্থ। তাঁর 'কামিনীকাঞ্চন' উপন্যাস এবং 'অন্ন চাই আলো চাই' পত্রিকা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। বঞ্চিত ও শোষিত জনগণকে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর সাহিত্য-সাধনার মূল লক্ষ্য। কাজী নজরুল ইসলামের মতাদর্শের অনুসারী কবি হিসেবে পরিচিত। সাহিত্যকর্মের জন্য প্রেসিডেন্টের 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' পুরস্কার লাভ (১৯৬২)। মৃত্যু. ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫।

মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী (১৮৫৫-১৯৩২)। জন্ম. কালীকচ্ছ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নভেম্বর ১৮৫৫। চিকিৎসক, দেশকর্মী ও ব্রাহ্মসাধক। পিতা সাধকপুরুষ আনন্দ স্বামী সর্বধর্ম সমন্বয়



মতাদর্শের প্রবর্তক। এন্ট্রান্স (১৮৭১) ও ঢাকা কলেজ থেকে এফএ (১৮৭৩) পাশ করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পাঁচ বছর পড়াশুনা। পিতার সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদে স্বগৃহে ফিরে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা শুরু। অল্প সময়ে যশলাভ। কলকাতা থাকাকালে (১৮৭২-৬২) ছাপাখানার কালি, কাপড়ের কল, দেশলাই কল নির্মাণে মনোনিবেশ। হিন্দুমেলায় নিজ কারখানায় তৈরি কাপড় ও দেশলাই প্রদর্শনী করে প্রশংসা লাভ। কালীকচ্ছে প্রায় আট বিঘা জঙ্গল পরিষ্কার করে লোহার কারখানা স্থাপন (১৮৮৮)। দেশলাই কাঠি ও বাক্স তৈরির কারখানা স্থাপন; এই আবিষ্কৃত কল নিয়ে দেশলাই তৈরির কারখানা বহু স্থানে স্থাপন। নিজ বাড়িতে ঝিনুক ও নারকেল মালার বোতাম তৈরির কারখানা স্থাপন। স্বগৃহে চরকায় বোনা মোটা কাপড় পরিধান। এইসব কার্য ও স্বদেশী প্রচার-উদ্যোগ দেখার জন্য অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখের কালীকচ্ছে আগমন (১৯০৬)। বিপিন পাল কর্তৃক তাঁকে 'বাংলার তলস্তয়' আখ্যাদান। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কালীকচ্ছে নেতৃত্ব গ্রহণ। চাঁদপুরে ত্রিপুরা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে (১৯০৮) সভাপতি। তাঁর গৃহ স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র। স্বদেশী আন্দোলনে পুত্র ডা. বিবেক নন্দীর পিকেটিং ও স্বদেশী আদর্শ প্রচার। মানিকতলা বোমা মামলায় (১৯০৮) অভিযুক্ত হয়ে কারাবন্দী অবস্থায় পুত্র বিপ্লবী অশোক নন্দীর যক্ষারোগে মৃত্যু। পল্লী উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, চরকা-খদ্দর প্রচার, নৈশ স্কুল ও দেশলাই কারখানা পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্থাপিত 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠান'-এর প্রথম সভাপতি। সাধক পিতার কীর্তিকে অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে সর্বধর্ম যোগমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা এবং মণ্ডলীর নামে আনন্দধামের সমুদয় সম্পত্তি দান। সমাজ ও আত্মীয়স্বজন-পরিত্যক্ত বহু নারী তাঁর বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত। সমাজসেবী ও দেশব্রতী। মৃত্যু. জুন, ১৯৩২।

মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৫৮-১৯৪৪)॥ জন্ম. বিটগর গ্রাম, নবীনগর, কুমিল্লা, ডিসেম্বর ১৮৫৮। দানবীর। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। অন্যের বাসায় পাচকের কাজ করে কুমিল্লা জেলা স্কুলে অধ্যয়ন। স্কুলের পাঠ ত্যাগ করে সামান্য পুঁজি নিয়ে কুমিল্লা শহরে একটি মুদির দোকান খোলেন। কঠোর পরিশ্রম করে ব্যবসায়ে পসার ঘটিয়ে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন। সে অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়। পিতার নামে কুমিল্লা শহরে ঈশ্বর পাঠশালা (হাইস্কুল) ও মাতার নামে রামমালা ছাত্রাবাস স্থাপন। নিবেদিতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ও তৎকর্তৃক স্থাপিত। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঠশালা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা। মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি, পত্র-পত্রিকা ও পাণ্ডুলিপিতে সমৃদ্ধ কুমিল্লা রামমালা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যানুরাগের এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন। কাশীতে রামমালা ধর্মশালা, হরসুন্দরী ধর্মশালা ও সীতাকুণ্ডে গিরিশ ধর্মশালা স্থাপন করে ও গয়ায় ভারত সেবাশ্রমের জন্য ভূমিদান করে ধর্মানুরাগের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন। বিজনী নদীতে লোহার পুল নির্মাণ করে জনসেবার আর এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন। দরিদ্রদের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠা করেন হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্র। ঢাকার পাটুয়াটুলিতে স্থাপন করেন এম.ভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথ ঔষধালয়। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর ব্যবসায়ে অর্জিত কোটি টাকার সম্পত্তি জনহিতকর কার্যে দান। ব্যবসায় বাণিজ্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা। প্রকাশিত গ্রন্থঃ ব্যবসায়ী, দানবিধি, ঋণবিধি, পারিবারিক চিকিৎসা, স্ত্রীরোগ চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথিক ওলাওঠা চিকিৎসা, পারিবারিক ভেষজতত্ত্ব। দানবীর ও কর্মবীর হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন। মৃত্যু. ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪।



মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)॥ জন্ম. কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্তী সাগরদাঁড়ী গ্রাম, যশোর, ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪। কবি ও নাট্যকার। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতা দেওয়ানি আদালতের একজন আইনজীবী। মাতা জাহ্নবী দেবী। কায়স্থ জমিদার পরিবারের জন্ম। সাগরদাঁড়ী পাঠশালার পাঠ শেষ করে ১৮৩৩-এ কলকাতার হিন্দু কলেজ (১৮১৭)-এর জুনিয়র স্কুলের সর্বনিম্ন শ্রেণিতে ভর্তি। ১৮৪১-এ এই কলেজের সিনিয়র বিভাগে প্রবেশ। এ সময়ে পাশ্চাত্যের ভাব ও আদর্শের প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। নারী শিক্ষার উপর ইংরেজিতে কবিতা রচনা করে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'লিটারারি গ্রামার', 'ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট', 'লিটারারি ব্লসম কমেট' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ। তাঁর অন্তরে হোমার, ভার্জিল, ওবিদ, দান্তে, টাসো ও মিলটনের মতো মহাকবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। ইংল্যান্ডে গিয়ে ইংরেজিতে কাব্যচর্চা করলে তাঁর এই আশা ফলবতী হবে বলে মনে করে সেখানে যাবার জন্য ব্যাকুল হন। বিলেতে যাবার সুবিধে হবে এ আশায় ১৮৪৩-এর ৯ ফেব্রুয়ারি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ। এদিন থেকে তাঁর নামের আগে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে অচিরেই মধুসূদনের বিলেত গমনের সুবিধে হলো না। ধর্মান্তরিত হওয়ার দরুন হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত হন (১৮৪৩)। বিশপস কলেজে ভর্তি। এখানে গ্রিক ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ফলে পিতা ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পিতা অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিলে কলকাতা ত্যাগ করে ভাগ্য অন্বেষণে মাদ্রাজ গমন (১৮৪৮)। সেখানে এক অনাথ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগদান। ১৮৫২-তে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইস্কুল বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি লাভ। সেখানকার দৈনিক পত্রিকা 'স্পেকটেটর' এর সহকারী সম্পাদক পদেও দায়িত্ব পালন। কিছুদিন মাদ্রাজের 'হিন্দু ক্রোনিকল' পত্রিকা সম্পাদনা। মাদ্রাজে প্রবাসকালে হিব্রু, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়া, তামিল ও তেলেগু ভাষা শিক্ষা। 'টিমোথি পেনপোয়েম' ছদ্মনামে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখে 'মাদ্রাজ সার্কুলার',



'স্পেকটেটর', 'হিন্দু ক্রোনিকল' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ। এছাড়া 'ক্যাপটিভ লেডি' (১৮৪৯) কাব্য রচনা। মাদ্রাজে বাসকালে রেবেকা টমসন নাম্নী এক ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ (১৮৪৮)। পরে হেনরিয়েটা (মাদ্রাজ স্কুলের মধুসূদনের এক সহকর্মীর কন্যা) নাম্নী অন্য এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৮৫৬)। পিতামাতার মৃত্যুর পর মাদ্রাজ ত্যাগ করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন (১৮৫৬)। কলকাতা পুলিশ কোর্টে প্রথমে কেরানিগিরি, পরে দোভাষীর চাকরি গ্রহণ। এ সময়ে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আগ্রহ জাগে। এতোকাল ইংরেজি ভাষাচর্চা করে এসেছিলেন, এবার বাংলা ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ। রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬) 'রত্নবলী' (১৮৫৮) নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে পাইকপাড়ার (কলকাতা) রাজাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ির সখের নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হন। এ নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে মধুসূদনের মনে বাংলায় নাটক রচনার সংকল্প জাগে। মহাভারতের দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান অবলম্বন করে পাশ্চাত্য রীতিতে রচনা করেন 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮) নাটক। ইংরেজি শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলদের মদ্যাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারকে ব্যঙ্গ করে 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৫৯) এবং আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের গোপন লাম্পট্যকে পরিহাস করে 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৫৯) নামক প্রহসন রচনা। গ্রিক পুরাণ থেকে উপাখ্যান সংগ্রহ করে 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নাটক প্রণয়ন। রাজপুত ইতিহাস থেকে আখ্যানবস্তু গ্রহণ করে রচনা করেন বিয়োগান্তক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। বাংলা সাহিত্যের যুগ প্রবর্তক কবি। সংস্কৃত সাহিত্য (রামায়ণ ও মহাভারত) থেকে গৃহীত উপাখ্যানকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের রূপ ও রীতিতে সমকালীন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির জীবনদর্শন ও রুচির উপযোগী করে কাব্যিক রূপ দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের অবতারণা। মহাভারতের সুন্দ ও উপসুন্দ কাহিনীকে অবলম্বন করে 'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৮৬০) কাব্য রচনা। রামায়ণের রাম-রাবণের কাহিনীর উপর ইউরোপীয় মহাকাব্যের সৌন্দর্য ও দীপ্ত শৌর্যের রং ফলিয়ে ওজস্বিনী ভাব ও ভাষায় রচনা করেন তাঁর অমর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' (১৮৬১)। রামায়ণের অধর্মচারী, পাপী ও বর্বর রাক্ষস রাবণকে বীর, দেশপ্রেমিক, অসমযোদ্ধা ও এক অটল শক্তির আধার রূপে চিত্রিত করে মধুসূদন উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণের প্রধান কবি হিসেবে আবির্ভূত হন। 'ব্রজাঙ্গনা' (১৮৬১) তাঁর রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকাব্য। রোমক কবি ওবিদের 'হিরোয়দস' কাব্যের আদর্শে প্রণয়ণ করেন পত্র-কাব্য 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২)। এ কাব্যের এগারোটি পত্রের (যেমন সোমের প্রতি তারা, নীলধ্বজের প্রতি জনা, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী) নায়িকা চরিত্রই হিন্দু পুরাণ থেকে গৃহীত। বাংলা পদ্যসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা। 'পদ্মাবতী' নাটকের পদ্যাংশে এ ছন্দের সূচনা। 'মেঘনাদবধ' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এ ছন্দে 'মেঘনাদবধ' কাব্যে বীররস ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে করুণ রস সৃষ্টিতে অসাধারণ শিল্পকুশলতার পরিচয় প্রদান। ১৮৬২-র ৯ জুন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইংল্যান্ড যাত্রা। ১৮৬৩-তে লন্ডন থেকে ফ্রান্সে গমন। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে অবস্থানকালে ইতালীয় কবি পেত্রার্ক-এর অনুকরণে 'চতুর্দশপদী কবিতা' (সনেট) রচনা। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) নামে এগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশ। বাংলায় সনেট (চতুর্দশপদী কবিতা) রচনারও প্রথম কৃতিত্ব তাঁর। ১৮৬৬-তে লন্ডনের গ্রেজ ইন থেকে ব্যারিস্টারি ডিগ্রি লাভ। বিদেশে অবস্থানকালে অমিতব্যয়িতার জন্যে আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) কর্তৃক অর্থ সাহায্য প্রদান। ১৮৬৭-র ৫ জানুয়ারি লন্ডন থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ওকালতিতে সুবিধে করতে না পারায় ১৮৭০-এর জুনে মাসিক হাজার টাকা বেতনে কলকাতা হাইকোর্টে অনুবাদ বিভাগের পরীক্ষকের চাকরি গ্রহণ। দু'বছর পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ব্যারিস্টারি ব্যবসায় ফিরে আসেন। ১৮৭১-এ হোমারের 'ইলিয়াড'-এর উপাখ্যান অবলম্বন করে বাংলা গদ্যে 'হেকটর বধ' রচনা। মধুসূদনের শেষ জীবন দুঃখ ও দারিদ্র্যে পূর্ণ। মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের জন্যে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার কারণে, ঋণের বোঝায় শেষ জীবন অশান্তিময় হয়ে ওঠে এবং কপর্দকহীন অবস্থায় কলকাতা জেনারেল হাসপাতালে পরলোক গমন। উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা মধুসূদন তাঁর বহুমুখী প্রতিভার দ্বারা বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত

শক্তির আবিষ্কার করে এ ভাষার যে উৎকর্ষ সাধন করে গেছেন সেজন্য তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। মৃত্যু. কলকাতা, ২৯ জুন ১৮৭৩।

মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০-১৯৪২)॥ জন্ম. হোগলা গ্রাম, তমলুক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ১৮৭০। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শহীদ। দরিদ্র কৃষকের কন্যা। নিরক্ষর মাতঙ্গিনী হাজরার ১৮ বছর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় বৈধব্যবরণ। ১৯৩২-এর ২৬ জানুয়ারি স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর শোভাযাত্রা বের করলে সেই শোভাযাত্রায় যোগদান। এই বছরই অলিনান লবণ কেন্দ্রে লবণ প্রস্তুত করে আইন অমান্য করেন। ফলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে হাঁটিয়ে বহুদূর নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। এরপর চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী শ্লোগান দেওয়ার অপরাধে ৬ মাস কারা ভোগ। ১৯৩৩-এ অবৈধ তমলুম মহকুমা কংগ্রেস সম্মেলনে যোগদান। ১৯৩৯-এ মেদিনীপুর কংগ্রেস মহিলা সম্মেলনের প্রতিনিধিত্ব করেন। আশেপাশের গ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি হলে সেবা করতেন। এজন্য লোকে তাঁকে বলতো 'গান্ধী বুড়ি'। ১৯৪২-এর ২৯ সেপ্টেম্বর এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে থানা দখল করতে যান। ইংরেজ সেনাদল গুলি চালাতে শুরু করলে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এই দৃশ্য দেখে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে সবার সামনে এগিয়ে এসে বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান করে বলেন, 'করবো অথবা মরবো, হয় জয় না হয় মৃত্যু, তোমরা বাড়িতে ফিরে গিয়ে কি বলবে?' এই কথা বলে মিছিল নিয়ে অকম্পিত পদে অগ্রসর হলেন। এই সময়ে পুলিশ প্রথমে তাঁর দুই বাহুতে এবং শেষে কপালে গুলি করে। জাতীয় পতাকা উচ্চে রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু. ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪২।



মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩)॥ জন্ম. মাতুলালয়, শ্রীধরপুর, যশোর, ২৩ জানুয়ারি ১৮৬৩। পৈতৃক নিবাস সাগরদাঁড়ি, যশোর। কবি। পিতা আনন্দমোহন দত্ত। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্রী। বিধুশঙ্কর বসু তাঁর স্বামী। ১৮৭৩-এ বাল্যবিবাহ এবং ১৯ বছর বয়সে একটি কন্যা সন্তান নিয়ে বৈধব্যবরণ। বাল্যকালে পিতা এবং বিবাহের পর স্বামীর কাছ থেকে কবিতা রচনার অনুপ্রেরণা লাভ। চৌদ্দ বছর বয়সে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা তাঁর 'পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা' নামক একটি বীররসাত্মক কবিতা ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর রচিত গদ্যপদ্য রচনা 'প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়' (১৮৮৪)। রচিত কবিতাগ্রন্থ: কুসুমাঞ্জলি (১৮৯৩), কনকাঞ্জলি (১৮৯৬), বীরকুমারবধ (১৯০৪) ইত্যাদি। তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতাগুলো প্রধানত বিয়োগ বেদনা-সঞ্জাত। প্রকৃতি, জাতীয়তা, পুরাণ, ইতিহাস ও সমাজ তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এবং সমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কার নিবারণার্থে বহু প্রবন্ধ রচনা। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় সামাজিক সমস্যা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার লাভ। গল্প রচনায়ও সুনাম অর্জন। রাজলক্ষ্মী, অদৃষ্ট চক্র ও শোভা গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার লাভ। সাহিত্য কৃতির জন্য ১৯১৯ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভারত সরকারের বৃত্তি পান। ১৯৩৭-এ চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কাব্য-সাহিত্য শাখার সভানেত্রী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৩৯-এ 'ভুবন মোহিনী স্বর্ণপদক' ও ১৯৪১-এ 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান। মৃত্যু. খুলনা, জামাতার গৃহে, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৪৩।



মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪)॥ জন্ম. আড়বেলিয়া, চব্বিশ পরগনা, ২২ মার্চ ১৮৮৭। ব্রিটিশ-ভারতের বিপ্লবী ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা। আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পিতা দীনবন্ধু ভট্টাচার্য ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। ১৮৯৭-এ হরিণাভি অ্যাংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ভর্তি। ১৯০৫-এ গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগদান। ১৯০৬-এ জাতীয় বিদ্যাপীঠ থেকে প্রবেশিকা পাস। এরপর যাদবপুরের

বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে ভর্তি। ১৯০৭-এ চাংড়িপোতা রেলস্টেশনে একটি ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করার সন্দেহে পুলিশ-কর্তৃক গ্রেফতার, কিন্তু প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। পরে বাঘা যতীনের সহকর্মী হিসেবে গুপ্ত সংগঠন সংগঠিত করার কাজে



আত্মনিয়োগ। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১০-এ গ্রেফতারবরণ। প্রমাণাভাবে ছাড়া পেয়ে ভারতের নানা জায়গায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে লিপ্ত। ১৯১৪-তে ইংরেজদের শত্রু জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগে প্রধান ভূমিকা পালন। এই বছরই ১৩ জানুয়ারি গার্ডেনরিচে ও ২২ ফেব্রুয়ারি বেলিয়াঘাটায় স্বদেশি ডাকাতিতে অংশগ্রহণ। সি. মার্টিন নাম ধারণ করে ১৯১৫-তে বৈদেশিক যোগসূত্র গড়ে তোলার জন্য বাটাভিয়া গমন। ভারতে ফিরে পুনরায় ১৯১৫-র ১৫ আগস্ট দেশত্যাগ। হরি সিং নাম গ্রহণ করে ফিলিপাইনে গমন এবং সেখান থেকে মি. হোয়াইট ছদ্মনামে জাপানের নাগাসাকিতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ। এরপর জাপানি পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পিকিং গমন। সেখানে ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক ধৃত। একরাত্রি হাজতবাস করে পরদিন ব্রিটিশ কনসালকে ধাপ্পা দিয়ে মুক্ত হন এবং ইউনান প্রদেশে গমন। সেখান থেকে টোকিওতে আগমন। ১৯১৬-তে আমেরিকার সানফ্রানসিসকো-তে গমন। সেখানে জার্মান গুপ্তচররূপে চিহ্নিত হওয়ার আশংকায় মানবেন্দ্রনাথ রায় নাম গ্রহণ। ইভলিন ট্রেন্টকে বিবাহ। আমেরিকার র‍্যাডিক্যালদের প্রভাবে মার্কসবাদে বিশ্বাসী হন এবং সোশালিস্ট ভ্রাতৃসংঘের প্রথম ভারতীয় সদস্য। এরপর মেক্সিকো গমন। সেখানে সোশালিস্ট পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত। এই অবদানের জন্য লেনিন কর্তৃক মস্কোয় নিমন্ত্রিত। ১৯১৯-এ গার্সিয়া ছদ্মনামে মেক্সিকো থেকে বার্লিন গমন এবং ১৯২০-তে মস্কো আগমন। সেখানে 'মে দিবসে'র অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান। ১৯২০-এ মস্কোতে 'কমিনটার্নের কার্যকরি সমিতি'র (E. C. C.I.) ও প্রেসিডিয়ামের সভ্য নির্বাচিত। একই বছর তাসখন্দে গঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাতজন সভ্যের অন্যতম। খিবা শহরে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির কয়েকজন পলাতক সৈন্য ও কিছুসংখ্যক ইরানি বিপ্লবীকে নিয়ে একটি সৈন্যদল গঠন করে তাদের সাহায্যে মেশেদাকোয়েটা সড়ক ও ট্রান্সক্যাস্পিয়ান রেলপথের কয়েকশো মাইল শত্রুমুক্ত করেন। বোখারায় সোভিয়েত সরকার গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। মস্কোয় 'টয়লার্স অফ দি ইস্ট' নামক বিদ্যালয়ে উচ্চপদ লাভ। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থার বিশিষ্ট সদস্য এবং বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত এই সংস্থার বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ। ইউরোপ থেকে 'ভ্যানগার্ড', 'ম্যাসেস', 'অ্যাডভান্স গার্ড' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার কাজ চালান। ১৯২৪-এ চীন বিপ্লবের বিভিন্ন পরিকল্পনায় বোরোদিনকে সাহায্যের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে চীনে গমন। বোরোদিনের সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় ১৯২৭-এ চীন থেকে বহিষ্কৃত। এই ঘটনার পর থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনে তাঁর আধিপত্য নষ্ট হয় এবং ১৯২৮-এ কমিউনটার্ন থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯৩০-এ ডা. মাহমুদ ছদ্মনামে ভারতে প্রত্যাবর্তন। ১৯৩১-১৯৩৬ পর্যন্ত কারাভোগ। কারামুক্তির পর ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে সম্মানিত। প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর এলেন রায়কে বিবাহ (১৯৩৭)। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 'লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস ম্যান' গঠন (১৯৩৭)। কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ও কমিউনিস্ট জীবনের অবসান। ১৯৪০-এ কংগ্রেসের সভাপতি পদের প্রার্থী হয়ে পরাজিত। 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পিপলস পার্টি' গঠন (১৯৪০)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মিত্র শক্তির যুদ্ধ নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে 'নিউ হিউম্যানিজম' (নব মানবিকতাবাদ) নামে এক মতবাদ প্রচার। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন, গ্রামে-মহল্লায়-কলে-কারখানায় আঞ্চলিক জনসমিতির ভিত্তিতে লোকায়ত গণতন্ত্র, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক দল ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিলোপসাধন তাঁর এই মতবাদের মূল কথা। ১৯৩৭-এর ৪ এপ্রিল বোম্বাই থেকে Independent India পত্রিকা প্রকাশ। ১৯৪৯-এ পত্রিকাটি Radical Humanist নামে প্রকাশিত হয়। স্ত্রী এলেন গটসচেককে নিয়ে দেরাদুনে বসবাস। বিশ্বের সতেরটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন।

ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ও স্প্যানিস ভাষায় রচিত আনুমানিক গ্রন্থ সংখ্যা ৬৭। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: India in Transition (১৯২২), Revolution and Counter Revolution in China (১৯৪৬), New Humanism (১৯৪৭), Reason, Romanticism and Revolution (2 Vol ১৯৪৯), My Memoirs (মৃত্যুর পরে ১৯৬৪-তে প্রকাশিত)। মৃত্যু. ২৫ জানুয়ারি ১৯৫৪।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (১৯৩৯-১৯৮৩)॥ জন্ম, মাওরুম, নানিয়ারচর, রাঙামাটি, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। রাজনীতিবিদ। ডাকনাম মঞ্জু। পিতা চিত্তকিশোর চাকমা, মা সুভাষিণী দেওয়ান। মহাপুরম উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও জুনিয়র হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষালাভ। ১৯৫৬-এ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদে যোগদান। ১৯৫৭-এ পাহাড়ি ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫৮-এ রাঙামাটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাস এবং পূর্বপাকিস্তান বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান। ১৯৬০-এ পাহাড়ি ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে আসীন। ১৯৬০ চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি। ১৯৬১-এ কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে আন্দোলন পরিচালনা। চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়নকালেই ১৯৬৩-র ১০ ফেব্রুয়ারি নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেফতার। ১৯৬৫-এ ৮ মার্চ মুক্তি লাভ। ১৯৬৫-এ কারাগার বসে বি.এ. পাস। ১৯৬৬-এ তিনি দিঘিনালা উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান। ১৯৬৮-এ চট্টগ্রাম রেলওয়ে কলোনি হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান। ১৯৬৯-এ এল.এল.বি. পাস করে চট্টগ্রাম বার কাউন্সিলে যোগদান। চট্টগ্রামে কলেজে অধ্যয়নকালে প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায়ে ৬ দফা ও ১১ দফা দাবির আন্দোলনে সমর্থন দান। ১৯৭০-এ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিপুল ভোটে জয়ী। ১৯৭২-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি ১১টি আদিবাসী গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে জনসংহতি সমিতি গঠন এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য ৪ দফা দাবি পেশ। ঐ বছরের ৩১ অক্টোবর পাহাড়িদের 'বাঙালি' বলার প্রতিবাদে সংসদ ত্যাগ। ১৯৭৩-এ বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত। ১৯৭৪-এ তিনি বাংলাদেশ সরকারের পার্লামেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেন ইংল্যান্ডে। জাতীয় সংসদে তিনি পার্বত্য জেলার আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকারের বিষয়ে যেমন ছিলেন সোচ্চার, তেমনি দেশের শ্রমজীবী মানুষের আর্থসমাজিক উন্নয়নের জন্য ছিলেন সর্বদা উচ্চকণ্ঠ। দেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বাজেট সুশাসন প্রভৃতি বিষয়ে সংসদে ছিল সক্রিয় অংশগ্রহণ। প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা, নির্ভীকতা, নিষ্ঠা, সততা, দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণের কারণে সম্মানিত। অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। জাতীয় সংসদের সদস্য হয়েও বাঁশের বেড়া আর শালপাতায় ছাওয়া ঘরে মাটিতে পাটি বিছিয়ে শয়নের অভ্যাস বজায়। বঙ্গবন্ধুর সংগে আদিবাসীদের অধিকার, পাহাড়িদের স্বায়ত্তশাসন তাদের পৃথক ভাষণ সংস্কৃতি ঐতিহ্য অর্থনেতিক স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর একধরনের সমঝোতার ফলে ১৯৭৫-এ বাকশালে যোগদান। ১৯৭৭-এ এবং ১৯৮২-তে জনসংহতি সমিতির সভাপতি নির্বাচিত। মৃত্যু: প্রতিপক্ষের গুলিতে খাগড়াছড়িতে নিহত, ১০ নভেম্বর ১৯৮৩।



মানিকউদ্দীন আহমদ (১৮৬৮-১৯৪৮)॥ জন্ম. সুদিনগ্রাম, আদমদিঘী, বগুড়া, ১৮৬৮। শিক্ষাবিদ, লেখক, নর্মাল পাস পণ্ডিত। বগুড়ার ধুপচাঁচিয়া মডেল স্কুলের শিক্ষক। কিছুকাল পোস্ট মাস্টারি করনে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বিবিধ উপদেশসম্বলিত প্রাচীন প্রবাদ ও খনার বচন (১৮৯৯), নবহীরক খনি বা ইসলাম সুহৃদ (১৯০৮), উপদেশ লহরী (১৯১৩), বাঙ্গলা শব্দকোষ বা ছাত্র সহচর অভিধান (১৯১৪), শোকোচ্ছ্বাস ও বিদায়গীত। মৃত্যু. ১৯৪৮।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)॥ জন্ম. পিতার কর্মস্থল দুমকা শহর, সাঁওতাল পরগনা, বিহার, ১৯ মে ১৯০৮। কথাসাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস মালবদিয়া গ্রাম, মুন্সীগঞ্জ। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ. ছিলেন সেটেলম্যান্ট বিভাগের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (চাকরি জীবনের শেষ পর্যায়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে

উন্নীত) ; মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী ; পিতৃদত্ত নাম



প্রবোধকুমার, মানিক তাঁর ডাক নাম ; মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে অঙ্কে লেটারসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিক (১৯২৬) ও বাঁকুড়া ওয়েসলিয় মিশন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এসসি. (১৯২৮) পাস। অঙ্কে অনার্স নিয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এসসি. ক্লাসে ভর্তি। কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে তর্কে বাজি রেখে প্রথম গল্প 'অতসী মামী' রচনা এবং বিচিত্রা পত্রিকায় (ডিসেম্বর ১৯২৮, জানুয়ারি ১৯২৯) প্রকাশিত। প্রথম গল্পের লেখক হিসেবে ডাকনাম মানিক ব্যবহার। এভাবেই আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা পড়ে গিয়ে পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে খ্যাতি লাভ। পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অবহেলা ও গল্প উপন্যাস পাঠ করে সময় ব্যয় করায় পরপর দু'বার বি.এসসি. পরীক্ষায় অকৃতকার্য ; পরীক্ষায় ফেল, সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ পারিবারিক মতবিরোধের কারণ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সাহিত্যকর্মেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ। ১৯৩৭-এর ১ জানুয়ারি বঙ্গশ্রী পত্রিকার সহ-সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ; ১৯৩৯-এর ১ জানুয়ারি এ চাকরি থেকে পদত্যাগ। ছোটভাই সুবোধকুমারের সঙ্গে উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস নামে কলকাতায় একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। ময়মনসিংহের গভর্নমেন্ট গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ (১৯৩৮)। ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অর্গানাইজার (বেঙ্গল) দপ্তরে পাবলিসিটি সহকারী পদে যোগদান। ১৯৪৩-এর জুন মাসে চাকরিতে ইস্তফা দান। ১৯৪৪-এ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সভাপতিত্ব (১৯৪৪)। ১৯৪৬-এ প্রগতি লেখক সংঘের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট ও পরবর্তী কয়েকটি দিনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত টালিগঞ্জ অঞ্চলে জীবন বিপন্ন করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মৈত্রী প্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৪৭-এ বোম্বেতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে গণসাহিত্য শাখার সভাপতি। ১৯৫৩-র ৪ এপ্রিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ আয়োজিত জোসেফ স্টালিনের (মৃত্যু. ৫ মার্চ ১৯৫৩) শোকসভায় সভাপতিত্ব। একই বছর প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সভাপতিত্ব। তিরিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় নাম ; তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলো স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল। শরৎচন্দ্র ও কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের পর বাংলা সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনোবিশ্লেষণের ধারা সর্বাধিক উজ্জ্বলভাবে অঙ্কনের কৃতিত্ব তাঁর। তাঁর প্রথম পর্যায়ের রচনায় মানুষের অবচেতন মনে যে নিগূঢ় রহস্যলীলা প্রচ্ছন্ন থাকে তার (ফ্রয়েডীয় সূত্র) নিপুণ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে সমাজ সচেতন বামপন্থি দৃষ্টির (মার্কসবাদ) সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত। সমাজ ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা নাগরিক জীবনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তার ব্যাখ্যা এ পর্যায়ের রচনায় দৃষ্টিগোচর। যৌনাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উদরপূর্তির সমস্যার ভিত্তিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) রচিত। ষাটখানি গ্রন্থ ও অসংখ্য অগ্রন্থিত রচনার প্রণেতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম–উপন্যাস: জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬), শহরতলী (১৯৪০), অহিংসা (১৯৪১), শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), চিহ্ন (১৯৪৭), চতুষ্কোণ (১৯৪৮), জীয়ন্ত (১৯৫০), সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২), আরোগ্য (১৯৫৩), হরফ (১৯৫৪), হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬) ইত্যাদি। গল্পগ্রন্থ: অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ভেজাল (১৯৪৪), হলুদ পোড়া (১৯৪৫), আজকাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), মাটির মাশুল, ছোটবড় (১৯৪৮), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯), ফেরিওয়ালা (১৯৫৩), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০), উত্তরকালে গল্প সংগ্রহ ইত্যাদি। প্রবন্ধ গ্রন্থ: লেখকের কথা। মৃত্যু. কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬।

মামুন মাহমুদ (১৯২৯-১৯৭১)॥ জন্ম. কলকাতা,



১৯২৯। দেশপ্রেমিক বাঙালি ও শহীদ। মাতা শামসুন নাহার মাহমুদ ছিলেন বিখ্যাত সমাজকর্মী ও সাহিত্যিক। কলকাতার বালীগঞ্জ সরকারি বিদ্যালয় থেকে ১৯৪২-এ প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই.এ. এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস। ১৯৪৭-এ ঢাকায় আগমন। ই.পি.সি.এস. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পুলিশ সার্ভিসে যোগদান। কর্মজীবনে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন। ১৯৫৮-তে চট্টগ্রামের এস.পি. নিযুক্ত। ১৯৬৬-তে খুলনার এস.পি. হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ এবং একই বছর ঢাকায় বদলি। তিনি ছিলেন সাহসী, ন্যায়পরায়ণ অফিসার। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নি। খুলনা থাকাকালে জনৈক এম.পি.এ. ইলেকট্রিক তার চুরির দায়ে ধরা পড়লে ওপর থেকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি তা অস্বীকার করলে কেসের তদন্তভার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে। এ সময়ে খুলনায় চোরাচালানির সঙ্গে যুক্ত মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা গ্রেফতার হন। তাঁকেও ছেড়ে দেবার নির্দেশ হলে তিনি তা অস্বীকার করে সত্য ঘটনা উদ্ঘাটন করেন। ১৯৬৬-তে যখন ৬-দফা আন্দোলন তুঙ্গে, সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করা হয়; কিন্তু তিনি খুলনাতে ১৪৪ ধারা জারি না করায় তৎকালীন গভর্নর মোনেম খাঁ তাঁকে ঢাকায় ডেকে পাঠান এবং সতর্ক করে দেন। ১৯৭০-এর ১৭ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে মওলানা মওদুদীর মিটিং বানচালকারী জনতার ওপর গুলির নির্দেশ দিলে তিনি সে নির্দেশ অমান্য করেন। ফলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে বদলি করা হয়। ১৯৭১-এর মার্চ মাসে তিনি রাজশাহীর ডি.আই.জি। ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ জনৈক পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন পাসঅর্ডার ছাড়া ট্রেজারিতে ঢোকার চেষ্টা করলে ট্রেজারি রক্ষীরা তাঁকে বাঁধা দেয়। রক্ষীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলে তিনি অস্বীকার করে বলেন, 'আমার গার্ডরা কোনো অন্যায় করেনি, তারা পাস অর্ডার ছাড়া কাউকে ট্রেজারিতে ঢুকতে দেয় নি, তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে মাত্র।' মার্চের প্রথম থেকেই রাজশাহীতে পাকিস্তানি বাহিনী শুরু করেছিল ত্রাসের রাজত্ব। ৩ মার্চ টেলিফোন অফিসের সামনে, ৪ মার্চ বাজার এলাকায় হত্যা করা হয় বাঙালিদের। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বাসভবনে ও অফিসে কালো পতাকা ওড়ালেন মামুন মাহমুদ। পাকিস্তানের পুলিশ বিভাগে চাকরি করে তিনি এভাবেই তাঁর বাঙালি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। ঝুঁকি ছিল, বিপদ ছিল, জীবনের ওপরও হুমকি ছিল; কিন্তু তিনি ভয় পাননি। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুতে ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭ টায় রংপুর থেকে ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ ওয়ারলেসে কথা বলতে চান, এই বলে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে। তিনি আর ফিরে আসেন নি।

মালাধর বসু, গুণরাজ খান॥ জন্ম. বর্ধমান জেলার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তস্থিত কুলীন গ্রাম, খ্রিস্টীয় ১৫শ শতকের মধ্যপাদ। তাঁর জীবদ্দশায় রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ গৌড়ের সুলতান (১৪৫৯-১৪৭৩) এবং তারপরে বারবাক শাহের পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮২) গৌড়াধিপতি হন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবি। কবিত্ব শক্তির গুণে শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের কাছ থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ। রচিত কবিতাগ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। আনুমানিক ১৪৭৩-এ কাব্য রচনার শুরু এবং ১৪৮০-তে শেষ। ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধ অবলম্বনে কাব্যখানি রচিত। সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষাপ্রয়োগ ও মনোরম বর্ণনার মাধ্যমে আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ও পরিবেশকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করে বাংলা ভাষায় হিন্দু পুরাণের কাহিনী এ কাব্যে পরিবেশিত হয়েছে। চৈতন্যদেব কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পূর্বে ভাগবতকে বাংলার জনসাধারণের নিকট সর্বপ্রথম প্রচার করার কৃতিত্ব মালাধর বসুর। চৈতন্যদেব যে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' পাঠ করেছিলেন তা 'চৈতন্যচরিতামৃত' (২/১৫) থেকে জানা যায়।

মাশুকর রহমান (১৯৪২-১৯৭১)॥ জন্ম. যশোর শহর, ৩১ জানুয়ারি ১৯৪২। শিক্ষাবিদ, মুক্তিযোদ্ধা। যশোর জেলা স্কুল থেকে ১৯৫৬-তে মেট্রিক পাস। ১৯৫৮-তে যশোর এম.এম. কলেজ থেকে ঢাকা বোর্ডে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে আই.এসসি., ১৯৬৩-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যা ও গণিতে অনার্স ডিগ্রি লাভ। ১৯৬২-তে ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার

দায়ে গ্রেফতার। ১৯৬৪-তে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে এম.এসসি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ। গণিতে রেকর্ড সংখ্যক নম্বর পাওয়ায় স্পেশাল বৃত্তি লাভ। Actuary-তে ডিগ্রি লাভের জন্য লন্ডন গমন এবং সেখানে Applied Mathematics-এর ওপর ডিগ্রি অর্জন। ১৯৬৯-এ দেশে প্রত্যাবর্তন। ১৯৬৯-এর ডিসেম্বরে Eastern Federal Insurance Company-তে Actuary হিসেবে যোগদান। তিনিই প্রথম বাঙালি Actuary। ১৯৭০-এ Actuary-এর Thesis লন্ডনে প্রেরণ। ১৯৭১-এর ৩ এপ্রিল ভারত গমন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে পাক-সেনাদের সহযোগী রাজাকার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ চলাকালে ধরা পড়েন এবং তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়, মৃত্যু. ২৩ অক্টোবর ১৯৭১।

মাহফুজুল হক (১৯৩২-১৯৬৬)॥ জন্ম. বৈরাগ, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ১ এপ্রিল ১৯৩২। শিক্ষাবিদ। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯৫৪-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৯৬১-তে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন এবং পরে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ছাত্রজীবন থেকে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময়ে চট্টগ্রাম জিলা যুক্তফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৫-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান। প্রায় এক বছর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা, সরকারি ভাষারূপে বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষা ও সমস্যা। মৃত্যু. ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।

মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১)॥ জন্ম. মাতুলালয়, ফতেয়াবাদ গ্রাম, চট্টগ্রাম, ১ মে ১৮৯৮। পৈতৃক নিবাস ফতেপুর গ্রাম, চট্টগ্রাম। সাহিত্যিক। ফতেয়াবাদ এম.ই. স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস (১৯১৬)। কিছুদিন চট্টগ্রাম কলেজে আই.এ. ক্লাসে অধ্যয়ন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বাঙালি পল্টনে যোগদান (১৯১৭) করে মেসোপটেমিয়া গমন এবং যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ। যুদ্ধশেষে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেয়া হলে দেশে প্রত্যাবর্তন (১৯১৯)। ১৯২০-এ



সাব-রেজিস্ট্রার পদে সরকারি চাকরিতে যোগদান। ১৯৪৮-এ ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি লাভ। ১৯৫২-র জানুয়ারি মাসে ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার এবং একই বছর জুন মাসে ইন্সপেক্টর অব রেজিস্ট্রেশন পদে উন্নীত। ১৯৫৪-তে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। একই বছর ২৮ অক্টোবর (১৯৫৪) তাঁর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে সাপ্তাহিক 'জামানা' পত্রিকা প্রকাশিত। কথাসাহিত্য, স্মৃতিকথা ও ইতিহাস-রচয়িতা হিসেবে খ্যাত। তাঁর প্রথম রচনা 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' (১৯৪০)। আত্মচরিতমূলক এই গ্রন্থে তাঁর সৃষ্টিশীল মনের পরিচয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত। আত্মজীবনীমূলক অপর গ্রন্থ 'মোমেনের জবানবন্দী' (১৯৪৬) সমাজ ও বাস্তবজীবনের একখানি নিখুঁত চিত্র। মাহবুব-উল আলমের গদ্যরীতি সাবলীল ও বলিষ্ঠ। 'তাজিয়া' (১৯৪৬) ও 'পঞ্চ অন্ন' (১৯৫৩) তাঁর বিখ্যাত গল্প সংকলন। ছোটগল্পেই তাঁর শিল্পীসত্তা পূর্ণভাবে বিকশিত। 'মফিজন' (১৯৪৬) বাস্তব জীবনভিত্তিক 'মিনিয়েচার' উপন্যাস। 'গোঁফ সন্দেশ' (১৯৫৩) একটি ব্যঙ্গ রচনা। জাতিসংঘের ইউনেস্কোর কমিশন পেয়ে 'বার্মা' (১৯৫৯), 'সিলোন' (১৯৫৯), 'ইন্দোনেশিয়া' (১৯৫৯), 'তুর্কী' (১৯৬০), 'সৌদী আরব' (১৯৬০), 'পূর্ব-পাকিস্তানের পক্ষী' (১৯৬০), 'পূর্ব-পাকিস্তানের বনক্ষেত্র' (১৯৬০), 'পূর্ব-পাকিস্তানের মৎস্য সম্পদ' (১৯৬০) নামক পুস্তিকা রচনা। 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' (তিন খণ্ড, ১৯৪৭-১৯৫০) ও 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' (চার খণ্ড,) তাঁর ইতিহাসমূলক গ্রন্থ। সাহিত্যকর্মের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৫), প্রেসিডেন্টের পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' (১৯৬৭) ও একুশে পদক (১৯৭৮) লাভ। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ৭ আগস্ট, ১৯৮১।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী (১৯২৭-২০০৭)॥ জন্ম. গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম, ৭ নভেম্বর ১৯২৭ কবি, সাংবাদিক এবং ভাষা-সংগ্রামী,

একুশের প্রথম কবিতার জনক। পিতা আহমদুর রহমান চৌধুরী এবং মাতা রওশন আরা বেগম। তিনি ১৯৪৭-এ গহিরা হাইস্কুল হতে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর



কলেজ পরিদর্শনে এসে আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের পক্ষে মত প্রকাশ করলে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। ১৯৪৭-এ চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র কংগ্রেসে যোগদান এবং 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ। নভেম্বর মাসে 'সীমান্ত' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা। পত্রিকাটি ১৯৫২ সাল পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত। তিনি ১৯৫৪-এ যুক্তফ্রন্ট আহ্বায়ক নির্বাচিত। চট্টগ্রামের প্রান্তিক নব নাট্যসংঘ ও কৃষ্টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার সম্পাদক (১৯৭২-৮২)। ১৯৫২-এ চট্টগ্রাম প্রাদেশিক ভাষা-আন্দোলন কমিটির সদস্য। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতা রচনা। এ কবিতাটি ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত প্রথম কবিতা হিসেবে স্বীকৃত। সরকার কবিতাটি বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৫২-এর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৭ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায় ছাপা হয় কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি। ১৯৫২'র ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ১৯৫৩-এ গণতন্ত্রী পার্টি গঠিত হলে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নির্বাচিত। ১৯৫৪-এ যুক্তফ্রন্টের পক্ষে দায়িত্ব পালন। ১৯৬৫-৬৬-এ কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্ত হলে সক্রিয় রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ। চট্টগ্রামের লোকসংগীত সম্মেলন, যুব উৎসব সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম নজরুল জয়ন্তী ১৯৪৬-এ উদযাপন পরিষদের সম্পাদক। চট্টগ্রামে প্রথম বিশ্বশান্তি পরিষদ গঠন ১৯৪৯ সালে। পারমাণবিক বোমা নিষিদ্ধ করার দাবিতে চট্টগ্রাম থেকেই ৭ লাখ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সুইডেনে বিশ্বশান্তি পরিষদে প্রেরণ। ১৯৫০-এ মাহবুবুল আলম চৌধুরী বিশ্ব শান্তি পরিষদের চট্টগ্রাম শাখার সম্পাদক হন। ১৯৫০-এ চট্টগ্রামে চার দিনব্যাপী সংস্কৃতি সম্মেলনের সাংগঠনিক সম্পাদক। ১৯৫৩-এ 'কবি নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন কবিকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ। ১৯৫৭-এ মাওলানা ভাসানী আয়োজিত টাঙ্গাইলের কাগমারী সম্মেলনেও তাঁর নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক স্কোয়াড অংশগ্রহণ করে। রচিত কাব্য: আবেগধারা (১৯৪৪), ইস্পাত (১৯৪৫), অঙ্গীকার (১৯৪৬), কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি (১৯৮৮), সূর্যাস্তের অস্তরাগ (২০০৪), সূর্যের ভোর (২০০৬)। গদ্যগ্রন্থ: 'গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র, স্বৈরতান্ত্রিক গণতন্ত্র' (২০০৬); ছড়াগ্রন্থ: 'ছড়ায় ছড়ায়' (২০০৪); নাটক: 'দারোগা' (১৯৪৪), 'আগামীকাল' (১৯৫৩), 'পুস্তিকা', 'মিসরের মুক্তিযুদ্ধ' (১৯৫৬), 'বিপ্লব' (১৯৪৬)। পুরস্কার: বাংলা একাডেমী ফেলোশিপ (১৯৮৬), ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী সংবর্ধনা (১৯৯০), চট্টগ্রামের অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সম্মাননা (১৯৯৭), চট্টগ্রাম সংগীত পরিষদ সম্মাননা (১৯৯৯), সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সম্মননা (২০০০), বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী সম্মাননা (২০০১), পদাতিক নাট্য সংসদ সম্মাননা (২০০২), ঋত্বিজ পদক (২০০৬), একুশে পদক (২০০৯)। মৃত্যু. ঢাকা, ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৭।

মাহবুবল হক (১৯২৩-১৯৭৪)॥ জন্ম. ফরহাদনগর গ্রাম, ফেনী, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩। শ্রমিক নেতা ও সাংবাদিক। স্থানীয় আমিরাবাদ হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাস (১৯৩৯)। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে টালিক্লার্ক পদে চাকরি গ্রহণ। রেলওয়ে



শ্রমিক-আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। সিরাজগঞ্জ রেলকর্মী সম্মেলনের (১৯৫০) প্রধান উদ্যোক্তা। এ সম্মেলনে 'পূর্ব-পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ' (১৯৫০) গঠিত হলে এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। পরবর্তীকালে এ সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি ও সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন (১৯৫৫-১৯৭১)। ১৯৫৬-তে শেরে বাংলা

এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক-শ্রমিক পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৬২-তে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। পার্লামেন্টে সরকারবিরোধী ভূমিকা পালন। ১৯৫৪-তে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে, ১৯৬৫ ও ১৯৭০-এ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। প্রথিতযশা সাংবাদিক। ফেনী থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পল্লীবার্তা' (১৯৫৭)। ১৯৫৮-তে 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় কমার্শিয়াল ম্যানেজার পদে যোগদান। 'পল্লীবার্তা' ফেনী থেকে ঢাকায় অবজারভার অফিসে স্থানান্তর এবং অবজারভার গ্রুপের পত্রিকা হিসেবে এটি সাপ্তাহিক 'পূর্বদেশ' নামে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত। ১৯৬২-তে অবজারভার গ্রুপের ম্যানেজিং এডিটর নিযুক্ত। ১৯৬৯-এর ১৪ আগস্ট তাঁর উদ্যোগে 'পূর্বদেশ' সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক রূপান্তরিত। এ পত্রিকার একাধারে সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক পরিচালক (১৯৬৯-১৯৭১)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকা পালনের অভিযোগে ১৯৭১-এর ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে 'পূর্বদেশের' সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত ও গ্রেফতার। ১৯৭৩-এর জুন পর্যন্ত জেলে অবস্থান। ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে দৈনিক 'জনপদের' প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে যোগদান। সাংবাদিকতায় ও রেলওয়ে শ্রমিক আন্দোলনে, ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনে, ষাটের দশকে পূর্ববাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে জাতীয় পরিষদের বক্তৃতায় ও পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বাঙালিদের উপর শোষণ ও শাসন চালাবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন। মৃত্যু. ঢাকা, ৫ জুন ১৯৭৪।

মাহবুবুর রব খালেদ বাহালী (?-১৯৫০)॥ জন্ম. বোলাই গ্রাম, কিশোরগঞ্জ। উর্দু কবি ও সম্পাদক। বাংলাদেশের বিশিষ্ট উর্দু কবি। উপমহাদেশের বিভিন্ন সাময়িকীতে বহু লেখা প্রকাশিত। উর্দু কাব্যের পাঠকদের কাছে খালেদ বাহালী নামে পরিচিত। ময়মনসিংহ থেকে 'আখতার' নামে একটি উর্দু সাময়িকপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা। মৃত্যু. ১৯৫০।

মাহমুদ নূরুল হুদা (১৯১৬-১৯৯৬)॥ জন্ম. পিতার কর্মস্থল সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী, ১৯১৬। ছাত্রনেতা ও সংস্কৃতিকর্মী। পৈতৃক নিবাস উত্তর গুথুমা গ্রাম, পরশুরাম, ফেনী। পিতা জেলা সাব-রেজিস্ট্রার খানসাহেব শাহাবুদ্দীন মোহাম্মদ মাহমুদ। নারায়ণগঞ্জ আই.ই.টি. হাইস্কুল থেকে মেট্রিক ও কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই.এ. পাস। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে বি.এ. অধ্যয়ন। স্নাতক পরীক্ষায় অকৃতকার্য। অবিভক্ত বঙ্গের মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগে'র (১৯৩৩) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য (১৯৩৩-১৯৩৫)। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় 'নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন' (১৯৩৭) গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন। এর প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-সম্পাদক। তাঁর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কর্তৃক তাঁকে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগের' কাউন্সিল সদস্য মনোনীত (১৯৩৭)। ১৯৪৭ পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন (১৯৪০) পরিচালনার জন্য গঠিত 'সর্বদলীয়ঃ সংগ্রাম পরিষদে'র সম্পাদক। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক সচিব (১৯৪৩-১৯৫০)। মুসলিম লীগের সদস্য হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর ১৯৫০-এ কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। পূর্ববাংলার প্রগতিশীল যুব সমাজকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য যুব নেতার সঙ্গে 'পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ' (১৯৫১) গঠন। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে (ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) সক্রিয় ভূমিকা পালন করায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি। পূর্ববাংলার প্রথম অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন 'গণতন্ত্রী দল' (এপ্রিল ১৯৫২) সংগঠন। ১৯৫৭-তে এ দলের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে গ্রেফতার। দুই বছর তিন মাস কারানির্যাতন ভোগের পর মুক্তিলাভ। সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ। প্রয়াত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর স্মরণে ঢাকায় 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমি' (১৯৫৫)



প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান সর্বাগ্রগণ্য। জন্মলগ্ন থেকে এর সম্পাদক ও পরে সভাপতি (আমৃত্যু)। তাঁর নেতৃত্বে বাফা (বুলবুল ললিতকলা একাডেমি) পূর্ববাংলায় অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি তথা বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ষাটের দশকের মধ্যভাগের পরে (১৯৬৭) বাঙালি সংস্কৃতিকে খর্ব করার কুমতলবে পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলায় রবীন্দ্র-সংগীতের প্রচারের উপর বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নিলে তাঁর নেতৃত্বে বাফা কর্তৃক সরকারের সে সিদ্ধান্তের প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন। সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বাফা রবীন্দ্রনাথের গান ও তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের মনে অনুপ্রেরণা জোগায়। এই আন্দোলনের পথ ধরেই ১৯৭১-এ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। একজন লেখকও বটেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: চিরঞ্জীব নজরুল (১৯৮৮), অমর শিল্পী বুলবুল (১৯৮৯), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী: কাছে থেকে দেখা (১৯৯৩)। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর আত্মজীবনী রচনার কাজ সমাপ্ত করে গেছেন। মৃত্যু. ১৩ মে ১৯৯৬, বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬-১৯৭৯)॥ জন্ম. পাবনা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯০৬। পৈতৃক নিবাস নেয়ামত বাড়ি গ্রাম, কুষ্টিয়া। কবি। ডিভিশনাল স্কুল ইন্সপেক্টর খানবাহাদুর মহম্মদ সোলায়মান তাঁর পিতা। রাজশাহী মিশন স্কুল, বরিশাল ও পাবনায় শিক্ষালাভ। ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। রাজশাহীতে তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন 'আনোয়ারা' উপন্যাসের লেখক মোহাম্মদ নজিবর রহমান। ১৯২৮-এ 'হাইজিনে' ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ। রন্ধন প্রণালীতে 'লেডি কারমাইকেল ডিপ্লোমা' পাস। অল্প বয়স থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখে পরিচিতি লাভ। তাঁর প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ: পশারিণী (১৩৩৮), মন ও মৃত্তিকা (১৩৬৭) এবং অরণ্যের সুর (১৯৬৬)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কলকাতার এলবার্ট হলে (১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি দেওয়া উপলক্ষে যশোর সাহিত্য সংঘ কর্তৃক যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল সে অনুষ্ঠানে প্রবন্ধপাঠ। এ ছাড়া ১৯৩৭-এ কলকাতা সাহিত্য সম্মেলনেও যোগদান। তিনি ধার্মিক ও কলকাতার পির সাহেবের মুরিদ হওয়া সত্ত্বেও কুসংস্কার, পর্দা, অশিক্ষার বিরুদ্ধে চিরদিন প্রতিবাদ করেছেন। ছবি আঁকা ও সংগীতের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। মুসলিম বাঙালি মহিলা কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথম সনেট ও গদ্যছন্দে কবিতা লিখেছেন। তাঁর 'পশারিণী' কবিতাগ্রন্থের পূর্বে আর কোনো বাঙালি মুসলিম মহিলা কবির কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬৭-তে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৭৭-এ 'একুশে পদক' লাভ। আজীবন কুমারী ছিলেন। মৃত্যু. ২ মে ১৯৭৯।



মাহমুদুন্নবী (১৯৪০-১৯৯০)॥ জন্ম. কেতু গ্রাম, বর্ধমান, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪০। সংগীতশিল্পী। দেশভাগের (১৯৪৭) পর পিতার সঙ্গে পূর্ববঙ্গে আগমন। খুলনার ফুলতলা থানার দামোদর গ্রামে বসতবাড়ি নির্মাণ। পিতার (সরকারের হিসাব রক্ষণ বিভাগের কর্মচারী) কর্মক্ষেত্র ফরিদপুর শহরে শিক্ষাজীবন অতিবাহিত। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে আই.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। টেস্ট পরীক্ষার পূর্বে কলেজের পাঠ ত্যাগ করে সঙ্গোপনে চট্টগ্রাম গমন। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর ঢাকায় আগমন। ঢাকার ইসলামপুরে জনৈক ওস্তাদের কাছে তালিম গ্রহণ। করাচি গমন। করাচি বেতারকেন্দ্র থেকে আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা 'পথে যেতে দেখি আমি যারে' গানটি পরিবেশন করে আধুনিক বাংলা গানের একজন খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী হিসেবে আবির্ভূত। এরপর আটটি গান সম্বলিত আধুনিক গানের একটি লং প্লে রেকর্ড প্রকাশ। ১৯৬৩-তে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। ঢাকা বেতারকেন্দ্রে নিয়মিত শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত। 'প্রেমের নাম বেদনা', 'আমি ছন্দহারা এক নদীর মত ছুটে যাই', 'তুমি যে আমার কবিতা', 'গানের খাতায় স্বরলিপি',



'আমি সাত সাগর পাড়ি দিয়ে', 'তুমি কখন এসে দাঁড়িয়েছো', 'সালাম পৃথিবী সালাম', 'এক অন্তহীন স্বপ্ন', 'বড় একা একা লাগে', 'ও মেয়ের নাম দেব কি ভাবি শুধু তাই আমি' প্রভৃতি জনপ্রিয় গানে কণ্ঠ দিয়ে প্রভূত সুনাম অর্জন। চলচ্চিত্রেরও একজন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী। 'জংলী ফুল', 'কাগজের নৌকা', 'আলো তুমি আলেয়া', 'হীরামন', 'বেহুলা', 'আগুন নিয়ে খেলা', 'চাওয়া পাওয়া', 'সমাপ্তি', 'স্বরলিপি', 'সমাপ্তি', 'আবির্ভাব', 'নীল আকাশের নীচে', 'দুই ভাই', 'নাচের পুতুল', 'খেলাঘর', 'জোয়ার ভাটা', 'অনির্বাণ', 'দর্পচূর্ণ', 'দি রেইন', 'ছন্দ হারিয়ে গেল' প্রভৃতি ছায়াছবির গানে কণ্ঠদান। ষাটের দশকে পূর্ববাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একজন পৃষ্ঠপোষক। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে 'এই পথ, এই কালো পথ' প্রভৃতি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে মুক্তিকামী মানুষের মনে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি অনুপ্রেরণা যোগান। শৌখিন কণ্ঠশিল্পী রাশিদা চৌধুরী তাঁর সহধর্মিণী। গায়িকা সামিনা চৌধুরী ও ফাহমিদা চৌধুরী তাঁর কন্যা। আধুনিক বাংলাগানের দক্ষ কণ্ঠশিল্পী হিসেবে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। মৃত্যু. সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০।

মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮)॥ জন্ম, বারাসত, চব্বিশ পরগনা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৬ নভেম্বর ১৯৪১। পুরো নাম মোহাম্মদ মাহমুদুল হক, ডাকনাম বটু। কথাসাহিত্যিক। বাবা সিরাজুল হক, মা মাহমুদা বেগম। পিতামহ শেখ জিয়াউদ্দীন ছিলেন



চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাটের দাদুপুর গ্রামের জমিদার। ১৯৫১-এ ঢাকায় আগমন। বাবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব কর্মকর্তা হিসেবে দেশভাগের পরেই ঢাকায় আসেন। আজিমপুরের কাছেই ওয়েস্ট অ্যান্ড হাইস্কুলে ভর্তি। এখানে শিক্ষক লেখক শহীদ সাবেরের প্রেরণায় 'অগ্রগামী' হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ। ১৯৫৩-এ 'সৈনিক' পত্রিকায় প্রথম গল্প দুর্ঘটনা' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮-এ ওয়েস্ট অ্যান্ড হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাস। জগন্নাথ কলেজে আই.এ. শ্রেণিতে ভর্তি হলেও পড়াশোনা অসমাপ্ত থাকে। ১৯৫৮-এ 'ব্যাঘ্র ও নীল দুপুর', 'দ্রৌপদীর আকাশে পাখি'- নামে দুটি উপন্যাস রচনা। ১৯৫৯-এ কয়েক মাস দৈনিক 'সংবাদ-এ চাকরিও করেন। এরপর তিনি পারিবারিক ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়েন। বায়তুল মোকররাম মার্কেটে পৈতৃক স্বর্ণের দোকান ছিল। ১৯৬৭-এ বিয়ে করেন, স্ত্রী হোসনে আরা কাজল। এ সময় ছড়া ও কবিতা লেখেন। 'গাঙচিল' নামে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা। ১৯৮০-এ কবিদের সংগঠন 'পাদবলী'র সম্পাদক। কয়েক বন্ধু মিলে 'সাহিত্য সমবায়' নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান (১৯৮৮) শুরু। গ্রন্থ: 'অনুর পাঠশালা' (১৯৭০), 'জীবন আমার বোন' (১৯৭২), 'নিরাপদ তন্দ্রা' (১৯৭৯), 'কালো বরফ' (১৯৭৭) ও 'মাটির জাহাজ' (১৯৭৭), 'খেলাঘর' (১৯৭৮) 'অশরীরী' ('রোববার' পত্রিকায়), 'চিক্কোর মরণ কাবুক' ('শিশু' পত্রিকা), 'পাতালপুরী' (১৯৮৮), 'প্রতিদিন একটি রুমাল', 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৯৯)। সম্মননা: বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৭), দৈনিক জনকণ্ঠ গুণীজন সম্মাননা (১৯৯৯)। মৃত্যু. ঢাকা, ২১ জুলাই ২০০৮।

মিজানুর রহমান চৌধুরী (১৯২৮-২০০৬)॥ জন্ম. চাঁদপুর, ১৯ অক্টোবর, ১৯২৮। রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রী। কলেজ থেকেই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ১৯৬২-এ তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত



পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য। শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকার সময়ে দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৬৭-এ তিনি গ্রেফতার হন। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সম্মিলিত বিরোধী দলের অন্যতম সংগঠক। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। '৭০ এর নির্বাচনে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য হন। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩-এ সংসদ সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭৩-এ শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভায় তিনি তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বলাভ। ১৯৭৫-এ

শেখ মুজিব নিহত হলে আবদুল মালেক উকিল এবং মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের দু'টি অংশের সৃষ্টি। পরে জাতীয় পার্টিতে (সে সময়ের নাম জাতীয় দল) যোগ দেন (১৯৮৪)। ১৯৮৬-তে প্রধানমন্ত্রী হন। এরশাদের রাষ্ট্রপতি থাকাকালে তিনি দুই বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০-তে এরশাদ সরকার পতনের পর এরশাদ জেলে থাকাকালীন জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন। ২০০১-এ মিজানুর রহমান আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ছিলেন। মৃত্যু. ঢাকা, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

মিয়াধন॥ জন্ম. জাবেদা গ্রাম, সিলেট। গীতিকার ও সংগীতকার। সিলেট অঞ্চলের একজন প্রসিদ্ধ গান রচয়িতা ও সংগীতকার। ১৯৩২-এ সংগীত গ্রন্থ 'নূতন প্রেম ভাণ্ডার' প্রকাশিত। বাউল সুরে বহু গানের রচয়িতা হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ। 'প্রাণ ললিতা ত্বরা যাও গো বন্ধুরে আনিয়া দাও' গানটি বাউল সুরে রচিত। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ সঠিক জানা যায় না।

মিরজা আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৮৪)॥ জন্ম. আবদা গ্রাম, হবিগঞ্জ, সিলেট, ১ ডিসেম্বর, ১৯১৯। কথাসাহিত্যিক। প্রকৃত নাম মিরজা আবু মুসা আবদুল হাই। সিলেটে গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস (১৯৩৭)। সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এসসি. (১৯৩৯) ও একই কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বি.এসসি. (১৯৪২) ডিগ্রি লাভ। আসাম প্রাদেশিক সরকারের সরবরাহ বিভাগে ইন্সপেক্টর পদে চাকরিতে যোগদান (১৯৪৩)। ১৯৪৫-এ চিফ ইন্সপেক্টর অব সিভিল সাপ্লাই পদে উন্নীত। ১৯৪৫-তে ইস্ট পাকিস্তান জুনিয়র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পরের বছর (১৯৫৫) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নোয়াখালীর মাইজদিতে পোস্টিং লাভ। লক্ষ্মীপুর ও রাউজানের সার্কেল অফিসার পদে (১৯৫৯-১৯৬০) এবং চাঁদপুর ও টাঙ্গাইলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে (১৯৬০-১৯৬৪) দায়িত্ব



পালন। ১৯৬৪-তে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সদর দপ্তর ইসলামাবাদে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সেকশন অফিসার পদে যোগদান। ১৯৭৩-এর জানুয়ারি মাসে ইসলামাবাদ থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন এবং 'ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ'-এর ঊর্ধ্বতন নির্বাহী পদে যোগদান। ১৯৭৫-এ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে উপ-সচিব পদে পদোন্নতি লাভ। ১৯৭৬-এ এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ। ছোটগল্পকার হিসেবে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ। বাস্তব জীবনের আলেখ্য তাঁর গল্পে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত। ব্যক্তি ও সমাজকে অবলোকনের দৃষ্টি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ; সমকালীন মানুষ ও পরিবেশের গভীরতম স্তর প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর অনেক গল্পে। 'মেহেরজানের মা' গল্পটি এর প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'ছাড়া-প্রচ্ছায়া' (১৯৭৬) পাঠক সমাজ কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস রচনার অন্যতকম পথিকৃত। 'ফিরে চলো' (১৯৭৯) ও 'তোমার পতাকা' (১৯৮১) উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কিত। ছোটগল্পে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৭৭)। মৃত্যু. ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪।

মিরাজউদ্দীন, মৌলানা (?-১৯৫৪)॥ জন্ম. খলিসাপুর, পূর্বধলা, ময়মনসিংহ। শিক্ষাজীবন শুরু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে। অল্প সময়ের মধ্যে আরবি ও ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন। নিজ চেষ্টায় বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ। পূর্বধলা জগৎমণি হাই স্কুলের হেড মৌলভি হিসেবে কর্মজীবন শুরু। পরে সুফিমতে দীক্ষা গ্রহণ করে ভক্ত ও সাধকের জীবনযাপন। পির হিসেবে স্বীকৃতি লাভ। কিন্তু মৌলবাদে তেমন আস্থা ছিল না। মুরশিদি গান রচনা ও তাঁর গায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ধর্মীয় গান গাওয়ার জন্য মৌলবাদের দ্বারা তিরস্কৃত ও নিন্দিত। সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী। আরবি ও ফারসি থেকে বাংলা অনুবাদে দক্ষ। রচিত গ্রন্থ: মৌলানা বাণী। মৃত্যু. ১৯৫৪।

মির্জা মোহম্মদ ইউসফ আলী (১৮৫৮-১৯২০)॥ জন্ম. আলীয়াবাদ গ্রাম, রাজশাহী, ১৮৫৮। লেখক ও সমাজ-সংস্কারক। স্থানীয় শ্রীধরপুর মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে রাজশাহী নর্মাল স্কুলে ভর্তি। এ স্কুলের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ। ১৮৮৭-তে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে এন্ট্রান্স পাস। ১৮৯১-তে একই

পদ্ধতিতে এফ.এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য। নিজের চেষ্টায় ইংরেজি, উর্দু, আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন। কুচবিহার অঞ্চলের একটি বাংলা বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। এখানে কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর রাজশাহী লোকনাথ স্কুলে যোগদান। ১৮৮১-তে রংপুর সরকারি নর্মাল স্কুলে চাকরি লাভ। কিছুকাল স্কুল পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৮৩-তে সাব-রেজিস্ট্রার পদে চাকরি লাভ। ১৯১৭-তে অবসর গ্রহণ। উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে ইসলামি পুনর্জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ। এ কাজে পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ ও সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা। রাজশাহীর 'নূর-অল-ইমান সমাজ' (১৮৮৪), 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম' (১৮৯১) ও 'রাজশাহী জেলা মুসলমান শিক্ষা সমিতির' (১৯১৮) প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতির' কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য। মাসিক 'নূর-অল-ইমান' (১৯০০), দ্বি-মাসিক 'শিক্ষা সমাচার' ও চতুর্মাসিক 'মুসলমান শিক্ষা-সমবায়' (১৯২১) পত্রিকা সম্পাদানা। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সহযোগী ও তাঁর সম্পাদিত 'সোলতান' (১৯০৪) পত্রিকা প্রকাশে বিশেষ সহায়তা প্রদান। ১৮৯৯-তে রাজশাহী ফুলার হোস্টেল নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন। নওগাঁর মুসলিম হোস্টেল নির্মাণেও অবদান রাখেন। বাঙালি মুসলমানের সংঘবদ্ধ সাহিত্য-প্রয়াসের উন্মেষ যুগে মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলীর আত্মপ্রকাশ। মননে ও প্রকাশভঙ্গিতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ছিল সুস্পস্ট। তাঁর অমর কীর্তি ঈমাম গাজ্জালী রচিত 'কিমিয়ায়ে সা'আদত' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'সৌভাগ্য-স্পর্শমণি' (৫ খণ্ড, ১৮৯৫-১৯০৩)। রবীন্দ্রনাথের মতে এই 'গ্রন্থ ...বাঙলা ভাষার এক অমূল্য সম্পদ এবং কষ্টি পাথরে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে'। 'দুগ্ধসরোবর' (১৮৯১) মুসলমান সমাজের কল্যাণ কামনায় রচিত। 'খোশখবর' ও 'অন্তিমকালের কর্তব্য' তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ। মৃত্যু. ৩০ মে, ১৯২০।

মির্জা শেখ ইতিসামুদ্দীন (আঠারো শতক)॥ জন্ম. পাঁচনূর, নদীয়া, আঠারো শতক। পাঁচনূরের বর্তমান নাম কাজীপাড়া। ভ্রমণকারী, লেখক, দূত ও পণ্ডিত। শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম বিলেত যাত্রী। সম্রাট শাহ আলমের দূত হিসেবে ইংল্যান্ডে রাজা তৃতীয় জর্জের কাছে প্রেরিত ক্যাপ্টেন সুনটন-এর মুন্সি হিসেবে ফরাসি ভাষায় অভিজ্ঞ বাঙালি পণ্ডিত ইতিসামুদ্দীন (১৭৬৪-এর জানুয়ারি মাসে) বিলেত যাত্রা করেন। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সফর করে ১৭৬৬-এ তিনি বঙ্গদেশে ফিরে আসেন। ভারতের তৎকালীন প্রাচুর্যের জন্য ভাগ্যান্বেষী ইংরেজরা তখন ভারতে আসার জন্য ফারসি শিখতে শুরু করে। ইতিসামুদ্দীনের ফারসি ভাষায় দখলের জন্য তাঁকে সেখানে থেকে যাওয়ার জন্য বহু অনুরোধ করা হয়। কিন্তু স্বদেশ প্রেমিক এই বাঙালি তাতে রাজি হন নি। পরবর্তীকালে লেখা তাঁর সফরনামায় তিনি লেখেন: 'সুলেমানের সিংহাসন অপেক্ষা নিজ জন্মভূমির কাঁটা (বিদেশের) সুবাসিত ফুল অপেক্ষাও মধুরতর।' ১৭৭৯-তে তিনি তাঁর সফর অভিজ্ঞতা ফারসি ভাষায় রচনা করেন। তাঁর এই ভ্রমণ কাহিনীর মূল পাণ্ডুলিপির নাম: শিগার্ফ-নামা-এ-বিলায়েত বা বিলাতের আশ্চর্য দৃশ্যাবলী। মূল পাণ্ডুলিপি এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে মাদ্রাজের গভর্নরের দেহরক্ষী সেনাদলের অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন জেমস অ্যাডওয়ার্ড আলেকজান্ডার পাণ্ডুলিপিটির একটি সংক্ষিপ্ত ও কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করেন লন্ডন থেকে ১৮২৭-এ। এর প্রকাশক ছিলেন জন ডানকান। ১৯৮১-তে ঢাকা থেকে অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ-কৃত মূল ফারসি থেকে 'বিলায়েতনামা' নামে এই গ্রন্থটির একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইতিসামুদ্দীনের আরো কয়েকটি মূল পাণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে আছে ফারসি ভাষায় লেখা পারিবারিক ইতিহাস 'নসবনামা'। মির্জা ইতিসামুদ্দীন ফারসি, বাংলা, আরবি ও ইংরেজি জানতেন। বাংলা ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

মিসেস এম. রহমান (১৮৮৫-১৯২৬)॥ জন্ম. শেখপুর গ্রাম, আরামবাগ, হুগলী, ১৮৮৫। সাহিত্যিক, সমাজসেবী। হুগলী জজকোর্টের উকিল খানবাহাদুর মজহারুল আনওয়ার চৌধুরী তাঁর পিতা। পিতা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিরোধী থাকায় বাল্যে নিয়মিত লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বাড়ির হিন্দু সরকার এবং চাচাতো ভাইয়ের নিকট গোপনে লেখাপড়া শিক্ষা। এগার বছর বয়সে ফুরফুরার কাজী মাহমুদুর রহমানের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। স্বামীগৃহে 'নবনূর' পত্রিকায় বেগম রোকেয়ার নানা প্রবন্ধ পাঠ করে

তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রবন্ধ লেখায় উৎসাহ লাভ। প্রথম রচনা 'সহচর'-এ প্রকাশিত। এরপর ধূমকেতু, বিজলী, আত্মশক্তি, মোহাম্মদী, সওগাত প্রভৃতি কাগজে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ। তাঁর রচিত গ্রন্থ –উপন্যাস: মা ও মেয়ে। গল্প: চানাচুর। লেখালেখির মধ্য দিয়ে অধিকার বঞ্চিত মুসলিম মহিলার ন্যায্য অধিকার আদায়ে সংগ্রামী ভূমিকা পালন। সাহিত্যসাধনা এবং নারীজাগরণের অক্লান্ত সংগ্রামই ছিল তাঁর জীবনের কর্মসাধনা। মৃত্যু. ডিসেম্বর ১৯২৬।

মীর কাশিম॥ বাংলার নবাব। রাজত্বকাল ১৭৬০-১৭৬৪। গুজরাটের সুবেদার সৈয়দ ইমতিয়াজের পৌত্র। নবাব আলীবর্দী ও নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনাধ্যক্ষ ও পরবর্তীকালে বাংলার নবাব মীর জাফরের কন্যা ফাতেমা বেগমকে বিয়ে করে রাজদরবারে প্রতিপত্তি বিস্তার ও ক্রমোন্নতি লাভ। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) পরাজিত নবাব সিরাজদ্দৌলাকে মীর জাফরের আদেশে পশ্চাদধাবন করে বন্দী করেন। মীর জাফর (সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর ইনি বংলার নবাব হন) কর্তৃক প্রথমে রংপুরের ও পরে পূর্ণিয়ার ফৌজদার নিযুক্ত। ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে অক্টোবর ১৭৬০-এ মীর জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে বাংলার নবাব হন। প্রচুর অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইংরেজদের কাছ থেকে নবাবি লাভ, পরে অর্থ দিতে অপারগ হওয়ায় ইংরেজদের মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রামের জমিদারির আয় ছেড়ে দেন। রাজকোষের আয় বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের কতকগুলো বিভাগের ব্যয়ভার সংকোচন করেন ধনবান নগরবাসীদের অতিরিক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং জমিদারদের নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেন। শাসনকার্যে সুশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হন। প্রতারণা, দুর্নীতি ও কার্যে গাফিলতির জন্য কর্মচারীদের কঠোর শাস্তি দিতেন। মোগল-সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কর্মচারীদের সঙ্গে গুপ্ত মন্ত্রণার সন্দেহে মহারাজ নন্দকুমারকে কারারুদ্ধ করেন। শাহ আলম পাটনা অধিকারের চেষ্টা করলে বিহারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন। ইংরেজদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসনের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। সেখানে যুদ্ধাস্ত্রের কারখানা স্থাপন ও পাশ্চাত্য রীতিতে সৈন্যবাহিনীকে গড়ে তোলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার যে অধিকার ছিল, সে সুযোগ কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারী এবং এদেশিয় অনুগৃহীত কর্মচারীরাও ভোগ করতে থাকে। ফলে নবাবের আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় তিনি ইংরেজ গভর্নরের কাছ থেকে এর প্রতিকারের দাবি করেন, কিন্তু প্রতিকার না পাওয়ায় দেশীয় বণিকদের উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দেন। এতে ইংরেজ কোম্পানি ও কর্মচারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে নবাব মীর কাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ বাধে। নবাব ইংরেজ অনুগত জগৎ শেঠ, মহাতাব রায়, স্বরূপ চাঁদ, রাজা রাজবল্লভ, রামনারায়ণ প্রমুখ উচ্চপদস্থকে বন্দী করে মুঙ্গের দুর্গে আটক করেন। ফলে ৭ জুলাই ১৭৬৩-তে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। কাটোয়া, গিরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ২৩ অক্টোবর ১৭৬৪-তে সম্মিলিত বাহিনী বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হয়। পলাতক অবস্থায় দিল্লির উপকণ্ঠে দুর্দশার মধ্যে মৃত্যুবরণ। বুদ্ধিমান, তেজস্বী, কর্মদক্ষ ও স্বাধীন প্রকৃতির নবাব। মৃত্যু. ১৭৭৭।



মীর কাশেম খান, ওস্তাদ (১৯২৮-১৯৮৪)॥ জন্ম. শিবপুর গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১ জুলাই ১৯২৮। সেতার বাদক, সংগীত পরিচালক, সুরকার ও অর্কেস্ট্রা পরিচালক। শৈশবে পিতা ওস্তাদ নায়েব আলী খাঁর নিকট কণ্ঠ সংগীত ও তবলা যন্ত্রে হাতেখড়ি। পরে সেতার যন্ত্রে তালিম গ্রহণ। দীর্ঘদিন একটানা সাধনার দ্বারা সেতারে পারদর্শিতা অর্জন। পিতৃব্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর নিকট সংগীতে তালিম গ্রহণ। কর্মজীবনের শুরুতে কলকাতা ব্যালেট্রুপে সেতার বাদক হিসেবে যোগদান। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে ও জলসায় সেতার পরিবেশন করে প্রশংসা অর্জন। ১৯৪৯-এর ১ মে তারিখে ঢাকা বেতারকেন্দ্রে 'নিজস্ব শিল্পী' হিসেবে যোগদান। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী গওহর জামিলকে নৃত্যসংগীত বিদ্যাপীঠ 'জাগো আর্ট সেন্টার' স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান এবং

সংগীত পরিচালক ও বাদ্যযন্ত্র বিভাগের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন। সামান্য ক্ষতি, আনার কলি, বিচার, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যের সংগীত পরিচালক। ১৯৭৬-এ শ্রেষ্ঠ সেতার বাদক হিসেবে জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার লাভ। ১৯৭৮-এ 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী স্বর্ণপদক'-এ ভূষিত এবং ১৯৭৯-তে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'কৃতি সন্তান' হিসেবে সম্মানিত। ১৯৮৪-তে রেডিও বাংলাদেশ নিজস্ব শিল্পী সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত। একই বছরে সংগীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'একুশে পদক'-এ ভূষিত। মৃত্যুকালে রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উপ-প্রধান সংগীত প্রযোজক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্যু. ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৪।

মীর জাফর খাঁ (?-১৭৬৫)॥ নবাব আলীবর্দী খাঁর ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি। প্রথম জীবনে বাংলার নবাব আলীবর্দীর কাছে প্রতিপালিত হন। উচ্চ বংশীয় মুসলমান সন্তান হওয়ায় আলীবর্দী নিজের বৈমাত্রেয় ভগ্নী শাহ খানমের সঙ্গে মীর জাফরের বিয়ে দেন। ক্রমোন্নতির ফলে বখসির পদ লাভ। মারাঠা যুদ্ধে শৌর্য-বীর্য দেখিয়ে সুনাম অর্জন। ভীষণ ক্ষমতালোভী ছিলেন। আতাউল্লার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বঙ্গরাজ্য দখল করার চেষ্টা করায় নবাব আলীবর্দী কর্তৃক পদচ্যুত হন। পরে নওয়াজেস মহম্মদের অনুরোধে নবাবের ক্ষমা লাভ করে পুনরায় সেনাপতির পদ লাভ। ১৭৫৬-তে আলীবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব হলে তারও সেনাপতি হন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ মহলে প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াতে থাকেন। সিরাজের বিরোধী আত্মীয়বর্গ ও কর্মচারীদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুচতুর ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে গোপনে এক চুক্তি সম্পাদন করেন। সিরাজের পতন ঘটিয়ে নিজে নবাব হওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। ১৭৫৭-র ২৩ জুন ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও নীরব ভূমিকা পালন করে ২৪ জুন সিরাজের পতন ঘটান। ২৯ জুন ক্লাইভের অনুগ্রহে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবরূপে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। কার্যত ইংরেজরাই ক্ষমতার অধিকারী থাকে। ১৭৫৯-এ আলী গহরের নেতৃত্বে মোঘল সৈন্য পাটনা আক্রমণ করলে ক্লাইভের সহায়তায় মোঘলদের বিতাড়িত করেন। প্রতিদানে চব্বিশ পরগনার জমিদারি থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার রাজস্ব জায়গির স্বরূপ ইংরেজ কোম্পানিকে দান করেন। শাসনকালের চতুর্থ বছরে ইংরেজ কোম্পানিকে কলকাতায় টাকশাল স্থাপনের সুবিধা দেন। শাসনে অক্ষমতা, আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য দেশবাসীর উপর অতিরিক্ত করারোপ, ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ এবং অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ও তাদের চাহিদা মাফিক বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সুবিধাদি প্রদান—এ-সকল কারণে মীর জাফরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। ফলে ১৭৬০-এ ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। কন্যা-জামাতা মীর কাশিম ইংরেজদের সহায়তায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন (১৭৬০)। ১৭৬৩-তে ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশিমের বিরোধ উপস্থিত ও যুদ্ধ বাধলে কোম্পানির অনুগ্রহে মীর কাশিমের স্থলে পুনরায় মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন। ইংরেজগণ এই সুবাদে মীর জাফরের কাছ থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। মৃত্যু. কুষ্ঠ রোগে প্রাণত্যাগ ১৭ জানুয়ারি ১৭৬৫।



মীর মদন (?-১৭৫৭)॥ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাধ্যক্ষ। পলাশীর যুদ্ধে সমর নৈপুণ্য ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রদর্শন করে আত্মোৎসর্গ। হোসেন কুলি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হাসানউদ্দীন খাঁর পার্শ্বচররূপে ঢাকায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বীরত্ব ও বিশ্বস্ততার সংবাদ পেয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন এবং মীর জাফরকে কেবল নামে প্রধান সেনাপতি রেখে তাঁকে দেওয়ান-ই-অন বা সৈন্য পরিসংখ্যার প্রধানরূপে নিযুক্ত করেন। ১৭৫৭-র ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পক্ষে অধীনস্থ সেনাবাহিনীকে পরিচালিত করে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সহকারী মোহনলালসহ শত্রুর কামানের গোলায় রণক্ষেত্রেই প্রাণ ত্যাগ। মৃত্যু. ২৩ জুন ১৭৫৭।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)॥ জন্ম. লাহিনীপাড়া, কুষ্টিয়া, ১৩ নভেম্বর ১১৮৪৭। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক। ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম। পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন। স্বগৃহে মুন্সির কাছে আরবি ফারসি এবং পাঠশালায় পণ্ডিতের কাছে বাংলা শিক্ষা। স্কুলজীবন কাটে প্রথম কুষ্টিয়ায়, পরে পদমদী এবং শেষে কৃষ্ণনগরে। স্বগ্রামের জগমোহন নন্দীর পাঠশালা, কুমারখালির ইংরেজি বিদ্যালয়, পদমদী নবাব স্কুল ও কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নের কথা আত্মজীবনীতে আছে। লেখাপড়া কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। আলীপুর আদালতের আমীন নাদির হোসেনের আশ্রয়ে কলকাতায় কালীঘাট স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু লেখাপড়ায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। শেষে লেখা-পড়া ছেড়ে লাহিনীপাড়ায় এসে পিতৃসম্পত্তি দেখাশুনা করতে থাকেন। নাদির হোসেনের সুন্দরী কন্যা লতিফননেসার সঙ্গে মশাররফ হোসেনের বিবাহ স্থির হয়। বিবাহ-অনুষ্ঠানে কন্যা বদল করে নাদির হোসেন কর্তৃক তাঁর কুরূপা ও বুদ্ধিহীনা কন্যা আজিজননেসাকে মশাররফ হোসেনের সঙ্গে প্রদান (১৯ মে ১৮৬৫)। এ বিবাহে মশাররফ হোসেন সুখী হননি; তাই বিবি কুলসুমকে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী রূপে গ্রহণ। জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় ফরিদপুর নবাব স্টেটে চাকরি করে। ১৮৮৫-তে দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে টাঙ্গাইল আগমন। জমিদার পরিবারের সঙ্গে মনোমালিন্য ও স্থানীয় লোক ও কর্মচারীদের সঙ্গে বিবাদের কারণে টাঙ্গাইল ছেড়ে লাহিনীপাড়ায় প্রত্যাবর্তন। এরপর ভাগ্যান্বেষণে বগুড়া, কলকাতা এবং পদমদীতে যাতায়াত। ১৯০৩ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত কলকাতায় অবস্থান। কলকাতার সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) ও কুমারখালি গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩) পত্রিকার মফঃস্বল সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন। আজিজননেহার (১৮৭৪) ও হিতকরী (১৮৯০) নামক পত্রিকা সম্পাদনা। বঙ্কিম যুগের অন্যতম প্রধান গদ্যশিল্পী। ছাত্রজীবনেই 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'গ্রামবার্তায়' তাঁর রচনা প্রকাশিত। কাঙাল হরিণাথ তাঁর সাহিত্যগুরু। মুসলিম রচিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমন্বয়ধর্মী ধারার প্রবর্তক হিসেবে খ্যাত। পরবর্তীকালে বহু মুসলমান সাহিত্যিক কর্তৃক তা অনুসরণ। তাঁর বাংলা গদ্য ফেনিলোচ্ছল ও বেগবান। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক 'বঙ্গদর্শনে' (১৮৭২) তাঁর গদ্যরচনার ভূয়সী প্রশংসা। উপন্যাস, নাটক, জীবনী, আত্মজীবনী, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, কাব্যসংগীত প্রভৃতি বিষয়ক ৩৫টি গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থঃ রত্নবতী (১৮৬৯), গোরাই ব্রীজ বা গৌরী সেতু (১৮৭৩), বসন্তকুমারী নাটক (১৮৭৩), জমীদার দপর্ন (নাটক, ১৮৭৩), এর উপায় কি (১৮৭৫), বিষাদসিন্ধু (১৮৮৫-১৮৯১) সংগীত লহরী (১৮৮৭), গো-জীবন (১৮৮৯), বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯), উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০), তাহমিনা (১৮৯৭), টালা অভিনয় (১৮৯৭), নিয়তি কি অবনতি (১৮৮৯), গাজী মিয়াঁর বস্তানী (রসরচনা, ১৮৯৯), ভাই ভাই এতই চাই (১৮৯৯), ফাস কাগজ (১৮৯৯), এ কি! (১৮৯৯), পঞ্চনারী পদ্য (১৮৯৯), প্রেম পারিজাত (১৮৯৯), রাজিয়া খাতুন (১৮৯৯), বাঁধা খাতা (১৮৯৯), মৌলুদ শরীফ (১৯০৩), মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা (১ম ভাগ ১৯০৩, ২য় ভাগ ১৯০৮), বিবি খোদেজার বিবাহ (১৯০৫), হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ (১৯০৫), হযরত বেলালের জীবনী (১৯০৫), হযরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ (১৯০৫), মদিনার গৌরব (১৯০৬), বাজীমাৎ (১৯০৮), আমার জীবনী (আত্মরচিত, ১৯০৮-১৯১০), হযরত ইউসোফ (১৯০৮), খেতবা, আমার জীবনীর জীবনী বিবি কুলসুম (১৯১০)। বিষাদ সিন্ধু (মহরম পর্ব ১৮৮৫, উদ্ধার পর্ব ১৮৮৭, এজিদবধ পর্ব ১৮৯১) তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি। মহররমের বিষাদময় ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত মহাকাব্যধর্মী এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক স্থায়ী সম্পদ। বাংলার মুসলমান সমাজের অর্ধ শতাব্দীর জড়তা দূর করে আধুনিক ধারায় ও রীতিতে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমেই। মৃত্যু পদমদী, ১৯১২।



মীর মোহাম্মদ আলী॥ ফরিদপুরের জমিদার, রাজনীতিবিদ। ১৮৭৬-এ বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য (১৮৭৬)। সেন্ট্রাল

মহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সহসভাপতি (১৮৮৯)। ১৮৭৯-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি সিভিল সার্ভিস রেগুলেশন অ্যাক্ট (১৮৭৭) ও ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের (১৮৭৮) বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আনন্দমোহন বসুর আয়োজিত সভার সভাপতি। নওয়াব আবদুল লতিফের বন্ধু, সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের চাচাতো ভাই ও পৃষ্ঠপোষক। মীর মশাররফ হোসেন শেষ জীবনে তাঁর জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ইংরেজ সরকার কর্তৃক নওয়াব উপাধি প্রদান। মৃত্যুর পূর্বে স্কুল, মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি জনহিতকর কাজের জন্য তাঁর সম্পত্তির একটা বড় অংশ দান করে যান। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। মীর মশাররফ হোসেনের বই ছাড়াও তিনি মাইকেল, বিদ্যাসাগরের রচনা পাঠে আনন্দ পেতেন। প্রিয় বই ছিল আলালে ঘরের দুলাল'। তিনি 'সুধাকর' পত্রিকারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

মীর্জা হুসেন আলী। জন্ম. অষ্টাদশ শতাব্দী, মুরাদনগর, কুমিল্লা। গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। তান্ত্রিক সাধক। শক্তিধর্মে আস্থাভাজন বৈষ্ণব কবি ও কালীসাধক। সম্ভ্রান্ত বংশীয়। বরদাখাতের জমিদার আগা সাদেকের পুত্র মীর্জা ইব্রাহিম বেগের কনিষ্ঠ কন্যাকে বিয়ে। সে-সূত্রে বরদাখাত পরগনার এক-তৃতীয়াংশের জমিদার। বরদাখাতের নারায়ণপুর কালিবাড়ি ও মসজিদ তাঁর স্মৃতিবহ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দশশালা বন্দোবস্তের নথিপত্রে তাঁর নাম রয়েছে। তাঁর রচিত মালসি গান পূর্ববঙ্গে বহুল প্রচলিত ছিল। একটি ভক্তিমূলক গান 'আমি তোমার কি ধার ধারি,/ শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি/ বলে মীর্জা হুসেন আলী,/ যা করে মা জয় কালী'। অসংখ্য শ্যামাসংগীত রচনা। গানগুলির বেশির ভাগ হারিয়ে গেছে। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে তাঁর বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত।

মুকুন্দদাস (১৮৭৮-১৯৩৪)॥ জন্ম. বানাড়ি গ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, ১৮৭৮। চারণ কবি। পিতৃপ্রদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর। পদ্মা নদীতে বানাড়ি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে পিতা গুরুদয়াল দে সপরিবার বরিশাল চলে যান এবং বরিশালের ডেপুটির আদালতে তিনি আর্দালির চাকরি নেন। পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য গুরুদয়াল দে বরিশাল শহরের আলেকান্দা এলাকায় একটি মুদির দোকান খোলেন। মুকুন্দদাস বরিশাল জেলা স্কুল ও ব্রজমোহন স্কুলে পড়লেও প্রবেশিকা পাস করেন নি। পিতার মুদির দোকানে দোকানদারি করা ও বরিশাল শহরে অশান্ত যুবকদের নিয়ে হট্টগোল করা ছিল তাঁর প্রাক শিল্পী জীবনের কাজ। ১৯ বছর বয়সে বীরেশ্বর গুপ্ত নামে এক বৈষ্ণবের কণ্ঠে গান শুনে কীর্তনের দলে যোগদান। পরে তৎকর্তৃক একটি কীর্তনের দল গঠন। ১৯০২-এ রামানন্দ গোসাঁইজী বা হরিবোলানন্দ নামে এক ত্যাগী সাধুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ। মন্ত্রগুরু রামানন্দ স্বামী কর্তৃক 'মুকুন্দদাস' নাম দান। বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছে স্বদেশি মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ। চারণ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ। দেশাত্মবোধক সংগীত ও নাটক রচয়িতা। 'স্বদেশি যাত্রা' নামে এক অভিনব যাত্রার উদ্ভাবক, প্রবর্তক, প্রচারক ও অভিনেতা। 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায় লিখতেন। যাত্রাগানে সারা বরিশাল মাতিয়ে রাখতেন। কাজী নজরুল ইসলাম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক যথাক্রমে 'বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণ সম্রাট মুকুন্দ' উপাধিতে ও 'সন্তান' আখ্যায় ভূষিত। একজন স্বভাব কবি। বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ। গ্রামে গ্রামে দেশাত্মবোধক গান ও স্বদেশি যাত্রাভিনয়ের জন্য ইংরেজ সরকারের কোপানলে পড়েন। ১৯০৮-এ গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তিলাভ। 'মাতৃপূজা' গীত সঙ্কলনে ইংরেজ বিদ্বেষী গান প্রকাশিত হওয়ায় তিন বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা। জরিমানার টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে পৈতৃক দোকান বিক্রি। কারাবাসের সময়ে স্ত্রী সুভাষিণী দেবীর মৃত্যুবরণ। অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২) ও আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০) কালে তৎ-কর্তৃক যাত্রাপালা গেয়ে জনসাধারণের মনে দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি, কৃষক মজুর, জেলে, তাঁতি কামার, কুমোর ও নারীর জাগরণ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, পরাধীন ভারতকে ইংরেজ শাসকদের কবল থেকে মুক্ত করার বাণী তাঁর গান ও যাত্রাপালায় শাণিত অস্ত্রের মতো



প্রকাশিত রচিত গ্রন্থ: সাধনসংগীত, পল্লীসেবা ব্রহ্মচারিণী, পথ, সখী, সমাজ, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি। অসংখ্য মেডেল ও পুরস্কারে ভূষিত জনগণের কাছে 'চারণকবি' নামেই সমধিক পরিচিত। মৃত্যু. ১৮ মে ১৯৩৪

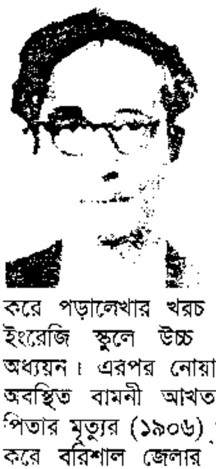
মুকুন্দবিহারী মল্লিক (১৮৮৮-১৯৭৪)॥ জন্ম. খাড়াসম্বল, বাগেরহাট, ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৭। রাজনীতিবিদ। নমঃশূদ্র পরিবারে জন্ম। পিতা প্রসন্নকুমার মল্লিক। মাতা বেলাদেবী মল্লিক। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হলে পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিকের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। বাগেরহাট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯০৫), কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ. (১৯০৭), একই কলেজ থেকে বি.এ. (১৯১০), এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালি ভাষায় এম.এ. (১৯১২) ও বি.এল. (১৯১৪) পাস। পালি ভাষায় এম.এ. পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে পালি ভাষা বিভাগের প্রভাষক পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু এই নিয়োগ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। পত্রিকায় লেখা হয়: 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চণ্ডালের পূজা'। এই ধরনের মন্তব্য মুকুন্দবিহারী মল্লিককে মানসিকভাবে আহত করে। তাই ১৯১৪-এ বি.এল. পাস করার পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতে শুরু করেন। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে এ সময়ে তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের রাজ্যপাল কারমাইকেল সঙ্গে মুকুন্দবিহারীর আলাপ হয় এবং রাজ্যপাল তাঁকে সহায়তার আশ্বাস দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯১৬-এ নমঃশূদ্র ছাত্রদের জন্য 'বাণীভবন' নামে আলাদা একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। বাগেরহাটে পড়াশুনার সময়ে মুকুন্দবিহারী মল্লিককে নমঃশূদ্র সমাজের স্বতন্ত্র সামাজিক অবস্থান এবং তাদের আর্থিক দুর্গতির বিষয়টি ভাবিয়ে তুলতো। লেখাপড়া শেষ করার পর এদের অবস্থা পরিবর্তন করার বিষয়টি তাঁর মাথায় আসে। এই লক্ষ্যে ১৯১৫-এ তিনি নিখিলবঙ্গ নমঃশূদ্র সমিতি নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি এর সভাপতি ছিলেন। ১৯১৭ এবং ১৯২০-এ কলকাতার ডালহৌসি স্কয়ারে, ১৯২৪-এ খুলনায়, ১৯৩০-এ যশোরে, ১৯৩৩ ও ১৯৩৪-এ বরিশালে এই সমিতির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৯-এ তিনি ভাইসরয়ের মনোনয়নে এমএলসি মনোনীত হন। ১৯২৯-এর ২১শে জানুয়ারি তাঁর নেতৃত্বে এই সমিতির ১০ জন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সাইমন কমিশনের সামনে অনুন্নত জাতির জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। ১৯৩২-এর ১৭ই আগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নীতি ঘোষণা করেন, তার পেছনে মুকুন্দবিহারীর ঐ ডেপুটেশনের ভূমিকা রয়েছে। এই ঘোষণার প্রতিবাদে গান্ধীজি ১৯৩২-এর ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে আমরণ অনশন করেন। পরে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে খানিকটা পরিমার্জিত হয় পুণা চুক্তির মাধ্যমে। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ১৯৩৭-এর ১লা এপ্রিলের নির্বাচনে বাগেরহাটের সংরক্ষিত আসন থেকে মুকুন্দবিহারী মল্লিক এমএলসি নির্বাচিত হন এবং শেরেবাংলার মন্ত্রিসভায় সমবায় ও ঋণশালিসি দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসী হন। তাঁর নামে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানায় জলিরপাড়-কলিগ্রাম মুকুন্দবিহারী মল্লিক উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যু. কলকাতা, ৪ আগস্ট ১৯৭৪।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ (আনুমানিক ১৫৪০-১৬০০)॥ জন্ম. দামুন্যা গ্রাম, বর্ধমান, আনুমানিক ১৫৪০। কবি। রাঢ়ীয় বংশজাত ব্রাহ্মণ হৃদয় মিশ্র তাঁর পিতা। ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে দামুন্যার পৈতৃক বাস্তুভিটা ত্যাগ করে মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ। জমিদার নন্দন রঘুনাথ রায়ের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত। রঘুনাথ রায়ের জমিদারি আমলে (১৫৭৩-১৬০৫) তাঁর সভাসদ নিযুক্ত। রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা (১৫৯৪/১৫৯৫)। বিচিত্র জীবন রসের প্রকাশ গুণে সৃষ্টি মঙ্গলকাব্যের সীমার মধ্যে থেকেও এতে বাস্তব জীবনের চিত্র উপস্থাপনে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় প্রদান। সাধারণ বাঙালির জীবন থেকে নেওয়া উপাদানের দ্বারা মুকুন্দরাম কর্তৃক তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চিত্র চরিত্র অঙ্কন। এজন্য তিনি দুঃখ বর্ণনার কবি হিসেবে আখ্যায়িত। কাব্যের

কাহিনী বিন্যাসে ও বিভিন্ন নর-নারীর চরিত্রাঙ্কনে এবং সমকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণে মুকুন্দরাম একালের একজন দক্ষ ঔপন্যাসিকের মতো তাঁর শিল্পকুশলতার পরিচয় প্রদানে সক্ষম হয়েছেন। কবির এ কাব্য 'অভয়ামঙ্গল' ও 'অম্বিকামঙ্গল' নামেও পরিচিত। কবি প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ রঘুনাথের কাছ থেকে কবিকঙ্কণ উপাধি লাভ। মৃত্যু. আনুমানিক ১৬০০।

মুখতার আহমদ সিদ্দিকী। ইতিহাস লেখক। পাবনার সিরাজগঞ্জের ইতিহাস লিখে খ্যাতি অর্জন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ: সিরাজগঞ্জের ইতিহাস (প্রথম সংস্করণ প্রকাশ, কলকাতা, ১৯১৫। জন্ম ও মৃত্যু. তারিখ অজ্ঞাত।

মুজফ্ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩)। জন্ম. মুসাপুর গ্রাম, সন্দ্বীপ, ৫ আগস্ট ১৮৮৯। রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও লেখক। এক দরিদ্র অথচ অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্ম। সন্দ্বীপ আদালতের মোক্তার মনসুর আলী তাঁর পিতা। গৃহশিক্ষকতা

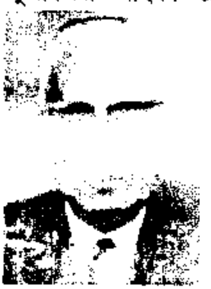


করে পড়ালেখার খরচ জোগাড়। সন্দ্বীপ মধ্য ইংরেজি স্কুলে উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। এরপর নোয়াখালী জেলার স্থলভাগে অবস্থিত বামনী আখতারিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি। পিতার মৃত্যুর (১৯০৬) পর মাদ্রাসার পাঠ ত্যাগ করে বরিশাল জেলার বুড়িরচর গ্রামে জনৈক কৃষকের বাড়িতে কিছুদিন গৃহশিক্ষকতা। মুসাপুর প্রত্যাবর্তন ও সন্দ্বীপ কার্গিল স্কুলে ভর্তি। ১৯০৭-এ হাজেরা বেগমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। ১৯১০-এ নোয়াখালী জেলা স্কুলে ভর্তি। এ স্কুল থেকে ১৯১৩-তে মেট্রিক পাস। এরপর হুগলী মহসিন কলেজে আই.এ.ক্লাসে ভর্তি। কিছুকাল পর এ কলেজের পাঠ ত্যাগ করে কলকাতায় গমন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই.এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য। কলকাতায় বাংলা সরকারের ছাপাখানায় কেরানিগিরি চাকরি গ্রহণ। ১৯১৮-তে চাকরি ত্যাগ করে কলকাতায় রাজনীতি, সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির' (১৯১১) সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার' (১৯১৮) সম্পাদনা কর্মে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। এ সময়ে সাহিত্য সমিতির দপ্তরের (৩২, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা) একটি কক্ষে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে বাস ও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত। মুজফ্ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলামের যুগ্ম সম্পাদনায় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' (১২ জুলাই ১৯২০-জানুয়ারি ১৯২১) প্রকাশিত। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হলে (১৭ অক্টোবর ১৯২০) এর কলকাতা শাখার সংগঠক নিযুক্ত। নজরুল ইসলাম সম্পাদিত অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' (১৯২২) পত্রিকায় দ্বৈপায়ন ছদ্মনামে নিয়মিত উপ-সম্পাদকীয় রচনা। ১৯২৩-এর ১৭ মে প্রথম কারারুদ্ধ। ১৯২৪-এ কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি হিসেবে বিচারে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ১৯২৫-এর ১২ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে জেলে থেকে মুক্তিলাভ। কিছুকাল 'গণবাণী' (১৯২৬-১৯২৮) পত্রিকা সম্পাদনা। ঐতিহাসিক মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার (২০ মার্চ ১৯২৯)। বিচারে তিন বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত। সাজা ভোগের পর ১৯৩৩-এর ৯ জানুয়ারি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ। নজরবন্দী অবস্থায় মুসাপুরে পৈতৃক ভিটায় প্রায় সাড়ে তিন বছর বাস। এ সময়ে তার একমাত্র সন্তান মোসাম্মৎ আফিয়া খাতুনের জন্ম। ১৯৩৬-এর ২৫ জুন গৃহবন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ। সাপ্তাহিক 'গণশক্তি' পুনঃপ্রকাশে (১৯৩৬) বিশেষ ভূমিকা পালন। ১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক তাঁর ওপর কলকাতা ত্যাগের ওয়ারেন্ট জারি। এ নির্দেশ অমান্য করলে এক মাস কারাদণ্ড ভোগ। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সরকারের কাছ থেকে পুনরায় কলকাতা ত্যাগের হুকুমনামা লাভ। এরপর আত্মগোপন অবস্থায় প্রায় দুই বছর কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রদান (১৯৪০-১৯৪২)। ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনে সভাপতিত্ব (১৯৪৫)। 'দৈনিক স্বাধীনতা' (১৯৪৫) প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন। মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ অনুযায়ী ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে (আগস্ট ১৯৪৭) ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি রাষ্ট্র গঠিত হলে, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক মুজফ্ফর আহমদকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা। ১৯৪৮-এ ভারত সরকারের নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেফতার। ১৯৫১-র ১৬

এপ্রিল কারাগার থেকে মুক্তিলাভ। চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের সময়ে (১৯৬২) ভারত রক্ষা আইনে গ্রেফতার। প্রায় দুই বছর কারাভোগের পর মুক্তিলাভ। চীন ও রাশিয়ার আদর্শগত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে সিপিআই ও সিপিএম নামে আত্মপ্রকাশ করলে (১৯৬৪), সিপিএম-এর পক্ষাবলম্ব। এ দলের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন। 'দৈনিক গণশক্তি' (১৯৬৬) প্রকাশে তাঁর অবদান স্মরণীয়। 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সির' একজন প্রধান সংগঠক ও 'গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রেসের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'কাকাবাবু' নামে কর্মী ও নেতাদের কাছে পরিচিত। বিশিষ্ট গদ্য লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে: স্মৃতিকথা' (১৯৫৯), 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা' (১৯৬৫), 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' (১ম খণ্ড ১৯৬৯ ও ২য় খণ্ড ১৯৭২), 'ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ' (১৯২১-১৯৩৩) ইত্যাদি। সাম্যবাদী নেতা হিসেবে খ্যাত। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। কৃষক শ্রমিক তথা সমাজের সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সারাজীবন আপসহীন সংগ্রাম পরিচালনা। মৃত্যু. কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩।

মুজাম্মিল॥ বাংলার প্রাচীন মুসলিম কবিদের মধ্যে অন্যতম। আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কিংবা মধ্যবর্তী সময়ে জীবিত ছিলেন। চট্টগ্রামের অধিবাসী। সুফি-পন্থি কবি। পির বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম কিংবা বদর শাহ তাঁর পির ছিলেন। এ পর্যন্ত তিনটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলো: নীতিশাস্ত্র বার্তা, সায়াৎ নামা ও খঞ্জন চরিত্র।

মুজাফফর আহমদ চৌধুরী (১৯২৩-১৯৭৮)॥



জন্ম. বীরামিহপুর গ্রাম, নোয়াখালী, ২৩ নভেম্বর ১৯২৩। শিক্ষাবিদ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তাত্ত্বিক। পিতা মৌলভী ওবায়েদউল্লাহ (বাসিকপুর মাদ্রাসার হেড মৌলানা)। নোয়াখালীর ফরাসগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ১৯৩৮-এ প্রথম বিভাগে মেট্রিক, ফেনী কলেজ থেকে ১৯৪০-এ প্রথম বিভাগে আই.এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৩-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৪৪-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৯৫৮-১৯৬০ পর্যন্ত লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ The Civil Service in Pakistan: Centrally Recruited Civil Service বিষয়ে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ১৯৪৫-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৫০-১৯৫২ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্র-জনতা হত্যা ও পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আয়োজিত ২৩ ফেব্রুয়ারির সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা দাবি করে এবং সরকারের গণবিরোধী ও দমননীতির তীব্র সমালোচনা করে বক্তৃতা করলে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার। এক বছরের বেশি সময় কারাভোগের পর ১৯৫৩-র ৫ মে মুক্তিলাভ এবং পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কর্মে যোগদান। ১৯৫৫-র অক্টোবর থেকে ১৯৫৬-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাকিস্তান গণ-পরিষদের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ও ১৯৫৬ নভেম্বর থেকে ১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের প্রতিনিধিরূপে দায়িত্ব পালন। ১৯৬১-তে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রিডার ও ১৯৬৯-এ অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক রাওয়ালপিণ্ডিতে আহূত গোলটেবিল বৈঠকে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১০-১৩ মার্চ ১৯৬৯) আওয়ামী লীগ সদস্যদের উপদেষ্টা হিসেবে যোগদান। ষাটের দশকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব হয়, তিনি তার একজন তাত্ত্বিক। ১৯৭১-এ স্বাধীনতাযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা সেলের প্রধানের দায়িত্ব পালন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত (২১ জানুয়ারি ১৯৭২)। এক বছর তিন মাস উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৭৩-এর এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান পদ লাভ। ১৯৭৫-এর

২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত। কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল, ১৯৭৫)-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের হাতে নিহত হন। খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হলে মোশতাক সরকারের শিক্ষামন্ত্রীরূপেও দায়িত্ব পালন। একই বছরের ৭ নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এলে ৮ নভেম্বর মন্ত্রিত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ। পুনরায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোক-প্রশাসনের গবেষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: The Civil Service in Pakistan (1963), An Examination of the Criticism against Bureaucracy (1964), Government and Politics in Pakistan (1968), Rural Government in East Pakistan (1969)। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, জনপ্রিয় অধ্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের 'ম্যাক' (MAC) নামে পরিচিত। মৃত্যু, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭৮।

মুজিবুর রহমান খান, ফুলপুরী (১৮৮৯-১৯৬৯)॥ জন্ম, পাগলা গ্রাম, ফুলপুর, ময়মনসিংহ, ১৮৮৯। সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মী। রূপসী ভাট্টা গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ। ছাত্র বৃত্তি পান। ফুলপুর যতীন্দ্র হাই স্কুলে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা। অধ্যয়নরত অবস্থায় স্বদেশি স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগদান। প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা সূর্য সোমের প্রেরণায় কংগ্রেসে যোগদান। ১৯১৮ থেকে পরবর্তী কয়েক বছর ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। ১৯২৯-এ ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক নিযুক্ত। প্রজা আন্দোলনের জোয়ারে কৃষক-প্রজা দলে যোগদান। সুবক্তা ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। এ. কে. ফজলুল হকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত কৃষকপ্রজা আন্দোলনের মুখপত্র সাপ্তাহিক চাষীর (প্রতিষ্ঠা ২৬ জুন ১৯৩৬) আজীবন সম্পাদক। পত্রিকাটির বাংলাদেশে বিশেষ করে ময়মনসিংহের কৃষক ও গণ-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। প্রজাস্বত্ব আইন পাসের ব্যাপারে চাষীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনি বহু প্রবন্ধে কৃষকদের উপর শোষণ-নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন। সুসং অঞ্চলের কৃষক ও আদিবাসীদের বিদ্রোহ ও টংক প্রথার বিভীষিকাময় খবর প্রকাশের দায়ে ইংরেজ শাসক কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। সুসং দুর্গাপুর অঞ্চলে হাজং ও প্রজা বিদ্রোহের সময়ে এ পত্রিকায় প্রখ্যাত পণ্ডিত ও তৎকালীন ভারতীয় কৃষক-প্রজা সমিতির সভাপতি রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের কৃষক ও আদিবাসী সমস্যা-সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত। ধনবাড়ির জমিদার নওয়াব হাসান আলী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা-পার্টির একজন প্রথম শ্রেণির সংগঠক, প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ও নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক হিসেবে সকল মহলের শ্রদ্ধা অর্জন। মৃত্যু মে ১. ১৯৬৯।

মুজীবর রহমান (১৮৭৩-১৯৪০)॥ জন্ম, নেহালপুর গ্রাম, বশীরহাট-চব্বিশ পরগনা, ২২ জানুয়ারি ১৮৭৩। সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। পিতা মুন্সী এলাহি বখ্শ। এগারো বছর বয়সে পিতৃহীন হন। স্থানীয় ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাস করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। এফ.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। কলকাতার শিয়ালদহ পুলিশ কোর্টে শিক্ষানবিসের কাজে যোগদান। কিছুদিন পরে অস্থায়ীভাবে নাজিরের পদে নিযুক্তি লাভ। অচিরেই এ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতার বৌবাজারে একখানি মনিহারি দোকান খোলেন (১৯০০)। এ সময় থেকে রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় পত্রাদি প্রকাশ। কলকাতার আন্তনীবাগান থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ইসলাম রবি' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। কিছুদিন পর পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে মতভেদ ঘটায় এর সংশ্রব ত্যাগ। মাসিক 'মিহির ও সুধাকর' (১৮৮৫) পত্রে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ। আবুল কাশেমের (বর্ধমান) সম্পাদনায় কলকাতার বৌবাজার স্ট্রিট থেকে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' (৬ ডিসেম্বর ১৯০৬) প্রকাশিত হলে এর ম্যানেজার নিযুক্ত। এর দেড় মাস পরে আবুল কাশেম রোগাক্রান্ত হয়ে সম্পাদনার কর্ম ত্যাগ করে বর্ধমানে চলে



গেলে মুজীবর রহমান এ পত্রিকার (দি মুসলমান) সম্পাদক ও পরিচালক নিযুক্ত হন। সেই অবধি সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর (১৯০৬-১৯৩৬) যোগ্যতা, নিষ্ঠা, সাহসিকতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে 'দি মুসলমান' সম্পাদনা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার আবদুর রসুল ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। স্যার আশুতোষ চৌধুরী, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাজা বনবিহারী কাপুর ছিলেন এর নিয়মিত পাঠক ও গ্রাহক। ১৯২৫-এর ২০ জানুয়ারি থেকে 'দি মুসলমান' সপ্তাহে তিনবার করে প্রকাশিত হতে থাকে। শেষ পর্যায়ে 'দি মুসলমান' দৈনিকে রূপান্তরিত। অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে ১৯৩৬-এ 'দৈনিক মুসলমানের' জীবনান্ত ঘটে। তাঁর সম্পাদনায় ১৯২৬-এর জুলাই মাসে বাংলা সাপ্তাহিক 'খাদেম' (১৯২৬) এবং ১৯৩৭-এর ৪ জানুয়ারি ইংরেজি সাপ্তাহিক 'কমরেড' (১৯৩৭) প্রকাশিত। অবিভক্ত বঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। প্রথমে বঙ্গীয় বিপ্লবী দলের, তারপরে কংগ্রেস (১৮৮৫) ও সবশেষে মুসলিম লীগের (১৯০৬) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) যোগদান করে ১৯২১-এর ৯ ডিসেম্বর গ্রেফতার। এক বছর তেইশ দিন কারাদণ্ড ভোগের পর ১৯২২-এর ৩১ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ। এরপর মুসলিম লীগের রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়েন। বহুদিন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারি পদে দায়িত্ব পালন। ১৯২৭-এর ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ১৯শ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ১৯৩১-এ কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির' (১৯১১) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৭-এর ১৭ অক্টোবর নেহালপুরের গ্রামের বাড়িতে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত। প্রায় তিন বছর রোগ ভোগের পর পরলোক গমন। চিরকুমার মুজীবর রহমান ছিলেন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ইংরেজি ভাষায় সাংবাদিকতার অগ্রনায়ক। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে মুসলমান সমাজের একমাত্র ইংরেজি সংবাদপত্রের (দি মুসলমান) সম্পাদক বলে তাঁর খ্যাতি ও সম্মান ছিল সর্বব্যাপী। অবিভক্ত বঙ্গে ব্রিটিশ শাসনামলে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উন্নতি বিধানের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালান। মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ ও বক্তব্যাদি 'দি মুসলমান' পত্রিকায় নির্ভীক ও জোরালো সুস্পষ্ট উপস্থাপিত। কানপুর মসজিদ ভঙ্গ, আর'-সাহাবাদের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, বলকান যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে স্বদেশি ও বিদেশি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় আপসহীন ভূমিকা পালন। মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। গ্রন্থ: Interesting Selections। মৃত্যু. নেহালপুর, ২৬ এপ্রিল ১৯৪০।

মুজীবুর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪)॥ জন্ম. উলুয়াটি গ্রাম, নেত্রকোনা, ২৩ অক্টোবর ১৯১০। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। নেত্রকোনা আঞ্জুমান হাই স্কুল থেকে ১৯২৮-এ এন্ট্রান্স ও ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯৩৪-এ বি.এ.



পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি। কিছুদিন অধ্যয়নের পর বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে চব্বিশ পরগনার হারুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান। ১৯৩৬-এ 'দৈনিক আজাদ'-এর সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৩৯-১৯৬৫ পর্যন্ত এ পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক। এ ছাড়া কলকাতার সাপ্তাহিক 'কমরেড' ও ঢাকার মাসিক 'মোহাম্মদী'র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন। বিভাগ পূর্বকালে অল বেঙ্গল এন্টি ফেসিস্ট রাইটারস গিল্ডের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি, বঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য সমিতির সম্পাদক (১৯৪৪), পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক (১৯৪৫) এবং ১৯৪৬-এ ভারতের প্রথম গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদে সদস্যপদ ত্যাগ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য। পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক, বুলবুল ললিতকলা একাডেমির সহসভাপতি এবং রওনক সাহিত্য সমিতির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৫-১৯৭১ পর্যন্ত 'দৈনিক পয়গাম'-এর সম্পাদক। ১৯৬৭-তে রেডিও এবং টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের সমর্থনে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে পুনরায়

'আজাদ'-এ যোগদান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। সাংবাদিকতা ও সাহিত্য কৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ পাকিস্তান সরকারের 'সেতারা-এ-কায়েদে আজম' এবং বাংলাদেশ সরকারের 'একুশে পদক' (১৯৮০)-এ ভূষিত। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: পাকিস্তান, বিলাতে প্রথম ভারতবাসী, সাহিত্যের সীমানা, আমাদের ইতিহাস, গাজী ও শহীদ এবং সাহিত্যের বুনিয়াদ। মৃত্যু. ঢাকা, ৫ অক্টোবর ১৯৮৪।

মুনশী আশরাফ হোসেন (১৮৯২-১৯৬৫)॥ জন্ম. রহিমপুর গ্রাম. মুনশী বাজার, সিলেট, ১৮৯২। গবেষক, প্রবন্ধকার। বাল্যকাল থেকেই বাংলা শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ছিল। কিন্তু পিতা বিরূপ হওয়ায় খারিজি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে পাঁচ বছর অধ্যয়ন। এখানে আমপারা থেকে কোরান খতম করেন। ১৩/১৪ বছর বয়সে গোপনে শ্রীনাথপুরের অন্তর্গত নবকিশোর দাশ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত স্বদেশি নৈশ-স্কুলে ভর্তি হন। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। কালীপ্রসাদ মধ্য ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা। একটি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু। ১৯২১-এ শিলচর নর্মাল স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত, গুরু ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি এবং ট্রেনিং গ্রহণ শেষে শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ। সিলেটের লোকসাহিত্য সংগ্রহে জীবনের অনেকাংশ ব্যয় করেন। তিনি একজন খ্যাতনামা পুঁথি-সংগ্রাহকও ছিলেন। সিলেটি নাগরী লিপির লেখা পুঁথিও তিনি অজস্র সংগ্রহ করেন। ১৯১৮ থেকে সাহিত্যচর্চা শুরু। প্রথমত বিভিন্ন সাময়িকপত্রিকায় স্থানীয় সংবাদ পরিবেশন করতেন। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বহু প্রবন্ধ রচনা। সাহিত্য ও সমাজ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৫-এ কলকাতা নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কর্তৃক সাহিত্যরত্ন কাব্যবিশারদ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৫-এ বঙ্গ সাহিত্য মহামণ্ডল কর্তৃক পুরাতত্ত্ববিদ ও ১৯৬৪-তে পাকিস্তান সরকারের 'তমঘা-ই-কায়দে আজম' খেতাবে ভূষিত। সাহিত্য ও স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে নানা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনা। মধ্যযুগের সাহিত্য বিশেষত মুসলিম সাহিত্যিক সম্বন্ধে তিনি নানা প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর রচিত 'মণিপুরের লড়াই' নামক গাথাটি দীনেশচন্দ্র সেন East Bengal Ballads পর্যায়ে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: শান্তি কন্যার বারমাসী, ধনাই সাধুর গীত, লীলার বারমাসী, মাধব জালুয়ার বারমাসী, রাধারমণ সংগীত, মণিপুরের লড়াই, খটু সংগীত, সোনা বারইর গীত, মধুমালার গীত, হীরাধর বানিয়ার গীত, রাগ মারফাত, সিলেটের ইতিহাস, গীতরূপের মনোহর রাগ বাউ, কোকিলা কন্যার বারমাসী, দিলখোস কন্যার বারমাসী, খঞ্জন সুন্দরীর বারমাসী, কাঞ্চন সুন্দরীর বারমাসী ইত্যাদি। এ ছাড়া বহু পাঠ্য-পুস্তক রচনা করেন, যেমন–মক্তব শিক্ষা, সাহিত্য সুধা, সাহিত্য ঝর্ণা প্রভৃতি। তাঁর রচিত সিলহটের ইতিহাস (১৩৬৩-১৩৬৯) মাসিক আল ইসলাহ্ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। মৃত্যু. ১৯৬৫।

মুনশী রইসউদ্দিন (১৯০১-১৯৭৩)॥ জন্ম. নাকোল গ্রাম, মাগুরা, জানুয়ারি ১৯০১ (২৩ পৌষ ১৩০৮)। উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী। পিতা মুনশী আব্বাসউদ্দিন। দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্ম। দশ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ। বিমাতার হাতে লালিত-পালিত।



সংগীতের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন ফুফাতো ভাই উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী শামসুল হকের কাছে। মেট্রিক পাস করার পর গ্রাম ছেড়ে চাকরির সন্ধানে কলকাতায় গমন। কিছুদিন পর এক অয়েলম্যান স্টোরে সেল্‌সম্যানের চাকরি লাভ। ওস্তাদ রাসবিহারী মল্লিকের কাছে ধ্রুপদ ও খেয়ালে তালিম গ্রহণ। কয়েক বছর পর কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যান পিতার ডাকে। এরপর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ এবং কুষ্টিয়া কটন মিলে চাকরি গ্রহণ। কুষ্টিয়ায় একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ওপর শিক্ষা গ্রহণের জন্য পুনরায় কলকাতা গমন। গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী কর্তৃক পরিচালিত 'কলকাতা সংগীত কলাভবনে' ভর্তি। সেখান থেকে ক্লাসিক্যাল মিউজিকে সার্টিফিকেট লাভ (১৯৪২)। এর পূর্বে ১৯৩৮ থেকে কলকাতা বেতারে সংগীত পরিবেশন। প্রথমা পত্নীর পরলোকগমন (১৯৪৪)। মুর্শিদাবাদের সৈয়দা আলেয়া খাতুনকে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরূপে গ্রহণ। দেশ বিভাগের (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ঢাকা

বেতারের শিল্পী হিসেবে যোগদান। তৎকর্তৃক 'নারায়ণগঞ্জ সংগীত বিদ্যালয়' পুনর্গঠন এবং এর অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ। 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমির' (১ জুলাই ১৯৫৫) প্রতিষ্ঠাতা সহ-অধ্যক্ষ এবং ১৯৬৪-তে এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের গান পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে (২২ জুন ১৯৬৭) সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। সংগীতের নতুন নতুন রাগের স্রষ্টা হিসেবে খ্যাত। সংগীতের ওপর বাংলায় কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা। 'সংগীত পরিচয়', 'প্রবেশিকা সংগীত শিক্ষা পদ্ধতি', 'অভিনব শতরাগ', 'গীত লহরী', 'ছোটদের সা-রে-গা-মা' তাঁর সংগীতবিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'অভিনব শতরাগ' গ্রন্থের জন্য 'দাউদ পুরস্কার' লাভ (১৯৬৬)। সংগীতের গবেষণার ক্ষেত্রে অবদান রাখায় তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের 'প্রাইড-অব-পারফরমেন্স' সম্মানে ভূষিত। মৃত্যু. ঢাকা, ১১ এপ্রিল ১৯৭৩।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)॥ জন্ম. মানিকগঞ্জ শহর, ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ১৯২৫। পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী। শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, অনুবাদক, সমালোচক, বাগ্মী। পিতা আবদুল হালিম চৌধুরী (খানবাহাদুর) ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ১৯৪১-এ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক, ১৯৪৩-এ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে আই.এসসি, ১৯৪৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বি.এ. (অনার্স) ও ১৯৪৭-এ একই বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা) থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. (ইংরেজি) পাস। নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে জেলখানায় পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ। এম.এ. প্রথম পর্ব (১৯৫৩) ও এম.এ. দ্বিতীয় পর্ব (১৯৫৪) উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। ১৯৫৮-তে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পাস। ১৯৪৯-এ লিলি চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে



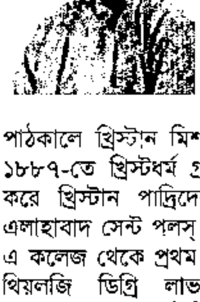
আবদ্ধ। ১৯৪৯-১৯৫০ পর্যন্ত খুলনার দৌলতপুরের ব্রজলাল কলেজের ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৯৫০-এ জগন্নাথ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক (১৯৫০-১৯৫২ ও ১৯৫৪-১৯৫৫), বাণিজ্য বিভাগের খণ্ডকালীন ইংরেজির প্রভাষক (১৯৫০-১৯৫১), বাংলা বিভাগের খণ্ডকালীন প্রভাষক (১৯৫৫)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক (১৯৫৫-১৯৬২), রিডার (১৯৬২-১৯৭০), অধ্যাপক (১৯৭০-১৯৭১)। বাংলা বিভাগের প্রধান (১৯৬৮-১৯৬৯, ১৯৬৯-১৯৭১)। কলা অনুষদের ডিন (১৯৭১)। ছাত্র-জীবনেই বামপন্থি চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ। ১৯৪৩-এ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগদান। ১৯৪৮-এ কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে যোগদান। ঐ বছরের শেষের দিকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। এ-বছরের ২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ড ও পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক সভায় বক্তৃতা করার দায়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার ও ১৯৫২-১৯৫৪ পর্যন্ত জন নিরাপত্তা আইনে কারাভোগ। ১৯৫৩-র ১৭ জানুয়ারি কারাগারে বসে বিখ্যাত 'কবর' নাটক রচনা। একুশের পটভূমিতে রচিত নাটকটি ঐ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি রাজবন্দীদের দ্বারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অভিনীত হয়। ১৯৫৪-র ৪ এপ্রিল পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হলে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ। কেন্দ্রীয় সরকার একই বছর ২৯ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ববঙ্গে ৯২ (ক) ধারার শাসন প্রবর্তন করলে পুনরায় গ্রেফতার। সেই বছর অক্টোবর মাসে বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ। বাংলা টাইপ রাইটিংয়ের কী-বোর্ড যা মুনীর অপটিমা নামে পরিচিত, তার উদ্ভাবক (১৯৬৫)। ১৯৬৭-র ২২ জুন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে এক বিবৃতিতে রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। বাংলা বর্ণমালা সংস্কার পদক্ষেপের বিরোধিতা (১৯৬৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ-নাটক: রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), চিঠি (১৯৬৬), কবর (১৯৬৬), দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬), পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৯)। অনুবাদ নাটক: কেউ কিছু বলতে

পারে না (১৯৬৭), রূপার কৌটা (১৯৬৯), মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০)। প্রবন্ধ গ্রন্থঃ ড্রাইডেন ও ডি.এল. রায় (১৯৬৩, পরে তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত), মীর মানস (১৯৬৫), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯), বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০)। ১৯৬২-তে নাটকে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৬৫-তে মীর মানস গ্রন্থের জন্য দাউদ পুরস্কার এবং ১৯৬৬-তে সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব লাভ। ১৯৭১-এর মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু-কর্তৃক আহূত অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব বর্জন। নাট্যকার, অনুবাদক, শ্রোতাসম্মোহনকারী বক্তা, কৃতী অধ্যাপক, সমালোচক, প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী মুনীর চৌধুরী বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাত। মৃত্যু. ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে বিবৃতি দিলেও ঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পাননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানি বাহিনীর এ দেশীয় সহযোগী আলবদর বাহিনী-কর্তৃক অপহৃত এবং নিখোঁজ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মুন্সী আবদুর রউফ, ল্যান্সনায়েক (১৯৪৩-১৯৭১)॥ জন্ম. সালামতপুর গ্রাম, বোয়ালমারী, ফরিদপুর, ১৯৪৩। বীরশ্রেষ্ঠ। কৈশোরে বাবা মারা যাওয়ার ফলে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। ১৯৬৩-র ৮ মে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ ভর্তি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুতে চট্টগ্রামে ১১ নম্বর উইং-এ চাকরিরত ছিলেন। সে সময়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগদান। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটি-মহলছড়ি জলপথ প্রতিরোধ করার জন্য চিংড়ি খালের বুড়িঘাটে অবস্থান নেয়। ৮ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের দু কোম্পানি সৈন্য, সাতটি স্পিড বোট এবং দুটি লঞ্চে করে বুড়িঘাট দখলের জন্য অগ্রসর হয়। প্রতিরক্ষা ব্যূহের সামনে এসে ৩" মর্টার এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্র দিয়ে হঠাৎ অবিরাম গোলা বর্ষণ শুরু করে। গোলাবৃষ্টির তীব্রতায় তিষ্ঠানোর উপায় ছিল না, প্রতিরক্ষার সৈনিকরা পেছনে সরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু পিছু হটতে অস্বীকৃতি জানান ল্যান্সনায়েক আবদুর রউফ। নিজ পরিখা থেকে মেশিনগানের গুলি বর্ষণ শুরু করেন। পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না শত্রুরা। মেশিনগানের এই গুলি বর্ষণের ফলে স্পিড বোটগুলো ডুবে যায় এবং আরোহীরা হতাহত হয়। পেছনের দুটো লঞ্চ দ্রুত পিছু হটে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে শুরু করে দূরপাল্লার ভারী গোলাবর্ষণ। ওদের সঙ্গে বেশিক্ষণ লড়তে পারেননি ল্যান্সনায়েক আবদুর রউফ। মর্টারে গোলা এসে পড়ে তাঁর উপর। লুটিয়ে পড়েন তিনি, নীরব হয়ে যায় তাঁর মেশিনগান। ততক্ষণে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে সক্ষম হন তাঁর সহযোদ্ধারা। স্বাধীনতার পর তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করা হয়। মৃত্যু. বুড়িঘাট ৮ এপ্রিল ১৯৭১।



মুন্সী জমিরউদ্দীন (১৮৭০-১৯৩৭)॥ জন্ম. গাঁড়াডোব গ্রাম, মেহেরপুর, জানুয়ারি ১৮৭১ (১৫ মাঘ, ১২৭৭)। ধর্মপ্রচারক ও লেখক। নিষ্ঠাবান মুসলিম পরিবারে জন্ম। বাল্যকালে নামাজ-রোজা প্রভৃতি ইসলামিক বিধিবিধান নিয়মিতভাবে পালন। কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে পাঠকালে খ্রিস্টান মিশনারিদের সংস্পর্শে এসে ১৮৮৭-তে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ। নর্মাল পাঠ সমাপ্ত করে খ্রিস্টান পাদ্রিদের সহায়তায় ১৮৯১-তে এলাহাবাদ সেন্ট পলস্ ডিভিনিটি কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে হায়ার গ্রেড অব থিয়লজি ডিগ্রি লাভ (১৮৯৩)। কলকাতা ক্যাথিড্রাল মিশন ডিভিনিটি কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন। এ-সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খ্রিস্টধর্মতত্ত্ব এবং সংস্কৃত, আরবি, গ্রিক, হিব্রু ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা গ্রহণ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ। কিছুকাল পরে বাইবেলের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে মনে সংশয় দেখা দেওয়ায় খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে আবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ। এরপর স্বীয় গ্রামের



স্কুলে শিক্ষকতার কর্মে যোগদান। কিছুকাল পর এ কর্ম ত্যাগ করে মুন্সী মেহেরুল্লাহর সহচর হিসেবে ইসলাম ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ। খ্রিস্টান মিশনারিরা ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করে যে সব পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করেন তার প্রতিবাদে পুস্তক রচনা করে খ্যাতি অর্জন। ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্যের অন্বেষণই তাঁর লেখার বিষয়বস্তু। গ্রন্থ: আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত (১৮৯৭), হজরত ইসা কে? (১৮৯৯), ইসলামী বক্তৃতা (১৯০৭), মেহের-চরিত (১৯০৮), শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদরীর ধোকাভঞ্জন ১৯১৬, ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদরী ওয়েঙ্গার সাহেবের সাক্ষ্য (১৯১৬), ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদরী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য (১৯২৫), Glory of Islam (১৯২৯) ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মের একজন বিশিষ্ট প্রচারক ও সেবক। তেজস্বী ওয়াজকারী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ। মৃত্যু. গাঁড়াডোব, ২ জুন ১৯৩৭ (আষাঢ় ১৩৪৪)।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭)॥ জন্ম. ঘোপ, নলডাঙ্গা, ১৮৬১। ধর্ম প্রচারক। পৈতৃক নিবাস যশোর জেলার ছাতিয়া ডেলা গ্রাম। পাঁচ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষা লাভে অসমর্থ। মায়ের উৎসাহে মৌলভী মুহম্মদ ইসমাইলের আশ্রয়ে থেকে কোরান শরীফ পাঠ, পারসি গোলেস্তাঁ, বোস্তাঁ ও উর্দু ভাষা শিক্ষা। তারপর সংসার চালানোর উদ্দেশ্যে দর্জির কাজ শিখে যশোরে একটি দোকান স্থাপন। দর্জির কাজে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করায় সাহেবদের সুনজরে পড়ে একটি চাকরি লাভ। কিছুদিনের মধ্যেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় স্বাধীনভাবে দর্জির কাজ শুরু। এ সময়ে যশোরে খ্রিস্টান পাদ্রি-কর্তৃক ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করে খ্রিস্টান ধর্মের মহিমা প্রচার আরম্ভ, এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যাও প্রচার। মুন্সী মেহেরুল্লাহ পাদ্রিদের অপতৎপরতা সহ্য করতে না পেরে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে 'খ্রিস্টান ধর্মের অসারতা' নামে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এ সময়ে যশোরে 'ধর্মোৎসাহিকা' নামে



এক আঞ্জুমান সভা গঠন। ধীরে ধীরে ব্যবসায়ী জীবন ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে ধর্মপ্রচারকের জীবন গ্রহণ। অপূর্ব মনীষা ও বাগ্মিতার অধিকারী। যখন বক্তৃতা করতেন তখন ওয়াজ মহফিলে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকতেন। তর্কযুদ্ধেও পারদর্শী। তাঁর যুক্তিপূর্ণ তর্ক যুদ্ধের ফলে বহু অমুসলমান নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। মুসলমান সমাজের শিক্ষা সম্প্রসারণের দিকে বিশেষ নজর দান। এ উদ্দেশ্যে মনোহরপুর গ্রামে একটি মাদ্রাসা ও একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন। খানবাহাদুর বদরুদ্দিন হায়দর ও রাজ বাহাদুর নূর মোহাম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ সমাজ হিতৈষীর সহায়তায় 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি' গঠন। ১৯০৩-এ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি' এবং ১৯০৬-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত শিক্ষা সমিতি'-র অধিবেশনে যোগদান এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন। তিনি শুধু একজন ধর্ম প্রচারক নন, একজন বিখ্যাত লেখকও। অনেক সময় বক্তৃতা করতে গিয়ে কবিতা রচনা করে ফেলতেন। রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলো হলো: খ্রিস্টীয় ধর্মের অসারতা (১৮৮৬), মেহেরুল ইসলাম, বিধবা গঞ্জনা, উপদেশমালা, নবরত্নমালা বা বাংলা গজল, ইসলামী বক্তৃতামালা, হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা (১৯০৮) ইত্যাদি। মৃত্যু. ৭ মে ১৯০৭।

মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩)॥ জন্ম. কাউনিয়া, বরিশাল, ১৮৬২। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। আদি নিবাস বঙ্গীমাইনা গ্রাম, ঢাকা। পির, মুরিদি ও শিক্ষকতা ছিল তাঁদের বংশজাত পেশা। বাল্যকালে পিতৃহীন হন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের পিতৃব্যের আশ্রয়ে থেকে বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। কিছুকাল পরে কুমিল্লা জেলার রূপসা গ্রামের জমিদার ও লেখিকা নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর স্বামী চৌধুরী মোহাম্মদ গাজীর বাড়িতে নীত হন। সেখানে আরবি ও ফারসি অধ্যয়ন। ১৮৭৬-এ বাজাপ্তী গাজীপুর সার্কেল স্কুলে ভর্তি। সেখান থেকে বাঙ্গলা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ত্রিপুরা জেলায় (বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা) প্রথম হন। এরপর রূপসার পাঠশালায় শিক্ষকতা। পোস্ট মাস্টারের চাকরি গ্রহণ। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন। ১৮৮৩-এ কলকাতায় গমন। এখানে 'মুসলমান' (১৮৮৪) নামক পত্রিকার

সম্পাদক নিযুক্ত। পরে ঢাকায় 'শ্রীমন্ত সওদাগর' নামক একটি পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এরপর 'নবসুধাকর' (সাপ্তাহিক, ১৮৮৬) পত্রিকার সম্পাদক হন। এ সময় 'ইসলাম' (১৮৮৫) নামক মাসিক পত্রিকার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট হন। ১২৯৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে তাঁর চেষ্টা ও পরিচালনায় 'সুধাকর' পত্রিকা প্রকাশিত। পরে এর সম্পাদক হন। এ সময় 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯১) নামক অপর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা। ১৯০৬-এ তাঁর সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক সোলতান' পত্রিকা প্রকাশিত। শেষ জীবনে 'নবযুগ' ও 'বয়াত বন্ধু' পত্রিকা সম্পাদনা। সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। ১৮৮০-এ প্রকাশিত 'পদ্য-প্রসূন' নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকের মাধ্যমে। রচিত উল্লেখযোগ্য ধর্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ 'তোহফাতুল মুসলেমিন'; অন্যান্য গ্রন্থ—বোধোদয়তত্ত্ব, গ্রীসতুরস্ক যুদ্ধ, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনচরিত (১৯২৭), পাক পাঞ্জাতন, হজরত ফাতেমা জোহরা (রা), হক নসিহত, জঙ্গে রুম ও ইউনান, জোলেখা, বৃহৎ হীরকখনি, উপদেশ রত্নাবলী, জোবেদা খানমের রোজনামচা, আমিরজানের ঘরকন্না, বিলাতী মুসলমান (১৯০৯), কৃষকবন্ধু কাব্য (১৯২৫), আমার সংসার জীবন (১৯১৫), মুসলমান সাহিত্যের ইতিহাস, মোসলেম পাক প্রণালী ইত্যাদি। বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়কে ইসলামমুখী করে তোলাই ছিল তাঁর সাহিত্যসাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদের ভাষাজ্ঞান ছিল তীক্ষ্ণ। তিনি এক সময় বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' গ্রন্থের কয়েকটি অসঙ্গতি নির্দেশ করে পত্র লিখেন, বিদ্যাসাগর তা যথারীতি সংশোধন করে তাঁর পত্রের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯৩৩।

মুর্শিদকুলী খাঁ (?-১৭২৭)॥ বাংলার নবাব। দাক্ষিণাত্য-নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের সন্তান বলে কথিত। সহায়সম্বলহীন অবস্থায় হাজী সফি নামক পারস্যের এক বণিক তাঁকে ক্রয় করে ইস্পাহান নিয়ে যান। সেখানে তাঁর নাম রাখা হয় মহম্মদ হাদী। বণিক তাঁকে সন্তান জ্ঞানে লালন-পালন করে নানা বিষয়ে শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শী করে তোলেন। বণিকের মৃত্যুর পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। নিজের বুদ্ধিমত্তাগুণে তৎকালীন মোঘল-সম্রাট শাহজাহানের অধীনে চাকরি পান। পরে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার আওরঙ্গজেবের অধীনে রাজস্ব বিভাগে কাজ পান। আওরঙ্গজেব সম্রাট হলে (১৬৫৮) তিনি সুবে বাংলার দেওয়ানরূপে ঢাকায় প্রেরিত হন (১৭০০)। আওরঙ্গজের-পৌত্র শাহজাদা আজিম ওসমান (১৬৯৭-১৭০৭) তখন বাংলার নবাব হলেও প্রকৃতপক্ষে মুর্শিদকুলী খাঁ-ই বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। আজিম ওসমানের সঙ্গে মতবিরোধ হলে ১৭০১-এ তিনি রাজস্ব বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) থেকে মুখসুদাবাদে নিয়ে আসেন। ১৭০২-এ মুর্শিদকুলী খাঁ উপাধি লাভ; ১৭০৮-১৭০৯-এ দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান। পুনরায় বাংলার দেওয়ান হন। ১৭১৭-তে সম্রাট ফররুক শিয়র-কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হন। তখন মুখসুদাবাদের নাম পরিবর্তিত হয়ে তাঁর নামানুসারে মুর্শিদাবাদ হয় এবং ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী সেখানে স্থানান্তরিত হয়। বাংলায় মুর্শিদকুলী খাঁ-ই প্রথম মুসলমান যিনি রাজ্য শাসন ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল পর্যায়ে নিয়ে আসেন। তাঁর শাসনগুণে নতুন করে জমিদারি বন্দোবস্তে হিন্দু জমিদার ও প্রজাবর্গের মধ্যে সদ্ভাব গড়ে ওঠে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য অনেক থানা স্থাপিত হয়। নিজে পণ্ডিত ছিলেন এবং গুণীব্যক্তির কদর করতেন। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেক অবাঞ্ছিত কর পরিহার করেন। স্বভাবসিদ্ধ দূরদৃষ্টির জন্য ইংরেজদের সুনজরে দেখতেন না। জীবন-সায়াহ্নে (১৭২৩) মুর্শিদাবাদে বহু প্রাসাদ, কেল্লা ও দরবার-গৃহ নির্মাণ করেন। নির্মিত বিখ্যাত কাটরার মসজিদের সোপানতলে তাঁর মরদেহ সমাহিত। মৃত্যু. ১৭২৭।



মুহম্মদ আবদুল মুকতাদির (১৯৪০-১৯৭১)॥ জন্ম. সিলাম গ্রাম, সিলেট, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০; শিক্ষাবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২-তে ভূতত্ত্বে এম.এসসি. এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭-তে ভূতত্ত্বে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ। ১৯৬৩-১৯৬৪ পর্যন্ত সহকারী ভূতত্ত্ববিদ পদে পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত। ১৯৬৪-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত; প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী;

ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলন ও ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুতে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় হত্যা করে।

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)। । জন্ম. মরিচা গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ২৬ নভেম্বর ১৯১৯। শিক্ষাবিদ, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক। পিতা আবদুল গনি রাজশাহী জেলার পোরশা গ্রামের বিখ্যাত 'সাহু' পরিবারে শিক্ষকতা ও ইমামতি করতেন। রাজশাহী মাদ্রাসা থেকে উচ্চ মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার (১৯৩৬)। ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি। একই বছর মরিচা গ্রামের জমিদার-কন্যা আনিসা বেগমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯৩৬)। প্রথম বিভাগে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে আই.এ. পাস (১৯৩৮)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি.এ. অনার্স (১৯৪১) এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. (১৯৪২) ডিগ্রি লাভ। 'বেঙ্গল জুনিয়ার এডুকেশন সার্ভিস'-এ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান এবং এই-সূত্রে কৃষ্ণনগর কলেজ, রাজশাহী সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ ও ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা। ১৯৪৯-এ বাংলার প্রভাষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। ১৯৫২-তে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানে এম.এ. পাস। ধ্বনিবিজ্ঞানে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল A Study of Nasals and Nasalization in Bengali। ১৯৫৪-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৯৬২-তে অধ্যাপক পদ লাভ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালির শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ ও মমতা। পাকিস্তান সরকার-কর্তৃক আরবি ও রোমান হরফে বাংলা প্রচলন ও বাংলা বর্ণমালা সংস্কার পরিকল্পনার বিরোধিতা করে এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সেই পদক্ষেপের বিরোধিতা (জুন ১৯৬৭)। ১৯৫৬-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রথম প্রকাশিত ষান্মাষিক 'সাহিত্য পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। বাংলা ভাষার বিভিন্ন ধ্বনির গঠন, উচ্চারণ ও ব্যবহারবিধির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে এ ক্ষেত্রে যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তা তুলনাহীন। তিনি যে কেবল একজন ভাষাবিজ্ঞানী ও ধ্বনিবিজ্ঞানী এবং একজন গবেষকই ছিলেন তা নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল। ১৯৬৩-র ২২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ও বাংলা বিভাগ আয়োজিত 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ'-এর প্রস্তুতি সমিতির সভাপতি। এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল সেই সময়ে বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেয়া পাকিস্তানি সংস্কৃতির বিরোধিতা করা এবং নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৫৪), বিলাতে সাড়ে সাত শ' দিন (১৯৫৮), তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা (১৯৫৯), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৬০), A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali (১৯৬০), ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪), বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে, ১৯৬৮)। প্রবন্ধ ও গবেষণার জন্য ১৯৬১-তে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, রেল লাইনে কাটা পড়ে, ৩ জুন ১৯৬৯।



মুহম্মদ আবুবকর, মওলানা (১৯১২-১৯৭৩)। জন্ম. শহরদিয়া গ্রাম, কুষ্টিয়া, ১৯১২। কবি, গীতিকার ও শিক্ষাবিদ। ১৯২৮-এ কলকাতা মাদ্রাসা থেকে ১ম বিভাগে ফাজেল পাস। ১৯৩৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়া কলেজ থেকে আরবিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস এবং প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ। ১৯৫২-তে শিক্ষায় ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। বত্রিশ বছর শিক্ষকতা করার পর শিক্ষা বিভাগের অধীনে পি. টি. ইনস্টিটিউটের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদ

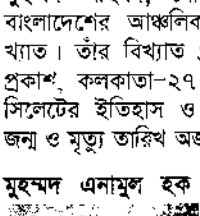
থেকে অবসর গ্রহণ। প্রকাশিত গ্রন্থ—অনুবাদ; বাংলা আমপারা (১৯৩৩), ভোরের আজান (১৯৪০)। মৃত্যু. ২৯ জুলাই ১৯৭৩।

মুহম্মদ আবুল মঞ্জুর (১৯৪০-১৯৮১)॥ জন্ম. গুপিনাথপুর, কসবা, কুমিল্লা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০। পৈতৃক নিবাস কামালপুর, চাটখিল থানা, নোয়াখালী। মুক্তিযোদ্ধা। কলকাতায় শিক্ষাজীবন শুরু। পঞ্চম শ্রেণিতে ঢাকার আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি। নবম শ্রেণিতে পাঞ্জাবের সারগোদা পাবলিক স্কুলে ভর্তি। এখান থেকে ১৯৫৫-তে সিনিয়র কেমব্রিজ এবং ১৯৫৬-তে আই.এসসি. পাস। ১৯৬৮-তে কানাডার স্টাফ কলেজ থেকে পাস করে পি. এসসি. ডিগ্রিলাভ। ১৯৫৭-তে কাকুল সামরিক একাডেমিতে যোগদান এবং ১৯৫৮-তে পাকিস্তান সামরিক একাডেমি থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কমিশন লাভ। সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় সি.এস.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সি.এস.পি. হন, কিন্তু সেনাবাহিনী ত্যাগ করার অনুমতি পাননি। ১৯৭১-এর প্রথম দিকে পাকিস্তানের শিয়ালকোটস্থ একটি ব্রিগেডের 'ব্রিগেড মেজর' হিসেবে দায়িত্ব লাভ। একই বছর ২৬-এ মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে জুলাই মাসে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ। ৮ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত। এই সেক্টরের অধীনে ছিল কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা। পরে বরিশাল ও পটুয়াখালীকে এই সেক্টর থেকে বাদ দেয়া হয়। তাঁর সেক্টরের সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই হাজার, গেরিলা সাত হাজার। সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টরের হেড কোয়ার্টার ছিল বেনাপোল। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬) ডিসেম্বর ১৯৭১) পর যশোরস্থ ৫৫ নম্বর ব্রিগেডের কমান্ডার নিযুক্ত দুই বছর এ পদে দায়িত্ব পালনের পর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাই কমিশনের অফিসে মিলিটারি অ্যাডভাইজার নিযুক্ত। ১৯৭৫-এর ১৩ নভেম্বর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিফ অফ জেনারেল স্টাফ নিযুক্ত। ১৯৭৭-এর শেষের দিকে চট্টগ্রামের ২৪তম ডিভিশনের জি.ও.সি-র দায়িত্ব গ্রহণ এবং ২৯ মে, ১৯৮১ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ৩০ মে ৮১ তারিখে চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অফিসারদের একটি দলের হাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হলে মেজর জেনারেল মঞ্জুর সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনের প্রধানরূপে নিজেকে ঘোষণা করেন। পরে ঢাকা-কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলে তিনি আত্মগোপনের প্রয়াস পান, কিন্তু ২ জুন, ১৯৮১ চট্টগ্রামে ধরা পড়েন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে চট্টগ্রামে সামরিক ছাউনিতে নেওয়া হলে অজ্ঞাতনামা অস্ত্রধারীর গুলিতে নিহত হন। মুহম্মদ আবুল মঞ্জুর দক্ষ সামরিক অফিসার ও জ্ঞানচর্চায় উৎসাহী বলে পরিচিত ছিলেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেন দেশের স্বাধীনতার পক্ষে লড়বার জন্যে। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য সরকার-কর্তৃক 'বীর-উত্তম' খেতাবে ভূষিত। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ২ জুন ১৯৮১।



মুহম্মদ আহমদ, মৌলবী॥ ইতিহাস লেখক। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার জন্য খ্যাত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ; শ্রীহট্ট দর্পণ (প্রথম প্রকাশ, কলকাতা—২৭ মার্চ ১৮৭৭)। বইটিতে সিলেটের ইতিহাস ও ভূগোল বর্ণিত হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২)॥ জন্ম. বখতপুর গ্রাম, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯০২ শিক্ষাবিদ ও গবেষক। মওলানা আমিনুল্লাহ (কলকাতা) মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষা লাভ। ঈশাপুর পরগণার বিখ্যাত মৌলবী পরিবারে জন্ম। ছাত্রাবস্থায় পিতৃব্য-কন্যা রশীদহ খাতুনের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ (১৩৩০)। রাউজান হাই স্কুল থেকে ১৯২৩-এ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাস এবং মহসীন বৃত্তি লাভ। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে ১৯২৫-এ প্রথম বিভাগে আই.এ. পাস ১৯২৭-এ চট্টগ্রাম কলেজ থেকে দ্বিতীয়



শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে আরবিতে বি.এ. অনার্স এবং ১৯২৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইন্ডিয়ান ভার্নাকুলার বিভাগ থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯২৯-১৯৩৪ পর্যন্ত অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক। গবেষণার বিষয়: History of Sufism in Bengal। ১৯৩৫-এ পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ১৯৩৬-এ ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. টি. ডিগ্রি লাভ ও চট্টগ্রামের মীরশরাই-এর জোরওয়ারগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত। ২৫ মে ১৯৩৭-এ হাওড়া জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্বভার গ্রহণ। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ মালদহ জেলা স্কুলে একই পদে যোগদান। ১৪ জুলাই ১৯৪৫-এ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত। ১০ এপ্রিল ১৯৪৮-এ রাজশাহী সরকারি কলেজে বাংলার অধ্যাপক পদে যোগদান। ১ জুলাই ১৯৫২-তে বেসরকারি দৌলতপুর কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ২৫ এপ্রিল ১৯৫৪-তে রাজশাহী সরকারি কলেজে বাংলার অধ্যাপক, ১৯ জুন ১৯৫৪-তে জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ও ২৭ নভেম্বর ১৯৫৪-তে পূর্ববাংলা স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত। ১ নভেম্বর ১৯৫৫-তে পূর্ববাংলা সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত। ১ ডিসেম্বর ১৯৫৬-তে বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদে যোগদান। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১-তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপকপদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৬৪-১৯৬ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক। ১৯৬৯-১৯৭৩ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক। ২৪ এপ্রিল ১৯৭৩-১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ১৯৭৭-এ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে যোগদান। ১৯৮১ থেকে আমৃত্যু ঢাকা যাদুঘরে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো। সাহিত্যকর্ম: আবাহন (গীতি সংকলন, ১৯২০-১৯২১), ঝর্ণাধারা (কবিতা সংকলন, ১৯২৮), চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য-ভেদ (১৯৩৫), আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সঙ্গে একযোগে রচনা, ১৯৩৫), বঙ্গে সুফীপ্রভাব (১৯৩৫), বাঙলা ভাষার সংস্কার (১৯৪৪), পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম (১৯৪৮), ব্যাকরণ মঞ্জরী (১৯৫২), মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯৫৭), বাংলাদেশের ব্যবহারিক অভিধান (স্বরবর্ণাংশ সম্পাদনা, ১৯৭৪), A History of Sufism in Bengal (Asiatic Society of Bangladesh, 1976), মনীষা মঞ্জুষা (১ম খণ্ড ১৯৭৫), মনীষা মঞ্জুষা (২য় খণ্ড ১৯৭৬), বুলগেরিয়া ভ্রমণ (১৯৭৮) আদ্যপরিচয় শেখ জাহিদ (সম্পাদনা, ১৯৮০)। সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ: Perso-Arabic Elements in Bengali (with Dr. G. M. Hilali, 1967), Abdul Karim Sahitya Bisharad Commemoration Volume (Asiatic society of Bangladesh, 1972). Dr. Mohammad Shahidullah Felicitation Volume (Asiatic society of Pakistan, 1966), ইমরুল কায়েসের কাব্য—নূরদ্দিন অনূদিত। মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য গ্রন্থের ইংরেজি ও উর্দু সংস্করণ (১৯৫৭-তে প্রকাশিত)। সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখায় ১৯৬৪-তে 'প্রেসিডেন্ট পুরস্কার', ১৯৬৮-তে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ', ১৯৭৯-তে 'একুশে পদক', ১৯৮০-তে শেরে বাংলা সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৮১-তে মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান তুলনারহিত। বিশেষ করে বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনের তাত্ত্বিক পুরোধা এবং নির্ভীক প্রবক্তা ছিলেন। ১৯৪৭-এর নভেম্বর মাসে 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'বাংলাকে ছাড়িয়া উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে পূর্ব-পাকিস্তানবাসী গ্রহণ করিলে, তাহাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্যু অনিবার্য।' বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। এদেশে অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে সরকারি দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নয় মাস গ্রামাঞ্চলে আত্মগোপন করে কাটান। মৃত্যু. পি. জি. হাসপাতাল, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২।

মুহম্মদ এয়াকুব (১৮৯৪-১৯৬০)॥ জন্ম, গালিমপুর, বরুড়া, কুমিল্লা, ১৮৯৪। পিতা মুন্সী

'বড় মিঞা' নামে পরিচিত। বামপন্থী



রাজনীতিবিদ, বিশেষত কৃষক আন্দোলনের নেতা হিসেবে সর্বভারতে নন্দিত। অল্প বয়স থেকেই জমিদার ও মহাজন বিরোধী। ১৯২০-২১-এ খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয়। প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত থাকলেও ক্রমে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ভাবাদর্শে উজ্জীবিত। কুমিল্লা জেলার লাকসামের হাসনাবাদে সংঘটিত বিদ্রোহে (১৯৩২) পুলিশের গুলিতে তিনজন কৃষক শহীদ হন। ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে এই বিদ্রোহ ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। মুখলেছুর রহমান, এরাদুল্লাহ, কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ভূমিকাও উজ্জ্বল। বিষ্ণু দে এই বিদ্রোহ নিয়ে কবিতা রচনা করেন। তিরিশের দশক থেকে গড়ে ওঠে ত্রিপুরা কৃষক সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন কামিনীকুমার দত্ত, আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, অছিমুদ্দিন আহমদ, মুখলেছুর রহমান, আবদুল মালেক ও মুহম্মদ এয়াকুব। আঞ্চলিক সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও এঁদের নেতৃত্বে ১৯৩৭-এর সাধারণ নির্বাচনে ত্রিপুরা জেলার সাতটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষকপ্রজা দলের প্রার্থীদের পরাজিত করে পাঁচটি আসনে সমিতির প্রার্থীর জয়লাভ। পরে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত। নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলনের (১৯৪২) সভাপতি। সে সভায় উপস্থিত ছিলেন জ্যোতি বসু, মণি সিংহ, বঙ্কিম মুখার্জি, ভূপেশ গুপ্ত, মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ। ১৯৪৬-এ দাঙ্গা প্রতিরোধে ব্যাপক ভূমিকা পালন। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মনোনয়নে বগুড়া অঞ্চল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ১৯৫৪-এ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পূর্বপাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির মনোনয়নে একই নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে আলোচনাক্রমে যে আটটি আসন কমিউনিস্ট পার্টি প্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ও নির্ধারিত ছিল, এটি তার একটি। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের শরিক দল নেজামে ইসলামের হঠকারিতায় সামান্য ভোটে পরাজিত। ১৯৫১-এ পূর্বপাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৪-এ প্রকাশ্য কমিটির সদস্য হিসেবে কমিউনিস্ট সংগ্রামে অনন্য ভূমিকা। ১৯৫৩-৫৪-এ পূর্বপাকিস্তান কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি। আতাউর রহমান খানের সরকারের আমলে কৃষকের স্বার্থরক্ষার নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সদস্য হিসেবে সংস্কারমূলক সুপারিশ পেশ করেন। পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ধারায় ১৯৫২-এ কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বহু বছর কারাভোগ। নির্যাতন সত্ত্বেও আদর্শচ্যুত হননি। ত্যাগী, আদর্শবাদী, অনলবর্ষী বক্তা। মৃত্যু. কুমিল্লা, ২৩ জানুয়ারি ১৯৬০।

মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা (১৯০০-১৯৭৭)॥ জন্ম. মারগ্রাম, বীরভূম,



পশ্চিমবঙ্গ, ১ ডিসেম্বর ১৯০০। বিজ্ঞানী, লেখক। এক খান্দান পির পরিবারে জন্ম। পিতা খোন্দকার আবদুল মুকিত বি.এ.। পিতার পেশা ছিল পিরগিরি। কলকাতার উডবার্ন এম.ই. স্কুল থেকে স্কলারশিপ নিয়ে এম.ই. এবং কলকাতা মাদ্রাসা থেকে ১৯১৮-তে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস। ১৯২৪-এ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়নশাস্ত্রে এম.এসসি.-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। উচ্চতর গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ। ১৯২৯-এ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Stainless Configuration of Multiplanmet Ring বিষয়ে গবেষণার জন্য ডি.এসসি. উপাধি লাভ। একই বছর লন্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে ডি.আই.সি. ডিগ্রি লাভ। ছাত্রাবস্থায় আইনজীবী কাজী গোলাম আহমেদের কন্যা আকরামুন্নেসার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯১৯)। ১৯৩১-এ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনার কর্মে যোগদান, ১৯৩৬-এ বিভাগীয় প্রধান এবং ১৯৪৬-এ এই কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। মাঝখানে কিছুকাল ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন (১৯৪২-

১৯৪৪)। এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ১৯৪৭-১৯৪৯ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের জনশিক্ষা পরিচালক। পাকিস্তান সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান উপদেষ্টা নিযুক্ত। ১৯৫২-১৯৫৫ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ১৯৫৫-১৯৬৬ পর্যন্ত পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগার সমূহের (সায়েন্স ল্যাবরেটরীজ) প্রথম পরিচালক। ১৯৬৬-তে অবসর গ্রহণের পর কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত। পরে নীতি-নির্ধারণী প্রশ্নে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খানের সঙ্গে বিবাদ বাধায় পদত্যাগ। ১৯৭৪ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর। রচিত ১০২টি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বিখ্যাত গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত। তিনি বিজ্ঞান-চর্চায় মাতৃভাষাকে সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে বিশ্বভারতী থেকে 'লোক-শিল্প গ্রন্থমালা' পর্যায়ে যে গ্রন্থমালা সিরিজ প্রকাশিত হতে শুরু করে তাতে তাঁর রচিত যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি শিল্প গ্রন্থটি ১৯৪০-এ প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গ্রন্থ: বিজ্ঞানের সরস কাহিনী, বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী, বিজ্ঞানের সূচনা, জৈব রসায়ন (১ম ও ২য় ভাগ ১৯৬৬, ৩য় ১৯৭০ এবং ৪র্থ ভাগ ১৯৭১), পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্প সম্ভাবনা, পরমাণু পরিচিতি, বিজ্ঞানের পহেলা কথা ইত্যাদি। এ ছাড়া মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বহু পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন। 'পবিত্র কোরানের পূত কথা ও অঙ্গারী জওয়ারা' নামে একটি ধর্মীয় পুস্তকওরচনা করেছিলেন। পুরোগামী বিজ্ঞান (১৯৬৩) ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা (১৯৭২) নামক বিজ্ঞান পত্রিকা তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত। বিজ্ঞানী হিসেবে ড. খুদা ও তাঁর সহকর্মীদের ১৮টি আবিষ্কারের পেটেন্ট রয়েছে। এর মধ্যে পাটসংক্রান্ত আবিষ্কার রয়েছে ৯টি। আখের রস ও গুড় থেকে মল্ট ভিনিগার, পাট ও পাটকাঠি থেকে রেয়ন এবং পাটকাঠি থেকে কাগজ তাঁরই আবিষ্কার। স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিপ্রদান। রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৯৭৬-এ 'একুশে পদকে'-এ সম্মানিত। একুশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একজন সচেতন বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করেছেন। বিজ্ঞানী ড. খুদার বিজ্ঞান-সংক্রান্ত অবদান ছাড়াও তাঁর জীবনের একটি বড় কাজ হলো স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য যে কমিশন (১৯৭২) গঠন করা হয় তিনি তার সভাপতি নিযুক্ত হয়ে অল্প সময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করেন যা সকল মহলে সমাদৃত হয়। এই রিপোর্ট 'কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' নামে খ্যাত। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ৬-দফা স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিক আন্দোলনকে উপলক্ষ করে পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটলে, একজন সচেতন বুদ্ধিজীবী হিসেবে জন-সাধারণের মধ্যে বাঙালিত্বের চেতনাকে শানিত করে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণের পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ। ১৯৬৭-র ২২ জুন পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্র-সংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। মৃত্যু. ঢাকা, ৩ নভেম্বর ১৯৭৭।

মুহম্মদ খান (১৫৮০-১৬৫০)॥ জন্ম. জোবরা গ্রাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, ১৫৮০। কবি। কবি সৈয়দ সুলতানের শিষ্য এবং পীরের আদেশে গ্রন্থ রচনা। কবির পূর্ব-পুরুষেরা উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। মুহম্মদ খান নিজে পির ছিলেন এবং অধ্যাত্মসাধনায় কামেল পির হতে পেরেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। কবির রচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে— সত্যকলি বিবাদ সংবাদ, হানিফার লড়াই, আসহাবনামা, কিয়ামৎনামা, দজ্জালনামা, কাশিমের লড়াই ও মক্তুল হোসেন। মৃত্যু. আনুমানিক ১৬৫০।

মুহম্মদ নূরুল হক (১৯০৭-১৯৮৭)॥ জন্ম. দশঘর গ্রাম, সিলেট, ১৯ মার্চ ১৯০৭। লেখক। দশঘর প্রাইমারি স্কুল, স্থানীয় রায়কেলী এম.ই. স্কুল, ফুলবাড়ি (সিলেট) জাতীয় মাদ্রাসা ও বেলাবো (নরসিংদী) আমলাব সিনিয়র মাদ্রাসায় অধ্যয়ন



১৯৩৬-এ সিলেট সরকারি মাদ্রাসা থেকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। 'সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের' (১৯৩৬) প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। আমৃত্যু এ পদে অধিষ্ঠিত থেকে এ প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি, পত্র-পত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি দ্বারা সমৃদ্ধ করে সংস্কৃতিচর্চার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন। সাহিত্য সংসদের মুখপত্র মাসিক 'আল ইসলাহ' (১৯৩৯) পত্রিকা প্রায় পঞ্চাশ বছর সম্পাদনা। মুসলিম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ। মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবে সিলেট গণভোটে (জুলাই ১৯৪৭) বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। ভাষা-আন্দোলনেরও (ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) একজন বিশিষ্ট সৈনিক। বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে 'আল ইসলাহ' পত্রিকায় সম্পাদকীয় রচনা (১৯৪৭)। ১৯৭১-এ মার্চে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে পাকিস্তান সরকারের দেয়া 'তমঘা-ই-খিদমত' খেতাব ত্যাগ। বাঙালি মুসলমান সমাজের কল্যাণসাধন ও সমাজে ইসলামিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বহু গ্রন্থ রচনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিশ্বনেতা (১৯৫৩), ফারুক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য (১৯৫৩), সংবাদপত্র সেবায় সিলেটের মুসলমান (১৯৬৯), শেষ নবীর বাণী (১৯৭০), আলোক স্তম্ভ (১৯৮০), বিগত যুগের আদর্শ (১৯৮১) ও হজরত শায়ক জালাল মুজর্বদ (দঃ)-র শিষ্যগণ (১৯৮২)। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। মৃত্যু. সিলেট, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭)॥ জন্ম. মুরারিপুর গ্রাম, পাবনা, ৩১ জানুয়ারি, ১৯০৪। ফোকলোর বিশেষজ্ঞ, লেখক ও শিক্ষাবিদ। পিতা জয়ধর আলি মণ্ডল। এক নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম। স্থানীয় খলিলপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স (প্রথম বিভাগ, ১৯২১), পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজ থেকে আই.এসসি. (তৃতীয় বিভাগ, ১৯২৩), রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে বি.এ. (তৃতীয় বিভাগ, ১৯২৬) ও কলকাতা



বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়ান ভার্নাকুলার বিভাগ থেকে বাংলায় এম.এ. (প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় স্থান, ১৯২৮) পাস। ছাত্রজীবনে রাজবাড়ির মৌকুড়ির সাব-পোস্ট মাস্টার শফিউল্লাহর কন্যা শারিফুন্নেসার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯২৯-এ সহকারি স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত। প্রায় চার বছর এ পদে উল্লাপাড়া (পাবনা), বদরগঞ্জ (রংপুর), রাজশাহী ও নওগাঁয় দায়িত্ব পালন। ১৯৩২-এ ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের স্কুল শাখার ইংরেজির সহকারী শিক্ষক। নিযুক্ত। ১৯৩৫-এ হাওড়া জেলাস্কুলে বদলি। ১৯৩৮-এ চট্টগ্রাম সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার প্রভাষক নিযুক্ত। রাজশাহী কলেজ, হুগলি মহসীন কলেজ ও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার প্রভাষক নিযুক্ত। রাজশাহী কলেজ, হুগলি মহসীন কলেজ ও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা (১৯৪১-১৯৪৮)। ১৯৪৮-এ পূর্ব-পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিসে যোগদান। সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজে বাংলার অধ্যাপক (১৯৪৮-১৯৫২)। ১৯৫২-তে সরকার পরিচালিত মাসিক 'মাহে-নও' (এপ্রিল ১৯৪৯) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। এ পত্রিকা প্রায় ছয় মাস সম্পাদনা করার পর ঢাকা কলেজে বাংলার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত। প্রায় সাত বছর এ কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৯৫৯-এর জানুয়ারি মাসে অবসর গ্রহণ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। 'মাহে-নও' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে সরকার বাংলা বর্ণমালা পরিবর্তনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তার বিরোধিতা করে সরকারের বিরাগে পতিত। ষাটের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান সরকার বেতার ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ ও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা চালুর যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল সোচ্চার কণ্ঠে সরকারের সে সব পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর বিভিন্ন সামরিক সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক কাজের প্রতিবাদী কণ্ঠ। অলিখিত বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান সংগ্রাহক। দশ খণ্ডে সমাপ্য লোকসংগীতের সংকলন গ্রন্থ 'হারামণি' (১ম খণ্ড ১৯৩০, ২য় খণ্ড ১৯৪২, ৩য় খণ্ড ১৯৪৭, ৪র্থ খণ্ড ১৯৫৮, ৫ম খণ্ড ১৯৬১, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৬২, ৭ম খণ্ড ১৯৬৫, ৮ম খণ্ড ১৯৭৬, ৯ম ১৯৮৮ ও ১০ম খণ্ড ১৯৮৯) সম্পাদনা করে সব শ্রেণির মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন। প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ: শিরণী (১৯৩১),

ধানের মঞ্জুরী (১৯৩৩), আগরবাত্তী (১৯৩৮), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (১ম খণ্ড ১৯৬০, ২য় খণ্ড ১৯৬৪ ও ৩য় খণ্ড ১৯৬৬) ও ইরানের কবি। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৫) ও একুশে পদক (১৯৮৩) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭।

মুহাম্মদ মুকীম (অষ্টাদশ শতাব্দী)॥ জন্ম. নোয়াপাড়া, চট্টগ্রাম। কবি। আনুমানিক ১৭০০ থেকে ১৭৭৫-এর মধ্যে জীবনকাল। তাঁর পূর্বপুরুষগণ নোয়াখালী জেলার ফেনীর অধিবাসী। কবি শৈশবেই পিতৃহারা হন। স্থানীয় কাসিমুদ্দীন চৌধুরীর পুত্র জীবন হুসেন চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে লেখাপড়া শিক্ষা। যৌবনে জমিদার আলী আকবর চৌধুরীর সেরেস্তায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ। বিবিধ জ্ঞানের অধিকারী। সংগীতশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, এমন কি হিন্দুমুসলমানদের ধর্মীয় শাস্ত্রেও অগাধ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন। পাণ্ডিত্যের দিক থেকে একমাত্র আলাওল ছাড়া আর কার সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। মুহম্মদ মুকীম তাঁর প্রথম কাব্য 'গুল-ই-বকাওলী' গ্রন্থে তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কবিদের নাম উল্লেখ করে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের ওপর আলোকপাত করেছেন। কবির পঞ্চম এবং সম্ভবত শেষ গ্রন্থ 'ফায়দুল মুকতদী' থেকে জানা যায়, 'গুল-ই-বকাওলী' রচনার পরে তিনি আর তিনটি কাব্য রচনা করেছেন। এগুলি হলো: কালাকাম, মৃগাবতীও আইয়ুব নবীর কথা। কিন্তু কাব্যত্রয়ের কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)॥ জন্ম. পেয়ারা গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ১০ জুলাই ১৮৮৫। ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ। ১৯০৪-এ হাওড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস। বিভিন্ন ভাষার প্রতি উৎসাহ এবং একাধিক



ভাষা শিক্ষার সূত্রপাত এ বয়সে হয়েছিল। ১৯০৬-এ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ. পাস। ১৯০৮-১৯০৯-এ যশোর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা। ১৯০৯-১৯১০-এ কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যয়ন ও সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাস। ১৯১২-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পাস। ১৯১১-১৯১৫-তে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির (৪ সেপ্টেম্বর ১৯১১) সম্পাদক। ১৯১৩-তে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় জার্মানিতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ছাড়পত্রের অভাবে বিদেশ যাত্রায় ব্যর্থ। ১৯১৪-তে বি.এল. পাস। ১৯১৫-এর মার্চ মাস পর্যন্ত সীতাকুণ্ড হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। একই বছর 'আল এসলাম' পত্রিকার সহ-সম্পাদক। ১৯১৫-১৯১৯-এ চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাটে আইন ব্যবসায়। ১৯১৭-তে দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। ১৯১৮-১৯২১ পর্যন্ত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র যুগ্ম-সম্পাদক। ১৯১৯-১৯২১ পর্যন্ত ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সহকর্মী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক পদে দায়িত্ব পালন। ১৯২১-এর ২ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান। একইসঙ্গে সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক শিক্ষক (১৯২৫ পর্যন্ত)। ১৯২২-১৯২৪ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপক। ১৯২৩-এর ২২ ও ২৩-এ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের সমাবর্তন উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান। ১৯২৬-এর ১৯ জানুয়ারি ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' কর্তৃক আয়োজিত প্রতিষ্ঠা সভার সভাপতি। ১৯২৬-১৯২৮ পর্যন্ত প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক ভাষা, প্রাচীন পার্সি, তিব্বতি, বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষা অধ্যয়ন ও পিএইচ.ডি. উপাধি অর্জন, উপরন্তু ডিপ্লোমা-ফোন সনদপত্রলাভ। ১৯২৭-১৯২৮-এ সরবনে পাঠরত অবস্থাতেই এক অবকাশে জার্মানির ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন। ১৯২৮-এর আগস্ট মাসে দেশে প্রত্যাবর্তন এবং প্রাক্তন কর্মস্থলে যোগদান। একই বছরের অক্টোবর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুবক সম্মেলনে সভাপতিত্ব। ১৯৩৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ পৃথক হলে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও রিডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৪০-১৯৪৪ পর্যন্ত ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রভোস্ট। ১৯৪১-এ হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে ভাষাতত্ত্ব

শাখার সভাপতি, এবং Philology and Indian Linguistics নামক প্রবন্ধ পাঠ। ১৯৪২-এ ঢাকায় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' কর্তৃক আয়োজিত 'সোভিয়েত মেল' নামক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন। ১৯৫৩-১৯৫৫ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ফরাসি ভাষার খণ্ডকালীন অধ্যাপক। ১৯৪৪-এ বাংলা বিভাগের রিডার ও অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর বগুড়ায় আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগদান। ১৯৪৫-এ জয়পুরে অনুষ্ঠিত পি. ই. এন. আয়োজিত নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে যোগদান। ১৯৪৮-এ পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। একই বছরের নভেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে বাংলা বিভাগে পুনরায় যোগদান। ১৯৫৫-এর ১ ডিসেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ পদে যোগদান এবং ১৯৫৮-এর ডিসেম্বরে অবসর গ্রহণ। ১৯৫৮-এর নভেম্বর মাসে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অন ট্রেডিশনাল কালচার ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া'-তে ইউনেস্কো মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান ও সেমিনারের চেয়ারম্যান নিযুক্ত। ১৯৫৯-১৯৬০-এ করাচিতে অবস্থিত উর্দু উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত উর্দু—অভিধান প্রকল্পের সম্পাদক নিযুক্ত এবং এক বছরকাল সেখানে অবস্থান। ১৯৬০-এর ১ জুলাই 'পূর্ব-পাকিস্তানি ভাষার আদর্শ অভিধান' প্রকল্পের সম্পাদক হিসেবে বাংলা একাডেমীতে যোগদান। ১৯৬১-১৯৬৪-তে বাংলা একাডেমীর ইসলামি বিশ্বকোষ প্রকল্পের অস্থায়ী সম্পাদক। একই সময়ে পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। ১৯৬৩-তে পূর্ব-পাকিস্তানি ভাষার আদর্শ অভিধান' প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত। ১৯৬৩-১৯৬৪-তে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের নিযুক্ত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য। একই সময়ে ঢাকার ইসলামিক একাডেমির কার্যনির্বাহক সভার সদস্য। ১৯৬২-১৯৬৭ পর্যন্ত বাংলা কলেজের সাংগঠনিক সংসদ ও ব্যবস্থাপক সংসদের সভাপতি। ১৯৬৩-তে বাংলা একাডেমী কর্তৃক গঠিত বাংলা পঞ্জিকার তারিখবিন্যাস কমিটির সভাপতি. এই কমিটি কর্তৃক উদ্ভাবিত তারিখ যুক্তিসম্মত ও সহজে অনুসরণযোগ্য। রচনাকর্ম-গবেষণা: সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোহা (১৯২৬), বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড ১৯৫৩, ২য় খণ্ড ১৯৬৫—, বৌদ্ধ মর্মবাদীর গান (১৯৬০), ভাষাতত্ত্ব: ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), বাংলা ব্যাকরণ (১৯৫৮), বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৬৫) প্রবন্ধ পুস্তক:ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৯), বাংলা আদব কি তারিখ (১৯৫৭), Essays on Islam(১৯৪৫), Traditional Culture in East Pakistan (১৯৬৩, মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে) গল্পগ্রন্থ: রকমারি (১৯৩১) শিশুতোষ গ্রন্থ: শেষ নবীর সন্ধানে, ছোটদের রসুলুল্লাহ (১৯৬২), সেকালের রূপকথা (১৯৬৫)। অনুবাদ গ্রন্থ: দীওয়ানে হাফিজ (১৯৩৮), অমিয়শতক (১৯৪০), রুবাইয়াত-ই-ওমর খ্যায়াম (১৯৪২), বাণী শিক্ওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ (১৯৪২), মহানবী (১৯৪০), বাইঅতনামা (১৯৪৮), বিদ্যাপতি শতক (১৯৫৪), কুরআন প্রসঙ্গ (১৯৬২), মহররম শরীফ (১৯৬২), অমর কাব্য (১৯৬৩), ইসলাম প্রসঙ্গ (১৯৬৩), Hundred Sayings of the Holy Prophet (১৯৪৫), Buddhist Mystic Songs (১৯৬০)। সংকলন ও সম্পাদনা: পদ্মাবতী (১৯৫০), প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (১৯৫২), গল্প সংকলন (১৯৫৩), দুই খণ্ডে প্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। 'আঙুর' (শিশু পত্রিকা, ১৯২০), ইংরেজি মাসিক 'দি পিস' (১৯২৩), মাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'বঙ্গভূমি' (১৯৩৭) পাক্ষিক পত্রিকা 'তকবীর' (১৯৪৭) সম্পাদনা। ১৯৬৭-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইমেরিটাস অধ্যাপক পদ লাভ। পাকিস্তান সরকার-কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রাইড অব পারফরম্যান্স, ১৯৬৭-তে ফরাসি সরকার কর্তৃক নাইট অব দি অর্ডারস অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স পদক প্রদান। আদমজী, দাউদ প্রভৃতি সাহিত্য পুরস্কার কমিটির স্থায়ী সভাপতিরূপে দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা তাঁর জীবনের প্রধান একটি কাজ। বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ও প্রাচ্যের অন্যতম ভাষাবিজ্ঞানী। একজন খাঁটি বাঙালি ও ধর্ম প্রাণ মুসলমান। তৎকর্তৃক ধর্মীয় অনুভূতি অপেক্ষা জাতীয় অনুভূতিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান। জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ রেখে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।' মুহম্মদ

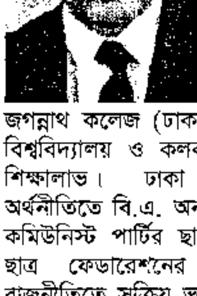
শহীদুল্লাহ্‌র এ-দুঃসাহসিক উক্তি বাঙালির জাতীয়চেতনা শাণিতকরণে মাইলফলকের ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পরপরই দেশের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে, না বাংলা হবে এ বিতর্ক সৃষ্টি হলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন। তাঁর এ ভূমিকার ফলে পূর্ববাংলায় রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়। মৃত্যু. ঢাকা, ১৩ জুলাই ১৯৬৯।

মুহম্মদ শামসুজ্জোহা, শহীদ (১৯৩৪-১৯৬৯)॥



জন্ম. বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ৫ আগস্ট ১৯৩৪। শিক্ষাবিদ। ১৯৪০-এ বাঁকুড়া জেলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি। ১৯৪৮-এ একই স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ১৯৫০-এ বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে আই. এসসি পাস। বাঁকুড়া ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। ১৯৫৩-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে বি.এসসি. অনার্স এবং ১৯৫৪-তে এম.এসসি. (রসায়ন) পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে বাহান্নো-র ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৫৭-তে লন্ডনে ইমপেরিয়াল কলেজ থেকে বি.এসসি. অনার্স এবং ১৯৬৪-তে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ১৯৬১-র মার্চ মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেভলপমেন্ট অফিসার হিসেবে যোগদান এবং একই মাসে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রভাষক পদ লাভ। ১৯৬৬-তে রিডার পদে উন্নীত। ১৯৬৫-তে শাহ মখদুম হলের হাউস টিউটর এবং ১৯৬৬-র ডিসেম্বরে প্রভোস্ট নিযুক্ত। ১৯৬৮-র ১ মে থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৬৮-র শেষ দিক থেকে আইয়ুব সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন দানা বাঁধে। ১৯৬৯-এর ২০ জানুয়ারি শহীদ হন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান, ২৪ তারিখে গণ-অভ্যুত্থান দিবসে শহীদ হন মতিউর। ১৫ ফেব্রুয়ারি শহীদ হন তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক। এ-সকল হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে সেনাবাহিনী বাধা দিলে তিনি ছাত্রদের সাহায্যে ছুটে যান। বিক্ষোভকারীদের উপর আক্রমণ না চালাবার জন্য তিনি সামরিক বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বান উপেক্ষা করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মিছিলের উপর গুলি চালায় এবং ড. জোহা গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যান। সে অবস্থায় জনৈক মিলিটারি অফিসার তাঁকে বেয়োনেট দিয়ে আঘাত করলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। গুলিবিদ্ধ হবার কিছুক্ষণ আগে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আমি বলছি গুলিবর্ষণ হবে না। যদি গুলিবর্ষণ হয় তবে কোনো ছেলের গায়ে লাগার পূর্বে তা আমার গায়ে লাগবে।' তাঁর মৃত্যু আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলনে প্রচণ্ড গতির সঞ্চার করে। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারা পূর্ববাংলায় গণ-বিক্ষোভের জোয়ার প্রবাহিত হয়। এর ফলে আইয়ুব সরকারের পতন ত্বরান্বিত হয়। শামসুজ্জোহা ছিলেন পঞ্চাশের দশকে এদেশের প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী। কর্মজীবনেও তিনি পূর্ববাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগ বাঙালির জাতীয় চেতনাকে শাণিত করে তোলে, আর এই চেতনার বলেই ১৯৭১-এ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। তিনি অত্যন্ত ক্রীড়াপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যু. রাজশাহী, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ (১৯১৭-১৯৯৫)॥ জন্ম. বশির



হাট, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ৪ জুলাই ১৯১৭। লেখক। পূর্ণ নাম আবুল ফজল মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ। পিতা প্রখ্যাত পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ কলেজ (ঢাকা), আলীগড় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা রিপন 'ল' কলেজে শিক্ষালাভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি.এ. অনার্স ডিগ্রি লাভ (১৯৪০)। কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য হিসেবে ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন। রাজনৈতিক

কারণে এম.এ. পরীক্ষা দিতে অপারগ হন। বীমা ব্যবসায়ের একজন বিশেষজ্ঞ। সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের ডাইরেক্টর পদে দায়িত্ব পালন। ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা: বীমা পরিকল্পনা ও বিক্রয় শৈলী : শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সিনেট সদস্য (১৯৬৪-১৯৬৭)। ঢাকা 'ল' কলেজের খণ্ডকালীন অধ্যাপক। সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম যুব-কিশোর সংগঠন 'আলাপনী মজলিস'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। কিছুকাল দৈনিক সংবাদ (১৯৫১)-এর কিশোর সংগঠন খেলাঘর-এর সভাপতি। আজাদ, দিলরুবা (মাসিক), সান্ধ্য দৈনিক চাষী ও বাংলাদেশ ইলাসট্রেটেড উইকলি পত্রিকার কনসালটিং এডিটর। প্রতিরোধ পত্রিকার সম্পাদনা। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। বীমা, বাণিজ্যিক আইন ও কোম্পানি আইনের ওপর বহু গ্রন্থ রচনা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: Essential Features of Company Law & Practice (১৯৫১), Life Insurance Salesmenship (১৯৬১), Symposium On Insurance (১৯৬৭), জীবন বীমা বিক্রেতার কলা ও কৌশল (১৯৬৮), ইসলামের দৃষ্টিতে বীমা (১৯৭৬), বাণিজ্যিক আইন (১৯৭৮)। অন্যান্য গ্রন্থ: আধুনিক উপকথা (১৯৬৬), ইসলামের ঐতিহ্য ও খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (১৯৮১), স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা প্রসঙ্গ (১৯৮০)। সম্পাদনা: শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ (১৯৬৭)। মৃত্যু। ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ১৯৯৫।

মুহম্মদ সিদ্দিক খান (১৯১০-১৯৭৮)॥ জন্ম. পিতার কর্মস্থল রেঙ্গুন, বার্মা, ২১ মার্চ-১৯১০। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ও লেখক। পিতা ইসরাইল খান ছিলেন রেঙ্গুন আদালতের উকিল। পৈতৃক নিবাস ধুবড়িয়া গ্রাম, টাঙ্গাইল। রেঙ্গুন স্কুল থেকে চারটি বিষয়ে ডিস্টিঙ্কশনসহ সমগ্র বার্মায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে মেট্রিক পাস (১৯২৫)। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। ইংরেজিতে ডিস্টিঙ্কশনসহ প্রথম বিভাগে আই.এ. (১৯২৭), দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে ইতিহাসে বি.এ. অনার্স (১৯২৯), দ্বিতীয় শ্রেণিতে বি. এল (১৯৩১), এবং স্বর্ণপদক সহ ইতিহাসে এম.এ. (১৯৩৬) ডিগ্রি লাভ। রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটি কলেজে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক পদে দায়িত্ব পালন (১৯৩১-১৯৪১)। বার্মায় জাপানি আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪২-এ বার্মা ত্যাগের জোয়ারে রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় আগমন। বঙ্গীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন (১৯৪৩-১৯৪৭)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক (১৯৪৭-১৯৪৮), চট্টগ্রামে ইস্ট পাকিস্তান ট্রেডিং কর্পোরেশনের ম্যানেজার (১৯৪৮-১৯৫০), মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ (১৯৫০-১৯৫১) ও পাকিস্তান রিফিউজি রিহ্যাভিলিটেশন ফিনান্স কর্পোরেশনের সেক্রেটারি (১৯৫১-১৯৫৩)। ১৯৫৩-র ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সচিব পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৫৪-র মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন। এরপর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য লন্ডন গমন। লন্ডন স্কুল অফ লাইব্রেরিয়ানশিপ অ্যান্ড আরকাইভে 'the theory and Practice of University LibrianshipÕ শীর্ষক দুই বছরের কোর্স (১৯৫৪-১৯৫৬) সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত করে দেশে প্রত্যাবর্তন। ১৯৫৬-র জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের গ্রন্থাগারিকের পদে যোগদান। ১৯৭২-এ এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ। একজন স্বনামধন্য গ্রন্থাগারিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আধুনিক পঠন-পাঠনের পদ্ধতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন। তাঁর উৎসাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। ঐ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতাপ্রধান পদে দায়িত্ব পালন (১৯৫৯-১৯৭২)। এছাড়া ঢাকার সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরির ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকেরও দায়িত্ব সম্পাদন (১৯৬১-১৯৭২)। একজন লেখক হিসেবেও খ্যাত। মুদ্রণ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ওপর গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। এতদ্ব্যতীত সাহিত্য-সমালোচনা, শিশুসাহিত্য ও ছোটগল্পের লেখক হিসেবেও সুনাম অর্জন। গ্রন্থ: 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা' (১৩৭১), 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' (১৩৭২), 'ঢাকা: ঐতিহ্য, ইতিহাস, শিক্ষা' 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে', 'ইতিহাস',



'সাহিত্য সমালোচনা', 'গল্প', 'শিশু-কিশোর সাহিত্য: জীবনী'। মৃত্যু. ১৩ আগস্ট ১৯৭৮।

মুহসিনুল মুলক, নওয়াব (১৮৭৩-১৯০৭)॥ জন্ম. রাড়া, ১৮৭৩। রাজনীতিবিদ। সাধারণ পদ থেকে উন্নতি করে ডেপুটি কালেক্টর হয়েছিলেন। হায়দারাবাদ রাজ্যের রাজস্ব সচিব। বহু সংস্কার সাধন করার জন্য ১৮৯৩-তে বরখাস্ত। পরবর্তীকালে স্যার সৈয়দ আহমদের বন্ধু ও সহকর্মী। আলীগড় আন্দোলনে সহযোগিতা প্রদান। ১৮৯৮-তে স্যার সৈয়দ আহমদের স্থলে কলেজের সম্পাদক নিযুক্ত। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা জোরদারকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ। হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে উর্দুকে সমর্থন। মন্টো-মর্লি সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে সত্তরজন মুসলিম নেতার এক প্রতিনিধি দল গঠন এবং ১৯০৬-এর ১ অক্টোবর সিমলায় ব্রিটিশ ভাইস-রয়ের সঙ্গে দেখা করে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ও অন্যান্য কয়েকটি সুবিধা আদায়। নিজে ডেপুটেশনের সেক্রেটারি ও আগা খান (৩য়) তার নেতা নির্বাচিত। ১৯০৬-এ ঢাকায় মুসলিম এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান। এবং মুসলিম লীগের (১৯০৬) ভিত্তি স্থাপন। উর্দু ভাষার প্রাবন্ধিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ। কয়েকটি উর্দু গ্রন্থের লেখক। মৃত্যু. ১৯০৭।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)॥ জন্ম. মেদিনীপুর, আনুমানিক ১৭৬২। লেখক। বিদ্যাশিক্ষা নাটোরের সভাপণ্ডিতের নিকটে। সেখানে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হলে (১৮০১) অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরীর অধীনে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিত পদে নিযুক্তি লাভ। অধ্যাপনাকালে পাঠ্যপুস্তকের অভাব অনুভূত হওয়ায় ১৮০২-এ 'বত্রিশ সিংহাসন' নামক উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা। ১৮০৫-এ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৮১৬-এর ৯ জুলাই অধ্যাপনার কর্ম থেকে পদত্যাগ করে সুপ্রিম কোর্টের জজ-পণ্ডিতের পদে যোগদান। কলকাতায় হিন্দু কলেজ (১৮১৭) স্থাপনের জন্য ১৮১৬-এর ২১ মে কলেজ সংক্রান্ত নিয়মাবলি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হলে তার সভ্য নির্বাচিত। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির (১৮১৭) পরিচালক সমিতির একজন সদস্য। ১৮১৮-র শেষাশেষি তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা: কাশী, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করে ১৮১৯-এর মাঝামাঝি বাড়ি ফেরার পথে মুর্শিদাবাদের নিকটে মৃত্যুবরণ। বাংলা গদ্যের উন্মেষ যুগের অন্যতম লেখক। গ্রন্থাবলি: বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলি (১৮০৮), বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭) ও প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩)। মৃত্যু. ১৮১৯।

মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬)॥ জন্ম. সাওড়াতলী গ্রাম, বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ, ৬ অক্টোবর ১৮৯৩। বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ। পিতা জগন্নাথ সাহা গ্রামে সামান্য ব্যবসায় করতেন। অনটনের মধ্যে ছাত্রজীবন অতিবাহিত। ১৯০৫-এ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে



ভর্তি। বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫-১৯১১) প্রতিবাদসভায় যোগ দেয়ার অপরাধে স্কুল থেকে বহিষ্কার। পরে ঢাকা জুবলি স্কুল থেকে ১৯০৯-এ পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পাস। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১১-তে আই.এসসি.-তে তৃতীয়, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৩-তে গণিতে অনার্সসহ বি.এসসি.-তে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৫-তে ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার। ছাত্রজীবনে বাঘা যতীন, পুলিন দাস প্রমুখ বিপ্লবীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অপরাধে ফিনান্স পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি-বঞ্চিত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান (১৯১৮)। 'প্রেসার অব লাইট'-এর উপর গবেষণা করে ডি.এসসি. উপাধি লাভ (১৯১৯)। 'অ্যাস্ট্রোফিজিকস'-এর উপর গবেষণা করে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান (১৯২০)। ১৯২৩-এ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত। সেখানে পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষাদান ও গবেষণার জন্য 'স্কুল অব ফিজিকস' স্থাপন। ১৯৩৩-এ কলকাতায় ফিরে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের 'পালিত অধ্যাপক' নিযুক্ত। অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন। তাঁর সম্পর্কে আইনস্টাইনের উক্তি: 'Dr. M.N. Shaha has

won an honoured name in the whole scientific world। ' তাপীয় আয়নবাদ অর্থাৎ তাপপ্রয়োগে আয়ন প্রক্রিয়া (Tharmal Ionisation) সংক্রান্ত তত্ত্ব উদ্ভাবন করে পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন। তাপের প্রভাবে কিভাবে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন অণু গঠিত হয় এই তত্ত্বে সেই পদ্ধতি উদ্‌ঘাটিত। সূর্য ও নক্ষত্রের গঠন সংক্রান্ত বিশ্লেষণে এ তত্ত্বের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। এছাড়া পরমাণু বিজ্ঞান, আয়ন মণ্ডল, পঞ্জিকা সংস্কার, বন্যা প্রতিরোধ ও নদী পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবেষণা কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ লন্ডনের রয়েল সোসাইটি কর্তৃক তাঁকে ফেলোশিপ প্রদান। 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' নামক বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকার অন্যতম প্রকাশক। কলকাতায় 'ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন। নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন। তাঁর মৃত্যুর পরে এটি 'সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' নামে রূপান্তরিত। রচিত গ্রন্থঃ 'The Principle of Relativity', Treatise on hear', ÔTreatise on Modern Physics', Junior Textbook of Heat with Meteorology প্রভৃতি। মৃত্যু. দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে পরিকল্পনা কমিশনের সভায় যাবার পথে আকস্মিকভাবে প্রাণত্যাগ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬।

মেহেরুন্নেসা (১৯৪৬-১৯৭১)॥ জন্ম. ১৯৪৬।



পশ্চিমবঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে এসে মীরপুরে বসবাস। কবি। মা ও বড় বোনের কাছে শিক্ষা লাভ। স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। নিজের চেষ্টা ও সাধনায় জ্ঞানার্জন তাঁর কৃতিত্ব। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রুফ দেখতেন এবং ফিলিপ্‌স কোম্পানিতে চাকরি করতেন। আমৃত্যু এখানে কর্মরত। ১৯৫২-১৯৫৩-তে ছোটদের জন্যে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় দৈনিক সংবাদ-এ খেলাঘরের পাতায়। কবিতাটির নাম 'চাষী'। তৎকালীন প্রায় সকল পত্রিকায় তাঁর অজস্র কবিতা ছড়িয়ে আছে : বেগম, ললনা, কাফেলা, যুগের দাবি, আওয়াজ, নওবেলাল, অনন্যা, আজাদ, সংবাদ, ইত্তেফাক, মিল্লাত, দৈনিক পাকিস্তান, পাকিস্তানি খবর, পাক সমাচার প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁর কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যু. মুক্তিযুদ্ধ চলাকারে অবাঙালির হাতে নিহত (১৯৭১)।



মোকাররম হোসেন খোন্দকার (১৯২২-১৯৭২)॥ জন্ম. হাজীনগর গ্রাম, ঢাকা, ১ মার্চ ১৯২২। স্থায়ী বাসস্থান দাসার গ্রাম, মাদারীপুর। শিক্ষাবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪২-এ রসায়নে বি.এসসি. অনার্স-এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান এবং ১৯৪৩-এ রসায়নে এম.এসসি.-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ। ১৯৪৮-এ ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ১৯৪৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৪৯-এ রিডার পদে উন্নীত। ১৯৫৪-এর এপ্রিল মাসে রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত। ১৯৬০-এর ১ জুলাই অধ্যাপক পদ লাভ। পাকিস্তান 'একাডেমি অফ সায়েন্স', 'রয়েল ইনস্টিটিউট অফ কেমিস্ট্রি অফ গ্রেট ব্রিটেন', 'রয়েল সোসাইটি অফ আর্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফ লন্ডন' ও 'কেমিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন'-এর ফেলো। 'পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্স অফ সায়েন্স', পাকিস্তান সরকারের 'কাউন্সিল অফ সাইনটিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' ও 'পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি'র সদস্য। 'পাকিস্তান কেমিক্যাল ডিভিশনাল কাউন্সিল'-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অবৈতনিক উপদেষ্টা। মোকাররম হোসেন খোন্দকার ছিলেন খ্যাতনামা রসায়ন বিজ্ঞানী। সড়ক ও দালানকোঠা গবেষণায় (Road and Building Research), প্লাস্টিক গবেষণায় (Plastic Research) এবং খাদ্য গবেষণায় (Food Research) তাঁর মৌলিক অবদান রয়েছে। মৃত্যু. ঢাকা ৩০ নভেম্বর ১৯৭২।

মোখতার আহমদ আনসারী (১৮৮০-১৯৩৬)॥



জন্ম. গাজীপুর, ১৮৮০ চিকিৎসাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক। প্রথমে এলাহাবাদে মুইর কলেজে শিক্ষালাভ। পরে দাক্ষিণাত্যের নিজাম কলেজ থেকে ১৯০০-তে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন। ১৯০১-এ এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে ভর্তি এবং ১৯০৫-এ এম.বি., সি.এইচ.বি., এম.আর.সি.পি. (লন্ডন) এবং এল.আর.সি.পি. (লন্ডন) উপাধি লাভ। লন্ডনের চ্যারিংক্রস হাসপাতালের হাউস সার্জন, লন্ডন লক হাসপাতালের রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার এবং লন্ডনের সেন্ট পিটার্স হাসপাতালের ক্লিনিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টরূপে কর্ম সম্পাদন। দশ বৎসর ইউরোপে অবস্থান করে ডক্টর অব মেডিসিন এবং মাস্টার অব সার্জারি উপাধি লাভ করে দেশে প্রত্যাবর্তন। ১৯১২-১৯১৩-তে বলকান যুদ্ধের সময়ে আহতদের পরিচর্যার জন্যে একদল চিকিৎসক নিয়ে তুরস্কে গমন। ১৯১৭-১৯১৮-তে ভারতে হোমরুল আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলে আন্দোলনে যোগদান। ১৯২০-এ মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯২২-এ গয়ায় খেলাফত সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯২০-১৯২২ পর্যন্ত খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান। ১৯২৭-এ মাদ্রাজ কংগ্রেসের এবং ১৯২৮-এ কলকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলনের সভাপতি। ১৯৩০-এর ২৭ আগস্ট নয়াদিল্লিতে তাঁর বাসভবনে বেআইনি ঘোষিত কংগ্রেসের সভায় সভাপতিত্ব। অন্যান্য কংগ্রেসী কর্মীদের সঙ্গে গ্রেফতারবরণ এবং ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ১৯৩২-এর জানুয়ারি মাসে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের কারাদণ্ডের পর কংগ্রেসের সভাপতি। এ বছর ৮ জানুয়ারি নিজ বাড়িতে গ্রেফতারবরণ এবং ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ১৯৩৩-এ তাঁরই উদ্যোগে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত হয় এবং তিনি এর সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৩৫-এর এপ্রিল মাসে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ। মৃত্যু. ১৯৩৬।

মোজাম্মেল হোসেন (১৯১৭-১৯৮৬)॥ জন্ম. নবদ্বীপ, নদীয়া, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ সংগীতশিল্পী ও সংগীত শিক্ষক। দেশভাগের পর রাজশাহীতে স্থায়ীভাবে বসবাস। অধ্যাপক নগেন দত্ত ও ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম গ্রহণ। পরবর্তীকালে ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় কণ্ঠসংগীতের চর্চা ছেড়ে তবলা শিক্ষা শুরু। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ গোপাল প্রামাণিকের কাছে তবলায় তালিম গ্রহণ। একজন প্রথিতযশা সংগীত শিক্ষক। বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ-সংগীত-সাধকদের অন্যতম। মৃত্যু. ২ জুলাই ১৯৭৬।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬)॥



জন্ম. কাঞ্চনপুর গ্রাম, নোয়াখালী, ১৯০৩। সাহিত্যিক। কুমিল্লার ইউসুফ হাইস্কুল থেকে মেট্রিক, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ. পাস। ইউসুফ হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত। শিক্ষকতা-কালে ১৯৪৩-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বাংলায় এম.এ. পাস। ১৯৪৬-এ কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের বাংলার প্রভাষক নিযুক্ত। বিভাগোত্তর কালে (১৯৪৭) কলকাতা ছেড়ে পূর্ববাংলায় আগমন এবং চট্টগ্রাম কলেজে বাংলা বিভাগে যোগদান। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের (১৯২৬) বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পেশাগত কারণে কুমিল্লায় বাস করলেও ঢাকায় সাহিত্য সমাজের সভা ও সম্মেলনে নিয়মিতভাবে যোগ দিতেন। এর পঞ্চম (১৯৩১), ষষ্ঠ (১৯৩২) ও অষ্টম (১৯৩৪) বার্ষিক সম্মেলনে যথাক্রমে পঠিত হয় তাঁর 'আমাদের দৈন্য', 'আদেশপন্থী ও অনুপ্রেরণাপন্থী' ও 'মুসলমান সাহিত্যিকদের চিন্তাধারা' প্রবন্ধ। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও বৈরাগ্যবিলাস' প্রবন্ধটি সমাজের মুখপত্র 'শিখা' (১৯২৭)-র পঞ্চম বর্ষে প্রকাশিত। বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী। যুক্তিনিষ্ঠ ও মুক্তবুদ্ধিদীপ্ত সরস প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন। তাঁর গদ্য চমৎকারিত্ব ও দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। 'ব্রার্ট্রান্ড রাসেল' (১৮৭২-১৯৭০), 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৮৬১-১৯৪১) ও 'ক্লাইভ বেল'

(১৮৮১-১৯৬৪)-এর জীবনদর্শনের অনুসারী। মৃত্যুর পর তাঁর তিনখানি গদ্যগ্রন্থ 'সংস্কৃতি-কথা' (প্রবন্ধের সংকলন) (১৯৫৮), 'সভ্যতা' (ক্লাইভ বেলের সিভিলাইজেশনের অনুবাদ) (১৯৬৫) ও 'সুখ' (বার্ট্রান্ড রাসেলের কংকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেসের অনুবাদ) (১৯৬৮) প্রকাশিত। কবিতা রচনায়ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।



মোনাজাত উদ্দিন (১৯৪৫-১৯৯৫)॥ জন্ম. রংপুর, ১৮ জানুয়ারি ১৯৪৫। সাংবাদিক। ষাটের দশকে সান্ধ্য দৈনিক 'আওয়াজ'-এ তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। ১৯৬৬-তে 'দৈনিক আজাদ'-এ রিপোর্টার হিসেবে যোগদান। স্বাধীনতার পর 'দৈনিক সংবাদ'-এর সিনিয়র রিপোর্টার নিযুক্ত। 'সংবাদ'-এ দায়িত্ব পালনকালে গ্রামীণ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার প্রবর্তন। দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলা ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। এ-সকল জেলার গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে-ঘুরে সেখানকার বিবর্ণ মানুষের সমস্যা-সংকট, সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার আলেখ্য সংগ্রহ করে 'সংবাদ'-এর পাতায় তুলে ধরেন। তাঁর প্রণীত রিপোর্ট ও ফিচার ছিল সত্যনিষ্ঠ ও বাস্তব জীবনভিত্তিক। তাঁর জনপ্রিয় প্রতিবেদন ও ফিচারের মধ্যে রয়েছে: 'আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'কানসোনার মুখ', 'মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ দলিল' এবং উত্তরাঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন সিরিজ প্রতিবেদন। তাঁর সর্বশেষ চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদনটি ছিল মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি বীরপ্রতীককে নিয়ে (দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত)। দীর্ঘকাল 'সংবাদ'-এ কাজ করার পর ১৯৯৪-র ১৯ সেপ্টেম্বর 'দৈনিক জনকণ্ঠে' যোগদান। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: 'পথ থেকে পথে', 'সংবাদ নেপথ্য', 'কানসোনার মুখ', 'পায়রাবন্দের শেকড় সংবাদ', 'নিজস্ব রিপোর্ট', 'ছোট ছোট গল্প', 'শাহ আলম মজিবরের কাহিনী', 'অনুসন্ধানী প্রতিবেদন–গ্রামীণ পর্যায় থেকে', 'চিলমারীর এক যুগ', 'নানা মুখ নানা কথা'। সাংবাদিকতায় অবদান রাখায় জহুর হোসেন চৌধুরী স্বর্ণপদক লাভ (১৯৮১)। 'কানসোনার মুখ' শীর্ষক সিরিজ প্রতিবেদনের জন্য ফিলিপস পুরস্কার পান (১৯৮৭)। ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স তাঁকে পুরস্কৃত করে 'প্রযুক্তি চিন্তাযুক্ত' প্রতিবেদনের জন্য। তাঁকে সম্মানিত করে ওয়াশিংটনের 'পদ্মার ঢেউ' বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার কেন্দ্র ও বগুড়ার লেখকচক্র। মৃত্যু. রেলওয়ে ফেরিতে তিস্তামুখ ঘাট থেকে বাহাদুরাবাদ ঘাটে রওয়ানা হন। ফেরি কানসোনা টার্নিং-এ পৌঁছুলে তিনি ফেরির ছাদে ওঠেন। ছাদ থেকে নদীর ছবি তোলার সময় হঠাৎ তিনি পা ফসকে নদীবক্ষে পড়ে যান। সাঁতার না জানায় নিমিষেই নদীর ঘূর্ণাবর্তে তলিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর সলিল সমাধি ঘটে, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৫।



মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১)॥ জন্ম. খালিশপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, ২২ জুলাই, ১৯২৬। শহীদ অধ্যাপক ও লেখক। আট-নয় বছর বয়সে পিতা বজলুর রহিম চৌধুরীর (সরকারি কর্মচারী) মৃত্যু ঘটলে মাতুলালয়ে মাতা মাহফুজা খাতুনের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ। নোয়াখালী আহমদিয়া স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার (১৯৪২)। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ঢাকার বোর্ডে আই.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার (১৯৪৪)। এরপর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে বাংলায় অনার্সে ভর্তি। কিছুকাল পর ঐ কলেজ ত্যাগ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজিতে অনার্সে ভর্তি। বাংলা পড়ার প্রতি অনুরাগবশত এ কলেজ ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে ভর্তি। সেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বাংলা অনার্স কোর্সের পাঠ সমাপ্ত। নন কলেজিয়েট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. বাংলা অনার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (১৯৪৬)। এই পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে 'সুরেন্দ্রনলিনী স্বর্ণপদক' লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. (বাংলা) ক্লাসে অধ্যয়ন (১৯৪৬-১৯৪৭)। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র ভবনের বৃত্তি লাভ করে ১৯৪৭-এর জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনে ভর্তি। এখান থেকে

'সাহিত্যভারতী' উপাধি লাভ (১৯৪৮)। প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলায় এম.এ. পাস (১৯৫৩)। রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের 'স্ক্রিপ্ট রাইটার' হিসেবে কর্মজীবন শুরু (১৯৪৯)। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত (১৯৫০)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সিনিয়র প্রভাষক পদে যোগদান (১৯৫৫)। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে দু বছর ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন ও গবেষণা (১৯৫৭-১৯৫৯)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রিডার পদে উন্নীত (১৯৭০)। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি অর্জন। রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্র-সাহিত্য পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী এ অভিযোগে ১৯৬৭-র ২২ জুন পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার ও রবীন্দ্র-সাহিত্য পঠন-পাঠনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করলে, সরকারের সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদজ্ঞাপন। বাঙালি সংস্কৃতির সেবক ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক। সুবক্তা হিসেবেও খ্যাত। মার্জিত রুচি ও নম্র স্বভাবের জন্য সকল শ্রেণির মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন। প্রাবন্ধিক ও গবেষক হিসেবে সুনাম অর্জন। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙলা বানান ও লিপি সংস্কার (১৯৬২) রবি পরিক্রমা (১৯৬৩), রঙিন আখর (১৯৬৩, Colloquial Bengali (১৯৬৩), সাহিত্যের নবরূপায়ণ (১৯৬৯)। ১৯৫৬-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৫৬) শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ঐ বছর পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্সে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক হিসেবে 'স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদকে' ভূষিত। প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৭১)। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর পাক-হানাদার বাহিনীর এ দেশীয় সহযোগী আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যাপক লুৎফুল হায়দার চৌধুরীর ঢাকাস্থ বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে যায়; তিনি আর ফিরে আসেননি।

মোয়াজ্জেম হোসেন (১৯৩৪-১৯৭১)॥ জন্ম. ভাদুয়াখালী গ্রাম, খুলনা, ১৯৩৪। মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪-তে অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রিলাভ। ১৯৫৫-তে বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতে গিয়ে গেরিলাযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে ফিরে নিজের এলাকায় মুক্তিবাহিনী গঠন। বাগেরহাট অঞ্চলে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধে কৃতিত্ব ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ২৮ অক্টোবর আততায়ীর গুলিতে শহীদ হন।

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, লাল মিয়া (১৯০৫-১৯৬৭)॥ জন্ম. ফরিদপুর, ৩০ জানুয়ারি ১৯০৫। রাজনীতিবিদ। লাল মিয়া নামে সমধিক পরিচিত। জমিদার পরিবারে জন্ম। পিতা মইজুদ্দিন বিশ্বাস। ফরিদপুর এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। ছাত্রজীবনেই কংগ্রেস-এর রাজনীতিতে প্রবেশ। ১৯২০-তে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) অংশগ্রহণ করায় কারাবরণ। ১৯২৪-এ তাঁর উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং যোগদান করেন মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ। ১৯২৫-এ ফরিদপুর পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত এবং ত্রিশ বছর পৌরসভার কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত। এ ছাড়া লোকাল বোর্ড ও জেলাবোর্ডের নির্বাচিত সদস্যরূপে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন। ১৯৩০ ও ১৯৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং দুবারই কারাবরণ। ১৯৩৬ ও ১৯৪০-এ কংগ্রেসের মনোনয়নে ফরিদপুর থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪০-এর কলকাতার 'অন্ধকূপ হত্যা' স্মৃতিসৌধ অপসারণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গ্রেফতারবরণ। ১৯৪৩-এ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪৫-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য, ১৯৪৯-এ ফরিদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান, ১৯৫০-এ পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য ও ১৯৬২-তে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় ফরিদপুর থেকে পাকিস্তান



জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬২-র জুন মাস থেকে ১৯৬৪-র জানুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন) পার্লামেন্টারি পার্টির চিফ হুইপ ও পাকিস্তান সরকারের চিফ পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি। ১৯৬৪-র জানুয়ারি থেকে ১৯৬৫-র মার্চ পর্যন্ত আইয়ুব খাঁর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী। ১৯৬৫-এর ২৫ মার্চ গণতন্ত্রীদের ভোটে পুনরায় ফরিদপুর থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৫-র মার্চ থেকে ১৯৬৭-র এপ্রিল পর্যন্ত দ্বিতীয়বার কেন্দ্রীয় সরকারের চিফ পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ও সরকার দলীয় চিফ হুইপ। ১৯৩৪, ১৯৩৬ ও ১৯৬০-এ তিনি ফরিদপুরে কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রথম বারের প্রদর্শনী (১৯৩৪) উপলক্ষে সাহিত্য সম্মেলন করেন এবং সে সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় বারের প্রদর্শনীর (১৯৩৬) উদ্বোধন করেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু এবং তৃতীয় বারের প্রদর্শনীর (১৯৬০) উদ্বোধন করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৯৪১-এ নিখিল ভারত রবীন্দ্রস্মৃতি সম্মেলন-উদ্যোগ কমিটির সদস্য নির্বাচিত। তিনি দুখানি কবিতার বই রচনা করেন: 'দিন আগত ঐ মুসলমান তব কই' ও 'নওবেলাল' (১৯৬০)। ৫০ বছর বয়সে আবদআল্লাহ্ জহিরউদ্দীন নাম ধারণ। মৃত্যু. ঢাকা ৭ এপ্রিল ১৯৬৭।

মোয়াজ্জেম হোসেন, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার (১৯৩২-১৯৭১)॥ জন্ম. ডুমুরিতলা গ্রাম, পিরোজপুর, ১৯৩২। স্থানীয় কচুয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭-এ মেট্রিক পাস। প্রথমে বাগেরহাট কলেজে ও পরে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই.এসসি. অধ্যয়ন। কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯৫০-এ পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান। প্রায় সাত বছর ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীতে শিক্ষাগ্রহণ। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সুপারিশক্রমে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে কমিশন লাভ। ১৯৫৭-তে বিলেত থেকে পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন এবং পাকিস্তান নৌবাহিনীতে এক বছর চাকরি করার পর নৌবাহিনী সংক্রান্ত কারিগরি বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পুনরায় ব্রিটেন গমন। ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনী থেকে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ। ১৯৬০-১৯৬৬ পর্যন্ত করাচিতে পাকিস্তান নৌবাহিনীর সদর দফতরে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৬৫-তে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার পদে উন্নীত। ১৯৬৬-র ১ মে নেভাল বেস চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদে চট্টগ্রামে বদলি এবং সেখান থেকে ১৯৬৭-র ১১ মার্চ ডেপুটেশনে পূর্ব-পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল কর্তৃপক্ষের চাকরিতে যোগদান। বাঙালি সৈনিকদের স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেযার জন্য সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে তৎকর্তৃক একটি 'গুপ্ত বিপ্লবী সেল' গঠন। এ গুপ্ত সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা। পরবর্তীকালে এ পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। ১৯৬৭-র ৯ ডিসেম্বর ঢাকায় দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার। সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটিয়ে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব-পাকিস্তানকে আলাদা রাষ্ট্র করার অভিযোগ এনে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই নম্বর আসামি করা হয়। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণ-আন্দোলনের চাপে সরকার এ মামলা প্রত্যাহার করে নেয় (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)। একই বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি নিঃশর্ত মুক্তিলাভ। ১৯৭০-এর ২৮ মার্চ তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি।' বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য কাজ করে গেছেন। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুতে ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ ঢাকায় নিজস্ব বাসভবনে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে নিহত।



মোল্লা জালালুদ্দীন আহমদ (১৯২৬-১৯৭৯)॥ গাপালগঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারি ৷ গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল ুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে দত কলেজ থেকে বি.এ. ালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এল.এল.বি. (১৯৫৩) াইন ব্যবসায় যোগদান। কোর্টের একজন বিশিষ্ট তিষ্ঠা লাভ। ছাত্রজীবনেই যুক্ত। ১৯৪১-এ বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগের ফরিদপুর শহর শাখার সভাপতি ও ফরিদপুর জেলা শাখার সাংগঠনিক



সম্পাদক এবং ১৯৪২-১৯৪৭ পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিলর। পাকিস্তান আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিতি লাভ। পাকিস্তান ইস্যুর ওপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত ১৯৪৬-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনকালে মুসলিম লীগের ফরিদপুর জেলা ইউনিটের সহকারী নির্বাচন পরিচালক। সিলেট রেফারেন্ডামে (৬ ও ৭ জুলাই ১৯৪৭) মুসলিম লীগ দলীয় কর্মীদের নেতৃত্ব দান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ এবং সরকার-বিরোধী রাজনীতি সংগঠিত করার কাজে মনোযোগ প্রদান। ৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮-এ প্রতিষ্ঠিত 'ছাত্রলীগ' ও ২৩ জুন, ১৯৪৯-এ প্রতিষ্ঠিত 'আওয়ামী লীগ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে আন্দোলন পরিচালনা করার দায়ে সলিমুল্লাহ হল থেকে বহিষ্কৃত। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৬৪-র ২৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ (১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর সামরিক সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা) পুনরুজ্জীবনে শেখ মুজিবুর রহমানের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ১৯৬৪-১৯৭২ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য। ১৯৬৬-তে ৬ দফা দাবির পক্ষে সাংগঠনিক তৎপরতায় নিয়োজিত হলে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার। দুই বছর কারাভোগের পর ১৯৬৮-তে মুক্তিলাভ। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণ-আন্দোলন চলাকালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক রাওয়ালপিণ্ডিতে আহূত গোল টেবিল বৈঠকে (২৬ ফেব্রুয়ারি ১০, ১১, ১২, মার্চ ১৯৬৯) আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর ফরিদপুর-৬ এলাকা থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকারের দূত হিসেবে স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্য সফর। এ সময় বৈরুতে স্থাপিত বাংলাদেশ মিশনের প্রধান। দেশ স্বাধীন হবার পর মন্ত্রিসভায় যোগদান। ১৯৭২-এর ১২ এপ্রিল থেকে ১৯৭৩-এর ১৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সরকারের ডাক, তার ও টেলিফোন দফতরের মন্ত্রী। ১৯৭৩-এ ফরিদপুরে-১১ নির্বাচনী এলাকা থেকে উপ-নির্বাচনে পুনরায় জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত এবং মৎস্য, পশুপালন, ভূমিরাজস্ব ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ। ১৯৭৪-এর মে মাসে স্বাস্থ্যগত কারণে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ। ১৯৭৫-এ বাকশাল গঠিত হলে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিযুক্ত। ১৯৭৯-র ফেব্রুয়ারিতে তৃতীয়বার গোপালগঞ্জ জেলা থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। তিনি ছিলেন স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রবক্তা। বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম কৌসুলি ছিলেন। মৃত্যু. ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯।

মোশাররফ হোসেন, নওয়াব (১৮৭১-১৯৬৬)॥



জন্ম. চিওড়া গ্রাম, কুমিল্লা, ১৮৭১। রাজনীতিবিদ। ১৯১৮-তে তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯২৭-এ বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত। তাঁর সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিল গৃহীত। ১৯৩৭-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত এবং ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। দীর্ঘকাল নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন। দেশভাগের পরে আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। ১৯২৬-এ নওয়াব উপাধি লাভ। জলপাইগুড়িতে ২২টি ও সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে ১ টি মোট ২৩টি চা বাগানের মালিক মোশাররফ হোসেন অত্যন্ত দানশীল ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বহু স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যু. ১৪ নভেম্বর ১৯৬৬।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)॥ জন্ম.



হাকিমপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭ জুন ১৮৬৮। সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। পিতা মওলানা আবুদল বারি খাঁ ছিলেন মধ্যবঙ্গের একজন আলেম ও পির। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন যশোর-খুলনা

সীমান্তের পয়গ্রামের হিন্দু ব্রাহ্মণ। পনের শতকে ঐ বংশের কামদেব ও জয়দেব নামক দুই সাহোদর ভাইয়ের ইসলাম ধর্মগ্রহণ : কামদেব জালালুদ্দীন খাঁ আর জয়দেব কামালুদ্দীন খাঁ নাম গ্রহণ করে পিরালি কাজে নিয়োজিত হন। আকরাম খাঁ এই কামালুদ্দীন খাঁর বংশধর। তাঁর বয়স যখন ১২/১৩ বছর তখন তাঁর পিতামাতার কলেরা রোগে একই দিনে মৃত্যু। মাতামহ কর্তৃক প্রতিপালিত। ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগবশত ইংরেজি স্কুলের পাঠ ত্যাগ করে ১৮৯৬-তে কলকাতা আলিয়া মদ্রাসায় ভর্তি। কৃতী ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে সুনাম অর্জন। মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯০০-তে ফাজেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯০৩-এ তাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকা প্রকাশিত। ১৯০৮-এ পত্রিকাটি সাপ্তাহিকে পরিণত। ৯১৩-তে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 'আঞ্জুমানে ওলামা' গঠন এবং এর মুখপত্র মাসিক 'আল এসলাম' (১৯১৫) পত্রিকা প্রকাশ। স্বীয় সম্পাদনায় ১৯২০-এ উর্দু দৈনিক 'জামানা' ও ১৯২১-এ দৈনিক 'সেবক' প্রকাশ। সেবকের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'কে দৈনিকে রূপান্তর। ১৯২৭-এর ৬ নভেম্বর দ্বিতীয় পর্যায়ে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'মোহাম্মদী' প্রকাশ। সাংবাদিক জীবনের অমর কীর্তি 'দৈনিক আজাদ' (৩১ অক্টোবর ১৯৩৬) প্রকাশ ও সম্পাদনা (১৯৪০-এ স্বাস্থ্যহানির জন্য আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে সম্পাদনার দায়িত্বভার অর্পণ)। অবিভক্ত বঙ্গে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বার্থ রক্ষায় আজাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর আজাদ কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর (১৯৪৮)। একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, মুসলিম লীগের (১৯০৬) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১), খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২), ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ আন্দোলনে (১৯২৪-১৯২৫) বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। বঙ্গদেশের খেলাফত কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত (১৯১৯)। 'সেবক' পত্রিকায় 'অগ্রসর' শিরোনামে অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে উত্তেজনাকর সম্পাদকীয় লেখার দায়ে গ্রেফতার (১৯২১)। এক বছর কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভ (১৯২২) 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) প্রণয়নে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অন্যতম সহযোগী। সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে (জুন ১৯২৪) সভাপতির দায়িত্ব পালন। ১৯২৯-এ কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে 'নেহেরু রিপোর্টের' (১৯২৯) বিরোধিতা। 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির' (১৯২৯) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এর প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৩৫-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৩৬-এ মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪১-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। পাকিস্তান লাভের (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বাস। পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহসভাপতি এবং পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫১-তে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ। ১৯৫৪-তে গণ-পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হলে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯৬২-তে পুনরায় আজাদের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে আজাদ পরিচালনা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ। আইয়ুব সরকারের জারিকৃত প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিনান্সের প্রতিবাদে ১৯৬৩-র ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সাংবাদিকদের যে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় তাতে নেতৃত্ব দান। দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে (২ জানুয়ারি ১৯৬৫) সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। পূর্ববাংলায় রবীন্দ্র-জন্মশত বার্ষিকী পালনের (১৯৬১) বিরোধিতা। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের বিরোধী এ বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রনাথের গান প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সে পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন প্রদান (জুন ১৯৬৭)। আরবি, উর্দু, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন আকরম খাঁ বাংলা গদ্য সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজচিন্তামূলক গ্রন্থ রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অক্ষয় কীর্তি হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনী 'মোস্তফা চরিত' (১৯২৩) এবং পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদ 'তফসিরুল কোরআন' (১-২ খণ্ড ১৩৭৮ হিজরি, ৩-৫ খণ্ড—১৩৭৯ হিজরি)। 'সমস্যা ও সমাধান', 'মোসলেম

বাংলার সামাজিক ইতিহাস' (১৯৬৫), 'মুক্তি ও ইসলাম' তাঁর অন্যান্য গদ্যগ্রন্থ। আকরাম খাঁর ভাষা গাঢ়বদ্ধ ও সংস্কৃতানুসারী। ক্ষণজন্মা পুরুষ। অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম জাগরণের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের সাংবাদিকতার পথিকৃৎ। ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও নারীস্বাধীনতা ও সংগীতচর্চার অনুকূলে মত প্রকাশ। মৃত্যু. ঢাকা, ১৮ আগস্ট ১৯৬৮।

মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজীম (১৯৩১-১৯৭১)॥



জন্ম. রানীনগর গ্রাম, নওগাঁ, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩১। শহীদ। রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি. ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ছাত্র-রাজনীতিতে যোগদান। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনে রাজশাহী ও ঢাকায় সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাঁরা নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি। কিছুকাল আত্মগোপন। ফজলুল হক হল বার্ষিকীর সম্পাদক। কমিশন পেয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান। লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত। সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ এবং লতীফ বাওয়ানী জুটমিলের লেবার অফিসার পদে যোগদান। ১৯৬৫-১৯৬৬ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফুলব্রাইট সংস্থার বৃত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শ্রমিক পরিচালনা' বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ। সেখানে আন্তর্জাতিক শ্রমসংক্রান্ত বিষয়ের উপর বিতর্কে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার এবং স্বর্ণপদক লাভ। এরপর দেশে প্রত্যাবর্তন ও রাজশাহী জেলার গোপালপুর চিনিকলের প্রশাসক নিযুক্ত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১-এর ৫ মে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে নিহত।

মোহাম্মদ আবদুর রব, মেজর জেনারেল (১৯১৯-১৯৭৬)॥ জন্ম. হবিগঞ্জ, ১৯১৯। মুক্তিযোদ্ধা। সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে বি.এ. এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস। ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান। ১৯৪৪-এ কমিশন লাভ। দ্বিতীয়



মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)-এ বার্মা সেক্টরে এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে (১৯৬৫) কাশ্মীর সেক্টরে অংশগ্রহণ। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে লেঃ কর্নেল পর্যন্ত পদোন্নতি লাভ। ১৯৭০-এ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। এরপর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগদান। একই বছর ৭ ডিসেম্বর হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ, বানিয়াচং ও আজমীরিগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু করলে তাঁর নেতৃত্বে বৃহত্তর সিলেট জেলায় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি। ১৭ এপ্রিল (১৯৭১) মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ পদে নিযুক্তি লাভ। প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম.এ. জি. ওসমানীর সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন। বিজয়ের প্রাক্কালে ওসমানীর সঙ্গে হেলিকপ্টার যোগে মুক্তাঞ্চল সফরকালে পাকিস্তানি বাহিনী ঐ হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে মেশিনগানের গুলি নিক্ষেপ করলে আবদুর রব গুরুতররূপে আহত হন। ১৯৭২-এর ৭ এপ্রিল পর্যন্ত চিফ অব স্টাফ পদে দায়িত্ব সম্পাদন। অবসর গ্রহণকালে অবৈতনিক মেজর জেনারেল পদমর্যাদা লাভ। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ হবিগঞ্জ জেলা থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (২৬ অক্টোবর ১৯৭২)-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য বীর-উত্তম উপাধিতে ভূষিত। কর্নেল রব নামে সমধিক পরিচিত। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। মৃত্যু. ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ১৯৭৬।

মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী (১৮৯৪-১৯৫১)॥ জন্ম. কাকারা, চকরিয়া, কক্সবাজার, মার্চ ১৮৯৪। সম্পাদক, সাহিত্যিক ও গবেষক। গ্রামের নিম্ন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু। ১৯১১-এ কক্সবাজার সদরে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি। কিছুদিনের মধ্যে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত নতুন স্কুলে সাত মাস অধ্যয়নের পর

বিদ্যালয় ত্যাগ। ১৯১৪-এ কেরানির চাকরি ও



গৃহশিক্ষকতায় নিযুক্ত। তিন মাস পরে ইস্তফা। এ সময় 'রোস্তম সোহরাব' নামে ক্ষুদ্র কাব্যপুস্তিকা রচনা। ১৯১৭-এ 'নূরন্নেহার' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি কলকাতার মাখদুমী লাইব্রেরিকে মাত্র ১৫০ টাকা বিক্রি। 'উপেন্দ্র-নন্দিনী' ও 'মেহেরুন্নেসা' নামে আরও দুটি উপন্যাস রচনা। ১৯১৮-এ 'পদ্মিনী' উপন্যাস ও 'চিন্তার চাষ' নামক গ্রন্থের কপিরাইট বিক্রি। ১৯১৯-এ মাসিক পত্রিকা 'সাধনা' প্রকাশ। সাধনা ৩য় বর্ষ সংখ্যা পর্যন্ত চট্টগ্রাম থেকে এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলো কলকাতা থেকে প্রকাশিত। 'সাধনা'য় মৌলানা ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, শাহাদাৎ হোসেন, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, মাহবুব-উল আলম, কাজী নজরুল ইসলাম, বনফুল, শশাঙ্কমোহন সেন, ডা. লুৎফর রহমান প্রমুখ লেখকদের লেখা প্রকাশিত। ১৯২১-এর এপ্রিলে মুসলমান মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা মাসিক 'আন্নেসা' চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশ। সম্পাদিকা হিসেবে তাঁর স্ত্রী বেগম সাদিয়া খাতুনের নাম মুদ্রিত হলেও তিনিই মূলত সম্পাদক ও প্রকাশক। 'জাতীয় জাগরণের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র' হিসেবে সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ' সম্পাদনা। ১৯২২-এর ১৫ আগস্ট সংখ্যায় 'সময় থাকিতে সাবধান, বুঝে চল বৃটিশ' সম্পাদকীয় লেখার জন্য কারাবরণ। 'মোসলেম জগৎ' ১৯২৪-এ বন্ধ হয়। ১৯২৬-এ জেলা জজ কোর্টের অবৈতনিক জোরার নিযুক্ত। ১৯৩৬-এ কাকারা ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, চকিরয়া থানা মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও কক্সবাজার মহকুমা মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি। ১৯২৩-এ 'বেগম খোশ' নামক ওষুধ প্রস্তুত করে প্রচুর অর্থ লাভ। ১৯৩৩-এ কলকাতা থেকে 'রক্তসেতু' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা। ১৯৩৮-এ 'মোসলেম জগৎ পঞ্জিকা' নামক মুসলমানি পঞ্জিকা প্রকাশ। ১৯৩৭-এ ১৯৪৬-এ দু'বার বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনে পরাজিত। গ্রন্থ: 'বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ', 'যবনবধ কাব্য' (১৩৫১), 'পাকিস্তান বিজয় কাব্য (১৩৫৫), অনুবাদ 'পবিত্র কোরআনের আমপারা খণ্ডের কাব্যানুবাদ', 'মহাকোরান কাব্য' (১৯২৭) উপন্যাস: 'জরিনা (১৩৩২), 'উপেন্দ্রনন্দিনী (১৯১৭) 'প্রণয় প্রদীপ, 'মেহেরুন্নেসা, 'গন্ধর্ব-দুহিতা প্রভৃতি। গবেষণা: 'চট্টগ্রামী ভাষাতত্ত্ব' (১৩৫৩), 'চাটিগ্রামী ও রোমাইতত্ত্ব'; সমালোচনা: 'কলির বাংলা'। পুরস্কার: ১৯৩২ প্রাদেশিক সরকারের সনদ ও স্বর্ণপদক লাভ। ১৯৬৬-এ সাহিত্যকর্মের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে মরণোত্তর বিশ হাজার টাকা সম্মানী লাভ। মৃত্যু. কক্সবাজার, ২৬ মার্চ ১৯৫১।

মোহাম্মদ আবদুল করিম মিয়া (১৯২৯-১৯৮৪)॥ জন্ম. পূর্ব শিমুলীয়া গ্রাম, টঙ্গিবাড়ি, মুন্সীগঞ্জ, ৪ মার্চ ১৯২৯। ক্ল্যারিওনেট বাদক। শৈশবকাল থেকে সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট। ষোল বছর বয়সে পদ্ধতিগতভাবে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম গ্রহণ শুরু। ক্ল্যারিওনেট বাদনে দক্ষতা অর্জন। রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা কেন্দ্রের নিয়মিত ক্ল্যারিওনেট বাদক। মৃত্যু. ঢাকা, ২৪ অক্টোবর ১৯৮৪।

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস (১৯০৬-১৯৮৮)॥ জন্ম.



নাসিরকোট, হাজীগঞ্জ চাঁদপুর, ১ জানুয়ারি, ১৯০৬। শিক্ষাবিদ, বয়স্কশিক্ষার পথিকৃৎ, আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ। পিতা আফসার উদ্দিন আহমদ, মাতা মানিকজান। রূপসা আহমদিয়া হাইস্কুল থেকে আরবি ও ইতিহাসে ডিস্টিংশনসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিক উত্তীর্ণ (১৯২৫) এবং মহসিন বৃত্তি লাভ। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯২৭ ও ১৯২৯-এ আই.এ. ও বি.এ. পাস। ১৯৩২-৩৩-এ ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.টি., ১৯৩৬-এ ময়নামতি থেকে স্কাউটিং প্রশিক্ষণ, ময়মনসিংহ প্রাইমারি ট্রেনিং কলেজ থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ, ডিপ্লোমা এবং প্রথম শ্রেণিতে এম.এড.। ১৯৫৪-৫৫-এ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৫৮-৫৯-এ মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পল্লী উন্নয়ন ও বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ। ১৯২৯ থেকে ৪৯ পর্যন্ত হাইস্কুলে শিক্ষকতা, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও স্কুল সাবইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত। ১৯৫১-

৫৭-এ কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ। ১৯৫৭-এ পূর্ব-পাকিস্তান শিক্ষা কমিশনের সহকারী সচিব ও ঢাকা জুনিয়র কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৫৮-৬৩-এ পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের বয়স্ক শিক্ষা শাখার এডিপিআই। ১৯৬২-এ 'কুমিল্লা মডার্ন স্কুল' এবং 'সবুজ সংঘ' নামে শিশুসংগঠন প্রতিষ্ঠা। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য 'পাক্ষিক আলো' নামে পত্রিকা (১৯৬৯-৭১) সম্পাদনা। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের উপদেষ্টা সম্পাদক (১৯৮৫-৮৬)। বয়স্কশিক্ষার জন্য সহজ ভাষায় পাঠ্যবইয়ের প্রণেতা এবং নব্যশিক্ষিতদের জন্য ২৪টি পুস্তিকা প্রণয়ন। কুমিল্লায় শহীদস্মৃতি ডিগ্রি কলেজ (১৯৭৩) ছাড়াও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন। প্রকাশিত গ্রন্থ; প্রবন্ধ ও গবেষণা: কর্তব্য সাধনে যুবক (১৯৭০), নজরুলকাব্যে ইসলামী ভাবধারা (১৯৭০), কুমিল্লা নজরুল (১৯৭৬), শহর কুমিল্লা (১৯৭৮), শিশুসাহিত্যে নজরুল (১৯৮৩), পল্লীউন্নয়নে শিক্ষা: কুমিল্লার অভিজ্ঞতা (১৯৮৩), কুমিল্লায় জেলায় ইসলাম প্রচার (১৯৮৭), কুমিল্লার স্মরণীয় বরণীয় (১৯৮৭); শিশুসাহিত্য: ছোটদের নজরুল পরিচিতি (১৯৬২) সৈয়দ আহমদ (১৯৬৭), ছোটদের নবী মোস্তফা (১৯৮০), বেগম রোকেয়া (১৯৮৬), এদেশের এক হাতেম তায়ী (১৯৮০), জনগণের নবাব (১৯৮৭); বয়স্কশিক্ষা ও সাক্ষরতা– গাঁয়ের পথে চলো (১৯৬০), বয়স্কশিক্ষা সাথী (১৯৬৭), বয়স্কশিক্ষা (১৯৬৯); বয়স্কশিক্ষা পুস্তিকা: পল্লী সংগঠনে বয়স্কশিক্ষা (১৯৭২), সাক্ষরতা সারথী (১৯৮২); প্রাথমিক শিক্ষা: শিক্ষানীতির কয়েকটি কথা (১৯৫৫), পাঠশালার প্রথম শ্রেণি (১৯৭৫), মক্তব শিক্ষক প্রবর্শিকা (১৯৮৬)। পাকিস্তান সরকারের 'তমঘা-ই-কায়েদে আজম' পুরস্কার লাভ (১৭০); শিক্ষায় অবদানের জন্য 'একুশে পদক' লাভ (১৯৮৩)। মৃত্যু, ঢাকা, ৩০ আগস্ট ১৯৮৮।

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (১৯২৭-১৯৭৮)॥ জন্ম. দরগাপাড়া, রাজশাহী, ১৯২৭। উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী। উত্তরাধিকার-সূত্রে সংগীতের প্রতি অনুরক্ত। রাজশাহীর বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ আবদুল আজিজ ওরফে মনু মাস্টারের কাছে সংগীতে প্রথম পাঠ গ্রহণ। পরে প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ হরিপদ দাসের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম গ্রহণ। ১৯৫৩-তে জাতীয় পর্যায়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার। ১৯৫৭-তে রেডিওতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। ১৯৬৪-তে রাজশাহী বেতারকেন্দ্রের সংগীত প্রযোজক নিযুক্ত। ১৯৭২-এ 'আলাউদ্দিন সংগীত সম্মেলনে', ১৯৭৪-এ রেডিও বাংলাদেশের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে এবং ১৯৭৬-এ রেডিও বাংলাদেশ চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত সংগীত সম্মেলনে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করে প্রভূত প্রশংসা অর্জন। মৃত্যু, রাজশাহী, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৮।

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (১৯১৫-১৯৯৩)॥



জন্ম. গোপালপুর, সুজানগর, পাবনা, ১৯১৫। জ্যোতির্বিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ। ১৯৩৮-এ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিশুদ্ধ গণিতে অনার্সসহ এম.এসসি. পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ। ১৯৩৯-এ শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে লন্ডন গমন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সরকারের নির্দেশেই ফিরে আসতে হয়। দেশে ফিরে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে প্রভাষক হিসেবে চাকরি করেন। এরপর যোগ দেন চট্টগ্রাম কলেজে এবং সেখান থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯৪৮-এ গণিত বিভাগের প্রধান হিসেবে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমান বুয়েট) যোগদান। ১৯৬২-এ আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পূর্ব-পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হলে প্রথম রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগলাভ। ১৯৬৮-এ ছাত্র কল্যাণ পরিচালক পদে নিযুক্ত এবং এই পদ থেকেই ১৯৮০-এ অবসর গ্রহণ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক এম. এ. রশীদের নামে ১৯৮৪-এ প্রবর্তিত প্রথম 'ডক্টর রশীদ অধ্যাপক' পদে নিয়োগলাভ। তিনিই প্রথম বাংলায় আকাশের তারাসমূহের ছক তৈরি করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের প্রথম খগোলক (celestial globe) নির্মিত। এই খ-গোলকটি বর্তমানে বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশনে সংরক্ষিত। তিনি বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা

সভাপতি। বাংলাদেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ এবং উপকরণ তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন। ১৯৬২ -৮২ সাল পর্যন্ত তার অঙ্কিত তারাচিত্র 'রাতের আকাশ' নামে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রচনাবলি: বিশ্বরহস্যে নিউটন ও আইনস্টাইন (১৯৪২), খগোলক পরিচয় (১৯৬৫), তারা পরিচিতি (১৯৬৭), প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা (১৯৭৩), বিশ্ব ও সৌরজগৎ (১৯৮৬), আকাশ পট (১৯৮৯), টেক্সট বুক অব ইন্টারমিডিয়েট ডাইনামিক, টেক্সট বুক অব ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস, টেক্সট বুক অব ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস। পুরস্কার: ড. কুদরত-ই-খুদা স্মৃতিপদক (১৯৮৫), বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩), একুশে পদক (১৯৮৫), কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, অনুসন্ধিৎসু চক্র ও বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন ব্রুনো পদক (১৯৯০) প্রভৃতি। মৃত্যু. ঢাকা, ২০ জুলাই ১৯৯৩।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল, মেজর (১৯৪২-১৯৮৯)॥ জন্ম. উজিরপুর, বরিশাল, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২। মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ। মেজর জলিল নামে সমধিক পরিচিত। মাতৃ-গর্ভে থাকতেই পিতা জনাবালী শিকদারের পরলোক গমন।



উজিরপুর ডব্লিওবি ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস (১৯৫৯)। পাকিস্তানের কোয়েটায় গমন। সেখানে দূর সম্পর্কীয় এক মামার (সেনাবাহিনীর কর্মচারী) কাছে আশ্রয় গ্রহণ। কোয়েটায় কিছুদিন ইলেকট্রিক মেকানিকের কাজ শেখেন। মামার চেষ্টায় মারী ইয়ং ক্যাডেট ইনস্টিটিউশনে ভর্তি। এই ইনস্টিটিউশন থেকে আই.এ. পাস। ১৯৬২-তে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে ট্রেইনি অফিসার পদে যোগদান। সামরিক বাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় বি.এ. ও এম.এ. (ইতিহাস) পাস। ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করায় পদোন্নতি লাভ। ১৯৬৫-র শেষের দিকে ক্যাপ্টেন ও ১৯৭০-এর শেষের দিকে মেজর পদে উন্নীত। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে অসুস্থ মাতাকে দেখার জন্য ছুটি নিয়ে মুলতান থেকে বরিশালে আগমন। সে অবস্থায় মার্চে (১৯৭১) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান। নবম সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব লাভ। নভেম্বর মাসে (১৯৭১) মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম.এ. জি. ওসমানী কর্তৃক তাঁকে সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ২৮ ডিসেম্বর (১৯৭১) খুলনায় গ্রেফতার। ১৯৭২-এর ৪ জুলাই মুক্তিলাভ। একই বছর ৩১ অক্টোবর (১৯৭২) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন এবং দলের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-আহবায়কের দায়িত্ব লাভ। ২৬ ডিসেম্বর (১৯৭২) ঢাকায় কাউন্সিল অধিবেশনে দলের (জাসদ) সভাপতি নির্বাচিত। সরকার-বিরোধী ভূমিকা পালনসহ দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনা। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে সাতটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সব ক'টিতে পরাজিত। ১৯৭৪-এর ১৭ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ঘেরাও করতে গেলে গ্রেফতার। মুজিব সরকারের পতনের (১৫ আগস্ট ১৯৭৫) পর ১৯৭৫-এর ৮ নভেম্বর মুক্তিলাভ। সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা, সরকার উৎখাত ও বেআইনিভাবে ক্ষমতা দখলের পদক্ষেপ নেওয়ার অভিযোগে একই বছর ২৫ নভেম্বর (১৯৭৫) মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের হাতে পুনরায় গ্রেফতার। বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান (১৮ জুলাই ১৯৭৬)। ১৯৮০-র ২৪ মার্চ জেল থেকে মুক্তিলাভ। ১৯৮১-তে ১৪ নভেম্বরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ত্রিদলীয় (জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কৃষক-শ্রমিক সমাজবাদী দল) জোটের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। ১৯৮৪-র জাসদের জাতীয় কমিটি কর্তৃক তাঁকে দলের সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পথ ত্যাগ করে ইসলামি আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' নামে একটি দল গঠন। আশির দশকে কিছুকাল মধ্যপ্রাচ্যে আদম ব্যবসায় নিয়োজিত। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: সীমাহীন সময় (১৯৭৬), দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনদর্শন, সূর্যোদয় (১৯৮২), অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা (১৯৮৯), Bengladesh Nationalist Movement for Unity(A

Historical Necessity। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান স্মরণীয়। সত্তরের দশকে বাংলাদেশের সরকার-বিরোধী রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। মৃত্যু. ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ১৯ নভেম্বর ১৯৮৯।

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম (?-১৯৫৭)॥ জন্ম. নগরসুন্দরদী গ্রাম, ফরিদপুর। সাংবাদিক, কথাশিল্পী। ইসলাম দর্শন (১৯২০) ও মুসলিম পত্রিকার সম্পাদক এবং মোছলেম হিতৈষী (১৯১১) পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে'র জয়েন্ট সেক্রেটারি। প্রকাশিত গ্রন্থ—উপন্যাস: পল্লী সংস্কার, বিষাদ লহরী, প্রতিশোধ, মিলন, প্রতিদান। কাব্য: কবিতা লহরী, জাতীয় লহরী। পুথি: শরিয়তুল মোসলেমীন, এস্কে গোলজার (১৯১৩), এস্কে জহর (১৯১৩), জেহাদে হিন্দুস্তান, পরীমালা (১৯১৫)। এ ছাড়াও পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করেন। মৃত্যু. ১৯৫৭।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্-হেল কাফী মওলানা (১৯০০-১৯৬০)॥ জন্ম. মাতুলালয়, টুবগ্রাম, বর্ধমান, ১৯০০। পৈতৃক নিবাস সুলতানপুর, চট্টগ্রাম। পিতা মওলানা আবদুল হাদী কর্তৃক দিনাজপুর জেলার বস্তিআড়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন। লেখক, আলেম ও রাজনীতিবিদ। রাজনীতিবিদ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ হেল বাকী তাঁর অগ্রজ। শৈশবে মায়ের কাছে উর্দু, ফারসি এবং বাবার কাছে আরবি ভাষা শিক্ষা। পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ করে হুগলী মাদ্রাসা ও কলকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো-পারসিয়ান বিভাগে অধ্যয়ন। কলকাতা মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পাস। ১৯১৯-এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বি.এ. পড়ার সময়ে খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ইংরেজি শিক্ষা বর্জন। এই সময়ে 'আলহেলাল' পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আবুল কালাম আজাদের সংসর্গ লাভ এবং তাঁর নির্দেশে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকায় আগমন। পরবর্তীকালে কলকাতায় ফিরে মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত খেলাফত কমিটির মুখপত্র উর্দু দৈনিক পত্রিকা 'জামানা'-র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান। ১৯২১-এ পত্রিকার সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক গ্রেফতার হলে পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯২২-এ জময়াতে উলামায়ে বাংলার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯২৪-এ তৎকর্তৃক সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সত্যাগ্রহী' প্রকাশ। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহকারী হিসেবে ইনডিপেনডেন্ট মুসলিম পার্টির সংগঠন ও প্রচারণার কাজে অংশগ্রহণ। ঐ দলের সেক্রেটারির পদেও দায়িত্ব পালন। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০) যোগ দেবার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গে বিশেষ করে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ববাংলায় ইসলামি প্রচার কাজ চালান এবং অনেক মাদ্রাসা ও ঈদ্গা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনের পক্ষে বক্তৃতা দেওয়ায় গ্রেফতার ও কারানির্যাতন ভোগ। ১৯৩৫-এ রংপুর জেলার হারাগাছা বন্দরে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ আহলে হাদীস সম্মেলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ। ১৯৪০-এ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী মুসলিম কনফারেন্সে এবং ১৯৪৪ ও ১৯৪৫-এ নিখিল ভারত আহলে হাদীস সম্মেলনে যোগদান। ১৯৪৯-এ তৎকর্তৃক মাসিক পত্রিকা 'তর্জমানুল হাদীস' প্রকাশ। তাঁরই প্রচেষ্টায় ও সম্পাদনায় ১৯৫৭-তে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আরাফাত'-এর প্রকাশ। উর্দু ও আরবি ভাষায় ছোট-বড় ছাব্বিশটি বই রচনা। প্রবন্ধ ও গবেষণার জন্যে ১৯৬০-এ বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ১৯৬০।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ হেল বাকী, মওলানা (১৮৮৬-১৯৫৩)॥

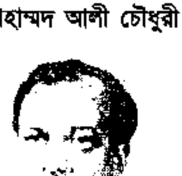


জন্ম. মাতুলালয়, টুব গ্রাম, বর্ধমান, ১৮৮৬। পৈতৃক নিবাস, সুলতানপুর, চট্টগ্রাম। লেখক ও রাজনীতিবিদ। পিতা মওলানা আবদুল হাদী কর্তৃক দিনাজপুরের বস্তিআড়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন। লেখক, আলেম ও রাজনীতিবিদ মওলানা আবদুল্লাহ্ হেল কাফী তাঁর অনুজ। প্রথমে রংপুরের এক মাদ্রাসায় তাঁর বিদ্যাশিক্ষা শুরু। পরে ভারতের জামিউল উলুম মাদ্রাসায় আরবি সাহিত্য, ইসলামি শাস্ত্র ও ইতিহাস অধ্যয়ন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে উত্তরবঙ্গস্থ জামা-আতে আহলে হাদীসের দায়িত্ব গ্রহণ। দেশের শিক্ষিত জনগণের জন্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান 'আঞ্জুমান-ই-উলামা-ই বাংলা'র অন্যতম সংগঠক ও কর্ণধার। খেলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনে (১৯১৯-১৯২২) বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। ১৯৩০-এ

কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার দায়ে গ্রেফতার ও কারানির্যাতন ভোগ। ১৯৩২-এ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কারাবরণ। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত 'কৃষক-প্রজা পার্টির' প্রজা আন্দোলনে যোগদান (১৯৩৩) এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত (১৯৩৪)। পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে ১৯৪৩-এ মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪৬-এ অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহসভাপতি এবং পরে সভাপতি। একই সঙ্গে পাকিস্তান গণ-পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য মনোনীত। 'পীরের ধ্যান' নামে একটি পুস্তিকা এবং কোরান, হাদীস ও ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করেন। মৃত্যু. ঢাকা. ১৯৫৩।

মোহাম্মদ আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২)॥ জন্ম. চণ্ডীপুর গ্রাম, বসিরহাট, চব্বিশ পরগনা, ১৮৫৯। বসিরহাটের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও লোকাল বোর্ডের সদস্য। মোহাম্মদী পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ। 'চণ্ডীপুর ইসলামি মেলার' প্রবর্তক। তাঁর সব গ্রন্থই ধর্মবিষয়ক: মেসবাহুল মসলেমিন (১৮৭৯), গোলজার এসলাম (১৮৮১), মহরম উৎসব (১৮৮৪), বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ (১৯০৭) ইত্যাদি। লৌকিক ইসলামের পরিবর্তে তৎকর্তৃক শাস্ত্রীয় ইসলামের ওপর গুরুত্ব আরোপ। একজন মৌলবাদী ইসলামি সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে সচেতন ভূমিকা পালন। মৃত্যু. ১৯৩২।

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (১৯০৯-১৯৬৩)॥ জন্ম. বগুড়া, ১৯১০। রাজনীতিবিদ। জমিদার পরিবারে জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস করে রাজনীতিতে যোগদান। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬-এ মুসলিম লীগের মনোনয়নে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪৪-১৯৪৫-এ অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভার পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ও ১৯৪৬-



১৯৪৭-এ পরবর্তী বঙ্গীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার অর্থ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রী। এ ছাড়া বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি (১৯৩৭-১৯৪৭), বগুড়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বগুড়া স্কুল বোর্ডের সভাপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। পাকিস্তান আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর ১৯৪৮-এ বার্মায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত, ১৯৪৯-১৯৫২ পর্যন্ত কানাডায় পাকিস্তানের হাই কমিশনার, ১৯৫২-১৯৫৩ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ-কর্তৃক ১৯৫৩-র ১৭ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৫৪-র ২৯ মে মোহাম্মদ আলীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক পূর্ববাঙলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বাতিল ঘোষণা এবং ৯২ (ক) জারি করে পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন প্রবর্তন। ১৯৫৪-র ২০ ডিসেম্বর তাঁর পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইনমন্ত্রীরূপে, আবু হোসেন সরকার স্বাস্থ্যমন্ত্রীরূপে এবং জেনারেল আইয়ুব খাঁ দেশরক্ষা মন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। ১৯৫৪-তে তাঁর আমলে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ছাড়া পাকিস্তান 'সেন্টো' ও 'সিয়াটো'র সদস্য হয়। ১৯৫৫-র ৭ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ। এরপর প্রথমে যুক্তরাষ্ট্র ও পরে জাপানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত (১৯৫৫-১৯৫৯)। ১৯৬২-র ২৮ এপ্রিল আইয়ুব খাঁ-কর্তৃক প্রবর্তিত বুনিয়াদি গণতন্ত্রের প্রথায় বগুড়া থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত এবং পরিষদের নেতা (জুন ১৯৬২-জানুয়ারি ১৯৬৩)। একই বছরের ১৩ জুন (১৯৬২) আইয়ুব খাঁর মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পদে কর্মরত। 'বগুড়ার মোহাম্মদ আলী' নামে পরিচিত। মৃত্যু. ২৩ জানুয়ারি ১৯৬৩।

মোহাম্মদ ইদরিস আলী (১৯১১-১৯৭৩)॥ জন্ম. সরিষা গ্রাম, পাবনা, ১ মার্চ ১৯১১। শিক্ষাবিদ ও গবেষক। স্থানীয় নাকালিয়া হাইস্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে মেট্রিক পাস (১৯২৮)। করটিয়া সাদত কলেজে ভর্তি। আই.এ. টেস্ট পরীক্ষার পূর্বে কলেজের পাঠ ত্যাগ করে কলকাতায় গমন। সেখানে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয়কলা শিক্ষা গ্রহণ। এরপর মিনার্ভার সদস্য হিসেবে নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ। ১৯৩২-এ তা ত্যাগ

করে পুনরায় পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি



এ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. (১৯৩৪) ও কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৩৬) পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. (১৯৩৯) ডিগ্রি লাভ। ১৯৪০-এর ৩ জুলাই সরকারি কলেজে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯৪৯-এ অফিসিয়েটিং অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৫৭-র জুলাই মাসে বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা-অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান। ১৯৬০-এর সেপ্টেম্বর মাসে এ প্রতিষ্ঠানের সচিব পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৬২-র জানুয়ারি মাসে রাজশাহী সরকারি কলেজে অধ্যাপনার কর্মে যোগদান। পরের বছর ডিসেম্বর (১৯৬৩) মাসে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা-ডাইরেক্টরেটে এ.ডি.পি.আই. নিযুক্ত। ১৯৭০-এ এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ। একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অ্যাডহক ভিত্তিতে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। ১৯৭২-এর জুলাই মাসে সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি লাভ। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। প্রাবন্ধিক ও গবেষক। গ্রন্থ: মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৯৫৮), অলস মনের অবান্তর ভাবনা (আত্মজীবনী ১৯৭০), শিক্ষা সমস্যা (অনুবাদ ১৯৭০) ও কৃষ্ণকান্তের উইল ও বঙ্কিম (১৯৭০)। মৃত্যু. ঢাকা, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭০।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম (১৮৯৪-১৯৬৬)॥ জন্ম. বিষ্ণুপুর গ্রাম, সদরপুর থানা, ফরিদপুর, ১৮৯৪। বিচারপতি ও রাজনীতিবিদ। বরিশাল



জিলা স্কুল থেকে ১৯১৪-তে মেট্রিক, ১৯১৬-তে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ. ও ১৯১৮-তে একই কলেজ থেকে ইংরেজিতে বি.এ. (অনার্স) পাস। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম.এ. কোর্স সমাপ্ত ১৯২০-তে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং ব্রিটিশ পরিচালিত শিক্ষা বর্জনের জন্যে কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নাগপুর সম্মেলনে যোগদান এবং এম.এ. পরীক্ষা বর্জন ১৯২২-এ ঢাকা ল' কলেজ থেকে বি.এল. পাস। প্রথমে ফরিদপুর (১৯২২-১৯২৪), পরে ঢাকা বারে (১৯২৪-১৯৩৯) আইন ব্যবসায়। কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপনা। ১৯৩৯-এ বিচার বিভাগে চাকরি গ্রহণ। ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটর (১৯৩৯-১৯৪৩), বরিশালের অতিরিক্ত জেলা জজ ও সেশন জজ (১৯৪৩-১৯৪৫), যশোরের জেলা জজ ও সেশন জজ (১৯৪৫-১৯৪৭), বরিশালের জেলা জজ ও সেশন জজ (১৯৪৭-১৯৫০)। ১৯৫০-এ ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত। ১৯৫৬-তে এই পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন (১৯৫৬-১৯৫৮)। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি হলে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আইনমন্ত্রী নিযুক্ত। শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় ১৯৬২-র এপ্রিল মাসে স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৬৪-র ২৫ জুলাই সম্মিলিত বিরোধীদল (কপ) গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে (২ জানুয়ারি ১৯৬৫) আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে কপের (সম্মিলিত বিরোধীদল) প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৬৬-তে ৬-দফা আন্দোলন চলাকালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান অস্ত্র প্রয়োগের ভয় দেখালে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর অবদান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে ১৯৬২-র অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের, আইয়ুব সরকারের স্বৈরাচারী ও জনস্বার্থবিরোধী ভূমিকা এবং পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ ও বক্তৃতা-বিবৃতি স্বাধিকার আন্দোলনকারীদের মনে প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। তাঁরই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় মুসলিম পারিবারিক আইন বিধি-৬১ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। মৃত্যু. ঢাকা, ১৩ নভেম্বর ১৯৬৬।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম ডা. (১৯১১-১৯৮৯)॥ জন্ম. কায়েরা গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, ১৯১১। চিকিৎসাবিদ। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাস। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের হাউস ফিজিশিয়ান (১৯৩৮-১৯৪৫) ও রেসিডেন্সিয়াল ফিজিশিয়ান (১৯৪৫-১৯৪৭)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। কিছুদিন চট্টগ্রাম জেলার সিভিল সার্জন পদে চাকরি করার পর ১৯৪৮-এ উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যান্ড গমন। ১৯৫০-এ লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়াঙ্গ থেকে এম.আর.সি.পি. ডিগ্রি লাভ। দেশে ফেরার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশনে উচ্চপদে দায়িত্ব পালন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক (১৯৫০-১৯৬২), পাকিস্তান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৫৬--১৯৭১), স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল (১৯৬২-১৯৬৪), করাচির জিন্নাহ পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল সেন্টারের পরিচালক (১৯৬৪-১৯৭১) ও পাকিস্তান মেডিক্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান (১৯৬৯-১৯৭১)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর করাচি থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। ঢাকার শাহবাগে ডায়াবেটিস হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের নেতৃত্ব গ্রহণ। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশে ডায়াবেটিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ও উন্নতিসাধন। বাংলাদেশ ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৭৩-১৯৮৯), মন্ত্রীর পদমর্যাদায় স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা (১৯৭৫-১৯৭৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য (১৯৮১), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এশিয়া অঞ্চলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য (১৯৮২-১৯৮৩), আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের সদস্য প্রভৃতি পদে দায়িত্ব পালন। চিকিৎসা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে অবদান রাখায় পাকিস্তান সরকারের সিতারা-ই-পাকিস্তান (১৯৬৩) ও বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৭) লাভ। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অধ্যাপক সম্মানে ভূষিত। ঢাকা ডায়াবেটিস হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় তাঁর শ্রম, সাধনা ও মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর মৃত্যুর পর এই হাসপাতালের নামকরণ করা হয়েছে 'ইব্রাহিম মেমোরিয়াল ডায়াবেটিস সেন্টার' (বারডেম হাসপাতাল)। মৃত্যু. ঢাকা, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।



মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯২৫-১৯৮৭)॥ জন্ম. কুশালপুর গ্রাম মৌলভীবাজার, ১৯২৫। রাজনীতিবিদ। মৌলভীবাজার সরকারি স্কুল থেকে মেট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ও এম.এ. পাস। বায়ান্নর ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। এ আন্দোলনে কারাভোগ। ভাষা-আন্দোলনের প্রগতিশীল চেতনাকে সাংগঠনিক রূপ দেয়ার জন্য ১৯৫২-র ২৬ এপ্রিল 'পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' গঠন। এ নবগঠিত ছাত্র সংগঠনের পর চা-শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগদান। পূর্ব-পাকিস্তান টি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক, পরে এর সভাপতি। ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগে যোগদান। একই বছর ৭ ডিসেম্বর সিলেট-৪ আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এর মে মাসে মুজিবনগর গমন ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ সিলেট-৪ আসন থেকে, ১৯৭৯-র ১৮ ফেব্রুয়ারি সিলেট-১৫ আসন থেকে ও ১৯৮৬-র ৭ মে মৌলভীবাজার-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য (১৯৭৮-১৯৮৬) ও মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি (১৯৭৭-১৯৮৬)। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী একজন প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ হিসেবে খ্যাত। মৃত্যু. ঢাকা, ২১ নভেম্বর ১৯৮৭।



মোহাম্মদ ইসমাইল, খানবাহাদুর (১৮৭১-১৯৪৪)॥ জন্ম. হোসেন্দিগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ১১

জুলাই ১৮৭১। প্রথম জীবনে ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ। পরে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ. পাস। অর্থকষ্টের জন্য ঢাকার ইসলামিয়া হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষকের চাকরি গ্রহণ এবং চাকরির টাকা দিয়ে বি.এ. পড়াশোনা চালান। আইন পাস করে ময়মনসিংহ বারে যোগদান। স্বল্প সময়ে খ্যাতনামা আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। ওজস্বী বাগ্মী হিসেবে খ্যাতি অর্জন। পূর্ববঙ্গকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করার আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) নওয়াব সলিমুল্লাহর সহকর্মী। খানবাহাদুর উপাধি লাভ। ময়মনসিংহে আঞ্জুমানে ইসলামিয়া সমিতি গঠন। ১৯০৬-১৯২০-এর মধ্যে চার বার ময়মনসিংহ জেলাবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত। পরে চেয়ারম্যান এবং ১৯২৯ পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। খানবাহাদুর আবদুল মোমিনের নেতৃত্বে গঠিত নিউ স্কিম মাদ্রাসার শিক্ষা সংস্কার কমিটির সক্রিয় সদস্য। এঁদের উদ্যোগে নিউ স্কিম মাদ্রাসা প্রবর্তন। ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা। প্রজা সমিতিতে যোগদানের ফলে ময়মনসিংহের প্রজা আন্দোলনে গতিবেগ সৃষ্টি। ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত ১৯৩৫-এর কৃষক প্রজা সম্মিলনীর অন্যতম সংগঠক। ময়মনসিংহে তাঁর নামে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। মৃত্যু. ৪ মাঘ, ১৩৫১।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০)॥ জন্ম. মাগুরাডাঙ্গা গ্রাম, পাংশা, রাজবাড়ী, নভেম্বর ১৮৮৮ (১৮ কার্তিক ১২৯৫)। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। পিতা পুলিশ অফিসার (দারোগা) এনায়েতুল্লাহ চৌধুরী। পাংশা হাইস্কুল থেকে এম.ই. এবং রাজবাড়ী সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। বি.এ. ক্লাসে অধ্যয়নকালে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ায় কলেজ ত্যাগ। এ সময়ে তাঁর অগ্রজ মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কোহিনুর' (১৮৯৮-১৯০১-১৯০৪-১৯০৬-১৯১১-১৯১২ ও ১৯১৫) সম্পাদক রওশন আলী চৌধুরী রোগাক্রান্ত হলে উক্ত পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ। ১৯১৪-১৯১৫ পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলার জোরওয়ারগঞ্জ হাইস্কুলে শিক্ষকতা। রাজবাড়ী সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনে শিক্ষক হিসেবে যোগদান। ১৯২০-১৯২১-এ পাংশা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করার সময় অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণ। কারামুক্তির পর শিক্ষকতার চাকরি ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় গমন এবং মধ্যম ভ্রাতা আওলাদ আলী চৌধুরীর সঙ্গে সাংবাদিকতায় যোগদান। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' (৪ সেপ্টেম্বর ১৯১১) প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। এ সমিতির সম্পাদক হিসেবেও কয়েক বছর দায়িত্ব পালন। সমিতির মাসিক পত্র 'সাহিত্যিক' (১৯২৬)-এর যুগ্ম-সম্পাদক। এয়াকুব আলী চৌধুরী ও কবি গোলাম মোস্তফার যুগ্ম-সম্পাদনায় পত্রিকাটি এক বছর চলেছিল (১৯২৬)। রওশন আলী চৌধুরী ও আওলাদ আলী চৌধুরীর অকালমৃত্যু ঘটায় তাঁদের পরিবারবর্গের দায়িত্ব গ্রহণ। তাঁর শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখময়। শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যে নিপতিত হয়ে ৪৭/৪৮ বছর বয়সে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। শেষ জীবনের ৪/৫ বছর জীবন্মৃত অবস্থায় গ্রামের বাড়িতে বাস। মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক মাসিক পঁচিশ টাকা হিসেবে একটি সাহিত্যিক বৃত্তি মঞ্জুর। বাংলা গদ্যের একজন শক্তিশালী শিল্পী। ইসলামি দর্শন ও সংস্কৃতি তাঁর রচনার মূল উপজীব্য। বক্তব্যের বলিষ্ঠতায়, ভাষার মাধুর্যে ও ভাবের গাম্ভীর্যে তাঁর রচনাবলি বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী। চিরকুমার ছিলেন এবং সচ্চরিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য সুপরিচিত। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু এ বিতর্কে বাংলা ভাষার পক্ষাবলম্বন। সুবক্তা হিসেবেও খ্যাত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ধর্মের কাহিনী (১৯১৪), নূরনবী (১৯১৮), শান্তিধারা (১৯১৯), মানব মুকুট (১৯২২)। মৃত্যু. রাজবাড়ী, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪০।

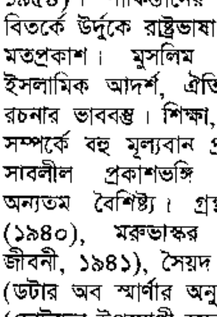
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)॥ জন্ম. বাঁশদহ গ্রাম, সাতক্ষীরা, সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ (২৮ ভাদ্র ১৩০৩)। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। গ্রামীণ ডাক্তার মুনশী মোহাম্মদ ইব্রাহিম তাঁর পিতা। স্থানীয় বাবুলিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাস। কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে এফ.এ. ক্লাসে অধ্যয়ন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (দৈনিক আজাদের প্রতিষ্ঠাতা) ও মুজীবর রহমান (সাপ্তাহিক 'দি মুসলমানের' সম্পাদক)-এর সংস্পর্শে এসে কলেজের পাঠ ত্যাগ করে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। মওলানা আকরম খাঁ প্রতিষ্ঠিত 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' (১৯০৮) পত্রিকার সম্পাদকীয়

বিভাগে চাকরি লাভ। দৈনিক মোহাম্মদীর



(১৯২১) ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন। আশরাফ-আতরাফ সম্পর্ক নিয়ে মওলানা আকরম খাঁর সঙ্গে মতান্তর ঘটলে চাকরিচ্যুত। 'দি মুসলমান' (১৯০৬), 'দৈনিক সেবক' (১৯২১), 'সাপ্তাহিক খাদেম' (১৯২৬) ও 'সাপ্তাহিক সওগাত' (১৯২৮)-এর সম্পাদকীয় বিভাগে দায়িত্ব পালন। দ্বিমাসিক 'সাম্যবাদী'র (১৯২২) দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা। শাহের বানুর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯২৪)। স্বাস্থ্যহানির কারণে ১৯৩৫-এ কলকাতা ত্যাগ করে স্বগ্রাম বাঁশদহে প্রত্যাবর্তন। বাকি জীবন সেখানে স্থায়ীভাবে বাস (১৯৩৫-১৯৫৪)। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (বাংলা-উর্দু) বিতর্কে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের পক্ষে মতপ্রকাশ। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক। ইসলামিক আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ তাঁর রচনার ভাববস্তু। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা। সহজ ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গি তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থঃ মহামানুষ মুহসীন (১৯৪০), মরুভাস্কর (হযরত মোহাম্মদের জীবনী, ১৯৪১), সৈয়দ আহমদ, স্মার্ণা-নন্দিনী (ডটার অব স্মার্ণার অনুবাদ), হযরত মোহম্মদ (ছোটদের উপযোগী হযরত মোহাম্মদের জীবনী, ১৯৪৮), কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৪৯), মণিচয়নিকা (১৯৫১)। মৃত্যু. বাঁশদহ, ৮ নভেম্বর ১৯৫৪)।

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ (১৯০৭-১৯৭৮)॥ জন্ম.

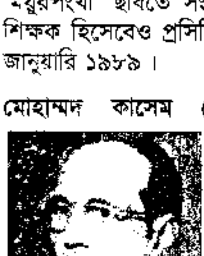


বাউরিয়া গ্রাম, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম, ১ মার্চ ১৯০৭। সাংবাদিক ও লেখক। এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম। পিতা রমিজ আলী ছিলেন কলকাতার তৎকালীন এক ইংরেজ বণিক কোম্পানির কর্মচারী। এন্ট্রান্স ক্লাসে অধ্যয়নকালে পিতার মৃত্যু। সন্দ্বীপ কার্গিল হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯২৪) ও চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ.এ. (১৯৩২) পাস। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বরিশাল বি.এম. কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি। আর্থিক সঙ্কটে পড়ে কলেজের পাঠত্যাগ করে চাকরির সন্ধানে রেঙ্গুন গমন (১৯৩৩)। রেঙ্গুনের 'ডেইলি নিউজ'-এর ক্যাজুয়াল রিপোর্টার পদে চাকরি লাভ। বার্মা থেকে দেশে ফিরে সন্দ্বীপ হাইস্কুলে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত। ১৯৩৬-এ কলকাতার 'স্টার অব ইন্ডিয়া'র সিনিয়র সহ-সম্পাদক পদে যোগদান। কিছুদিন পরে দৈনিক আজাদ (১৯৩৭)-এর সিনিয়র সহ-সম্পাদক নিযুক্ত। অল্পকাল পরে আজাদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে জাহাজি শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান। বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের বেতনভোগী জেনারেল সেক্রেটারির পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৪২-এ ওরিয়েন্ট প্রেসের কলকাতা শাখার সম্পাদকের পদে যোগদান। ১৯৪৬-এ 'দৈনিক ইত্তেহাদ' (১৯৪৬)-এ পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক নিযুক্ত। ছাত্রজীবন থেকে কংগ্রেসের (১৮৮৫) রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কংগ্রেস ত্যাগ করে ১৯৩৭-এ মুসলিম লীগে (১৯০৬) যোগদান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের তথ্য বিভাগের সহকারী সম্পাদক (১৯৫৪-১৯৬৭)। 'লালকোর্তা' ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ। একজন মননশীল গদ্যলেখক। সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। গ্রন্থঃ সংবাদ ও সাংবাদিক (১৯৪৩), সেকালের কথা (১৯৪৯), সেকালের কাহিনী (১৯৫০), ফাঁসির মঞ্চে (১৯৫২), বিচিত্র জীবন (১৯৫২), সেকাল ও একাল (১৯৫২), আমাদের মুক্তি সংগ্রাম (১৯৫৩), যুগ-বিচিত্রা (১৯৬৭), জীবন জাগার কাহিনী (১৯৮২)। যুগ-বিচিত্রায় (১৯৬৭) আত্মকথা বর্ণনার ভেতর দিয়ে ব্রিটিশ-ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সুচারুভাবে উপস্থাপিত। মৃত্যু. ঢাকা, ৩ আগস্ট ১৯৭৮।

মোহাম্মদ ওসমান খান (১৯২২-১৯৮৯)॥ জন্ম. করিমকান্দি গ্রাম, হরিরামপুর-মানিকগঞ্জ, ১৯২২। সংগীতশিল্পী। বাল্যকাল যাত্রাদলের গান ও পিতামহের বাজানো দোতারার সুর শুনে সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। পিতার মৃত্যুর পর বারো বছর বয়সে গান শেখার জন্য



কলকাতায় গমন। সেখানে মামার বাসায় থেকে ওস্তাদ বিভূতি দত্ত, মাস্টার মনোরঞ্জন ও ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খান খসরুর কাছে গানের তালিম গ্রহণ। কলকাতা মেগাফোন কোম্পানি থেকে তাঁর কণ্ঠে 'পরদেশীরে কলসী লইয়া ঘাটে বইসা থাকি' গানটি রেকর্ডিং হলে সংগীত রসিক সমাজে পরিচিতি লাভ। 'তোর লাগি পরাণ কান্দেরে' গানটি গেয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্রের সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার। কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন। দেশ বিভাগের (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিত পল্লীগীতি পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন। বাংলাদেশ টেলিভিশনেরও একজন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী তিনি। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের গণসংগীত শাখায় দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন। 'আমার সোনার ময়না পাখী', 'বনের কোকিল আর ডাকিস নারে', 'আমার মাইজা ভাই সাইজা ভাই কই গেলা রে' প্রভৃতি জনপ্রিয় পল্লীগীতির রচয়িতা, সুরকার ও গায়ক। চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক হিসেবেও খ্যাত। 'জরিনা সুন্দরী', 'আবার বনবাসে রূপবান', 'বাহরাম বাদশা' ও 'ময়ূরপংখী' ছবিতে সংগীত পরিচালনা। গানের শিক্ষক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ৩ জানুয়ারি ১৯৮৯।

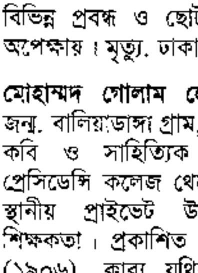


মোহাম্মদ কাসেম (১৯০৫-১৯৫৭)॥ জন্ম. কুমিল্লা, ১৯০৫। আদি নিবাস ঢাকা। সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও প্রকাশক। প্রাক-প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতিকালে পিতা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের মৃত্যু হওয়ায় শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। চাকরির সন্ধানে কুমিল্লা ছেড়ে ঢাকায় আগমন। ঢাকায় চকবাজারে একটি মনিহারি দোকানে কর্মচারীরূপে যোগদান (১৯২০)। কিছুকাল পর এ কাজ ত্যাগ করে কলকাতায় গমন ও অতিকষ্টে জীবনধারণ। প্রায় দুই বছর পর কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় প্রত্যাগমন (১৯২৫)। ঢাকার পুরাতন মোগলটুলীতে ছোটখাটো একটি মনিহারি দোকান স্থাপন (১৯২৬)। এ সময়ে সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ এবং সেসূত্রে আবদুল কাদির, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, আবুল ফজল প্রমুখের সঙ্গে পরিচয় লাভ। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের (১৯২৬) সঙ্গেও যুক্ত হন। ১৯২৬-এ প্রথমে 'দরদী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। পরে স্বসম্পাদনায় মাসিক 'অভিযান' প্রকাশ। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র বার্ষিক সম্মেলনে (১৯২৭) 'তত্ত্ব ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন। এ সময়ে মোগলটুলীতে ফজলে রাব্বির স্টেশনারি দোকানে চাকরি গ্রহণ। ঢাকার রহমতগঞ্জের হাজী পিয়ার বক্সের কন্যা খায়রুন্নেসার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ (১৯২৮)। পরের বছর দোকানের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় পুনরায় গমন। কলকাতায় 'কঙ্কালে'র কবি আশরাফ আলী খানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং দৈনিক সুলতান পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি লাভ। 'বেদুঈন' পত্রিকার সহসম্পাদক নিযুক্ত (১৯৩২)। 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'বেদুঈন', 'বাংলার বাণী', 'হানাফী', 'মোয়াজ্জিন' প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশ। মাসিক 'মোহাম্মদী'তে বারজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান গল্পকার রচিত ধারাবাহিক উপন্যাস 'বারোয়ারী'র (১৩৩৬) পঞ্চম অধ্যায়ের লেখক। 'আগামীবারে সমাপ্য' (১৯৩৩) উপন্যাস প্রকাশিত হলে কথাসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত মাসিক 'সবুজ বাংলা' (১৯৩৪) সম্পাদনা। পুনরায় কলকাতা গমন। সম্ভ্রান্ত মুসলিম প্রকাশনালয় 'এম্পায়ার বুক হাউসে' (পরে 'মখদুমী লাইব্রেরি' নামে খ্যাত) চাকরি লাভ (১৯৩৭)। ১৯৩৯-এ এ প্রতিষ্ঠানের ঢাকা শাখার ম্যানেজার পদে যোগদান। ৬/৭ বছর পর এ সংস্থার স্বত্বাধিকার লাভ। 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র ঢাকা কেন্দ্রের ফিচার রচয়িতা, আবৃত্তিকার, বেতার-নাট্যকার ও অভিনেতা হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন। ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'মনসুর ডাকাত', 'সোহরাব রোস্তম', 'যারা [illegible] (ধারাবাহিক)', 'শতাব্দীর আলো' প্রভৃতি নাটকের [illegible] জনপ্রিয়তা লাভ। ১৯৪১-

এ দাঙ্গাবিরোধী 'নওজোয়ান ক্লাব' গঠন ও সকল সম্প্রদায়ের কাছে জনহিতৈষী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ। ১৯৪২-এ 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণ। ঢাকার 'রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ঢাকার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে খ্যাত। তাঁর নিবাস 'খায়রুনমহল' এ সময়ে ঢাকার একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক আড্ডায় রূপলাভ। রুচিশীল পুস্তক-প্রকাশক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও ছোটগল্প গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায়। মৃত্যু. ঢাকা, ২২ নভেম্বর ১৯৫৭।

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪)॥ জন্ম. বালিয়াডাঙ্গা গ্রাম, মাগুরা, যশোর, ১৮৭৩। কবি ও সাহিত্যিক। ১৮৯৪-তে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাস। আমরণ স্থানীয় প্রাইভেট উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। প্রকাশিত বই: বঙ্গ বীরাঙ্গনা কাব্য (১৯০৬), কাব্য যূথিকা (১ম ভাগ ১৯৬০), বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান (১৯১০), দিল্লি আগ্রা ভ্রমণ (১৯১২), কবিতা কুসুম, নীতিপ্রবন্ধ মুকুল (১ম সং ১৯১৬, ২য়-সং, ১৯২১), পয়গামে মোহাম্মদী (অনুবাদ, ১৯২২) ইত্যাদি। মৃত্যু. ১৯৬৪।

মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭)॥ জন্ম.



কুশাখালী গ্রাম, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ২ জানুয়ারি ১৯২২। রাজনীতিবিদ। পিতা হাজী মোহাম্মদ ইয়াসিন। জোতদার পরিবার জন্ম। স্থানীয় ফরাশগঞ্জ হাইস্কুল থেকে মেট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ও এম.এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১৯৪৪) পাস। বামপন্থি ছাত্রসংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা শহর শাখার বিশিষ্ট নেতা। ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি। যুবলীগ (২৭ মার্চ ১৯৫১)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫১-র ৩১ ডিসেম্বর এ সংগঠনের সহসভাপতি নির্বাচিত। ১৯৪৮-এর মার্চের ও ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও উদ্যোক্তা আন্দোলনে কারানির্যাতন ভোগ। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ (৩০ জানুয়ারি ১৯৫২)-এর প্রভাবশালী সদস্য। ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। ৭ মার্চ (১৯৫২) গ্রেফতার। প্রায় দুই বছর কারাভোগের পর ১৯৫৪-র ২০ ফেব্রুয়ারি মুক্তিলাভ। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগদান। যুক্তফ্রন্টের টিকেটে নোয়াখালী জেলা থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত (মার্চ ১৯৫৪)। ৩০ মে (১৯৫৪) ৯২-ক ধারা জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিলে গ্রেফতার। পূর্ব-পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন (১৯৫৬) ও পূর্ব-পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন (১৯৬৪)-এর সভাপতি। ১৯৫৭-র ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রশ্নে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর (পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি) সঙ্গে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ) মতবিরোধ দেখা দিলে উক্ত চুক্তির বিরোধী নেতা মওলানা ভাসানীর পক্ষ অবলম্বন। একই বছর ২৫ জুলাই ঢাকায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হলে এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে তাঁর ওপর হুলিয়া জারি। গ্রেফতার এড়াবার জন্য আত্মগোপন। প্রায় সাত বছর ফেরারি জীবন যাপন। ১৯৬৬-র মার্চে হুলিয়া প্রত্যাহৃত হওয়ার পর প্রকাশ্য রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন ও আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচির বিরোধিতা। চীন ও রাশিয়ার আদর্শগত বিরোধকে কেন্দ্র করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হলে ১৯৬৭-র ৩০ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন পিকিংপন্থি ন্যাপের পূর্ব-পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণ-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার প্রশ্নে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বিরোধ ঘটায় ১৯৭০-এর ৩০ মে ন্যাপের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ। তাঁর নেতৃত্বে সাম্যবাদী দল গঠন ও দলের সভাপতি নির্বাচিত। দলীয় আদর্শ হিসেবে গণচীনের নীতি ও পন্থা গ্রহণ। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় তৎকর্তৃক নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর ও রামগতি অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী

উভয়ের বিরুদ্ধে এক সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর আত্মগোপন অবস্থায় সশস্ত্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বদান। সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্য রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে (১৫ আগস্ট ১৯৭৫) বাকশাল (কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ) সরকারের পতন ঘটালে ১৯৭৬-এ আত্মপ্রকাশ করে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে যোগদান। একই বছর ১২ অক্টোবর তাঁর নেতৃত্বে সাম্যবাদী দল পুনরুজ্জীবিত। লে. জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা। ১৯৭৯-র ১৮ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী-১৩ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক শাসন উচ্ছেদ করে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনার জন্য ১৫ দলীয় জোট গঠন (৩০ জানুয়ারি ১৯৮৩)-এ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। জোটের অন্যতম সদস্য হিসেবে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ। ১৯৮৬-র ৭ মে'র সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর-৪ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। নীতিনিষ্ঠ, ত্যাগী, সংগ্রামী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সমাজতন্ত্রবাদী রাজনীতিবিদ। ভাষা-আন্দোলনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। মৃত্যু. ঢাকা, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৭।

মোহাম্মদ দানেশ, হাজী (১৯০০-১৯৮৬)॥ জন্ম সুলতানপুর গ্রাম, দিনাজপুর, ১৯০০। কৃষক-নেতা ও রাজনীতিবিদ। জোতদার পরিবারে জন্ম। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. (১৯৩১) ও এল.এল.বি.. (১৯৩২) পাস। দিনাজপুর আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯৩৮-এ বঙ্গীয় কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন কৃষক সমিতির কর্মসূচির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ। টোল আদায় বন্ধ ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবিতে দিনাজপুর জেলায় ব্যাপক সংগ্রাম পরিচালনা। ১৯৪২-এ রংপুরের ডোমারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় কৃষক সম্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে ১৯৩৮ ও ১৯৪২-এ কারাভোগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পর বর্গা চাষিদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি জেলায় তথা সারা উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দান। ১৯৪৫-এ মুসলিম লীগে যোগদান। তেভাগা আন্দোলন পরিত্যাগ করতে রাজি না হওয়ায় পরের বছর মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার ও মুসলিম লীগ দলীয় বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক গ্রেফতার। ১৯৪৭-এ মুক্তিলাভ। একই বছর দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনায় যোগাদান। ১৯৫২-র ২৭ এপ্রিল তাঁর নেতৃত্বে গণতন্ত্রী দল গঠিত ও দলের সভাপতি নির্বাচিত। গণতন্ত্রী দলের যুক্তফ্রন্টে (৩ ডিসেম্বর ১৯৫৩) যোগদানের প্রধান উদ্যোক্তা ও ফ্রন্টের মনোনয়নে দিনাজপুর জেলা থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত (মার্চ ১৯৫৪)। ৯২-ক ধারা জারি করে পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া (৩০ মে ১৯৫৪) হলে গ্রেফতার। ১৯৫৬-তে মুক্তিলাভ। গণতন্ত্রী দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন (২৫ জুলাই ১৯৫৭)। ন্যাপের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে কারারুদ্ধ। ১৯৬৪-র ২৯ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পূর্ব-পাকিস্তান কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত। প্রায় দেড় বছর এ পদে দায়িত্ব পালনের পর পুনরায় ন্যাপের সহসভাপতি নির্বাচিত (জুলাই ১৯৬৫)। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচির বিরোধিতা করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা (১৯৬৬-১৯৭০)। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বরের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দিনাজপুর-৩ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কাছে পরাজিত। ১৯৭১-এর ৫ জানুয়ারি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানীপন্থি) থেকে পদত্যাগ। একই বছর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর গমন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কর্ম সম্পাদন। দেশ স্বাধীন (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) হওয়ার বছর দুয়ের পর জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন (জাগমুই) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন (ডিসেম্বর ১৯৭৩) এবং এর সভাপতির পদ গ্রহণ। জাগমুই বিলুপ্ত করে শেখ মুজিবুর রহমান



কর্তৃক গঠিত বাকশাল (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫)-এ যোগদান ও এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিযুক্ত (৭ জুন ১৯৭৫)। সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত (১৫ আগস্ট ১৯৭৫) হওয়ার পর বাকশাল (কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ) সরকারের পতন ঘটলে তৎকর্তৃক রাজনৈতিক দলবিধির (১৯৭৬) আওতায় গণমুক্তি ইউনিয়ন (জাগমুই) পুনরুজ্জীবিত। ১৯৮০-তে এ দলের অস্তিত্ব বিলোপ করে কয়েকজন বামপন্থি নেতার সহযোগিতায় গণতান্ত্রিক পার্টি গঠন ও এর সভাপতি নির্বাচিত। দলটি সামরিক শাসক লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় পার্টির (১ জানুয়ারি ১৯৮৬) সঙ্গে একীভূত হলে জাতীয় পার্টির অঙ্গ সংগঠন জাতীয় কৃষক পার্টির প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত (১৯৮৬)। ১৯৮৬-র ৭ মে'র জাতীয় সংসদের নির্বাচনে দিনাজপুর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। কৃষক, সাধারণ ও মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম পরিচালনা। তেভাগা আন্দোলনের নেতা হিসেবে পরিচিত। মৃত্যু. ঢাকা, ২৮ জুন ১৯৮৬।

মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন (১৮৩২-১৯১৬)॥ জন্ম. সুরুজ গ্রাম, টাঙ্গাইল, ১৮৩২। মুসলিম শাস্ত্রবেত্তা, ইসলাম প্রচারক, লেখক। মধ্যবাংলা স্কুলে পড়াশুনা। আরবি, ফারসি ও উর্দুতে জ্ঞান অর্জন। পণ্ডিতী, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ও কাজির পদে চাকরি। পাক-ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ। বাংলাদেশের নানাস্থানে ওয়াজ-নসিহত করে লোককে হেদায়েত করেন। করটিয়ার জমিদারদের মাহমুদীয়া প্রেসের ম্যানেজার। আখবার-এ-ইছলামীয়া নামে মাসিক পত্রের সম্পাদক ও প্রকাশক। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশ। মৃত্যু. ১৯১৬।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৬০-১৯২৩)॥ জন্ম. চরবেলতৈল গ্রাম, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, আনুমানিক ১৮৬০। ঔপন্যাসিক। শাহজাদপুর ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ঢাকা নর্মাল স্কুলে ভর্তি। টিউশনি করে লেখাপড়ার ব্যয়নির্বাহ। নর্মাল পাস করার পর জলপাইগুড়িতে একটি নীলকুঠিতে কিছুদিন চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ। শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। প্রথমে ভাঙ্গাবাড়ি (সিরাজগঞ্জ) মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে (মতান্তরে মধ্য বাংলা মডেল ছাত্রবৃত্তি স্কুলে) প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালন। শিক্ষকতার পাশাপাশি একই সময়ে ভাঙ্গাবাড়ির ডাকঘরে পোস্টমাস্টার পদেও কর্ম সম্পাদন। সলঙ্গা (রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ) মাইনর স্কুলের হেডপণ্ডিত হিসেবে দায়িত্ব পালন। স্কুলটি কমরুল গ্রামে (রায়গঞ্জ) স্কুলটি স্থানান্তরিত হলে সেখানে যোগদান এবং উক্ত গ্রামে স্থায়ী বসতবাটি নির্মাণ। ১৯১০-এ হাটি কমরুল স্কুল থেকে বদলি হয়ে রাজশাহী জুনিয়র মাদ্রাসার বাংলার শিক্ষক পদে যোগদান। চরবেলতৈল গ্রামে একটি মক্তব স্থাপন (১৮৯২)। এটি পরবর্তীকালে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত। সলঙ্গায় শিক্ষকতা করাকালে স্থানীয় হিন্দু-জমিদার তাঁর জমিদারিতে গো-বধ ও গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন। তাঁর সংগ্রামের ফলে সলঙ্গায় গো-বধের অধিকার প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। প্রথম উপন্যাস 'আনোয়ারা'র (১৯১৪) ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত এ উপন্যাসে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের পারিবারিক ও সামাজিক চিত্র উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। প্রেম, বিরহ এবং দাম্পত্য জীবনের সঙ্কট ও সেই সঙ্কট থেকে উত্তরণ এর আখ্যানবস্তু। ধর্ম ও সত্যের জয়, অধর্মের পরাজয় ও আনোয়ারার স্বামীনিষ্ঠা এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। 'চাঁদতারা বা হাসান গঙ্গা বাহমণি' (১৯১৭), 'পরিণাম' (১৯১৮), 'গরীবের মেয়ে' (১৯১৭), 'দুনিয়া আর চাই না' (১৯২৪), 'মেহেরউন্নিসা', 'প্রেমের সমাধি' তাঁর অন্যান্য উপন্যাস। 'বিলাতী বর্জন রহস্য' (১৯০৪) ও 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' (১৯০৪) তাঁর রচিত গদ্য পুস্তিকা। মৃত্যু. হাটি কুমরুল, ১৮ অক্টোবর ১৯২৩ (১ কার্তিক ১৩৩১)।

মোহাম্মদ নাসির আলী (১৯১০-১৯৭৫)॥ জন্ম.



ধাইদা গ্রাম, বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি, ১৯১০। শিশুসাহিত্যিক। স্থানীয় তেলীরবাগ কালীমোহন দুর্গামোহন ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স (১৯২৬), জগন্নাথ কলেজ থেকে এফ.এ. (১৯২৮) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.কম. (১৯৩১) পাস। চাকরির সন্ধানে কলকাতায় গমন। প্রায় দুই বছর

গৃহশিক্ষকতা করে জীবনধারণ। এরপর কলকাতা হাইকোর্টে অনুবাদকের চাকরি লাভ। দৈনিক ইত্তেহাদের (১৯৪৬-১৯৪৮) শিশু বিভাগের পরিচালকের সহকারী হিসেবেও দায়িত্ব পালন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন ও ঢাকা হাইকোর্টে চাকরিতে যোগদান। ১৯৬৭-তে অবসর গ্রহণ। ১৯৪৯-এ প্রকাশনা সংস্থা 'নওরোজ কিতাবিস্তান' প্রতিষ্ঠা। ১৯৫২-তে দৈনিক আজাদের শিশু-কিশোর বিভাগ 'মুকুলের মহফিল' পরিচালনার দায়িত্ব লাভ। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের বিরোধী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে (২২ জুন ১৯৬৭) সরকারের সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে বিবৃতি প্রদান (১৭ মে ১৯৭১)। 'বাগবান' ছদ্মনামে ১৯৭৫ পর্যন্ত (মাঝখানে কিছুদিন বাদে) আজাদের মুকুলের মহফিল পরিচালনা। সাহিত্যচর্চায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন শিশুসাহিত্যিক হিসেবে। ছোটদের জন্য শিক্ষামূলক গল্প, প্রবন্ধ ও জীবনকথা রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। হাস্যরস সৃষ্টিতে তাঁর শিল্পকুশলতা প্রশংসার দাবিদার। নাসির আলীর ভাষা সহজ-সরল ও মার্জিত। **গ্রন্থ:** আমাদের কায়েদে আজম (১৩৫৫), মণিকণিকা (১৯৪৯), শাহী দিনের কাহিনী (১৯৪৯), ছোটদের ওমর ফারুক (১৯৫১), আকাশ যারা করলো জয় (১৯৫৭), আলী বাবা (১৯৬৩), ইতালীর জনক গ্যারিবল্ডি (১৯৬৩), বীলবলের খোশগল্প (১৯৬৪), সাত পাঁচ গল্প (১৯৬৫), বোকা বকাই (১৯৬৬), যোগাযোগ (১৯৬৮), লেবু মামার সপ্তকাণ্ড (১৯৬৮), ভিনদেশি এক বীরবল (১৯৭০), বারোশো বানরের পাল্লায় (১৯৭৬), আলবার্ট আইনস্টাইন (১৯৭৬), মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা (১৯৭৬), বোবারা সব কালো (দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮২) ইত্যাদি। শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৭) ও ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৮) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৭৫।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (১৮৮৮-১৯৯৪)॥ জন্ম. পাইকারদী গ্রাম, চাঁদপুর, ১৭ ডিসেম্বর ১৮৮৮। সাময়িকপত্র সম্পাদক। এক সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে জন্ম। প্রাইমারি স্কুলে পাঠ শেষ করে স্থানীয় চালিতাতলী অ্যাডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশনে



ভর্তি। সেখানে কয়েক ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। পিতৃবিয়োগ ও দারিদ্র্যজনিত কারণে হাই স্কুলের পাঠ ত্যাগ। সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য স্টিমার কোম্পানির স্থানীয় নরসিংহপুর ঘাটের স্টেশন মাস্টারের সহকারী পদে চাকরি গ্রহণ। ১৯১০-এ ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স কোম্পানির চাঁদপুর শাখার এজেন্ট নিযুক্ত। বীমা ব্যবসায় প্রচুর অর্থোপার্জন। সেকালের মুসলমান সমাজের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি দেখে তীব্র বেদনা অনুভব। সাময়িকপত্র প্রকাশ করে তার মাধ্যমে প্রচার কার্য দ্বারা এর প্রতিকার বিধানে ব্রতী। কলকাতা থেকে সচিত্র মাসিক সাহিত্যপত্র 'সওগাত' (১৯১৮) প্রকাশ ও সম্পাদনা তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি। এতে নবীন-প্রবীণ মুসলমান সাহিত্যিকমণ্ডলীর মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা-সমৃদ্ধ রচনা প্রকাশ করে পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজকে প্রগতির পথে নিয়ে যান। সেকালের বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের বই ও পত্র-পত্রিকায় ছবি ছাপার রেওয়াজ ছিল না। গোঁড়া মুসলমান সমাজের অন্ধ সংস্কার উপেক্ষা করে তৎকর্তৃক সওগাতে কবি-সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও বিদুষী মহিলাদের ছবি ও সমাজ-মানুষের নানা অসঙ্গতির কার্টুন প্রকাশ। কলকাতায় 'সওগাত প্রেস' নামে কালার প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা (১৯২৬)। একই সময়ে কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের মিলনকেন্দ্র ও আলোচনার কেন্দ্রস্থল হিসেবে 'সওগাত সাহিত্য মজলিস' গঠন (১৯২৬)। কবি কাজী নজরুল ইসলামের অন্যতম সুহৃদ ও পৃষ্ঠপোষক। নজরুল ছিলেন 'সওগাত সাহিত্য মজলিসের' মধ্যমণি। সচিত্র সাপ্তাহিক মহিলা সাহিত্যপত্র 'বেগম' (১৯৪৭) প্রতিষ্ঠা তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর ১৯৫৪-তে 'সওগাত' ও 'বেগম' কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর। ঢাকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত। বাংলা একাডেমীর ফেলো, জাতীয় যাদুঘর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও নজরুল ইনস্টিটিউট ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। বাংলা একাডেমীর সম্মাননা

পুরস্কার (১৯৭৫), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পুরস্কার লাভ। কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের পুরস্কৃত করার জন্য নিজের নামে 'নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক' প্রবর্তন (১৯৭৬)। প্রকাশিত গ্রন্থঃ শিরি-ফরহাদ (উপন্যাস), আল্লার নবী মোহাম্মদ (দঃ), বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের জাগরণের অন্যতম অগ্রনায়ক। মৃত্যু. ঢাকা, ২১ মে ১৯৯৪।

মোহাম্মদ নাসির (১৯০৩-১৯৭৯)॥ জন্ম. চট্টগ্রাম শহর, ১৫ নভেম্বর ১৯০২। পল্লীগীতি গায়ক। পিতা আবদুল হামিদ, মাতা মাহতাব জাহান। শৈশবকাল থেকে গানের প্রতি প্রবল ঝোঁক জন্মে। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সংগীত-ব্যক্তিত্ব আর্য সংগীত বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রলাল দাসের নিকট সংগীতে হাতেখড়ি। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খাঁর কাছে সংগীতে তালিম গ্রহণ। ১৯৩২-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানির প্রতিনিধির অনুরোধে কলকাতায় গমন এবং প্রখ্যাত শিল্পী জগন্ময় মিত্রের তত্ত্বাবধানে গান রেকর্ড করেন। শচীনদেব বর্মণ, মৃণালকান্তি প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ। ১৯৩২ থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত পল্লীগীতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। রেল বিভাগে চাকরি গ্রহণ। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর চট্টগ্রাম আগমন। চাকরি ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে সংগীত-সাধনায় নিমগ্ন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিত পল্লীগান, আঞ্চলিক গান ও ভক্তিমূলক গান পরিবেশন। ১৯৭৫-এ বাংলাদেশ সরকার-কর্তৃক সংগীতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এককালীন পাঁচ হাজার টাকা উপহার প্রদান। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ২৮ এপ্রিল ১৯৭৯।

মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, ডা. (১৯৩২-১৯৭১)॥



জন্ম. ছাতিয়ানি, গ্রাম, পাবনা, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। চিকিৎসক। পিতা আফসারউদ্দীন আহমদ। পাবনা জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৪৮) ও ঢাকা কলেজ থেকে আই.এসসি. (১৯৫০) পাস। উভয় পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ (১৯৫৫)। ১৯৫৬-র ১৫ ডিসেম্বর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে অ্যাসিসেটেন্ট সার্জন পদে যোগদান। ১৯৫৭-র ৮ জানুয়ারি ডা. জাহানারার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৫৯-এ মেডিসিনের রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত। চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংল্যান্ডের এডিনবরায় গমন (মার্চ-১৯৬০)। একই বছর কার্ডিওলজিতে এম.আর.সি.পি. ডিগ্রি লাভ (সেপ্টেম্বর-১৯৬০)। অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ইংল্যান্ডের বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মসম্পাদন। ১৯৬২-তে লন্ডন থেকে জেনারেল মেডিসিনে এম.আর.সি.পি. ডিগ্রি লাভ। লন্ডনের হ্যামারস্মিত হাসপাতালে সিনিয়র রেজিস্ট্রার পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৬৩-র ১ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সহকারী অধ্যাপক অব মেডিসিন ও অধ্যাপক অব কার্ডিওলজি'র দায়িত্ব লাভ। প্রতিভাবান চিকিৎসক। দেশে গণমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ। ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচুর আর্থিক সাহায্য প্রদান। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল ও ল্যান্সেট-এ বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার জন্য খ্যাত। শ্রেণিহীন ও শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। মৃত্যু. মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৫ ডিসেম্বর (১৯৭১) আলবদর বাহিনীর সহযোগিতায় কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য তাঁকে ৭৫, সিদ্ধেশ্বরীর (ঢাকা) বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে গুলি করে হত্যা করে।

মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী (১৯২৫-১৯৯৪)॥ জন্ম, মোগলটুলী, কুমিল্লা, ১ জুন ১৯২৫। সাংবাদিক ও সাপ্তাহিকী সম্পাদক। পৈতৃক নিবাস শহবাজপুর, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মাতা সৈয়দা ফগরুন্নেসা, পিতা এএফএম



মোহাম্মদ আসাদ ছিলেন হাইস্কুলের ধর্মশিক্ষক; তিনি আরবি-ফারসি ভাষার অভিধান রচনা করেছিলেন। ফজলে রাব্বী ১৯৪৫-এ ব্রিটিশ ভারতে পূর্বতন ত্রিপুরা জেলার মুসলিমলীগ ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর জেলা কমান্ডার ছিলেন। ১৯৪৮-এ জেলরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেন। বাহিনীর অফিসার্স ট্রেনিং স্কুলে কমিশন লাভের পর ১৯৫২-র জুন পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি করেন। ১৯৫৫-এর ৫ মে সাপ্তাহিক 'আমোদ' বের করেন। প্রথম তিন বছর এটি ছিল ক্রীড়া সাপ্তাহিক। পরে সাধারণ সাপ্তাহিকে পরিণত। তিনি নিজে পত্রিকা বিলি করতেন, গ্রাহক চাঁদা আদায় করতেন এবং পাঠকের সঙ্গে পত্রিকার খবর সম্পর্কে মতাবিনিময় করতেন। আবার স্ত্রী, পুত্র কন্যাদেরও পত্রিকার যেমন প্রুফ দেখা, ছবি তোলা, ছাপানোর পর পত্রিকা ভাঁজ করা, ডাকযোগে পাঠানোর জন্য ডাকটিকিট লাগানো প্রভৃতি কাজে সম্পৃক্ত করেছেন। স্থানীয় পত্রিকায় শুধু স্থানীয় খবরই প্রকাশিত হবে–এই নীতির কারণে অঞ্চলিক সাংবাদিকতার অনুসরণীয় ধারা সৃষ্টিতে সক্ষম হন। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইউরোপে ৩৮ দিন (১৯৭৪), লাব্বায়েক (১৯৭৯), মহাচীন ও ক্যান্টন মসজিদের স্মৃতি (১৯৮১), কাগজের নৌকা (১৯৯২)। আঞ্চলিক সাংবাদিকতার একটি অনুকরণীয় ধারা সৃষ্টির য় ইউনেস্কো কর্তৃক এশিয়ার পাঁচটি আঞ্চলিক সংবাদপত্রের একটি হিসেবে 'আমোদ' স্বীকৃতি লাভ করে। কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন কুমিল্লা ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক (১৯৭৭)। উষসী পরিষদ পদক (১৯৮৪) প্রভৃতি। মৃত্যু. কুমিল্লা, ২৮ নভেম্বর ১৯৯৪।

মোহাম্মদ ফজলুল হক (১৯৩৩-১৯৯৩)॥ জন্ম. চরভবসুর গ্রাম, দেওয়ানগঞ্জ-জামালপুর, ১৯৩৩। সংগীতশিল্পী। পিতা আইনজীবী ফসিহউদ্দীন সরকার, মাতা আবিদা খাতুন। বাল্যকাল থেকেই গানের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। পিতা ছিলেন তাঁর সংগীত-চর্চার বিরোধী। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত শিক্ষায় পুত্রকে শিক্ষিত করে তুলতে পারিবারিক বাধা উপেক্ষা করে ষোলো বছর বয়সে গান শেখার অভিপ্রায়ে পাটনায় গমন। সেখানে ওস্তাদ নুর মোহাম্মদ খানের কাছে গানের তালিমগ্রহণ। কলকাতায় গিয়ে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ, বিনয় দাস, বিজন ভট্টাচার্য ও ওস্তাদ নিছার হোসেন খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ। সংগীতজগতের প্রবাদপুরুষ মোহাম্মদ রফির সঙ্গে দিল্লিতে এক সংগীতানুষ্ঠানে মীর্জা গালিবের একটি গজল গেয়ে সংগীতরসিকদের কাছ থেকে প্রশংসা অর্জন। মোহাম্মদ ফজলুল হকের কণ্ঠের প্রশংসা করে মোহাম্মদ রফি বলেন, 'হামরা মাফিক একদম দোসরা আওয়াজ হায়'। ১৯৫৯-এ ঢাকায় আগমন। ঢাকা বেতারকেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী হিসেবে যোগদান। ঢাকার শাহীন স্কুল, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, নিক্কণ ললিতকলা একাডেমি (শান্তিনগর, ঢাকা) ও মীরপুর সাংস্কৃতিক একাডেমির উচ্চাঙ্গসংগীতের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন। উচ্চাঙ্গসংগীত, নজরুল-গীতি, আধুনিক গান ও গজল গানের সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। 'আমি যদি আরব হতাম মদিনারই পথ', 'গা গারে গা নাম মোহাম্মদ' প্রভৃতি নজরুল-গীতি, 'আকাশের চাঁদ তুমি আকাশেই থাকো' প্রভৃতি আধুনিক গান, 'মাওলা মায়তো জোগান বানে তেরি ইয়াদ মে', 'চান্দা তুয়ো সেনা বোলেঙ্গে ম্যাঁ' প্রভৃতি গজল সুললিত কণ্ঠে পরিবেশন। গানের শিক্ষক হিসেবেও সুনাম অর্জন। নীনা হামিদ, শাহনাজ রহমতউল্লাহ, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, আনজুমান আরা বেগম, জিনাত রেহানা, ফেরদৌস ওয়াহিদ প্রমুখ খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পীর সংগীত-গুরু। প্রতিভাবান গায়ক। তাঁর সুরের ব্যঞ্জনায় বাংলাগানের প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ। সংগীতে অবদান রাখায় একুশে পদক লাভ (১৯৯৩)। মৃত্যু. ঢাকা, ১৯৯৩।



মোহাম্মদ ফরহাদ (১৯৩৮-১৯৮৭)॥ জন্ম. পিতার কর্মক্ষেত্র পাবনায়। রাজনীতিবিদ। পৈতৃক নিবাস প্রামাণিকপাড়া, পঞ্চগড়। পিতা আহমেদ সাদাকাতুল বারী ছিলেন সরকারি স্কুলের শিক্ষক। দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক



(১৯৫৩), দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৫৭) ও একই কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৫৯) পাস। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (১৯৫৭-১৯৫৮)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯৬১)। কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন (১৯৬২)। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনে দিনাজপুর সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৫৩-তে ছাত্র ইউনিয়নের দিনাজপুর জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৪-তে প্রথম গ্রেফতার। আট মাস কারাভোগের পর মুক্তিলাভ। ১৯৫৫-তে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ। ১৯৫৭-তে ছাত্র ইউনিয়নের দিনাজপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৫৮-তে ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত। দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন (১৯৬০-১৯৬২)। ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী ও একই বছরের সেপ্টেম্বরে হামিদুর রহমান শিক্ষাকমিশন রিপোর্ট বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। সামরিক সরকার কর্তৃক তাঁর ওপর হুলিয়া জারি। গ্রেফতার এড়াবার জন্যে আত্মগোপন। ১৯৬২-১৯৭১ পর্যন্ত আত্মগোপন অবস্থায় ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টি বিকাশের অনুকূলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা। ১৯৬৭-তে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিযুক্ত। পরের বছর ১৯৬৮-র অক্টোবরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (গোপনে অনুষ্ঠিত) পার্টির অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ। কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কোপন্থি) ও ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সমন্বয়ে গঠিত গেরিলা বাহিনীর (মুক্তি বাহিনীর একটি শাখা) প্রধান সংগঠক ও অধিনায়ক (মে-ডিসেম্বর ১৯৭১)। স্বাধীনতা উত্তরকালে কমিউনিস্ট পার্টির মুজিব সরকারকে সহযোগিতা দানের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন। ১৯৭২-এর ৬ অক্টোবর ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী রীনা খানের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) দ্বিতীয় কংগ্রেসে (প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত) প্রথমবার, ১৯৮০-র ফেব্রুয়ারিতে তৃতীয় কংগ্রেসে দ্বিতীয়বার ও ১৯৮৭-র এপ্রিলে চতুর্থ কংগ্রেসে তৃতীয়বার পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৭৫-এর ৭ জুন কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) তার নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে বাকশালের (কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ) সঙ্গে একীভূত হলে এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষক নিযুক্ত। একই বছর ১৫ আগস্ট (১৯৭৫) রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে পুলিশের জুলুম এড়াবার জন্যে আত্মগোপন। ১৯৭৬-এর ১২ অক্টোবর রাজনীতি দলবিধির (১৯৭৬) আওতায় কমিউনিস্ট পার্টি পুনরুজ্জীবন এবং জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকারকে সহযোগিতা প্রদান। ১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বগুড়া ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সেনাবিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে জিয়া সরকার কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে (১৪ অক্টোবর ১৯৭৭) গ্রেফতার। হাইকোর্টে রিট করে ১৯৭৮-এর জুলাইতে মুক্তিলাভ। একই বছর ১৮ নভেম্বর রাজনীতি দলবিধি প্রত্যাহার করা হলে কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং মোহাম্মদ ফরহাদ কর্তৃক পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ। ১৯৭৯-র ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচনে বোদা-দেবীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক সখ্য স্থাপন ও সরকারবিরোধী ভূমিকা পালন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক সমাবেশে আফগান স্টাইলে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করার কথা ঘোষণা করলে ১৯৮০-র এপ্রিলে পুনরায় গ্রেফতার। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের। হাইকোর্টেরিট করে জামিনে মুক্তিলাভ (আগস্ট ১৯৮১)। সামরিক শাসক লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগ, নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক ঐক্য তথা ১৫ দলীয় জোট (৩০ জানুয়ারি ১৯৮৩) গঠনে, জাতীয় দাবি ৫ দফা প্রণয়নে ও ৭ দলীয় জোটের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন। ১৯৮৬-র ৭ মে ১৫ দলীয় (আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) জোটের প্রার্থী হিসেবে পঞ্চগড়-২ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কৃষক-শ্রমিকের অর্থনৈতিক মুক্তি ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সারাজীবন আন্দোলন

পরিচালনা। চীন ও রাশিয়ার আদর্শগত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ষাটের দশকে বিশ্ব-কমিউনিস্ট রাজনীতিতে ভাঙ্গন দেখা দিলে রাশিয়ার নীতির একনিষ্ঠ অনুসারী। হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য মস্কো গমন (১০ আগস্ট ১৯৮৭)। সেখানে পরলোক গমন। মৃত্যু. মস্কো, ৯ অক্টোবর ১৯৮৭।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)॥ জন্ম. ঘোড়শাল গ্রাম, শাহজাদপুর-সিরাজগঞ্জ, ২ মার্চ, ১৮৯৮। গদ্যশিল্পী। কবিরাজি চিকিৎসক হাজী আজম আলী তাঁর পিতা। স্ত্রী জোবেদা খাতুন। শাহজাদপুর হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস (১৯১৪)। রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. (১৯১৬) ও দর্শনে অনার্সসহ দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ. (১৯১৮) পাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯২০)। ১৯২২-এ ল' পাস। ১৯২৩-এ বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আয়কর অফিসার পদে যোগদান। ১৯২৪-এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯৩০-এ ম্যাজিস্ট্রেট ও ১৯৩৬-এ সাবডিভিশনাল অফিসার পদে উন্নীত। ১৯৪৪-৫ কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ সমবায় ও ঋণ সালিশি বিভাগে সহকারী সেক্রেটারি পদে যোগদান। একই পদমর্যাদায় ১৯৪৫-এ সিভিল সাপ্লাই বিভাগে বদলি। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে দায়িত্ব লাভ। কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক (১৯৪৮-১৯৪৯), ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (১৯৫০-১৯৫১) পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৫১-তে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি পদে যোগদান। ১৯৫৫-তে এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ। একই বছর ৩ ডিসেম্বর (১৯৫৫) বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলে এর বিশেষ কর্মকর্তা (পরিচালক) পদে নিয়ুক্তি লাভ। ১৯৫৭-তে এ দয়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এ মত প্রকাশ করে ১৯৬৭-র ২২ জুন জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। একজন সৃজনশীল গদ্যশিল্পী। বাংলা ভাষায় দার্শনিক ও চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। 'পারস্য প্রতিভা' (১ম খণ্ড ১৯২৪ ও ২য় খণ্ড ১৯৩২) ও 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৪) তাঁর বিখ্যাত গদ্যগন্থ। 'পারস্য প্রতিভায়' পারস্যের খ্যাতনামা কবিদের জীবনী ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম, ফারসি সাহিত্যের প্রেক্ষাপট, সুফিমত ও বেদান্ত দর্শন এবং 'মানুষের ধর্মে' জগৎ ও জীবন, ইহলোক ও পরলোক, জড়প্রকৃতি ও মনোজগৎ, জীবনপ্রবাহ ও আত্মা প্রভৃতি দুরূহ তত্ত্ব ক্লাসিক্যাল বাংলা গদ্যে উপস্থাপিত। অন্যান্য গ্রন্থ: কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত (১৯৫৭), নবীগ্রহ সংবাদ (১৯৬০), নয়া জাতির স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ (১৯৬৩), হযরত ওসমান (১৯৬৯), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারা (১৯৬৯)। প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬০) ও 'নয়াজাতির স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ' গ্রন্থের জন্য 'দাউদ পুরস্কার' (১৯৬৩) লাভ। পাকিস্তান সরকারের 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' উপাধিতে ভূষিত (১৯৬২)। মৃত্যু. ঢাকা, ২ নভেম্বর, ১৯৭৪।



মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ (১৯২৭-১৯৮৭)॥ জন্ম শালেবাদ গ্রাম, নওগাঁ, ২ সেপ্টেম্বর ১৯২৭। রাজনীতিবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. এবং ১৯৫৩-তে এল.এল.বি. পাস। ১৯৪৮-এর মার্চের ও ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। ১৯৫৩-তে নওগাঁ আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। একই বছর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি পদে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর রাজশাহী-৩ আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। ১৯৭২-এর ১২ অক্টোবর গণ-পরিষদের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২)



রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ৭ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত; প্রায় তিন বছর এ পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৭৫-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাকশাল (কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ) গঠিত হলে এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিযুক্ত (৭ জুন ১৯৭৫)। ১৯৭৯-র ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচনে রাজশাহী-৯ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। ১৯৮৬-র ৭ মে নওগাঁ-৩ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। ভাষা-আন্দোলন, ষাটের দশকে পূর্ববাংলার স্বাধিকার আন্দোলন ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। মৃত্যু. নওগাঁ, ৯ মে, ১৯৮৭।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬)॥ জন্ম. খড়কি, যশোর ১৫ আগস্ট ১৯৩৬। কবি, গীতিকার, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ। পিতা মোহাম্মদ শাহাদৎ আলী, মাতা রাহেলা খাতুন। ১৯৫৩-এ যশোর জিলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস। ১৯৫৫-এ



রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে ১৯৫৫-এ আই.এসসি. পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় ১৯৫৮-এ প্রথম শ্রেণীতে সম্মান এবং ১৯৫৯-এ বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাস। ১৯৬০-এ রাশিদা জামানের সঙ্গে বিয়ে। ১৯৬৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ১৯৬৯-৭০-এ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন। ১৯৫৯-এ এম.এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরের পরের দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান। ১৯৭৫-এ প্রফেসর পদে উন্নীত। ১৯৭৮-৮১-এ এবং পরে আরো দুইবার বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ৪৪টি পিএইচ.ডি. গবেষণা সম্পন্ন। অতিথি অধ্যাপক হিসেবে হার্ভার্ড, বোস্টন, আইওয়া, শিকাগো ও বার্কেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রফেশনাল এসোসিয়েট হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন। ১৯৫২-এ ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধেও পক্ষে কাজ করেন। বাংলা সংগীত রচনার ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান। ১৯৫৫ থেকে বেতারের নিয়মিত গীতিকার। ১৯৬৪-এ 'ডাকবাবু'র জন্যে চলচ্চিত্রে প্রথম গান রচনা; 'আমার দেশের মাটির গন্ধে, ভরে আছে সারা মন', 'ভাষার জন্যে যারা দিয়ে গেছে প্রাণ', 'স্বাধীনতা এক গোলাপ ফোঁটানো দিন', 'লক্ষ প্রাণের মূল্যে গড়েছি সোনার বাংলাদেশ', 'এই বাংলায় সবুজে শ্যামলে দেখি পৃথিবীর মুখ', 'কত যে ধীরে বহে মেঘনা, শান্ত তবু সুপ্ত সে নয়', 'সাগর ভেঙ্গে বন্যার জল আয়', 'তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়', 'হলুদ বাটো মেন্দি বাটো বাটো ফুলের মৌ', 'দাও গয়ে হলুদ পায়ে আলতা হাতে মেহেদী', 'একটুশ খানি দ্যাখ একখান কথা রাখো', 'ফুলের কানে ভোমর এসে চুপি চুপি বলে যায়', 'প্রেমের নাম বেদনা, সেকথা বুঝিনি আগে', 'অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান যেন ভুলে যেও না' প্রভৃতি গান জনপ্রিয় হয়েছে। 'ডাকবাবু', 'ঢাওয়া-পাওয়া', 'অলীবাবা', 'নতুন নামে ডাকো', 'এতটুকু আশা', 'পরশমনি', 'ধীরে বহে মেঘনা' ছায়াছবিতে লেখা গানগুলি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। গানের সংকলন 'অনির্বাণ' (১৯৬৭) ও 'নির্বাচিত গান' (১৯৮৪) প্রকাশিত। কবিতাগ্রন্থ: 'দুর্লভ দিন' (১৯৬১), 'শঙ্কিত আলোক' (১৯৬৮), 'বিপন্ন বিষাদ' (১৯৬৮), প্রতনু প্রত্যাশা (১৯৭৩), 'ভালবাসার হাতে' (১৯৭৬), 'ইচ্ছেমতী' (১৯৭৬), 'ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার' (১৯৮৪), 'তৃতীয় তরঙ্গে' (১৯৮৪), 'সঙ্গী বিহঙ্গী' (১৯৮৪), 'কোলাহলের পর' (১৯৯০), 'ধীর প্রবাহে' (১৯৯২); প্রবন্ধ-গবেষণা: 'আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র' (১৯৬২), 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৫), 'মুহম্মদ শহীদুল্লাহ' (১৯৬৯), 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক' (১৯৭০), 'বাংলা কবিতার ছন্দ' (১৯৭০), 'বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা' (১৯৭৮), 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ইতিহাস' (১৯৮১), 'রবীন্দ্র চেতনা' (১৯৮৪), 'আধুনিক বাংলা কবিতা প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত' (১৯৮৫), 'ভাষা আন্দোলনঃ শিক্ষায় ভাষা পরিকল্পনা' (১৯৯২) প্রভৃতি; সংগ্রহ-সম্পাদনা: 'যশোরের লোককাহিনী', 'প্যারীচাঁদ-রচানাবলী, 'মধুসূদন কাব্য গ্রন্থাবলী, 'মধুসূদন নাট্য গ্রন্থাবলী', 'নজরুল সমীক্ষণ',

'ঢাকার লোককাহিনী', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটক (মুহম্মদ আব্দুল হাই সহযোগে), 'মুহম্মদ এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ', 'সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ' (যৌথ)। পুরস্কার ও স্বীকৃতিঃ শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসাবে জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৭২ ও ১৯৭৩), কবিতার জন্যে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭২), মস্কো টেলিভিশনে রাদুগা পুরস্কার (১৯৮০), এশিয়ান ব্রডকাস্টিং কম্পিটিশিন পুরস্কার (১৯৮২), যশোর সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (কবিতা, ১৯৮৪), লেখিকা সংঘ স্বর্ণপদক (কবিতা ১৯৮৪), কালুশাহ সাহিত্য পুরস্কার (গবেষণা ১৯৮৪), হাসান হাফিজুর রহমান স্বর্ণপদক (প্রবন্ধ ১৯৮৪), একুশে পদক (১৯৮৭), মাইকেল মধুসূদন সাহিত্য পুরস্কার (গবেষণা ১৯৮৮), শিল্পী কামরুল হাসান পদক (সাহিত্য, ১৯৮৯), সাংবাদিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ স্বর্ণপদক (সাহিত্য, ১৯৯১), জসিমউদ্‌দীন পুরস্কার (১৯৯২)। মৃত্যু. ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

মোহাম্মদ মহসীন, হাজী (১৭৩২-১৮১২)॥ জন্ম. হুগলী, ১৭৩২। দানবীর। পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ইস্পাহান (পারস্য)। হুগলীর বণিক হাজী ফৈজুল্লাহ তাঁর পিতা, মাতা জৈনাব খানম। জৈনাব খানমের প্রথম বিয়ে হয়েছিল হুগলীর এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এবং নদীয়া ও যশোরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জায়গিরদার আগা মোতাহারের সঙ্গে। মন্নুজান খানম তাঁদের ঔরসজাত সন্তান। মন্নুজানের বয়স যখন আট বছর তখন আগা মোতাহারের পরলোকগমন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি মন্নুজানকে দান করে যান। জৈনাব খানম এবার হাজী ফৈজুল্লার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এ বিয়ের ফলেই মহাত্মা মহসীনের জন্ম। মন্নুজান তাঁর মাতার সঙ্গে বৈপিতৃ হাজী ফৈজুল্লার গৃহে বাস করতে থাকেন। মহসীনের বাল্যশিক্ষা হুগলীতে। গৃহে আগা সিরাজী নামক একজন পণ্ডিতের কাছে আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভ ভোলানাথ ওস্তাদ নামক একজন সংগীতবিদের কাছে সেতারবাদন ও সংগীত



শেখেন। মুর্শিদাবাদে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ। সেখানে বিদ্যাভ্যাসকালে তাঁর পিতামাতার মৃত্যু ঘটে মুর্শিদাবাদের মক্তবের পাঠ সমাপ্তির পর হুগলীতে প্রত্যাবর্তন। মন্নুজানের সঙ্গে হুগলীর ফৌজদার মীর্জা সালাউদ্দীনের পরিণয় ক্রিয়া সুসম্পন্ন হওয়ার পর মহসীন দেশভ্রমণে বহির্গত হন (১৭৬২)। মক্কা ও মদীনায় গমন করে হজব্রত পালন। সাতাশ বছরকাল আরব, মিশর ও পারস্য ভ্রমণ করে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন (১৭৯৪)। কখনো মুর্শিদাবাদে, কখনো হুগলীতে, কখনো ঢাকায় বাস। মীর্জা সালাউদ্দীনের মৃত্যুর (১৭৯৪) পর বৈপিত্রেয় ভগ্নী মন্নুজানের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ। ১৮০৩-এ মন্নুজানের ইহলোক ত্যাগ। মৃত্যুকালে নিঃসন্তান মন্নুজান তাঁর সমুদয় সম্পত্তি মহসীনকে দান করে যান। এ বিশাল সম্পত্তির আয় চিরকুমার মহসীন তাঁর নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় না করে দীন-দুঃখীর দুঃখমোচনের জন্য ব্যয় করতে থাকেন। দরিদ্রকে অকাতরে অন্ন, বস্ত্র ও চিকিৎসা দান। হুগলীতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে বহু অর্থদান। মৃত্যুর ছয় বছর পূর্বে ১৮০৬-এর ২৬ এপ্রিল একটি ফান্ড গঠন করে ধর্ম ও জনহিতকরকার্যে সমস্ত সম্পত্তি দান। মহসীন ফান্ডের অর্থে 'হুগলী মহসীন কলেজ' (১৮৩৬) ও 'হুগলী দাতব্য চিকিৎসালয়' (১৮৩৬) এবং হুগলীর নতুন 'ইমামবাড়া' (১৮৪৮) স্থাপিত। এ ছাড়া হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরবি পাঠশালা (মাদ্রাসা) ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস স্থাপিত। মহসীন ফান্ডের বৃত্তির অর্থে হাজার হাজার মুসলমান ছাত্রের উচ্চশিক্ষা লাভ। এঁদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ আমীর আলী স্বয়ং। দানশীল, দয়াবান এবং ধর্ম ও বিদ্যানুরাগী মহাপুরুষ। আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় এবং ইতিহাস ও বীজগণিতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। লোহা ও সেলাই কাজে দক্ষতার পরিচয় প্রদান। অশ্বারোহণ ও অস্ত্রচালনায় ছিলেন পারদর্শী। অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন এবং নিজের হাতে রান্না করে খেতেন ও অপরকে খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন। ফকির প্রভৃতি সাধু সজ্জনের সঙ্গে মিশতে ভালবাসতেন। ধনী লোকের সঙ্গ পছন্দ করতেন না। নবাব-নাজেম প্রমুখ রাজপুরুষ সদাসর্বদা তাঁর নিকট আগমন করলেও তিনি কখনো তাঁদের দরবারে যেতেন না। শিয়া-সুন্নি, হিন্দু-মুসলমান

সকলকে সম্মান চোখে দেখতেন। গুম্ফ ও শ্মশ্রুমুণ্ডন করতেন। মৃত্যু. হুগলী, ২৯ নভেম্বর ১৮১২ (১৬ অগ্রহায়ণ ১২১৯)।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)॥



জন্ম. বাউইগাছি গ্রাম, শান্তিপুর-নদীয়া, ১৮৬০। কবি ও গদ্যশিল্পী। শৈশবে পিতৃহীন হন। শান্তিপুরের ডাকঘর নামক গ্রামে মাতামহ মোহাম্মদ বাদউল্লাহর কাছে প্রতিপালিত। মাইনর স্কুল থেকে ভার্নাকুলার পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে বৃত্তি লাভ। তামাচিকা বাড়ি ইংরেজি স্কুলে ভর্তি (১৮৭৮)। এ স্কুলে কয়েক মাস পড়াশুনার পর শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি। এ বিদ্যালয়ে এন্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সময়' পত্রিকায় কিছুকাল কর্ম সম্পাদন। শান্তিপুর রামনগর ভার্নাকুলার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক পদে যোগদান। এ স্কুলে এক বছর শিক্ষকতা। শান্তিপুর জুনিয়র জুবলি মাদ্রাসা (১৮৮৭) প্রতিষ্ঠিত হলে এর শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভ। এ মাদ্রাসায় কয়েক বছর শিক্ষকতা করার পর তামাচিকা বঙ্গ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান। তাঁর গদ্যপাঠে মুগ্ধ হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁকে মেট্রিকুলেশনের বাংলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত (১৯১৯)। শান্তিপুরের 'ইসলাম করদাতৃ সভার' (১৮৮৩) প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাল শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, কিছুকাল এর ভাইস-চেয়ারম্যান, ত্রিশ বছর নদীয়া জেলা বোর্ডের শিক্ষা-কমিটির সদস্য, কিছুকাল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির (১৯১১) সহসভাপতি ও বিশ বছর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন। 'লহরী' (১৮৯৯) ও 'মোসলেম ভারত' (১৯২০) নামক মাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা। বিশিষ্ট কবি ও সৃজনশীল গদ্যশিল্পী; ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর ও দারিদ্র্যপীড়িত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের জাগরণের বাণী তাঁর সাহিত্যকর্মে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশিত তাঁর গদ্য ও পদ্যের ভাষা ওজোগুণসম্পন্ন ও প্রসাদগুণ-মণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ; কাব্য– কুসুমাঞ্জলি (১৮৮১), অপূর্ব দর্শন (১৮৮৫), প্রেমহার (১৮৯৮), হজরত মহাম্মদ (১৯০৩), জাতীয় ফোয়ারা (১৯১২), ইসলাম সংগীত (১৯২৩); গদ্যগ্রন্থ– মহর্ষি-মনসুর (১৮৯৬), ফেরদৌসী-চরিত (১৮৯৮), শাহনামা (পারস্যের কবি ফেরদৌসী-চরিত (১৮৯৮), শাহনামা (পারস্যের কবি ফেরদৌসীর 'শাহনামার' গদ্যানুবাদ, ২৯০৯), তাপস-কাহিনী (২য় সং ১৯০৪) খাজা ময়ীনউদ্দীন চিশতী (১৯১৮), হাতেমতাই (১৯১৯), টিপু সুলতান (১৯৩১)। উপন্যাস– জোহরা (১৯২৯), দরাফখান গাজী (১৯১৯)। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবেও পরিচিত। শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা, সৎশিক্ষা, পত্র-দলিল-লিখন-শিক্ষা, প্রাথমিক রচনা শিক্ষা, সাহিত্যশিক্ষা, সুনীতিশিক্ষা, সরল বাঙ্গালা শিক্ষা, কিন্ডার গার্ডেন ধারাপাত প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক 'কাব্যকণ্ঠ' উপাধি প্রদান। 'শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক' নামে খ্যাত। মৃত্যু. শান্তিপুর, ৩০ নভেম্বর, ১৯৩৩।

মোহাম্মদ মোদাব্বের (১৯০৮-১৯৮৪)॥ জন্ম.



শালিপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, ৬ অক্টোবর, ১৯০৮। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। স্থানীয় স্যার আর.এন. মুখার্জী হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস (১৯২২)। যাদবপুর গৌড়ীয় বিদ্যায়তনে কিছুকাল অধ্যয়ন। পিতৃব্য মুজিবর রহমানের (সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক) কাছে সাংবাদিকতায় তালিম গ্রহণ। 'দি মুসলমান' (১৯০৬) ও 'খাদেম' (১৯২৬) পত্রিকায় সাংবাদিকতা (১৯২৪-১৯৩৩)। ১৯৩০-এ শিশুসাহিত্যিক হোসনে আরার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৩৫-এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর 'ডেইলী ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগদান। একই বছর (১৯৩৫) সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক পদে নিযুক্তি লাভ। দৈনিক 'আজাদ' (৩১ অক্টোবর ১৯৩৬) প্রকাশিত হলে এর বার্তা-সম্পাদক

নিযুক্ত। 'বাগবান' ছদ্মনামে এ পত্রিকার ছোটদের পাতা 'মুকুলের মহফিল' সম্পাদনা। ১৯৪৮-এ 'ইত্তেহাদ' (১৯৪৬) পত্রিকায় যোগদান। অবিভক্ত বঙ্গের একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী। ১৯২৯-এ বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান। ১৯৩২-এ সন্ত্রাসবাদ দমন আইনে ও ১৯৩৪-এ আন্তঃপ্রদেশ ষড়যন্ত্র মামলায় কারানির্যাতন ভোগ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর ১৯৪৯-এর আগস্ট মাসে কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। 'অর্ধ-সাপ্তাহিক পাকিস্তান' (১৫ আগস্ট ১৯৪৯) নামক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা। দৈনিক 'মিল্লাতের' (অক্টোবর ১৯৫২) প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সম্পাদক। ১৯৬৫-তে সাংবাদিকতার পেশা থেকে অবসর গ্রহণ। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এ বক্তব্য উপস্থাপন করে ১৯৬৭-র ২২ জুন পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারবন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাদেশের আদর্শের বিরোধী তৎকর্তৃক এ মত প্রকাশ করে তা পরিবর্তনের দাবি উত্থাপন (১৯৭৬-১৯৭৭)। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। শিশুসাহিত্যের রচয়িতা হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: শিশুসাহিত্য– হীরের ফুল (১৯৩০), তাকডুমাডুম (১৯৩০), মিসেস লতা সান্যাল এবং আরও অনেকে (১৯৩৩), কিসসা শোন (১৯৫০), ডানপিটের দল (১৯৬২), গল্প শোন (১৯৭১), বউ হারালো হুলো বিড়াল (১৯৭৯); ভ্রমণকাহিনী|জাপান ঘুরে এলাম (১৯৫৯), প্রবাল দ্বীপে (১৯৬৪); বিবিধ|সন্ধানী আলো (১৯৪৩), আনলো যারা জীয়ন কাঠি (১৯৪৬), আমার প্রথম লেখা (১৯৫৭), সাংবাদিকের রোজনামচা (১৯৭৭), ইতিহাস কথা কয় (১৯৮১), নজরুল ইসলাম (১৯৮২)। শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৫) ও সাংবাদিকতায় একুশে পদক (১৯৭৯) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ২১ এপ্রিল, ১৯৮৪।

মোহাম্মদ মোর্তজা (১৯৩১-১৯৭১)॥ জন্ম. চণ্ডিপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ১ এপ্রিল ১৯৩১। চিকিৎসক, কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক ও সমাজবিজ্ঞানী। শৈশবকাল কাটে পারিবারিক ধর্মীয় অনুশাসনের ভেতর। প্রাথমিক শিক্ষা এখানেই লাভ। ১৯৪৬-এ কলকাতার সরকারি বালিগঞ্জ স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা



এবং ১৯৪৮-এ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এসসি. পাস। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে কিছুকাল পড়াশোনার পর ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুখে ঢাকা আগমন। ১৯৫৪-তে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাস। ১৯৫৫-র ১৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রে চাকরিতে যোগদান। আমৃত্যু এখানেই চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন। চাকরিতে প্রবেশের পর থেকেই পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মননশীল ও সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য রচনা। ষাটের দশক থেকে প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। গোপনে পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) প্রতিষ্ঠিত হলে সক্রিয় কর্মী হিসেবে আত্মনিয়োগ। সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপরে বহু গ্রন্থ রচনা। সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ: জনসংখ্যা ও সম্পদ, প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক, পাক-ভারত যুদ্ধের তাৎপর্য। উল্লেখযোগ্য অনূদিত গ্রন্থ: চিকিৎসাশাস্ত্রের কাহিনী, প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস (যৌথ অনুবাদ)। চিকিৎসাবিজ্ঞান পরিভাষা সংকলন করেছিলেন যা তাঁর মৃত্যুর পর আহমদ রফিক সম্পাদনা করেন। রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ ও পুস্তিকার উল্লেখযোগ্য অনুবাদ: ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, শান্তি না শক্তি, হুনানের কৃষক আন্দোলন, জনযুদ্ধের বিজয় দীর্ঘজীবী হোক প্রভৃতি। 'চরিত্রহানির অধিকার' তাঁর রচিত একখানি উপন্যাস। বেশ কিছু গল্প ও কবিতা রচনা করেন। সাপ্তাহিক 'গণশক্তি' পত্রিকায় ছদ্মনামে 'দেশে দেশে মুক্তিযুদ্ধ' এই শিরোনামে নিয়মিত নিবন্ধ প্রকাশ। ঐ পত্রিকায় সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে উপসম্পাদকীয় ও অন্যান্য নিবন্ধও লিখতেন। মাসিক 'কপোত' পত্রিকায় কিশোর উপযোগী 'রাজনীতির পরিচয়' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ। এখনো তাঁর বেশ কিছু রচনা অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ 'জনসংখ্যা ও সম্পদ'-এর জন্য ১৯৬৪-তে 'ন্যাশনাল ব্যাংক অব

পাকিস্তান পুরস্কার' লাভ শোষিত-নিপীড়িত জনগণের মুক্তির নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। মুক্তিযুদ্ধের অকুণ্ঠ সমর্থক। মৃত্যু. ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে ১৪ ডিসেম্বর প্রত্যুষে ফুলার রোডস্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার বাসভবন থেকে তাঁকে পাকিস্তানি বাহিনীর এদেশিয় সহযোগী আলবদর বাহিনীর সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়। ১৯৭২-এর ৪ জানুয়ারি মীরপুরে বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হলে সেখানে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, সিপাহি (?-১৯৭১)। জন্ম. পশ্চিম হাজীপুর, দৌলতখান, বরিশাল। জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। বীরশ্রেষ্ঠ। পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর উচ্চ বিদ্যালয়ে দু-এক বছর অধ্যয়ন। শৈশব থেকেই খুব দুঃসাহসী হিসেবে খ্যাত। ১৯৬৭-র ১৬ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ। তিনি ছিলেন চতুর্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক। ১৯৭১-এর প্রথম দিকে চতুর্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঠানো হয়। স্বাধীনতাযুদ্ধ (২৬ মার্চ-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১) শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে ঘিরে তিনটি প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে তোলে; সেগুলো হলো আশুগঞ্জ, উজানীস্বর আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া) এন্ডারসন খালের পাড়ে। আশুগঞ্জের প্রতিরক্ষাঘাঁটিতে ছিল দুই কোম্পানি সৈন্য, বাকি দুটিতে এক কোম্পানি করে। আখাউড়ায় অবস্থিত চতুর্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট দক্ষিণ দিক থেকে নিরাপত্তার জন্য গঙ্গা সাগরের উত্তরে দরুইন গ্রামে দুই নম্বর প্লাটুনকে অবস্থানের নির্দেশ দেয়। এই দুই নম্বর প্লাটুনের সঙ্গে ছিলেন মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল। ১৬ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী চতুর্থ ইস্টবেঙ্গলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুমিল্লা-আখাউড়া রেললাইন ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পরদিন ভোরবেলা পাকিস্তান সেনাবাহিনী দরুইন গ্রামে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের উপর মর্টার ও আর্টিলারির গোলাবর্ষণ শুরু করে। নিজ প্রতিরক্ষা যথেষ্ট শক্তিশালী নয় বুঝতে পেরে মেজর শাফায়েত জামিল 'ডি' কোম্পানির ১১ নম্বর প্লাটুনকে দরুইন গ্রামে আগের প্লাটুনের সঙ্গে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেন। ১৭ এপ্রিল ১১ নম্বর প্লাটুন নিয়ে হাবিলদার মুনির আহমদ দরুইনে পৌঁছেন। সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা তাঁর নিকট থেকে গুলি নিয়ে নিজ পরিখায় অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনদিন অপেক্ষার পর প্রতিরক্ষা এলাকায় খাবার আসে। কিন্তু মোস্তফা খাবার নিতে আসেন নি, তিনি পরিখাতেই অবস্থান করতে থাকেন। সকাল আটটার দিকে শত্রুর কয়েকটা হেলিকপ্টারকে পশ্চিম উজানীস্বর পুলের দিকে উড়ে যেতে দেখা যায়। ১১টার দিকে শুরু হয় শত্রুর গোলাবর্ষণ। একই সঙ্গে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। সাড়ে এগারোটার দিকে মোগরা বাজার ও গঙ্গা সাগরের অবস্থান থেকে অবিরাম বর্ষিত হয় শত্রুর মেশিনগানের গুলি। বারোটার দিকে আসে পশ্চিম দিক থেকে সরাসরি আক্রমণ। প্রতিরক্ষা সৈনিকরা আক্রমণের আকস্মিকতা ও তীব্রতায় বিহ্বল হয়ে পড়েন। কিন্তু নির্ভীক মোস্তফা মরিয়া হয়ে পাল্টা আঘাত হানতে থাকেন। তাঁর পূর্ব দিকের সৈনিকরা তখন পেছনে সরে নতুন অবস্থানে যাচ্ছে। মোস্তফাকে যাবার জন্য অনুরোধ করে সবাই। মোস্তফা জানান, যে অবস্থা তাতে সবাই বাঁচতে চাইলে কেউ বাঁচবে না। তাঁর আশা যেন তাঁরা ছেড়ে দেন। মোস্তফা পূর্ণোদ্যমে এল.এম.জি. থেকে গুলি চালাতে থাকেন। শত্রুপক্ষ মাত্র ৭০ গজের মধ্যে এবং নিজপক্ষের ৯ জন এরই মধ্যে নিহত এবং অনেকে আহত। এমন অবস্থায় মোস্তফা শত্রুদের ঠেকিয়ে রেখে নিজ পক্ষকে অপসারণের সহায়তা করে যান। তাঁর অবিরাম গুলি-বৃষ্টির মুখে শত্রু তাঁর সহযোদ্ধাদের পিছু ধাওয়া করতে সাহস পায় না। সঙ্গীরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যায়। পরিখা থেকে তখনও তাঁর গুলি-বৃষ্টি থামে না। এক সময়ে গুলি শেষ হয়ে যায়, তিনিও লুটিয়ে পড়েন শত্রুর আঘাতে। সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফার অনমনীয় দৃঢ়তা এবং দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক অতুলনীয় গৌরব গাঁথা। স্বাধীন দেশে তিনি বীরশ্রেষ্ঠের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। মৃত্যু. দরুইন গ্রাম. ১৬ এপ্রিল ১৯৭১।



মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (১৮৭৪-১৯৩৩)। জন্ম. নারায়ণপুর গ্রাম, পাংশা,

ফরিদপুর, ১৮৭৪। সাংবাদিক ও লেখক। পিতা এনায়েতুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন একজন পুলিশ অফিসার (দারোগা)। খ্যাতনামা গদ্যশিল্পী এয়াকুব আলী চৌধুরীর বড় ভাই তিনি। পাংশা এম.ই. স্কুলে মাইনর ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। 'কোহিনূর' নামক মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা তাঁর কর্মজীবনের প্রধান কীর্তি। ১৮৯৮-এ (১৩০৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে) এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত। পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক ও কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে রওশন আলী চৌধুরীর প্রায় দশ বছর (১৮৯৮-১৯০১, ১৯০৪-১৯০৬, ১৯১১-১৯১২ ও ১৯১৫) যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন। এ সময়কালের মধ্যে কোহিনূরের ৫৯টি সংখ্যা প্রকাশিত। প্রধানত মননশীল প্রবন্ধ ও সৃজনশীল কবিতা ও গল্প এতে প্রকাশিত হতো। বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এর লেখক ছিল। কলকাতা থেকে ইরানি ভাষায় প্রকাশিত 'হাব্‌লুল মতিন' (১৯১২) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা কর্মে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীকে সহায়তা। 'সোলতান' (নবপর্যায়ে প্রকাশিত, ১৯২৩) নামক সাপ্তাহিকের সহযোগী সম্পাদক। কিছুকাল সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদীর' (১৯০৮) বার্তা-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। সারা জীবন কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে এ দলের প্রতিটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) সক্রিয় ভূমিকা পালন। পাংশায় 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' (১৯০৫) গড়ে তুলে স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনেরও (১৯২০-১৯২২) একজন সুপরিচিত নেতা। লেখক হিসেবেও খ্যাত। নানা পত্রিকায় তাঁর রচনা ছড়িয়ে রয়েছে; পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। বাঙালি মুসলমানের ভাবজগতে সমাজ সচেতন ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা সঞ্চারের প্রবক্তা। দেশাত্মবোধের জাগরণ ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্যই পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা এবং লেখনী পরিচালনা। মৃত্যু. পাংশা, ১৯৩৩।

মোহাম্মদ রওশন ইজদানী (১৯১৭-১৯৬৭)॥ জন্ম. বিদ্যাবল্লভ, ময়মনসিংহ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭। লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক ও গবেষক। পিতার নাম শের আলী কবির। স্থানীয় মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা, আগুজিয়া হাই স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। মাতা-পিতার অকালমৃত্যুর ফলে লেখাপড়ায় ছেদ ঘটে। বাউলদের সঙ্গে মেলামেশা ও গান-বাজনার মধ্যে কালাতিপাত। এক পর্যায়ে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হিসেবে চাকরিতে যোগদান। পরে ঋণ-শালিসি বোর্ডের কেরানি, এবং শেষ জীবনে দৈনিক আজাদ ও ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশনের প্রুফ রিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন। রওশন ইজদানীর বড়ো অবদান গ্রাম থেকে বিভিন্ন ধরনের লোকসাহিত্য সংগ্রহ করা এবং তার উপর নিবন্ধ রচনা করে বিভিন্ন পত্রিকায় তা প্রকাশ করা। ক্রমে লোকসাহিত্য-বিশারদ হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন। লোকসাহিত্য বিষয়ক তাঁর দুটি গ্রন্থের নামঃ 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য' (১৯৫১) এবং 'পূর্ব পাকিস্তানের লোকসাহিত্য' (১৯৬৬)। 'চিনুবিবি' (১৯৫১) ও 'খাতামুন নবীঈন' (১৯৬০) নামে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থও রয়েছে। মৃত্যু. বিদ্যাবল্লভ, ২৩ জুন ১৯৬৭।

মোহাম্মদ রুহুল আমিন, আর্টিফিসার (১৯৩৫-১৯৭১)॥ জন্ম. বাঘচাপড়া গ্রাম, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী, ১৯৩৫। বীরশ্রেষ্ঠ। বাঘচাপড়া প্রাইমারি স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে আমিষাপাড়া হাই স্কুলে অধ্যয়ন। ১৯৫৩-তে জুনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেন করাচির অদূরে আরব সাগরের মধ্যে অবস্থিত মানোরা দ্বীপে পি.এন.এস. বাহাদুর-এ। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর পি.এন.এস. কারসাজে (নৌবাহিনীর কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) যোগদান। ১৯৫৮-তে পেশাগত প্রশিক্ষণ সমাপ্ত। ১৯৬৫-তে মেকানিসিয়ান কোর্সের জন্য নির্বাচিত হন এবং পি.এন.এস. কারসাজে কোর্স সমাপ্ত করার পর আর্টিফিসার পদে নিযুক্ত। ১৯৬৮-তে চট্টগ্রাম পি.এন.এস. বখতিয়ার নৌ-ঘাঁটিতে বদলি। ১৯৭১-এর এপ্রিল মাসে ঘাঁটি থেকে পালিয়ে ভারতের ত্রিপুরা সীমান্ত অতিক্রম করে ২ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে বিভিন্ন স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ। বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠিত হলে কলকাতায় আগমন। ভারত সরকার দুটি



গানবোট বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে উপহার দেয়। গানবোটের নামকরণ করা হয় 'পদ্মা' ও 'পলাশ'। রুহুল আমিন 'পলাশ'-এর প্রধান ইঞ্জিনরুমে আর্টিফিসার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ। ৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী যশোর সেনানিবাস দখলের পর 'পদ্মা', 'পলাশ' এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীর একটি গানবোট 'পানভেল' খুলনার মঙ্গলা বন্দরে পাকিস্তানি নৌ-ঘাঁটি পি. এন. এস. তিতুমীর দখলের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ১০ ডিসেম্বর দুপুর ১২টার দিকে গানবোটগুলো যখন খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছে তখন অনেক উঁচুতে তিনটি জঙ্গি বিমান উড়তে দেখা যায়। শত্রুর বিমান অনুমান করে 'পদ্মা' ও 'পলাশ' থেকে গুলি করার অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু অভিযানের সর্বাধিনায়ক মিত্রবাহিনীর ক্যাপ্টেন মনীন্দ্রনাথ সামন্ত জানান বিমানগুলো ভারতীয়। এ কথা শুনে সবাই শঙ্কামুক্ত হন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বিমানগুলি নিচু দিয়ে উড়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে যায় এবং ঘুরে এসেই আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু করে। গোলা সরাসরি গানবোট 'পদ্মা'র ইঞ্জিনরুমে পড়ায় ইঞ্জিন বিধ্বস্ত হয় এবং অনেক নাবিক হতাহত হয়। 'পদ্মা' অচল হলেও 'পলাশ' ও 'পানভেল' তখনো সচল। পলাশের অধিনায়ক লে. কমান্ডার রায় চৌধুরী আদেশ দিলেন, 'জাহাজ ত্যাগ কর'। জাহাজ থামানোর আদেশ পাওয়া মাত্র রুহুল আমিন উপরে উঠে এসে চিৎকার করে জানতে চান, জাহাজ থামাতে বলা হয়েছে কেন? পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হবে দেখে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং উপস্থিত সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানালেন যে, কেউ যেন যুদ্ধ বন্ধ না করে, হয় জয় নয় ক্ষয়। কামানের ক্রুদের বললেন বিমানের দিকে গুলি ছুঁড়তে। নিজে ইঞ্জিনরুমে ফিরে গেলেন। কিন্তু অধিনায়কের আদেশ অমান্য করে বিমানগুলোকে আর চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। বিমানগুলো বোমাবর্ষণ করে পলাশের ইঞ্জিনরুম নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় মোহাম্মদ রুহুল আমিনের দেহ। তাঁর কর্তব্যজ্ঞান ও দেশপ্রেমের কাছে জীবনের মায়া তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। কৃতজ্ঞ জাতি তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেছে। মৃত্যু. খুলনা, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মোহাম্মদ সাইদুর (১৯৪০-২০০৭)। জন্ম. ২৮ জানুয়ারি ১৯৪০, বিন্নগাঁও, কিশোরগঞ্জ। বাবা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন আহমেদ সরকারি প্রচার বিভাগে গীতিকার ও পুঁথিপাঠক। মা আনোয়ারা খাতুন (ফুল বানু)। পিতামহ আসমত আলী ব্যাপারীও গায়েন ছিলেন। বিন্নগাঁও প্রাইমারি স্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। এরপর তমালতলা প্রাইমারি বিদ্যাপীঠ, কিশোরগঞ্জ মাইনর স্কুল (বর্তমান পিটিআই) এবং আজিমউদ্দিন হাইস্কুলে



অধ্যয়ন। স্কুলে পড়ার সময় বাড়ির পাশে কাইনজার বিলের অপর পাড়ে এক অন্ধ বৃদ্ধের মধুমালার গান শুনে মুগ্ধ হন। কোথাও গানের আসর হলেই সেখানে ছুটে যেতেন। এসব আসরে পুঁথিপাঠ, জারি-সারি, পালাগান, কবিগান খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। আবদুল গনি বয়াতি নামে এক গাড়োয়ান রাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গল্প শোনাতেন। সাইদুরও মাঝে মধ্যে তার সঙ্গী হতেন। বাবার পুঁথিপত্র ঘেঁটে মৈমনসিংহ গীতিকায় চন্দ্রাবতীর সন্ধান পান। চন্দ্রাবতীর কাহিনীর ঐতিহাসিক সূত্র ধরে চন্দ্রাবতীর ভণিতায় কিছু গান লোকমুখ থেকে সংগ্রহ। এভাবেই সংগ্রাহক জীবনের সূত্রপাত। ১৪ বছর বয়সে ১৯৫৬-এ মওলানা ভাসানী আহূত ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে জারিগানের দল নিয়ে অংশগ্রহণ। বাংলা একাডেমীর সংগ্রাহক হিসেবে ১৯৬২-এর জুলাই মাসে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পান। আগস্ট মাসে প্রথম লোকসাহিত্য সংগ্রহ একাডেমীতে জমাদান। চাকরিতে থেকেই ১৯৬৮-এ মেট্রিক পাস করেন। ১৯৭২-এ বাংলা একাডেমীতে স্থায়ী নিয়োগ লাভ। এছাড়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'পূর্বদেশ' ও সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'র স্থানীয় সাংবাদিক হিসেবেও দায়িত্ব পালন। পরে 'কিশোরগঞ্জ বার্তা' সম্পাদনার দায়িত্ব পালন। একক প্রচেষ্টায় বাংলা মাসভিত্তিক ১২৯৩টি মেলার তালিকা প্রণয়ন, যাতে মেলার নাম, স্থান ও ঠিকানা, উপলক্ষ, তারিখ, মেলার বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তথ্য, প্রধান প্রধান পণ্যসামগ্রীর নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'জামদানি' গ্রন্থটি তিনি মাঠ পর্যায়ের কাজের ওপরে রচনা করেন। তার সম্পাদনায় বাংলা একাডেমীর 'লোকসাহিত্য সংকলন' ৩০তম খণ্ড (শিয়ালের কিসসা), ৪১তম খণ্ড (লোকনাট্য-১), ৪৫তম খণ্ড (আনুষ্ঠানিক গীত), 'বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন'

৪৯তম খণ্ড (মুহররম অনুষ্ঠান), ৫১তম খণ্ড (বেড়াভাসান উৎসব), ৬১তম খণ্ড (লোকনাট্য-২), ৬৩তম খণ্ড (লোকনাট্য-৩, যৌথভাবে সম্পাদিত) প্রকাশিত হয়। এছাড়া মোহাম্মদ আলী খানের সঙ্গে যৌথভাবে 'কিশোরগঞ্জের ইতিহাস' রচনা ও সম্পাদনা। নিজ বাড়িতে একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা। ১৯৭৪-এ বাংলা একাডেমীতে তাঁর একক লোকশিল্প সংগ্রহ প্রদর্শনী হয়। ১৯৮৮-এ লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেল আর্ট গ্যালারিতে ওপেন এয়ার প্রদর্শনীতে তাঁর নিজস্ব লোকশিল্প সংগ্রহের প্রদর্শনী এবং ১৯৮৯-এ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত যৌথভাবে 'নকশিকাঁথা প্রদর্শনী' হয়। পুরস্কার। ১৯৮৮-এ লোকনাটক সংগ্রহের স্বীকৃতিস্বরূপ আরণ্যক নাট্যগোষ্ঠী সম্মাননা, ২০০১-এ বাংলা একাডেমী ফেলোশিপ, ২০০১-এ জাপানের ফুকুওয়াকা এশিয়ান আর্ট গ্যালারি সংবর্ধনা, ২০০২-এ বাংলাদেশ কারুশিল্পী পরিষদের সম্মাননা, 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' নাটক মঞ্চায়নের শতরজনী উপলক্ষে কলকাতায় এর সংগ্রাহক হিসেবে সংবর্ধনা। মৃত্যু. কিশোরগঞ্জ, ৪ মার্চ ২০০৭।

মোহাম্মদ সাদত আলী (১৯৪২-১৯৭১)॥ জন্ম. রসুলপুর গ্রাম, নরসিংদী, ২৮ জানুয়ারি ১৯৪২। শিক্ষাবিদ। স্থানীয় গাছা হাই স্কুল থেকে ১৮৫৭-তে মেট্রিক, নরসিংদী কলেজ থেকে ১৯৬০-এ আই.কম., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩-তে বি.কম. (অনার্স) এবং ১৯৬৪-তে এম.কম. পাস। যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯-এ এড.ডি. (ডক্টর অব এডুকেশন) ডিগ্রি লাভ। ১৯৬৪-১৯৬৫ পর্যন্ত নরসিংদী কলেজে অধ্যাপনা। ১৯৬৮-র ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাণিজ্য বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬৯-এর ৩১ মে সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৬৯-১৯৭১ পর্যন্ত শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাণিজ্য শিক্ষা বিভাগের প্রধান। সাদত আলী ছিলেন কৃতী অধ্যাপক, মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তার অধিকারী। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১-এর ২৬ এপ্রিল ঢাকা থেকে নরসিংদী যাওয়ার পথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নিহত।



মোহাম্মদ সানাউল্লাহ (১৮৯২-১৯৭৩)॥ জন্ম. তিলকপুর গ্রাম, ঈশ্বরদী, পাবনা, ১৮৯২। শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক। রাজশাহী মাদ্রাসায় আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ও ফারসিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আরবি-ফারসিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পান। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ইসলামিয়া কলেজের আরবি ও ফারসি ভাষার বিভাগীয় প্রধানরূপে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা। ১৯৪৬-এ হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির (১৯১১) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। 'সাম্যবাদী' নামক পত্রিকার প্রকাশক ও পরিচালক। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'খানসাহেব' উপাধি প্রদান। উল্লেখযোগ্য বই: দিল্লিশ্বরী (দ্বি. মু. ১৩৫৭), মোগল কুমারী, মৃত্যুপথে (১৩৫৭), আদর্শ বালিকা, হজরত রহিমা, হজরত ফাতেমা, রক্তকমল রাজকন্যা, রাক্ষুসে রানী । আরবি থেকে তাজকেরাতুল উলমা অনুবাদ করেন ইংরেজিতে। মৃত্যু. ১৯৭৩।

মোহাম্মদ সুলতান (১৯২৮-১৯৮৩)॥ জন্ম. মাজগ্রাম, বোদা থানা, দিনাজপুর, ১৯২৮। রাজনীতিবিদ। ১৯৪২-এ যশোর জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৪৬-এ রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে আই.এ., একই কলেজ থেকে ১৯৪৯-এ বি.এ. এবং ১৯৫২-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. পাস। কিছুদিন ঢাকার ওয়েস্ট অ্যান্ড হাই স্কুলে শিক্ষকতা। পরে ছাপাখানা ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর প্রেসের নাম আনন্দ মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নাম পুঁথিপত্র প্রকাশনী। তাঁর ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন দেশের সমকালীন



রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের দাবিতে ১৯৪৮-এর ১১ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বানে সমগ্র পূর্ববাংলায় যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় ও ধর্মঘট পালিত হয়, মোহাম্মদ সুলতান রাজশাহী সরকারি কলেজের ছাত্র হিসেবে সেই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। ১৯৫১-এর ২৮ মার্চ পূর্ববাংলার প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুবকর্মীরা গঠন করেন যুবলীগ। তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। ১৯৫২-১৯৫৩ পর্যন্ত যুবলীগের যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে সমধিক খ্যাত। ১৯৫২-র ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক'জন ছাত্রনেতা ফজলুল হক হলের পুকুরপাড়ে মিলিত হয়ে পরের দিন ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯৫২-র ২৬ এপ্রিল ভাষা-আন্দোলনের প্রগতিশীল চেতনাকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য গঠিত হয় 'পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন'। মোহাম্মদ সুলতান ছিলেন এই নবগঠিত ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৫৭-তে আওয়ামী লীগের মার্কিন ঘেঁষা নীতির প্রতিবাদে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি অংশ আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (২৫ জুলাই ১৯৫৭) গঠন করে। মোহাম্মদ সুলতান এই নবগঠিত দলকে সংগঠিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৫৮-তে সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হলে গ্রেফতারবরণ। নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে দীর্ঘ কয়েক বছর কারাগারে আটক। ১৯৬৫-র ২৬ জুলাই ন্যাপের (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) কাউন্সিল অধিবেশনে এর পূর্ব-পাকিস্তান কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত। দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন কারাগারে আটক থাকাকালে ১৯৬৬-১৯৬৭ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। চীন ও রাশিয়ার আদর্শগত বিরোধকে কেন্দ্র করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) দ্বি-খণ্ডিত হলে (৩০ নভেম্বর ১৯৬৭) মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন পিকিংপন্থি ন্যাপের পক্ষাবলম্বন। ন্যাপের এ অংশেরও যুগ্ম-সম্পাদক। ১৯৭০-এ সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ এবং নিজের প্রকাশনা ও ছাপাখানা পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ। ১৯৫৩-তে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ভাষা-আন্দোলনের ওপর প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' তাঁর পুঁথিপত্র প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত। ঐ বছরই সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত এবং প্রকাশক হিসেবে তাঁর ওপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলে আত্মগোপন। সদালাপী মোহাম্মদ সুলতান এদেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মৃত্যু, ঢাকা, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৩।

মোহাম্মদ হানিফ (১৯৪৪-২০০৬)॥ জন্ম, ঢাকা



১ এপ্রিল ১৯৪৪। রাজনীতিবিদ। পিতা আব্দুল আজিজ, মা মুন্নী বেগম। ঢাকার ইসলামিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা (১৯৬০), তৎকালীন কায়েদে আজম কলেজ (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী কলেজ) থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১৯৬৩) এবং একই কলেজ থেকে স্নাতক (১৯৬৫) ডিগ্রি লাভ। ১৯৬২-এ কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৫-এ বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব নিযুক্ত। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০এর জাতীয় নির্বাচন, ৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে দেশগঠনে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ১৯৭৩-এ জাতির জনকের ছেড়ে দেয়া আসন ঢাকা-১২ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত এবং জাতীয় সংসদের হুইপ মনোনীত। ৭৫-এ বঙ্গবন্ধু সপরিবার নিহত হওয়ার পর গৃহবন্দী। ১৯৭৮-এ ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮১-এ জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর গ্রেফতার। ১৯৮৩-এ এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের সময় পুনরায় গ্রেফতার ও কারাবরণ। ১৯৯২-এ দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৯৪-এ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে প্রথম প্রত্যক্ষ ভোটে মেয়র নির্বাচিত। সাড়ে আট বছর তিনি এই পদে আসীন। ১৯৯৬-এ 'জনতার মঞ্চ'র অন্যতম উদ্যোক্তা। ২০০৩-এ তৃতীয়বারের মতো ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য।

২০০৪-এর ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার উপর গ্রেনেড হামলায় আক্রান্ত হয়েও নেত্রীকে রক্ষায় অন্যদের সঙ্গে মানববর্ম তৈরি। ২০৫-এর ৮ ফেব্রুয়ারি মুক্তাঙ্গনে এক সমাবেশে ভাষণ দেয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত। মৃত্যু. ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০০৬।

মোহাম্মদ হামিদ আলী (১৮৭৪-১৯৫৪)॥ জন্ম. সুলতানপুর, রাউজান, ১৮৭৪। তাঁর পেশা ছিল শিক্ষকতা। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুসারী কবি। ১৯০৩-এ তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'ভ্রাতৃ-বিলাপ' প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলিঃ ভ্রাতৃ-বিলাপ, কাসেম বধ, সোহরাব বধ, জয়নালোদ্ধার। মৃত্যু. ১৯৫৪।

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, সিপাহি (১৯৪৫-১৯৭১)॥ জন্ম. ডুমুরিয়া গ্রাম, চাপড়া, চব্বিশ পরগনা, ১৯৪৫। স্থায়ী নিবাস ঘরোদা, খালিশপুর, খুলনা। বীরশ্রেষ্ঠ। খালিশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং পরবর্তীকালে স্থানীয় নাইট স্কুলে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা। ১৯৭১-এর ২ ফেব্রুয়ারি ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান। যোগদানের পরই চট্টগ্রামের সেনানিবাসে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে গমন। ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে সেনাবাহিনীর চাকরিস্থল থেকে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন। বাড়িতে থাকেন মাত্র একদিন। পরের দিনই মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্যে চলে যান সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল থানার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ধলই চা বাগানের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ধলই বর্ডার আউট-পোস্টে। সামরিক দিক থেকে এই ফাঁড়িটি দখল করা ছিল মুক্তিবাহিনীর জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘাঁটি দখলের দায়িত্ব দেয়া হয় ১ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সি কোম্পানিকে। এই দলে ছিলেন হামিদুর রহমান। ২৮ অক্টোবর ভোরে আক্রমণের দিন ঠিক করা হয়। ২৭ অক্টোবর রাত দশটায় যাত্রা শুরু। ভোর চারটায় লক্ষ্য স্থলের কাছে পৌঁছে চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া হয়। সামনে দু'প্লাটুন ও তার পেছনে আর এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা, শেষের প্লাটুনটি প্রথম দু'প্লাটুনের অনুসরণকারী হিসেবে অগ্রসর হতে থাকে। ঘাঁটির কাছাকাছি এলে একটি মাইন বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় শত্রুর অবিরাম গোলাবর্ষণ। বাধ্য হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা মাটিতে শুয়ে পড়ে, আর এগুনো সম্ভব নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় শত্রুর এল.এম.জি. অবস্থানের ফলে, আর গাছপালার জন্যে নিজস্ব মেশিনগান দিয়ে গুলি করেও কোনো ফল হচ্ছিলো না। শত্রুর এল.এম.জি. স্তব্ধ করতে না পারলে ঘাঁটি দখল অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যে এগিয়ে এলেন সিপাহি হামিদুর রহমান। ক্রলিং করে শত্রুর অগোচরে এগিয়ে গেলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুপক্ষের এল.এম.জি-র অবস্থানের ওপর। নিহত হলো এল.এম.জি. চালকদ্বয়। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হলো এল.এম.জি. এবং গুলির আঘাতে নিস্পন্দ হয়ে গেলেন হামিদুর রহমান নিজেও। কিন্তু স্পন্দন জাগলো সি কোম্পানির সৈনিকদের মধ্যে। দুর্বার গতিতে তাঁরা দখল করলেন সেই দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেলো। নিজের জীবন উৎসর্গ করে হামিদুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতায় অবদান রাখেন। দেশ তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠের সম্মানে ভূষিত করে। মৃত্যু. ধলই, শ্রীমঙ্গল, ২৮ অক্টোবর ১৯৭১।



মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ (১৮৮০-১৯৪৬)॥ জন্ম. কাজীপাড়া, বারাসত, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৮৮০। সাহিত্যিক। বি.এ. পর্যন্ত পড়াশুনা করেন, কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে বি.এ. পাস করা সম্ভব হয়নি। কলকাতার আলীপুর কোর্টে কেরানির চাকরি গ্রহণ। পরবর্তীকালে নিজ যোগ্যতা বলে টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত। প্রকাশিত রচনা–উপন্যাসঃ নেক নজর, তাজিয়া। গল্পগ্রন্থঃ প্রদীপ ও চেরাগ। মৃত্যু. ১৯৪৬।

মোহাম্মদ হোসেন খসরু, ওস্তাদ (১৯০৩-১৯৫৯)॥ জন্ম. কুমিল্লা, ২ এপ্রিল ১৯০৩। পৈতৃক নিবাস কসবা গ্রাম, কুমিল্লা। উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বি.এ. পাস করার পর লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে ভর্তি। সেখান থেকে



সংগীতে উচ্চ ডিগ্রি লাভ। পিতা বংশীবাদক জাইদুল হোসেনের নিকট বাঁশিতে তালিম গ্রহণ। অপরদিকে মাতামহ জানে আলম চৌধুরীর কাছে সংগীতে তালিম গ্রহণ ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে পারদর্শিতা অর্জন। রামপুরের ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁর কাছে ধ্রুপদ, ধামার, সাদ্রা ও হোরি অঙ্গের রাগ-রাগিণী শিক্ষা গ্রহণ। লক্ষ্ণৌ, দিল্লি, রামপুর ও বেনারসে ওস্তাদ নাসিরুদ্দীন খাঁর কাছে ধ্রুপদ; ওস্তাদ কালে খাঁর কাছে টপ্পা, ওস্তাদ ওয়াজীর খাঁ, ওস্তাদ মোহাম্মদ আলী খাঁ, জদ্দান বাঈ, ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ ও ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে খেয়াল; ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ ও ওস্তাদ মঈজুদ্দিন খাঁর কাছে ঠুমরী এবং ওস্তাদ মসিত খাঁর কাছে তবলাবাদন শেখেন। লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের সহ-অধ্যক্ষ, কলকাতার কলেজ-রো মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং ঢাকার বুলবুল ললিতকলা একাডেমির অধ্যক্ষ। ১৯২২-এ কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন। কবির বহু গানে সুরারোপ করেন। কবি তাঁর কাছ থেকে বহু রাগ-রাগিণীর তালিম নেন। তবলাবাদনে তাঁর পারদর্শিতা সর্বজনবিদিত। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রবেশিকা ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট শ্রেণির সংগীত সিলেবাসের প্রণেতা। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কর্তৃক 'দেশমণি'-রূপে আখ্যায়িত। ১৯৬১-তে 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' (মরণোত্তর) সম্মানে এবং ১৯৭৮-এ 'শিল্পকলা একাডেমী পদকে' (মরণোত্তর) ভূষিত। মৃত্যু. ৬ আগস্ট ১৯৫৯।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)॥ জন্ম. কাঁচড়াপাড়া গ্রাম, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ২৬ অক্টোবর, ১৮৮৮। কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য-সমালোচক। পৈতৃক নিবাস বলাগড়, হুগলি। পিতা নন্দলাল মজুমদার। পিতৃকুলের দিক থেকে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) এবং মাতৃকুলের দিন থেকে কবি ঈশ্বরগুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। বলাগড় স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯০৪) ও কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. (১৯০৮) পাস। কলকাতার তালতলা স্কুলে শিক্ষকতা (১৯১০-১৯১৪) করার পর ১৯১৪-তে সরকারি জরিপ বিভাগে কানুনগো পদে চাকরি গ্রহণ। তিন বছর এ পদে দায়িত্ব পালন। আবার স্কুলে মাস্টারি গ্রহণ। ১৯২৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনার কর্মে যোগদান। ১৯৪৪-এ অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা তৃতীয় পর্যায়ে প্রকাশ ও সম্পাদনা। কাব্যসাধনায় তিনি দেহাত্মবাদী। তাঁর কবিতার ভাষা, শব্দ প্রয়োগ ও ছন্দনির্মাণ-কৌশল অনন্য। রবীন্দ্র-যুগেও তাঁর ভাব ও ভাষা স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক প্রয়োগ। সৃষ্টিশীল সাহিত্য-সমালোচক ও প্রবন্ধকার। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, নিপুণ বিশ্লেষণ ও ভাব-গম্ভীর ভাষার মহিমায় তাঁর সমালোচনা গ্রন্থগুলো বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য/স্বপন পসারী (১৯২১), বিস্মরণী (১৯২৯), স্মরগরল (১৯৩৬), ও হেমন্ত গোধূলি (১৯৪১); প্রবন্ধ ও সমালোচনা/আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১৯৩৬), সাহিত্যকথা (১৯৩৯) বিবিধ কথা (১৯৪১), বিচিত্র কথা (১৯৪১), সাহিত্য বিতান (১৯৪২), বাংলা কবিতার ছন্দ (১৯৪৫), বাংলার নবযুগ (১৯৪৫), জয়তু নেতাজী (১৯৪৬), কবি শ্রীমধুসূদন (১৯৪৭), সাহিত্য বিচার (১৯৪৭), বঙ্কিম উপন্যাস (১৯৪৮), বঙ্কিম বরণ (১৯৪৯), কবি-প্রদক্ষিণ (১৯৪৯), শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র (১৯৫০), বাংলা ও বাঙ্গালী (১৯৫১), জীবন জিজ্ঞাসা (১৯৫১), কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য (১ম খণ্ড ১৯৫২ ও ২য় খণ্ড ১৯৫৩)। সাহিত্য সাধনার প্রথমার্ধে ছিলেন রবীন্দ্র-অনুগত। এজন্য 'শনিবারের চিঠির' ব্যঙ্গবাণের শিকার হন। 'শনিবারের চিঠির' ব্যঙ্গকবিতায় তাঁর বিকৃত নাম ছিল 'মধুকরকুমার কাঞ্জিয়াল'। অল্পকাল পরে তিনি 'শনিবারের চিঠির' দলে যোগ দেন এবং এ গোষ্ঠীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে রবীন্দ্র-বিরোধিতায় নিয়োজিত হন। রবীন্দ্রনাথকে খাটো, মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রকে বড় লেখক হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস চালান। মৃত্যু. কলকাতা, ২৬ জুলাই, ১৯৫২।



মোহিনীমোহন দাশগুপ্ত॥ জন্ম. হিঙ্গজিয়া, সিলেট। ইতিহাস লেখক। সিলেটের তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার জন্য খ্যাত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: শ্রীহট্টের ইতিহাস (প্রথম সংস্করণ, ঢাকা ১ নভেম্বর ১৯০৩)। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘা যতীন (১৮৮০-১৯১৫)॥ জন্ম. কয়াগ্রাম, নদীয়া, ৮ ডিসেম্বর ১৮৮০ বিপ্লবী ও শহীদ। ১৮৯৮-তে কৃষ্ণনগর এ. বি. স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস। কলকাতা সেন্ট্রাল কলেজে এফ.এ. ক্লাসে ভর্তি। কিছুদিন পর কলেজের পাঠ ত্যাগ করে শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শেখেন। প্রথমে Amhuty Company-তে এবং পরে মজফ্ফরপুরে কেনোড সাহেবের অধীনে স্টেনোগ্রাফারের চাকরি গ্রহণ। এক সময়ে কলকাতায় বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে যোগদান। সেক্রেটারি হুইলার ও ওমালীর



স্টেনোগ্রাফার হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯০৩-এ অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসে তাঁদের বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। ১৯০৬-এ কলকাতায় নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান। ১৯০৭-এ কুষ্টিয়ায় মামা ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বেড়াতে যান। সেখানে এক বাঘের সঙ্গে যতীনের সাংঘাতিক লড়াই হয়। ছোরার আঘাতে বাঘটি হত্যা করলে 'বাঘা যতীন' নামে পরিচিতি লাভ। ১৯১০-এ হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার আসামিরূপে এক বছর কয়েদ খাটেন। ১৯১১-তে ছাড়া পেয়ে ঠিকাদারি কাজ নিয়ে যশোর-ঝিনাইদহ প্রভৃতি স্থানে গমন। ১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির সহায়তায় সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক দলসমূহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে তাতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। এই উদ্দেশ্যে জার্মানি জাহাজ 'মেভারিক' থেকে অস্ত্র নামানোর উদ্দেশ্যে সংগীতের সঙ্গে বালেশ্বর গমন। কিন্তু পুলিশ সব জানতে পারে। ১৯১৫-র ৯ সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুচরদের সঙ্গে পুলিশের দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ হয়। ট্রেঞ্চের ভিতরে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে আহত হন। পরদিন বালেশ্বর হাসপাতালে প্রাণত্যাগ। বুড়িবালামের তীরে সংঘটিত এই যুদ্ধ 'কোপতিপোদার' যুদ্ধ নামে খ্যাত। সর্বভারতীয় বিপ্লবীদের অন্যতম সংগঠক রাসবিহারী বসু এই যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী ছিলেন। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কলকাতার তৎকালীন ইংরেজ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট নতমস্তকে এই বিপ্লবীর উদ্দেশ্যে সম্মান জানান। মৃত্যু. বালেশ্বর হাসপাতাল, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)॥ জন্ম. পাতিলপাড়া গ্রাম, বর্ধমান, ১৮৮৭। পৈতৃক নিবাস হরিপুর গ্রাম, নদীয়া। কবি। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি.ই. ডিগ্রি লাভ (১৯১২)। প্রথমে নদীয়া জেলাবোর্ডে, পরে কাশিমবাজার রাজ



স্টেটে ওভারশিয়ার পদে দায়িত্ব পালন। একজন বিশিষ্ট কবি। বাংলা কবিতাকে অবাস্তব কল্পনার জগৎ থেকে কঠোর বাস্তবে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ভাবের দৃঢ়তায়, ব্যঙ্গের ঝাঁজে, দুঃখময়তায়, মধ্যবিত্ত বাঙালি-জীবনের স্বপ্ন ও বাস্তবের সংঘাত-চেতনায়, বিদ্রোহী মনোভাবে তাঁর কবিতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মরীচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭), মরুমায়া (১৯৩০), সায়ম (১৯৪১), ত্রিযামা (১৯৪৮), প্রভৃতি তাঁর কবিতাগ্রন্থ। কাব্যপরিমিতি (১৯৩৯) সাহিত্যের রূপতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। রবীন্দ্র-যুগের একজন শক্তিশালী ও মৌলিক কবি হিসেবে খ্যাত। মৃত্যু. ১৯৫৪।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)॥ জন্ম. জামশেরপুর, নদীয়া, ২৭ নভেম্বর ১৮৭৮। পৈতৃক নিবাস বলাগড় গ্রাম, হুগলী। কবি। কলকাতার ডাফ কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯০২)। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের প্রাইভেট সেক্রেটারিরূপে কর্মজীবন আরম্ভ।



নাটোরের মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি ও জমিদারির সুপারিনটেনডেন্ট পদে এবং কর কোম্পানি ও এফ.এন. গুপ্ত কোম্পানিতে উচ্চ পদে কর্ম সম্পাদন। মানসী পত্রিকার সম্পাদক (১৯০৯-১৯১৩) ও যমুনা পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক (১৯২১-১৯২২)। পূর্বাচল পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। রবীন্দ্রানুসারী কবিকুলের অন্যতম।

পল্লীপ্রীতি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবি-মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রাম-বাংলার শ্যামল-স্নিগ্ধ রূপ, পল্লী-জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাগ্যাহত ও নিপীড়িত নারীর প্রতি সমবেদনা তাঁর কবিতায় আন্তরিকতার সঙ্গে সহজ সরল ভাষায় তাৎপর্যমণ্ডিতভাবে প্রকাশিত। লেখা (১৯০৬), রেখা (১৯১০), অপরাজিতা (১৯১৫), নাগকেশর (১৯১৭), বন্ধুর দান (১৯১৮), জাগরণী (১৯২২), নীহারিকা (১৯২৭), মহাভারতী (১৯৩৬) প্রভৃতি তাঁর কবিতাগ্রন্থ॥ মৃত্যু. ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩৩)॥ জন্ম. বরমা, চট্টগ্রাম, ১৮৮৫। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। ১৯০২-এ প্রবেশিকা পাস করে ১৯০৪-এ বিলাত গমন। ১৯০৮-এ কেম্ব্রিজ থেকে বি.এ. এবং ১৯০৯-এ ব্যারিস্টারি পাস। ১৯১০-এ কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। অল্পদিনের মধ্যেই একজন ঝানু আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। ১৯১২ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত চট্টগ্রামে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রতিবাদস্বরূপ ব্যারিস্টারি পেশা ত্যাগ। একই বছরে বার্মা অয়েল কোম্পানির (চট্টগ্রাম) ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ধর্মঘট পরিচালনা করে সস্ত্রীক গ্রেফতার বরণ এবং কারাদণ্ড ভোগ। এই ঐতিহাসিক শ্রমিক ধর্মঘটই এ দেশের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। ধর্মঘটী শ্রমিকদের পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪০ হাজার টাকা দান। ঋণ করে এই টাকা দিয়েছিলেন। এই মহানুভবতার জন্য দেশবাসীর কাছ থেকে 'দেশপ্রিয়' উপাধি লাভ। ১৯২২-১৯২৩-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। এরপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'স্বরাজ্য পার্টি'তে (১৯২৩) যোগদান। ১৯২৩-এ চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। পাঁচবার কলকাতার মেয়র নির্বাচিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরিচালিত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। তৎকর্তৃক 'অ্যাডভান্স' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত। দেশবন্ধু'র মৃত্যুর (১৯২৫) পর ১৯২৯ পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি। ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ উত্থাপিত পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবের পাশাপাশি গান্ধীজী, মতিলাল নেহেরু প্রমুখ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব রাখলে যতীন্দ্রমোহনের মধ্যস্থতায় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গৃহীত। ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি কলকাতা কর্পোরেশন বিল্ডিং-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন। একই বছর ভারতবর্ষ থেকে বার্মাকে আলাদা করার প্রতিবাদে রেঙ্গুনে বক্তৃতা দেয়ার জন্য আবার কারানির্যাতন ভোগ। জালিয়ানওয়ালাবাগে আপত্তিকর বক্তৃতার জন্য কারারুদ্ধ। জেল থেকে বেরিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলাত গমন। ফেরার পথে ১৯৩২-এ জাহাজে গ্রেফতার। প্রথমে যারবেদা জেলে ও পরে দার্জিলিং এবং রাঁচিতে বন্দী করে রাখা হয়। ১৯০৮-এ নেলী গ্রে-র সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দেশ এবং মানুষের সেবায় আমৃত্যু সস্ত্রীক সংগ্রাম করে গেছেন। মৃত্যু. রাঁচি, ১৯৩৩।



যদুনাথ ভট্টাচার্য॥ জন্ম. মাগুরা। ঐতিহাসিক। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার বিখ্যাত জমিদারদের কাজ-কর্মের তথ্যনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণমূলক ইতিহাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: রাজা সীতারাম রায় (প্রথম সংস্করণ: ১২ মার্চ ১৯০৫), রাজা সীতারাম রায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এবং সংশ্লিষ্ট রাজগণের ইতিহাস (পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯১০)। জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত।

যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮)॥ জন্ম. করচমাড়িয়া গ্রাম, নাটোর ১০ ডিসেম্বর ১৮৭০। ইতিহাসবিদ। জমিদার পরিবারে জন্ম। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স (১৮৮৭) ও রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে দশম স্থান অধিকার করে এফ.এ. (১৮৮৯) পাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসে অনার্সসহ প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান



অধিকার করে বি.এ. (১৮৯১) ও ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. (১৮৯২) ডিগ্রি লাভ। ১৮৯৩-তে রিপন কলেজ থেকে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত ১৮৯৬-তে মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) যোগদান। ১৮৭৯-তে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ। ১৮৯৮-তে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে যোগদান। একই বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৮৯৯-তে পাটনা কলেজে বদলি। ১৯০১-এ পুনরায় প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থানান্তরিত। ১৯০২-১৯১৭ পর্যন্ত পাটনা কলেজে অধ্যাপনা। ১৯১৭-১৯১৯ পর্যন্ত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। ১৯১৮-তে ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে উন্নীত। ১৯১৯-১৯২৩ পর্যন্ত কটক র‍্যাভেনশ কলেজে ও ১৯২৩-১৯২৬ পর্যন্ত পাটনা কলেজে অধ্যাপনা। ১৯২৬-এ অধ্যাপনার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ। একই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত। ১৯২৮ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক। মোগল যুগের ইতিহাস রচনায় গভীর পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান। সত্যনিষ্ঠ, তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রামাণিক ইতিহাস রচনার জন্য উর্দু, ফারসি, মারাঠী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা গ্রহণ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ও বিদেশ থেকে বহু দুস্প্রাপ্য পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও দলিলপত্র সংগ্রহ। প্রকাশিত গ্রন্থ: India of Aurangzib: Topography, Statistics and Roads (1901), Economics of British India (1909), History of Aurangzib (vol. I & II-1912, vol. III-1916, vol. IV-1919, vol. V-1924), Anecdotes of Aurangzib. and Historical Essays (1912), Chaitanya: His Pilgrimages and Teachings (1913), Shivaji and His Times (1919), Studies of Mughal India (1919), Mughal Administration (1st Series 1920. 2nd Series 1925), Later Mughals (1928), India Through the Ages (1928), A Short History of Aurangzib (1930), Bihar and Orissa During the Fall of the Mughal Empire (1932), Fall of the Mughal Empire (vol. 1-1932, vol. 2-1934, vol. III-1938, vol. IV-1950), Studies in Aurangzib's Reign (1933). House of Shivaji (1940), History of Bengal Vol. II [Published by Dhaka University] (1948), Bengal Nawabs (1952), Military History of India (1961), Nadir Shah in India (1973), পাটনার কথা (১৯১৬), শিবাজী ১৯২৯) ও মারাঠা জাতীয় বিকাশ (১৯৩৬)। History of Aurangzib তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা গ্রন্থ। ১৯৩৪-এ বিলাতের রয়্যাল হিস্টরিকাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত। নবগঠিত বঙ্গীয় আইনসভার মনোনীত সদস্য (১৯৩০-১৯৩২)। তিনবার (১৯৩৫, ১৯৪০ ও ১৯৪৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত। সি.আই.ই. (১৯২৬) ও নাইট (১৯২৯) উপাধিতে ভূষিত। ১৯৩৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৪৪-এ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট উপাধি লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯ মে ১৯৫৮।

যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৫৫-১৯২৩)॥ জন্ম. তেতুলিয়া গ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ১৮৫৫। গণিতবিদ। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। পিতা কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন সামান্য ভূ-সম্পত্তির অধিকারী। গ্রামের টোলের পাঠ শেষ করে সিরাজগঞ্জ এম.ই. স্কুলে ভর্তি। এ



স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয় ময়মনসিংহ জেলা আদালতের উকিল কালীনাথ ভাদুড়ীর আশ্রয়ে থেকে ময়মনসিংহ বঙ্গ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে পিতার মৃত্যু। বঙ্গ বিদ্যালয় থেকে মাসিক চার টাকা বৃত্তি লাভ করে মধ্যবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এরপর মাতার অনুরোধে গিরিজাসুন্দরী দেবীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ। ভাদুড়ী বাবু সরকারি উকিল হয়ে শেরপুর চলে গেলে গৃহশিক্ষকতা করে পড়ালেখার খরচ যোগাড়। ১৮৭৬-এ বৃত্তিসহ ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৯৭৮-এ বৃত্তিসহ কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে এফ.এ. ও ১৮৮০-তে বি.এ. পাস। ১৮৮২-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এম.এ. ডিগ্রিলাভ। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত কলকাতা সিটি কলেজে গণিতে অধ্যাপনা। ১৮৮৭-তে স্যার সৈয়দ আহমদের আমন্ত্রণে আলীগড় এম.এ. ও. কলেজে গণিতের অধ্যাপক পদে যোগদান। ১৯১৬-তে অধ্যাপনার কর্ম

থেকে অবসর গ্রহণ। অবসর জীবনের অধিকাংশ সময় সিরাজগঞ্জ ও পাবনায় বাস। পাবনা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত। কিছুকাল অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন। তেঁতুলিয়ার বাড়িতে একটি মন্দির নির্মাণ এবং প্রতি বছর সেখানে মহাধুমধামে কালীপূজা অনুষ্ঠান। সিরাজগঞ্জ নাট্যভবনের প্রতিষ্ঠাতা। গণিত সম্রাটরূপে খ্যাত। ১৮৯০-তে তাঁর বিখ্যাত 'পাটিগণিত' গ্রন্থখানি ইংরেজিতে প্রকাশিত। পরে এই গ্রন্থটি বাংলা, উর্দু, হিন্দী, অসমীয়া, মারাঠী ও নেপালি ভাষায় অনূদিত। পরবর্তী অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল গ্রন্থটি অবিভক্ত বঙ্গের প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পঠিত। ১৯১২-তে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর 'বীজগণিত' গ্রন্থখানি প্রকাশিত। 'কুলশাস্ত্র দীপিকা' নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ। মৃত্যু. বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর, ১৯২৩।

যামিনী রায় (১৮৮৭-১৯৭২)॥ জন্ম. বেলিয়াতোড় গ্রাম, বাঁকুড়া, ১০ এপ্রিল ১৮৮৭। চিত্রশিল্পী। পিতা রামতারণ রায়। এক খুদে জমিদার পরিবারে জন্ম। স্কুলের পড়া শেষ করে ১৯০৩-এ কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি। সেখানে ১৯১৬ পর্যন্ত তের বছর চিত্রকলা শেখেন। ছাত্র থাকাকালীন তাঁর ক্লাসওয়ার্ক ছিল উঁচু মানের। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পর্সি ব্রাউন কোনো পরীক্ষা না নিয়েই তাঁর এই প্রতিভাবান ছাত্রকে যে কোনো ক্লাসে কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর একটি ছবি বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল আর্ট স্কুলের ক্লাসে। আর্ট স্কুল থেকে পাস করার পর 'ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমী' পত্রিকায় ছবি প্রকাশ করে প্রশংসা অর্জন। কালীঘাটের পটুয়াদের আঁকা ছবির শৈলীতে বিশেষ আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হন। প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করলেও ১৯২১ থেকে সেই রীতি পরিহার করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ছবির আঙ্গিক গড়ে তোলেন। লোকশিল্পের ভাব-ঐশ্বর্যকে তাঁর শিল্পপ্রতিভার দ্বারা এক উত্তুঙ্গ পর্যায়ে স্থাপিত। দেশের লোকের সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্ম, ধর্মগত দৃশ্যাবলী, বিচিত্র আনুষ্ঠানিক নৃত্য, কর্মরত সাধারণ গ্রাম্য মানুষ তাঁর চিত্রের ক্যানভাসে পরিপাট্যভাবে উপস্থাপিত। সাঁওতাল মা ও ছেলে, চাষীর মুখ, পূজারিণী মেয়ে, কীর্তন, বাউল, গণেশ জননী, পিতাপুত্র, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী, তিন কন্যা, যীশুখ্রীস্ট, কৃষ্ণবলরাম, মহাদেব, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি চিত্রে তাঁর অনুপম শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। পদ্মভূষণ উপাধি লাভ (১৯৫৪)। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি লাভ (১৯৫৬)। মৃত্যু. ২৪ এপ্রিল ১৯৭২।



যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭)॥ জন্ম. ন্যাতড়া গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, ২৮ অক্টোবর ১৮৬৬। শিশুসাহিত্যিক। দেওঘর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস। এরপর কিছুকাল কলকাতা সিটি কলেজে পড়াশুনা। সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা। শিক্ষকতার কর্মে যোগদানের পর থেকেই শিশুসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ। 'সখা', 'সখী', 'মুকুল', 'বালকবন্ধু', 'বালক' প্রভৃতি শিশু পত্রিকায় লিখে খ্যাতি লাভ। 'সন্দেশ' পত্রিকাতেও তাঁর বহু শিশুতোষণ ছড়া প্রকাশিত। ১৮৯৬-তে 'সিটিবুক সোসাইটি' নামে কলকাতায় একটি প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন। ধর্মমতে ছিলেন ব্রাহ্ম। ১৯২৩-এ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত। বাংলা ভাষায় যোগীন্দ্রনাথই প্রথম উদ্ভট ছড়ার রচয়িতা। তাঁর আজগুবি ছড়াগুলো ছোটদের মনোরঞ্জনের এক অসাধারণ সৃষ্টি। 'অজগর আসছে তেড়ে/ আমটি আমি খাব পেড়ে' ছড়া সম্বলিত তাঁর রচিত সচিত্র 'হাসি ও খেলা' (১৮৯১) পুস্তকখানি বাংলায় প্রথম শিশুতোষ বই। 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯) যোগীন্দ্রনাথের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছড়া সংকলন। রচিত অন্যান্য শিশুতোষ পুস্তক: ছবি ও গল্প (১৮৯২), রাঙা ছবি (১৮৯৬), হাসিখুশি (১ম ভাগ, ১৮৯৭), হাসিরাশি (১৮৯৯), পশুপক্ষী (১৯১১) ও বনে জঙ্গলে (১৯২৯)। এ ছাড়া 'চারু পাঠ', 'সাহিত্য', 'শিক্ষা সঞ্চয়' প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও রচনা। মৃত্যু. ২৬ জুন ১৯৩৭।

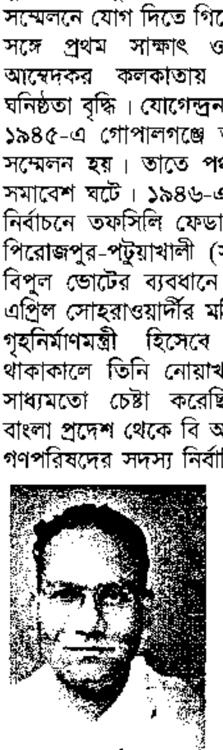


যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮৩-১৯৬৬)॥ জন্ম. বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ, ২২ মার্চ ১৮৮৩

ঐতিহাসিক, গবেষক। বাংলার ইতিহাস রচনায় খ্যাতি অর্জন। তিনি অল্পবয়সে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং ১০০ টিরও বেশি বই লেখেন। তিনি শিশুভারতী নামের বিখ্যাত কোষগ্রন্থের সম্পাদনা করেন। তিনি 'কৈশোরক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং 'বিশ্বের ইতিহাস' ২১ খণ্ডে রচনা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ: 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' (সচিত্র) প্রথম প্রকাশ: কলকাতা, ২২ নভেম্বর ১৯০৯, 'কেদার রায়' (ষোড়শ শতকের বাংলার ইতিহাস। বাংলার বারো ভূঁইয়ার কাহিনী ও কেদার রায়ের জীবনকথা) প্রথম প্রকাশ: ঢাকা ১৯১৪, 'বিক্রমপুরের বিবরণ', প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ: ঢাকা, ২ আগস্ট ১৯১৯। মৃত্যু. ১৯৬৫।

যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ত, মহামহোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৬০)॥ জন্ম. সুসংদুর্গাপুর, নেত্রকোণা, ১৮৮৭। অধ্যাপক, লেখক ও সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। বঙ্গদেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা অধ্যাপকের নিকট কলাপ ব্যাকরণ, নব্যন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন। বহরমপুরের জুবিলী টোলের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ। মীমাংসা ও অলঙ্কার শাস্ত্রেও পারদর্শিতা অর্জন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রীর নিকট সংখ্যা ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'সাংখ্যাতীর্থ' ও 'বেদান্ততীর্থ' উপাধি লাভ। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি লাভ। গ্রন্থ: অদ্বৈতসিদ্ধি (বেদান্তের অনুবাদ-১৯৩১), ন্যায়ামৃত (১৯৩১), প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি (১৯৪৯), ভারতীয় দর্শনের বিচার রীতি (১৯৫১), ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়, মহামতি বিদুর। মৃত্যু. ১৯৬০।

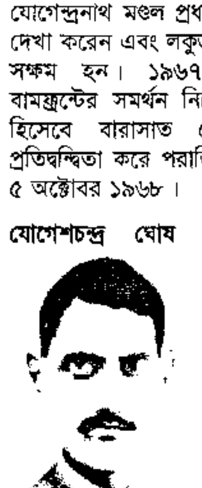
যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৯০৪-১৯৬৮)॥ জন্ম. মৈস্তারকান্দি, গৌরনদী, বরিশাল, ২৯ জানুয়ারি ১৯০৪। রাজনীতিবিদ। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেতা। পিতা রামদয়াল মণ্ডল। মাতা সন্ধ্যারানী মণ্ডল। পিতামাতার দশম সন্তান। ১৯২৪-এ বার্থী তারা ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগ পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯২৬-এ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ. পাস। ১৯২৯-এ একই কলেজ থেকে অঙ্ক এবং সংস্কৃত বিষয় নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পাস। ১৯৩৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল. ডিগ্রি অর্জন। ১৯৩৬-এর জানুয়ারি মাসে বরিশাল সদর লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত। একই বছরে আইনজীবী হিসেবে বরিশাল সদর আদালতে যোগদান। ১৯৩৭-এর সাধারণ নির্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে বাখরগঞ্জ উত্তর-পূর্ব নির্বাচন কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের শক্তিশালী প্রার্থী জমিদার সরল দত্তকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেন। ১৯৪০-এ কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্র বসু এবং শরৎচন্দ্র বসুর সহযোগিতায় নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে কলকাতা কর্পোরেশনের ৩ নং বটতলা ওয়ার্ড থেকে কমিশনার নির্বাচিত হন। ১৯৪৩-এ নিখিল ভারত তফসিলি ফেডারেশনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সভাপতি নির্বাচিত। এ বছর মার্চ মাসে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে ২০ জন এমএলএ-সহ তিনি মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমউদ্দিনকে সমর্থন দেন। তখন নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় সমবায় ও ঋণদান দপ্তরের মন্ত্রী হন। একই বছর মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সমবায় মন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে বি আর আম্বেদকরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়। ১৯৪৪-এ আম্বেদকর কলকাতায় এলে দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে ১৯৪৫-এ গোপালগঞ্জে তফসিলি ফেডারেশনের সম্মেলন হয়। তাতে পঞ্চাশ হাজার প্রতিনিধির সমাবেশ ঘটে। ১৯৪৬-এর ২২শে মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তফসিলি ফেডারেশনের প্রার্থী হিসেবে পিরোজপুর-পটুয়াখালী (সংরক্ষিত) কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হন। ২৪শে এপ্রিল সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভায় বিচার, পূর্ত ও গৃহনির্মাণমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। মন্ত্রী থাকাকালে তিনি নোয়াখালীর দাঙ্গা প্রতিরোধে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলা প্রদেশ থেকে বি আর আম্বেদকর ভারতের গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ বছর ১লা



নভেম্বর মুসলিম লীগের সুপারিশে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী হিসেবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যোগ দেন। ১৯৪৭-এর সূচনায় দেশভাগ আসন্ন জেনে

বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করতে থাকেন। বাংলা প্রদেশের বিভিন্ন অংশে জনসভা করে তিনি বঙ্গভঙ্গের কুফল তুলে ধরে বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। দেশভাগের পাশাপাশি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা গঠনের ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু প্রমুখের উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ করা অসম্ভব বিবেচনায় ১৯৪৭-এর ৫ আগস্ট তিনি দিল্লি ত্যাগ করে করাচি চলে যান। ১১ আগস্ট তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের অস্থায়ী স্পিকার হিসেবে নিযুক্ত হন। এরপর ১৫ আগস্ট তাঁকে স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম আইন ও শ্রমমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। ১৯৫০-এ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, প্রভৃতি জেলায় ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের অনুমতির অপেক্ষা না করেই তিনি তাঁর নিজ এলাকায় চলে যান এবং সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ান। দাঙ্গায় বিধ্বস্ত সংখ্যালঘুদের সাহায্য করার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানাতে থাকেন। কিন্তু এ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীরবতায় তিনি অসহায় বোধ করেন এবং এক পর্যায়ে কলকাতায় ছেলের অসুস্থতার খবর পেয়ে কলকাতায় চলে যান। কলকাতা থেকেই তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নিকট পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। পাশাপাশি পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন জানাতে থাকেন, তাঁরাও যেন পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯৫২-এর ১৫ অক্টোবর তিনি উদ্বাস্তুদের কল্যাণ ও অন্যান্য জনকল্যাণকে সামনে রেখে ইউনাইটেড পিপলস অরগানাইজেশন নামের একটি সংগঠন দাঁড় করান। ১৯৫৩ সাল থেকে ভারতের উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে গণসংযোগ বৃদ্ধি করেন। ১৯৫৮-এর ১১ ও ১২ জানুয়ারি বাগজোলাতে অনুষ্ঠিত উদ্বাস্তু সম্মেলনে অন্যান্য উদ্বাস্তু নেতাদের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়। তখন সকলে মিলে দাবি তোলেন, যাতে বাঙালি উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পুনর্বাসিত করা হয়। মার্চ মাসে এই দাবি নিয়ে সত্যাগ্রহের সময়ে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কয়ারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ১৯৫৮-এর জুলাই মাসে তিনি 'পূর্বভারত বাস্তুহারা সংসদ' নামে একটি সংগঠন করে তোলেন এবং এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৬০-এর ৭ই জানুয়ারি উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজনীতি করার অপরাধে তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬২-এ পশ্চিমবঙ্গের সংরক্ষিত দুটি বিধানসভা (হাঁসখালী ও বাগদা) কেন্দ্র থেকে নির্বাচন করে পরাজিত হন। এ সময়ে 'পশ্চিমবঙ্গ কৃষক-প্রজা পরিষদ' নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৬৩-এ দিল্লি গিয়ে আম্বেদকর প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়া বা আরপিআই-এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে ঐ পার্টির পশ্চিমবঙ্গীয় শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর ভারতে আরপিআই-এর একটি নির্বাচনী প্রচারণা শেষ করে ১৯৬৪-এর ৩০শে এপ্রিল কলকাতা পৌঁছামাত্র পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কথা বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৫-এর মাঝামাঝি নাগাদ লকুড় কমিটি নমঃশূদ্র সহ কয়েকটি জাতিকে তফসিলি জাতির তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কথা তুললে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন এবং লকুড় কমিটির চক্রান্ত ঠেকাতে সক্ষম হন। ১৯৬৭-এর সাধারণ নির্বাচনে বামফ্রন্টের সমর্থন নিয়ে আরপিআই-এর প্রার্থী হিসেবে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। মৃত্যু. হেলেঞ্চা, ৫ অক্টোবর ১৯৬৮।

যোগেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৭-১৯৭১)॥ জন্ম. গোসাইরহাট, শরীয়তপুর, ১৮৮৭। শিক্ষাবিদ ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবিশারদ। ঢাকা জুবিলী স্কুল থেকে ১৯০২-এ এন্ট্রান্স, জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯০৪-এ এফ.এ., কুচবিহার কলেজ থেকে ১৯০৬-এ বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৮-এ রসায়নশাস্ত্রে এম.এ. পাস। ১৯০৮-১৯১২ পর্যন্ত ভাগলপুর কলেজে ও ১৯১২-১৯৪৮ পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজে রসায়নের অধ্যাপনা। ১৯৪৭-১৯৪৮ পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ। ১৯৪৮-এ শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ। লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির ফেলো (১৯১১-১৯৭১) ও যুক্তরাষ্ট্রের কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য। ১৯১৪-তে ঢাকায় তৎকর্তৃক আয়ুর্বেদ ঔষধ



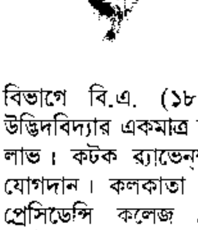
প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান 'সাধনা ঔষধালয়' স্থাপিত। তাঁর গবেষণা, সাধনা ও কর্মোদ্যমের ফলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী আধুনিক মানে উন্নীত। রোগ-ব্যাধির কারণ ও লক্ষণ, আয়ুর্বেদ চিকিৎসার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, আয়ুর্বেদ ঔষধের ব্যবহার পদ্ধতি ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বহু গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থাবলি: অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা, আরোগ্যের পথ, গৃহ-চিকিৎসা, চর্ম ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ও মুখরোগ চিকিৎসা, আমরা কোন পথে? আয়ুর্বেদ ইতিহাস, Whither Bound are We, Home Treatment. মৃত্যু. ১৯৭১-এর ৪ এপ্রিল সাধনা ঔষধালয়ের সদর দফতর (৭১, দীননাথ সেন রোড, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা)-এ নিজ অফিসকক্ষে পাকসেনাদের গুলিতে নিহত।

যোগেশচন্দ্র বাগল (১৯০৩-১৯৭২)॥ জন্ম. মাতুলালয়, কুমিরমারা গ্রাম, পিরোজপুর, ২৭ মে ১৯০৩। পৈতৃক নিবাস চলিশা গ্রাম, পিরোজপুর। লেখক। স্বল্প আয়ের এক কায়স্থ পরিবারে জন্ম। গৃহশিক্ষকতা করে পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহ। স্থানীয়



কদমতলা জর্জ উচ্চ ইংরেজি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯২২), বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ. (১৯২৪) ও কলকাতা সিটি কলেজ থেকে বি.এ. (১৯২৭) পাস। কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসে অধ্যয়ন। ১৯২৮-এ প্রবাসী পত্রিকায় প্রুফরিডার হিসেবে যোগদান। কর্মদক্ষতার পরিচয় প্রদান করলে কিছুকাল পরেই এ পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে নিযুক্তি লাভ। সহকারী সম্পাদকরূপে কয়েক বছর দায়িত্ব পালন। ১৯৩৫-এ দেশ পত্রিকায় যোগদান। ১৯৪১-এ প্রবাসী পত্রিকায় প্রত্যাবর্তন। ১৯৬১-তে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ায় সাংবাদিকতার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। ইতিহাসের গবেষণায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন। উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নবজাগরণের বিস্তৃত ইতিহাস এবং কৃতি বাঙালি সন্তানদের তথ্যসমৃদ্ধ জীবন-চরিত রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা (১৯৪১), রাধাকান্ত দেব (১৯৪২), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪৩), জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত (১৯৪৫), রাজনারায়ণ বসু (১৯৪৫), ভারতের মুক্তিসন্ধানী (১৯৪৭), বাংলার জনশিক্ষা (১৯৪৯), বাংলার স্ত্রীশিক্ষা (১৯৫০), জাতীয় আন্দোলনে বাঙ্গালী (১৯৫৪), বরণীয় (১৯৫৯), বিদ্যাসাগর পরিচয় (১৯৫৯), জাগৃতি ও জাতীয়তা (১৯৬০), বেথুন সোসাইটি (১৯৬১), মুক্তির সন্ধানে ভারত (১৯৭২) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ। শিশুসাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক। সাহসীর জয়যাত্রা (১৯৩৮), জগৎ কোন্ পথে (১৯৪০), জাতির বরণীয় যাঁরা (১৯৪৩), মার্কিন জাতির কর্মবীর (১৯৪১), বীরত্বের রাজটীকা (১৯৪৩), সংকল্প ও সাধনা (১৯৫০), বিদ্যার্থী মনীষী যাঁরা (১৯৬০) প্রভৃতি তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ। সম্পাদনা– ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য (১৯৪৩), বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড-১৯৫৩ ও ২য় খণ্ড-১৯৫৪), রমেশ রচনাবলী (১৯৬০)। গবেষণা কর্মের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক 'রামপ্রাণ গুপ্ত' পুরস্কার (১৩৫৬) প্রদান। সরোজিনী বোস স্মৃতি পুরস্কার (১৯৬২) ও শিশির কুমার পুরস্কার (১৯৬৬) লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ১৯৭২।

যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬)॥ জন্ম. হুগলী জেলার দিগড়া গ্রাম, ২০ অক্টোবর ১৮৫৯। বহুতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিত। কিছুকাল বাঁকুড়া জেলা স্কুলে অধ্যয়ন। বর্ধমান রাজস্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৭৮), বৃত্তিসহ এফ. এ., হুগলী কলেজ থেকে প্রথম



বিভাগে বি.এ. (১৮৮২) পাস। ১৮৮৩-তে উদ্ভিদবিদ্যার একমাত্র ছাত্র হিসেবে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজে উপাধ্যায়রূপে যোগদান। কলকাতা মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটানা ৩৬ বছর অধ্যাপনার পর ১৯১৯-এ অবসরগ্রহণ। ১৯২০-এ বাঁকুড়ায় গিয়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানে বসবাস। 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়ে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষদের একজন বিশিষ্ট সভ্য, কিছুকাল এর সহসভাপতি ছিলেন। এ ছাড়া বিজ্ঞান পরিষদ, উদ্ভিদবিদ্যা পরিষদ ও উৎকল সাহিত্য সমাজের সভ্য ছিলেন। 'বাশুলী চণ্ডীদাস' নামক পুঁথি আবিষ্কার করে খ্যাতিমান হন। বাংলা বানানে দ্বিত্ব বর্জন রীতির প্রচলন করেন। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ডক্টরেট। সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: বাঙলা শব্দকোষ (১ম-৪র্থ খণ্ড), সিদ্ধান্ত দর্পণ (১৮৯৯), আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ (১৯০৩), বাঙলা ভাষা (১৯০৮-১৯১৫), বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল (১৯৫৪), পূজাপার্বণ, পত্রালী (২ খণ্ড), রত্ন পরীক্ষা, শঙ্কু নির্মাণ, চণ্ডীদাস চরিত ও Ancient Indian Life (১৯৪৮)। পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১০-এ পুরীর পণ্ডিত সভা কর্তৃক 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৫৬-র ১৭ এপ্রিল বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে বিশেষ সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ। Ancient Indian Life গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার, 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও সরোজিনী পদকও পান। মৃত্যু. ৩০ জুলাই ১৯৫৬।

যোগেশচন্দ্র সিংহ (১৮৯০-১৯৭৯)॥ জন্ম. সাধনপুর, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ১৮৯০। সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ। ১৯১০-এ পটিয়া হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বঙ্কিম পদকপ্রাপ্ত হয়ে ইন্টারমিডিয়েট, ইংরেজিতে অনার্সসহ



বি.এ. এবং প্রথম শ্রেণি অধিকার করে এম.এ. পাস। ১৯১৮-তে চট্টগ্রাম কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। পরবর্তীকালে সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৯৪৮-এ সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯৪৯-এ পুনরায় সরকারি কলেজের অধ্যক্ষরূপে যোগদান। চট্টগ্রাম নৈশ কলেজ ও চট্টগ্রাম মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষরূপে তিন বছর দায়িত্ব পালন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ, রাসলীলা, পরমহংস অদ্বৈতানন্দ, মাতৃপ্রশস্তি, দুর্গাপূজার নবপত্রিকা তত্ত্ব, সরস্বতীতত্ত্ব, সীতাকালী। মৃত্যু. ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯।

যোগেশ ব্রহ্মচারী (১৮৯৫-?)॥ জন্ম. নয়াপাড়া, গুজড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম, ১৮৯৫। ছাত্র থাকাকালে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান। ১৯২০-এ এম.এ. পাস। জামির আলী ফকির ছদ্মনামে অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। এমন কি জামির আলী নামে জাহাজের খালাসি হয়ে লন্ডন গমন। সেখানে যোসেফ নাম গ্রহণ। ১৯২২-এর ১ এপ্রিল লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১৯২৩-এ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। শেষ জীবনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: তোমার হাতে আমার বীণা। সম্পাদনা: গীতা। মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

রউফ॥ জন্ম. ভাটপাড়া গ্রাম, সিলেট। গীত রচয়িতা ও সংগীতশিল্পী। পুরো নাম আবদুর রউফ চৌধুরী। 'রউফ' নামে সমধিক পরিচিত। গান রচয়িতা, সুরকার ও সংগীতশিল্পী হিসেবে খ্যাত। তাঁর গানের মূল সুর বিচ্ছেদ। গানে বাউল সুরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত। ১৯১২-এ স্ত্রীর মৃত্যুর পর 'বিচ্ছেদ সংগীত' নামে একটি কবিতাগ্রন্থ রচনা। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

রওশন ইজদানী (১৯১৮-১৯৬৭)॥ জন্ম. বিদ্যাবল্লভ গ্রাম, ময়মনসিংহ, ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ (১৫ ফাল্গুন-১৩২৪)। কবি। পিতা শেখ আলী কবিরের পেশা ছিল কবিরাজি চিকিৎসা। বাল্যকালে পিতার মৃত্যু। ওল্ড স্কিম মাদ্রাসায় বিদ্যাশিক্ষার



হাতেখড়ি। পরে আশুজিয়া হাই স্কুলে ভর্তি। এ স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। মাতৃবিয়োগের পর উদাসীন হয়ে বাউলদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং বাউল গান গেয়ে সময় কাটান। কিছুকাল পর জুবায়দা আখতার খাতুনকে বিবাহ করে সংসার-ধর্মে প্রত্যাবর্তন (১৯৩৯)। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার কর্ম গ্রহণ। কিছুকাল পর ঋণ সালিসি বোর্ডের কেরানির চাকরিতে যোগদান। ১৯৪৮-এ 'দৈনিক আজাদের' রিডিং

সেকশনের প্রুফ রিডার, গ্রেড-১ পদে যোগদান। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ১৯৫৯-এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। সরকারি ভাতা লাভ। পল্লীকবি হিসেবে খ্যাত। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি তাঁর কবিতায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। 'চিনুবিবি' (১৯৫১) রওশন ইজদানীর একখানি বিখ্যাত পল্লীকাব্য। হযরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনীমূলক কাব্য 'খাতামূন নবীঈন' (১৯৬০) তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্য। লোকসাহিত্যের গবেষক ও সংগ্রাহক হিসেবেও পরিচিত। 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য' (১৯৫১) ও 'পূর্ব-পাকিস্তানের লোকসাহিত্য' (১৯৬৬) তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ। মতাদর্শের ক্ষেত্রে ইসলামি ভাবধারার অনুসারী। মৃত্যু. বিদ্যাবল্লভ, ২০ জুন ১৯৬৭।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)॥ জন্ম. মাতুলালয়, বাকুলিয়া গ্রাম, বর্ধমান, ১৮২৭। কবি। আট বছর বয়সে পিতা রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু। মাতুলালয়ে লালিত-পালিত। বাকুলিয়া পাঠশালা ও স্থানীয় মিশনারি স্কুলের পাঠ শেষ করে হুগলী মহসিন কলেজে ভর্তি। পাঠদশায় রাখাল দাসী দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৮৪১)। বিবাহের দুই বছর পর মাতৃবিয়োগ। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কলেজের পাঠ ত্যাগ (১৮৪৩)। কলকাতায় আগমন। সংবাদ সাগর (১৮৫২) ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ (১৮৫৬) পত্রিকা সম্পাদনা। এডুকেশন গেজেট (১৮৫৬) পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন। ১৮৬০-এ কিছুকাল কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা। একই বছর ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসার ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত। কালক্রমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত। দীর্ঘকাল কটকে এ পদে দায়িত্ব পালন। এখানে প্রবাসকালে 'উৎকল দর্পণ' নামে একখানি উড়িয়া সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা। ১৮৮২-তে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ইংরেজি প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। দেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত করার কবি হিসেবে খ্যাত তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যের 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' স্তবকটি দেশাত্মবোধের এক শাশ্বত বাণী বিশেষ। বাংলা সাহিত্যে এরূপ নির্মল দেশাত্মবোধক ও বীররসাত্মক পদ্য রচনার প্রথম কৃতিত্ব তাঁর। রচিত কবিতাগ্রন্থ: 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮), 'নীতি কুসুমাঞ্জলি' (১৮৭২) ও 'কাঞ্চী কাবেরী' (১৮৭৯)। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্য। ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্স-রস ও দেশপ্রেমের ভাবধারায় উনিশ শতকে ইতিহাসাশ্রিত যে আখ্যান কাব্য রচনার ধারা প্রবাহিত হয়, তার প্রারম্ভিক নিদর্শন এ কাব্যখানি। টডের 'অ্যানালস অফ রাজস্থানের' আখ্যান অবলম্বন করে এটি রচিত। মৃত্যু. ১৩ মে, ১৮৮৭।



রজতনাথ নন্দী (১৯০১-১৯৭৫)॥ জন্ম, কুমিল্লা, ১৯০১। পৈতৃক নিবাস কালীকচ্ছ, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পিতা রজনীনাথ নন্দী ছিলেন আইনজীবী, স্বদেশী আন্দোলনের নেতা, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক। কুমিল্লা শহরে যে ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মমন্দির গড়ে ওঠেছে তাতে রজতনাথ নন্দীর প্রধান ভূমিকা ছিল। উনিশ শতকের জাগরণের প্রভাবে কুমিল্লা শহরে সংবাদপত্র প্রকাশনা শুরু হয়। পরই ধারাবাহিকতায় রজতনাথ নন্দী 'প্রতিনিধি' নামে সাপ্তহিক পত্রিকা পরিচালনা করেন ১৯০৩-এ। পত্রিকাটি মূলত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক। স্থানীয় পত্রিকা হিসেবে এটি পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি ছিলেন বিভিন্ন সংবাদসংস্থা ও সংবাদপত্রের স্থানীয় সংবাদদাতা, বিশেষ প্রতিনিধি ও সহ-সম্পাদক। সংবাদপত্রের মধ্যে আনন্দ বাজার, অবজারভার, মর্নিং নিউজ, পাকিস্তান টাইমস, স্টেটসম্যান প্রভৃতি। সংবাদ সংস্থার মধ্যে ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (ইউপিআই), পিটিআই, এপি, ইটাপিপি, বিপিআই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩১-এ শান্তি সুনীতি কর্তৃক জেলা ম্যাজিস্টেট স্টিভেন্স হত্যা, ১৯৩২-এ হাসনাবাদ কৃষক বিদ্রোহ, বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় সংবাদ প্রেরণের মাধ্যমে কুমিল্লা



অঞ্চলের জনমত ও প্রতিবাদী সংস্কৃতির চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন নিরলসভাবে। অকৃতদার এই মানুষটি আদর্শে ছিলেন অবিচল, আপসহীন এবং উদারনৈতিক। মৃত্যু. কুমিল্লা, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৫।

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)॥ জন্ম. ভাঙাবাড়ি গ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ২৬ জুলাই, ১৮৬৫। গীতিকার, কবি ও সংগীতশিল্পী। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন একজন দক্ষ সংগীতজ্ঞ, 'পদচিন্তামণি' নামক কীর্তন গ্রন্থ ও 'অভয়াবিহার' নামক গীতিকাব্যের রচয়িতা। পিতার কাছে শৈশবকালে সংগীত অনুশীলন। রাজশাহীতে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ। কুচবিহার জেনকিন্স স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৮৩), রাজশাহী কলেজ থেকে এফ.এ. ও কলকাতা সিটি কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৮৯১-তে বি.এল. পাস করে রাজশাহী আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। কিছুদিন নাটোর ও নওগাঁয় অস্থায়ী মুন্সেফ হিসেবে দায়িত্ব পালন। সংগীত রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান। স্বরচিত গানের সুকণ্ঠ গায়ক। তাঁর গান বিষয়বস্তু অনুযায়ী চার ভাগে বিভক্ত: ১. দেশাত্মবোধক গান, ২. ভক্তিমূলক গান, ৩. প্রীতিমূলক গান ও ৪. হাস্যরসের গান। রজনীকান্তের দেশাত্মবোধক গানের আবেদন ব্যাপক। স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) চলাকালে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই' গানটি রচনা করে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি। কবি হিসেবেও খ্যাত। নির্মল আবেগ ও কোমল সুরের ব্যঞ্জনায় তাঁর গান ও কবিতা সমৃদ্ধ। তাঁর রচিত 'বাণী' (১৯০২), 'কল্যাণী' (১৯০৫), 'অভয়া' (১৯১০) 'অমৃত' (১৯১০), 'আনন্দময়ী' (১৯১০), 'বিশ্রাম' (১৯১০), 'সদ্ভাবকুসুম' (১৯১৩) ও 'শেষদান' (১৯২৭) এই আটটি কবিতাগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই গীত। 'বাণী' ও 'কল্যাণী' রজনীকান্তের বিশিষ্ট গানের সঞ্চয়ন। কান্ত কবি নামেও পরিচিত। মৃত্যু. ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০।



রজনীরঞ্জন সেন (১৮৬৭-১৯৩)॥ জন্ম. নয়াপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম, ১৮৬৭। সাহিত্যিক। পেশায় আইনজীবী।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থটি Triump of Valmiki নামে ইংরেজিতে অনুবাদ। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: Cosmic Dust, Holy City of Benaras। মৃত্যু. ১৯৩৫।

রণদাপ্রসাদ সাহা (১৮৯৬-১৯৭১)॥ জন্ম. শিমুলিয়া, ঢাকা, ১৬ নভেম্বর ১৮৯৬। সমাজসেবক, দানবীর। সাধারণ্যে আর পি সাহা নামেই বেশি পরিচিত। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত মীর্জাপুর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। তাঁর পিতার আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। রণদাপ্রসাদের বয়স যখন সাত বছর তখন তাঁর মা সন্তান প্রসবকালে ধনুষ্টংকারে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। পিতা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করলে গৃহত্যাগ। চৌদ্দ বছর বয়সে কলকাতায় গমন এবং বিপ্লবী দলে যোগদান। কয়েকবার গ্রেফতার বরণ। কলকাতায় মুটের কাজ থেকে শুরু করে নানারকম কাজ সম্পাদন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময়ে ব্রিটিশ-বেঙ্গল সেনা মেডিক্যাল কোরে যোগ দিয়ে মেসোপটেমিয়ায় (বর্তমান ইরাক) গমন। সেখানে অসাধারণ কর্মনৈপুণ্যের জন্য সদ্য প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল রেজিমেন্টে কমিশন লাভ। পরে সেনাবাহিনী ত্যাগ এবং রেলওয়েতে নিম্নমানের চাকরিতে বহাল। চাকরিতে ইস্তফা দান এবং সঞ্চিত অর্থ দিয়ে শেয়ার ইন্ডাস্ট্রিজের মাধ্যমে গৃহে গৃহে কয়লা সরবরাহের ব্যবসায় শুরু। পরবর্তী চার বছরে কলকাতায় একজন বিশিষ্ট কয়লা ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। এ সময়ে The Bengal River Service Company নামে নৌ-পরিবহন সংস্থা ও নৌ-পরিবহন বীমা কোম্পানি স্থাপন। ১৯৩৮-এ নিজ গ্রাম মীর্জাপুরে কুড়ি শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালসহ ডিসপেন্সারি এবং দুশো ছাত্রীর থাকা ও পড়াশোনা করার মত আবাসিক স্কুল স্থাপনের কাজ শুরু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পর সরকারের ক্লিয়ারিং এজেন্ট, শ্রমিক কন্ট্রাক্টর এবং স্টোরিং এজেন্ট হিসেবে কর্ম সম্পাদন। এ সময়ে নারায়ণগঞ্জে পাট প্রক্রিয়াজাত করার জন্য জর্জ এন্ডারসনের কাছ থেকে জুট প্রেসিং বিজনেস এবং গোডাউন ফর জুট স্টোরিং ক্রয়। এ সমস্ত এন্টারপ্রাইজ থেকে



প্রাপ্ত সমুদয় লভ্যাংশ গরিবদের কল্যাণার্থে ব্যয় করার নিমিত্ত ১৯৪৭-এ 'কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অফ বেঙ্গল লিমিটেড' নামক একটি অলাভজনক প্রাইভেট কোম্পানি রেজিস্টার্ড করেন মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে মীর্জাপুরে ডিগ্রি মহিলা কলেজ 'কুমুদিনী মহিলা কলেজ' প্রতিষ্ঠা। পিতার নামে মানিকগঞ্জে 'দেবেন্দ্র কলেজ' স্থাপন। বাংলার দুর্ভিক্ষের সময়ে (১৯৪৩) রেডক্রস সোসাইটিকে এককালীন তিন লক্ষ টাকা দান এবং ক্ষুধার্তদের জন্য চার মাসব্যাপী সারাদেশে দুইশো পঞ্চাশটি ফ্রি-কিচেন খোলা রাখেন। মীর্জাপুরে অবস্থিত ভারতেশ্বরী হোমস, কুমুদিনী হাসপাতাল, কুমুদিনী কলেজ তাঁর প্রধান কীর্তি। মৃত্যু. ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক নিহত, ১৭ মে ১৯৭১।

রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭)॥ জন্ম. ডিব্রুগড়, আসাম, ১৫ জানুয়ারি, ১৯১২। পিতা অপূর্বরত্ন দাশগুপ্ত, মাতা ইন্দুপ্রভা সেন। ১৯১২ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত পিতার কর্মস্থল রাঁচিতে বাস। ১৯১৭-এ পিতৃব্য নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের কর্মস্থল পুরুলিয়ায় বাস ও রামপদ পণ্ডিতের



পাঠশালায় ভর্তি। ১৯১৯-এ পিতার কাছে রাঁচিতে ফিরে আসা। ১৯২১-এ রাঁচি জেলাস্কুলে পড়ার সময় বিপবী হরিপদ দে'র সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী আদর্শের সঙ্গে পরিচয়। ১৯২৯-এ মেট্রিক পাস ও বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ভর্তি। ছাত্রাবাসে থাকাকালে 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগদান। ছাত্র-ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেয়া ও ব্রিটিশ পতাকা অবমাননার জন্য ১৯৩০-এ কলেজ থেকে বহিষ্কার; কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি এবং রামমোহন রায় হোস্টেলে অবস্থান পরের বছর আই.এসসি. পাস। ১৯৩২-এ রাজনীতি থেকে দূরে রাখার চেষ্টায় নিকটাত্মীয় জীবনানন্দ দাশের পৈতৃক বাড়ি বরিশালের সর্বানন্দ ভবনে স্থানান্তর ও ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজিতে অনার্সসহ স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি। বরিশালে 'জাগরণী গোষ্ঠী' নামের বিপ্লবী গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা। ১৯৩৪-এ পিতার অকাল পঙ্গুত্বের কারণে লেখাপড়া বন্ধ, পঙ্গু পিতাসহ পরিবারের সদস্যদের ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে স্থানান্তর। ১৯৩৮-এ পিতার মৃত্যু। ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে কর্মগ্রহণ এবং নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত 'সোনার বাংলা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান। এ সময় ব্যাংক ও ইনসিওরেন্স কোম্পানির লোকদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা। ১৯৪০-এ ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন ও সাহিত্য সংকলন 'ক্রান্তি' প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ। ১৯৪২-'৪৩-এ ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-বিরোধী ভূমিকা পালন; 'প্রতিরোধ পাবলিশার্স' প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৮-এর ১০ ও ১১ মার্চ বাংলা ভাষার পক্ষে প্রচারণা, গ্রেফতার ও কয়েকদিন পর মুক্তি। পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি পুনর্গঠনে ভূমিকা গ্রহণ। ৩০শে জুন করোনেশন পার্কে পার্টির সভায় বক্তৃতা, ৭ জুলাই আটক এবং বিনা বিচারে কারাগারে প্রেরণ। ১৯৪৯-এ কারাগারে তাঁর নেতৃত্বে রাজবন্দিদের সাংস্কৃতিক কর্ম আরম্ভ এবং মর্যাদার দাবিতে দুইবার অনশন। তৃতীয়বার অনশনের পর তাঁর বিরুদ্ধে পৃথক মামলার শিকার। চতুর্থবার অনশনের পর সরকার কর্তৃক কিছু দাবি মানা। ১৯৫০-এ ঢাকায় প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হলে পরিবারের মা ও ভাইবোনদের কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ। জেলে সাংস্কৃতিক, বিপ্লবী ও পাকিস্তান-বিরোধী কর্মের দায়ে তাঁকে বারবার জেলবদল। ১৯৫২-এ রাজশাহী জেলে থাকা অবস্থায় উর্দু ভাষাচর্চা আরম্ভ। ১৯৫৩-এ ঢাকা জেলে তাঁর অনুরোধে মুনীর চৌধুরী কর্তৃক 'কবর' নাটক রচনা এবং জেলে মঞ্চায়ন। ১৯৫৫-এ 'প্রাদেশিক জননিরাপত্তা আইন' বাতিল ও সাড়ে সাত বছর পর কারামুক্তি। 'রেজা' ছদ্মনামে আত্মগোপন এবং ঢাকায় গোপনে বিপ্লবী কর্মচালনা। ১৯৫৭-এ ঢাকার শাঁখারিবাজার-তাঁতিবাজার-ইসলামপুর এলাকা থেকে মুসলিম লিগ প্রার্থীকে হারিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচিত। ১৯৫৮-এ 'দৈনিক সংবাদ'-এ সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান। ১৯৬২-এ সামরিক আদেশ বলে গ্রেফতার, পরের বছর মুক্তি; ১৯৬৫-তে আবার গ্রেফতার, ১৯৬৮-এ মুক্তি। জেলে বসেই সাহিত্য-সমালোচনামূলক গ্রন্থ রচনা এবং বাংলাদেশে মার্ক্সীয় সাহিত্য-সমালোচনায় নতুনধারাপাত। ১৯৬৯-এ এ দেশে 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার' সম্পাদনা করার মাধ্যমে জীবনানন্দচর্চার নবোন্মোচন। মুক্তিযুদ্ধকালে

প্রগতিশীল লেখকশিল্পীদের সংগঠিত করার জন্য প্রথমে আগরতলা পরে কলকাতায় গমন। বেতার-কথিকা, বক্তৃতা, লেখা এবং জনমত সংগ্রহের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করা। মুক্তিযুদ্ধ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন এবং 'দৈনিক সংবাদ'-এ কর্ম অব্যাহত রাখা। ১৯৭৫-এ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে কলকাতায় গমন। চিরকুমার-জীবনে থাকা-খাওয়ার অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতীয় ভাতা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। গ্রন্থাবলি: উপন্যাসের শিল্পরূপ (১৯৫৯), শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে (১৯৬৬), ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম (১৯৭০), আলো দিয়ে আলো জ্বালা (১৯৭০), আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (১৯৮৬), সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ (১৯৮৮), মুক্তি ধারা (১৯৮৯), সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা: আত্মজিজ্ঞাসা (১৯৯৪); গল্পগ্রন্থ: রহমান মাস্টারের মা ও অন্যান্য গল্প (১৯৮৪); সম্পাদনা: জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার (১৯৬৯), সুকান্ত সমগ্র (১৯৭০), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন (১৯৭৫); অনুবাদ: ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা (১৯৬৯), গোর্কি মায়াকোভস্কি নেরুদার কবিতা (১৯৭৩); কলামগ্রন্থ: মনে মনে (১৯৮৭)। মৃত্যু: কলকাতা, ৪ নভেম্বর, ১৯৯৭, ৬ নভেম্বর মরদেহ ঢাকায় আনয়ন ও শেষকৃত্য সম্পন্ন।

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী (১৯২১-১৯৮৮)॥ জন্ম. দক্ষিণ বালুচর গ্রাম, পালং, শরীয়তপুর, ২৬ ডিসেম্বর ১৯২১। লেখক। জমিদার পরিবারে জন্ম। তুলাসার গুরুদাস স্কুল থেকে মেট্রিক পাস (১৯৩৯)। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ভবনে ভর্তি। সেখান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস (১৯৪১)। কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে বি.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। ছাত্রজীবনেই ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। অনুশীলন দলের সদস্য। ১৯৪৩-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। পরের বছর পার্টির ফরিদপুর জেলা সংগঠকের পদ লাভ (১৯৪৪)। ১৯৪৭-এ পার্টির ফরিদপুর জেলা কমিটির সদস্য হন। পার্টির সদস্যা বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৪৮-১৯৫০ পর্যন্ত কলকাতায় বাস। দেশে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ। পালং স্কুলে শিক্ষকতার কর্মে যোগদান (১৯৫০)। ১৯৫৪-তে পালং তুলাসার গুরুদাস স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত। ১৯৫৭-তে পালং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। একটানা ছাব্বিশ বছর এ পদে দায়িত্ব পালন (১৯৫৭-১৯৮৩)। পালং তুলাসার গুরুদাস স্কুলের মাঠে সপ্তাহব্যাপী এক আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠান (মার্চ ১৯৫৭)। ১৯৬১-তে 'ঢাকা দক্ষিণ-পূর্ব রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পরিষদ' গঠন। ইস্টবেঙ্গল ইনস্টিটিউশনে (সদরঘাট, ঢাকা) অনুষ্ঠিত পরিষদের এ উৎসবে নেতৃত্ব প্রদান। ১৯৭১-এ পালং থানায় মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। বাঙালি সংস্কৃতির একজন নিষ্ঠাবান সেবক। সংস্কারমুক্ত উদার মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে খ্যাত। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। কবিগান, জারিগান, মুর্শিদি, ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া গান জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। 'পূর্বাপর' (১৯৬৮) তাঁর প্রকাশিত একমাত্র কবিতাগ্রন্থ। 'রবীন্দ্র-তরুমূলে' (১৯৮৮) তাঁর রচিত একখানি সরস স্মৃতিকথা। 'ঝরাপাতা' (১৯৮৮) রথীন্দ্রকান্ত ঘটকের গল্পগ্রন্থ। মৃত্যু. সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল (ঢাকা), ১৫ জুন ১৯৮৮।



রফিকউদ্দিন আহমদ (১৯২৬-১৯৫২)॥ জন্ম. পারিল বলধারা গ্রাম, সিংগাইর-মানিকগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর, ১৯২৬। ভাষা শহীদ। পিতা আবদুল লতিফ ছিলেন ঢাকার বাদামতলীস্থ কমার্শিয়াল প্রেসের মালিক। স্থানীয় বায়রা স্কুল থেকে মেট্রিক পাস (১৯৪৯)। মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্রনাথ কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি। এই কলেজে আই. কম. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। কলেজের পাঠ ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন এবং পিতার সঙ্গে থেকে কমার্শিয়াল প্রেস পরিচালনা। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সরকারের ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার



বিক্ষোভ প্রদর্শন। রফিকউদ্দিনের এই বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের হোস্টেল প্রাঙ্গণে মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালালে সে গুলি রফিকউদ্দিনের মাথায় লাগে এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। পুলিশ কর্তৃক তাঁর লাশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নীত এবং সেদিন রাত তিনটায় সামরিক বাহিনীর প্রহরায় ঢাকার আজিমপুর গোরস্তানে তাঁর লাশের দাফন। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের অমর শহীদ। রফিকউদ্দিন ও অন্যান্য ভাষা শহীদের আত্মত্যাগের ফলেই বাংলাভাষার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ (১৯৫৬)। তাঁর শহীদ স্মৃতি উত্তরকালে পূর্ববঙ্গবাসীদের মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এবং এই চেতনার ভিত্তিতেই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা লাভ (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)। মৃত্যু. ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

রফিকুল ইসলাম (১৯৩৬-১৯৭১)॥ জন্ম. উত্তর বগুড়া রোড, বরিশাল, ১৯৩৬। ১৯৫১-তে মেট্রিক পাস করে ঢাকা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি। কিছুকাল পর উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ। ১৯৬৩-তে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ. ও ১৯৬৫-তে বি.এ. এবং ১৯৬৭-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাস। কুষ্টিয়া জেলার দর্শনা কলেজে বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনা। কলেজ জীবনে বরিশাল শিল্পী সংসদ, খেলাঘর, মুকুল ফৌজ, বরিশাল সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও বরিশাল প্রেসক্লাব-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইত্তেফাকের বরিশাল জেলার সংবাদদাতা ও বরিশাল জেলা সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ছাত্রসংসদের নাট্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন, ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৪-র গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ১৯৬৬-র ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলন এবং ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাঁর রচিত কবিতা 'নূতন সাহিত্য', 'চতুরঙ্গ' এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১-এর ২৯ জুলাই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গুলিতে নিহত।

রবার্ট এরিক্ মর্টমার হুইলার (১৮৯০-১৯৭৬)॥



জন্ম. যুক্তরাজ্যের এডিনবরায়, ১৮৯০। শিল্পকলাবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও অধ্যাপক। লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে শিক্ষা লাভ এবং ডি.লিট. উপাধি প্রাপ্ত। শ্রম ও সাধনায় শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন। প্রথম মহাযুদ্ধে রাজকীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান। পরবর্তীকালে ওয়েল্স বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও ওয়েলস্ জাতীয় সংগ্রহশালার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অবধায়ক পদে বৃত ১৯২০ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত, ১৯২৫-১৯২৬-এ এর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত। পরে যথাক্রমে লন্ডন যাদুঘরের অবধায়ক ও সম্পাদক (১৯২৬-১৯৪৪) ও তৎসঙ্গে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রিটিশ পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক (১৯৩৪-১৯৪৪)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীতে লেফটেন্যান্ট-কর্নেলরূপে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ৮ম বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত। ১৯৪৪-এ ৪ বছরের জন্য ভারতবর্ষে আগমন এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে নতুনভাবে খননকার্য পরিচালনা ও অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার তাঁর অসামান্য কীর্তি। ১৯৪৮-১৯৫০ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের উপদেষ্টারূপে কর্মরত। ১৯৫০-এ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর দীর্ঘকাল লন্ডন ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। ১৯৫২-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট'-এ অধ্যাপনা। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ইতিহাসে হুইলারের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান, ব্রিটেন ও ফ্রান্সে বহু জায়গায় খননকার্য পরিচালনা করেছিলেন। প্রধান রচনা: Harappa (১৯৪৭), Mohenjodaro (১৯৫২), Archeology from Earth (১৯৫৪) The Indus Civilization (১৯৫৩), Civilization of the Indus Valley and Beyond (১৯৬৬) ইত্যাদি। মৃত্যু. লন্ডন, ২২ জুলাই ১৯৭৬।

রবি নিয়োগী (১৯০৯–২০০২)॥ জন্ম. গরুহাটি গ্রাম, শেরপুর, ২৯ এপ্রিল ১৯০৯। প্রকৃত নাম

রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী। পিতা রমেশচন্দ্র নিয়োগী ও



মাতা সুরবালা নিয়োগী। জোতদার পরিবার। ১৯২৬-এ শেরপুরের গোবিন্দকুমার পিস্ মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ময়মনসিংহে আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি। ছাত্রাবাসে থাকাকালে ধীরেন সেনের আখড়ায় ডন-কুস্তি শেখার সময় বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে জড়িত। ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে ১৯২৭-এ আনন্দমোহন কলেজ থেকে বহিষ্কার; কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি। কলকাতায় বিপ্লবী সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, জীবন চ্যাটার্জি প্রমুখের সংস্পর্শে আন্দোলনে সম্পৃক্ত। লেখাপড়া অসমাপ্ত। ১৯২৯-এ শেরপুরে ফিরে আসা এবং আইন অমান্য আন্দোলনের অংশগ্রহণ ও অন্তরীণ। মুক্তি পেয়ে ১৯৩০-এ শেরপুর-জামালপুর গুদারাঘাটে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধ। সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড। ১৯৩৩-এ বিপজ্জনক বন্দি হিসেবে আন্দামানে প্রেরণ। ব্রিটিশ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ আমল মিলিয়ে চৌত্রিশ বছরের কারাবাস। আন্দামান জেলে মার্কসবাদে দীক্ষিত। আন্দামানে গঠিত কমিউনিস্ট কনসলিডেশনের অন্যতম সদস্য। ১৯৩৬-এ আন্দামান থেকে কলকাতা আলিপুর ও ময়মনসিংহ জেলে প্রেরণ, পরে মুক্তি। ১৯৩৮-এ কংগ্রেস সভাপতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু শেরপুর এলে বামপন্থী ও উদার কংগ্রেসিদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভার সভাপতি। সে বছরই মণি সিংহ, খোকা রায়, নগেন সরকার, আলতাব আলি প্রমুখের সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনে আত্মনিয়োগ এবং ময়মনসিংহ জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। পাকিস্তান আমলের চব্বিশ বছরের মধ্যে বিশ বছরই জেল বা অন্তরীণ-জীবন। ১৯৫৩-এ জেল থেকে মুক্তি পেয়েই শেরপুরের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ ও পরের বছর প্রতিষ্ঠা। তাঁর অনুরোধে জমিদান করেন ক্ষিতি ধর। ১৯৫৪-এ যুক্তফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকাগ্রহণ। ১৯৫৮-এ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ছিলেন ঢাকা জেলে। ১৯৬৬-এ রবি নিয়োগী যখন জেলে বন্দি, বঙ্গবন্ধু শেরপুর সফরকালে রবি নিয়োগীর বাড়ি গিয়ে তাঁর স্ত্রী জ্যোৎস্না নিয়োগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জ্যোৎস্না নিয়োগীও বিপ্লবী। জ্যোৎস্না-রবি নিয়োগীর বিয়ে হয় ১৯৪১-এ। জীবনের বিভিন্ন সময় মোট সাত বছর জ্যোৎস্না নিয়োগী কারান্তরালে ছিলেন। তাঁদের প্রথম সন্তান কারাগারে ভূমিষ্ঠ হয়। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, বিশেষ করে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন। উত্তরাঞ্চলের ডালু, শিবগঞ্জ, শ্রীবর্দি, নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, মহেন্দ্রগঞ্জ সীমান্তের বিভিন্ন ক্যাম্পে সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ। ময়মনসিংহ জেলায় বিভিন্ন সময় সংগঠিত টঙ্ক, ভাওয়ালি, নানকার, তেভাগা প্রভৃতি কৃষক আন্দোলনের সংগঠক। কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে কখনো ন্যাপে, কখনো একতা পার্টিতে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাকশালে যোগদান। বঙ্গবন্ধুহত্যার পর গ্রেফতারবরণ ও ১৯৭৭-এ মুক্তিলাভ। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসেবে আমৃত্যু কর্মকাণ্ড পরিচালনা। মৃত্যু. শেরপুর, ১০ মে, ২০০২।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)॥ জন্ম. কলকাতায়



জোড়াসাঁকোতে সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারে, জমিদার বংশে, ৭ মে ১৮৬১ (২৫ জানুয়ারি ১২৬৮ বঙ্গাব্দ)। বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা: কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, সংগীত রচয়িতা, সুরস্রষ্টা, গায়ক, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ বাবা-মা'র চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র। প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি স্বগৃহে বিভিন্ন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে; পরে যথাক্রমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি স্কুল এবং সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। কিন্তু পড়াশুনা কোথাও ভালো এগোয়নি। স্কুলের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকায় শেষ পর্যন্ত বাড়িতেই পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়, অত্যন্ত পড়ুয়া ও মেধাবী ছিলেন বলে স্বশিক্ষিত ব্যক্তিমনীষার

চূড়ান্ত উদাহরণ বাঙালি জাতির সম্মুখে রেখে যেতে পেরেছেন। কবিতা রচনার সূত্রপাত আট বছর বয়সে, তেরো বছর বয়সে তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় 'অমৃত বাজার' নামে দ্বিভাষিক একটি পত্রিকায় (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কবিকে প্রথম ইংল্যান্ডে পাঠানো হয় ১৮৭৮-এ, সেখানে তিনি প্রথমে ব্রাইটনে কিছুদিন ও পরে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যাপক হেনরি মর্লির কাছে মাস তিনেক ইংরেজি সাহিত্য পড়েছিলেন; তাঁর শিক্ষা শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়নি পিতৃনির্দেশে দেশে ফিরে আসার জন্য। দেড় বছর বিলেতে কাটিয়ে দেশে ফিরে আসেন ১৮৮০-র ফেব্রুয়ারি মাসে। ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য দ্বিতীয়বার বিলেতযাত্রা ১৮৮১-র ২২ এপ্রিল, কিন্তু মাদ্রাজ থেকেই ফিরে আসেন শেষ পর্যন্ত। বিলেত যাত্রার পূর্বেই 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় 'বনফুল' এবং 'ভারতী' পত্রিকায় 'কবি-কাহিনী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। 'ভারতী' পত্রিকা বেরিয়েছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ি থেকেই; তাঁর আরো অনেক কবিতা এখানে প্রকাশিত হয়েছিল। বিলেতে বসবাসকালে এই পত্রিকাতেই তাঁর পত্রগুচ্ছ বেরুতে থাকে 'য়ুরোপ প্রবাসী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে। পরবর্তী বছরে তাঁর তিনটি বই বেরোয়; 'ভগ্ন হৃদয়' গীতিকাব্য ও 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকা এবং পূর্বোল্লোখিত পত্রাবলী গ্রন্থাকারে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামে। ঠাকুরবাড়িতে তখন সংগীতের আবহাওয়া, রবীন্দ্রনাথের নিজের কণ্ঠস্বরও ভালো ছিল। এই পরিবেশের অনুপ্রেরণায় 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্য লিখে ফেলেন (১৮৮১) এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে তা অভিনীত হয়; কবি অভিনয় করেন বাল্মীকির ভূমিকায়, আর তাঁর সেজো ভাই হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা সরস্বতীর ভূমিকায়। 'কাল-মৃগয়া' গীতিনাট্য প্রকাশিত ও অভিনীত হয় ১৮৮২-তে, রবীন্দ্রনাথ অন্ধ মুনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর পঞ্চম ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে গঙ্গাতীরে চন্দননগর শহরে বাস করার সময়ে লেখেন 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩), 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এর (১৮৮২) কবিতাবলী ও 'বৌঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩) উপন্যাস। তাঁর প্রথম নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচিত হয়েছিল ১৮৮৪-তে, মহীশুরের কারোয়ার-এ এসে। নিতান্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বিবাহ সম্পন্ন হয় ১৮৮৩-র ৯ ডিসেম্বর তারিখে; স্ত্রী ভবতারিণী দেবী খুলনার দক্ষিণডিহি গ্রামের মেয়ে, শ্বশুরালয়ে তাঁর নাম পাল্টে রাখা হয় 'মৃণালিনী দেবী', আমৃত্যু তিনি এই নামেই পরিচিত হন রবীন্দ্রনাথের বিবাহের অল্পকালের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী প্রায়-সমবয়সী বৌঠান কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন (১৯ এপ্রিল ১৮৮৪); ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য, কারণ রবীন্দ্রমনন ও রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশে এই মহিলার প্রভাব অসামান্য এবং রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু এই শোকের যন্ত্রণা ভুলতে পারেন নি। ইতোপূর্বে সংসারে আরো একটি মৃত্যু ঘটে গিয়েছিল: রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগ্নী সৌদামিনী দেবীর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় শিলাইদহে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। সারদাপ্রসাদই জমিদারির কাজকর্ম দেখতেন এবং তাঁকে সহায়তা করতেন মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ। সারদাপ্রসাদের অকাল মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের ওপর জমিদারির কাজকর্ম শিখে নেওয়ার নির্দেশ আসে এবং পিতার নির্দেশানুযায়ী তিনি কলকাতার কাছারিতে বসতে শুরু করেন। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দুমাস পরে ১২ জুন তারিখে হৃদরোগে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন হেমেন্দ্রনাথ। এর ফলে জমিদারি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সম্পূর্ণতই রবীন্দ্রনাথের ওপর এসে পড়ে। উপরন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের দায়িত্বও তাঁকে বহন করতে হয় এ বছর (১৮৮৪) থেকে। তাঁর রচিত অজস্র ব্রহ্মসংগীত এবং ব্রাহ্মমত সম্পর্কে রচনাদির প্রত্যক্ষ উৎসস্থল ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচাঞ্চল্য। ১৮৮৫-তে 'বালক' নামে মাসিক পত্রিকা বেরোয় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর (সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী) সম্পাদনায়, তিনি 'বালক'-এর নিয়মিত লেখক: কবিতা, প্রবন্ধ, হাস্যকৌতুক, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি এবং ধারাবাহিকভাবে 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনা। প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হয় ১৮৮৬-তে। রচনা করলেন 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য (১৮৮৮); এবং 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯) নাটক। ১৮৯০-উল্লেখযোগ্য নানা কারণে: 'মানসী' কাব্যের প্রধান কবিতাসমূহ ও 'বিসর্জন'-এর মতো ভাবাশ্রয়ী ট্রাজেডি এ বছরেই লেখা হয়েছে, এ বছরেই মাত্র আড়াই মাসের বিলেত যাত্রার পরিণতিতে পরের বছরে (১৮৯১) বেরোয় 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' ১৮৯১-এর এপ্রিলে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকা প্রকাশিত

হতে শুরু করে, তাতে দেনা পাওনা, পোস্ট মাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান ও তারাপ্রসন্নের কীর্তি নামে গল্পষষ্ঠক প্রকাশের দ্বারা বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের একটি স্বকীয় ধারা প্রবর্তন। এ বছরের শেষভাগে ঠাকুর পরিবার থেকে 'সাধনা' নামে মাসিক পত্রিকা বেরোয়, এই পত্রিকায় ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ সাল (১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে ১৩০২-এর ভাদ্র-কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত) প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই একটি করে গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। সর্বমোট ৩৬টি গল্প। ১৮৯৪-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হলে নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে তিনিও সহসভাপতি মনোনীত হন। জমিদারি তদারকির ব্যস্ততার মধ্যে (১৮৮৭-১৮৯৫) ভ্রাতুষ্পুত্রী (মেজ ভাই সত্যেন্দ্রনাথের মেয়ে) ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে গ্রামীণ বাংলার চিরকালীন রূপ ফুটে উঠেছে, ১৯১২-তে এগুলো সংগ্রথিত করে 'ছিন্নপত্র' নামে ছাপা হয়, অনেক পরে গ্রন্থের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'ছিন্ন পত্রাবলী' হয়। এই পর্বেই রচিত হয়েছিল 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যনাট্য ও কবিতাগ্রন্থাদি, 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭) নামে দুটি প্রহসন; 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'র প্রবন্ধাবলী। রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে এক বছরের জন্য 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন, তাঁর অনেক ছোটগল্প-প্রবন্ধ-কবিতা তখন এতে স্থান পায়। ১৮৯৮-তে কবি কলকাতার পৈতৃক ভবন ছেড়ে সপরিবার কুষ্টিয়ার শিলাইদহে চলে আসেন এবং ১৯০১ থেকে বীরভূম জেলার বোলপুর গ্রামের প্রান্তদেশে 'শান্তিনিকেতন'-এ পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন। প্রসঙ্গত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুর স্টেশন থেকে দেড় মাইল দূরে নির্জন প্রান্তরের মধ্যে কুড়ি বিঘা জমি কিনে ছোট একতলা পাকা বাড়ি নির্মাণ করে তার নাম দিয়েছিলেন 'শান্তিনিকেতন'; পরবর্তী প্রজন্ম থেকে সমগ্র এলাকাটি এই গৃহনামেই পরিচিত হয়ে উঠতে থাকে। ১৯০১-এ শান্তিনিকেতনে কবি 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ক্রমবর্ধিষ্ণু এই বিদ্যাপীঠই পরে (১৯২১) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত রূপ পায়। বিদ্যালয় স্থাপনের এগারো মাস পরে ১৯০২-তে (১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৭ অগ্রহায়ণ) পত্নী মৃণালিনী দেবী এবং তার কয়েক মাস পরে সদ্যবিবাহিতা মধ্যমা কন্যা রেণুকা দেবী লোকান্তরিত হন। ১৯০৫-এ পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে ও ১৯০৭-এ কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ মাত্র তেরো বছর বয়সে মারা যান। এইসব উপর্যুপরি মৃত্যু, দুঃখ-শোক যে অন্তর উপলব্ধিতে তাঁকে নিয়ে যায় তার প্রকাশ ঘটতে থাকে 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) কাব্যের গীতিমাধুরীতে ও শান্তিনিকেতন উপদেশমালায়। উনিশ শতকের অন্তিম ও বিশ শতকের প্রারম্ভিক কয়েকটি বছর রবীন্দ্রনাথকে সমাজ-হিতৈষী ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। ১৯০৫-এ বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হলে তার প্রতিবাদে তিনি সভা-সমিতিতে বক্তৃতাদান, প্রবন্ধ ও দেশাত্মবোধক সংগীত রচনা করেছেন একের পর এক। ১৯১২-তে পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয় ১৯১২-র ২৮ জানুয়ারি। এ বছরেরই মে মাসে পুত্র ও পুত্রবধূসহ ইংল্যান্ড গমন; পথিমধ্যে জাহাজে বাংলা 'গীতাঞ্জলি' ও অন্যান্য কাব্য থেকে কিছু কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। এইসব অনুবাদ Gitanjali (Song Offerings) নামে ১৯১২-র নভেম্বরে বিলেতে প্রকাশিত হয় এবং এই গ্রন্থের জন্য তাঁর কবিপ্রতিভার বৈশ্বিক স্বীকৃতি মেলে ১৯১৩-তে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে ডি.লিট. উপাধি প্রদান (২৬ ডিসেম্বর, ১৯১৩) করে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইটহুড বা 'স্যার' উপাধি অর্পণ করেন ১৯১৫-এ ৩ জুন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পাঁচ মাস পরে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' (মে ১৯১৪) প্রকাশের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা শৈলীগতভাবে ভিন্ন মোড় নেয়; এই পত্রিকায় একাধিক ছোটগল্প, 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসদ্বয় ধারাবাহিক (১৯১৪-১৯১৬) প্রকাশ পায়। 'বলাকা' নামের ভিন্নস্বাদের কবিতাগ্রন্থের (১৯১৬) বহু কবিতা এতে প্রকাশিত হয়। ১৯১৬-তে মার্কিন দেশে থেকে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়ার পথে জাপান সফর ও সেখানে প্রদত্ত বক্তৃতায় উগ্র জাতীয়তাবাদের নিন্দা করেন। ১৯১৭-তে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্রিটিশ দমননীতির প্রভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠলে চিঠিপত্রে ও প্রবন্ধে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশে সোচ্চার হন। জ্যেষ্ঠকন্যা মাধুরীলতার অকাল মৃত্যুর (মে ১৯১৮) চালচিত্রে

রচিত হল 'পলাতকা' কাব্যের কবিতাগুচ্ছ। পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঘৃণায় একদালব্ধ 'স্যার' উপাধি বর্জনের কথা ঘোষণা করলেন বড়লাটকে লেখা খোলা চিঠিতে, চিঠিটি ১৯১৯-এর ২ জুন প্রকাশিত হয়। মে ১৯২০ থেকে জুলাই ১৯২১ পর্যন্ত তিনি দেশের বাইরে থাকলেন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মান, হল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ভ্রমণ ও বক্তৃতাদানের উদ্দেশ্যে। দেশে ফিরে দেখলেন গান্ধীজীর অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন চলছে; গান্ধীজীর সঙ্গে এ সময়ে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে কিছু রচনার মাধ্যমে, তজ্জন্য অবশ্য যুগস্রষ্টা এই দুই মনীষীর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হয়নি। ১৯২১-এর ২৩ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানকে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিলেন বিশ্বভারতী পরিষদ গঠন ও সংবিধান প্রণয়নের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে। 'মুক্তধারা' (১৯২২) ও 'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটক রচিত হলো য়োরোপের সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও মাত্রাতিরিক্ত বাস্তবতাবাদের সংকট দেখানোর উদ্দেশ্যে। ১৯২৪-এর জুলাই মাসে চীন সরকারের নিমন্ত্রণে চীন সফর এবং দেশে ফিরে অল্পদিনের মধ্যেই দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা;পেরুর স্বাধীনতাযুদ্ধের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উৎসবে যোগ দিতে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য আর্জেন্টিনায় গৃহবন্দী হয়ে পড়লেন হিস্পানি কবি-সম্পাদিকা-বুদ্ধিজীবী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর বাগানবাড়িতে, লিখিত হতে লাগলো 'পূরবী'র (১৯২৫) কবিতাবলী; পেরু যাওয়া হলো না। ওকাম্পো-র নাম তিনি দিয়েছিলেন 'বিজয়া', পরে 'পূরবী' কাব্য তাঁকেই উৎসর্গিত হলো। ১৯২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে দেশে ফিরে দেখলেন রাজনীতি মাহাত্ম্যে হিন্দু ও মুসলিম যুযুধান দুই শক্তিতে পরিণত হয়েছে; অহিংসার কথা বললেন 'নটীর পূজা' (১৯২৬) নাটকে। এ বছরই (১৯২৬) তাঁকে আবার য়োরোপ যেতে হলো মুসোলিনীর নিমন্ত্রণে প্রথমে ইতালিতে, পরে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মান, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রিস ও মিশর প্রভৃতি দেশে। ১৯২৭-এ বৃহত্তর দ্বীপময় ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহ পর্যটন করলেন। ১৯২৯-এ গেলেন কানাডায় এক শিক্ষা সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার জন্য, ফিরবার পথে জাপান ও ইন্দোচীন সফর। 'শেষের কবিতা' ও 'যোগাযোগ' উপন্যাসদ্বয় ও 'মহুয়া' কাব্য প্রকাশিত হলো এ বছরেই উপরন্তু রচিত হলো 'রাজা ও রাণী' নাটক ভেঙে 'তপতী' (১৯২৯), কবি স্বয়ং বিক্রমের ভূমিকায় অভিনয়ও করলেন। ১৯৩০-এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিবার্ট বক্তৃতা' প্রদানের জন্য বিলেত যাত্রা। এই তাঁর সর্বশেষ য়োরোপ ভ্রমণ; বিলেত থেকে ফ্রান্স (এখানে প্যারিসে তাঁর চিত্র প্রদর্শনী হলো), ইংল্যান্ড হয়ে জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ঘুরে এসে লিখলেন: 'রাশিয়ার চিঠি'। বললেন, 'এ যুগের তীর্থযাত্রা পূর্ণ হলো'। তারপরে আমেরিকা সফর এবং পুনরায় লন্ডন হয়ে স্বদেশ প্রত্যাগমন। ১৯৩২-এ ইরানের রেজা শাহ্ পহলভীর আমন্ত্রণে প্রথমে ইরান এবং পরে সেখান থেকে ইরাকে গেলেন। ১৯৩৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে 'কমলা বক্তৃতামালা'য় ভাষণ দিলেন 'মানুষের ধর্ম' বিষয়ে। ১৯৩৪-এ (মে মাসে) চললেন সাংস্কৃতিক দল নিয়ে সিংহলে। ১৯৩৬-এর জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত। ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে অভিভাষণ দিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৩৭-এর ১০ সেপ্টেম্বর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, ইরিসিপেলাসের আক্রমণ; তাঁর সামর্থ্য ও দৃপ্ত শরীরের ভাঙ্গন এখন থেকে শুরু হলো। এ বছরই বেরিয়েছিল তাঁর ছড়া ও কবিতার বই 'খাপ ছাড়া' ও 'ছড়ার ছবি', প্রবন্ধ গ্রন্থ 'কালান্তর', বিজ্ঞান-সম্পর্কিত গ্রন্থ 'বিশ্ব-পরিচয়' এবং সচিত্রিত গল্পের বই 'সে'। ১৯৪০-এর ৭ আগস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করলো শান্তিনিকেতনে এসে। এর অনতিকাল পরে কালিম্পং-এ কবি পুনর্বার অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কলকাতায় আনা হলো, চিকিৎসা চললো, কিঞ্চিৎ সুস্থতার পর শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। এই অসুখ থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে উঠতে পারেন নি। কবির ব্যাধি ছিল বার্ধক্যজনিত কারণে প্রস্রাব নিঃসরনের কষ্ট ও প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি। এত অসুখের ভিতরেও সাহিত্য সৃষ্টির বিরাম নেই: 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪১) এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'ছড়া' ও 'শেষ লেখা' কাব্যদ্বয়ের কবিতাসমূহ এ সময়েই লিখিত হয়েছে। ব্যাধি নিরাময়ের জন্য শেষবারে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং

তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের উপস্থিতিতে পঁচিশ মিনিটের একটি ছোট অপারেশন করা হয় (৩০ জুলাই ১৯৪১) যার নাম 'সুপ্রা পিউবিক সিস্টোস্টমি' অস্ত্রোপচারের ঘা পরে বিষিয়ে যায়, নানা জটিলতা ও উপসর্গ সৃষ্টি করে; এবং অসহ্য কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে ৭ আগস্ট তারিখে (১৩৪৮-এর ২২ শ্রাবণ) দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অবশেষে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটলো। ষাটের দশকে পূর্ব-বাংলায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালির জাতীয় চেতনা বিকাশের আন্দোলনে ও ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর গান ও কবিতা দেশবাসীর মনে ব্যাপক অনুপ্রেরণা যোগায়। তাঁর 'জন গণ মন' গানটি ভারতের এবং 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত। এক নজরে রবীন্দ্রনাথের বিশাল সৃষ্টিভাণ্ডার: কবিতাগ্রন্থ ৫৬, গীতিপুস্তক ৪, ছোটগল্প ১১৯, উপন্যাস ১২, ভ্রমণকাহিনী ৯, নাটক ২৯, কাব্যনাট্য ১৯, চিঠিপত্রের বই ১৩; গানের সংখ্যা ২২৩২ এবং অঙ্কিত চিত্রাবলী প্রায় দু হাজার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—কাব্য: সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালি (১৮৯৭), কল্পনা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১০), বলাকা (১৯১৬), পূরবী (১৯২৫), পুনশ্চ (১৯৩২), পত্রপুট (১৯৩৬), সেজুঁতি (১৯৩৮); উপন্যাস: গোরা (১৯১০), চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), শেষের কবিতা (১৯২৯), চার অধ্যায় (১৯৩৪); ছোটগল্প: গল্পগুচ্ছ; নাটক: চিত্রাঙ্গদা (১২৯৯), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১১), রক্তকরবী (১৯২৪), তাসের দেশ (১৯৩৩), চণ্ডালিকা (১৯৩৩); প্রবন্ধগ্রন্থ: বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), শিক্ষা (১৯০৮), শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), কালান্তর (১৯৩৭), সভ্যতার সংকট (১৯৪১); ভ্রমণ কাহিনী: য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১), রাশিয়ার চিঠি (১৯১৯), পারস্যে (১৯১৯), জাপান যাত্রী (১৯৩১); আত্মজীবনী: জীবনস্মৃতি (১৯১২); জীবনী: চরিত্রপূজা (১৯০৭); পত্র-সাহিত্য: ছিন্নপত্র (১৩১৯); গানের সংকলন: গীতবিতান; বিশ্বভারতী কর্তৃক ৩০ খণ্ডে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ১৫ খণ্ডে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশিত। মৃত্যু: ৭ আগস্ট ১৯৪১।

রমাপ্রসাদ চন্দ (১৮৭৩-১৯৪২)॥ জন্ম: শ্রীধরখোলা গ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, ১৫ আগস্ট ১৮৭৩। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ। সপ্তম শ্রেণিতে



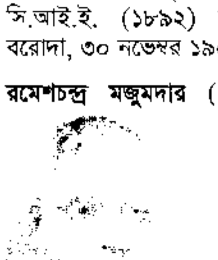
অধ্যয়নকালে পিতা কালীপ্রসাদ চন্দের মৃত্যু। টিউশনি করে লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮১১), ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. (১৮৯৩) ও কলকাতা ডাফ কলেজ থেকে বি.এ. (১৮৯৬) পাস। উত্তর প্রদেশের গাজীপুর হিন্দু স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত (১৯০১)। ১৯০৫-এ রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে বদলি। ১৯১৭ পর্যন্ত এ স্কুলে শিক্ষকতা। কলকাতা মিউজিয়ামের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে যোগদান। এ প্রতিষ্ঠানে কিছুকাল চাকরি করার পর পুনরায় রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার কর্মে যোগদান। স্বল্পকাল পরে স্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় আগমন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রভাষক পদে নিযুক্তি লাভ (১৯১৯)। কিছুকাল পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব গঠিত নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৯২১-এ কলকাতা মিউজিয়ামের পুরাতত্ত্ব বিভাগে সুপারিনটেনডেন্ট পদে চাকরি লাভ। ১৯৩২-এ এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও দীঘাপতিয়ার (রাজশাহী) কুমার শরৎকুমার রায়ের সহযোগে রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি (১৯১০) গঠন ও এর সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত। এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য। ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্বনৃতত্ত্ব সম্মেলনে যোগদান (১৯৩৪)। প্রাচীন ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব গবেষণায় মৌলিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান। বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের বহু নতুন তথ্যের আবিষ্কারক হিসেবে তাঁর অবদান স্মরণীয়। পুরাতত্ত্ব বিষয়ে অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: গৌড় রাজমালা (১৯১২), Indo-Aryan Races (১৯১৬), Medieval Indian Sculpture in the British Museum (১৯৩৬), ইতিহাসে বাঙালি (১৯১৮)। প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার প্রদত্ত

রায়বাহাদুর উপাধি লাভ (১৯২৪)। মৃত্যু, এলাহাবাদ, ২৮ মে, ১৯৪২

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)॥ জন্ম, মাতুলালয়, কৃষ্ণসিংহের গলি, কলকাতা, ১৩ আগস্ট ১৮৪৮। পৈতৃক নিবাস রামবাগান, কলকাতা। সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সিভিলিয়ান। ডেপুটি কালেক্টর ঈশানচন্দ্র দত্ত তাঁর পিতা। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হওয়ার অল্পদিন পর মাতার মৃত্যু। এর দুই বছর পর পিতার পরলোকগমন। খুল্লতাত শশীচন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাভ্যাস। এন্ট্রাস পরীক্ষার পূর্বে মাতঙ্গিনী দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ লাভ করে এন্ট্রান্স (১৮৬৪) ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সিনিয়র স্কলারশীপ লাভ করে এফ.এ. (১৮৬৬) পাস। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ. ক্লাসে পড়ার সময়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেয়ার জন্য বিলেত গমন (১৮৬৮)। লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যয়ন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আই.সি.এস. (১৮৭১) পাস। তিনি দ্বিতীয় বাঙালি আই.এস. (১৮৬৩-তে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন)। ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে প্রত্যাবর্তন। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পদে নিযুক্তি লাভ (১৮৭১)। কালক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনার পদে উন্নীত। প্রথম বাঙালি কমিশনার। ১৮৯৭-র জানুয়ারি মাসে দশ মাসের ছুটি নিয়ে দ্বিতীয়বার বিলেত গমন। আর চাকরিতে যোগদান করেননি। বছরে হাজার পাউন্ড পেনশনে অবসর গ্রহণ। তিন বছর লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ভারতীয় ইতিহাসে অধ্যাপনা। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বরোদা রাজ্যের রাজস্ব-সচিবের পদ গ্রহণ (১৯০৪)। কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে তৃতীয়বার বিলেত গমন (১৯০৬)। সেখানে বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে যোগদান। দেশে প্রত্যাগমনের পর সুরাটে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প-সম্মেলনে সভাপতিত্ব। ডি-সেন্ট্রালাইজেশন কমিশনের সদস্য নিযুক্ত (১৯০৭)। মাসিক চার হাজার টাকা বেতনে বরোদা রাজ্যের দেওয়ান-পদাভিষিক্ত (১ জুন ১৯০৯)। Arcydae ছদ্মনামে Bengal Magazine ও Mookerjee's Magazine-এ ইংরেজিতে কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবীকঙ্কন (১৮৭৭), জীবন-প্রভাত (১৮৭৮) ও জীবন-সন্ধ্যা (১৮৭৯) তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস। মোগল যুগের পটভূমিকায় রচিত এ-সকল উপন্যাসে দেশাত্মবোধের সুর উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। সংসার (১৮৮৬) ও সমাজ (১৮৯৪) রমেশচন্দ্র দত্তের সামাজিক উপন্যাস। বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনে এ দুইটি উপন্যাস লিখিত। ইংরেজি গ্রন্থ: The Lake of Palms: a Story of Indian Domestic life [London 1902], The Economic History of India (1757-1857), [London 1902]. India in the Victorian Age: an Economic History of the People (1837-1900) [London 1904]। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি (১৮৯৪) ও বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য (১৮৯৫)। বঙ্গীয় সরকারের সি.আই.ই. (১৮৯২) উপাধি প্রদান। মৃত্যু, বরোদা, ৩০ নভেম্বর ১৯০৯।



রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০)॥ জন্ম, খণ্ডপাড়া গ্রাম, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর ১৮৮৮। ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদ। মায়ের দিক থেকে তিনি রাজা রাজবল্লভের বংশধর, বাপের দিক থেকে রাজা হরিনাথের। বাবা ত্রিপুরার রাজ এস্টেটের উকিল হলধর মজুমদার। কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স (১৯০৫) পাস করে বিভাগীয় বৃত্তি লাভ। কলকাতা রিপন কলেজ থেকে চতুর্থ স্থান অধিকার করে এফ.এ. (১৯০৭) পাস প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পোস্টগ্রাজুয়েট স্কলারশিপ পেয়ে ইতিহাস অনার্সসহ বি.এ. (১৯০৯) ও একই কলেজ থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. (১৯১১) ডিগ্রি লাভ। ১৯১২-তে 'অন্ধ্র কুশান আমল' সম্বন্ধে গবেষণা করে ১৯১৩-তে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি



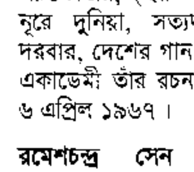
লাভ। ঢাকা গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজের প্রভাষক নিযুক্ত (১৯১৩) পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রভাষক পদে যোগদান (১৯১৪)। সেখানে প্রায় সাত বছর অধ্যাপনা। এ সময়ে 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস' বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে যোগদান। ইতিহাস বিভাগের প্রধান ও জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৩৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত। ১৯৪২-এ এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব ইন্ডোলজির প্রিন্সিপাল পদে দায়িত্ব পালন (১৯৫০-১৯৫২)। ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য ভারত সরকারের গঠিত 'বোর্ড অব এডিটরসের' (১৯৫৩) ডাইরেক্টর নিযুক্ত। তৎকর্তৃক উপস্থাপিত খসড়া বোর্ড অব ডাইরেক্টরের সভায় উপেক্ষিত হলে এ কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ। স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে সে ইতিহাস রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। বাংলাদেশ ও ভারতের লুপ্ত প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার ও তা লিপিবদ্ধ করে অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদান। রচিত গ্রন্থাবলি: বাংলার ইতিহাস (৪ খণ্ড), Corporate Life in Ancient India, Early History of Bengal, Outline of Ancient Indian History and Civilization, Ancient Indian Colonies in the Far East (3 Vols.), Greater India, Ancient India, Inscription of Komboza, History and Culture of Indian People, The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857, History of Freedom Movement, A Brief History of India। 'ডি.লিট.' (কলকাতা, যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়), 'দেশিকোত্তম' (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) ও 'ভারততত্ত্ব' (ভাস্কর সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা) উপাধি লাভ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০।

রমেশচন্দ্র শীল (১৮৭৭-১৯৬৭)॥ জন্ম. গোমদণ্ডী গ্রাম, বোয়ালখালি, চট্টগ্রাম, ১৮৭৭। কবিয়াল। প্রাইমারি স্কুলে অধ্যয়নকালে সংগীতের প্রতি অনুরক্ত। কবিগান শুনলেই আকুল হয়ে উঠতেন। এ আকুলতাই তাকে 'কবিয়াল' করে তোলে। তিনি হিন্দু-মুসলমানের সেতুবন্ধ হিসেবে খ্যাত। মাইজভাণ্ডারের পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ। মাইজভাণ্ডারি গানকে জনপ্রিয় করার কৃতিত্বের অধিকারী। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন,



১৯২২-এর বিখ্যাত রেল ধর্মঘট, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, সূর্য সেন-প্রীতিলতার বীরত্বপূর্ণ আত্মাহুতি প্রভৃতি ঘটনা ছাড়াও দুর্ভিক্ষ, মজুতদার ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে, সকল রকম শোষণের বিরুদ্ধে এবং কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার সংগ্রামে তাঁর কবিগান ছিল অগ্রণী। ভাষা-আন্দোলনের সোচ্চার প্রবক্তা। ১৯৫৪-তে কারাবরণ। জনসেবা তাঁর 'আসল ধর্ম'। বহু সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে অংশগ্রহণ। তাঁর রচিত কয়েকটি গানের গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৯-এ তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের মাসোহারা মঞ্জুর, কিন্তু সংগ্রামী ভূমিকার জন্য ১৯৬২-তে মাসোহারা প্রত্যাহার। ১৯৬২-তে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি কর্তৃক শ্রেষ্ঠ লোককবির সম্মানে ভূষিত। তাঁর গানের বইগুলোর মধ্যে রমেশ শীলের শ্রেষ্ঠ গান ও ছড়া, ভাণ্ডারে মাওলা, আশেক মালা (১ম ভাগ), শান্তিভাণ্ডার, (২য় ভাগ), আত্মতত্ত্ব (৩য় ভাগ), নূরে দুনিয়া, সত্যদর্পণ, জীবন সাথী, মুক্তি দরবার, দেশের গান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলা একাডেমী তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করেছে। মৃত্যু. ৬ এপ্রিল ১৯৬৭।

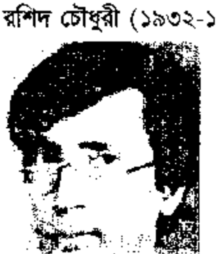
রমেশচন্দ্র সেন (১৮৯৪-১৯৬২)॥ জন্ম. চোরবাগান, কলকাতা, ২২ আগস্ট, ১৮৯৪।



কথাসাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস পিঞ্জরী গ্রাম, গোপালগঞ্জ। পিতা কলকাতার বিখ্যাত কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র সেন। প্রথম জীবনে পণ্ডিত সীতানাথ সংখ্যাতীর্থের সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা গ্রহণ। টোলে পাঠরত অবস্থাতেই প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে এন্ট্রান্স পাস (১৯১৩)। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯১৭) এম.এ. ক্লাসে ভর্তি। পিতৃবিয়োগজনিত কারণে

স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ ত্যাগ। বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে অধ্যাপনাকর্মে যোগদান। কিছুকাল পর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কবিরাজিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। কলকাতায় 'সাহিত্য সেবক সমিতি' (১৯২১) গঠন করে নবীন ও প্রবীণ লেখকদের সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগে উৎসাহ প্রদান। সুপরিচিত কথাসাহিত্যিক সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপিত। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সমন্বিত জীবনের শিল্পী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। শতাব্দী (১৯৪৫), কুরপালা (১৯৪৬), কাজল (১৯৪৯) প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। মৃত ও অমৃত (১৯৪৯), কয়েকটি গল্প (১৯৪৯), তারা তিনজন (১৯৫৭), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৬০) প্রভৃতি তাঁর গল্পগ্রন্থ। মৃত্যু. কলকাতা, ১ জুন ১৯৬২।

রশিদ চৌধুরী (১৯৩২-১৯৮৬)॥ জন্ম. রতনদিয়া



গ্রাম, ফরিদপুর, ১ এপ্রিল ১৯৩২। চিত্রশিল্পী। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ ইউসুফ হোসেন চৌধুরী তাঁর পিতা। জমিদার পরিবারে জন্ম। পঞ্চাশের দশকের প্রথম ভাগে পদ্মার ভাঙ্গনে রতনদিয়ার বসতবাড়ি বিলীন হলে গোটা পরিবার ঢাকায় চলে আসে। নদীর ভাঙ্গন, জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ও পিতা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলে তাঁদের পরিবারে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে। মেট্রিক পাস করে ঢাকা আর্ট স্কুলে ভর্তি (১৯৫০)। চারুকলায় প্রথম বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভ (১৯৫৪)। আর্ট স্কুলের চিত্রাঙ্কন বিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত। স্পেন সরকারের বৃত্তি পেয়ে মাদ্রিদ গমন (১৯৫৮)। সেখানকার চারুকলা বিদ্যালয়ে প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্যের ওপর এক বছর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে প্রত্যাবর্তন। ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের (সাবেক ঢাকা আর্ট স্কুল) প্রাচ্যশিল্পের প্রভাষক পদে যোগদান (১৯৫৮)। কিছুকাল পর ফরাসি সরকারের বৃত্তি পেয়ে পারী গমন (১৯৫৮)। সেখানকার চারুকলা একাডেমি অব জুলিয়াতে ভাস্কর্য, ফ্রেসকো ও ট্যাপেস্ট্রি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ। ১৯৬৪-তে পারী থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় আর্ট কলেজে অধ্যাপনায় যোগদান। ফরাসি স্ত্রী (তাঁর নাম আন) গ্রহণ করে সরকারি নিয়ম ভঙ্গ করার দায়ে সরকারি আর্ট কলেজের চাকরি হারান (১৯৬৫)। ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য অনুষদের পার্টটাইম প্রভাষক পদে যোগদান। ১৯৬৯-এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৭৩-এ সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৮১ পর্যন্ত এ অধ্যাপনা। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সভাপতি (১৯৭১-১৯৮১)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য চট্টগ্রাম থেকে ফ্রান্সে গিয়ে বাস। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ফ্রান্স থেকে চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন (১৯৭২)। চট্টগ্রাম চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের (১৯৭৩) প্রতিষ্ঠাতা। শেষজীবনে জিন্নাত চৌধুরীকে দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। বাংলাদেশে ট্যাপিস্ট্রি (তাপিশ্রী) শিল্পমাধ্যমের সার্থক প্রবর্তক। বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকগাথা থেকে তাঁর চিত্রের আখ্যানবস্তু গৃহীত। 'সোনাভানু', 'ভয়', 'বাংলার বিদ্রোহ' প্রভৃতি চিত্রে লোকজ ঐতিহ্যের সার্থক প্রয়োগ। 'সোনাভানুতে' পুঁথিসাহিত্যের সোনাভানের প্রতীকে নারীর বীরত্ব, 'ভয়ে' গ্রামের বট গাছের নীচে সংস্থাপিত কালীর শক্তি ও তার ভয়াল আকৃতি এবং 'বাংলার বিদ্রোহ'-এ ষাঁড়, কাস্তে, লাঠি, হাত ও সাপের প্রতিচিত্রে বিদ্রোহের ভয়ঙ্কর ও থরথর রূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত। রশিদ চৌধুরীর চিত্রকলা লোকজ সংস্কৃতির আদলে সমকালীন মানুষের বিক্ষুব্ধ মানসিকতার প্রতিভাস। ঢাকা, চট্টগ্রাম, পারী (ফ্রান্স), রাওয়ালপিণ্ডি, লন্ডন প্রভৃতি স্থানে তাঁর একক দশটি চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত। চিত্রকলায় অবদান রাখায় 'একুশে পদক' লাভ (১৯৭৭)। মৃত্যু. ঢাকা, ক্যান্সারে, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৮৬।

রশীদ আল ফারুকী (১৯৪০-১৯৮৭)॥ জন্ম. গুপ্তাখালী, সীতাকুণ্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম, ১৫ মার্চ ১৯৪০। অধ্যাপক, সাহিত্যসাধক ও গবেষক। প্রকৃত নাম (পীরজাদা) খায়ের উল বসর। পিতা মওলানা মোহাম্মদ নুরুল আবসার ও মাতা গুলচেহেরা বেগম। মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সীতাকুণ্ডের টেরিয়াইল স্কুল

থেকে প্রবেশিকা পাস (১৯৬০)। চট্টগ্রাম কলেজ

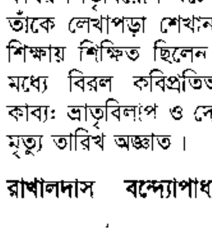


থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১৯৬২), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক সম্মান (১৯৬৫) ও এম.এ. ডিগ্রি (১৯৬৬) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. (১৯৮১) উপাধি। ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ (১৯৫৪), যুবলীগে যোগদান (১৯৫৫), আওয়ামী লীগে যোগদান (১৯৫৬), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান (১৯৫৭), চট্টগ্রামে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ (১৯৬২), ঢাকায় শিক্ষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ (১৯৬৪)। চট্টগ্রামের রাউজান কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু (১৯৬৭)। ১৯৭০-এ রিসার্চ ফেলো হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান। ১৯৭৫-এ সহকারী অধ্যাপক, ১৯৮২-তে সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত। সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি অঙ্গনের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। বঙ্গবন্ধু পরিষদ চট্টগ্রামের সভাপতি (১৯৮৩), বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৮৬) ও বিশ্ব মৈত্রী পরিষদ চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৮৭) হিসেবে দায়িত্ব পালন। প্রকাশিত গ্রন্থ – রুচি ও প্রগতি (১৯৬৯), বাংলা সাহিত্যে চরিত্র চিত্রণ (১৯৬৯), উর্দু সাহিত্যের রূপরেখা (১৯৭০), শরৎ সাহিত্য-জিজ্ঞাসা (১৯৭১), মুসলিম মানস: সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া (১৯৮১), বাংলা উপন্যাসে মুসলিম লেখকদের অবদান (১৯৮৪), সমকালীন প্রসঙ্গ (১৯৮৪), বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৮৫), নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৯৮৭), ধর্ম ও রাষ্ট্র (১৯৮৯), ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব (১৯৮৯); সম্পাদিত গ্রন্থ: আধুনিক সাহিত্যের রূপকার (১৯৭৬), প্রসঙ্গ: ভাষা ও সাহিত্য (১৯৮০), কাজী আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গ, বঙ্কিম পরিক্রমা। মৃত্যু: ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৭।

রশীদ সরকার (?-১৯৭১)॥ ময়মনসিংহের প্রখ্যাত প্রতিমা-শিল্পী। ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কাছে দেব-দেবীর প্রতিমা অঙ্কন-রীতি শিক্ষা। এ রীতি ছিল প্রথানুসারী ও গতানুগতিক। ষাট-এর দশকে রশীদ দেব-দেবীর প্রতিমা অঙ্কনের একটি স্বকীয় পদ্ধতি উদ্ভাবনে [illegible] সাহস রশীদের মৌল বৈশিষ্ট্য; প্রথা ভাঙেন তিনি গুরুর পদ্ধতি থেকে সরে এসে, ধর্মীয় বিষয়ের উপস্থাপনার স্বীকৃত রীতিকে অস্বীকার করে এবং মুসলমান হয়ে হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। এই প্রথা ভাঙার মধ্যে তাঁর শিল্প অন্বেষার এক দীপ্ত চেতনা প্রতিফলিত। একজন লোকজ শিল্পীর এই বিদ্রোহী চেতনা তাঁর অন্য শিল্পকর্মেও ভাস্বর। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' সিরিজের মাটির খোদাই করা মিছিলের ছবি তাঁর অনন্য শিল্পকর্ম। মৃৎশিল্পের কাজে এ এক নতুন পথ। এই নতুন পথের পথিক ছিলেন রশীদ সরকার। মৃত্যু. ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী শিল্পীকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং তাঁর সমস্ত শিল্পকর্ম পুড়িয়ে ধ্বংস করে।

রহিমুন্নিসা (উনিশ শতক)॥ জন্ম. চট্টগ্রাম, উনিশ শতকের প্রথম পাদে। কবি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে মীর কাশিমের যুদ্ধে পরাজয়কালে রহিমুন্নিসার পিতামহ বিহারের মুঙ্গের থেকে পালিয়ে এসে চট্টগ্রামে বসবাস করতে থাকেন। পিরালি করে জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নেন। স্বামী চট্টগ্রামের হাটহাজারীর মেখল গাঁয়ের আহমদ আলী চৌধুরী। শৈশবেই কবির পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁর মা আলিমুন্নেসা তাঁকে লেখাপড়া শেখান। রহিমুন্নিসা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। সে যুগের মহিলাদের মধ্যে বিরল কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কাব্য: ভ্রাতৃবিলাপ ও দোরদানা বিলাপ। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

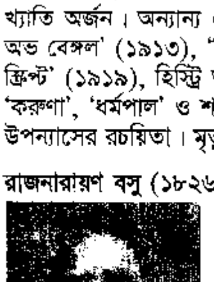
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৩০)॥



জন্ম. বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৮৮৬। ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক। ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম। বহরমপুর আদালতের আইনজীবী মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতা। এফ.এ. ক্লাসে অধ্যয়নকালে পিতৃ-মাতৃহীন হন। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পাস (১৯০০)। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯০৩-এ এফ.এ., ১৯০৭-এ ইতিহাসে অনার্সসহ বি.এ. ও ১৯১০-এ এম.এ. (ইতিহাস) ডিগ্রিলাভ। এম.এ.

পরীক্ষা দেয়ার পূর্বেই কলকাতা মিউজিয়ামে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগে সহকারী অধ্যক্ষ পদে চাকরি লাভ। ১৯১১-তে সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ও ১৯১৭-তে সুপারিনটেনডেন্ট পদে উন্নীত। অফিস পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে চাকরিচ্যুত (১৯২৬)। ১৯২৮-এ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী' অধ্যাপক নিযুক্ত। মহেঞ্জোদারোতে অতি প্রাচীন যুগের সভ্যতার (সিন্ধু সভ্যতা) নিদর্শন আবিষ্কার (১৯১৭) তাঁর সরকারি কর্মজীবনের প্রধান কীর্তি। এখানকার ধ্বংসাবশেষ যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার নিদর্শন তার প্রমাণ প্রথম উপস্থাপন। মহেঞ্জোদারোতে খননকার্য (১৯২২-১৯২৩) চালিয়ে যে সব পুরাবস্তু তিনি আবিষ্কার করেন সেগুলোর উপর গবেষণা করে পণ্ডিতবর্গ সিদ্ধান্তে আসেন যে সিন্ধু সভ্যতা তাম্র প্রস্তর যুগের অর্থাৎ ৫ হাজার বছরের পুরাতন সভ্যতা। কনিষ্ক ও পাল রাজাদের সম্পর্কেও বহু প্রামাণ্য তথ্যের আবিষ্কার। পাহাড়পুরের খননকার্যেরও পরিচালক। পুরাতত্ত্বের ন্যায় মুদ্রাতত্ত্বেও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর 'প্রাচীন মুদ্রা' (১৯১৫) গ্রন্থটি বাংলায় রচিত মুদ্রা সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ। ইতিহাসের গবেষণায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১ম ভাগ ১৯০৪ ও ২য় ভাগ ১৯১৭) রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ: 'পালস অভ বেঙ্গল' (১৯১৩), 'দি অরিজিন অভ বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট' (১৯১৯), হিস্ট্রি অভ্ ওড়িষ্যা' (১৯৩০)। 'করুণা', 'ধর্মপাল' ও শশাঙ্ক' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচয়িতা। মৃত্যু. ১৯৩০।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)॥ জন্ম. বোড়ার গ্রাম, চব্বিশ পরগণা, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮২৬। চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক। কলকাতায় গুরু পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ। পরে হেয়ার স্কুলে ভর্তি। ১৮৪০-১৮৪৩ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন। মধুসূদন দত্তের সুহৃদ।



ছাত্রজীবনে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের বস্তুবাদী জীবনদর্শন দ্বারা পরিচালিত। পিতা ও প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ (১৮৪৬)। কঠ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ইংরেজিতে অনুবাদ। ১৮৪৯-এ সংস্কৃত কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৮৫১-তে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান। ১৮৬৮-তে শিক্ষকতার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ। শ্রমিক-কৃষকদের শিক্ষাদানের জন্য মেদিনীপুরে একটি নৈশ বিদ্যালয় ও নারীশিক্ষার জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। মাতৃভাষাচর্চার দ্বারা শিক্ষা, সাহিত্য ও সংগীতের উন্নতি, দেশি প্রথায় ব্যায়াম ও দেশি ঔষধ ব্যবহার করার জন্য দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত। তাঁর আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে নন্দগোপাল মিত্র কর্তৃক 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭) প্রতিষ্ঠা। রাজনারায়ণ কর্তৃক এ মেলার নবম বার্ষিক উৎসব উদ্বোধন (১৮৭৫)। 'সঞ্জীবনী সভা' নামক গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির সভাপতি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সমিতির সঙ্গে যুক্ত থেকে স্বদেশপ্রেমে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১) প্রতিষ্ঠিত হলে এর সভ্য নিযুক্ত। ১৮৭৯-তে দেওঘরে গমন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ-১৮৫৫, ২য় ভাগ-১৮৭০), ব্রাহ্মসাধন (১৮৬৫), ধর্মতত্ত্বদীপিকা (১ম ভাগ-১৮৬৬, ২য় ভাগ-১৮৬৭), আত্মীয়সভার সদস্যদের বৃত্তান্ত (১৮৬৭), হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা (১৮৭৩), প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে (১৮৭৩), সেকাল আর একাল (১৮৭৪), ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব (১৮৭৫), হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত (১৮৭৬), বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮), বিবিধ প্রবন্ধ (১ম খণ্ড ১৮৮২), তাম্বুলোপ হার (১৮৮৬), সারধর্ম (১৮৮৬), বৃদ্ধ হিন্দুর আশা (১৮৮৭), রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯০৯), দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি, গ্রাম্য উপাখ্যান ইত্যাদি। এছাড়া অনেক ইংরেজি গ্রন্থও রচনা করেছেন। ভগবদ্‌ভক্ত রাজনারায়ণ বসু জীবৎকালে 'ঋষি' আখ্যায় অভিহিত হয়েছিলেন। মৃত্যু. ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯।

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)॥ জন্ম. মাতুলালয়, বামনপাড়া গ্রাম, বর্ধমান, ১৬ মার্চ ১৮৮০। সাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস বীরনগর (উলা) গ্রাম, নদীয়া। পিতা চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার। দ্বারভাঙ্গা রাজ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯৫), পাটনা কলেজ

থেকে এফ.এ. (১৮৯৭), কলকাতা প্রেসিডেন্সি



কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্সসহ বি.এ. (১৮৯৯) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে রসায়নে এম.এ. (১৯০০) ডিগ্রি লাভ। ১৯০২-এ ল' পাস। এফ.এ. পাস করার পর শ্যামাচরণ দে'র পৌত্রী মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ১৯০৩-এ বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস কোম্পানিতে রাসায়নিকের পদে চাকরি লাভ। পরের বছর (১৯০৪) এর পরিচালক পদে উন্নীত। স্বাস্থ্যহানির দরুন ১৯৩২-এ এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের গল্প লিখে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। 'বিচিত্র অভিজ্ঞতা, মননশীল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁর humour সৃষ্টির প্রধান সম্পদ।' বাংলা সাহিত্যে রস রচনার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বঙ্গানুবাদ ও অভিধান প্রণয়নে অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান। গ্রন্থাবলী।ছোটগল্প: গড্ডলিকা (১৯২৪), কজ্জলী (১৯২৭), হনুমানের স্বপ্ন (১৯৩৭), গল্পকল্প (১৯৫০), ধুস্তুরী মায়া (১৯৫২), কৃষ্ণকলি (১৯৫৩), নীলতারা (১৯৫৬), আনন্দীবাঈ (১৯৫৭); প্রবন্ধ।লঘুগুরু (১৯৩৯), ভারতের খনিজ (১৯৪৩), কুটীর শিল্প (১৯৪৩), বিচিন্তা (১৯৫৫); অনুবাদ।মেঘদূত (১৯৪৩), বাল্মীকি রামায়ণ (১৯৪৬), মহাভারত (১৯৪৯), হিতোপদেশের গল্প (১৯৫০); অভিধান।চলন্তিকা (১৯৩৮),। কৃষ্ণকলি গল্প গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার (১৯৫৫) ও আনন্দীবাঈ গল্প গ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৫৮) লাভ। ভারত সরকারের পদ্মভূষণ (১৯৫৬) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট. (১৯৫৭) ডিগ্রি প্রদান। মৃত্যু. ২৭ এপ্রিল ১৯৬০।

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী (১৯০৭-১৯৩৪) জন্ম. নোয়াখালী শহর, ১৬ মার্চ ১৯০৭। কবি ও প্রাবন্ধিক। পিতা আবদুর রশীদ খান, মাতা হাজেরা খানম। পিতা নোয়াখালী পৌরসভার সদস্য ও সহ-সভাপতি, জেলা বোর্ডের সদস্য এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য। ১৩৩১



সনে প্রখ্যাত রাজনীতিক আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি। গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠগ্রহণের পাশাপাশি পারিবারিক গ্রন্থাগারের অসংখ্য গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। পিতামাতার অনুপ্রেরণায় স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। জনলগ্ন রাজনীতিক স্বামীর সাহচর্য সাহিত্যজীবনে প্রভাব বিস্তার করে। স্বামীর এক চিঠির উত্তরে বিখ্যাত 'চাষা' কবিতা রচনা। 'চাষা' কবিতার প্রথম দুই পংক্তি 'সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা/ দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা' প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছে। কবিতাগ্রন্থ 'উপহার' (১৩৩২) ও গল্পগ্রন্থ 'পথের দাবি' প্রকাশ। মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত, নওরোজ, নয়াবাংলা পত্রিকায় লিখতেন। প্রবন্ধগুলিতে মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থা তুলে ধরে নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কবিতার মধ্যে রয়েছে সমাজ সচেতনতা। স্বল্পায়ু হওয়ায় স্বল্পপ্রজ বটে কিন্তু এর মধ্যেই চিন্তা-চেতনার ঘটেছে সাবলীল প্রকাশ। গ্রামের নিভৃত পরিবেশে থেকেও জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। কুমিল্লায় এ. কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জেলা কৃষক সম্মেলনের (১৯৩৬) উদ্বোধনী সংগীত 'মরণ সাগর কূলে বসে/ গাই জীবনের জয়গান/ মরণের পথে বেঁচে আছে যারা/ তাহাদেরই এ অভিযান' রচনা। মৃত্যুর পরে 'রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী রচনা-সংকলন' (১৯৮২)। মৃত্যু. কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৩৪।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৪-১৮৯১)। জন্ম. শুঁড়া,



কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ঐতিহাসিক ও প্রাবন্ধিক। গোবিন্দচন্দ্র বসাকের হিন্দু ফ্রি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ। গৃহে ক্যামিরন নামক একজন ইংরেজ শিক্ষকের নিকট

পরিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট ইংরেজি বলতে ও লিখতে শেখেন। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি (১৮৩৯)। একদা কতিপয় ছাত্র একজন ইংরেজ অধ্যাপককে লাঞ্ছিত করলে কলেজ কর্তৃপক্ষ রাজেন্দ্রলালের কাছে তাদের নাম জানতে চান। সহপাঠীদের নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়ায় দোষী ছাত্রদের সঙ্গে কলেজ থেকে বিতাড়িত। আইন অধ্যয়ন ও ওকালতি পরীক্ষা প্রদান। প্রশ্নপত্র পূর্বেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল প্রমাণিত হওয়ায় পরীক্ষার ফল বাতিল। এতে মর্মাহত হয়ে কলেজের পাঠ ত্যাগ। এরপর নিজের সাধনায় ফরাসি, গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান, সংস্কৃত, ফারসি, হিন্দি, উর্দু ও উড়িয়া ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন। ১৮৪৬-এ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত। কখনো এর সহ-সভাপতি, কখনো সম্পাদক এবং সর্বশেষে প্রথম ভারতীয় সভাপতিরূপে (১৮৮৫) দায়িত্ব পালন। মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনে সরকারের ওয়ার্ল্ড ইনস্টিটিউটের পরিচালক নিযুক্ত (১৮৬৬)। বিলেতের পেনি ম্যাগাজিনের আদর্শে বাংলা ভাষায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) নামে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। সাত বছর এ পত্রিকা সম্পাদনা। 'রহস্য-সন্দর্ভ' (১৮৬৩) নামে আর একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা চার বছর সম্পাদনা। ইংরেজি সাপ্তাহিক হিন্দু-পেট্রিয়টের (১৮৫৩) সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর (১৮৮৪) পর কিছুদিন এটি সম্পাদনা। ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া (১৮৫৬) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের (১৮৫১) বিশিষ্ট নেতা। কয়েকবার এর সহসভাপতি ও সভাপতি পদে সমাসীন। কলকাতায় কংগ্রেসের (১৮৮৫) দ্বিতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি (১৮৮৬)। কলকাতা সেন্ট্রাল টেকস্ট বুক সোসাইটির সভাপতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, কলকাতার জাস্টিস অফ দি পিস্ ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং সারস্বত সমাজের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদন। বিশিষ্ট মননশীল লেখক। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের গবেষণায় কৃতিত্ব প্রদর্শন। 'Antiquites of Orissa', 'Buddha gaya', 'Lalit Bistar', 'Patanjal's 'Yogasutra', 'Nepalese Buddhist Literature', 'Indo Aryans' প্রভৃতি তাঁর প্রণীত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সহায়তায় প্রথম বঙ্গাক্ষরে কয়েকটি মানচিত্র প্রকাশ (১৮৫০-১৮৫৮)। তেজস্বী বক্তা হিসেবেও খ্যাত। কলকাতা টাউন হলে 'ব্লাক অ্যাক্ট' (Black Act)-এর খসড়ার উপর এক আলোচনা সভায় (৬ এপ্রিল, ১৮৫৭) অগ্নিময় বক্তৃতা প্রদান করে বলেন: 'এদেশে যে-সব ইংরেজ আসে, তার প্রধান অংশ বিলাতী সমাজের আবর্জনা।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁকে সর্বপ্রথম সম্মানসূচক ডক্টর অফ ল উপাধি প্রদান (১৮৭৬)। রায় বাহাদুর (১৮৭৭), সি.আই.ই. (১৮৭৮) ও রাজা (১৮৮৮) উপাধি লাভ। উনিশ শতকের বিশিষ্ট মনীষী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটা সভা। তিনি কেবল মননশীল লেখকই ছিলেন না ... তাঁহার মূর্তিতে মনুষ্যত্ব প্রত্যক্ষ হইত। অথচ যোদ্ধবেশে তাঁর রুদ্রমূর্তি বিপজ্জনক ছিল। ... রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান। কখনো পরাভূত হইতে জানিতেন না।' মৃত্যু. কলকাতা, ২৬ জুলাই ১৮৯১।

রাধাকমল মুখার্জী (১৮৮৯-১৯৬৮)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৮৮৯। শিক্ষাবিদ ও লেখক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ডক্টরেট উপাধি লাভ। ১৯১৭-১৯২১ পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়েই অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন। পরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এবং শেষে উপাচার্যের পদে দায়িত্ব পালন। সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় তিরিশটি গবেষণাগ্রন্থ রচনা। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে সকল গবেষণা করেছেন সেগুলোকে প্রধানত সাত ভাগে ভাগ করা যায়। ১. অর্থনীতি নির্ভর সমাজতত্ত্ব, ২. আঞ্চলিক সমাজতত্ত্ব, ৩. রাষ্ট্রনীতি নির্ভর সমাজতত্ত্ব, ৪. নগর সমাজতত্ত্ব, ৫. সাহিত্য নিষ্ঠা সমাজতত্ত্ব, ৬. দর্শন নির্ভর সমাজতত্ত্ব এবং ৭. পরিকল্পনা নিষ্ঠা সমাজতত্ত্ব। মৃত্যু. ১৯৬৮।

রাধাকান্ত দেব (১৭৭৩-১৮৬৭)॥ জন্ম. শোভাবাজার, কলকাতা, ১০ মার্চ ১৭৭৩। পণ্ডিত ও সমাজসেবী। শোভাবাজার রাজবংশের তৃতীয় পুরুষ। কার্নিংহামের ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ। নিজের সাধনায় ইংরেজি, বাংলা, আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন। হিন্দু কলেজ (২০ জানুয়ারি ১৮১৭) প্রস্তুতি সাব-কমিটির সদস্য। দেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য এ কলেজ

প্রতিষ্ঠায় ডেভিড হেয়ারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান। ১৮১৮-তে হিন্দু কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য নিযুক্ত। তাঁর আনুকূল্যে বহু ছাত্রের এ কলেজে শিক্ষা লাভ। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব। ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল করে তোলার অভিযোগে



হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষক ডিরোজিওকে কলেজ থেকে অপসারণের (২৫ এপ্রিল ১৮৩১) ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন। সতীদাহ প্রথা রহিতের (৪ ডিসেম্বর ১৮৩৯) বিরোধিতা। হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন (২৬ জুলাই ১৯৫৬) পাস না করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন পত্র দাখিল (১০ মার্চ ১৮৫৬)। মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলো খ্রিস্টতত্ত্ব শিক্ষাদান কেন্দ্রে পরিণত হলেও হিন্দু ছাত্ররা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হতে থাকলে তা প্রতিরোধের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা। বাংলা পাঠশালা (১৪ জুন, ১৮৩৯), হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় (১ মার্চ ১৮৪৬) ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ (২ মে ১৮৫৩) প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা। হিতার্থী বিদ্যালয় ও মেট্রোপলিটান কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় ১৮৫০-এর ১ জুন হিন্দু কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের উন্নতিসাধনের ব্যাপারে প্রগতিশীল মতাবলম্বী। চিকিৎসাশাস্ত্রে শব ব্যবচ্ছেদ শিক্ষার জন্য হিন্দু ছাত্রদের বিলেত যাত্রার প্রতি সমর্থনদান এবং এ বিষয়ে অর্থ সাহায্য প্রদান। গৃহে নারীদের শিক্ষাদানের প্রতি উৎসাহ প্রদান। সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য শোভাবাজারে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮৫৯)। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৫) প্রকাশের ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন। 'টি কমিটির' (১৮৩৪) সদস্য ও কলকাতার অবৈতনিক 'জাস্টিস অব দি পীস' নিযুক্ত (১৮৩৫)। 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' (৩১ অক্টোবর ১৮৫১) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। মাতৃভাষা বাংলায় শিল্প ও কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য শিল্প ও কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে মত প্রকাশ। সুপণ্ডিত ও সুবক্তা হিসেবে খ্যাত। 'শব্দকল্পদ্রুম' (১৮১৯-১৮৫৮) নামক বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান সংকলন ও তা বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান। 'স্কুল বুক সোসাইটির' সহযোগিতায় 'নীতিকথা' (১৮১৮) ও 'বাঙ্গালা শিক্ষা গ্রন্থ' (১৯২১), 'সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা শিক্ষা গ্রন্থ' (১৮২৭) প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক রচনা। সুদীর্ঘ কর্মজীবন থেকে ১৮৬৪-তে অবসর গ্রহণ করে বৃন্দাবন গমন। বাকি জীবন সেখানে বাস। সরকারের কাছ থেকে 'রাজা বাহাদুর' (১৮৩৮) ও 'কে সি এস আই' (১৮৬৬) উপাধি লাভ। উনিশ শতকের রক্ষণশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা। সমাজের প্রাচীন রীতি-নীতি অক্ষুণ্ন রেখে ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের পক্ষপাতী ব্যক্তিত্ব। মৃত্যু. ১৯ এপ্রিল ১৮৬৭।

রাধাকান্ত নন্দী (১৯২৭-১৯৮৪)॥ জন্ম. বানরীপাড়া, বরিশাল, ১৯২৭। তবলাবাদক। শৈশবে পিতামহ কালীচরণের সঙ্গে নগর-সংকীর্তন দলে মন্দিরা বাজাতেন। মন্দিরা, করতাল, খোল প্রভৃতির সঙ্গে তবলাচর্চা শুরু। বাড়ি থেকে পালিয়ে সৈন্যদলের এক নৃত্যমণ্ডলীতে কাজ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ। সংগীত পরিচালক সুবল দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় ও ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ফিল্মে বাজনা বাজানোর সুযোগ লাভ। পণ্ডিত আলোখেলাল মিশ্রর শিষ্যত্ব গ্রহণ। লক্ষ্ণৌর বুঞ্চন খাঁর কাছে কিছুকাল তবলাবাদনের তালিম গ্রহণ। লঘু ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের বহু ভারতবিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করে সুনাম অর্জন। কাড়া, নাকাড়া, খোল, পাখোয়াজ, নাল, মাদল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে সিদ্ধহস্ত। ১৯৬৬-তে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের উদ্যোগে নেহেরু তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য লন্ডন সফর। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যার্থে পুনরায় লন্ডন সফর। মৃত্যু. ৩০ নভেম্বর ১৯৮৪।

রাধাগোবিন্দ বসাক (১৮৮৫-১৯৮২)॥ জন্ম. নবাবপুর, ঢাকা, ৮ জানুয়ারি ১৮৮৫। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ববিদ। এক দরিদ্র কায়স্থ পরিবারে জন্ম। টিউশনি করে পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহ। ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস



(১৯০১) । ঢাকা কলেজে ভর্তি । এ কলেজ থেকে এফ.এ. (১৯০৩), বি.এ. (১৯০৫) ও সংস্কৃতে এম.এ. (১৯০৭) ডিগ্রি লাভ । স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে 'সোনামণি' পুরস্কার লাভ. ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে হেড পণ্ডিতের চাকরি গ্রহণ । ইস্টবেঙ্গল ও আসাম গভর্নমেন্টের রিসার্চ স্কলার (১৯০৮-১৯১০) । ঢাকা কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অস্থায়ী প্রভাষক পদে নিযুক্তি লাভ (১৯১০) । পরের বছর রাজশাহী কলেজের লেকচারারের স্থায়ী পদে যোগদান । এ কলেজে প্রায় আট বছর অধ্যাপনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এপিগ্রাফির' প্রভাষক পদে প্রায় দুই বছর দায়িত্ব পালন (১৯১৮-১৯২০) । ১৯২০-এ পুনরায় রাজশাহী কলেজে যোগদান । ১৯২১-এর ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এর বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের একমাত্র প্রভাষক নিযুক্ত । ১৯৩৩ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন । 'দি হিস্ট্রি অব নর্থ-ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ (১৯৩৩) । একই বছর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্তি লাভ । ১৯৪০-এ এই কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধানের পদ থেকে অবসর গ্রহণ । প্রাচীন ইতিহাস, লিপি ও লেখ্যতত্ত্ব, পালি-প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত । 'কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র' (১৯৫০) তাঁর একখানি বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ । অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ: A Catalogue of the Archaeological Relics in the Museum of the Varendra Research Society (১৯১৯), The History of North-Eastern India (১৯৩৪), The Ramacaritam of Sandhyakara Nandi (১৯৩৯), Lecture on Buddha and Buddhism (১৯৬১) । মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গ্রিফিথ' পুরস্কার লাভ । কলকাতা সংস্কৃত কলেজ কর্তৃক 'বিদ্যাবাচস্পতি' ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট. ডিগ্রি প্রদান । রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ (১৯৬৫) । মৃত্যু. কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ১৯৮২ ।

রাধারমণ দত্ত (১৮৩৩ বঙ্গাব্দ-১৩২৩ বঙ্গাব্দ)। জন্ম. কেশবপুর গ্রাম, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ, ১৮৩৩ বাংলা । ধামাইল গানের প্রবক্তা ও মরমি কবি পিতা রাধামাধব দত্ত পুরকায়স্থ, মাতা সুবর্ণ দেবী বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ, ভারতের আসাম, করিমগঞ্জ ও শিলচরে তাঁর



ধামাইল গান বেশ জনপ্রিয় । ধামাইল গান ছাড়াও তিনি কীর্তন, গৌরপদ, গোষ্ঠ, অভিসার, মালসী, প্রার্থনাসহ প্রায় দেড় সহস্রাধিক গান লিখেছেন । তাঁর গান নিয়ে নন্দলাল শর্মা সম্পাদিত রাধারমণ গীতিমালা (২০০২), বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী সম্পাদিত বাউলকবি রাধারমণ গীতি সংগ্রহ (২০০৯) ও তপন বাগচী সম্পাদিত রাধারমণের গান (২০০৯) প্রকাশিত হয়েছে । মৃত্যু. ২৬ কার্তিক ১৩২৩ ।

রাধিকামোহন মৈত্র (১৯১৭-?) জন্ম. তালন্দ গ্রাম, রাজশাহী, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ । সরোদবাদক । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিলাভ ও কিছুকাল রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনা । জমিদার-সন্তান । জমিদারের দরবারে দেশের বরেণ্য সংগীতজ্ঞরা আসতেন । তাঁদের বাজনা শুনে শৈশবকালে সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট । ১৯২৮-এ ওস্তাদ আমীর খাঁর কাছে সংগীতে তালিম গ্রহণ শুরু । ওস্তাদ আমীর খাঁর মৃত্যুর পর ওস্তাদ দবীর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ও সুর শৃঙ্গার যন্ত্রে এবং তার সঙ্গে ধ্রুপদ, ধামার ও সাদ্‌রা গানের তালিম গ্রহণ । দীর্ঘ চৌদ্দ বছর সংগীতের অনুশীলন । ১৯৩৪-এ এলাহাবাদে নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতায় ও অলবেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স আয়োজিত সংগীত প্রতিযোগিতায় সরোদে প্রথম স্থান অধিকার । ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংগীত-জলসায় অংশগ্রহণ ও প্রশংসা অর্জন । ১৯৩৭-এ আকাশবাণীর শিল্পী হিসেবে যোগদান । একজন খ্যাতিমান সংগীতস্রষ্টা । অলকানন্দা, চন্দ্রমল্লার, দীপকল্যাণ রাগের স্রষ্টা এবং মোহনবীণা, দিলবাহার ও নবদীপা নামে তিনটি বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবক । রাগসংগীতের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সংগীত নাটক একাডেমি কর্তৃক সম্মানে ভূষিত । মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত ।

রামকানাই দত্ত (১৮৫২-১৯২০) । জন্ম. সুলতানপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৮৫২ । দেশকর্মী, সমাজহিতৈষী ও সাহিত্যসেবী । পিতা উমানাথ দত্ত । ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আইন ব্যবসায় শুরু

(১৮৭৩)। সরকারি আইনজীবী, পৌরসভার কমিশনার ও ভাইস চেয়ারম্যান। স্বদেশী আন্দোলনে তরুণদের দ্বারা গঠিত 'সন্তান সমিতি'র উপদেশক এবং ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার ভূমিকা গ্রহণ। 'উপাসনা সমাজ' (১৯০৮) এবং বিপন্ন-সেবার জন্য 'সেবক সেনা' নামে সেবার্থী দল গঠন। পাক্ষিক সন্তান (১৯০৮)-এর উপদেশক। ধর্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও কবিতা প্রকাশ। মাসিক সাময়িকপত্র 'ঊষা'র (১৮৯৩) অন্যতম সম্পাদক। সাহিত্যসাধক হিসেবে নানামুখী রচনা প্রকাশ। উনিশ শতকের শেষ দশকে 'দানব নন্দিনী, 'বিরাটে পাণ্ডব', 'চৈতন্যলীলা', 'মনিপুর বিভ্রাট', বিশ্বমঙ্গল' প্রভৃতি নাটিকা রচনা ও মঞ্চায়ন। 'স্বদেশ সংগীত' ও 'সেবক সংগীত' নামক সংগীতগ্রন্থের রচয়িতা। 'মাহাম্মদ' (বৈশাখ ১৩১৬) কাব্যগ্রন্থে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রশস্তি ও তাঁর প্রবর্তিত আদর্শের মাহাত্ম্য বর্ণন। কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাবিংশতি' (১২৮৬), 'কবিতা শতক', 'জীবন-গীতা' (১৩০৫), 'লিপি দর্পন', 'মাতৃপূজা', 'নব ব্রহ্মোপাসনা', 'সিদ্ধার্থ', 'বিদুর', 'হাসান হোসেন', 'সাধনাকুসুম' (১৮৮৬, প্রথমখণ্ড, শিবস্তোত্র ও শিবসংগীত), 'আনন্দ গীতা' (১৩২৪, আনন্দ স্বামীর প্রকৃততত্ত্ব এবং উপদেশ বাণী অবলম্বনে প্রণীত), 'কবিতা-সুনীতি', 'শ্রীচন্দ্রনাথ', 'বিবাহ-সংগীত', 'শোকোচ্ছ্বাস' (১৩০৬, মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের স্বর্গারোহণে প্রণীত), 'মহিন্ন স্তোত্রের বঙ্গ পদ্যানুবাদ' (১৩০৩)। অন্যান্য গ্রন্থ: 'সন্তান শিক্ষা', 'বড়লোক', 'ভারত জুবিলী', 'নবলীলা', 'ভাবসংগীত', 'সিদ্ধা', 'অভিষেক গাঁথা', 'অলকাভবন', 'ক্ষেপারাম'। প্রাবন্ধিক হিসেবেও খ্যাত ব্রাহ্মধর্ম প্রসারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লোকনাথ দিঘিরপাড়ে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা। সাধক আনন্দ স্বামীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। জাতিভেদ প্রথার প্রতিবন্দস্বরূপ সর্বমানবের শিক্ষাবিস্তারে 'এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন' উচ্চ ইংরেজি স্কুল (১৯০১) স্থাপন পরে এটি 'রামকানাই হাই একাডেমী' নামে রূপান্তরিত। মৃত্যু ১৯২৫



রামকিঙ্কর বেইজ (১৯০৬-১৯৮০)। জন্ম. যুগীপাড়া গ্রাম, বাঁকুড়া, ২৫ মে ১৯০৬। চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। শিক্ষার সুত্রপাত সুরেশ পণ্ডিতের পাঠশালায়। তারপর বঙ্গ বিদ্যালয় ও ন্যাশনাল স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। শৈশব থেকেই কুমোরের কাজ, সুতোরের কাজ, মাটির মূর্তি গড়া ও ছবি আঁকায় উৎসাহী। কৈশোর ও যৌবনারম্ভে গ্রামাঞ্চলে থিয়েটার কোম্পানির দৃশ্যপট এঁকে অর্থ উপার্জন। এ সময়েই ১৯২৫-এ 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শ লাভ এবং শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। নন্দলাল বসুর আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে আগমন এবং আমৃত্যু বসবাস। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে প্রথমে ছাত্র হিসেবে যোগ দিলেও তাঁকে কেউ ঠিক শিক্ষার্থী ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি। প্রতিভাধর বয়ঃকনিষ্ঠ সতীর্থরূপেই বিবেচনা করেছিলেন। নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। কলাভবনেই ছাত্রত্ব থেকে শিক্ষকতায় নিয়োজিত। ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে কলাভবনে অধ্যাপক এবং আরো পরে কলা ভবনের ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান। ১৯৭১-এ অবসর গ্রহণ। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের মধ্যবর্তী পর্বে রঙ্গমঞ্চের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁর মঞ্চসজ্জা ও নির্দেশনায় সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' এবং রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' ও 'মুক্তধারা' অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। চিত্রাঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য নির্মাণে যা-কিছু করেছেন সবই তাঁর নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর। এ ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শিক্ষক নেই, দেশি বা বিদেশি কারো কোনো শৈলী অনুসরণ করেননি, উপরন্তু সর্বদাই প্রথাবিরোধী বিদ্রোহী শিল্পীসত্তার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন চিত্রী হিসেবে প্রথিতযশা হলেও তাঁর বিশ্বখ্যাতি ভাস্কর হিসেবে। তাঁর ভাস্কর্য কর্মের অক্ষয় কীর্তি রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি যেটি হাঙ্গেরির বালাতন হ্রদের তীরে একটি স্বাস্থ্যনিবাসে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁর ছবি ও ভাস্কর্য কর্ম বিশ্বভারতী,



দিল্লির ললিতকলা একাডেমি ও অন্যত্র বহু স্থানে সংরক্ষিত আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার (দিল্লিতে) যক্ষ-যক্ষিণীর চব্বিশ ফুট দীর্ঘ মূর্তি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। ১৯৭০-এ 'পদ্মভূষণ' খেতাবে ভূষিত। ১৯৭৬-এ ললিতকলা একাডেমির ফেলোশিপ লাভ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু. কলকাতা, ২ আগস্ট ১৯৮০।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (১৮৩৬-১৮৮৬)॥ জন্ম. কামারপুকুর গ্রাম, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ধর্ম-সাধক। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমণি দেবী। বাল্যনাম গদাধর। বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে অনুশীলনের ফলে হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্ট, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে। ১৮৫৫-তে রানি রাসমণি নির্মিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির পুরোহিত নিযুক্ত হন। এখানে কালীসাধনায় তাঁর সিদ্ধি লাভ ঘটে। তেইশ বছর বয়সে সারদামণির পাণিগ্রহণ। সারদামণির বয়স তখন ছিল ছয় বছর। এ ছিল নামে বিবাহ, উভয়ের মধ্যে কোনো কালেই কোনো দৈহিক সম্পর্ক ছিল না। পরে উনিশ বছর বয়সে যখন সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন রামকৃষ্ণ তাঁকে সাক্ষাৎ জগদম্বা-জ্ঞানে পূজা করেন। তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবন, জ্ঞান ও উপদেশে মুগ্ধ হয়ে কলকাতার তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক তাঁকে যুগাবতাররূপে মান্য। সাধারণভাবে তিনি পরমহংসদেব নামে অভিহিত। তিনি ধর্মের জটিল ও গভীর বিষয়গুলোকে অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করতেন। বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর অতি প্রিয় শিষ্য। এ ছাড়া শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে আসেন। ফরাসি মনীষী রঁমা রোঁলা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলোচনা করে রামকৃষ্ণ দেব সম্পর্কে এক বৃহৎ জীবনী প্রণয়ন করেন। রামকৃষ্ণের উপদেশাবলী 'শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। 'শক্তি'র উপাসনা তাঁর ধর্মমতের মূল কথা। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা: 'সব ধর্মই সত্য যত মত তত পথ।' রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এক বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত দেশে-বিদেশে তাঁর অসংখ্য ভক্ত আছে এবং ভক্তগণ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা তাঁর বিপুল প্রভাবকেই প্রমাণিত করে। মূর্তিগড়া, ছবি আঁকা এবং অভিনয় কলাতেও পারদর্শী ছিলেন। মৃত্যু. ১৬ জুন ১৮৮৬।



রামচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৪৭-১৯২২)॥ জন্ম. আবুরখালী, রাউজান, চট্টগ্রাম। সাহিত্যিক। লাইসেন্সসিয়েট মেডিক্যাল প্রাকটিশনারশিপ পরীক্ষায় পাস করে সরকারি চাকরি গ্রহণ। প্রকাশিত গ্রন্থ: চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস, শ্রমণ কর্তব্য, নির্বাণ দর্শন, কর্মস্থান, শিশুচিকিৎসা। মৃত্যু. ১৯২২।

রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮)॥ জন্ম. বারুইহুদা, নদীয়া, ১৮১৩। শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক। শিক্ষাজীবন শুরু গ্রামের পাঠশালায়, সেখানে প্রচলিত প্রথানুযায়ী আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ও সামান্য ইংরেজি শিক্ষা লাভ। ১৮২৬-এ কলকাতা গমন ও কলুটোলা ব্রাহ্ম স্কুলে ভর্তি। দু'বছর পর বৃত্তিসমেত হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণিতে প্রবেশ। ১৮৩২-এ এই কলেজে বৃত্তি লাভ, ১৮৩৩-এ কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত। কর্মজীবনে সরকারি শিক্ষা বিভাগে যোগ দিয়ে প্রথমে হিন্দু কলেজ, পরে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, বর্ধমান স্কুল, উত্তরপাড়া স্কুল, বারাসত স্কুল এবং বরিশাল জেলা স্কুলে শিক্ষকতা। কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৮৬৫-তে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। কিছুদিন গোবরডাঙা মুখোপাধ্যায় জমিদার পরিবারে সরকার নির্দিষ্ট অভিভাবকের কর্ম সম্পাদন। কলেজ-জীবনে ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসেন এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অন্যতমরূপে পরিচিতি লাভ। ডিরোজিওর প্রভাবে ইহলৌকিক, যুক্তিবাদী ও মানবকল্যাণমুখী ভাবধারা গ্রহণ। তাঁর উপর ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাব থাকলেও কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। কুসংস্কার ও জাতিভেদের প্রবল বিরোধী। নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতির অন্যতম প্রবক্তা। বিধবা বিবাহের পক্ষে মত প্রকাশ, উপবীত



ত্যাগ। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা। প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তাঁকে সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। এমন কি আত্মীয়গণ কর্তৃক 'একঘরে' হন। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রকাশের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের (১৮৩৮) অন্যতম এবং পরে সম্পাদক। আধুনিক ও মুক্ত দৃষ্টির অধিকারী রামতনু লাহিড়ী আজীবন জ্ঞান অন্বেষণে জীবন ব্যয় করেছেন। উনিশ শতকের বাংলাদেশের শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। রামতনু লাহিড়ীকে Arnold of Bengal বলা হতো। মৃত্যু. ১৮ আগস্ট ১৮৯৮।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) জন্ম. হরিনাভি গ্রাম, চব্বিশ পরগণা, ২৬ ডিসেম্বর, ১৮২২। নাট্যকার। পিতা রামধন শিরোমণি। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া কর্তৃক সন্তান-স্নেহে লালিত-পালিত। কলকাতা হিন্দু গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর তাঁর ভ্রাতা। গ্রামের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষারম্ভ। পরে কলকাতা হিন্দু গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে দশ বছর অধ্যয়ন (১৮৪৩-১৯৫৩)। কলকাতা হিন্দু-মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্তি লাভ। এখানে দুই বছর শিক্ষকতা করার পর ১৮৫৫-তে কলকাতা হিন্দু গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে যোগদান। এ কলেজে সাতাশ বছর অধ্যাপনা করার পর ১৮৮২-তে অবসর গ্রহণ। বাকি জীবন হরিনাভি গ্রামে বাস। এখানে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষাদান। নাটক রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান। বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিধিবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার কৃতিত্ব তাঁর। বাঙালির প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনাশ্রিত নাটকের প্রথম স্রষ্টা হিসেবে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও সার্থক নাটক। এতে কুলীনদের বহুবিবাহ প্রথার হৃদয়হীনতার চিত্র হাস্যরসের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন। এ নাটক রচনার জন্য রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার লাভ (১৮৫৪)। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য তাঁর দ্বারা লেখানো হয় 'রত্নাবলী' নাটক (১৮৫৮)। বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার নিন্দা করে রচনা করেন অপর সামাজিক নাটক 'নব-নাটক' (১৮৬৬)। এ নাটক রচনার জন্য কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে দুইশত টাকা পারিতোষিক পান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালায় এটি বহুবার অভিনীত। প্রকাশিত অন্যান্য নাটক: বেণীসংহার (১৮৫৬), যেমন কর্ম তেমন ফল (প্রহসন, ১৮৬৫), মালতীমাধব নাটক (১৮৬৭), উভয় সঙ্কট (প্রহসন, ১৮৬৯), চক্ষুদান (প্রহসন, ১৮৬৯), রুক্মিণী হরণ (১৮৭১), স্বপ্নধন নাটক (১৮৭৩), ধর্মবিজয় (১৮৭৫), কংসবধ নাটক (১৮৭৫)। প্রবন্ধ পুস্তক: পতিব্রতোপাখ্যান (১৮৫৩)। নাটক রচনায় নৈপুণ্যের জন্য 'দি বেঙ্গল ফিলহার্মোনিক আকাদেমি' কর্তৃক 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান। জনসাধারণ কর্তৃক 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে আখ্যায়িত। মৃত্যু. হরিনাভি, ১৯ জানুয়ারি, ১৮৮৬।



রামপ্রসাদ সেন (আনুমানিক ১৭২০-১৭৮২)। জন্ম. হালিশহর, চব্বিশ পরগণা, ১৭২০। শক্তিসাধক, গীতিকার, কবি ও গায়ক। ১৬ বছর বয়সের মধ্যেই বাংলা, সংস্কৃত, ফারসি ও হিন্দি ভাষায় দক্ষতা অর্জন। পিতা রামরাম প্রসাদের মৃত্যুর পর জীবিকা নির্বাহের জন্য ১৭/১৮ বছর বয়সে কলকাতায় আগমন। সেখানে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে মুহুরিগিরি চাকরি লাভ। পরবর্তীকালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ। তান্ত্রিক শক্তিসাধক হিসেবে খ্যাত। শ্যামাবিষয়ক গীত রচনায় পারদর্শিতা প্রদর্শন। তাঁর রচিত সংগীত 'রামপ্রসাদী সংগীত' নামে পরিচিত। রামপ্রসাদই বাংলা সাহিত্যে শক্তিগীতি ধারার প্রবর্তক। তাঁর নামে প্রচারিত পদের সংখ্যা তিন শতাধিক এ-সকল গানে কালীভক্তির ব্যাকুলতা নিপুণভাবে প্রকাশিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিসহ একশত বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'কালীকীর্তন' তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ। মৃত্যু. ১৭৮২।

রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৯-১৯২৭)। জন্ম. কেদারপুর গ্রাম, টাঙ্গাইল, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯। লেখক, ঐতিহাসিক ও পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের নেতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: হজরত মোহম্মদ (১৯০৪),

মোগল বংশ (১৯০৪), ইসলাম কাহিনী (১৯০৪), রিয়াজুস সালাতীন (অনুবাদ, ১৯০৫), ব্রতমালা (১৯০৭), পাঠান রাজবৃত্ত (১৯১১), প্রাচীন ভারত (১৯১৪), প্রাচীন রাজমালা (১৯২৪), চেঙ্গিস খাঁ ও তাহার উত্তরাধিকারীগণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ও পৃষ্ঠপোষক। অধ্যাপক হিসেবে খ্যাতি অর্জন ছাড়াও ১৯১৮-র ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে ইতিহাস শাখার সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ বিশ্লেষণধর্মিতা ও পাণ্ডিত্যের জন্য বিদ্বৎসমাজের প্রশংসা অর্জন করে। মৃত্যু. ১৯২৭।

রামমোহন রায়, রাজা (১৭৭২-১৮৩৩)॥ জন্ম. রাধানগর, হুগলী, ১৭৭২। রাধাকান্ত রায় ও তারিণী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র তিনি। সমাজ সংস্কারক, ধর্ম সংস্কারক, চিন্তাবিদ ও বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তাঁর বিদ্যাশিক্ষার হাতে খড়ি। পাটনায় আরবি ও ফারসি এবং কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ। তরুণ বয়সেই তাঁর মনে আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ ঘটে। যৌবনে কিছুকাল পিতার জমিদারির তত্ত্বাবধান। পৈতৃক-সূত্রে কিছু জমি, বাগান ও জোড়াসাঁকোর বাড়ির স্বত্বাধিকারী হন। এছাড়া নিজে দু'খানি তালুক কিনেন। ১৭৯৬-র পর অর্থোপার্জনের প্রতি মনোযোগ প্রদান। কলকাতায় প্রায়ই আসতেন এবং নবাগত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁদের নানা বিষয়ে সাহায্য প্রদান। এই সুযোগে ভালভাবে ইংরেজি শেখেন। ১৮০১-এ কলকাতায় সিভিলিয়ান জন ডিগবির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কোম্পানির কাগজ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় শুরু। ৭ মার্চ ১৮০৩ থেকে দু'মাস কাল যশোরে কালেক্টর উডফোর্ডের অধীনে দেওয়ানরূপে কর্ম সম্পাদন। ১৮০৩-এ মুর্শিদাবাদ থাকাকালীন একেশ্বরবাদ সম্পর্কে তাঁর প্রথম রচনা আরবি ও ফারসি ভাষায় লিখিত 'তুহফাৎউল মুয়াহ্হিদ্দীন' প্রকাশিত। ১৮০৫-১৮১৪ সময়ে ডিগবির দেওয়ানরূপে প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হন। ১২ এপ্রিল ১৮০৯-এ স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিলটনের সঙ্গে মত-বিরোধের প্রেক্ষাপটে আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য লর্ড মিন্টোর কাছে লিখিত অভিযোগ উপস্থাপন। ১৮১৪ থেকে কলকাতায় বসবাস। সর্বসংস্কারমুক্ত রামমোহন এ সময় থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ত্যাগ করে পাশ্চাত্য ধারায় জীবন যাপন করেন। ১৮১৫-১৮১৯-এর মধ্যে একেশ্বরবাদ ধর্মমত অনুসারে অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বেদান্তসূত্র ও তৎসমর্থক উপনিষদ প্রকাশে ব্রতী হন। ১৮১৫-তে একেশ্বর উপাসনার উদ্দেশ্যে 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠা। একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করে রামমোহন যে ধর্মমত প্রবর্তন করেন তার নাম ব্রাহ্মধর্ম। হিন্দুধর্মে নিরাকার ব্রহ্মোপসনাই প্রকৃষ্ট' এই মত প্রচারের জন্য রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাঁর বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। হিব্রু ভাষা শিখে বাইবেলের নতুন ব্যাখ্যা দিলে পাদ্রিদেরও বিরাগভাজন হন। ১৮২১-এ 'ইউনিটারিয়ান কমিটি' নামক অপর একটি ধর্মসভা স্থাপন। ২০ আগস্ট ১৮১৮-এ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখের সহায়তায় 'ব্রাহ্ম-সমাজ' প্রতিষ্ঠা। দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য ডেভিডহেয়ার ও রামমোহনের চেষ্টায় ১৮১৭-তে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত। ১৮২৩-এ নিজ ব্যয়ে কলকতায় অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা। উনিশ শতকের প্রধান সমাজ সংস্কারক হিসেবে খ্যাত। হিন্দুসমাজে প্রচলিত সহমরণ প্রথা (সতীদাহ প্রথা) রোধের উদ্দেশ্যে নিজমতের সপক্ষে হিন্দুশাস্ত্রের নানা প্রমাণ দাখিল করে সরকারি পর্যায়ে এই কুপ্রথা বিলোপের প্রয়াস পান। ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯-এ লর্ড বেন্টিংক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর মতামত ছিল অতি-আধুনিক ধরনের। জমিদার শ্রেণির অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক সম্প্রদায়ের দুরবস্থার প্রতিকার দাবি করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ (১৮৩১)। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। প্রেস রেগুলেশনের প্রতিবাদ করে সুপ্রিম কোর্টে এক দরখাস্ত দাখিল (১৮১৮)। সম্পাদিত পত্রিকা: ইংরেজি-বাংলায় দ্বি-ভাষিক ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), বাংলায় 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) ও ফারসি ভাষায় 'মীরাৎ-উল-আখবার' (১৮২২)। দিল্লির বাদশাহ-কর্তৃক 'রাজা' উপাধি প্রদান এবং বাদশাহর দূত হিসেবে ইংল্যান্ডে ব্রিটিশরাজের কাছে প্রেরিত হন। ১৮৩১-এ লন্ডনে উপস্থিত হবার অল্পকাল পরেই তিনি দার্শনিক জেরেমি



বেন্থামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ফ্রান্স যান। ১৮৩২-এ প্যারিসে ফরাসি সম্রাট লুই ফিলিপ কর্তৃক সংবর্ধিত। ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে মত্যুবরণ করেন এবং বিলেতেই সমাহিত। বাংলা গদ্যের প্রস্তুতিপর্বে বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৫), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮), গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩) প্রভৃতি ৩০টি বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। এছাড়া তাঁর ৩৯টি ইংরেজি রচনাও রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। পাশ্চাত্য-জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারা সমন্বয়সাধনের প্রথম উদ্যোক্তা। বাংলা গদ্যের বিকাশে তাঁর অবদান স্মরণীয়। গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে বাংলায় প্রবন্ধ রচনার প্রথম কৃতিত্ব তাঁর। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে একদিকে যেমন এ ভাষার ভাব ও শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন, তেমনি অন্যদিকে এ ভাষায় তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ রচনা করে এতে প্রকাশভঙ্গির দৃঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চার করে একে ঋজু, সতেজ ও পুষ্ট করেছেন। মৃত্যু. ইংল্যান্ড ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩।

রামরাম বসু (আনুমানিক ১৭৫৭-১৮১৩)॥ জন্ম. চুচুঁড়া, হুগলী, ১৭৫৭। আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের অন্যতম লেখক। চব্বিশ পরগণার নিমতা গ্রামে শিক্ষালাভ। ফারসি ভাষা জানার আগ্রহে কিছুকাল সুপ্রিম কোর্টের ফারসি দোভাষী উইলিয়ম চেম্বার্সের মুনশিরূপে কর্মরত। ১৭৮৭-১৭৯২ পর্যন্ত কেরীর সহকর্মী জন টমাসের বাংলা ভাষার শিক্ষক ও সহকর্মীরূপে কর্ম সম্পাদন। ১৮৯৩-১৮৯৬ পর্যন্ত উইলিয়ম কেরীকে বাংলাভাষা শেখান এবং কেরী সাহেবের মুনশিরূপে পরিচিত হন। ১৮০১-এ কেরী কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের (স্থাপন মে ১৮০০) বাংলা বিভাগের সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত। ১৮১৩ পর্যন্ত আমৃত্যু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যুক্ত। পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূরীকরণের জন্য রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র লিখলে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিনশ' টাকা পারিতোষিক পান। ১৮০১-এ প্রকাশিত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র-ই বাংলায় প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গ্রন্থ। 'লিপিমালা' (১৮০২) তাঁর অপর গদ্যগ্রন্থ। রামরাম বসুর রচনারীতি সরল ও সহজ; মুখের ভাষার কাছাকাছি। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: খৃস্ট-স্তব, গসপেল মেসেঞ্জার গ্রন্থের প্রথম বাংলা অনুবাদ হরকরা, জ্ঞানোদয়, লিপিমালা, খৃস্ট বিবরণামৃতং। মৃত্যু. ৭ আগস্ট ১৮১৩।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩)॥ জন্ম. পাঠকপাড়া গ্রাম, বাঁকুড়া, ২৯ মে ১৮৬৫। সাংবাদিক। বাঁকুড়া স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৩৩), কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ.এ. (১৮৮৫), কলকাতার সিটি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. (১৮৮৮) এবং ইংরেজিতে এম.এ. (১৮৯০) ডিগ্রি লাভ। প্রতিটি পরীক্ষাতেই কৃতিত্ব প্রদর্শন ও বৃত্তি লাভ। ১৭৯৩-১৭৯৫ পর্যন্ত সিটি কলেজে, ১৮৯৫-১৯০৫ পর্যন্ত এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালায় (কলেজ) ও ১৯২৪-১৯২৫ পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রণী পুরুষ। 'দাসী' (১৮৯২), 'মুকুল' (১৮৯৫), 'প্রদীপ' (১৮৯৭) প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা। এলাহাবাদে প্রবাসকালে ১৯০১-এর এপ্রিল মাসে বিখ্যাত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'প্রবাসী' প্রকাশ। প্রথম প্রকাশ প্রবাসে (এলাহাবাদে) বলে এর নাম রাখা হয় 'প্রবাসী'। সুদীর্ঘকাল এ পত্রিকা সম্পাদনা। ১৯০৭-এ ইংরেজি মাসিক পত্রিকা 'মডার্ন রিভিউ' ও ১৯২৭-এ হিন্দি ভাষায় 'বিশাল ভারত' পত্রিকা প্রকাশ। ইংরেজি ও বাংলা মাসের পহেলা তারিখ থেকে পত্রিকা প্রকাশের পদ্ধতি তৎ-কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত। স্কুলে পাঠকালে ব্রাহ্ম শিক্ষকদের সান্নিধ্য লাভ। ১৮৮৯-তে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। ১৯১০-এ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্পাদক ও ১৯২২-এ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি নিযুক্ত। নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও দৃঢ়চেতা সাংবাদিক হিসেবে খ্যাত। সত্যনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বহুবার নিগৃহীত হন। মৃত্যু. ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩।



রামু খাঁ (আঠারো শতক)॥ ১৭৭৬-এর প্রথম চাকমা বিদ্রোহের নায়ক। পাহাড়িয়া তুলাচাষী এই চাকমা নেতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইজারাদারদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে

আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং পাহাড়ি অঞ্চল থেকে ইংরেজ শাসনের মূলোচ্ছেদে প্রয়াসী হন। চাকমাদের ঐক্যবদ্ধ করে কার্পাস কর দেওয়া বন্ধ করেন এবং রাঙ্গুনিয়া ও অন্যান্য স্থানের ইজারাদারদের ঘাঁটি ধ্বংস করেন। ফলে ইজারাদাররা পালিয়ে যায়. রামু খাঁ ছিলেন চাকমা রাজা শের দৌলতের সেনাপতি ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। দুজনই ছিলেন দেশপ্রেমিক ও বিদ্রোহী স্বভাবের। চাকমাদের উপর রামু খাঁর অসাধারণ প্রভাব ছিল। ফলে এঁদের বিদ্রোহ বেশ সফল হয়ে ওঠে। তখন এঁদের দমন করার জন্য ইংরেজ শাসকদের সেনাবাহিনী ইজারাদারদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তীর-ধনুক দিয়ে ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব বিবেচনা করে বিদ্রোহী চাকমারা গভীর অরণ্যে সরে পড়ে। তখন ইংরেজ সৈন্যরা বিভিন্ন স্থানে চৌকি বসিয়ে চাকমাদের হাটবাজারে আসা ও খাদ্য সংগ্রহের পথ বন্ধ করে দেয়। এতে রামু খাঁ বশ্যতা স্বীকার করে এবং প্রতিবছর ৫০১ মন তুলা বার্ষিক রাজস্ব হিসেবে ইংরেজ শাসকদের দিতে বাধ্য হন। জন্ম মৃত্যু. তারিখ অজ্ঞাত।

রামু মালী (১৮৪০-১৯১৪)॥ জন্ম. আউটপাড়া গ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ১৮৪০। কবিয়াল। সমকালে সারা বাংলাদেশে পরিচিত এক খ্যাতিমান কবিয়াল। ময়মনসিংহের তিন প্রধান কবিয়াল রামগতি, রামকানাই ও রামু মালী। তিনজনেরই জন্ম তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহকুমায়। এঁদের মধ্যে রামু মালী নিরক্ষর হলেও প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী ও কবিগানের জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিতে সক্ষম হন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি রামুর কোনো আগ্রহ ছিল না। ভুঁইমালী সম্প্রদায়ভুক্ত ও প্রায় নির্বিত্ত রামুর এ ব্যাপারে কোনো সঙ্গতিও ছিল না। কিন্তু প্রখর বুদ্ধি, সংগীত প্রেম ও আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর প্রধান সম্বল। এতে আকৃষ্ট হয়ে অমর ভট্টাচার্য তাঁকে শিষ্য করে নেন এবং রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, তন্ত্র, পুরাণ এবং বিভিন্ন শাস্ত্র মুখে মুখে শিক্ষা দেন। খুব স্বল্প সময়ে এ-সকল বিদ্যায় রামু বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সেই সঙ্গে তাঁর সুপ্ত কবি প্রতিভাও জাগ্রত হয়ে উঠে। চৌদ্দ বছর বয়সে রামু কবির দলে প্রবেশ করেন এবং বিশ বাইশ বছর বয়সে একজন বিখ্যাত কবির সরকার হয়ে উঠেন। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দে মুখে মুখে ছড়া রচনা এবং পাঁচালীতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। পাঁচালী কীর্তন দ্বারা তিনি সভাকে হাসাতে বা কাঁদাতে পারতেন। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, যমকানুপ্রাস, ব্যজস্তুতিতে তাঁর তুলনা ছিল না। ধর্ম ও শাস্ত্রের নিগূঢ় ব্যাখ্যার ক্ষমতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও প্রতিপক্ষকে হতবুদ্ধি, প্রয়োজনে নাজেহাল করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। মুখে মুখে রচিত রামুর ছড়া-পাঁচালী বা বিদ্রূপবাণ মিশ্রিত পঙ্‌ক্তিমালা হারিয়ে গেছে কিন্তু কালের বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করা গেছে তাঁর মৌল চেতনাবিধৃত কিছু অবিনাশী পঙ্‌ক্তি। তার একটি লাইন এ রকম, 'জাতিকুল, সেতো স্থূলের দেশে গেলে'। মৃত্যু. ১৯১৪।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)॥ জন্ম. টেঁয়া গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, ২৪ আগস্ট, ১৮৬৪ (৫ ভাদ্র, ১২৭১)। প্রাবন্ধিক। শিক্ষাজীবনে অত্যন্ত মেধার পরিচয় প্রদান। প্রতিটি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ। কান্দি ইংরেজি স্কুল থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পাস (১৮৮২)। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এফ.এ. (১৮৮৪), পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. (১৮৮৬) এবং পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. (১৮৮৭) ডিগ্রি লাভ। ১৮৮৮-তে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ। ১৮৯২-তে কলকাতা রিপন কলেজে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯০৩-এ উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' (১৮৯৪) স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা। এ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন (১৯০৪-১৯১১)। ১৯১৯-এ এর সভাপতি নির্বাচিত। পরিষদের মুখপাত্র 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' সম্পাদনা (১৮৯৯-১৯০৩, ১৯১৭-১৯১৮)। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। 'প্রকৃতি' (১৮৯৬) শীর্ষক গ্রন্থে তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধাবলী ও 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৩) শীর্ষক গ্রন্থে দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধাবলী সংকলিত। 'চরিতকথা' (১৯১৩), 'কর্মকথা' (১৯১৩), বিচিত্র



প্রবন্ধ (১৯১৪), শব্দ-কথা (১৯১৭), 'যজ্ঞকথা' (১৯২০), বিচিত্র জগৎ' (১৯২০) তাঁর অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের সংকলন। বিজ্ঞান ও দর্শনের জটিল তত্ত্ব প্রাঞ্জল ও সাবলীল গদ্যে বিশ্লেষণ করে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন। মৃত্যু. কলকাতা, ৬ জুন, ১৯১৯ (২৩ জ্যেষ্ঠ, ১৩২৬)।

রালফ্ লিলি টার্নার, স্যার (১৮৮৮-১৯৮৩)॥ জন্ম. ১৮৮৮। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ। ক্লাসিক্স আর প্রাচ্যভাষার ট্রাইপসে প্রথম শ্রেণির অনার্স নিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে বি.এ. পাস। সংস্কৃতে ব্রাদার্টন পুরস্কার লাভ। ১৯১৩-তে ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে যোগ দিয়ে কাশীর কুইন্স কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত। নব্যভারতীয় আর্যভাষা নিয়ে গবেষণা শুরু। এর প্রথম ফসল: The Indo-Aryan Nasals in Gujarati (১৯১৫)। ১৯১৬-তে প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান। সহযোদ্ধা গুর্খাদের কাছ থেকে নেপালি কথ্য ভাষা শিক্ষা। দীর্ঘদিন এ বিষয়ে চর্চার ফলে প্রকাশিত হয়: Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali Language (১৯১৩)। নেপালি ভাষার সীমাবদ্ধ শব্দ সম্পদের আলোকে এতে বিধৃত হয় সমগ্র ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের ইতিহাস। এ বইয়ে টার্নার শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি বিচারের এক নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন। টার্নারের সব চেয়ে বড় কাজ গ্রীয়ার্সনের Linguistic Survey of India-র পরিশিষ্টরূপে পরিকল্পিত ভারতীয় ভাষার তুলনামূলক অভিধানের কাজটি সম্পন্ন করা। ১৯৫৭-তে সত্তর বছর বয়সে টার্নার লন্ডনের ওরিয়েন্টাল স্কুলের ডিরেক্টরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে এ কাজে হাত দেন। দশ বছর ধরে একাগ্র নিষ্ঠায় কাজ করে এই বয়স্ক পণ্ডিত এই অসামান্য কাজটি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। ১৯৬২ থেকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে ১৯৬৬-তে A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages গ্রন্থটির প্রকাশনা সম্পূর্ণ হয়। ১৫০০০ [illegible] থেকে উৎপন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষ[illegible]দের এই অভিধান ভারতীয় ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে এক অসামান্য অবদান। টার্নারের অন্যান্য কীর্তির মধ্যে রয়েছে নব্য ভারতীয় ভাষা ও উপভাষা চর্চার ক্ষেত্রে একদল দক্ষ ভারতীয় পণ্ডিত গবেষকের সৃষ্টি। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন: বাবুরাম সাকসেনা, রঘুবীর, এস.এম. কাত্রে, বনারসীদাস জৈন, সিদ্ধেশ্বর বর্মা প্রমুখ। ১৯২২-এ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হলে টার্নারকে নির্বাচিত করা হয় ঐ সম্মানজনক আসনের জন্য। ১৯৩৭-এ কলকাতা মাদ্রাসার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসির অধ্যাপক স্যার ডেনিসন রস ওরিয়েন্টাল স্কুলের ডিরেক্টরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে সংস্কৃতের অধ্যাপক টার্নার ঐ পদে বৃত হন। এই পদে তাঁর নিয়োগের ফলে ইংলন্ডে ভারতবিদ্যার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯২০-এ কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্বোধনী বক্তৃতায় টার্নার একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব রেখেছিলেন। এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন/অধ্যাপনার বিষয় হবে ভারতবিদ্যা-বিশেষ করে ভারতীয় ভাষা। একদিকে ধ্বনিবিজ্ঞানের ল্যাবরেটারিতে আধুনিক কথ্য ভাষা উপভাষা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ, অন্যদিক পুঁথিপত্র ঘেঁটে ভাষার লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার। ওরিয়েন্টাল স্কুলের পরিচালক হয়ে টার্নার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাঁর প্রস্তাবিত দুটি কাজই এই স্কুলের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করার চেষ্টা করে গেছেন। ফলে প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার একটি গভীরতাশ্রয়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওরিয়েন্টাল স্কুল ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। দৃঢ় অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও অসাধারণ সংগঠন শক্তির জন্যই টার্নারের পক্ষে প্রায় এককভাবে এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। মৃত্যু. ২২ এপ্রিল ১৯৮৩।

রাশীদুল হাসান (১৯৩২-১৯৭১)॥ জন্ম. বড়শিজা গ্রাম, বীরভূম, ১ নভেম্বর ১৯৩২। শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক ও কবি। প্রকৃত নাম শেখ মুহম্মদ আবদুর রশীদ। মুর্শিদাবাদ জেলার ভাবতা আজিজিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৪৭-এ হাই মাদ্রাসা এবং ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ১৯৪৯-এ আই.এ. পাস। ১৯৫২-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৫৮-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে এম.এ. (ইংরেজি) পাস। ১৯৫৪-১৯৫৫ পর্যন্ত



নরসিংদী কলেজে, ১৯৫৬-১৯৫৯ পর্যন্ত পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজে, ১৯৫৯-১৯৬৭ পর্যন্ত বীরভূম জেলার কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাষক। ১৯৬৭-র ৪ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান। ১৯৭০-এ সিনিয়র প্রভাষক পদে উন্নীত। ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ১৯৭১-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনামূলক ইংরেজি ও বাংলায় প্রবন্ধ প্রকাশ। মৃত্যু. স্বাধীনতাযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী আল-বদর বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং মীরপুরে বধ্যভূমিতে হত্যা করে।

রাসমোহন চক্রবর্তী (১৮৯৯-১৯৮২)॥ জন্ম, বেরাচাকি, চাঁদপুর, ১৬ নভেম্বর ১৮৯৯। প্রাচ্যভাষা, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে পণ্ডিত। পিতা তিলকচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা বামাসুন্দরী দেবী। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন পিতৃবিয়োগ ও দেড় বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ, ফলে নরসিংহপুরে নিকটাত্মীয়ার স্নেহাদরে লালিত। ১৯১৫-এ নরসিংহপুর এম.ই. স্কুল থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও বৃত্তিলাভ। ১৯১৯-এ চাদপুর হাসান আলী জুবিলী হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও বৃত্তিলাভ। ঢাকা কলেজে ভর্তি হলেও মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ত্যাগ এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত কলেজে ভর্তি। এখান থেকে ১৯২১ ও ১৯২৩-এ প্রথম বিভাগে আই.এ. ও বি.এ পাস করেন। ১৯২৫-এ ইতিহাস ও দর্শনে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাস করেন। কিছুদিন ঢাকা ন্যাশনাল কলেজে শিক্ষকতা করেন। দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের আহবানে ১৯২৬-এ রামমালা গ্রন্থাগারের (১৯১৭) প্রধান গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব গ্রহণ এবং আজীবন রামমালা ছাত্রাবাসের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন। মহেশবাবু বেশি দূর লেখাপড়া করতে না পারায় তার মনোবেদনা দিল। এজন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। রামমালা গ্রন্থাগার ছিল রাসমোহন চক্রবর্তীর সাধনস্থল দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় সেখানে কাটাতেন; তাঁর প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বই সংগৃহীত হতো। আবার সংগৃহীত প্রতিটি বইয়ের সারাংশ রচনা করে মহেশ বাবুর জ্ঞানতৃষা তিনি নিবৃত্ত করতেন। এভাবে গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আজ বাংলাদেশের সমৃদ্ধতম গ্রন্থাগার হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির পেছনে তাঁর অবদান অনেক। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ভিত্তিক গ্রন্থরচনা করেছেন। গ্রন্থাগারে মুদ্রিত গ্রন্থ, সাময়িকপত্র এবং হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির এক বিরাট ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল তারই পরম যত্নে। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী: মহাপ্রাণ মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রথম খণ্ড, ১৯৬৯,) অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (১৩৭৪), বিবেকানন্দ বাণী সংগ্রহ, শ্রীশ্রীচণ্ডী (১৩৬০), সর্বোল্লাসতন্ত্রম (১৯৪১), শ্রীসপ্তমতী রহস্যময় (১৩৬৩), যুগাশঙ্খ (১৩৩৭), রামমালা গ্রন্থাগার গ্রন্থ তালিকা (১৯৩৯) রামমালা গ্রন্থতালিকা (১৯৪৯), দৈনিক প্রার্থনা (১৩৬৭), আষাঢ়ী পূর্ণিমা ধর্মচক্র প্রবর্তন (১৯৬৫), মাঘী পূর্ণিমা ও তথাসত্ত্বের অন্তিম যাত্রা (১৩৭৫)। মৃত্যু. কুমিল্লা, ১৪ মে ১৯৮২।



রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১)॥ জন্ম. রেডক্রস হাসপাতাল, বরিশাল, ১৬ অক্টোবর ১৯৫৬। কবি। পৈতৃক নিবাস মংলা, খুলনা। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। ঢাকা ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল থেকে ১৯৭৪-এ এস.এস.সি এবং ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৭৬-এ এইচ.এস.সি. পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অনার্স ক্লাসে ভর্তি। ১৯৮০-তে বি.এ. অনার্স (বাংলা) ও ১৯৮৩-তে এম.এ. (বাংলা) ডিগ্রি লাভ। ১৯৮১-র ২৯ জানুয়ারি নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৮৮-তে সাত বছরের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট' ও 'জাতীয় কবিতা পরিষদ' গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা। 'জাতীয় কবিতা পরিষদের'



প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-সম্পাদক। পঁচাত্তরের পরের সবকটি সরকারবিরোধী ও স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ প্রতিবাদী কবি হিসেবে খ্যাত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, দেশাত্মবোধ, গণ-আন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত। এছাড়া স্বৈরতন্ত্র ও ধর্মের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে রুদ্র'র কণ্ঠ ছিল উচ্চকিত। কবিকণ্ঠে কবিতা পাঠে যে ক'জন কবি কবিতাকে শ্রোতৃপ্রিয় করে তোলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ: উপদ্রুত উপকূল (১৯৭৯), ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম (১৯৮১), মানুষের মানচিত্র (১৯৮৬), ছোবল (১৯৮৬), গল্প (১৯৮৭), দিয়েছিলে সকল আকাশ (১৯৮৮), মৌলিক মুখোশ (১৯৯০), খুঁটিনাটি খুনশুটি ও অন্যান্য কবিতা (১৯৯১)। 'বিষ বিরিক্ষের বীজ' (১৯৯২) তাঁর একখানি কাব্যনাট্য। গীতিকার হিসেবেও জনপ্রিয়তা অর্জন। সংস্কৃতি সংসদ প্রবর্তিত মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার লাভ (১৯৮০)। মৃত্যু. ঢাকা, ২১. জুন ১৯৯১।

রুহুল আমিন, মওলানা (১৮৮২-১৯৪৫)॥ জন্ম. নারায়ণপুর গ্রাম, বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা, ১৮৮২। ইসলাম প্রচারক, ইসলামি সাহিত্যের স্রষ্টা। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা এবং ইংরেজি ও বাংলাভাষা স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরকাল বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচার। তাঁর ১১৪টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়। মৃত্যু. ১৯৫৪।

রুহুল কুদ্দুস (১৯২৪-১৯৯১)॥ জন্ম. পাঁচরিখি গ্রাম, সাতক্ষীরা, খুলনা, ১৯২৪। সিভিলিয়ান। পিতা রইসউদ্দিন আহমেদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে এম.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯৪৮)। ঐ বছর ঢাকা কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান। ১৯৪৯-এ



পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সরকারি চাকরিতে যোগদান। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালে গোপনে পূর্ববাংলার স্বাধিকার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত থেকে দেশাত্মবোধের পরিচয় প্রদান। শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত পূর্ববাংলার মুক্তিসনদ ৬ দফা কর্মসূচির অন্যতম প্রণেতা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার (১৯৬৮) অন্যতম আসামি। ১৯৬৮-র ৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার। সরকার কর্তৃক এ ষড়যন্ত্রকে আগরতলা ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত। একই অভিযোগে ১৭ জানুয়ারি (১৯৬৮) শেখ মুজিবুর রহমানকে (সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ) গ্রেফতার। ৩৫ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের। এ মামলাই ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। মামলার সরকারি নাম 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিচার'। এ মামলার ৩৫ জন আসামির মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ১, আর রুহুল কুদ্দুস ছিলেন ১০ নম্বর আসামি। ১৯৬৮-র ৯ জুন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে সিগনাল অফিসার মেসে মামলার শুনানী শুরু। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছিল: 'অভিযুক্তরা ভারতের সাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন।' মামলার শুনানির শেষ তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণআন্দোলনের চাপে ২২ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) মামলা প্রত্যাহার করে নিলে মুক্তিলাভ। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী মুজিবনগর সরকারের (১৯৭১) মুখ্য সচিব পদে দায়িত্ব পালন। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারেরও মুখ্য সচিব নিযুক্ত। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে পদচ্যুত। একজন দেশপ্রেমিক বাঙালি। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। মৃত্যু. গুলশান, ঢাকা, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।

রেবতীমোহন বর্মণ (১৯০৩-১৯৫২)। জন্ম. শিমুলকান্দি, কিশোরগঞ্জ, ১৯০৩। অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তি, মার্ক্সবাদী সাহিত্য প্রসারে অগ্রণী। ঢাকা পগোজ স্কুল ও কুমিল্লা জিলা স্কুলে পড়াশুনা। স্কুলজীবনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে পরিচালিত ইস্টবেঙ্গল রেল

ধর্মঘটে অংশগ্রহণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় (১৯২২) প্রথম স্থান লাভ। ঢাকা শ্রীসংঘের সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ। কলকাতায় ছাত্র পড়িয়ে লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই.এ. এবং সেন্ট পলস কলেজ থেকে স্নাতক। স্নাতক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য জগত্তারিণী পদক লাভ এবং পদক বিক্রির অর্থে কিশোর মাসিক 'বেণু' প্রকাশ। কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর। ১৯৩০-এ গ্রেফতার হয়ে বিনা বিচারে ১৯৩৮ পর্যন্ত বিভিন্ন বন্দী শিবিরে থাকাকালে মার্কসবাদের মূলপাঠ অধ্যয়নের মাধ্যমে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ। জেল থেকে বের হয়ে পার্টির পরামর্শে কৃষক আন্দোলন সংগঠনের কাজে যুক্ত। মার্কসবাদী সাহিত্য প্রসারার্থে ঢাকায় 'গণসাহিত্য চক্র' প্রকাশনা সংস্থা প্রবর্তন। এ প্রয়াসে তাঁর সহযোগী নেপাল নাগ, গোপাল বসাক ও জ্ঞান চক্রবর্তী। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী গঠনেও মুখ্য ভূমিকা পালন। রচিত গ্রন্থ: 'তরুণ রুশ' (১৯২৯), 'সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ' (১৯৫২), 'সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি', 'মার্ক্স প্রবেশিকা', 'কৃষক ও জমিদার', 'সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কট', 'হেগেল ও মার্ক্স', 'ক্যাপিটাল', 'লেনিন ও বলশেভিক পার্টি', 'সমাজের বিকাশ', 'সোভিয়েট ইউনিয়ন', 'শান্তিকামী সোভিয়েট', 'অর্থনীতির গোড়ার কথা', 'Society and its Development', 'Marxist View of Capital' প্রভৃতি। অনূদিত গ্রন্থ: 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', 'সমাজবাদ– বৈজ্ঞানিক ও কাল্পনিক' প্রভৃতি। 'ক্যাপিটাল' অনুবাদে দক্ষতা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর। বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। কৃষকসভার চতুর্থ প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯৪০) সম্পাদকমণ্ডলীর গবেষণা ও তথ্য শাখার সম্পাদক নির্বাচিত। দেশভাগের পরে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় গমন (১৯৫১)। কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শেষদিন পর্যন্ত কষ্টভোগ। মৃত্যু. অরুন্ধতী পাহাড়, আগরতলা, ত্রিপুরা, ৬ মে ১৯৫২।



রেয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৮)॥ জন্ম. চারান গ্রাম, টাঙ্গাইল, ১৮৫৯। সাহিত্যিক। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী। কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসার বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক। পরে দেলদুয়ারের জমিদার এ.কে. গজনভীর এস্টেটের ম্যানেজার। সুধাকর দলের মুখপত্র 'সুধাকর'-এর সঙ্গে যুক্ত। উনিশ শতকে খ্রিস্টান পাদ্রিরা যখন মুসলমানদেরকে দলে দলে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করছিলেন, তখন মুসলমান সমাজকে ধর্মান্তরিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মুসলমানদের জাতীয় জীবনের অতীত ঐশ্বর্য এবং সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক চেতনা ছিল তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম উৎস। গ্রন্থ: সমাজ ও সংস্কারক, অগ্নিকুক্কুট; প্রবন্ধ: কৌমুদী, সুরিয়া বিজয়। মৃত্যু. ১৯১৮।

রোকনুজ্জামান খান, দাদাভাই (১৯২৫-১৯৯৯)॥



সাংবাদিক, সংগঠক, শিশুসাহিত্যিক। জন্ম, পাংশা, রাজবাড়ী, ৯ এপ্রিল ১৯২৫। পিতা মোখাইরউদ্দিন খান। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি। ১৯৪৮-এ আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার 'মিতালী মজলিস' নামের শিশুতোষ পৃষ্ঠা সম্পাদনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। এরপর 'শিশু সওগাত' পত্রিকায় ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৫২-এ দৈনিক মিল্লাতের 'কিশোর দুনিয়া'র শিশু বিভাগের পরিচালক। ১৯৫৫-এ দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় তরুণ সাংবাদিক হিসেবে যোগদান এবং 'কচিকাঁচার আসর' বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত। আসরের পরিচালক হিসেবে নামকরণ হয় 'দাদাভাই'। ১৯৫৬-এ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিশু-কিশোর সংগঠন 'কচিকাঁচার মেলা' প্রতিষ্ঠা। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'হাট্টিমাটিম টিম', 'খোকন খোকন ডাক পাড়ি', 'আজব হলেও গুজব নয়' প্রভৃতি। সম্পাদনা: 'আমার প্রথম লেখা', 'ঝিকিমিকি', 'বার্ষিক কচি ও কাঁচা', 'ছোটদের আবৃত্তি' প্রভৃতি গ্রন্থ। পুরস্কার: বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৮), বাংলাদেশ শিশু একাডেমী পুরস্কার

(১৯৯৪), একুশে পদক ও স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (২০০০)। মৃত্যু, ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)॥



জন্ম, পায়রাবন্দ গ্রাম, রংপুর, ৯ ডিসেম্বর, ১৮৮০। সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী। পৈতৃক নাম রোকেয়া খাতুন। বিবাহের পর নামের শেষে সাখাওয়াত হোসেন যুক্ত। মিসেস আর. এস. হোসেন নামেও পরিচিত। আবু আলী সাবের তাঁর পিতা। এক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্ম। পিতৃগৃহে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইব্রাহিম সাবের ও জ্যেষ্ঠভগ্নী করিমুন্নেসার কাছে সামান্য বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষা লাভ। ষোলো বছর বয়সে উর্দুভাষী ও বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ (১৮৯৭)। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় গৃহে বাংলা ও ইংরেজি উত্তমরূপে আয়ত্ত। বিবাহিত জীবনে দুইটি কন্যা সন্তানের জন্মদান; দুইটি সন্তানেরই অকাল মৃত্যু ঘটে। স্বামীর সঙ্গে ভাগলপুরে বাসকালে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ। স্বামীর মৃত্যুর (১৯০৯) পর সমাজসেবা ও সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ। স্বামীর জন্মস্থান ভাগলপুরে স্বামীর নামে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। সপত্নীর কন্যা বিষয়-সম্পত্তির অংশ নিয়ে অশিষ্ট আচরণ করলে ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায় আগমন (১৯১০)। কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন (১৬ মার্চ ১৯১১)। ১৯১৭-তে এই স্কুল মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুলে ও ১৯৩১-এ উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত। আমৃত্যু এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও সুপারিনটেনডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন। মুসলিম নারীশিক্ষার অন্ধকার যুগে কলকাতার মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ। সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা (১৯১৬): নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্ব ও সমিতির বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট শিল্পী। সমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দূর করার জন্য লেখনী পরিচালনা। তাঁর সব রচনাই সমাজজীবনের বেদনাবোধ থেকে উৎসারিত। মতিচূর (১ম খণ্ড-১৯০৪, ২য় খণ্ড-১৯২২) ও অবরোধবাসিনী (১৯৩১) বেগম রোকেয়ার গদ্যগ্রন্থ। পদ্মরাগ (১৯২৪) তাঁর রচিত উপন্যাস। নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী প্রভৃতি সাহিত্যপত্রে তাঁর বহু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও রসরচনা প্রকাশিত। মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ। পর্দার নামে নারীর ব্যক্তিত্বের অবমাননা শৈশব থেকেই রোকেয়ার মনে তীব্র বেদনাবোধের সঞ্চার করে এবং নারীর প্রতি সমাজের নানা অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতা তাঁর মনে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করে তোলে। বিবাহের পর মুক্ত মনের অধিকারী স্বামীর সান্নিধ্যে এসে তাঁর উচ্চশিক্ষা লাভ ও চিত্তবিকাশের সুযোগ ঘটে। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ও তাদের ন্যায্য অধিকার কায়েমের জন্য নিরলস সংগ্রাম পরিচালনা। মৃত্যু, কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২।

রোমেনা আফাজ (১৯২৬-২০০৩)॥



জন্ম, শেরপুর, বগুড়া, ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬। কথাসাহিত্যিক। পিতা কাজেম উদ্দীন আহম্মদ ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর; মাতা বেগম আছিয়া খাতুন। বগুড়া সদর থানার ফুলকোট গ্রামের ডাক্তার মোঃ আফাজ উল্লাহ সরকারের সঙ্গে বিয়ে। লেখালেখি শুরু নয়বছর বয়স থেকে। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রথম লেখা ছড়া 'বাংলার চাষী' প্রকাশিত। রহস্য সিরিজ 'দস্যু বনহুর' ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। রচিত গ্রন্থ ২৫০টি। 'কাগজের নৌকা', 'মোমের আলো', 'মায়ার সংসার', 'মধুমিতা', 'মাটির মানুষ', 'দস্যু বনহুর' প্রভৃতি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে। এছাড়া 'দেশের মেয়ে', 'জানি তুমি আসবে', 'রক্তে আঁকা ম্যাপ', 'মান্দিগোর বাড়ি' তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। বগুড়ার জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ, বাংলাদেশ

মহিলা জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা, উদীচী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী; বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতি, বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। পুরস্কার: স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ২০১০ (মরণোত্তর), গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার সম্মাননা পদক ২০০৬ (মরণোত্তর), বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম পদক ২০০৩, বগুড়া নারী বিকাশ সংস্থা প্রদত্ত বেগম রোকেয়া স্বর্ণপদক ২০০০, ঢাকার নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা গুণীজন সংবর্ধনা ১৯৯৯ প্রভৃতি। মৃত্যু. বগুড়া, ১২ জুন ২০০৩।

লক্ষ্মণ মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২)॥ জন্ম. চিকদাইর, রাউজান, চট্টগ্রাম, ১৮৬১। স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর এক মাতুলের সাহায্যে ব্রহ্মদেশের আকিয়াবে গমন। আকিয়াবের সরকারি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি। এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর জীবিকার সন্ধানে পড়াশুনা ত্যাগ। কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, মুসলমান মৌলবী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংস্পর্শ লাভ এবং নিজের অধ্যবসায়ে সংস্কৃত, পালি ও আরবি ভাষার ব্যুৎপত্তি অর্জন। এ সময়ে বেদ, বাইবেল, কোরান ও ত্রিপিটক পাঠ করেন। ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, বার্মিজ, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় দক্ষতা লাভ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী—কাব্য: পদ্মিনী, আর্য অনার্য যুদ্ধ, চীন উদ্ধার কাব্য (১৯২৪), চট্টগ্রামী ভাষা, স্বধর্ম। উপন্যাস: জনক নন্দিনী। মৃত্যু. ২৫ জানুয়ারি ১৯৪২।

ললিতমোহন বর্মণ (১৮৯৯-১৯৬১)। জন্ম.



পৈরতলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৭ মার্চ ১৮৯৯। বিপ্লবী। প্রথমজীবনে যুগান্তর দলের কর্মী হিসেবে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ (১৯১৮)। পরবর্তীকালে তাঁরই নেতৃত্বে সমগ্র ত্রিপুরায় বিপ্লবী সংগঠনের বিস্তৃতি লাভ; চা-বাগান শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্পাদক (১৯২২) হিসেবে চিত্তাতোষ বর্ধনের সহায়তায় বিরাট কংগ্রেসে স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন. দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট আন্দোলন পরিচালনাকালে কারারুদ্ধ। পরে অসহযোগ আন্দোলনে কারাদণ্ড। জেল থেকে ফিরে গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ। পল্লী উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, চরকা-খদ্দর প্রচার, নৈশ স্কুল ও দেশলাই কারখানা পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠান' নামীয় সংস্থা গঠন ও প্রতিষ্ঠার কাজে প্রাণান্তর পরিশ্রম। দেশবন্ধুর প্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে এ সংস্থার 'চিত্তরঞ্জন জাতীয় প্রতিষ্ঠান' নামকরণ। এ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে কুমিল্লা জেলার গ্রামে গ্রামে মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস প্রচার। বৈপ্লবিক সংগঠন 'কল্যাণ সংঘ' প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রত্যেকটি স্কুলে এর কেন্দ্র স্থাপন। এ সংগঠন গড়ে তোলার কাজে কয়েকজন বিপ্লবীকে কুমিল্লায় প্রেরণ (১৯২৬)। কয়েক বছরের চেষ্টায় দলের দৃঢ় ভিত্তি লাভ। ছাত্র-যুবাদের সংঘবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ। সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠা ও ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা এবং বক্তৃতা দ্বারা যুবসমাজকে দেশহিতে আকৃষ্টকরণ। ছাত্র-যুবাদের নিয়ে সম্মেলনের তাগিদ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে অনুষ্ঠিত (১৯২৭) 'ত্রিপুরা জেলা যুব সম্মেলন'-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। লবন আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০) ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তাঁর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহী দল ১২৫ মাইল পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে করতে নোয়াখালীর সমুদ্রতীরে গমন। চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ, কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্বদান। কুমিল্লায় সারা ভারত কৃষকসভার অধিবেশনে (১৯৩৮) অংশগ্রহণ। সমাজতান্ত্রিক ও মার্ক্সীয় মতবাদে বিশ্বাসী। শেষজীবনে সমবায় আন্দোলন ও সাংবাদিকতায় যুক্ত। মৃত্যু. ১৯ আগস্ট ১৯৬১।

লায়লা আর্জুমান্দ বানু (১৯২৯-১৯৯৫)॥ জন্ম.



বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা, ৫ জানুয়ারি, ১৯২৯। সংগীতশিল্পী। 'গ্লিমপসেস অব ওল্ড ঢাকা' (১৯৫২) গ্রন্থের প্রণেতা সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর তাঁর পিতা, স্বামী জাতীয় সংসদের সাবেক স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯৪৭)। ওস্তাদ রমণীমোহন ভট্টাচার্য ও

ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খাঁর কাছে গানের তালিম গ্রহণ। নজরুল সংগীত, আধুনিক গান, পল্লীগীতি, গজল প্রভৃতি গানের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী। উর্দু, ফারসি, তুর্কি ও রুশ ভাষায়ও গান গাইতেন। ঢাকা বেতারকেন্দ্রের প্রথম মুসলমান মহিলা কণ্ঠশিল্পী। এ বেতারকেন্দ্রের উদ্বোধনের দিন (১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯) কিশোরদের এক অনুষ্ঠানে প্রথম সংগীত পরিবেশন। উর্দু ও বাংলা চলচ্চিত্রের নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী। সাহনী, এদেশ তোমার আমার ও মাটির পাহাড় ছবির সংগীতে কণ্ঠদান। নজরুল স্বরলিপি সত্যায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, জাতীয় যাদুঘর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, সংগীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা পদে দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে বিবৃতি প্রদান (১৭ মে ১৯৭১)। সংগীতে অবদান রাখায় ইরান সরকারের করোনেশন স্বর্ণপদক (১৯৬৮) ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের প্রাইড অব পারফরম্যান্স পদক (১৯৬৯) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।

লায়লা সামাদ (১৯২৮-১৯৮৯)॥ জন্ম. কলকাতা, ৩ এপ্রিল ১৯২৮। পিতা দিনাজপুরের খানবাহাদুর আমিনুল হক। সাংবাদিক ও লেখিকা। কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল, স্যার আশুতোষ কলেজ ও ব্রাবোর্ন কলেজে অধ্যয়ন।



বি.এ. পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে ডিপ্লোমা লাভ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ১৯৫০-এ 'বেগম' পত্রিকার সহ-সম্পাদিকা নিযুক্ত। ১৯৫২-তে 'দৈনিক সংবাদ'-এ স্টাফ রিপোর্টার পদে যোগদান। সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'-এ মহিলা বিভাগ, 'দৈনিক পূর্বদেশ'-এর শিশুবিভাগ ও 'দৈনিক বাংলা'র মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা। তাঁর সম্পাদনায় মাসিক 'অনন্যা' (১৯৫৪-৫৮) ও মাসিক 'চিত্রিতা' (১৯৬৯) প্রকাশিত। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সহ-সভানেত্রী, বিজনেস ও প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাবের সহ-সভানেত্রী ও ঢাকা সিনে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদিকা। ছোট গল্পের লেখিকা হিসেবে খ্যাত। উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ: দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে (১৯৬৩), কুয়াশার নদী (১৯৬৫), অরণ্যে নক্ষত্রের আলো (১৯৭৫), অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা (১৯৭৮); শিশুসাহিত্য: শ্রী শ্রী বিড়ালোত্তম দাস (১৯৬২); বিবিধ: আপনার শিশুকে জানুন (১৯৬২), বেগম সাহেবা (১৯৭৯), ষোল দেশের ষোল কাহিনী (১৯৭৯)। ছোটগল্পে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৮১)। এদেশের বাংলা দৈনিকের প্রথম মহিলা সাংবাদিক হিসেবে স্মরণীয়। মৃত্যু. ঢাকা, ১০ আগস্ট ১৯৮৯।

লালন সাঁই (১৭৭২-১৮৯০)॥ জন্ম. ভাঁড়ারা গ্রাম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া। অক্টোবর ১৭৭২। বাউলসাধক ও বাউল কবি। প্রবাদ আছে-এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে তাঁর জন্ম। কোন এক সময় তিনি এক বাউল দলের সঙ্গী হয়ে গঙ্গাস্নানে যান। পথিমধ্যে বসন্ত রোগাক্রান্ত হলে সঙ্গীরা



তাঁকে নদীর তীরে ফেলে যান। সিরাজ শাহ নামক জনৈক মুসলমান বাউলসাধক তাঁকে কুড়িয়ে নেন এবং শুশ্রুষা করে বাঁচিয়ে তোলেন। সিরাজ শাহের কাছেই কাছেই লালিত-পালিত হন। সিরাজ শাহ'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মরমি সাধনায় আত্মনিয়োগ। সিরাজ শাহের সঙ্গে পালকি বহনের কাজ করে জীবনধারণ। সিরাজ শাহ'র মৃত্যু হলে কুষ্টিয়ায় গমন এবং ছেউড়িয়া গ্রামে আখড়া স্থাপন। এখানেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভ না করলেও নিজের সাধনায় হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি লাভ। বাউলসাধক ও বাউল সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে তাঁর স্থান শীর্ষে। তাঁর গান অধ্যাত্মভাব, মরমি রসব্যঞ্জনা ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা সহস্রাধিক। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সর্বপ্রথম লালনের ২৯৮টি গান সংগ্রহ এবং ২০টি গান তৎকর্তৃক 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ। বাঙালি বিদ্বৎসমাজের কাছে লালনকে পরিচিত করার প্রথম কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে

লালনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মুক্ত এক সর্বজনীন ভাবরসে ঋদ্ধ বলে লালনের গান বাংলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়। তাঁর 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'বাড়ির কাছে আরশী নগর', 'আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে' প্রভৃতি গান বাউল-তত্ত্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতিতে ফকির লালন সাঁই আজ অবশ্য-উচ্চারিত নাম। তাঁর নামের মহিমা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে ক্রমশ প্রসার লাভ করেছে। তিনি শুধু বাউলসম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিনিধিই নন, গানের ভেতর দিয়ে বাউলসাধনার মূল ভাষ্যও রচনা করেছেন। বাউলগানের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হিসেবে তাঁর নাম এক চলিষ্ণু নদীর মতো কাল থেকে কালান্তরেও বহমান। ২০০৫-এর ২৫ নভেম্বর ইউনেস্কো বাউলগানকে 'A masterpiece of the Oral and Intangible Heritage Humanity' হিসেবে যে স্বীকৃতি দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে লালনের গান। মৃত্যু. ছেউড়িয়া (কুষ্টিয়া), ১ কার্তিক শুক্রবার ১২৯৭/ ১৭ অক্টোবর ১৮৯০।

লালবিহারী দে, রেভারেন্ড (১৮২৪-১৮৯৪)॥



জন্ম. সোনাপলাশী গ্রাম, বর্ধমান, ১৮ ডিসেম্বর ১৮২৪। এক দরিদ্র বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্ম। খ্রিস্টধর্ম প্রচারক, শিক্ষাবিদ, পত্রিকা সম্পাদক ও ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থ রচয়িতা। প্রথমে গ্রামের পাঠশালায়, পরে কলকাতায় ডাফ সাহেবের জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে শিক্ষা লাভ। ১৮৪৩-এর ২ জুলাই রেভারেন্ড ডাফের কাছে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। ডাফ সাহেবের চার্চে ধর্মযাজক (১৮৪৬-১৮৬৭) রূপে কর্মজীবন শুরু। ১৮৫৫-তে রেভারেন্ড হন। ১৮৬৭-তে সরকারি শিক্ষা বিভাগে যোগদান। ১৮৬৭-১৮৭২ পর্যন্ত বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে দায়িত্ব পালন। কিছুকাল বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা। ১৮৭৭-১৮৮৮ পর্যন্ত হুগলী মহসিন কলেজে ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক। পদোন্নতির ব্যাপারে বর্ণবৈষম্য নীতি অনুসৃত হওয়ায় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কলেজের অধ্যক্ষপদ পাননি। হুগলী কলেজে থাকাকালীন 'Bengali Magazine' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। এছাড়া 'Friday Review' ও 'Indian Reformer' নামক পত্রিকা সম্পাদনা। ১৮৭৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ফেলো নির্বাচিত। বেথুন সোসাইটির সদস্য। ভারতে শিক্ষাবিস্তারের গুরুত্ব আরোপ করে বেথুন সোসাইটির সভায় যে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন সেগুলো হলো।Primary Education of Bengal (১০ ডিসেম্বর ১৮৫৮), Vernacular Education in Bangla (১৮৫৯), English Education in Bangla (১৮৫৯), Teaching of English Literature in the Colleges of Bangal (১৮৭৪)। ১৮৬৯-এর ৯ জানুয়ারি Compulsory Education in Bengal নামে শিক্ষাবিষয়ক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাতে তৎকালীন গর্ভমেন্ট শিক্ষাবিস্তারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সে সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেন। তিনি ভারতীয় ও ইউরোপিয়ানদের মধ্যে বৈষম্য, হিন্দু জাতিভেদ প্রথা ও রায়তদের প্রতি হিন্দু জমিদারদের শোষণ নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। এ সম্পর্কে তাঁর লেখা।The History of Bengal Raiyat নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইনের প্রশংসা লাভ করে। গ্রাম বাংলার নিজস্ব সম্পদ ও উপকথার উপর লেখা দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।Bengal Peasant life ও Folktales of Bengal। এ ছাড়া তাঁর Recollection of Alexander Duff (১৮৭৯) গ্রন্থখানি লন্ডন থেকে প্রকাশিত। মৃত্যু. ২৮ অক্টোবর ১৮৯৪।

লাল মাহমুদ॥ জন্ম. বাগুইডহর, ময়মনসিংহ। সংগীত রচয়িতা। প্রথম জীবনে গাজীর কীর্তন করতেন। পরে কবির দলে যোগদান। আধ্যাত্মিক সংগীত রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচিত একটি পদ–'...কেহ তোমায় বলে কালী, কেহ বলে বনমালী/কেহ খোদা আল্লা বলি ডাকে সারাৎসার।' জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

লুৎফর রহমান, ডাক্তার (১৮৯৭-১৯৩৬)॥ জন্ম. মাতুলালয়, পারনান্দুয়ালী গ্রাম, মাগুরা; পৈতৃক নিবাস হাজী গ্রাম, মাগুরা। প্রাবন্ধিক, চিন্তাবিদ। পিতা ময়েনউদ্দীন জোয়ার্দার ছিলেন স্টেশন মাস্টার ও মাতা সামসুন্নাহার বেগম গৃহিণী। স্ত্রী আয়েশা খাতুন। গ্রাম্য পাঠশালা, মাগুরা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, হুগলী উচ্চ ইংরেজি স্কুল

(এন্ট্রান্স ১৯১৫) ও হুগলী কলেজে বিদ্যাশিক্ষা লাভ। এফ.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য। ১৯২১-এ কৃষ্ণনগর হোমিওপ্যাথিক কলেজ থেকে এইচ.এম.বি ডিগ্রি লাভ। সিরাজগঞ্জের বি.এল. ইনস্টিটিউশনে এবং চট্টগ্রামের জোরওয়ারগঞ্জ স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা। এরপর কলকাতায় পনেরো বছর ধরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। পরে মির্জাপুর গ্রামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন। এসময় কয়েকটি ওষুধ পেটেন্ট করেন। এগুলোর মধ্যে যোগিনী পাচন, আনন্দ বটিকা, জ্বরবিজয়ী বটিকা, নয়ন শান্তি, মুখারি, ক্ষত-শান্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানে চিকিৎসক হিসেবে সুনাম অর্জন করলেও স্থানীয় এক চিকিৎসকের ষড়যন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে মির্জাপুর ত্যাগ করে মাগুরা স্টিমারঘাট সংলগ্ন একটি বাড়িতে ডাক্তারখানা খোলেন। নারীসমাজের উন্নতিকল্পে 'নারীতীর্থ' নামে সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন এবং 'নারী শক্তি' নামে পত্রিকা প্রকাশ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: উপন্যাস: পথহারা, প্রীতি উপহার, সরলা (১৯১৬), বাসর উপহার, রায়হান (১৯১৯)। প্রবন্ধ: উচ্চ জীবন (১৯১৯), মহৎ জীবন (১৯২৬), উন্নত জীবন (১৯২৭), মানবজীবন (১৯২৭), সত্য জীবন (১৯৪০), যুবক জীবন, ধর্ম জীবন। শিশুসাহিত্য: রানী হেলেন (১৯৩৪), ছেলেদের মহৎ কথা, ছেলেদের কারবালা। ছোটোগল্প : পলায়ন, রানী, অহিংসা, রাজপথ, অমাবস্যা, রোমান্টিক বিয়ে, ফিরে যাও-ফিরে যাও। চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন। তাঁর প্রবন্ধ সহজবোধ্য কিন্তু ভাবগভীর। মানুষকে উন্নত জীবনের পথে এবং মহৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তাঁর প্রবন্ধরাজি উপদেশমূলক। মৃত্যু. মাগুরা, ৩১ মার্চ ১৯৩৬।

লোকমান খান শেরোয়ানী (?-১৯৬৯)॥ জন্ম. পাঠানটুলি, চট্টগ্রাম। লেখক। প্রথম জীবনে জাতীয়বাদী আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বসুর ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ছয় বছর রাজবন্দীর জীবনযাপন। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক রাষ্ট্র বার্তার' সম্পাদক। সাপ্তাহিক 'অধিকার' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি, কলকাতার 'দৈনিক প্রত্যহ' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। বাংলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। চিত্রশিল্পী হিসেবেও খ্যাতি ছিল। প্রকাশিত গ্রন্থাবলী-- উপন্যাস: বিদ্রোহী আরব। গল্প: রূপায়তন। কাব্য: দামামা, সবনম, লোকমান বাণী, রক্ষক ভক্ষক হলে। মৃত্যু. ২৭ আগস্ট ১৯৬৯।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)॥ জন্ম. সবলসিংহপুর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ২ জানুয়ারি ১৯১৭। সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ। প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান। পিতা শেখ মোহাম্মদ এহিয়া, মাতা গুলজান বেগম। কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা



শুরু করলেও পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও অর্থনীতি বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং বাংলায় এমএ ডিগ্রি লাভ। আইএ পাস করার পর তিনি কিছুদিন কলকাতা করপোরেশন এবং বাংলা সরকারের তথ্য বিভাগে চাকরি করেন। ১৯৪১-এ তিনি কলকাতার গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজে লেকচারার পদে নিযুক্ত। ১৯৪৭-এ চট্টগ্রাম কমার্স কলেজে যোগদান। ১৯৫৮ থেকে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করে ১৯৭২-এ স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ। চাকরি জীবনের প্রথমদিকে কিছুকাল 'কৃষক' পত্রিকায় সাংবাদিকতাও করেন। গ্রন্থ–উপন্যাস: জননী (১৯৫৮), ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), সমাগম (১৯৬৭), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), রাজা উপাখ্যান (১৯৭১), জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১), দুই সৈনিক (১৯৭৩), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), আর্তনাদ (১৯৮৫), রাজপুরুষ (১৯৯২): গল্পগ্রন্থ: জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প (১৯৫২), মনিব ও তাহার কুকুর (১৯৮৬), ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৯০); প্রবন্ধগ্রন্থ: ভাব ভাষা ভাবনা (১৯৭৪), সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (১৯৮৫), মুসলিম মানুষের রূপান্তর (১৯৮৬); নাটক: আমলার মামলা (১৯৪৯), পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা (১৯৯০); শিশুতোষ গ্রন্থ: ওটেন সাহেবের বাংলো (১৯৪৪), মস্কুইটোফোন (১৯৫৭), ক্ষুদে সোশালিস্ট (১৯৭৩), পঞ্চসঙ্গী (১৯৮৭); রম্যরচনা: নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত (১৯৮২); স্মৃতিকথা: স্বজন সংগ্রাম (১৯৮৬), কালরাত্রি খণ্ডচিত্র (১৯৮৬), অনেক কথন (১৯৯১), গুড বাই জাস্টিস মাসুদ

(১৯৯৩), মুজিবনগর (১৯৯৩), অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ (১৯৯৪), সোদরের খোঁজে স্বদেশের সন্ধানে (১৯৯৫), মৌলবাদের আগুন নিয়ে খেলা (১৯৯৬), আর এক ধারাভাষ্য (১৯৯৬); অনুবাদ: নিশো (১৯৪৮-৪৯), লুকনিতশি (১৯৪৮), বাগদাদের কবি (১৯৫৩), টাইম মেশিন (১৯৫৯), পাঁচটি কাহিনী (লিও টলস্টয়, ১৯৫৯), স্পেনের ছোটগল্প (১৯৬৫), পাঁচটি নাটক (মলিয়ার, ১৯৭২), ডাক্তার আবদুল্লাহর কারখানা (১৯৭৩), পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মানুষ (১৯৮৫), সন্তানের স্বীকারোক্তি (১৯৮৫)। পুরস্কার: বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬), প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৮৩), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১), স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৯৭), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার প্রভৃতি। মৃত্যু. ঢাকা, ১৪ মে ১৯৯৮।

শইখ শরফুদ্দীন (১৯০০-১৯৮৪)॥ জন্ম. ফুলবাড়ি গ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ১ অক্টোবর ১৯০০। শিক্ষাবিদ। ১৯০৬-এ সিরাজগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে জেলেপাড়া গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষাজীবনের সূচনা। ১৯১৭-তে সিরাজগঞ্জ বি.এল. হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস। ১৯২৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবিতে প্রথম শ্রেণিতে এবং ১৯২৫-এ ফারসিতে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ. পাস। ১৯৩২-এ কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯২৬-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ও ফারসি বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। এ বছরই সরকারের শিক্ষা বিভাগে চাকরিতে যোগদান। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ, রাজশাহী কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে প্রায় ত্রিশ বছর অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের পদে কাজ করে ১৯৫৫-তে ঢাকার মাদ্রাসা-ই-আলীয়া থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ। ১৯৫৬-তে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে পুনরায় অধ্যক্ষের পদে যোগদান ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৬৪-র এপ্রিল থেকে ছয়মাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা। ১৯৬৫-র ১৬ জানুয়ারি বাংলা একাডেমীতে গবেষক ও বিশেষজ্ঞরূপে যোগদান এবং বাংলা ইসলামি বিশ্বকোষ ও বাংলা অভিধানের সংকলনের কাজ সম্পন্ন করে ১৯৭০-এ স্থায়ীভাবে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯২৬-এ কলকাতায় পাবনা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মনোনীত। পরে এ সমিতি ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন। পূর্ব-পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার এবং 'জামীআত-ই-কিসানিল কুরআন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক পদেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (বাংলা-উর্দু) বিতর্কে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন (জুন ১৯৬৭)। ইসলামিক পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত। ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী তাঁর রচনায় আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: দি নেশন অব ইভ্যলিউশন থ্রু দি এজেস (১৯৭৭-১৯৮১), পবিত্র জীবন (১৯৭৮-১৯৮০), লেকচার্স অন ইসলাম (১৯৭৯), দি হিজরা অ্যান্ড দি চার্টার (১৯৮০), আরবি ভাষা ও সাহিত্য (প্রাচীন যুগ) (১৯৮১), ইসলামি নানা প্রসঙ্গ (১৯৮১), বাংলাদেশে সুফি প্রভাব ও ইসলামিক প্রচার (১৯৮২) ইত্যাদি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত রমেশচন্দ্র মজুমদার ও যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত 'হিস্টরি অব বেঙ্গল' গ্রন্থ রচনায় অংশগ্রহণ। শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখায় মরণোত্তর বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৪১০ হিজরি) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ১৬ জুন ১৯৮৪।



শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪-১৯৯৫)। জন্ম. জয়নগর-মজিলপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ২৫ নভেম্বর, ১৯৩৪। কবি, কথাসাহিত্যিক। দারিদ্র্যের কারণে স্নাতক পাস অর্ধসমাপ্ত রেখে প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ এবং সাহিত্যকে জীবিকা করার উদ্দেশ্যে উপন্যাস লেখা আরম্ভ। প্রথম উপন্যাস লেখেন 'কুয়োতলা'। ১৯৬১-এর নভেম্বরে ইশতাহার

প্রকাশের মাধ্যমে যে চারজন কবিকে হাংরি



আন্দোলন-এর জনক মনে করা হয় তাঁদের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। অন্য তিনজন হলেন সমীর রায়চৌধুরী, দেবী রায় এবং মলয় রায়চৌধুরী। ১৯৬৩-এ তিনি হাংরি আন্দোলন ত্যাগ করে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীতে যোগ দেন। তিনি প্রায় ৫০টি হাংরি বুলেটিন প্রকাশ করেন। কবিতাগ্রন্থঃ এ প্রেম হে নৈঃশব্দ্য (১৯৬২), ধর্মে আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৭), সোনার মাছি খুন করেছি (১৯৬৮), অন্ধকার নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকার (১৯৬৮), হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান (১৯৬৯), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৯৭০), পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি (১৯৭১), প্রভু নষ্ট হয়ে যাই (১৯৭২), সুখে আছি (১৯৭৪), ঈশ্বর থাকেন জলে (১৯৭৫), অস্ত্রের গৌরবহীন একা (১৯৭৫), জ্বলন্ত রুমাল (১৯৭৫), ছিন্নবিচ্ছিন্ন (১৯৭৫), সুন্দর এখানে একা নয় (১৯৭৬), কবিতায় তুলো ওড়ে (১৯৭৬), ভাত নেই পাথর রয়েছে (১৯৭৯), অঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল (১৯৮০), প্রচ্ছন্ন স্বদেশ (১৯৮১), যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো (১৯৮৩), কক্সবাজারে সন্ধ্যা (১৯৮৫), ও চিরপ্রণম্য অগ্নি (১৯৮৫), মিষ্টি কথায়, বিষ্টিতে নয় (১৯৮৫), সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার (১৯৮৬), এই তো মর্মর মূর্তি (১৯৮৭), বিষের মধ্যে সমস্ত শোক (১৯৮৮), আমাকে জাগাও (১৯৮৯), ছবি আঁকে ছিঁড়ে ফ্যালে (১৯৯১), জঙ্গলে বিষাদ আছে (১৯৯৪), বড়োর ছড়া (১৯৯৪), সেরা ছড়া (১৯৯৪), টরে টক্কা (১৯৯৬), কিছু মায়া রয়ে গেল (১৯৯৭), সকলে প্রত্যেকে একা (১৯৯৯)। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারসহ তিনি একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত। মৃত্যু. মার্চ ২৩, ১৯৯৫।

শচীন দেববর্মণ (১৯০৬-১৯৭৫)॥ জন্ম. কুমিল্লা, ১ অক্টোবর ১৯০৬। সংগীতশিল্পী, সুরকার ও সংগীত পরিচালক। স্থায়ী বসতি আগরতলা।ত্রিপুরা রাজ্য। পিতা সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ ও ত্রিপুরার রাজদরবারে চাকরি গ্রহণ। শৈশবকাল থেকে সংগীতের প্রতি অনুরক্ত।



চাকরি পরিত্যাগ করে সংগীতের চর্চার জন্য কলকাতায় গমন। ওস্তাদ বাদল খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখ সংগীতজ্ঞের কাছে রাগসংগীতে তালিম গ্রহণ। কাব্যসংগীত ও লোকসংগীতের সুর ও লয়কে সমন্বিত করে কণ্ঠসংগীতের এক স্বকীয় শৈলী উদ্ভাবন। লোকসংগীত নিজস্ব ঢঙে পরিবেশন করে প্রচুর সুনাম অর্জন। নিজস্ব ভঙ্গিতে গেয়ে রাগসংগীতকেও জনপ্রিয় করে তোলেন। ১৯২৩-এ কলকাতা বেতারে প্রথম গান পরিবেশন। ত্রিশের দশকে চলচ্চিত্র জগতে গায়ক ও সুরকার হিসেবে যোগদান। ১৯৩৭-এ 'রাজগী' ছায়াছবিতে প্রথম সংগীত পরিচালনা। আশিটির অধিক বাংলা ও হিন্দি ছায়াছবিতে সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন। ছদ্মবেশী, জীবন-সঙ্গিনী, মাটির ঘর প্রভৃতি চিত্রে সুরযোজনা। ১৯৪৪ থেকে বোম্বাই-এ বসবাস শুরু। সেখানকার চিত্রপুরীতে শিকারী, দেবদাস, সুজাতা, বন্দিনী, গাইড, আরাধনা, বাজি, শবনম, দো ভাই, ট্যাক্সি ড্রাইভার, পিয়াসা, কাগজকে ফুল প্রভৃতি চলচ্চিত্রে সুর সংযোজন। গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত তাঁর কণ্ঠ-সংগীতের সংখ্যা ১৩১টি। একক কণ্ঠে ১২৭টি এবং মীরা দেববর্মণের সহকণ্ঠে ৪টি দ্বৈত-সংগীত রেকর্ডিং। অজয় ভট্টাচার্য, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, মীরা দেববর্মণ, মোহিনী চৌধুরী, রবিগুহ মজুমদার, শৈলেন রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, হেমেন্দ্রকুমার রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জসীমউদ্‌দীনের রচিত লোকসংগীত নিজে সুরারোপ করে গেয়েছেন ও রেকর্ডিং করেছেন। 'স্বপন না ভাঙ্গে যদি', 'আমি ছিনু এক', 'বল বল বল বঁধু', 'তুমি যে গিয়াছ বকুল-বিছান পথে', 'বঁধুগো এই মধুমাস', 'ওরে সুজন নাইয়া', 'মেঘ ঝরে যায়', 'চোখ গেল চোখ গেল', 'বাজে না বাঁশি গো', 'ঝন্ ঝন্ ঝন্ মঞ্জরী বাজে', 'যদি দখিনা পবন', 'তুমি কি শ্যামের বাঁশি' এ-সকল হৃদয়স্পর্শী লোকগীতি সুললিত কণ্ঠে রেকর্ডিং করে বাংলা সংগীতের ভাণ্ডারকে

সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৫৮-তে সংগীত-নাটক আকাদেমি ও লন্ডনের এশিয়ান ফিল্ম সোসাইটি কর্তৃক বিশেষ সম্মানিত। ১৯৬৯-এ 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত। 'সরগমের নিখাদ' শিরোনামায় দেশ পত্রিকায় সংগীত বিষয়ে তাঁর সাধনা ও অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ। একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী। 'শচীন কর্তা' নামে সুপরিচিত। বোম্বাই-এর চিত্র-জগতের সুপ্রতিষ্ঠিত সংগীতশিল্পী মীরা দেবী তাঁর স্ত্রী এবং সুরকার রাহুল দেববর্মণ তাঁর একমাত্র পুত্র। মৃত্যু. বোম্বাই, ৩১ অক্টোবর ১৯৭৫।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১)॥ জন্ম. সেনহাটি, খুলনা, ১৮৯২। নাট্যকার। রংপুরে শিক্ষা লাভ। স্বদেশি আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) যোগদান করে বিদ্যালয় ত্যাগ। জাতীয় বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাস করে বি.এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন।



কিছুকাল জাতীয় কলেজে অধ্যাপনা। 'কৃষক' ও 'ভারত' নামক পত্রিকার সহ-সম্পাদক। 'হিতবাদী', 'বিজলী', 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি সাময়িকপত্রের সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নাটক রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। দেশাত্মবোধ তাঁর ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁর গৈরিক পতাকা (১৯৩০), দেশের দাবি (১৯৩৪), রাষ্ট্রবিপ্লব (১৯৪৪), সিরাজুদ্দৌলা, ধাত্রীপান্না, আবুল হাসান, কামাল আতাতুর্ক, বাংলার প্রদীপ, নর-দেবতা, সংগ্রাম ও শান্তি, ভারতবর্ষ, এই স্বাধীনতা, সবার উপর মানুষ সত্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নাটক জাতীয় চেতনা ও স্বাজাত্যবোধের ছটায় জ্বলজ্বলে। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের বিচিত্র সমস্যা তাঁর সামাজিক নাটকে উজ্জ্বলভাবে রূপায়িত। রক্তকমল (১৯২৯), ঝড়ের রাতে (১৯৩১), নার্সিং হোম (১৯৩৩), স্বামী-স্ত্রী (১৯৩৭), তটিনীর বিচার (১৯৩৯) প্রভৃতি তাঁর সামাজিক নাটক। অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাণী তাঁর নাটকের অপর বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসনিষ্ঠায়, কাহিনীর দৃঢ় সংবদ্ধতায় ও শক্তিশালী সংলাপে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটক সমৃদ্ধ। মৃত্যু. ১৯৬১।

শফিউর রহমান (১৯১৮-১৯৫২)॥ জন্ম. কোন্নগর, হুগলী পশ্চিমবঙ্গ, ২৪ জানুয়ারি, ১৯১৮। ভাষা শহীদ। ঢাকার পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট মাহবুবুর রহমান তাঁর পিতা। কলকাতা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল



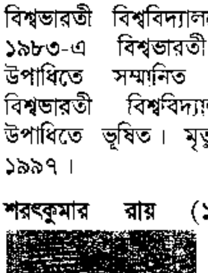
কলেজ থেকে আই.কম. পাস। চব্বিশ পরগণা সিভিল সাপ্লাই অফিসে কেরানির চাকরি গ্রহণ। কলকাতার তমিজউদ্দিন আহমদের কন্যা আকিলা খাতুনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯৪৫)। দেশ বিভাগের (১৪ আগস্ট, ১৯৪৭) পর পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে পিতার সঙ্গে ঢাকা আগমন। ঢাকা হাইকোর্টে হিসাবরক্ষণ শাখায় কেরানির চাকরিতে প্রবেশ। ১৯৫২-র ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটায় ঢাকার ৬নং রঘুনাথ দাস লেনের বাসা থেকে সাইকেলে চড়ে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ঐদিন সকাল সাড়ে দশটার দিকে নওয়াবপুর রোডে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ প্রদর্শন। পুলিশ ঐ বিক্ষোভ মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করলে গুলি শফিউর রহমানের পিঠে লাগে। আহত অবস্থায় তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। ডা. এলিনসন কর্তৃক তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার। অস্ত্রোপচার সফল না হওয়ায় ঐদিন সন্ধ্যে সাতটায় হাসপাতালে তাঁর পরলোক গমন। রাত তিনটায় পুলিশ প্রহরায় ঢাকার আজিমপুর গোরস্তানে শফিউর রহমানের লাশের দাফন। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের অমর শহীদ। তাঁর ও অন্যান্য ভাষা শহীদের আত্মত্যাগের ফলেই বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ (১৯৫৬)। তাঁর শহীদ স্মৃতি উত্তরকালে পূর্ববঙ্গবাসীদের মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এবং এই চেতনার ভিত্তিতে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা লাভ (১৬

ডিসেম্বর, ১৯৭১)। মৃত্যু. ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

শম্ভু মিত্র (১৯১৫-১৯৯৭)॥ জন্ম. ভবানীপুর, কলকাতা, ২২ আগস্ট ১৯১৫। অভিনেতা, নাট্যজন। পিতা শরৎকুমার বসু ও মাতা শতদলবাসিনী দেবী। শম্ভু মিত্রের পৈত্রিক নিবাস হুগলি জেলার কলাছাড়া গ্রামে। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করে ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেননি। ১৯৩৯-এ রংমহলে যোগদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চে তাঁর পদার্পণ। পরে যোগ দিয়েছিলেন মিনার্ভায়। নাট্যনিকেতনে কালিন্দী নাটকে অভিনয়সূত্রে সে যুগের কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে আলাপ হয়। পরবর্তীকালে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনায় আলমগীর নাটকে অভিনয়ও করেছিলেন। কিন্তু এই সময় থেকেই শিশিরকুমারের থেকে আলাদা সম্পূর্ণ নিজস্ব এক নাট্যঘরানা তৈরিতে উদ্যোগী হন শম্ভু মিত্র। ১৯৪২-এ ফ্যাসিবিরোধী সংঘের সঙ্গে পরিচিত হন শম্ভু মিত্র। ১৯৪৩-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি.সি. যোশির অনুপ্রেরণায় যোগ দেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে। ১৯৪৫-এর ১০ ডিসেম্বর গণনাট্য সংঘে কাজ করার সময়ই প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। কন্যা শাঁওলী মিত্রও মঞ্চাভিনেত্রী। ১৯৪৮-এ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন নাট্যসংস্থা বহুরূপী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সফোক্লিস, হেনরিক ইবসেন, তুলসী লাহিড়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। শাঁওলি মিত্রের নাট্যসংস্থা পঞ্চম বৈদিকের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন শম্ভু মিত্র। তাঁর পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল নবান্ন, দশচক্র, রক্তকরবী, রাজা অয়দিপাউস ইত্যাদি। রচিত নাটকের মধ্যে চাঁদ বণিকের পালা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০-এ একটি আর্ট কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্দেশ্যে গঠন করেন বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চ সমিতি। ১৯৭৮-এর ১৬ জুন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে দশচক্র নাটকে অভিনয় করেন। বহুরূপীর প্রযোজনায় এটিই তাঁর শেষ নাটক। ১৯৭৯-এ প্রায় দৃষ্টিহীন অবস্থায় নান্দীকার প্রযোজিত মুদ্রারাক্ষস নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। ১৯৮০-৮১-এ ফ্রিৎজ বেনেভিৎজের পরিচালনায় ক্যালকাটা রিপোর্টারির প্রযোজনায় 'গ্যালিলিওর জীবন' নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৮৩-এ নিজের প্রযোজনায় কন্যা শাঁওলী মিত্র পরিচালিত 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকে কন্যার সঙ্গে অভিনয় করেন শম্ভু মিত্র। শাঁওলী মিত্রের পরবর্তী নাটক 'কথা অমৃতসমান'-এর সঙ্গে ও যুক্ত ছিলেন শম্ভু মিত্র। ১৯৮৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রসদনে 'পঞ্চম বৈদিকে'র প্রযোজনায় ও তাঁর পরিচালনায় দশচক্র নাটকটির পরপর ছয়টি অভিনয় পাঁচ দিনে মঞ্চস্থ হয়। অভিনেতারূপে এরপর আর মঞ্চে অবতীর্ণ হননি তিনি। ১৯৭৬-এ ম্যাগসেসে পুরস্কার ও ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মান লাভ করেন। ১৯৭৭-এ এক বছরের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং ফেলো। ১৯৮৩-এ বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধিতে সম্মানিত করে। যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯ মে ১৯৯৭।



শরৎকুমার রায় (১৮৭৬-১৯৪৬)॥ জন্ম. দিঘাপতিয়া, নাটোর, ১৮৭৬। জমিদার ও সমাজসেবী। কুমার শরৎকুমার রায় নামে পরিচিত। পিতা নাটোরের দিঘাপতিয়ার বিখ্যাত জমিদার প্রমথনাথ রায়। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষালাভ। কলকাতার রিপন কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ বিএ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এমএ ডিগ্রি অর্জন। কলকাতার শিক্ষাজীবনে তিনি তাঁর গৃহশিক্ষক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মাধ্যমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হন। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯০০-তে ইউরোপ



ভ্রমণ : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সিংহ প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্য আবিষ্কার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ। ১৯১০-এর সেপ্টেম্বর মাসের ২৭ তারিখ তাঁরা বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি নামে সংগঠনের সভাপতি। পরিচালক হন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, এবং সম্পাদক হন রমাপ্রসাদ চন্দ। সংগঠনের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ শরৎকুমার রায় তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে খরচ করতেন। প্রত্নসামগ্রীর সংগ্রহ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে একটি জাদুঘর গঠনের প্রয়োজন দেখা দিলে পারিবারিক জমির উপরে নিজের খরচে শরৎকুমার একটি জাদুঘর ভবন নির্মাণ করেন। গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে ১৯১৯-এ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের ভবন উদ্বোধন করেন। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের পাশাপাশি রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশন, রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী, ইন্ডিয়ান মিউজিক সোসাইটি প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। ১৯৩০-এ তিনি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত। তাঁর জমিদারিতে কৃষির উন্নতির জন্য তিনি কৃষিখামার, দুগ্ধখামার, চিনিকল, ফলের বাগান প্রভৃতি স্থাপন করেন। এলাকায় কৃষির উন্নতির জন্য তিনি তাঁর বড়ো ভাইয়ের নামে 'বসন্তকুমার কৃষি ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত টিকে থাকে। মৃত্যু. ১৯৪৬।

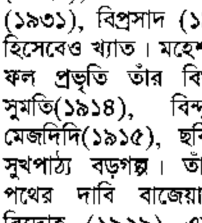
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)॥ জন্ম. দেবানন্দপুর গ্রাম, হুগলী, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ (৩১ ভাদ্র ১২৮৩)। খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁর কৈশোর ও যৌবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় ভাগলপুরে, মাতুলালয়ে। ভাগলপুর দুর্গাচরণ এম.ই. স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৮৭)। ভাগলপুর ত্যাগ করে মতিলালের সপরিবার দেবানন্দপুরে প্রত্যাবর্তন। শরৎচন্দ্রের হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি। এ স্কুলে পাঠকালে দাবাখেলায়, গান গাওয়ায় ও বাঁশি



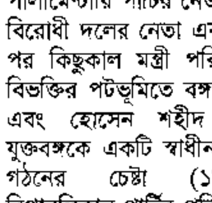
বাদনে দক্ষতা অর্জন। রবীন্দ্রসংগীতের সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে পরিচিতি লাভ। ব্রাঞ্চ স্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। মতিলালের আবার দেবানন্দপুর ত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্রকন্যাসহ ভাগলপুর শ্বশুরালয়ে গমন এবং আমৃত্যু সেখানে বাস। শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর টি.এন. জুবলী স্কুলে ভর্তি। এ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস (১৮৯৪) করে ভাগলপুর জুবলী কলেজে এফ.এ. ক্লাসে ভর্তি। মাতৃবিয়োগ (১৮৯৫) ও দারিদ্র্যবশত কলেজের পাঠ ত্যাগ। অর্থ-উপার্জনের জন্য বনেলি স্টেটের সেটেলম্যান্ট কর্মকর্তার সহকারী পদে চাকরি গ্রহণ। অল্পকাল পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এক সন্ন্যাসী দলে যোগদান। বেশ কিছুকাল এ দলের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে একদা মজফ্‌ফরপুরে ধর্মশালায় আগমন। সাংগীতিক গুণের জন্য আইনজীবী শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে আশ্রয় লাভ। এখানে গান গেয়ে ও নাটকে অভিনয় করে সুনাম অর্জন। পিতার মৃত্যু (১৯০৩) সংবাদ শুনে মজফ্‌ফরপুর থেকে ভাগলপুর গমন। মাতুলদের পরামর্শানুসারে চাকরির সন্ধানে কলকাতায় আগমন। কলকাতা হাইকোর্টে অনুবাদকের কাজ লাভ। কিছুকাল পর একাজ ত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে ১৯০৩-এ রেঙ্গুন গমন। স্বাক্ষরবিহীনভাবে প্রেরিত 'মন্দির' গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার লাভ (১৯০৩)। বার্মা রেলের হিসেব পরীক্ষকের অফিসে পঁচাত্তর টাকা মাইনের কেরানিগিরি চাকরি লাভ। (১৯০৫)। শান্তিদেবীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। দু'বছর পর প্লেগ-রোগাক্রান্ত হয়ে শান্তিদেবী দেহত্যাগ করলে হিরন্ময়ী দেবীকে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরূপে গ্রহণ। বার্মায় প্রবাসকালে সাহিত্যসাধনায় ঋন্ যোগ। 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' (১৯০৭) উপন্যাস প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৬-তে বার্মা ত্যাগ করে দেশে প্রত্যাবর্তন। হাওড়ায় বাজেশিবপুরে অবস্থান। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯২৫-এ সামতাবেড়ে (হাওড়া) গৃহ নির্মাণ করে বাস। ১৯৩০-এ কলকাতায় অশ্বিনী দত্ত রোডে বাড়ি নির্মাণ করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস। ১৯৩৬-এ ৬১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অভিনন্দিত। বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অসামান্য সংবেদনশীলতা তাঁর উপন্যাসের প্রধান সম্পদ। গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি তাঁর

কথাসাহিত্যে উজ্জ্বলভাবে রূপায়িত। মানুষের অন্তরে তার ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে প্রণয়াকাঙ্ক্ষার যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সেই সংঘাতের চিত্র অসাধারণ শিল্পকুশলতার সঙ্গে অঙ্কিত। মানুষের অন্তরের দুঃখ বেদনাকে অতি দরদের সঙ্গে চিত্রিত করার জন্য দরদি কথাসাহিত্যিক হিসেবে আখ্যায়িত। বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে তাঁর স্থান শীর্ষে। প্রকাশিত উপন্যাস: পরিণীতা (১৯১৪), বিরাজ বৌ (১৯১৪), পণ্ডিত মশাই (১৯১৪), পল্লী সমাজ (১৯১৬), বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬), দেবদাস(১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), শ্রীকান্ত (১মপর্ব-১৯১৭, ২য় পর্ব-১৯১৮, ৩য় পর্ব-১৯২৭ ও ৪র্থ পর্ব-১৯৩৩), দত্তা (১৯১৮), গৃহদাহ (১৯২০), বামুনের মেয়ে (১৯২০), দেনাপাওনা (১৯২৩), পথের দাবি (১৯২৬), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১), বিপ্রদাস (১৯৩৫) ইত্যাদি। গল্পকার হিসেবেও খ্যাত। মহেশ, বিলাসী, সতী, মামলার ফল প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প। রামের সুমতি(১৯১৪), বিন্দুর ছেলে (১৯১৪), মেজদিদি(১৯১৫), ছবি (১৯২০) প্রভৃতি তাঁর সুখপাঠ্য বড়গল্প। তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস পথের দাবি বাজেয়াপ্ত (১৯২৬)। তরুণের বিদ্রোহ (১৯২৯) এবং স্বদেশ ও সাহিত্য (১৯৩২) তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯২৩) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ডি.লিট. (১৯৩৬) উপাধি লাভ। মৃত্যু. পাক নার্সিং হোম, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ (২ মাঘ-১৩৪৪)।

শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০)॥ জন্ম. কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯। পৈতৃক নিবাস চব্বিশ পরগনার কোদলিয়া গ্রাম। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও আইন পাস। ১৯১১-তে কটকে আইন ব্যবসায় শুরু। ১৯১৮-তে বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি ডিগ্রি লাভ। কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতিতে যোগদান। ১৯২৩-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য দল গঠন করলে তার সঙ্গে যুক্ত। ১৯২৪-এ কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত। ১৯৩০-এ চট্টগ্রাম বিদ্রোহীদের বিচার শুরু হলে আইনজীবী হিসেবে তাঁদের পক্ষ অবলম্বন। বিচারে বিপ্লবীদের শাস্তি হওয়ার আশংকায় তাঁদের অস্ত্র সরবরাহ করে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা প্রদান। বামপন্থি রাজনীতিতে যুক্ত থাকার অপরাধে একাধিকবার কারাবরণ। ১৯৩৭-১৯৩৯ পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য। এ ছাড়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার কার্যকরী সমিতির সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়সমিতির সভাপতি, বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা, কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিরোধী দলের নেতা এবং ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কিছুকাল মন্ত্রী পরিষদের সদস্য। ভারত-বিভক্তির পটভূমিতে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তবঙ্গকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গঠনের চেষ্টা (১৯৪৭)। 'সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৮-এ নামে একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ। স্বাধীন ভারতে একটি উপ-নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত। কিন্তু বিধানসভায় যোগদানের আগের দিন মৃত্যুবরণ। মৃত্যু. ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০।



শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০)॥ জন্ম. পূর্ণিমা, বিহার, ৩০ মার্চ ১৮৯৯। কথাসাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস বরাহনগর, চব্বিশ পরগণা। মুঙ্গের আদালতের আইনজীবী তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতা। মুঙ্গের জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯১৫) ও কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. (১৯১৯) পাস। পাটনা থেকে 'ল' পাস (১৯২৬) করে মুঙ্গের আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯২৯-এ ওকালতি ত্যাগ করে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ। ১৯৩৮-এ হিমাংশু রায়ের আহ্বানে বোম্বে গমন। সেখানকার ছায়াচিত্র জগতের কাহিনীকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন। ১৯৫২-তে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে



সম্পর্ক ছিন্ন করে পুণায় গমন। সেখানে স্থায়ীভাবে বাস। ডিটেকটিভ কাহিনীর বিশিষ্ট শিল্পী। তাঁর 'ব্যোমকেশ' ও 'বরদা' এক অপূর্ব সৃষ্টি। শরদিন্দর ছোটগল্প, বড়গল্প ও উপন্যাসও বিশেষ সমাদৃত। ইতিহাসের গল্পশ্রিত 'গৌড়মল্লার' (১৯৫৪) ও 'তুঙ্গভদ্রার তীরে (১৯৬৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অন্যান্য উপন্যাস: ঝিন্দের বন্দী (১৯৩৮), বিষের ধোঁয়া (১৯৩৮), তুমি সন্ধ্যার মেঘ (১৯৫৮), গল্পগ্রন্থ: জাতিস্মর (১৯৩২), চুয়াচন্দন (১৯৩৫), কালকূট (১৯৪৪), ছায়াপথিক (১৯৪৯); নাটক: বন্ধু (১৯৩৭), পথ বেঁধে দিল (১৯৪১), ডিটেকটিভ: ব্যোমকেশের ডায়েরী (১৯৩৩)। শিশির কুমার পুরস্কার (১৯৫১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (১৯৬৩) ও রবীন্দ্র-পুরস্কার (১৯৬৭) লাভ। মৃত্যু. পুনা, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০।

শরাফত আলী (১৯৪৩-১৯৭১)॥ জন্ম. দক্ষিণ রামপুর গ্রাম, কুমিল্লা, ১ জুলাই ১৯৪৩। শিক্ষাবিদ। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৬৪-তে বি.এসসি. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭-তে গণিতে এম.এসসি. ডিগ্রি লাভ। ১৯৬৮-এর ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৭০-১৯৭১ পর্যন্ত শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটর। কর্তব্যপরায়ণ, বিনয়ী, সদালাপী ও কৃতী শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি ছিল। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁকে শহীদুল্লাহ হলের সামনে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে।



শরীয়তুল্লাহ, হাজী (১৭৮১-১৮৪০)॥ জন্ম. শামাইল (বাহাদুরপুর) গ্রাম, মাদারীপুর, ১৭৮১। ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা। সাধারণ মুসলিম পরিবারে জন্ম। আট বছর বয়সে পিতা আব্দুল জলিল তালুকদার প্রাণত্যাগ করলে পিতৃব্য আজিমুদ্দীনের গৃহে আশ্রয় লাভ। বারো বছর বয়সে পিতৃব্য-গৃহ থেকে পলায়ন করে কলকাতায় গমন। সেখানে মওলানা বশারত আলীর নিকট কুরআন পাঠ শিক্ষা গ্রহণ। হুগলী জেলার ফুরফুরায় দুই বছর ও মুর্শিদাবাদে এক বছর আরবি ও ফারসি ভাষা অধ্যয়ন। ১৭৯৯-তে আঠারো বছর বয়সে তাঁর ওস্তাদ মওলানা বশারত আলীর সঙ্গে মক্কায় গমন। সেখানে মওলানা মুরাদের কাছে দুই বছর ও বিখ্যাত পণ্ডিত তাহির কাছে চৌদ্দ বছর আরবি ভাষা ও ইসলামিক শাস্ত্র শিক্ষাগ্রহণ। এরপর কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছর ইসলামিক বিদ্যা অধ্যয়ন। ওয়াহাবি মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮১৮-তে আরবদেশ থেকে জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তন। মুসলমানদের মধ্যে অকৃত্রিম আসলামিক বিধি-বিধান চালু করার জন্য তৎকর্তৃক আন্দোলন শুরু। এক সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ) ও এক রাসুলের (হযরত মুহাম্মদ) উপর বিশ্বাস স্থাপনন, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়, রমজান মাসে রোজা রাখা, সক্ষম ব্যক্তির হজ্বব্রত পালন ও জাকাত দান প্রভৃতি ইসলামিক 'ফরজ' আদায়ের জন্যে মুসলমান সমাজেপ্রচার চালান। 'ফরজ' কথা থেকে তাঁর আন্দোলন 'ফরায়েজি আন্দোলন' নামে আখ্যায়িত। ১৮২০-এ দ্বিতীয়বার মক্কায় গমন। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ও শিক্ষক তাহির নিকট থেকে বাংলাদেশে ইসলামিক সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার অনুমতি নিয়ে বাহাদুরপুরে প্রত্যাবর্তন। মুসলমান সমাজে প্রচলিত শেরেক ও বিদাতের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান পরিচালনা। কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, পিরপূজা, কবরপূজা, গীতপূজা প্রভৃতি শেরেকি কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলমানদের উপদেশ প্রদান। এছাড়া হিন্দু জমিদারদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পৈতানুষ্ঠান, রথযাত্রা ও দুর্গাপূজার জন্য কর প্রদান না করার জন্য শিষ্যদের নির্দেশ দান। তাঁর এই আদেশ মতে অনুসারীরা এ-সকল খাজনা দেয়া বন্ধ করলে হিন্দু-জমিদার ও তাদের মিত্র নীলকুঠিয়ালদের কাছ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হন। হিন্দু-জমিদাররা ক্রুদ্ধ হয়ে ফরায়েজিদের দাড়ির উপর কর আরোপ করেন ও তাদের জমিদারিতে গরু জবাই নিষিদ্ধ করে দেন। ফলে জমিদারদের সঙ্গে ফরায়েজিদের তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সরকারি প্রশাসন যন্ত্র জমিদারদের পক্ষাবলম্বন করায় হাজী শরিয়তুল্লাহ অনেক বার গ্রেফতার



হন। শরীয়তুল্লাহর এই সংস্কার আন্দোলন কালক্রমে ইংরেজি-শাসনবিরোধী আন্দোলনে রূপধারণ। ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসকদের দ্বারা কবলিত হওয়ায় তৎ-কর্তৃক একে 'দারুল-হরব' বলে ঘোষণা। কাজেই এদেশে জুমা ও ঈদের নামাজ না পড়ার জন্য তৎ-কর্তৃক ফতোয়া জারি। হাজী শরীয়তুল্লাহর এ আন্দোলন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় জনপ্রিয়তা অর্জন। তিনি শুধু একজন ধর্মীয় সংস্কারক নন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠারও একজন দিশারী। কৃষক, তাঁতি তথা শ্রমজীবী মানুষকে যুগ-যুগের শোষণ-বঞ্চনা থেকে এবং বিদেশি শাসণ-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য তৎকর্তৃক তাঁর এই সংস্কারক আন্দোলন পরিচালনা। মৃত্যু. বাহাদুরপুর, ১৮৪০।

শশাঙ্কমোহন সেন (১৮৭২-১৯২৮)॥ জন্ম. ধলঘাট গ্রাম, পটিয়া, চট্টগ্রাম, ১ জুলাই ১৮৭২। কবি, সাহিত্য সমালোচক ও শিক্ষাবিদ। ধলঘাটে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা সমাপ্ত। ১৮৯০-তে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ।



১৮৯২-তে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ.এ.পাস। ১৮৯৪-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণিতে বি.এ.পাস। ১৮৯৭-তে রিপন কলেজ থেকে বি.এল.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আইনে ডিগ্রি লাভের পরপরই চট্টগ্রামে ফিরে এসে ওকালতি শুরু। আইন ব্যবসায় সফলতা অর্জন করতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ পেশা অপেক্ষা নেশার (সাহিত্য) প্রতি অধিকতর মনোযোগ ও কালক্ষেপণ। ১৯২০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে ওকালতি পরিত্যাগ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। কবি প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্যিক খ্যাতি চট্টগ্রামে বসবাসকালীন কর্মজীবনেই অর্জন। প্রকাশিত গ্রন্থ— কাব্য: সিন্ধুসংগীত (১৮৯৫), শৈলসংগীত (১৯০৫), স্বর্গে ও মর্ত্যে (১৯১২), বিমানিকা (১৯২৪)। কাব্যনাট্য: সাবিত্রী (১৯০৯), বিশ্বামিত্র (মৃত্যুর পরে চট্টগ্রামের অঞ্জলি পত্রিকায় প্রকাশিত)। সমালোচনা:বঙ্গবাণী (১৯১৫), মধুসূদন-অন্তর্জীবন ও প্রতিভা (১৯২৮), বাণী মন্দির (১৯২৮)। অপ্রকাশিত রচনা-কাব্য: রূপসুন্দরী, শুক্রকমল, নচিকেতা। কাব্যনাট্য: স্বপ্ন। জীবদ্দশায় সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন অধ্যাপক ও সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে। নিজে শুধু বি.এ. উপাধিপ্রাপ্ত হলেও এম.এ. ক্লাসের অধ্যাপনাভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছিল তাঁর তীক্ষ্ণধী মনীষার জন্যেই। পরে তাঁকে 'গোপাল দাস চৌধুরী অধ্যাপক' পদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মান জানায়। সাহিত্যবিচারের মান ও পদ্ধতি বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে হওয়াই যে বাঞ্ছনীয় তা তিনি তাঁর সমগ্র সমালোচনা সাহিত্যে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের প্রধান কাব্যবিশ্লেষণ সম্ভবত তিনিই এবং বাংলাদেশের প্রথম আধুনিক সাহিত্য সমালোচকও সেই সঙ্গে। মৃত্যু. কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ১৯২৮।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৬৪)॥ জন্ম. চন্দ্রহার গ্রাম, বরিশাল, ১৯১১। লেখক ও অধ্যাপক। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ. পাস। কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. (১৯৩৫) ডিগ্রি



লাভ। স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে যোগদান। ১৯৩৭-এ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ। পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত (১৯৩৮)। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে 'অবসকিওর রিলিজিয়াস কাল্ট অ্যাস এ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ বেঙ্গলী লিটেরেচার' বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি উপাধি লাভ (১৯৩৯)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার রামতনু অধ্যাপক নিযুক্ত (১৯৫৫)। কালে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে বৃত। কৃতী গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ: দর্শনে ও সাহিত্যে

(১৯৫২), ভারতের শক্তিসাধনা ও শক্তিসাহিত্য (১৯৬০) তাঁর দুখানি বিখ্যাত গবেষণামূলক গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, সাহিত্যের স্বরূপ, 'টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি বাংলা সমালোচনা ও প্রবন্ধ সাহিত্যেও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কবিতা, উপন্যাস ও শিশুসাহিত্যের লেখকরূপেও পরিচিত। কবিতাঃ দিনান্তের আগুনে। উপন্যাস ও গল্পঃ এপারে, সীতা, নিশা ঠাকুরের কড়চা। শিশুসাহিত্যঃ শ্যামলদীঘির ঈশান কোণ। ইংরেজি গ্রন্থঃ Obscure Religious Cults: As a Background of Bengali Literature.An Introdution to Tantric Buddhism। ভারতের শক্তিসাধনা ও শক্তিসাহিত্য গ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ (১৯৬১)। মৃত্যু. কলকাতা, ২১ জুলাই ১৯৬৪।

শশীকুমার হেশ (১৮৬৯-?)॥ জন্ম. সাজিউড়া গ্রাম, ময়মনসিংহ, ১৮৬৯। প্রতিকৃতি আঁকিয়ে, তৈলচিত্র শিল্পী। শৈশব ও বাল্যকাল দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাস করে নিজ গ্রামের পাঠশালায় পণ্ডিতি ও ছবি অঙ্কন শুরু। কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য বহু পরিশ্রমে ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের বৃত্তি সংগ্রহ। আর্ট স্কুলে পড়ার সময়ে অঙ্কনে পারদর্শিতার জন্য বৃত্তি লাভ। কলেজের অধ্যাপক গিলার্ডি সাহেব কর্তৃক ইতালি গিয়ে অঙ্কনবিদ্যায় পারঙ্গম হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান। ১৮৯৪-তে ইতালি গমন ও তিন মাসে ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করে রয়াল অ্যাকাডেমিতে প্রবেশ। এখানে তিন বছর অতিবাহিত। পরে মিউনিখে গিয়ে রয়্যাল অ্যাকাডেমির স্পেশাল পেইন্টিং কোর্সে ছ-মাস শিক্ষানবিশি করেন। স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে প্যারিস গমন। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য-কর্তৃক তাঁর প্রবাসজীবনের (সাড়ে তিন বছর) প্রায় যাবতীয় ব্যয়ভার বহন। প্রায় দেড় বছর পর লন্ডনে গমন এবং সেখানে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিতে ডব্লিউ, সি, বেনার্জী, দাদা ভাই নৌরজী, বিপিনচন্দ্র পাল, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের উপস্থিতিতে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রায় ছ-বছর ইউরোপে অতিবাহিত করে ১৯০০-তে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আতিথ্য গ্রহণ। এ বছরই ৬ ডিসেম্বর তারিখে ফরাসি বিদুষী মহিলা আতালি ব্র্যাঁমা-র সঙ্গে ব্রাহ্মমতে বিবাহ এবং তাতে পৌরহিত্য করেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী। শশীকুমার মুখ্যত প্রতিকৃতি-শিল্পী। বরোদার গাইকোয়াড়ের একাধিক পারিবারিক চিত্র তিনি এঁকেছেন। তাঁর অঙ্কিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডব্লিউ. সি. বেনার্জি, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের তৈলচিত্র বিখ্যাত হয়ে আছে। অন্যদিকে এই শিল্পীর ছবি এঁকেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৃত্যু. ফ্রান্স, তারিখ অজ্ঞাত।

শহীদ সাবের (১৯৩০-১৯৭১)॥ জন্ম. ঈদগাঁও গ্রাম, কক্সবাজার, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৩০। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ১৯৪৯-এ চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিক পাস। সেই সময় থেকেই বামপন্থি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ছাত্র



ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী। তখন মুসলিম লীগ সরকারের দোর্দণ্ড প্রতাপ। ব্যাপক নির্যাতন এবং দমন নীতির মাধ্যমে শুরু হয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রগতিশীল রাজনীতির একনিষ্ঠ কর্মী শহীদ সাবের গ্রেফতার হন। বছর কয়েক বিনাবিচারে আটক থাকার পর ১৯৫৪-তে মুক্তিলাভ। ১৯৫৫-তে জগন্নাথ কলেজ থেকে বি.এ.পাস। ফেডারেল ইনফরমেশন সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দী থাকার অপরাধে চাকরিতে নিয়োগপত্র পাননি। কিছুদিন ওয়েস্ট অ্যান্ড হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরি করার পর দৈনিক সংবাদ-এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান। তাঁর কর্মজীবন মাত্র ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত। ১৯৫৮-এর শেষের দিকে শুরু হয় মানসিক বৈকল্য। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বছরগুলো মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু বদ্ধ পাগলের পাগলামি ছিল না। এ অবস্থাতেও কবিতার অনেক উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি রচনা করেছিলেন। 'সংবাদ' অফিস ছিল তাঁর প্রিয় জায়গা। চট্টগ্রাম জেলে বসে লেখেন তাঁর বিখ্যাত রচনা 'আরেক দুনিয়া থেকে'। এটি কলকাতার 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন 'নতুন সাহিত্য'

পত্রিকার সম্পাদককে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ প্রতিভাবান তরুণ সাহিত্যিকের সাহিত্যজগতে শুভ আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এরপর থেকেই কবি এবং গাল্পিক শহীদ সাবেরের যাত্রা শুরু। প্রকাশিত গ্রন্থঃ 'এক টুকরা মেঘ'(১৯৫৫)। শিশুসাহিত্যঃ ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান (১৯৫৮)। অসংখ্য কবিতা লিখেছেন কিন্তু বই হয়নি। দু'টি অনুবাদ গ্রন্থ আছে। ছোটগল্পের জন্য ১৯৭২-এ বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ৩১ মার্চ 'সংবাদ'অফিসে ঘুমিয়ে থাকার সময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী 'সংবাদ' অফিস পুড়িয়ে দিলে সেই আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ।

শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮): জন্ম: হাশিল, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩। কথাসাহিত্যিক ও সরকারি আমলা। পিতা নুরুল হক ও মাতা জাহানারা খাতুন। প্রকৃত নাম মো. শহীদুল হক। ঢাকার কলেজিয়েট স্কুল ও ময়মনসিংহের



ফুলবাড়িয়া স্কুলে পড়ার পর চট্টগ্রামের সাতকানিয়া মডেল হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক (১৯৬৬), ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১৯৭২), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক সম্মান (১৯৭৬) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ (১৯৭৭)। দি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি এবং কিছুদিন বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে গবেষণা কর্মকর্তা হিসাবে কর্মজীবন শুরু। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে দায়িত্বপালন। প্রকাশিত গ্রন্থ– ছোটগল্প: পারাপার (১৯৮৫), ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প (১৯৯৯), ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প (২০০৪), শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প (২০০৬); উপন্যাস: জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা (১৯৮৭), সে রাতে পূর্ণিমা ছিল (১৯৯৫), মুখের দিকে দেখি (২০০৬), শহীদুল জহির নির্বাচিত উপন্যাস (২০০৭)। আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, আজকের কাগজ সাহিত্য পুরস্কার এবং প্রথম আলো বর্ষসেরা সাহিত্য পুরস্কার (মরণোত্তর) অর্জন। মৃত্যু. ২৩ মার্চ ২০০৮।

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)॥ জন্ম. মজুপুর গ্রাম, ফেনী, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। পুরো নাম আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। কলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যাপক (পরে ঢাকা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ) মওলানা



মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ তাঁর পিতা। মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৪২)। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে আই.এ.(১৯৪৪) ও অর্থনীতিতে অনার্সসহ দ্বিতীয় বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি.এ. (১৯৪৬) ডিগ্রি লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি। একই সঙ্গে রিপন কলেজে আইন অধ্যয়ন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি। রাজনীতিতে অতিমাত্রায় জড়িয়ে পড়ায় কিছুকাল পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ ত্যাগ। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে মার্কবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বামপন্থি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ঢাকায় আগমনের পর কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতে যোগদান। গণতান্ত্রিক যুবলীগ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন। পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান। এ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখায় ৩ জুন (১৯৫২) গ্রেফতার। প্রায় সাড়ে তিন বছর কারানির্যাতন ভোগ। ১৯৫৫-তে পুনরায় গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ। ১৯৫৬-র ৮ সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি হলে ১৪ অক্টোবর (১৯৫৮) আরেকবার গ্রেফতার। প্রায় চারবছর কারাভোগের পর ১৯৬২-র সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিলাভ। সাপ্তাহিক ইত্তেফাক (১৯৪৯) পত্রিকায় যোগদানের মাধ্যমে সাংবাদিক জীবনে

প্রবেশ। ১৯৫৮-তে দৈনিক সংবাদের সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত লাভ। ষাটের দশকে এ পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক পদে উন্নীত। এতে দেশপ্রেমিক ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক পরিক্রমা' ও বিশ্বকর্মা ছদ্মনামে 'বিচিত্র কথা শীর্ষক উপসম্পাদকীয় রচনা। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ডা. আর. আহমদের কন্যা কমিউনিস্ট কর্মী জোহরা বেগমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯৫৮)। একই বছর ১৪ অক্টোবর সামরিক সরকার কর্তৃক শহীদুল্লা কায়সার গ্রেফতার হলে জোহরা বেগমের ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতায় গমন এবং শহীদুল্লাহ কায়সারের সঙ্গে পরিণয় সম্পর্ক ত্যাগ। ১৯৬৯-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি পান্না চৌধুরী (পান্না কায়সার) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। জনজীবনের আলেখ্য রূপায়ণে দক্ষতার পরিচয় প্রদান। বাঙালি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রামী চেতনা তাঁর উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। সারেং বৌ (১৯৬২) ও সংশপ্তক (১৯৬৫) তাঁর দু'খানি বিখ্যাত উপন্যাস। রাজবন্দীর রোজনামচা (১৯৬২) তাঁর স্মৃতিকথা। পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬) ভ্রমণবৃত্তান্ত। সারেং বৌ উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬২) ও উপন্যাসে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২) লাভ। ভাষা-আন্দোলনের বিশিষ্ট সৈনিক। এদেশের প্রতিটি প্রগতিশীল তথা গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। সমাজতান্ত্রিক মতবাদের একজন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক। মৃত্যু. মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র দিন কয়েক পূর্বে ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক তাঁর ঢাকার কায়েতটুলীর বাসভবন থেকে অপহৃত। এরপর তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

শান্ত রক্ষিত (৭০৫-৭৬২)॥ জন্ম. ঢাকা, ৭০৫। দার্শনিক। এক সময়ে নালন্দার প্রধান আচার্য ছিলেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কোনো এক সময়ে তিব্বতে যান এবং ৭৪৯-এ সেখানে একটি মঠ স্থাপন করেন। তিনি 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে তিনি মহাযান দর্শনের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করেন এ গ্রন্থে। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা: 'তত্ত্বসিদ্ধি'। আরো কিছু গ্রন্থ রচনা করেন, বৌদ্ধ দর্শনের উদ্দেশ্যে সেসব পুস্তকের শুধু তিব্বতীয় অনুবাদই পাওয়া যায়। মৃত্যু. ৭৬২।

শান্তি দেব॥ জন্ম. সাভার ঢাকা। দার্শনিক। সম্ভবত ৬৪৮ থেকে ৮১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর জীবনকাল। কথিত আছে তিনি ছিলেন রাজকুমার। তারা দেবীর অনুপ্রেরণায় তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবনবরণ করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: শিক্ষাসমুচ্চয় এবং বোধিচর্যাবতার। শিক্ষাসমুচ্চয়ে মহাযান সম্প্রদায়ের মতবাদ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে এবং বোধিচর্যাবতারে আলোচিত হয়েছে বুদ্ধত্বকামী ব্যক্তির জীবনাদর্শন। এ গ্রন্থে মহাযান দর্শনের অনুসরণে জাগতিক জীবনের সবকিছুর অসারতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন এবং বলেছেন যে, সুখ-দুঃখ, অনুরাগ-বিরাগ, লাভ-ক্ষতি সবই অবাস্তব। তাই মানুষের দায়িত্ব হলো অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পার্থিব জীবনের দুর্দশা হতে অব্যাহতি লাভের জন্য চেষ্টা করা। জন্ম ও মৃত্যু. তারিখ অজ্ঞাত।

শান্তিদেব ঘোষ (১৯১০ -১৯৯৯)॥ জন্ম. বাজাপ্তি



গ্রাম, চাঁদপুর, ৭ মে, ১৯১০। কণ্ঠশিল্পী, রবীন্দ্রসংগীত-বিশারদ। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক। প্রকৃত নাম শান্তিময় ঘোষ। পিতা কালীমোহন ঘোষ, মাতা মনোরমা দেবী। প্রথমদিকে কালীমোহন শিলাইদহে গ্রামোন্নয়নের কাজে নিযুক্ত। পরে শান্তি নিকেতনে গিয়ে গ্রাম সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ। কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের কাছে সংগীত শিক্ষা শুরু। রবীন্দ্রনাথ সংগীত ও নৃত্যকলা শিক্ষার জন্য তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ এবং অধুনা ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও বালি ভ্রমণ করেন। ১৯৩০-এ মাত্র কুড়ি বছর বয়সে শিক্ষক হিসেবে বিশ্বভারতীতে যোগদান। ১৯৩৬-এ ইলা ঘোষের সঙ্গে বিয়ে। পরে বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনে রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্য বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। ১৯৬৪-৬৮ ও ১৯৭১-৭৩ সময়পর্বে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন। ১৯৪৮-এ শান্তিদেব আকাশবাণী কলকাতার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৬-৬০-এ ভারতের সংগীত-নাটক অকাদেমির প্রকাশনা সমিতির

সদস্য। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও আসাম সাহিত্য সম্মেলনের সংগীত বিভাগের সভাপতিও হন। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ। রচিত গ্রন্থ: রবীন্দ্রসংগীত (১৯৪২), জাভা ও বালির নৃত্যগীত (১৯৬৩), রূপকার নন্দলাল (নন্দলাল বসুর জীবনী, ১৯৫৬), ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি (১৯৫৬), রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে সংগীত ও নৃত্য, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য (১৯৮৬), রবীন্দ্রসংগীত-বিচিত্রা, নৃত্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ, জীবনের ধ্রুবতারা (আত্মজীবনী)। পুরস্কার: সংগীত-নাটক অকাদেমির ফেলোশিপ (১৯৭৭), সুরেশচন্দ্র স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার (১৯৮০), পদ্মভূষণ সম্মান (১৯৮৪), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' (১৯৮৪), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি.লিট. (১৯৯১), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধি এবং কলকাতার রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্র থেকে 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

শামসুদ্দীন আহমেদ (১৮৮৯-১৯৬৯)॥ জন্ম. কুষ্টিয়া, ১৮৮৯। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি লাভ। ১৯১৭-তে আইনজীবী হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান। একই সময়ে



রাজনৈতিক জীবনের শুরু। ১৯২০-এ অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ। একই সঙ্গে ১৯২১-১৯২৫ পর্যন্ত প্রাদেশিক খেলাফত কমিটি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। তৎকালীন বঙ্গীয় কংগ্রেস সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ। কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসেবে ১৯২৭-এ বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত। ১৯২৯-এ পদত্যাগ। শেরেবাংলা এ.কে.ফজলুল হক কলকাতা করপোরেশনের মেয়র থাকাকালীন ১৯৩৩-১৯৩৬ পর্যন্ত ঐ সংস্থার নির্বাচিত কমিশনার। কৃষক প্রজাপার্টির (১৯২৯) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ১৯৩৫-এ সম্পাদক নির্বাচিত। কৃষক প্রজাপার্টির সদস্য হিসেবে ১৯৩৭-এ বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত। শেরে বাংলা ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদানের পর বিধানসভায় কৃষক প্রজাপার্টির নেতা নির্বাচিত। শেরে বাংলা ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্য। ১৯৪১-১৯৪৩ পর্যন্ত দ্বিতীয় ফজলুল হক মন্ত্রিসভারও সদস্য। ১৯৪৪-এ মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭-এর আগস্ট পর্যন্ত পুনরায় বঙ্গীয় মন্ত্রিসভার (১৯৩৭-১৯৪১) সদস্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর বার্মায় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত। সোসিয়ালিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান-এর প্রতিষ্ঠাতা। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবী। মৃত্যু. ১৯৬৯।

শামসুদ্দোহা (১৯০১-১৯৮৪)॥ জন্ম. শরিষাবন গ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, ১৯০১। আমলা ও মন্ত্রী। পূর্ণনাম আবু হামিদ মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা। ১৯২২-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ.অনার্স (ইতিহাস) পাস। ১৯২৪-এ ভারতীয়



পুলিশ সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে যোগদান। ১৯২৮-এ কলকাতার পুলিশের ডেপুটি কমিশনার পদে উন্নীত। পরে সদর দপ্তরে বদলি। পুলিশের সদর দপ্তরে ডেপুটি কমিশনার পদে দায়িত্ব পালনকারী প্রথম ভারতীয়। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গের পুলিশের ডি.আই.জি. নিযুক্ত। ১৯৪৮-১৯৫০-এ আনসার ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের মহাপরিচালক এবং ১৯৫০-১৯৫১-তে কলকাতায় পাকিস্তানি দূতাবাসের ডেপুটি হাই কমিশনার। ১৯৫২-তে পূর্ববঙ্গ পুলিশের আই.জি. পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৬০-এ এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯৬৫-র ২১ মার্চ মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় বিক্রমপুর এলাকা থেকে (কনভেনশন মুসলিম লীগের মনোনয়নে) পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ১৭ আগস্ট আইয়ুব খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য, কৃষি ও পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুব

সরকারের পতন ঘটায় মন্ত্রিত্ব থেকে পদচ্যুত (২৫ মার্চ ১৯৬৯)। ১৯৩৭-এ কিংস পুলিশ মেডেল লাভ। মৃত্যু. লন্ডন, ১৯৮৪।



শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)॥ জন্ম. গুথুমা গ্রাম, ফেনী, ১৯০৮। সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ। বাবা মৌলভী মুহাম্মদ নূরুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন মুন্সেফ এবং মা আছিয়া খাতুন চৌধুরী ছিলেন গৃহিণী। এক সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান মুসলমান পরিবারে জন্ম। ছয় মাস বয়সে পিতৃহীন হন। মাতামহ খানবাহাদুর আব্দুল আজিজের চট্টগ্রামের বাড়িতে শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত। শিক্ষাজীবনের সূচনা চট্টগ্রাম শহরের ডাক্তার খাস্তগীর স্কুলে। পরবর্তীকালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে মেট্রিক পাস (১৯২৬)। ড. ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। কলকাতার ডায়েসিসন কলেজে ভর্তি। ১৯২৮-এ আই.বি.এ. ১৯৩২-এ বি.এ. এবং ১৯৪২-এ প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বাংলায় এম.এ.পাস। ১৯৪৪-এ এম.বি.ই. ডিগ্রি লাভ। ১৯৪৩-এ বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে যোগদান। কলকাতা সাখাওয়াত হোসেন মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, কলকাতা লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ ও ঢাকা ইডেন কলেজে বাংলার অধ্যাপিকা। বেগম রোকেয়ার সঙ্গে নারীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির (১৯১১) সম্মেলনে (১৯৩৯) এর মহিলা শাখার সভাপতি ও সমিতির পরবর্তী সম্মেলনে (১৯৪১)-এর শিশুসাহিত্য শাখার সভানেত্রী। এছাড়া ১৯৪৮-এ নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির সহ-সভানেত্রী, ১৯৫৮-তে পূর্ব-পাকিস্তান শিশুকল্যাণ পরিষদের সভানেত্রী ও ১৯৬২-তে ঢাকা লেডিস ক্লাবের সভানেত্রী নির্বাচিত। রাজনীতির ক্ষেত্রেও বিচরণ ছিল। ১৯৬২-১৯৬৪ পর্যন্ত সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য। প্রকাশিত সাহিত্য কর্ম: পুণ্যময়ী (১৯২৫), রোকেয়া জীবনী (১৯৩৭), বেগম মহল (১৯৩৮), শিশুর শিক্ষা (১৯৩৯), নজরুলকে যেমন দেখেছি (১৯৫৮), ফুল বাগিচা, আমার দেখা তুরস্ক ইত্যাদি। বড় ভাই হবীবুল্লাহ বাহারের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 'বুলবুল' (১৯৩৩) নামে চতুর্মাসিক পত্র প্রকাশ। এটি দ্বিতীয় বর্ষে (১৯৩৪) ত্রৈমাসিক ও তৃতীয় বর্ষে (১৯৩৬) মাসিক পত্রে রূপান্তরিত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও এদেশের যে কজন মহিলা সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শামসুন নাহার মাহমুদ তাদের অন্যতম। শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এ-সকল গুণাবলীর জন্য কবি নজরুল ইসলামের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ। নজরুল কর্তৃক তাঁর 'সিন্ধু-হিল্লোল' (১৯২৭) কবিতাগ্রন্থ 'বাহার-নাহার'-এর নামে উৎসর্গ। মৃত্যু. ঢাকা, ১০ এপ্রিল ১৯৬৪।



শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)॥ জন্ম. মাহুতটুলি, ঢাকা, ২৩ অক্টোবর, ১৯২৯। কবি, সাংবাদিক। বাবা মুখলেসুর রহমান চৌধুরী ও মা আমেনা বেগম। পিতার বাড়ি নরসিংদী জেলার রায়পুরায়, পাড়াতলী গ্রামে। ঢাকার পোগোজ ইংলিশ হাইস্কুল থেকে মেট্রিক ১৯৪৫-এ। ১৯৪৭-এ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ. পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে ভর্তি এবং তিন বছর অধ্যয়ন। পরে বি.এ. পাস করে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. প্রথমপর্ব উত্তীর্ণ হলেও শেষপর্বের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেননি। সাংবাদিক হিসেবে ১৯৫৭-এ কর্মজীবন শুরু দৈনিক মর্নিং নিউজ-এ। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তানের অনুষ্ঠান প্রযোজক। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত 'মর্নিং নিউজ'-এর সহযোগী সম্পাদক। ১৯৬৪ থেকে দৈনিক পাকিস্তান-এ যোগদান। মুক্তিযুদ্ধের পরে এর নাম হয় 'দৈনিক বাংলা'। ১৯৭৭-এ 'দৈনিক বাংলা' ও সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'র সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৮৭-তে সামরিক সরকারের শাসনামলে তাঁকে পদত্যাগ বাধ্য করা হয়। প্রথম প্রকাশিত কবিতা ১৯৪৯-এ ছাপা হয় সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকায়। বিভিন্ন পত্রিকায়

সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লিখেছেন সিন্দবাদ, চক্ষুষ্মান, লিপিকার, নেপথ্যে, জনান্তিকে, মৈনাক প্রভৃতি ছদ্মনামে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় মজলুম আদিব (বিপন্ন লেখক) নামে কবিতা ছাপা হয়। ১৯৫৫-এর ৮ জুলাই জোহরা বেগমের সঙ্গে বিয়ে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদ্রুপ করে ১৯৫৮-এ সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকায় লেখেন 'হাতির শুঁড়' নামক কবিতা। বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারাগারে তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখেন অসাধারণ কবিতা 'টেলেমেকাস' (১৯৬৬)। ১৯৬৭-এর ২২ জুন পাকিস্তানের তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী রেডিও পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত সম্প্রচার নিষিদ্ধ করলে শামসুর রাহমান তখন সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান-এ কর্মরত থেকেও পেশাগত অনিশ্চয়তার তোয়াক্কা না করে রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৬৮-এর দিকে পাকিস্তানের সকল ভাষার জন্য অভিন্ন রোমান হরফ চালু করার প্রস্তাব করেন আইয়ুব খান, যার প্রতিবাদে আগস্টে ৪১ জন কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী এর বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন যাদের একজন তিনি। ক্ষুব্ধ হয়ে লেখেন মর্মস্পর্শী কবিতা 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'। ১৯৬৯-এর ২০ জানুয়ারি গুলিস্তানে একটি মিছিলের সামনে একটি লাঠিতে শহীদ আসাদের রক্তাক্ত শার্ট দিয়ে বানানো পতাকা দেখে লেখেন 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিবার নিয়ে চলে যান নরসিংদীর পাড়াতলী গ্রামে। এপ্রিলের প্রথম দিকে তিনি লেখেন যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় আক্রান্ত ও বেদনামথিত কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' ও 'তামাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা'। ১৯৮৭-এ এরশাদেও স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে দৈনিক বাংলার প্রধান সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ। উল্লেখযোগ্য কাব্যঃ প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭), নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮), নিজ বাসভূমে (১৯৭০), বন্দি শিবির থেকে (১৯৭২), ফিরিয়ে নাও ঘাতককাঁটা (১৯৭৪), আমি অনাহারী (১৯৭৬), শূন্যতায় তুমি শোকসভা (১৯৭৭), বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে (১৯৭৭), প্রেমের কবিতা (১৯৮১), ইকারুসের আকাশ (১৯৮২), উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ (১৯৮২), বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮), হরিণের হাড় (১৯৯৩), তুমিই নিঃশ্বাস, তুমিই হৃদস্পন্দন (১৯৯৬), হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল (১৯৯৭)। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, শামসুর রাহমানের নির্বাচিত কবিতা ও শামসুর রাহমানের রাজনৈতিক কবিতা। শিশুতোষ গ্রন্থঃ এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৫), ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো (১৯৭৭), স্মৃতির শহর (১৯৭৯), লাল ফুলকির ছড়া (১৯৯৫)। অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছেঃ মার্কোমিলিয়ানস (১৯৬৭), রবার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা (১৯৬৮), হৃদয়ে ঋতু, হ্যামলেট, ডেনমার্কের যুবরাজ (১৯৯৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা (১৯৮৫), দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা (যৌথ) এবং দুই বাংলার বিরহের কবিতা (যৌথ)। উল্লেখযোগ্য পুরস্কারঃ 'আদমজী পুরস্কার' (১৯৬৩), 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' (১৯৬৯), 'একুশে পদক' (১৯৭৭), 'স্বাধীনতা পুরস্কার' (১৯৯১), সাংবাদিকতায় 'জাপানের মিত্সুবিশি পদক' (১৯৯২), ভারতের 'আনন্দ পুরস্কার' (১৯৯৪)। এছাড়া ভারতের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত। কবি ও সাংবাদিক হিসেবে সম্মানিত হয়ে তিনি ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া), বার্মা (মিয়ানমার), পশ্চিম জার্মানি (সাবেক), যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। মৃত্যু. ঢাকা, ১৭ আগস্ট ২০০৬।

শামসুল আলম খান মিলন (১৯৫৭-১৯৯০)॥



জন্ম. হলিফ্যামিলি হাসপাতাল, ঢাকা, ২১ আগস্ট, ১৯৫৭। শহীদ। পৈতৃক নিবাস কলাকোপা, লক্ষ্মীপুর। পিতা শাহাদাতুল্লাহ খান ছিলেন বিমানবাহিনীর ফ্লাইট সার্জেন্ট। মাতা সেলিনা বেগম ইডেন কলেজের অধ্যাপিকা। স্ত্রী মাহমুদা শিকদার (কবিতা)। ঢাকার সরকারি বিজ্ঞান কলেজের শিল্পকলা বিভাগ থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এস.এস.সি. (১৯৭৩), নটরডেম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এসসি. (১৯৭৫) ও ঢাকা

মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. (১৯৮৩) পাস। আই.পি.জি.এম.আর. থেকে বায়োকেমিস্ট্রিতে এম.ফিল ডিগ্রি লাভ (১৯৮৮)। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নকালে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগে (জাসদপন্থি) যোগদান। এ ছাত্র সংগঠনের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শাখার সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক নির্বাচিত (১৯৮০)। ১৯৮১-তে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত। মজিদ খান (এরশাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী) প্রণীত শিক্ষানীতি (১৯৮২)-বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনে (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ১৯৮৬-তে বি.এম.এ.-এর প্রকাশনা সম্পাদক ও ১৯৮৮-তে এর যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৮৯-তে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ফিজিওলজি বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। আশির দশকের স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ১৯৯০-এর ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন। এরশাদবিরোধী এ আন্দোলনের সমর্থনে ও সরকারের স্বাস্থ্যনীতি বাতিলের দাবিতে ঐ দিন বেলা ১১টায় পিজি হাসপাতালে বি.এম.এ-র আহূত সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে রিক্সাযোগে যাওয়ার পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মোড়ে সরকারের সন্ত্রাসী ঘাতকদের নিক্ষিপ্ত গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন। তাঁর আত্মত্যাগের ফলে স্বৈরাচার-বিরোধী গণ-আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত। মিলন-হত্যার এক সপ্তাহের মধ্যে গণ-বিক্ষোভের মুখে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে (৬ ডিসেম্বর ১৯৯০)। তাঁর প্রাণদান দেশে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের (১৯৯১) ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। একজন লেখক হিসেবেও পরিচিতি লাভ। মাসিক 'গণ-সংস্কৃতিতে' নিয়মিত স্বাস্থ্যবিষয়ক কলাম রচনা। মৃত্যু. ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ১৯৯০।

শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫)॥ জন্ম. মাইঠান (মাতুলালয়), দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮। পৈতৃক বাড়ি একই উপজেলার টেউরিয়া গ্রামে। রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪৪-এ আবুল হাশিম ঢাকায় চলে এসে মুসলিম লীগ



কর্মীশিবির স্থাপন করেন। এই কর্মীশিবিরের নেতৃত্ব দেন শামসুল হক। এই কর্মীশিবির থেকেই ছাত্রলীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরে আওয়ামী লীগ) জন্ম লাভ করে। শামসুল হকের নেতৃত্বেই এই কর্মীশিবির ১৯৪৫-৪৬-এ পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগকে জনসাধারণের গণসংগঠনে পরিণত করে। মুসলিম লীগ ১৯৪৫-এ নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীরা প্রায় সকলেই জয়লাভ করে। ১৯৪৬-এর প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম লীগ শতকরা ৯৭ ভাগ আসনেই জয়লাভ করে। তখন একমাত্র বাংলা ছাড়া ভারতের আর কোথাও কোন প্রদেশে মুসলিম লীগের একক সরকার ছিল না। বাংলায় মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা না থাকলে জিন্নাহ মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন না এবং কংগ্রেসও ভারত বিভাগ মেনে নিতে পারত না। এই বিবেচনায় পাকিস্তান সৃষ্টিতে শামসুল হকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়া ভারত বিভাগের সময় সিলেটে গণভোটে জামায়াতে উলামায়ে হিন্দের প্রবল বিরোধিতার মুখে ঐ কর্মীশিবিরের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই সিলেট পাকিস্তানভুক্ত হতে পেরেছিল। ১৯৫২-এ ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে গ্রেফতার এবং কারাবরণ। ১৯৫৩-এ অত্যন্ত অসুস্থ শরীর ও মানসিক ব্যাধি নিয়ে মুক্তিলাভ। সে সময়ে তাকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত। ১৯৫৪ সাল থেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে প্রায় ১০ বছর পথেপথে ঘুরে বেড়িয়েছেন; নতুন দল গঠনের জন্য পরিচিত অনেকের কাছে চাঁদাও চেয়েছেন। ১৯৬৫-এ শামসুল হক হঠাৎ নিখোঁজ হন। তাঁর নিখোঁজ হওয়া নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে রহস্যের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৫-এর মাঝামাঝি সময়ে জোকারচর গ্রামের কংগ্রেস নেতা মহিউদ্দিন আনসারী কলকাতা থেকে সিরাজগঞ্জ হয়ে বাড়ি ফেরার পথে এক স্থান থেকে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন মহিউদ্দিন

আনসারীর বাড়িতে ৭ দিন থাকার পর তার হঠাৎ খুব জ্বর হয়। স্থানীয় হোমিও চিকিৎসক শুকলাল দাসের চিকিৎসা গ্রহণ। প্রচণ্ড জ্বরে কোন এক শনিবার (মাসের নাম অজানা) দুপুর ২টা থেকে আড়াইটার মধ্যে মারা যান। মৃত্যু. ১৯৬৫

শাহ আজিজুর রহমান (১৯২৫-১৯৮৭)॥ জন্ম. কুষ্টিয়া, ২৩ নভেম্বর ১৯২৫। রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ.অনার্স (ইংরেজি) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ল' পাস। অবিভক্ত বাংলায় অন্যতম ছাত্রনেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন। ১৯৪৫-১৯৪৭-এ নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা থেকে ঢাকায় আগমন ও পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনের বিরোধিতা। একই বছর পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৬২-র ২৮ এপ্রিল মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে কুষ্টিয়া এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। একই বছর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত এন.ডি.এফ. (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট)-এর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে যোগদান। ১৯৬৪-র ৮ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগে যোগদান ও দলের নিখিল পাকিস্তান কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। ১৯৬৫-র ২১ মার্চ কুষ্টিয়া এনই ৩৩ আসন থেকে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ১২ জুন জাতীয় পরিষদে সংযুক্ত বিরোধীদলের উপনেতা নির্বাচিত। প্রায় তিন বছর নয় মাস এ পদে দায়িত্ব পালন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার (১৯৬৮) আসামি পক্ষের অন্যতম আইনজীবী (১৯৬৮-১৯৬৯)। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার। জাতীয় লীগে (১৯৬৯) যোগদান ও দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বরের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে কুষ্টিয়া-২ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ-বিরোধী ভূমিকা পালন। পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে গমন এবং মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে বক্তব্য প্রদান। স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর দালাল আইনে গ্রেফতার। ১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে দালালদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আওতায় মুক্তিলাভ। ১৯৭৬-এর ৮ আগস্ট রাজনীতি দলবিধির (১৯৭৬) আওতায় আব্দুর সবুর খানের নেতৃত্বে সাবেক মুসলিম লীগ পুনরুজ্জীবিত করা হলে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৭৮-এর ২৯ জুন দলের অনুমতি ব্যতিরেকে সামরিক প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকারে যোগদান এবং শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী নিযুক্ত; দলীয় স্বার্থবিরোধী কাজের জন্য মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার। ১৯৭৮-১৯৮৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ১৯৭৯-র ১৮ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়া-৩ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১৫ এপ্রিল (১৯৭৯) জাতীয় সংসদের নেতা ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৮২-র ২৪ মার্চ পর্যন্ত উভয় পদে দায়িত্ব সম্পাদন। ১৯৮৫-র ২৯ জুন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আলাদা গ্রুপ গঠন ও এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ। সামরিক প্রেসিডেন্ট লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে সরকারের গঠিত জাতীয় ফ্রন্টে যোগদান (১৭ আগস্ট ১৯৮৫)। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়ায় কয়েক মাস পরে ফ্রন্ট ত্যাগ। ১৯৮৯-র আগস্টে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি) যোগদান। সুবক্তা ও দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি ও আরবি ভাষায় ব্যুৎপন্ন। মৃত্যু. ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।



শাহ আব্দুল হামিদ (১৯০০-১৯৭২)॥ জন্ম. গোবিন্দগঞ্জ গ্রাম, রংপুর, ১৯০০। স্পিকার। ১৯২০-এ রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে বি.এ.পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ। ১৯২৭-এ ওকালতি পাস করে গাইবান্ধা বারে

যোগদান। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনে



অংশগ্রহণ। ১৯৩৬-এ মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪২-এ রংপুরে জেলা বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। ১৯৪৩-১৯৫৪ পর্যন্ত রংপুর স্কুল বোর্ডের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৪৫-এ ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫১-১৯৫৫ পর্যন্ত সাবেক ন্যাশনাল ব্যাংকের কেন্দ্রীয় বোর্ডের ডিরেক্টর। ১৯৫৬-তে আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৫৭-১৯৬৬ পর্যন্ত রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। ১৯৬৬-তে ৬ দফা আন্দোলনে এবং ১৯৬৯-এ গণ-আন্দোলনে রংপুরে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ, পলাশ বাড়ি নির্বাচনী এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে মুজিবনগরে গমন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৭২-এর ১০ এপ্রিল সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ গণ-পরিষদের প্রথম স্পিকার নির্বাচিত। মৃত্যু. গাইবান্ধা, ১ মে ১৯৭২।

শাহ আবদুল করিম (১৯১৬-২০০৯)॥ জন্ম.



ধলআশ্রম গ্রাম, দিরাই, সুনামগঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬। দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম। বাউলসাধক, গণসংগীত শিল্পী ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। পিতা ইব্রাহিম আলী, মাতা নাইওরজান বিবি। ১৯৫৭-তে কাগমারী সম্মেলনে কবিয়াল রমেশ শীলের সঙ্গে গণসংগীত পরিবেশনসহ যৌবনে তিনি পেয়েছিলেন মৌলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সান্নিধ্য। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রাম তাঁর গানে ফুটে উঠেছে। ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তাঁর গান বাঙালি জাতিকে চেতনা জুগিয়েছে। লোকসংগীতে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'একুশে পদক' (২০০১) লাভ। এ ছাড়া পেয়েছেন প্রায় দুই শতাধিক পদক, সম্মাননা ও সংবর্ধনা। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: আফতাব সংগীত (১৯৪৮), গণসংগীত (১৯৫৭), কালনীর ঢেউ (১৯৮১), ধলমেলা (১৯৯০), ভাটির চিঠি (১৯৯৮), কালনীর কূলে (২০০১) ও শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র (২০০৯)। মৃত্যু. সিলেট, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯।

শাহ আহসানউল্লাহ (১৭৯৮-?)॥ জন্ম. ভাদ্রমাস, ১২০৫ বঙ্গাব্দ। ধর্মপ্রচারক। ঢাকার শাহ সাহেব লেনে তাঁর মাজার আছে। রাস্তাটির নামও তাঁরই নামে রাখা হয়েছে। শাহ সাহেবের পূর্বপুরুষ দিল্লি থেকে এদেশে এসে প্রথমে সোনার গাঁও-এ বসবাস শুরু করেন। পরে মুগুরী খোলায় বসতি স্থাপন করেন। প্রথমে চিশতিয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন, পরে কাদেরিয়া তরিকার মুরিদ হন। জীবনের প্রথম দিকে সুদীর্ঘকাল ধরে বিদ্যাশিক্ষা, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে দিনযাপন। বাংলাদেশ ও তার বাইরে শাহ সাহেবের অজস্র মুরিদ ও ভক্ত রয়েছে। সুফি মতের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেও তিনি পুরোপুরি শরিয়ত মেনে চলতেন। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার তাঁর শাহ সাহেব লেনের বাড়িতে তাঁর উরস উদযাপন করা হয়। মৃত্যু. তারিখ অজ্ঞাত।

শাহ এ এম এস কিবরিয়া (১৯৩১ -মৃত্যু ২৭



জানুয়ারি, ২০০৫)॥ জন্ম হবিগঞ্জ, ১লা মে ১৯৩১। পুরো নাম শাহ আবু মোহাম্মদ শামসুল কিবরিয়া। অর্থনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদ। পিতা শাহ ইমতিয়াজ আলী। ১৯৫২-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ। ভাষা-আন্দোলনে সম্পৃক্ততার অভিযোগে গ্রেফতারবরণ। ১৯৫৩-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন। ১৯৫৪-এ সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে বৈদেশিক বিভাগে যোগদান। কূটনৈতিক মিশনের সদস্য

হিসেবে কলকাতা, কায়রো, জাতিসংঘ মিশন, নিউইয়র্ক, তেহরান এবং জাকার্তায় নিয়োজিত। ইসলামাবাদেও বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এবং ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে পাকিস্তান দূতাবাসে নিযুক্ত। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে পাকিস্তান দূতাবাসে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসেবে কর্মরত সত্ত্বেও ১৯৭১-এর ৪ আগস্ট বাঙালি সহকর্মীদের নিয়ে দূতাবাস ত্যাগ এবং বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। পরে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশন তদারকি এবং বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকাপালন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য ও অগ্রগতি নিয়ে নিয়মিত বুলেটিন ও পুস্তিকা প্রকাশ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক বিষয়ক বিভাগের মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান। ১৯৭৩-এর জানুয়ারি মাসে হাইকমিশনার হিসেবে নিযুক্তি এবং অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ফিজিতে দায়িত্ব পালন। ১৯৭৬-এ জেনেভায় জাতিসংঘের ইউরোপীয় কার্যালয়ের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্তি। ১৯৭৮-এ পাররাষ্ট্র সচিব হিসেবে দেশে প্রত্যাবর্তন। ১৯৭৯-এ ম্যানিলায় আংকটাডের সভায় ৭৭-জাতি গ্রুপের প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত। ১৯৮১ থেকে মার্চ ১৯৯২ পর্যন্ত এসকাপের নির্বাহী সচিব পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৮৬-এ জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিনিধি হিসেবে কম্বোডিয়ায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে যোগদান। ১৯৯২-এ দেশে ফিরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদান এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত। ১৯৯৪-এ আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন। ১৯৯৭-এ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (এসকাপ) চেয়ারম্যান নির্বাচিত। ১৯৯৮-এ আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মনোনীত। ২০০১-এ হবিগঞ্জ-৩ এলাকা থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত। 'মৃদুভাষণ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: মৃদু ভাষণ (১৯৯৭), দ ইমার্জিং নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার, (১৯৯৯), বাংলাদেশ এট দ্য ক্রসরোডস, (১৯৯৯), চিত্ত যেথা ভয়শূন্য। মৃত্যু: হবিগঞ্জ বৈদ্যেরবাজারে জনসভায় গ্রেনেড হামলায় ৩ সহযোগীসহ মর্মান্তিকভাবে নিহত, ২৭, ২০০৫।

শাহজালাল, হজরত (১২৭১-?)॥ জন্ম: কুনিয়া শহর, তুরস্ক, ১২৭১। ধর্মপ্রচারক। ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে যে সমস্ত পির-দরবেশ ও আউলিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হজরত শাহজালাল অন্যতম। হজরত শাহজালালের পুরো নাম শেখুল মশায়েল মখদুম শেখ শাহজালাল মজর্রদ বিন মোহাম্মদ। তাঁর প্রতিপালনের ভার মাতুল সৈয়দ আহমদ কবীরের উপর অর্পিত। মক্কা শরিফে সৈয়দ আহমদ কবীরের বাসস্থান ছিল। তিনি শাহজালালকে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে দীন ইলম শিক্ষা দেন। অল্পদিনেই কামিলিয়াত হাসিল করেন। কথিত আছে একদিন সৈয়দ আহমদ কবীর তাঁর জোহরাখানা থেকে কিছু মাটি শাহজালালের হাতে দিয়ে বলেন, 'যে স্থানের মাটি এই মাটির সঙ্গে মিলে যাবে সেই স্থান হবে তোমার সাধনভূমি। তুমি উক্ত স্থানে গিয়ে ইসলাম ধর্মপ্রচার কর।' মাতুলের দেওয়া উক্ত মাটি নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম এখানে আসেন। এরপর দিল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হন। সে সময় নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (১২৩৬-১৩২৫) দিল্লির একপ্রান্তে বাস করতেন। তিনি তাঁকে দুজোড়া কবুতর উপহার দেন। এই কবুতর বর্তমানে জালালি কবুতর নামে পরিচিত। সিলেটের হিন্দু-মুসলমান এই কবুতর কখনো বধ করে না। হজরত শাহজালাল সিলেটে আসার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত গৌরগোবিন্দ সিলেটের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মুসলমান বিদ্বেষী ও অত্যাচারী শাসনকর্তা। শাহজালাল ৩১১ জন অনুসারীসহ ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে কুমিল্লা আসেন। গৌরগোবিন্দ তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে সমস্ত নদীপথ বন্ধ করে দেয়। কথিত আছে শাহজালাল মৃগচর্মের জায়নামাজে বসে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নদী পার হন। উপায় না দেখে গৌরগোবিন্দ বিনাযুদ্ধে সিলেট ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। হজরত শাহজালাল ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে, (৭০৩ হিজরি) সিলেট জয় করেন। সিলেটে এসে কিছুদিন চৌকিদীঘি মহল্লায় লাককড় তুড়ায় বাস করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি তাঁর মৃত্যুর খবর মুরিদানগণকে জানিয়েছিলেন। তাঁর হুজরাখানা লম্বায় আড়াই হাত ও প্রস্থে দুই হাত ছিল। এই হুজরাখানায় বসে তিনি ত্রিশ বছর আল্লাহর

এবাদত করেন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন। কথিত আছে তাঁর ইন্তেকালের পর হুজরাখানার পাশে কাফন, আতর ও খোদিত অবস্থায় একটি কবর পাওয়া যায়। এই কবরে তাঁকে দাফন করা হয়। ইবনে বতুতার মতে হজরত শাহজালাল ১৩৪৭-এ ইন্তেকাল করেন। তাঁর কবরের ওপরে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। এই স্মৃতিসৌধটিই বর্তমানে হজরত শাহজালালের দরগা নামে খ্যাত। এই দরগায় হজরত শাহজালালের ব্যবহৃত তরবারি, জুলফিকার, কাঠের খড়ম ও দুধ খাওয়ার দুটি বাটি সযত্নে রক্ষিতআছে। হজরত শাহজালাল কেবল সিলেটে ধর্মপ্রচার করেই ক্ষান্ত হননি।ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রংপুর ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। মৃত্যু. অজ্ঞাত।

শাহতাব (১৯৩৬-১৯৭৭)॥ জন্ম. মাইলাকান্দা গ্রাম, ঈশ্বরগঞ্জ ১৯৩৬। চিত্রশিল্পী, অধ্যাপক, প্রগতিশীল সংস্কৃতি সংগঠক। ১৯৫৮-তে ঢাকায় চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে ফাইন আর্টস-এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ। ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিল্পকলা বিভাগের অধ্যাপক। চিত্র-সমালোচকদের মতে শাহতাব কিউবিক পদ্ধতির অঙ্কনরীতির অনুসারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেও একজন মৌলিক ও স্বকীয় প্রতিভার অধিকারী শিল্পী হিসেবে নিজের স্থান করে নেন। একজন প্রতিভাবান নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে এবং বিশেষত ময়মনসিংহের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন বিশিষ্ট কর্মী। মৃত্যু.২৮ জুন ১৯৭৭।

শাহ মখদুম॥ জন্ম. ইসলামিক তাহসিব ও তমুদ্দনকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে পাঠান আমলে যে কয়েকজন ধর্মনেতা, ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও আধ্যাত্মিক গুরু ভারতবর্ষে আগমন করেন এঁদের মধ্যে হজরত শাহ মখদুমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি জালালি ও শিয়ারি শাখার একজন কামেল দরবেশ ছিলেন। ইনি সকল সময়ে কালো পাগড়ি দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন। তাঁর দরগাহর পিরপাল স্বরূপ জনৈক বাদশাহ কর্তৃক ২৫০ বিঘা জমি প্রদত্ত হয়েছিল। এই জমিগুলি সম্রাট মহম্মদ শাহ, শাহ আলম ও আলমগীর এবং রাজশাহীর রানি ভবানী ও রাজা রামজীবন প্রমুখ মোগল ... কর্তৃক জমিদার দ্বারা লাখেরাজ ও দেবোত্তর হয়েছিল। হজরত শাহ মখদুমের শিয়ারি রীতি অনুযায়ী রাজশাহীতে মহররম পর্ব উদযাপিত হয়। আলী কুলী বেগ কর্তৃক শাহ মখদুমের সমাধি সৌধ পুনঃনির্মাণের পর এই সমাধি চত্বরে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে মহরমের তাজিয়া উঠতে দেখা যায়। ১৬৩৫-এ হজরত শাহ মখদুম রূপোসের স্মৃতিসৌধ স্থাপিত হয়। এই স্মৃতিসৌধের কপাট ও চৌকাঠগুলো কারুকার্যমণ্ডিত। প্রস্তরাদির ওপরে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত। আলী কুলী বেগই এই স্মৃতিসৌধের গম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে চার লাইন বিশিষ্ট একটি ফারসি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। এ ছাড়া স্মৃতিসৌধের গায়ে যে লিপি খোদিত আছে তাতে শাহ মুখদুমকে শাহ দরবেশরূপে সম্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে স্মৃতিসৌধটি দরগায় পরিণত। হিন্দুদের কাছে তিনি 'মখদুম বাবা' এবং মুসলমানদের কাছে তিনি 'দরবেশ' হিসেবে পরিচিত। ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই দরগায় নানা প্রকার মানত করে থাকে। মৃত্যু.অজ্ঞাত।

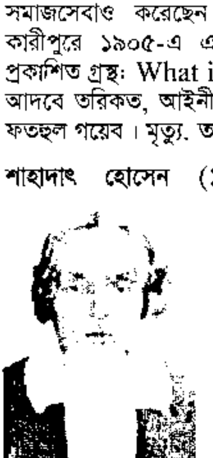
শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ (১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ)॥ জন্ম. হাফিজপুর গ্রাম, বালিয়া পরগনা, হুগলী। কবি। দোভাষী পুঁথিসাহিত্যের শ্রেষ্ঠকবি শাহ গরীবুল্লাহর বিস্তারিত জীবন কাহিনী জানা যায় না। কবির ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে অষ্টাদশ শতকের পুঁথিকার সৈয়দ হামজা তাঁর কাব্যে শাহ গরিবুল্লাহ সম্পর্কে যে সামান্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সেটুকুই একমাত্র সম্বল। গরীবুল্লাহর আবির্ভাব নিয়ে মতভেদ আছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে গরীবুল্লাহ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন গরীবুল্লাহ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিরেন। কবির রচিত গ্রন্থ: আমীর হামজা, সোনাভান, জঙ্গনামা, সত্যপীরের পুঁথি ও ইউসুফ জোলেখা। মৃত্যু.অজ্ঞাত।

শাহ মুহম্মদ সগীর॥ জন্ম. আনুমানিক ১৪ থেকে ১৫ শতক। কবি। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি রাজকর্মচারী। মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম। তাঁর ইউসুফ জোলেখা (১৩৮৯-১৪০৯) কাব্যটি সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আমলে রচিত। এই কাব্য তিনি রাজবন্দনায় সুলতান 'গেয়াস'-এর ... প্রশংসামুখ। শাহ মুহম্মদ

সগীরের কাব্যে প্রাকৃত ভাবাপন্ন শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। এ দেশের মুসলমানদের ধর্মকথা শোনবার উদ্দেশ্যে তিনি কাব্য রচনায় প্রয়াসী হলেও তাঁর কাব্য শিল্পমূল্যেও সমৃদ্ধ। মৃত্যু. আনুমানিক ১৫ শতক।

শাহ মোহাম্মদ বদিউল আলম (১৮৫৬-?)॥ জন্ম. চট্টগ্রাম শহর, ১৮৫৬। সাহিত্যিক। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ। ১৮৮৬-তে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কর্মজীবন শুরু। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন বলে বিভিন্ন কারণে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে যোগদান। ১৮৮৮-তে কলকাতা থেকে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'মোহামেডান অবজারভার' পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ। এ অপরাধে গ্রেফতার বরণ এবং এক বছর চট্টগ্রাম জেলে কারারুদ্ধ। সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি সমাজসেবাও করেছেন। নিজগ্রাম ইজ্জতনগর কারীপুরে ১৯০৫-এ একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা। প্রকাশিত গ্রন্থ: What is Man, আদবে মুরিদ, আদবে তরিকত, আইনীয়ে জাহাঙ্গীরি। অনুবাদ: ফতহুল গয়েব। মৃত্যু. তারিখ অজ্ঞাত।

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩)॥ জন্ম. হাড়োয়া-চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৮৯৩। সাহিত্যিক। হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। হাড়োয়া মাইনর স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা। কলকাতায় গমন। সেখানে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির (১৯১১) গ্রন্থাগারিক, মাসিক সওগাতের (১৯১৮) সহকারী সম্পাদক, মাসিক সহচরের (১৯২১) যুগ্ম-সম্পাদক, দৈনিক সুলতান (১৯২৮) ও সাপ্তাহিক মোসলেম জগতের সহকারী সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন। আইন অমান্য আন্দোলনের (১৯৩১) সমর্থনে কলকাতার মীর্জাপুর পার্কে এক সমাবেশে বক্তৃতা দেয়ার দায়ে চার মাস [illegible] প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ঢাকা বেতারকেন্দ্রে চাকরি লাভ (১৯৪৮)। রেডিও পাকিস্তানের পাক্ষিক পত্রিকা (বাংলা) 'এলান' সম্পাদনা। বেতারকেন্দ্র থেকে চাকুরিচ্যুত (মে ১৯৫৩) হওয়ার পর ঢাকা ত্যাগ করে পণ্ডিতপোল গমন। কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন। মুসলিম ঐতিহ্য সচেতন কবি। শব্দ, ধ্বনি ও ছন্দবিন্যাসের নিপুণতায় ও ভাবগাম্ভীর্যে তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ। মৃদঙ্গ (১৯২৮), কল্পলেখা (১৯২৯), রূপচ্ছন্দা (১৯৫০) প্রভৃতি শাহাদাৎ হোসেনের বিশিষ্ট কবিতাগ্রন্থ। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে নায়ক-নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত। সরফরাজ খাঁ (১৯১৯), আনারকলি (১৯৪৫), মসনদের মোহ (১৯৪৬), তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। উপন্যাস: মরু ও কুসুম (১৯১৯), হিরণলেখা (১৯২০), পারের পথ (১৯২০), স্বামীর ভুল (১৯২১), সোনার কাঁকন (১৯২৩), যুগের আলো (১৯২৪), রিক্তা (১৯২৭), পথের দেখা (১৯২৯), কাঁটাফুল (১৯৩০); গল্প: রূপায়ণ (১৯৩৩); শিশুসাহিত্য: ছেলেদের গল্প (১৯২৪), মোহন ভোগ (১৯২৪)। মৃত্যু. কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৩।



শাহেদ আলী (১৮৯৯-১৯৫৮)॥ জন্ম. আশ্চিনপুর গ্রাম, মতলব, কুমিল্লা, ১৮৯৯। রাজনৈতিক ও ডেপুটি স্পিকার। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯২১-এ দর্শনে বি.এ.অনার্স এবং ১৯২৩-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৯২৫-এ 'ল' পাস। ১৯২৬-এ কুমিল্লা জেলা আদালতে আইন ব্যাবসায় যোগদান। ১৯২৯-এ শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগদান। কৃষক-প্রজা পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং কুমিল্লা জেলা শাখার সহসভাপতি পদে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন। ১৯৩৭-এ বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত। এ পদে ১৯৪৫ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠিত (১৯৫৩) হলে এর কেন্দ্রীয় নেতা। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের



মনোনয়নে চাঁদপুর পশ্চিম নির্বাচনী এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৫-তে পূর্ববঙ্গ পরিষদের ডেপুটি স্পিকার নিযুক্ত। ১৯৫৮-র ১৯ সেপ্টেম্বর কৃষক-শ্রমিক পার্টি ত্যাগ করে আওয়ামী লীগে যোগদান। পরের দিন ২০ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) পূর্ববঙ্গ পরিষদের অধিবেশন বসে; ঐদিন ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) দলীয় সদস্য দেওয়ান মাহবুব আলী কর্তৃক পরিষদের স্পিকার আব্দুল হাকিমের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ দলীয় পরিষদ সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। অনাস্থা প্রস্তাবটি সংখ্যাধিক্য ভোটে পাস হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে পরিষদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়। অধিবেশন শুরুর পরপরই পরিষদ কক্ষে উপস্থিত সরকারি দল ও বিরোধী দলের সদস্যরা বাকবিতণ্ডার পর সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই সংঘর্ষে পরিষদ কক্ষের অভ্যন্তরে শাহেদ আলী মারাত্মকভাবে আহত হলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরিত হন এবং সেখানেই মৃত্যু। মৃত্যু.ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

শাহেদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯০-১৯৬৫)॥ জন্ম. মেদিনীপুর, ২৪ অক্টোবর ১৮৯০। শিক্ষাবিদ ও শিল্পকলা-বিশারদ। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জাহেদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর পিতা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অগ্রজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স পাস (১৯১০)। ১৯১৪-তে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ইতিহাসে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ। ১৯১৭-তে সোভিয়েত রাশিয়ায় গমন এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। মস্কোর আর্ট থিয়েটারে অন্যতম শিল্পনির্দেশক হিসেবে কাজ করেন। ১৯২০-এ ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ। প্যারিসে কিছুকাল জাতিপুঞ্জ পরিচালিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি বিনিময় কেন্দ্রের ললিতকলা শাখার উপদেষ্টারূপে কর্মরত (১৯২৬-১৯২৯)। পরে প্যারিসে এসে ১৯৩১ পর্যন্ত সেখানে বসবাস। দেশে ফিরে



১৯৩২-১৯৪৩ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগেশ্বরী শিল্প অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন; কিছুকাল বিশ্বভারতীয় ইসলামি সংস্কৃতির অধ্যাপকরূপে কর্মরত। ১৯৪৩-১৯৪৭ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য। পাকিস্তান সৃষ্টির (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর ১৯৪৮-এর শেষের দিকে করাচিতে গমন এবং পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিযুক্ত, পরে সভাপতি। ১৯৫২-তে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যদেশিয় শিল্পকলার অধ্যাপক পদে যোগদান। ১৯৫৪-তে স্পেনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত। এরপর মরক্কো, তিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতরূপে দায়িত্ব পালন। ১৯৫৯-এ করাচিতে ফিরে সেখানে অবসর জীবনযাপন। চিরকুমার। জওহরলাল নেহরু এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানাভাষায় দক্ষ। প্রাচ্যদেশিয় শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশ্বের অন্যতম বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত হন। একজন কবি হিসেবেও খ্যাত, তাঁর কাব্যের নাম: Essays in Verse (১৯৩৭)। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: Musalman Culture, A Handbook of Musalman Art, Musalman Art in Spain. মৃত্যু. ৩ মার্চ ১৯৬৫।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)॥ জন্ম. মাতুলালয়, চাংড়িপোতা গ্রাম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ৩১ জানুয়ারি ১৮৪৭। পৈতৃক নিবাস মজিলপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা। পণ্ডিত, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। মজিলপুর পাঠশালা, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন। ১৮৭২-এ সংস্কৃতে এম.এ.পাস করে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ; ১৮৭৩-১৮৭৪ পর্যন্ত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা। এ ছাড়া হরিনাভি স্কুল পরিচালনায় সহায়তা প্রদান। ১৮৭৪-এ ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত। ১৮৭৬-এ হেয়ার স্কুলে সংস্কৃতের শিক্ষকরূপে যোগদান। ১৮৭৮-এ সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা প্রদান; ১৮৬৫ থেকে



সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। বাল্যবিবাহের বিপক্ষে এবং বিধবাবিবাহের পক্ষে কর্ম সম্পাদন। ১৮৬৯-এর ২২ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ। উপবীত ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করায় পিতর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। India Reforms Association-এ যোগ দিয়ে মদ্যপান নিবারণ এবং শিক্ষা, সাহিত্য এবং কারিগরিবিদ্যার প্রচারে সহায়তা প্রদান। এ সময় 'মদ না গরল' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। ১৮৭৭-এ গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতি গঠন। ১৮৭৮-এ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ভাঙ্গন ধরে। এ সমাজ নারী-পুরুষ একত্রে উপাসনা করার রীতি গ্রহণ করেছিল। স্ত্রীলোকেরা পর্দার আড়ালে পৃথক স্থানে বসতেন। প্রগতিবাদীরা পর্দা দূর করে দিয়ে প্রকাশ্যভাবে নারী-পুরুষ একত্রে বসে উপাসনা করার দাবি তোলেন। সমাজের আচার্য কেশবচন্দ্র সেন এ দাবির বিরোধিতা করেন। তিনি স্ত্রীলোকদের পর্দার আড়ালে পৃথক স্থানে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিবাদকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভেঙ্গে যায়। ১৮৭৮-এ শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৯-তে আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে 'সিটি কলেজ' ও 'স্টুডেন্ট সোসাইটি' নামক ছাত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন। ১৮৮৩-তে তাঁর উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে 'সখা' নামে ভারতের প্রথম কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। 'তত্ত্বকৌমুদী' ও 'ইন্ডিয়ান মেসেজ' নামক পত্রিকা সম্পাদনা ও এ কাজে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান। বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক হিসেবে সুনাম অর্জন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কাব্যঃ নির্বাসিতের বিলাপ (১৮৬৮), পুষ্পমালা (১৮৭৫), হিমাদ্রি কুসুম (১৮৮৭), পুষ্পাঞ্জলি (১৮৮৮)। উপন্যাসঃ মেজ বৌ (১৮৮০), যুগান্তর (১৮৯৫), নয়নতারা (১৮৯৯), বিধবার ছেলে (১৯১৬)। প্রবন্ধঃ বক্তৃতা-স্তবক (১৮৮৮), রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪), প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড-১৯০৪), ধর্মজীবন (১ম-৩য় খণ্ড, ১৯১৪-১৯১৬), আত্মচরিত (১৯১৮)। মৃত্যু. ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৯।

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৯০৩। কথাশিল্পী। মালদহ জেলার চাঁচল হাইস্কুলে শিক্ষা লাভ। স্কুলজীবন থেকেই সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক জন্মে। এ সময়ে প্রথম কবিতা মাসিক ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত।



খবরের কাগজের হকাররূপে জীবিকা শুরু দৈনিক বসুমতী বিক্রি করে তার কমিশনের টাকায় জীবিকানির্বাহ। এরপর দৈনিক বসুমতীতেই গল্প লেখা শুরু। তৎকালীন বসুমতী সম্পাদক সাহিত্যিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের দ্বারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ। কথাশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ। ব্যক্তিগত জীবনে চিরকুমার ছিলেন। আমৃত্যু কলকাতার বিভিন্ন মেসে থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। হাসির গল্প রচনায় অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন। ছোটদের জন্য লিখেছেন প্রচুর। লঘু প্রবন্ধ রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ–উপন্যাসঃ প্রেমের পথ ঘোরালো (১৯৪৬)। গল্পগ্রন্থঃ আজ এবং আগামীকাল (১৯২৯), মেয়েদের মন (১৯৪০)। কবিতাঃ মানুষ (১৯২৯), চুম্বন (১৯২৯)। নিজের সম্পাদনায় জীবিতকালে প্রকাশিত শিব্রাম রচনাবলী (মোট ৫ খণ্ড)। ১৯৭৫-এ প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯৮০।

শিরিন বেগম কাজী (১৯১৫-২০০২)॥ জন্ম. রাজনান, মধ্যপ্রদেশ, ভারত। দ্বিতীয় বাঙালি মুসলিম মহিলা চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ। পিতা ডাক্তার কাজী আব্দুস সাত্তার ও মাতা আঞ্জুমান নেসা। প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা চিকিৎসক জোহরা বেগম কাজী তাঁর বড় বোন। পৈতৃক বাস গোপালপুর, কালকিনি, মাদারীপুর। ১৯৩১-এ আলিগড় মুসলিম মহিলা স্কুল থেকে দ্বিতীয় বাঙালি মুসলিম আলিগড়িয়ান হিসাবে মেট্রিক পাস। দিল্লির লেডি হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৩৭-এ এম.বি.বি.এস. পাস। মহাত্মা গান্ধীর 'সেবাগ্রাম'-এ অবৈতনিকভাবে দায়িত্বপালন। জব্বলপুরের ডা. মোহাম্মদ ইফসুফের সঙ্গে বিয়ে। ১৯৪৮-এ দেশে ফিরে মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলে গাইনি বিভাগে চিকিৎসক ও শিক্ষক হিসেবে যোগদান। ১৯৫১-এ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে ডিপ্লোমা অর্জন। ১৯৫৯-৬২-এ পাকিস্তান হেলথ কাউন্সিল থেকে প্রকাশিত 'উইমেন অ্যান্ড হেলথ

নাউ' নামে ইংরেজি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা। ১৯৬০-এ 'Magic Casements' নামে গ্রন্থ রচনা। ১৯৬০-এ ঢাকা পৌরসভার কমিশনার নিযুক্ত ১৯৬৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরাসি ও রাশিয়ান ভাষা এবং ইসলামি একাডেমি থেকে আরবি ভাষা শিক্ষা। মৃত্যু. ঢাকা, ১৮ মে ২০০২।

শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১)॥ জন্ম. পলুয়া-মাগুরা গ্রাম, যশোর, ১৮৪০। সাংবাদিক। পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ, মাতা অমৃতময়ী। কলকাতা কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস (১৮৫৭)। কিছুদিন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন। পিতার মৃত্যুর পর শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ (১৮৬০)। কিছুকাল পরে ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুল পদে উন্নীত। মাতা অমৃতময়ীর নামানুসারে পলুয়া গ্রামে অমৃতবাজার নামে একটি বাজারের প্রতিষ্ঠা। কালক্রমে পলুয়া-মাগুরা গ্রামের নাম অমৃতবাজার গ্রামে রূপান্তরিত। চাকরি পরিত্যাগ করে সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান। নিজ গ্রাম থেকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮)। পরের বছর এটি ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকায় রূপান্তরিত। ১৮৭১-এ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কলকাতায় স্থানান্তরিত। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮৭৮) চালু হলে পত্রিকাটি ইংরেজি সাপ্তাহিকে পরিণত (২১ মার্চ ১৮৭৮)। ১৮৯১-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি অনুজ মতিলাল ঘোষের সম্পাদনায় অমৃতবাজার দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত। সরকার ও সমাজের অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে সংবাদ পরিবেশন করে পত্রিকাটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন। সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংবাদ ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রেও এ পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম পালন। ১৮৬৯-এ থিওসফিক্যাল সোসাইটির সদস্য হন। সবশেষে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ। রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ। 'ইন্ডিয়ান লীগ' (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫) স্থপতিদের অন্যতম। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বাধীকার লাভ ও স্বদেশি দ্রব্য জনপ্রিয় করে তোলার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকায় নিয়মিত লেখনী চালনা। ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্ট, প্রেস অ্যাক্ট, আর্মস অ্যাক্ট প্রভৃতি দমনমূলক আইনের বিরোধিতা। দেশে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন (১৮৭০)। ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২) গঠনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। এর পরিচালক নিযুক্ত (১৮৭৩)। সংগীতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ। পাখোয়াজ বাদনে সিদ্ধহস্ত। কীর্তন ও টপ্পা গানের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী। লেখক হিসেবেও খ্যাত। তাঁর 'অমিয় নিমাইচরিত' চৈতন্যদেবের একখানি মনোরম জীবনালেখ্য। 'নয়শো রূপেয়া' (১২৭৯) নামক নাটক ও 'বাজারের লড়াই' (১৮৭৪) নামক প্রহসন রচনা। ইংরেজি গ্রন্থ 'লর্ড গৌরাঙ্গ'। অন্যান্য গ্রন্থ- 'শ্রীনরোত্তমচরিত'; 'শ্রীকালাচাঁদ গীতা' (কাব্য), 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস' (নাটক), 'সংগীতশাস্ত্র'। মৃত্যু. ১০ জানুয়ারি ১৯১১।



শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯)॥ জন্ম. মেদিনীপুর, ২ অক্টোবর, ১৮৮৯। অভিনেতা ও নাট্যাচার্য। পৈতৃক নিবাস রামরাজাতলা, হাওড়া। বঙ্গবাসী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯০৫), স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ.(১৯১০) ও ইংরেজিতে এম.এ. (১৯১৩) পাস। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপনা। এ সময়ে দুই বছরের সন্তান রেখে তাঁর স্ত্রীর আত্মহত্যা। শৌখিন অভিনেতারূপে ছাত্র ও অধ্যাপক জীবনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে বহু ইংরেজি ও বাংলা নাটকে অভিনয়। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ভূয়সী প্রশংসা লাভ। ম্যাডাম থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে যোগদান। সেখানে 'আলমগীর' নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে নাট্যামোদী জনসাধারণের চিত্ত জয় (১৯২১)। মতের অমিল হওয়ায় ম্যাডান থিয়েটার ত্যাগ। ১৯২৩-এ একটি নাট্যগোষ্ঠী গঠন করে ইডেন গার্ডেনস-এ ক্যালকাটা একজিবিশনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ। রামচন্দ্রের ভূমিকায়



অভিনয় করে বাংলার নাট্যজগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি। মনোমোহন থিয়েটার (নাট্যমন্দির) ইজারা নিয়ে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর রচিত 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ। এ নাটক মঞ্চায়নে সর্বত্র নতুনত্ব আনেন। বিলেতি ভাবধারা বর্জন করে কনসার্টের বদলে রোশনচৌকি, আসন-ব্যবস্থায় বাংলা অক্ষর ব্যবহার, প্রবেশপথে আল্পনা অঙ্কন ও পূর্ণকলস স্থাপন, প্রেক্ষাগৃহে চন্দন-অগুরু-ধূপের গন্ধের ব্যবস্থা প্রবর্তন। আর ছিল পাদপ্রদীপের বদলে আলোক-সম্পাত। সিনের পরিবর্তে বক্স সেট। 'সীতা' দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেন: "শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগনৈপুণ্যে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।" এ নাটকে সীতার ভূমিকায় প্রভা ও রামের ভূমিকায় শিশিরকুমার অভিনয় করে কিংবদন্তীতে পরিণত হন। কর্নওয়ালিস থিয়েটারে 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় (১৯২৬), পরে দশম অভিনয়ে জয়সিংহের ভূমিকায়, 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় (১৯২৭), 'ষোড়শীতে' জীবানন্দের ভূমিকায়, 'দ্বিগ্বিজয়ীতে' নাদির শাহের ভূমিকায় ও 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে 'মাইকেলে' নাম-ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয়। ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বর মাসে নিজস্ব নাট্যগোষ্ঠী নিয়ে আমেরিকায় গমন। নিউইয়র্কে সীতা মঞ্চস্থ করে আমেরিকাবাসীদের মন জয়। বাংলা থিয়েটারের নবযুগের প্রবর্তক। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান শিশিরকুমার অভিনয় বৃত্তি গ্রহণ করায় বহু শিক্ষিত অভিনয়-দক্ষ যুবক পেশাদারী নট-বৃত্তি গ্রহণে উৎসাহিত হন। ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ'(১৯৫৯) উপাধি গ্রহণে অসম্মতিজ্ঞাপন. খেতাবের বদলে দেশে একটি জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হলে খুশি হবেন বলে মত প্রকাশ। মৃত্যু.বরাহনগর, ৩০ জুন, ১৯৫৯।

শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭২-১৯৪৬)॥ জন্ম. কীর্তিপাশা গ্রাম, বরিশাল, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ। এসরাজবাদক। প্রথম জীবনে বাঁশি বাদন শিক্ষা, পরে ক্ল্যারিওনেট। যাত্রাদলে বাঁশি ও ক্ল্যারিওনেট বাজাতেন। অমৃতলাল দত্ত ওরফে হাবু দত্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ। গুরুর কাছে এসরাজবাদনে তালিম গ্রহণ। ঢাকার বলদার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, রাজশাহীর জমিদার ললিতমোহন মৈত্র ও ওস্তাদ আমীর খাঁর কাছে এসরাজে তালিম গ্রহণ। সংগীত শিক্ষা সমাপনান্তে ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দরবারে সংগীতজ্ঞ নিযুক্ত। ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে এসরাজ তালিম প্রদান। পরে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর আমন্ত্রণে ওস্তাদ ওয়াজীর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ। কলকাতায় 'সংগীত সম্মিলনীতে' এসরাজের শিক্ষকতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে কিছুকাল শান্তিনিকেতনে অবস্থান। মৃত্যু. ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

শীতালাং শাহ॥ জন্ম. ডঙ্গার গ্রাম, সিলেট। আধ্যাত্মবাদের কবি। সংসারত্যাগী পুরুষ। আধ্যাত্মবাদের গান রচয়িতা। প্রায় তিনশ আধ্যাত্মিক গান রচনা। গানগুলো সিলেট অঞ্চলে বহুল পরিচিত। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচলিত। তাঁর রচিত গানগুলো 'শীতালাং শাহের' গান হিসেবে পরিচিত ও গীত হয়ে থাকে। জন্ম ও মৃত্যু. তারিখ অজ্ঞাত।

শীলভদ্র (৫২৯-৬৫৪)॥ জন্ম. সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ), আনুমানিক ৫২৯। বৌদ্ধ পণ্ডিত। শৈশবকাল থেকে অধ্যয়ন-প্রিয়। রাজকীয় সম্মান ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে রাজ্যত্যাগ। ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। তৎকালীন মগধের নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ আচার্য ধর্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভের পর ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন। দীক্ষাগুরু ধর্মপালের নির্দেশক্রমে দক্ষিণ ভারতের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাভূত। তৎকালীন মগধরাজ এতে খুশি হয়ে তাঁকে একটি নগরের রাজস্ব প্রদান। সেই অর্থে একটি বৌদ্ধবিহার স্থাপন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (৬০৬-৬৪৬) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ও সর্বাধ্যক্ষরূপে দায়িত্ব পালন। পাণ্ডিত্য ও ধর্মনিষ্ঠার গুণে সংঘের নিকট 'ধর্মনীতি' বলে আখ্যায়িত। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর অধ্যয়ন। সংস্কৃত ভাষায় 'আর্য-বুদ্ধ ভূমি-ব্যাখ্যান' নামে একটি গ্রন্থের রচয়িতা। শীলভদ্র তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত বলে খ্যাত হন। পরবর্তীকালে তাঁর নাম হয় মহাস্থবির শীলভদ্র। মৃত্যু. ৬৫৪ (আনুমানিক)।

শুকুর মাহমুদ (১৬৮০-১৭৫০)॥ জন্ম. রামপুর বোয়ালিয়ার নিকটবর্তী সিন্দুর কুসুমী গ্রাম, রাজশাহী, ১৬৮০ (আনুমানিক)। কবি। তিনি

সাধক ছিলেন। সাধক ফকির হিসেবে তাঁর অনেক শিষ্য-সাগরেদ ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, নাথ ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র বিশেষ করে হিন্দুপুরাণ সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। হিন্দুশাস্ত্রের অনেক জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধেও কবির জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর। কবিতাগ্রন্থ: গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস। ত্রিপুরার রাজা গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস এবং তাঁর রানি ময়নামতির যোগসাধনার কাহিনী অবলম্বনে আঠারো শতকের গোড়ার দিকে এই ঐতিহাসিক কাহিনীকাব্য রচিত। মৃত্যু.১৭৫০।

শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১)॥ জন্ম. মোহাম্মদপুর, বসিরহাট, চব্বিশ পরগনা, ১৮৫৯। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। টাকীর মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পাস, কলকাতার সিটি স্কুলে ভর্তি এবং এন্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন।



অসুস্থতার কারণে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত। সাংবাদিকতাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ। সুধাকর (সাপ্তাহিক, ১৮৯৪), মিহির (মাসিক, ১৮৯২), মিহির ও সুধাকর (সাপ্তাহিক, ১৮৯৪), হাফেজ (মাসিক, ১৮৯৬), মোসলেম ভারত (মাসিক, ১৯০০), মোসলেম হিতৈষী (সাপ্তাহিক, ১৯১১), ইসলাম দর্শন (মাসিক, ১৯১৬) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনা। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ: হজরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি (১৮৮৮), ইসলাম তত্ত্ব (১৮৯৬), নামাজতত্ত্ব (১৮৯৮), হজবিধি (১৯০৩), ইসলাম ইতিবৃত্ত (১ম ও ২য় খণ্ড-১৯১০) নামাজশিক্ষা (১৯১৭), ইসলামনীতি (১৯২৫), কোরআন হাদিসের উপদেশাবলী (১৯২৬), রোজাতত্ত্ব (১৯২৮), খোতবা (১৯৩২)। রোমান্সধর্মী অনুবাদ গ্রন্থ: আলহামরা এবং প্রণয়যাত্রী (১৮৯২)। শেখ আবদুর রহিম কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতি-বিষয়ক বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতা মোহামেডান ইউনিয়নের সদস্য, আঞ্জুমান ওয়ায়েজিনে ইসলামের প্রথম সম্পাদক, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ও পরে সহসভাপতি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইসলামের ভাবধারার আলোকে বাংলার মুসলমান সমাজে নব-জাগরণের আন্দোলন সৃষ্টি। বাংলা ভাষার প্রশ্নে তাঁর ধারণা ছিল উদার এবং স্বচ্ছ। তিনি 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ' প্রবন্ধে বলেছেন, 'অন্ধকার যুগে যখন আমি নিজের ক্ষীণশক্তিটুকু লইয়া সম্পূর্ণ নিরবলম্বন ও নিঃসহায় অবস্থায় বাঙ্গালার সাহিত্য আসরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম তখন একটিমাত্র চিন্তা আমার সমস্ত দেহমন অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সেই চিন্তাটি এই যে, কেমন করিয়া আমার প্রিয়তম স্বজাতি বাঙ্গালি মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় অবাধ প্রচার করিব, কেমন করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত কুহেলিকা ও জড়তা মোচন করিয়া তাহাদিগকে মাতৃভাষার পুণ্যমন্দিরে লইয়া আসিব এবং কেমন করিয়া তাহাদের মনের মধ্যে মাতৃভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের প্রেরণা জাগাইয়া দিব?' মৃত্যু. ১৯৩১।

শেখ আব্দুল জব্বার (১৮৮১-১৯১৮)॥ জন্ম. বনগ্রাম, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ, ১৮৮১। সাহিত্যিক ও সমাজসেবী। গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ। তারপর মধ্য বাংলা বিদ্যালয়ে। এখানকার পাঠ সমাপ্তির পূর্বেই আরবি-ফারসি শিক্ষার জন্য কিশোরগঞ্জ মহকুমার সৈয়দগাঁও মাদ্রাসায় ভর্তি। পিতার মৃত্যুর পর পড়াশুনা বন্ধ। মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। ১৯১৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত। কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। 'ইসলাম আভা' নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। ছাত্রাবস্থায় সাহিত্যচর্চা শুরু। মিহির ও সুধাকর, কোহিনুর, সুপ্রভাত, ভারত মহিলা, প্রবাসী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় রচনাদি প্রকাশিত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: মক্কা শরীফের ইতিহাস (১৯০৬), ইসলামচিত্র ও সমাজ চিত্র (১৯০৭), মদিনা শরীফের ইতিহাস (১৯০৭), ইসলাম সংগীত (১৯০৮), আদর্শ রমণী (১ম ভাগ-১৯০৯), জেরুজালেম বা বায়তুল মকাদ্দাসের ইতিহাস (১৯১০), আদর্শ রমণী (২য় ভাগ ১৯১২), হজরতের জীবনী (১৯১৩), নূরজাহান বেগম (১৯১৩), দেবী রাবেয়া (স্ত্রীর বেনামিতে, ১৯১৩), বাজী (১৯১৭), আদম হাওয়া (মৃত্যুর পর প্রকাশিত, ১৯২৫), স্বপ্নবিচার। পাঠ্যপুস্তক: শিশু সোপান, সাহিত্য সোপান, ইসলামিয়া বাল্য শিক্ষা, আদর্শ সাহিত্য, সাহিত্য পাঠ ইত্যাদি। মৃত্যু. ঢাকা, ১৯১৮।

শেখ চান্দ॥ আনুমানিক ১৫৬০ থেকে ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। কবি। দক্ষিণ সিলেটের অন্তর্গত ভানুগাছ পরগনার 'ভাগের

হাট' গ্রামের অধিবাসী কারও কারও মতে, কবির আদি নিবাস সিলেট হলেও তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে ত্রিপুরায়, ত্রিপুরায়ই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। তাঁর পীরের নাম শাহদৌলা। শেখ চান্দ একাধারে সংসারত্যাগী সাধক ও শক্তিশালী কবি। তাঁর বৈরাগ্যময় সাধক-জীবন সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়েই কেটেছে। কবির পাঁচটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়: রসুল, বিজয় শাহদৌলা, কিয়ামত নামা, হর-গৌর সংবাদ ও তালিব নামা।



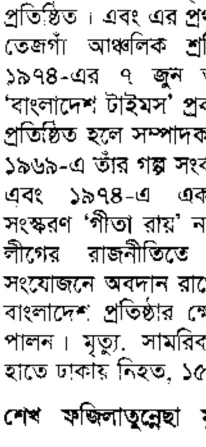
শেখ ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)॥ জন্ম. কাকিনা, রংপুর, ৩০ চৈত্র ১২৮৯ (১৮৮২)। সাহিত্যিক। বাল্যে তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক হরশঙ্কর মৈত্রেয়। উনিশ বছর বয়সে বিদ্যালয়ের পাঠ ত্যাগ করে কাকিনা রেল স্টেশনের নিকটবর্তী মেসার্স এম.ডি. আপকার কোম্পানির জুট ফার্মে চাকরি গ্রহণ। স্বীয় দক্ষতাগুণে সহকারী ম্যানেজার পদে উন্নীত। সাত বছর পরে চাকরিত্যাগ। কাকিনায় সাহারিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস নামে একখানা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা। এ ছাপাখানা থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'বাসনা' নামক একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত। গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই সিদ্ধহস্ত। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল এবং তাতে একটি সহজ সাবলীলতা লক্ষণীয়। সরল পদ্য বিকাশ (১৮৯৩), তৃষ্ণা (১৯০০), পরিত্রাণকাব্য (১৯০৪), ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি (১৯১১), গাঁথা (১৯১৩) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ। লায়লী মজনু (১৯০৪) শেখ ফজলল করিমের রচিত উপন্যাস। মানসিংহ (১৯০৩), মহর্ষি হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতির (রা.) জীবন-চরিত (১৯১৪), চিন্তার চাষ (নীতিকথা, ১৯১৬), বিবি রহিমা (জীবনী, ১৯১৮), পথ ও পাথেয় (১৯১৮), রাজর্ষি এবরাহীম (জীবনী, ১৯২৫), বিবি খাদিজা (জীবনী, ১৯২৭), বিবি ফাতেমা (জীবনী, ১৯২৭) প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ গদ্যগ্রন্থ। হারুন-অর-রশীদের গল্প (১৯১৬) ও সোনার বাতি (১৯১৮) তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী লেখক হিসেবে পরিচিত। নদীয়ার 'সাহিত্যসভা' কর্তৃক 'সাহিত্যবিশারদ' (১৯১৬) ও 'কাব্যরত্নাকর' (১৯১৭) উপাধি প্রদান। মৃত্যু. ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬।



শেখ ফজলুল হক মনি (১৯৩৯-১৯৭৫)॥ জন্ম. টুঙ্গিপাড়া গ্রাম, গোপালগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর ১৯৩৯। রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, লেখক। ঢাকা নবকুমার স্কুল থেকে ১৯৫৬-তে মেট্রিক, ১৯৫৮-তে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ., বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯৬০-এ বি.এ. এবং ১৯৬২-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. ও আইনে ডিগ্রি লাভ। ১৯৬২-তে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়ে গ্রেফতার এবং ছয়মাস বিনাবিচারে কারাভোগ। ১৯৬৪-র এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে চ্যান্সেলর ও পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মোনেম খানের কাছ থেকে সনদপত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং সরকারের গণ-বিরোধী শিক্ষানীতির প্রতিবাদে সমাবর্তন বর্জন আন্দোলনে নেতৃত্ব দান। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁর ডিগ্রি প্রত্যাহার। পরবর্তীকালে মামলায় জয়লাভ করে ডিগ্রি লাভ। ১৯৬৫-তে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার এবং দেড় বছর কারাভোগ। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক (১৯৬০-১৯৬৩)। ৬ দফা আন্দোলনে (১৯৬৬) বিশেষ ভূমিকা পালন করায় তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি এবং ১৯৬৬-র জুলাই মাসে কারারুদ্ধ। এ পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সাজানো অভিযোগে আটটি মামলা দায়ের। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণ-আন্দোলনের চাপে মুক্তিলাভ। ১৯৭০-এর ১১ জানুয়ারি তাঁর উদ্যোগে সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী' পত্রিকা প্রকাশিত। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহারের অন্যতম প্রণেতা। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বি.এল.এফ.) বা 'মুজিব বাহিনী' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

সমন্বয়ে গঠিত পূর্বাঞ্চল সেক্টরে 'মুজিব বাহিনী'র দায়িত্বে নিয়োজিত। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ১৯৭২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী'-কে দৈনিকে রূপান্তরিত ১৯৭৩-এর ২৩ আগস্ট তাঁর প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিক 'সিনেমা' প্রকাশ। শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭২-এর ১১ নভেম্বর তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত। এবং এর প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত। তেজগাঁ আঞ্চলিক শ্রমিক লীগের সভাপতি। ১৯৭৪-এর ৭ জুন তাঁর সম্পাদনায় দৈনিক 'বাংলাদেশ টাইমস' প্রকাশ। ১৯৭৫-এ বাকশাল প্রতিষ্ঠিত হলে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৯-এ তাঁর গল্প সংকলন 'বৃত্ত' নামে প্রকাশিত এবং ১৯৭৪-এ একই সংকলনের 'দ্বিতীয় সংস্করণ 'গীতা রায়' নামে প্রকাশিত। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজনে অবদান রাখেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। মৃত্যু. সামরিক বাহিনীর একটি দলের হাতে ঢাকায় নিহত, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব (১৯৩০-১৯৭৫)॥



জন্ম. টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, ৮ আগস্ট ১৯৩০। ডাকনাম রেণু। সমাজসেবী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী। পিতা শেখ জহুরুল হক এবং মাতা হোসনে আরা বেগম। চাচা শেখ লুৎফর রহমান। মাত্র তিন বছর বয়সে পিতাকে হারান। তার দুই বছর পরে মাকে হারান। পিতা-মাতাকে অকালে হারানোর পরে চাচা শেখ লুৎফর রহমান ও চাচি সায়েরা খাতুন তাঁর দেখাশোনা করতেন। এঁদের সন্তান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেই ১৯৩৮-এ রেনুর বিয়ে। প্রথমে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ও পরে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশোনা। শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে আদর্শ বধূ, সন্তানের সার্থক মা, বঙ্গবন্ধুর কাজের সাথী, বিচক্ষণ উপদেষ্টা ও পরামর্শকারী, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের আদর্শ ভাবি। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। যে কোন পরিস্থিতি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, শান্ত, অসীম ধৈর্য ও সাহস নিয়ে মোকাবেলা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরিবারের সবার প্রতি সুদৃষ্টি। স্বামী যখন কলকাতায় থাকতেন তখন সময় কাটত নানা রকম বই পড়ে। বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পারিবারিক-রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা। বঙ্গবন্ধুর ১৪ বছর কারাবাসকালীন সংসার পরিচালনার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিক ও জাতীয় সঙ্কট উত্তরণে পরামর্শ প্রদান ও বঙ্গবন্ধুকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা। অত্যন্ত দানশীল। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের 'আদর্শ ভাবি' হিসেবে কারাগারে আটক নেতাকর্মীদের খোঁজখবর নেয়া থেকে শুরু করে পরিবার-পরিজনদের যে কোন সঙ্কটে পাশে দাঁড়াতেন। এই মহীয়সী নারীর স্নেহ, মায়া-মমতা, দরদ, আপ্যায়নের কথা আজও স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকরা অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। বঙ্গবন্ধু ব্যস্ত থাকতেন রাজনীতি নিয়ে ফলে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা, সন্তানদের দেখাশোনা, লেখাপড়ার সব দায়িত্বই নিজের হাতে পালন। রাজনৈতিক জীবনে অনেক জটিল সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে থেকে সৎ পরামর্শ দান। বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে খোলামেলা আলোচনা করতেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করার পর তৎকালীন পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার জিজ্ঞসাবাদ ও গ্রেফতারের হুমকির শিকার। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে সক্রিয় সহযোগিতা দান। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য ছায়ার মতো অনুসরণ। ১৯৬৮-এ বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে পঁয়ত্রিশ জন বাঙালি নৌ ও সেনাবাহিনীর সদস্য ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাসহ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এ মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দেবার সিদ্ধানত্ম নেওয়া হয়। এ বিষয়ে বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের আপত্তি ছিল। দেশের সার্বিক আন্দোলনের পরিস্থিতি অবলোকন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সকল বিষয় অবহিতকরণ। দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ, তাই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতেই হবে। বঙ্গবন্ধু যেন শক্ত থাকেন সে বিষয়ে পরামর্শ দেন। ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দিতে যাওয়ার আগে বেগম

মুজিব তাঁকে বলেছিলেন, 'সারা দেশের মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি তাদের নিরাশ করবে না। তোমার মন যা বলে, তাই তুমি বলবে।' বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণার প্রাথমিক পর্বটি সেরে ফেলেন অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে উচ্চারণ করে– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ২৫ মার্চ রাতে বাঙালীর অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পর বেগম ফজিলাতুন্নেছা হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর চোখ এড়িয়ে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, শেখ জামাল, শেখ রাসেলসহ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একাত্তরের অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে আত্মগোপন। এ সময় পাকিস্তানি বাহিনী ক্ষিপ্ত হায়েনার মতো তাদের খুঁজে বেড়ায়। পরে পাকিস্তানী সামরিক গোয়েন্দারা তাদের মগবাজারের একটি বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। এরপর বেগম মুজিবসহ পরিবারের অপর সদস্যদের ধানমণ্ডির ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে গৃহবন্দী করে রাখে। এই বন্দিজীবনে দুঃসহ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তাঁকে। তারপরেও ধৈর্য হারাননি। একদিকে অসুস্থ শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা, সন্তানদের দেখাশোনা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনার প্রথম সন্তান জয়ের জন্মলাভ, সৈন্যদের গঞ্জনা শোনা; অপরদিকে স্বামীর চিন্তায় উদ্বিগ্ন– একটা অমানুষিক চাপ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। দীর্ঘ নয়মাসে বন্দি অবস্থায় যে কোনো মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু ছির অনিবার্য। স্বাধীনতার পরে গৃহের অন্তরালে থেকে শেখ মুজিবের সেবাযত্ন প্রদান, পারাবারিক দায়িত্ব পালন। ১৯৭২-এ নারী পুনর্বাসন বোর্ডের মাধ্যমে কয়েকজন মেয়ের বিয়ে দান। সমাজের সেবামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন নীরবে নিভৃতে। স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ১৯৯৮-এ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ। মৃত্যু: সামরিক বাহিনির কয়েকজন দেশদ্রোহী সদস্যের হাতে বঙ্গবন্ধু ও পরিবারের অন্য অনেক সদস্যসহ নিহত, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫।

শেখ ফয়জুল্লাহ॥ আদি মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। চট্টগ্রামের অধিবাসী। এ পর্যন্ত কবির পাঁচটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ গুলো হলো: গোরক্ষ বিজয় বা গোরঙ্গ বিজয়, গাজী বিজয়, সত্যপির, জয়নালের চৌতিশা ও রাগনামা। জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত।

শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু (১৯২০-১৯৭৫)॥



জন্ম, টুঙ্গিপাড়া গ্রাম, গোপালগঞ্জ, ১৭ মার্চ ১৯২০। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও রাষ্ট্রনায়ক। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন একজন জোতদার ও গোপালগঞ্জ আদালতের নাজির। মাতা সায়রা খাতুন। চার বোন, দুই ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয়। তাঁর বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি বছর বয়স্কা জ্ঞাতিভগ্নী ফজিলতন্নেসার (রেনু) সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ১৯৪১-এ মেট্রিক, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৪-এ আই.এ. এবং একই কলেজ থেকে ১৯৪৬-এ বি.এ. পাস। স্কুলজীবনে গোপালগঞ্জ সফরে এলে বাংলার তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নজরে পড়েন। ইসলামিয়া কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়ার পর পর এই সম্পর্ক গাঢ় হয়। সে সময় থেকে সোহরাওয়ার্দীর একজন অনুসারী হিসেবে কলকাতায় মুসলিম ছাত্র আন্দোলন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আবুল হাশিম নেতৃত্বাধীন বামপন্থি গ্রুপের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। 'নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন', নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের' কাউন্সিলার এবং 'গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের' সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৪৬-এ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। সিলেটের গণভোট অনুষ্ঠানকালে (৬ ও ৭ জুলাই-১৯৪৭) মুসলিম লীগের পাঁচশত কর্মী তাঁর নেতৃত্বে কাজ করে। এই গণভোটে মুসলিম লীগের বিরাট সাফল্য অর্জনের পশ্চাতে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার দরিদ্র মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট-১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন এবং ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ল' ক্লাসে ভর্তি। মুসলিম লীগ সরকার জনকল্যাণমূলক আর্থ-সামাজিক, গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ না করার প্রতিবাদে এ সময় মুসলিম লীগ ত্যাগ। সরকারের জনস্বার্থবিরোধী স্বৈরাচারী নীতির বিরোধিতা ও পূর্ব বাংলার স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ১৯৪৮-এ ৪ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' গঠিত। তিনি ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। একই বছর 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত (২ মার্চ-১৯৪৮) হলে এর সঙ্গে যুক্ত। এবছর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে হরতাল পালনের সময়ে ঢাকায় গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ। 'বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে পূর্ববঙ্গ পরিষদে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে' এ মর্মে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নাজিমুদ্দীন সরকার চুক্তিবদ্ধ হলে জেল থেকে মুক্তিলাভ (১৫ মার্চ ১৯৪৮)। ১৯৪৯-এর মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি দাবির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ও গ্রেফতার। একই বছর ২৩ জুন (১৯৪৯) পুরনো ঢাকার রোজগার্ডেনে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হলে কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় এর যুগ্ম-সম্পাদকের পদ লাভ। খাদ্য সংকটের ব্যাপারে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে ১৯৪৯-এর অক্টোবর মাসে আর একবার গ্রেফতার। বন্দীদশায় বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে ফরিদপুর কারাগারে অনশন ধর্মঘট পালন (১৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। ২৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) মুক্তি লাভ। ১৯৫৩-তে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৪-র মার্চের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে গোপালগঞ্জ এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। অতঃপর শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রী নিযুক্ত (১৪ মে ১৯৫৪)। একই বছর ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা প্রয়োগ করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ববঙ্গে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করলে গ্রেফতার হন। একই বছর ডিসেম্বর মাসে মুক্তি লাভ। ১৯৫৫-র জুন মাসে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান দ্বিতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ২২ অক্টোবর কাউন্সিল সভায় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে দলকে অসাম্প্রদায়িক করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। ১৯৫৬-র ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের' শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত। আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করে গড়ে তোলার উদ্দেশে দলের কাউন্সিল সভার প্রস্তাব অনুসারে ১৯৫৭-র জুলাই মাসে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে কারারুদ্ধ ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষিত। সামরিক সরকার কর্তৃক বিভিন্ন অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ডজনখানেক মামলা দায়ের। আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সব মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর মাসে জেল থেকে মুক্তি লাভ করলেও গৃহে অন্তরীণ অবস্থায় বছর দুয়েক দিনযাপন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারকে (৩০ জানুয়ারি ১৯৬২) কেন্দ্র করে ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-বিক্ষোভ শুরু হলে পুনরায় গ্রেফতার। ১৯৬২-১৯৬৩-তে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এনডিএফ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) দেশব্যাপী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন চালালে তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। সোহরাওয়ার্দীর আকস্মিক মৃত্যুতে (৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩) এনডিএফ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে দেশকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা থেকে উদ্ধারকল্পে ১৯৬৪-র ২৫ জানুয়ারি তৎকর্তৃক আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবন। একই বছর ২৫ জুলাই (১৯৬৪) 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (কপ) গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন এবং আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় অনুষ্ঠিত (২ জানুয়ারি ১৯৬৫) দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী ফাতেমা জিন্নার নির্বাচনী প্রচার অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (৬-২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫) সমাপ্তির পর উভয় দেশের মধ্যে 'তাসখন্দ চুক্তি' স্বাক্ষরের (১০ জানুয়ারি ১৯৬৬) পটভূমিকায় ১৯৬৬-র ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের এক সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে ৬ দফা কর্মসূচি পেশ। সর্বজনীন ভোটাধিকার, ফেডারেল পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, কেন্দ্র ও প্রদেশের জন্য পৃথক মুদ্রা (দুই মুদ্রা) ব্যবস্থা, প্রাদেশিক সরকারকে কর ও শুল্ক ধার্যের ক্ষমতা প্রদান, প্রাদেশিক সরকারকে

বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণের ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা অর্পণ এবং প্রদেশগুলোকে আঞ্চলিক বাহিনী সংরক্ষণের অধিকার দেওয়ার দাবি ৬ দফায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। একই বছর ২০ মার্চ (১৯৬৬) আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত। অতঃপর ৬ দফার পক্ষে জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার অভিযান শুরু।এ কর্মসূচির ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন এবং তা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে মূল দাবি হিসেবে ধরা দেয়। ১৯৬৬-র ৮ মে সরকার কর্তৃক নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার। তাঁর মুক্তি ও ৬ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ৭ জুন (১৯৬৬) আওয়ামী লীগের ডাকে পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত। ১৯৬৮-র ১৭ জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি লাভ। কিন্তু একই রাতে পুনরায় জেলগেট থেকে গ্রেফতার করে তাঁকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁকে প্রধান আসামি করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' (১৯ জুন ১৯৬৮-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯) সূত্রপাত। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছিল: 'অভিযুক্তরা ভারতীয় অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটিয়ে কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্র করেছিলেন।' ৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণ-অভ্যুত্থানের চাপে আইয়ুব সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করে তাঁকে মুক্তি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান এবং 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত। দেশের বিবাদমান রাজনৈতিক সংকট মীমাংসাকল্পে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক রাওয়ালপিন্ডিতে আহূত গোলটেবিল বৈঠকে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১০-১২ মার্চ ১৯৬৯) যোগদান। গোলটেবিল বৈঠকে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে (ক) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, (খ) ফেডারেল পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, (গ) ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, (ঘ) জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে প্রদেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব, ও (ঙ) পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল—এ পাঁচ দফা প্রস্তাব উত্থাপন। পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এই দুই দফা দাবি ব্যতীত অবশিষ্ট তিন দফা দাবি নাকচ করা হলে বৈঠক ত্যাগ। অতঃপর বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গ্রহণ। বাঙালির জাতিসত্তাকে শাণিত করার লক্ষ্যে 'জয় বাংলা' স্লোগান উদ্ভাবন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলো ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক জাতিসত্তার ভিত্তিতে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ নামে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পটভূমিকায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। জাতীয় নির্বাচনকে (১৯৭০) সামনে রেখে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' (গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্র কায়েম) প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি উপস্থাপন। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তাঁর নেতৃত্বে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের একক বিজয় অর্জন। নিজে তিনটি আসন (ঢাকা-৮, ঢাকা-৯ ও ফরিদপুর-৫) থেকে নির্বাচিত। জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ (৩০০ আসনের মধ্যে ১৬০ আসনের অধিকারী) দলের নেতা হিসেবে তাঁর সরকার গঠনের কথা। সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ১৯৭১-এর ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান। ১ মার্চ (১৯৭১) ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা। ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক। ৩ মার্চ থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাঁর নির্দেশে পরিচালিত। ৭ মার্চ তৎকালীন ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান। তিনি ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' উদ্ভূত রাজনৈতিক সংকটের পটভূমিকায় ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো ত্রিপক্ষীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত (২২-২৫ মার্চ ১৯৭১)। এই আলোচনা ব্যর্থ হয়। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু। একই রাতে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ স্বীয় বাসভবন থেকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হাতে গ্রেফতারবরণ এবং গ্রেফতারের আগে (২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। গ্রেফতারের পর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ। ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং এম.এ.জি. ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করে মুজিবনগরে (বৈদ্যনাথতলা গ্রাম, মেহেরপুর)

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত। এ সরকারের নেতৃত্বে নয় মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চলার পর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক অস্ত্র সমর্পণ (জানুয়ারি ১৯৭২) ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর বাংলাদেশ ত্যাগ (১৫ মার্চ ১৯৭২)। তাঁর শাসনামলে রাশিয়া, ইটালি, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান, বেলজিয়াম, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ইরাক, ইরানসহ ১০৪টি দেশ কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁর নেতৃত্বের ফলে কমনওয়েলথ, জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভ। লাহোরে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) এবং এর অব্যবহিত পূর্বে পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪)। তাঁর নেতৃত্বে গণপরিষদের (১৯৭২) সদস্যদের নিয়ে গঠিত 'শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি' গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে স্বল্প সময়ে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের' সংবিধান রচনা করে এবং ১৯৭২-এর ৪ নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান গৃহীত। ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭২) উক্ত সংবিধান চালু। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার প্রবর্তিত। এই শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত। চারটি আসন (ঢাকা-১২, ঢাকা-১৫, ফরিদপুর-১১ ও বাখরগঞ্জ-৪) থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে ১৬ মার্চ (১৯৭৩) দ্বিতীয়বার সরকার গঠন। ১৯৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত। এই সংশোধনীর বলে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত। একই দিন (২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫) রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ। ২৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৫) দেশের রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে দিয়ে তাঁর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একক জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন। ৭ জুন (১৯৭৫) বাকশালের সাংগঠনিক কমিটি গঠন। জেলার শাসনব্যবস্থায় গভর্নর পদ্ধতির প্রবর্তন ও বহুমুখী গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে দেশের কৃষি-অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ছিল বাকশালের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি প্রদান। শিল্প-কারখানা, ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি জাতীয়করণ, রক্ষী বাহিনী গঠন, সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা, ঢাকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ, শহীদ পরিবারকে অনুদান ও ভাতা প্রদান, যুদ্ধবিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দান, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স (১৯৭৩) ও জাতীয় বেতন স্কেল চালু ইত্যাদি তাঁর সরকারের উল্লেখযোগ্য কাজ। এছাড়া ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পঁচিশ বছর মেয়াদি 'বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি'(১৯৭২), গঙ্গার পানি বণ্টন সংক্রান্ত অস্থায়ী 'ফারাক্কা চুক্তি' (১৯৭৪) সম্পাদন। 'বিশ্ব শান্তি পরিষদ' প্রদত্ত 'জুলিও কুরী পদক' লাভ। ১৯৭৩-এর ২৩ মে 'বিশ্ব শান্তি পরিষদের' সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্র কর্তৃক ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে পদক প্রদান। তিনি প্রথম বাঙালি যিনি ১৯৭৪-এর ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বাংলায় ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। পূর্ব বাংলার (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) স্বাধিকার আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা এবং তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা পালন করায় এবং এর ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি 'জাতির পিতা' হিসেবে স্বীকৃত। ১৯১২-এ তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মৃত্যু, ঢাকার ধানমন্ডিস্থ স্বীয় বাসভবনে সামরিক বাহিনীর স্বাধীনতা-বিরোধী একটি চক্রের হাতে সপরিবার নিহত, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫।

শেখ মুত্তালিব (১৫৯৬-১৬৬০)॥ জন্ম. সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম, ১৫৯৬ (আনুমানিক)। কবি। দশ বছর বয়সে পিতৃহীন হলে মৌ. রহমতুল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিপালিত এবং তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ। শিক্ষাগুরু রহমতুল্লাহ্‌র আদেশে কিফায়তুল মুসল্লিন নামক গ্রন্থ রচনা। এ গ্রন্থটি দেশে সমাদৃত হয়েছিল। বাংলা ও আরবি উভয় হরফে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। অপর গ্রন্থের নাম কায়দানী কিতাব। মৃত্যু. ১৬৬০ (আনুমানিক)।

শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫)॥ জন্ম. শিবপুর, হাওড়া, ১৮৯৫। কবি, ঔপন্যাসিক। বি.এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। 'মুসাফির' পত্রিকার সম্পাদক। 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক। রচিত গ্রন্থ-কাব্যঃ আমার প্রিয়া, পীযূষপ্লাবনী, মর্মবীণা, মুক্তিবীণা, চন্দ্রলোকে (১৯৫৪)। উপন্যাসঃ বঙ্কিমদুহিতা (১৯১৭), শেখ সংসার, দরবেশ কাহিনী, নূতন বৌ, প্রেমের পথে (১৯৫৭), আদর্শ গৃহিণী (১৯৫৭), রূপের মোহ (১৯৫৭)। জীবনীঃ শিশুদের মোস্তফা (১৯২৭)। মৃত্যু. ১৯৪৫।

শেখ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৮২-১৯৭২)॥



জন্ম. দলগ্রাম, কালিগঞ্জ, রংপুর, ১৮৮২। সাহিত্যিক ও সমাজসেবক। কাকিনায় থেকে প্রথমে পাঞ্জাবি মওলানা আব্দুল লতিফের নিকট আরবি-ফারসি শিক্ষা। তারপর কাকিনা মহিমারঞ্জন মাইনর স্কুল থেকে প্রাইমারি ও এম.ই. স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি লাভ। রংপুর জেলা স্কুলে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। ১৯০৩-এ মেট্রিক পরীক্ষা দেন কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে। কিন্তু অসুস্থ থাকায় সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারেন নি এবং এখানেই পড়াশুনা বন্ধ। ১৯১০-এ তুষভাণ্ডার এম.ই. স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার হিসেবে কর্মজীবন শুরু। ১৯১৮-তে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের পদ পেয়ে শিক্ষকতা ত্যাগ। এই চাকরিতে থাকা অবস্থায় সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ। বারো বৎসর ধরে ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, ছয় বছর লোকাল বোর্ডের মেম্বার। মাদ্রাসা স্কুল ... চিকিৎসালয় স্থাপনে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। সাহিত্য কীর্তিঃ হিস্ট্রি অব সারাসিনস'-এর অনুবাদ আরব জাতির ইতিহাস (১ম খণ্ড-১৯১০, ২য় খণ্ড-১৯১২, ৩য় খণ্ড-১৯১৫)। গ্রন্থটির বাংলা একাডেমী সংস্করণ ৩ খণ্ড একত্রে বের হয় (১৯৬৪)। আরব জাতির ইতিহাস গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে এই লেখকের প্রণীত মহাত্মা স্যার সৈয়দ, জীবহত্যা ও কোরবানী, ইসলাম প্রচারের ইতিহাস কয়েকটি বই-এর নাম পাওয়া যায় যা যন্ত্রস্থ বলা হয়েছে। মৃত্যু. ১৯৭২।

শেখ লুৎফর রহমান (১৯২০-১৯৯৪)॥ জন্ম.



ছোট বাকাল গ্রাম, সাতক্ষীরা, ১৯২০। সংগীতশিল্পী। পিতা শেখ আবদুল হক ছিলেন স্কুল শিক্ষক ও সৌখিন সংগীতশিল্পী। নয় মাস বয়সে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে একটি পা হারান। ইংরেজি স্কুলে, পরে মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ। গান শেখার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগলে মদ্রাসার পাঠ ত্যাগ করে পিতার কাছে রবীন্দ্র ও নজরুল সংগীতে তালিম গ্রহণ। স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উমাপদ ভট্টাচার্য তাঁর গানের দ্বিতীয় শিক্ষক। তারানির জমিদার সংগীতজ্ঞ ডাক্তার পশুপতি চট্টোপাধ্যায় একদিন এক গানের জলসায় তাঁর কণ্ঠে গান শুনে বিমোহিত হন। পশুপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজের বাড়িতে তাঁকে আশ্রয় দেন। পশুপতির কাছে পাঁচ বছর উচ্চাঙ্গ সংগীত, টপ্পা, রামপ্রসাদী ও শ্যামাসংগীত শেখেন। সংগীতে প্রতিষ্ঠা লাভের অভিপ্রায়ে কলকাতায় গমন (১৯৪২)। সেখানে প্রথমে অনাথনাথ বসু, পরে বিদ্যুৎ বিশ্বাসের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম গ্রহণ। 'সং' পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে' গায়কের চাকরি লাভ। কলকাতা বেতারে গানের অডিশনে পাস করে সেখান থেকে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ঢাকা বেতারের সংগীতশিল্পী হিসেবে যোগদান। ১৯৫৬-১৯৬৪ পর্যন্ত করাচিতে নজরুল একাডেমির সংগীত শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন। করাচিতে কিছুকাল হাবিব আলী খাঁ বিনকার কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতে পাঠ গ্রহণ। ১৯৬০-এ বগুড়ার এক

সংস্কৃতিবান পরিবারের কন্যা মাহমুদা বেগমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৬৪-তে করাচি ত্যাগ করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত (প্রতি রোববার) 'সংগীত শিক্ষার আসর' পরিচালনা নজরুল ইনস্টিটিউটের সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, সংগীত মহাবিদ্যালয়ের (ঢাকা) নজরুলগীতি শাখার অধ্যাপক। গণ-সংগীতের খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার। 'ওরে ভাইরে ভাই, বাংলাদেশের বাঙালি আর নাই', 'শোনেন হুজুর-বাঘের জাত এই বাঙালেরা', 'লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয়', 'বল বীর বল উন্নত মম শির', 'ওঠ দুনিয়ার গরিব ভুখারে জাগিয়ে দাও', 'দিকে দিকে জাগে আজি বিপ্লব', 'মানব না বন্ধনে মানব না', 'জনতার সংগ্রাম চলবেই', 'বিপ্লবেরই রক্ত রাঙা ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে', 'ওরে মাঝি দে নৌকা ছেড়ে', 'ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, ধ্বংসের মুখোমুখি এসে গেছি আমরা', 'হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ', প্রভৃতি গণ-সংগীত নিজের সুরে গেয়ে সংগ্রামী মানুষের মন জয়। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এ-সকল গান পরিবেশন করে এদেশের মানুষকে ভাষা-আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা যোগান। বাঙালি সংস্কৃতি সমৃদ্ধি করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। জাতীয় জাগরণের শিল্পী হিসেবে খ্যাত। সংগীতে অবদান রাখায় একুশে পদক লাভ। 'জীবনের গান গাই' তাঁর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। মৃত্যু. ঢাকা, ৩০ নভেম্বর ১৯১৪।

শেখ সুফিউর রহমান (১৮৮৭-১৯৮১)॥ জন্ম. ফুলবাড়ি গ্রাম, মালদহ, ভারত, ১৮৮৭। গায়ক ও গান রচয়িতা। শৈশব থেকে মুখে মুখে গান রচনায় দক্ষতা প্রদর্শন। গ্রামের পালা-পার্বণে স্বরচিত গান পরিবেশন। মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত 'আলকাপ' গানের অশালীন কথাকে শালীনতায় রূপ দিয়ে নতুনভাবে তৈরি করে 'গম্ভীরা গান' হিসেবে প্রচলনের কৃতিত্বের অধিকারী। সমাজের সত্য ঘটনা হাস্যরসের মাধ্যমে ব্যঙ্গাত্মক আকারে পরিবেশন গম্ভীরা গানের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ইংরেজ বিতাড়নের বিষয়বস্তু এ গানে স্থান পাওয়ায় ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে নজরবন্দির জীবনযাপন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন। একাধারে গানের মাস্টার, নাচের মাস্টার, প্রাইভেট মাস্টার ও পোস্ট মাস্টার ছিলেন বলে 'সুফি মাস্টার' নামে সুপরিচিত। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে আগমন ও রংপুরে বসবাস শুরু, পরে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রোহনপুর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস। গানের পারদর্শিতার স্বীকৃতিস্বরূপ আঠারোটি সোনার মেডেলে ভূষিত। তাঁর রচিত গান বিভিন্ন শিল্পী কর্তৃক হিজ মাস্টার্স ভয়েস, সেনোলা, টুইন ও কলম্বিয়া গ্রামোফোনে রেকর্ড করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা প্রদানের জন্যে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে (১৯৭১) বহু গান রচনা। মৃত্যু. ২৬ এপ্রিল ১৯৮১।

শেখ হবিবর রহমান (১৮৯১-১৯৬২)॥ জন্ম. ঘোষপতি গ্রাম, মাগুরা, ১৮৯১। সাহিত্যিক। যশোর জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯১০) ও কলকাতা সিটি কলেজ থেকে আই.এ. (১৯১২) পাস। বি.এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য (১৯১৪)। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং স্কুল থেকে এল. টি. পাস (১৯২২)। সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদীর' (১৯০৮) সহকারী সম্পাদক (১৯১৪)। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সচিত্র মাসিক সাহিত্যপত্র 'বঙ্গনুর' (১৯১৯) সম্পাদনা। যশোর জেলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত (১৯১৪)। ১৯২৪-এ বারাসত গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে যোগদান। একই বছর মক্তব সাব-ইন্সপেক্টর পদে খুলনায় বদলি। ১৯২৭-এ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ও ১৯৩০-এ বারাকপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে স্থানান্তরিত। ১৯৪৪-এ সরকারি স্কুলের শিক্ষকতার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯৫১-তে খুলনা করোনেশন বালিকা বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদে যোগদান। ১৯৬০ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। কবি হিসেবে খ্যাত। ঐতিহ্যসচেতনতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মুক্তবুদ্ধিজাত চিন্তা, মানসিক প্রেম ও নিসর্গ চেতনাকে কেন্দ্র করে তাঁর কবি-কল্পনা বিকশিত। গল্প, প্রবন্ধ, ইসলামের ইতিহাস-আশ্রয়ী উপাখ্যান, অনুবাদ ও শিশুতোষ গ্রন্থ রচনায়ও দক্ষতার পরিচয় প্রদান। প্রকাশিত গ্রন্থ: পারিজাত (কাব্য, ১৯১২), আবে হায়াত (গজল গ্রন্থ, ১৯১৪), বাঁশরী (কাব্য,



১৯১৭), হাসির গল্প (১৯১৭), নিয়ামত (গল্প সংকলন, ১৯১৭), কোহিনূর (কাব্য, ১৯১৯), আলমগীর (উপন্যাস, ১৯১৯), ভারত সম্রাট বাবর (কিশোর পাঠ্য ইতিহাস, ১৯১৯), সাদী'র কালাম (অনূদিত কবিতাগ্রন্থ, ১৯২৬), আমার সাহিত্যজীবন (আত্মজীবনী, ১৯২৭), সুন্দরবনে ভ্রমণ (১৯২৭), গুলশান (কাব্য, ১৯২৮), গুলিস্তাঁর গল্প (অনূদিত গল্পগ্রন্থ, ১৯২৯), গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ (১৯৩৩), বস্তাঁর বঙ্গানুবাদ (১৯৩৩), কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা (১৯৩৪), শয়তানের সভা (সচিত্র ব্যঙ্গ রসাত্মক গদ্যরচনা, ১৯৪৬), ইসলাম ও অন্যধর্ম (প্রবন্ধ পুস্তক, ১৯৪৯), মরণের পরে (গদ্যগ্রন্থ, ১৯৫৫) ইত্যাদি। নদীয়া সাহিত্য সভা কর্তৃক 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি প্রদান। মৃত্যু. খুলনা, ৭ মে ১৯৬২।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬)॥ জন্ম. মাতুলালয়, অণ্ডাল গ্রাম, বর্ধমান, ২১ মার্চ ১৯০১। পৈতৃক নিবাস রূপসীপুর, বীরভূম। কথাশিল্পী। পিতা ধরণীধর মুখোপাধ্যায়, মাতা হেমবরণী দেবী। তিন বছর বয়সে মাতৃহীন হন। ধনী কয়লা ব্যবসায়ী মাতামহ মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বাল্যকাল কাটে। রানী গঞ্জের স্কুলে লেখাপড়া করার সময়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সহপাঠী হিসেবে পান। প্রি-টেস্ট পরীক্ষার সময় তাঁরা উভয়েই প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য আসানসোল যান; সেখান থেকে এসডিও-র চিঠি নিয়ে কলকাতায় আসেন এবং ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে ঢোকার সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষায় শৈলজানন্দ বাদ পড়েন, নজরুল যুদ্ধে যোগ দেন। এরপর এনট্রান্স পাস করে কলেজে ভর্তি হন। কিছুকাল পরে কলেজের পাঠ ত্যাগ করে শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শিখে কয়লাকুঠিতে চাকরি নেন। পরে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য-সাধনায় নিয়োজিত হন। 'বাঁশরী' পত্রিকায় তাঁর 'আত্মঘাতী ডায়েরী' নামক গল্প প্রকাশিত হলে মাতামহ তাঁর আশ্রয় থেকে তাঁকে বিদায় দেন। কলকাতায় এসে কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিতি লাভ। এবং নিজেও এই গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক হিসেবে খ্যাতিমান। এরপর সাহিত্যকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ। দীর্ঘদিন 'কালিকলম' পত্রিকা সম্পাদনা। সাহিত্য রচনার পাশাপাশি চলচ্চিত্র জগতে যোগদান। 'নিউ থিয়েটার্স'-এ কাহিনীকার হিসেবে যোগদান। ১৯৪১-এ 'নন্দিনী' ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা। এ ছাড়া 'বন্দী', 'শহর থেকে দূরে', 'অভিনয় নয়', 'মানে না মানা' প্রভৃতি ছবি পরিচালনা। প্রায় দু'শ উপন্যাসের রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসঃ মাটির ঘর (১৯১৮), ঝড়ো হাওয়া (১৯২৩), রাঙা শাড়ী, বাংলার মেয়ে (১৯২৫), জোয়ার ভাটা (১৯২৬), পূর্ণচ্ছেদ (১৯২৯), অনাহূত (১৯৩২), অনিবার্য (১৯৩২) ইত্যাদি। খনি-শ্রমিকদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সার্থক গল্প-রচনার পথিকৃত হিসেবে খ্যাত। সাঁওতাল-বাউড়ি কুলি-কামিন ধাওড়াদের অজ্ঞাত জীবন তাঁর গল্প-উপন্যাসে নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কিত। মৃত্যু. ২ জানুয়ারি ১৯৭৬।



শৈল দেবী (১৯১৬-১৯৪৪)॥ জন্ম. কুমিল্লা, ১৯১৬। কণ্ঠশিল্পী। গানের গুরু বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ সমরেন্দ্র পাল ও ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ। কলকাতায় গিরিন চক্রবর্তীর সহায়তায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহচর্য লাভ। কবির কাছে গান শিক্ষা লাভ। ছায়াছবির নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী। অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত কণ্ঠসংগীত পরিবেশন। বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানি কর্তৃক তাঁর গাওয়া গানের রেকর্ড প্রকাশ। মৃত্যু. ১৯৪৪।



শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯১৮)॥ জন্ম. আড়িয়াল গ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা, ১৮৫৮। ব্যায়ামবিদ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নকালেই নিয়মিত ব্যায়াম অনুশীলন। ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের সে সময়ের বিখ্যাত পালোয়ান অধর ঘোষের নিকট কুস্তি শিক্ষা গ্রহণ। আঠারো থেকে বাইশ বছর বয়সের মধ্যে পাঞ্জাবের ভুট্টা সিং, কাদের পালোয়ান, যুক্তপ্রদেশের জয়মল সিং প্রমুখ পালোয়ানকে পরাজিত করে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন। দুই বছর ত্রিপুরার মহারাজার পার্শ্বচররূপে কর্ম সম্পাদন।

পরে বরিশাল জেলা স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক হিসেবে যোগদান। পাটনার নওয়াবের চিড়িয়াখানার বাঘিনীর সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হলে নওয়াব কর্তৃক বাঘসমেত এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান। ১৮৮৭ বঙ্গাব্দে ফ্রেড কুকের ইংলিশ সার্কাসে হিংস্র জন্তুর খেলা দেখাবার জন্য অ্যাক্রোব্যাটস হিসেবে নিযুক্তি লাভ এবং বাঘের খেলা দেখিয়ে দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন। ১৮৮৮-এ একটি সার্কাস দল গঠন। এই দলটি ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে যায়। পুনরায় 'গ্রান্ড শো অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস' নাম দিয়ে আরেকটি সার্কাস দল গঠন। বুকের ওপর ১২/১৩ মণ ওজনের পাথর ভাঙাতেন। এভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবিদ হিসেবে স্বীকৃতিলাভ। তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যায়াম অনুশীলন, আত্মনির্ভরশীলতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করাই ছিল তাঁর জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য। পিতার মৃত্যুর পর ৪২ বছর বয়সে 'তিব্বতী বাবা' নামে জনৈক সন্ন্যাসীর কাছে ধর্মে দীক্ষিত হয়ে 'সোহহং স্বামী' নামে পরিচিতি হন এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবকিছু ত্যাগ করেন। প্রণীত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: সোহংতত্ত্ব, সোহং সংহিতা, বিবেকগাথা, Truth ও ভগবদ্‌গীতার সমালোচনা। মৃত্যু. ৬ ডিসেম্বর ১৯১৮।

শ্যামাচরণ দেব (১৮৭০-১৯৬১)॥ জন্ম. বনিয়াচঙ, শ্রীহট্ট, ২১ নভেম্বর ১৮৭০। রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক। ১৮৮৯-তে হবিগঞ্জ হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৮৯১-এ ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. পাস। প্রথমে হবিগঞ্জ স্কুলে এবং পরে করিমগঞ্জ রতনমণি স্কুলে শিক্ষকতা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) সক্রিয় অংশগ্রহণ। ন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং শিক্ষক। ১৯১৭-তে জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য পদ লাভ। একই বছর শিলচর ক্রিশ্চান বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত। অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২) চলাকালে কাছাড় জেলার কংগ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদক। পরে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯২৩-এ শিলচরে দীননাথ নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। এবং নামেমাত্র বেতনে স্ত্রীসহ এখানে শিক্ষকতা গ্রহণ। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য বহুবার কারাভোগ। বিধবাবিবাহ সমর্থন এবং জাতিভেদ প্রথার বিরোধী। মৃত্যু. ১৯৬১

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৫৩)॥ জন্ম. ভবানীপুর, কলকাতা, ৬ জুন ১৯০১। শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। 'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর পিতা। মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২১-এ বি.এ. এবং ১৯২৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাস। ১৯২৪-এ আইন পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। ১৯৩৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট. ও বারানসী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক এল.এল.ডি. উপাধি লাভ। ১৯২৪-এ কলকাতা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট হিসেবে যোগদান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য নির্বাচিত। এরপর আইনশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলেত গমন। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে এলেও আইন ব্যবসায় উৎসাহী না হয়ে পিতার সহযোগীরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে মনোনিবেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ। বিহারীলাল মিত্রের অর্থ সাহায্যে সোস্যাল সায়েন্স বিভাগের প্রবর্তন, আশুতোষ মিউজিয়াম ও পাঠাগার স্থাপন এবং বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৯২৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৩৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদের প্রথমে সদস্য, পরে চেয়ারম্যান নিযুক্ত। ১৯৩৫-এ ও ১৯৩৭-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যরূপে পুনঃনির্বাচিত। তৎকালীন ভারত সরকারের জাতিসংঘের কমিটি অব ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশনের সদস্য মনোনীত। ১৯৩৯-এ হিন্দু মহাসভার নেতারূপে রাজনীতিতে প্রবেশ। ১৯৪১-এ শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশনে বঙ্গীয় সরকারের অর্থমন্ত্রীরূপে যোগদান। এই মন্ত্রিসভা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩) নামে পরিচিত। ১৯৪২-এ কংগ্রেসের আহ্বানে 'ভারত-ছাড়'



আন্দোলনে অংশগ্রহণ। এই বছর মন্ত্রী থাকাকালীন ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত নিষিদ্ধ হিন্দু মহাঅধিবেশনে যোগদান করলে কারাবরণ। ১৯৪৪-এ নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নেহেরু মন্ত্রিসভার শিল্পমন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরূপে যোগদান। নীতি বিষয়ে মতবিরোধ ঘটায় ১৯৫০-এর ১৯ এপ্রিল মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ। ১৯৪৯-এ হিন্দু মহাসভার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ এবং ১৯৫১-তে পশ্চিমবঙ্গে 'জনসঙ্ঘ' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন। পরে এই দলের সভাপতি হন। ১৯৫২-তে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত। এই সময় থেকে ভারতীয় পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতারূপে যে সব বক্তৃতা দেন সেই অসাধারণ বক্তৃতাবলী সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৫৩-র ১১ মে পার্লামেন্টে জম্মু প্রজাপরিষদ ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি যে দাবি তোলেন তার পক্ষে শ্যামাপ্রসাদ বক্তব্য রাখেন। এ-ব্যাপারে সরকার বিরোধিতা করলে তার প্রতিবাদে দিল্লিতে মিছিল বের করে গ্রেফতার হন। কিছুদিন পর মুক্তিলাভ। ১৯৫৩-র ৮ মার্চ জম্মু ও কাশ্মীর দিবস পালিত হলে শ্যামাপ্রসাদ ও অন্যান্য কয়েকজন নেতার গ্রেফতারবরণ। সুপ্রিম কোর্টের আদেশে মুক্তিলাভ। ১৯৫৩-র ৫ মে কাশ্মীর যাত্রা। ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতির প্রতিবাদে কাশ্মীরে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুনরায় গ্রেফতার এবং নিশাতবাগের কাছে এক কুটিরে আটক। তাঁর সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে অবরোধের মধ্যে মৃত্যুবরণ। মৃত্যু. ২৩ জুন ১৯৫৩।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০)॥ জন্ম. মাতুলালয়, হাতিয়া গ্রাম, বীরভূম, ২৩ মার্চ ১৮৯২। সাহিত্য-সমালোচক। পৈতৃক নিবাস কুশামা গ্রাম, বীরভূম। পিতা মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. পাস (১৯১০)। ১৯১২-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে ইংরেজিতে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন। 'রোমান্টিক থিওরি: ওয়ার্ডসওয়ার্থ অ্যান্ড কোলরিজ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯২৭-এ পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। রিপন কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক। রাজশাহী কলেজের উপাধ্যক্ষ (১৯৩৫-১৯৪০) ও অধ্যক্ষ (১৯৪১-১৯৪৬) হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর পুনরায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রত্যাবর্তন। এরপর সরকারি চাকরি ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯৫৫ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৪৭-এর পর কংগ্রেস দলের রাজনীতিতে যোগদান। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। খ্যাতনামা গবেষক ও প্রাবন্ধিক। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনা, সমালোচনা ও মূল্যায়নে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে, ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, Critical Theory and Practice in the Lyrical Ballad। মৃত্যু. ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০।

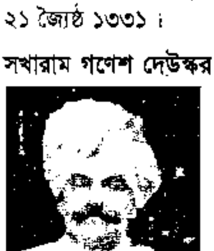


শ্রীনাথ রায় (১৮৪১-১৯২৪)॥ জন্ম. ভাগ্যকুল, বিক্রমপুর, ১২৪৮ বঙ্গাব্দ। জমিদার। প্রেমচাঁদ রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। একাদশ বছর বয়সে বিক্রমপুরের তারাটিয়া গ্রাম নিবাসী প্রসাদচন্দ্র দে-র জ্যেষ্ঠকন্যা তীর্থময়ীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ঢাকা ইংরেজি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস (১৮৬৩)। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। এল.এ. পরীক্ষা দেওয়ার সময়ে পিতা এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তাঁর শুশ্রূষার জন্য কলেজের পাঠ ত্যাগ (১৮৬৫)। পিতার মৃত্যুর পর জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ। ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। পরে ভাগ্যকুল ইন্ডিপেনডেন্ট বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। এডুকেশন কমিটি, ইকনমিক মিউজিয়াম কমিটি ও ঢাকা জেলা বোর্ডের সদস্য, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, কলকাতা



জুওলোজিক্যাল গার্ডেনের লাইফ সদস্য ও ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাইফ গভর্নর। পূর্ববঙ্গে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে ষাট হাজার টাকা ব্যয়ে মায়ের নামে 'সুভদ্রামণি ওয়ার্ড' স্থাপন। শ্রীনাথ ও তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় রাজা জানকীনাথ রায় ও অনারেবল রায় বাহাদুর সীতানাথ রায় কর্তৃক বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পনেরো হাজার টাকা দান। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী শ্রীনাথ রায় কর্তৃক নানাস্থানে বহু দেবালয়ের মন্দির সংস্কার ও নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয়। 'ঢাকা সারস্বত সমাজের' প্রধান প্রাণপুরুষ। এ সমাজের কল্যাণের জন্য বিপুল অর্থ দান। রাজভক্ত শ্রীনাথ রায় কর্তৃক প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৯১৮) ব্রিটিশ সরকারকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য অর্থ সাহায্য। সুগায়ক, সাহিত্যানুরাগী, সদালাপী ও মিষ্টভাষী হিসেবে খ্যাত। সংগীতচর্চা, বিশেষত কীর্তনাদি খুব পছন্দ করতেন। গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের আরতির সময়ে নিজে কীর্তন করতেন। পণ্ডিত, সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, অতিথি, অভ্যাগত আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের সৎকারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ। আর্তজনকে অন্ন ও অর্থদান। দানশীলতা ও সর্বসাধারণের হিতার্থে কাজ করায় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'রাজা' উপাধি প্রদান। 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংক' প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭-এ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে একমাত্র পুত্র বাহাদুর প্রমথনাথ রায়কে বিষয়-সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে ভগবৎ সাধনায় আত্মনিয়োগ। মৃত্যু. ভাগ্যকুল, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১।

সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২)॥ জন্ম. দেওঘর, ১৮৬৯। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। দেওঘর বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সময় সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বসুর চেষ্টায় তৎকালে দেওঘর প্রবাসী সাহিত্যগুরু

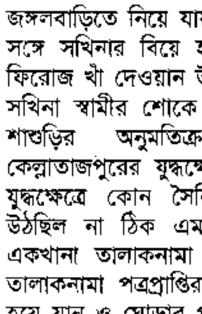


রাজনারায়ণ বসুর সংস্পর্শে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট। ছাত্রাবস্থায়ই সাহিত্য পত্রিকায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি লিখে খ্যাতি অর্জন। কর্মজীবনে দেওঘর স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর ১৮৯৭-তে সপরিবার কলকাতা গমন এবং কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ পরিচালিত 'হিতবাদী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রায় এক যুগ হিতবাদীর সহ-সম্পাদকরূপে কাজ করার পর ১৯০৭-এ সম্পাদক নিযুক্ত। এই পত্রিকায় সুরাট কংগ্রেসে তিলকের ভূমিকার সমালোচনা করে সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতে অস্বীকার করায় পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ। পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করার পর ন্যাশনাল কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত। রাজনীতিতে চরমপন্থি আচরণের জন্য কলেজ ত্যাগ। ভারতে স্বদেশি আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) সময়ে তৎকালীন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। বিপ্লবী কার্যকলাপেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ১৯০২-এ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় উত্তর কলকাতায় বিপ্লবীদের যে আখড়া গড়ে উঠে, তাতে যুক্ত হয়ে বিপ্লবী ছাত্রদেরকে দেশপ্রেমমূলক বক্তৃতা দিয়ে উৎসাহিত করতেন। 'যুগান্তর' পত্রিকায় বিপ্লববাদ সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ। ১৯০২-১৯২৬-এ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত শিবাজী-উৎসব সভায় বিশেষ ভূমিকা পালন। বাংলা ভাষায় প্রায় ১২ খানা গ্রন্থ রচনা। তাঁর স্বদেশি ও বিপ্লবী আন্দোলনের উপর লেখা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: দেশের কথা। মৃত্যু. ১৯১২।

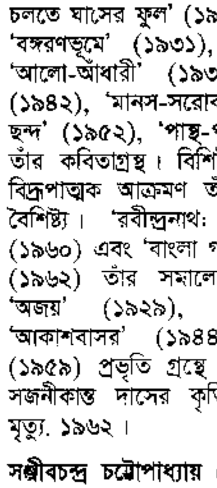
সখিনা বীরাঙ্গনা॥ বাংলা সাহিত্যে বীরাঙ্গনা সখিনার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সখিনার পিতা উমর খাঁ, কেল্লাতাজপুরের জমিদার ছিলেন। এই কেল্লাতাজপুর নেত্রকোণা মহকুমার দক্ষিণ অঞ্চলে পাতয়াড়া বা পাতুড়ী নদীর তীরে অবস্থিত। উমর খাঁ পাঠান বংশীয়। কয়েক পুরুষ আগে তিনি বাংলাদেশে আসেন এবং সপরিবার বাস করে বাঙালি হয়ে যান। তিনি তার মেয়ে সখিনাকে পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াও বীরাঙ্গনা নারী তৈরির মানসে শৈশব কাল থেকে ঘোড়ায় চড়া থেকে শুরু করে যুদ্ধের যাবতীয় কৌশল শিক্ষা দেন। একদিন সখিনার সঙ্গে অসুস্থ উমর খাঁর শয্যাপাশে, ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অবস্থিত জঙ্গলবাড়ির জমিদার ফিরোজ খাঁর দেওয়ানের সাক্ষাৎ ঘটে। সখিনাকে বিয়ে করার মানসে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান তাঁর উজিরকে বিয়ের পয়গাম নিয়ে উমর খাঁর কাছে পাঠান। উমর খাঁ তাঁর মেয়ের এরূপ অশোভনীয় বিয়ের পয়গাম পেয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন ও জঙ্গলবাড়ির উজিরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে তাড়িয়ে

দেন। কারণ ফিরোজ খাঁ দেওয়ানের পূর্বপুরুষ কালিদাস গজদানী 'কাফের প্রধান' ছিলেন। তিনি খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে গৌড়ের শাসনকর্তা হুসেন শাহের পরামর্শে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন। ফিরোজ খাঁ দেওয়ান এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ফলে উমর খাঁ এমন বংশে মেয়ে দিতে কিছুতেই রাজি হলেন না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জঙ্গলবাড়ির সৈন্যরা কেল্লাতাজপুর আক্রমণ করে দখল করে নেয় ও সখিনাকে বন্দী করে জঙ্গলবাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে ফিরোজ খাঁর সঙ্গে সখিনার বিয়ে হয়। এর অব্যবহিত পর ফিরোজ খাঁ দেওয়ান উমর খাঁ কর্তৃক বন্দী হলে সখিনা স্বামীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন ও শাশুড়ির অনুমতিক্রমে বীরাঙ্গনা বেশে কেল্লাতাজপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সৈনিকই তাঁর সঙ্গে পেরে উঠছিল না ঠিক এমনি মুহূর্তে স্বামীর দেয়া একখানা তালাকনামা পত্র তাঁর হস্তগত হয়। তালাকনামা পত্রপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থবির হয়ে যান ও ঘোড়ার পৃষ্ঠ থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। বন্দী স্বামী উদ্ধারের জন্যে বীরাঙ্গনা সখিনার এই বিস্ময়কর ঘটনা, কেল্লাতাজপুরের মাঠ আজও সে সাক্ষ্য বহন করছে।

সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২)॥ জন্ম. বেতালবন গ্রাম, বর্ধমান, ২৫ আগস্ট ১৯০০। কবি, সমালোচক, গবেষক ও সাময়িকপত্রের সম্পাদক। পৈতৃক নিবাস রায়পুর গ্রাম, বীরভূম। পিতা হরেন্দ্রলাল দাস। দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯১৮), বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশনারী কলেজ থেকে আই.এসসি. (১৯২০) ও কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এসসি. (১৯২২) পাস। এম.এসসি. পড়ার সময়ে শনিবারের চিঠির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভাবকুমার ছদ্মনামে লেখনী ধারণ। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯২৫-১৯২৮), 'প্রবাসী প্রেসে'র মুদ্রাকর ও কর্মাধ্যক্ষ (১৯২৮-১৯৩১), 'দৈনিক বসুমতী'র সাময়িক প্রসঙ্গের লেখক (১৯৩২) ও 'বঙ্গশ্রী' মাসিকপত্রের সম্পাদক (১৯৩২-১৯৩৫)। 'শনিবারের চিঠি'র ১১শ সংখ্যা থেকে আজীবন সম্পাদক ও পরিচালক (১৯২৮-১৯৩২, ১৯৩৬-১৯৬২)। শনিরঞ্জন প্রেস ও রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক (১৯৪৫-১৯৪৮, ১৯৫১-১৯৫৫), কোষাধ্যক্ষ (১৯৬১), সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক (১৯৪০) ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সংসদের সদস্য (১৯৪৮-১৯৬২)। আধুনিক সাহিত্যিকরা তাঁর সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গবাণের শিকারে পরিণত হন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাদ যাননি। রবীন্দ্রনাথের আচরণ, তাঁর রচনা, তাঁর ছবি/কোনো কিছুই 'শনিবারের চিঠি'র কটাক্ষ থেকে রেহাই পায়নি। 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গ কবিতায় কাজী নজরুল ইসলামের বিকৃত নাম ছিল 'গাজী আব্বাস বিটকেল'। ব্যঙ্গকবিতা ও ভাবগম্ভীর কবিতা উভয় রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান। 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' (১৯২৯), 'অঙ্গুষ্ঠ' (১৯৩১), 'বঙ্গরণভূমে' (১৯৩১), 'রাজহংস' (১৯৩৫), 'আলো-আঁধারী' (১৯৩৬), 'পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৪২), 'মানস-সরোবর' (১৯৪২), 'ভাব ও ছন্দ' (১৯৫২), 'পান্থ-পাদপ' (১৯৬২) প্রভৃতি তাঁর কবিতাগ্রন্থ। বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক। বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ তাঁর সমালোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য' (১৯৬০) এবং 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৬২) তাঁর সমালোচনা ও গবেষণাগ্রন্থ। 'অজয়' (১৯২৯), 'কলিকাল' (১৯৪০), 'আকাশবাসর' (১৯৪৪), 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৯৫৯) প্রভৃতি গ্রন্থে কথাসাহিত্যিক হিসেবে সজনীকান্ত দাসের কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। মৃত্যু. ১৯৬২।



সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৯৯)॥ জন্ম. কাঁঠালপাড়া গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, ১৮৩৪। কথাশিল্পী। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যমাগ্রজ। মেদিনীপুর জেলা স্কুল ও হুগলী কলেজে শিক্ষা লাভ। নিজের চেষ্টায় ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে ব্যুৎপত্তি অর্জন। কর্মজীবনে বর্ধমান



কমিশনার অফিসে কিছুকাল কেরানির কর্ম সম্পাদন Bengali Ryots: Their Rights and Liabilites (১৮৬৪) নামক গ্রন্থ লিখে খ্যাতি অর্জন এবং ডেপুটি মেজিস্ট্রেটের পদ লাভ। সরকারি চাকরি উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ও কিছুকাল বিহারের পালামৌতে অবস্থান। কৃষ্ণনগরে থাকাকালে দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন। ১৮৭৭-১৮৮২ পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা। ১৮৭৪-১৮৭৫ ও (১৮৭৩ সাল, ১২৮০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা) 'ভ্রমর' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা। রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: কণ্ঠমালা (১৮৭৭), মাধবীলতা (১৮৮৪), জালপ্রতাপ চাঁদ (ইতিহাস ভিত্তিক রচনা, ১৮৮৩)। গল্প: রামেশ্বরের অদৃষ্ট (১৮৭৭), দামিনী। প্রবন্ধপুস্তক: যাত্রা (১৮৭৫), সৎকার ও বাল্য বিবাহ। ভ্রমণ কাহিনী: পালামৌ (১৮৮০-১৮৮২)। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'পালামৌ' সঞ্জীবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। ছোটনাগপুরের আদিম গিরি-দরী অরণ্যানী এবং আরণ্যক পশু-মানব লেখকের বর্ণনাগুণে এতে জীবন্তভাবে পরিস্ফুটিত। 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' এই শাশ্বত চিত্তাকর্ষক বাক্যটি এ গ্রন্থের এক অমূল্য সম্পদ বিশেষ। মৃত্যু. ১৮৮৯।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)॥ জন্ম. পূর্ণিয়া, বিহার, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৬। কথাশিল্পী। ১৯২৪-এ পূর্ণিয়া জেলা থেকে স্কুল থেকে মেট্রিক, পাটনা কলেজ থেকে ১৯২৬-এ আই.এসসি., ১৯২৮-এ বি.এ. ও ১৯৩০-এ এম.এ. পাস। পরে পাটনা ল' কলেজ থেকে আইন পাস। ১৯৩২-১৯৩৯ পর্যন্ত পূর্ণিয়ার ওকালতি। এরপর স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে ওকালতি ছেড়ে দিয়ে একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে কংগ্রেসে যোগদান। ১৯৪০-১৯৪২ পর্যন্ত রাজনৈতিক কারণে ভাগলপুর জেলে বন্দীজীবন কাটান। ১৯৪২-এ ছাড়া পেয়ে কিছুকাল পূর্ণিয়ার গ্রামাঞ্চলে সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ। পুনরায় রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে ১৯৪২-১৯৪৪ পর্যন্ত পাটনা জেলে আটক। কর্মপদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধ ঘটায় ১৯৪৮-এ কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে সমাজতন্ত্রী দলে যোগদান। দেশি-বিদেশি অনেক ভাষায় দক্ষতা অর্জন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: জাগরী (১৯৪৬), ঢোঁড়াইচরিত মানস (দুই খণ্ড, ১৯৪৯-১৯৫১), সত্যি ভ্রমণকাহিনী (১৯৫১), অপরিচিতা (১৯৫৪), অচিনরাগিণী (১৯৫৪), সংকট (১৯৫৭), গণনায়ক (১৯৪৮), চিত্রগুপ্তের ফাইল-পত্র লেখার বাধা, আলোক দৃষ্টি ইত্যাদি। ১৯৪২-এর রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত তাঁর 'জাগরী' উপন্যাসের ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন। বিহারের জনজীবনের চিত্র সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস ও গল্পে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত। 'জাগরী' উপন্যাসের জন্য ১৯৫০-এ রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. ১৯৬৫।



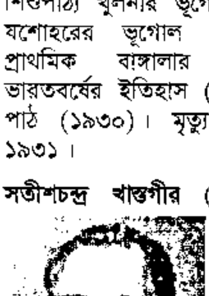
সতীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮১-১৯২৯)॥ জন্ম. ফতোয়াবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, ১৮৮১। সাহিত্যিক। এন্ট্রান্স পাস করার পর ১৯০২-এ রাঙ্গামাটি স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান। এ সময়ে চাকমা রাজার বাড়িতে গৃহশিক্ষক হিসেবেও নিযুক্তি লাভ। চাকমাদের জীবনের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে 'চাকমা জাতির ইতিহাস' রচনা। কলকাতার প্রবাসী ও ভারতী পত্রিকায় তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ এবং ১৯০৯-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ১৯০৯-এ কলকাতার নর্মাল স্কুলে বদলি। ১৯১১-তে উক্ত বই ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ। এতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন এবং লন্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোয়াইটি কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বৈদেশিক সহায়ক ফেলোরূপে স্বীকৃতি প্রদান। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত, রামায়ণ, মহাভারত, চাকমা জাতির ইতিহাস (বাংলা ও ইংরেজিতে) মৃত্যু. ১৯২৯।

সতীশচন্দ্র মিত্র (১৮৭২-১৯৩১)॥ জন্ম. পাইকপাড়া, খুলনা, ১৪ ডিসেম্বর ১৮৭২। ইতিহাসবিদ। পিতা খুলনা আদালতের পেশকার প্যারীমোহন মিত্র। খুলনা জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯২), কলকাতা মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে এফ.এ.



(১৮৯৪) ও কলকাতা সিটি কলেজ থেকে বি.এ. (১৮৯৭) পাস। মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অকৃতকার্য। স্কুলশিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু (১৮৯৯)। ১৯০৪-এ খুলনার দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে (১৯০২) ইতিহাস, অঙ্ক ও বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯৩১ পর্যন্ত এই বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনা। 'শিল্প ও সাহিত্য' নামক সাময়িকপত্র সম্পাদনা (১৯০৪-১৯০৫)। স্থানীয় ইতিহাস রচনায় প্রতিভার পরিচয় প্রদান। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' (১ম খণ্ড ১৯১৪ ও ২য় খণ্ড ১৯২২) তাঁর একখানি বহুল আলোচিত ও বহুল প্রশংসিত গ্রন্থ। অন্যান্য গ্রন্থঃ মা (কবিতা সংকলন, ১৮৯৬), প্রতাপসিংহ (ভারত-প্রতিভা গ্রন্থাবলী-১, ১৯০৪), উচ্ছ্বাস (বিবিধ আবেগময় রচনা, ১৯০৮), হরিদাস ঠাকুর (ভক্ত প্রসঙ্গ-১, ১৯২৫), সপ্ত গোস্বামী (ভক্ত প্রসঙ্গ-২, ১৯২৭), শিশুপাঠ্য যশোহরের ইতিহাস (১৯২৮), শিশুপাঠ্য খুলনার ইতিহাস (১৯২৯), শিশুপাঠ্য খুলনার ভূগোল (১৯২৯), শিশুপাঠ্য যশোহরের ভূগোল (১৯২৯)। পাঠ্যপুস্তকঃ প্রাথমিক বাঙ্গালার ইতিহাস (১৯০২), ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৯০৩) ও ঐতিহাসিক পাঠ (১৯৩০)। মৃত্যু. দৌলতপুর, ৭ জুন ১৯৩১।

সতীশচন্দ্র খাস্তগীর (১৮৯৮-১৯৭৩)॥ জন্ম. চট্টগ্রাম, ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮)। পদার্থবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সত্যরঞ্জন খাস্তগীর তাঁর পিতা। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে পদকসহ বৃত্তি পেয়ে এন্ট্রান্স (১৯১৫) পাস।



চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই.এসসি. (১৯১৭) পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে পদার্থবিজ্ঞানে বি.এসসি. অনার্স (১৯১৯) ও একই কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে পদার্থবিজ্ঞানে এম.এসসি. (১৯২১) ডিগ্রি লাভ। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের গবেষক হিসেবে যোগদান (১৯২২)। বিশিষ্ট নোবেল বিজ্ঞানী অধ্যাপক সি.জি.বারকল্লার অধীনে বিভিন্ন মাধ্যমে কিভাবে এক্স-রশ্মির বিচ্ছুরণ এবং শোধন ঘটে থাকে সে সবের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। এই কাজেরই স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৪ ও ১৯২৬-এ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. এবং ডি.এসসি. উপাধি লাভ। দেশে ফিরে পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান (১৯২৬)। কলোনিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দিয়ে কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন (১৯২৮)। সেখানে তিন বছর শিক্ষকতা করার পর ফিরে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষকের পদে। অল্পদিনের মধ্যেই রিডার পদে উন্নীত। কালক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন নিযুক্ত। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) এক বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে ভারত গমন। বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান পদে যোগদান। ১৯৫৮-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক ও বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধানের পদে নিযুক্ত লাভ। ১৯৬১-তে ভারতীয় কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ও ১৯৬২-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের পদ অলঙ্কৃত। ১৯৬৩-র ৩১ অক্টোবর অধ্যাপনার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পদার্থবিজ্ঞান শাখার প্রধান পদে যোগদান (১ মে ১৯৬৪)। ১৯৬৯-এর মে মাস পর্যন্ত সেখানে কাজ করার পর অবসর নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন সি এস আই আর-এর রিটায়ার্ড সায়েনটিস্ট হিসেবে। উল্লেখযোগ্য গবেষণাঃ 'ক্রিস্টাল রেকটিফিকেশন', 'কৃত্রিম অয়নমণ্ডল (আর্টিফিশিয়াল আয়নোস্ফিয়ার), 'গ্যাসীয় মাধ্যমে তড়িৎ-ক্ষরণজনিত কম্পন', (অসসিলেশন্স ইন গ্যাসিয়াস ডিসচার্জ), 'বায়ুমণ্ডলে বেতার তরঙ্গের গতি-প্রকৃতি', 'কম দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ' এবং 'কম কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গের সঞ্চারণ'। মৃত্যু. কলকাতা, ৬ মে ১৯৭৩।

সত্য সাহা (১৯৩৪-১৯৯৯)॥ জন্ম. ফতেহাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৪। সংগীত পরিচালক, গায়ক, চিত্রপরিচালক, প্রযোজক ও পরিবেশক। পিতা প্রসন্নকুমার সাহা এবং মাতা হীরামতি সাহা। স্ত্রী রমলা সাহা প্রযোজিক, পুত্র সুমন সাহা অভিনেতা ও পুত্র

ইমন সাহা সংগীত পরিচালক। নারায়ণগঞ্জ হাই



স্কুল থেকে ১৯৪৯-এ মেট্রিক, কলকাতার সেন্ট্রাল কলেজ থেকে ১৯৫১-এ আই.এসসি. এবং ১৯৫৪-এ বি.এসসি. পাস। চাচা রবীন্দ্রলাল সাহার কাছে সংগীতের হাতেখড়ি। উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নেন নারায়ণগঞ্জে সুপর্ণা নন্দীর কাছ থেকে। পঞ্চাশের কলকাতার 'মেজোমশাই', 'জালিয়াতি' কয়েকটি ছবিতে সহকারী সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬০-এ ঢাকায় এসে খান আতাউর রহমানের মাধ্যমে বেতার ও 'তোমার আমার' চলচ্চিত্রে গায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন এবং আলী মনসুরের 'জানাজানি' (১৯৬৫) ছবিতে প্রথম সংগীত পরিচালনা করেন। সংগীত পরিচালনায় মুক্তিপ্রপ্ত প্রথম ছবি সুভাষ দত্ত পরিচালিত 'সুতরাং' (১৯৬৪)। এই ছবিতে তাঁর সুর করা গান তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যায়। তাঁর সংগীত পরিচালিত দুই শতাধিক ছবির মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে: 'ভাওয়াল সন্ন্যাসী' (১৯৬৬), 'কাগজের নৌকা' (১৯৬৬), 'রূপবান' (১৯৬৫), 'ফির মিলেঙ্গে হামদোনো' (১৯৬৬), 'গুনাই বিবি' (১৯৬৬), '১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন' (১৯৬৬), 'চাওয়া পাওয়া' (১৯৬৭), 'মধুমালা' (১৯৮৬), 'আবির্ভাব' (১৯৬৮), 'আয়না ও অবশিষ্ট' (১৯৬৭), 'দীপ নেভে নাই' (১৯৭০), 'এতটুকু আশা' (১৯৬৮), 'পরশমনি' (১৯৬৮), 'মোমের আলো' (১৯৬৮), 'নীল আকাশের নীচে' (১৯৬৭), 'মানুষ অমানুষ' (১৯৭০), 'মায়ার সংসার' (১৯৬৯), 'আলোর মিছিল' (১৯৭৪), 'অশিক্ষিত' (১৯৭৮), 'সূর্যকন্যা' (১৯৭৬), 'ছুটির ঘন্টা' (১৯৮০), 'লাল সবুজের পালা' (১৯৮১), 'পুরস্কার' (১৯৮৩), 'আগুনের পরশমণি' (১৯৯৪), 'অজান্তে' প্রভৃতি। তাঁর সুরারোপিত জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে 'সুতরাং'-এর 'এমন মজা হয় না', 'নদী বাঁকা জানি'; 'কাগজের নৌকা'র 'আমি নিজের কাছে'; 'নীল আকাশের নীচে'র 'নীল আকাশের নীচে আমি', 'আবির্ভাব'-এর 'ভাবী যেন লাজুক লতা', 'এতটুকু আশা'-র 'তুমি কি দেখছো কভু'; 'আয়না ও অবশিষ্ট'-এর 'আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল', 'নয়নমণি'র 'নারীগো নারী'; 'ছুটির ঘন্টা'র 'একদিন ছুটি হবে' ও 'আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী'; 'অশিক্ষিত'র 'ঢাকা শহর আইসা আমার'; 'আলোর মিছিল'-এর 'এই পৃথিবীর পরে' প্রভৃতি। স্বরলিপি বাণীচিত্র নামে চিত্র প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী। প্রযোজিত ছবি বিনিময়, ছুটির ঘন্টা, অশিক্ষিত, পুরস্কার, উজানভাটি, যন্তর-মন্তর, তোমার জন্য পাগল, মীমাংসা, চরমপত্র প্রভৃতি। তোমার আমার, আয়না ও অবশিষ্ট, আবির্ভাব, জিঞ্জির প্রভৃতি ছবির কণ্ঠশিল্পী। 'রাম রহিম জন' (১৯৯১) নামে একটি ছবি পরিচালনা। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতিসহ বহু সংস্থার পুরস্কার প্রাপ্ত। মৃত্যু. কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি ১৯৯৯।



সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)॥ জন্ম. গড়পার, কলকাতা, ২ মে ১৯২১। চলচ্চিত্রকার, লেখক, অঙ্কনশিল্পী। আদি নিবাস মসুয়া গ্রাম, ময়মনসিংহ। পিতামহ-খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, পিতা-প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়, মাতা-সুপ্রভা দেবী। জমিদার পরিবারে জন্ম। আড়াই বছর বয়সে পিতৃহীন হন (১৯২৩)। রায় পরিবার আর্থিক সংকটে পড়লে ছয় বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে কলকাতার ভবানীপুরে মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ। মাস্টারি ও সূচিকর্ম করে সুপ্রভা দেবীর সত্যজিতের পড়াশুনার খরচ যোগাড়। প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে ফটোগ্রাফি, সংগীত ও চিত্রাঙ্কনের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মে। অর্থনীতিতে অনার্সসহ বি.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯৩৯)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি। সেখানে নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসে প্রকৃতি ও ভারতীয় শিল্পের শক্তি ও সৌন্দর্য বুঝতে শেখেন। শান্তিনিকেতনের পড়াশুনা শেষ না করেই জীবিকার তাগিদে কলকাতায় চলে আসেন (১৯৪২)। ব্রিটিশ মালিকানাধীন ডি.জে. কিমার বিজ্ঞাপন সংস্থার জুনিয়র ভিসুয়ালাইজার পদে যোগদান (এপ্রিল ১৯৪৩)। এর মাধ্যমেই কর্মজীবনের পাশাপাশি শিল্পীজীবনেরও সূচনা।

বইয়ের সঙ্গে চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়াশুনা ও চিত্রনাট্য রচনায় মনোনিবেশ। বংশী চন্দ্রগুপ্ত, চিদানন্দ দাসগুপ্ত প্রমুখের সহায়তায় 'কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা (৫ অক্টোবর ১৯৪৭)। বিজয়া দাসের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯৪৮)। বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষণজন্মা পরিচালক ও নির্মাতা। প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' (চিত্রনাট্য-বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' থেকে, ১৯৫৫) মুক্তি পাওয়ার পর পরই নিটোল ছবির নির্মাতা হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন। পরের বছর ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৫৬) 'পথের পাঁচালী'র শ্রেষ্ঠ মানবিক আবেগসম্পন্ন চলচ্চিত্র হিসেবে পুরস্কার লাভ। ছত্রিশ বছরের চলচ্চিত্রকার জীবনে (১৯৫৫-১৯৯১) আঠাশটি শিল্প-সুষমামণ্ডিত ছবি নির্মাণ। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো হলো: 'অপরাজিতা' (চিত্রনাট্য-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অপরাজিত' থেকে, ১৯৫৬), 'পরশ পাথর' (চিত্রনাট্য-রাজশেখর বসুর ছোটগল্প 'পরশ পাথর' থেকে, ১৯৫৮), 'জলসাঘর' (চিত্রনাট্য-তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'জলসাঘর' থেকে, ১৯৫৮), 'অপুর সংসার' (চিত্রনাট্য-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অপরাজিত' থেকে, ১৯৫৯), 'দেবী' (চিত্রনাট্য-প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'দেবী' থেকে, ১৯৬০), 'তিনকন্যা' (চিত্রনাট্য-রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প থেকে, ১৯৬১), 'রবীন্দ্রনাথ' (চিত্র্যনাট্য-সত্যজিৎ রায়, ১৯৬১), 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' (চিত্রনাট্য-সত্যজিৎ রায়, ১৯৬২), 'অভিযান' (চিত্রনাট্য-তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অভিযান' থেকে, ১৯৬২), 'মহানগর' (চিত্রনাট্য-নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প 'অবতরণিকা' থেকে, ১৯৬৩), 'চারুলতা' (চিত্রনাট্য-রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'নষ্টনীড়' থেকে, ১৯৬৪), 'চিড়িয়াখানা' (চিত্রনাট্য-শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'চিড়িয়াখানা থেকে, ১৯৬৭), 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (চিত্রনাট্য-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'প্রতিদ্বন্দ্বী' থেকে ১৯৭০), 'সীমাবদ্ধ' (চিত্রনাট্য-শঙ্করের উপন্যাস 'সীমাবদ্ধ' থেকে, ১৯৭১), 'অশনি সঙ্কেত' (চিত্রনাট্য-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অশনি সঙ্কেত' থেকে, ১৯৭৩), 'জনঅরণ্য' (চিত্রনাট্য-শঙ্করের উপন্যাস 'জনঅরণ্য' থেকে, ১৯৭৫), 'হীরক রাজার দেশে' (চিত্রনাট্য-সত্যজিৎ রায়, ১৯৮০), 'সদ্গতি' (চিত্রনাট্য-মুন্সী প্রেমচাঁদের ছোটগল্প 'সদগতি' থেকে, ১৯৮১), 'গণশত্রু' (চিত্রনাট্য-হেনরিক ইবসেনের নাটক An Enemy of the Poeople থেকে, ১৯৮৯), 'আগন্তুক' (চিত্রনাট্য-সত্যজিৎ রায়, ১৯৯১)। প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে এ-সকল চলচ্চিত্রের অধিকাংশ নির্মিত হলেও, সৃষ্টিকুশলতার গুণে এগুলো একান্তভাবে সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব সৃষ্টি নতুন সৃষ্টি; সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ নয়। চিত্রনাট্যগুলোর গীতিময় সংলাপও তাঁর একক সৃষ্টি। অধিকাংশ ছবির (প্রথম ছয়টি ব্যতীত) আবহসংগীতের রচয়িতাও তিনি নিজে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালির বাস্তব জীবন, বাংলার নিসর্গ রোদ ও বৃষ্টির খেলা, মেঘের নানান রঙ, বন-বনানী, নদ-নদী, সাগর-সৈকত, জলে পোকার নৃত্য, কাশবনের বিস্তৃত শুভ্রতা সুচারুভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর ছবিতে। 'মহানগর', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ' ছবিতে কলকাতার মধ্যবিত্তের রূপটি অত্যন্ত সার্থকভাবে উপস্থাপিত। সত্যজিতের ছবি গভীর মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। মানবতাবোধই তাঁর ছবিগুলোকে করে তুলেছে কালজয়ী। তাঁর অপর কীর্তি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত কিশোর সাহিত্য পত্র 'সন্দেশ' (১৯১৩)-এর পুনঃপ্রকাশ (১৯৬১)। আমৃত্যু এ পত্রিকা সম্পাদনা। শিশু ও কিশোরদের জন্য রসোত্তীর্ণ গল্প ও উপন্যাস রচনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'কৈলাস কেলেঙ্কারি' (১৯৭৪), 'সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু' (১৯৭৪), 'জয় বাবা ফেলুনাথ' (১৯৭৬), 'ফটিকচাঁদ' (১৯৭৬), 'গোরস্থানে সাবধান' (১৯৭৯), 'যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে' (১৯৮২), 'ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু' (১৯৮৫), 'মোল্লা নাসিরুদ্দীনের গল্প' (১৯৮৫), 'তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ' (১৯৮৫), 'দার্জিলিং জমজমাট' (১৯৮৭), 'একের পিঠে দুই' (১৯৮৮)। চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য 'অস্কার' পুরস্কার (১৯৯২) ও 'ভারতরত্ন' (১৯৯২) উপাধি লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ১৯৯২।

সত্যব্রত সামশ্রমী (১৮৪৬-১৯১১)॥ জন্ম. পাটনা শহর, ২৮ মে ১৮৪৬। পৈতৃক নিবাস কালনা-ধাত্রী গ্রাম, বর্ধমান জেলা। ডেপুটি কালেক্টর রামদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতা। ভারত বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপক। প্রকৃত নাম সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়। সামশ্রমী উপাধি। পিতা বিদ্যানুরাগী বাঙালিদের মধ্যে বেদজ্ঞ পণ্ডিতের

একান্ত অভাব দেখে পুত্র সত্যব্রতকে বেদ বিষয়ে সুশিক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং যেহেতু এই বিশেষ জ্ঞানচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র কাশী, তাই পুত্রের শিক্ষা স্মরণ রেখেই নিজেও কাশীবাসী হন আট বছর বয়সে সত্যব্রতকে কাশীর সরস্বতী মঠে প্রেরণ। সেখানে বিশ্বরূপ স্বামীর নিকট পাণিনি ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য আত্মস্থ। গুজরাট দেশীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ নন্দরাম ত্রিবেদীর কাছে চতুর্বেদ অধ্যয়ন। এভাবে দীর্ঘ বারো বছর অকল্পনীয় পরিশ্রমের মধ্যে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত এবং ১৮৬৬-তে বিশ বছর বয়সে বেদ বিষয়ে পারঙ্গম হন। এরপরে ভারত ভ্রমণে বের হন। তাঁর সঙ্গে তত্ত্বালোচনায় চমৎকৃত হয়ে বুন্দী রাজসভার পণ্ডিতমণ্ডলী-কর্তৃক তাঁকে 'সামশ্রমী' উপাধিতে ভূষিত। কাশীতে স্বগৃহে বিনা পারিশ্রমিকে অধ্যাপনা শুরু। কাশী থেকে সংস্কৃত ভাষায় 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করে সুদীর্ঘ আট বছর (১৮৬৭-১৮৭৪) দেশে-বিদেশে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার প্রসার ঘটানোর প্রয়াস চালান। ১৮৭৫-এ পিতার মৃত্যুর পর সপরিবার কলকাতায় আগমন এবং বেদ প্রচারের উদ্দেশ্যে মুদ্রণযন্ত্র ক্রয় করে একটি প্রকাশনালয় স্থাপন। রচিত, সম্পাদিত বা অনূদিত প্রায় যাবতীয় গ্রন্থই এখান থেকে প্রকাশ। কলকাতা থেকে 'উষা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ। ১৮৮৯ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত প্রকাশিত এই সাময়িকীরও লক্ষ্য ছিল বেদ আলোচনা ও প্রচার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে বেদ পড়ানোর আমন্ত্রণ জানালে তা গ্রহণ। বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হলে তিনি ধর্মীয় কারণে অব্রাহ্মণকে বেদ পড়াতে অস্বীকার করলে তাঁকে বিরূপ সমালোচনা ও দুর্নামের ভাগী হতে হয়। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা বহু। ভাষ্য, প্রাতিশাখ্য সূত্র ও ব্রাহ্মণসহ সাম ও যজুর্বেদ বাংলা অনুবাদের সঙ্গে প্রকাশ তাঁর প্রধান কীর্তি। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রবর্তিত 'বিব্লিওথেকা ইন্ডিক' গ্রন্থমালায় তাঁর সম্পাদিত সায়ন ভাষ্যসহ সামবেদ পাঁচটি সুবৃহৎ খণ্ডে ১৮৭১ থেকে ১৮৭৮-এর মধ্যে প্রকাশিত। এতদ্ব্যতীত তাঁর সম্পাদনায় ঐ গ্রন্থমালা চার খণ্ডে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, দুখণ্ডে শতপথ ব্রাহ্মণ, চার খণ্ডে যাস্কের নিরুক্ত প্রকাশ। এশিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসোসিয়েট মেম্বার ও অনারারি ফেলো। মৃত্যু. কলকাতা, ১ জুন ১৯১১।

সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১)॥ জন্ম. সোনারঙ গ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, ১৯০৭।



সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। পিতা ধরণীমোহন সেন। শান্তিনিকেতনের আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর পিতৃব্য। সোনারঙ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতায় আগমন। সেখানে যুগান্তর দলের ব্রিটিশবিরোধী গোপন রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হন। আই.এসসি. এবং বি.এ. পাস করার পর ইতিহাসে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি। সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার জন্য গ্রেফতার (১৯৩১)। বহরমপুর বন্দী শিবিরে একটানা পাঁচ বছর আটক থাকেন। জেলে বসেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জেল থেকে মুক্তিলাভের (১৯৩৮) পর শান্তিনিকেতনে গবেষণাবৃত্তি লাভ। শান্তিনিকেতনে প্রবেশ না করে মার্কসবাদে দীক্ষা গ্রহণ। সমাজতন্ত্রের পক্ষে মেহনতি মানুষকে সংগঠিত করার জন্য সোনারঙে প্রত্যাগমন। কৃষক আন্দোলনে যোগদান। ঢাকা জেলা কৃষক সমিতির নেতৃত্ব প্রদান। ১৯৪৯-এ দ্বিতীয়বার গ্রেফতার। প্রায় চার বছর কারানির্যাতন ভোগের পর ১৯৫৩-তে মুক্তিলাভ। ১৯৫৪-র ৩০ মে পূর্ববাংলায় ৯২-ক ধারা জারি হলে আবার গ্রেফতার। কিছুকাল পর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে 'দৈনিক সংবাদে' সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে পুনরায় গ্রেফতার। দীর্ঘ পাঁচ বছর জেলে বাস করার পর ১৯৬৩-র শেষের দিকে মুক্তিলাভ। 'দৈনিক সংবাদে' পুনরায় সাংবাদিকতার কর্মে যোগদান। ১৯৬৫-র আগস্ট থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত আবার কারাবাস। মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় যুক্ত হন 'সংবাদের' সঙ্গে। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কলকাতায় গমন। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ১৯৭২-এ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। এরপর কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ। প্রধানত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত সত্যেন সেনের সাহিত্য-কৃতীর উল্লেখযোগ্যতা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। তাঁর সাহিত্যসাধনা শুরু যখন তখন তিনি বয়সে পঞ্চাশ অতিক্রান্ত।

পরবর্তী দু'দশক লিখেছেন অজস্র, প্রধানত উপন্যাস। তার বিষয় সমাজ, রাজনীতি, সমকালীন ও অতীত ইতিহাস। বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ, আন্দোলন-সংগ্রামের আলেখ্যমালা ও শিশুতোষ গ্রন্থ রচনায়ও পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান। মার্কসবাদের শ্রেণি সংগ্রাম ও গণ-মানুষের মুক্তির বাণী তাঁর সাহিত্যকর্মে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। রবীন্দ্রসংগীত ও গণসংগীতের সুকণ্ঠ গায়ক। গণসংগীত রচনায় দক্ষতা প্রদর্শন। সাংস্কৃতিক সংগঠন 'উদীচি'র (১৯৬৯) প্রতিষ্ঠাতা। গ্রন্থাবলি: উপন্যাস ভোরের বিহঙ্গী (১৯৫৯), অভিশপ্ত নগরী (১৯৬৭), পাপের সন্তান (১৯৬৯), রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ (১৯৭৩), পদচিহ্ন (১৯৬৮), সেয়ানা (১৯৬৮), কুমারজীব (১৯৬৯), বিদ্রোহী কৈবর্ত (১৯৬৯), পুরুষ মেধ (১৯৬৯), আলবেরুনী (১৯৬৯), সাত নম্বর ওয়ার্ড (১৯৬৯), উত্তরণ (১৯৭০), একূল ভাঙে ওকূল গড়ে (১৯৭১), মা (১৯৭০), অপরাজেয় (১৯৭০)। ইতিহাস: মহাবিদ্রোহের কাহিনী (১৯৫৮), প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ (১৯৭১), বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম (১৯৭৬), বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, বিশ্বমানবের মহাতীর্থে, অভিযাত্রী (১৯৬৯), মানব সভ্যতার উষালগ্নে (১৯৭০), ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা (১৯৮৬)। জীবনী: মনোরমা মাসীমা (১৯৭০), বিপ্লবী রহমান মাস্টার (১৯৭৩), সীমান্ত সূর্য আব্দুল গাফফার খান (১৯৭৬)। বিবিধ: গ্রাম বাংলার পথে পথে (১৯৬৫), আমাদের এই পৃথিবী (১৯৬৭), এটমের কথা (১৯৬৯), জীববিজ্ঞানের কথা (১৯৭৩), ইতিহাস ও বিজ্ঞান (১ম খণ্ড ১৯৭৭, ২য় খণ্ড ১৯৭৯)। শিশুসাহিত্য: পাতাবাহার (১৯৬৭), অভিযাত্রী (১৯৬৯)। ১৯৭৩-এর শেষের দিকে হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। একই বছর ঢাকা ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে গিয়ে ভগ্নী প্রতিভা সেনের কাছে আশ্রয় গ্রহণ। চিরকুমার সত্যেন সেন বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতির এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। উপন্যাসে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৭০)। মৃত্যু. শান্তিনিকেতন, ৫ ডিসেম্বর ১৯৮১।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)॥ জন্ম. জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ১ জুন ১৮৪২ সাহিত্যিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ। ভারতের প্রথম আই.সি.এস.। স্বগৃহে বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষা। ১৮৫৭-তে এন্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে ঐ বছরই হিন্দু স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন। এই সময়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৮৫৯)। ১৮৬১-তে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ। ১৮৬২-র ২৩ মার্চ লন্ডন গমন এবং ১৮৬৪-তে প্রথম ভারতীয় আই.সি.এস. (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। এরপর চাকরি ব্যাপদেশে বোম্বাই গমন। ১৮৬৫-তে আমেদাবাদের অ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত। ১৮৯৭-তে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। সরকারি চাকরিতে থাকাকালীনই ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তির দিন (১২ এপ্রিল ১৮৬৭) জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ জাগানোর উদ্দেশ্যে কলকাতার বেলগাছিয়ায় 'হিন্দুমেলার প্রবর্তন'। মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গান রচনা করে বিশেষ প্রশংসিত। ১৮৯৭-তে নাটোরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ১০ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব। এ ছাড়া ১৯০০ ও ১৯০১-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সভাপতি। ১৯০৬-এ আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও ১৯০৭-এ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও সভাপতি মনোনীত হন। ৯টি বাংলা গ্রন্থ ও ৩টি ইংরেজি গ্রন্থ রচনা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা (১৮৫৯, ৬০, ১৯০৯-১০, ১৯১৮-২৩)। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বোম্বাই চিত্র (১৮৮৮), বৌদ্ধধর্ম (১৯০১), সুশীলা-বীর সিংহ নাটক (১৮৬৭), স্ত্রী স্বাধীনতা, ভারতবর্ষীয় ইংরেজ (১৯০৮), আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস (১৯১৫), Raja Rammohon Ray, The Autobiography of Maharshi Devendranath Tagore ইত্যাদি। এছাড়া তিলকের ভগবদ্গীতার অনুবাদ, তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদ ও মেঘদূতের অনুবাদ (১৮৮৪) করে খ্যাতি অর্জন।



সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অধ্যাত্ম দেশাত্মবোধক সংগীতও রচনা। স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীকে বিলাতে পাঠিয়ে পাশ্চাত্য মহিলাদের আদর্শে গড়ে উঠতে উৎসাহ জোগান। জ্ঞানদানন্দিনী গৃহের পর্দাপ্রথা ভাঙতে সক্ষম হন। দেশের সামাজিক উন্নতির পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু. কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ১৯২৩।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)॥ জন্ম. মাতুলালয়, কলকাতার নিকটবর্তী নিমতা গ্রাম, ১৮৮২। কবি। পৈতৃক নিবাস চুপী গ্রাম, বর্ধমান। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর পিতামহ। কলকাতার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী



রজনীনাথ দত্ত তাঁর পিতা। কলকাতা সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯৯) ও জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে এফ.এ. (১৯০১) পাস। বি.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে পিতার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যোগদান। পরে ব্যবসায় পরিত্যাগ করে কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রযুগের ও রবীন্দ্রভক্ত কবি হলেও নানা গুণে তিনি স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুতে, কবিতার ছন্দ-নির্মাণের কৌশলে এবং শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কারুকার্যে। কল্পনা ও হৃদয়াবেগকে পরিহার করে জ্ঞানচর্চাকে কবিত্ব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ। দেশাত্মবোধ, শক্তির সাধনা ও মানবতার বন্দনা তাঁর কবিতার ভাববস্তু। সমাজের তুচ্ছ মানুষকে নিয়ে কবিতা রচনার প্রথম কৃতিত্ব তাঁর। 'মেথর' তাঁর এতদ্বিষয়ক একটি বহুল প্রশংসিত কবিতা। ছন্দের ঝঙ্কারে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সমৃদ্ধ। 'ছন্দের রাজা' ও 'ছন্দের যাদুকর' বলে খ্যাত। শব্দ চয়নেও কৃতিত্ব প্রদর্শন। অগণিত খাঁটি দেশি শব্দ সেই সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দ কবিতায় ব্যবহার করে বাংলা ভাষার শক্তিবৃদ্ধি। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ ক্ষমতা প্রশংসনীয়। আরবি, ফারসি, চীনা, জাপানি, ইংরেজি ও ফরাসী ভাষার অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা বঙ্গানুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন। রচিত কবিতাগ্রন্থ: সবিতা (১৯০০), সন্ধিক্ষণ (১৯০৫), বেণু ও বীণা (১৯০৬), হোমশিখা (১৯০৭), ফুলের ফসল (১৯১১), কুহু ও কেকা (১৯১২), তুলির লিখন (১৯১৪), অভ্র-আবীর (১৯১৬), হসন্তিকা (১৯১৯), বেলা শেষের গান (১৯২৩), বিদায় আরতি (১৯২৪), কাব্য সঞ্চয়ন (১৯৩০)। অনুবাদ কাব্য: তীর্থরেণু (১৯১০), তীর্থসলিল (১৯১৮), মণি মঞ্জুষা (১৯১৫)। গদ্যরচনা: জনম দুঃখী (অনুবাদ উপন্যাস, ১৯১২), চীনের ধূপ (অনুবাদ প্রবন্ধগ্রন্থ, ১৯১২), রঙ্গমল্লী (অনুবাদ নাটক, ১৯১৩)। চল্লিশ বছর বয়সে পরলোক গমন। মৃত্যু. ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২২।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২-১৯০৮)॥ জন্ম. মেদিনীপুর, ৩০ জুলাই ১৮৮২। পৈতৃক নিবাস বোড়াল, চব্বিশ পরগনা। বিপ্লবী ও শহীদ। অভয়চরণ বসুর পুত্র এবং বিখ্যাত পণ্ডিত রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৯৭-তে মেদিনীপুর



কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ১৮৯৯-তে মেদিনীপুর কলেজ থেকে এফ.এ. পাস। কলকাতা সিটি কলেজে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি। স্বাস্থ্যগত কারণে বি.এ. পরীক্ষা দেয়া হয়নি। খড়গপুরে কেলনার কোম্পানির হোটেলে কিছুকাল কেরানির চাকরি করার পর মেদিনীপুর কালেক্টরিতে চাকরি গ্রহণ। ১৯০২-এ মেদিনীপুরে যে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে বিপ্লবী হেমচন্দ্রদাস কানুনগো তার নেতৃত্ব দেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সহকারীরূপে কাজ করেন। ১৯০৫-এ মেদিনীপুরে 'ছাত্রভাণ্ডার' সংগঠন তৈরি। এই ছাত্রভান্ডার তাঁত শিক্ষা ও ব্যায়ামচর্চার আড়ালে গুপ্ত বিপ্লবী আড্ডা হিসেবে গড়ে ওঠে। ১৯০৬-এ মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। এ সময়ে তাঁরই নির্দেশে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম কর্তৃক মেদিনীপুরে 'সোনার বাংলা' নামক বিপ্লবাত্মক ইস্তাহার প্রচার। ক্ষুদিরাম গ্রেফতার হলে তাঁকে মিথ্যা উছিলায় মুক্ত করার অপরাধে চাকরিচ্যুত। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ১৯০৬-এ

বোমা তৈরি শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্যারিসে গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনের অধিবেশনে ও সুরাটে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে নরমপন্থি নেতাদের বিরুদ্ধে দলবলসহ বিক্ষোভ করলে উভয় অধিবেশন ভেঙ্গে যায়। সুরাটে বাল গঙ্গাধর তিলকের সমর্থক ছিলেন। মজফ্ফরপুরে বোমা বিস্ফোরণে কিংসফোর্ড-হত্যা প্রচেষ্টায় ক্ষুদিরাম বসু গ্রেফতার হলে তাঁর ঘরে তল্লাশি হয়, বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করে মেদিনীপুর জেলে প্রেরণ। পরে আলিপুর বোমা মামলায় নরেন গোসাঁইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় সত্যেন্দ্রনাথের নাম তালিকাভুক্ত হলে তাঁকে কলকাতার আলিপুর জেলে বদলি করা হয়। আলিপুর বোমা মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোসাঁইকে জেলে থেকেই হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ। বিপ্লবী কানাইলালও জেলে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। সত্যেন্দ্রনাথ রাজসাক্ষী হতে অভিলাষী এই ছলনায় নরেন গোসাঁইকে জেলে ডেকে এনে ১৯০৮-এর ৩১ আগস্ট নরেন গোসাঁইকে গুলি করেন। আহত অবস্থায় নরেন পালিয়ে যাওয়ার সময় কানাইলালের গুলিতে নিহত। বিচারে উভয়ের ফাঁসি হয়। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্বে জেল-প্রাঙ্গণে তাঁর জন্য প্রার্থনা করেন। মৃত্যুর পর বিপুল জনতার সমাবেশ ঘটায় ভীত হয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার জেলের ভিতরেই তাঁর শবদাহের আদেশ দেন, এমনকি দাহকার্য শেষ হওয়ার পরও চিতাভস্ম জেলের বাহিরে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। মৃত্যু. ২১ নভেম্বর ১৯০৮।

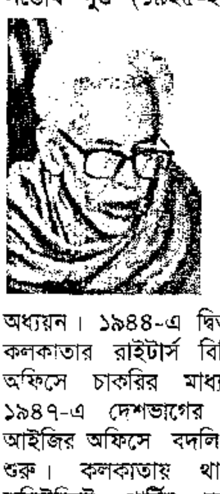
সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিজ্ঞানাচার্য (১৮৯৪-১৯৭৪)॥



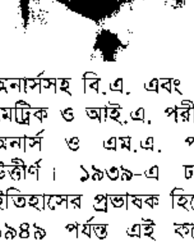
জন্ম. কলকাতা, ১ জানুয়ারি ১৮৯৪। বিজ্ঞান সাধক, কোয়ান্টাম স্ট্যাটিসটিক্সের উদ্ভাবক, পদার্থতত্ত্ববিদ ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ। কলকাতা হিন্দু স্কুল থেকে পঞ্চম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স (১৯০৯) পাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ। এফ.এ. (১৯১১) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার। গণিতে অনার্সসহ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. পাস (১৯১৩)। মিশ্রগণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রি লাভ (১৯১৫)। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে মিশ্রগণিতে ও পদার্থবিদ্যায় গবেষণায় মনোনিবেশ। এই সময়ে ড. মেঘনাদ সাহার সাহচর্য লাভ। ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে পদার্থবিদ্যার রিডার হিসেবে যোগদান। কালক্রমে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হন। এখানে চব্বিশ বছর গবেষণাকর্ম সম্পাদনা। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা ও এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফির উপর গবেষণা করে বিজ্ঞানজগতে বরেণ্য হন, তার সুচনা ও উন্মেষ ঢাকাতেই। ১৯২৪-এ 'প্ল্যাঙ্কস্ ল অ্যান্ড দি লাইট কোয়ান্টাম হাইপথেসিস' নামে তাঁর যে পেপারটি প্রকাশিত হয় তা পাঠ করে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন চমৎকৃত হন। তিনি (আইনস্টাইন) সত্যেন্দ্রনাথের এই পেপার জার্মান ভাষায় অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি 'বোস-আইনস্টাইন' সংজ্ঞা নামে সমাদৃত। সত্যেন্দ্রনাথের সূত্র অনুসারে তাপে অণুরা সরে দাড়ায় এবং তাদের মধ্যে একটা গতির বৃদ্ধি সঞ্চার হয়। এর ফলে উত্তপ্ত পদার্থ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বেড়ে যায়। 'তাঁর এই নতুন গবেষণার পূর্বে এই পদ্ধতিটি (তাপের দ্বারা আয়তন বৃদ্ধি) ম্যাকসওয়েল-বল্জম্যান স্ট্যাটিসটিকস নামে পরিচিত ছিল। এই বিজ্ঞানীদ্বয় পদার্থের অণুকে একেবারে পৃথক পৃথকভাবে ধরতেন, যেন তাপ পেলে অণুগুলি আলাদা আলাদাভাবে তাদের উত্তপ্ত আচরণ আরম্ভ করে দেয়। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নতুন পদ্ধতিতে অণুর এই স্বাতন্ত্র্যটি অস্বীকার করে দেখালেন যে, এরা এক-একটা গুচ্ছে ঘোরাফেরা করে, একেবারে স্বতন্ত্র ও এককভাবে নয়। অণুরও ক্ষুদ্র একটি অংশ যে প্রোটন– তিনি তার উপর তাঁর এপদ্ধতি প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনলেন।' আপেক্ষিক তত্ত্বের কতকগুলি জটিল গাণিতিক সমীকরণের পূর্ণ সমাধান করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর একটি কীর্তি স্থাপন। ১৯২৯-এ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি ও ১৯৪৪-এ মূল সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৪৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯৫৬ পর্যন্ত খয়রা অধ্যাপক পদে এবং কয়েক বছর স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের ডিন পদে দায়িত্ব

পালন। অবসর গ্রহণের পর ১৯৫৮-তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'এমিরিটাস প্রফেসর' পদে নির্বাচিত। দুই বছর বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত (১৯৫৬-১৯৫৮)। ১৯৫৯-এ ভারত সরকারের জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯৫৮-তে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত। এ ছাড়া ১৯৫২ থেকে কিছুকাল রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য। বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' এবং ভারত সরকারের 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা অগ্রণীয়। কলকাতায় 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠা এবং তার মুখপত্ররূপে মাসিক 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। মূলত বিজ্ঞানী হলেও সাহিত্য, সংগীতে ছিল অনুরাগ। 'সবুজপত্র' ও 'পরিচয়' সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। বেহালা এবং এসরাজ বাজাতেন। মৃত্যু. ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪।

সন্তোষ গুপ্ত (১৯২৫-২০০৪)॥ জন্ম. রুনসি, ঝালকাঠি, ৯ জানুয়ারি, ১৯২৫। ছদ্মনাম: অনিরুদ্ধ। পিতা যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, মা কিরণবালা দেবী। ঝালকাঠির পি.কে. ইন্সটিটিউট থেকে মেট্রিক পাস করে কলকাতার সিটি কলেজে আই.এ. অধ্যয়ন। ১৯৪৪-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আইজি প্রিজন অফিসে চাকরির মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পরে কারা বিভাগের আইজির অফিসে বদলি হয়ে ঢাকায় স্থায়ী বাস শুরু। কলকাতায় থাকতেই সম্পর্ক ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। ঢাকায় এসেও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই দমননীতি নেমে আসে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর। সরদার ফজলুল করিম, রেলশ্রমিক মো. আবদুল বারী প্রমুখের সঙ্গে মা-সহ গ্রেফতার। জেলখানায় আইজি প্রিজন তাঁকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে বলেন, 'তোমাকে ভুল করে ধরে এনেছে। আমি তোমার রিলিজের ব্যবস্থা করছি।' সন্তোষ গুপ্ত বললেন, 'ভুল হয়নি। পুলিশ ঠিক লোককেই ধরেছে' এরপরও তিনবার জেল খাটার অভিজ্ঞতা। জেল থেকে বের হওয়ার পর ১৯৫৭-এ দৈনিক 'সংবাদে' যোগদান। দৈনিক 'আজাদে'ও কিছুকাল সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা। ১৯৫৮-এ আইয়ুবের সামরিক শাসনের শুরুতেই আবার গ্রেফতার। ১৯৬৪-র দাঙ্গার সময় শেলীর কবিতা ও শেক্সপিয়ারের সনেটের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি লুট হয়। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কলকাতায় ন্যাপের মুখপত্র 'নতুন বাংলা'র সঙ্গে যুক্ত। এসময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য বিভাগে কাজ করেন। আমৃত্যু দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায়।পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত ছিলেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি আলোচনা-সমালোচনাতেও সিদ্ধহস্ত। দৈনিক সংবাদে 'অনিরুদ্ধের কলাম' লিখে খ্যাতি অর্জন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: সাহিত্য-সমালোচনা: অনুত্তম বক্তব্য (১৯৮৭); প্রবন্ধ: স্মৃতি-বিস্মৃতির অতলে (১৯৯৬), ইতিহাসের ছায়াচ্ছন্ন প্রহর ও বঙ্গবন্ধু (১৯৯৬), ইতিহাস আমাদের দিকে (১৯৯৭), বাংলাদেশের চিত্রশিল্প: স্বরূপের সন্ধান (১৯৯৭) ইত্যাদি। পুরস্কার-পদক: বঙ্গবন্ধু পুরস্কার (১৯৮৫), জহুর হোসেন স্মৃতিপদক (১৯৮৭), জেবুন্নেসা ও মাহবুবউল্লাহ কল্যাণ ট্রাস্ট (১৯৮৭), মাওলানা তর্কবাগীশ পদক (১৯৯৫), একুশে পদক (১৯৯৭) প্রভৃতি। মৃত্যু. ঢাকা. ৬ আগস্ট ২০০৪।



সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯১৫-১৯৭১)॥ জন্ম. ঢাকা, ৩ আগস্ট ১৯১৫। শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক। ১৯৩২-এ ঢাকার পগোজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯৩৪-এ ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ., ১৯৩৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ বি.এ. এবং ১৯৩৮-এ এম.এ. পাস। মেট্রিক ও আই.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং অনার্স ও এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ। ১৯৩৯-এ ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইতিহাসের প্রভাষক হিসেবে যোগদান। ১৯৪৭-১৯৪৯ পর্যন্ত এই কলেজে ইতিহাসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৪৯-এ ঢাকা



বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগদান। মেধাবী ছাত্র হিসেবে ছাত্রজীবনে সরকারি বৃত্তি ও স্যার যদুনাথ সরকার বৃত্তি লাভ। ইতিহাসে বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী সন্তোষ ভট্টাচার্য ছিলেন ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক। মৃত্যু. ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ স্বাধীনতাযুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানি বাহিনীর এদেশিয় সহযোগী আলবদর বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবন থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। পরে মীরপুর বধ্যভূমি থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

সন্তোষ সেনগুপ্ত (১৯০৯-১৯৮৪)॥ জন্ম. বিক্রমপুর, ঢাকা, ১৯০৯। সংগীতশিল্পী। শৈশব থেকেই গানের অনুশীলন শুরু। সাত-আট বছর বয়স থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডের গান অনুকরণের দক্ষতা অর্জন। পরে পশ্চিমবঙ্গে গমন। বহরমপুরের বিখ্যাত গায়ক মঞ্জু সাহেবের কাছে সংগীতে তালিম গ্রহণ। পরবর্তীকালে কবি নজরুল ইসলাম, হিমাংশু দত্ত সুরসাগর, কমল দাশগুপ্ত প্রমুখ গুণীজনের সান্নিধ্য লাভ। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত সেনোলা গ্রামোফোন কোম্পানি ও হিজ মাস্টার্স ভয়েজের সঙ্গে যুক্ত। চার বছরে হিন্দি গীত, গজল, ঠুমরী, কীর্তন ও আধুনিক বাংলা গানের কুড়িখানা রেকর্ড প্রকাশ। এইচ.এম.ভি. ও কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানির প্রযোজক ও আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার আসরের পরিচালক। রবীন্দ্র-সংগীত, নজরুলগীতি, অতুল প্রসাদের গান ও ভজন সংগীতে দক্ষ। 'বেস্ট লাভ সংগস্ অব নজরুল' এবং 'সে ইট উইথ ফ্লাওয়ার' নামক নজরুল ইসলামের গানের দু'টি লংপ্লে রেকর্ডের প্রণেতা। সংগীতচর্চার পাশাপাশি স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ২১ জুন ১৯৮৪।

সবদর হোসেন খাঁ॥ জন্ম. শিবপুর গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সেতারবাদক। শৈশবকাল থেকেই সংগীতের প্রতি অনুরাগী। তানসেন বংশীয় সংগীতজ্ঞ ত্রিপুরাধিপতির রাজদরবারের প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ কাশেম আলী খাঁ রবাবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ। একজন নীরব সাধক। 'সদু খাঁ' নামে সুপরিচিত। ওস্তাদের নির্দেশে মাঝে-মধ্যে ত্রিপুরার রাজদরবারে সেতারবাদন পরিবেশন। সংগীতের এই মহান পুরুষের পাঁচ পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র[ফকির (তাপস) আফতাবউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

সংগীত জগতের জ্যোতিষ্ক। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

সমর দাস (১৯২৯-২০০১)॥ জন্ম. নবদ্বীপ বসাক লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর ১৯২৯। সুরকার ও সংগীত পরিচালক। পিতা জিতেন্দ্রনাথ দাস এবং মাতা কমলিনী দাস। পরিবারের গণ্ডিতেই সংগীতশিক্ষা শুরু। সংগীতে হাতেখড়ি উচ্চাঙ্গ সংগীত সাধক রবীন্দ্রনাথ দাসের কাছে। লেখাপড়া করেন ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুল ও কলকাতার সেন্ট পল স্কুলে। স্কুলে পড়ার সময়ই প্রথমে বাঁশি এবং পরে গিটার বাদনে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯৪৫-এ ১৬ বছর বয়সেই ঢাকা বেতার কেন্দ্রে বাঁশি বাজানোর সুযোগ পান। কলকাতায় সলিল চৌধুরী ও কালীপদ সেনের সঙ্গে বিভিন্ন ছায়াছবিতে সহকারী সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এসবের মধ্যে 'জিজ্ঞাসা' ও 'লটারি' উল্লেখযোগ্য। গিটার ও পিয়ানো বাজানোয় দক্ষতা। ১৯৫০-এ কলকাতায় হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানিতে যোগদান। বাংলা ছায়াছবির সংগীত পরিচালক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। ১৯৫০-এ কলকাতার বাংলা চলচ্চিত্র 'লটারি'র অন্যতম সংগীত পরিচালনা। ১৯৫৪-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ এশীয় আন্তর্জাতিক সংগীত সম্মেলনের সংগীত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ঢাকায় নির্মিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা কাহিনীচিত্র আবদুল জব্বার খান পরিচালিত 'মুখ ও মুখোশ' (১৯৫৬) ছবির সংগীত পরিচালনা। তাঁর সংগীত পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ছবি : 'আসিয়া' (১৯৬০), 'মাটির পাহাড়' (১৯৫৯), 'রাজা এলো শহরে' (১৯৬৪), এবং 'ধীরে বহে মেঘনা' (১৯৭৩) প্রভৃতি। ঢাকা বেতারে ১৯৬০-এ সংগীত পরিচালক হিসেবে যোগদান। ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক ও প্রধান সংগীত পরিচালক ছিলেন। 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'নোঙর তোলো তোলো' প্রভৃতি গানে সুরারোপ। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু উদ্দীপনামূলক ও গণসংগীতে সুর সংযোজনা। সুরারোপিত গানের মধ্যে রয়েছে 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য



উঠেছে, রক্তলাল রক্তলাল', 'নোঙ্গর তোলা তোলো', 'ভেবো না গো মা', 'এই সূর্যোদয়ের ভোরে কাঁদো বাঙালি কাঁদো', 'সন্ধ্যাকাশের তারার মতো', 'লাজুক লাজুক চোখে মেলে', 'জাগলো গোলাপ', 'তোমারে উড়িয়ে দিলাম', 'আজ ছুটি দিলাম' প্রভৃতি। ২৬টি দেশাত্মবোধক গানের লংপ্লে রেকর্ডের সংগীত পরিচালনাও তার কৃতিত্ব। ১৯৭২-এ সুরবিন্যাস করে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' মূল গানটি বিবিসি লন্ডন থেকে সামরিক ব্রাশব্রান্ডে রেকর্ড করার দায়িত্ব পালন। ১৯৮৫ ও ১৯৯৫-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাফ গেমস সূচনা সংগীতের সুরারোপ। বাংলাদেশে 'সংগীত পরিষদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য। পুরস্কার: একুশে পদক এবং স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার। মৃত্যু. ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০১।

সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)॥ জন্ম. বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলকাতা, ১০ অক্টোবর ১৯১৬। কবি। আদি নিবাস সুয়াপুর গ্রাম, মানিকগঞ্জ, ঢাকা। পিতা অধ্যাপক অরুণচন্দ্র সেন, পিতামহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তা দীনেশচন্দ্র সেন। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯৩৬-এ বি.এ. অনার্স (ইংরেজি) ও ১৯৩৮-এ এম.এ. (ইংরেজি) ডিগ্রি লাভ। উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। কবিতা পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। মার্কসবাদের নিষ্ঠাবান ভক্ত। বিশিষ্ট মননশীল আধুনিক কবি। বহু আধুনিক কবির অনুসরণীয় কবি হিসেবে খ্যাত। নগরজীবনের ক্লেদ ও গ্লানি, মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্কট, সংশয়, নীতিহীনতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা এবং সংগ্রামী গণ-চেতনা তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠভাবে রূপায়িত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার বিপরীতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার আধুনিক গদ্যকবিতা রচনা করে বাংলা কাব্যে এক যুগের প্রবর্তন। রুশসাহিত্যের দক্ষ অনুবাদক। কবিতাগ্রন্থ: কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭), গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪০), নানাকথা (১৯৪২), খোলাচিঠি (১৯৪৩), তিন পুরুষ (১৯৪৪), সমর সেনের কবিতা (১৯৫৪)।



গদ্য গ্রন্থ: বাবু বৃত্তান্ত (১৯৭৮)। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯৮৭।

সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)॥ জন্ম. রাজানগর গ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর ১৯২৪। ঔপন্যাসিক। নিম্নবিত্ত কায়স্থ হিন্দু পরিবারে জন্ম। ঢাকার সূত্রাপুরে বাল্যজীবন কাটান। ঢাকার গ্র্যাজুয়েটস স্কুলে কয়েক বছর পর্যন্ত অধ্যয়ন। পরে নৈহাটি মহেন্দ্র স্কুলে ভর্তি। ৮ম শ্রেণির পরীক্ষায় প্রমোশন না পেয়ে স্কুলত্যাগ (১৯৩৯)। পোলট্রি ফার্মের ডিম, মুরগি, সবজি বিক্রি করে, চটকলের বড়কর্তাদের মেম সাহেবদের ছবি এঁকে, বস্তিতে থেকে দিন কাটাতে থাকেন। সত্যপ্রসন্ন দাসের (মাস্টার মশাই) সান্নিধ্যে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান এবং চটকল এলাকায় ট্রেড ইউনিয়নের কাজে আত্মনিয়োগ। ১৯৪৩-এ ইছাপুর রাইফেল কারখানার পাঁচ সিকে রোজে টেনারের চাকরি পান। ১৯৪৪-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ। গৌরী দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলে নিজের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন। ১৯৪৯-এ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে গ্রেফতার। ১৯৫১-তে মুক্তিলাভ। মুচলেকা দিতে অস্বীকার করায় চাকরি ফিরে পান নি। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে সাহিত্যচর্চায় পুরোপুরি ঝুঁকে পড়েন। ১৯৬৭-তে শ্যালিকা ধরিত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একজন বিশিষ্ট রূপকার। ব্রাত্য-জীবন, সমাজের বিকৃতরূপ উন্মোচন করার জন্য যৌনতা, মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর বামপন্থি রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির করুণ পরিণতি, রাজনৈতিক দলের লালিত হিংসা ও হত্যা মানুষকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তার নিখুঁত চিত্র অঙ্কনে পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান। শেষের দিকের উপন্যাসে নিঃসঙ্গ মানুষের একক সংগ্রামের আলেখ্য রূপায়িত। সেখানে মানুষের মেলা– মেলার মধ্যেও মানুষ একা, সে উপাখ্যানই সমরেশ বসু উপস্থাপন করেছেন গ্রাম, নগর, তীর্থ, নদী ও সমুদ্রের পটভূমিতে। গঙ্গা (১৯৫৫), প্রজাপতি (১৯৬৭), যুগ যুগ জিয়ে,



বিবর (১৯৬৫), শ্রীমতী কাফে (১৯৫৪), বিটি রোডের ধারে (১৯৫৩), মানুষ, বাঘিনী, মহাকালের রথের ঘোড়া, পুনর্যাত্রা, শাম্ব প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। মানুষের শাশ্বত বেদনা, গ্লানি, মানুষ হবার দায় এবং সংকল্প তাঁর উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। প্রজাপতি (১৯৬৭) উপন্যাসে অশ্লীলতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। আদালত রায় দিয়েছিল যে, বইটিতে অশ্লীল কিছু নেই। কালকূট ছদ্মনামে লিখতেন। গঙ্গা উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার (১৯৫৫) এবং সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৮০) লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ১২ মার্চ ১৯৮৮।

সরদার আবদুল জব্বার (১৯৪১-১৯৭১)॥ জন্ম. হরিহরপুর, নওগাঁ মাতুলালয়, ৪ জানুয়ারি ১৯৪১। রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। পৈতৃক নিবাস বক্তিয়ারপুর, নওগাঁ। পিতা আহমদ আলী সরদার, মাতা ছতুন বিবি। হলঘোষ পাড়া ও চাকলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা শুরু। চাকলা হাই স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৫৬), নওগাঁ বি.এম.সি কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৫৯), বগুড়া আজিজুল হক কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৬১) এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি. (১৯৬৬) পাস। একই বছর নওগাঁ উকিলবারে যোগদান। নওগাঁ মহকুমা রেডক্রস সোসাইটির সেক্রেটারি (১৯৬৯-৭১)। নওগাঁ ডিগ্রি কলেজ, চাকলা হাই স্কুল, উকিলপাড়া নবারুণ সংঘ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত। নাট্যাভিনেতা ও নাট্যনির্দেশক হিসেবে খ্যাতিলাভ। ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এবং ১৯৬৪-এ ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনে এলাকায় জনমত গঠনে ভূমিকা পালন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্‌ফর-ন্যাপ)-এর নওগাঁ মহকুমা শাখার যুগ্মসম্পাদক (১৯৬৭-১৯৬৯) নির্বাচিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় নওগাঁ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য। মার্চের প্রথম দিকে নওগাঁ ই.পি.আর. ক্যাম্পে মেজর নাজমুল হকের (৭নং সেক্টর কমান্ডার) নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ। এপ্রিলের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গের বালুরঘাট গমন। আগস্টের মাঝামাঝি মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ মিশন নিয়ে দেশে প্রবেশ। নওগাঁ মহকুমার সীমান্তবর্তী থানা ধামইরহাট প্রবেশের মুখে কলেজের সামনে ব্রিজের ওপর পাকহানাদার ও রাজাকার বাহিনীর হাতে ধৃত। ফার্শিপাড়া চৌধুরীবাড়ির পাকসেনা ক্যাম্পে তিন দিন গাছে ঝুলিয়ে হাতে পেরেক মেরে নির্যাতন। পরে অবশ-নিথর দেহ মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়। সম্মাননা: ধামইরহাটের ফার্শিপাড়ায় শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ, নওগাঁ উকিলবারে হলঘরের নামকরণ, বাংলাদেশ ডাকবিভাগ 'শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক ডাকটিকিট' (১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭) প্রকাশ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের স্মৃতিসৌধে ২১ নম্বরে তালিকাভুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরে বালুরঘাটে স্মৃতিস্মারক প্রতিষ্ঠিত, বাংলা একাডেমীর শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ (১৯৮৫) এবং 'স্মৃতি ৭১' ১ম খণ্ডে (১৯৮৮)-এ তাঁর তথ্য সন্নিবিষ্ট। মৃত্যু. নওগাঁ, ১১ থেকে ২১ আগস্টের মধ্যে, ১৯৭১।

সরদার আলাউদ্দিন আহমেদ (১৯৪১-১৯৭২)॥



জন্ম. শ্রীধরপুর গ্রাম, শ্রীনগর, বিক্রমপুর, ১৯৪১। সংগীতশিল্পী। শৈশবকাল থেকেই গানের প্রতি অনুরাগী। প্রখ্যাত দোতারাবাদক ও পল্লীগানের সুরকার কানাইলাল শীলের শিষ্যত্ব গ্রহণ। ১৯৫৪-তে প্রথম জনসাধারণ্যে গান পরিবেশন। ১৯৬৪-তে বেতার অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ। ১৯৭০-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েজ গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে লোকগীতির রেকর্ড প্রকাশ। 'মধুরাতি' (পরে 'তীর ভাঙ্গা ঢেউ' নামে প্রকাশিত) এবং 'দয়াল মুরশিদ' ছায়াছবির সংগীত পরিচালক। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ। 'গণসংগীত' দলে যোগদান এবং মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্পে গান পরিবেশন। স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে সংগীত পরিবেশন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সাহায্যার্থে বিভিন্ন স্থান সফর করে গান গেয়ে অর্থ সংগ্রহ। প্রখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে বোম্বের পলিডোর গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় দু'টি কবিগানের রেকর্ড প্রকাশ। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকা বেতারকেন্দ্রের 'নিজস্ব শিল্পী' হিসেবে যোগদান। স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' ও 'সংগ্রাম' ছায়াছবিতে নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ। মৃত্যু. ঢাকা, ১ নভেম্বর ১৯৭২।

সরদার জয়েনউদ্দিন (১৯১৮-১৯৮৬)॥ জন্ম. কামারহাটি গ্রাম, পাবনা, ১৯১৮। কথাসাহিত্যিক। কৃষক পরিবারে জন্ম। পিতা তহেরউদ্দিন বিশ্বাস। স্ত্রী রাবেয়া খাতুন। স্থানীয়



খলিলপুর হাইস্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৩৯) পাস। পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজে আই.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। সেনাবাহিনীতে হাবিলদার ক্লার্ক পদে যোগদান। দেশভাগের (১৯৪৭) পর সামরিক চাকরি থেকে অব্যাহতি লাভ। ঢাকায় নতুন করে কর্মজীবন শুরু। ১৯৪৮-এ পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী পদে যোগদান। ১৯৫১-তে দৈনিক 'সংবাদে'র বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার নিযুক্ত। ১৯৫৫ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির শিশু-কিশোর ম্যাগাজিন 'সেতারা' ও 'শাহীন'-এর সম্পাদক (১৯৫৫-১৯৫৬)। ১৯৫৮-তে দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার নিযুক্ত। ১৯৬০-এ ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে ইন্সপেক্টর পদে যোগদান। ১৯৬২-তে বাংলা একাডেমীর প্রকাশন ও বিক্রয় শাখার সহকারী অফিসার নিযুক্ত। ১৯৬৪ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। ন্যাশনাল বুক সেন্টার (পরবর্তীকালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)-এর রিসার্চ অফিসার পদে যোগদান। ১৯৭২-এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত। ১৯৭৮-এ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে বদলি হয়ে বাংলাদেশ টেকস্ট বুক বোর্ডের ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান। ১৯৮০-তে চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ। খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। সমকালীন সমাজের সঙ্কট, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, গ্রামীণ সমাজের অবহেলিত মানুষের দুঃখ-বেদনা এবং জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের শোষণ-নিপীড়নের চিত্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস– আদিগন্ত (১৯৫৯), পান্নামতি (১৯৬৪), নীল রং রক্ত (১৯৬৫), অনেক সূর্যের আশা (১৯৬৭), বেগম সেফালী মীর্জা (১৯৬৮), শ্রীমান তালেব আলী ও শ্রীমতি ক খ (১৯৭৪), বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ (১৯৭৫); ছোটগল্প।নয়নচুলি (১৯৫২), বীরকণ্ঠীর বিয়ে (১৯৫৫), খরস্রোত (১৯৫৫), বেলা ব্যানার্জীর প্রেম (১৯৬৬), অষ্টপ্রহর (১৯৭৩); শিশুসাহিত্য।উল্টোরাজার দেশ, আমরা তোমাদের ভুলব না, অবাক অভিযান। উপন্যাসে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৭) এবং 'অনেকে সূর্যের আশার' জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬৭) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৬।

সরলাদেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫)॥ জন্ম. জোড়াসাঁকো,



কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭২। সাহিত্যিক, দেশপ্রেমিক। মাতা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী। পিতা জানকীনাথ ঘোষাল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জানকীনাথ নদীয়া জেলার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশোদ্ভব। বেথুন স্কুলে কবি কামিনী রায়ের সহপাঠী। শিক্ষাজীবন অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। ১৮৮৬-তে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার। ১৮৯০-এ মাত্র সতেরো বছর বয়সে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. পাস। সংস্কৃত, ফরাসি ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন। সংগীতজ্ঞ হিসেবও সুনাম অর্জন। কিছুকাল মহীশূরে মহারানি গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা। ভারতী, সখা ও বালক পত্রিকায় রচনা প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যিক জীবন শুরু। ১৯০৩-এ কলকাতায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' ও 'বীরাষ্টমী ব্রত' পালনের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ। নিরালম্বন স্বামী বা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনে সহায়তা প্রদান। ১৯০৪-এ স্বদেশি দ্রব্য চালু প্রকল্পে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা। ১৯০৫-এ উর্দু পত্রিকা হিন্দুস্থান (লাহোর)-এর সম্পাদক ও পাঞ্জাবের আর্যসমাজীয় নেতা পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৩০-এ কলকাতায় 'ভারত-স্ত্রী-শিক্ষাসদন' প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়া 'ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল' স্থাপন। লালা লাজপৎ রায়, গোখলে, তিলক, গান্ধীজি প্রমুখ নেতার সঙ্গে রাজনীতিসূত্রে সংশ্লিষ্ট হন। ১৮৯৫-১৮৯৭, ১৮৯৯-১৯০৭, ও ১৯২৪-১৯২৬ পর্যন্ত যৌথভাবে 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা। রচিত ১০০টি জাতীয় সংগীতের সংকলন 'শতগান'

(১৯০০)। গল্পগ্রন্থ: নববর্ষের স্বপ্ন। আত্মকথা: জীবনের ঝরাপাতা। অন্যান্য গ্রন্থ: বাঙালির পিতৃধন (১৯০৩), ভারতী-স্ত্রী মহামণ্ডল (১৯১১) ইত্যাদি। মৃত্যু. ১৮ আগস্ট ১৯৪৫।

সরলাবালা সরকার (১৮৭৫-১৯৬১)॥ জন্ম. কাঁঠালপোতা, নদীয়া, ১০ ডিসেম্বর ১৮৭৫। পৈতৃক নিবাস বড় রামদিয়া, ফরিদপুর। সাহিত্যিক। পিতামহী বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী 'আমার জীবনে'র লেখিকা রাসসুন্দরী দাসী। বাড়িতেই শিক্ষালাভ। পিতা কিশোরীলাল সরকারের কাছে প্রথমপাঠ গ্রহণ। পরবর্তী জীবনের বিদ্যাভ্যাস জ্যেষ্ঠাগ্রজ ডাক্তার সরসীলাল সরকারের কাছে। বারো বছর বয়সে শরৎচন্দ্র সরকারের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ এবং তেইশ বছর বয়সে বৈধব্যবরণ। বাকি দীর্ঘজীবন পারিবারিক গণ্ডী ও সাহিত্যচর্চায় অতিবাহিত। রচিত প্রথম কবিতা ১২৯৭ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৮৯৮-এ স্বামীর মৃত্যুর পর সাহিত্য– প্রদীপ, উৎসাহ, জাহ্নবী, উদ্বোধন, অন্তঃপুর, সুপ্রভাত, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প প্রকাশ। স্বদেশি আন্দোলনের সময় ১৩ মার্চ ১৯৩০-এ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মহিলার উদ্যোগে গঠিত 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র অন্যতম সদস্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক ১৯৫৩-তে ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার' নিযুক্ত। রচিত কবিতাগ্রন্থ: প্রবাহ (১৯০৪), অর্ঘ্য (১৯৫১); জীবনী: নিবেদিতা (১৯১২), কুমুদনাথ (১৯৩৮), স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ (১৯৫৭)। গল্পগ্রন্থ: চিত্রপট (১৯১৭), গল্প সংগ্রহ (১৯৫৭)। শিশুপাঠ্য: পিনকুর ডাইরি। স্মৃতিচিত্র: হারানো অতীত (১৯৫৩)। প্রবন্ধ: মনুষ্যত্বের সাধনা (১৯৫৩), সাহিত্য-জিজ্ঞাসা (১৯৫৭)। মৃত্যু. ১ ডিসেম্বর ১৯৬১।



সরসীকুমার সরস্বতী (১৯০৬-১৯৮০)॥ জন্ম. আত্রাই গ্রাম, রাজশাহী, ১৪ নভেম্বর ১৯০৬। গবেষক, ইতিহাসবেত্তা, শিল্পশাস্ত্রী। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল ও রাজশাহী কলেজের পাঠ শেষ করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে ১৯৩০-এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাস। ছাত্রজীবন শেষে ১৯৩১-এ রাজশাহীতে প্রত্যাবর্তন করে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় যোগদান। ১৯০৫-এ তাঁর কর্মক্ষেত্র পরিবর্তিত হয় কলকাতা শহরে প্রথমে এশিয়াটিক সোসাইটি, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁর সংস্রব অন্তত চল্লিশ বছরের। গবেষণা কর্মসূত্রে যুক্ত থাকার বাইরেও সোসাইটির গ্রন্থাগারিক (১৯৪৯-১৯৫৪), সম্পাদক (১৯৬০-১৯৬৩), সহসভাপতি ও সভাপতি (১৯৭৫-১৯৭৬), ১৯৪০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম তাঁকে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ জানান উপাচার্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগে বহু বছর পড়াশুনার পর ১৯৫৪-১৯৬২ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপনা। ১৯৬৩-১৯৬৭ পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। উপরন্তু এ সময়েই (১৯৬৪-১৯৬৫) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সেক্রেটারি-কিউরেটর হিসেবেও কর্মরত। ১৯৬৭-তে বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়ে ১৯৬৭-১৯৭২ পর্যন্ত 'শিক্ষা ও স্থাপত্য ইতিহাস' বিভাগের অধ্যক্ষ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: Early Sculpture of Bengal, Buddhist Shrines in India, Glimpses of Mughal Architecture of Bangal, A Survey of Indian Sculpture, Tantrayane Art-An Album. পালযুগের চিত্রকলা। অধ্যাপক সরসীকুমার প্রথম বিখ্যাত হন স্থাপত্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল'-এ ঐ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। পাহাড়পুরের মন্দিরের স্থাপত্যকলা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন শৈলীর এবং সেই শিল্পরীতি যে 'সর্বতোভদ্র' নামে স্বীকৃত তা তিনিই প্রথম সুধীসমাজে প্রকাশ করেন। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ছড়িয়ে আছে পনেরটি গ্রন্থে ও দুই শতাধিক প্রবন্ধে। এ সবের অধিকাংশই ইংরেজিতে রচিত। ১৯৬৯-এ আচার্য যদুনাথ স্বর্ণপদক লাভ। মৃত্যু. কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-১৯৭২)॥ জন্ম. গিরিডি, হাজারীবাগ, ১৯০৩। পৈতৃক নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার মালিহাটি গ্রাম। কথাশিল্পী ও সাংবাদিক. শৈশবে কিছুকাল ছোটনাগপুরে কাটান। প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয় মুর্শিদাবাদে, কৈশোরে পুনরায় ছোট নাগপুরে আগমন। সালার স্কুল থেকে ১৯১৮-তে প্রবেশিকা পাস করে হাজারীবাগ কলেজে ভর্তি। পরে বহরমপুর কলেজে চলে আসেন। ১৯২১-এ বহরমপুর কলেজে বি.এ. পড়ার সময়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান। পরে ব্যবসায় শুরু। ব্যবসায় উপলক্ষে নাগপুর, মেদিনীপুর, পাটনা প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করে কলকাতায় গমন। কলকাতার ন্যাশনাল কলেজ থেকে বি.এ. পাস। এ সময় সুভাষচন্দ্র বসু ও কিরণশংকর রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। এই পরিচয়-সূত্রে সুভাষচন্দ্রের আগ্রহে 'আত্মশক্তি' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি গ্রহণ। পরে বৈকালী, নায়ক প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করার পর পুনরায় 'আত্মশক্তিতে' প্রত্যাবর্তন। 'আত্মশক্তি' নবকলেবরে 'নবশক্তি' রূপে প্রকাশিত হলে এর সম্পাদক নিযুক্ত। 'নবশক্তিতে' রবীন্দ্র মৈত্রের একটি রাজদ্রোহমূলক কবিতা প্রকাশিত হলে সম্পাদক হিসেবে কিছুকাল কারাদণ্ড ভোগ। এরপর আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান। এবং দশ বছর কাজ করার পর অবসর গ্রহণ। মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবেই পরিচিত। রচিত গ্রন্থ– উপন্যাস: বন্ধনী (১৯৩১), শৃঙ্খল (১৯৩২), আকাশ ও মৃত্তিকা (১৯৩৩), পান্থনিবাস (১৯৩৫), ঘরের ঠিকানা (১৯৩৬), ময়ূরাক্ষী (১৯৩৬), গৃহকপোতী (১৯৩৭), সোমলতা (১৯৩৮), অভিশাপ (১৯৩৮), হংসবলাকা (১৯৩৭), শতাব্দীর অভিশাপ (১৯৪১), কালো ঘোড়া (১৯৪৬) ইত্যাদি। গল্পগ্রন্থ: দেহযমুনা (১৯৩৬), মনের গহনে (১৯৩৬), ক্ষুধা (১৯৪৪); নাটক: হালদার সাহেব (১৯৪৭)। মৃত্যু. ১৯ মার্চ ১৯৭২।

সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯)॥ জন্ম. পিতার কর্মক্ষেত্র হায়দ্রাবাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯। কবি, রাজনীতিবিদ ও বাগ্মী। পৈতৃক নিবাস ব্রাহ্মণগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নিজামের শিক্ষা উপদেষ্টা ড. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতা। বার বছর বয়সে এন্ট্রান্স পাস (১৮৯১)। নিজামের প্রদত্ত বৃত্তির টাকায় প্রথমে ইংল্যান্ডের কিংস কলেজ ও পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্টেন কলেজে শিক্ষাগ্রহণ (১৮৯৫-১৮৯৮)। বিলেত থেকে হায়দ্রাবাদে ফেরার পর ড. মোতিয়ালা গোবিন্দরাজলু নাইডুর



সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৮৯৮)। ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন। অল্প বয়সেই ইংরেজিতে কবিতা রচনা। প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ: 'The Golden ThresholdÕ (১৯০৫), 'The Bird of TimeÕ (১৯২০), 'The Broken Wing', ÔThe Sceptred FluteÕ (১৯২৮), 'The Songs of India'। ১৯১৫-তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে (১৮৮৫) যোগদান। রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের অনুসারী। ১৯২১-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের লেখা বক্তৃতা আহমেদাবাদের কংগ্রেসের অধিবেশনে পাঠ। দেশবন্ধুর লেখা আর সরোজিনী নাইডুর পড়া এই দুইয়ে মিলে উক্ত অধিবেশনে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি। ১৯২৫-এ কংগ্রেসের কানপুরের অধিবেশনে দলের সভানেত্রী হন। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনে, ১৯৩২-এ গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহে ও ১৯৪২-এ ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ। ১৯৩১-এ গান্ধীর সঙ্গে বিলেতে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান। ভারতের স্বাধীনতা লাভের (১৯৪৭) পর উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত (১৫ আগস্ট ১৯৪৭)। আমৃত্যু এ পদে দায়িত্ব পালন। ইংরেজি ভাষায় বাগ্মিতার জন্য যশস্বিনী। তাঁর বক্তৃতা যেমন ছিল বুদ্ধিদীপ্ত, তেমনি মাধুর্যমণ্ডিত। ভাষণের ছত্রে ছত্রে নির্ভীকতা ও দেশপ্রেম ফুটে উঠতো। খ্যাতিমান বাঙালি। একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হিসেবে ব্রিটিশ ভারতে অসামান্য খ্যাতি অর্জন। মৃত্যু. লক্ষ্ণৌ লাটপ্রসাদ, ২ মার্চ ১৯৪৯।

সলিমুল্লাহ, নবাব, স্যার॥ জন্ম. আহসান মঞ্জিল, ঢাকা, ১৮৬৬। সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ। নবাব আহসানউল্লাহর পুত্র। আহসানউল্লাহর প্রথম স্ত্রীর ছয়জন পুত্র-কন্যার মধ্যে সলিমুল্লাহ ছিলেন পঞ্চম সন্তান। বিদেশি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গৃহে শিক্ষালাভ। কিছুকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে দায়িত্ব পালন (১৮৯৩-১৮৯৫)। ১৯০১-এ পিতার মৃত্যু হলে তিনি নিযুক্ত হন পরিবারের প্রধান (নবাব)। নবাব



পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তিনিই রাজনীতিতে প্রথম সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। নবগঠিত ব্যবস্থাপক সভায় কোনো মুসলমান নির্বাচিত না হতে পারায় আগা খাঁ, নবাব মহসীনুল মুলক, নবাব বিকরুল মুলক, নবাব আলী চৌধুরী প্রমুখ মুসলিম নেতার সঙ্গে মিলে ১৯০৬-এর ১ অক্টোবর বড়লাট লর্ড দ্বিতীয় মিন্টোর (১৯০৫-১৯১০) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যবস্থাপক সভা ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে মুসলমানদের আলাদা নির্বাচনের দাবি পেশ, মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে ঢাকায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান (১৯০৬) ও তাদের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য সেই সম্মেলনে মুসলিম লীগ গঠনে নেতৃত্ব দান (১৯০৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের (১৯২১) প্রধান উদ্যোক্তা, আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, যা পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতি হয়েছে, তাঁর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর আন্দোলনের ফলে সরকার কর্তৃক শিক্ষা বিভাগে মুসলমানদের জন্য সহকারী পরিদর্শক ও বিশেষ সাব-ইন্সপেক্টরের পদ সৃষ্টি। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকায় একটি এতিমখানা (সলিমুল্লাহ্ এতিমখানা, আজিমপুর), একটি মেডিক্যাল কলেজ (স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, মিটফোর্ড, ঢাকা), একটি সাধারণ কলেজ (সলিমুল্লাহ কলেজ, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাস (সলিমুল্লাহ হল) ও একটি রাস্তার (সলিমুল্লাহ রোড) নামকরণ হয়েছে। জি.সি.আই.ই. এবং কে.সি.এস.আই. উপাধিতে ভূষিত। খাজা সলিমুল্লাহ ছিলেন জনদরদি নেতা। এদেশের অনুন্নত মুসলমান সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। উত্তর প্রদেশের অনুন্নত মুসলমানদের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদের যে অবদান তার সঙ্গে নবাব সলিমুল্লাহর অবদানের তুলনা করা যায়। মুসলমানদের অবস্থার উন্নতিকল্পে ব্রিটিশ শাসকের কাছে বঙ্গবিভাগের দাবি পেশ করেন। বলা যায় তাঁর একক প্রচেষ্টায় তদানীন্তন বড়লাট কার্জন বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) মেনে নেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে হিন্দু সমাজ ও কংগ্রেসের আন্দোলনের চাপে সরকার বঙ্গভঙ্গ রহিত (১৯১১) করলে অত্যন্ত ব্যথিত হন। কলকাতায় পরলোক গমন করার সময়ে পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা ও চার স্ত্রী রেখে যান। মুসলিম লীগ (১৯০৬) গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে স্মরণীয়। ১৯০৬-এর ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে নবাব বিকরুল মুলকের সভাপতিত্বে মুসলিম নেতাদের এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে নবাব খাজা সলিমুল্লাহর প্রস্তাব অনুসারে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মৃত্যু. ১৬ জানুয়ারি ১৯১৫।

সলিল চৌধুরী (১৯২৫-১৯৯৫)। জন্ম. আসাম, ১৯২৫। গীতিকার ও সুরকার। আসামের এক চা বাগানের ঘন সবুজ পরিবেশে সংগীতজ্ঞ পিতা ড. জ্ঞানেন্দ্রময় চৌধুরীর কাছে সংগীতশিক্ষার হাতেখড়ি। পিতৃব্য নিকি চৌধুরীর কাছেও সংগীতে তালিম গ্রহণ।



কলকাতায় তাঁর সংগীত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ১৯৪৪-এ কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগদান এবং গণসংগীত রচনায় মনোনিবেশ। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় 'বিচারপতি তোমার বিচার', 'ও আলোর পথযাত্রী', 'জন্মভূমি', 'হাতে মোদের কে দেবে', 'কোন এক গাঁয়ের বধূ', 'কালো মেয়ে', 'শান্তির গান' প্রভৃতি স্মরণীয় গান রচনা। সুরকার হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পালকি চলে', সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অবাক পৃথিবী' ও 'রানার' এবং বিমল ঘোষের 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা' প্রভৃতি কবিতায় ও গানে সুরসংযোজন। তাঁর সুরারোপিত গান গেয়ে ভারতের যে সব কণ্ঠশিল্পী অমর হয়েছেন তাঁরা হলেন মোহাম্মদ রফি, মুকেশ, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মুঙ্গেশকর, যিশু দাস, সুশীলা, গীতশ্রী ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সলিল চৌধুরীর সুরে লতা মুঙ্গেশকরের গাওয়া 'নিশিদিন, নিশিদিন', 'না মন লাগে না', 'সাত ভাই চম্পা' ও 'না যেও না', সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা','আয় বৃষ্টি ঝেঁপে', 'মনের বসন্ত এসো' ও 'গা গা রে পাখি গা' এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের

গাওয়া 'রানার', 'ধিতাং ধিতাং বলে', 'ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা', 'পথ হারাবো বলেই পথে নেমেছি', 'দুরন্ত ঘূর্ণির ওই লেগেছে পাক' প্রভৃতি গান বাংলা গানের রাজ্যে সেরা গান হিসেবে স্বীকৃত। চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক হিসেবেও সুনাম অর্জন। 'পরিবর্তন', 'দুই বিঘা জমি', 'প্রকাশ', 'মায়া', 'কাবলিওয়ালা', 'মধুমতি' প্রভৃতি ছায়াছবিতে সংগীত পরিচালনা। মার্কসবাদের একজন ভক্ত হিসেবে পরিচিত। আধুনিক বাংলা গানের সুরস্রষ্টা হিসেবে ও গণসংগীতের প্রণেতা হিসেবে তিনি একজন স্মরণীয় বাঙালি। মৃত্যু. কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫।

সাইদুর রহমান (?-১৯৮২)॥ জন্ম. বাকড়ী গ্রাম, ঝিনাইদহ।



সংগীতশিল্পী। পুরো নাম এ.এইচ. সাইদুর রহমান। পারিবারিক সাংগীতিক পরিবেশে মানুষ। বড় ভাই এ.কে.এম. শামসুর রহমান উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুসারী এবং মেজো ভাই আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কণ্ঠশিল্পী। শৈশবকাল থেকেই নজরুলগীতির অনুশীলন শুরু। নজরুলগীতির একজন বিশিষ্ট শিল্পী, সাধক ও সংগ্রাহক। নজরুল ইসলামের গানের স্বরলিপি সম্পাদনা ও প্রকাশ তাঁর প্রশংসনীয় উদ্যম। ১৯৬৮-তে 'নজরুল সুর সংকলন' প্রকাশ। এতে দুষ্প্রাপ্য কয়েকশ' নজরুলগীতি তাঁর অসাধারণ প্রচেষ্টায় সংগৃহীত ও অন্তর্ভুক্ত। ঢাকার নজরুল একাডেমি কর্তৃক একনিষ্ঠ সাধনার জন্য আজীবন সদস্যপদ দান। ১৯৬৪ থেকে চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্রের নজরুলগীতির একজন নিয়মিত কণ্ঠশিল্পী। বাংলাদেশ রেলওয়ের একজন চাকুরে। মৃত্যু. ৩১ আগস্ট ১৯৮২।

সাইদুর রহমান, অধ্যক্ষ (১৯০৯-১৯৮৭)॥ জন্ম. রসুলাপুর গ্রাম, কুমিল্লা, ১৯০৯। শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক। বাল্যকালে পিতা-মাতা হারান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে বি.এ. অনার্স (১৯৩১) এবং একই বিষয়ে এম.এ. (১৯৩২) ডিগ্রি লাভ। উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ। রাজশাহী কলেজে দর্শনের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৪১-এ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে বদলি। ১৯৪৩-এ কলকাতা বেকার হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট



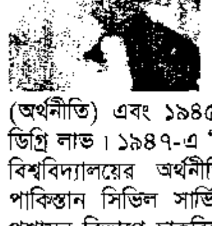
নিযুক্ত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের স্পেশাল অফিসার পদে নিযুক্ত (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)। ১৯৪৯-এ অধ্যাপক পদে ঢাকা কলেজে বদলি। ১৯৪৭-১৯৫৩ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ও ১৯৫১-১৯৫৩ পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের খণ্ডকালীন প্রভাষক। ১৯৫৩-তে সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজে এবং ১৯৫৭-তে চট্টগ্রাম কলেজে বদলি। ১৯৬২-তে চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল পরিদর্শক পদে যোগদান। ১৯৬৩-তে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় কলেজটি দেশের সর্ববৃহৎ কলেজে পরিণত। দুই শিফটে (দিবা ও নৈশ) এর ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজারের উপরে। টিনশেড থেকে কলেজটি বিশাল প্রাসাদে রূপান্তরিত। লার্নিং ও আর্নিং পদ্ধতি চালু করে মেধাবী ও গরিব ছাত্রদের কলেজের প্রশাসনিক দপ্তরে চাকরি প্রদান। ১৯৬৪-র জানুয়ারি মাসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে ১৪ হাজার দাঙ্গাপীড়িত হিন্দু নরনারীকে কলেজ প্রাঙ্গণে আশ্রয় দান করে মানবকল্যাণের এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন। ১৯৬৭-তে অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ। দেশের প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। ১৯৭১-এ জন্মস্থান রসুলাপুরে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক হাসপাতালটি বাংলাদেশ ও ভারতে যাতায়াতের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার। জীবনমুখী ও মানবতাবাদী দর্শনের অনুশীলন, প্রকাশ ও প্রচারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সনাতনী অধ্যাত্মধর্মী ও পরকালমুখী দর্শনচিন্তার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। তাঁর মতে মুক্তি ও প্রগতির জন্য শুধু ধর্মসাধনা বা তপস্যা নয়, এর জন্য চাই কর্ম, কুসংস্কারমুক্ত মন, মুক্তবুদ্ধি, সাম্যবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা, চাই ত্যাগ ও মানবকল্যাণের মানসিকতা। ধর্মাচার নিয়ে রসিকতা করতেন বলে উগ্র ধর্মবাদীরা তাঁকে নাস্তিক, কমিউনিস্ট প্রভৃতি

অপবাদে আখ্যায়িত করে। আসলে তিনি স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। মানবকল্যাণের (কল্যাণ দর্শন) বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর মতবাদ হলো: 'সৃষ্টির প্রতি সেবামূলক দায়িত্ব পালন না করে স্রষ্টাকে সেবা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই মানুষকে বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী সমাজকে সর্বহারা শ্রেণির মানুষের কল্যাণের জন্যে কাজ করে যেতে হবে।' মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পূর্ববাংলায় যে ঐতিহাসিক আন্দোলন (মার্চ ১৯৪৮ ও ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) সংঘটিত হয়, একজন সরকারি কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও সে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ। বাংলাদেশ দর্শন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তেজগাঁও মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। স্বাধীনতা (১৯৭১) উত্তরকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করে যে অর্থ উপার্জন করেন তা দিয়ে নিজের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাইদুর রহমান ফাউন্ডেশন' স্থাপন। প্রতি বছর এ ফাউন্ডেশন আয়োজিত সেমিনারে মানবকল্যাণের উপর প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা বক্তব্য রাখেন। গ্রন্থ: ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক ফিলোসফি (১৯৫৩)। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'শতাব্দীর স্মৃতি', সাপ্তাহিক 'যায় যায় দিন' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৮৬-১৯৮৭)। মৃত্যু. ঢাকা, ২৮ আগস্ট ১৯৮৭।

সা'দত আলি আখন্দ (১৮৯৯-১৯৭১)॥ জন্ম. চিঙ্গাশপুর গ্রাম, বগুড়া, ১.৭ . ১৮৯৯। লেখক। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। পিতা সানিউদ্দিন আখন্দ (স্থানীয় পাঠশালার শিক্ষক)। স্ত্রী রাবেয়া খাতুন। ১৯১৬-তে বগুড়া করোনেশন ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স, ১৯১৮-তে কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এফ.এ., ১৯২০-এ রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. অনার্স (ইতিহাস) ও ১৯৩৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ। ১৯২০-১৯২২-এ বগুড়া সারিয়াকান্দি নারছি হাইস্কুল, মহিমাগঞ্জ হাইস্কুল ও বাগবাড়ি হাইস্কুলে শিক্ষকতা। ১৯২২-এ পুলিশ বিভাগে যোগদান। দারোগা পদে প্রায় তেত্রিশ বছর দায়িত্ব পালন। ১৯৫৫-তে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। মানবপ্রেমিক, উদার চিন্তা ও আধুনিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী একজন মননশীল গদ্য লেখক। ইতিহাস ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: তরুণ মুসলিম (১৯২৯), ইতিহাসের শহীদ (১৯৩৫), তেরো নম্বরে পাঁচ বছর (১৯৬৯) ও অন্য দিন অন্য জীবন (১৯৬৯)। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ থেকে প্রাণরক্ষার জন্য বগুড়া শহরের স্বীয় বাসভূমি পরিত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্রসহ অত্র জেলার পুষিন্দা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ। দুশ্চিন্তাজনিত কারণে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ায় সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত। তাঁর কৃতী দুই পুত্র অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও চরমপত্র খ্যাত এম.আর. আখতার (মুকুল)। মৃত্যু. পুষিন্দা, বগুড়া, ১২ মে ১৯৭১।



সানাউল হক (১৯২৪-১৯৯৩)॥ জন্ম. চাউড়া গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৩ মে ১৯২৪। কবি। ১৯৩৯-এ ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাইস্কুল থেকে মেট্রিক ও ১৯৪১-এ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ. পাস। ১৯৪৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. অনার্স (অর্থনীতি) এবং ১৯৪৫-এ এম.এ. (অর্থনীতি) ডিগ্রি লাভ। ১৯৪৭-এ 'ল' পাস। কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করে প্রশাসন বিভাগে চাকরিতে যোগদান। কালক্রমে সচিব পদে উন্নীত। বেলজিয়ামে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পদে দায়িত্ব পালন। সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য (১৯৭৯-১৯৯০)। প্রখ্যাত কবি। প্রেম, নিসর্গ, স্বদেশ ও বিভিন্ন সূক্ষ্ম মানসিক অনুভূতিকে কেন্দ্র করে তাঁর কবি-কল্পনা বিকশিত। নদী ও মানুষের কবিতা (১৯৫৬), সম্ভবা অনন্যা (১৯৬২), সূর্য অন্যতর (১৯৬৩), বিচূর্ণ আর্শিতে (১৯৭৩), একটি ইচ্ছা



সহস্র পালে (১৯৭৩), কাল সমকাল (১৯৭৫), পদ্মিনী শঙ্খিনী (১৯৭৬), প্রবাস যখন (১৯৮১), বিরশীর কবিতা (১৯৮৩), উত্তীর্ণ পঞ্চাশে (১৯৮৪) তাঁর কবিতাগ্রন্থ : বন্দর থেকে বন্দরে (১৯৬৪) সানাউল হকের ভ্রমণমূলক রম্যরচনা। প্রবন্ধ: ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ (১৯৭২)। সিতারা-ই-কায়েদে আজম খেতাব (১৯৬৪), বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৪), ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৯) ও একুশে পদক (১৯৮৩) লাভ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও মুক্তবুদ্ধির ধ্যান-ধারণা বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু. ঢাকা, ৪ মে ১৯৯৩।

সায়ীদুল হাসান (১৯২৯-১৯৭১)॥ জন্ম. বানিয়াচং গ্রাম, হবিগঞ্জ, সিলেট ১৯২১। রাজনীতিবিদ। পিতা খানবাহাদুর রফিকুল হাসান। স্ত্রী বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) দলীয় সাবেক সাংসদ ফরিদা হাসান। সিলেট জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাস। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ. পাস। কিছুকাল আইন অধ্যয়ন। ছাত্রজীবনেই বামপন্থি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে প্রথমে লন্ডনে, পরে কলম্বোতে পাকিস্তান হাই কমিশন অফিসে ট্রেড কমিশনার পদে দায়িত্ব পালন। শ্রীলঙ্কায় চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালে পূর্ব-পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষের সংবাদ শুনে চাকরি ত্যাগ করে দেশে প্রত্যাবর্তন। স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের জন্য ব্যবসায় নিয়োজিত হন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (২৫ জুলাই ১৯৫৭) গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৬৫-র আগস্ট মাসে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিযুক্ত। চীন ও রাশিয়ার আদর্শগত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) দ্বিধাবিভক্ত হলে (নভেম্বর ১৯৬৭) মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন পিকিংপন্থি ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বর মাসে এই দলের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত। মৃত্যু. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৮ মে ১৯৭১ পাকহানাদার বাহিনী কতৃর্ক অপহৃত হন। তারপর থেকে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এদেশে বামপন্থি রাজনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। সুরুচিপূর্ণ ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব হিসেবেও পরিচিতি লাভ।



সাবিরিদ খান॥ জন্ম. চট্টগ্রাম। কবি। তাঁর সময়কাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। ড. সুকুমার সেনের মতে তিনি সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সর্বমোট তিনটি কাব্য রচনা করেছেন বলে জানা যায়। এগুলো পূর্ণাঙ্গ কোনো প্রতিলিপি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কবিতাগ্রন্থ তিনটির নাম: বিদ্যাসুন্দর, রসুল বিজয়, হানিফা ও কয়রাপরী। জন্ম মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

সামাদ (?-১৯৬৫)॥ জন্ম. পূর্ণিয়া, বিহার। জন্ম তারিখ জানা যায় না। ফুটবল খেলোয়াড়। সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। ১৯১৫-তে তাজহাট ফুটবল দল গঠিত হলে সেই দলে যোগদান। কুচবিহার মাঠে আই.এফ. শীল. খেলায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে দু'টি গোল করে স্বীয় দলকে বিজয়ী করেন। ১৯১৬-তে ইংল্যান্ডের 'সামার সেট' ফুটবল দলের বিরুদ্ধে একাই দুটি গোল দেন। ১৯২৭-এ ডুরান্ড কাপের খেলায় রেলওয়ে দলের পক্ষে 'শের-উড ফরেস্টার' দলের বিরুদ্ধে একমাত্র দর্শনীয় গোল করে দলকে বিজয়ী করেন। এ গোলটির জন্যে তখনকার ভারতের প্রধান সেনাপতি শের-উড-মাল তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ১৯২৬-এ ভারতীয় একাদশের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত এবং দূরপ্রাচ্য সফর। ১৯৩৭-এ আইলিংটন কেরিন্থিয়ানস ইংল্যান্ডের একাদশের বিরুদ্ধে কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেন। ভারতের মোহামেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গেও অনেকবার খেলেছেন। ভারতীয় দলের পক্ষে সিংহল, হংকং, জাভা, চীন, অস্ট্রেলিয়া, বার্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, সুমাত্রা, বোর্নিও প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে খেলেছেন। ১৯৪৪-এ তিনি তাঁর ছেলে গোলাম হোসেন একই সঙ্গে রেলওয়ের দলের পক্ষে খেলেছেন



১৯৪৭-এ পূর্ব-পাকিস্তানে আগমন এবং পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ের কর্মচারী হিসেবে পার্বতীপুর অফিসে যোগদান। ১৯৬২-তে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ। সামাদ চল্লিশ বছর যাবৎ নিয়মিত ফুটবল খেলেছেন। তিনি লেফট আউটে খেলতেন। তাঁর সমকালীন সময়ে অসাধারণ ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মৃত্যু. পর্বতীপুর, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫।

সালাহউদ্দিন, আবু হামিদ (১৯২৬-২০০৩)॥



জন্ম. বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, ৩০ মার্চ ১৯২৬। পৈতৃক নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে। চলচ্চিত্রকার, প্রযোজক, পরিবেশক, কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, সংগীত পরিচালক, গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী। পিতা আবদুল লতিফ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মাতা আহসানুন্নেসা খাতুন গৃহিণী। দিনাজপুরের বালুরঘাট হাই স্কুল থেকে ১৯৪২-এ মেট্রিক, ১৯৪৪-এ ঢাকা কলেজ থেকে আই.এসসি. এবং ১৯৪৬-এ কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এসসি. পাস। কুমিল্লার 'বঙ্গবিদ্যালয়' (পরে রবীন্দ্র মেমোরিয়াল হাইস্কুল) এ শিক্ষকতার মাধ্যমে শুরু হয় কর্মজীবন। পরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে বিজ্ঞানের ডেমোনেস্ট্রেটর পদে যোগদান। পারিবারিক পরিবেশে সংস্কৃতিচর্চার সূত্রপাত। পঞ্চাশে দশকে কুমিল্লার 'দি গ্রেট ভারনাল থিয়েটার' তাঁর নেতৃত্বে সক্রিয় হয়। কামাল রহমানের প্রযোজনায় ঢাকায় 'যে নদী মরুপথে' (১৯৬১) ছবি পরিচালনার মাধ্যমে চিত্রজগতে পদার্পণ। এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য তাঁর। 'সূর্যস্নান' (১৯৬২) ও লোকগাঁথা 'রূপবান' (১৯৬৫) চিত্র নির্মাণের জন্য খ্যাতিমান। উর্দু ছবির ভিড়ে 'রূপবান' বাংলা ছবির উদ্ধারকারী হিসেবে খ্যাত। 'সালাহউদ্দিন চিত্রকল্প' নামে চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। তাঁর পরিচালিত ও প্রযোজিত অন্যান্য চলচ্চিত্র: 'ধারাপাত' (১৯৬৩), '১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন' (১৯৬৬) ও 'আলোমতি' (১৯৬৯) এবং প্রযোজিত-পরিবেশিত চিত্রাবলী 'কাঞ্চনমালা' (১৯৬৭), 'নিশি হলো ভোর' (১৯৬৮), 'বিন্দু থেকে বৃত্ত' (১৯৭০), 'মানুষ অমানুষ' (১৯৭০), 'রাজমুকুট' (১৯৭০), 'জয়বাংলা' (১৯৭২), 'নিমাই সন্ন্যাসী' (১৯৭২), 'গান গেয়ে পরিচয়' (১৯৭২), 'মেঘের অনেক রং' (১৯৭৬)। ১৯৬৫-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'পাকিস্তান চলচ্চিত্র উৎসব' ও 'আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এর অন্যতম আয়োজক। ষাটের দশকে পাকিস্তান চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি ও 'চলচ্চিত্রকার পরিষদ'-এর গঠনে ভূমিকা পালন। ১৯৬৮-এ 'পাকিস্তান গ্রামোফোন কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা। এই কোম্পানির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১-এর ৭ মার্চের ভাষণ, 'জয় বাংলার জয়' সহ অনেক দেশাত্ববোধক এবং জনপ্রিয় বাংলা গান ও লোকসংগীতের রেকর্ড প্রকাশ করা হয়। দেশ-বিদেশের অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা প্রাপ্ত। মৃত্যু. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ২৬ অক্টোবর ২০০৩।

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)॥ জন্ম.



তেঁতুলিয়া গ্রাম, খুলনা, ১৯১৯। কবি, সংগীত রচয়িতা, নাট্যকার ও সাংবাদিক। পিতা সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমীর পেশা ছিল কৃষি ও ব্যবসায়। পিতৃব্য সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী (কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও অবিভক্ত বঙ্গেও লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির ডেপুটি স্পিকার)। স্থানীয় তালা বি.দে. ইনস্টিটিউশন থেকে মেট্রিক পাস (১৯৩৬)। কিছুকাল কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়ন। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। প্রথম দিকে কলকাতায় 'দৈনিক নবযুগ'-এ সাংবাদিকতা। কলকাতার টালিগঞ্জ নিবাসী এম. সেনের কন্যা পুষ্প সেন (বিবাহোত্তর নাম নার্গিস খাতুন)-এর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ (১৯৪৬)। জীবনের শেষ দিকে মাতুল-কন্যা কাজী রোজীকে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ (১৯৭১)। দেশভাগের (১৯৪৭) পর ১৯৫০-এ কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। রেডিও পাকিস্তানে চাকরি গ্রহণ। ১৯৫৩-তে দৈনিক ইত্তেফাকে'র সহযোগী সম্পাদক, ১৯৫৪-তে দৈনিক মিল্লাতের প্রধান সম্পাদক এবং ১৯৫৭-১৯৭০ পর্যন্ত মাসিক 'সমকাল' (সেপ্টেম্বর

১৯৫৭) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৫৮-তে 'সমকাল মুদ্রায়ণ' নামে একটি ছাপাখানা ও 'সমকাল প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনালয় স্থাপন। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি সংস্কৃতিচর্চার যে ধারা প্রবাহিত হয় তার একজন পৃষ্ঠপোষক। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সে পদক্ষেপের বিরোধিতা (জুন ১৯৬৭)। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তৎকালীন স্বাধীনবাংলা সরকারের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' তাঁর রচিত এ গান তখন মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ অনুপ্রাণিত করে। তাঁর কবিতায় যুগযন্ত্রণা বলিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত। একজন বিপ্লবকামী কবি হিসেবে অসংখ্য গণসংগীত লিখে খ্যাতি অর্জন। রচিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম– কবিতাঃ প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), বৈরীবৃষ্টিতে (১৯৬৫), তিমিরান্তিক (১৯৬৫), কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮), বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১)। নাটকঃ শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮), সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫), মহাকবি আলাওল (১৯৬৫)। উপন্যাসঃ মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), পূরবী (১৯৪৪), নতুন সকাল (১৯৪৫)। গল্পগ্রন্থঃ মতি আর অশ্রু (১৯৪১)। কিশোর উপন্যাসঃ জয়ের পথে (১৯৪২), নবী কাহিনী (জীবনী, ১৯৫১)। অনুবাদঃ রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম (১৯৬৬), সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), বারনাড মালামুডের যাদুর কলস (১৯৫৯), সিংয়ের নাটক (১৯৭১)। গানঃ মালব কৌশিক (১৯৬৯)। ১৯৬৬-তে নাটকে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। সিকান্দার আবু জাফর শুধু কবি হিসিবেই খ্যাত নন, সাহিত্য মাসিক 'সমকাল'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশে আধুনিক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সমকালের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু. ৫ আগস্ট ১৯৭৫।

সিরাজউদ্দৌলা (১৭৩৩-১৭৫৭)॥ জন্ম. মুর্শিদাবাদ, ১৭৩৩। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। প্রকৃত নাম মীর্যা মুহম্মদ। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব আলীবর্দী খাঁ তাঁর মাতামহ এবং আলীবর্দীর ভ্রাতা হাজী আহমদ তাঁর পিতামহ। নবাব আলীবর্দীর পুত্র সন্তান ছিল না। সিরাজের



জন্মের পরেই আলীবর্দী বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি সিরাজকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। ১৯৪৮-এ সিরাজের পিতা পাটনার নবাব যইনুদ্দীন আহমদ আফগান বিদ্রোহীর হাতে নিহত হলে সিরাজ মাতামহের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করেন। বিহারে শান্তিস্থাপন করে আলীবর্দী সিরাজকে পাটনার নবাব নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি বালক বলে মুর্শিদাবাদে মাতামহের নিকট থাকেন। এবং রাজা জানকীরাম বিহারে তাঁর প্রতিনিধি হন। সিরাজের পনের বছর বয়সে আলীবর্দী তাঁকে নিজের উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। আলীবর্দীর মৃত্যুর পর ১৭৫৬-এর ১০ এপ্রিল মনসুরুলমূলক সিরাজউদ্দৌলা শাহ কুলী খান মীর্জা মুহাম্মদ হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর নাম ধারণ করে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ। ঢাকার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার বিধবা পত্নী আলীবর্দীর অন্যতম কন্যা ঘসেটি বেগম এবং পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা আলীবর্দীর অন্যতম দৌহিত্র শওকত জঙ্গ সিরাজের সিংহাসন আরোহণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। সিরাজ তাদের দমন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মতিঝিল আক্রমণ করে সিরাজ ঘসেটি বেগমকে বন্দী করেন। ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে তাঁর বিরোধ শুরু হয়। ইংরেজগণ নবাবের বিনা অনুমতিতে কলকাতায় দুর্গ সংস্কারে হাত দেয়। বারবার তাগিদের পরও তারা দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গল না। তারা নবাবের শত্রু রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে কলকাতার দুর্গে আশ্রয় দেয়। নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে ১৭৫৬-এর জুন মাসে ইংরেজদের কাসিমবাজার কুঠি অধিকার করেন। এতে বাধ্য হয়ে ইংরেজগণ মুচলেকা পত্রে স্বাক্ষর করে দুর্গ প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলতে, দেশীয় লোকদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করতে এবং বিনা শুল্কে বাণিজ্য করে রাজকোষের যে ক্ষতি করেছে তা পূরণ করতে। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি এই মুচলেকাপত্রের শর্ত পালন না করায় নবাব সসৈন্য কলকাতা আক্রমণ করেন এবং ২০ জুন ১৭৫৬-তে কলকাতা জয় করেন। এর নাম রাখেন আলীনগর। এরপর

সিরাজউদ্দৌলা তাঁর মাসতুত ভাই পূর্ণিয়ার শাসক শওকত জঙ্গের বিদ্রোহ দমন করতে যাত্রা করেন। ১৭৫৬-এর ১৬ অক্টোবর, নবাবগঞ্জের নিকট মণিহারীর যুদ্ধে শওকত জঙ্গ পরাজিত ও নিহত হলে সিরাজ পূর্ণিয়া অধিকার করেন। ইংরেজ কোম্পানি মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভের অধীনে একদল সৈন্য ও ওয়াটসনের অধীনে এক নৌবহর কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠায়। ১৭৫৭-এর ২ জানুয়ারি ক্লাইভ বিনাযুদ্ধে কলকাতা অধিকার করেন। এই সংবাদ পেয়ে সিরাজ ক্লাইভের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ১৭৫৭-এর ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতা শহরতলীতে পৌঁছে আমীর চাঁদের বাগানে শিবির স্থাপন করেন। ১৭৫৭-র ৪ ফেব্রুয়ারি কুয়াশাচ্ছন্ন প্রাতঃকালে ক্লাইভ সিরাজের শিবির আক্রমণ করেন। সিরাজউদ্দৌলা ক্লাইভের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধি আলীনগরের সন্ধি নামে খ্যাত। সন্ধির শর্তানুসারে ইংরেজরা পূর্ব যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, বঙ্গদেশে বিনাশুল্কে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা এবং দুর্গ নির্মাণের অধিকার লাভ করে। এদিকে হীনস্বার্থের লোভে জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, মানিক চাঁদ, ইয়ার লতিফ প্রমুখ প্রধান অমাত্য নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। ইংরেজগণও ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। ক্লাইভ আলী নগরের সন্ধিভঙ্গ করে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ১৭৫৭-এর ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশী নামক স্থানে নবাবের সঙ্গে ক্লাইভের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মীরজাফর প্রমুখ সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকায় ইংরেজদের জয় হল। পরাজিত হয়ে সিরাজউদ্দৌলা পলায়ন করেন এবং কয়েকদিন পর রাজমহলে ধৃত হয়ে মুর্শিদাবাদে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। এইভাবে দেশি ও বিদেশি বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তের ফলে সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়। দেশাত্মবোধের দিক থেকে সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা বাংলার সিংহাসনের মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। মৃত্যু. ২ জুলাই ১৭৫৭।

সিরাজ শাহ (১৭৫০-১৮১৯)॥ জন্ম. হরিশপুর গ্রাম, হরিণাকুণ্ডু, ঝিনাইদহ, ১৭৫০। মরমি সাধক। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। ঘরে বসে নিজের চেষ্টায় সামান্য আরবি ও বাংলা শেখেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে যৎসামান্য পৈতৃক সম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে গেলে সংসারনির্বাহের জন্যে পালকি বহনের কাজে আত্মনিয়োগ। সাধক জীবনের প্রতি বাল্যকাল থেকেই প্রগাঢ় অনুরাগ থাকায় সুযোগ পেলেই বিভিন্ন ধর্মসভায় যোগদান করতেন এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তাঁদের কথা শুনতেন এবং সে সব কথা গভীরভাবে চিন্তা করতেন। পরে শাহ্ আগর মানিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও পালকি বাহকরূপে গুরুর কাছেই অবস্থান। কিছুকাল পর গৃহে প্রত্যাবর্তন, কিন্তু নিজের কথা বাইরে প্রকাশ না করায় অজ্ঞেয় বেহারারূপে পরিচিত। লালন শাহ্ তাঁর সংস্পর্শে এলে তাঁর সাধক জীবনের পূর্ণতা আসে এবং লালন শাহ্-র গুরু হিসেবে পরিচিত হন। মৃত্যু. ১৮১৯।

সিরাজ শিকদার (১৯৪৪-১৯৭৫)॥ জন্ম. রাজবাড়ি, শরীয়তপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪। রাজনীতিবিদ। সার্কেল অফিসার আবদুর রাজ্জাক শিকদার তাঁর পিতা। ১৯৫৯-এ বরিশাল জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এসসি. পাস করে ঢাকা



প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। ১৯৬৭-তে কৃতিত্বের সঙ্গে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ছাত্র থাকাকালে প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন-এ যোগদান। ১৯৬৫-তে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট (১৯৫৪-তে বেআইনি ঘোষিত) পার্টির ঢাকা জেলা কমিটির কংগ্রেসে (গোপন) ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান। ১৯৬৭-তে ছাত্র ইউনিয়ন [মেনন গ্রুপ]-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি পদে নির্বাচিত। কর্মজীবনের শুরুতে সি.অ্যান্ড.বি.-তে চাকরি গ্রহণ। তিন মাস পর সরকারি চাকরি ছেড়ে 'ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড' নামক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়ে টেকনাফ গমন। ১৯৬৮-র ৮ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলন'। ১৯৬৮-র শেষের দিকে চাকরি ছেড়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। 'মাও-সে-তুঙ

গবেষণাকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা। কিন্তু জামাতে ইসলামী দলের জোর দাবির মুখে আইয়ুব সরকার-কর্তৃক গবেষণাকেন্দ্রটি বন্ধ ঘোষণা। সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালু রাখার জন্যে ১৯৭০-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার টেকনিক্যাল ট্রেনিং কলেজে প্রভাষকরূপে যোগদান। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করার পর পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদের পক্ষ থেকে ২৩ এপ্রিল সংগঠনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত দলিলে গ্রামাঞ্চলে কিভাবে সর্বহারা রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি লিপিবদ্ধ করেন। ৩০ এপ্রিল ১৯৭১-এ বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠিতে পূর্ববাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী গঠন। যুদ্ধের মাঝেই ৩ জুন স্বরূপকাঠির পেয়ারাবাগানে শ্রমিক-কৃষকদের রাজনৈতিক দল 'পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি' গঠন। স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল বিতর্কিত। তাঁর দল একই সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। ১৯৭২-এর ১৪ জানুয়ারি সর্বহারা পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত। তিনি কমিটির সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৭২-এর মার্চ দলের নতুন রাজনৈতিক দলিল প্রণয়ন। ১৯৭৩-এর ২০ এপ্রিল এগারোটি গণ-সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট'। তিনি এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত। স্বাধীনতা উত্তরকালে মুজিব-সরকারের (১৯৭২-১৯৭৫) বিরোধিতা। ১৯৭৪-এর ২৮ ডিসেম্বর তদানীন্তন সরকার দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে আত্মগোপন। ১৯৭৫-এর ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামের হালি শহরে গোয়েন্দাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারবরণ এবং বিমানযোগে ঢাকা আনয়ন। ২ জানুয়ারি সাভারের রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে প্রেরণকালে পথে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু। সিরাজ শিকদার বৈপ্লবিক রাজনৈতিক সংগঠক। পূর্ববাংলায় সর্বহারার রাজত্ব কায়েমের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ। তাঁর মৃত্যুর পর এই আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। তিনি ছিলেন কবি। একটি কবিতার বই আছে। মৃত্যু. সাভার, ঢাকা, ১৯৭৫।

সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী (১৯০১-১৯৭৯)॥ জন্ম. কাসিমপুর গ্রাম, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা, ২২ অক্টোবর, ১৯০১। লোকসাহিত্যের গবেষক। পিতা মোহাম্মদ নবী বকস দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম। ৯/১০ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটলে কেন্দুয়ার নরেন্দ্রনগর গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ। নরেন্দ্রনগর মিডল ইংলিশ স্কুল থেকে মাইনর পাস করে আশুজিয়ার জগন্নাথ



চক্রবর্তী ইনস্টিটিউশনে ভর্তি। এ স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। দারিদ্র্যজনিত কারণে স্কুলের পাঠ ত্যাগ। রঘুনাথপুর পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত। নেত্রকোণা গুরু ট্রেনিং স্কুল থেকে জি.টি. এবং ঢাকা নর্মাল স্কুল থেকে টিচারশিপ সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। নেত্রকোণা শহরের নিকটবর্তী বলি জুনিয়র মাদ্রাসার হেডপণ্ডিতের পদে যোগদান (১৯২৯)। ১৯৩১-এ মোহনগঞ্জ হাই স্কুলের ভার্নাকুলার টিচার পদে নিযুক্তি লাভ। পরবর্তীকালে জামালপুর গুরু ট্রেনিং স্কুলে, ঢাকা প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এবং ময়মনসিংহ প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সংলগ্ন প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। ১৯৬৫-তে শিক্ষকতার কর্ম থেকে অবসরগ্রহণ। লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক, গবেষক ও বিশ্লেষক হিসেবে খ্যাত। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে লোকসংগীত, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা প্রভৃতি অমূল্য রত্নরাজি সংগ্রহ করে সেগুলোর যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তাঁর পাণ্ডিত্যের ছাপ বিদ্যমান। প্রকাশিত গ্রন্থ: লোকসাহিত্যে ছড়া (১৯৬২), লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ (১৯৬৮), বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি (১৯৭৩)। সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের তমঘা-ই-খিদমত উপাধি গ্রহণ। প্রবন্ধ ও গবেষণার জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৭৬)। মৃত্যু. কাসিমপুর গ্রাম, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯।

সিরাজুদ্দীন হোসেন (১৯২৯-১৯৭১)॥ জন্ম. শরশুনা গ্রাম, শালিখা, মাগুরা, ১ মার্চ ১৯২৯। সাংবাদিক। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। তিন-সাড়ে তিন বছর বয়সে পিতৃহীন হন। ঝিকরগাছা স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৪৩), যশোর মধুসূদন কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৪৫) ও কলকাতা

ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৪৭) পাস।



বি.এ. পরীক্ষা দেয়ার পর কলকাতায় দৈনিক আজাদের (১৯৩৬) বার্তা বিভাগে শিক্ষানবিস সাংবাদিক হিসেবে যোগদান। কিছুকাল পর সিনিয়র সাব-এডিটর পদে উন্নীত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর ১৯৪৮-এ আজাদ কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে এর সহকারী বার্তা-সম্পাদক নিযুক্ত। কালক্রমে এ পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক পদে উন্নীত। ১৯৫৪-তে একটি সংবাদ প্রকাশকে উপলক্ষ করে আজাদ কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরি থেকে বাদ দেয়। ফ্রাংকলিন পাবলিকেশনে জুনিয়র এডিটর হিসেবে যোগদান। একই বছর (১৯৫৪) দৈনিক ইত্তেফাকে (২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩) বার্তা-সম্পাদক পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৬৬-র জুন মাসে আইয়ুব সরকার ইত্তেফাক বন্ধ করে দিলে সংবাদ প্রতিষ্ঠান পি.পি.আই.-এর ব্যুরো চিফ হিসেবে যোগদান। ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পুনরায় ইত্তেফাক প্রকাশিত হলে পি.পি.আই. পরিত্যাগ করে ইত্তেফাকে বার্তা-সম্পাদক পদে ফিরে আসেন। ১৯৭০-এ উক্ত পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক পদে উন্নীত। সৎ, সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে খ্যাত। হৃদয়স্পর্শী শিরোনাম, সংবাদ নির্বাচন, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইত্তেফাক যে মুনশিয়ানার পরিচয় দেয় তার মূলে ছিল সিরাজুদ্দীন হোসেনের অবদান। শোষিত-বঞ্চিত বাঙালির দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য ইত্তেফাকে 'মঞ্চে নেপথ্যে' কলামে অকুতোভয়ে লেখনী পরিচালনা। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ও অমিততেজ দৃষ্টিভঙ্গি এ দেশের মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। দেশ প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা সৃষ্টিতে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির পন্থানুসারী হিসেবে পরিচিত। ষাটের দশকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ববাংলায় যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তার একজন তাত্ত্বিক। ইত্তেফাকে শিশু-অপহরণ সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লিখে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠনে ১৯৫০-এ আজাদে ও ১৯৬৪-তে ইত্তেফাকের মাধ্যমে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। দুইবার সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচিত সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন। কয়েকখানা গ্রন্থেরও প্রণেতা। 'ছোট থেকে বড়', 'মহিয়সী নারী', 'ইতিহাস কথা কও', 'The Days Decisive' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সাংবাদিকতায় বিশিষ্ট অবদান রাখায় একুশে পদক (মরণোত্তর) লাভ (১৯৭৭)। মৃত্যু. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে (১৯৭১) অধিকৃত ঢাকায় ইত্তেফাকে দুঃসাহসিক সম্পাদকীয় লেখার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন নানাভাবে, অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন মুজিবনগর সরকারের কাছে। তাঁর এ দেশপ্রেমমূলক ভূমিকা তাঁর জীবনকে সংকটাপন্ন করে তোলে। দেশ স্বাধীন হবার মাত্র ছ'দিন পূর্বে (১০ ডিসেম্বর ১৯৭১) পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসর আলবদর বাহিনীর কয়েকজন সদস্য তাঁকে তাঁর চামেলীবাগের (ঢাকা) বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেন নি।

সিরাজুল হক খান (১৯২৪-১৯৭১)॥ জন্ম. সাতচকিয়া গ্রাম, নোয়াখালী, ১ জানুয়ারি ১৯২৪। শিক্ষাবিদ। স্থানীয় ফুলগাজী হাইস্কুল থেকে ১৯৩৯-এ মেট্রিক, ফেনী কলেজ থেকে ১৯৪১-এ আই.এ. ও ১৯৪৩-এ বি.এ. পাস। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ১৯৪৯-এ বি.এড. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৬৫-তে এম.এড. এবং যুক্তরাষ্ট্রের নর্দার্ন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭-তে এড.ডি. (ডক্টরেট অব এডুকেশন) উপাধি লাভ। কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ১৭ বছর বিভিন্ন সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ১৯৬৮-র ১১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত। সিরাজুল হক ছিলেন একজন খ্যাতনামা পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা। তিনি স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড-



কর্তৃক অনুমোদিত বহু ইংরেজি, বাংলা ও ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন কৃতী শিক্ষক, মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তার অধিকারী। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগী আলবদর বাহিনীর সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাস থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে।

সিলভ্যাঁ লেভি (১৮৬৩-১৯৩৫)॥ জন্ম. প্যারিস, ২০ মার্চ ১৮৬৩। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ, গবেষক, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের 'একোল্ দ্য ওৎ জেত্যুদ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮৮৩-তে স্নাতক পাস। এখানে ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিত অধ্যাপক আবেল্ বের্গেঞ্রন্-এর কাছে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা অধ্যয়ন। স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর বের্গেঞ্রন্-এর অধীনেই গবেষণা শুরু এবং তার প্রাথমিক ফলস্বরূপ কাশ্মীরি কবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'বৃহৎ কথামঞ্জরী' সম্পর্কে সুদীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধ প্যারিস-এর এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র 'জনার্ল আজিয়াতিক্'-এ প্রকাশিত (১৮৮৫)। ১৮৮৬-তে অধ্যাপক বের্গেঞ্রন্-এর সহকারী হিসেবে একোল্ দ্য ওৎ জেত্যুদ (Ecole de Hautes Etudes) কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত এবং গুরুর মৃত্যুর (১৮৮৯) পর প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ লাভ। ১৮৯০-তে ভারতীয় নাটক বিষয়ে গবেষণা সন্দর্ভের জন্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ। ১৮৯৪-তে কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এ সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত, এই পদটিতে তাঁর পূর্বসূরি ছিলেন অধ্যাপক দ্য শেজি-এর ন্যায় ইউরোপের অগ্রগণ্য সংস্কৃত পণ্ডিত। লেভির কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র ক্রমশ ভারতবর্ষ থেকে বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। বৈদিক সাহিত্য অন্বেষণ থেকে সরে এসে বৌদ্ধ সাহিত্য ও ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের ইতিহাস জানার জন্য তিনি তিব্বত ও চীন ভাষা শিখতে শুরু করেন। চীনা ভাষা ও সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এদুয়ার শাভান-এর তত্ত্বাবধানে অচিরেই এ দুটি ভাষার ব্যুৎপত্তি অর্জন। ১৮৯৭-তে গবেষণার উপাদান সংগ্রহের জন্য ভারত, নেপাল, ইন্দোচীন ও জাপান ভ্রমণ। এরই ফলস্বরূপ নেপাল বিষয়ে তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থ (১৯০৫-১৯০৮) প্রকাশিত হয়। এই বই অদ্যাবধি নেপাল সম্বন্ধীয় সর্বশ্রেষ্ঠ আকর গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে আসছে। ১৮৯৮-তে 'একোল্ দ্য ওৎ জেত্যুদ' প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত। ১৮৯৯-তে ফরাসি সরকারের সহায়তায় সায়গনে 'একোল ফ্রঁসেজ দেসঁক্রিম ওরিয়' নামে দূরপ্রাচ্য সম্পর্কে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান কম্বোজের নম্‌পেন শহরে সক্রিয়। ১৯১০-এ তাঁর শিষ্য পল পেলিও মধ্য এশিয়ায় গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে দুষ্প্রাপ্য বহু মূল্যবান পুথি নিয়ে আসেন। সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে ব্রাহ্মী লিপিতে রচিত কিছু পুঁথির পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে লেভি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'তুখারিয়া' নামে একটি বিস্তৃত ভাষা আবিষ্কার করেন। ১৯২০-তে প্যারিসে লেভির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ হয় এবং কবির অনুরোধে ১৯২১-এ লেভি সস্ত্রীক বিশ্বভারতীতে আসেন। এখানে পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে তাঁর অধ্যাপনাকালে বিশ্বভারতীতে ভারতবিদ্যা ও চীনা-তিব্বতি ভাষা অনুশীলনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বিশ্বভারতী ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভাষণ দেন। ১৯২২-এ দুটি ভাষণই যথাক্রমে Ancient Indian ও Eastern Humanism নামে সম্পৃক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত। ১৯২২-এর আগস্ট মাসে কলকাতা ত্যাগ করে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে প্রথমে নেপাল গমন ও অনেক পুঁথি সংগ্রহ। এরপরে জাপানের টোকিও ও কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রনে সেখানে বক্তৃতা প্রদান। ১৯২৩-এ স্বদেশে ফিরে গেলে ফরাসি সরকার-কর্তৃক 'লেজিওঁ দ্যনর' বা নাইট উপাধিতে ভূষিত। ১৯২৬-এ দ্বিতীয়বার জাপানে আসেন ও 'মেজ' ফ্রাঁকো-জাপানেজঁ' অর্থাৎ জাপ-ফরাসি ভবন নামে বৌদ্ধ ধর্ম ও সভ্যতা বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে দুবছর তা পরিচালনা। এ ছাড়া বৌদ্ধ বিশ্বকোষ সম্পাদনার কাজেও এ সময়ে হাত দেন। দুবছর জাপানে অবস্থানকালে যবদ্বীপ, বালি প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ। বালিদ্বীপ থেকে সংগৃহীত পুঁথি পরে 'স্যান্সক্রিট্ টেক্সট্ ফ্রম বালি' নামে প্রকাশ (১৯৩২)। ১৯২৯-এ পুনর্বার ভারত ও নেপাল ভ্রমণে আসেন। এ যাত্রাতেও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এ বছরেই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অ্যাস্তিত্যুদ সিভিলিজাসিওঁ অ্যাঁথিয়েন' নামে ভারত-সংস্কৃতি বিষয়ক এক গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন। সারাজীবন প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় নিজে যেমন উৎসর্গিত প্রাণ ছিলেন তেমনি স্বদেশ-বিদেশে একদল সুযোগ্য শিষ্যমণ্ডলীও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সহকর্মী ও শিষ্যবর্গের মধ্যেই বন্ধু,

জুল ব্লক, ডক্টর কালিদাস নাগ, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রথিতযশা। গ্রন্থাবলি: Grande Encyclopedia (১৮৮৯), Le Theatre India (১৮৯০), Le Nepal (৩য় খণ্ড-১৯০৫-১৯০৮), সম্পাদনা: Hobougirin (Encyclopedia Dictionary of Buddhism) (১৯২৯-১৯৩৫) ইত্যাদি। মৃত্যু. প্যারিস, ৩০ অক্টোবর ১৯৩৫।

সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪)॥ জন্ম. কলকাতা, ১০ এপ্রিল ১৮৯৫। কথাশিল্পী। আদি নিবাস পাঠকপাড়া, বাঁকুড়া। প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতা। বিশিষ্ট লেখিকা শান্তা দেবী তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নি। সাংবাদিক পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে কাটান জীবনের প্রথম তেরো বছর। এলাহাবাদে প্রধানত গৃহশিক্ষকের কাছেই শিক্ষালাভ। বাড়িতে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে লালিত। ১৯০৮-এ এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় গমন। কলকাতায় বেথুন স্কুল থেকে ১৯১২-তে মেট্রিক এবং ১৯১৬-তে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস। ১৯১২-তে শান্তা দেবীর সঙ্গে মিলিতভাবে 'সংযুক্তা দেবী' নামে হিন্দুস্তানি উপকথার বঙ্গানুবাদ করেন। ১৯১৭-তে পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আগমন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের অন্যদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ। ১৯২৩-এ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সুধীরকুমার চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে প্রায় ছয় বছর রেঙ্গুনে কাটান। ছাত্রাবস্থায় সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট। তখন থেকেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় গল্প লেখা শুরু। মূলত উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: ব্রজমান (১৯১৮), ছায়াবীথি (১৯১৯), পথিকবন্ধু (১৯২০), আলোর আড়াল (১৯২১), রজনীগন্ধা (১৯২১), সোনার খাঁচা (১৯২৭), পরভৃতিকা (১৯৩০) ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের জীবনের উপর রচিত স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'পুণ্যস্মৃতি'। শান্তাদেবীর সঙ্গে মিলিতভাবে লেখেন: উদ্যানলতা (১৯১৯)। এ ছাড়া নিজের ও শান্তাদেবীর গল্পের ইংরেজি অনুবাদ 'টেলস অফ বেঙ্গল' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ। ১৯৬০-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে সভানেত্রিত্ব করেন। তাঁর রচনা এককালে বাঙালি পাঠক সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মৃত্যু. ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৪।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)॥ জন্ম. মাতুলালয়, মহিম হালদার স্ট্রিট, কালীঘাট-কলকাতা, আগস্ট ১৯২৬, (৩০ শ্রাবণ ১৩৩৩)। কবি। পৈতৃক নিবাস কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ। নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুনীতিদেবীর দ্বিতীয় পুত্র। এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য (১৯৪৫)। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য। সেকালের দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতার' কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক। বামপন্থী বিপ্লবী কবি হিসেবে খ্যাত। শোষিত মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের হুংকার তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত। রচিত কবিতাগ্রন্থ: 'ছাড়পত্র' (১৯৪৭), 'ঘুম নেই' (১৯৫০), 'পূর্বাভাস' (১৯৫০), 'অভিযান' (১৯৫৩), 'হরতাল' (১৯৬২) ও 'গীতিগুচ্ছ' (১৯৬৫)। ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের পক্ষে 'আকাল' (১৯৪৪) নামক কবিতাগ্রন্থ সম্পাদনা। সুকান্তের কবিতা প্রকৃতপক্ষে গণ-আন্দোলনের সংগ্রামী মানুষের চিত্ত-চেতনার সঙ্গে নিবিড় একাত্মতায় বিলীন। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাঁর কবিতা বাঙালিদের মনে শক্তি ও সাহস যোগায়। মাত্র ২১ বছর বয়সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন। মৃত্যু. যাদবপুর টি.বি. হাসপাতাল, ১৪ মে ১৯৪৭, (২৯ বৈশাখ ১৩৫৪)।



সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)॥ জন্ম. মসুয়া গ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর, ১৮৮৭। শিশুসাহিত্যিক। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও শিশুতোষ পত্রিকা 'সন্দেশ' (১৯১৩) প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর পিতা। কলকাতা সিটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। সে সময়



থেকে নাটক অভিনয় ও ছোটদের হাসির নাটক রচনায় যত্নবান হন। 'ননসেন্স ক্লাব' প্রতিষ্ঠা। ক্লাবের মুখপাত্র ছিল 'সাড়ে-বত্রিশ ভাজা'। রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বি.এসসি. ডিগ্রি লাভ। ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং টেকনোলজিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহনের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন স্কলারশিপ পেয়ে ইংল্যান্ড গমন (১৯১১)। ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল অফ টেকনোলজি থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে এফ.আর.পি.এস. ডিগ্রি লাভ (১৯১৩)। দেশে প্রত্যাবর্তন করে পিতার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইউ.আর. অ্যান্ড সন্স কোম্পানিতে যোগদান। উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর (১৯১৫) পরে এর পরিচালক নিযুক্ত। 'মানডে ক্লাব' প্রতিষ্ঠা। 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা (১৯১৫-১৯২৩)। বাংলা শিশুসাহিত্যের বিশিষ্ট শিল্পী : অনুপম ভাষায় গল্প, নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে শিশুদের মন জয়। এ-সকল রচনার সঙ্গে মুদ্রিত তাঁর আঁকা ছবিগুলোও অতুলনীয়। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'আবোল-তাবোল' (১৯২৩), 'হ-য-ব-র-ল' (১৯২৪), 'পাগলা দাশু' (১৯৪০), 'বহুরূপী' (১৯৪৪), খাইখাই' (১৯৫০) প্রভৃতি বই বাংলা শিশুতোষ সাহিত্যের অমর সৃষ্টি। সুগায়ক ও সুঅভিনেতা হিসেবেও খ্যাত। অস্কার পুরস্কার (১৯৯২) প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২) তাঁর পুত্র। মৃত্যু. কলকাতা, কালাজ্বরে, ১৯২৩।

সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৯০১। পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ। পৈতৃক নিবাস পোতান গ্রাম, বর্ধমান। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯১৭), বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আই.এ. (১৯১৯), কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে



সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. (১৯২১) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম.এ. (১৯২৩) পাস স্নাতক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ (১৯২৪)। 'Historical Syntax of Indo-Aryan' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ (১৯৩৭)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ও পুনার ডেকান কলেজে অধ্যাপনা ১৯৫৪-তে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের খয়রা অধ্যাপক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পদে উন্নীত। ১৯৮২-তে স্কুল অব দ্রাবিড়িয়ান ইনস্টিটিউশনের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক নিযুক্ত। বাঙ্গালা সাহিত্যের সুবিস্তৃত, সুশৃঙ্খল, তথ্যসমৃদ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন। ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের বিশ্লেষক হিসেবেও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (১৯৩৯), বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ-১৯৪০, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ-১৯৪২, দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৪৩, তৃতীয় খণ্ড-১৯৪৬, চতুর্থ খণ্ড-১৯৫৮), বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (১৯৪১), বিচিত্র সাহিত্য (১৯৫৬), চর্যাগীতি পদাবলী (১৯৫৬), ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯৫৮), পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ (১৯৫৫), ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬২), History of Brajabuli Literature (১৯৩৫), Old Persian Inscriptions of the Akhaemenian Emperors (১৯৪১), History and Pre-History of Sanskrit (১৯৫৯), History of Bangali Literature (১৯৫৯)। মৃত্যু. কলকাতা, ৩ মার্চ ১৯৯২।

সুখরঞ্জন সমাদ্দার (১৯৩৮-১৯৭১)॥ জন্ম. বানরীপাড়া, বরিশাল, ১৫ জানুয়ারি ১৯৩৮। শিক্ষাবিদ। স্থানীয় বাইশহারী স্কুল থেকে ১৯৫২-তে মেট্রিক, বরিশাল বি.এম. কলেজ থেকে ১৯৫৪-তে আই.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭-তে



সংস্কৃতে বি.এ. অনার্স ডিগ্রি লাভ। ১৯৫৮-১৯৫৯ পর্যন্ত গোপালগঞ্জ কলেজে অধ্যাপনা। ১৯৫৯-এ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। তিনি ছিলেন কৃতী অধ্যাপক, মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার অধিকারী। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ১৪ এপ্রিল পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টার থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং নৃশংসভাবে হত্যা করে।

সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৮৮৬। শিশুসাহিত্যিক। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। কলকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স ও বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. পাস। স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর কিছুকাল শিক্ষকতা। ১৯০৭-এ উড়িষ্যার ড. জয়ন্ত রাওয়ের সঙ্গে বিবাহ। স্বামী জয়ন্ত রাওয়ের সঙ্গে সমাজসেবায় অবদান রাখার জন্য 'কাইজার-ই-হিন্দ' পদক লাভ। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় 'আলোক' নামক একটি পত্রিকা নিজ সম্পাদনায় প্রকাশ। বাংলা ও ইংরেজিতে মোট কুড়িটি গ্রন্থের রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: আরো গল্প (১৯১৬), খোকা এলো বেড়িয়ে (১৯১৬), গল্প আর গল্প, গল্পের বই (১৯১২), নতুন ছড়া (১৯৫২), নানান গল্প (১৯৬৯), নিজে পড়ো (১৯৫৬), নিজে শেখো (১৯৫৭), নতুন পড়া (১৯২২), বিদেশি ছড়া (১৯৬২), সোনার ময়ূর, স্বাস্থ্য (তৃ. সং-১৯২৫), লালিভূলির দেশে (১৯৫৭), খেলার পড়া (১৯৬১), নানান দেশের রূপকথা, পথের আলো, ঈশপের গল্প, হিতোপদেশের গল্প, New Steps ইত্যাদি। 'নিজে পড়ো' গ্রন্থের জন্য ১৯৫৬-তে ভারত সরকার কর্তৃক সাহিত্য পুরস্কার প্রদান। ইংরেজিতে রচিত তাঁর কবিতা গ্রন্থ: Living Lights। চিত্রশিল্পে দক্ষতা ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থে নিজের আঁকা ছবি স্থান পেয়েছে। মৃত্যু. ৯ জুলাই ১৯৬৯।

সুখেন্দু চক্রবর্তী (১৯২৩-১৯৮০)। ঠাকুরপাড়া,



কুমিল্লা, ১৯২৩। পিতৃভূমি চান্দিনা, আড়িখোলা ঠাকুরবাড়ি জমিদার পরিবারে। গণসংগীত শিল্পী ও সুরকার। ডাক নাম খোকা। হরসুন্দরী ও নলিনী কুমার চক্রবর্তী কনিষ্ঠ পুত্র। ঈশ্বর পাঠশালা থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও সংগীতের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের ইতি। নীলিমা চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিণয় (১৯৫৪)। পারিবারিক পরিমণ্ডলে শিল্পীজীবনের সূচনা। প্রথমে ওস্তাদ সমরেন্দ্র পাল, পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী সত্যেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী এবং ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম গ্রহণ। এস্রাজ, সেতার ও তবলাবাদনে পারদর্শী। মূলত আধুনিক গানের শিল্পী হলেও গণসংগীতকে প্রাধান্য। বহু গণসংগীতের সুরারোপ। ব্রিটিশ হটাও (১৯৪২) আন্দোলনে কারাবরণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন নাহার হলের সংগীত শিক্ষক। 'যে নদী মরুপথে', 'দৃষ্টি' ও 'ফান্দে পড়িয়া বগা' প্রভৃতি ছায়াছবির সংগীত পরিচালক। বাংলাদেশ বেতারের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সংগীত প্রযোজক। ভাষা আন্দোলন, পূর্ব পাকিস্তান আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক সম্মেলন (কুমিল্লা, ১৯৫৫), কাগমারী সম্মেলন (১৯৫৭), ঢাকায় অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনে সংগীতের মাধ্যমে অভূতপূর্ব সাড়া জাগান। ষাট ও সত্তরের দশকে ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভূমিকা পালন। উনসত্তরের গণআন্দোলনে জাগরণী ভূমিকা। কচি-কাঁচা মেলার প্রাদেশিক শিক্ষা শিবির (মুন্সীগঞ্জ ১৯৬৫, কুমিল্লা ১৯০৬৮) এবং জাতীয় শিক্ষা শিবিরে (ঢাকা ১৯৭৪) আগত বন্ধুদের সংগীত শিক্ষাদান। কচি-কাঁচা মেলা-পরিচালিত সংগীতশিক্ষা কেন্দ্র 'সুরবিতান' পরিচালনা। উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর উপদেষ্টা ও আফ্রো-এশিয়া গণসংহতি পরিষদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুরে প্রাদেশিক পরিষদ-সদস্য ক্যাপ্টেন সুজাত আলীকে প্রধান উপদেষ্টা ও সুখেন্দু চক্রবর্তীকে সভাপতি করে 'স্বাধীন বাংলা মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক সংঘ' গঠন। জনগণের মনোবল বৃদ্ধি ও দেশকে স্বাধীন করার দীপ্তমন্ত্রে উজ্জীবনের লক্ষ্যে দল নিয়ে শরণার্থী শিবির, মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবিরাম জাগরণী গান পরিবেশন। তৃতীয় রবীন্দ্রসংগীত মেলা অভ্যুদয় পদক (২০০০), কচি-কাঁচা মেলা সুবর্ণজয়ন্তী সম্মাননা (২০০৬), কুমিল্লা পূর্বাশা ও কচি-কাঁচার মেলা চল্লিশ বছর পূর্তি উৎসব সম্মাননা, জাগরণের গান সম্মাননা (২০০৯), বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংস্কৃতিক উৎসব সম্মাননা (২০১০) লাভ। সংস্কৃতিসাধক। মৃত্যু. কুমিল্লা, ৭ জুলাই ১৯৮০।

সুচরিত চৌধুরী (১৯৩০-১৯৯৪)॥ জন্ম. কদুরখিল গ্রাম, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, ২১

জানুয়ারি ১৯৩০। সংগীতশিল্পী ও



কথাসাহিত্যিক। পিতা আশুতোষ চৌধুরী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকগীতিকা সংগ্রাহক)। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিক পাস। পঞ্চাশের দশকে চলন্তিকা রায়, শুধু চৌধুরী, সুরাইয়া চৌধুরী প্রভৃতি ছদ্মনামে গল্প-কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন। একই সময়ে বংশীবাদক হিসেবেও প্রশংসা লাভ। ঢাকা বেতারে প্রথম বংশীবাদন (১৯৫৪)। রেডিও পাকিস্তান করাচি কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী (১৯৫৫-১৯৫৬)। চট্টগ্রাম বেতারের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এর নিয়মিত শিল্পী। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত মাসিক সীমান্ত, সাপ্তাহিক রেনেসাঁ ও মাসিক উদয়ন এবং করাচি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক দিগন্তের সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: শুধু চৌধুরীর সেরা কবিতা (১৯৫১), সুরাইয়া চৌধুরীর শুধু গল্প (১৯৫২), আকাশে অনেক ঘুড়ি (১৯৬১), একদিন একরাত (১৯৬৬), সুচরিত চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮০), সুচরিত চৌধুরীর নির্বাচিত গল্প (১৯৯২), নদী নির্জন নীল (১৯৯২), কিংবদন্তীর গল্প: চট্টগ্রাম (১৯৯৩)। গানের সংকলন: সুরলেখা (১৯৬৮); অনুবাদ: নানা। সমাজের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনাচরণ তাঁর গল্পে নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত। ছোটগল্পে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৭৬)। মৃত্যু. চট্টগ্রাম, ৫ জানুয়ারি ১৯৯৪।

সুচিত্রা মিত্র (১৯২৪-২০১১)॥ জন্ম. ঝাড়খণ্ডের



ডিহিরী জংশন লাইনে শালবন ঘেরা গুঝাণ্ডি নামে একটি রেলস্টেশনের কাছে, ট্রেনের কামরায়, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৪। কণ্ঠশিল্পী। পিতা সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক; মাতা সুবর্ণলতা দেবী। পৈত্রিক নিবাস ছিল উত্তর কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে। কলকাতার বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে পাঠগ্রহণ। এখানে পড়ার সময় গানের চর্চা শুরু হয় দুই শিক্ষক অমিতা সেন এবং অনাদিকুমার দস্তিদারের কাছে। পরে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, শৈলজারঞ্জন মজুমদার এবং শান্তিদেব ঘোষের কাছে সংগীতশিক্ষা। ছেলেবেলায় তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ সাহচর্য লাভ করেছিলেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গেও সংযুক্তি। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি বিশেষ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৯৪১-এ ক্লাস টেন-এ পড়ার সময় শান্তিনিকেতনের সংগীত ভবন থেকে বৃত্তি লাভ করেছিলেন। ১৯৪২-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার মায়া পরিত্যাগ করে তিনি শান্তিনিকেতন চলে যান;-এর মাত্র কুড়ি দিন আগে রবীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হয়েছিলেন। ১৯৪৩-এ শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। ১৯৪৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে ইন্টারমিডিয়েট পাস। একই বছর রবীন্দ্র সংগীতে ডিপ্লোমা লাভ করেন। এরপর স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে সম্মান-সহ বিএ পাস। পরে বাংলায় এমএ পাস। ১৯৪৭-এর ১ মে ধ্রুব মিত্রের সঙ্গে বিয়ে। ১৯৫৫-এ বিচ্ছেদ। ১৯৬৩-এ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান। 'রবীন্দ্রসংগীত বিভাগের' প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালন। ১৯৮৪-এ তিনি রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপনা থেকে থেকে অবসর। ১৯৪৫-এ ২১ বছর বয়সে প্রথম গানের রেকর্ড প্রকাশিত। প্রায় চারশত রবীন্দ্রসংগীতে কণ্ঠদান এবং রেকর্ড প্রকাশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে নির্মিত উমাপ্রসাদ মৈত্রের 'জয়বাংলা' এবং মৃণাল সেনের 'পদাতিক'-এ অভিনয় করেছেন। মুক্তধারা, বিসর্জন, তপতী, নটীর পূজা, মায়ার খেলা, চিরকুমারসভা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাটকে অভিনয়। পুরস্কার: লন্ডন টেগোর হিম সোসাইটি প্রদত্ত টেগোর হিম প্রাইজ (১৯৪৫), নিখিলবঙ্গ সংগীত সম্মেলনে স্বর্ণপদক (১৯৫০), ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মশ্রী সম্মান (১৯৭৪), পঙ্কজ মল্লিক স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৯), এইচএমভি প্রদত্ত গোল্ডেন ডিস্ক অ্যাওয়ার্ড (১৯৮০), সংগীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার (১৯৮৫), এশিয়ান পেইন্টস প্রদত্ত শিরোমণি পুরস্কার (১৯৮৫), বর্ধমান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক ডি.লিট. (১৯৯০), বিশ্বভারতী প্রদত্ত দেশিকোত্তম (১৯৯৭), পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত আলাউদ্দিন পুরস্কার (১৯৯৭), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক ডি.লিট. (১৯৯৭), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক ডি.লিট. (১৯৯৭), কলকাতার শেরিফ (২০০১)। ১৯৪৬-এ কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীতের স্কুল 'রবিতীর্থ' স্থাপন করেন। ১৯৯৫-এ আত্মকথা 'মনে রেখো' প্রকাশিত। মৃত্যু. কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ২০১১।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)॥ জন্ম. হাতীবাগান, কলকাতা, ৩০ অক্টোবর ১৯০১। কবি ও প্রাবন্ধিক। প্রখ্যাত দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর পিতা। মাতা ইন্দুমতী বসুমল্লিক। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত কাশীর থিয়সফিক্যাল হাইস্কুলে শিক্ষা লাভ।



১৯১৮-তে কলকাতা ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯২২-এ স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ডিস্টিঙ্কশনসহ বি.এ. পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য ও আইন অধ্যয়ন (১৯২২-১৯২৪)। কিন্তু কোনো বিষয়েই পরীক্ষা দেননি। ১৯২৪-এ শ্রীমতী ছবি বসুর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। এক বছর পর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। পিতার 'ল' ফার্মে কিছুদিন শিক্ষানবিশি ছিলেন, কিন্তু পেশা হিসেব গ্রহণ করতে পারেননি। 'লাইট অব এশিয়া ইন্সিওরেন্স'-এ কিছুদিন কর্মসম্পাদন। ১৯২৯-এর ফেব্রুয়ারি-ডিসেম্বরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ। ১৯৩১-এ 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনা। ১২ বছর 'পরিচয়'-এর সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত। 'স্টেটসম্যান' ও শরৎচন্দ্র বসুর 'লিটারারি' কাগজে কিছুদিন দায়িত্ব পালন। 'ফরওয়ার্ড' ও 'সবুজপত্র' পত্রিকার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৩-এর ২৯ মে রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পী রাজেশ্বরী বসুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৫৭-থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। ১৯৫৯-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তিরিশোত্তর বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মননের চর্চা ও নাগরিক বিদগ্ধতা তাঁর কাব্যে সর্বত্র বিরাজমান। ইউরোপীয় কাব্যান্দোলনের রীতিধারাকে বাংলা কাব্যে সার্থকভাবে প্রয়োগ। তিনি স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল এবং তাঁর কাব্যভাষা ও রচনাশৈলী নবাগত কবিদের অনুসরণীয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রধান পরিচয় তিনি বঙ্গদেশে আধুনিক কবিতার প্রধান প্রবক্তা। তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধকে আধুনিক বাংলা কবিতার ইশতেহার হিসেবে গণ্য করা চলে। কবিতা গ্রন্থের সংখ্যা সাত: তন্বী (১৯৩০), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫৩), প্রতিদিন (১৯৫৪), দশমী (১৯৫৬)। ইউরোপীয় বিভিন্ন কবির কবিতার অনুবাদ গ্রন্থ: প্রতিধ্বনি। গদ্যগ্রন্থ দুটি: স্বগত (১৯৩৮), কুলায় ও কালপুরুষ (১৯৫৭)। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ করেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত হতে পেরেছিলেন। শুধু কবি হিসেবে নয়, একজন বিদগ্ধ সমালোচক ও সম্পাদক হিসেবেও স্মরণীয় হয়ে আছেন। মৃত্যু. ২০ জুন ১৯৬০।

সুধীরলাল চক্রবর্তী (১৯১৬-১৯৪৯)॥ জন্ম. ফরিদপুর, ১৯১৬। সুরকার ও সংগীতজ্ঞ। সুপণ্ডিত ও সংগীতরসিক পিতার পৃষ্ঠপোষকতায় বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসতো। ফলে ছোটবেলা থেকে সংগীত শিক্ষার অনুপ্রেরণা লাভ। সংগীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ। আধুনিক, রাগপ্রধান, গজল, ঠুমরী প্রভৃতি গানে পারদর্শী। সুদক্ষ সুরকার। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ঢাকা বেতারকেন্দ্রের সংগীত পরিচালক। তাঁর গাওয়া ও সুরারোপিত বহু গ্রামোফোন রেকর্ড বের হয়েছে। মৃত্যু. ১৯৪৯।

সুনির্মল বসু (১৯০২-১৯৫৭)॥ জন্ম. গিরিডি, ২০ জুলাই ১৯০২। কবি ও শিশুসাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস মালখানগর, মুন্সীগঞ্জ। ১৯২০-এ পাটনা থেকে মেট্রিক পাস করে কলকাতার সেন্টপলস কলেজে ভর্তি। কিছুকাল পর গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-১৯২২) ডাকে কলেজের পাঠ ত্যাগ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আর্ট কলেজেও



কিছুকাল পড়াশুনা। প্রথম কবিতা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত। কবিতা, ছড়া, গল্প, কাহিনী, উপন্যাস, রূপকথা, ভ্রমণকাহিনী, কৌতুকনাট্য প্রভৃতি বিষয়ে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী সাহিত্য রচনা। প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই 'হাওয়ার দোলা'। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ছানাবড়া, বেড়ে মজা, হৈচৈ, হুলুস্থুল, কথা শেখা, পাততাড়ি, মরণের ডাক, ছন্দের টুংটাং, আনন্দ লড়ু, শহুরে মামা, কিপটে ঠাকুর্দা, বীর শিকারী, কবিতা শেখা, ছন্দের গোপন কথা, আমার ছড়া, পাহাড়ে জঙ্গলে, জীবন খাতার কয়েক পাতা ইত্যাদি। তখনকার একমাত্র শিশুপাক্ষিক 'কিশোর এশিয়া'র পরিচালক। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি। ১৯৫৬ সাল 'ভুবনেশ্বরী' পদক লাভ। মৃত্যু. ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭)॥



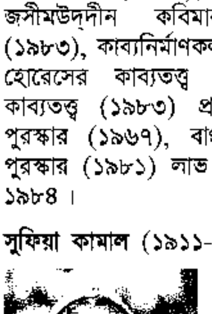
জন্ম. শিবপুর, হাওড়া, ২৬ নভেম্বর ১৮৯০। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত। ইংরেজের সদাগরি অফিসের কেরানি হারিদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতা। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। মতিলাল শীল ফ্রি স্কুল থেকে ১৯০৭-এ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে কুড়ি টাকা বৃত্তি লাভ। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১১-তে ইংরেজিতে অনার্সসহ প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. পাস। ১৯১৩-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে ইংরেজিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। এরপর কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত। পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। ১৯১৯ পর্যন্ত এ পদে কর্মরত। ১৯১৮-তে সংস্কৃতের শেষ পরীক্ষায় পাস এবং প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও জুবিলি গবেষণা পুরস্কার অর্জন। ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ১৯১৯-এ ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিলেত গমন; লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা লাভ। ১৯২১-এ ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই 'ইন্দো-আরিয়ান ফিললজি' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ডি.লিট. উপাধি লাভ। লন্ডনে থাকাকালে ধ্বনিতত্ত্ব, ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষাতত্ত্ব, প্রাকৃত ও ফারসি সাহিত্য, পুরনো আইরিশ, পুরনো ইংরেজি ও গোথিক ভাষার উপরে পড়াশুনা। লন্ডন থেকে প্যারিস যান। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লাভ ও ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সগডিয়ান ও প্রাচীন খোতানী ভাষা, গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার ইতিহাস এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়াটিক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন। ১৯২২-এ দেশে ফিরে এলে স্যার আশুতোষ কর্তৃক ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের 'খয়রা' অধ্যাপক নিযুক্ত। দীর্ঘ ত্রিশ বছর এ পদে কর্মরত। অধ্যাপক তারাপুরওয়ালার কাছে আবেস্তা অধ্যয়ন। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে 'The Origin and Development of the Bengali Language' (3 Vols) গ্রন্থখানি রচনা করে অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান। ১৯২৭-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণসঙ্গী হয়ে মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি ও শ্যামদেশ পরিভ্রমণ। এই সব দেশে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান। ১৯৫২-তে এমিরিটাস প্রফেসর নিযুক্ত। ১৯৩৫-এ লন্ডনে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব ফোনেটিক্স দ্বিতীয় অধিবেশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব। ১৯৩৬-এ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত। ১৯৫০-এ লন্ডনের সোসাইটি অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স এবং ১৯৫৫-তে অসলোর নরওয়েজিয়ান অ্যাকাডেমির সদস্য পদ লাভ। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে বহাল। ১৯৬৯-এ সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি নির্বাচিত। হিন্দিভাষায় বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৪৮-এ 'সাহিত্য বাচস্পতি' উপাধি লাভ। ১৯৩৬-এ ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত। ১৯৬৬-তে জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান লাভ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক 'ভাষাচার্য' উপাধি প্রদান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: The Origin and Development of the Bengali Language, Bengali Phonetic Reader, কিরাত জনকৃতি, ভারত সংস্কৃতি, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পশ্চিমের যাত্রী, ইউরোপ ভ্রমণ, জাতি সংস্কৃতি সাহিত্য, ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা, সংস্কৃতি

কী, দ্বীপময় ভারত, রবীন্দ্রসঙ্গমে, শ্যামদেশ ইত্যাদি। মৃত্যু. কলকাতা, ২৯ মে ১৯৭৭।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২৭-১৯৮৪)॥ জন্ম. দুলুখণ্ড গ্রাম, ইদিলপুর, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর ১৭ মার্চ ১৯২৮। পৈতৃক নিবাস দাসের জঙ্গল, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর। সাহিত্যিক, অনুবাদ ও শিক্ষাবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭-তে প্রথম শ্রেণিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮১-তে 'কবি জসীমউদ্‌দীনের কবিমানস ও কাব্যসাধনা' বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ১৯৫৮-১৯৬৪ পর্যন্ত বিভিন্ন কলেজে বাংলা সাহিত্যের শিক্ষকতা। ১৯৬৪-তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৭২-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান। অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়ে আমৃত্যু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: জসীমউদ্‌দীন (১৯৬৭), আধুনিক রচনা (১৯৬৮), কবি ফররুখ আহমদ (১৯৬৯), মোজাম্মেল হক (১৯৭০), মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ (১৯৭০), সাহিত্যসমীক্ষা (১৯৭৬), জসীমউদ্‌দীন কবিমানস ও কাব্যসাধনা (১৯৮৩), কাব্যনির্মাণকলা: এরিস্টটল (১৯৭৬), হোরেসের কাব্যতত্ত্ব (১৯৭৯), লুঙ্গিউনুসের কাব্যতত্ত্ব (১৯৮৩) প্রভৃতি। দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৭), বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ২৭ মে ১৯৮৪।



সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)॥ জন্ম বরিশাল, ২০ জুন, ১৯১১। কবি, সংগঠক, নারীনেত্রী। বাবা সৈয়দ আবদুল বারী ছিলেন পেশায় আইনজীবী। মা সাবেরা বেগম। সাত বছর বয়সে পিতৃহারা হন। মায়ের কাছে শিক্ষার হাতেখড়ি। বারো বছর বয়সে সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে বিয়ে। আধুনিকমনস্ক নেহাল হোসেন স্ত্রী সুফিয়া কামালকে সাহিত্যপাঠে উৎসাহিত করেন। বেগম রোকেয়ার লেখা তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। সাহিত্যপাঠের পাশাপাশি সাহিত্য রচনার শুরু। ১৯২৬-এ প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' সে-সময়ের প্রভাবশালী সাময়িকী 'সওগাতে' প্রকাশিত। ত্রিশের দশকে কলকাতায় অবস্থানকালে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র যেমন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র প্রমুখের দেখা পান। মুসলিম নারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামে' রোকেয়ার সঙ্গে সুফিয়া কামালের পরিচয়। বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারা ও প্রতিজ্ঞা তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়, যা তাঁর জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা চলতে থাকে। ১৯৩৭-এ গল্পের সংকলন 'কেয়ার কাঁটা' প্রকাশিত। ১৯৩৮-এ প্রথম কাব্য 'সাঁঝের মায়া'র মুখবন্ধ লিখেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৩২-এ স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। সংসার সামলাতে কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু এবং ১৯৪২ পর্যন্ত এ পেশায় নিয়োজিত। ১৯৩৯-এ কামালউদ্দীন আহমেদের সঙ্গে বিয়ে। দেশবিভাগের পূর্বে নারীদের জন্য প্রকাশিত সাময়িকী 'বেগমে'র সম্পাদক হন। ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের পর সপরিবার ঢাকায় আগমন। ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং এতে অংশ নেয়ার জন্য নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ। ১৯৫৬-এ শিশুদের সংগঠন 'কচিকাঁচার মেলা' প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা হোস্টেলকে 'রোকেয়া হল' নামকরণের দাবি জানান। ১৯৬১-এ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধের প্রতিবাদে সংগঠিত আন্দোলনে যুক্ত। এ বছর 'ছায়ানটে'র সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৬৯-এ 'মহিলা সংগ্রাম কমিটি'র সভাপতি নির্বাচিত, গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রদত্ত তমঘা-ই-ইমতিয়াজ পদক বর্জন। ১৯৭০-এ 'মহিলা পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭১-এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের মিছিলে নেতৃত্বদান। মুক্তিযুদ্ধের সময় ধানমণ্ডির বাসভবন থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তাদান। স্বাধীন বাংলাদেশে নারীজাগরণ আর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উজ্জ্বল



ভূমিকা পালন। ১৯৯০-এ স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়েছেন, কার্ফ্যু উপেক্ষা করে নীরব শোভাযাত্রা বের করেছেন। মুক্তবুদ্ধির পক্ষে এবং সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপক্ষে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশগ্রহণ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: কাব্য: 'চাঁদের মায়া' (১৯৩৮), 'মায়া কাজল' (১৯৫১), 'মন ও জীবন' (১৯৫৭), 'শান্তি ও প্রার্থনা' (১৯৫৮), 'উদাত্ত পৃথিবী' (১৯৬৪), 'দিওয়ান' (১৯৬৬), 'মোর জাদুদের সমাধি পরে' (১৯৭২); গল্প: 'কেয়ার কাঁটা' (১৯৩৭), ভ্রমণকাহিনী: 'সোভিয়েতে দিনগুলি' (১৯৬৮); স্মৃতিকথা: 'একাত্তরের ডায়েরি' (১৯৮৯)। পুরস্কার: ৫০টির বেশি পুরস্কার লাভ। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: স্বাধীনতা দিবস পদক (১৯৯৭), একুশে পদক (১৯৭৬), বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২), সোভিয়েত লেনিন পদক (১৯৭০), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯২), জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার (১৯৯৫), দেশবন্ধু সি আর দাশ গোল্ড মেডেল (১৯৯৬) প্রভৃতি। মৃত্যু. ঢাকা, ২০ নভেম্বর ১৯৯৯।

সুফী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯-১৯৮৭)॥ জন্ম.



ভাতুরিয়া গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৯ নভেম্বর ১৮৯৯। কবি। স্থানীয় শিবপুর মাইনর স্কুল থেকে মধ্যইংরেজি পরীক্ষায় পাস করে বিদ্যাকোট উচ্চইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি। মেট্রিক পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় গমন (১৯১৭)। সেনাবাহিনীতে যোগদান। বোম্বাই-এ ট্রেনিং গ্রহণের পর প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) অংশগ্রহণের জন্য বাগদাদ যান। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বাগদাদে ব্রিটিশ বাহিনী ভেঙে দেয়া হলে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন (১৯১৯)। ব্রিটিশ মালিকানাধীন ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড কোম্পানিতে (কলকাতা) ট্রাভেলিং সুপারভাইজার পদে চাকরি গ্রহণ। কার্যোপলক্ষে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন শহর, মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ এবং এশিয়ার শ্রীলংকা ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধু। ১৯৪২-এর ১০ জুলাই নজরুল ইসলাম রোগাক্রান্ত হলে রুগ্ন কবির চিকিৎসা ও তাঁর পরিবার পরিজন দেখাশোনার দায়িত্বভার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আসেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় চৌদ্দ বছর ব্যাপৃত থাকার পর ১৯৬২-তে সমাজ জীবনে প্রত্যাবর্তন। চট্টগ্রামের হজরত শাহ সুফী আলহাজ মওলানা অলি আহমদ নিজামপুরী পির সাহেবের কাছ থেকে 'সুফী' আখ্যা লাভ। পাকিস্তানের ভাবাদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এ বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে (জুন ১৯৬৭) সরকারের সে পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। একজন বিশিষ্ট কবি। কাব্য সাধনার দিক থেকে কাজী নজরুল ইসলামের ভাবশিষ্য। সামাজিক অন্যায়-অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ তাঁর কবিতায় ভাষায়িত। ইসলামিক আদর্শের রূপায়ণ তাঁর কবিতার অপর গুণ। 'ভাঙ্গা তলোয়ার' (১৯৪৫), 'ফের বানাও মুসলমান' (১৯৫৯), 'বিপ্লব বিপ্লব দ্বিতীয় বিপ্লব' (১৯৭৫) প্রভৃতি সুফী জুলফিকার হায়দারের প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ। নজরুল গবেষণায় ও নজরুল বিষয়ক স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। তাঁর রচিত 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' (১৯৬৪) গ্রন্থখানি নজরুলের জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'নজরুল প্রতিভার পরিচয়' ও 'জাতীয় কবি নজরুল' তাঁর অপর দু'খানি নজরুল বিষয়ক গ্রন্থ। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'সিতারা-ই-খিদমত' উপাধি (১৯৭০), বাংলাদেশ সরকারের 'একুশের পদক' (১৯৭৮) ও নজরুল ইনস্টিটিউটের 'নজরুল স্মৃতি পুরস্কার' (১৯৮৫) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ২৩ এপ্রিল ১৯৮৭।

সুফী ফতেহ আলী নিযামপুরী (?-১৮৮৬)॥ জন্ম. নিযামপুরী পরগনা, চট্টগ্রাম। জন্মতারিখ অজ্ঞাত। ধর্মপ্রচারক ও কবি। শৈশবে মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ। ছাত্রজীবন শেষে অযোধ্যার তৎকালীন নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহের প্রাইভেট সেক্রেটারি এবং পরে পলিটিক্যাল পেনশন অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত। চাকরি উপলক্ষে সপরিবার কলকাতায় বসবাস

কর্মজীবনে কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলতেন। পীরের দেয়া বিধি-নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ এবং পরবর্তীকালে পীরের নিয়মানুসারে লোকজনকে মুরিদ করতেন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইসলামের খেদমতে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হন। তিনি শুধু পির ও ধর্ম সংস্কারক ছিলেন না, পণ্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান ছিল। এ ভাষার বিখ্যাত কবি। তাঁর কবিনাম ছিল 'ওয়েসী'। 'দিওয়ান-ই-ওয়েসী' নামে কবিতাগ্রন্থ রচনা। তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন আলেম ছিলেন. তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি বা কেরামতি সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। মৃত্যু. ১৮৮৬।

সুফী মোতাহার হোসেন (১৯০৭-১৯৭৫)॥ জন্ম. ভবানন্দপুর গ্রাম, ফরিদপুর, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯০৭। কবি। পুলিশ ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ হাশিম তাঁর পিতা। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে এফ.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (১৯৩১) পাস। সব পরীক্ষায়ই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। আই.এ. পাস করার পর পুলিশ সুপার সৈয়দ ইস্কান্দার মোহাম্মদ সেলিমের প্রথমা কন্যা আছিয়া খানমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর ফরিদপুর জজকোর্টে চাকরি গ্রহণ। দুই বছর চাকরি করার পর নিউরেস্থিনিয়া ও ডিসপেপশিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ বারো বছর শয্যাশায়ী থাকেন। রোগমুক্তির পর শিক্ষকতার কর্মে যোগদান। ফরিদপুর ঈশান ইনস্টিটিউশনে ২০ বছর শিক্ষকতা। কাজী নজরুল ইসলাম ও মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার ফলে কাব্যচর্চায় প্রেরণা লাভ। মূলত সনেট রচয়িতা এবং তাতেই তাঁর কবিপ্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পাদিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়' নামক গ্রন্থে সুফী মোতাহার হোসেনের 'দিগন্ত' শীর্ষক সনেটটি সংকলন করেন। প্রকৃতি, প্রেম ও মানবতা তাঁর সনেটে ধ্বনিত। 'সনেট সংকলন' (১৯৬৫), 'সনেট সঞ্চয়ন' (১৯



(১৯৭০) তাঁর কবিতাগ্রন্থ। আদমজী পুরস্কার (১৯৬৫), প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৭০) ও বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৪) লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ৭ আগস্ট ১৯৭৫।

সুবল দাস (১৯২৬-২০০৫)॥ জন্ম. ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬। পিতা রবীন্দ্রলাল দাস, মাতা কামিনী রায়। পুত্র সজল দাস সংগীত পরিচালনা করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্নদা হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাস। সংগীতে হাতেখড়ি শৈশবে পারিবারিক পরিবেশে। যন্ত্রসংগীত শিল্পী হিসেবে শিল্পীজীবন শুরু। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওস্তাদ ইসরাইল খাঁর সান্নিধ্য লাভ। পরে ওস্তাদ খাদেম হোসেন খাঁ ও ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর কাছ থেকে যন্ত্রসংগীতের ওপর তালিম গ্রহণ। ফতেহ লোহানীর 'আকাশ আর মাটি' (১৯৫৯) ছবির সংগীত পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্রে পদার্পণ হন। সংগীত পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে 'প্রীত না জানে রীত' (১৯৬৩), 'কাজল' (১৯৬৫), 'ইন্দন' (১৯৬৬), 'আলী বাবা' (১৯৬৭), 'পিয়াসা' (১৯৬৯), 'ভানুমতি' (১৯৬৯), 'তানসেন' (১৯৭০) 'স্বরলিপি' (১৯৭০), 'দর্পচূর্ণ' (১৯৭০), 'যোগবিয়োগ' (১৯৭০), 'আলো তুমি আলেয়া' (১৯৭৫), 'অনেকদিন আগে' (১৯৭৪), 'ঘরণী' (১৯৮১), পুত্রবধূ (১৯৮১), 'ভাঙাগড়া' (১৯৮১), 'চিৎকার' (১৯৮২), 'ঝুমুর' (১৯৮৩), 'গৃহলক্ষী' (১৯৮৪) প্রভৃতি। সুরারোপিত কালজয়ী গানের মধ্যে রয়েছে 'গানের খাতায় স্বরলিপি লিখে, 'সজনী গো ভালোবেসে', 'তুমি যে আমার কবিতা', 'আমি সাত সাগর পাড়ি দিয়ে', 'এই পৃথিবীর পান্থশালায়', 'শত্রু তুমি বন্ধু তুমি', 'যদি বউ সাজ গো', 'শিল্পী আমি তোমাদের গান শোনাব', 'এই বৃষ্টি ভেজা রাতে', 'যখন থামবে কোলাহল', 'চলে যায় যদি কেউ বাঁধন ছিঁড়ে', 'এ কি বাঁধনে বাঁধলে জড়ালে আমায়', 'তুম অচ্ছা কিয়া দিল না দিয়া' প্রভৃতি। তার পুত্র। মৃত্যু. ঢাকা, ১৬ আগস্ট ২০০৫



সুবীর রায়চৌধুরী (১৯৩৩-১৯৯৩)॥ জন্ম. পিতার



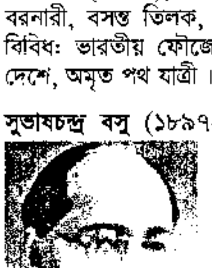
কর্মস্থল রেঙ্গুন, বার্মা, ১৯৩৩। লেখক। আদি নিবাস মূলঘর গ্রাম, খুলনা কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. (বাংলা) ডিগ্রি লাভ। নানা স্থানে শিক্ষকতা শেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান। পরবর্তীকালে রিডার পদে উন্নীত। গবেষণা, অনুবাদ ও সম্পাদনা কর্মে দক্ষতা প্রদর্শন। ছোটগল্পকার জগদীশ গুপ্তকে নতুনভাবে আবিষ্কার ও তাঁর সাহিত্যকর্মের বিশুদ্ধ মূল্যায়ন উপস্থাপন করে সুনাম অর্জন। চিরকুমার সুবীর রায়চৌধুরীর জ্ঞানস্পৃহার কথা সর্বজনবিদিত। কলকাতার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের অনুসন্ধানমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের সাহিত্য জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। গ্রন্থ: সে যুগের কিচ্ছা একালের ইতিহাসে (১৯৭০), বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশি থিয়েটার (১৯৭২), মেলা থেকে ঝামেলা (১৯৭৬), গোলন্দাজ থেকে গোয়েন্দা (১৯৮০), জজ থেকে জল্লাদ (১৯৯০), হেনরি ডিরোজিও: তাঁর জীবন ও সময় (১৯৯৩); সম্পাদনা: E.W.Madge, Henry Derogio: The European Poet and Reformer (1967), Raja Binayan Krishna Dev: Early History and Growth of Calcutta (1981); অনুবাদ–টোকোলোশ (১৯৮৬), নামালান (১৯৮৫)। সংকলন ও সম্পাদনা: পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প (১৯৫৯), বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (খণ্ড ১. ১৯৭৫), জগদীশ গুপ্তের গল্প (১৯৭৭), জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংগ্রহ (খণ্ড ১. ১৯৯১), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাসংগ্রহ (খণ্ড ১, ১৯৯২, খণ্ড ২, ১৯৯৩)। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯৯৩।

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০)॥ জন্ম. হাজারীবাগ, বিহার, ১৯০৯। কথাসাহিত্যিক। পিতা সতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, হাজারীবাগের স্থায়ী বাসিন্দা। হাজারীবাগ অন্নদা স্কুলে ও কলম্বাস



কলেজে বিদ্যাশিক্ষা। প্রথম জীবনে কখনো টিকা দেয়ার চাকরি, কখনো বাস-কন্ট্রাক্টরি, কখনো চাষের ও মিষ্টির দোকানদারি, কখনো সার্কাস পার্টিতে চাকরি, কখনো প্রেসে প্রুফরিডারের কাজ করে জীবিকানির্বাহ। পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক হন। ১৯৪৫-এ এ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে উন্নীত। গান্ধীবাদের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। বাংলা ছোটগল্পের একজন কুশলী শিল্পী হিসেবে খ্যাত। বিহার রাজ্যের জনজীবন তাঁর গল্প-উপন্যাসে নিপুণভাবে উপস্থাপিত। কাহিনীর মৌলিকতায়, বিষয়বৈচিত্র্যে এবং জীবনজিজ্ঞাসার গভীরতায় তাঁর কথাসাহিত্য এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। গ্রন্থ–গল্প: ফসিল (১৯৪১), পরশুরামের কুঠার (১৯৪১), শুক্লাভিসার (১৯৪৪), গ্রাম যমুনা, মণিকর্ণিকা, জতুগৃহ (১৯৫২), মনভ্রমর, থিরবিজুরী, কুসুমেষু, ভারত প্রেমকথা। উপন্যাস: তিলাঞ্জলী (১৯৪৪), গঙ্গোত্রী (১৯৪৭), ত্রিয়ামা, প্রেয়সী (১৯৫৭), শতকিয়া, সুজাতা, শুন বরনারী, বসন্ত তিলক, জিয়াভরলি, বাসবদত্তা। বিবিধ: ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস, কিংবদন্তীর দেশে, অমৃত পথ যাত্রী। মৃত্যু. ৯ মার্চ ১৯৮০।

সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫)॥ জন্ম. কটক,



২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭। পৈতৃক নিবাস চাংড়িপোতা, চব্বিশ পরগনা। বিপ্লবী ও রাজনীতিবিদ। 'নেতাজী' নামে সমধিক পরিচিত। পিতা আইনজীবী জানকীনাথ বসু, মাতা প্রভাবতী দেবী। কটকের সাহেবি প্রোটেস্টান্ট স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু। পরে র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসের দ্বারা তাঁর বিপ্লবী জীবন বিশেষ প্রভাবিত। ১৯১১-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি।

কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক ওটেন ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা প্রহৃত হলে ছাত্রদের নেতা সুভাষচন্দ্র কলেজ থেকে বহিস্কৃত। পরে স্যার অশুতোষের সহায়তায় স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৯-এ দর্শনে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণিতে বি.এ. পাস। এ সময়ে ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর থেকে প্রাথমিকভাবে সামরিক জ্ঞান লাভ। এরপর আই.সি.এস. পড়তে বিলেত গমন। মাত্র ছয় মাস পড়ে ১৯২০-তে চতুর্থস্থান অধিকার করে আই.সি.এস. হন। পওে মর‍্যাল সায়েন্সে কেম্ব্রিজ ট্রাইপস্ লাভ। দেশে ফিরে গান্ধীজীরঅসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে সিভিল সার্ভিসের চাকরি প্রত্যাখান। ১৯২১-এর ১৬ জুলাই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। গান্ধীজী তাঁকে চিত্তরঞ্জন দাশের পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে উপদেশ দেন। কিছুকাল কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের সম্পাদক ও জাতীয় কংগ্রেসের অধ্যক্ষ। এরপর বিপ্লবী জীবন শুরু। ১৯২১-এ প্রথম গ্রেফতারবরণ। ১৯২২-এ মুক্তিলাভের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯২৩-এ 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার ম্যানেজার ও সম্পাদক হন। এরপর মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে কাউন্সিলার হন। ১৯২৪-এর ২৩ এপ্রিল সর্বসম্মতিক্রমে কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত। ১৯২৪-এর অক্টোবর মাসে অন্তরীণ হন। প্রথমে কলকাতা, পরে বহরমপুর এবং ১৯২৬-এর ২৫ জানুয়ারি মান্দালয় জেলে প্রেরণ। জেলে অনশন করে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে ১৯২৭-এর ১৬ মে মুক্তিলাভ। সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। এরপর যুব সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯২৮-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন। এরপর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯২৯-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি। ১৯৩০-এ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত। একই বছর গান্ধীজির লবণ আইন আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেফতারবরণ। ১৯৩১-এ কারামুক্ত হয়ে গান্ধী-আরুইন চুক্তির প্রতিবাদ করেন। তৃতীয়বার বেঙ্গল রেগুলেশনে বন্দী হন। পরে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে ইউরোপ প্রেরণ। দেশে ফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ১৯৩৬-এ ফিরে এলে পুনরায় গ্রেফতার এবং এক বছর কারাভোগ। ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত, ১৯৩৯-এ পুনঃনির্বাচিত। দক্ষিণপন্থি কংগ্রেস জোটের বিরোধিতার মুখে ১৯৩৯-এর এপ্রিল মাসে পদত্যাগ। একই বছর (১৯৩৯) ৩ মে নতুন দল 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন। ১৯৪০-এ পুনরায় গ্রেফতার। কারাগারে অনশন করে মুক্তিলাভ। তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপে শঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার গৃহে অন্তরীণ রাখে। এই অবস্থায় পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ১৯৪১-এর ২৬ জানুয়ারি দেশ ত্যাগ। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে কাবুল হয়ে রাশিয়ায় গমন। জার্মানিতে এসে তৎকালীন জার্মান সরকারের আনুকূল্যে একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন। এরপর ইউরোপ থেকে সাবমেরিনযোগে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর পার হয়ে ১৯৪৩-এর ২ জুলাই সিঙ্গাপুর পৌছান। ১৯৪৩-এর ৪ জুলাই বিপ্লবী রাসবিহারী বসু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র সর্বময় কর্তৃত্ব সুভাষ বসুর হাতে সমর্পণ করেন। ১৯৪৩-এর ২১ অক্টোবর তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত। আজাদ হিন্দ ফৌজ-কর্তৃক জাপানি যুদ্ধজাহাজের সহায়তায় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল। ১৯৪৪-এ রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ সরকারের হেড কোয়ার্টারস স্থাপিত। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৪-এর ১৮ মার্চ ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাজিত করে ইম্ফল ও কোহিমার পথে দুটি ব্রিটিশ ঘাঁটি দখল। এ বছর ফরমোজার তাইহুকু বিমানঘাঁটিতে একটি বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ বসুর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচারিত। তাঁর রচিত বাংলা গ্রন্থ: 'তরুণের স্বপ্ন' এবং ইংরেজিতে লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী An Indian Pilgrim. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সূর্য সন্তান। স্বাধীনচেতা, সত্যনিষ্ঠ, দুঃসাহসী, নির্ভীক ও মহান দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে খ্যাত। মৃত্যু. ১৮ আগস্ট ১৯৪৫।

সুমিতা দেবী (১৯৩৬-২০০৪)॥ জন্ম. দক্ষিণখলি ধানকোড়া, মানিকগঞ্জ, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬। চলচ্চিত্র, মঞ্চ, বেতার ও টেলিভিশনের অভিনেত্রী, চিত্র প্রযোজিকা, মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজকর্মী। পিতা কুলেশ্বর ভট্টাচার্য ও মাতা শিবানী ভট্টাচার্য। প্রকৃত নাম হেনা ভট্টাচার্য। পরিচালক জহির রায়হানের সঙ্গে বিয়ের সময় নীলুফার বেগম নাম ধারণ। এফডিসি-র প্রথম

চলচ্চিত্র 'আসিয়া' (১৯৫৭-১৯৬০) এর মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্রে আগমন এবং সুমিতা দেবী নাম ধারণ। তিনি চিত্রজগতে 'ফার্স্ট লেডি' হিসেবে পরিচিত। তাঁর অভিনীত অন্যান্য উল্লেখ্য চলচ্চিত্র: 'আকাশ আর মাটি' (১৯৫৯), 'এদেশ তোমার আমার'(১৯৫৯), 'ধূপছাও' (১৯৬০), 'কখনো আসেনি' (১৯৬১), 'সোনার কাজল' (১৯৬২), কাঁচের দেয়াল' (১৯৬৩), 'এইতো জীবন' (১৯৬৪), 'সংগম' (১৯৬৪), 'তানহা' (১৯৬৪), 'বেহুলা' (১৯৬৬), ১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন', 'অভিশাপ' (১৯৬৭), 'আলীবাবা' (১৯৬৭), 'অপরিচিতা' (১৯৬৮), 'ওরা ১১জন' (১৯৭২), 'সূর্যকন্যা' (১৯৭৬), 'ডুমুরের ফুল' (১৯৭৮), 'ছোট মা' (১৯৭৯), 'নাগরদোলা' (১৯৭৯), 'স্মৃতি তুমি বেদনা' (১৯৮০), 'এতিম' (১৯৮০), 'জন্ম থেকে জ্বলছি' (১৯৮১), 'লাল সবুজের পালা' (১৯৮১), 'অংশীদার' (১৯৮৩), 'দুই পয়সার আলতা' (১৯৮২), 'দেবদাস' (১৯৮২), 'মোহনা' (১৯৮২), 'লালকাজল' (১৯৮২), 'আরশী নগর' (১৯৮৩) প্রভৃতি। তিনি 'মিতা ফিল্মস' নামে চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান গড়েন। তিনি নারী প্রযোজকদের মধ্যে অগ্রণী। তাঁর প্রযোজিত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৬৬), 'মোমের আলো' (১৯৬৮), 'মায়ার সংসার' (১৯৬৯), 'আদর্শ ছাপাখানা' (১৯৭০), 'নতুন প্রভাত' (১৯৭০), 'দেয়াল'। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন এবং পাক-মার্কিন আঁতাতের বিরুদ্ধে কলকাতার মিছিলে প্রতিবাদ করেন। 'কাঁচের দেয়াল'-এ অভিনয়ের জন্য পাকিস্তান চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী (১৯৬৫), 'সংগম' ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে 'নিগার', এফডিসি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতিসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননাপ্রাপ্ত। মৃত্যু: ঢাকা, ৬ জানুয়ারি ২০০৪।



সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ/দানী বাবু (১৮৬৮-১৯৩২)॥ জন্ম. উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চল, ১১ ডিসেম্বর ১৮৬৮। নট ও অভিনেতা। বাংলা নাট্যজগতে দানীবাবু নামে পরিচিত। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের একমাত্র পুত্র ও তাঁর নট-প্রতিভার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। বাল্যে কিছুকাল স্কুলে অধ্যয়ন, কিন্তু নাটকের নেশায় স্কুল ত্যাগ। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে থিয়েটারের দল গঠন। থিয়েটারে প্রথমে ঢোল বাজাতেন। ছবি আঁকায়ও পারদর্শী। পরে আর্ট স্কুলে ভর্তি। কিন্তু সেখানেও পড়াশুনা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। এরপর ব্ল্যাক উড অফিসে শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রবেশ। কিন্তু এক সময়ে শখের থিয়েটার গড়েন। ২৬ জুন ১৮৯০-তে অভিনেতা হিসেবে সর্বপ্রথম মঞ্চে অভিনয়। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য অর্থকষ্টে পড়েন। পরে অমৃতলাল মিত্রের চেষ্টায় স্টার থিয়েটারে ঢুকে অভিনয়ে দক্ষতা অর্জন। গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' নাটকে রঘুদেবের ভূমিকায় অভিনয় করে অসামান্য খ্যাতি লাভ। ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৩-এ গিরিশ ঘোষ অনূদিত 'ম্যাকবেথ' নাটকে ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয়। কলকাতার প্রায় সকল নাট্যমঞ্চেই অভিনয় করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) সময় সিরাজউদ্দৌলা নাটকে সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। ১৯১৮-তে বন্যার্তদের সাহায্যার্থে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ইচ্ছায় 'দুর্গেশ-নন্দিনী' নাটকে অভিনয় করেন। ২ অক্টোবর ১৯২৮-এ গিরিশ-স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় অভিনয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অভিনয়: চন্দ্রগুপ্তে চাণক্য, জনায় প্রবীর, সীতারামে গঙ্গারাম, রঞ্জাবতীতে বলাই, বলিদানে দুলালচাঁদ, কালাপাহাড়ে লাটু, স্বপ্নের ফুলে অধীর, করমেতী বাঈয়ে অলক এবং আর্ট থিয়েটারে আয়োজিত পোষ্যপুত্র নাটকে শ্যামাকান্তের চরিত্রে শেষ অভিনয়। মৃত্যু. ১৮ নভেম্বর ১৯৩২।



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫)॥ জন্ম. তালতলা, কলকাতা, ১০ নভেম্বর ১৮৪৮। রাজনীতিবিদ। কলকাতার খ্যাতনামা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতা। ডভটন কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে বিলেতে গমন। ১৮৬৯-এ আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কিন্তু

প্রকৃত বয়স সম্পর্কে সন্দেহ হওয়ায় তাঁকে



আই.সি.এস. হতে বাধা দেয়া হয়। তিনি আদালতের আশ্রয় নিয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ বলে স্বীকৃত হন। ১৮৭১-এ আই.সি.এস. হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। কর্মজীবনে প্রথমে সিলেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট হলেও একজন আসামিকে ফেরারি তালিকাভুক্ত করায় পদচ্যুত হন। ১৮৭৬-এ বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে যোগদান। পরে সিটি কলেজ ও ফ্রি চার্চ কলেজে অধ্যাপনা। ১৮৭৬-এ আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' গঠন। ১৮৮২-তে নিজের প্রতিষ্ঠিত রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা। ১৮৭৬-১৮৯৯ পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য, ১৮৮৫-তে উত্তর ব্যারাকপুরের মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান এবং ১৮৯৩-১৯০১ পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সংবাদদাতারূপে কর্মরত। ১৮৭৯-তে দৈনিক 'বেঙ্গলি' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। ১৮৮৩-তে একটি প্রবন্ধে আদালত অবমাননার জন্য কিছুদিন কারাদণ্ড ভোগ। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠার অন্যতম ব্যক্তিত্ব। ১৮৮৫-তে কংগ্রেস পুনা অধিবেশনে ও ১৯০২-এ আমেদাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব। ১৮৯০-তে জাতীয় কংগ্রেস পক্ষ থেকে অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে বিলেত যাত্রা। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে (১৯০৫-১৯১১) দেশব্যাপী আন্দোলন সংগঠন। এই স্বদেশি আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) তাঁর নির্ভীক নেতৃত্বে সমগ্র দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯০৬-এ বরিশালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা পরিচালনার অভিযোগে গ্রেফতারবরণ। ১৯০৯-এ বিলেতে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে প্রেস-সম্মেলনে যোগদান। ১৯১৩-তে কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯১৮-তে রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসের 'মডারেট' বা নরমপন্থি দলে যোগদান। এর ফলে জনপ্রিয়তা হারান। ১৯২৩-এ বাংলার আইন-সভার নির্বাচনে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পরাজিত। রাজনীতি থেকে অবসর। ১৯২১-এ ইংরেজি শাসন ব্যবস্থার সমর্থনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে দেশবাসীর কাছে নিন্দিত হন। ইংরেজ সরকারের 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত। তাঁর রচিত A Nation in Making নামক গ্রন্থখানি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান সংযোজন। ভারতের জাতীয়তার গুরু হিসেবে 'রাষ্ট্র গুরু'-রূপে আখ্যায়িত। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে মূল্যবান বক্তৃতা দিয়ে বাগ্মী হিসেবে পরিচিতি লাভ। মৃত্যু. ৬ আগস্ট ১৯২৫।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮)॥ জন্ম. জগন্নাথপুর, যশোর, ১৮৩৮। কবি। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। পিতা প্রসন্ননাথ মজুমদার। কলকাতায় ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন, হেয়ার স্কুল ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে শিক্ষা লাভ। বাল্যকাল থেকেই সংগীতের প্রতি অনুরাগী। সংস্কৃত, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় এবং দর্শন ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন। ১৮৮১ বঙ্গাব্দে মুঙ্গের গমন। সেখানে বিখ্যাত 'মহিলা' কাব্যের অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'নলিনী' পত্রিকায় নিয়মিত রচনা প্রকাশ। খ্যাতিলাভে অনীহা থাকায় জীবিতকালে প্রকাশিত গ্রন্থে নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। ১৮৮২-এ (১২৬৯) চৈত্রমেলা উপলক্ষে 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন পরিদর্শন' নামক রচনা প্রকাশ। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যকলা উচ্ছ্বাসবিহীন, যুক্তিনির্ভর ও দৃঢ়বদ্ধ। নারীবন্দনা ও মানবীয় প্রেম তাঁর কাব্যের ভাববস্তু। রচিত কাব্য: ষড়ঋতু বর্ণনা (১৮৫৬), সবিতা সুদর্শন (১৮৭০), বর্ষবর্তন (১৮৭২), মহিলা (১ম অংশ-১৮৮০), ২য় অংশ-১৮৮৩)। গদ্যগ্রন্থ: বিশ্বরহস্য (১৮৭৭)। অনুবাদ: রাজস্থানের ইতিবৃত্ত (১৮৭২-১৮৭৩); নাটক: হামির (১৮৮১)। মৃত্যু. ১৮৭৮।

সুরেন্দ্রলাল দাস (১৮৯২-১৯৪৩)॥ জন্ম. কাট্টলী গ্রাম, চট্টগ্রাম, ১৯ জানুয়ারি ১৮৯২। সংগীতশিল্পী ও সংগীত-সংগঠক। শৈশবেই সংগীত ও বংশীবাদনের মাধ্যমে সংগীত জগতে পরিচিতি অর্জন। ১৯২০-এ চট্টগ্রামের আর্য-সংগীত সমিতিতে (১৯০৬) যোগদান এবং সংগীত বিদ্যাপীঠের কাজ শুরু। বেহালা, সেতার প্রভৃতি দেশি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে চট্টগ্রামে 'আর্য সংগীত অর্কেস্ট্রা' (১৯২১) নামে একটি অর্কেস্ট্রা দল গঠন। ১৯২২-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে তাঁর পরিচালনায় দেশি বাদ্যযন্ত্র দিয়ে দেশি অর্কেস্ট্রা পরিবেশন করে আর্য সংগীত অর্কেস্ট্রা কলকাতা বেতার থেকে তাঁর

পরিচালনায় নিয়মিত অর্কেস্ট্রাবাদন প্রচার। কলকাতা বেতার যন্ত্রসজ্ঞ নামে আর একটি অর্কেস্ট্রা দল গঠন (১৯৩০)। ১৯৩৯-এ কলকাতার 'আওয়ার অর্কেস্ট্রা' দলে যোগদান। কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ। শিষ্যদের মধ্যে দক্ষিণামোহন ঠাকুর, প্রিয়গোপাল দাশগুপ্ত, প্রিয়দারঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু. ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৩।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৯৭০। পৈতৃক নিবাস আঁশমালী, নদীয়া। সাহিত্যিক ও সম্পাদক। পিতা গোপালচন্দ্র সমাজপতি, মাতা হেমাঙ্গী দেবী, স্ত্রী নলিনী দেবী। মাতামহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শৈশবে পিতৃবিয়োগ ঘটলে মাতামহের কাছে প্রতিপালিত। সে সময়ে



বিদ্যাসাগরের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা লাভ। বাল্যকালে পতাকা, সমাচার চন্দ্রিকা, সুরভি প্রভৃতি পত্রিকায় লেখা প্রকাশ। পরবর্তীকালে সম্পাদক হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন। ১৮৯০-এ প্রকাশিত 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। ১৮৮৯-এ 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামক পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। এ ছাড়া বসুমতী, সন্ধ্যা, নায়ক, বাঙালি প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা। স্বদেশি আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) সময় বাগ্মী হিসেবেও সুনাম অর্জন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর অন্যতম পরিচালক। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটা বিশেষ ধারার প্রবর্তক। এ ছাড়া সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যথেষ্ট। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গাত্মক ও সরস সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রচিত সাহিত্যকর্ম: কল্কিপুরাণ (১৮৮৬), সাজি (১৯০০), ছিন্নহস্ত (১৯১৫), আগমনী (১৯১৯), বঙ্কিম প্রসঙ্গ (১৯২১) প্রভৃতি গ্রন্থ। সুরেশচন্দ্র তৎকালীন সাহিত্যিক মহলে 'সমাজপতি' রূপে আখ্যায়িত। সম্পাদক হিসেবেও বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। মৃত্যু. ১ জানুয়ারি ১৯২১।

সুলতানউদ্দিন আহমেদ, অধ্যক্ষ (?-১৯৭১)॥ জন্ম. সরকারপাড়া গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ। চাঁদপুর স্কুলে শিক্ষালাভ। ১৯৫২-তে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এসসি. পাস। ১৯৫৯-এ ঢাকা আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল) পাস। ১৯৬৭-তে উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমন। ১৯৬৮-তে যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহামা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে M.S.in Technical Education-এ ডিগ্রি লাভ। কর্মজীবনে প্রথমে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর ইনস্ট্রাক্টর (সিভিল) হিসেবে নিযুক্তি লাভ। ১৯৬৫-তে ফরিদপুর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৯৬৮-র ৬ মার্চ যশোর পলিটেনিক ইনস্টিটিউট-এর অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে পাক সেনাবাহিনী তাঁর বাসভবনে ঢুকে তাঁকে এবং বাসার সমস্ত যুবকদের এক লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে, ৫ এপ্রিল ১৯৭১।

সুলেমান খান (১৯৩৯-১৯৭১)॥ জন্ম. সেকদি গ্রাম, চাঁদপুর, ১৯৩৯। শহীদ চিকিৎসক। ১৯৫৫-তে চাঁদপুর হাসান আলী হাই স্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৫৮-তে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই.এসসি. পাস করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি। ১৯৬৭-তে এম.বি.বি.এস. পাস। দু-বছর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ইন্টার্নি ডাক্তার হিসেবে কাজ করার পর টঙ্গি জুট মিলে চিকিৎসক হিসেবে যোগদান। কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। ১৯৬৯-এ গোপীবাগের তরুণদের নিয়ে 'তরঙ্গ' নামে একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা। একটি পাঠাগারও স্থাপন। 'তরঙ্গ' থেকে প্রকাশিত দুটি একুশের সংকলন 'শিখা' ও 'তরঙ্গ' সম্পাদনা। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে 'ছাত্র ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং এই সংগঠনের প্রচার সম্পাদক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গ্রামে পালিয়ে আসা আহত লোকদের চিকিৎসা এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান। এ জন্য মুসলিম লীগের পান্ডারা তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং পাকসেনাদের দোসর একদল দুষ্কৃতকারী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। মৃত্যু. ২৬ এপ্রিল ১৯৭১।

সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮)॥ জন্ম. কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ১৮৯০। শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। ডাক্তার সতীশচন্দ্র দে তাঁর পিতা। পিতার কর্মস্থল কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স

(১৯০৫) পাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে



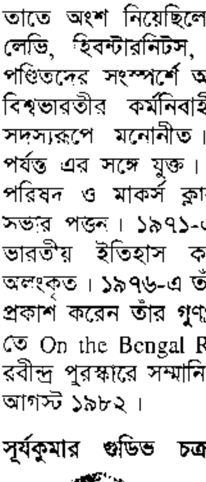
ভর্তি। এ কলেজ থেকে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় পাস করেন এবং বৃত্তি পান (১৯০৭)। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণির অনার্সসহ বি.এ. পাস (১৯০৯)। ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. (১৯১১) পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক ও পুরস্কার পান। ১৯১২-তে বি.এল. পাস। এই বছর কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯১৩ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি, ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যে অধ্যাপনা। ১৯১৫-তে গ্রিফিথ পুরস্কার ও ১৯১৭-তে পি. আর. এস. উপাধি লাভ। ১৯২৩-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের রিডার হিসেবে যোগদান। পরে সেখানকার সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি লাভ। ১৯৪৭-এ অবসর গ্রহণ। অবসর গ্রহণের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষরূপে কিছুকাল দায়িত্ব পালন। দীর্ঘদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৫০ ও ১৯৫৬-তে দুবার এর সভাপতি নির্বাচিত। পুনায় ডেকান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ইতিহাসভিত্তিক সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুকাল ভিজিটিং প্রফেসর। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত। পুনার ভান্ডারকার ইনস্টিটিউট আয়োজিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষকগণের সহায়তায় প্রকাশিত মহাভারতের 'দ্রোণপর্ব' ও 'উদ্যোগপর্বে'র সম্পাদনা। এ ছাড়া সরকারি অর্থানুকূল্যে ও নিজস্ব উদ্যোগে প্রায় পঁচিশ হাজার পুঁথি সংগ্রহ। তাঁর মধ্যে নয় হাজারেরও বেশি বাংলা প্রবাদ অর্থসহ সংকলন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ– 'কাব্যলীলায়িতা' (১৯৩৪), 'প্রকতনী' (১৯৩৪), 'অদ্যতনী' (১৯৪১), 'ক্ষণদীপিকা' (১৯৪৯), 'সায়ন্তনী' (১৯৫৪), 'বাংলা প্রবাদ' (১৯৪৫), 'নানা নিবন্ধ' (১৯৫০)। 'দীনবন্ধু মিত্র' (১৯৫১) তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ। ইংরেজি গ্রন্থ: History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, Study in the History of Sanskrit Literature (2 Vlos, 1923, 1925), Treatment of Love in Sanskrit Literature, Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal, History of Sanskrit Literature (১৯৪৭)। মৃত্যু, ১৯৬৮।



সুশোভন সরকার (১৯০০-১৯৮২)॥ জন্ম, কাঁথি, মেদিনীপুর, ১৯ আগস্ট ১৯০০। ইতিহাসবেত্তা, পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ। স্কুল জীবন শেষ হয় ঢাকায় ১৯১৭-তে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২১-এ ইতিহাসে অনার্স নিয়ে স্নাতক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। ১৯২৩-এ এম.এ. পরীক্ষাতেও একই কৃতিত্ব প্রদর্শন। অক্সফোর্ডের জেসাস কলেজে দুবছর (১৯২৩-১৯২৫) ইতিহাস অধ্যয়ন এবং অনার্স নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। অক্সফোর্ডে থাকাকালীন সময়েই তাঁর মানসচিন্তায় দুটি অভিজ্ঞতা স্থায়ী প্রভাব ফেলে– পিএইচ.ডি. উপাধির প্রতি নির্মোহতা এবং মার্কসীয় রাজনীতি ও দর্শন। ১৯২৫-এ শিক্ষক জীবনের শুরু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে রিডার হিসেবে যোগ দিয়ে ১৯৩৩ পর্যন্ত অধ্যাপনা। এখানে পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ঘনিষ্ঠতা। অধ্যাপক বসুর উৎসাহে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট আর্কাইভে কাজ শুরু। ১৯৩০-১৯৩২-এর গ্রীষ্মাবকাশে নেপাল, তিব্বত, ভুটান, বর্মা ও শ্যামদেশের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক কি ছিল তা নিয়ে মোট ছটি গবেষণা-প্রবন্ধ রচনা। ১৯৩৩-এ প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক এবং একই সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক অধ্যাপক পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৫৬-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করার পর নবগঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের প্রধান। ১৯৬১-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপনার জন্যে আমন্ত্রণ; উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে ১৯৬৭-তে কর্মজীবন থেকে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইতিহাসের ধারা (১৯৪৪,

অমিত সেন ছদ্মনামে)। A Marxian Glimpse of History, Notes on Bengal Renaissance (১৯৪৬, অমিত সেন ছদ্মনামে), Studies in Bengal Renaissance (১৯৬১, অতুলচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে সম্পাদনা), প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ (১৯৮২), প্রসঙ্গ ইতিহাস (১৯৮৩)। সুশোভন সরকার তাঁর জীবদ্দশায় অধ্যাপক হিসেবে প্রায় কিংবদন্তীর পুরুষ ছিলেন। লিখেছেন কম, কিন্তু সারাজীবন অধ্যাপনা, ইতিহাসচর্চা ও মার্কসীয় সমাজচিন্তার মাধ্যমে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দীপিত করে গেছেন। স্বনামে অল্পবিস্তার লেখা ছাড়াও 'বিজন রায়' ও 'অমিতসেন' ছদ্মনামে লিখতেন। অধ্যাপনা বৃত্তির বাইরেও তাঁর কর্মকাণ্ড বিস্তৃত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন ও ক্রিয়াকর্মে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। ১৯২০-১৯২১-এ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবীর পরিচালনায় 'সমাজ'-এর একটি অংশে যোগদান করে রবীন্দ্রনাথকে সংরক্ষণশীল সাধারণ সমাজের সদস্য পদে নির্বাচনের জন্যে আন্দোলনে নামেন। বিশ্বভারতী সোসাইটি পত্তনের সময়ে তাতে অংশ নিয়েছিলেন, এই সময়েই সিলভাঁ লেভি, হিবন্টারনিটস, স্টেলা, ক্রামরিশ প্রমুখ পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বিশ্বভারতীর কর্মনির্বাহী সংসদে (কর্মসমিতি) সদস্যরূপে মনোনীত। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত এর সঙ্গে যুক্ত। অবসর-জীবনে জনশিক্ষা পরিষদ ও মার্কস ক্লাব নামে দুটি আলোচনা সভার পত্তন। ১৯৭১-এ মজফফরপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে সভাপতির পদ অলংকৃত। ১৯৭৬-এ তাঁর সম্মানে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেন তাঁর গুণগ্রাহী পণ্ডিতবর্গ। ১৯৮১-তে On the Bengal Renaissance গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত। মৃত্যু. কলকাতা, ২৭ আগস্ট ১৯৮২।

সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী (১৮২৩-১৮৭৪)॥



জন্ম. কনকসার গ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, ১৮২৩। চিকিৎসক। ঢাকা সদর কোর্টের উকিল রাধামাধব চক্রবর্তী তাঁর পিতা। দেড় বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ। আট বছর বয়সে পিতার মৃত্যু ঘটলে দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত। বিদ্যাশিক্ষার জন্য এক জ্ঞাতি দারোগার সঙ্গে কুমিল্লায় গমন। প্রথমে মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের, পরে কালিদাস মজুমদারের ও সবশেষে গোলকনাথ মুন্সীর আশ্রয়ে থেকে কুমিল্লা সরকারি স্কুলে অধ্যয়ন। কুমিল্লার কালেক্টর আলেকজান্ডার সূর্যকুমারের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য প্রদানপূর্বক তাঁকে হেয়ার স্কুলে অধ্যয়নের জন্য কলকাতা পাঠান। এ স্কুল থেকে বৃত্তিসহ জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৪৩)। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি। তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নকালে সরকারি বৃত্তি পেয়ে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিলেত গমন (১৮৪৫)। অধ্যাপক হেনরি গুডিভের তত্ত্বাবধানে থেকে লন্ডন মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন। ১৮৫০-এ এম.ডি. উপাধি লাভ। একই বছর খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ। তাঁর শিক্ষকের নামানুসারে গুডিভ নাম ধারণ ও এক ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ। বিলাত থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন ও কলকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার কর্মে যোগদান। ১৮৫৫-তে দ্বিতীয়বার বিলেত গমন। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর মেডিকেল সার্ভিসে চাকরি লাভ (১৮৫৭)। প্রতিভাবান চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন। ক্ষয় রোগের হেতু নির্ণয়ে অসাধারণ মেধার পরিচয় প্রদান। উপদংশঘটিত রোগে আয়োডাইড অব পটাসিয়ামের প্রথম প্রয়োগ। লান্সেট, ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল, ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট প্রভৃতি পত্রিকায় চিকিৎসা বিদ্যাবিষয়ক বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ। চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর যে সব বক্তৃতা করেছেন সেগুলো 'Popular Lectures on Subjects of Indian Interest' নামে ১৮৯০-তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্য ১৮৭৩-এ তৃতীয়বার বিলেত গমন। মৃত্যু. লন্ডন, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪।

সূর্য সেন, মাস্টারদা (১৮৯৩-১৯৩৪)॥ জন্ম. নোয়াপাড়া, চট্টগ্রাম, ১৮ অক্টোবর ১৮৯৩। বিপ্লবী। প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়ন ও পরে বহরমপুর কলেজ থেকে ১৯১৮-তে বি.এ.পাস। উমাতারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। 'মাস্টারদা' নামে সমধিক পরিচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) শেষের দিকে অনুরূপ সেন, চারুবিকাশ দত্ত, অম্বিকা চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখের

সঙ্গে চট্টগ্রামে গোপন বিপ্লবী দল সংগঠনের কাজ শুরু। ১৯২০-তে গান্ধীজী-কর্তৃক বিপ্লবীদের কাছে এক বছরে স্বরাজ এনে দেবার প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২১) শুরু। এই গণ-আন্দোলনে বিপ্লবীরাও যোগ দিয়েছিলেন।



এই সময় চট্টগ্রাম বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটায় সমিতি ভাগ হয়ে যায়। পরে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলটি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কংগ্রেসের প্রকাশ্য আন্দোলনে কলকাতার 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে সহযোগিতা করতো সেই দলের সভাপতি ছিলেন সূর্য সেন। আরো ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ এবং নির্মল সেন। মহাত্মা গান্ধী যখন অহিংস আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন তখন বিপ্লবীরা নিজেদের গোপন সংগঠন ও অস্ত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আবার সক্রিয় হয়ে উঠলেন। ১৯২৩-এর ১৩ ডিসেম্বর দিনের বেলায় প্রকাশ্য রাস্তায় রেলওয়ে কর্মচারীদের বেতন বাবদ নিয়ে যাওয়া ১৭০০০.০০ টাকা ছিনতাই করা হয়। এতে অংশ নেন অনন্ত সিং, দেবেন দে ও নির্মল সেন। এরপর পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বিপ্লবীদের আস্তানায় হানা দিলে পুলিশের সঙ্গে এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ নাগর খানা পাহাড় খণ্ডযুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের পর সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী ধরা পড়েন। কিন্তু মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করতে না-পারায় তিনি ছাড়া পান। পরে ১৯২৬-এ টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার পর কলকাতায় গ্রেফতার হয়ে ১৯২৮-এ মুক্তিলাভ। ১৯২৯-এর প্রথম দিকে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত। একই বছরের মে মাসে চট্টগ্রামে চারটি সম্মেলন সূর্য সেনের দলের উদ্যোগে ডাকা হয়। ১৯৩০-এর শুরু থেকেই ভবিষ্যৎ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ। ১৯০০-এর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও তার কয়েকদিনের মধ্যে জালালাবাদ পাহাড়ে কয়েকশত নিয়মিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদের যে সম্মুখ যুদ্ধ হয়, তাতে ব্রিটিশ শাসনের প্রায় দেড়শত বছরের মধ্যে সাময়িকভাবে হলেও ব্রিটিশরা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এই দেশের মানুষের কাছে পরাজয়বরণ করে পলায়ন করে। এই দিক থেকে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সূর্য সেনের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল ছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দিন এবং ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড় সংঘটিত হয় মরণপণ যুদ্ধ। ইংরেজ সরকার সূর্য সেনকে গ্রেফতারের জন্য প্রচুর টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। তাঁকে ধরতে এসে ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন নির্মল সেনের গুলিতে নিহত হন। অবশেষে ১৯৩৩-এর ২ ফেব্রুয়ারি সূর্য সেন গৈরলা গ্রামে শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে গোপন অবস্থানের সময়ে একজন নিকট আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়েন। বিচারের সময়ে সূর্য সেনের বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ সরকার উপস্থিত করতে পারে নি। সঙ্গে রিভলবার পাওয়ার জন্য কেবল অস্ত্র আইনের সাজা হতে পারতো তাঁর, কিন্তু ইংরেজের বেতনভোগী বিচারক তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে দ্বিধা করে নি। এর বিরুদ্ধে সমস্ত আপিল বাতিল হয় এবং সূর্য সেনের ফাঁসির হুকুম বহাল থাকে। দেশের স্বাধীনতার জন্য সূর্য সেন নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পূর্ববাংলায় ষাটের দশকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ৬-দফাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সূর্য সেনের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ আন্দোলনকারীদের শক্তি ও সাহস যুগিয়েছিল। মৃত্যু. চট্টগ্রাম জেল, ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪।

সুহাসিনী দাস (১৯১৫-২০০৯)। জন্ম: ১৬ আগস্ট ১৯১৫, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ। বিপ্লবী নারীসংগঠক, সমাজসেবী। পিতা প্যারীমোহন রায়, মাতা শোভা রায়। ১৬ বছর বয়সে সিলেট শহরের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী কুমুদচন্দ্র দাসের সঙ্গে বিয়ে। বিয়ের চার বছরের মধ্যেই স্বামীর মৃত্যু। এরপরই তিনি সমাজসেবা ও রাজনীতিতে সক্রিয় হন। শ্বশুরের পরিবার থেকে প্রাপ্ত অঢেল সম্পত্তির জণকল্যাণমূলক কাজে বিলিয়ে দিয়েছেন। ১৯৪০-এর ২৬শে জানুয়ারি সিলেট জেলার



মহিলা সংঘের আলোচনাসভায় সারাজীবন খদ্দরের কাপড় পরিধান করার সংকল্প গ্রহণ। মহিলা সংঘের স্কুলের শিক্ষক হিসেবে তাঁতের কাজ, চরকায় সুতাকাটা, চামড়ার ব্যাগ তৈরি, স্যান্ডেলের ফিতা তৈরি প্রভৃতি স্বদেশি কাজ শিক্ষাদান। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন যোগদানের কারণে ১৯৪২-এ কারাবরণ। ব্রিটিশবিরোধী এবং ভারতের স্বাধীনতা অন্দোলনের পূর্ববাংলায় বিপ্লবী ভূমিকা পালন। ১৯৪৬-এ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করেন। ১৯৪৭-এ কুলাউড়ার রঙ্গিরকুল পাহাড়ে কংগ্রেসকর্মীদে আশ্রম প্রতিষ্ঠায় ভূমিকাপালন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধেরও সংগঠক। ১৯৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার সময় রঙ্গিরকুল আশ্রমে থেকে মানুষের সেবাদান। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করে আশ্রমকে রক্ষাকরণ। স্বাধীনতার পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে যুক্ত হন সমাজসেবায়। নারীদের স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকাপালন। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'সেকালের সিলেট'। ১৯৭৩-এ ভারতের রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' হিসেবে সংবর্ধিত। ১৯৯৬-এ রাষ্ট্রীয় 'সমাজসেবা' পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. ৩০ মে ২০০৯, সিলেট।



সেলিনা পারভিন (১৯৩১-১৯৭১)॥ জন্ম. কল্যাণ নগর, রামগঞ্জ, নোয়াখালী, ১৯৩১। কবি ও সাংবাদিক। লেখাপড়া শুরু হয় ফেনী শহরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে তাঁর পরিবার শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে লেখাপড়া বন্ধ হয়। পরে মেট্রিক দিয়েছিলেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। ছিলেন স্বশিক্ষিত। প্রচুর পড়াশুনা করে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানার্জন। চাকরি নেন প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের মেট্রনরূপে। পরে তা ছেড়ে রিসেপশনিস্টের চাকরি গ্রহণ। কিন্তু তাও পছন্দ হয়নি। এরপর ললনা পত্রিকায় যোগদান। নিজের চেষ্টায় 'শিলালিপি' নামে অনিয়মিত সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা। নিয়মিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন। অজস্র কবিতা, প্রবন্ধাদি পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১৯৭১-এর মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করেন। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর স্বাধীনতাযুদ্ধে বিজয়ের প্রাক্কালে পাকসেনাদের এ-দেশীয় দোসর আলবদর বাহিনীর হাতে নিহত।



সেলিনা বানু (১৯২৬-১৯৮৩) রাজনীতিবিদ, শিক্ষক ও সমাজসেবী। জন্ম. ১২ অক্টোবর ১৯৬৮, দিলালপুর, পাবনা। মা হাজেরা খাতুন। বাবা ওয়াছিম উদ্দিন আহমদ (১৮৭৬-১৯২৮) ছিলেন আইনজীবী। পাবনা জেলা বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট, মিউনিসিপলিটির চেয়ারম্যান ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের (১৯২০) সদস্য হিসেবে জনহিতকর কাজে অনবদ্য ভূমিকা পালন। পাবনা গার্লস স্কুল থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় (১৯৪৩) ফার্সিতে লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ; পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট (১৯৪৫) ও বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি (১৯৪৯) এবং ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রি (১৯৬১) অর্জন। পাবনা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবন শুরু। পাবনা সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন। রংপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও ঢাকায় লীলা নাগ-প্রতিষ্ঠিত নারী শিক্ষামন্দিরে শিক্ষকতা (১৯৫৯-১৯৬৪)। ১৯৬৪-তে কুমিল্লার ফরিদা বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন। ছাত্রবয়সেই কমিউনিস্ট স্টাডি গ্রুপে (১৯৩৯) সম্পৃক্ত। ১৯৪৬-১৯৪৮ পর্যন্ত পাবনা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। পর্দাপ্রথা ভেঙ্গে ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির লঙ্গরখানা পরিচালনা। ১৯৪৯-এ কমিউনিস্ট নেতা খোন্দকার শাহজাহান মোহাম্মদের সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। পার্টির নির্দেশে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে (১৯৫৩) প্রাদেশিক কমিটির মহিলা সম্পাদক নির্বাচিত। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে (১৯৫৪) মহিলা আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে আওয়ামী লীগ

পার্লামেন্টারি পার্টির হুইপ মনোনীত। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপের (১৯৫৭) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৯৬৭-তে মস্কোপন্থী ন্যাপে যোগদান করে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। মুক্তিযুদ্ধকালে ত্রিপুরার আগরতলা ক্রাফটস ক্যাম্প ও কলকাতা সল্টলেকে শরণার্থীদের সেবা-যত্ন ও রান্নার দায়িত্ব পালন। মৃত্যু. ঢাকা, ২৬ জানুয়ারি ১৯৮৩।

সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮)॥ জন্ম. সেনেরখিল, সোনাগাজী, ফেনী, ১৮ আগস্ট ১৯৪৯ সাল। নাট্যকার, শিক্ষাবিদ। পিতা মফিজউদ্দিন আহমেদ, মাতা ফিরোজা খাতুন। বাবার চাকরি-সূত্রে শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ফেনী, চট্টগ্রাম, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও রংপুরের বিভিন্ন স্থানে। ১৯৬৪-এ ফেনীর সেনেরখিলের মঙ্গলকান্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি.এবং ১৯৬৬-এ ফেনী কলেজ থেকে এইচ.এস.সি. পাস। টাঙ্গাইলের করোটিয়ায় সরকারি সাদত কলেজে থেকে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ। ১৯৯৫-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৮১-৮২-এ নাট্যনির্দেশক নাসিরউদ্দিন ইফসুফের সঙ্গে গ্রাম থিয়েটার গঠন। প্রথম রেডিও নাটক 'বিপরীত তমসায়' ১৯৬৯-এ। টেলিভিশনে প্রথম নাটক আতিকুল হক চৌধুরীর প্রযোজনায় 'লিব্রিয়াম' (পরিবর্তিত নাম 'ঘুম নেই') প্রচারিত ১৯৭০-এ। আমিরুল হক চৌধুরী নির্দেশিত এবং বহুবচন প্রযোজিত প্রথম মঞ্চনাটক 'সর্প বিষয়ক গল্প' (১৯৭২)। বিজ্ঞাপনী সংস্থা 'বিটপী'তে কপিরাইটার হিসেবে চাকরি জীবন শুরু। ১৯৭৪-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান। আমৃত্যু ঐ বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। নাটকগ্রন্থ: 'সর্প বিষয়ক গল্প ও অন্যান্য নাটক' (১৯৭৩), 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন' (১৯৭৫), 'বাসন' (১৯৮৫) 'মুনতাসির', 'শকুন্তলা', 'কিত্তনখোলা' (১৯৮৬), 'কেরামতমঙ্গল' (১৯৮৮), 'যৈবতী কন্যার মন' (১৯৯৩), 'চাকা' (১৯৯১), 'হরগজ' (১৯৯২), 'প্রাচ্য' (২০০০), 'হাতহদাই' (১৯৯৭), 'নিমজ্জন' (২০০২), 'ধাবমান', 'স্বর্ণবোয়াল' (২০০৭), 'পুত্র', 'স্বপ্ন রজনীগণ' ও 'ঊষা উৎসব'। রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত নাটক: 'বিপরীত তমসায়' (রেডিও পাকিস্তান, ১৯৬৯), 'ঘুম নেই' (পাকিসস্তান টেলিভিশন, ১৯৭০), 'রক্তের আঙ্গুরলতা' (রেডিও বাংলাদেশ ও বিটিভি), 'অশ্রুত গান্ধার' (বিটিভি, ১৯৭৫), 'শেকড় কাঁদে জলকণার জন্য' (বিটিভি ১৯৭৭), 'ভাঙনের শব্দ শুনি' (আয়না সিরিজ, বিটিভি ১৯৮২-৮৩), 'গ্রন্থিকগণ কহে' (বিটিভি ১৯৯০-৯১), 'ছায়া শিকারী' (বিটিভি ১৯৯৪-৯৫), 'রঙের মানুষ' (এনটিভি ২০০০-২০০৩), 'নকশীপাড়ের মানুষেরা' (এনটিভি, ২০০০), 'কীত্তনখোলা' (আকাশবাণী কোলকাতা, ১৯৮৫)। 'চাকা' নাটক থেকে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় ১৯৯৪, 'কীত্তনখোলা' নাটক থেকে চলচ্চিত্র নির্মিত ২০০০-এ। 'একাত্তরের যীশু' চলচ্চিত্রের সংলাপ রচনা ১৯৯৪-এ। পুরস্কার ও সম্মাননা: নাটকে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৪; ঋত্বিজ সংবর্ধনা, ১৯৮৫; কথক সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৩; একুশে পদক, ২০০৭; জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১৯৯৩; অন্য থিয়েটার (কলকাতা) সংবর্ধনা; নান্দিকার পুরস্কার (কলকাতা) ১৯৯৪; শ্রেষ্ঠ টেলিভিশন নাট্যকার, ১৯৯৪; খালেকদাদ চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার; জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (একাত্তরের যীশু, শ্রেষ্ঠ সংলাপ) ১৯৯৪; মুনীর চৌধুরী সম্মাননা, ২০০৫। মৃত্যু. ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি ২০০৮।



সৈয়দ আকবর আলী॥ জন্ম. মামুদপুর, সিলেট। আদি নিবাস হবিগঞ্জ। আসল নাম সরফুদ্দিন। গীতিকার। ছাবাল আকবর আলী ভণিতায় গান রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ। 'এক্কে দেওয়ানা', 'যানায়ে জান' ও 'যৌবন বাহার' নামে গানের বইয়ের রচয়িতা। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

সৈয়দ আবদুল মান্নান (১৯১৪-১৯৮০)॥ জন্ম. চাচইর গ্রাম, বরিশাল, ১৯১৪। সাংবাদিক, সাহিত্যিক। মেট্রিক পাস। প্রথমজীবনে সরকারি চাকুরে। পরবর্তীকালে সাংবাদিক। মাসিক তাহযিব, সাপ্তাহিক 'নয়া জামানা' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: গুলেবাকাওয়ালী (১৯৫৩), মহাকবি ইকবাল,

এক যে ছিল সওদাগর, যেমন কর্ম তেমন ফল, সোনালী যুগের কাহিনী, শাহী দরবারের কিস্‌সা, ককেশাসের বন্দী, কাঠের পুতুল, ত্রিপালীর রাজকন্যা, স্বপ্ন সফল হোক, আগুনের ফুলকি ইত্যাদি। মৃত্যু. ২৩ আগস্ট ১৯৮০।

সৈয়দ আবদুল হাই, কর্নেল (১৯১৮-১৯৭১)॥ জন্ম. শেরপুর শহর, শেরপুর, ১৯১৮। চিকিৎসাবিদ। শেরপুর গোবিন্দকুমার পিস মেমোরিয়াল স্কুল থেকে ১৯৩৭-এ মেট্রিক, জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৪০-এ আই.এসসি. ময়মনসিংহ লিটন স্কুল থেকে এল.এম.এফ. (১৯৪৫-১৯৪৬) এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি. ডিগ্রি লাভ। ১৯৫০-এ পাকিস্তান আর্মি মেডিক্যাল কোর-যোগদান। মেডিকেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর ওপর প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৬১-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস-এ যান এবং দুবছর প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৯৬৩-তে দেশে প্রত্যাবর্তন. ১৯৬৪-তে ঘানা গমন ও ১৯৭০-এ দেশে প্রত্যাবর্তন এবং যশোর সেনানিবাসে যোগদান Deputy Surgeon General হিসেবে। মৃত্যু. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুতে যশোর সেনানিবাসে বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে যোগদান এবং পাক সেনা-কর্তৃক গ্রেফতার ও হত্যা, ৩০ মার্চ ১৯৭১।

সৈয়দ আবদুস সাত্তার (১৯২৬-১৯৬১)॥ জন্ম. লাওকেরা গ্রাম, হাজীগঞ্জ, কুমিল্লা, ১৯২৬। নাট্যকার। কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে ১৯৪৭-এ মেট্রিক এবং ১৯৫৪-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ। নেত্রকোণা কলেজ. পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: নাটক-কবি-দা। প্রথম নাটক প্রকাশিত হয় 'বিরস-রসনা' ছদ্মনামে। 'কবি-দা' নাটকের জন্যে ১৯৬০-এ আদমজী পুরস্কার লাভ। মৃত্যু. ১৯ এপ্রিল ১৯৬১।

সৈয়দ আবদুস সুলতান (১৯১৭-১৯৯১)॥ জন্ম. রৌহা গ্রাম, শেরপুর, ১৯১৭। রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও লেখক। কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৩৬) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি. (১৯৩৮) ডিগ্রি লাভ। সরকারের সমবায় বিভাগে চাকরি গ্রহণ। প্রায় এগারো বছর চাকরি করার পর ১৯৪৯-এ ময়মনসিংহ জেলা আদালতে ও ১৯৫৫-তে ঢাকা



হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯৬২-র ২৮ এপ্রিল মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় ময়মনসিংহ-৫ নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। এরপর মুসলিম লীগের পরিষদে বিরোধীদলের উপনেতা। ১৯৬৭-তে পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত। তিন বছর এ পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগে যোগদান। একই বছর ৭ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ময়মনসিংহ-৯ আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডা সফর করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠন। স্বাধীনতালাভের পর (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) ১৯৭২-এ যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের প্রথম হাই কমিশনার নিযুক্ত। ১৯৭৬ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব সম্পাদন। রম্যসাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী ও জীবনীগ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: ভ্রমণকাহিনী-পঞ্চনদীর পলিমাটি, সুদূরের চিঠি, পথের দেখা; রম্যসাহিত্য– মণিরাগ, ব্যতিক্রমের এক অধ্যায়; জীবনীগ্রন্থ– ইবনে সিনা, তরুণের জিন্নাহ, মরণজয়ী সক্রেটিস, মরণজয়ী শেখ মুজিব, বড় মানুষদের ছোটকালের গল্প; অনুবাদ সাহিত্য– বেকনের প্রবন্ধ, বিদেশি ছোটগল্প; শিশুসাহিত্য– আর রক্ত নয়, ফুল ফল ও পাতা; প্রবন্ধ গ্রন্থ-Genocide in Bangladesh, The Prophet of all Times.। মৃত্যু. ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯১।

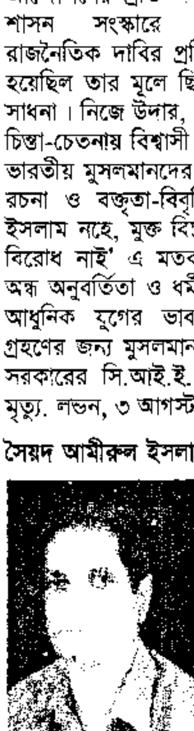
সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬৪-১৯৩০)॥ জন্ম. বাবানাম গ্রাম, হুগলী, ১৮৬৪। কবি। হোমিওপ্যাথিতে এম.ডি. ডিগ্রি লাভ। এরপর ১৮৯৬-তে স্বীয় ডিসপেন্সারিতে চিকিৎসা আরম্ভ। 'দেবর্তি দরবার' নামক মাসিক পত্রিকার পরিচালক। ১৯২৬-এর ২৩ সেপ্টেম্বর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করেন। 'হোসেনী ছন্দ' নামক এক প্রকার অমিত্রাক্ষর

ছন্দের উদ্ভাবক। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি– কাব্য: যমজ ভগিনী (১৯০৫), স্বর্গারোহণ (১৯০৬), জীবন্ত পুতুল (১৯০৭), নূরজাহান, হাবসী বাদশা (১৯২৫) ইত্যাদি। মৃত্যু. ১৯৩০।

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৯)॥ জন্ম. চুঁচুড়া, হুগলী, ৬ এপ্রিল ১৮৪৯। আইনবিদ ও ঐতিহাসিক। চুঁচুড়ার হেকিমি ঔষধ ব্যবসায়ী সৈয়দ সাদ আলী তাঁর পিতা। শিক্ষাজীবনে মেধার পরিচয় প্রদান। প্রতিটি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ। এন্ট্রান্স পাস করে হুগলী কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে ১৮৬৭-১৮৬৮-তে ইতিহাস ও অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ল'পাস করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। সরকারি বৃত্তি পেয়ে ১৮৭৩-এ লন্ডনের ইনার টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি ডিগ্রি লাভ। দেশে ফিরে পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৮৭৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত। ১৮৭৫-এ প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন-অধ্যাপকের পদে নিযুক্তি লাভ। এ পদে পাঁচ বছর অধিষ্ঠিত। ১৮৭৬-এ সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠন। ১৮৭৮-এ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্তি লাভ। কিছুকাল পর প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত। ১৮৮১-তে চাকরি ছেড়ে পুনরায় ব্যারিস্টারি পেশায় যোগদান। অল্পকাল পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৮৮৩ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য বড়লাট লর্ড রিপন কর্তৃক ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত। ১৮৮৪-তে 'ঠাকুর আইন অধ্যাপকে'র পদ অলঙ্কৃত। ১৮৯০-তে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯০৪-এ এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ। সস্ত্রীক বিলেত গমন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বাস। লন্ডনে মুসলিম লীগের শাখা কমিটি গঠন। আজীবন এ সমিতির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থেকে ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণ সাধনার্থে আন্দোলন পরিচালনা। ইলবার্ট বিলের সঙ্কটকালে অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদর্শন। ১৯০৯-এর ১৩ নভেম্বর প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এ পদ লাভ। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং আইনশাস্ত্রের গবেষণায় অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান। 'Spirit of Islam', 'History of the Saracens', 'Ethics of Islam' প্রভৃতি তাঁর ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ। 'Mahomedan Law', 'The Personal Law of the Mahomedan', 'Civil procedure in British India', 'A Commentary on the Bengal Tenancy Act', 'The Law of Evidence Applicable of British India'. প্রভৃতি তাঁর আইনবিষয়ক গ্রন্থ। মুসলিম আইনে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির অধিকারী। ১৯১১-তে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কর্তৃক ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ওয়াকফ বিল উপস্থাপন দুই বছর পরে এ বিল আইনে পরিণত। প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ আমীর আলীই ছিলেন এই বিলের জন্মদাতা। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবির প্রতি যে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল তার মূলে ছিল আমীর আলীর নিরলস সাধনা। নিজে উদার, অসাম্প্রদায়িক ও আধুনিক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সে আলোকে ভারতীয় মুসলমানদের মানস গঠনের জন্য প্রবন্ধ রচনা ও বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান। 'অন্ধ বিশ্বাস ইসলাম নহে, মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ইসলামের বিরোধ নাই' এ মতবাদ প্রচারের জন্য খ্যাত। অন্ধ অনুবর্তিতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি পরিহার করে আধুনিক যুগের ভাবধারা ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলমানদের উপদেশদান। ব্রিটিশ সরকারের সি.আই.ই. উপাধি লাভ (১৮৮৭)। মৃত্যু. লন্ডন, ৩ আগস্ট ১৯২৯।



সৈয়দ আমীরুল ইসলাম (১৯৪২-২০০৯)॥ জন্ম. ময়মনসিংহ, ১৯৪২। ইতিহাসবিদ, জাদুঘর বিশেষজ্ঞ। পিতা সৈয়দ আফসারুদ্দিন আহমদ, মাতা সৈয়দা হালিমা খাতুন ময়মনসিংহের মৃত্যুঞ্জয় হাই স্কুল থেকে ১৯৫৮-এ মেট্রিক, আনন্দমোহন কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৬০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩-তে ইতিহাস বিষয়ে অনার্স ও ১৯৬৪-তে এম.এ.।



১৯৬২-এ ইউসিস ঢাকা থেকে সাংবাদিকতা বিষয়ে ও ১৯৮৮-এ বাংলা একাডেমীতে ফোকলোর কর্মশালায় অংশগ্রহণ। ১৯৬৫-১৯৭৬ সময়ে ফেণীর চন্দনবাইশা কলেজ, নেত্রকোণা কলেজ ও জয়পুরহাট কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক মুসলিম ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে প্রবেশনারি অফিসার (১৯৬৮-৬৯)। পরে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যোগদান। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইংরেজি জার্নাল 'বাংলাদেশ ললিতকলা'র নির্বাহী সম্পাদক। ১৯৯৯ সনে জাতীয় জাদুঘর থেকে অবসরের পর প্রকশনা প্রতিষ্ঠান 'মুক্তধারার' সম্পাদক, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলাপিডিয়া-র সহকারী সম্পাদক, শিক্ষাকোষ (কম্পেন্ডিয়াম অব এডুকেশন)-এর সম্পাদক ও সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন। আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, ঢাকা সিটি জাদুঘর ইত্যাদি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার সংগে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। ঢাকা বিজ্ঞান চেতনা পরিষদের সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ও আন্তর্জাতিক জাদুঘর কমিটির সদস্য। 'মানবসভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থের জন্য ১৯৭৬-এ বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার লাভ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: নাটক: 'সার্কাস মেনলিয়াম' (১৯৮৯), ইতিহাস: 'ইতিহাস সন্ধান' (১৯৮৮), 'বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস' (১৯৯৬), 'গ্রীক সভ্যতা' (১৯৮৫), 'বাংলাদেশ ও ইসলাম' (১৯৮৭), 'মানব সভ্যতার ইতিহাস: আদিম যুগ (১৯৭৫), 'ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট' (১৯৯৯), উপন্যাস: 'আমার পিতা অসুস্থ' (২০০১)। মৃত্যু. ঢাকা, ২০০৯।

সৈয়দ আলতাফ হোসেন (১৯২৩-১৯৯২)॥ জন্ম. বিষ্টুদিয়া গ্রাম, কুষ্টিয়া, ১৬ মার্চ ১৯২৩। রাজনীতিবিদ। কৈশোরে পিতৃমাতৃহীন হন। কুষ্টিয়ার হরিনারায়ণপুর স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৩৯), কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ. (১৯৪৪) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল. (১৯৪৬)



ও ইতিহাসে এম.এ. (১৯৪৭) পাস ছাত্র ফেডারেশনের ইসলামিয়া কলেজ শাখার সভাপতি ১৯৪৪-এ কলকাতার মর্নিং নিউজ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান। ঢাকায় পাকিস্তান অবজারভার (১৯৪৯) পত্রিকার বার্তা বিভাগে চাকরি গ্রহণ (১৯৪৯)। ঢাকার মর্নিং নিউজ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে দায়িত্ব পালন। (১৯৫০-১৯৫৩)। নিউ নেশন (১৯৫৬) পত্রিকা সম্পাদনা। ১৯৫৩-তে আওয়ামী লীগে (১৯৪৯) যোগদান। যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত (মার্চ ১৯৫৪)। পূর্ববঙ্গে ৯২-ক ধারার শাসন বলবৎ করা হলে (৩০ মে ১৯৫৪) তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি। ১৯৫৫-র শেষের দিকে গ্রেফতার। কয়েক মাস কারাভোগের পর মুক্তিলাভ। পুলিশ ধর্মঘটের (১৯৫৫) সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠনে (২৫ জুলাই ১৯৫৭) বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। এ দলের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটির সদস্য (১৯৫৭-১৯৬৫)। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে তাঁর বিরুদ্ধে তৃতীয়বার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি। দুই বছর আত্মগোপন অবস্থায় কাটান। ১৯৬১-তে কোহিনূর বেগমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৬২-তে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনে ইন্ধন যোগাবার দায়ে কারাবরণ। ১৯৬৫-র ২৬ জুলাই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) পূর্ব-পাকিস্তান কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। চীন ও রাশিয়ার আদর্শগত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ন্যাপ দ্বিধাবিভক্ত হলে মস্কোপন্থি ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৭-১৯৭২)। ১৯৬৬-তে আবার গ্রেফতার। ১৯৬৮-র মে মাসে হাই কোর্টের আদেশে মুক্তিলাভ। একই বছর জুন মাসে পুনরায় গ্রেফতার। কিছুদিন পর জামিনে মুক্তি পান। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠকের দায়িত্ব পালনের সময়ে ১৯৬৮-র নভেম্বর মাসে আর একবার কারারুদ্ধ। আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থানের পর মুক্তিলাভ (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে (১৯৭১) দেশ ও জাতির সেবায় গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন। ভারতে অবস্থানকালে ন্যাপের নেতৃত্বে গঠিত ৬০টি যুব ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব পালন। কৃষক-শ্রমিক

আওয়ামী লীগের (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ) সরকারের রেলওয়ে প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত (২৩ জুলাই ১৯৭৫)। বঙ্গবন্ধু নিহত (১৫ আগস্ট ১৯৭৫) হওয়ার পর খোন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক গঠিত সরকারের সড়ক যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী (১৫ আগস্ট-৫ নভেম্বর ১৯৭৫)। অধুনালুপ্ত জাতীয় একতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৭৮-১৯৮৬), ১৯৮৫-তে একতা পার্টি, ন্যাপ (হারুন)-সহ ন্যাপ (মুজাফ্ফর)-এর একাংশের সমন্বয়ে গঠিত ঐক্য ন্যাপের আহ্বায়ক নির্বাচিত। ১৯৯০-তে ঐক্য ন্যাপ ও প্রজাতন্ত্রী পার্টির সমন্বয়ে গঠিত গণতন্ত্রী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার জন্য ১৫ দলীয় জোট গঠন (জানুয়ারি ১৯৮৩), জোটের ৫ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতিলগ্নে এক গোপন বৈঠকরত অবস্থায় অন্যান্য নেতার সঙ্গে আর এক দফা গ্রেফতার (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩)। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চাপে কিছুদিন পর মুক্তিলাভ। ১৫ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে ১৯৮৬-র ৭ মে কুষ্টিয়া জেলা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ও ঢাকা ল' কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ হিসেবে খ্যাত। এদেশের স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। মৃত্যু. ঢাকা, ১২ নভেম্বর ১৯৯২।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)। জন্ম. আলোকদিয়া, মাগুরা, ২২ মার্চ ১৯২২। কবি, সমালোচক, শিক্ষাবিদ। পিতা সৈয়দ আলী হামেদ এবং মাতা সৈয়দা কামরুন্নেগার খাতুন। ঢাকার ধামরাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন। ১৯৩১-এ ঢাকায় আর্মানিটোলা বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি। ১৯৩৮-এ প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস ১৯৪০-এ ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ. পাস ১৯৪৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে এম.এ. ডিগ্রি লাভ ১৯৪৫-এ হুগলী ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। এ বছরই প্রোগ্রাম এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে অল-ইন্ডিয়া রেডিওতে যোগদান। ১৯৪৬-এ কমর মুশতরীর সঙ্গে বিয়ে। ১৯৪৭-এ ঢাকা বেতারে যোগদান। ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের যোগদান। ১৯৫৪-এ করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ। ১৯৫৫-এ আন্তর্জাতিক পি.ই.এন. পাকিস্তান শাখার সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত। বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ (১৯৬০-৬৬)। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান (১৯৬৬-১৯৭১)। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৭২-৭৫)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৭৫-৭৭)। বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীর মর্যাদায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা (১৯৭৭-৭৮)। ১৯৭৮-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পুনরায় যোগদান। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (১৯৮৯-৯০)। আর্মানিটোলা বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় ১৯৩৭-এ স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর একটি ইংরেজি কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৯৫৩-এ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সহযোগে 'গল্পসঞ্চয়ন' নামে একটি সংকলন সম্পাদনা। ১৯৫৪-এ 'নজরুল ইসলাম' শিরোনামে সমালোচনাগ্রন্থ প্রকাশ। ১৯৫৬-এ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সঙ্গে যৌথভাবে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ রচনা। করাচী থাককালীন 'কবি মধুসূদন' নামে গ্রন্থ রচনা। ১৯৬৩-তে গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিসের 'ইডিপাস' নাটক অনুবাদ করে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন। ১৯৬৫-এ হুইটম্যানের কাবিতা অনুবাদ ও সম্পাদনা। প্রবন্ধগ্রন্থ: 'নজরুল ইসলাম' (১৯৫৪), 'কবি মধুসূদন' (১৯৫৭), 'কবিতার কথা' (১৯৫৭), 'সাহিত্যের কথা' (১৯৬৪), 'কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা' (১৯৬৮), 'আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে' (১৯৭০), 'রবীন্দ্রনাথ: কাব্যবিচারের ভূমিকা' (১৯৭৪), 'জার্মান সাহিত্য: একটি নিদর্শন' (১৯৭৬), 'আধুনিক কাব্যচৈতন্য এবং মোহাম্মদ মানিরুজ্জামানের কবিতা'(১৯৮৬) প্রভৃতি। কবিতাগ্রন্থ: 'অনেক আকাশ (১৯৫৯),



একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৪), সহসা সচকিত (১৯৬৫) এবং আমার প্রতিদিনের শব্দ (১৯৭৪), চহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৮৫), সমুদ্রেই যাব (১৯৮৭), রজনীগন্ধা (১৯৮৮)। পুরস্কার: বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৭), দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৮), সুফী মোতাহার হোসেন স্বর্ণপদক (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৮৩), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৮৫), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮৮) প্রভৃতি। মৃত্যু. ঢাকা, ২৫ জুলাই ২০০২।

সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৫-১৯৫৬)॥ জন্ম. দামপাড়া গ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, (১ আশ্বিন ১২৮২), সেপ্টেম্বর ১৮৭৫। এক নিম্নবিত্তের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম। লজিং থেকে স্কুল ও কলেজের পাঠ গ্রহণ। মুন্সীগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে এফ.এ. পাস। নেত্রকোণা দত্ত হাই স্কুলে শিক্ষকতা। মাসিক সাহিত্যপত্র 'নবনূর' (১৯০৩) সম্পাদনা। ১৯০৩-এ পুলিশ বিভাগে সাব-ইন্সপেক্টর পদে যোগদান। পরে ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত। একজন বিশিষ্ট কবি। 'ডালি' (১৯১২) তাঁর একমাত্র কবিতাগ্রন্থ। ইসলামি মানবতাবাদের আলোকে মানুষের মঙ্গল কামনায় তাঁর কবিমানস পরিস্ফুটিত। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পটভূমিকায় মুসলমান সমাজের বৃহত্তর কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। ঈদ উৎসবকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় কবিতা রচনার তাঁর ('ঈদ', ঈদ সংখ্যা, 'নবনূর', ১৯০৩) প্রথম কৃতিত্ব। গদ্যশিল্পী হিসেবেও সুনাম অর্জন। জীবনী গ্রন্থ 'তাপসী রাবেয়া' (১৯১৭) ও পত্রোপন্যাস 'হাজেরা' (১৯২৮) সৈয়দ এমদাদ আলীর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ। পুলিশ বিভাগে চাকরি করলেও সৎ ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন। কর্মদক্ষতার গুণে সরকারের কাছ থেকে 'খান সাহেব' উপাধি লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩), ডিসেম্বর ১৯৫৬।



সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)॥ জন্ম. ষোলশহর, চট্টগ্রাম, ১৫ আগস্ট ১৯২২। কথাসাহিত্যিক। আব্দুল্লাহ্‌ ... অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ আহমদউল্লাহ তাঁর পিতা। শৈশবাবস্থায় মাতৃবিয়োগ ঘটে। কুড়িগ্রাম হাইস্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৩৯), ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৪১), ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বি.এ. (১৯৪৩) পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে এম.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। ১৯৪৫-এ কলকাতার দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদে যোগদান। ১৯৪৭ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। দেশভাগের (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর ঢাকা বেতারকেন্দ্রের সহকারী বার্তা-সম্পাদক পদে নিযুক্তি লাভ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)। করাচি বেতারকেন্দ্রের বার্তা-সম্পাদক (১৯৫০-১৯৫১), নয়াদিল্লি, সিডনি, জাকার্তা ও লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসের প্রেস অ্যাটাশে (১৯৫১-১৯৬০)। প্যারিসে পাকিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (১৯৬০-১৯৬৭), প্যারিসে ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট (১৯৬৭-১৯৭১)। ফরাসি রমণী অ্যান মারির সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (৩ অক্টোবর ১৯৫৬)। ১৯৭১-এ প্যারিসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় কর্মপরিচালনা। বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠরূপকার। গভীর জীবনবোধ, অন্তর্লোকের রহস্য অনুসন্ধান স্পৃহা ও সংস্কারকামী মনের অভিব্যঞ্জনায় তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটক ঋদ্ধ। ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-সমস্যার পটে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, মূল্যবোধের বিপর্যয় এবং মানসিক স্খলন পতনের আলেখ্য তাঁর রচনায় উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস– লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)। ছোটগল্প– নয়নচারা (১৯৫১), দুইতীর (১৯৬৫), গল্প-সমগ্র (১৯৭২)। নাটক– বহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪)। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হন প্রথম উপন্যাস লালসালুকে কেন্দ্র করেই। উপন্যাসটির ফরাসি অনুবাদ (L Arbre Sams Maeme) প্রকাশিত হয় ১৯৬১-তে, ইংরেজি অনুবাদ



(Tree Without Roots) প্রকাশিত ১৯৬৭-তে। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ক্ষেত্রে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি বিস্ময়কর। পি.ই.ইন. পুরস্কার (১৯৫৫), উপন্যাসে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৩-মরণোত্তর) লাভ। মৃত্যু. প্যারিস, ১০ অক্টোবর ১৯৭১।

সৈয়দ নওশের আলী (১৮৯০-১৯৭২)॥ জন্ম. নড়াইল, যশোর, ১৮৯০। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ডিগ্রি লাভ। ১৯২৭-এ যশোর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত। প্রায় এক যুগ ঐ পদে নিয়োজিত। ১৯২৯-এ



বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির (১৯২৭) সদস্য। ১৯৩৭-এ বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত এবং ফজলুল হক মন্ত্রিসভার সদস্য। ফজলুল হকের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯৩৮-এ মন্ত্রিসভা ত্যাগ। ১৯৪০-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। ১৯৪১-এ কংগ্রেসে যোগদান। ১৯৪১-এ কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, কৃষক প্রজা পার্টিসহ অন্যান্য দল নিয়ে ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠনের উদ্যোক্তা ও অন্যতম নেতা। 'দৈনিক কৃষক' (১৯৩৮)-এর পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য। ১৯৪৩-এ কারাবরণ। নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুর 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সদস্য'। বঙ্গীয় বিধানসভার স্পিকার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা। ভারতীয় পার্লামেন্টের (রাজ্যসভা) সদস্য (১৯৫২-১৯৫৬, ১৯৬২-১৯৬৮)। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) সদস্য (১৯৫৭-১৯৬২)। কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাতিমান আইনজীবী। বিশিষ্ট কৃষক নেতা, রাজনীতিবিদ ও পার্লামেন্টারিয়ান। সততা, সাহস ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য নন্দিত। বঙ্গীয় বিধানসভার স্পিকার হিসেবে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় প্রদান। মৃত্যু. ১৯৭২।

সৈয়দ নজমুল হক (১৯৪১-১৯৭১)॥ জন্ম. মাতুলালয়, কান্দাপাড়া গ্রাম, খুলনা, ৫ জুলাই ১৯৪১। পৈতৃক নিবাস পয়গ্রাম, কসবা, খুলনা। সাংবাদিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩-তে বি.এ. অনার্স (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ও ১৯৬৪-তে এম.এ.



(রাষ্ট্রবিজ্ঞান) পাস। ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারিতে সামরিক আইন-বিরোধী আন্দোলনে এবং একই বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বর শিক্ষা কমিশন রিপোর্টবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৬৪-র ২২ মার্চ কার্জন হল প্রাঙ্গণে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনেম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান পণ্ডকরণের অপরাধে গ্রেফতার এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। পরে আদালতের রায়ে মুক্তিলাভ। ১৯৬৭-তে সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের ইনফরমেশন সার্ভিসের জন্য মনোনীত। সমাবর্তন অনুষ্ঠান পণ্ডের মামলার জন্য পুলিশ রিপোর্ট খারাপ থাকার দরুন চাকরিতে নিযুক্তি দিতে কর্তৃপক্ষের অসম্মতি প্রকাশ। সাংবাদিকতাকে স্থায়ী পেশা হিসেবে গ্রহণ। পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনালের চিফ রিপোর্টার ও কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের ঢাকাস্থ সংবাদদাতা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার (১৯৬৮) পুরো প্রসিডিংস রিপোর্টকরণ। (১৯৬৯)-এর অক্টোবরে শেখ মুজিবুর রহমানের ইংল্যান্ড ও ইউরোপে ভ্রমণসঙ্গী সাংবাদিক। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে (১৯৭১) পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার কাহিনী সংগ্রহ করে বহির্বিশ্বে প্রেরণ। ৬ আগস্ট (১৯৭১) তাঁকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে প্রেরণ। শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তাঁর উপর সরকারি চাপ প্রয়োগ। এতে তাঁর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। নভেম্বর ১৯৭১-এ মুক্তি পেয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। মৃত্যু. ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১-এ পাক-সৈন্যদের সহযোগী আলবদর বাহিনী দ্বারা ঢাকার পুরানা পল্টনস্থ বাসভবন থেকে অপহৃত ও নিহত।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-১৯৭৫)॥ জন্ম. যশোদল গ্রাম, কিশোরগঞ্জ। জানুয়ারি ১৯২৫। মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. পাস। ১৯৪৮-এ সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্রসংসদের সহসভাপতি নির্বাচিত। ঐ বছর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' (১৯৪৮)-এর অন্যতম সদস্য। ১৯৪৯-এ পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করে সরকারের আয়কর অফিসারের পদ লাভ। ১৯৫১-তে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। ১৯৫৩-তে ল' পাস করে ময়মনসিংহ জেলা আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। অতঃপর আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৫৭-তে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৬৪-র ৮ মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি নির্বাচিত। ১৯৭২-এর ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৬৬-র ৮ মে আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৬৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে আওয়ামী লীগ পরিচালনা। ডাক (ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি)-এর অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের আইয়ুব-বিরোধী গণ-আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। রাজনৈতিক সঙ্কট মীমাংসাকল্পে পিণ্ডিতে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে অনুষ্ঠিত সরকারের এক গোল টেবিল বৈঠকে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১০-১৩ মার্চ ১৯৬৯) আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য। ১৯৭০-এর নির্বাচনে ময়মনসিংহ-১৭ নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলনে প্রশংসনীয় অবদান রাখেন. ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে (বৈদ্যনাথতলা গ্রাম, মেহেরপুর) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই নবগঠিত সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে (পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী) সৈয়দ নজরুল ইসলামের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন। ১৯৭১-এর ২২ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১২ জানুয়ারি (১৯৭২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন। ১৯৭৫-এর ৯ এপ্রিল আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সহকারী নেতা নির্বাচিত'। ১৯৭৩-এর ৬ মার্চ পর্যন্ত এ পদে বহাল। ১১ এপ্রিল (১৯৭২) শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য নিযুক্ত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২) রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। (১৯৭৩)-এর ৭ মার্চ জাতীয় নির্বাচনে ময়মনসিংহ-২৮ নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১২ মার্চ (১৯৭৩) দ্বিতীয়বার আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সহকারী নেতা নির্বাচিত। ১৯৭৫-এর ১৪ আগস্ট পর্যন্ত এ দায়িত্বে নিয়োজিত। ২৫ জানুয়ারি (১৯৭৫) শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে দেশে একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার গঠিত হলে শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৭৫-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু নিজেকে চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাকশালের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির ২ নম্বর সদস্য নির্বাচিত। ১৫ আগস্ট (১৯৭৫) সামরিক বাহিনীর একটি দলের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে দেশে সামরিক আইন জারি: খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হন। এর ফলে মুজিব সরকারের পতন ঘটে এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম মন্ত্রিত্ব হারান। ১৯৭৫-এর ২৩ আগস্ট সরকার-কর্তৃক গ্রেফতার। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বাংলাদেশের মিল-কারখানা জাতীয়করণ করা হয়। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী। ষাটের দশকে বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা। স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাঙালির ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব. মৃত্যু. ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় কারাগারের



প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে প্রবেশকারী সশস্ত্র বাহিনীর কতিপয় ব্যক্তির হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৩ নভেম্বর ১৯৭৫-এ নিহত।

সৈয়দ নূরুদ্দিন (১৯২৩-১৯৮১)॥ জন্ম. ধীরেশ্বর গ্রাম, কিশোরগঞ্জ ; ১৯২৩। সাংবাদিক। ১৯৪৫-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. পাস। ১৯৪৬-এ কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ইত্তেহাদ' (১৯৪৬) পত্রিকায় সাংবাদিকতায় যোগদান। দেশবিভাগের (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর ঢাকা আগমন, প্রথমে 'আজাদ' (১৯৩৬) ও পরে 'পাকিস্তান অবজারভার' (১৯৪৯)-এর বার্তা-সম্পাদক, ১৯৫১-১৯৬০ পর্যন্ত 'সংবাদ'-এ প্রথমে বার্তা-সম্পাদক, পরে যুগ্ম সম্পাদকরূপে দায়িত্ব পালন। ১৯৬০-এ সাংবাদিকতা ত্যাগ। ১৯৬০-১৯৭২ পর্যন্ত কৃষি উন্নয়ন সংস্থার জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক, ১৯৭২-১৯৭৮ পর্যন্ত ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের তথ্য উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন। ১৯৮০-তে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ ও পুনরায় সংবাদ-এ যোগদান, এ পর্যায়ে এ পত্রিকার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রগাঢ় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী সৈয়দ নূরুদ্দিন সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন। এদেশের একজন প্রথম সারির সাংবাদিক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। সাংবাদিকতায় অবদান রাখায় মরণোত্তর একুশে পদক (১৯৮৩) লাভ। মৃত্যু. ২৩ জানুয়ারি ১৯৮১।



সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ (১৯১১-১৯৭৯)॥ জন্ম. মুর্শিদাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯১১। বিচারপতি ও বুদ্ধিজীবী। পিতা সৈয়দ আবদুস সালেক (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট), মাতা আফজালুন্নেসা (শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের ভগ্নী)। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৩১-এ অনার্স, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২-এ (প্রথম শ্রেণিতে) এম.এ. (অর্থনীতি) পাস। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৩-এ (প্রথম শ্রেণিতে) এল.এল.বি. এবং বিলেতের লিংকনস ইন থেকে ১৯৩৯-এ ব্যারিস্টারি ডিগ্রি অর্জন। কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগদান। লিয়াকত-নেহেরু চুক্তি (১৯৫০) বাস্তাবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন। ১৯৫১-এ ঢাকা হাইকোর্ট বারে যোগদান। ১৯৫২-তে ভাষা-আন্দোলনে ও ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্ট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ১৯৫৫-তে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ। ১৯৬১-তে এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীর প্রবল বিরোধিতার মুখে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী পালনে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন প্রস্তুতি কমিটির (১৯৬১) সভাপতি। ১৯৬৪-র ১৫ মে ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত। ১৯৬৭-এর ১৫ নভেম্বর উক্ত পদ থেকে পদত্যাগ। ১৯৬৮-তে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনে আইনগত ব্যবস্থা সংগঠিত করার ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচির প্রতি জোরালো সমর্থন প্রদান, শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের উপর প্রবল চাপ প্রয়োগ। পিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁ-আহূত গোল টেবিল বৈঠক (১৯৬৯)-এ যোগদান। পূর্ববাংলায় ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পক্ষে বক্তব্য পেশ। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি সৈন্যদের গণহত্যার প্রতিবাদে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, দক্ষ ও নির্ভীক বিচারপতি, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। 'মন্ত্রীর মামলায়', 'কর্নেল ভট্টাচার্যের মামলায়' ও 'পানের মামলায়' তাঁর রায় এদেশে আইনের ইতিহাসে স্থায়ী সম্পদ। মৃত্যু. ঢাকা, ৩ এপ্রিল ১৯৭৯।



সৈয়দ মাহমুদ আজাদ (১৮৪২-১৯০৭)॥ জন্ম. ঢাকা শহর, ১৮৪২। ফারসি ও উর্দুভাষার কবি। কবি হিসেবে 'আজাদ' নামেই পরিচিতি লাভ।

প্রথম দিকে 'শায়দা' (অশেক) কবি নামধারণ। গালিবের প্রত্যক্ষ শিষ্য সৈয়দ মাহমুদ আজাদ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ফারসি কবি হিসেবে সমালোচক মহলে স্বীকৃত। তাঁর কিছু উর্দু কবিতাও রয়েছে। আজাদ গালিবের সাহচর্য লাভের জন্য প্রায়ই দিল্লিতে অবস্থান করতেন। ফলে ফারসি ও উর্দু কাব্যজগতের দিকপালদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। গুরু গালিবের মতো আজাদও ফারসি ভাষাকে প্রধান প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। ফারসি 'কাসিদা' ও 'মসনবী' রচনাতেই তাঁর কাব্য-প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। গজল, রুবাই প্রভৃতিতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। ঢাকা শহর নিয়ে আজাদ-এর মুগ্ধতা ও উদ্বেগ তাঁর 'মসনবী' (মুস্তাহাল আফ্কার) ও 'কাসিদায় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৮৮-তে ঢাকায় যে টর্নেডো হয় তাকেও তিনি কাব্যভাষায় রূপ দেন। প্রকৃতির বর্ণনায়ও আজাদ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আজাদের রচনার সংখ্যা কম তবে গুণগত মানে তা সামান্য নয়। কবির 'দীওয়ানে আজাদ' (১৮৮৯) পাটনার আজিমাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। মৃত্যু. ঢাকা. ১৯০৭।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)॥ জন্ম. পিতার কর্মক্ষেত্র করিমগঞ্জ, আসাম, ১৩



সেপ্টেম্বর ১৯০৪। সাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস মৌলভীবাজার, সিলেট সাবরেজিস্ট্রার সৈয়দ সিকান্দর আলী তাঁর পিতা। সিলেট গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। শান্তিনিকেতনের স্কুল বিভাগে ভর্তি (১৯২১)। সেখানে পাঁচ বছর অধ্যয়নের পর বিশ্বভারতীর স্নাতক ডিগ্রি লাভ (১৯২৬)। আলীগড় কলেজে কিছুকাল আই.এ. ক্লাসে অধ্যয়ন। এরপর কাবুলের কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ফারসি ও ইংরেজি ভাষার প্রভাষক পদে যোগদান (১৯২৭)। সেখানে প্রায় দুই বছর অধ্যাপনা (১৯২৭-১৯২৯)। হুমবল্ট বৃত্তি পেয়ে জার্মানিতে গমন (১৯২৯)। বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন (১৯২৯-১৯৩১)। 'The Origin of the Khojahs and their life today' অভিসন্দর্ভ রচনা করে বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ (১৯৩২)। কিছুকাল মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন (১৯৩৪-১৯৩৫)। বরোদা রাজ্যের মহারাজ তৃতীয় সয়াজীরাওয়ের আমন্ত্রণে বরোদা কলেজের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক পদে যোগদান (১৯৩৫)। প্রায় দশ বছর সেখানে অধ্যাপনা (১৯৩৫-১৯৪৪)। 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় 'সত্যপির' নামে ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় 'রায়পিথোরা' নামে উপসম্পাদকীয় রচনা (১৯৪৫-১৯৪৯)। ১৯৪৯-এর জানুয়ারি মাসে বগুড়া আজিজুল হক কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান। তাঁর প্রগতিশীল মতবাদ কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেন নি। তাঁরা তাঁকে কমিউনিস্ট, পাকিস্তান-বিরোধী প্রভৃতি অপবাদে আখ্যায়িত করতে থাকেন। তাঁর অধ্যক্ষতাকালে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে সমালোচনা করে কলেজ ম্যাগাজিনে (১৯৪৯) একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কর্তৃপক্ষ বার্ষিকীটি প্রকাশের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব মুজতবা আলীর উপর চাপান (প্রথানুযায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর একটি আশীর্বাণী তাতে স্থান লাভ করে এবং সেটি কবিতায়) এছাড়া তাঁর লেখা 'পূর্ব-পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা' পুস্তিকাখানি ছিল সরকারের স্বার্থের পরিপন্থী। এ-সকল কারণে পাকিস্তান সরকারের কৈফিয়ত তলব। গ্রেফতার এড়াবার জন্য চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বগুড়া ত্যাগ করে ভারত গমন (৮ আগস্ট ১৯৪৯)। কিছুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা (ফেব্রুয়ারি-মে ১৯৫০)। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্সের সচিব পদে নিযুক্তি লাভ (১৯৫০)। ১৯৫২ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া খাতুনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯৫১)। বিয়ের পরেও রাবেয়া খাতুন তাঁর কর্মস্থল পূর্ব-পাকিস্তানে থাকতেন। ১৯৫৩-র ২৯ এপ্রিল স্টেশন ডাইরেক্টর পদে নতুন দিল্লির বেতারকেন্দ্রে যোগদান। কালে পাটনা ও কটক বেতারকেন্দ্রে উক্ত পদে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৫৬-র ১৫ ডিসেম্বর পদত্যাগ। ১৯৫৬-১৯৬১ পর্যন্ত লেখালেখির আয় দ্বারা জীবিকানির্বাহ। ১৯৬১-র ১৮ আগস্ট বিশ্বভারতীর রিডার নিযুক্ত। ১৯৬৫-র ৩০ জুন অধ্যাপনার কর্ম থেকে অব্যাহতি লাভ। সরস মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যধারার প্রবর্তক। ব্যঙ্গ ও রঙ্গ-রসিকতায় তাঁর গদ্যরচনা প্রদীপ্ত। ভ্রমণ কাহিনী, উপন্যাস, সাহিত্য সমালোচনা ও

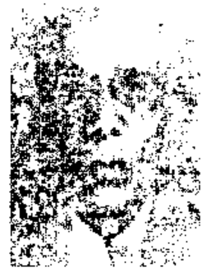
মননশীল প্রবন্ধ মিলিয়ে তাঁর বিপুল সংখ্যক রচনায় পাণ্ডিত্য ও সৃজন ক্ষমতার বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। 'দেশে বিদেশে' (১৯৪৯) 'পঞ্চতন্ত্র' (১৯৫২), 'চাচাকাহিনী'(১৯৫২), 'ময়ূরকণ্ঠী' (১৯৫২), 'জলে-ডাঙ্গায়' (১৯৬০), 'শবনম' (১৯৬০), 'টুনিমেম' (১৯৬৩), 'বড়বাবু' (১৯৬৫), 'শহর-ইয়ার' (১৯৭০), 'কত না অশ্রুজল' (১৯৭১) প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থ। ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বে অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় প্রদান। আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত, মারাঠি, গুজরাতি, ইংরেজি, ফারসি, ইতালিয়ান ও জার্মান ভাষার দক্ষতা অর্জন। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব ও তার তুলনামূলক বিচারে ও উপমহাদেশের স্বল্প সংখ্যক বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন নিষ্ঠাবান অনুরাগী। মৃত্যু. ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী (১৯০২-১৯৮১)॥ জন্ম. করিমগঞ্জ শহর, আসাম, ১ জুলাই ১৯০২। লেখক। পৈতৃক নিবাস মৌলবীবাজার, সিলেট।



সাবরেজিস্ট্রার খানবাহাদুর সৈয়দ সিকান্দর আলী তাঁর পিতা। প্রখ্যাত রম্যসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী দ্বিতীয় অগ্রজ। সিলেট সরকারি স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক (১৯২১), সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এসসি. (১৯২৩) এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি.এসসি. (১৯২৫) ডিগ্রি লাভ। আই.সি.এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেও চাকরি পাননি। ১৯২৬-এ আসাম প্রভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। একই বছর মৌলভীবাজার মহকুমার তৃতীয় শ্রেণির হাকিম পদে নিযুক্তি লাভ। ১৯৪০-এ সাব-ডিভিশনাল অফিসার ও ১৯৪৪-এ শিক্ষা বিভাগের (১৯৪৭) পর পূর্ব-পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান। বিভিন্ন পর্যায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি সেক্রেটারি ও বিভাগীয় কমিশনার পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৫৯-এ সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। অবসর-জীবনে বাংলা একাডেমীর সভাপতি (১৮৬৯-১৯৭১, ১৯৭৫-১৯৭৭) ও বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে বিবৃতি প্রদান (১৭ মে ১৯৭১)। সাহিত্য গবেষণা, ইতিহাস ও স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান। গ্রন্থঃ পশ্চিম পাকিস্তান (১৯৫২), The History of Jaintia (১৯৫৪), History of Chittagong (১৯৫৪), Personality Profiles (১৯৬৬), হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস (১৯৬৫), প্রবন্ধ বিচিত্রা (১৯৬৭), আমাদের কালের কথা (আত্মজীবনী, ১৯৬৮), মুজতবা-কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৭৬)। গবেষণা কর্মের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৭৩)। মৃত্যু. ঢাকা, ৯ আগস্ট ১৯৮১।

সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর (১৮৮৫-১৯৭২)॥ জন্ম. বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা, ৩ জুন ১৮৮৫। ইতিহাসবিদ।



সৈয়দ গোলাম মোস্তফার (অনারেবল ম্যাজিস্ট্রেট ও আইনজীবী) পৌত্র ও সৈয়দ আবদুল আজিজের পুত্র। ঢাকা মাদ্রাসা, কলকাতা মাদ্রাসা ও ঢাকা উকিল ইনস্টিটিউটে অধ্যয়ন। এন্ট্রান্স ক্লাসে ওঠার পর স্কুলের পাঠ ত্যাগ। পিতা পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তাঁর ছোটখাট জমিদারি পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ (১৯০৮)। একই সঙ্গে সরকারি চাকরি লাভের প্রয়াস চালান। নবাব সলিমুল্লাহ ও সৈয়দ আওলাদ হোসেনের সহায়তায় সাব-রেজিস্ট্রারের চাকরি লাভ (১৯০৯)। এ. কে. ফজলুল হকের ভাগ্নি হুরুন্নেসা সারা খাতুনের ('স্বর্গের জ্যোতি' গ্রন্থের লেখিকা) সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯১৪)। ১৯৪২-এ রেজিস্ট্রার পদ থেকে অবসরগ্রহণ। ঢাকা যাদুঘর, ইডেন কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের গভর্নিং বডির এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য। ইতিহাসের গবেষণায় খ্যাতি অর্জন। মোগল আমলের ঢাল-তরবারি, মধ্যযুগের তৈজসপত্র, পুরনো মুদ্রা, নবাবি আমলের আরবি-ফারসি হস্তলিপি, কোম্পানি আমলের চিত্রকলা

প্রভৃতি প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ। তাঁর সংগ্রহে সমৃদ্ধ হয়েছে ঢাকা যাদুঘর। 'Glimpses of Old Dhaka'(১৯৫২) তাঁর একখানি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ। কণ্ঠশিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানু তাঁর কন্যা। মৃত্যু. ঢাকা ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)।

সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন (১৯২৭-১৯৮৬)॥ জন্ম.  পিতার কর্মক্ষেত্র ভোলা, ৬ অক্টোবর ১৯২৭। আইনজীবী ও বিচারপতি। পৈতৃক নিবাস হুগলী। জেলা জজ সৈয়দ তসদ্দক হোসেন তাঁর পিতা। রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৪৮) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি. (১৯৫৩) ডিগ্রি লাভ। ছাত্রজীবনে আবৃত্তিকার, বেতার ও মঞ্চাভিনেতা হিসেবে সুনাম অর্জন। ১৯৫২-র ২৭ এপ্রিল বামপন্থি রাজনৈতিক সংগঠন 'গণতন্ত্রী দল' গঠিত হলে এর প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৪-র এপ্রিল মাসে ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। একই বছর ৩০ মে (১৯৫৪) কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা জারি করে পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিলে গ্রেফতার। 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমি' (১৯৫৫)-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরে এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন। মুক্তিযুদ্ধের (১৯৭১) সময়ে ঢাকা ত্যাগ করে সপরিবার যুক্তরাষ্ট্র গমন এবং সেখানে জাতিসঙ্ঘের ঘোষণাপত্র পরিমার্জনার কাজে যুক্ত থাকেন। ১৯৭৪-এর জুন মাসে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নিযুক্ত। অ্যামনেসটি ইন্টারন্যাশনালের আন্তর্জাতিক কাউন্সিলের সদস্য এবং এর বাংলাদেশ শাখার সভাপতি। এই আন্তর্জাতিক সংস্থা শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার (১৯৭৭) পায়। সংস্থার পক্ষ থেকে যে কয়জন সদস্য নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন, তার মধ্যে এশিয়ার প্রতিনিধিত্বকারীরূপে ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন। ইন্টারন্যাশনাল ল' অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এর বাংলাদেশ শাখার অবৈতনিক সম্পাদক ও পরে সভাপতি। মননশীল, নির্ভীক ও প্রিয়ভাষী বক্তা হিসেবে খ্যাত। তাঁর বাগ্মিতা, চিন্তাশীলতা, স্পষ্টবাদিতা ও অকুতোভয়তা দেশবাসীর কাছে তাঁকে যেমন প্রিয় করে তুলেছিল তেমনি অপ্রিয় করে তুলেছিল সামরিক শাসকদের কাছে। ১৯৮৪-র জানুয়ারি মাসে রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে বিচারপতির আসন থেকে অপসারিত। তাঁর বক্তৃতার সংকলন 'বাংলার কথা' (১৯৮৬) একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। বার্কলের মিলার্ড ফিলমোর ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল ল' কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টর অব ল' উপাধিতে ভূষিত (১৯৭১)। মৃত্যু. ঢাকা, ২ এপ্রিল ১৯৮৬।

সৈয়দ শামসুল হুদা চৌধুরী, নওয়াব, স্যার (১৮৬২-১৯২২)॥ জন্ম.  গোকর্ণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৮৬২। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম.এ. ও বি.এল. পাস। কলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়ায় কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু। ১৯০৮-এ পূর্ববঙ্গ ও আসাম আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯০৯-এ ইমপেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত। ১৯১২-তে অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯১২ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত বাংলার গভর্নরের পরিষদের সদস্য হিসেবে কর্মরত। ১৯১৭ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত। ১৯২১-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত। ১৯১৩-তে নওয়াব ও ১৯১৬-তে কে.সি.আই.ই. উপাধি লাভ। খ্যাতনামা বাঙালি। ন্যায়পরায়ণতা ও প্রখর ব্যক্তিত্বের জন্য খ্যাত। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯২২।

সৈয়দ শাহনূর॥ জন্ম. সৈয়দপুর গ্রাম, সিলেট। কবি ও সংগীতজ্ঞ। একজন জনপ্রিয় পল্লীগানের রচয়িতা ও গায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ। বহু পল্লীগান ও সারিগান রচনা। 'সৈয়দ শাহনূরে বলে আমি মনের নাগাল পাই/নিরলে বসিয়া রূপ/ নয়ান ভরে চাই গো' তাঁর একটি প্রসিদ্ধ গান। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮)॥ জন্ম. পটিয়া, চট্টগ্রাম, ১৫৫০। কবি। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কত সঠিক বলা কঠিন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে: নবীবংশ, শব-ই-মিরাজ, রসুল বিজয়, ওফাৎ-ই-রসুল, জয়কুম রাজার লড়াই, ইবলিশনামা, জ্ঞান চৌতিশা, জ্ঞান প্রদীপ, মারফতী গান ও পদাবলী। কবি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'নবী বংশে'র জন্যই সুপরিচিত। কাব্যখানি নবীদের ছন্দোবদ্ধ জীবনালেখ্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ সুলতান মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রাচীন ও খ্যাতিমান। মৃত্যু. আনুমানিক ১৬৪৮।

সৈয়দ হামজা (আনুমানিক ১৭৩৩-১৮০৭)॥ জন্ম. উদনা গ্রাম, ভুরশুট পরগনা, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ১৭৩৩। কবি। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী। দীর্ঘ ২০ বছর অতিবাহিত করেন শিক্ষকতায়। ফকির শাহ্ গরীবুল্লাহর অনুসারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। রচিত পুঁথির 'জঙ্গনামা' সমাপ্ত। অপর চারটি পুঁথির নাম: মধুমালতী (১৭৭৮), আমীর হামজা, হাতেমতাঈ (১৮০৪) ও জৈগুনের পুঁথি (১৭৯৮)। দোভাষী রীতির অলৌকিক কাহিনী-কাব্য অপেক্ষা রোমান্টিক কাব্যধারার প্রণয়-কাব্য রচনায় অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় প্রদান। 'আমীর হামজা'র শাহ্ গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত পুঁথির 'আমীর হামজা'র অনুসৃতি। হাতেম তাঈ উর্দুতে রচিত আবায়েজা মহফিল কাব্যের অনুবাদ। 'মধুমালতী' কাব্যটি তৎকালীন মুসলিম কবিদের প্রচলিত দোভাষীতে রচিত না হয়ে অবিমিশ্র বাঙলা ভাষায় রচিত। মৃত্যু. ১৮০৭।

সৈয়দা কানিজ ফাতেমা, রোকসনা (১৯৫৫-১৯৮৩)॥ জন্ম. ঢাকা শহর, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫। বৈমানিক। ১৯৬৯-এ প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এস.এস.সি. ১৯৭১-এ শেরে-ই-বাংলা কলেজ থেকে এইচ.এস.সি. পাস। এরপর বি.এসসি. শেষবর্ষ পর্যন্ত পড়াশোনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউশন থেকে Office Administration and Communication for Lady Executives কোর্স সমাপ্ত। বাংলাদেশ ফ্লাইং ক্লাবে প্রশিক্ষণার্থী বৈমানিক হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ। ১৯৮০-র ২ জানুয়ারি বাংলাদেশ বিমানে বৈমানিক হিসেবে যোগদান। ভারতের এয়ার ভাইস মার্শাল আই.বি. স্যাবরা-কর্তৃক ১৯৮০-তে 'সর্বোত্তম ... ...' ... বাংলাদেশ ফ্লাইং ক্লাস-কর্তৃক ১৯৭৯-তে সম্মানসূচক সহ-ফ্লাইং ইন্সট্যাক্টরের পদ প্রদান। মৃত্যু. কর্তব্যরত অবস্থায় বিমান দুর্ঘটনায়, ঢাকা, ৫ আগস্ট ১৯৮৩।

সৈয়দা মোতাহেরা বানু (১৯১১-১৯৭৩)॥ জন্ম. বামনা, পটুয়াখালী, ১৯১১। পৈতৃক নিবাস গট্টিগ্রাম, ফরিদপুর। কবি। পারিবারিক পরিবেশে শিক্ষা লাভ। মুসলিম পরিবারে যখন লেখাপড়ার চর্চা নিষিদ্ধ তখন পিতার কাছে শিক্ষার হাতেখড়ি। আরবি, ফারসি, উর্দু, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান অর্জন। প্রথম কবিতা রচনা করেন ষোলো বছর বয়সে। মুসলিম ভারত, ভারতবর্ষ, সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী আজাদ, বেগম প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর অজস্র কবিতা ছাপা হয়। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর রচিত গান রেকর্ড করা হয় কে. মল্লিকের কণ্ঠে। কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। নজরুল ইসলামের কাছ থেকে সাহিত্যচর্চার প্রেরণা পান। তাঁর প্রকাশিত বই নেই। মৃত্যু. ঢাকা, ১৯৭৩।

সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২)॥ জন্ম. বালিয়া গ্রাম, পলাশ, নরসিংদি, ২৪ মে ১৯২০। পূর্ণনাম সোমেন্দ্রকুমার চন্দ। সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। ঢাকা পোগোজ স্কুল থেকে ১৯৩৬-এ দ্বিতীয় বিভাগে মেট্রিক পাস। ঢাকা মিডফোর্ড মেডিকেল স্কুলে ভর্তি। এক বছর এ স্কুলে



পড়ার পর অসুস্থতার কারণে পড়াশুনা ত্যাগ। রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির সার্বক্ষণিক গোপন কর্মী হিসেবে। এই সময়েই তাঁর সাহিত্য জীবনেরও শুরু। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য জীবনের পরিধি। জীবদ্দশায় কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যুর পর ঢাকার প্রগতি লেখক সঙ্ঘ প্রকাশ করে: সংকেত ও অন্যান্য গল্প (১৯৪৩), কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়: বনস্পতি ও অন্যান্য গল্প (১৯৪৪)। ঢাকা কালিকলম প্রকাশনী থেকে এই দুটি গ্রন্থের সংযুক্ত রূপ 'সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ' নামে ... সম্পাদনায় প্রকাশিত ১৯৭৩-

এ সোমেন চন্দের রাজনৈতিক জীবনই ছিল তাঁর কর্মজীবন। সাহিত্যচর্চা ছিল এই জীবনেরই ভিন্নতর প্রকাশ। ১৯৩৯-এ সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের যে শাখা ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় তা সংগঠনে তাঁর বিশেষ শ্রম ও ভূমিকা ছিল। তাঁর লেখা গল্পগুলো মূলত এই সঙ্ঘের সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক বৈঠকে পাঠের জন্য লেখা। বেশ কিছু গল্প কয়েকটি বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়ে সমাদর লাভ করে। সোমেন চন্দ দায়বদ্ধ লেখক ছিলেন, এই দায়বদ্ধতা তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসে থেকে এসেছে, ফলে তাঁর রচনায় একদিকে যেমন সামাজিক বাস্তবতা এসেছে, তেমনি সেই সামাজিক বাস্তাবতার ভেতরে থেকে গণ-চেতনার তীক্ষ্নতা ও প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যু. ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়াকালে ফ্যাসিবাদ সমর্থকদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত, ঢাকা, ৮ মার্চ ১৯৪২।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-১৯৭৪)ঃ জন্ম. জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ১৯০১। রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক।



রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র। ঠাকুরপরিবারের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বাড়িতেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত। দশ বছর বয়সে ক্রোবেল ইনস্টিটিউশনে ভর্তি। পরে মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯১৭-তে মেট্রিক ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২১-এ অর্থনীতিতে অনার্সসহ বি.এ. পাস। ১৯১৭-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গান গেয়ে সভানেত্রী অ্যানিবেশান্তসহ অন্যদের প্রশংসা লাভ। ১৯২১-এ নিখিল ভারত ছাত্রসম্মেলনে যোগদানের জন্য আমেদাবাদ গমন। এ-সময়ে কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হন। ১৯২৬-এ শ্রমিক-কৃষক দলের মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকার মাধ্যমে মুজাফ্ফর আহমদ ও নজরুল ইসলামের ম্যানিফেস্টোর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯২৭-এ শ্রমিক-কৃষক দলের দ্বিতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভায় সভাপতিত্ব করেন। সমকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে পিতা সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৯২৭-এ ইউরোপে প্রেরণ। ইউরোপে কমিউনিস্ট ভাবধারার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। ১৯২৮-এ ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের জন্য মস্কো গমন। এ সময় থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান। এক সময়ে ব্রিটিশ সরকার-কর্তৃক গ্রেফতার। মুক্তিলাভের পর গোপন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জার্মানি গমন। জার্মানিতে একটি কবিতার বই প্রকাশ করলে হিটলার সরকার কর্তৃক গ্রেফতার। পরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে জার্মান কারাগার থেকে মুক্তিলাভ। প্যারিস যাওয়ার পথে পুনরায় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গ্রেফতার। মুক্তির পর দেশে প্রত্যাবর্তন। কিছুকাল পর আবার গ্রেফতার। এভাবে স্বাধীনতার (১৯৪৭) পূর্ব পর্যন্ত প্রায় আট বছর জেলে অতিবাহিত। ১৯২৭-এ 'দি রিভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' নামক রাজনৈতিক দল গঠন। পরে নীতিগত মতবিরোধের জন্য এই দল দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। কল্লোল গোষ্ঠীর একজন লেখক। বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি ও রুশ ভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— বাংলা গ্রন্থ: বিপ্লবী রাশিয়া, ত্রয়ী, যাত্রী ও রবীন্দ্রনাথের গান। বঙ্গানুবাদ: রাশিয়ার কবিতা। ইংরেজি ভাষায়: কমিউনিজম অ্যান্ড ফ্যাসিজিম, ট্যাকটিশ অ্যান্ড স্ট্রাটেজি অফ রিভলিউশন। জার্মান ভাষায়: স্টানিউর রিভলিউশন। ফরাসি ভাষায়: গান্ধী। ফ্যাসিবাদের উপর লেখা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন: হিটলারিজম অ্যান্ড দি এরিয়ান রুল ইন জার্মানি। রবীন্দ্র-সাহিত্য, শিল্প ও সংগীতের অন্যতম প্রবক্তা সৌম্যেন্দ্রনাথ বিপ্লবী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঠাকুর পরিবারে তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট রাজনীতিতে তিনি ছিলেন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। মৃত্যু. ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

স্বদেশ বসু (১৯২৮-২০০৯) জন্ম: কাশিপুর, বরিশাল, ২ জানুয়ারি ১৯২৮। রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদ। পিতা নিরোদচন্দ্র বোস, মাতা কুসুমকুমারী বোস। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামেই। কিশোর বয়সেই তিনি ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪৪-এ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি। ১৯৪৮-এ ভাষার দাবি উত্থাপিত হলে মার্চ মাসে বরিশালের

মোজাম্মেল হক, আবদুল খালেক ও কাজী



বাহাউদ্দীনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইশতেহার প্রকাশ করেন। ১০ মার্চ গ্রেফতার হন: প্রায় ৮ বছর নানা অজুহাতে তাকে জেলে রাখা হয়। খাদ্য-আন্দোলন, ময়মনসিংহে ছাত্র আন্দোলন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, নূরুল আমিনের জনসভায় মালেক হত্যা প্রভৃতি অভিযোগ তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত। জেলে থেকে পরীক্ষা দিতে চাইলে অনুমতি মেলেনি। ১৯৫৬-এ মুক্তি পান। ১৯৫৮-এ বরিশালের চাখার কলেজ থেকে বিএ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে এম.এ. শ্রেণিতে ভর্তি। ১৯৬০-এ এম.এ. পাসের পর ১৯৬১-এ করাচিতে PIDE (Pakistan Institute of Development Economics)-এ চাকরি নেন। ১৯৬২-এ ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তি। কিন্তু বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী বলে আমেরিকান ভিসা থেকে বঞ্চিত। ১৯৬৩-এ তাঁর রাজনৈতিক বন্ধু ইমাদুল্লাহ বসন্ত রোগে মারা গেলে তাঁর স্ত্রী নূরজাহান বেগমকে (পরে নূরজাহান বোস নামে পরিচিত) বিয়ে করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬-এ 'Economic Co-Operation among South Asian Countries' শীর্ষক গবেষণা করে পিএইচ.ডি. লাভ। আওয়ামী লীগের ছয়-দফার সঙ্গে একাত্মতা। ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে ভাষার দাবি তোলার প্রথম দিকে বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করতে গিয়ে গ্রেপ্তারবরণ। এরপর দফায় দফায় মামলা দিয়ে দীর্ঘ সময় তাঁকে জেলের ভেতর রাখে পাকিস্তান সরকার। 'কমিউনিস্ট' পরিচয়ের কারণে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ভিসা দেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে যোগদান করেন আগের কর্মস্থল পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকসে। ১৯৬৬-এ তিনি আওয়ামী লীগের ছয় দফা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং অনেকের সঙ্গে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকস (পিআইডিই) থেকে দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য তুলে ধরেন। ১৯৭০-এ পিআইডিই ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ। মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের পরিকল্পনা সেলের সদস্য নিযুক্ত। স্বাধীনতার পরে নবগঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর মহাপরিচালক নিযুক্ত। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সদস্য। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে 'Food Suply in Bangladesh' নামে তাঁর মৌলিক গবেষণা রয়েছে। ১৯৭৪-এ বিশ্বব্যাংকে যোগদান এবং ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ওয়াশিংটনে দায়িত্বপালন। পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনের শেষভাগে নির্বাক ছিলেন বহুদিন। মৃত্যু. ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর, ২০০৯। তাঁর দেহভস্ম মনোরমা বসু মাসিমার সমাধির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

স্বপনকুমার চৌধুরী (১৯৪৯-১৯৭১)। জন্ম. ঢেমশা গ্রাম, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, ৩১ অক্টোবর ১৯৪৯। মুক্তিযোদ্ধা ও ছাত্রনেতা। রাঙ্গুনিয়া এম.এম. হাইস্কুল থেকে ১৯৬৫-তে বিজ্ঞানে মেট্রিক (প্রথম বিভাগ এবং রাঙ্গুনিয়া কলেজ থেকে ১৯৬৭-তে আই.এসসি. (প্রথম বিভাগ) পাস। ১৯৬৭-১৯৭০ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে বি.এসসি. অনার্স কোর্সে অধ্যয়ন। ১৯৬৯-১৯৭০-এ পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক। ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী। ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনে এবং ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগদান। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতে গেরিলাযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ। দেশে ফিরে এসে নিজস্ব এলাকায় মুক্তিবাহিনী সংগঠন। ১৯৭১-এ পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে রাঙ্গুনিয়া পাহাড়ে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত।



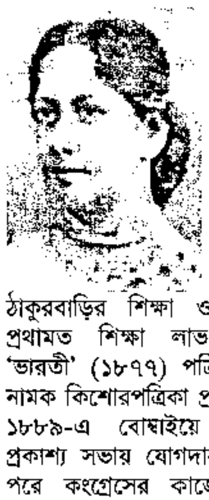
স্বরূপেন্দু সরকার (১৯৩৩—২০০৯)। জন্ম. চরবানিয়ারি, বাগেরহাট, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩। কবিয়াল ও লেখক। মাতা বিনোদিনী সরকার। পিতা কৃষ্ণকান্ত সরকার। স্ত্রী নীলিমা সরকার। উমাজুড়ি প্রাইমারি, চরবানিয়ারি নিম্নমাধ্যমিক,

এবং চিতলমারী হাই স্কুলে পড়াশুনা (১৯৪১–১৯৫০)। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেন দিঘিরজান হাইস্কুল থেকে ১৯৫১-তে। মাতার মৃত্যুজনিত কারণে পরীক্ষা অসমাপ্ত। পরের বছর পরীক্ষার পূর্বেই সপরিবার দেশত্যাগ। প্রথমে বর্ধমানের রামচন্দ্রপুর উদ্বাস্তু শিবিরে, পরে মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার নৃসিংহপুর এলাকার ঘনশ্যামপুর গ্রামে, এবং সেখানে বন্যা দেখা দিলে বর্ধমানের কাটোয়া শহরে বসবাস। ১৯৫৩-তে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদান এবং



কয়েক মাস পরে চাকরি ত্যাগ। ১৯৫৬-এ ফটোগ্রাফির কাজে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা এবং নকুলেশ্বর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ও কবিগান শেখার চেষ্টা। ১৯৫৮-এ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর রাজেন্দ্রনাথ সরকারের দলে কবিগানের তালিম গ্রহণ। ১৯৬০-এ নিশিকান্ত সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং কবিগানের দল গঠন। ১৯৬০ থেকে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত আসরগুলোতে খ্যাতিমান কবিয়ালদের বিপক্ষে কবিগান পরিবেশন। ডাক, মালসি, সখীসংবাদ, কবি ও ধুয়া পর্যায়ের অনেক গান রচনা। তাঁর থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ কবিয়ালগণও এইসব গান ব্যবহার করেন। 'ভাটির নাইয়া' নামে তাঁর ধুয়াগানের সংকলন (১৯৬৫, ২য় সং ২০০৪) প্রকাশ। বিখ্যাত মতুয়া শশী বানিয়ার নিকট মতুয়া ধর্মাদর্শে দীক্ষিত এবং এই ধর্মাদর্শের অন্যতম প্রচারক। মতুয়া আদর্শের বেশ কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা। এগুলো হলো: 'শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের পাঁচালী' (১৯৬৫), 'ঠাকুর এলো মোদের ঘরে' (১৯৬৬), 'মহালক্ষ্মী শান্তিদেবীর পাঁচালী' (১৯৯৮), 'পতিতপাবন গুরুচাঁদ' (২০০০), 'সমাজসংস্কারে মতুয়া' (২০০১), 'ছোটদের ধর্মগ্রন্থ' (২০০২), 'পাগল হরিভজন' (২০০৩), 'শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনকথা' (২০০৬), এবং 'পতিতের বান্ধব' (২০১০)। গুরুর মতোই টপ্পা-পাঁচালিতে তিনি সমকালের কবিয়ালদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রমিত ভাষা ব্যবহারে অত্যন্ত সচেতন। রাজেন্দ্রনাথ সরকার, নকুলেশ্বর সরকার, নিশিকান্ত সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার, রসময় সরকার, ছোট রাজেন্দ্রনাথ সরকার, কালীদাস সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, গৌর সরকার, নারায়ণচন্দ্র বালা, কালোশশী চক্রবর্তী, প্রিয়নাথ সরকার, অমূল্য সরকার, সরোজ সরকার, নন্দলাল সরকার, দ্বিজবর সরকার, অনাদিজ্ঞান সরকার, নারায়ণচন্দ্র সরকার, সন্ধ্যা সরকার, মণিলাল সরকার প্রমুখের বিপরীতে নিয়মিত কবিগান পরিবেশন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত অমূল্য সরকার, কৃষ্ণকান্ত সরকার, নিখিলচন্দ্র সরকার, সুরঞ্জন সরকার, হরিবর সরকার, হরিদাস সরকার, তিমির সরকার প্রমুখ। ১৯৭৯-এ বাগেরহাটের রাজাপুর গ্রামের মতুয়া সম্মেলনে 'কবিসিন্ধু', ২০০৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বীরেন্দ্র স্মৃতি সংসদ থেকে 'কবিসুরশ্রী' এবং ২০০৮-এ ঢাকার মতুয়া সম্মেলনে 'মতুয়ারত্ন' উপাধি লাভ। মৃত্যু. রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১৯ মে ২০০৯।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)॥ জন্ম. জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ২৮ আগস্ট ১৮৫৫। কথাসাহিত্যিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী। স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক।



ঠাকুরবাড়ির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রথামত শিক্ষা লাভ। ১৮৮৪-১৮৯৪-পর্যন্ত 'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকা সম্পাদনা। 'বালক' নামক কিশোরপত্রিকা প্রতিষ্ঠা তাঁর অপর কীর্তি। ১৮৮৯-এ বোম্বাইয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের প্রকাশ্য সভায় যোগদানকারী অন্যতম মহিলা। পরে কংগ্রেসের কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণ। ১৮৮৬-তে বৈশাখ মাসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সখি সমিতির' উদ্যোগে বেথুন স্কুল ভবনে একটি মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশি দ্রব্যাদির প্রচার। রচিত প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ (১৮৭৬)। অন্যান্য উপন্যাস: মেবার রাজ (১৮৭৭), ছিন্ন মুকুল (১৮৭৯), মালতী (১৮৮০), হুগলির ইমাম বাড়ি (১৮৮৮), বিদ্রোহ (১৮৯০), কাহাকে (১৮৯৮), বিচিত্রা (১৯২০),

স্বপ্নবাণী (১৯২১), মিলনরাত্রি (১৯২৫) : নাটক: বসন্ত উৎসব (১৮৭৯), বিবাহ উৎসব (১৯০১), দেবকৌতুক (১৯০৫), কনে বদল (১৯০৬), পাকচক্র (১৯০৬), রাজকন্যা (১৯১১), নিবেদিতা (১৯১৭), যুগান্ত (১৯২২), ও দিব্যকমল (১৯৩০) ; কাব্য: গাথা (১৮৯০), কবিতা ও গান (১৮৯৫)। বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ: পৃথিবী (১৮৮২)। সংগীত রচনায় ও দক্ষতার পরিচয় প্রদান। ১৯২৯-এ অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের মূল সভানেত্রী। ১৯২৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান। মৃত্যু. ৩ জুলাই ১৯৩২।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০৩)॥ জন্ম. কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩। হিন্দুধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। আইনজীবী বিশ্বনাথ দত্ত তাঁর পিতা। পারিবারিক পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ, পরে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে



অধ্যয়ন। ১৮৮৩-তে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে বি.এ. পাস। কিছুকাল আইন ক্লাসে অধ্যয়ন। পিতার মৃত্যুর পর চরম অর্থসংকটে পড়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা পরিত্যাগ। কিছুকাল মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতা। এই সময়ের মধ্যে দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন। সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সংগীত ও ব্যায়ামেও পারদর্শিতা অর্জন। রামমোহন রায়ের বেদান্ত দর্শন পড়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট। কলেজে পড়ার সময় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সান্নিধ্য লাভ ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ। রামকৃষ্ণের মৃত্যুও (১৮৮৬) পর তাঁর কিছু শিষ্যের সহায়তায় বরাহনগরে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন। এই সময়ে সন্ন্যাসদর্শ গ্রহণ এবং বিবেকানন্দ নামে অভিহিত (পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত)। তিন বছরকাল পরিব্রাজকরূপে সমস্ত ভারত ভ্রমণ। জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণায় জয়পুরের সভাপণ্ডিতদের কাছে পাণিনি, ক্ষেত্রীয় সভাপণ্ডিত নারায়ণ দাসের কাছে পতঞ্জলি এবং পাণ্ডু রায়ের কাছে বেদান্ত অধ্যয়ন। শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিরূপে যোগদানের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজবাসী বন্ধুদের সহায়তায় ১৮৯৩-এর ১৩ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা। সেখানে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে অসামান্য বাগ্মীরূপে পরিচিতি লাভ। ১৮৯৯-এ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা। এ বছরই বেদান্ত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকল্পে পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে গমন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ধর্ম-ইতিহাস সম্মেলনে যোগদান। ১৯০০-তে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বেনারসে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, রামকৃষ্ণ হোম, রাককৃষ্ণ পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপন। রচিত গ্রন্থ: পরিব্রাজক (১৯০৩), ভাববার কথা (১৯০৫), বর্তমান ভারত (১৯০৫,) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, Karmayoga, Rajayoga, Jnanayoga। বাংলা সাহিত্যে সফল কথ্যরীতির অন্যতম প্রধান প্রচারক। তাঁর বক্তৃতা ও রচনা তেজ, বীর্য, কর্তব্যপরায়ণতা, উদারতা, দেশানুরাগ, সাম্য, স্বাধীনতা, সর্বজীবে দয়া, ত্যাগ ও বৈরাগ্যসাধনার বাণীতে ভাস্বর। মৃত্যু. বেলুড় মঠ, ৪ জুলাই ১৯০২।

হবিবুর রহমান (১৯২৩-১৯৭১)॥ জন্ম. বালিয়াধার গ্রাম, নোয়াখালী, ১৯২৩। শিক্ষাবিদ। স্থানীয় দত্তপাড়া হাইস্কুল থেকে ১৯৩৮-এ মেট্রিক, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪০-এ আই.এসসি. কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ



থেকে ১৯৪৩-এ বি.এসসি. অনার্স (গণিত) পাস। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬-এ এম.এসসি. (গণিত)-তে রেকর্ড সংখ্যক নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪-তে গণিতে ট্রাইপস ডিগ্রি লাভ। ১৯৪৬-১৯৫৪ পর্যন্ত প্রভাষক, প্রেসিডেন্সি ও ইসলামিয়া কলেজ এবং ঢাকা কলেজ। ১৯৫৪-তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপনায় যোগদান। ১৯৫৮-এ রিডার পদে উন্নীত। ১৯৬২-তে যুক্তরাষ্ট্র গমন এবং ফলিত গণিতের বিভিন্ন উচ্চতর বিষয়ে অধ্যয়ন। ১৯৬৪-১৯৬৬ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ। ১৯৬৭-১৯৭০ পর্যন্ত রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ আমীর আলী হলের প্রাধ্যক্ষ। ১৯৭০-১৯৭১-এর এপ্রিল পর্যন্ত পুনরায় বিভাগীয় অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থাবলিঃ যোগাশ্রয়ী বীজগণিত, কলেজ বীজগণিত, নতুন বীজগণিত, পাটিগণিত, On Pell's Equation। তাঁর রচিত বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধে বিশ্বাসী। ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ১৯৬৯-এর আইয়ুব-বিরোধী গণ-আন্দোলন এবং ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের বলিষ্ঠ সমর্থক এবং প্রত্যক্ষভাবে এ-সকল আন্দোলনে অংশগ্রহণ। গণিতে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। গণিতের পাঁচশত বছরের একটি অমীমাংসিত সূত্রের সঠিক মীমাংসা করতে সক্ষম হন ১৯৭০-এ এর অক্টোবরে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাদানে উৎসাহী ছিলেন। মৃত্যু. ১৯৭১-এর ১৫ এপ্রিল পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তাঁকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে।

হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬)॥ জন্ম. গুথুমা গ্রাম, ফেনী, ১৯০৬। রাজনীতিবিদ ও লেখক। সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান মুসলমান পরিবারে জন্ম। পিতা মোহাম্মদ নুরুল্লাহ চৌধুরী। শামসুন নাহার মাহমুদ তাঁর বোন। তিন বছর বয়সে পিতৃহীন হন।



মাতামহ খানবাহাদুর আবদুল আজিজের চট্টগ্রামের বাড়িতে শৈশব ও কৈশোর কাল কাটান। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯২২), চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই.এসসি. (১৯২৪) ও কালকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. (১৯২৮) পাস। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত (১৯২৭)। ১৯৩১-এ কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব 'বি' টিমের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত; তাঁর অধিনায়কত্বে এটি 'এ' টিমে উন্নীত। ১৯৩২-এ আই.পি.এস. (ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সূর্য সেনের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের অভিযোগে পুলিশ রিপোর্ট খারাপ থাকায় চাকরি লাভ থেকে বঞ্চিত. ছোটবোন শামসুন নাহারের যুগ্ম-সম্পাদনায় চতুর্মাসিক সাহিত্যপত্র 'বুলবুল' (১৯৩৩) প্রকাশ। এটি দ্বিতীয় বর্ষে (১৯৩৪) ত্রৈমাসিক ও তৃতীয় বর্ষে (১৯৩৬) মাসিকপত্রে রূপান্তরিত। ১৯৩৭-এ বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত; ১৯৩৮-এ আনোয়ারা হকের (পরবর্তীকালে আনোয়ারা বাহার চৌধুরী) সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৩৯-এ সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি কমিটির সহ-সহসভাপতির পদ লাভ। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণে এই কমিটির ভূমিকা সর্বজনবিদিত। ১৯৪০-এ লাহোরে মুসলিম লীগের সম্মেলনে যোগদান। এ সম্মেলনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত (২৩ মার্চ ১৯৪০)। পূর্ব-পাকিস্তান রেঁনেসা সোসাইটির (১৯৪৩) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৪৪-এ বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক ও বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (আপার হাউস) সদস্য নির্বাচিত। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন (১৯৪৫-১৯৪৬)। ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের মনোনয়নে ফেনীর পরশুরাম এলাকা থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। নির্বাচনের সময়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দক্ষিণহস্ত হিসেবে কর্ম সম্পাদন। নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাফল্যের মূলে তাঁর অবদান যথেষ্ট। কলকাতা পোর্ট হজ কমিটির নির্বাচিত চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন (১৯৪৬-১৯৪৮)। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নোয়াখালীর দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা পরিভ্রমণ ও সিলেট রেফারেন্ডামে অংশগ্রহণে (জুলাই ১৯৪৭)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪আগস্ট ১৯৪৭) পর পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত। মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালনকালে মশক নিধন অভিযান সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা। ঢাকা শহরকে মশকমুক্ত করার ব্যাপারে অভূতপূর্ব সাফল্যের পরিচয় প্রদান। ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের (১৯৪৮) অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। পূর্ব-পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের (১৯৫১) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৫৩-র ৬ এপ্রিল ব্লাডপ্রেসার স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ ও রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ। বিশিষ্ট গদ্য লেখক। ওমর ফারুক, আমীর আলী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, পাকিস্তান প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভক্ত-শিষ্য'। হবীবুল্লাহ বাহারের আমন্ত্রণে কবির ১৯২৬-এ প্রথমবার ও ১৯২৯-এ

দ্বিতীয়বার চট্টগ্রামে আগমন এবং বাহারের মাতামহের বাড়ি 'আজিজ মঞ্জিলে' অবস্থান। নজরুল কর্তৃক তাঁর 'সিন্ধু হিন্দোল' (১৯২৭) কবিতাগ্রন্থ বাহার-নাহার-এর নামে উৎসর্গ। খ্যাতনামা বাঙালি। রাজনীতি, সাংবাদিকতা, খেলাধুলা, সাহিত্য সর্বত্রই কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান। মৃত্যু. ঢাকা, স্ট্রোকে, ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬।

হরচন্দ্র চৌধুরী, বিদ্যাবিনোদ॥ লেখক, পণ্ডিত, গবেষক, সংস্কৃতিসেবী। শেরপুরের বিদ্যোৎসাহী জমিদার। শেরপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান (১৮৮৬-১৮৮৮)। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত। ময়মনসিংহ জেলায় আধুনিক সংস্কৃতিচর্চার পথিকৃৎ। ময়মনসিংহ জেলার শেরপুরে 'বিজ্ঞাপনী' নামক ছাপাখানা স্থাপন এবং 'বিদ্যোন্নতি সাধিনী' (১৮৬৫), নামক পত্রিকা প্রকাশ। উক্ত পত্রিকা ১৮৮১-এ সাপ্তাহিক 'চারুবার্তায়' রূপান্তরিত। 'বিজ্ঞাপনী' ছাপাখানারও 'চারুপ্রেস' নাম ধারণ। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'র প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ এই চারুপ্রেস থেকেই মুদ্রিত। নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনহিতকার কাজের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে ৩০ হাজার বইসমৃদ্ধ শেরপুরের হেমাঙ্গ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা। পারিবারিক গ্রন্থাগারের জন্য প্রচুর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ। রচিত গ্রন্থসমূহ: শেরপুরের বিবরণ (১৯৭২), বংশানুচরিত, জীবনের নশ্বরতা, শেরপুরের বংশাবলী, মানুষের মহত্ত্ব, ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির কর্মকাণ্ড প্রভৃতি। জন্ম ও মৃত্যু. তারিখ অজ্ঞাত।

হরদয়াল নাগ (১৮৫৩-১৯৪২)॥ জন্ম, কাশিমপুর, মতলব, চাঁদপুর, ১৮৫৩ পিতা গুরুপ্রসাদ নাগ, মাতা গোবিন্দপ্রিয়া। ১৮৭৪-এ ঢাকা কলোজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করেন। কিছুদিন সরকারি চাকুরির পর ১৮৮৩-এ আইনের সনদ লাভ করেন।



দীর্ঘদিন চাঁদপুর আইনজীবী সমিতির সভাপতি ছিলেন। আইন ব্যবসায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে রাজনীতি ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ। ঢাকায় অবস্থানকালে ভারত হিতৈষিণী' (১৮৮০-৮৩) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তখন কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সংস্পর্শ লাভ। ১৮৮৬-এ কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯০৭-এ বিদেশি পণ্যবর্জন আন্দোলনে গ্রেফতার। ১৯০৬-এর মার্চে গঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত এবং ১৯২২-৪২ পর্যন্ত এর সহসভাপতি। চাঁদপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ১৯২১-এ এপ্রিল-মে মাসে সিলেটের চা-বাগানের কুলীদের বিদ্রোহ ও কর্মত্যাগ এক সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। ইংরেজ মালিকরা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতো, তাদের ওপর চাপাতো অকথ্য নির্যাতন। কুলীদের আন্দোলনে সমর্থনদান। ১৯৩০-এ লবণ আন্দোলনে ত্রিপুরা, সিলেট ও নোয়াখালী জেলার নেতৃত্বদান। ১৯৩২-এ আইন অমান্য আন্দোলনে ছয় মাস কারাভোগ। বহরমপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৫-এ কলাতায় কংগ্রেসের সুবর্ণজয়ন্তী সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁর বাসভবন 'হরদয়াল ভবন' ছিল রাজনৈতিক ও সমাজসেবীদের মিলনক্ষেত্র। গান্ধীবাজী হিসেবে 'চাঁদপুরের গান্ধী' নামে পরিচিতি লাভ। মৃত্যু. ১৯৪২।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)॥ জন্ম, নৈহাটি, পশ্চিমবঙ্গ, ৬ ডিসেম্বর-১৮৫৩। পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। আট বছর বয়সে পিতা রামকমল ভট্টাচার্যের মৃত্যু ঘটলে আর্থিক সংকটে পড়ে টিউশনি করে লেখাপড়ার ব্যয়নির্বাহ। গ্রামের স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৮৬৬-তে



কলকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ। ১৮৭১-এ প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স, ১৮৭৩-এ ১৯তম স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে এফ.এ., ১৮৭৬-এ ৮ম স্থান অধিকার করে বি.এ. পাস। বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম হওয়ায় প্রতি মাসে ৫০ টাকা 'সংস্কৃত কলেজ স্নাতক বৃত্তি', ২৫ টাকা 'লাহা বৃত্তি' এবং রাধাকান্ত দেব মেডেল' লাভ। ১৮৭৭-এ একই কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে

প্রথম স্থান অধিকার করে সংস্কৃতে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন এবং কৃতিত্বের জন্য 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ। ১৮৭৮-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি হেয়ার স্কুলের অনুবাদ শিক্ষক নিযুক্ত। একই বছর মার্চ মাসে হেমন্তকুমারীর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ। ১৮৮৩-র জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্তি লাভ। একই বছর ২০ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সরকারে অনুবাদ বিভাগে সহকারী অনুবাদকের পদে যোগদান। ১৮৮৬-র জানুয়ারি মাসে জনশিক্ষা বিভাগের অধীনে বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্তি লাভ। ১৮৯৫-র জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক পদে যোগদান। ১৯০০ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন। একই বছর ৮ ডিসেম্বর (১৯০০) সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং বঙ্গদেশের সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিস্ট্রারের পদ অলংকৃত। ১৯০৮-এ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ। সরকার কর্তৃক তাঁকে ইতিহাস, ধর্ম, লোকাচার, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য গঠিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যুরো অব ইনফরমেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদ প্রদান। ১৯২১-এর ১৮ জুন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের (১৯২১) বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৯২৪-এর ৩০ জুন এ পদ থেকেও অবসর গ্রহণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতি (১৮৯৭-১৯০২, ১৯১১-১৯১২, ১৯১৬-১৯১৯, ১৯২৮ ও ১৯৩০-১৯৩১, ১৯১৩-১৯১৫, ১৯১৯-১৯২৩, ১৯২৫-১৯২৯) পদে দায়িত্ব পালন। এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি (১৯১৯-১৯২১)। সোসাইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থান এবং সুদূর নেপাল ও তিব্বত থেকে বহু দুস্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ। ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর হিসেবেও দায়িত্ব পালন। লন্ডন এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি সদস্য। বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' নেপালের রাজদরবার থেকে উদ্ধার করে ১৯১৬-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশ এবং বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণ। চর্যাপদ আবিষ্কার ও প্রকাশিত হওয়ার পরই পণ্ডিত সমাজ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য হাজার বছরের পুরনো। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লেখক প্রতিভার সূচনা হয়েছে ছাত্রজীবন থেকে। বি.এ. ক্লাসে অধ্যয়নকালেই 'ভারত মহিলা' প্রবন্ধ রচনা করে হোলকার পুরস্কার লাভ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বাল্মীকির জয় (১৮৮১), মেঘদূত ব্যাখ্যা (১৯০২), কাঞ্চনমালা (উপন্যাস, ১৯১৬), হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা (১৯১৬), বেণের মেয়ে (উপন্যাস, ১৯২০), প্রাচীন বাংলার গৌরব (১৯৪৬), বৌদ্ধধর্ম (১৯৪৮)। ইংরেজি গ্রন্থ: Vernacular Literature of Bengal before the Introduction of English Education (১৮৯১), Discovery of Living Buddhism in Bengal (১৮৯৭), Magadhan Literature (১৯২৩), Sanskrit Culture in Modern India (১৯২৮)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একাধারে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, বহু ভাষাবিদ, দার্শনিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক। প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বহু নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্য তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৮৯৮-তে 'মহামহোপাধ্যায়' এবং ১৯১১-তে সি. আই. ই. উপাধি লাভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক ডি-লিট, উপাধিতে ভূষিত (১৯২৭)। মৃত্যু. ১৭ নভেম্বর ১৯৩১।

হরলাল রায় (১৯১৩-১৯৯৪)॥ জন্ম. সুবর্ণখুলি



গ্রাম, রংপুর, ১৯১৩। কণ্ঠশিল্পী। বগুড়া মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাস। ঢাকা বেতারকেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পী। ভাওয়াইয়া গানের বিশিষ্ট গায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর কাল রেডিও টেলিভিশনে এ গান পরিবেশন করে নিজেকে একজন উচ্চমানের কণ্ঠশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। 'ভাইল পাক কররে কাঁচা মরিচ দিয়া', 'গোস্বা করি না খাইয়া ভাত' প্রভৃতি ভাওয়াইয়া গান গেয়ে সংগীতরসিকদের মন জয়। চলচ্চিত্রের অভিনেতা হিসেবেও খ্যাত। 'ধারাপাত', 'জোয়ার এলো', 'নদী ও নারী', 'কাঁচকাটা হীরে', 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'পালঙ্ক' ছবিতে অভিনয়। এদেশের একজন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। ভাওয়াইয়া গান জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মৃত্যু. ৪ নভেম্বর ১৯৯৪।

হরিচরণ আচার্য (১৮৬১-১৯৪১)॥ জন্ম. নরসিংদী, ১৮৬১। কবিয়াল। ছাত্রবৃত্তি পাস করে সাটিরপাড়ার রঘুনাথ ব্রহ্মচারীর টোলে চতুষ্টয়

বৃত্তি পর্যন্ত অধ্যয়ন। রামকানাই আচার্য,



বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী, হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ খ্যাতনামা কবিয়ালের কাছে কবিগান শিক্ষা গ্রহণ। গানের দল গঠন করে বাংলার গ্রামে গ্রামে কবিগান পরিবেশন। 'কবির সরকার' রূপে টপ্পা ও ছড়া-পাঁচালী রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন। গ্রন্থ: গানের সংকলন–কবির ঝঙ্কার (১ম ও ২য় খণ্ড-১৯৫৩) অমিয় লহরী (১৯৩১); গদ্য-বঙ্গের কবির লড়াই (১৯৩১), বসন্ত লীলামৃত। বসন্ত সাধুর শিষ্য বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হরিচরণ আচার্য কর্তৃক নিজ গ্রামে 'শ্রীশ্রী গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শিষ্যদের গান, কবিতা, পাঁচালী রচনা ও শাস্ত্র শিক্ষাদান। কিশোরগঞ্জের পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক 'কবিগুণাকর' উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু. ১৯৪১ (১৩ জ্যৈষ্ঠ-১৩৪৮)।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯)॥ জন্ম.



মাতুলালয়, রামনারায়ণপুর, চব্বিশ পরগনা, ২৩ জুন ১৮৬৭। শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত ও আভিধানিক। পৈতৃক নিবাস মশাইকাটি গ্রাম, বসিরহাট, চব্বিশ পরগনা। এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। পিতা নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সামান্য বেতনে স্থানীয় জনৈক জমিদারের কাচারিতে চাকরি করতেন। মশাইকাটি পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষারম্ভ। এরপর বসিরহাট মাইনর স্কুল, বাদুড়িয়া লন্ডন মিশনারি স্কুল, আড়বলিয়া স্কুল ও ধান্যকুড়িয়া স্কুলে অধ্যয়নের পর কলকাতার জেনারেল অ্যাসেম্বলির সেকেন্ড ক্লাসে ভর্তি। পরীক্ষায় ভালো ফল করায় বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ লাভ। এখান থেকে এন্ট্রান্স পাস করে কলকাতার মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্তি। মল্লিক ফান্ড থেকে নিয়মিত কলেজের বেতন পেয়ে এফ.এ. পাস করে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি। তৃতীয় বার্ষিক বি.এ. ক্লাসে পড়ার সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি যান। ছুটির পরে দেশ থেকে ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় মল্লিক ফান্ড থেকে তাঁর কলেজের বেতন দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বি.এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নি। পরে গ্রামের স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত। কলকাতায় টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার প্রধান পণ্ডিত হিসেবে যোগদান। এরপর রবীন্দ্রনাথের জমিদারির অর্ন্তগত পতিসরের কাচারিতে সুপারিনটেনডেন্টের পদ লাভ। ১৯০১-এ (১৩০৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে) রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনে এসে তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংস্কৃতে অধ্যাপনাকালে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয্যে ১৯০৫-এ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নামক বিখ্যাত বাংলা অভিধান সংকলনে ব্রতী হন। চল্লিশ বছরকাল অসাধারণ ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমসহকারে ১৯৪৫-এ এই বিরাট অভিধানের সংকলন ও সম্পাদনা কর্ম সমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থ বিশ্বভারতী কর্তৃক পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তিনি ম্যাথু আর্নল্ডের 'শোরাব রোস্তম' এবং বলিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, কবিকথা মঞ্জুষা প্রভৃতি গ্রন্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করেন। অন্যান্য গ্রন্থ: সংস্কৃত প্রবেশ, পালিপ্রবেশ ব্যাকরণ কৌমুদী, কবির কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা, Hints on Sanskrit Translation and Composition ইত্যাদি। বিশ্বভারতী থেকে ডি.লিট., কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক ও শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার লাভ। ১৯৫৭-তে 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নিষ্ঠা, সাধনা ও পরিশ্রমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধরণ। মৃত্যু. ১৯৫৯।

হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮)॥ জন্ম.



সাফলিডাঙ্গা, কাশিয়ানি, গোপালগঞ্জ, ১১ মার্চ ১৮১২। মতুয়া ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। বঙ্গাব্দ অনুযায়ী তাঁর জন্ম ১২১৮ সনের ২৯শে ফাল্গুন। অনুসৃত চান্দ্রমাস অনুযায়ী মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তাঁর জন্মতিথি, হিন্দু বিশ্বাস

অনুযায়ী যা বারুণী উৎসবের তিথি। পিতা যশোমন্ত বৈরাগী ছিলেন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। মাতা অন্নপূর্ণা দেবী। স্ত্রী শান্তিদেবী হরিচাঁদের পূর্বপুরুষগণ সাফলিডাঙায় এসে বাস করার পূর্বে নড়াইল জেলার লক্ষ্মীপাশা গ্রামে বসবাস করতেন। শৈশব থেকেই হরিচাঁদ ঠাকুর অত্যন্ত ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন গ্রামের পাঠশালায় তিনি মাত্র কয়েক মাস পড়াশুনা করেন। কথিত আছে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি বর্ণমালা ও গাণিতিক সংখ্যার ধারণাকে আয়ত্তে আনেন। কিশোর বয়সী হরিচাঁদ ব্রজ, নাটু ও বিশ্বনাথ—এই তিন বন্ধুকে নিয়ে প্রধানত গরু চরানোর কাজ করতেন। অবতার পুরুষদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে যে বত্রিশ লক্ষণের কথা বলা হয়, হরিচাঁদ ঠাকুরের মধ্যে তা সকলে লক্ষ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতার কথাও ধীরে ধীরে প্রচারিত হতে থাকে। কিশোর বয়স থেকে হরিচাঁদ একমাত্র নাম-সংকীর্তনকে সাধনার উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন। নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে হরিনামে মাতোয়ারা—এই অর্থে তিনি তাঁর মতাদর্শকে মতুয়া নামে অভিহিত করেন। বর্ণহিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে নানা রকম বাধা আসে। অলৌকিক শক্তি দিয়ে যাবতীয় বাধা তিনি অতিক্রম করেন। গৌতম বুদ্ধ এবং চৈতন্যদেবের অবতার হিসেবে নিজের পরিচয়দান। তবে গৃহে থেকে ধর্মকর্ম করাকেই তিনি শ্রেয় হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। বলেন, 'হাতে কাজ ও মুখে নাম'-ই হলো আসল ধর্ম। বাহ্যশুচিতার চেয়ে অন্তরের শুচিতাকেও তিনি বড়ো করে দেখান। তাঁর ব্যক্তিজীবন ছিল অত্যন্ত অনাড়ম্বর। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে সব ধরনের সাংসারিক কাজের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রাখতেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া ধর্মাদর্শে জাতিভেদকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়। তিনি তাঁর ভক্তদের যেসব নির্দেশ (আজ্ঞা) দিতেন, তা এ রকম: ১. সত্য কথা বলো, ২. হাতে কাজ ও মুখে নাম করো, ৩. পিতা-মাতাকে ভক্তি করো, ৪. পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করো, ৫. জগতের সব প্রাণীকে ভালোবাসো, ৬, জাতিভেদ অস্বীকার করো, ৭. পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হও, ৮. সাধুসাজ ত্যাগ করো ইত্যাদি। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, আন্দামান প্রভৃতি অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মতুয়া ভক্ত রয়েছে মতুয়াদের মিলনকেন্দ্র দুটি: একটি গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি এবং অন্যটি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার ঠাকুরনগরে। হরিচাঁদের জন্মতিথিতে বারুণীস্নান এবং সেই উপলক্ষে লাল নিশান ও ডঙ্কা-শিঙ্গা-কাঁসি নিয়ে নৃত্যরত নারীপুরুষ মতুয়ার মিছিল মানুষের ভাবোদয় ঘটায়। মতুয়ারা তাদের ধর্মচর্চার অংশ হিসেবে নিয়মিত মহোৎসব করে, যা মূলত নামকীর্তনের সঙ্গে আহার্য গ্রহণ। মৃত্যু. ওড়াকান্দি, গোপালগঞ্জ, ৬ মার্চ ১৮৭৮।

হরিদাস ভট্টাচার্য (১৮৯১-১৯৫৬)॥ জন্ম. ৭ নভেম্বর ১৮৯১, ভাটপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। অধ্যাপক ও গবেষক। পিতা রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। ১৯১২-এ স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯১৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাস করেন। পরে (১৯১৭) তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল. এবং বোর্ড অব সংস্কৃত স্টাডিজ থেকে 'কাব্য' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯১৫-এ স্কটিশ চার্চ কলেজের দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবনের সূচনা হয়। ১৯১৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার প্রভাষক হিসেবে যোগদান। কাছাকাছি সময়ে 'এভোলুশন অব দি সোল' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও মোয়াট স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের রিডার হিসেবে যোগদান। নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগকে গড়ে তোলার জন্য তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেন। চাকরির সুবাদে তিনি ক্রমে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, কলা অনুষদের ডিন, মেম্বারস অব দি কোর্ট, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৩-৩৪-এ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফাউন্ডেশন অব লিভিং ফেইথ' শিরোনামে স্টিফোনাস-নির্মলেন্দু ঘোষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৩১-এ মালব্য কমোমোরেশন বক্তৃতা, ১৯৩৯-এ প্রিন্সিপাল মিলার এনডাওমেন্ট বক্তৃতা, ১৯৪৩-এ কে পি পাঠক কমোমোরেশন বক্তৃতা সহ বহু সম্মানজনক বক্তৃতা প্রদান করেন। মনোদর্শন, নীতিদর্শন, শিক্ষাদর্শন, সমাজদর্শন, ভারতীয় দর্শন, দর্শন, ধর্মদর্শন, বিজ্ঞানদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা

করেন। সব প্রবন্ধই ইংরেজি ভাষায় রচিত। দর্শনশাস্ত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'দর্শনসাগর' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৪৭-এ অবসর গ্রহণের পর তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডোলজি বিভাগে যোগদান। মৃত্যু. কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ১৯৫৬।

হরিনাথ দে (১৮৭৭-১৯১১)॥ জন্ম. আড়িয়াদহ গ্রাম, চব্বিশ পরগণা, ১২ আগস্ট ১৮৭৭। পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ। ১৮৯২-তে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পাস। ১৮৯৪-তে ইংরেজি ও ল্যাটিন ভাষায় সর্বোচ্চ নম্বরসহ ডাফ বৃত্তি নিয়ে এফ.এ. পাস।



১৮৯৬-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ল্যাটিন ও ইংরেজি অনার্সে যথাক্রমে প্রথম ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে বি.এ. এবং একই বছর ল্যাটিন ভাষায় এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এবং সংস্কৃতের এ ও ই গ্রুপে এম.এ. পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান দখল। ১৮৯৭-তে সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিলেত গমন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। আই.সি.এস. পরীক্ষায় প্রথমবার কৃতকার্য না হলেও সেই পরীক্ষায় গ্রিক ভাষায় প্রথম হন। দ্বিতীয়বার পাস করে Colonial Service-নিয়ে সিংহলে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ। ১৯০০-তে কেম্ব্রিজের Classical Tripos-এ প্রথমভাগে প্রথম শ্রেণিতে এবং ১৯০১-এ মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষায় Tripos-দ্বিতীয় শ্রেণি পান। দেশে ফিরে ঢাকা সরকারি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ১৯০৭-এ কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির প্রথম বাঙালি গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত এবং ১৯১১-র ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত কর্মরত। প্রবেশিকা থেকে এম.এ. পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় গ্রিক, ল্যাটিন, ইংরেজি, ফারসি, আরবি, সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষায় প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক। ১৯০৪-এ ইবনে বতুতার 'বাংলাদেশের বিবরণ' এবং সুলতান গিয়াসউদ্দীনের উদ্দেশ্যে রচিত পারস্য কবি হাফিজের একটি গীতিকবিতা টীকাসহ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ। এ ছাড়া চীনা ভাষা থেকে নাগার্জুনের' মাধ্যমিক দর্শন', তিব্বতি ভাষায় রচিত 'ভুয়াঙের লজিক' ও কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ। ফারসিতে কৃষ্ণকান্তের উইলের অনুবাদ তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। তাঁর সম্পাদনায় বৌদ্ধ দর্শনের আদি ইতিহাসের প্রামাণিক নিদর্শন 'নির্বান ব্যাখ্যা শাস্ত্রম ও লংকাবতরসূত্র'। নবাব নসরৎ জঙ্গের ঢাকার বিবরণীমূলক পারসিক রচনা 'তারিখ-ই-নসরৎ-জঙ্গী' এবং Memoire de M. Jean Daw-র ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত। মৃত্যুর কিছুকাল আগে আরবি ভাষায় ব্যাকরণ, তিব্বতি ও ফারসি ভাষায় অভিধান এবং তিনটি ভাষায় উপনিষদ অনুবাদ। ইংরেজি ভাষায় বিশেষ দক্ষতার জন্য 'স্কীট' পুরস্কার লাভ। তাঁর প্রাপ্ত বৃত্তির পরিমাণ ছিল তখনকার দিনের প্রায় এক লাখ টাকা। মাত্র ৩৪ বছরের সীমিত জীবনকালে ইউরোপের ২০টি ও ভারতীয় ১৪টি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন। বড়লাট কার্জন ভারতের মনীষা সম্পর্কে যে দাম্ভিক উক্তি করেন, তা হলো তিনি ভারতের মাত্র দুজন পূর্ণমানব ও একজন অর্ধমানব দেখেছেন. তার মধ্যে হরিনাথ দে দুজন পূর্ণ মানবের একজন। মৃত্যু. ৩০ আগস্ট ১৯১১।

হরিপদ দাস॥ জন্ম. রাজশাহী। উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী। কলকাতায় বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ অতুল রায়চৌধুরীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগীতে হাতেখড়ি। কিছুদিন পর প্রখ্যাত সংগীত শিক্ষক সাতকড়ি মালাকারের নিকট তালিম গ্রহণ। পরে রাজশাহীর সংগীতজ্ঞ রথীন চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ। বিখ্যাত ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ রাজশাহীতে এলে তাঁর কাছেও কিছুদিন উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নেন। পাটনায় ওস্তাদ জাকির হোসেনের নিকট সাত বছর সংগীত অনুশীলন। হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ধ্রুপদ ও রাধিকামোহন মৈত্রের কাছে সরোদ বাদন শিক্ষা লাভ। ১৯৪২-এ রাজশাহীতে 'সংগীত শিক্ষা ভবন' নামে একটি সংগীত প্রতিষ্ঠান স্থাপন। একজন দক্ষ সংগীত শিক্ষক হিসেবে সুনাম অর্জন। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

হরেন্দ্রলাল রায় (১৮৫৯-১৯৩৭)॥ জন্ম. ভাগ্যকুল গ্রাম, মুন্সীগঞ্জ. জমিদার ও দানবীর। জমিদার হরপ্রসাদ রায়ের (২৬ বছর) ও দানবীর। জমিদার হরপ্রসাদ রায়ের (২৬ বছর)

নিঃসন্তান বিধবা স্ত্রী মণিক্যময়ী রায়চৌধুরাণী



কর্তৃক হরেন্দ্রলালকে দত্তক গ্রহণ (১৮৬৪)। পাঠ্যাবস্থায় বিক্রমপুরের বিদগাঁও গ্রাম নিবাসী সনাতন পালের জ্যেষ্ঠাকন্যা রাধারাণীর পাণিগ্রহণ। ভাগ্যকুল মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পাস। কলকাতা হিন্দু স্কুলে ভর্তি। সেখানে নবম শ্রেণিতে প্রমোশন পাওয়ার পর এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে স্কুলের পাঠ ত্যাগ। জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর কলকাতা, নলছিটি, আঙ্গারিয়া, নারায়ণগঞ্জ ও ভৈরব বাজারে লবণ ও চালের ব্যবসায় করে বিপুল অর্থ ও ভূ-সম্পত্তি অর্জন। জনকল্যাণে প্রচুর অর্থ ব্যয়। মুন্সীগঞ্জে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি কলেজ স্থাপন (১৮৯৭)। ৪/৫ বছর চলার পর স্থানীয় কতিপয় পদস্থ লোকের দলাদলির জন্য কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। নিজ জমিদারি মেদিনীপুরে গোমকপোতা গ্রামে স্ত্রীর নামে 'রাধারাণী হাই ইংলিশ স্কুল' (১৮৯৮) ও ভাগ্যকুলে নিজ নামে 'হরেন্দ্রলাল হাই ইংলিশ স্কুল' (১৯০০) প্রতিষ্ঠা। মুন্সীগঞ্জে আট হাজার টাকা ব্যয়ে 'হরেন্দ্রলাল পাবলিক লাইব্রেরি' (১৯০৫) স্থাপন। এর উন্নতিকল্পে পরে আরও আড়াই হাজার টাকা দান। মুন্সীগঞ্জ উচ্চ প্রাইমারি বালিকা বিদ্যালয়ের টিনের ঘরটি দালানে পরিণত করার জন্য আড়াই হাজার টাকা প্রদান। বহু টোলে অর্থ দান করে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান। মুন্সীগঞ্জের পুষ্পোদ্যানে এক হাজার ও ঢাকা লেডী ডাফরিন ফান্ডে পাঁচ হাজার টাকা দান। ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে চব্বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ঢাকার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যাংকিন সাহেবের নামে একটি আউটডোর 'র‍্যাংকিন ওয়ার্ড' স্থাপন। পরে ঐ ওয়ার্ডের উন্নতির জন্য আরও আট হাজার তিন শত টাকা দান। মুন্সীগঞ্জ ও ভাগ্যকুল হাসপাতালের গৃহ প্রস্তুতকালে চার হাজার টাকা দান। মুন্সীগঞ্জ, ভৈরব ও ভাগ্যকুল হাসপাতালে নিয়মিত চাঁদা প্রদান। ঢাকার জগন্নাথ কলেজের লাইব্রেরিতে চার হাজার পাঁচ শত টাকা দান। ঢাকার সারস্বত সমাজের ফান্ডে বহু অর্থ দান। ঢাকার ঘোড় দৌড়ের রাস্তা প্রস্তুতের জন্য আড়াই হাজার টাকা ও ঘোড় দৌড়ের ফাণ্ডে তিন হাজার আটশত টাকা দান। ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর স্কুলের গৃহ উত্তোলনে কতক টাকা দান। তাঁর সর্বশুদ্ধ দান তিন লক্ষ টাকার ওপরে। নানান স্থানে পানীয় জলের জন্য দীঘি, পুষ্করিণী, নলকূপ খনন দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন। আর্তজনকে অর্থদান ও দুর্ভিক্ষপীড়িত জনকে অন্নদান। প্রজাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতি বছর ঝুলন যাত্রা, রাসযাত্রার আয়োজন এবং স্থানে স্থানে মেলা বসাতেন। এ-সকল উৎসবে নৃত্য-গীতের বন্দোবস্ত করে প্রজা ও গ্রামবাসীদের মনোরঞ্জন। পুত্র শ্যামলাল ও বীরেন্দ্রলালের বিয়ে উপলক্ষে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বহুবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। ফুটবল খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য 'হরেন্দ্রলাল শিল্ড' ও 'সরোজেন্দ্রলাল কাপ' খেলার আয়োজন ও প্রচলন। এ সবের পশ্চাতে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময়ে ব্রিটিশ সরকারকে বহু টাকা ঋণদান এবং নিজের স্টীকার সরকারকে প্রদান করে একান্ত রাজভক্তির পরিচয় দেন। দানশীলতা ও রাজভক্তির স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ সরকারের 'কায়সার-ই-হিন্দ গোল্ড মেডেল' (১৯০৫) ও 'রায়বাহাদুর' উপাধি গ্রহণ। মৃত্যু. কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ (১৩ আশ্বিন ১৩৪৪)।

হাফিজ মোহাম্মদ আজমল খাঁ, হাকিম (১৯৬৫-১৯২৭)॥ জন্ম. দিল্লি, ১৮৬৫। ভারত বিখ্যাত ইউনানি চিকিৎসক, গ্রন্থকার, রাজনীতিবিদ। আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন। চিকিৎসা, দর্শন ও তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন এবং বাড়িতে দেশীয় ভেষজ মতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা। জীবনের প্রারম্ভেই ইসলামের নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ। হাকিমি চিকিৎসা ও স্বদেশ হিতৈষণায় সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ। ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে 'হাফিজ-উল-মূলক' উপাধি লাভ। ১৮৯২-১৯০২ পর্যন্ত রামপুর নওয়াবের খাস হাকিমরূপে কর্মরত। ইরাক ভ্রমণ। দেশে ফিরে দিল্লির তিব্বতীয় মাদ্রাসায় (বর্তমানে কলেজ) কয়েক বছর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯১১-তে ইউরোপ ভ্রমণ। লর্ড হার্ডিঞ্জের অনুমোদনক্রমে ভারত সরকার-কর্তৃক প্রথম শ্রেণির 'কায়সার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক প্রদান। দিল্লিতে লেডী হার্ডিঞ্জ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৮-তে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। এ বছর দিল্লির কংগ্রেস

অধিবেশনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। জালিয়ানওয়ালবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯) প্রতিবাদে ১৯২০-র এপ্রিলে সরকার প্রদত্ত সমস্ত উপাধি ও স্বর্ণপদক বর্জন। ১৯২০-এ কংগ্রেসের স্বরাজ প্রস্তাব সমর্থন এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২২) সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯২০-তে অনুষ্ঠিত খিলাফত কনফারেন্সের সভাপতি। ১৯২৪-এ আহমদাবাদ কংগ্রেসের অধিবেশনের সভাপতি। আলীগড় মুসলিম কলেজের অন্যতম ট্রাস্টি, নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের প্রতিনিধি, নিখিল ভারত আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানি সম্মেলনের কার্যনির্বাহী সমিতির সভাপতি, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও মাদ্রাজ জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের সহকারী সভাপতি। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'ভারতের সেরা ভদ্রলোক' বলে অভিহিত। চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর আরবিতে রচিত গ্রন্থ: আততাউন (প্লেগসম্বন্ধীয়), আততুজাত-উল-হামেদিয়া কিসিমাইত-তাফলিসিয়া (কুষ্ঠ-সম্বন্ধীয়), আল কোয়ালউল মার্মব ফিমাউল মক্রুর ইত্যাদি। মৃত্যু. রামপুর, ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৭।

হাবিবুর রহমান (১৯১৬-১৯৬২)॥ জন্ম. চট্টগ্রাম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬। অর্থনীতিবিদ। ১৯৩৩-এ সাতকানিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯৩৫-এ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ. ১৯৩৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি.এ. সম্মান এবং ১৯৩৯-এ এম.এ. (অর্থনীতি) ডিগ্রি লাভ। চট্টগ্রাম সরকারি মহাবিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে তেরো বছর অধ্যাপনা। তার মধ্যে দশ বছর অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৫৩-তে পাকিস্তান সরকার-কর্তৃক করাচিতে অবস্থিত ইনষ্টিটিউট্ অব ব্যাংকার্স-এ সচিবের পদে নিয়োগ। ১৯৫৪-তে নবগঠিত পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতি বিভাগে অ্যাসিসট্যান্ট চিফ হিসেবে যোগদান। ১৯৫৯-এ জেনারেল ইকনোমিক্স বিভাগের প্রধান নিযুক্ত। সরকারের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার (১১৯৬০-১৯৬৫) টেকনিক্যাল দলিলগুলোর অন্যতম নির্মাতা। ১৯৫৮-১৯৫৯ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভেন্ডারবিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডেভেলপমেন্ট ইকনোমিক্স'-এ একটি কোর্স করার সময়ে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। এই সময়ে 'গ্রোথ মডেলস্ অ্যান্ড পাকিস্তান' নামে একটি বই লিখে খ্যাতি অর্জন। বইটিতে পাকিস্তানের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরি করেও ১৯৬১-তে পরিকল্পনা কমিশনের একটি অভ্যন্তরীণ দলিলে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার ফলে ঔপনিবেশিক শোষণ চলছে বলে দাবি করেন। এবং তথ্য দিয়ে তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। এই ঐতিহাসিক দলিলটি ভেন্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রাজুয়েট প্রোগাম ইন ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট'-এর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই দলিলে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবহেলা ও শোষণকে তিনি জাতীয় ঐক্যের প্রতি হুমকি বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। মৃত্যু. ১৪ এপ্রিল ১৯৬২।

হাবিবুর রহমান চৌধুরী (১৮৯৯-১৯৭২)॥ জন্ম, গোপীনাথপুর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পিতা গোলাম নবী চৌধুরী। ১৯১৮-এ কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাস। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক এবং কলকাতা থেকে আইন ডিগ্রি অর্জন করে কুমিল্লায় আইনব্যবসায় শুরু। ছাত্রজীবনে ১৯২১-এ কংগ্রেসে যোগদান। গান্ধীবাদে উজ্জীবিত হয়ে খদ্দর পরতেন। রাজদ্রোহিতা ও আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য চার দফায় প্রায় অর্ধযুগ কারাভোগ। ১৯৪১-এ একক সত্যাগ্রহের জন্য গান্ধী প্রথম যে ছয়জনকে মনোনীত করেন, তিনি তার অন্যতম। ১৯৩২-এ ত্রিপুরা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের তিন সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য। ১৯৫০-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়াকফ কমিশার নিযুক্তি লাভ। ঐ পদে প্রায় এক যুগ কাজ করেন। ১৯৬৩-এ কলকাতা থেকে ফিরে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ। অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রামী। মৃত্যু. কুমিল্লা, ১৯৭২।

হাবিবুর রহমান, হাকীম (১৮৮১-১৯৪৭)॥ জন্ম. ঢাকা, ১৮৮১। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। পিতা পেশোয়ার জেলার অধিবাসী, পরে কার্যোপলক্ষে ঢাকায় বসবাস। তেরো বছর বয়সে শিক্ষা লাভের জন্য কানপুর গমন ও হাকিম আগা হুসাইন ও দিল্লির আবদুল মজিদের নিকট হাকিমি শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা লাভ। ১৮৯৯-তে আগ্রায় হাকিমিশাস্ত্র অধ্যয়ন। এভাবে দীর্ঘ

এগারো বছর হাকিমি শাস্ত্রের ওপর পড়াশুনা করে



ঢাকায় ফিরে এসে হাকিমি কর্মজীবনের সূচনা। ১৯৩৩-এ ঢাকায় তিবিবয়া হাবিবিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা। উর্দু সাহিত্য ও মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ১৯০৬-এ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হবার পর নওয়াব সলিমুল্লাহর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ। মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক পদেও অধিষ্ঠিত। ১৯০৬-এ 'আল-মাশরিফ', নামে ঢাকায় প্রথম উর্দু মাসিক তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত। পত্রিকাটি পরে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ আসুদেগান-ই-দাক্কা, গু-আরা-ই-দাক্কা, মসজিদ-ই-দাক্কা ইত্যাদি। তদানীন্তন সরকার-কর্তৃক অধ্যবসায় ও সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ 'শিক্ষা-উল-মূলক' উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু. ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭।

হাবীবুর রহমান (১৯২২-১৯৭৬)॥ জন্ম. পালিশ গ্রাম, বর্ধমান, ১ জুলাই



১৯২২। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক। কলকাতা হেয়ার স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। আর্থিক কারণে পড়াশোনা চালানো সম্ভব হয়নি। প্রথম জীবনে কয়লা খনিতে কাজ গ্রহণ। ১৯৪২ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত ইত্তেহাদ, কৃষক, জাগরণ, শিশু সওগাত, আজাদ, মিল্লাত, সংবাদ প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা। ১৯৫৬-১৯৭৩ পর্যন্ত ঢাকাস্থ ইউসিস-এ কর্মরত। ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস (১৯৭৩-১৯৭৪) এবং সিলবার বার্ডেট কোম্পানির (১৯৫৫-১৯৫৬) বাঙলা বইয়ের অনুবাদ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহকারী পরিচালক (১৯৭৪-১৯৭৬)। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-কবিতাঃ উপান্ত (১৯৬২)। শিশুসাহিত্যঃ আগডুম বাগডুম (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৬২), সাগর পারের রূপকথা (১৯৬২), সাগর পারের রূপকথা (১৯৬২), বিজন বনের রাজকন্যা (১৯৬১), লেজ দিয়ে যায় চেনা (১৯৬৩), বনে বাদাড়ে (১৯৬৩), পুতুলের মিউজিয়াম (১৯৬৩), গল্পের ফুলঝুরি (১৯৬৩) হীরা মতি পান্না (১৯৬৭), মন চলে মোর তেপান্তরে, বনমোরগের বাসা (১৯৭৫)। অনুবাদঃ চীনা প্রেমের গল্প (১৯৬৩), জন কেনেডী (১৯৬২), জীবনের জয়গান (১৯৬২), পাল তুলে দাও (১৯৬২)। সম্পাদনাঃ কিশোর সংকলনঃ সপ্তডিঙ্গা (১৯৬২)। হাবীবুর রহমান ছোটদের জন্যে শুধু সাহিত্যেই রচনা করেন নি, ছোটদের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। দৈনিক সংবাদ'-এর ছোটদের পৃষ্ঠা 'খেলাঘর'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'ভাইয়া' নামে তা পরিচালনা। দৈনিক আজাদ-এর 'মুকুলের মহফিল' 'বাগবান' নামে পরিচালনা। তাঁর গীতিনাট্য, নাটক রেডিও, টেলিভিশন, মঞ্চে বহুবার অভিনীত। মৃত্যু. ১৭ জুন ১৯৭৬।

হামিদউদ্দীন আহমেদ, মৌলভী (১৮৪১-১৯১৫)॥ জন্ম লাঙ্গলজোড়া গ্রাম, জামালপুর, ১৮৪১ (আনুমানিক)। সমাজসেবী, আইনজীবী। প্রথম জীবনে ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ। পরে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্তি এবং ঐ স্কুল থেকে ১৮৬৪-তে প্রবেশিকা এবং ১৯৬৮-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস। পরে বি.এল. পাস। তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট ও প্রথম মুসলমান উকিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকতেই আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। বয়োজ্যেষ্ঠ বলে বসু তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কিছুদিন মহারাজা শশিকান্তেরও বাল্যশিক্ষক। বেশ কটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন। ময়মনসিংহে ওকালতি শুরু করেই একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সমাজের নেতা হিসেবে নিজের স্থান করে নেন। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক, অসাম্প্রদায়িক এবং দেশীয় ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের সমর্থক। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ১৮৭৭-এর ২০ আগস্ট 'ময়মনসিংহ সভা' নামে একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান সদস্যগণ একত্রে এই সভায় মিলিত হতেন এবং কাজে অংশ নিতেন। ১৮৯৯-তে আনন্দমোহন বসু ময়মনসিংহ কর্তৃক মিলিতভাবে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান। ময়মনসিংহে সিটি কলেজ নামে একটি কলেজ স্থাপন। এরও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মৌলবী হামিদউদ্দীন। মৃত্যু. ১৯১৫।

হামিদুর রহমান (১৯২৮-১৯৮৮)॥ জন্ম. ইসলামপুর, ঢাকা, ১৯২৮। শহীদ মিনারের রূপকার ও চিত্রশিল্পী। নাট্যকার সাঈদ আহমদ ও সংস্কৃতিসেবী নাজির আহমদ তাঁর ভাই। এক উচ্চ মধ্যবিত্ত 'ঢাকাইয়া' পরিবারে জন্ম। পিতা মির্জা ফকির মোহাম্মদ এবং পিতৃব্য মির্জা আবদুল কাদের সর্দার। ঢাকা সরকারি আর্টস স্কুল (বর্তমানে বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা ইন্‌স্টিটিউট)-এ চিত্রকলার ওপর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ (১৯৪৮-১৯৫০)। চিত্রশিল্পে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইউরোপ গমন। প্যারিসের 'ইকোল দ্য বোজ আর্টস'-এ চিত্রাঙ্কন শিক্ষা (১৯৫০-১৯৫১)। এরপর লন্ডনের 'সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন'-এ ভর্তি। ঐ ইনস্টিটিউশন থেকে চিত্রকলায় ডিপ্লোমা লাভ করে ১৯৫৬-তে দেশে প্রত্যাবর্তন। তাঁর মডেল অনুসারে ১৯৫৮-র নভেম্বর মাসে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে (রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি যে স্থানে আবুল বরকত শহীদ হয়েছিলেন সে স্থানে) শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু। ১৯৫৮-র ২০ফেব্রুয়ারির মধ্যে মিনারের ভিত, মঞ্চ ও তিনটি স্তম্ভের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। একই বছর ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে সামরিক সরকারের নির্দেশে মিনারের নির্মাণ কাজ বন্ধ। হামিদুর রহমানের দেশ ত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্রে গমন। 'পেনসিলভিয়া অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস'-এ রিসার্চ স্কলার হিসেবে এক বছর চিত্রকলার ওপর গবেষণা (১৯৫৯-১৯৬০)। পরবর্তী জীবনের প্রায় সাড়ে তিন দশক যুক্তরাজ্য, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে অতিবাহিত। কানাডার মন্টিয়ালে 'ম্যাকডোনাল্ড কার্টিলার পলিটেকনিক'-এ চারুকলায় অধ্যাপনা। ১৯৬২-র ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর মডেল অনুসারে (সংশোধিত আকারে) শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ পুনরায় আরম্ভ। এক বছরের মধ্যে এ কাজ সমাপ্ত। ১৯৬৩-র ২১ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনারের উদ্বোধন। শহীদ মিনারের ভাস্কর্যের রূপকল্পের ভেতর দিয়ে বাঙালির আবেগ ও সংগ্রামের এবং বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মহিমা রূপায়িত। চিত্রকর হিসেবেও দেশে ও বিদেশে খ্যাত। দেশ, কাল ও সমকালীন জীবনের জটিলতা ও সমস্যা তাঁর চিত্রের ক্যানভাসে বিমূর্ত। সত্তরের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের ধ্বংসযজ্ঞ, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, পাক-হানাদার বাহিনীর নারী নির্যাতন ও গণহত্যা, বন্যার প্রলয়ংকরী রূপ ও ধংসলীলা, বন্যাপীড়িত মানুষের আত্মরক্ষার সংগ্রাম, বাঙালির জীবন ও জীবিকার প্রাত্যহিক কর্মপ্রবাহ তাঁর চিত্রকলায় উদ্ভাসিত। দেয়াল চিত্র (মুর্যাল) অঙ্কনেরও কৃতিত্ব প্রদর্শন। সিমেন্টের সঙ্গে রং মিশিয়ে অঙ্কন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারের ১৭০০ বর্গফুট মুর্যাল। এতে জেলে, মাছ, জাল, গৃহবধূ, গহবর, নদী, হরিণ, দ্রুতগামী অশ্ব প্রভৃতি প্রতীকের মাধ্যমে পল্লী বাংলাকে উপস্থাপন। ১৯৭৩-এ লন্ডনের কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউট গ্যালারিতে এবং ১৯৮৬-তে ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীতে তাঁর একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত। মৃত্যু. মন্টিয়াল, কানাডা, ১৯ নভেম্বর ১৯৮৮।



হামিদুল হক চৌধুরী (১৯০১-১৯৯২)॥ জন্ম. রামনগর গ্রাম, ফেনী ১৯০১। রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অঙ্কে ডিসটিংশনসহ বি.এসসি. পাস (১৯২৫)। ল' ডিগ্রি লাভের পর ১৯৩০-এ কলকাতা বারে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯৩৭-এ মুসলিম লীগের মনোনয়নে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ভারত-পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণের র‍্যাডক্লিফ কমিশনের (১৯৪৭) সদস্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯৪৯-এ পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত। একই বছর পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটলে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ। ১৯৫৩-তে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীনে কৃষক-শ্রমিক



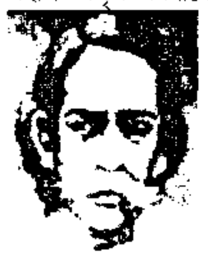
পার্টির গঠন এবং এ দলের সহসভাপতি নির্বাচিত। ১৯৫৫-তে কৃষক-শ্রমিক পার্টির মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান দ্বিতীয় গণ-পরিষদে সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) যুক্তফ্রন্ট-মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৫৬-র শাসনতন্ত্রের খসড়া বিল প্রণয়ন ও গণ-পরিষদে তা পাস করিয়ে নেয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ১৯৫৮-র ১৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারে অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত। একই বছর ৭ অক্টোবর দেশব্যাপী সামরিক আইন জারি করা হলে মন্ত্রিত্ব থেকে পদচ্যুত এবং গ্রেফতার। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' (এন. ডি. এফ.-১৯৬২)-এর অন্যতম সংগঠক এবং কোষাধ্যক্ষ (১৯৬৪-১৯৬৯)। আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচির বিরোধিতাকারীদের অন্যতম। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলনের পটভূমিকায় রাজনৈতিক সঙ্কট মীমাংসাকল্পে রাওয়ালপিণ্ডিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১০-১৩ মার্চ ১৯৬৯) এন.ডি.এফ.-এর প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে সহায়তাদানের জন্যে গঠিত 'শান্তি কমিটি'র (৯ এপ্রিল ১৯৭১) শীর্ষস্থানীয় নেতা। ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) কিছুদিন পূর্বে ঢাকা ত্যাগ করে পাকিস্তানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ। প্রায় আট বছর সে দেশে বাস। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুজিব-সরকার কর্তৃক তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল (১৯৭২)। ১৯৭৮-এ তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থাপনায় পাকিস্তান থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। এদেশে সংবাদপত্রকে শিল্পে পরিণত করার অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯৪৯-এর ১১ মার্চ তৎকর্তৃক ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' (বর্তমানে বাংলাদেশ অবজারভার) প্রতিষ্ঠা। ঢাকা হাইকোর্টের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী। ষাটের দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। মৃত্যু, ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি ১৯৯২।

হামিদুল্লাহ খাঁ (১৮০৯-১৮৮০)॥ জন্ম, চট্টগ্রাম, ১৮০৯। সাহিত্যিক। বাল্যকালে গৃহ-শিক্ষক ফারসি কবি এনামুল্লাহ, বাকলিয়ার মৌলবী আবদুল আলী প্রমুখ পণ্ডিতজনের নিকট শিক্ষালাভ। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ইংরেজ সরকারের জরিপ বিভাগে কাজে যোগদান। ১৮৮২-এ ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে পদোন্নতি লাভ। খানবাহাদুর শেখ মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ খাঁ ঊনবিংশ শতকের চট্টগ্রামের সর্বাপেক্ষা গুণী খ্যাতিমান ব্যক্তি। ফারসি ভাষায় প্রথম চট্টগ্রামের ইতিহাস আহাদিসুল খাওয়ানিন বা তারিখে হামিদী রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। ফারসি ও বাংলা ভাষায় সাহিত্য সাধনা। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: আহাদিসুল খাওয়ানিন (১ম খণ্ড-১৮৭০-২য় ও ৩য় খণ্ড), আনোয়ারুন্না রাইন-ফি-আখবারুল-খাইরাইন, আজায়েবুল মুখলুকাত, ত্রাণপথ, বীরত্ব মোচন। মৃত্যু, ১৮৮০।

হালী মোস্তফা (১৯৪৭-২০০০) জন্ম, বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা, ২ জানুয়ারি ১৯৪৭। স্থপতি ও লেখক। প্রকৃত নাম মোস্তফা হারুন কুদ্দুস। মা আফিয়া খাতুন। পিতা মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস (১৯০৬-১৯৮৮)। পৈতৃক বাড়ি, নাসিরকোট, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। কুমিল্লায় আওয়ার লেডি অব ফাতেমা গার্লস স্কুলে বিদ্যারম্ভ। কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৬২), কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১৯৬৫) ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপত্যবিদ্যায় প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক (১৯৭০)। নেদারল্যান্ডের সামাজিকবিদ্যা ইনস্টিটিউট থেকে নগর ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর (১৯৭৬)। স্কুলজীবনে বয়ঃস্কাউটের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ। কর্মজীবনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের সহকারী স্থপতি, বাংলাদেশ কনসাল্টেন্ট লিমিটেডের প্রকল্প স্থপতি এবং শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প স্থপতি। স্থাপত্যিক পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে পারঙ্গম। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে ইরাকের ব্যবিলনের শূন্য উদ্যান সংরক্ষণ ও পুনঃসংস্কার প্রকল্পে কাজ করেন (১৯৭৮)। ১৯৭৯-তে স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান শহীদুল্লাহ অ্যান্ড এসোসিয়েটস লিমিটেডে



সিনিয়র স্থপতি হিসেবে যোগ দিয়ে ১৯৮১-এ পরিচালক পদে উন্নীত ১৯৮৭-এ বিয়ে করেন, স্ত্রী হাসিনা বানু। তাঁর স্থাপত্যকর্মের মধ্যে তৃতীয় কলা ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭১); শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ (১৯৭২); সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর (১৯৭৪); খামারবাড়ির কৃষিভবন, মিলনায়তন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটর নিবাস (১৯৯৫); চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস ও হাউজ টিউটর নিবাস (১৯৯৬); বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, (১৯৯৭); ঢাকা সেনানিবাসের সম্মেলন কেন্দ্র ভবন (১৯৯৬); বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির অনুষদ ভবন, ভিআইপি হোস্টেল ও বিশ্রামাগার; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ একাডেমিক ভবন, (১৯৯৮); জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিক অনুষদ ভবন (১৯৮৮); কুমিল্লা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, কুমিল্লা ক্লাব, নাসিরকোর্ট স্মৃতিসৌধ উল্লেখযোগ্য। জাতীয় সংসদ ভবন নির্মাণ কাজে লুই আই কানের সহযোগী। শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শিল্পচৈতন্যের চূড়ান্ত প্রকাশ। তিনটি ত্রিভুজ আকারের ইটের দেয়াল তিনরকম উচ্চতায় গতিশীলতা এবং বলিষ্ঠ উপস্থাপনায় শহীদদের আত্মত্যাগ ও সাহসের মূর্ত প্রতীক নির্দেশ করছে। জাতীয় স্মৃতিসৌধের মূলমঞ্চের মাঝখানে মার্বেল পাথরে খোদিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাংশের ব্যবহার: 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই/ নিঃশেষ প্রাণ যে করিবে দান/ ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' লিখেছেন উপন্যাস, শিল্প-সমালোচনা, সমাজ-সংস্কৃতি ও স্থাপত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, অনুবাদ, কবিতা ও কলাম রচনা। নির্বাচিত রচনার সঙ্কলন 'হালী মোস্তফা রচনা-সংগ্রহ' (২০০৭)। 'ইত্তেহাদ'-এ 'হালী মোস্তফার শেষ কলাম' (১৯৮০-৮৪) প্রকাশিত। মৃত্যু. ঢাকা, ২৬ অক্টোবর ২০০০।



হাসন রাজা (১৮৫৪-১৯২২)॥ জন্ম. লক্ষ্মণশ্রী গ্রাম, সুনামগঞ্জ, ৭ পৌষ ১২৬১ বঙ্গাব্দ। মরমি কবি, সাধক ও জমিদার। পূর্ব পুরুষেরা অযোধ্যার অধিবাসী। তাঁরা ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং সুনামগঞ্জে আগমন ও স্থায়ীভাবে বসবাস। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ হয়নি। পনেরো বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তি মহাজন-কর্তৃক নিলামে তুলতে আরম্ভ করলে মাতাকে সম্মত করিয়ে নিজস্ব সম্পত্তি বিক্রয় করে বনেদি পৈতৃক সম্পত্তি 'রামপাশা' অঞ্চল রক্ষা করতে সক্ষম হন। জীবনের শুরুতে প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারদের কারসাজিতে বিভিন্ন মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। এক মিথ্যা মামলায় দায়রা আদালত-কর্তৃক দেড় বছর কারাদণ্ড প্রদান। কিন্তু হাইকোর্টে আপিল করায় নিষ্কৃতি লাভ। শীতের মৌসুমে গাজীর গীতের মেলা বসাতেন এবং সমুদয় খরচ বহন করতেন। তাঁর সম্পত্তি সুচারুরূপে পরিচালনার জন্যে মি. নিটল নামক এক ইংরেজ ম্যানেজার নিযুক্ত। ম্যানেজার পরবর্তীকালে পদত্যাগ করেন এবং তৎকর্তৃক হাসন রাজার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। মামলায় দশ হাজার টাকা খেসারত দান। ১৯১৭ বা ১৯১৮-তে আসামের তদানীন্তন চিফ কমিশনার বাটসন বেল সুনামগঞ্জ পরিদর্শনে গেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১৯২০-এ ভারতের তদানীন্তন বড়লাট চেমস ফোর্ট সিলেট এলে দুই পুত্রসহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সুনামগঞ্জে হাসন এম.ই. স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। এ স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া ও বৃত্তির ব্যবস্থা। পরে এই স্কুল জুবলি হাই ইংলিশ স্কুলে পরিণত। কৈশোর ও যৌবনে শ্রীকৃষ্ণে নানাবিধ লীলায় অভিনয়। যৌবনে ছিলেন আর দশজন জমিদারের মতো ভোগী; পরিণত বয়সে ভোগের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা আসে। ষাট বছর বয়সে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিলি বন্টন করে দরবেশী জীবনযাপন শুরু। অনেক দেবালয় ও আখড়া তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত। একজন উচ্চ শ্রেণির হেকিম ও চিকিৎসক। কেয়াফফা শাস্ত্রেও বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। বহু আধ্যাত্মিক গানের রচয়িতা। সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এই গানগুলো তাঁর 'হাসান উদাস' গ্রন্থে মুদ্রিত। তাঁর গানে প্রেম, বৈরাগ্যময় মরমি চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এইসব গানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষঙ্গগুলো পাশাপাশি বিদ্যমান মৃত্যু. ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ।

হাসান জান (১৯২৭-১৯৭৪)॥ জন্ম. গোবরা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ১৯২৭। শিশুসাহিত্যিক। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় কলকাতা মডেল স্কুলে। প্রথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ভর্তি হন পার্ক সার্কাস মডার্ন স্কুলে। সেখান থেকে ১৯৫৪-এ মেট্রিক পাস। হাই স্কুলে থাকাকালীন শেষ দু'বছর ভবানীপুরে 'মণিমেলার' সঙ্গে সংযুক্ত। ১৯৪৭-এ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই.এ. ১৯৫১-তে সেন্ট্রাল কলেজ থেকে বি.এ. পাস। ১৯৫৩-তে চব্বিশ পরগনা জেলার বাণীপুর পোস্ট গ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজ থেকে ডিপ্লোমা-ইন-বেসিক এডুকেশন-এ ডিগ্রিলাভ। ভূগোলে অনার্স ক্লাসে ভর্তি; কিন্তু ফাইনাল ইয়ারে থাকাকালীন নানা অসুবিধার কারণে পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি। 'নিখিল ভারত মণিমেলা' কেন্দ্রের ক্রীড়া সচিবের দায়িত্ব পালন। ঢাকার কেন্দ্রীয় 'কচিকাঁচা মেলা'র ক্রীড়া-বিষয়ক উপদেষ্টা। মেট্রিক পাস করার পর শিক্ষাজীবনের পাশাপাশি কর্মজীবন শুরু। প্রথমে কিছুদিন সাব-রেজিস্টারের কর্ম সম্পাদন। পরে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ। শিক্ষকতার পর কিছুদিন ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন। সেই সঙ্গে চিত্রীর কাজও করতেন। তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকায় 'আনন্দ-মেলা' ও আজাদ পত্রিকায় 'মুকুলের মহফিল' পাতার লেখক হিসেবে সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ। শিশু-সওগাত, কাকলি, নন্দিনী, সমাজ, রামধনু, মণিমুকুর, কথা-সাহিত্য প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় দীর্ঘদিন যাবৎ ছড়া, গল্প ও পশুপাখি সম্বন্ধে লিখতেন। ১৯৪৬-১৯৪৮ পর্যন্ত দৈনিক আজাদ পত্রিকায় মুকুলের মহফিল বিভাগে বাগবানের সহকারী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৭-১৯৪৯ পর্যন্ত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিশোর সংগঠন মণিমেলার মুখপত্র ও সাহিত্যপত্র মাসিক 'মণিমুকুর'-এর অন্যতম পরিচালক। 'কচি ও কাঁচা' মাসিক পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য। ১৯৬৪-তে ভারত থেকে ঢাকা আগমন। এখানে এসে প্রথমে ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ইত্তেফাকের কচি-কাঁচার আসর, পূর্বদেশের চাঁদের হাট, দৈনিক বাংলার সাত চম্পা, মাসিক কচিকাঁচা, টাপুর-টুপুর, সবুজ পাতা, খেলাঘর প্রভৃতিতে ছড়া, গল্প ও পশুপাখি সম্বন্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ লিখেছেন। ১৯৭৩-এ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত শিশু পত্রিকা 'ধান-শালিকের দেশ'-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ। আমৃত্যু উক্ত পদে বহাল ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: নরম গরম (১৯৭২), লাল নীল ছড়া (১৯৭৪)। মৃত্যু. ঢাকা, ১ এপ্রিল ১৯৭৪।



হাসান জামান (১৯২৮-১৯৭৮)॥ জন্ম. যশোর, ১৯২৮। গবেষক ও শিক্ষাবিদ বি.এ. (অনার্স) এবং ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন। এরপর ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস-এ এম.এ. পাস। লন্ডন থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। থিসিসের বিষয় ছিল: Rise of Ithe Muslim Middle Class in India and Pakistan। ১৯৫২-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগদান। ইন্টারন্যাশনাল ল' এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান দু-বিভাগেরই অধ্যাপক। পরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রিডার পদে উন্নীত। কিছুকাল পাকিস্তান কাউন্সিলের সহসভাপতি এবং জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার পরিচালক পাকিস্তানের 'তাহযীব ও তমদ্দুনের' একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে পরিচিত। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই অজুহাত তুলে পাকিস্তান সরকার রেডিও টেলিভশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করতে চাইলে সরকারের সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন (জুন-১৯৬৭), বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বিদেশে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইসলামী তমদ্দুন (১৯৫২), ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (১৯৫৪), ইসলামী অর্থনীতি (১৯৫৫), ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৬১), সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য (১৯৬৭)। ইংরেজি রচনা-Political Science and Islam (1952), Fourteen Points of Islamic Constitiution (1955), Basis of the Ideology of Pakistan (1965)। ডক্টর হাসান জামান প্রধানত ইসলাম ধর্মের জাগতিক প্রয়োগ দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। মৃত্যু. ১৯৭৮।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)॥ জন্ম. মাতুলালয়, জামালপুর শহর, ১৪ জুন ১৯৩২। পৈতৃক নিবাস, কুলকান্দি গ্রাম, জামালপুর। কবি ও সাংবাদিক। পিতা আবদুর রহমান (স্কুল-শিক্ষক)। স্ত্রী সাঈদা হাসান (অবিভক্ত বাংলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মফিজউদ্দিন ফকিরের কন্যা)। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিক

(১৯৪৬) ও ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৪৮) পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (১৯৫১) এবং বাংলায় এম.এ. (১৯৫৫) ডিগ্রি লাভ। ফেব্রুয়ারির (১৯৫২) ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। তাঁর সম্পাদনায় ভাষা-আন্দোলনের ওপর প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (১৯৫৩) প্রকাশিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক (১৯৫৪-১৯৫৫)। ১৯৫২-তে বেগম পত্রিকায়, ১৯৫৩-১৯৫৪-তে সওগাত পত্রিকায় ও ১৯৫৫-১৯৫৭-তে দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন। মাসিক সাহিত্যপত্র সমকাল (১৯৫৭)-এর সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফরের সহযোগী। ১৯৫৭-তে জগন্নাথ কলেজের বাংলার প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬৪-র গোড়ার দিকে চাকরিচ্যুত হন। কয়েক মাস দৈনিক পয়গামে সহকারী সম্পাদক হিসেব কর্ম সম্পাদন। ১৯৬৫-র ১ জানুয়ারি দৈনিক পাকিস্তানের সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান। প্রেস্ট্রাস্ট পত্রিকায় (দৈনিক পাকিস্তান) সাংবাদিকতা করলেও গণ-চেতনা ও গণ-দাবির প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সে পদক্ষেপের বিরোধিতা (জুন ১৯৬৭)। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ (১৯৭১) শুরুর পর পরই কুমিল্লা জেলার এক গ্রামে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গ্রামবাসীদের মনোবল চাঙ্গা করার লক্ষ্যে কর্ম সম্পাদন। স্বাধীনতার পর দৈনিক পাকিস্তান দৈনিক বাংলা নামে প্রকাশিত হলে এর সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতির পদ লাভ (১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১)। মস্কোতে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলার (১৯৭৩-১৯৭৪), মস্কো থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সংস্থাপন বিভাগের ও. এস. ডি. (১৯৭৪-১৯৭৫)। বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য (১৯৭৬-১৯৭৯)। ১৯৭৭-এ বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের 'মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাস প্রকল্প'-এর প্রধান নিযুক্ত। তাঁর সম্পাদনায় ১৬ খণ্ডে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র' (১৯৮২-১৮৮৩) প্রকাশিত। কবি, সমালোচক ও গল্পকার হিসেবে খ্যাত। বিভাগোত্তর পূর্ববাংলায় যে আধুনিক কাব্যান্দোলনের উন্মেষ ঘটে তার অন্যতম স্থপতি। তাঁর সাহিত্যকর্মে জনজীবনের প্রত্যাশা, যন্ত্রণা, প্রতিবাদ এবং মানুষের সংগ্রামী জীবনচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। সমাজ ও জীবনের অঙ্গীকারে তাঁর সাহিত্য প্রগতিশলি শিল্প-পরিচর্যায় সমৃদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ-কবিতা: বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩), আর্ত শব্দাবলী (১৯৬৮), অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮), যখন উদ্যত সঙ্গীন (১৯৭২), বজ্রে চেরা আঁধার আমার ভেতরের বাঘ (১৯৮৩), ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী (১৯৮৩); প্রবন্ধ: আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫) মূল্যবোধের জন্যে (১৯৭০), সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩), আলোকিত গহবর (১৯৭৭): গল্প: আরো দু'টি মৃত্যু (১৯৭০)। পুরস্কার: লেখক সংঘ পুরস্কার (১৯৬৭), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৭), বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭১), সুফী মোতাহার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৬), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), নাসিরুদ্দীন স্বর্ণ পদক (১৯৮২), একুশে পদক-১৯৮৪ (মরণোত্তর) লাভ। মৃত্যু. হার্ট, লিভার ও কিডনির চিকিৎসার জন্য মস্কো গমন (১৭ জানুয়ারি ১৯৮৩)। সেখানকার সেন্ট্রাল ক্লিনিক হাসপাতালে পরলোক গমন, ১ এপ্রিল ১৯৮৩।



হাসিনা খানম (১৮৯২-?) জন্ম. ১৮৯২। শিল্পী। উচ্চাঙ্গ-সংগীত ও ছবি আঁকায় দক্ষতা প্রদর্শন। তাঁর জল রং-এ আঁকা কিছু ছবি ও স্কেচ ১৯৩০-১৯৪০ এর দশকে সওগাত, বসুমতি প্রভৃতি কাগজে ছাপা হয়। বাঙালি মুসলমান নারীদের মধ্যে তিনি ছবি আঁকার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। সংস্কৃতিবান পারিবারিক পরিবেশেই তিনি শিল্পচর্চা শুরু করেন। সমাজ কর্মী হিসেবে বিশেষ খ্যাত। মৃত্যু. তারিখ অজ্ঞাত।

হিমাংশকুমার দত্ত (১৯০৮-১৯৪৪)॥ জন্ম. কুমিল্লা শহর, ১৯০৮। সংগীতজ্ঞ ও সুরকার। কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস (১৯২৪)। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে আই.এসসি. (১৯২৬) ও বি.এ. ডিগ্রি লাভ। শৈশবকাল থেকেই সংগীতের প্রতি অনুরক্ত ও সুগায়িকা মায়ের নিকট সংগীতের তালিম গ্রহণ। ভজন গানে এবং রাগ সংগীতে

দক্ষতা অর্জন। বিশিষ্ট সুরকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন। তাঁর গানের সুরে রাগ-সংগীতের প্রাধান্য ও করুণ রসের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। অজয়কুমার ভট্টাচার্য, বিনয় মুখোপাধ্যায়, সুবোধ পুরকায়স্থ প্রমুখ বিশিষ্ট গীতিকারের গানে সার্থকভাবে সুর সংযোজন।



অজয়কুমার ভট্টাচার্যের 'বরষার মেঘ ডাকে ঝড় বরিষণে', 'মম মন্দিরে', 'আলোছায়া দোলা', 'তুমি তো বঁধু জান:, বিনয় মুখোপাধ্যায়ের 'নতুন ফাগুন যবে', সুবোধ পুরকায়স্থের 'ডাক দিয়ে যায় কেগো আমায় বাজিয়ে বাঁশি' প্রভৃতি গান তাঁর সুরের সৌন্দর্যে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠেছে। 'খুঁজে দেখা পাইনে যাহার', 'তব স্মরণ খানি', 'আবেশ আমার যায় উড়ে কোন ফাল্গুনে' হিমাংশুকুমারের অপারপর অতি জনপ্রিয় গান। সংগীতের ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতার জন্য ভাটপাড়া থেকে 'সুর-সাগর' (১৯৩১) উপাধিতে ভূষিত। মৃত্যু. ১৫ নভেম্বর ১৯৪৪।

হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭)॥ জন্ম. বগজুরী গ্রাম, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, ১৮৬৬। বাংলা চলচ্চিত্রের জনক। ১৮৯৬-তে কলকাতায় আই.এসসি. অধ্যয়নকালে 'স্টার থিয়েটার'-এর আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দেখেই চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি। পড়াশুনা ত্যাগ করে বায়োস্কোপ অনুশীলন। ১৮৯৮-তে চলচ্চিত্রের জন্য যান্ত্রিক সাজসরঞ্জাম ক্রয় এবং কলকাতার 'ক্লাসিক থিয়েটার'-এ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু। ১৮৯৮-তে ভোলায় এস.ডি.ও-র ডাকবাংলায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন। ছোটভাই মতিলাল সেনকে নিয়ে গড়ে তোলেন রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি। ১৯০০-তে বিদেশ থেকে ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমদানি। বিলেতের পার্থে কোম্পানি-কর্তৃক এ সময় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য একজন মুভি ক্যামেরাম্যান কলকাতায় প্রেরণ। ঐ মুভি ক্যামেরাম্যানের কাছ থেকে মুভি ক্যামেরা চালানোর কলাকৌশল শিক্ষা লাভ। এবং পথঘাটে ও সামাজিক অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যপূর্ণ গতিশীল দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ শুরু। তৎকালীন প্রখ্যাত নাট্য প্রযোজক, নাট্যকার ও নট অমর দত্তের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় জনপ্রিয় বাংলা নাটকের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত করে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯০১-এ ক্লাসিক থিয়েটারের প্রদর্শন। বিশেষ বিশেষ দৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত। জনপ্রিয় নাটকগুলো হলো: সীতারাম, আলিবাবা, হরিপদ, সরলা, ভ্রমর, দোলযাত্রা, বঁধু ইত্যাদি। ১৯০৩-এ প্রথম বাংলায় বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ। সি.কে. সেনের মাতার তেল 'জবাকুসুম', বটফেস্ট পাল্সের' অ্যাডওয়ার্ডস টনিক' ও ডব্লিউ মেজর কোম্পানির 'সালসা পিলা' উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপন চিত্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি থেকেই বিজ্ঞাপন চিত্রগুলো নির্মিত হয়। ১৯০০-১৯১৭ পর্যন্ত নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবির সংখ্যা প্রায় ৪০টি। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়া পত্তন করে বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসের প্রথম পুরুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। মৃত্যু. কলকাতা, ১৯১৭।



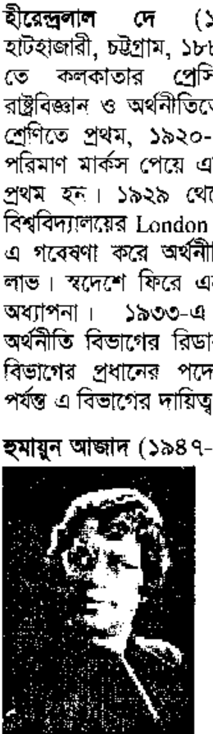
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২)॥ জন্ম. হাটখোলা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ১৮৬৮। দার্শনিক ও পণ্ডিত। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাস করার পর ১৮৮৮-তে বি.এল. পাস। ১৮৮৯-তে ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। বি.এ. পরীক্ষায় দুটি এবং এম.এ. পরীক্ষায় একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। ১৮৯৩-তে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ। ১৮৯৪-তে হাইকোর্টের অ্যাটোর্নিশিফ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি হিসেবে খ্যাতি অর্জন। ১৯২০ পর্যন্ত বিশিষ্ট নেতারূপে বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ১৮৯৪-১৯২০ পর্যন্ত কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে নিয়মিত যোগদান। ১৯০৮-এ অরবিন্দের মামলার ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন। ১৯১৫-তে বাংলার হোমরুল আন্দোলনে ভারতে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের নেত্রী অ্যানি বেশান্তের প্রধান সহকারী নিযুক্ত। অ্যানি বেশান্তের



সহায়তায় কাশী কেন্দ্রীয় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে হিন্দু মহাসভা গঠন। পরবর্তীকালে অ্যানি বেশান্তের সংস্পর্শে থিওসফিচর্চায় উৎসাহী। বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটির সহ-সভাপতি; দেশীয় শিল্প প্রসারের জন্য বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস, ন্যাশনাল ব্যাংক ও হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তিন বছর এর সভাপতি ও সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত। 'পন্থা' ও 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামক দুটি পত্রিকা সম্পাদনা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: গীতায় ঈশ্বরবাদ, উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব, জগদগুরুর আবির্ভাব, নারীর নির্বাচন অধিকার, মহাদেব, অবতারতত্ত্ব, বেদান্ত পরিচয়, বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা, যাজ্ঞ্যবল্কের অদ্বৈতবাদ, প্রেমধর্ম, রাসলীলা, সাংখ্য পরিচয়, বুদ্ধি ও বোধি, দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র, উপনিষদ, জরা ও জবিতত্ত্ব, কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান। মৃত্যু. ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪২।

হীরেন্দ্রলাল দে (১৮৯৬-১৯৭৪)॥ জন্ম. হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, ১৮৮৬। শিক্ষাবিদ। ১৯১৮-তে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, ১৯২০-তে উক্ত বিষয়ে রেকর্ড পরিমাণ মার্কস পেয়ে এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের London School of Economics-এ গবেষণা করে অর্থনীতিতে ডি.এসসি. উপাধি লাভ। স্বদেশে ফিরে এসে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। ১৯৩৩-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের রিডার নিযুক্ত। পরবর্তীকালে বিভাগের প্রধানের পদে উন্নীত। এবং ১৯৪৯ পর্যন্ত এ বিভাগের দায়িত্ব পালন। মৃত্যু. ১৯৭৪।

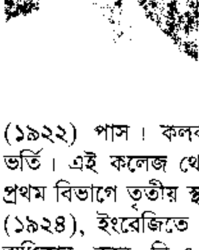
হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪)॥ জন্ম রাঢ়িখাল,



মুন্সিগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭। কবি, প্রাবন্ধিক, ভাষাবিদ, কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। পিতা আবদুর রাশেদ। রাড়িখালের স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৬২-এ মাধ্যমিক, ১৯৬৪-এ ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস। ১৯৬৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক এবং ১৯৬৮-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান। ১৯৭৬-এ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। অভিসন্দর্ভের নাম Pronominalization in Bengali (বাংলা সর্বনামীয়করণ)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা: অলৌকিক ইস্টিমার (১৯৭৩), জ্বলো চিতাবাঘ (১৯৮০), সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে (১৯৮৫), যতোই গভীরে যাই মধু যতোই উপরে যাই নীল (১৯৮৭), আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে (১৯৯০), হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯৩), আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৯৪), কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু (১৯৯৮), কাব্যসংগ্রহ (১৯৯৮), পেরোনোর কিছু নেই (২০০৪); কথাসাহিত্য: ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল (১৯৯৪), সব কিছু ভেঙে পড়ে (১৯৯৫), মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ (১৯৯৬), যাদুকরের মৃত্যু (১৯৯৬), শুভব্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার (১৯৯৭), রাজনীতিবিদগণ (১৯৯৮), কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ (১৯৯৯), নিজের সঙ্গে নিজের জীবনের মধু (২০০০), ফালি ফালি ক'রে কাটা চাঁদ (২০০১), শ্রাবণের বৃষ্টিতে রক্তজবা (২০০২), ১০,০০০, এবং আরো একটি ধর্ষণ (২০০৩), একটি খুনের স্বপ্ন (২০০৪), পাক সার জমিন সাদ বাদ (২০০৪); সমালোচনা: শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৮৮), ভাষা-আন্দোলন: সাহিত্যিক পটভূমি (১৯৯০), নারী (১৯৯২), প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে (১৯৯২), নিবিড় নীলিমা (১৯৯২), মাতাল তরণী (১৯৯২), নরকে অনন্ত ঋতু (১৯৯২), জলপাই রঙের অন্ধকার (১৯৯২), রবীন্দ্র প্রবন্ধ/রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা (১৯৯৩), শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা (১৯৯৩), সীমাবদ্ধতার সূত্র (১৯৯৩), আধার ও আধেয় (১৯৯৩), আমার অবিশ্বাস (১৯৯৭), পার্বত্য চট্টগ্রাম: সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা (১৯৯৭), মহাবিশ্ব (২০০০), দ্বিতীয় লিঙ্গ (মূল: সিমোন দ্য বোভোয়ার) (২০০১), আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম (২০০৩), ধর্মানুভূতির উপকথা ও অন্যান্য (২০০৪), ভাষাবিজ্ঞান: Pronominalization in Bengali (১৯৮৩), বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র (১৯৮৩),

বাক্যতত্ত্ব (১৯৮৪), বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড) (১৯৮৪), বাঙলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড) (১৯৮৫), তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (১৯৮৮), অর্থবিজ্ঞান (১৯৯৯); কিশোরসাহিত্য: লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী (১৯৭৬), ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না (১৯৮৫), কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী (১৯৮৭), আব্বুকে মনে পড়ে (১৯৮৯), বুকপকেটে জোনাকিপোকা (১৯৯৩), আমাদের শহরে একদল দেবদূত (১৯৯৬), অন্ধকারে গন্ধরাজ (২০০৩), Our Beautiful Bangladesh (২০০৪); অন্যান্য: হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ (১৯৯২), সাক্ষাৎকার (১৯৯৪), আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন (১৯৯৫), বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময় (১৯৯৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা (১৯৯৭)। পুরস্কার: বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬)। ২০০৪-এ বাংলা একাডেমী গ্রন্থমেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে আততায়ী হামলার শিকার। চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ার পরে ৭ আগস্ট ২০০৪ বিশ্ববিখ্যাত কবি হাইনরিশ হাইনের ওপর গবেষণা বৃত্তি নিয়ে জার্মানি গমন। ১২ আগস্ট তার ফ্ল্যাটের কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃত্যু. মিউনিখ, জার্মানি, ১১ আগষ্ট ২০০৪।

হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)। জন্ম. কোমরপুর



গ্রাম, ফরিদপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬। লেখক ও রাজনীতিবিদ। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খানবাহাদুর কবিরুদ্দিন আহমদ তাঁর পিতা। নওগাঁ কে. বি. স্কুল থেকে ইংরেজিতে লেটারসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিক (১৯২২) পাস। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। এই কলেজ থেকে ইংরেজিতে লেটারসহ প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আই.এ. (১৯২৪), ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. অনার্স (১৯২৬) এবং ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম প্রথম স্থানস অধিকার করে এম.এ. (১৯২৮) ডিগ্রি লাভ। সরকারি বৃত্তি পেয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যান্ড গমন (১৯২৮)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সেটার কলেজে ভর্তি। অক্সফোর্ড থেকে দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. অনার্স ডিগ্রি লাভ (১৯৩১)। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠিনী শান্তি দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯৩২)। ১৯৩২-এ অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রভাষক পদে যোগদান। দর্শন বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত। পরবর্তীকালে অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৪৫ পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৩৭-এর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির টিকিটে ফরিদপুর নির্বাচিত এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মুসলিম লীগ প্রার্থী তমিজুদ্দিন খানের কাছে পরাজিত। এর কিছুকাল পরে রেলওয়ে নির্বাচনী এলাকা থেকে উপ-নির্বাচনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত (১৯৩৭)। বঙ্গীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকের রাজনৈতিক সচিব নিযুক্ত। ১৯৪৬-এর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে পুনরায় রেলওয়ে নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী জ্যোতি বসুর কাছে পরাজিত। ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব হিসেবে যোগদান। ১৯৫০-এ ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত। ১৯৫২-তে ভারতের শিক্ষা সচিবের পদ অলংকৃত। ১৯৫৫-তে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালর নেহেরুর পরামর্শে সরকারি চাকরি পরিত্যাগ করে কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগদান। কংগ্রেসের মনোনয়নে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত (১৯৫৬)। কেন্দ্রীয় সরকারের বেসামরিক বিমান চলাচল প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৫৭-তে কংগ্রেসের মনোনয়নে পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট নির্বাচনী এলাকা থেকে ভারতীয় লোকসভার সদস্য নির্বাচিত। এরপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের কেবিনেট মন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৫৮-তে নেহেরু সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৬৪-১৯৬৬-তে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রিসভার শিক্ষা ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। ১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারিতে মন্ত্রিত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের পর কংগ্রেস ত্যাগ। 'বাংলা কংগ্রেস' গঠন। পশ্চিমবঙ্গে অকংগ্রেসী প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন (১৯৬৭)। দর্শন, সাহিত্য ও সমাজ তত্ত্বের ওপর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি

অর্জন। সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতিচর্চার ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক জীবনদৃষ্টির প্রতিভু হিসেবে পরিচিত। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'চতুরঙ্গ' (১৯৩৯) প্রকাশ ও এর সম্পাদনা (১৯৩৯-১৯৬৯)। গ্রন্থ: প্রবন্ধ-ধারাবাহিক (১৯৪০), শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব (১৯৪২), বাংলার কাব্য (১৯৪৫), মার্কসবাদ (১৯৫১), নয়া ভারতের শিক্ষা (১৯৫৫), শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (১৯৫৭), মিরজা আবু তালিব খান (১৯৬১), Kant of Philosophy in General (1935), Poetry Monads and Society (1941), Muslim Politics in Bengal (1943), Rabindranath Tagore (1945), Education in India (1956), Studies in Bengali Poetry (1964), The Bengali Novel (1978)। কাব্য-স্বপ্নসাধ (১৯২৮), সাথী (১৯৩০), অষ্টাদশী (১৯৩৮)। উপন্যাস-নদী ও নারী (১৯৪৫)। মৃত্যু. কলকাতা, ১৮ আগস্ট ১৯৬৯।

হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২)॥ জন্ম. বরিশাল, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৮।



কবি। ব্রজমোহন স্কুল থেকে ১৯৬৩-তে মেট্রিক, ১৯৬৫-তে বি. এম. কলেজ থেকে আই.এ. ১৯৬৮-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি.এ. (অনার্স) এবং ১৯৬৯-এ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাস। ১৯৭০-এ বাংলা একাডেমী গবেষণা বৃত্তিলাভ এবং ১৯৭২-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান। বাংলা একাডেমীতে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'সাম্প্রতিক জীবন চৈতন্য ও জীবনানন্দ দাশের কবিতা'। পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। ১৯৭২-এর প্রথম দিকে গোপন বিপ্লবী রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ এবং বাম প্রগতিশীল সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। একই বছর একবার গোপন রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সরকারের রোষানলে পতিত এবং গ্রেফতারবরণ। 'পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি' গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৭১-এ 'লেখক সংগ্রাম শিবির' প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৭২-এ এর নাম 'বাংলাদেশ লেখক শিবির' রাখা হয়। প্রকাশিত গ্রন্থ-কবিতা: কুসুমিত ইস্পাত (১৯৭২)। ১৯৮৫-র ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমী থেকে 'হুমায়ূন কবির রচনাবলী' প্রকাশিত হয়। পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির প্রধান নেতা সিরাজ শিকদারের সঙ্গে পার্টির কর্মসূচির প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। এর কিছুকাল পরে নিহত হন। মৃত্যু. ঢাকা, আততায়ীর গুলিতে, ৬ জুন ১৯৭২।

হুমায়ুন কাদির (১৯৩২-১৯৭৭)॥ জন্ম.



মাতুলালয়, গোপালপুর গ্রাম, মাদারীপুর, ২৯ জুলাই ১৯৩২। কথাসাহিত্যিক। পৈতৃক নিবাস কুঠিবাড়ি, ভাঙ্গা-ফরিদপুর। পিতা শিক্ষাবিদ এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৫০), ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৫৪) ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৫৮) পাস। কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম.এ.(১ম পর্ব) ক্লাসে অধ্যয়ন। 'দৈনিক সংবাদ'-এর বার্তা বিভাগে দায়িত্ব পালন (১৯৫৯-১৯৬০)। এরপর মাসিক 'সওগাত'-এ যোগদান। ১৯৬১-তে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'পাক জমহুরিয়াত' (বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর সচিত্র বাংলাদেশ সংবাদ নামে প্রকাশিত) পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত। আমৃত্যু এ পদে কর্ম সম্পাদন। স্কুল-শিক্ষিকা জাহেদা বেগমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯৬২)। এক পুত্র-সন্তান লাভের পর তাঁদের দাম্পত্য জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয় (১৯৬৫)। এরপর একাকী বাস। সমাজ-সচেতন কথাসাহিত্যিক। বাস্তবতাবোধ, রোমান্টিক চেতনা ও মনোবিশ্লেষণ প্রবণতা এ তিনের সমন্বয়ে তাঁর গল্প-উপন্যাস ঋদ্ধ। উপন্যাস: নির্জন মেঘ (১৯৬৫)। গল্পগ্রন্থ: একগুচ্ছ গোলাপ ও কয়েকটি গল্প (১৯৬৬), আদিম অরণ্যে একরাত্রি (১৯৭০), শীলার জন্যে সাধ (১৯৭৯), কোথায় পাব তারে (১৯৮৮)। ছোটগল্পে মরণোত্তর বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ (১৯৮০)। মৃত্যু. ঢাকা, ২০ এপ্রিল ১৯৭৭।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)॥ কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোড, ১৮ এপ্রিল ১৮০৯। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কবি, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক। বাংলায় উনিশ শতকের নবজাগরণের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বাঙালি শিক্ষাজীবী মহল তাঁকে একজন বিশিষ্ট বাঙালিরূপে দাবি করে গর্ববোধ করতেন। ১৮১৫-১৮২২ পর্যন্ত স্কটল্যান্ডের প্রেস বিটারিয়ান যুক্তিবাদী খ্রিস্টান ডেভিড ড্রামন্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে শিক্ষালাভ এবং ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন। ড্রামন্ডের শিক্ষাগুণে উদার, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী হয়ে গড়ে ওঠেন। ১৮২৩-এ শিক্ষা শেষ করে কিশোর ডিরোজিও জেমস স্কট অ্যান্ড কোম্পানির সওদাগরি অফিসে চাকরি নেন। এই উপলক্ষে ভাগলপুরে গমন। ভাগলপুরের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে কবিতা রচনার অনুপ্রেরণা পান। কলকাতায় জন গ্রান্ট সম্পাদিত 'ইন্ডিয়া গেজেট'-এ কয়েকটি কবিতা 'জুভেনিস' ছদ্মনামে প্রকাশিত। ১৮২৬-এ কলকাতার হিন্দু কলেজের (১৮১৭) শিক্ষকরূপে যোগদান। ছাত্রদেরকে ইতিহাস ও ইংরেজি শিক্ষাদান। শিক্ষাদান কুশলতায় মুগ্ধ হয়ে ছাত্রগণ তাঁর একান্ত অনুরক্ত হয়ে পড়ে। দার্শনিক অ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম, বার্কলে, লক, মিল, হিউম, রীড, স্টুয়ার্ড, পেইন্ট, ব্রাউন প্রমুখ মনীষীর রাজনৈতিক মতবাদ ও দর্শনের ব্যাখ্যা ও প্রচারের দ্বারা তিনি ছাত্রদের জ্ঞান, যুক্তি ও বিচার শক্তিকে জাগ্রত করেন। ডিরোজিওর শিক্ষাদর্শে আলোকিত তৎকালীন হিন্দু কলেজ সম্পর্কে বলা হয় Hindu College at the time of Derozio-master spirit of the era। 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে খ্যাত। তাঁর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ছাত্রগণের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারিচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পরবর্তীকালে সমাজ, সাহিত্য ও প্রগতিমূলক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিখ্যাত হয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও তাঁর আদর্শে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮২৮-এ অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করে ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন সভায় পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা ও মতবিনিময় করতেন। এই অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শে কলকাতার তৎকালীন ছাত্রসমাজ তাদের শিক্ষাগুরু ডিরোজিওকে যুক্ত করে আরো সাতটি বিতর্কসভা স্থাপন করেন। ডেভিড হেয়ারের আগ্রহাতিশয্যে ডিরোজিও পটলডাঙ্গা স্কুলে যে বক্তৃতা করতেন তা শুনে হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য স্কুলের ছাত্ররা সেখানে ভিড় জমাতো। ১৮৩০-এ ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক 'পার্থেনন' নামক একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ। এই পত্রিকায় তৎকালীন সামাজিক বিধিব্যবস্থা, এমনকি সরকারি রীতিনীতির নিন্দাসূচক সমালোচনা প্রকাশিত হতো। ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষের আদর্শে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ডিরোজিওর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ছাত্রগণ ক্রমে হিন্দুধর্মে প্রচলিত বিবিধ সংস্কার, যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস এমনকি ধর্মীয়আচার ব্যবহারের উপর ব্যঙ্গবিদ্রুপ ও সমালোচনা করে। মদ্যপান, নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ ও নানা বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। ছাত্রদের আচার ভ্রষ্টতায় তৎকালীন হিন্দু সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ফলে ১৮৩০-এ হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ এক নিষেধাজ্ঞা জারি করে ছাত্র ও শিক্ষকদের ধর্ম বা রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে যোগদানে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ছাত্ররা এই নিষেধাজ্ঞায় আরও উগ্র হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৮৩১-এর ২৩ এপ্রিল অধ্যক্ষসভায় এক বিশেষ অধিবেশনে ডিরোজিওকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কলেজ-কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হেনরী হেম্যান উইলসন ডিরোজিওকে পদত্যাগ করতে পত্র দেন। ১৮৩১-এর ২৫ এপ্রিল ডিরোজিও তাঁর উপর আনীত অভিযোগ খণ্ডন করে প্রতিবাদসহ পদত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর সংবাদপত্র প্রকাশে আত্মনিয়োগ। কিছুকাল 'হেসপারাস' নামক পত্রিকা সম্পাদনা। ১৮৩১-এর ১ জুন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের মুখপত্র 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' নামক একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ। রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ: পোয়েমস (১৮২৭) ও দি ফকির অফ জাঙ্গিরা (১৮২৮)। মৃত্যু. কলকাতায় কলেরা রোগে, মাত্র তেইশ বছর বয়সে, ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১



হেনা দাস (১৯২৪-২০০৯): জন্ম. সিলেট, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪। শিক্ষাবিদ, শিক্ষকনেত্রী, নারীনেত্রী। পিতা সতীশচন্দ্র দত্ত একজন স্বনামধন্য আইনজীবী এবং মা মনোরমা দত্ত চুনারুঘাট থানার নরপতি গ্রামের জমিদার জগৎচন্দ্র বিশ্বাসের বড়ো মেয়ে।



সিলেট সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে ১৯৩০-এ শিশু শ্রেণীতে ভর্তি। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই হেনা দাস ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে, সশস্ত্র বিপ্লোবী আন্দোলনে প্রভাবিত হন। ১৯৩৮-এ ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান। ১৯৪০-এ ঔ স্কুল থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯৪২-এ প্রথম বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এরপর তিনি বামপন্থী রাজনীতির জন্য যুক্ত হন। ১৯৪৭-এ বি.এ. পাস করেন। ময়মনসিংহ মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে বি.এড. ডিগ্রি লাভ। ১৯৬৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। বিয়ে হয় পার্টির সক্রিয় কর্মী কমরেড রোহিণী দাসের সঙ্গে। তিনি ছিলেন সিলেট জেলা কৃষক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা। রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিকূলে থাকায় বর ও কনেকে গোপনে কলকাতায় চলে যেতে হয় এবং ১৯৪৮-এর ২৮ জুন ঘরোয়াভাবে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর পার্টির নির্দেশে হেনা দাস ও রোহিণী দাস অনেকদিন আত্মগোপন ছিলেন। ১৯৪৮-১৯৪৯-এ নানাকার আন্দোলনে নানাকার মেয়েদের সংগঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৮-এ তিনি ঢাকায় গেন্ডারিয়া মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে আসেন। ১৯৬১-এ প্রধানশিক্ষিকা হিসেবে 'নারায়ণগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে' যোগদান। পরে মহাখালী ওয়ারলেস স্টেশন স্কুলেও প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন। ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ভারতগমন এবং উদ্বাস্তু শিক্ষকদের সঙ্গে রিলিফের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৭৮ সাল থেকে পরবর্তী ১৪ বছরে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়ে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন। ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের অন্যতম সদস্য। ১৯৮৭-এর ৩ জানুয়ারি স্বামী রোহিণী দাসের পরলোকগমন। ১৯৮৯-এ শিক্ষকতা থেকে অবসর নেন। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ২০০০-এর ২২ জানুয়ারি মহিলা পরিষদের সভানেত্রী নির্বাচিত। শিক্ষা ও রাজনৈতিক বিষয়ক প্রবন্ধ এবং স্মৃতিমূলক রচনা লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'উজ্জ্বল স্মৃতি', 'শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবন', 'স্মৃতিময় দিনগুলো', 'নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা', 'স্মৃতিময়-'৭১' এবং 'চার পুরুষের কাহিনী'। পুরস্কার: জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদক (২০০৫), ও রাষ্ট্রীয় 'রোকেয়া পদকে' সম্মানিত। এছাড়া সুনামগঞ্জ পৌরসভা, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ঢাকেশ্বরী মন্দির, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট, আহমদ শরীফ ট্রাস্টসহ বহু প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মাননা লাভ। মৃত্যু. ঢাকা, ২০ জানুয়ারি ২০০৯।

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো (১৮৭১-১৯৫০)॥ জন্ম. রাধানগর, মেদিনীপুর, ১৮৭১। বিপ্লবী। মেদিনীপুর টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে মেদিনীপুর কলেজে কিছুকাল এফ.এ. অধ্যয়ন। পরে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে ও আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ। কর্মজীবনে মেদিনীপুর স্কুলে অঙ্কন শিক্ষক ও পরে রসায়ন শাস্ত্রের ডেমনস্ট্রেটর নিযুক্ত। চিত্রাঙ্কনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সুবিধা না হওয়ায় মেদিনীপুর জেলা বোর্ডে চাকরি গ্রহণ। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯০২-এ অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শ লাভ। এরপর মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় আগমন এবং বিপ্লবী দল সংগঠনে মনোনিবেশ। মেদিনীপুরে তরুণদের অস্ত্র চালানো শিক্ষা দান। পূর্ব-বঙ্গের তৎকালীন লাট র‍্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যা প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন। ১৯০৬-এ বৈপ্লবিক কাজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে ইউরোপ গমন। ভারতীয় বিপ্লবী শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা কর্তৃক বিদেশে অর্থ সাহায্য প্রদান। লন্ডনে কৃষ্ণবর্মার 'ইন্ডিয়া হাউসে' বোমা তৈরির ব্যাপারে গবেষণা। পরে প্যারিসে ভারতীয় বিপ্লবী নেত্রী মাদার কামার সহায়তায় ফরাসি স্যোশালিস্ট পার্টির গুপ্ত সংগঠনের কার্যরীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। ফরাসি বিপ্লবী কর্তৃক বোমা তৈরির নিয়ম-কানুন শিক্ষা প্রদান।

১৯০৭-এ দেশে ফিরে চন্দন নগরের মেয়রের উপর নিজের তৈরি বোমা প্রথম নিক্ষেপ। মেয়র সেদিন রক্ষা পান। দ্বিতীয় বোমাটি পুস্তকে রেখে কলকাতা চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে পাঠানো হয়। কিংসফোর্ডও রক্ষা পান। তৃতীয় বোমাটি ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নিক্ষেপ করেন। ১৯০৮-এর ২৫ মে কলকাতায় মুরারিপুকুর বাগানবাড়ি খানা তল্লাসির সময়ে নেতৃস্থানীয় অনেকের সঙ্গে গ্রেফতারবরণ। বিচারে দ্বীপান্তর হয়। ১৯২১-এ মুক্তিলাভ। শেষ জীবন গ্রামের বাড়িতে কাটান। তাঁর রচিত 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' পুস্তকখানি বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম রাজনৈতিক ইতিহাস। মৃত্যু. ৮ এপ্রিল ১৯৫০।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)। জন্ম. মাতামহের গৃহে, গুলিটা-রাজবল্লভহাট গ্রাম, হুগলী, ১৭ এপ্রিল ১৮৩৮। কবি। পৈতৃক নিবাস উত্তর পাড়া গ্রাম, হুগলী। কুলীনের বংশে জন্ম। চার ভাই দুই বোনের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। পিতা কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অতিশয় দরিদ্র। কৌলীন্যের বলে কৈলাসচন্দ্র গুলিটা-রাজবল্লভহাট গ্রাম নিবাসী কলকাতা আদালতের মোক্তার রাজচন্দ্র চক্রবর্তীর একমাত্র সন্তান আনন্দময়ীকে বিবাহ করে শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন। কৈলাসচন্দ্র বিশেষ কোনো কাজ-কর্ম করতেন না বিধায় শ্বশুরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। হেমচন্দ্র কলকাতার খিদিরপুর বাঙ্গালা স্কুলে পাঠকালে রাজচন্দ্র চক্রবর্তী মৃত্যুমুখে পতিত হলে আর্থিক সঙ্কটে পড়ে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর আশ্রয়ে থেকে ইংরেজি শেখেন। সর্বাধিকারী মহাশয় হেমচন্দ্রকে কলকাতার হিন্দু কলেজে (১৮১৭) সিনিয়র স্কুল বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেন (১৮৫৩)। জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মাসিক দশ টাকা বৃত্তি লাভ (১৮৫৫)। একই বছর কলকাতার ভবানীপুর নিবাসী কালীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কামিনী দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে দুই বছরের জন্য মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি লাভ (১৮৫৭)। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণিতে পাঠকালে বৃত্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে লেখাপড়া ত্যাগ করে মিলিটারি অডিট অফিসে কেরানিগিরি চাকরি গ্রহণ (১৮৫৯)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বারের বি.এ. পরীক্ষায় (১৮৫৯) অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার। সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতা ট্রেনিং স্কুলে হেড মাস্টার পদে যোগদান (১৮৫৯)। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এল. পরীক্ষা দেন (১৮৬০)। পরীক্ষায় যোগ্যতা প্রদর্শন করতে না পারায় এল.এল.ডিগ্রি লাভ। শিক্ষকতার কর্ম ত্যাগ করে ১৮৬১-তে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় অংশগ্রহণ। একই বছর প্রথমে শ্রীরামপুর, পরে হাওড়ায় মুন্সেফ পদে কর্ম সম্পাদন। কিছুকাল পর চাকরি ত্যাগ করে পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৮৬৬-তে বি.এল. ডিগ্রিলাভ। ১৮৯০-এ সরকারি উকিল নিযুক্ত। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরবর্তীকালের কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কবি। বাংলা মহাকাব্যের ধারায় হেমচন্দ্রের প্রধান দান হচ্ছে স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনা সঞ্চার। তাঁর প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১)। 'বীরবাহু' (১৮৬৪), 'কবিতাবলী' (খণ্ড কবিতার সংকলন ১৮৭০), 'বৃত্রসংহার' (১ম খণ্ড-১৮৭৫, ২য় খণ্ড-১৮৭৭), 'আশাকানন' (১৮৭৬), 'ছায়াময়ী' (১৮৮০), 'দশ মহাবিদ্যা' (১৮৮২), 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮) হেমচন্দ্রের অন্যান্য প্রধান কাব্য। 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য ও এটি কবির শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর খণ্ড কবিতাগুলো এক অনবদ্য রচনা। 'জীবন-সংগীত' (লংফেলোর এর বঙ্গানুবাদ), 'ভারতসংগীত', 'ভারতবিলাপ', 'গঙ্গার উৎপত্তি', 'পদ্মের মৃণাল', 'ভারত-কাহিনী', 'অশোকতরু', 'কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ' প্রভৃতি খণ্ড কবিতা তাঁর অভূতপূর্ব সৃষ্টি। জীবন-সায়াহ্নে অন্ধ হয়ে যান এবং চরম দারিদ্র্যাবস্থার সম্মুখীন হন। মৃত্যু. খিদিরপুর, কলকাতা, ২৪ মে ১৯০৩।



হেমপ্রভা মজুমদার (১৮৮৮-১৯৬২)। জন্ম. খিলপাড়া, নোয়াখালী, ১৮৮৮। রাজনীতিক, অবিভক্ত বাংলার জননেত্রী। প্রগতিশীল পিতা গগনচন্দ্র চৌধুরী সামাজিক সংস্কারের মধ্যেও হেমপ্রভাকে স্কুলে পাঠান। স্বামী বসন্তকুমার মজুমদার কুমিল্লা জেলায় যুগান্তর দল সংগঠনে

অগ্রণী ও একনিষ্ঠ কংগ্রেসী। স্বামীর কাছ থেকেই



দেশসেবার মন্ত্রলাভ। কংগ্রেসে যোগদান (১৯২১)। উর্মিলা দেবী প্রতিষ্ঠিত 'নারী কর্ম মন্দির'-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে সভা-সমিতি ও আন্দোলন পরিচালন। চাঁদপুর ও গোয়ালন্দ স্টিমার ধর্মঘটে (১৯২১) স্বামীকে সার্বিক সহায়তাদান এবং গোয়ালন্দে স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠন। বসন্ত কুমার প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৫) 'ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' এবং অসহযোগ আন্দোলনে অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ গ্রেফতার হলে হেমপ্রভার আন্দোলন পরিচালনা। অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের সংগঠনে মুখ্য দায়িত্ব পালন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মুক্তিসংগ্রামের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, চিত্তরঞ্জন দাসের প্রিয়জন। কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন। কলকাতায় 'মহিলা কর্মী সংসদ' গঠন (১৯২২)। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ (১৯৩০)। একই সঙ্গে তাঁর দুই কন্যা শান্তিপ্রভা ও অরুণা রাজরোষের শিকার। কুমিল্লা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৩২)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্য (১৯৩৭)। ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান (১৯৩৯) এবং সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের পর দলের নেতৃত্ব গ্রহণ (১৯৪১)। কলকাতায় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত (১৯৪৩)। কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে (১৯৪৪) অল্ডারম্যান নিযুক্ত। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু (২ মে ১৯৪৯) সত্ত্বেও রাজনৈতিক কর্মধারা অব্যাহত। দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান। চলচ্চিত্রকার সুশীল মজুমদার তাঁর পুত্র। নারী জাগরণে বিশেষ ভূমিকা পালন। ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার সহ-সভানেত্রী। তাঁর সম্পর্কে নজরুলের কাব্যোক্তি 'কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া/ আসিলে আলোক জননী/ প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত/ হেম-প্রভ হল ধরনী।' দৃঢ়চেতা ও তেজস্বিনী। মৃত্যু. ৩১ জানুয়ারি ১৯৬২।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৯)॥ জন্ম. বারানসি, ১৬ জুন ১৯২০। গায়ক ও সংগীত পরিচালক। প্রকৌশলী হওয়ার জন্য শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি। সেখানকার পড়া



ত্যাগ করে সংগীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ। ১৯৩৫-এ কলকাতা বেতারে গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর সাংগীতিক জীবনের সূচনা। অর্ধ শতাব্দীকাল অনন্য ও সুললিত কণ্ঠে অজস্র গান গেয়ে সুরের যাদুকর বলে খ্যাতি লাভ। ১৯৩৭-এ তাঁর গাওয়া প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত। ১৯৪৫-এ বাংলা ছায়াছবি 'নিমাই সন্ন্যাসী'-তে প্রথম নেপথ্য গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। 'পাল্কী চলেরে', 'ও নদীরে', 'পথের ক্লান্তি ভুলে', 'কোন এক গাঁয়ের বধূর কাহিনী', 'রানার রানার', 'আজ দু'জনার দু'টি পথ', 'সুরের আকাশে', 'মুছে যাওয়া দিনগুলো', 'এই বালুকা বেলায়', 'এই পথ যদি না', 'এই রাত তোমার আমার' প্রভৃতি আধুনিক গান গেয়ে সংগীত রসিকদের মন জয়। রবীন্দ্র-সংগীতেরও প্রতিভাবান কণ্ঠশিল্পী। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্র-সংগীতের প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড বের হয় ১৯৪৪-এ। 'বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও', 'মনে রবে কিনা রবে আমারে', 'প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ শাখায়', 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে', 'শুধু তোমার বাণী', 'আমার রাত ফুরালো' প্রভৃতি রবীন্দ্রসংগীত তাঁর কণ্ঠে অপূর্ব সুরমাধুর্যে গীত। বহু হিন্দি চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক ও নেপথ্য গায়ক। 'আনন্দ মঠ'-এর নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীরূপে হিন্দি ছায়াছবির জগতে প্রবেশ। হিট ছবি 'নাগিন'-এর সংগীত পরিচালক হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ। 'বিশ সাল বাদ', 'আমনে সামনে' প্রভৃতি ছবিরও সংগীত পরিচালক। লেখক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। ছাত্রজীবনে 'বাতায়ন' ও 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর বহু গল্প প্রকাশিত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (১৯৭১) প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন। গান গেয়ে অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য প্রদান। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট. ডিগ্রি প্রদান। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করলে (১৯৮৮) তৎকর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান। মৃত্যু. কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।



হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-১৯৮৭)॥ সিলেট, ১৪ জানুয়ারি ১৯১২। সংগীতশিল্পী এবং সুরকার। হবিগঞ্জ হাইস্কুল থেকে পাস করার পর শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে ভর্তি হন। সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত। ১৯৩২-এ কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৫-এ কারাবন্দী থাকাকালে যক্ষারোগে আক্রান্ত এবং মুক্তি লাভ। ১৯৪৮-এ তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সময়ে গ্রেফতার হয়ে তিন বছর বন্দী থাকেন। ১৯৩৮-৩৯-এ বিনয় রায়, নিরঞ্জন সেন, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখের সঙ্গে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আই.পি.টি.এ গঠন। পঞ্চাশের দশকে এই সংঘের শেষ অবধি এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২-এ বাংলার প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের আমন্ত্রণে প্রথম কলকাতায় সংগীত পরিবেশন। ১৯৪৩-এ সিলেট গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতার আগে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গানের সুরকারদের মধ্যে অগ্রগণ্য। 'তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান', 'কিষাণ ভাই তোর সোনার ধানে বর্গী নামে' প্রভৃতি গান আসাম ও বাংলায় সাড়া ফেলেছিল। ষাটের দশকে 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে কাজ করার সময় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতপার্থক্য হলে পদত্যাগ। চীন-ভারত মৈত্রীর ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন। দুবার তিনি চীনে গমন চীনা ভাষায় গান রচনা। 'সিঙ্গার্স' নামে দল গঠন করে জীবনের শেষ দিকেও গ্রামে গ্রামে গান পরিবেশন। 'কল্লোল', 'তীর', 'লাললণ্ঠন' প্রভৃতি নাটকের সংগীত পরিচালক। 'লাললণ্ঠন' নাটকে চীনা সংগীতের সুর ব্যবহৃত। উল্লেখযোগ্য রচনা: 'শঙ্খচিলের গান', 'জন হেনরীর গান', 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য', 'বাঁচব বাঁচব রে আমরা', 'মশাল জ্বালো', 'সেলাম চাচা', 'আমি যে দেখেছি সেই দেশ', 'হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান'। বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'লোকসংগীত শিক্ষা'। মৃত্যু. কলকাতা, ২২ নভেম্বর ১৯৮৭।



হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩)॥ জন্ম. কলকাতা, ১৮৮৮। শিশুসাহিত্যিক পত্রিকা-সম্পাদক, ভারতীগোষ্ঠীর লেখক সাপ্তাহিক নাচঘর (১৯২৪) পত্রিকা সম্পাদন। এছাড়া রংমশাল ও অন্যান্য প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনা-সূত্রে যুক্ত। চিত্র-শিল্পেও নৈপুণ্য প্রদর্শন। শিশুসাহিত্য ছাড়াও গল্প ও উপন্যাস লিখে খ্যাতি লাভ। ১৯০৩-এ বসুধা পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত। গ্রন্থ সংখ্যা বিপুল। কেবল শিশুসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থসংখ্যা ৮০টির বেশি। শিশু-কিশোরদের রোমাঞ্চকর গল্প-উপন্যাসের লেখক হিসেবেই হেমেন্দ্রকুমারের জনপ্রিয়তা। তাঁর ভূতের গল্পগুলো বাংলা শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে পরিগণিত। রচিত কয়েকটি গ্রন্থ: ভোরের পূরবী (১৯২১), মালাচন্দন (১৯২২), মায়াকানন (১৯২৯), অমাবস্যার রাত (১৯৩৮), অন্ধকারের বন্ধু (১৯৪২), যকের ধন, দেড়শ' খোকার কাণ্ড, যাদের দেখেছি, বাংলা রঙ্গালয় ও শিশির কুমার (১৯৫৪), ওমর খৈয়ামের রুবায়ত ইত্যাদি। গীতিকার হিসেবেও খ্যাত। এছাড়া শিশির কুমার ভাদুড়ীর 'সীতা' নাটকের নৃত্য-পরিচালক। মৃত্যু. ১৮ এপ্রিল ১৯৬৩।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬-১৯৬২)॥ জন্ম. চৌগাছা গ্রাম, যশোহর, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬। সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা। কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে ১৮৯৩-তে এন্ট্রান্স পাস। ১৮৯৯-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস। সাংবাদিকতায় দীক্ষা 'সাহিত্য' পত্রিকার সুরেশচন্দ্র সামাজপতির কাছে ছাত্রাবস্থা থেকেই। ১৯০৬-তে অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা পরিচালনায় নিয়োজিত। 'আর্যাবর্ত' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা (১৯১০-১৯১৪)। 'সাপ্তাহিক বসুমতি'-তে লেখা শুরু এবং শেষ পর্যন্ত এর সম্পাদনার ভারও গ্রহণ। ইংরেজি 'বসুমতি'রও সম্পাদক। এ সময়ে তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রবন্ধ এত জ্বালাময়ী ছিল যে ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে তা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বসুমতীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে 'দৈনিক হিন্দুস্থান' নামক বাংলা কাগজ প্রকাশ। এ ছাড়া

'অ্যাডভান্স' ও 'মাতৃভূমি' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। 'বসুমতি' পত্রিকার স্বত্বাধিকার মৃত্যুর পূর্বে বসুমতি পরিচালনার জন্য যে চারজন এক্‌জিকিউটর মনোনীত করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। লন্ডন ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ জার্নালিস্ট-এর সদস্য মনোনীত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক। ১৯৪৫-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। শিক্ষাক্ষেত্রেও অবদান উল্লেখযোগ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে গিরীশ ঘোষ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দান। প্রকাশিত গ্রন্থ-উপন্যাস: বিপত্নীক, অধঃপতন, প্রেমের জয়, নাগপাশ, মৃত্যুমিলন, অদৃষ্টচক্র, অশ্রু, প্রেম মরীচিকা, মুক্তার মালা। কিশোর পাঠ্য গ্রন্থ: আষাঢ়ে গল্প, রবিন্‌সন ক্রুসো। প্রবন্ধ: নিউ জার্মানি, দ্য নিউজ পেপার অব ইন্ডিয়া, কংগ্রেস ও বাঙালি। সংবাদপত্রের কাটিং দিয়ে বিষয়ানুগ বিন্যাসের সূত্রপাত সর্বপ্রথম তিনিই শুরু করেন। সে কারণেই অনেকে তাঁকে বঙ্গদেশের 'সাংবাদিক গ্রন্থাগারের একজন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারিক' আখ্যায় ভূষিত করে থাকেন। মৃত্যু. কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২।

হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২-১৯৩৫)॥ জন্ম. ফুলকোচা, পাবনা, ১৮৯২। কবি ও শিশুসাহিত্যিক। সিরাজগঞ্জ বি.এল. স্কুলে শিক্ষা লাভের পর রাজশাহী সরকারি কলেজে ও পরে কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যয়ন। কলেজে থাকাকালে কবি খ্যাতি অর্জন। 'হিন্দুস্থান' নামক দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। পরবর্তীকালে বাঁশরী, মহিলা, রাষ্ট্রবাণী, উদয়ন প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনা-সূত্রে দীর্ঘদিন যুক্ত। কিছুকাল সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'খাদি প্রতিষ্ঠান'-এর প্রচার বিভাগে কর্ম-সম্পাদন। শেষজীবনে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'-এর প্রচার বিভাগে যোগদান। কাব্য গ্রন্থ: ফুলের ব্যথা (১৯২২), মায়াকাজল (১৯৩০), মণিদীপা (১৯৩১)। শিশুতোষ গ্রন্থ: মায়াগৃহ (১৯২৫), গল্পের ঝরণা (১৯২৯), গল্পের আলপনা (১৯৩০), গল্পের মায়াপুরী (১৯৩৩), পাঁচ সাগরের ঢেউ (১৯৩৩), দুর্গম পথের যাত্রী (১৯৫৫), ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন (১৯৫৬), ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫৬) ইত্যাদি। মৃত্যু. ১৫ জুলাই ১৯৩৫।

হোসেন আলী (১৯২৩-১৯৮১) জন্ম. পাবনা, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩। কূটনীতিবিদ। ঢাকা



বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৫-এ রসায়নে এম.এস‌সি. এবং করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৮-এ এল.এল.বি. পাস। চাকরি জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে ওয়াশিংটন ডিসি-র ফরেন সার্ভিস ইনস্টিটিউটে আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন, ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরের একটি কোর্সে যোগদান এবং প্যারিসের ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স থেকে কূটনীতি বিদ্যায় ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ। ১৯৪৯-এ পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগদান। ভারত, তুরস্ক, বেলজিয়াম, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, বার্মা ও অস্ট্রেলিয়ায় পাকিস্তানি দূতাবাসে বিভিন্ন কূটনৈতিক পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৭০-এ কলকাতায় পাকিস্তানি দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার পদ লাভ। বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ১৯৭১-এর ১৮ এপ্রিল স্বীয় মিশনের ৬৫ জন সহকর্মীসহ বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। ভারতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান কর্মকর্তারূপে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ১৯৭২-এর জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে নিযুক্তি লাভ। একই বছর মার্চে (১৯৭২) অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার নিযুক্ত। একই সঙ্গে নিউজিল্যান্ড ও ফিজিতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭৩-এর জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত। ১৯৭৬-১৯৭৯ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার নিযুক্ত। দেশপ্রেমিক বাঙালি। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কূটনীতি ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন। মৃত্যু. অটোয়া, ২ জানুয়ারি ১৯৮১।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)॥ জন্ম. মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯২। রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। পিতা স্যার জাহেদ সোহরাওয়ার্দী (কলকাতা

হাইকোর্টের বিচারপতি) ও মাতা খোদেস্তা বানু। কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে অনার্সসহ বিজ্ঞানে স্নাতক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. (১৯১৩), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ বি.এসসি., বি.সি.এল., রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইংরেজিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। গ্রেস ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস (১৯১৮) করে দেশে প্রত্যাবর্তন। কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। স্যার আব্দুর রহিমের কন্যা নিয়াজ ফাতেমার সঙ্গে বিয়ে (১৯২০)। বিয়ের তিন বছর পরে স্ত্রীবিয়োগ। ১৯৪০-এ ভেরা টিসিস্কো (মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনেত্রী) নাম্নী এক রুশ মহিলার পাণিগ্রহণ। ১৯৪৬-এ তাঁদের বিয়েবিচ্ছেদ। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের (মওলানা মোহম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী) পরিচালিত খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ (১৯২০)। খিদিরপুর শিল্প এলাকা থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) নামে এক ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন। ১৯২৪-এ কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত। কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার (১৯২৬) পর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে সিমলায় যে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান। ১৯২৭-এ তাঁর নেতৃত্বে ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন গঠিত। ১৯২৮-এ কলকাতায় নিখিল ভারত খেলাফত কনফারেন্স ও একই বছর কলকাতায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম কনফারেন্সের আয়োজন। ঐ বছর দিল্লিতে মুসলিম সম্মেলনে যোগদান। এ সম্মেলনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা দাবি করে প্রস্তাব গৃহীত। কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কনফারেন্সের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান। এর প্রথম সভায় সভাপতিত্ব। ১৯৩৬-এ খাজা নাজিমুদ্দীনকে সভাপতি করে



কলকাতায় ইনডিপেনডেন্ট মুসলিম পার্টি গঠিত হলে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত। একই বছর এ দল তার নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন নিখিল ভারত মুসলিম লীগে একীভূত হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি নিযুক্ত। ১৯৩৭-এ দুইটি আসন (কলকাতা দক্ষিণ ও চব্বিশ পরগণা) থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। একই বছর এপ্রিল মাসে শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগ-কৃষক প্রজা পার্টির বঙ্গীয় কোয়ালিশন সরকারের বাণিজ্য ও শ্রম দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত। খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত লীগ মন্ত্রিসভার খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের মন্ত্রী (২৪ এপ্রিল ১৯৪৩-২৩ এপ্রিল ১৯৪৬)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা পরিচালনা। জেলা ও মহকুমা লীগের কমিটিসমূহ পুনর্গঠিত করে ও শত শত জনসভায় লীগের আদর্শ প্রচার করে নামসর্বস্ব মুসলিম লীগকে একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দলে রূপান্তরিত। তাঁর কর্মকুশলতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে মুগ্ধ হয়ে বাংলার মুসলমান ছাত্র ও যুব সমাজের ব্যাপকভাবে লীগের পতাকাতলে সমবেত। ফলে লীগ একটি গণ-সংগঠনে পরিণত। এর ফলস্বরূপ ১৯৪৬-এর বঙ্গীয় বিধানসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগের অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন। এ বিজয়ের ফলেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পথ ত্বরান্বিত। ৩ এপ্রিল (১৯৪৬) বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত। তাঁর নেতৃত্বে ২৪ এপ্রিল (১৯৪৬) অবিভক্ত বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত। তিনি যুক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী (২৪ এপ্রিল ১৯৪৬-১৩ আগস্ট ১৯৪৭)। ১৬ আগস্ট (১৯৪৬) মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস পালনকে কেন্দ্র করে কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে তা দমনের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন। ১৯৪৭-এর প্রথম দিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে স্বাধীন বঙ্গের দাবি উত্থাপন। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ এ দাবির বিরোধিতা করায় স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

খণ্ডিত করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে পরাজিত (৫ আগস্ট ১৯৪৭)। পাকিস্তান সৃষ্টির (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর সেখানে না এসে ভারতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলনে শরিক হন। ১৯৪৮-এর ৩ জুন পূর্ববঙ্গের (পূর্ব-পাকিস্তানে) নাজিমুদ্দীন সরকার কর্তৃক সোহরাওয়ার্দীর পূর্ববঙ্গে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি। আয়কর বিভাগের দৌরাত্ম্যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলে কলকাতা ত্যাগ করে করাচি গমন (মার্চ ১৯৪৯)। পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯৫০-এ পাঞ্জাবের ইফতেখার হোসেন খানের সহযোগিতায় জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন। এর বছর দুয়েক পরে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের সরকার-বিরোধী শক্তিসমূহের সমন্বয়সাধন করে লাহোরে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৫৩) গঠন এবং দলের আহ্বায়ক নির্বাচিত। দলকে অসাম্প্রদায়িক করার লক্ষ্যে পরবর্তীকালে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে দলের নাম রাখেন পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (১৯৫৫)। পূর্ববঙ্গ পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবেলা করার জন্য শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (সভাপতি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি), মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ) ও শেখ মুজিবুর রহমানের (সাধারণ সম্পদক, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ) সহযোগে যুক্তফ্রন্ট গঠন (৩ ডিসেম্বর ১৯৫৩)। নির্বাচনে (৮-১১ মার্চ ১৯৫৪) যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ১৯৫৪-র ২০ ডিসেম্বর মোহাম্মদ আলীর (বগুড়া) নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৫৫-তে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান দ্বিতীয় গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। গণ-পরিষদের বিরোধীদলের নেতা (১৯৫৫-১৯৫৬)। গণ-পরিষদে শাসনতন্ত্রের (১৯৫৬) খসড়া বিলের উপর আলোচনা কালে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি জানান। রাষ্ট্রের নাম 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান'-এর বদলে 'রিপাবলিক অব পাকিস্তান' রাখার পক্ষে মত প্রকাশ। ১৯৫৬-র ১২ সেপ্টেম্বর তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত। পার্লামেন্টে যুক্ত নির্বাচন বিল (১৯৫৭) পাস তাঁর সরকারের প্রধান কীর্তি; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপন। মওলানা ভাসানী 'পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি' (১৯৫৪) বাতিলের দাবি জানালে সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক সে দাবি প্রত্যাখ্যান। দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ভাসানীর আওয়ামী লীগ ত্যাগ ও তাঁর (ভাসানী) নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত (২৫ জুলাই ১৯৫৭)। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করলে রিপাবলিকান পার্টি কর্তৃক তাঁর কোয়ালিশন সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার নির্দেশ মোতাবেক প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ (১১ অক্টোবর ১৯৫৭)। জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক সরকার কর্তৃক তাঁর উপর এবডো আইন প্রয়োগ (১৯৬০) করে তাঁকে কোন নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানের প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা (১৯৬০-১৯৬৬)। ১৯৬২-র ৩১ জানুয়ারি করাচিতে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার। এ গ্রেফতারের প্রতিবাদে পূর্ববাংলায় ব্যাপক ছাত্র-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত। ছয় মাস ২০ দিন কারাবাসের পর ১৯ আগস্ট (১৯৬২) মুক্তিলাভ। ১৯৬২-র ৫ অক্টোবর এন.ডি.এফ. (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) গঠন এবং এর মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা। অতিরিক্ত খাটুনির জন্য হৃদরোগে আক্রান্ত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বৈরুত গমন (১৯ মার্চ ১৯৬৩)। অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটলে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য লন্ডন যান। সেখানে ৬ মাস অবস্থানের পর আবার বৈরুত আগমন। সেখানকার হোটেল ইন্টারন্যাশনালে প্রাণত্যাগ। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের প্রতি গভীর আস্থাশীল একজন প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত রাজনীতিবিদ। ব্রিটিশ শাসনামলে অবিভক্ত বঙ্গে মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের মাধ্যমে পাকিস্তানে সরকার-বিরোধী রাজনীতির প্রবর্তন তাঁর জীবনের এক অসাধারণ কীর্তি। এ দেশে অসাম্প্রদায়িক তথা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি চালু করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বিধায় দেশের সুধীসমাজ কর্তৃক 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' বলে আখ্যায়িত। মৃত্যু. বৈরুত, ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩।

নির্ঘণ্ট